রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

বৈশাখ ১৩৮

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৮০

সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

আষাঢ় ১৩৮০

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৮০

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

১৩৮০

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৮০

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৮০

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত -

প্রবাসী

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৮০

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
প্রথম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৮০ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিদ্যুৎ সরবরাহ

বিদ্যুৎ-এর প্রাচীন নাম ক্ষণপ্রভা, চপলা ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ এই আছে এই নাই এবং স্থিরভাবে চির বর্তমান থাকার ধার দিয়াও যায় না। আধুনিক মানুষ কিন্তু সেই অস্থিরতার প্রতীক মেঘবক্ষে গতিশীলা সৌদামিনীকে বাঁধিয়া স্থির অচঞ্চল শক্তিরূপে নিজের জীবনযাত্রার সুবিধা সৃষ্টির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। বিদ্যুৎ এখন মানুষের পথঘাট গৃহ আলোকিত রাখিতেছে, পাখা চালাইতেছে, রন্ধনে, যন্ত্রচালনায়, সংবাদ প্রেরণে, দূরত্ব দূর করিয়া মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনে, বহু ও বিভিন্নভাবে মানবজীবন সুগম ও আনন্দময় করিতে সহায়ক হইতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এখন এতই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহা না থাকিলে আধুনিক মানুষের জীবনধারণ মহা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের বহুগ্রামে যদিও এখনও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হইতেছে না, তথাপি বহু সহস্র শহরে ও বৃহৎ বৃহৎ গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার জীবনের অঙ্গরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিদ্যুৎ ব্যবহার এমনই সহজ সরলভাবে বাড়িয়া চলিতেছিল যে ভারতের মানুষ সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় দলাদলি জর্জ্জরিত সর্ব্বকর্ম্ম ব্যবস্থা ও শাসনের আসরে বিরাজমান রাজনৈতিক মহারথী এবং তাঁহাদের আমলাগণের স্পর্শে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়টা এমন একটা রূপ গ্রহণ করিল যাহাতে চিরপ্রভা পুনরায় ক্ষণপ্রভা হইয়া দেখা দিলেন। দেশের মানুষ যেখানে অন্ধকারে আলোক, বায়ুশূন্যতা নাশ করিয়া বায়ু সঞ্চালন আয়োজন, যানবাহন যন্ত্র পরিচালনা, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে জীবনযাত্রা

সুগম ও আধুনিক রীতিসম্মত করিতেন; সেই সকল রীতি পদ্ধতি আয়োজন ব্যবস্থা অকস্মাৎ একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার আবর্তে গিয়া পড়িল। ফলে জীবনযাত্রা কাজ কারবার, যন্ত্র ব্যবহার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চলাফেরা প্রভৃতি সকল কিছুই প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ সরবরাহ কখন থাকে, কখন থাকে না তাহা আর কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব থাকিতেছে না। হঠাৎ আলো নিভিয়া অন্ধকার প্রকট হইয়া উঠিতেছে, যন্ত্র থামিয়া গিয়া কাজকর্ম অচল হইতেছে, নানাভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক লোকসান ও দুঃসহ কষ্টের কারণ সৃষ্টি হইতেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ কিন্তু অতি সহজসাধ্য সাধারণ ক্ষমতাজাত ব্যবস্থার কাজ। বাষ্পের শক্তিতে অথবা তৈল জ্বালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদক "জেনারেটর" যন্ত্র চালাইয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করা কিম্বা জলধারার গতিবেগ ব্যবহারে "টারবাইন" দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি সজননা, কোন কিছুই সাধারণ বুদ্ধির যন্ত্রবিদ্‌দের পক্ষে কঠিন কার্য্য নহে। এই কার্য্য পৃথিবীর সকল দেশেই করা হইতেছে এবং কেহই ইহার জন্য এমন কিছু করিতে বাধ্য হইতেছেন না, যাহা লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ মানুষ লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে সর্বদাই সক্ষমতার সহিত করিতেছেন না। ভারতের যন্ত্রবিদ্ ও কারখানা পরিচালকগণ তুলনামূলকভাবে অপরাপর দেশের যন্ত্রকলাকৌশলীদিগের অপেক্ষা কিছু বেশী অকর্ম্মণ্য নহেন। উপরওয়ালাদিগের নিকট প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইলে ভারতীয় কর্ম্মীগণ যে কোন দেশের যে কোন কর্ম্মীর সমতুল্যভাবে কর্ম্মক্ষমতা দেখাইতে পারেন। সুতরাং যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্য্য ভারতে যথাযথভাবে না হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই কথাই মনে হইবে যে দোষ কর্ম্মীদিগের নহে; উপরওয়ালাদিগের অবহেলা, গাফিলতি, দীর্ঘসূত্রী ধরণ ধারণ বা পারস্পরিক কলহ বিবাদ হইতেই সকল গোলযোগের সূত্রপাত হইতেছে। বস্তুতঃ ভারতের সর্ব্বত্রই যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্য্যে বাধা বিপত্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহার মূলে আছে ব্যবস্থাপক সরকারী কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের নির্দেশ দিবার মালিক শাসনকার্য্যভার প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগণ। কোন্ যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী সরবরাহের ভার পাইবে, কোন্ কনট্রাকটর মেরামত ইত্যাদি করিবে, ইহার জন্য অর্থব্যবস্থা কিভাবে কখন করা হইবে, এই সকল কথা লইয়াই যত গোলযোগ। রেষারেষি, দলাদলি, সুপারিস, লেনদেন ইত্যাদি নানান কথার উত্থাপনা। ফলে সকলের গৃহ অন্ধকার, কাজকর্ম বন্ধ, অকারণ হায়রানি ও অশেষ লোকসান। আশ্চর্য্যের বিষয় যে লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ কারবারী প্রভৃতি এই কষ্ট ও লোকসান বরদাস্ত করিতেছেন। অন্য কোন দেশ হইলে এইরূপ কর্মক্ষমতা-হীনতা যাঁহাদের তাঁহারা নিশ্চয়ই নিজেদের প্রভুত্ব হারাইয়া উচ্চপদ হইতেই অপসৃত হইতেন। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন অভিযোগ না করিয়া কষ্টভোগ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত। ইহা সম্ভবতঃ সাম্রাজ্যবাদীদিগের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া দুইশত বৎসর থাকিবার ফল।

জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সরবরাহ জীবনযাত্রার একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং সেই কারণে ঐ সকলের সরবরাহ চালিত রাখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। মানুষের অতি প্রয়োজনীয় যাহা তাহার সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করা একটা সামাজিক অপরাধ। যাহারা ঐ বাধা সৃষ্টি করে তাহাদের আইনতঃ দণ্ডনীয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এদেশে তাহারা সাজা ত পায়ই না বরঞ্চ নানাভাবে লাভবান্‌ই হয়। এইরূপ পরিস্থিতি সমাজকল্যাণ বিরুদ্ধ এবং দেশে সমাজবাদ জাতীয় আদর্শের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রচারিত হয় সে দেশে এই প্রকার সমাজ-বিরুদ্ধতাকে কদাপি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইতে পারে না। ইহার দমন যাহাতে হয় সেই চেষ্টা সকলের করিতে হইবে।

সমাজের সকল ব্যক্তির সুখ সুবিধা ও মঙ্গল যেসকল বস্তু বা কার্য্যের উপর নির্ভর করে সেইসকল বস্তু উৎপাদনে ও কার্য্য সাধনে যাহারা বাধার সৃষ্টি করে তাহাদের এই সমাজ-বিরুদ্ধতা দমন কে করিতে পারে? উচ্চপদস্থ

মন্ত্রী স্থানীয় ব্যক্তিগণ সকল সময়ে এই কার্য্য সাধনে সক্ষম থাকেন না বলা যাইতে পারে। যথা কলিকাতায় একটি বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কলাকৌশল বিচারক বৈঠকে শ্রীযুক্ত সি. সুব্রহ্মণ্যম কিছুকাল পূর্বে বলিয়াছেন যে "আমাদের বৃহৎ মূলধন লাগাইয়া কার্য্য ব্যবস্থার আয়োজন আছে কিন্তু তাহাতে কোন উৎপাদন কার্য্য হয় না। আমাদের বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্জননার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ শক্তি উৎপন্ন হয় না। আমাদের ইস্পাতের কারখানা আছে কিন্তু তাহাতে ইস্পাত উৎপাদন হইতেছে না।" শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যম্ ইস্পাত ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মন্ত্রী ছিলেন; এখন তিনি কারখানা, বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশল ব্যবস্থার মন্ত্রী। তাঁহার কথা হইতে মনে হয় যে ভারত সরকারের মন্ত্রীদিগের বস্তু উৎপাদন অথবা কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কোন ক্ষমতাই নাই। তাঁহারা শত শত কোটি টাকা দেশবাসীর নামে ঋণ করিয়া ব্যয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবাসী যে সেই ব্যয়ভার স্কন্ধে লইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন তাহা হইতে মন্ত্রীগণ ভারতবাসীর কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেছেন না। এইরূপ ব্যবস্থায় ঐ বিরাট ঋণ বা রাজস্বজাত মূলধন একভাবে নিষ্ফল নিয়োগে জলে পড়িয়াছে বলিলে কোন ভুল হয় না। ভারতের মানুষ এভাবে অপব্যয়জাত ব্যবস্থার ফলে মাথা পিছু যে ঋণের বোঝা বহন করিতেছেন তাহা অল্প নহে। রাষ্ট্রনীতির কোন আদর্শ আওড়াইয়া ঐভাবে গরীব দেশের মানুষকে অকারণ ঋণভার বহাইবার কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে না। অন্ততঃ একথা সকলেই বলিতেছে ও বলিবে যে অর্থের অপচয় করিয়া কোনও দায়িত্ব না থাকা খুবই সুখের কারবার। সেই সুখ উপভোগ করিতেছেন শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রের দলপতি ও উপদলপতিগণ। এবং দায়িত্বহীনভাবে কার্য্য পরিচালনা হইতে লাভবান্ হইতেছেন আমলাগণ ও তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত সরবরাহকারী, বিক্রেতা, কনট্রাকটর প্রভৃতি। ক্ষতির ধাক্কা সামলাইতেছেন শুধু রাজস্বদাতা ও ঋণের বোঝা বহনকারী ভারতবাসী জনসাধারণ।

রাষ্ট্রীয় গমের ব্যবসার আরম্ভ

রাষ্ট্রীয় ভাবে গমের আড়ত খুলিয়া গম ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে ও তাহার ফলে নানান স্থলে গোলযোগেরও সূচনা হইয়াছে। কোথাও যে-সকল ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের মত পরিমাণে গম আছে তাহারা সরকারী ভাবে ধার্য্য মূল্যে গম দিতে অনিচ্ছুক দেখা যাইতেছে। শুনা যাইতেছে যে বাজারে যে স্থলে এক কুইনটাল গমের মূল্য একশত দশ টাকা সেই স্থলে সরকারী ক্রেতাগণ ক্রয়মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন মাত্র ছিয়াত্তর টাকা। মূল্যের অল্পতা লইয়া হাঙ্গামা হইতেছে বিহারে এবং কোথাও কোথাও এই কারণে চাষীদিগের উপর সরকারী লোকের দ্বারা বল প্রয়োগের কথাও শুনা গিয়াছে। মহারাষ্ট্রে যাহারা খুচরা গম বিক্রয় করিত তাহাদিগের মধ্যে শতকরা আশিজন দোকান বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে বহু দালাল, লরি চালক এবং গুদাম ঘরের ব্যবস্থাপক বেকার হইয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের যাহাতে অনিষ্ট না হয় সেই ভাবে চলিবেন ধরিয়া লইলে গভর্ণমেন্টের উচিত হইত যথাসম্ভব ঐ সকল ব্যবস্থা সরকারী ভাবে মোতায়েন রাখিয়া কার্য্য ব্যবস্থা করা। কোনও কিছুর ভার গ্রহণ করিলেই যদি গভর্ণমেন্ট সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সকল আয়োজন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে গভর্ণমেন্টের দ্বারা জাতির মঙ্গল সাধন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। গঠন কার্য্যে অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন রীতি পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় কিন্তু সকল পথ ঘাট আফিস গুদাম ও বিশেষ করিয়া কর্ম্মীদিগকে সরাইয়া না দিলে নূতন পন্থা অনুসরণ হইতে পারে না, এইরূপ ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই। যে সকল ব্যক্তি গম ক্রয় বিক্রয় করিতেন তাঁহাদিগকে যথা সম্ভব সরকারী কার্য্যের সহিত সংযুক্ত রাখিতে পারিলেই কার্য্য চালিত ভাবেই গভর্ণমেন্টের হস্তে চলিয়া যাইত। এখন যে খুচরা বিক্রয়কারীগণ গমের ব্যবসা হইতে বাহির হইয়া যাইল তাহাতে কালোবাজার প্রবলতর হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইল। মহারাষ্ট্রে যাহা হইল ভারতের সর্ব্বত্রই

সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। ভারতের সকল গম খাইবার মানুষকে যদি রেশন কার্ড দিতে হয় তাহা হইলে ভারত ব্যাপী এমন একটা পরিস্থিতি হইবার সম্ভাবনা যাহা অতি ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করিতে পারে। এখন অবধি যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে যে সরকারী ব্যবস্থা জন সাধারণ ও পূর্ব্বকার ব্যবসায়ীদিগের সহিত সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে না। সরকারী কার্য্য দেশবাসীর বিরুদ্ধতা জাগাইয়া তুলিতেছে বলিয়া মনে হয় এবং আমরা মনে করি না যে তাহা জাতির মঙ্গলের দিক দিয়া একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ।

কর্ত্তব্যে অক্ষমতা ও কর্ম্মে ইস্তাফা

"ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকা। ইহার কোন রানৈতিক প্রচার উদ্দেশ্য নাই; রাজনৈতিক বিষয়ে এই পত্রিকা নিরপেক্ষ। বিগত ৭ই এপ্রিল সংখ্যাতে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার লেখেন, "সাবাস, করণ সিংহ! কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রী করণ সিংহ একটি অ্যাভ্রো বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত হইয়া কয়েকজন ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়ায় নিজ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে পত্র লেখেন। শ্রীকরণ সিংহ ঐ দুর্ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ঐ সকল ব্যক্তির প্রাণ নাশ হওয়ায় বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন ও ঐ বিষয়ের জন্য পরোক্ষ ভাবে তাঁহার নৈতিক দায়িত্ব আছে বিবেচনা করিয়া কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়াছিলেন। এইরূপ সৎসাহস অন্য মন্ত্রীরা দেখাইলে আমরা খুবই খুশী হইতাম। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার যখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী রেলওয়ে মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি একটা রেল দুর্ঘটনা হইবার পরে কার্য্যে ইস্তাফা দিয়াছিলেন। এ কথা ঠিক যে শ্রী করণ সিংহ প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে নিজের কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাতে দেশবাসীর নিকট তাঁহার সুনাম ও যশ বৃদ্ধিই হইয়াছে।

"আমরা কি আশা করিতে পারি যে অপরাপর মন্ত্রীগণও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে অক্ষমতা ঘটিলে পদত্যাগ করিবেন? তাহা যদি করেন তাহা হইলে দেশের শাসন ও অন্যান্য কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে উন্নতি ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতা ক্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিবে। সম্প্রতি যে ধানবাদে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণ হইল সে বিষয়ের কি হইল?"

আমরা যতটা জানি আমাদের অধিকাংশ মন্ত্রীগণই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া উচ্চ-পদস্থদিগকে বাঁচাইয়া নিম্ন স্তরের কর্ম্মচারীদিগের স্কন্ধেই দোষ চাপাইয়া কার্য্য শেষ করেন।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়

এক-একজন উপার্জ্জক ব্যক্তির যদি তিনজন করিয়া পোষ্য থাকে তাহা হইলে ভারতের ৫৬ কোটি মানুষের মধ্যে চৌদ্দ কোটি মানুষ রোজগার করেন ধরিতে হয়। বস্তুতঃ আরও কয়েক কোটি লোকও কিছু কিছু কাজকর্ম্ম করেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় ২০ কোটি মানুষ কর্ম্মক্ষম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি সরকারী চাকুরী করিয়া দিন গুজরান করে তাহাদিগের সংখ্যা ৪০।৫০ লক্ষ। ইহাদের মাসিক রোজগারের নিম্নতম মান যাহাতে অন্ততঃ ১৮৫ টাকা হয় এখন সেই রূপ পরিকল্পনা সরকারী চিন্তাশীলদিগের মনে জাগ্রত হইয়াছে। অথাৎ উপার্জ্জনকারীর পরিবারে লোকেদের জীবনযাত্রার জন্য মাথা পিছু ৪৬ টাকা অবধি ব্যয় করিবার ক্ষমতা যাহাতে থাকে, ব্যবস্থা সেইরূপ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ৪৬ টাকাতে মানুষ একমাস কি খাইতে পারে, কিরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিতে পারে, কি প্রকার বাসস্থানে বাস করিতে সক্ষম হয়, ঔষধ ও চিকিৎসা লাভ সম্ভব হয় কি না, শিক্ষা প্রাপ্তির কিরূপ সম্ভাবনা থাকে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই আন্দাজের উপর নির্ভর করে। কারণ, একজন মানুষ যদি উপযুক্ত খাদ্য খাইতে যায় তাহা হইলে তাহার মাসিক ৪৬ টাকাতে শুধু খাওয়াই কোনও মতে চলিতে পারে। বৎসরে যদি ৪ খানা কাপড়, ৪ খানা কুর্ত্তা, ৪ খানা ফতুয়া ও এক জোড়া জুতা প্রয়োজন হয়; ঐ সকলের উপর মাসিক ব্যয় ৭।৮ টাকা হয়। গৃহে চার ব্যক্তি থাকিলে এবং গৃহ ঠিক ভাবে রাখিতে ভাড়া ইত্যাদি সমেত যদি মাসিক কুড়ি টাকা খরচ হয় তাহাতেও মাথা

পিছু মাসিক ৫।৬ টাকা না ধরিলে চলে না; অর্থাৎ খাওয়া ব্যতীত অপর ব্যয় মাসিক ১৫।১৬ টাকা হইবেই। সুতরাং খাওয়ার উপর দৈনিক এক টাকা ধরিলে সামাজিক প্রয়োজনের ব্যয়, সঞ্চয় ইত্যাদির জন্য কিছুই থাকে না বলা যাইতে পারে। তারপরে আছে একটা বিরাট বেকারত্বের সমস্যা। কুড়ি কোটি মানুষের মধ্যে যদি ৪।৫ কোটি বেকার থাকেন তাহা হইলে ঐ বেকার-দিগের সংসার চালাইবার ভার পড়ে যাহাদের কাজ আছে তাহাদের উপর। অর্থাৎ অনেকেরই যাহা রোজগার হইবে তাহার কিছুটা অংশ বেকার আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালনের জন্য খরচ হইবে। ইহাতে নিজেদের সংসার চালাইতে যতটা অর্থ প্রয়োজন হইবে তাহা হইতে কিছুটা অপরকে দিলে পরে নিজেদের টানাটানি হইবে। সভ্য জগতের অধিকাংশ দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সরকারী খরচে হয় বলিয়া ঐ সকল খরচের জন্য কাহাকেও নিজেদের অল্প উপার্জ্জন হইতে কিছু দিতে হয় না। তৎপরে যাহাদের কাজ থাকে না তাহাদের ভরণ পোষণের ভারও সরকারের উপরেই থাকে। আত্মীয় বন্ধুদের স্কন্ধে সে ভার ন্যস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিনা খরচে শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি হইবার পরে সরকারী বেকার ভাতা থাকার ফলে কাহাকেও সরকারী কাজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে করিতে হয় না। আমাদের দেশে শুধু সমাজবাদ বা সোসিয়ালিজম কথায় প্রচারিত হইয়াই শেষ হয়। কার্য্য ক্ষেত্রে কোনও প্রকার সামাজিক দায়িত্বই সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র পূর্ণরূপে বহন না করিলে ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যয়ভার কখন কি পরিমাণে কাহার উপরে পড়িবে তাহা অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়। অর্থাৎ কাহারও অধিক ও কাহারও কম। সুতরাং কাহার কি পরিমাণ উপার্জ্জন হইলে জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও অভাবের ভারে ভারাক্রান্ত হইবে না, সে কথা স্থির-নিশ্চয় ভাবে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা যদি অনিশ্চয়তার খপ্পরে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে জাতীয় অর্থনীতির অর্থ বিচারও মূল্যহীন হইয়া যায়। এই কারণেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কোন্ ক্ষেত্রে কতটা থাকিবে তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক, এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজবাদ প্রভৃতি কথার কোনও অর্থ থাকিবে না।

নববর্ষ

ষাট বৎসরেরও পূর্ব্বে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যেকথা বলেছিলেন আজও তাহা সেই যুগের মতই কঠোর কঠিন সত্যের রূপ ধারণ করে' প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি বলেছিলেন :

"নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে—সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এই জন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায়নি—আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায়নি। এই জন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিণে বাতাসে নবীনতার আশিষ মন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়—এই যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়—কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

"কিন্তু মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মত আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মতো দিকে দিগন্তে চমকিত হতে থাকে।"

অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীলতা যেখানে চিরকালের নিয়ম অনুসরণ করে চলতে থাকে সেখানে পুরাতনের যাওয়া আর নূতনের আসা সহজ পথে সাবলীল গতিতে চলে। সে যাওয়া-আসার মধ্যে কোনো উন্মত্ত আবেগ

লক্ষিত হয় না। পাতা ঝরে গিয়ে নূতন পাতার উদ্গম হয় শান্তভাবে; তার মধ্যে কোন উদ্দামতা থাকে না। কিন্তু যেখানেই মানুষের প্রাণশক্তি সক্রিয় হয়, সেখানেই নূতনের আগমন ঘোরতম আবর্তের ভিতর দিয়া নিজ আগমন ব্যক্ত করে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যেখানে মানুষ আসিয়াছে সেখানেই সে তাহার ভাঙ্গাগড়ার খেলা সৃষ্টি করিয়া একটা নিদারুণ আলোড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কবি সেই জন্য বলিয়াছেন :

"মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশি দিনের সন্তান নয়, তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে যেন প্রাচীন। কেননা, সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত—যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারছে না। সে আপনার শতসহস্র সংস্কারের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে—সেই তার জগৎ আপনার রুচি-বিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখতে দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শতসহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান, হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশঃ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে—প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেই জন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্মস্থানে গিয়ে পড়ে—তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, 'প্রভু, তুমি আমাকেই মারছ'; বলি 'আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা করো'; কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি, 'তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না।'

"মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে।........."

অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কালের উপস্থিতি আছে তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কোন্ দিনটি পুরাতন, কোন্‌টিই বা নূতন তাহা কেহ দেখিতে পায় না। দিন বিশেষকে প্রকৃতি নববর্ষ বলিয়া চিহ্নিত করেন নাই। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির আসরে শান্ত, নির্মল ও সহজ। মানুষ যেখানে পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নূতনকে প্রাণবান্ করে প্রতিষ্ঠা করতে যায় সেখানেই প্রলয়ের ধ্বংসলীলা আর সৃষ্টির প্রচণ্ড সংগ্রাম। তাই কবি বলেছেন :

"মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখীর গান তার গান নয়, অরুণের

আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

"বিশ্ববিধাতা সূর্য্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজ-গৌরব দিয়েছেন; তিনি তাকে সহজ জীবন দেননি। সেইজন্যেই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

....

মানুষের জীবনে পুরাতনকে অতিক্রম করাও যুদ্ধ, নূতনকে অবলম্বন করিয়া প্রগতির পথে অগ্রগমনও যুদ্ধ:

"মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, 'তুমি বীর।' তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন।.........তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, 'হে বীর জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আর একটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আর একটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ করো; তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।'

শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। শক্তি আমাদের তিনি দিয়াছেন। মোহের বশে আমরা নিজেদের দুর্ব্বল মনে করি।

"আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শানিত অস্ত্র সব ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। সে-সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপর গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। এ-সমস্ত তো সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণ-হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো —নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্ব্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে—সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্মঅবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক—জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।

"না নাএ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মত গ্রহণ করো।

....

"হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি—তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিন বলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টি-লীলার নব আনন্দসঙ্গীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তাহলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব। তা হলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

কবির বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ। তখন সাম্রাজ্যবাদের নিস্পেষণ জর্জ্জরিত ভারতবাসী মুক্তি কোন্ পথে অনুসন্ধানে ব্যাকুল প্রাণে দিকে দিকে ধাবিত। কেহ জনমত গঠন চেষ্টায় আন্দোলনে নিযুক্ত; কেহ কঠিন হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রাণ যাইলেও আদর্শ উপলব্ধি করিতে হইবে পণ করিয়া মহাবলশালী উৎপীড়ক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, কেহ নিজদেশ হইতে বিতাড়িত, কেহবা দ্বীপান্তরবাসী ও কারারুদ্ধ। কবির বাণী সেই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও যেমন করিয়া আমাদের প্রাণে সমর্থনের সুরে ঝংকৃত হইয়াছিল আজ সাম্রাজ্যবাদ অপসৃত হইয়া গিয়া থাকিলেও অপরাপর বহু দুঃখ কষ্ট, নিস্পেষণ, উৎপীড়ন, শোষণ ও দুর্নীতির সক্রিয় আবির্ভাবে মানুষের মানবীয় অধিকার রক্ষা, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় সেইরূপ সবল কর্ম্মশীলতার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

মানুষকে যে শুধু শাসকদিগের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিয়া জাতীয়তার আদর্শ রক্ষা করিতে হয় এমন নহে। বহু-ক্ষেত্রে শাসক দিগের শক্তি অধর্ম্ম বিনাশে সক্ষম হয় না। তখন জনসাধারণকেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সমাজের অঙ্গে অঙ্গে যখন দুর্নীতি ও অধর্ম্ম শাখা প্রশাখা বিস্তার করে; তখন সমাজের সকল মানুষের কর্ত্তব্য হয় সেই সকল মানবীয়তা বিনাশক অবয়বগুলিকে উৎপাটিত করিয়া ফেলা।

পাকিস্থান বাংলাদেশ ভারত

বর্ষশেষে পাকিস্থান-বাংলাদেশ-ভারতের সমস্যা-সমূহের সমাধান হয় নাই পাকিস্থান এখনও বাংলাদেশের আদি জন্মদাতা মূল দেশ হিসাবে গণ্য হইবে কি না এবং বাংলাদেশ আবার পাকিস্থানে পুনঃসংযুক্ত হইবে কি না, ইত্যাদি কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "সমাপ্তের" তালিকায় লিখিত হইয়া গিয়া থাকিলেও পাকিস্থানের দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তিতে তাহা বড় অক্ষরেই লেখা রহিয়াছে। পাকিস্থান বাংলাদেশকে নিজের অংশ বলিয়া বিবেচনা করে ও সেই কারণে তাহার রাষ্ট্রীয় পার্থক্য স্বীকার করে না। মুজিবুর রেহমান বলেন যে ঐ স্বীকৃতি না আসিলে পাকিস্থানের যুদ্ধবন্দী ফিরাইয়া দিবার অভিযোগের কোনও বিচার হইতে পারে না। কারণ পাকিস্থান যদি বাংলাদেশ বলিয়া কোনও পৃথক দেশ আছে বলিয়াই স্বীকার না করে তাহা হইলে সেই দেশের সহিত কোনও বিষয় লইয়া আলোচনা কি করিয়া চালাইতে পারে? রাষ্ট্রপতি ভুট্টো পৃথিবীর সকল জাতিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে পাকিস্থানের বাংলাদেশের উপর দখল বজায় রাখার চেষ্টার মধ্যে রাষ্ট্রনীতি বিরুদ্ধ কোন অপরাধ প্রবণতার কথা উঠিতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ বিদ্রোহ করিয়াছিল সুতরাং পাকিস্থানের সৈন্যগণ সেই বিদ্রোহ দমন হেতু যাহা করিয়াছিল সব কিছুই সামরিক রীতি অনুগত। ভুট্টো সম্ভবত সামরিক অপরাধ কথাটার অর্থই বুঝিতে চাহেন না। কারণ বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঁচলক্ষ অসহায় নারীদিগের চরম নির্য্যাতন, বাছাই করিয়া শিক্ষিত জনগণকে, উকিল, অধ্যাপক, গায়ক, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ্ প্রভৃতিকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা, কারখানা ও ধানের ক্ষেত উড়াইয়া জ্বালাইয়া মানুষকে অনাহার-মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য করা, একক্রোটি নরনারী শিশুকে তাড়াইয়া দেশের বাহিরে বহিষ্কার করা ইত্যাদি গণ-হত্যাকর ও সর্ব্বসাধারণের উপর চরম উৎপীড়নকর কার্য্যকে সামরিক রীতি অনুগত বলিলেই তাহা বিশ্ব-মানবের দরবারে গ্রাহ্য হইবে মনে হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার যাহা করিয়াছিল তাহার জন্য বহু জার্মান উচ্চপদস্থ সামরিকের শাস্তি হইয়াছিল। সেই সকল বিচার কাহিনী "সামরিক অপরাধ" বিচারের কাহিনী বলিয়া ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। শেখ মুজিবুর রেহমান যে পাকিস্থানের কোন কোন সামরিক-দিগের ঐ রূপ বিচার করিতে চাহিতেছেন, বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহলে তাহা কোন অন্যায় কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। যতটা জানা যায় ঐ অভিযোগ ৯৩০০০ হাজার যুদ্ধবন্দীর মধ্যে মাত্র অল্প কয়েক শত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই আনয়ন করা হইবার সম্ভাবনা।

ভারত সরকার যে ৯০০০০ হাজার যুদ্ধবন্দির অবশিষ্ট ৯২৫০০ বিরানব্বই হাজার পাঁচ শতর অধিক বন্দীকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যদি হইয়া যায় তাহা হইলে ভুট্টোর আর কিছু বলিবার থাকিবে না এবং পুরাতন পশ্চিম পাকিস্থানে যে সকল বাঙ্গালীকে তিনি আটকাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই সকল বাঙ্গালীরা কোনও অপরাধ করে নাই যাহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে। ভুট্টো কষ্টকল্পিত কোনও অভিযোগ যদি বা উঠাইবার চেষ্টা করে তাহাও জগতের দরবারে কেহ বিশেষ বিশ্বাস করিবে বলিয়া মনে হয় না। ভুট্টো মনে মনে যদি বাংলাদেশকে পূর্ব্ব পাকিস্থান বলিয়াই ভাবিয়া চলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিশ্বের যে

এরপর ১০৫ পাতায়

রবীন্দ্রনাথ ঃ খেয়া

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য

'খেয়ার, পূর্ববর্ত্তী কাব্যগুলিতে যে নিসর্গপ্রীতি ও মানবপ্রীতি দেখা গিয়াছে কবির জীবনে উহারা আলাদা আলাদা দুইটি বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়; উহারা তাঁহার বিশ্বানুভূতিরই দ্বৈতপ্রকাশ। নৈবেদ্যের পূর্ববর্ত্তী কাল পর্যন্ত এই বিশ্বানুভূতি প্রধানতঃ রোমান্টিক ভাবাপ্লুতার দ্বারা সম্মোহিত হইয়াছে এবং নৈবেদ্যে আসিয়া কবির ভাবময়তা রোমান্টিক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ক্রমে মিষ্টিক হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ বিশ্বানুভূতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। একরূপ ভাগবত-ভাব তাঁহার অন্তর চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে ক্রমে 'প্রেয়' হইতে 'শ্রেয়ের' অভিমুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। 'খেয়াতে' আসিয়াই সেই শ্রেয়-অভিসার-পথে কবি যেন রহস্যময় 'অরূপে'র দিব্য আলোকে শুচিস্নান করিয়াছেন। কী যেন এক স্পর্শে কবির তনুমনপ্রাণ স্পন্দিত, স্ফুরিত ও শিহরিত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা সেই অবাঙ্‌মনসগোচর 'অরূপ'কে রূপায়িত করা যায় না বলিয়াই বোধ হয় রহস্যময়তার আশ্রয় কবিকে লইতে হইয়াছিল। সেই লীলাঘন রহস্যময়তা, কি ভাবে, কি ইঙ্গিতে, কি ইশারায় এমন কি কবির অনুভব ক্রিয়ার অন্তর্লীন ধ্যানের মধ্যেও একরূপ রোমাঞ্চিত ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া কবির অন্তর্জীবনকে ধীরে ধীরে পরমবৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছে—যাহার রসপূর্তিতে দেখিতে পাই গীতালি, গীতিমাল্য, ও গীতাঞ্জলির ভক্তি অর্ঘ্যগুলি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'খেয়ার' যুগটি ছিল **political agitation**-এর যুগ। ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন লইয়া দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। সেই উত্তেজনার আগুন রবীন্দ্রনাথকেও যে বিশেষভাবে উত্তপ্ত না করিয়াছিল তাহা নয়। তাহার পরিচয় ছড়াইয়া আছে তাঁহার সেই সময়কার অনলময়ী বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রাণউদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে। ইহারই তিন-চার বৎসর পূর্বে কবি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দর্শন করিয়াছিলেন পত্নী-বিয়োগের মাধ্যমে। এবং বৎসর না ঘুরিতেই তাঁহার মধ্যমা কন্যার মৃত্যু ঘটে। একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে স্বদেশী উত্তেজনা—এইরূপ একটি প্রবল মানসিক অস্থিরতার পটভূমিকার মধ্যেই 'খেয়া'র উৎপত্তি। অথচ, 'খেয়া' কাব্যখানির বিষয়বস্তুতে না আছে মৃত্যুর ভীষণতা, না আছে স্বাদেশিকতার কলরব, আছে শুধু প্রেমাস্পদের নিকট হৃদয়খানিকে উজাড় করিয়া মেলিয়া ধরা। "বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে, তোমার এবার সময় হবে কবে।"—এই 'প্রতীক্ষা'। এমন একটি বিস্ময়কর বৈপরীত্য কেমন করিয়া সম্ভব হইল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

কিন্তু না। এই বৈপরীত্যই রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের একটি স্বরূপ-লক্ষণ, ইহার পরিচয় আমরা পাই 'খেয়া' লিখিবার বহুপূর্বে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে লিখিত তাঁহার 'পঞ্চভূতের' ডায়েরী'তে। তখনও তাঁহার জীবনে মৃত্যু ও স্বদেশী উত্তেজনার ঢেউ এমন জোয়ার তুলিয়া আসে নাই; কিন্তু "ভূতনাথবাবু" প্রকৃত পৌরুষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন, "অসীম প্রতিভাধর কর্ম্মী পুরুষেরা অন্তরে অন্তরে বিজনবাসী, উদাসীন, যোগী। নেপোলিয়ন সহস্র কর্ম ও যুদ্ধের দ্বারা পরিবৃত্ত থাকিয়াও অন্তরে অন্তরে একা, নির্জ্জন ও উদাসীন।" আসলে, উক্তিটি রবীন্দ্রনাথেরই কবি-প্রকৃতির রূপকভাষ্য।

"তুমি কাজ দিলে কাজেরই সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি।"

(খেয়া—'তার'

'এই কাজের সঙ্গেই অসীম ছুটি' কবির জীবনে অপূর্ব ঐক্য আনিয়া দিয়াছে বলিয়াই তাঁহার অন্তরের গভীরে যে একতারা রহিয়াছে উহা একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে উত্তেজনা, উভয়কেই পশ্চাতে রাখিয়া একাকী আপন মনে বিচিত্রসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে।

"হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
একতারাতে একটি যে তার
আপন-মনে সেইটি বাজা।

(খেয়া—'সীমা')

প্রকৃতপক্ষে, সংসারের শোক, দুঃখ, মৃত্যু অথবা কলরবময় উত্তেজনা কবির 'বহিঃআমি'টিকে যতবেশী আন্দোলিত করিয়াছে, তাঁহার অন্তর্'আমি"টি ততবেশী "আবৃত্তচক্ষু" হইয়া অমৃতের প্রতি, অন্তর্যামীর প্রতি জ্যা-মুক্ত শরের মত স্থির লক্ষ্যে ধাবিত হইয়াছে। তাই—

"হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেল।"

(খেয়া—সমাপ্তি)

বাউল ভাষায় বৈরাগী অন্তরের কী নিবিড় অনুরাগ! বোধকরি, ইহাই বৈষ্ণবের প্রেমাভিসার; ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'গোধূলি লগন'।

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।

তাই অন্তরে অন্তরে কবি পুলকিত; কেননা তিনি অসীমের আনাগোনার ইসারা পাইয়াছেন:

"আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।"

(ঘাটের পথ)

যিনি বসিয়া থাকেন তিনি সংসারেরও নহেন, সংসার-বৈরাগ্যেরও নহেন, তিনি উভয়ের সন্ধিস্থলে বসিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লন 'তটস্থ' কবি-বাউলকে।

"ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

(শেষ-খেয়া)

তিনি 'কৃপা' করিয়া এমনিভাবে অনুরাগভরে ডাকিয়া লন বলিয়াই তো কবির অন্তর-ফুল ফোটে। তাঁহার তীব্র ব্যাকুলতার অশ্রুসাগরে—

"একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রুসাগর
সলিল মাঝে।"

(প্রভাতে)

এই ভক্তির ফুল-ফোটানো বড় সহজ নয়। কেবল সাধন, ভজন, পূজন, আরাধনা দ্বারাই ইহা লভ্য নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন দৈবী অনুকম্পা, অহৈতুকী কৃপা—

"যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।"

(ফুল-ফোটান)

তাই কবি-অন্তর ভোর হইয়া আছে বাসর ঘরের নববধূর মতো—কখন তাঁহার বঁধুয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইবে—

"তোরা আমায় জাগাসনে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।"

(জাগরণ)

চেতন জগতের কলকোলাহল অপেক্ষা বরং গভীর অচেতনে ঘুমাইয়া থাকিয়া তাহার প্রতীক্ষা করাও ভাল।

"ওগো আমার ঘুম যে ভালো

গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারই আপন পরশনে।"
(জাগরণ)

'সে' আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে—এই সুখের স্বপন বি-চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। সে ভাবিতে থাকে,

"সে আসবে মোর চোখের 'পরে
সকল আলোর আগে
তাহারই রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হয়ে জাগে।"
(জাগরণ)

শুধু তাই নয়, তাহাকে ধরিতে হইবে বলিয়া কবি নজেকেও ধরিয়া রাখিবেন আত্মসমাহিত রূপে :

"এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণবঁধু হে—
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরাণে পরশমধু হে।"
(মুক্তিপাশ)

এই অরূপ-চেতনায় কবিচিত্ত যখন রূপে রূপে অপরূপ ইয়া উঠিতেছে হঠাৎ তখন কোথা হইতে কবির সুখের পনকে ছিন্ন করিয়া দিয়া দেখা দিল তাঁহার 'দান'।

"এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্ব'লে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—"
(দান)

এ কিসের ইঙ্গিত? সুখ নয়, স্বপন নয়, "নয় এ লা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি,— এ যে ভীষণ রবারি।"

এই তরবারি একটি মূর্তিমান 'অশান্তি'। মানুষ কে এড়াইয়া চলিতে চায়। ধর্মবোধের প্রথম যে রয়া "শান্তম্", মানুষ সেই অবস্থায় কেবল সুখকেই পাইতে চায়, সম্পদকেই পাইতে চায়, শিশুর মতো কেবল মধুর রসভোগের তৃষ্ণাই তার লক্ষ্য, যেন সম্ভোগের কুঞ্জকাননে সুখে থাকিতে পাইলেই তাহার ধর্ম রক্ষা পাইয়া যায়; দুঃখকে, রুদ্রকে, বজ্রকে তাহার বড়ো ভয়। তাই ঝড়ের রাতে বজ্রের সাথে দুঃখরাতের রাজা যখন আসেন তখন মন প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু দুঃখের মধ্য দিয়া, অশান্তির মধ্য দিয়া যে-সত্য লাভ হয় না সে-সত্য-তো 'সমগ্র' সত্য নয়—উহা ক্ষুদ্র অংশভাগ মাত্র। তাই, কেবল 'শান্তম্' নয়, তার চেয়ে বড় সত্য 'শিবম্'। এই 'শিব'কে অর্থাৎ মঙ্গলকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে, "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। অচেতন শান্তি একরূপ বন্ধন, তাই অশান্তির তরবারির দ্বারা তাহাকে ছিন্ন না করিলে বন্ধনমুক্তি ঘটে না। অশান্তি রুদ্ররূপে আসিলেও শান্তির প্রসন্নতাকে লুকাইয়া লইয়া আসে। "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" রুদ্রের এই দক্ষিণ মুখকে পাইতে হইলে রুদ্রের ভীষন আবির্ভাবকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রুদ্রকে বাদ দিয়া যে-প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করিয়া যে-শান্তি সে তো 'সত্য' নয়—সে স্বপ্ন। তাই ঐ তরবারি প্রাকৃত-মুগ্ধতাকে দুঃখের চরম আঘাতে কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্যের আনন্দলোকে প্রবেশের প্রতীক। কারণ, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম-পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

এই তরবারির আর একটি ব্যাখ্যাও সম্ভব। উহা অহংকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিবার তরবারি। 'খেয়া'র 'বন্দী' কবিতায় দেখানো হইয়াছে এই অহং-বোধ কেমন লোহার শিকল গড়িয়া আপনাকে আপনি বন্দী করিয়া রাখে।

"ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস
আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন

লোহার শিকলখানা,—
কত আগুন, কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।"
(বন্দী)

কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করিতে গিয়া শক্তির এতবড়ো অপচয় বোধকরি আর কিছু নাই। এই বর্ব্বর অহং-শক্তি অরূপানুভূতির পথে চরম বাধা। তাই চরম দুঃখের আঘাতে ঐ অহং-কে ছিন্ন করিবার প্রতীক হইল ঐ তরবারি। বোধকরি ঐ তরবারির রহস্যের মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে কেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে স্বদেশী উত্তেজনা, এতদুভয় "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" সত্বেও শান্ত সমাহিত চিত্তে অরূপানুসন্ধানে 'হাট' ছাড়িয়া 'ঘাটে' আসিয়া 'খেয়া' পারাপারের উদ্দেশ্যে অজানার অভিমুখে পাড়ি দিয়াছিলেন।

এই পর্যন্ত আসিয়া আমরা 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ খানির একটি বিশেষ ভাবধারার সহিত পরিচিত হইলাম। পরিচিত জগতের সীমা হইতে 'নীরব ব্যকুলতা'র খেয়ায় কবিচিত্ত পাড়ি দিয়াছে অপরিচিত জগতের উদ্দেশে— অরূপ যাহার রূপ, অশেষ যাহার সীমা, অসীম সেখানে প্রকাশ। তাই গ্রন্থখানি শুরু হইয়াছে "শেষ খেয়া" দিয়া আর সারা হইয়াছে "খেয়া" কবিতায়। অতএব গ্রন্থখানির ভাবগত-ঐক্য ঠিক বজায় আছে; যাহার পরিচয় পাই "পথের শেষ" কবিতায়।

"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।"

ঐক্য বজায় থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থখানিকে কেবল একটি ভাবের তত্ত্বরূপ ভাবিয়া লইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা অধিক। প্রকাশনের সময় একই সময়ের রচনা হিসাবে কবিতাগুলি যখন সংগৃহীত ও সংযোজিত হয় তখন সর্বত্রই যে একই ভাবের ক্রমবিকাশ সকল কবিতার মধ্যে পরিস্ফুট থাকে অথবা সকল কবিতাগুলির মধ্যে একটি পূর্ব্বাপর পারম্পর্য রক্ষিত হয় এমন ভাবিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে যে-গ্রন্থখানিতে অধিকতর ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে সেই "গীতাঞ্জলির" মধ্যেও এমন দুটি কবিতা স্থান জুড়িয়া আছে যাহাদের ব্যক্তিগত মূল্য ও জনপ্রিয়তা অত্যধিক বেশী হইলেও গ্রন্থের সামগ্রিকতার দিক্ হইতে উহারা স্বতন্ত্র এবং বিছিন্ন। কবিতা দুইটির একটি হইতেছে "দুর্ভাগা দেশ" অপরটি, "ভারততীর্থ"।

ঠিক সেই রকমেই 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থখানিতেও অরূপানুসন্ধান ও দুঃখানুভূতির সাথে সাথে কোথাও কোথাও মর্ত-প্রীতি, কোথাও কোথাও অন্য ভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 'বালিকাবধূ', 'শুভক্ষণ', 'ত্যাগ', 'অনাবশ্যক', 'প্রার্থনা', 'সার্থক নৈরাশ্য' 'সমুদ্রে', 'দিঘি' 'সবপেয়েছির দেশে', 'হারাধন', 'কোকিল', 'নীড়', 'আকাশ', 'লীলা', ও ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত।

আর, এরূপ না হইয়াও উপায় নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি এমন একটি ব্যাপার যাহার উপর টিকিট সাঁটিয়া আপন ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়িয়া তোলা যায় না। উহা যেন বীণাপাণির বিরাট বীণার বহু বিচিত্র তার কোনটা সোনার, কোনটা রূপার কোনটা সরু, কোনটা মোটা। হালকা, ভারী, আমোদের বা প্রমোদের যত রকমের সুর আছে দরকার মত সবই সেই বীণায় বাজিয়া উঠে। আসলে সেই এক শুভ্রজ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন; কবি সেই বিচিত্রের দূত। তাই বিচিত্রের লীলারঙ্গ কবিচিত্তে ক্ষণে ক্ষণে নবনব মূর্চ্ছনায় সুরের বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া যায়। কবির কাব্য সেই তরঙ্গের শিল্পলিপি। কবির নিজের কথায়: "যেখানে আমি থামিনি সেখানে আমি থেমেছি এমনভাবের একটি ফটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি

ঘোড়ার আকাশে-তোলা-পা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে।"

উপরে আলাদা করিয়া যে সব কবিতার উল্লেখ রহিয়াছে তন্মধ্যে শুভক্ষণ ত্যাগ ও অনাবশ্যক এই কবিতা-ত্রয়ী অনেকটা এক সুরে গাঁথা—যাহার ধর্মব্যাখ্যা ও শিল্পব্যাখ্যা উভয়ই সম্ভব। ধর্মব্যাখ্যার দিক্ হইতে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই শুভক্ষণ যদি মন বাসনাহীন হইয়া তন্মুখী হইয়া থাকে। এই শুভক্ষণটি সার্থক হয় মহৎ ত্যাগে—যাহা ফলাকাঙ্ক্ষাহীন। যাহা জগতের প্রয়োজনের হিসাবে একান্তই অর্থহীন ও অকিঞ্চিৎকর, সেই স্বার্থলেশহীন ত্যাগের আনন্দই মহত্তর চরিতার্থতা দান করিতে সম্ভব। তাই কাব্যের জগতের মধ্য হইতেই অবকাশ কুড়াইয়া একান্ত আমার মত সংগোপনে সেই পরম একের উদ্দেশে "আকাশ-প্রদীপ" ভাসাইবার যে, অনাবশ্যক, স্মৃতি-চারণ, প্রেমিকার উহাতেই চরম তৃপ্তি, পরম প্রাপ্তি। আর, শিল্পব্যাখ্যার দিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যাখ্যাই যথেষ্ট :

"খেয়ার 'অনাবশ্যক' কবিতার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করিনে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা' অত্যাবশ্যক তার কতই অপ্রয়োজনে ফেল-ছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই। সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অথচ বঞ্চিত হয় সে যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

শিল্পের দিক্ হইতে শুভক্ষণ ও ত্যাগ কবিতা দুইটির ব্যাখ্যা শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ও সুন্দর করিয়াছেন। "সুন্দর যেদিন সৃষ্টির রাজপথে আসিয়া দেখা দেয় 'রাজার দুলালে'র বেশে, সুন্দরের পূজারিণী সেদিন 'তাহার বক্ষের মণি ফেলিয়া না দিয়া' থাকিতে পারে না। সে মণি হয়তো কেহই কুড়াইয়া লয় না—রথচক্রের নিষ্পেষণে সে হয়তো গুঁড়া হইয়া মিলিয়া যায় রাজপথের ধুলার সঙ্গে কিন্তু তথাপি 'রাজার দুলালে'র যে রহিয়াছে অমোঘ আকর্ষণ।"

খেয়ার 'বালিকাবধূ' কবিতাটি নানা দিক্ দিয়া একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা। প্রথমতঃ ইহা একটি উৎকৃষ্ট রূপক। প্রেমঘন লীলাময়কে বঁধু কল্পনা করিয়া শিশু-শুভ্র বিশ্বাসের অনভিজ্ঞ প্রত্যয়কে বধূ কল্পনা করিবার মধ্যে একরূপ চমৎকারিত্ব দ্যোতিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দুঃখের মধ্যেই যে বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা এবং বিধিমার্গী বিষয়ীর নিকট যাহা অপরাধ, অনুরাগগামী বিশ্বাসী প্রেমিকের নিকট তাহাই পূজা—এই 'লীলা'-তত্ত্বটি অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করিয়াছে কবিতাটির ইঙ্গিতময় পরিবেশ সৃজনে।

"মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতে বুঝি ভালবাস
খেলাঘর-দ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কি যে পাও পরিচয়।"

এই নিয়ম-কানুন-অনুশাসন-বিহীন অবোধ বিশ্বাসী শিশু-প্রাণই পরম প্রেমিক বিশ্ববঁধুর একান্ত প্রিয় বধূ।

"রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দন-বনমধু,—
ওগো বর, ওগো বঁধু।"

'বালিকাবধূ' কবিতাটিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মাটিকে 'বধূ' কল্পনা করিলেও কোন অসঙ্গতি হয় না। শিশুকাল হইতেই বিশ্বের পশ্চাতে এক বিচিত্র বিশ্ব-দেবতার বিশ্বাস কবিচিত্তে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাইয়াছিল। রোমান্টিকতার দিক্ হইতেই তিনিই তাঁহার জীবন-দেবতা; শিল্পপ্রেরণার দিক্ হইতে তিনিই তাঁহার কৌতুকময় অন্তর্যামী; আর, নৈবেদ্য-খেয়ার যুগে তিনিই

তাঁহার পরাণবঁধু। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন মাধুর্য বর্ণনা করা মিষ্টিক কবিদের স্বভাব। জালালউদ্দিন রুমী হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি পর্যন্ত প্রত্যেকটি মিষ্টিক কবিই তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের সগোত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়া mysticism প্রেমলীলার রোমান্টিক কল্পনা ছাড়িয়া আরো উর্ধ্বে একটা অতীন্দ্রীয় অনুভূতির ভক্তিরাজ্যে পৌঁছাইয়া "সব আছে, সব পাইয়াছি" আস্তিক্য বিশ্বাসে অলৌকিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। সাধন-ভজন-পূজন-আরাধনার নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ অবোধ কবিচিত্ত কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই ধর্ম জগতের পরমতীর্থ মাধুর্য-রাজ্যে বঁধুয়ার সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন চরম দুঃখের মধ্যেও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখিয়া বরং তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে ভগবান্ ভক্তকে শুধু কৃপাই করেন না, ভালোও বাসেন।

কবির কাব্যে বিশেষ বিশেষ 'মুড-এর' মধ্যেও অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া যায়। এবং ঘটিয়া যায় বলিয়াই কবি কবিই থাকিয়া যান, তাত্ত্বিক হইয়া উঠেন না। প্রথম জীবনে মর্ত্ত-প্রীতি কবির চেতনাকে বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, বলিয়াছিলেন :

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।—

তিনি বলেন, "জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" তাই, "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।" অজিত চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন, "বিধাতা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির চিত্তবীণাকে কী এক নিগূঢ় উপায়ে একই ছন্দে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে কোনো খণ্ডতার মধ্যে তাহার চিত্ত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, নানাপথ ঘুরিয়া অবশেষে আবার ইহারই মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।"

ইহারই পরিচয় পাওয়া যায় খেয়ার বিভিন্ন কবিতায়।

'প্রার্থনা'—

আমি বিশ্ব-সাথে রব সহজ
বিশ্বাসে।
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে।

'সার্থক নৈরাশ্য'—

ধন্য ধরার মাটি,
জগতে ধন্য জীবের মেলা।
ধুলায় নমিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাত বেলা।

'কোকিল'—

ফুল-বাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদম-শাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।
বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুল-বনে
কোকিল—কোথা ডাকে।

'লীলা'—

ওগো, এমনি তোমার ইচ্ছা যদি
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব।
ল'য়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,
বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা,—
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

এই 'লীলা' কবিতাটি গীতাঞ্জলি-নৈবেদ্য যুগের লীলাবাদেরই অপরূপ পুনরাবৃত্তি।

'নীড় ও আকাশ'—

তবু নীড়ে ফিরে আসি,
এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
তবুও এই ভালবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

'দীঘি' কবিতার রস যত না মিষ্টিক তার বেশী রোমাণ্টিক। অতীতের সোনারতরীর 'হৃদয়-যমুনা'র যৌবনধর্ম উচ্চতর ভাবের পরিমার্জনে পরিশোধিত হইলে যাহা দাঁড়ায় তাহা 'দীঘি'।

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।'

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে 'খেয়া'র যুগটি political agitation-এর যুগ। পল্লী-সংস্কার, ন্যাশনাল কলেজ ইত্যাদি স্বদেশ-হিতকর কর্মে কবি প্রবল উত্তেজনায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু জগতের কর্ম এক, আর সাধক-শিল্পীর কর্ম আর-এক। বাস্তবের সাথে কল্পনার সংঘাত অনিবার্য। তাই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, তাই রবীন্দ্রনাথের কাজের জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ।

'বিদায়'—

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।...
আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরাণ জুড়ে বাজে
ভালবাসি হায়রে ভালোবাসি।
সবার বড় হৃদয়-হরা হাসি।

খেয়ার 'হারাধন' একটি বিচিত্র কবিতা। ইংলণ্ডের শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি রোমাণ্টিক কবিদের কাব্যরচনার অন্যতম প্রধান কৌশল হইল 'Myth-making' অর্থাৎ কথিকা-সৃষ্টি। এরূপ কথিকা-সৃষ্টি কখনো কখনো নিছক সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্যও রচিত হইতে পারে আবার কখনো কখনো রূপকছলেও ব্যবহৃত হইতে পারে। সেইদিক্ হইতে খেয়ার 'হারাধন' কবিতাটি একটি অপূর্ব কথিকা-সৃষ্টি। এবং এইরূপ মৌলিক হীরকখণ্ড রবীন্দ্রসাহিত্যে খুব বেশী আর নাই। আমাদের শাস্ত্রে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মে কোন বিরাম নাই। কিন্তু বাইবেলে ঈশ্বর প্রথম ছয়দিনে আলো, হাওয়া জল, আকাশ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম লইয়াছিলেন। এই কাহিনীটিকে পশ্চাতে রাখিয়া কবি কল্পনা করিলেন :

বিধি যে দিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে।

অর্থাৎ বিধাতা যতক্ষণ সৃষ্টি-কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন ততক্ষণ আর সকল বৃহৎ ব্যাপারই সৃষ্টি হইয়াছে যাহাদের মূল্য কাজের হাটে বেশী, কেবল সৃষ্টি হয় নাই সুন্দরের। সুন্দর আসিয়া আপনিই ধরা দিল যখন বিধাতা সৃষ্টি করার কাজে ক্ষান্ত দিলেন। বড় বড় দেবতারা সবাই আনন্দে বাহবা দিলেন "কি আনন্দ। এ কি পূর্ণ ছবি।" এমন সময় সভার মাঝে একজন বলিয়া উঠিল, "জ্যোতির মালায় একটি তারা, কোথায় গেছে টুটে।" সে কি? চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ— সবাই বাহির হইয়া পড়িল কোথায় হারা-তারা গিয়াছে তাহারই সন্ধানে। হঠাৎ তখন হইতেই এই হারাধনের মূল্য বাড়িয়া গেল, "সেই তারাতেই

স্বর্গ হত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়
সবার চেয়ে ভালো।"

কবি বলিতেছেন, "সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে—

তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।"—যেন তাহাকে না পাইলে এতবড় সৃষ্টিকর্মটার অর্থই চলিয়া যায়। বাহিরে চলিতেছে দেবতাদের বিনিদ্র অনুসন্ধান—কিন্তু স্তব্ধ তারার দল গভীর নিশীথে নীরব হাসিয়া ভাবিতেছে "মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে।"

সবাই আছে তো এই হারাধন রত্নটি তাহলে কী? সেটি হইল রস। কারণ, সৃষ্টি শুধু মাত্র রূপসৃষ্টিই নয়, উহা রসসৃষ্টিও বটে। তাই রূপের ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে 'রসো বৈ সঃ'—কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ সেই রস-স্বরূপ সকল রূপকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন আপনাকে আড়ালে রাখিয়া। রসোপলব্ধির এই তত্ত্বটি ধরা পড়ে কেবল সৃষ্টির লীলারস অনুভব ক্রিয়ার আস্বাদনের মধ্য দিয়া। ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন; তত্ত্বজ্ঞানীর শুষ্ক তত্ত্ব বা বিজ্ঞানীর প্রযুক্তি বিদ্যা দ্বারা নয়। তাই সৃষ্টির পর হইতে বিশ্বজগৎ সেই তারাটির খোঁজে আছে বলিয়াই যুগে যুগে সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত-কারণ, সকল সুন্দরোপাসনার মূল কথা 'রস'।

খেয়ার 'সব পেয়েছির দেশ' অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে 'এষহ্যেবানন্দয়তি'র উপলব্ধির কবিতা। আবার কাহারও কাহারও মতে শুষ্ক কর্ম জগৎ হইতে অবসর লইয়া অতীতের রোমান্টিক কল্পনার রাজ্যে বিশ্রাম লওয়ার কবিতা। অর্থাৎ একদল সমালোচক কবিতাটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মঞ্জুর করেন, অপর দল শিল্প ব্যাখ্যা। কবিতাটির লঘু তরল সুর ও কল্পনা-বিলাস দেখিয়া ইহাকে শুধুমাত্র রোমান্টিক nostalgia অর্থাৎ রম্য গৃহসুখ-প্রবণতার কবিতা বলা যাইতে পারে, যেমন বলা যায় কবি W. B. Yeats-এর কয়েকটি Celtic কবিতা সম্বন্ধে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতাটি সহজ বলিয়াই সহজ নয়। ইহার পশ্চাতের প্রচ্ছন্ন অর্থটি নিগূঢ়।

উপনিষদে অনন্ত সত্যস্বরূপকে আনন্দের দ্বারা উপলব্ধি করিবার কথা আছে। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ব্রহ্মের সেই আনন্দকে জানিয়া সাধক কিছু হইতেই ভয় পান না। এই জন্যই এই আনন্দকে উপনিষদ 'এষঃ' বলিয়াছেন।—এষহ্যেবানন্দয়তি। ইনিই আনন্দ দিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সব পেয়েছির দেশ' সেই অনন্ত আনন্দের দেশ এবং তাহারই রসময় উপলব্ধি কবিতাটির প্রাণ। এখানে যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দরূপ। তাই 'সব পেয়েছির দেশ'-এ অসাধারণত্ব কিছু নাই, হয়তো খুঁজিলে দেখিবার মতো একটি জিনিসও পাওয়া যাইবে না—সেই পথের ধারে ঘাস, সেই স্বচ্ছ তরল স্রোতের ধারা, সেই গ্রামের কুটিরটি ঘেরিয়া ঝুমকা লতার দোল,—এগুলির মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই, অতিপ্রাকৃত বা অসাধারণ কিছু নাই, তবু ইহারই মধ্যে সব পেয়েছির সন্তোষ, ইহারই মধ্যে আপনদের পরমাতৃপ্তি; অতএব,

ওরে কবি এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল্।

আকাঙ্ক্ষাহীন পরমাতৃপ্তির এই নির্লোভ সন্তোষ,—বোধকরি ইহাই সাধকের ব্রহ্মানন্দ, শিল্পীর সুন্দর, কবির সুখ।

সমালোচনা সাহিত্য

রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যে সমালোচনা নামক একটি বিভাগ আছে। অনেকে এই বিভাগটিকে অনাবশ্যক মনে করিয়া থাকেন যেহেতু সমালোচনা ব্যাপারটা অন্যের রচনার উপর নির্ভরশীল। সমালোচনা ব্যাপারে মৌলিকতার অবসর নাই। যেখানে মৌলিকতার প্রশ্ন অবান্তর সে রচনা সাহিত্য-বহির্ভূত ব্যাপার হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত, ইহাই তাঁহাদের অভিমত।

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে, critics are those who have failed in literature, অর্থাৎ যারা মৌলিক রচনা করিতে অসমর্থ তারাই সমালোচক বা ক্রিটিক। তাদের মতে সমালোচক একরকমের পরগাছা, অন্যের রচনার উপর তারা একান্ত নির্ভরশীল। নিজের কোন বক্তব্য নাই, তারা অন্যের বক্তব্যের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করিয়া একটা তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেন মাত্র।

কিন্তু সব সাহিত্যেই সমালোচনা নামক একটি বিশিষ্ট বিভাগের উপস্থিতিতে সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়া পড়ে; শুধু তাহাই নয় সমালোচনা যে সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ তাহাও স্বীকৃত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইল, মানুষ মাত্রই ভ্রম ও ভ্রান্তির দাস। এবং যেহেতু সাহিত্যিকও মানুষ, সে হিসাবে সেও রচনায় ভ্রমও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত নয়। আমরা সবাই চাই সৎ-সাহিত্য, ভ্রম ও ভ্রান্তি মুক্ত সাহিত্য। অবশ্য সাহিত্যিক মাত্রই সর্ব্বদা সচেষ্ট রচনাকে ভ্রান্তি মুক্ত রাখিতে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও রচনায় দোষ ত্রুটি আসিয়া পড়ে। যাহা অবাঞ্ছিত, যাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অহিতকর, রচনায় সেইরূপ কোন বিষয়ের বিবৃতি থাকিলে সে বিষয় আলোচনা বা বিচারের যে প্রয়োজন থাকে তাহা অনস্বীকার্য্য।

যেমন আইন বিধি বর্তমান থাকা সত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের বিচারের জন্য একটি বিশিষ্ট বিভাগ প্রত্যেক রাষ্ট্রেই থাকে, তেমনি সাহিত্যিক বিষয়ে বিচার করিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইল সমালোচক। এই হিসাবে সমালোচকের মর্য্যাদা কবি সাহিত্যিকের উপরে। ইউনিভারসিটিতে সাহিত্য বিচারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্যাতিমান কবি বা গল্পলেখক ন'ন, সে বিষয়ের বিচারক হইল সমালোচক। অবশ্য এক-ই ব্যক্তি কবি গল্পলেখক হইয়াও সাহিত্য সমালোচক হইতে পারেন। তাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু কবি সাহিত্যিককে সমালোচকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে বিশিষ্ট সমালোচনা করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়াই তাঁরা সাহিত্যে বিশিষ্ট সমালোচক হিসাবে স্বীকৃত।

কাব্য ও গল্পের মত সমালোচনা সাহিত্যও সমান হৃদ্য ও উপভোগ্য হইতে পারে। এটা নির্ভর করে সমালোচকের শক্তি সামর্থের উপরে। যে সমালোচক সূক্ষ্মদর্শী ও মনস্তত্ত্ববিদ্ তাঁহার আলোচনা ঠিক মৌলিক রচনার মত হৃদ্য ও উপভোগ্য হইয়া থাকে। সমালোচককে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর সমালোচক রচনার ভাষা, রীতি ও আঙ্গিক বিশ্লেষণে নিযুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচককে নিযুক্ত দেখি রচনাশ্রিত রসের আবিষ্কারে।

শকুন্তলা নাটকের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে নাটকের বহির্ভাগ লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিতে পাই, শকুন্তলা

কতটা স্বাভাবিক কতটা স্বভাববিরুদ্ধ, কতটা সরল আর কতটা চরিত্রের 'বাহানা' হিসাবে প্রতিফলিত, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা আলোচনাই হইয়াছে, বিশিষ্ট রচনা হইয়া উঠে নাই। কারণ, আলোচনায় শকুন্তলা নাটকের অন্তর বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বিশিষ্ট ও মৌলিক রচনার আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি যখন লিখিলেন, শকুন্তলা নাটকে আশ্রমও একটি চরিত্র তখন আমরা আলোচনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে চমৎকৃত হই। আশ্রম-প্রকৃতি সেখানে মানব মূর্ত্তি ধারণ করিল। পতিগৃহে গমনোন্মুখ শকুন্তলার সখিদ্বয় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার বিচ্ছেদকাতর মূর্ত্তির পাশে বেতসলতার কণ্টক করে শকুন্তলার বল্কল পরিধেয় টানিয়া ধরিবার চিত্রটি কি আরও মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক নয়? শৃঙ্গে হরিণ মাতার শকুন্তলাকে স্পর্শে অশ্রুমতী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অশ্রু বর্ষণের চিত্র কি আরও বিচিত্রভাবে বিচ্ছেদ কাতর হইয়া প্রতিভাত হয় নাই? অথচ রবীন্দ্রনাথ নাটকের দোষগুণ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। তিনি নাটকে যে রসনির্ঝরের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই পাঠককে বিতরণ করিয়াছেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের আলোচনাকে বলিতে চাই মৌলিক রচনা।

আবার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন লিখিলেন—অযোধ্যার রাম রাম নহে……রাম তব মনোভূমি মাঝে", সেখানে তিনি সমালোচকের সমালোচনা করিয়াছেন; প্রকারান্তরে রচনায় কি আলোচ্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁর মতে রসের আবিষ্কারই হইল প্রকৃষ্ট সমালোচনা। আবার এই রবীন্দ্রনাথকেই মেঘনাদবধ কাব্য ও পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনায় কাব্যের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণে ব্যস্ত দেখিতে পাই। আগের সমালোচনার ও পরের সমালোচনার ভঙ্গিতে পার্থক্য বিস্তর। আগের আলোচনা তিনি করিয়াছেন চোখ খুলিয়া পরের, আলোচনা করিয়াছেন চোখ বুজিয়া—ধ্যানমগ্ন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।

বলা বাহুল্য সমালোচনা এক বিষম বস্তু। পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা, বিদ্বিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিচারে একদেশদর্শিতা-স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সমালোচনার পথ অতি সংকীর্ণ। সমালোচককে অতি সন্তর্পণে সাহিত্য বিচার করিতে হয়। তাই সমালোচককে পণ্ডিত হইতে হইবে, সাহিত্যের রীতিনীতি, আদর্শ-আঙ্গিক বিষয়ে নির্ভুল ধারণার অধিকারী হইতে হইবে, সবচেয়ে বড় কথা তাঁকে নিরপেক্ষ হইতে হইবে। ব্যক্তিবিদ্বেষ ও ব্যক্তিপ্রীতি সমালোচককে সযত্নে এড়াইয়া চলিতে হয়। আসামীর প্রতি বিচারকের যে নিরপেক্ষ মনোভাব আমরা বিচারে প্রত্যক্ষ করি, সমালোচককে সেই অনন্য-সাধারণ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। সমালোচকের বয়সের ক্রিয়াও সমালোচনা ব্যাপারে ক্রিয়াশীল। উপরি-উক্ত মেঘনাদবধ কাব্য ও পলাশীর যুদ্ধের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণ স্তরে নামিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁর তারুণ্যের জন্যই হইয়াছে। পক্ষান্তরে পরিপক্ক বয়সে শকুন্তলা নাটকের আলোচনা যে অপূর্ব্ব ও অসাধারণ হইয়াছে তাহাতে বয়সের ক্রিয়া, পরিপক্কতাই ক্রিয়াশীল।

পূর্বে বলিয়াছি সমালোচক দুই শ্রেণীর, সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ শ্রেণীর সমালোচকও বেশ জনপ্রিয় হয়, তারা নিযুক্ত লেখকের দোষত্রুটি আবিষ্কারে। রচনায় দোষত্রুটির উপস্থিতি অনিবার্য্য। লেখকের রচনায় এই দোষত্রুটির প্রদর্শনে অনেকে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়, কারণ মানুষ মাত্রই ঈর্ষাকাতর। যে রচনা পাঠকের শক্তি সাধ্যের বহির্ভূত সেই রচনা যদি ত্রুটি-সঙ্কুল প্রমাণিত হয় তবে পাঠক মনে মনে একটু পুলকিত হয় বৈ কি। সে মনকে প্রবোধ দিতে পারে, লেখক না হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিবার কারণ নাই; কারণ যারা লিখিতেছে এবং লিখিয়া একটু খ্যাতিমান্ ও অর্থবান্ হইতেছে তাদের রচনাও ভ্রমপ্রমাদ-মুক্ত নয়। লেখক হিসাবে খ্যাতি ও অর্থের পশ্চাতে না ছুটিয়া অন্য উপায়ে অর্থ ও খ্যাতি লাভের চেষ্টায় যে তারা নিযুক্ত তাহা বুদ্ধিমানের কাজই হইয়াছে। সমাজপতি সজনী দাস এই জাতীয় পাঠকের বরেণ্য সমালোচক যে

হইয়াছেন তাহা পূর্ব্বের বর্ণিত ঐ মানসিকতার ফল। অথচ সমাজপতি ও সজনী দাস অতি উচ্চস্তরের রস-বেত্তা। তাঁরা নিচে নামিয়া আসিলেন কেন? সাধারণ পাঠকের ঈর্ষা ও অসূয়ার ইন্ধন জোগাইলেন কেন? তাহার কারণ হইল স্ব স্ব সম্পাদিত পত্রিকাকে জনপ্রিয় করা আর দ্বিতীয় কারণ হইল জনপ্রিয় লেখকের প্রতি বিরুদ্ধতা। ফলে তাঁদের সমালোচনা হইয়া পড়িয়াছে সাময়িক ও অশাশ্বত।

এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক, যারা রচনার রস আবিষ্কারে বদ্ধকায়মন তাদের কথা বলিব। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক ব্যক্তিপ্রীতি ও ব্যক্তিবিদ্বেষ মুক্ত; এবং সাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষক, সাহিত্যিকের নয়। এরা আছে বলিয়াই জীবিতকালে যে সব সাহিত্যিক উপেক্ষিত হইয়া নিরতিশয় ক্ষোভ ও দুঃখে জীবনপাত করিল তারা পরবর্তীকালে, এমন কি মৃত্যুর পরে একটা posthumous স্বীকৃতি পাইয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়। এই শ্রেণীর সমালোচকের সমালোচনাই প্রকৃত সমালোচনা এবং এঁদের রচনার প্রভাবে কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি ধর্ম, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংস্কার সংগঠিত হয়। ফলে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে একটা বিশুদ্ধভাবের উদয় হইয়া মানবজাতিকে আর একটু শান্তির পথে, সুখের আশ্রয়ে লইয়া যায়।

সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে সমালোচনাবৃত্তি মানুষের একটা মৌল প্রবৃত্তি। মানুষের মধ্যে পরিবারস্থ বা প্রতিবেশীর মধ্যে ক্ষুদ্রতা, হিংসা বা স্বার্থপরতা দেখিলে আমরা সবাই ক্ষুণ্ণ হই। বেশির ভাগ লোক শক্তিহীন ও অসহায় হওয়াতে অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হইতে পারে না। তাই কোন দুর্দ্ধর্ষ লোক যদি অনাচার, স্বার্থপরতা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে শক্তিহীণ বহু তার সমর্থনে আগাইয়া আসে। ইহাই গণমত। সাহিত্যিক, নেতা ও ধর্মপ্রচারক সবাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, নেতা ও ধর্ম্মপ্রচারকের সমালোচক।

সাহিত্যে যে নূতন যুগের সৃষ্টি হয় তাহা অতীতের সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে ও সমালোচনার মধ্য দিয়াই। বঙ্কিমের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দ্বারা সমালোচিত, শাসক শ্রেণীর কার্য্যকলাপ বিরোধীপক্ষের দ্বারা নিন্দিত, পূর্বের ধর্মপ্রচারকের গৃহীত নীতি পরবর্তী কালের প্রচারকের দ্বারা অপকীর্তিত ও ধিকৃত। এইরূপে সমালোচনার মধ্য দিয়াই জীবনে, রাষ্ট্রে ও ধর্মে নবযুগের সৃষ্টি হয়। হয়ত এই সবের পিছনে অন্যকে উৎখাত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রচ্ছন্ন ও তিরস্কৃত থাকে, কারণ অতীত নেতাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিতে না পারিলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে গদিচ্যুত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র যাহা করিয়াছেন ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধদেবও তাহাই করিয়াছেন। ঋষিদের যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধতাতেই অহিংসাধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে আমরা যে বৌদ্ধ অবৌদ্ধ নির্বিচারে অহিংসার বিরোধী তাহা বুদ্ধ-নীতির সমালোচনা ছাড়া কিছু নয়। গান্ধি যখন বলিলেন—He (Raja Rammohan) was a pygmy in comparison with the Rishis of old—গান্ধির সেই উক্তি ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ষণ করিবার জন্য উক্ত হয় নাই, হইয়াছে রামমোহনকে, যিনি Father of Modern India হিসাবে স্বীকৃত, তাঁহাকে প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টায় কারণ রামমোহনকে গদিচ্যুত না করিতে পারিলে অপরের পক্ষে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কবিতাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে গদিচ্যুত করিবার চেষ্টা তরুণ কবিরা কম করে নাই; কাব্যে নূতন ভঙ্গি-ছন্দহীনতার নূতন আঙ্গিক প্রবর্তন করিবার চেষ্টায় রবীন্দ্র কাব্য সমগ্রভাবে সমালোচিত। কিন্তু তরুণ কবিরা শক্তিহীন ছিল বলিয়া বিরোধিতা নিষ্ফল হইয়াছে।

আধুনিক গল্পকারদের উদ্দেশ্যও সমান প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতি ও আদর্শ তাদের রচনায় অনুসৃত নয়। তারা এক-একজন সাহিত্যিক কালাপাহাড়, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ন্যায়-নীতির ঘোর বিরোধী। এই বিরোধিতার জন্য পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা মাথা

তুলিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়াছে। জমিদার প্রজায়, পিতা-পুত্রে, শাসক-শাসিতের মধ্যে যে 'দেহি দেহি' মনোভাব আধুনিক সাহিত্যে উত্তোলিত-শির তার পশ্চাতে আছে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-নীতির প্রতি তিক্ত উপেক্ষা ও তীব্র বিরোধিতা।

কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পরিণতি কি? দরিদ্র কি অর্থবান্ হইয়াছে, ঘরে কি শান্তি আসিয়াছে, রাষ্ট্রে কি ঐক্য ও সংহতি আসিয়াছে? আজ বঙ্কিমের মহা-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপহসিত, কেহই বিশ্বের কথা চিন্তা করিতে ইচ্ছুক নয়, বসুধৈব কুটুম্বকম্ আদর্শ বিকৃত; পরিশেষে শরৎচন্দ্রের বঙ্গভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিও অনাদৃত। নানা দলীয় নীতির সমর্থক আধুনিক লেখক বঙ্গ দেশকে এক কল্পিত মহাদেশ ভাবিয়া সীমাবদ্ধ দেশের মধ্যে উপনিবেশ সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর। পৌরাণিক মতে আধুনিক সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য হইল রচনায় শিল্প-নৈপুণ্য জাহির করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। ভাষার নৈপুণ্যে ও তির্য্যক্ বাক্যভঙ্গির সাহায্যে পাঠক-মনে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সম্বন্ধে একটা সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং গল্পাশ্রিত নায়ক-নায়িকার চরিত্রে সরলতার পরিবর্তে কুটিলতা সৃষ্টি গল্পকারদের রচনার একমাত্র লক্ষ্য।

অথচ মানুষ মাত্রই পৌরাণিকতার সমর্থক। সবাই আমরা চৌর্য্যের বিরোধী, প্রতারণার বিরোধী, চরিত্র হীনতার বিরোধী—এক কথায় আদর্শবাদিতার সমর্থক। নেতাকে আমরা স্বার্থপর হইতে দেখিতে চাহি না। দেশ-সেবককে সেবার জন্য সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করিতে দেখিলে ক্ষেপিয়া যাই। কিন্তু আধুনিক রচনায় থাকে চৌর্য্য, প্রতারণা ও চরিত্রহীনতার স্পষ্ট সমর্থন। জমিদার ও জোতদারের জমি জবর দখল করিবার প্ররোচনা, কাজ ফাঁকি দিয়া পুরা মাহিনা নিবার দাবী, অলসতার পরিশ্রমে বিমুখতার সমর্থনে। ছাত্রসঙ্ঘ পাইকারী হারে ফেল করিতেছে, তার সমর্থনে বলা হয়, কি খায়, কি পরে যে পাশ করিবে? অথচ আমরা ৫০/৬০ বছর আগে কি অভাব ও দুর্দ্দশার মধ্যে যে মানুষ হইয়াছি সে বিষয়ে কারো লক্ষ্য নাই। আমাদের সময়ে গরিবের ছেলেরাই ভাল পাশ করিত। আজিকার ছেলেরা আমাদের তুলনায় বেশি খায়, বেশি পরে এবং অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত পালিত এ কথা বলিবার লোক নাই। এটাও কারো চোখে পড়ে না যে, দেশকে বড় করিতে হইলে জনগণকে নিরতিশয় পরিশ্রমী হইতে হয়, সংযমী ও মিতব্যয়ী হইতে হয়। এটা পরীক্ষিত সত্য।

প্রকৃত সমালোচকের দায়িত্ব এইখানে। সাহিত্যে যখন ভোগের সমর্থক, বিলাস-ব্যসনের সমর্থক, চরিত্র-হীনতার সমর্থক চিত্র অঙ্কিত হয় তখন তিনি বজ্রকণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ করিবেন, অত্যন্ত ধীরভাবে অথচ সবল যুক্তি প্রয়োগে অলসতা, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধতা করিবেন। জাতিকে সবল ও শক্তিমান্ করিবার চেষ্টায় যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবেন, অতি সবল ও শুভবুদ্ধি-চালিত না হইলে পরাধীনতা যে আগত প্রায় তাহা জাতির মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করাইবেন। এই হিসাবে সমালোচকের দায়িত্ব রস-স্রষ্টার উপরে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—

সত্য মূল্য না দিয়াই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি,
ভাল নয় ভাল নয় সাহিত্যের সৌখীন মজদুরি।

ঠিক অনুরূপ কথা বহুদিন পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বে, প্রাচীন সাহিত্যে উক্ত হইয়াছে—

তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায়
সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে;
আয়াসায়াপরম্ কর্ম
বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণ্যম্॥

বিবর্তন

মনোজ গুপ্ত

বাড়ি ফিরতে বিজনের রোজই দেরি হয় আর রোজই সে ভাবে, 'কাল থেকে আর দেরি করব না।' দেরি করবে না এই সংকল্প নিয়েই সে রোজ সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরোয়। আড্ডায় গিয়েই বলে, "আজ আর দেরি করব না রে, সকাল সকাল উঠব।" প্রতাপ বলে, "রোজ রোজই তো শুনি ব্রাদার সন্ধ্যায় এই শুভ বুদ্ধি কিন্তু রাত ন'টার পর তোমার ওপর কোন অশরীরীর অবির্ভাব ঘটে, তুমি ঘড়ির কাঁটাও দেখতে পাও না, বাজনাও শুনতে পাও না। সুতরাং রোজ রোজ এই সদিচ্ছা প্রকাশ করার দরকার কী?" নীলমাধব বললে, "তাড়াতাড়ি ফিরবেই বা কেন? এখনও কি নাবালক আছ, না, ঘরে বউ শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে?"

প্রতাপ বললে, "বিজনের না হয় সে সৌভাগ্য এখনও হয়নি, যাদের হয়েছে তাদেরও তো বাড়ি ফেরবার কোন গরজ আছে বলে মনে হয় না।"

মন্তব্যটা নীলমাধবকে লক্ষ করে। এদের মধ্যে সেই সবচেয়ে আগে বিয়ে করেছে। বিয়ে করেছে বললে ঠিক বলা হয় না, তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বললে, "গরজ দেখিয়ে লাভ কি ভাই? যত দেরি করেই ফিরি কোনদিনই দেখব না বউ শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে। বাবাকে জল, কাকাকে পান, মাকে দাঁত খোঁটবার খড়কে দিয়ে, পিসীমার মশারি গুঁজে দিয়ে তাঁর যখন অধমের ঘরে পদার্পণ করবার সময় হয়, তখন আমার আর্দ্ধেক রাত।" নীলমাধবদের বড় সংসার তখনও একান্নবর্তী।

প্রতাপ জিগেস করলে, তোমাদের বাড়ি স্বামীজীর কতগুলো ছবি আছে? সব ঘরে একখানা করে তো?"

বুঝতে না পেরে নীলমাধব জিজ্ঞেস করলে, "কেন বল ত?"

"একখানা থাকলে শুধু মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত হতে। এত লোকের জন্যে বলি প্রদত্ত হতে গেলে একখানা ছবিতে কুলোয় না।"

নীলমাধব কাতর স্বরে বললে, "ঠাট্টা করছ? কর। আমি শুধু বলব, তুমি কি বুঝবে সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী নই, হবার সখও নেই, তবে বুঝতেও চাই না।"

বিজন বললে, "ঢের হয়েছে, এবার থাম, তাস দাও।"

বিজন কেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলে আর ফিরতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করে তা কোনদিন কাউকে বলে নি। বললে কেউ বুঝবে না, হয়তো ঠাট্টা করবে তাই বলেনি। সে যুগেও বাবার জন্যে কেউ তাড়াতাড়ি আড্ডা ছেড়ে উঠতে চায় শুনলে ঠাট্টা করার লোকের অভাব হত না। সে যুগ মানে এখন থেকে তিরিশ-বত্রিশ বছর আগেকার যুগ।

বিজনের দেরি করে ফেরার জন্যে বিজনের বাবা রাগারাগি করা দূরে কথা, সামান্য বিরক্তিও কোনদিন প্রকাশ করেন নি। তবু বাড়ির কাছাকাছি এলে বিজনের পা যেন চলতে চায় না। বাড়ি ঢুকতে কি রকম যেন লজ্জা করে। বাড়ি ঢোকবার সময় তার বাবার সামনে পড়তেই হয়, কারণ প্রায় প্রতিদিনই দরজাটা তিনিই খুলে দেন। বিজন জানে সে যতক্ষণ না বাড়ি ফিরবে ভদ্রলোক ঠায় একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকবেন। সে ফিরলে দরজা খুলে দিয়ে আবার সেই চেয়ারটায় গিয়ে বসবেন, যতক্ষণ না খেতে দেওয়া হয়। বিজন আর তার বাবা—একসঙ্গে খেতে বসেন

মানে খাবার জায়গা ও সময়টা এক। বিজনের বাবা খান এক মুঠো খই, এক চামচ ছাতু আর এক চিমটে ভেলি গুড়। বেশ কিছুদিন এই তাঁর রাতের খাবার, কেউ এর রদ-বদল করতে পারে নি, যেমন পারে নি বিজন বাড়ি ফেরার আগে খেয়ে নেওয়া সম্বন্ধে রাজী করতে। বিজনের একবারও মনে হত না তার বাবা তাকে লজ্জা দেবার জন্যে না-খেয়ে বসে থাকেন, তবু সে লজ্জা পেত কিন্তু হাতে তাস তুললেই সব ভুলে যেত। শেষ বাবারটা শেষ করতে রোজই দেরি হয়ে যেত।

সেদিন তাস খেলা ছিল না তবুও দেরি হল, অন্য দিনের চেয়ে বেশীই দেরি হল। প্রতাপের চাকরি হয়েছে; সেই উপলক্ষে সে বন্ধুদের খাওয়াচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বিজন বলে গিয়েছিল, প্রতাপের বাড়ি খাওয়া দাওয়া আছে, তার ফিরতে দেরি হবে, তার বাবা যেন খেয়ে নেন। সে স্বচ্ছন্দ মনে বাড়ি ফিরছিল। আজ নিশ্চয় তার বাবা জেগে বসে নেই। মা দরজা খুলে দেবেন। তাতে সে অপ্রস্তুত হবে না; মায়েরা তো ছেলেদের জন্যে কষ্ট করেই থাকে, না করতে পারলেই যেন দুঃখ পায়। কিন্তু অন্য দিনের মত তার বাবাই দরজা খুলে দিলেন। সে মাথা নিচু করে বাড়ি ঢুকল। যে ঘরে খাওয়া হয় সে ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলে তার মা মেঝেয় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। সে ডাকতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। বিজনের কি রকম সন্দেহ হল। সে জিজ্ঞেস করলে, "এখানে ঘুমোচ্ছিলে যে?"

"বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"খাওয়া হয়েছে?"

"কি যে বলিস। তুই রইলি বাইরে, খাওয়া হল কি না তার ঠিক নেই আর আমি খেয়ে বসে থাকব?"

"খাওয়ার নেমন্তন্ন আর বলছ খাওয়া হল কি না ঠিক নেই?"

"তা কি বলা যায়?"

"না, বলা যায় না। বাবা খেয়েছেন?"

"তুই না ফিরলে কবে খান যে জিজ্ঞেস করছিস?"

"অন্য দিনের কথা হচ্ছে না। আজ আমি বলে গেলাম তা সত্ত্বেও তোমরা না খেয়ে বসে থাকবে? এর কোন মানে হয় না।"

"মানেটা আজ বুঝতে পারবে না; বছর কুড়ি পরে হয়তো বুঝতে পারবে।" কথাগুলো বললেন বিজনের বাবা। তিনি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বিজন তা বুঝতে পারে নি। তাঁর কথার মানেও সে বুঝতে পারলে না; নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

উঁচু স্তরের চাকরি, সাহেব পাড়ায় বাড়ি, বিদুষী স্ত্রী সত্ত্বেও মিস্টার সেন সাহেব হতে পারে নি। অফিসে অবশ্য তার কথা বলতে হলে লোকে সেন-সাহেব বলেই উল্লেখ করে কিন্তু সবাই জানে সেন-সাহেব সাহেব নয়; মনে-প্রাণে এখনও সে মধ্য-বিত্ত বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলে, ছোটদের ভাই বলে, অধীনস্থ কোন লোককে সেলাম দেওয়ার চেয়ে তার কাছে গিয়ে কথা বলাই পছন্দ করে, সাহেব পাড়ায় থেকেও যখন তখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তার স্ত্রী বেলা বা ছেলে শুভেন্দু অবশ্যই এ সব পছন্দ করে না। তারা অনেকবার তাকে শোধরাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নি। তারা বিরক্ত হয়েছে। সে হেসে বলেছে, "এ কাঠামোয় আর হল না, পরের বার দেখা যাবে।" বেলা গম্ভীর হয়ে যায়, শুভেন্দু আড়ালে গিয়ে কাঁধ-ঝাঁকানি দেয়। না এখনও সামনা-সামনি সেটা করে নি। কেন করে নি সেটাই আশ্চর্য্য, কারণ করলেও সে প্রতিবাদ করত না, যেমন আরও অনেক কিছুতে করে না। শুভেন্দুর তার সম্বন্ধে ধারণা কি তা সে জানে আর এও জানে, সে ধারণা বদলাবার চেষ্টা করার কোন মানে হয় না, কারণ তা বদলান যাবে না।

শুভেন্দুর অনেক বন্ধু; তার চেয়েও বেশী বান্ধবী। দ্বিতীয়টা নাকি আধুনিক কলেজি জীবনে অপরিহার্য্য যেমন প্রথমটা ছিল আগেকার কলেজি জীবনে। আপত্তি করার প্রশ্ন ওঠে না; করলেই বা শুনছে কে? শুভেন্দুর বাড়ি থেকে বেরুবার বা বাড়ি ফেরবার কোন ঠিক নেই।

কোনদিন ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যায়, আবার কোন দিন হয়তো সারা দিনটা বাড়িতে বসেই কাটিয়ে দেয়। সেদিন চা-কফি করতে, খাবার ও সিগারেট আনতে চাকরদের প্রাণান্ত হয়। রাত দশটার আগে কোনদিনও ফেরে না। অবশ্য দশটার মধ্যেই যে ফিরবে এমন কোন কথা নেই। তার অনেক কাজ আর সে সমস্ত অত্যন্ত জরুরী; তার জন্যে সারা রাত বাইরে থাকলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। নেহাত যেন বাড়ির ওপর করুণা করেই সে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরলেই আবার টেবিলে এসে বসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। চান করতেই তো ঘন্টাখানেক লাগে। সাহেব পাড়ায় থাকলেও আর অনেক বিষয় সাহেব হলেও শুভেন্দুর ডিনার টাইমটা সাহেবী নয়। অনেকদিন পর্য্যন্ত মিস্টার সেন, যত রাতই হক, শুভেন্দুর ডিনার টেবিলে আসার জন্যে অপেক্ষা করতেন। যখন দেখলেন বাড়ি ফেরার পরও শুভেন্দুর ডিনার টেবিলে আসবার সময়টা ক্রমশঃ পেছিয়ে যাচ্ছে তখন একদিন মনে একটা খটকা লাগল; তিনি শুভেন্দুর জন্যে অপেক্ষা করা ছেড়ে দিয়ে দশটা বাজলেই খেয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। তবে শুভেন্দু বাড়ি না ফেরা পর্য্যন্ত শুতে যেতে পারতেন না।

সেদিন তাঁর খাওয়া হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ কেটে গেল, শুভেন্দু তখনও ফিরল না। বেলা বার কতক ফোন করল বুঝতে পারলেন কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না, হয়তো সেটা অনধিকার চর্চ্চার পর্য্যায়ে পড়বে। যতই রাত বাড়তে লাগল বেলার পক্ষে স্থির হয়ে বসে থাকা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল কিন্তু মিস্টার সেনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই; একভাবে চুরুট টেনে ও বই পড়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই স্থৈর্যে ধাক্কা খেয়ে বেলার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। সে বললে, "আচ্ছা, মানুষ তো? এইভাবে বসে থাকবে?"

"তবে কি করব?"

"খোঁজ-খবর করবে তো?"

"সে তো তুমি করেছ। আমি তার বেশী আর কি করতে পারি?"

"তুমি না বাবা।"

মিস্টার সেন বেলার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। এ দৃষ্টির মানে অনেক কিছু হতে পারে; একটা বোধহয়, তুমি তাহলে এ কথা আজও স্বীকার কর।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে স্পোর্টিং গাড়ির গর্জন এসে পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোরাল হয়ে ওঠা থেকে বাঁচিয়ে দিলে।

একটু পরেই শুভেন্দুর জুতোর আওয়াজ পেয়ে বেলা দরজা খুলে দিলে। হালকা শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকে শুভেন্দু একবার বাপের দিকে তির্য্যক্ দৃষ্টি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বেলা তাকে অনুসরণ করলে।

মিস্টার সেনের কানে এল—

"কি রে, ব্যাপার কি?"

"কেন? কি হয়েছে?"

"রাত ক'টা তা খেয়াল আছে?"

"দরকার মনে করি নি।"

"একটা কিছু বলে যাবি তো। আর হঠাৎ যদি কোথাও আটকে পড়িস একটা ফোন করে দিবি তো। এতটা রাত পর্য্যন্ত দুজনে ঠায় বসে আছি···"

"এর কোন মানে হয় না।"

বিজন সেনের মনে পড়ল, "মানেটা আজ বুঝতে পারবে না বছর কুড়ি পরে হয়তো বুঝতে পারবে।"

কিন্তু এ কথাগুলো উচ্চারণ করা যায় না, কারণ যুগ পাল্টে গেছে।

শিক্ষক ও রাজনীতি

সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল

বছরের পর বছর সংসদীয় গণতন্ত্রের সুর এদেশের আকাশে বাতাসে বেজে চলেছে। এই শ্যামের বাঁশী অনেককে করেছে উন্মনা, অনেককে করেছে ঘর-ছাড়া। রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন—কেউ-ই এ-আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন নি। সংসদ-ভবনে প্রবেশের জন্য তাই বহুলোকের, হ'য়েছে 'হিয়া দগদগি, পরাণ-পোড়নি।'

আমাদের শিক্ষকগণ সংসদীয় নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন বিপুল সংখ্যায়। লোক-সভা এবং বিধানসভার বহু আসনে তাঁরা অধিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপতি-ভবন থেকে শুরু ক'রে রাজ-ভবনের বহু কক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়েছে তাঁদের আবাস। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁরা আসীন। সর্বভারতীয়, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের রাজনীতিতে, শিক্ষকদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম বঙ্গ বিধান-সভায় শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা এতই বেশী যে, এই বিধান-সভাকে শিক্ষক-সভা বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাজনীতি বা দেশসেবায় শিক্ষকের এই ব্যাপক অংশ গ্রহণের পিছনে কতকগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ র'য়েছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক-ই নিম্নবিত্ত শিক্ষিত সমাজের প্রতিভূ। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্র অভিভাবক সবার-ই মোটামুটি শ্রদ্ধার পাত্র। বিপদে আপদে তিনিই লোকের পরামর্শদাতা। লোকজন সহজেই তাঁকে পায় এবং তিনিও অনেক সময় নিজে ক্ষতি-স্বীকার ক'রেও অন্যের উপকার ক'রে থাকেন। নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ লোকে তাঁর মুখ থেকেই শুনতে পায়। গ্রাম বা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরকারের সঙ্গে লেখাপড়ার কাজটি অনেক সময় তাঁকেই করতে হয়। সরকারী অফিসার এলে শিক্ষক-ই তাঁকে গ্রামটি ঘুরিয়ে দেখান; গ্রামের সমস্যাগুলি তিনিই সরকারী' প্রতিনিধির সামনে তুলে ধরেন। স্থানীয় বিবাদবিসংবাদ মিটিয়ে দেবার জন্য বিচার-সালিসী তাঁকেই করতে হয়। এক কথায়, সামাজিক নেতৃত্ব তাঁর-ই। স্বভাবতঃই তাঁর চতুর্দিকে একটা প্রভাবের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। সে-প্রভাব কম বা বেশী যা'-ই হোক, তা'র উপস্থিতি একটা বাস্তব সত্য।

যে সমস্ত শিক্ষক শহরাঞ্চলে বাস করেন, তাঁরাও নিজ নিজ এলাকায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের পাত্র। ছাত্র-ছাত্রীরা-ই 'স্যারে'দের দূত। তা'রাই 'স্যার'-কে পরিচিত করায়, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের আসনে এনে দেয়। তারা-ই পাঁচটা সামাজিক অনুষ্ঠানে 'স্যা'র-কে টেনে নিয়ে যায়—সংযুক্ত করে। সবার-ই ধারণা শিক্ষক অধ্যাপক, আর যা'-ই হোন, সৎ, ভদ্র এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁর কাছে নির্ভয়ে যাওয়া যায়, নিশ্চিন্তে মনের কথা বলা যায়।

শিক্ষকের এই সামাজিক প্রভাব অনেক সময় তাঁকে রাজনীতিতে টেনে আনে।

তা'-ছাড়া স্কুল-কলেজের প্রায় সমস্ত শিক্ষক-ই কোননা কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলি

সংগঠন করার জন্য বহু শিক্ষক কর্মীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়, দূর দূর এলাকায় সংগঠনের উদ্দেশে যেতে হয়। ফলে, তাঁদের পরিচয়ের গণ্ডি এবং কাজের পরিধি অনেক বেড়ে যায়। বিরোধী মতাবলম্বী সহকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়; সভা সমিতি, মিছিল, অবরোধ, অবস্থান এবং ধর্মঘটও করতে হয় মাঝে মাঝে। এ-সমস্ত কাজের যৌক্তিকতার প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, এ-গুলি সংগঠন করতে কর্মীদের দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। এই কাজে কর্মীদের চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-বুদ্ধি, শরীর-মন সব কিছুর-ই উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। ধৈর্য বাড়ে, সংগঠন ক্ষমতা বাড়ে এবং বিচার বিবেচনা শাণিত হয়। আবার, শিক্ষক-সমিতিগুলি কোন-না কোন রাজনৈতিক দলের বলয়-গ্রাসে বিধৃত। তাই, পেশাগত প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিশ্রম অনেক সময়েই রাজনীতি-পোষকতার পর্য্যায়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যে নেপথ্য বিধান শেষ ক'রে প্রত্যক্ষ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শিক্ষক আবির্ভূত হ'ন।

এই রাজনৈতিক জীবন শিক্ষকের পক্ষে অন্যদিক্ দিয়েও অনুকূল। কারণ, শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিতেই এত নিশ্চিত অবসর বোধ হয় আর নেই। গ্রীষ্ম এবং শরতের সুদীর্ঘ অবকাশ ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। কাজের দিনগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাঁচ ঘণ্টার সময় সীমায়। বাঁধা স্কুল শিক্ষকের তুলনায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আরও বেশী অবসর ভোগ ক'রে থাকেন। অন্যান্য বৃত্তিতে অবসর তুলনায় অনেক কম, অর্জিত ছুটিও অনেক সময় মেলে না কাজের চাপে। মোটকথা, শিক্ষকতায় অবকাশ প্রচুর এবং শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা কর্মঠ ও উচ্চাভিলাষী তাঁরা সময়-সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন। তাই, শিক্ষকের পক্ষে সমাজসেবায় তথা রাজনীতিতে অধিক সময় ব্যয় করা সম্ভব, নিজের পেশাগত কাজকর্ম অক্ষুণ্ণ রেখেও।

অনুকূল এই সমস্ত কারণ ছাড়াও, নীতি-হিসাবে শিক্ষককে রাজনৈতিক কার্য-কলাপে সংযুক্ত রাখার পক্ষে অন্যান্য যুক্তি দেখানো হয়।

রাজনীতি প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। বিশেষতঃ যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের তো রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ থাকা উচিত। অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য কিংবা ভুল বশতঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করেন বা নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী অশিক্ষিতদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে না পারেন, কিংবা সচেতন চেষ্টায় দেশের অধিকাংশ মানুষকে নিজের আদর্শ বা মতে আনতে না পারেন, তাহ'লে রাষ্ট্র-শক্তিকে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতি যেহেতু শূন্যতা বিরোধী, শিক্ষিতের রাজনৈতিক ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে সমাজের অন্যান্য অশুভ শক্তি রাষ্ট্র-যন্ত্রকে অধিকার করার চেষ্টা করবে এবং ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত পরিবেশের শিকার হ'তে হবে। তাই রাজনীতি থেকে দূরে থাকা বা রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ না করা সবার পক্ষেই, বিশেষতঃ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, গুরুতর অপরাধ। তাঁর ঔদাসীন্যে তিনি নিজের, প্রতিবেশীর এবং সমস্ত দেশের অমঙ্গল ডেকে আনছেন। যেহেতু শিক্ষক সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক কার্য-কলাপ সব সময়েই একান্ত কাম্য।

আরও আশা করা যায় যে, শিক্ষক যদি রাজনীতিতে অংশ নেন তা'হ'লে দেশের রাজনীতিও অনেকটা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে। স্বার্থ এবং গোষ্ঠীর-দ্বন্দ্ব শিক্ষকের সাধুতা এবং সরলতায় বেশ কিছুটা হ্রাস পায়; শিক্ষকের ঔদার্য এবং পরিশীলিত রুচিবোধ রাজনীতির উগ্রতা ও মত্ততা প্রশমিত করবে।

তা'ছাড়া, শিক্ষকের জীবনের বৃহত্তর অধ্যায় তারুণ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁর মনের উপর দিয়ে ছাত্র জীবনের ধারা অবিরত প্রবাহিত হ'চ্ছে। ঊর্মি-চঞ্চল এই প্রবহমান জীবন-স্রোত শিক্ষকের

মনোভূমিকে নিত্য নূতন পলিতে সাজায়—তা'কে রস-সিক্ত, কর্মক্ষম এবং সৃষ্টিশীল রাখে। তাই অভিজ্ঞতায় শিক্ষক প্রবীণ হ'লেও মানসিকতায় তিনি চির-নবীন। তাঁকে রাজনীতির সঙ্গে যদি যুক্ত করা যায় তা' হ'লে শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে তরুণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা বেশী। আবার শিক্ষকের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ছাত্রদের মধ্যে প্রসারিত হওয়ার সুযোগও নিশ্চিত। তাই যৌবনের ফুল এবং পরিণত বয়সের ফল যদি একই সঙ্গে পেতে হয় তবে ('শকুন্তলা'-পাঠ ছাড়াও) শিক্ষককে রাজনীতিতে নামাতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করা হয়। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হ'য়ে থাকে। সেই শিক্ষা-দান যাঁর পেশা, তাঁকে অর্থাৎ শিক্ষককে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। যেহেতু ক্ষমতা-ই বর্তমান সমাজে মর্যাদার ভিত্তি এবং যেহেতু রাজনীতি-ই মানুষকে চরম ক্ষমতার অধীশ্বর করতে পারে, অতএব রাজনীতির মাধ্যমেই আসতে পারে শিক্ষকের উপযুক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ সম্মান। কোন শিক্ষক যখন রাষ্ট্র-পতি কিংবা মন্ত্রী-পদ অলঙ্কৃত করেন, তখন নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষটির মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ দেখে জনসাধারণ পুলকিত হ'ন বৈ কি। তাই সকল দিক দিয়েই শিক্ষকের রাজনৈতিক জীবন কাম্য এবং বরণীয়।

কিন্তু বিষয়টি অবিসংবাদিত নয়। শিক্ষক রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ করলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে এবং হ'চ্ছে।

শিক্ষকতা এবং রাজনীতির মধ্যে একটা স্ব-বিরোধিতা র'য়েছে। শিক্ষকতার মূল কথা হ'ল ছাত্রদের দেহ এবং মনের স্বাভাবিক গঠনকে ত্বরান্বিত করা; আর রাজনীতির মূল কথা হ'চ্ছে মানুষকে স্ব-মতে আনা। শিক্ষকের কাজের মধ্যে থাকে একটি নিরভিমান শান্ত ছন্দ, যা' ছাত্রদের জ্ঞান-লাভের সহায়ক।

রাজনীতির মধ্যে থাকে নানা আলোড়ন, নানা অন্তঃ-প্রবাহ এবং নানা শক্তির দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে কখনো গায়ে কাদা-মাটি লাগে, আবার কখনো জোটে পুষ্প-অর্ঘ্য। শিক্ষকের কাজ প্রধানতঃ ফুল ফোটানো, আর রাজনীতির কাজ সেই ফুল আপন সাজিতে ভরা। শিক্ষকতার কাজ মানুষের মধ্যে বিশেষত্বের স্ফুরণ, রাজনীতির কাজ সমীকরণ। তাই শিক্ষকের কাজ এবং তা'র পদ্ধতি মূলগত ভাবে রাজনীতির প্রয়োজন থেকে ভিন্ন। শিক্ষক কোনমতেই কারখানার ফোরম্যান নন তাই একই মাপের হাজারো জিনিষ তৈরীতে তাঁর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। রাজনীতি কিন্তু চায় দলের নিয়মের অনুবর্তী, একই ধ্যাণ-ধারণার হাজারো সমর্থক। আর, শিক্ষকতা এমন-ই একটি পেশা, যেখানে শিক্ষকের সমগ্র সত্তার উপর টান পড়ে, তাঁর কর্ম-জীবন এবং ব্যক্তি জীবন একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু রাজনীতি তা' নয়। নৃশংস এবং চরিত্রহীন ব্যক্তিও রাজনীতিতে ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উঠতে পারেন, কিন্তু শিক্ষক হিসাবে সফল হ'তে পারেন না। তাই শিক্ষকতার সঙ্গে রাজনীতি সামঞ্জস্যহীন। শিক্ষক যেখানে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত, সেখানে ছাত্রেরা-ই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। তা'র কারণ, রাজনীতি-বিজড়িত শিক্ষক শিক্ষা এবং রাজনীতি দু'য়ের বিপরীতমুখী টানে শিক্ষার স্বার্থকেই বিসর্জন দিয়ে থাকেন।

আরও দেখা যায় যে, শিক্ষকের জীবনে অবকাশ বেশী হ'লেও রাজনীতি কেবল অবকাশ-রঞ্জনী বৃত্তি নয়। রাজনীতির বুভুক্ষা শিক্ষকের অবকাশকে সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ সময়-টুকুতেও টান দেয়। তাই দেখা যায়, রাজনীতি-করা শিক্ষকের নাই-নাই-নাই যে সময়। স্কুল-কলেজে তাঁর আগম-নির্গমের কোন স্থিরতা নেই; তাঁর ক্লাস প্রায়ই ফাঁক যায় অথবা প্রক্সি দিয়ে চালাতে হয়; তাঁর ছুটির পরিমাণ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। স্বভাবতঃই ছাত্রদের পঠন-পাঠন ব্যাহত হয় ভীষণ-ভাবে।

পড়াশুনার ক্ষতি ছাড়াও অন্য ধরণের গোলমাল সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। শিক্ষকের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে

অংশ গ্রহণের ফলে তাঁর সঙ্গে ছাত্র এবং অন্য সহকর্মীদের তীব্র মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। অবশ্য, মতবিরোধ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও আসতে পারে এবং এসেও থাকে; কিন্তু যখন দেখা যায় যে, ভিন্ন মতের শিক্ষক তাঁর মতামতকে কেবল আলোচনার স্তরে না রেখে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কাজও ক'রে যাচ্ছেন এবং স্কুলে-কলেজ থেকে বেতন ছুটি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাও পুরোমাত্রায় পেয়ে যাচ্ছেন, আর তাঁর অনুপস্থিতির দায়-ভাগ অন্য সহকর্মীদের বহন করতে হ'চ্ছে, তখন মতান্তর থেকে মনান্তর খুব দূরবর্তী থাকে না। রাজনীতি-সচেতন ছাত্রেরাও বিরোধী মতের শিক্ষককে সুনজরে দেখতে পারে না। এ-অবস্থায় শিক্ষালয় হ'য়ে দাঁড়ায় বিবদমান কয়েকটি শিবিরে বিভক্ত। একে অপরের দোষ দেখিয়ে বাহবা নিতে উৎসুক হ'য়ে পড়ে। বণিকের মানদণ্ড হয়তো একদিন রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু শিক্ষকের বেত্রখণ্ডও রাজদণ্ড হ'য়ে দেখা দেবে, সেই সম্ভাবনায় বিশেষ কয়েকজন শিক্ষক হয়তো উৎসাহিত হ'তে পারেন, কিন্তু তা'তে শিক্ষার্থীর কল্যাণ কোথায়? ক্ষমতালোভী ছাত্র-ভুক্ এই শিক্ষক-বৃন্দ আসলে ভগ্ন-ব্যক্তিত্বের শিকার। বৃহত্তর স্বার্থের তকমা পরা এই ব্যক্তিগণ নিজের নির্দিষ্ট কর্ত্তব্যকে যথোচিত নিষ্ঠা এবং গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করেন না। কিন্তু সেজন্য পূর্ণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে লজ্জা পান না বা পরাঙ্মুখ হ'ন না।

কিন্তু এসব ছাড়াও শিক্ষকের রাজনীতি করার বিরুদ্ধে অন্য গুরুতর আপত্তি রয়েছে। কোন অভি-ভাবক তাঁর ছেলেমেয়েকে পারতপক্ষে এমন শিক্ষকের কাছে পাঠাবেন না যিনি বিরুদ্ধবাদী কোন রাজনৈতিক দলের জ্ঞাত সমর্থক অথবা সক্রিয় কর্মী। কারণ, অভিভাবকের দৃষ্টিতে সে-শিক্ষক সম্পূর্ণ বিপথগামী এবং অশ্রদ্ধেয়; তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে যাওয়া আর শ্যাওড়া গাছে বকুলফুল খোঁজা—একই ব্যাপার। অভিভাবকের দৃঢ় ধারণা, তাঁর ছেলেমেয়েরা হাজার পরিশ্রমেও তেমন শিক্ষকের কাছে ন্যায়-বিচার পাবে না, প্রতিটি পরীক্ষায় তাদের অবমূল্যায়ন ঘটবেই এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন আপীল টিকবে না কোনখানেই। ছেলেমেয়েদের রাজনীতিতে হাতে-খড়ি দেবার জন্য নিশ্চয়ই কোন অভিভাবক তাদের স্কুল-কলেজে পাঠান না। তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষক, শিক্ষালয় এবং শিক্ষানুরাগীদের সম্পর্ক অবাঞ্ছিত ভাবে বিষ-ময় হ'য়ে উঠতে পারে। শিক্ষার স্বার্থে সে-সম্ভাবনার মূল উৎপাটিত হওয়া প্রয়োজন।

তাই, শিক্ষককে নিরপেক্ষ ভূমির উপরে দাঁড়াতেই হবে। সমস্ত দল এবং মতের উর্ধ্বে তাঁকে থাকতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত যাই-ই হোক না কেন। কাজে এবং কথায় তাঁকে সমদর্শিতা বজায় রাখতেই হবে, নইলে ছাত্র এবং অভিভাবকের শ্রদ্ধা তিনি পাবেন না, আর শিক্ষাদান এমন-ই কাজ যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহশীলতা এবং নির্ভরতা ছাড়া তা' কখনো-ই সুসম্পন্ন হ'তে পারে না। সমস্ত রাজ-নৈতিক মতামতই সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পথ-রেখা মাত্র। কোন পথ-ই চূড়ান্ত এবং চিরন্তন সত্য নয়। তাই কোন একটি মতকেই অখণ্ডনীয় সত্য জ্ঞান করা এক ধরণের বর্ণান্ধতা—তা' রাজনীতি ক্ষেত্রে হয়তো প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু শিক্ষালয়ে বর্ণান্ধ শিক্ষকের কোনই প্রয়োজন নেই। সেই শিক্ষক আমরা চাই, যিনি জ্ঞান-তপস্বী। দিবারাত্র তাঁর প্রধান চিন্তা হবে কেমন ক'রে নূতন নূতন বিষয় আয়ত্ত করা যায় এবং ছাত্রদের মধ্যে কিভাবে সেই জ্ঞান, সেই জিজ্ঞাসা উন্মেষিত করা যায়। শ্বেতকেতু কিংবা গৌতমের দিন অবশ্যই নেই। সহযোগী অধ্যাপক মৌদ্‌গল্যের উচ্চতর জ্ঞান-চর্চার পরিচয় পেয়ে নিজে অধ্যাপনা থেকে বিরত থাকবেন, এমন পাণ্ডিত্য-নিষ্ঠা এ-যুগে বিরল। তবুও শিক্ষককে যতখানি সম্ভব অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই ব্যাপৃত থাকতে হবে। কারণ যতদিন তিনি শিক্ষক, ততদিন জ্ঞান-সাধনা-ই তাঁর প্রকৃত জগৎ এবং সেখানেই তাঁর প্রকৃত সম্মান।

যাঁরা বলেন শিক্ষককে মর্য্যাদা দিতে গেলে তাঁদের

রাজনীতি করার সুযোগ দিতে হবে, তাঁদের বিজ্ঞতার প্রশংসা করা যায় না। রাজাকে মন্ত্রী ক'রে দেওয়ার মধ্যে যে-সম্মান, শিক্ষককে রাজনৈতিক নেতা করায় তার বেশী সম্মান দেখানো হয় কি-না সন্দেহ। জ্ঞানের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে তপস্বী শিক্ষক অগণিত ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি আজীবন পেয়ে থাকেন, তার কাছে স্বার্থসন্ধ কতকগুলি স্তাবকের চাটুকারিতার কোন তুলনা হয়? রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে কোন কারণে বিচ্যুত হ'লে নেতারা যে-অবস্থা পেয়ে থাকেন তা' কেবল হৃতশ্রী বিগতযৌবন অভিনেতৃ-জীবনের সঙ্গেই তুলনীয়। নির্বান্ধব একাকিত্বই তখন একমাত্র সম্বল।

প্রকৃত পক্ষে সমাজ এবং দেশকে ধ'রে রাখার জন্য ক্ষমতার কেন্দ্র-বিন্দু চিরকাল জ্ঞানীগুণীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। রাজ-শক্তি কার্যকর থাকলেও রাজার উপরে ছিল ব্রাহ্মণের স্থান। তপস্বী, সংযমী এবং জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-ই ছিলেন অতীতদিনে আমাদের সমাজের ভর-কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র আজ স্থানচ্যুত। তাই সমাজ তার ভারসাম্য হারিয়ে ইতস্ততঃ আন্দোলিত। কিন্তু এ-অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভর-কেন্দ্র গ'ড়ে উঠবেই। মনে হয়, শিক্ষক-সমাজই হলেন সেই নূতন শক্তি-কেন্দ্র। শিক্ষার যত প্রসার ঘটবে, স্কুল-কলেজ যত বাড়বে, জাতীয় জীবনে শিক্ষকের গুরুত্ব তত বেশী অনুভূত হবেই। দেশের সমস্ত তরুণ যেদিন বিদ্যালয়ে যাবে, সেদিন প্রাণ-শক্তির কী বিপুল উৎসার আমরা দেখতে পাব। আর জ্ঞান-সাধনার সেই বিরাট কর্ম-যজ্ঞে যিনি পৌরোহিত্য করবেন তিনি তো শিক্ষক। তাঁর সাহচর্যে এবং সংস্পর্শে যারা আসবে তারা চির-জীবনের জন্য প্রভাবিত হবেই। সমাজ এবং রাষ্ট্র সেই তপস্বী শিক্ষকের তপশ্চর্যায় পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবেই।

অবশ্য এ-কথা সত্য যে সব শিক্ষক-ই তপস্বী-জীবন যাপন করতে পারবেন না। কিন্তু তা' না পারলেও নিজস্ব পেশায় প্রতিটি শিক্ষককে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে হবে; অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং ছাত্র-কল্যাণ—এই হবে তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান। শিক্ষকতা কেবলমাত্র পেশা নয়, তা' একটি পরিপূর্ণ জীবন। তা'তে বাইরের ছায়া পড়বে না। বিদ্যালয় এবং মন্ত্রণালয়—এই দু'য়ের মধ্যে শিক্ষক যদি দ্বিধা-বিভক্ত হ'য়ে পড়েন, তা'তে কোনটিরই প্রকৃত মঙ্গল নেই।

তা' হ'লে প্রশ্ন উঠবে, রাজনীতি কার জন্য? সরকারী কর্মচারীর কাছে রাজনীতির দুয়ার রুদ্ধ। সরকারী কর্মী যত বাড়ছে, সেই পরিমাণেই শিক্ষিত-ব্যক্তি রাজনৈতিক অধিকার হারাচ্ছে। সরকারী স্কুল বা কলেজের শিক্ষকও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেন না। ছাত্রেরাও অপরিণতবুদ্ধি, সুতরাং রাজনীতির অনুপযুক্ত। তা'র উপর যদি বেসরকারী স্কুল-কলেজ শিক্ষকদেরও রাজনৈতিক অধিকার না থাকে তা' হ'লে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিরাট অংশ অরাজনৈতিক হ'য়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী এবং অগণিত বেকার। তবে কি রাজনীতি কেবল আমীর আর ফকিরের জন্য?

উত্তর অবশ্যই, না। আমীর এবং ফকির ছাড়াও মাঝামাঝি শ্রেণীর লোকের তো অভাব নেই। স্বাধীন বৃত্তিতে নিযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি রয়েছেন-ই। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও সংখ্যায় নগণ্য নন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা রাজ-নীতিতে অংশ গ্রহণ করুন, দেশকে নেতৃত্ব দিন। তবে অবসর গ্রহণের পূর্বে যদি কোন শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত হ'তে চান, তাঁর পক্ষে শিক্ষকতায় পদত্যাগ করাই উচিত। শিক্ষকের উত্তরীয় থাকুক চির-শুভ্র। তা' কেবল মাত্র শিক্ষককেই অপরিম্লান শুচিতায় ভূষিত করুক। কিন্তু সেই উত্তরীয়কে লাল, নীল, সাদা, কালো নানা দলের নানা ছোপ দিয়ে ঝাণ্ডা বানানো অনুচিত। শিক্ষকের মনোযোগের প্রধান অংশ ছাত্রদের জন্যই

নির্দিষ্ট থাকুক; না-থাকার একটি মাত্রই তাৎপর্য্য: তা' প্রতারণা এবং বিশ্বাসভঙ্গ। শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকে এই প্রতারণা অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার।

শিক্ষকের আগমনেই দেশের রাজনীতি পরিশুদ্ধ হবে, এ-ধারণা সত্য নয়। কারণ, শিক্ষক ছাড়াও অসংখ্য সৎ এবং সাধু ব্যক্তি সমাজে আছেন; তাঁদের দ্বারা যদি রাজনীতি পরিস্কৃত না হয়, তবে কেবল শিক্ষকের দ্বারাই হবে, এ-কথা যুক্তিহীন। তা' ছাড়া, রাজনীতির কতকগুলি নিজস্ব প্রয়োজন থাকে। তা'র টানে অনেক সময় সত্য এবং সুনীতি বিসর্জিত হয়। ব্যক্তিগত চরিত্র অকিঞ্চিৎকর না হ'লেও দলীয় রাজনীতিতে তা' গৌণ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য।

আর, তরুণ সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কেবল শিক্ষকগণ-ই করতে পারবেন এখন যুক্তিও সঠিক নয়। তরুণদল কি চায় তা' প্রতিটি সমাজ-কর্মীই জানেন। বরং তরুণের আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষক অপেক্ষা অন্যের পক্ষেই বেশী জানা সম্ভব, কারণ শিক্ষকের কাছে ছাত্র স্বভাবতঃই কিছুটা দ্বিধা-জড়িত; কিন্তু অন্যের কাছে তা'র মন অনেক বেশী অর্গল-মুক্ত। সুতরাং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষক অপরিহার্য্য নন।

তাই, সংসদ কক্ষে নিমন্ত্রণের বাঁশী যতই বাজুক, শিক্ষককে উন্মনা হ'লে চলবে না। 'তোঁহারি বাঁশরী যব শ্রবণে প্রবেশল, ছোড়লু গৃহসুখ আশ, পন্থক দুখ তৃণ হি ন জানলু'—এ-কথা আর যার মুখেই সাজুক শিক্ষকের মুখে নয়। কারণ, শিক্ষক প্রকৃত-ই জাতির জনক—তাঁকে অপ্রমত্ত প্রচেষ্টায় এবং অবিচলিত নিষ্ঠায় অপরিণত, ক্ষুদ্র এবং খণ্ডিত্যকে পরিপুষ্ট, মহৎ এবং সম্পূর্ণ ক'রে তোলার কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ আট ॥

সাধু সুন্দর সিং-কে আমার ভাল লেগেছিল তিনটি কারণে।

প্রথম, ঐকান্তিক খৃষ্টান প্রচারক হয়েও তিনি হাসতেন মন খুলেই। আমি সে যুগে বাইবেলের ভক্ত হতে পারি নি প্রথমত: এইজন্যে যে, খৃষ্টদেবের বাণী ছিল বেদনাচারণী। আমাকে এক ইংরেজ বিদুষী একবার লেখেন: "আপনার Sri Aurobindo Came to Me বইটি আমার খুব ভালো লেগেছে। কেবল আমি ঘোর আপত্তি করছি আপনি এতে এক অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের হাসিঠাট্টার কথা লিখেছেন বলে। এতে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে আমি মনে করি। আমাদের খৃষ্টদেব বাইবেলে কি কোথাও ভুলেও হেসেছেন...?"

সাধু সুন্দর সিং এহেন গম্ভীরাননাদের সামনে হয়ত হাসতেন না, জানি না, কিন্তু আমার কাছে তিনি অনেক সহাস্য উক্তি করেছিলেন। প্রাণোজ্জ্বল অট্টহাস্য নয়—কিন্তু সুমধুর স্মিত হাস্য। তাঁর জীবনীতে শ্রীমতী পার্কার পাশাপাশি ওঁর দুটি ছবি এঁকেছেন; সদা গম্ভীর প্রচারকের তথা হাসিভরা রসিকের। দুটি দৃষ্টান্ত দিই।

একদা সাধুজি তিব্বতে ডাকাতদের হাতে পড়েন। তারা তাঁর যা কিছু ছিল সবই হরণ করে। কিন্তু সাধুজির সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেমন করে? তারা প্রস্থান করবার মুখে সাধুজি তাদের ডেকে বললেন: "শোনো, আমাদের সর্বস্ব তোমরা হরণ ক'রলেও আমি আরো কিছু তোমাদের দিতে পারি।" সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের নানা গল্প বলা শুরু করলেন। শুনতে শুনতে তারা মুগ্ধ হয়ে সাধুজির কাছে ক্ষমা চেয়ে যা কিছু কেড়ে নিয়েছিল ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে প্রস্থান।

এটিকে বলা চলে কান্না-কাহিনী। এবার হাসির মহলে আসা যাক।

তিব্বতে একবার তিনি অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর জন্যে তারা তাদের একটি পেয়ালায় চা আনতে যেতেই সাধুজি বলেন—পিয়ালাটি আমাকে দাও, আমি ধুয়ে নিই। চা-পরিবেষক বলল: "সে কি হয়? আপনি অতিথি। পেয়ালা সাফ করার ভার আমাদেরই।" ব'লে এক ছ-ইঞ্চি লম্বা জিভ বের করে পিয়ালার তলা পর্যন্ত চেটে সাফ করে তাঁকে চা ঢেলে দিল। তিনি সে চাও ফেলে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার? তখন তাঁর তিব্বতী সহযাত্রী বলল, "ভারতীয়রা প্রতি ভোজের আগে তাদের হাত ও পাত্র সব ধোয়।" উত্তরে সে বলল অম্লানবদনে, "তোমরা তো দেখছি ভারী বোকা—যেহেতু সব পাত্রই যদি তোমরা ধোও তবে তো রোজ উদরপাত্রটিকে ধুয়ে নিতে হয়—এ-অসম্ভবকে সম্ভব কর কেমন করে?"

সাধুজিকে আমার ভালো লাগবার দ্বিতীয় কারণটি

এই যে, তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরতেন, বলতেন: "আমি ইণ্ডিয়ান —ভারত আমার দেশ। কিন্তু আমার ইষ্ট তো শুধু খৃষ্টান দেশগুলির জন্যে ক্রসে ঝোলেন নি, ঝুলেছিলেন সব দেশেরই জন্যে।" সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানব অভিধাটি চালু করেছিলেন। তাই সাধুজি জুড়ে দিতেন: 'আমি বিশ্বমানব, জন্মেছি ভারতে, পর্যটন করি সর্বত্র, সবার কাছে গাই তাঁর নাম যিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন: "Heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away: স্বর্গ মর্ত্য লুপ্ত হতে পারে কিন্তু আমার বাণী লুপ্ত হবার নয়।"

তাঁকে ভাল লাগার তৃতীয় কারণটি এই যে, তিনি আদর্শ খৃষ্টান হলেও নিজের বিবেকের নির্দেশেই চলতেন—গির্জাবাদীদের আদেশে নয়। খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁর বেপরোয়া বিবেকবাদে ক্ষুণ্ণ হতেন, কিন্তু সাধু সুন্দর সিং ছিলেন অচল অটল, বলতেন—খৃষ্টবাদ আর গির্জাবাদ সমার্থক নয়। শ্রীঅরবিন্দ একদা একটি নিবন্ধে churchianity শব্দটির প্রয়োগ করায় বিজ্ঞ মুদ্রাকর Christianity শব্দটি বসিয়ে দেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে তলব করে সাদরে প্রশ্ন করেন: "বৎস! তুমি কি ভেবে আমার ইংরেজীকে শুদ্ধ করতে গেলে?" সুন্দর সিং-এর কথা ভাবতে প্রায়ই এ-মজার গল্পটি মনে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ যা বলতে চেয়েছিলেন তার জন্যে churchianity শব্দটি তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। পাঁজাপুরুত, প্রাণহীন মন্ত্রতন্ত্রবাদ, আচারের ঘনঘটা—যারা গর্জন করে কিন্তু বর্ষায় না—এইসব বোঝাতেই শ্রীঅরবিন্দ প্রয়োগ করেছিলেন চার্চিয়ানিটি বিশেষ্যটি। সাধু সুন্দর সিং-ও এই প্রতিবাদের মূর্ত বিগ্রহ হয়েছিলেন non-conformist ভঙ্গিতে। সুফীদের মধ্যে অনেক মহাত্মাও এই দলে যাঁরা ধর্মের বাহ্য আচারপনাকে পাশ কাটিয়ে বহু দুঃখ পেয়েছেন, বিধিবাদীদের অত্যাচারে উৎপীড়নে যেমন পেয়েছিলেন সাধু সুন্দর সিং, যিনি খৃষ্টান হয়েও ভারতীয় পোশাক বর্জন করেন নি—যত্র তত্র দিগারে চলে অনেক সুশীল সুশীলার কাছেই অপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলতেন প্রায়ই: "খৃষ্টকে মানি এ-অঙ্গীকারের মানে নয় যে, আমি তাঁর পাণ্ডা পুরুতের বিধানও মানতে বাধ্য।" আমি সে সময় বিলেতের হালচাল তো ভালো বুঝতাম না—ওদের নানা আচারকেই মনে হ'ত বরণীয় নয়—বিশেষ করে অনেক গির্জায়ও নিগ্রোদের প্রবেশনিষেধের হুকুম। পরে কৃষ্ণপ্রেম আমাকে বলে: "জাতিভেদ নেই কোথায় ভাই? মানুষ যতদিন অন্তরে অভিমান পুষে রাখবে ততদিন সৌভ্রাত্র থাকবেই কথার কথা—slogan—জিগির।"

॥ নয় ॥

সৌভ্রাত্র—fraternity—বাণীটি সে-সময়ে (১৯২০ সালে) য়ুরোপে যত্র তত্র ওড়াতেন রাজনৈতিকেরা। "সব মানুষ সমান—কাজেই আমরা সবাই ভাই ভাই," এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ত ফরাসী বিপ্লবের egalite (সাম্যবাদ) ও liberte (স্বাধীনতাবাদ)। ইংলণ্ডে পৌঁছে আমার মন প্রথমটায় উজিয়ে উঠেছিল এ-ত্রয়ীমন্ত্র-ঝঙ্কারে। এ-ও পড়তাম নানা প্রখ্যাত পত্রিকায় যে, ১৯১৪-১৯১৮-এর যুদ্ধের নাম হ'ল a war to end all war—এর পরে আর বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না। দু-একটা টুকরো যুদ্ধ? ফুঃ। ওরা হ'ল ব্রণের মত—ক্যান্সার নয়, জাতিসংঘ—League of Nations—যে কোন দিন থামিয়ে দেবে।

সুভাষ কিন্তু সমানে মাথা নাড়ত। বলত: "এ-সব শান্তিপাঠ নয়, ধর্মের নীতির ভড়ং। জর্মানিকে প্রেসিডেন্ট উইলসন যে-কথা দিয়েছিলেন সে-কথা তিনি রাখেন নি, তাই জর্মনি ফের 'সাজো সাজো রণসাজে' বলে তৈরী হচ্ছে এর পরের বিশ্বযুদ্ধের জন্যে।" ওর মুখে কীনসের (John Meynard Keynes) "Economic Consequence of the Peace"-এর সুখ্যাতি শুনে বইটি পড়ে দমে গেলাম। কারণ কীন্স-ও লিখেছিলেন এই কথাই যে, জর্মনির 'পরে সুবিচার হয়নি, আর অবিচার হ'ল ভবিষ্যৎ যুদ্ধের রক্তবীজ। রাসেল খোলাখুলিই লয়েড জর্জকে দুরাত্মাদের কোঠায়

ফেলেছিলেন। পোয়াঁকারে তো ডাকসাইটে শঠ। না, তিনি আরো সোচ্চার হয়েছিলেন রাজনৈতিকদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। লিখেছিলেন (যতদূর, মনে পড়ে তাঁর Roads to Freedom-এ) যে, "শক্তিধররা স্বভাবে দুর্জন—holders of power are evil men"। রাসেলের "প্রিন্‌সিপল্‌স অফ স্পেশ্যাল রিকন্‌স্ট্রাকশন" ও "রোডস টু ফ্রীডম" বই দুটি আমি কেম্ব্রিজে প্রথম পড়ি, আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় "ইনিই দ্রষ্টা পুরুষ"। সুভাষও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত, কেবল বলত প্রায়ই সখেদে, "ওঁরা ভাবছেন মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ভবিষ্যতের কথা। এশিয়ার চীন বা ভারতের দুঃখকষ্ট নিয়ে মাথা বকাবার ওঁদের সময় নেই।"

আমি সুভাষের সঙ্গে এই ধরণের তর্ক করতাম :

দিলীপ : কিন্তু দুনিয়ার এরাই যে হর্তাকর্তা বিধাতা।

সুভাষ (হেসে) : হর্তা বটেই তো—একশোবার, কিন্তু কর্তা বা বিধাতা হ'তে হ'লে যে দিব্যদৃষ্টি চাই তা এঁদের কারোরই নেই—না, রাসেলেরও নেই।

দিলীপ : কিন্তু তুমি একটু অবিচার করছ না কি সুভাষ? রাসেলের স্বধর্ম নয় রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে নামা। তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কর্কটরোগের (cancer) নিদান (diagnosis), দিতে পারেন—কিন্তু চিকিৎসার দায়িত্ব কর্মীদেরই।

সুভাষ : কর্মী মানে? পোলিটিশিয়ান তো? কিন্তু তাঁরা কেউ কি সত্যি বিশ্বের মঙ্গল চান? চান নিজের জাতকে—নেশনকে—বড় করে তুলে ধরতে। তোমার আমার সমস্যা হ'ল ভারতের সমস্যা, এশিয়ার সমস্যা। আমরা সত্যিই চাই এক নবযুগকে আবাহন করতে। কিন্তু তার জন্যে চাই সব আগে, এক—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা; দুই—চীনের বিদেশী বণিকদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া।

দিলীপ : কিন্তু রাজনৈতিকেরাও তো আজকাল চাইছেন ভারতের ও চীনের নব অভ্যুত্থান।

সুভাষ (মৃদু হেসে) : দিলীপ, তুমি স্বপ্ন দে[...] ভালোবাসো বলেই এঁদের কথাকে বরণ করো [...] বিশ্বাসে। য়ুরোপ বা আমেরিকার মাথাব্যথা মুখ[...] শক্তি নিয়ে। আজ এ-জাত শক্তিধর হ'লে ও-জাত [...] মুখো হ'য়ে ব্যালান্স অফ পাওয়ার-এর দিকে এগ[...] কাল ওজাতের বেশি বাড় বাড়লে বাকি সবাই একজে[...] হয় তাকে দাবাতে। এ-পথে চিরশান্তি বা চিরসাম্[...] লক্ষ্যভেদ হতে পারে না।

দিলীপ : আমিও একথা মানি। তাই [...] বলি—তুমি কান না দিলেও—যে তাই ধ[...] ভিত্তি—

সুভাষ : ধর্ম বলো কাকে? ধার্মিকদের বিধান[...] তো? কিন্তু সব যুগেই তাঁরা মুখ্যতঃ নিজেদের মু[...] নিয়েই ব্যস্ত—ভাগবতের ভাষায় পরার্থনিষ্ঠা তাঁদে[...] মধ্যে কজনার ভাষণে পেয়েছ শুনি? ভাগবতে প্রহ্লাদে[...] এ-খেদের কথা আমি তো তোমার মুখেই শুনেছি।*

এ-নমুনাটি দিলাম—কীভাবে সে যুগে আমি সুভাষে[...] সঙ্গে তর্ক করতে করতেও তার ঐকান্তিক দেশাত্মবোধে[...] উদ্দীপনায় মুগ্ধ হতাম। আমরা সবাই এ ও ত[...] চাইতাম, এদিক ওদিক চুঁ মেরে। কিন্তু সুভাষ না। সে[...]

---

* প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি
বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং
ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।
অর্থাৎ
মুনিঋষিরা প্রায়ই ত্যজি অনিত্য এ দুঃখধাম রহে
বিজনচারী
আপন মুক্তির মৌন ব্রতে, হ'তে চায় না ব্যথিতের
বেদনাহারী।
তাপিতপানে যদি না চায় ফিরে তারা' কে দিবে
তাহাদের পরাদান
না দিলে তুমি? ছাড়ি তাপিতে আপনার চাহে না
মোক্ষ ও আনন্দ প্রাণ।
(ভাগবত—সপ্তম স্কন্ধ)

ছিল অন্য ছাঁচে গড়া মানুষ—যার পরম উপাধি—"দেশব্রত"। পরার্থনিষ্ঠা তার ছিল না বলব না, তবে আগে তো দেশ স্বাধীন হোক নৈলে কে কান দেবে আমাদের পরার্থনিষ্ঠার বা বিশ্বাত্মবোধের ঘোষণায়?—এইই ছিল সুভাষের বাণী।

আর একটি কথা সে বলত প্রায়ই: "দিলীপ, ডিমক্রাসি গাছে ফলে না যে, যে কেউ পেড়ে খেতে পারে—তার জন্যে বহু প্রস্তুতি চাই। ইংলণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স তিনটি দেশের ইতিহাস পড়ো মন দিয়ে—দেখবে কত ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে চলে তবে তারা পার্লামেন্টারি ডিমক্রাসি গড়ে তুলেছে। তাই আমার মনে হয় আমাদের দেশে ডিমক্রাসি রাতারাতি মুশকিলাসান হয়ে অভ্যুদিত হতে পারে না। প্রথমদিকে চাই রাজতন্ত্র। রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে যে-সহজ হৃদ্যতার আলো জেগে ওঠে আমাদের হয়ত প্রথমদিকে সেই আলোরই আহ্বান করতে হবে। তারপরে কি হবে, কীভাবে আমাদের দেশে সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার শক্তি ও নৈপুণ্য গড়ে উঠবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তবে let first things come first—আগে আমাদের দেশ থেকে ধনলোলুপ বণিকদের তো তাড়াই। মহাভারতে বলেছে - তোমার মুখে শুনেছি—"কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা, পর্যায়যোগাৎ লভতে মনুষ্যঃ।" ঠিক কথা। সবুরেই মেওয়া ফলে ভাই, হাঁকু পাঁকু করে ওদের রীতি নীতি ধার করে মূলধন বাড়ানোর চেষ্টার নাম অপচেষ্টা.. ..."

আজকের দিনে ভারতীয় ডিমক্রাসির শোচনীয় দুরবস্থা দেখে সুভাষের এ প্রায়োক্তিটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রায়োক্তি: "দিলীপ, কেউ কিছু দিলেই তা পাওয়া যায় না। মানুষ কোন অধিকার পেয়ে যখন তার সুপ্রয়োগে সিদ্ধ হয় তখনই সে হয় অধিকারী। প্রতি ত্যি পাওয়ার জন্যে চাই সে-প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া—সাধনায়।" রবীন্দ্রনাথের এ-সুভাষিতটি তাঁর নানা কথায়ই আমাদের সচকিত করে তুলেছিল। কিন্তু রাজনৈতিকদের সোরগোলে আমরা ভুলে যেতাম এ-স্মরণীয় নির্দেশটি, চাইতাম রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রে হাজারো সস্তা জিগিরের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে। সময়ে সময়ে ভাবি—সুভাষ আজকের দিনে আমাদের মধ্যে ফিরে এলে কোন পথে সহযাত্রীদের চালাত? কিন্তু সে জল্পনা কল্পনা রেখে ফিরে আসি কেম্ব্রিজের অধ্যায়ে—ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি সে সময়ে আমাদের মন কেমন রঙে রঙিয়ে উঠত হাজারো "বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি-র" মাঝে।**

অধিকাংশ ছাত্রই দেখলাম বিশ্বাস করত যে দল বেঁধে শাসক জাতির সঙ্গে নৈযুজ্য—ননকোঅপরেশন—ঘোষণা করামাত্র সাহেবরা পালাবার পথ পাবেন না। আমাদের কেম্ব্রিজের মজলিশে ভাষণ দিতে আহূত হয়ে সকলৎওয়ালাও এ-মতে সায় দিয়ে বলেছিলেন "League of Nationsএর যথার্থ নাম League of damnation"; আর এক মেমসাহেব দেশনায়িকা (তাঁর নামটি কিছুতেই মনে করতে পারছি না) বললেন সগর্বেই যে, ভারতের সাহেব ও মেমরা দারুণ ভয় পেয়েছেন—আমরা নৈযুজ্য করলে তাঁদের লীলাখেলা সাঙ্গ হবে বলে।

কিন্তু সুভাষ কোনদিনই এ-কথায় বিশ্বাস করে নি। শুধু সে নয়—আরো অনেক নেতার মনেই সংশয় ছিল—যেকথা পরে আবুল কলম আজাদ তাঁর "India Wins Freedom"এ লিখেছিলেন: যে আমরা অহিংস নৈযুজ্যবাদী হয়েছিলাম দায়ে পড়ে—এপথে রাতারাতি স্বাধীনতা মিলবে বা মিলতে পারে ব'লে নয়। এই সময়ে লণ্ডনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও আনি বেসান্তেরও ভাষণ শুনি। কিন্তু সুভাষ তাঁদের শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তাঁদের কথায় আদৌ কান দিল না। সে প্রকৃতিতে ছিল একরোখা—যাই ধরত, ধরত আঁকড়ে। এই দুর্দম অনমনয়ীতা তাকে কীভাবে বারবার

** কাব্যের ঝড় তর্কের ধূলি অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি'
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে নাহি তার কোনো

ত্রাস—

(নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ)

ভুগিয়েছিল সে-ইতিহাস সবাই জানে। কিন্তু যৌবনে বিলেতে তার মধ্যে এই রোখ কী ভাবে দীপ্ত হয়ে ফুটত সে খবর অনেকেই রাখেন না। তার নানা অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা ও বিতর্ক শুনতে শুনতে অনেক তামসিক মনও চেতিয়ে উঠত, মেনে নিত তাকে স্বধর্মে-নেতা—born leader—ব'লে, যার শিখর-পরিণতি হয়েছিল পঁচিশ বৎসর পরে যখন সে বিদেশে বিভুঁয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে দেশের "নেতাজি" উপাধি পায় তেমনি সহজে, যেমন সহজে শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে উষা সোনার টিপ পরে "স্বে মহিম্নি"—নিজের মহিমায় দীপ্তিময়ী হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডা আমি বেশিক্ষণ সইতে পারতাম না, যদিও বাগাড়ম্বরে প্রথমটায় যোগ দিতাম সোৎসাহেই। কিন্তু "যার কর্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে"— যা আমার স্বধর্ম নয় তাতে মশগুল হতে পারব কেন? কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করার পরেই মনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ আধার অন্তরে মশালের মতন জ্বলে উঠত: 'মানবজীবনের অন্তিম লক্ষ্য—ঈশ্বরলাভ।" সাধু সুন্দর সিং আমার কাছে এই ভাগবত বাণীর উদ্‌গাতা হয়ে এসেছিলেন বলেই তাঁর শান্তোজ্জ্বল সান্নিধ্যে এত গভীর তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তাঁকে ভজন শুনিয়ে আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলাম। প্রতিদানে তিনি আমাকে খৃষ্টদেবের পুণ্য কাহিনী শুনিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন যে সাংসারিক সমৃদ্ধির জন্যে আলাদা করে উৎসুক হবার দরকার নেই: "Seek ye first the Kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you.—ভাগবত রাজ্যের প্রজার আরো যা যা কাম্য সবই করায়ত্ত হবে। একথায় ভাগবতেরও সায় আছে: "তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে?" অর্থাৎ

প্রসন্ন হ'লে জগতের ঈশ্বর
পারে কি থাকিতে অলভ্য কোন বর?

রূপান্তরিত

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

অনিলবাবুর মেজাজটা কিছু তিরিক্ষি হয়ে আছে। কোন চুলোয় যে গেল দরকারী জিনিসপত্র। বাড়ী বদলের ধকলে তাঁর তো মাথাই ঠিক নেই। এই ছয়বছরে দু'দুবার বাড়ী বদল। তাও যদি বাড়ীর মত বাড়ী হত। বাড়ী নয়তো-দেশলাইয়ের বাক্স। আর তার ঘর। মানুষের দম বন্ধ করবার কল। এরই ভাড়া নাকি দু'শ। ছেলেরা উঠতে বসতে কতবার শোনাচ্ছে। ওদের দোষও দিতে পারেন না। শহরের এই গৃহসমস্যার যুগে যদি একটা বাড়ী থাকত তাঁর। ছেলেদের কতই না অর্থ সাশ্রয় হত। কিন্তু শৌখীনতাই অনিলবাবুর কাল হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী বড় ক্ষোভ অভিমান নিয়ে চোখ বুজেছিলেন। আহা। বেচারার বড় শখ ছিল নিজস্ব একখান বাড়ীর। কতবার অনিলবাবু স্ত্রীকে অন্য গিন্নীদের কাছে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছেন, 'সারাটা জীবন দিদি ভাড়া বাড়ীতে কাটালাম। নিজের ভিটেয় মরেও সুখ। সে সুখ আমার কপালে নেই।' অনিলবাবু ভাবেন সারা জীবন তিনি বাসাবাড়ীতে কাটিয়েছেন বটে, কিন্তু সে বাড়ী বাড়ীর মতই ছিল। কী মস্ত মস্ত ঘর। সেই সব ঘর ঠাসা ছিল জিনিসপত্রে। অনিলবাবুর ছিল জিনিস কেনার নেশা। নানা দেশের নানা জিনিসে ঘর বোঝাই করতেন। আর ছিল বই কেনার শখ। পাঁচটা বড় কাঁচের আলমারি ছিল বইয়ে ভর্তি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, সব বিষয়ের বই ছিল। তিনি রিটায়ার করবার

পর ছেলেরা ঐ বাড়ী ছেড়ে দিল। সব জিনিসপত্রের সঙ্গে বইগুলোও বেচে দিল। ছেলেরা বলে, ঐসব বই আজকাল নাকি কেউ পড়ে না। তা হবে। অনিলবাবু আজকালকার খবর রাখেন না। এখন অবশ্য অনিলবাবু বই পড়েন না। বইগুলো বেচে দিয়ে ভালই করেছে ছেলেরা। শুধু শুধু ঘর জঞ্জাল। মানুষই থাকবার জায়গা নেই। বই টইয়ের জন্য আজ আর তাঁর কোন মায়া নেই। কিন্তু যেটার তাঁর বড় প্রয়োজন, সেটা কোথায় গেল। এই তো চারদিন আগেও ছিল। এই বাসায় এসে অবধি আর দেখতে পাচ্ছেন না। হয়তো ছেলে বউয়েরা তাদের কারো ঘরে রেখেছে। বাজার থেকে ফিরে এসে বউমাকে শুধোলেই হবে। অনিলবাবু ছেঁড়া স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে বাজার চললেন। রাস্তায় বেরিয়ে কী মনে হতেই এদিক ওদিক চাইলেন তিনি। নাঃ। পরিচিত কেউ নেই এখানে। থাকবার কোন সম্ভাবনাও নেই। পরিচিত কেউ যদি দেখত তাঁকে। পরণে রঙচটা লুঙ্গী, গায়ে রঙ-বোঝা-না-যাওয়া পাঞ্জাবী। এককালের ফুলবাবু অনিলকুমার রায়। শান্তিপুরী ফাইন ধুতি ছাড়া বাড়ীতেও যিনি অন্য কিছু পরতেন না। কোনদিন তিনি বাজারই করেছেন কি। একবার বুঝি স্ত্রীর তাড়নায় বাজার গেছিলেন জামাইষষ্ঠীতে। সে কী গা ঘিন-ঘিন করা অভিজ্ঞতা। বাজারে ঢুকতেই চকচকে পাম্ শুয়ে একদলা কাদা লেগে গেছিল। মাংসের না মাছের কাদা ছিটকে ধপধবে পাঞ্জাবিটার দফা রফা হয়েছিল। গলদ্ঘর্ম হয়ে বাজার সেরেও নিস্তার পান নি। গৃহিণীর জিহ্বার ধারে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল। বেশী পয়সা দিয়ে তিনি নাকি বাজারের ওঁচা মাল কিনে এনেছিলেন। অথচ এখন তিনি বাজার করায় চৌকস। সবচেয়ে সস্তায় সেরা জিনিস ঘরে আনেন। বউমারা মুখে বলে না বটে, কিন্তু অনিলবাবু বোঝেন, তাঁর বাজার দেখে তারা প্রসন্ন।

অনিলবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ভাগ্যিস্। এপাড়ায় চেনাপরিচিত কেউ নেই। থাকলে এভাবে বাজার যেতে নিশ্চয় চক্ষুলজ্জা হত। কী জানি হত কি না! ঐ 'চক্ষুলজ্জা' বস্তুটি এখনও আছে। নাকি রিটায়ার করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসপত্রের মত ওটাও বেচে ফেলা হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে বাজার করলেন অনিলবাবু। মাছ টিপে টিপে দেখে কিনলেন। দশটা দোকান দেখে তবে আলু পটল কিনলেন। দুঁ ড়িপাল্লা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওজন করালেন। দোকানদারগুলো মহা পাজি। ওজনে ঠকাবার মতলব সব সময়। বাজার থেকে ফিরবার পথে একতাড়া বিড়ি কিনলেন। সিগারেট ছেড়ে ভালই করেছেন। কাগজে দেখেছেন, সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়। বিড়িই নিরাপদ্।

বাড়ী ফিরেই জিনিসটার কথা মনে পড়ে গেল। জিনিসটার জন্যই তাঁর ভিতরটা চারদিন ধরে খচখচ করছে। শখ শৌখীনতা তো ঘুচে গেছে কবেই। অতীতের শখের জিনিসের মধ্যে ওটাই অবশিষ্ট আছে। ঐটা নিজের কাছে রেখে এসেছেন বরাবর। আগের বাসাতেও নিজের চৌকির তলায় কাপড় জড়িয়ে রেখেছিলেন। দেওয়ালে টাঙাবার জায়গা ছিল না।

তাঁর যৌবনের ফোটোগ্রাফখানা। শখ করে গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধিয়েছিলেন। বাঁধাতে বেশ খরচ পড়েছিল। খরচের বহর দেখে গিন্নী তো রেগেই আগুন। পরে অবশ্য তিনিই সযত্নে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। দেওয়াল জোড়া মস্ত ছবি। অনিলবাবুর বাইশ বছরের চেহারার ফোটোগ্রাফ। বি এ পরীক্ষার ডিগ্রী নেবার পর তোলা গাউন-পরা, হাতে ডিগ্রি। অনিলবাবু যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন। এখন আয়নায় নিজেকে দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছবিখানাই 'যৌবন'-কে মনে পড়িয়ে দেয়। ছবিটা দেখবার জন্য মনটা খুবই আকুলি বিকুলি করতে লাগল। বাসা ছাড়বার সময় বাঁধাছাঁদার ভিতর নিজে তিনি ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। হারাবার কথা নয়। বউমাদের শুধোবেন ভাবলেন। কিন্তু এখন থাক। ওরা রান্নাঘরে ব্যস্ত। স্নান সেরে এসেই দেখা যাবে। স্নানের ঘরে যেতে

গিয়ে থমকালেন। কয়লার গাদার মধ্যে ওটা কী! চকমক করে উঠল যে! চকচকে জিনিসটা ধরে টান মারতেই বেরিয়ে এল। গিল্টি করা ফ্রেমের ভিতরকার সেই গাউন পরা ছবি। মুখে যার লাজুক লাজুক হাসি। কয়লার গাদায় চাপা পড়েও তরুণ অনিলের মুখের হাসি মিলোয় নি। কিন্তু জীবন্ত অনিলবাবুর ভাঙাচোরা মুখ ঐ কয়লার মতই কালো হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে নিজের ঘরে এলেন। ভাল করে ঝাড়লেন পরণের লুঙ্গী দিয়ে। সযত্নে রাখলেন চৌকির উপর। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রেমের ভিতর আঁটা ঐ ছেলেটার জন্য কেমন মমতা হতে লাগল। কিন্তু ছেলেটার ঐ বেয়াড়া হাসি! ওটাই সহ্য হয় না। তাই বেশীক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে পারেন না। চৌকির তলায় ঢুকিয়ে রেখে দেন।

সন্ধ্যের পর অনিলবাবু বেরোলেন। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ফোটোগ্রাফ সমেত ফ্রেমখানা। একটা ফোটো বাঁধাইয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দোকানদারকে শুধোলেন তারা পুরনো ফ্রেম কেনে কি না। দোকানদার ফ্রেমটা দেখল। বলল, পুরোন জিনিস। দাম বেশী দেওয়া যাবে না। দরাদরি করে একটাকায় রফা হ'ল। দোকানদার ফ্রে[illegible] থেকে ফোটোখানা খুলে ফেলল। অনিলবাবুর দিকে এগিয়ে ধরল। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। বললে[illegible] ওটার প্রয়োজন নেই। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলে[illegible] শুধু। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিছন ফিরে একবার তাকালেন। দেখলেন, দোকানদা[illegible] গাউন-পরা 'অনিল' কে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল রাস্তায়।

টাকাটা পকেটে পুরে পানবিড়ির দোকানের দিকে চললেন। একতাড়া বিড়ি কিনতে হবে। ও বেলাই বিড়ি সব ফুরিয়ে গেছে। হাতে পয়সা না থাকায় আর কিনতে পারেন নি। নেশার অভাবেই বোধহয় মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে।—'বাবু একটা পয়সা দে।' পিছন ফিরে দেখেন একটা ল্যাংড়া বাচ্চা ভিখিরী।—'যা পালা! পয়সা কোথায় পাব!'—'দে রাজাবাবু, দে। দুদিন ধরে খেতে পাই নি। ভগবান্ তোকে অনেক দেবে। গরীবকে দে।'

পকেট থেকে টাকাটা বের করে চট করে ভিখিরীটার হাতে ফেলে দিলেন। তারপর হনহন করে বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগলেন অনিলবাবু।
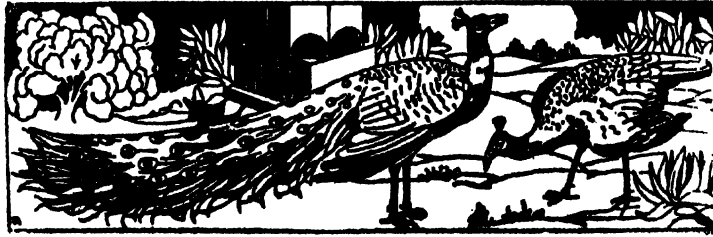
পরীক্ষা ঘরের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

॥ ৬ ॥

এই সব আবোল তাবোল উত্তরগুলি নিয়ে চিন্তা করলে এ থেকে শিক্ষা দেওয়া ও পাওয়ার কোথায় ত্রুটি, তা আবিষ্কার করা খুব কঠিন হবে না। সেদিকে আমি সব শেষে কিছু চেষ্টা করব এমন ইচ্ছা আছে। আপাতত আরো নমুনা দেব। এর আগে পঞ্চম অধ্যায়ে সমানাধিকরণ বহুব্রীহির একটি ব্যাখ্যায় পাওয়া গেছে—"সমানাধিকরণ বহুব্রীহি—যেমন লাঠালাঠি, দুই লাঠির সমান অধিকার।" এই ব্যাখ্যা, ও অন্য ব্যধিকরণ ও সমানাধিকরণ বহুব্রীহির ভুল ব্যাখ্যা দেখে কৌতুক অনুভব করেছিলাম ঠিকই। এর কিছুদিন পরে যষ্টিমধু নামক এক মাসিকে একটি লেখা চাওয়াতে আমি এই দুই প্রকার বহুব্রীহি বিষয়ে একটি গদ্যছন্দ লিখে দিয়েছিলাম। মাঝখান থেকে তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

পরীক্ষার হলে বসলে, হে সোনামুখ,
তোমাকে আর চেনা যায় না।
কিন্তু তুমি তো জান, তুমি কি সমাস।
হে সোনামুখ, হে কমলমুখ,
তুমি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।
তেমনি শূলপাণি, বজ্রনখ, পদ্মনাভ,
হে সোনামুখ—
সবই ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।
অর্থাৎ পূর্বপদ বিশেষণ না হলে যা হয়।......
এই বারেই আমার শেষ পরীক্ষা,
স্কুল ফাইনাল,
ফাইনাল অর্থাৎ, অন্তিম,
প্রাইভেট অবশ্য।

* * *

হে রক্তনেত্র, তোমাকেও স্মরণ করি আজ
হে পীতাম্বর, কালোবরণ,
আমার বয়স স্মরণ করে
তোমরাও আমাকে সাহায্য ক'রো।
মনে করিয়ে দিও যে তোমরা
সমানাধিকরণ বহুব্রীহি,
কারণ তোমাদের পূর্বপদ বিশেষণ,
পরপদ বিশেষ্য।
মাত্র এই দুটি বহুব্রীহি,—ব্যধিকরণ আর
সমানাধিকরণ,
আমার গোলমাল হয়ে যায়।
হয়—পরীক্ষার হলে বসলে।
হে রক্তনেত্র — সমানাধিকরণ কথাটায়
কেমন যেন সমান অধিকারের ধ্বনি,
কেমন যেন কম্যুনিজম-কমিউনিজম ভাব।......

ঐ যে "দুই লাঠির সমান অধিকার"—তা থেকেই এই মহাকাব্যের প্রেরণা পেয়েছিলাম। ব্যাকরণ খুলে আরো কয়েকবার গদ্যছন্দ রচনা করেছি—তার মধ্যে বিমল ঘোষের 'এষা' কাগজে 'খচ্' নামক কবিতাটি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। আপাতত কিছু রচনার স্বাদ গ্রহণ করা যাক। রচনার বিষয় ছিল আধুনিক যুগে রেডিওর প্রভাব (১৯৫৪)।

১। "রেডিওর কাজ হইল বায়ু হইতে সংবাদ নেওয়া। রেডিও প্রথমে ভারতে ছিল না ইহা প্রাশ্চাত্য (পাশ্চাত্য) দেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।......মানুষ যেমন বুঝিতে পারে যে তাহার শরীরে মাছি বসিলে সঙ্গে সঙ্গে একমুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া অনুভব করে, মানুষ সেইরূপ কতগুলি তার মুক্ত বাতাসে পোষ্টে লাগাইয়া রাখে এবং তাহা হইতে খবর পায়। বাতাসে একটা নদীর ঢেউএর মত ধাপ আছে। সেই ধাপ হইতে শব্দ ধরিয়া রেডিও দ্বারা বুঝা যায়।

……এখন বিলাতে কি হইতেছে তাহা রেডিওতে বিলাতের কাঁটা তুলিলে জানিতে পারিব।……একজন পুরুষ-সৈন্যের গায়ে কতগুলি যন্ত্র ফিট করায় সে স্ত্রীলোক হইয়া যায়। আবার যন্ত্র খুলিয়া দেওয়ায় পুরুষ হয়। যদি এই রেডিও না থাকিত, তবে এই আশ্চর্য সংবাদ অল্পসময়ে পাইতে অক্ষম থাকিতাম।"

(বাতাস থেকে সংবাদ ধরা, মনে হয় কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির লেখা রচনা থেকে সংগ্রহ করে থাকবে। বাকিটা মৌলিক।)

২। পূর্বকালে অনেক বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন, যেমন কপিলমুনি এই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শব্দদর্শন রচনা করিয়া যে সুখ্যাতি (অর্জন) করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। এইরূপে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং অন্যান্য কবি সকল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া সুকৃতি অর্জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু এই রেডিও কেহ তৈয়ারী করিতে পারেন নাই। প্রথমেই জগদীশচন্দ্র বসু একটি মরা ব্যাং এবং নুনের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আবিষ্কার করেন, তাহার পর এই বিদ্যুতের ফলে গ্যাস লাইট রেডিও সিনেমা প্রভৃতি চলিতেছে।……

রচনাটির এই অংশটুকু থেকে আমার সন্দেহ হয় কোনো রচনা পুস্তকে এই ধরণের কিছু নিশ্চয় লেখা আছে। আমি দু-একখানা বই দেখেছি, তাতে রেডিওর গানবাজনা বা কথা সবই বায়ুবাহিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দের বাহন বাতাস, সেই থেকে এই ধারণা। রচনা শিক্ষার পুস্তক থেকে রচনা শিখতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই এই এই দুর্দশা ঘটে। একখানা রচনা বই সংগ্রহ করে একটি রচনা পড়ে তৎক্ষণাৎ দুটি গল্প লেখার প্রেরণা পেলাম। গ্রীষ্মঋতু বিষয়ে একটি রচনায় দেখা গেল, গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমে গাছের পাতা সব শুকিয়ে যায়, গাছে একটিও পাতা থাকে না ইত্যাদি।

স্কুল ফাইন্যালের 'তোমার গ্রামের একটা ঘটনা লেখ' ও রচনা বইয়ের গ্রীষ্মকাল এই দুটি রচনা উপলক্ষেই আমি দুটি গল্প লিখেছিলাম ছোটদের জন্য। ঘটনায় শুধু আগুন লাগার কথা লিখেছিল সবাই ঘরে আগুন লাগলে শিশুকে বার করতে ভুলে গি বাইরে এসে হায় হায় করছে, এমন সময় ছাত্রটি শি উদ্ধার করে নিয়ে এল। এর কথা আগে বা ছাত্রদের ধারণা এবং শিক্ষকেরা কেউ কেউ এ করিয়ে দেবার জন্য দায়ী যে, খুব নাটকীয় কোনো না লিখলে তা রচনা হয় না। এবং গ্রীষ্মকাল গ্রামের ঘটনা বিষয়ে একই রকম রচনা পড়ে আমি পৃথক গল্প লিখেছিলাম সে সময়। দুটি গল্পই নম্বর ২০৫' নামক বইতে সংকলিত হয়েছিল। একটু একটু নমুনা দিচ্ছি।—

"সেদিন ছিল রবিবার। বিকেলে আ অমলদের বাড়িতে যাবে, এমন সময় রচনা ব্যাপারে তার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।…… জিনিসটা তার হঠাৎ চোখে পড়ল। দেখল ত বাগানের আম কাঁঠালের গাছগুলো সবুজ পাতায় অ হয়ে আছে।……এ দৃশ্য সে রোজ দেখে, পুরানো কিন্তু হঠাৎ তার এ কি হল?……এমন ভুল সে করল? ছুটে বেরিয়ে গেল সে স্কুলের দিকে। সেখ গিয়ে দেখল, সে যেখানে পরীক্ষা দিয়েছিল, সামনেও কত গাছ, পরীক্ষা দিতে বসে কতবা সেদিকে চেয়েছে, তবে সে কেন লিখল 'গ্রীষ্মক বাংলাদেশের কোনো গাছে একটিও পাতা থাকে না' কেন সে মুখস্থ করা রচনা লিখল, কেন সে এতকাল চো চেয়ে দেখেনি?

"দুঃখিত মনে সে এল অমলদের বাড়িতে। সে তার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে এবং সেও পাস করেছে দেখা হতেই আবদুল অমলকে জিজ্ঞাসা করল, বাংল তুই কোনটা লিখেছিস?

"কেন, বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল? একবার তো বলেছি তোকে?

"গাছে একটিও পাতা থাকে না লিখেছিল?

"লিখেছি বৈ কি।

"ভুল হয়নি ?

"হয়েছে বৈকি।……মুখস্থ করা জিনিস লিখেছি, তার মধ্যে কি আর দুচার কথা বানিয়ে লেখার সময় থাকে ?

"তা হলে তুই বুঝেছিলি যে ভুল লিখছিস ?

"নিশ্চয়। গাছ তো সামনেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কানে মায়ের দেওয়া বেল পাতা গোঁজা ছিল, গাছে পাতা না থাকলে সেটি এল কোত্থেকে ? আর মা মঙ্গলঘট বসিয়েছিল, তাতে আমের পল্লব তো আমিই গাছ থেকে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম।……

"অমল বলতে লাগল……ঐ রচনায় আছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে সকল ব্যাধির বীজাণু মরে যায়। তার পরেই কিন্তু আছে, গ্রীষ্মকালে বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। মরেই যদি গেল তা হলে ওরা এল কোত্থেকে ?

"তুই এসব বুঝতে পেরেও লিখলি ?

"তুই একটা গাধা। লিখব না কেন ? বলেছি তো, একটা কথা বদলাতে গেলে সবটাই যে নিজে বানিয়ে লিখতে হয়। তা পারলে কি আর মুখস্থ করি ?"

আবদুল কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল, সে আর কখনো মুখস্থ করে লিখবে না।"

একটি গল্পের মাঝখানের একটুখানি অংশ। দ্বিতীয় গল্পটির প্রেরণা, গ্রামের ঘটনা মানেই কোনো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা, এরই প্রতিবাদ ইচ্ছা থেকে জাত। স্কুলে রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছে, বিষয় তোমাদের গ্রাম। একটি ছেলে এই রচনা দেখে বিভ্রান্ত। গ্রামের আছে কি যে লিখব। এমন রচনা দেওয়া কেন ? তাই সে মাস্টারকে জব্দ করার জন্য লিখতে লাগল, আমাদের গ্রামে আছে কি যে লিখব ? এইভাবে আরম্ভ করে পচা ডোবা জঙ্গল মশামাছি জোঁক এই সব খুব তন্ন তন্ন করে বস্তারিত করে লিখল। সে মুখস্থ করে গিয়েছিল কর্তব্য, পিতৃভক্তি বা বর্ষাঋতু বা অন্য কোনো বিষয়ের রচনা। তাই সে প্রতিহিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের অবান্তর সব জিনিস ও বাজে ঘটনা কয়েক পাতা ধরে লিখল। যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছে।

কয়েকদিন পরে ফলাফল প্রকাশ হবে। ছেলেটির নাম তপন। সে একদিন শুনতে পেল তার রচনা নিয়ে স্কুলে খুব আলোচনা হচ্ছে, আর সে নাকি সবার প্রথম হয়েছে বাংলা রচনায়। কথাটা প্রথমে সে হেসে উড়িয়ে দিল, তারপর তার মনে হল……কথাটা টীচার রটিয়েছেন ঠাট্টা করে।……কিন্তু সবাই বলতে লাগল, তারা শুনেছে স্কুলের কোনো ছেলে আজ পর্যন্ত এত সুন্দর রচনা লেখেনি।……হেডমাস্টার সবাইকে ডেকে বলছিলেন, এই রচনাই আদর্শ রচনা। নিজের চোখে দেখা জিনিস, এমনি আন্তরিক ভাবে, এমনি সহজ ভাষায়, এমনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, লেখাই হচ্ছে উঁচু দরের রচনা। বড় বড় কথা, বড় বড় ঘটনা, খুব চমকপ্রদ সব ব্যাপার, লিখলেই রচনা হয় না। যে সব জিনিস অন্য সবাই তুচ্ছ মনে করে, যার মধ্যে তারা কোনো সৌন্দর্য দেখতে পায় না, সেই সব জিনিসেরই নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে শিল্পীর কাজ।……

গল্প দুটিতে যে পূর্ণতা ছিল, আংশিক উদ্ধৃতিতে তা নষ্ট হল বটে কিন্তু গল্পের যা বক্তব্য ছিল, অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আমার বিশ্বাস।

গ্রামের ঘটনায় আর একটি ছেলে লিখেছিল, এক গ্রামে একটি বাঘের দৌরাত্ম্যে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত, বড় বড় শিকারী কিছু করতে পারছে না, এক সাহেব শিকারীও ব্যর্থ হল, কিন্তু তিন চার জন ছাত্র মিলে বাঘটাকে মেরে দিয়ে এল। (এটি মৌলিক রচনা।)

ভাষার ও অন্যান্য আবোল তাবোলের নমুনা

১। উত্তাম না থাকিলে কিছুই হয় না।

২। তাহার সর্পদর্পণে মৃত্যু হইয়াছে।

৩। যীশুখ্রীষ্ট ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। বর্ষায় বজ্রবিদ্যুৎ দেখা দেয়।

৫। মানহানির জন্য নিরুর আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। (দেনা পাওনা)

৬। কাদম্বিনী ভাবিল আমি এখন পেতাত্ত। (জীবিত ও মৃত)

৭। বোমা তৈরী হয় সূর্যরশ্মির দ্বারা—তাহার নাম অ্যাটম বম।

৮। বক্তা যে কাজ বর্তমানে আরম্ভ করিয়া অতীতে শেষ করে তাহাকে অতীতকালের অর্থে বর্তমান কহে।

৯। টিউবেল। টিউবাল। (টিউব ওয়েল)

১০। No, a client=(১) না, একজন পার্থিব। (২) না, চুপ। (৩) না, বলিয়া চুপ করিল। (client =silent)। (৪) না, একটি সিলেণ্ট।

১১। বাচ্যান্তর কর: ঘরে প্রদীপ জ্বালাই নাই। =ঘর অন্ধকার।

১২। মন্+অন্তর=মনান্তর।

১৩। অনুবাদ: The officer then turned towards him and asked whether he could see the stars (১) বড় সাহেব তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া বলিল, বল, তারা দেখিতে পাও কিনা। (২)···যেমন আবহাওয়া তোমরাও তেমনি নক্ষত্র দেখতে পাও। (১) turned towards him=turned him out. (২) whether=weather=আবহাওয়া।)

১৪। The officer was greatly pleased with the man for his plain speaking—অফিসার ছিলেন মহৎ এবং তিনি লোকেদের অনুরোধ করিলেন তোমরা সর্বদা সত্যকথা বলিবে। (greatly=great=মহৎ। বাকি অংশের ব্যাখ্যা বুদ্ধির অগম্য।)

১৫। Ethnology=নিতম্ব ওঁষমী স্নান। দীক্ষা (=শিক্ষা।) সূর্যদয় বড়ই মনরোম। একদা এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন কতকগুলি খরগোসের সঙ্গে (hermit with matted hair,—hair=hare=খরগোস।) (১) এই সত্য আবিষ্কার করিতে তিনি পাগল হইলেন। (made his discoveries, made=mad=পাগল।) (২) এই দৃষ্টিই তাঁহাকে একজন পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিল। (এখানেও made=mad।)

১৬। তিনি ভাল আব্বিত্র করিতে পারিতেন। (আব্বিত্র=আবৃত্তি।)

১৭। মিনির বাবা একদিন প্রুফ লিখিতেছিলেন। (কাবুলিওয়ালা)

১৮। একে পরীক্ষা পাস করলে তার উপর ১০০০ টাকা লটারিতে জিতলে—তোমার ত আজ শি সংক্রান্তি।

১৯। গরুটা ধরা পড়িলে তাহাকে শিরে সংক্রান্তি করিয়া ছাড়িবে।

২০। can learn a lot from it=কেবল ভাগ্যের কথা জানিতে পারিব। (lot=ভাগ্য।)

২১। কাবুলিওয়ালার বক্ষে যে পিতৃত্বের ভাব তাহা জানিয়া আমরা বিস্মৃত হই।

২২। তবঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে—ব্যাখ্যা: তাহাদের সেই ঘৃণা যেন তৃণের ন্যায় জ্বলিতে থাকে।

২৩। Boys and girls and even grown ups. =(১) বালক ও বালিকা এবং যাহারা জন্মাইতেছে···। (২) বালক ও বালিকারা বড় হয়। (৩) বালক বালিকা এবং বনিতারাও।

২৪। নন্দকুমার মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত লোকের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিয়াছেন।

২৫। অনুবাদ my brothers and sisters told me I had given four times as much for it (the whistle) as it was worth.—আমি খেলনাটি চার ঘণ্টার জন্য আমার ভাইভগ্নীর হাতে দিয়াছিলাম। (time=সময়=ঘণ্টা, four times চার ঘণ্টা।)

২৬। জাতীয় ইতিহাস এনেছিল এক মাহেন্দ্র ক্ষয়।

২৭। আর্ত্তের ক্রন্দন—নিরন্নের হাহাকার।

২৮। সীতার বাগজালে লক্ষ্মণের চিত্তপুত্তলি দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

২৯। ভারত সতী সাধ্বীর দেশ।

৩০। তিনি স্বামীর উদ্ধগামিনী হন।

৩১। নদী রূপের মত ঝিক ঝিক করে।

৩২। বর্ষায় চারদিকে একটা সবুজের সমারোখ পড়িয়া যায়।

৩৩। মাঘ ফাল্গুনে বৃষ্টি হইলে তাহাকে বর্ষাকাল বলে।

৩৪। অর্থের জন্ম তাহারা লীলায়িত।

৩৫। কর্মের মধ্যে যে ক্রিয়া অকর্মণ্য থাকে তাহাকে কার্যকারী করিয়া লওয়াকে সমধাতুজ কর্ম বলে। (আসলের অকর্মক ক্রিয়া থেকে জাত কর্ম, যেমন সে ভাল নাচ নাচছে, ক্রূর হাসি হাসছে ইত্যাদি।)

৩৬। আমার ক্যালামিটি হইল।

৩৭। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জনসেবায় উদ্ধৃত করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন।

A king wishing to hear his three daughters express love for him, once asked them how dear he was to them. The eldest daughter replied, "My father, you are dearer to me than all the gold in the kingdom......

১। একজন রাজা ইচ্ছা করিল ডানগাটারকে ভালবাসতে তাহার জন্ম। এক জন জিজ্ঞাসা করিল কে প্রিয়। ছোট ডানগাটার উত্তর করিল আমার বাবা। (এখানে daughter ডানগাটার হয়েছে। u-কে n রূপে দেখেছে।)

২। রাজার তিন কন্তা ছিল এবং তাহাদিগকে খুব ভালবাসিত শোনা যায়। একদা উত্তর করিল প্রিয় কেমন আছ? ছোট কন্তাটি উত্তর করিল বাবা তুমি খুব শয়তান তোমার সমগ্র রাজ্যে। (eldest doughter = ছোট কন্তা। বাকিটা দুর্বোধ্য।)

The king looked at her in bewilderment and cried, "do you measure your love for me by common salt?" The princess shook her head, and again replied "I love you, father, more than salt."

১। রাজা দেখিলেন এবং চীৎকার করিলেন হাবাইও না। রাজপুত্র ভয় পাইল তাহার মাথা দেখিয়া এবং উত্তর দিল আমি ভালবাসি বাবা সমস্ত জিনিস থেকে।

২। রাজাটি তাহার দিকে তাকাইলেন এবং পরবর্তী সাক কাঁদিতে লাগিল। তুমি কি ইহাকে সত্য তোমার ভালবাসার লোক মনে কর? রাজা তাহার মাথায় হাত দিলেন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

Youngest daughter (১) বড় শিশুপুত্র। (২) বড় রাজপুত্র। Contrary to the expectation said ছোট রাজকন্তা রাজার প্রতি এসপিকটন করিয়া বলিল। The princess shook her head (১) রাজকুমারী করমর্দন করিল। (২) রাজকুমারী ভয়ে মাথায় হাত দিল। (৩) রাজপুত্র তাহার মাথায় আঘাত করিল। Almost in the centre of England stands the old town of Stratford. (১) স্ট্যাটফিল্ডে সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া সেন্টার করিলেন। পুরাতন টাউন ইংল্যাণ্ডে। (২) ইংলণ্ড একটি পুরাতন সহর। Promptly said—অঙ্কের আবৃত্তি করার মত বলিল। (থিয়েটারের prompting শব্দের ক্ষীণ স্মৃতি।)

The king looked at her in bewilderment and cried—(১) রাজা হিংস্র পশুর ন্যায় গর্জন করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। (২) রাজা চোখ গরম করে তাকিয়ে চীৎকার করে বললেন। (৩) রাজা তাহার দিকে তাকাইয়া মিস্ত্রীকে চীৎকার করিয়া বলিলেন। (মিস্ত্রী কি করে এলো সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।) Simply said—সিমপ্লি বলিল। Neighbouring village—নেবুইং গ্রাম।

ইণ্টারমীডিয়েট (বিজ্ঞান) পরীক্ষার্থীদের আবোল তাবোল।

এদের কথা পূর্বে একবার বলেছি। যা বাকি ছিল তার নমুনা দিচ্ছি এবারে—

১। কাশীতে কত পুণ্যভাক্ত ব্যক্তির সমাগম হয়।

২। শিশিরের এক ফোঁটা দান যে কত নগ্ন। (নগণ্য?)

৩। একটি রচনায় (নাম 'পল্লীবাস ও শহরবাসের তুলনা') ইংরেজী উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এই রকম— God maid the country and man maid the town.

৪। শহরের লোকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয় এবং মাঝে মাঝে strick করে।

৫। শৈবাল নামক পাথর দীঘির ধারে থাকে।... দীঘি শৈবাল পাথরের নিকট কৃতজ্ঞ।

৬। কাশীর প্রধান দ্রষ্টব্য তাহার সমুদ্র এবং তীরে সমুদ্রের খেলা। পৃথিবীর লোক এখানে সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতে আসে।

৭। জীবনের জলীয় বাষ্প জোর করিয়া চাপিয়া দিলে জীবনের লক্ষণ সাময়িকভাবে সুপ্ত থাকে। (অব্যক্ত জীবন)

৮। শিশিরকণা দোদিল্লমান হইয়া থাকে।

৯। অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রুপদীকে ভাল করিয়াছিলেন।

১০। শহর কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত।

১১। একমেবাদ্বিতীয়ম।

১২। শৈবালের অর্থ (১) মেঘ, (২) পাথর, (৩) আইস্‌বার্গ।

১৩। দ্বিতীয় স্পুটনিকের চালক ছিল লাইকা নামক একটি কুকুর।

পরীক্ষা ঘরের আবোল তাবোল অংশ প্রায় শেষ হয়ে এল। এই উদ্ধৃতিগুলির জন্য কোনো এক সম্প্রদায় দায়ী নয়। সকল ধর্মের ছাত্রই আছে—ছেলেমেয়ে সবাই আছে। ইংরেজী অনেক হাউলারের বইতে ছাত্রছাত্রীর নাম ছেপে দেওয়া হয়। আমার যদিও অধিকাংশই লেখা আছে, তবু নাম প্রকাশে বিরত রইলাম।

এ জাতীয় উত্তর লেখার প্রধান দায়িত্ব মনে হয় শিক্ষকের। সবই প্রায় ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষা। এক দিনের জন্যও যদি এর এক-একটি পাঠ চিত্তাকর্ষক করে ছাত্রদের মনে সম্পূর্ণ গেঁথে দেওয়া যেত তা হলে এ জাতীয় আবোলতাবোল লেখা কখনো সম্ভব হত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেরা অমনোযোগী হয় ভাল পড়ানোর অভাবে। শিক্ষকেরও শেখানোর গরজটা পুরো থাকা দরকার এবং তা থাকলে লাঙ্গুল মানে লাঙ্গল কিংবা আঙ্গুল, অথবা শৈবাল মানে পাথর বা আইসবার্গ লেখা সম্ভব হত না। ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল ফাইন্যাল ও ইন্টারমীডিয়েট—সর্বত্রই শেখানোর গরজের অভাবটাই আগে অনুভূত হয়। ছাত্রদের মনোযোগ শিক্ষক নিজগুণে আকর্ষণ করে নেবেন এটাই কাম্য। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, মাত্র একদিনের জন্যও যদি এক-একটি পাঠের মূল বক্তব্য চিত্তাকর্ষক করে বুঝিয়ে দেওয়া যেত, তা হলে এমন দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। ছাত্রের দোষ আছে অবশ্যই কিন্তু তাকে ভালবেসে টেনে ধরে রাখার ক্ষমতা শিক্ষকের কাছ থেকে অপেক্ষিত। (ক্রমশ)

গত মাসের আবোল তাবোলে ৬৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে অপুক্ত কর্তা স্থলে অনুক্ত কর্তা হবে। ১০০ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষ দুই ছত্রে 'রুপার' কথাটির পর দাঁড়ি হবে না, আর "তামা রূপো ও" স্থলে তামা রূপেও পড়তে হবে।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

'কল্কী' আপিসের বাড়ীতে রাজাজি এখন থাকেন না। তিনি পাশের রাস্তার একটি বাড়িতে উঠে গেছেন। মিনিট তিনেক মধ্যে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। কল্কীর কর্মী সদালাপী মিষ্টভাষী মুরলীধরবাবু এখন রাজাজির সেক্রেটারী। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের রাজাজির কক্ষে নিয়ে হাজির করলেন।

বাড়িটি বেশ বড়। বাইরে পুলিশ পাহারা রয়েছে। ঢুকেই ডানহাতে একটি ছোটখাটো পুলিশ ঘাটি। সেটি অতিক্রম করলে একটি হল ঘর। তারই বাঁ হাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষে রাজাজি শোয়া-বসা লেখা-পড়া সবই করেন। সেই ঘরেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। চারিদিকে কয়েকটি বইয়ের আলমারি রয়েছে। ছোট একটি খাটে তিনি বসেছিলেন। তার উপর অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা ও বই ছড়ানো। পাশে কয়েকটি চেয়ার টেবিল আছে।

আমরা সকলেই রাজাজির পায়ে হাতে দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। কানে এখন কম শোনেন এবং শরীরও খুব ভাল না, তাই মিনিট পাঁচেকের বেশি আমরা কথাবার্তা বলিনি। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে মৃদু হেসে বল্লেন—**My health is keeping pace with the conditions of the country**—আমার স্বাস্থ্য দেশের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলছে। আসবার সময় ডানহাতটা উর্ধ্বে তুলে বলেছিলেন—**See that West Bengal is not given to China**, দেখো পশ্চিম বাংলা চীনাদের দিয়ে দেওয়া না হয়। রাজাজি এ আশঙ্কার কথা লিখেও প্রকাশ করেছেন। তাঁর আশঙ্কার কারণ, পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। মধ্যে একসময় তো আমাদের মনেও অনুরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

রাজাজির সাধারণ স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালই মনে হলো। চেহারার উজ্জ্বলতা যেন বেড়েছে। প্রায় পঁচিশ বছর পরে তাঁকে দেখলাম। সেই বিখ্যাত কালো চশমা জোড়া চোখে ছিল না। সামান্য ন্যুব্জ হলেও স্বাভাবিকভাবে খাটের উপর বসেই তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ফিরবার পথে মুরলীধরবাবু খানিকটা পথ এগিয়ে দিলেন। কথায় কথায় তিনি জানালেন, এই ডিসেম্বরে (৭২) রাজাজির বয়স ৯৪ বৎসর পূর্ণ হবে। তিনি শতায়ু হোন এই প্রার্থনা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

মাদ্রাজের গভর্ণর হাউসের নাম এখন রাজাজি হল। জীবন্ত মানুষের নামে প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে বিরল নয়। কলকাতায় বাসন্তী দেবী কলেজ, লক্ষ্ণৌএর এ. পি. সেন রোড, বোম্বাইর নরীমান ও গান্ধীমার্গ এ প্রসঙ্গে মনে আসে। সাধারণ মানুষের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকে বলেই এমন নামকরণ গৃহীত হয়। ইতর বিশেষ হলে উপেক্ষিত তো হয়ই, হাসিঠাট্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রাজাজির বাড়ী যেতে এন এস সি বোস রোড নামে একটা রাস্তা আমরা অতিক্রম করেছিলাম। নামটা বাঙালীর—অথচ এন এস সি বোস যে কে তা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। হঠাৎ খেয়াল হলো এন এস সি মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র। এমন সংক্ষেপ করার ফলে নামটির মাধুর্য আমাদের কাছে কমে যায়।

হাতে আমাদের এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় আছে।

তার মধ্যে আর্ট কলেজ ও মিউজিয়ম দেখতে হবে। পাঁচটার সময় এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার বন্ধ থাকে। রাজাজির বাড়ী থেকে তাই সোজা আমরা মিউজিয়ামে গেলাম (প্যানথিয়ন রোড)। সকাল সাতটায় এটি খোলে। তাই আমাদের সূচিতে ছিল সকাল আটটায় এখানে আসব। এখান থেকে যাব ফোর্টের যাদুঘরে। সেটি খোলে বেলা ন'টায়। তারপর পার্থসারথি মন্দির ও অন্য ব্যবস্থা। কিন্তু সকালটা আমরা পুরো কাজে লাগাতে পারিনি বলে মাদ্রাজের কিছু কিছু দর্শনীয় স্থান ছেড়ে দিতে হলো।

শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই যাদুঘরটির প্রশংসা শুনেছি বহুজনের মুখে। অমরাবতী বৌদ্ধস্তূপ থেকে সংগৃহীত দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাস্কর্য এবং ব্রোঞ্জ মূর্তির গ্যালারিটির জন্যই যে কেবল এই সুখ্যাতি তা নয়।

মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বাংলার নানা স্থানের ভাস্কর্য এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। স্বভাবতঃ আমাদের বাঙালী মন এতে একটু বেশী উল্লসিত হয়েছিল। কার প্রেরণায় এগুলি এখানে স্থান পেয়েছে জানি না। তবে মনে পড়ল এই এই আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

সাপের অনেক ক্ষোদিত মূর্তি। একটিতে অবিকল মনসার চালচিত্র। দুটি ভগ্ন কালী মূর্তিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি মূর্তির মুকুটের আকার হলো করোটি।

লিপির বিবর্তন আমরা তেমন বুঝি না, তবে ভাল লাগে দেখতে। মহেনজোদারোর সীলমোহর,গয়নাগাটি, পাত্রাদি ও জপমালা ইত্যাদি দেখলে বিস্মিত ও আনন্দিত হবেন সকলেই। মহেনজোদারোর নামের সঙ্গে যে দুটি নাম অক্ষয় হয়ে আছে তা হলো জন মার্শাল ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালী হিসেবে রাখাল দাসের জন্য কিঞ্চিৎ গর্ব হয় বৈ কি!

যাদুঘরে অন্যান্য বহু দর্শনীয়ের মধ্যে মুদ্রার মাধ্যমে ভারতের ইতিহাস, মূল ও প্রতিলিপিতে ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ও বহুবিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের এমন সুন্দর সংগ্রহ সুলভ নয়। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখবার মত আরও বিস্তর বিচিত্র জিনিষের সমাবেশ ঘটেছে। সুন্দরভাবে সেগুলি সাজানো গোছানো এবং সযত্নরক্ষিত। গোটা প্রদর্শনীটি ভাল করে দেখা এক-আধদিনের কাজ নয়। কর্মীরা এখানে সৌজন্যশীল কিন্তু পয়সার প্রত্যাশী। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারি কোথায়ও কোন প্রবেশ মূল্য নেই। মিউজিয়ামের পাশেই আর্ট গ্যালারি। কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের দেখা হলো না। এখানকার নটরাজের মূর্তি ভুবনবিখ্যাত। মিউজিয়মে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার আছে।

সূর্য্যালোক থাকতে থাকতে সমুদ্র দর্শন করা চাই। তাই আমরা সোজা চলে গেলাম সমুদ্রতীরে। পথে পড়ল পাবলিক হেলথ লাইব্রেরী। ভারতবর্ষের আর কোন শহরে একমাত্র জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গ্রন্থাগার আছে বলে শুনিনি। মিউজিয়মের কাছ থেকেই বাস সমুদ্রতীরে যায়। বাস থেকে সমুদ্র কিনার বেশ খানিকটা দূর। বিরক্তিকর বালু ভেঙে অনেকটা পথ গেলে তবে জলের দেখা পাওয়া যায়। বালির উপরেই সুবেশা নরনারী ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসে আছেন। শিশুরা হুটোপুটি করছে। স্ত্রী-পুরুষ দোকানিরা নানা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কফি, বাদাম, খেলনা, খাবার, কড়ি, শঙ্খ সব পাওয়া যায়, এমন কি ঝাল মুড়িও। একটা ফুলের দোকানও দেখা গেল। আপনি ইচ্ছে করলে নামমাত্র মূল্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার শখ মেটাতে পারেন। জিন দেওয়া ঘোড়া নিয়ে ভাড়া দেবার জন্য মালিকেরা এখানে ঘোরা ফেরা করে।

এখানে এই বালুময় বেলাভূমিতে জনসভাদি অনুষ্ঠিত হয়। একটি স্থায়ী মঞ্চ সেজন্য নির্মিত হয়েছে। মাইক্রোফোন বসাবার স্থায়ী পোস্টও আছে। এইসব যন্ত্র থেকে সঙ্গীতের সুর ভ্রমণকারীদের তৃপ্ত করে।

সমুদ্র এখানে আকর্ষক মনে হয় নি। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। সেজন্য মাদ্রাজের মানুষের

গর্ব্ব খুব। সবটুকু দেখার অবকাশ হলো না। সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

পরের দিন সকালে সাতটায় হাইকোর্টের পেছনে একসপ্রেস বাস গুমটি থেকে আমাদের বাস ছাড়বে। জায়গাটার একটু হদিশ করে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি এসে গেল বলে তা আর হলো না। বাসে করে সরাসরি হোটেলে ফিরে এলাম।

স্নানাদি সেরে ৬টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একসপ্রেস বাস গুমটির উদ্দেশ্যে। সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কখনো প্রবলভাবে কখনো বা ঝিরঝির করে বর্ষণ চলছে তো চলছেই। এইরকম বিরামহীন বর্ষণ নাকি কদাচিৎ ঘটে। হোটেল থেকে খবর নিয়ে জেনেছিলাম হাইকোর্ট বেশি দূরে নয়, হেঁটেই যাওয়া চলে। বাসও আছে অনেক।

মাদ্রাজের পথঘাট আমাদের চেনা নয়। তাই বাসে যাব ঠিক করলাম। বাস নম্বর ও রাস্তার নিশানা পেতে আমরা হিমসিম খেয়ে গেলাম। তিনজন পথচারী আমাদের তিন রকম নির্দেশ করলেন। শেষ পর্যন্ত মোহনদা জনৈক ভিখারীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক পথ বা বাসের খবর পান। অনেকের ধারণা মাদ্রাজের কিছু লোক আছে যারা অন্য রাজ্যের নবাগতদের এইভাবে দুর্ভোগ দিয়ে আনন্দবোধ করে। আমার ধারণা ভাষা বিভ্রাটের ফলে এঁরা আমাদের কথাবার্তা ঠিকমত বুঝতে পারেন না। আর তার জন্যই বিভ্রান্তিকর নির্দেশ দেন।

দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র ভাষা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্র ও মহীশুরে যথাক্রমে তামিল, মালায়ালম, তেলেগু এবং কানাড়ী ভাষাভাষীর রাজ্য। এ ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তর বা পূর্ব্ব ভারতীয় ভাষার ও সংস্কৃতের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এরা হিন্দীর ঘোর বিরোধী। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা হলো তামিল। অন্যগুলিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ইংরেজী বহুজনে জানেন। কিন্তু একটি বিদেশী ভাষা কখনই দেশের আপামর জনসাধারণ শিখতে পারেন না। দুশো বছর ধরে ইংরেজী পড়ে শতকরা দশ পনের বা বড়জোর বিশজন মানুষ হয়তো এই ভাষাটা জানবার সুযোগ পেয়েছেন। অবশিষ্ট আশি শতাংশ মানুষের তো মাতৃভাষা সম্বল। সে ভাষার এক বর্ণও উত্তর অথবা পূর্ব্ব ভারতের মানুষের বোধগম্য হয় না। এই অসুবিধার একটা প্রতিকারকল্পে বিনোবাজি ভারতবর্ষের সকল ভাষা দেবনাগরী অক্ষরে লিখবার উপদেশ দিয়েছেন। সর্বসেবা সঙ্ঘ এ বিষয়ে উদ্যোগীও হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বোদয় মণ্ডল সর্বোদয় নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেছেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ আয়োজন হচ্ছে বলে জেনেছি।

বন্ধুবর বিধুভূষণ দাসগুপ্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা শেখার বই রচনা করেছেন। এগুলি পরিণত বয়সের মানুষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। মাদ্রাজ স্টেশনের বইয়ের দোকানে ত্রিশ দিনে তামিল ও তেলেগু শেখার বই দেখেছি। এ বই পড়ে কাজ চালাবার মত জ্ঞান অর্জন করতে বেশ সময় লাগে। ভ্রমণকারীর প্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যগুলির তর্জমা রোমান অথবা দেবনাগরী অক্ষরে দিয়ে দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে কাজ চালানো সম্ভব হয়। খাদ্য ও পানীয়ের নাম, নমস্কার ইত্যাদি শিষ্টাচারের প্রতিশব্দ, জামা কাপড় প্রভৃতি পোশাক পরিচ্ছদের এবং নিত্যব্যবহার্য নানা দ্রব্যের ইংরেজী ও স্থানীয় নামের তালিকার সঙ্গে কয়েকটি বাক্যের তর্জমা থাকলেই কাজ চলবে মনে হয়। কোন ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি এ কাজটি করলে ভ্রমণকারীদের বিশেষ সুবিধা হবে।

অসুবিধা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট পূর্বে আমরা বাস গুমটিতে বাস পেলাম। হাতে একটু সময় ছিল তাই ঘুরে ঘুরে হাইকোর্ট ও লাইট হাউসটি দেখে নিলাম। একেবারেই অর্থহীন এ দেখা। একটা বড় বাড়ী দেখলাম এইমাত্র। পঁচিশ পয়সা দক্ষিণা দিলে লাইট হাউসের মাথায় চড়ে শহর ও সমুদ্র দেখবার সুযোগ মেলে।

বসে কয়েকজন বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলো।

তার মধ্যে একজন মোহনদার ছাত্র। তিনি মোহনদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আজকের ছাত্রদের নামে কত দুর্নাম শুনি। তারা দুর্বিনীত শ্রদ্ধাহীন উচ্ছৃংখল অমনোযোগী ইত্যাদি ভূরি পরিমাণ অভিযোগ। এইরকম খবরে সংবাদপত্র ভরা থাকে। অথচ হাজার হাজার শ্রদ্ধাশীল বিনয়ী নীরব ছাত্রদের কথা কিন্তু আমরা মনে না রেখে ওদের কথাই বেশি করে বলি। আজকের শিক্ষার এটাই অর্থাৎ বিকৃত দৃষ্টিই হলো সব চেয়ে বড় গলদ। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় বাসটি ছাড়ল কিন্তু ট্যুরিস্ট ব্যুরোর আপিসে এসে অনেকক্ষণ দেরী হলো। সরকারী গাইডমশায় আসতে দেরী করার জন্যই এই বিভ্রাট। বাসটি সেন্ট টমাস পাহাড়ের নিকট আসতেই গাইড ভদ্রলোক মুখ খুললেন। যথাবিধি সৌজন্য সহকারে এখানকার খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক সংস্থা এবং ঐতিহাসিক গীর্জার কথা জানালেন। যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সাধু টমাস নাকি প্রথম শতকে এখান থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে গেছেন। তিনি আরও জানালেন, কোন গোঁড়া হিন্দু তাঁকে হত্যা করেছিল। এ কথাটির তাৎপর্য আমার নিকট দুর্বোধ্য। এ বাক্যটি না বল্লে ক্ষতি ছিল না। শুধু বলা যেত তিনি নিহত হন। ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচারের জন্য হত্যার ঘটনা একান্তই বিরল। ধর্মের নামে সারা পৃথিবীতে বিস্তর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সম্ভবত ভারতীয় হিন্দুই সবচেয়ে কম রক্তপাত ঘটিয়েছেন তাঁর ধর্মের জন্য। বহু গীর্জা হিন্দুর প্রদত্ত জমিতে ও অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে। মহীশূরের একটি প্রধান গীর্জার ভিত্তিশিলা স্থাপন করেছিলেন সেখানকার হিন্দু রাজা। এই তামিল নাড়ুর কুম্ভকোনমে বিবেকানন্দ কম্বু কণ্ঠে বলেছিলেন—"এই [illegible] কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসল[illegible] জন্য মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে।"

পথে ডি. এম. কে দলের সদর কার্যালয় দেখে এসেছি। ভবনশীর্ষে দলীয় প্রতীক (পাহাড়ের মধ্যে উদীয়মান সূর্য) অঙ্কিত এবং [illegible] ও কালো রঙের মিশ্রণে তৈরী পতাকা শোভিত। এই পতাকার লাল ও কালো অংশ আড়াআড়ি ভাবে জোড়া। কিন্তু খানিকটা পথ যেতেই পতাকার আকার বদলে গেল। লালও কালো অংশ এখন লম্বালম্বি জোড়া। একজন বল্লেন ওটা আন্না ডি, এম, কে দলের পতাকা। কিন্তু সে সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইলেন না কেউ। ডি, এম, কে হোক্, আর আন্না ডি, এম, কে হোক্ ভয় করে তাদের সকলেই। বর্ণ হিন্দুরা এদের কারো পরে নির্ভর করতে পারেন না। দলের বাইরে সকলেই নাকি নত ও নীরব হয়ে অছেন সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায়।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা কাঞ্চিপুরম পৌঁছে গেলাম। কাঞ্চিপুরমকে সংক্ষেপে কাঞ্চী বলা হয়। মাদ্রাজ শহর থেকে ৭১ কিলোমিটার। সুন্দর ও আনন্দদায়ক পথ। রেলেও আসা যায়। গাইড জানালেন শিব ও বিষ্ণু মন্দির মিলে এখানে ১২৪টি মন্দির আছে। ভ্রমণ পরিচালক ভদ্রলোকের মতে এত অল্প পরিসরে এত বেশি মন্দির ভারতের কোথায়ও নেই। শহরটির আয়তন ১১ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভ্রমণ পরিচালকের দাবি মেনে নেওয়া যায় না ভুবনেশ্বরকে সহস্র মন্দিরের নগর বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের একয়ার গ্রামেই শতাধিক, অবশ্য ক্ষুদ্রকায় মন্দির আছে।

শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত। যে দিকে শিবমন্দির তাকে বলা হয় শিব কাঞ্চী। আর বিষ্ণুমন্দির কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কাঞ্চী। বর্ষায় ভিজে ভিজে আমরা মন্দির ও দেবতা দর্শন করলাম। সময় কম, সর্বত্র যাওয়ার সুযোগ নেই। এখানে বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—একমবারেশ্বর, কৈলাসনাথ, শ্রীবরদারাজা, বৈকুণ্ঠ পেরুমল ও শ্রী কামাক্ষী মন্দির। বৌদ্ধ যুগের আগে আমাদের দেশে শিল্প ও ভাস্কর্য সমৃদ্ধ বৃহৎ মন্দির ছিল না। প্রধান মন্দিরগুলি সবই অনুমিত হয় বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত। পরে শ্রীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময় এই সব মন্দিরে [illegible] নানা দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই

মন্দিরগুলির অধিকাংশ দেড় দু হাজার বছরের পুরাতন। দক্ষ স্থপতি, ভাস্কর ও কারিগর মিলে মিশে সারা জীবন ধরে অনন্ত নিষ্ঠা আর ধৈর্যের সঙ্গে নিষ্প্রাণ পাথরকে কুঁদে কুঁদে তিলে তিলে তিলোত্তমা সৃষ্টি করে গেছেন। কেবল সৃষ্টি নয়, অপূর্ব রূপ ও সৌন্দর্য বোধের পরিচয় রেখে গেছেন তাদের স্থাপনায়। অনেক মন্দির আছে যেগুলি একাধিক পুরুষ ধরে নির্মিত হয়েছে। যেগুলি একাধিক পুরুশ ধরে নির্মিত হয়েছে।

ঘন্টা মিনিট বোনাস আর ওভারটাইমের হিসাবে বাঁধা আজকের মানুষকে দিয়ে আর যাই হোক পাথর খোদাই রার মন্দির আর মূর্তি গড়া সম্ভবপর হবে না। জীবনে বৈষয়িক উন্নতির কথা ভুলতে হবে, ভুলে যেতে হবে দিনরাত্রির হিসাব—এককথায় নিজের সৃষ্টির মধ্যে আত্মলোপ যিনি করতে সমর্থ হবেন তিনিই পারবেন তুচ্ছ পাথরকে দেবতা করে তুলতে, মূক শিলাখণ্ড একমাত্র তাঁর হাতেই মুখর হয়ে উঠতে পারে। এক দেড় হাজার বছর আগেকার মানুষেরা গড়েছিলেন এই সব ন্দির ও দেবতা—অথচ তাঁরা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। ীয় সৃষ্টির আনন্দে তাঁরা এতই বিভোর থাকতেন যে ার্থিব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন চেতনাই তাঁদের ছিল না। াই সব অজানা সাধকদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন র আমরা প্রথমে একমবারেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ লাম।

এ মন্দিরে পাথর শুধু নয়ন ভোলায় না, কথাও দ। তাদের ভাষা আমাদের জানা নেই, তাই মুগ্ধ খের দেখা দেখেই ফিরে এলাম। মূল মন্দিরের শ পথের বাড়িটিকে গোপুরম্ বলে। আমাদের শ নহবৎখানা যেমন হয়। এ মন্দিরের গোপুরমটি দেশে 'ম' বর্ণটি নানা শব্দের শেষে জুড়ে দেওয়া) ১৮৮ ফুট উঁচু। একতলা বাড়ি ১০ বা ১০॥ ফুট সেই হিসাবে এটি আঠারো তলা বাড়ির সমান। াতায় তের তলা বাড়ি দেখেই আমরা বিস্মিত । গোপুরম্‌কে টাওয়ার বলাই বোধ হয় ঠিক। ন্দিরে প্রবেশ মূল্য দশ পয়সা। পূজার কি নিয়মরূপঃ দীপ অভ্যর্থনা—ত্রিশ পয়সা; অষ্টত্তরম পঁচাত্তর পয়সা; সহস্রনাম দুই টাকা এবং রুদ্রম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আসল ব্যাপারটা কি তা বুঝতে পারি নি। এর পরেও পুরোহিত ঠাকুরকে পয়সা দিতে হয়, যদিও তার বাধ্য-বাধকতা নেই। পূজা উপকরণ সামান্য এবং পদ্ধতিও সরল। তালপাতার টুকরিতে একটি বা দুটি ঝুনো নারকেল আর সামান্য ধূপ ইত্যাদি পূজোপকরণ একটাকা থেকে দু টাকার মধ্যে কিনতে পাওয়া যায়। ফি জমা দেবার রসিদ সহ এই টুকরিটি পুরোহিতের হাতে দিলে তিনি দাঁড়িয়েই নামটি জেনে নিয়ে মন্ত্র পড়েন। পরে দেবতার সামনে নারকেলটি ভেঙ্গে একটুকরো শাঁস প্রসাদরূপে ফেরত দেন। এই হলো পূজা। এতে আমরা তৃপ্ত হই না। কিন্তু অন্য উপায় নেই।

এ দেশে মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামে মন্দিরের নাম হয়। কিন্তু প্রাঙ্গণে নানা গৃহে বিস্তর দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। একমবারেশ্বর হলেন শিব। কিন্তু দুর্গা, গণেশ, নটরাজ, প্রভৃতি অনেকেই এইখানে বিরাজ করছেন। সরকারী বিবরণ অনুসারে মন্দিরটি পল্লভেরা নির্মাণ করান। পরে বিজয়নগরের রাজা ও চোলাগণ কর্তৃক সংস্কৃত হয়। মূল মন্দিরটি যথেষ্ট বড়। তাছাড়া আছে পাঁচটি পৃথক্ বাড়ি এবং সহস্র স্তম্ভের হল ঘর বা মণ্ডপ।

এই মন্দিরে দেবী দুর্গা চতুর্ভুজা। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি একটি সাধারণ গৃহে স্থিতা। মহাবলীপুরমে, মহীশুরে ও আরও কয়েকটি স্থানে আমরা মা দুর্গার মূর্তি দেখেছি। এ মূর্তির সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পুত্রকন্যা পরিবৃতা বঙ্গজননী দশভুজার কোন মিল নেই। তবু দুর্গা দেখলে আমরা একটু বেশি তৃপ্ত ও পুলকিত হই। শান্ত শিব ও অশান্ত নটরাজ উভয়ই এখানে পূজিত হন।

এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরে দেবদেবীর জল-বিহারের জন্য একটি করে পুকুর আছে। বাংলায় প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে নৌকা বা লরীতে করে যেমন ঘোরানো হয় এও প্রায় সেই রকম। তবে এঁরা [illegible]

শেষে বিসর্জন না দিয়ে বিগ্রহকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যান এই যা পার্থক্য। মূল বিগ্রহ কিন্তু নাড়াচাড়া করা হয় না এই সব কাজের জন্ত অপেক্ষাকৃত ছোট একটি প্রতিরূপ বিগ্রহ তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।

এতবড় মন্দির দেখতে সময় পাওয়া গেল মাত্র আধ ঘণ্টা তাই সর্বত্র চোখ বুলিয়েই ফিরে আসতে হলো। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এখানে আচার্য শঙ্করের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে। সেটা আর দেখবার অবকাশ হলো না। দেখিয়ে দেবার কোন লোক নেই। সঙ্গের সরকারী গাইড বাস থেকে নামেন নি। আচার্য শঙ্কর একটি বিস্ময়কর নাম। ভ্রমণ-বিশারদ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী তাঁর রম্যাণি বীক্ষ্য বইয়ের কেরল পর্বে লিখেছেন—

"বিশ্বের অদ্বিতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়েছিল এই গ্রামে (কেরলার কালাডি)।...বিখ্যাত নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ কুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল।...আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নর্মদা তীরে গোবিন্দাচার্যের কাছে দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল কাশীধামে বাস করেন ও পরে বদ্রীনারায়ণ চলে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়।...বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের চাপে সনাতন হিন্দুধর্ম তখন পর্যুদস্ত। সেই সঙ্কটের দিনে আচার্য শঙ্কর তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে সর্বশূন্যবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করে হিন্দুর ধর্মকে তার স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।...এই বিশাল ভারতে শঙ্করাচার্য চারটি মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে হিমালয়ে বদরীনাথের পথে যোশী মঠ, দক্ষিণে মহিসুর রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর তীরে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, আর পশ্চিমে আরব সাগর তীরে দ্বারকায় সারদা মঠ। ...লোকে বলে বত্রিশ কিংবা আটত্রিশ বছর বয়সে হিমালয় পার হয়ে তিনি কৈলাসে গিয়েছিলেন শিবের দর্শনে, আর ফেরেন নি।"

শঙ্করাচার্যের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে আমরা বিষ্ণুকাঞ্চীর পথ ধরলাম। কাঞ্চী খুব পুরনো শহর। হিন্দুভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম এটি। পল্লভ ও চোলা রাজাদের রাজধানী ছিল এইখানে। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে পল্লভেরা বহু সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। কেবল মন্দির নয়, রেশম শিল্পের জন্যও এর খ্যাতি প্রচুর। বর্তমান জনসংখ্যা লক্ষাধিক। রাস্তাগুলি খুবই প্রশস্ত। পূর্বে নাকি আরও বেশি চওড়া ছিল। কালক্রমে মানুষ একটু একটু করে দখল করে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নিয়েছে, রাস্তা হয়েছে সঙ্কুচিত। রামানুজের স্মৃতির সঙ্গেও কাঞ্চী জড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ চাণক্যের জন্মভূমি বলেও এই শহরটিকে নির্দেশ করা হয়। বাংলার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব যে এখানে এসেছিলেন তা তো শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই লেখা আছে।

একমবারেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে আমাদের বাস দাঁড়াল একটি কাপড়ের দোকানের সামনে। শ্রীনিবাস এণ্ড কোং। আমাদের জানিয়ে দেওয়া হলো ভ্রমণকারীদের জন্য টাকায় দশ পয়সা বিশেষ রিবেট দেয় এই দোকানী। পছন্দমত কাপড় কিনলে ভি, পি করে পাঠায়। ট্রাভেলার্স চেক নেয়। ইত্যাদি। দোকানটি প্রধান বাজারের বাইরে। বড় বাজারে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় না, তার কারন সেখানে একবার ঢুকলে যাত্রীরা বেরিয়ে আসতে অস্বাভাবিক দেরি করেণ। সবাই প্রায় নেমে গেলেন। কিন্তু দু'চারজন ছাড়া বিশেষ কাউকে কিছু কিনে নিয়ে আসতে দেখা গেল না। একটি বাঙালী মহিলা মন্তব্য করলেন কলকাতার চেয়ে দাম বেশি।

এখন চা পানের বিরতি। বেশ একটি বড়সড় দোকানের সামনে এসে বাসটি থামল। দোকানের একাংশ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। দোসা বড়া আর কফি দিয়ে আমাদের সৎকার করা হলো। এ খাদ্যে আমরা অনভ্যস্ত। তবু কিছু খেতে হলো। চা পানের পর আমরা বরদারাজা বিষ্ণু মন্দির দেখতে গেলাম।

বরদারাজা মন্দির বিজয়নগরের রাজাদের কীর্তি বলে দাবি করা হয়। ভ্রমণ-পরিচালক বল্লেন, অনেকে

মনে করেন এটি বুদ্ধ মন্দির ছিল। হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের পূজার্চনা গ্রহণ করে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরের বাইরে একটি শিল্পসমৃদ্ধ মণ্ডপে পাথরের বিষ্ণুর কূর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই মণ্ডপের কার্ণিশ পাথর কেটে তৈরি শিকলে শোভিত ছিল। এখনও কয়েকখণ্ড দৃষ্টি গোচর হয়। বিস্ময়কর কীর্তি বটে!

মূল মন্দিরের সামনে গরুড় ও স্বর্ণ স্তম্ভ রয়েছে। জনৈকা শিবপুরবাসিনী প্রৌঢ়া যাত্রী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এত সোনা পেল কোথায়? তিন শ' টাকা করে সোনার ভরি! এতদিন ধরে এত সোনা এখানে রয়েছে অথচ চুরি চামারি হয় নি, লুঠপাট করে নেয়নি এটাও তাঁর বিস্ময়ের অন্যতম কারণ। উচ্চকণ্ঠে তিনি সে কথা সঙ্গীদের জানালেন। যাদের উদ্দেশে বলা তাঁরা বিব্রত হলেন কিন্তু কিছু বল্লেন না। বাংলায় কথা। অতএব এখানকার কেউ এটা বুঝতে পারছিলেন না ভেবে আমরা যেন স্বস্তি বোধ করছিলাম। মোহনদা তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে মহিলাটির বিস্ময়কে স্বাভাবিক বলতে চাইলেন।

মন্দির দেখার জন্য সময় ছিল আধ ঘণ্টা। এখানেও দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়। দর্শনার্থীকে যে পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয় সেখান থেকে দেবতার অবস্থান বেশ দূরে। স্তিমিত দীপালোকে দেবতা দর্শন করা যায় না। মধ্যে মধ্যে কর্পূর জেলে আরতি করা হচ্ছে। একাজটি পূজার অঙ্গ। প্রত্যেকটি যাত্রীর পূজোপকরণের মধ্যে খানিকটা কর্পূর থাকে। এই রকম এক আরতির মুহূর্তে এক পলক দেখে নিলাম।

প্রবেশ পথে ইংরেজী ও স্থানীয় ভাষায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ-হিন্দুদের মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমাদের সহযাত্রিণী একটি সপ্তদশী ইংরেজ-কন্যা বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে মুখটি কালো করে ফিরে গেলেন। আমার মনটি বিষণ্ণ হলো। কি এর তাৎপর্য জানি না। তবে মন্দির অভ্যন্তরে ভক্তজনের প্রবেশাধিকার থাকা সমীচীন, তা তিনি যে ধর্মের মানুষ হোন না কেন। বিবেকানন্দের পুস্তকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ল—"যদি ম্লেচ্ছেরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি।" এর তাৎপর্য আমরা স্বীকার করিনি। ইংরেজ-নন্দিনী ছাত্রী। তিন মাসের ছুটিতে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে এসেছেন। মন্দির দেখাই তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি জানবার আশা নিয়ে উপাযাচক হয়ে আলাপ করেছিলাম। পণ্ডিচেরি মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি নানা স্থানে পরে আমাদের দেখাশুনা হয়েছে। মন্দির পরিক্রমার সময় নগ্ন পদেই তিনি চলেন। অতি সাধারণ পোশাক, এক কাঁধে ঝোলা, অন্য কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে নগ্নপদে জল কাদার মধ্যে আমাদের সঙ্গে সমান তালেই তিনি চলতেন। দেখা হলেই স্মিতহাস্যে সম্বর্ধনা জানাতেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করতে চান নি। দুইটি মাত্র শব্দে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—কোয়াইট ন্যাচরাল, খুবই স্বাভাবিক। হৃদয়ে পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকলে এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে আমার মনে পড়েছিল নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ত আর ব্লাভাটস্কির কথা। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু তাঁর ভারতপ্রীতি, ঔদার্য ও প্রচলিত রীতিনীতি বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি চিরকাল আমার স্মরণে ভাস্বর হয়েই থাকবেন।

আর একটি ছোট্ট চঞ্চল মেয়ের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। বছর আড়াই মাত্র তার বয়স। নাম অর্চনা। সে বাংলা হিন্দী ওড়িয়া তিনটি ভাষায় অনর্গল কথা বলে আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছিল। মা তার ওড়িয়া, বাবা পুরুলিয়ার হিন্দীভাষী। থাকে জামসেদপুর লোহা কারখানার কলোনিতে। এখানে জনৈকা বাঙালী প্রতিবেশিনী মেয়েটির পাতানো ঠাকুরমা। এই মেয়েটির কলকণ্ঠ আমাদের বাসযাত্রার ক্লান্ত মুহূর্তগুলির শ্রান্তি অপনোদনের সহায়ক হয়েছিল।

পক্ষীতীর্থ

কাঞ্চি ছেড়ে আমরা এলাম পক্ষীতীর্থে। রাজপথে মাদ্রাজ থেকে দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। স্থানটির আসল নাম লোকে আর বলে না। পক্ষী তীর্থ নামেই এর খ্যাতি সমধিক। পাহাড়টির নাম হলো তিরুকালিকুন্দ্রম। তিরুকুলুকুনরম লেখাও দেখেছি। অর্থ পবিত্র পাখির পাহাড়। বৃষ্টির জন্য বাস তার নির্দিষ্ট গতিবেগে চলতে পারে নি। ফলে পাখি আসার সময় পেরিয়ে যাবার পরে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। মন্দির কর্মচারীরা জানালেন, "তাড়াতাড়ি উঠে যান, ভাগ্যে থাকলে পাখি দেখতে পাবেন। পাখি ভগবান্ এখনো এসে পৌছোন নি। পাখিরও বৃষ্টির জন্য দেরি হওয়া বিচিত্র নয়।

বাসে থাকতেই গাইড বলে দিয়েছিলেন, পাহাড় ও তার মন্দিরের ইতিকথা। সাবধান করে দিলেন—দুর্বল যাত্রীকে। খাড়া সিঁড়ি ভেঙ্গে পাঁচশ ফুট পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার ধকল তাদের সইবে না। একবার চেষ্টা করে দেখবার জন্য পনের পয়সার টিকেট কিনে আমরা সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম। ভয় ছিল সুধীরদাকে নিয়ে। ভদ্রলোক সত্তর পেরিয়েছেন। এমনিতে সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও বাতে মধ্যে মধ্যে কষ্ট পান। অশক্ত লোকের জন্য ডুলি আছে। জনপ্রতি ভাড়া ৪ টাকা ২৫ পয়সা। সুধীরদা এ সুযোগ নিতে রাজি হন নি।

কষ্ট হয়েছিল তবুও প্রায় .০ তলা বাড়ির সমান উঁচু এই পাহাড়ে তিনি চড়েছিলেন এবং সে জন্য পরে যন্ত্রণা ভোগ করেন নি। কোন কাজে আসক্তি জন্মালে কষ্ট দূর হয়ে যায়, আনন্দ হলে কঠিনতা লোপ পায়। সিঁড়িগুলি এমন করে সাজানো যে মনে হয় ওপরের দৃশ্যমান ধাপগুলি অতিক্রম করতে পারলেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। সেখানে গিয়ে দেখা যায় আমরা একটি বাঁকে এসে পৌঁছেছি মাত্র, লক্ষ্য আরও দূরে। তখন মনে হয়, এতদূর এসে ফিরে যাব?—এত লোক যাচ্ছে, ওরা যখন পারেন তখন আমিই বা পারব না কেন? আবার চলা শুরু হয়। এই রকম হাতছানি দিয়ে ডাক দেওয়া সিঁড়ি প্রায় সব মন্দিরে। ত্রিচিনপল্লীর রক টেম্পল বা শ্রাবণ বেলগোলায় গোমতেশ্বর এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে।

পর্বতশীর্ষে হর-পার্ব্বতীর ছোট্ট একটি বিশেষত্ব-বর্জিত মন্দির। পুরোহিতরা সকলেই নাকি অ-ব্রাহ্মণ। পূজার আয়োজন উপাচার খুবই সামান্য। পূজার পর প্রতিদিন এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে দুটো চিল জাতীয় পাখি এসে পুরোহিতের হাত থেকে প্রসাদ খেয়ে যায়। পাখি দুটি আসে, প্রসাদও খায়। কিন্তু এর পেছনে যে পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়েছে তা আজকাল বড় একটা কেউ বিশ্বাস করতে চান না। কথিত আছে সূর্য স্পর্শ করার অভিসারে বেরিয়ে জটায়ু ও সম্পাতি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে ভ্রষ্টাচারের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন এই পক্ষীযুগল প্রতিদিন রামেশ্বরম্ আর কাশীর মধ্যে যাতায়াত করে। অবিশ্বাসীরা বলেন - শেখানো পাখী। সরকারী পক্ষীশালা বেদাওন্নল তো কাছেই? আবার কেউ বলেন—আফিংএর মৌতাত ধরিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ওদের এখানে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দানিকেন সাহেব এ সংবাদ শুনলে হয়তো বলতে বসবেন গ্রহান্তরের কোন বিস্মৃত ব্যাপারের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে এই ঘটনাটি। আমরা এর প্রকৃত না সত্য অর্থ উদ্ঘাটনে অসমর্থ বলে নানাজনে নানান কথা বলছি।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় আজ পাখি ভগবান্ এলেন না। খাবার জায়গাটিতে প্রসাদ তখনও রয়েছে। ওপর থেকে গ্রামটিকে দেখে যে আনন্দ পাওয়া গেল, পাখি না আসার দুঃখ তার চেয়ে বেশি মনে হয় নি। পাহাড়, তেঁতুলগাছের জটলা, দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত তাল আর সবুজ ধানে ভরা মাঠের মধ্যে লাল টালির কুটিরগুলি দেখে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়।

নামতে তেমন কষ্ট নেই। তবে বর্ষার জন্য সতর্ক হয়ে চলতে হলো—পা পিছলে না যায়। খাড়াই যেখানে বেশি সে স্থানটিতে সরাসরি নিচের দিকে তাকালে পা-টা টলে যেতে পারে। মোড়ে মোড়ে যথারীতি ভিক্ষুক আছে। নিচের একটি মাত্র ফলের দোকান দেখা গেল। কলা আপেল আর মোসাম্বী পাওয়া যায়। দাম বাজারদরের অন্যূন দ্বিগুণ, তবু লোকে নির্বিচারে কিনছেন। একজন কয়েকটি ছমড়ো নারকেল নিয়ে বসেছেন। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কচি বেছে নিতে চেষ্টা করে ঠকে গেলাম।

ক্রমশঃ

ঈশ্বর, পুরুষ ও মহাভাগা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

ওরা দুটী নরনারী স্বর্গে গেল।

পুরুষ কবি শিল্পী গুণী ভারি সৎ। মেয়ে শুধু সতী। গুণ টুন কিছু নেই।

ঈশ্বর তাঁর মহা সিংহাসনে বসেছিলেন। চারদিকে মুনি ঋষি, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, সর্ব দেবদেবী, অপ্সরারা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু স্ব স্ব ভার্য্যা সহ। চিরযৌবন ও চিরবসন্ত লোক। তবে সকলেই নিঃসন্তান কোন্ মুনির অভিশাপে।

সভা হচ্ছিল, কি নৃত্য গীত হচ্ছিল। থেমে গেল ওদের দেখে।

ঈশ্বর বললেন, 'এস এস, বস, তারপর ভালো ছিলে তো বৎসগণ পৃথিবীতে?

আনন্দিত ভাবে পুরুষ বললেন, 'খুব ভালো প্রভু। তোমার মহিমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই সেখানে। মহা আনন্দে মহাকাব্য কাব্য রচনা করেছি আমরা—ছবি এঁকেছি তোমার সৃষ্টি নিয়ে—আকাশ সাগর নদী পর্বত প্রান্তর অরণ্য কানন মানুষ জীবজন্তু ঋতুচক্র প্রেম নারী—কিছুই বাদ দিইনি প্রভু। তোমার মহিমা সব দেখেছি প্রভু। সব লিখেছি। তোমার মহিমাতে মহিমান্বিত হয়েছি প্রভু।'

ঈশ্বর। (প্রসন্ন) 'বেশ বেশ, (নারীকে) তুমি কেমন ছিলে বৎসে?'

নারী। (বিমূঢ় ভাবে)—'ভালো প্রভু।'

'পৃথিবীকে ভালো লেগেছিল বৎসে? কি কি কাজ করেছ সেখানে?'

নারী—। 'কাজ? যেখানে যেখানে থেকেছি সেবা করেছি প্রভু। ভালো লাগার ভাবনা ভাবতেও অবসর পাইনি। কাজও কিছু করতে পেরেছি তা মনে হয় না।'

ঈশ্বর। 'কেন বৎসে?'

নারী। 'প্রথমে একটা ধর্মশালায় তুমি পাঠিয়েছিলে। সেখানে ভালো লাগা না লাগার কথা বোঝবার আগেই আবার একটা অতিথিশালায় তারা পাঠিয়ে দিল। রইলাম। তারপর—আবার একটা ধর্মশালায় এলাম……। তারপরে এখানে।

ঈশ্বর। 'তা ধর্মশালা বলছ কেন? ভালো লাগে নি থাকতে?'

নারী। (বিহ্বল ভাবে) 'বুঝতে পারিনি প্রভু। ওদের সেবা করেছি। ওরা মুষ্টি ভিক্ষা অর্থাৎ আহার আশ্রয় দিয়েছে।……আর……কেউ বলেছে আদরিণী দুহিতা। কেউ বলেছে তুমি স্বপ্ন তুমি কল্পনা। কেউ বলেছে মহীয়সী সতী। কেউ বলেছে মহাভাগা জীবধাত্রী। আমি মূর্খ নারী, ওসব কথার মানে জানি না প্রভু।'

* * *

ঈশ্বর। 'তা আবার যে মর্ত্তে ফিরে যাবার সময় হল। তৈরী হও বৎসগণ।'

পুরুষ। (খুশী) "আবার যদি ইচ্ছা করো আবার যাব (আসি) ফিরে।"

গাইল, "যা দেখেছি যা-পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

শ্লোক বলল, "আনন্দাৎ উৎপত্তি স্থিতি ও লয়"- উপনিষদের।

নারী। (বিচলিত) 'না, আর পাঠিয়ো না প্রভু।'

ঈশ্বর। 'কেন বৎসে, যেখানে জীবন যৌবন দেহ

তদুমন পতিপুত্র পরিজনে পরিবেষ্টিত হয়ে ধন্য হবে। তুমি শ্রেয়সী প্রেয়সী। তুমি মহাভাগা জননী। সেই রূপেই তোমাকে সৃজন করেছি। জগৎ তোমাকে পেয়ে ধন্য হয়।'

নারী। (ছল ছল নেত্রে) 'না প্রভু। আর তিন কাল ধরে ধর্মশালা অতিথিশালায় ঘুরে ঘুরে বাঁচার মূঢ় অস্থির অবজ্ঞাত জীবনে ফিরে যেতে চাই না। চাই না ঠাকুর।'

ঈশ্বর। 'তবে পুরুষজন্ম চাও?'

নারী। 'না প্রভু। ওরা ভারি অহঙ্কারী। অতি বুদ্ধিজীবী। আমাদের জীবধর্মী জন্তু বলে।'

ঈশ্বর—ঈষৎ হাসলেন। 'বৎসে, ওদের কথায় আহত দুঃখিত হয়েছ দেখছি। কিন্তু ওরাও তো 'জীব ধর্মী জীব। ওরা নিজেরাও জানে। তোমরাও জানো।' নারী লজ্জিত নত মুখে নীরব।

* * *

সহসা আকাশ ঝাপসা হয়ে গেল। চাঁদ সূর্য্য তারা দেব দেবী আদিত্য গ্রহ বসু স্বর্গ সব মেঘের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। একটা মেঘের ভীম গর্জন শোনা গেল।

ঈশ্বর অন্তর্হিত হয়ে গেছেন। ওরা সভায় কাছাকাছি দাঁড়াল।

তারপর দেখল ওরা পৃথিবীতে এসে পড়েছে। দুটো ধর্মশালায় দুজনে।

পুরুষটী সেই ধর্মশালাতেই চিরকাল রইল।

আর মেয়েটা? মেয়েটা? (আধুনিক থিয়েটারের ষ্টেজ বদলানো দেখেছেন আপনারা ত) পটকা নয়, কিন্তু বিয়ের বাজনার মত একটা শব্দ হল। মেয়েটা দেখল আর একটা অতিথিশালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বাঃ। সবাই বলছে 'মহাভাগা' 'পূজার্হা'। আবার 'গৃহদীপ্তয়া'। ভালো ভালো অবোধ্য কথা। বিশ্বাস করল সে। আবার একটু পরে। আরেক অতিথিশালা বা ধর্মশালায় দেখা গেল।

এবারে নারীটা বুড়ী হয়েছে। কিন্তু কোথায় রয়েছে? ঐ যে? ঐখানে?

কোথায়? নাঃ সে নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছে, না।

* * *

আমরাও খুঁজে পাচ্ছি না।

বোধহয় স্বর্গে গেছে। ঈশ্বরকে অভিসম্পাত দিতে। ঈশ্বরের গায়ে কি অভিশাপ লাগে জিজ্ঞাসা করছেন?

লাগে। ভৃগু মুনির শাপ লেগেছিল।

লাল নীল হলুদ

প্রমোদরঞ্জন পাল

সমীর ঘরে ঢুকে টেবিলে কি যেন একটা খুঁজছিল। শমিতা দেয়ালের গায় তাকটা গোছাতে গোছাতে জিজ্ঞেস করল—কি খুঁজছ বল ত?

—আমার সিগরেট লাইটারটা পাচ্ছি না।

শমিতা তোয়ালে দিয়ে একটা কাঁচের গ্লাস মুছছিল। জানলা দিয়ে সে দেখতে পেল যোগমায়া এদিকে আসছেন। শাশুড়ীকে আসতে দেখে শমিতার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। ছেলে ও বউয়ের মেলামেশাটা তিনি খুব একটা প্রীতির চোখে দেখেন না কোনও দিন।

শমিতা চোখের ইসারায় সমীরকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করে বলল,—এই যে এখানে তাকের উপরে রয়েছে।

সমীর কাছে যেতেই শমিতার হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো শমিতার পায়ের আঙুলে বিঁধে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করল। নুয়ে পড়ে বেঁধা-কাঁচের টুকরো টেনে বের করতে করতে শমিতা রাগের ভাব করে বলল,—দিলে ত গ্লাসটা ভেঙ্গে?

সমীর অবাক্ হল শমিতার অভিযোগে। শমিতাই গ্লাসটা ফেলেছে অথচ দায়ী করছে ওকে। শমিতার পা থেকে রক্ত ঝরছে দেখে সমীর প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, নিজেকেই অপরাধী মনে করে সঙ্কুচিত হচ্ছিল। প্রতিবাদের কথা এখন সে ভাবতেও পারছিল না। গ্লাসটা যে শমিতা ফেলেছে যোগমায়া তা দেখতে পাননি। তিনিও সমীরকেই অপরাধী মনে করে বললেন,—কেন, কি অত দরকার তোর এখানে? তোকে বারণ করলেও ত কানে কথা নিস্ না।

দোষ তার নয় অথচ দুজনেই তাকে দোষ দিচ্ছে সে মাকে বলল,—আমি গ্লাস ফেলিনি, আমাকে কেন বলছ?

সমীর প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু তার কথায় কোন জোর ছিল না। সমীরের অবস্থা দেখে শমিতা মনে মনে বেশ খুশীই হচ্ছিল। বেশ জব্দ হয়েছে এবার। গ্লাসটা সে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিল সমীরকে জব্দ করার জন্যে।

সমীরের চুপসে যাওয়া ফাটা বেলুনের মত মুখের দিকে তাকিয়ে শমিতার মনে এবার একটু করুণা হল. সে সমীরকে বলল,—দেখত, বার্ণলটা টেবিলের ওপর আছে। খুব জ্বালা করছে।

সমীর বার্ণল এনে কাটায় লাগিয়ে দিয়ে নিজেই যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। অপরাধের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে এই ভেবে।

অন্যায় আচরণের জন্য সমীরের মন বিরূপ হতে পারে শমিতার সে চিন্তা নেই। তার মনের মধ্যে ক্ষোভের জ্বালা। সামান্য কাটার জ্বালা ত তার কাছে কিছুই নয়। শাশুড়ী আর তার ছেলের ওপর শমিতার আক্রোশ। সুযোগ পেলে সে আঘাত করতে ছাড়ে না। সমীর বিরক্ত হবে? তা হোক। তাকে বিরক্ত করতেই সে চায়। তাকে সে বিদ্রোহী করতে চায়। তাতে যদি তার চেতনা, নির্জীবতার খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ক্রোধে ফেটে পড়ে তাতেই শমিতা খুশী হয় বেশী। কিন্তু শমিতার কিসের এত আক্রোশ?

শমিতা ও শাশুড়ীর মধ্যে স্বাধিকার ও আধিপত্যের সেই চিরন্তন ঝগড়া। মায়ের ছেলের উপর মালিকানার জোর বেশী, না স্ত্রীর তার স্বামীর ওপর। বেশ একটি জটিল গ্রন্থি। টানাটানিতে গ্রন্থির ফাঁস শক্ত হয়, সরল হয় না, আরও অঘটিতকর ঘটনার কারণ হয়।

শমিতার প্রতি সমীরের একটা নিস্পৃহ ভাব। অথচ সমীর মায়ের প্রতি বেশ অনুরক্ত। সমীর মায়ের কাছে নানা আবদার জানাত, যেমনটি সে করে এসেছে ছোটবেলা থেকে, কিন্তু শমিতার কাছেই তার যত সঙ্কোচ। শমিতা তাকে কাছে টানার চেষ্টা করেছে, আপন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হয়নি। এক টুকরো রবারকে টেনে ছেড়ে দিলে সেটা যেমন গুটিয়ে তার পূর্ব আকারে আবার ফিরে আসে, সমীরেরও হয়েছে তাই। টানাটানিতে সে তার অভ্যস্ত খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেও আবার সে মায়ের আঁচলের আশ্রয়ে ফিরে আসে। শমিতার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় তার এই আচরণ। ছেলেমানুষ নাকি? তাকেই সমীরের এত ভয়টা কিসের? হয়ত এ পরিবারে সে নতুন এসেছে। তা নতুনই বা কি করে বলা যায়? দু' বছর ত হয়ে গেছে। তবুও জড়তা কাটল না সমীরের? অদ্ভুত! দুঃখে ক্ষোভে শমিতা মাঝে মাঝে মরিয়া হয়ে অশোভন আচরণ করে ফেলে। মনের ঝাল মেটানোই শুধু তার উদ্দেশ্য নয়। আঘাত করে সমীরকে তার অস্বাভাবিক অবরোধ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসাই তার কাম্য। কিন্তু উদ্দেশ্য তার সফল হয় না। অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। যে সমীরকে শমিতা বেপরোয়া ও মারমুখী করে তুলতে চায়, সে যেন আরও নেতিয়ে পড়তে চায় এতে। জলের ওপর কোনও আঘাতের চিহ্নই থাকে না—সহজেই সমীর তার নিটোল নিস্তরঙ্গ আবাসে ফিরে যায়। আঘাত তার ওপর মোটেই কার্যকর হয় না।

সমীর, যা হোক, এতদিন একটা প্রচার সংস্থায় চাকরি করছিল। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই, দুম্ করে সে একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এল—কি না, শরীর ভাল নয়। চাকুরী সে করবে না। শরীর ভাল না? কি হয়েছে?—ডাক্তার দেখানো হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—কিছুই হয়নি। মানসিক অবসাদ, মনের অসুখ, Schizophrenia। শমিতা শঙ্কিত হল? কিসে থেকে কি আবার বাধিয়ে বসেছে সমীর।

কিছুদিন চিকিৎসার পর সমীর ভাল হয়ে উঠল। শমিতা নিশ্চিন্ত হলেও যোগমায়া শমিতাকে ছেড়ে কথা কইলেন না। সমীরের অসুখের জন্য তিনি শমিতাকেই দায়ী করে বসলেন। শমিতা ত শুনে আগুন। সে বলল—মায়ের সৃষ্টিছাড়া আচরণই সমীরের অসুখের কারণ।

অশান্তি বাড়ল। ফাঁড়া কিন্তু কেটেও কাটল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই সমীরের রোগ আবার দেখা দিল। ইনসুলিন চিকিৎসায় এবার কিন্তু সমীরের কোন উন্নতি দেখা গেল না। ইলেক্ট্রিক শক্ দিয়ে সমীরকে চাঙ্গা করে তোলা হল। কিছুদিন বিশ্রামের পর তাকে চাকরিতে যোগ দিতে বলা হলে সে রাজী হল না। আর চাকরি নয়। সে ব্যবসা করবে, বইয়ের ব্যবসা! তার ইচ্ছা এবং উৎসাহে বাধা দেওয়া উচিত হবে না বলে শমিতা ও যোগমায়া দুজনেই তার কথায় সায় দিলেন।

সমীরের অসুখের পর থেকেই শমিতার সঙ্গে যোগমায়ার মন-কষাকষি বেড়ে গিয়েছিল। তিনি কাজে অকাজে শমিতার দোষ খুঁজে বেড়াতেন। যোগমায়ার ধারণা স্বামীর স্বাস্থ্যের একমাত্র জিম্মাদার স্ত্রী। স্ত্রীর পয়মন্ত ভাগ্য যখন কলকাঠি নাড়ে তখনই স্বামীর আয় আর আয়ু আনন্দে নাচতে থাকে। মোট কথা তিনি বোঝাতে চাইলেন, অপয়া শমিতাই সমীরের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ। শাশুড়ীর এই অভিযোগে শমিতা মনে কষ্ট পেত। অপমানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে কখনও সে পাল্টা আক্রমণ করতেও ছাড়ত না। যোগমায়া কি তাহলে তাঁর অপয়া ভাগ্যের জন্যই স্বামী হারিয়েছেন? একটি কঠোর আঘাতেই যোগমায়া ধরাশায়ী হতেন। যোগমায়ার যুক্তি তখন একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ত। ভাষা খোঁজে না পেয়ে গালি পাড়তেন—ডাইনী। কথার পিঠে শমিতা তাঁকে বলত—আপনি ত স্বার্থপর আর হিংসুটি। শমিতার সামনে বার বছরের ননদ রেখা এসে দাঁড়ালে শমিতা চুপ করে যেত। সে তখন ভাবত,

রেখার কাছে সে যেন ঝগড়া করে ইজ্জতে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এদিকে স্বামী ঝি কখনও শমিতার কাছে যোগমায়ার নামে নালিশ করতে এলে শমিতা রেগে যেত, লাগানো ভাঙ্গানোর জন্য। স্বামীকে সে বরং তখন শক্ত কথা বলে তার উৎসাহ দমিয়ে দিত। নিজেদের ঝগড়ার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ শমিতার মোটেই পছন্দ হত না।

কিন্তু যোগমায়া দমবার পাত্রী নন। একটা কিছু নিয়ে শমিতার সঙ্গে বিরোধ লাগিয়েই রাখতেন। সমীরের একবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হল। যোগমায়া ফতোয়া দিলেন—সমীর তাঁর ঘরে শোবে। তিনি নিজে সমীরের দেখাশোনা করবেন। এতে শমিতার রাগ হল। শাশুড়ীর এ বাড়াবাড়ি কেন? কেন, শমিতা কি অপটু, না দায়িত্বহীনা সে? শমিতার কাছে এটা আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন। শমিতা আপত্তি জানালে তিনি যুক্তি দেখালেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ছোঁয়াচে রোগ। শমিতার তফাতে থাকাই ভাল। শমিতা এই যুক্তিতে সান্ত্বনা পেল না।

রুগ্ন ছেলেকে ডাইনীর কাছ থেকে সরিয়ে রাখা যোগমায়ার মনের কথা। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাখার ইঙ্গিতটা শমিতা এইভাবেই ব্যাখ্যা করল।

রাত্রিবেলা ঝগড়া করতে তার ইচ্ছা হল না। রেখাকে নিয়ে সে শুতে গেল। কিন্তু শমিতার মন বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল। ঘুম আসছিল না তার। তার শিরা উপশিরায় লাভা স্রোতের দাহ। ভেতরে বিস্ফোরক ও বিস্ফোরণের কাজে চলছে—

বর্ষাকাল, হঠাৎ বাইরে ঝড় এল। হাওয়াতে জানলায় খট খট শব্দ হচ্ছে। অস্বস্তিতে শমিতা বিছানায় উঠে বসল। তার একটু ভয়ভয়ও করছিল। রেখাকে জাগাবে কি না বুঝে উঠতে পারছিল না। ছেলেমানুষ, ওকে জাগিয়েই বা কি হবে? এই ভেবে সে নিরস্ত হল। শমিতা দরজা খুলে শাশুড়ীর ঘরের কড়া নাড়তে লাগল। ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে কড়ানাড়ার উৎকট শব্দে শমিতার নিজেরই গায় কাঁটা দিয়ে উঠল। ভেতর থেকে শব্দ এল—কে?

—আমি শমিতা, দরজা খুলুন, মা।

যোগমায়া দরজা খুলে বললেন—কি হয়েছে?

শমিতা গলায় ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল—চোর।

—চোর? কোথায়?

—আমার জানলায় ধাক্কা দিয়েছিল।

যোগমায়া শমিতার ঘরে জানলা পরীক্ষা করে বললেন,—মিছামিছি ভয় পেয়েছ, জানলায় হাওয়া ধাক্কা দিয়েছে, তুমি ভেবেছ চোর।

শমিতা এবার মিথ্যে কথা বলল।

—না, হাওয়া নয়। জানলা খুলতেই দেখলাম একটা লোক সরে গেল। আমি একা ঘরে শুতে পারব না। ভয় করছে।

—একা কেন, রেখা ত রয়েছে।

—ওতো ছেলেমানুষ।

চোরের কথা যে শমিতা মিথ্যা বলছে, যোগমায়ার বুঝতে বাকী ছিল না। ছল করে সমীরকে তার কাছে শমিতা সরিয়ে নিতে চায় তিনি বুঝতে পারলেন।

হট্টগোলে রেখার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সে বলল—আমার ভয় করছে মা, আমি তোমার কাছে শোব।

যোগমায়া মুশকিলে পড়লেন। রাত দুপুরে আবার ঝগড়া বাধাতে তাঁর ইচ্ছে হল না। তিনি ঘরে গিয়ে সমীরকে শমিতার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

শাশুড়ীর পরাজয়ে শমিতা খুশী হল; কিন্তু এতে তার মন ভরল না। অভিমান তার মনে বিঁধতে লাগল। ফাঁকির কালো ফাঁকটার দিকে তার চোখ পড়তেই তার কান্না পেতে লাগল। ছলনা করে সে জিতেছে, সে ছোট হয়ে গেছে, উপযাচিকা হয়ে সে নিজেকে অপমান করেছে। কি দরকার ছিল এই? হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এ কাজটা না করলে অন্ততঃ তার মানটা বাঁচত। শমিতা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল।

শমিতাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সমীর ভাবল শমিতা খুব ভয় পেয়েছে বুঝি। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সমীর বলল, একটু জল খাবে শমি? সমীর কুঁজো থেকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে ওকে খেতে দিল।

অন্তর্দাহে আর অনুশোচনায় শমিতার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। জল খেয়ে সে আরাম পেল। সমীরের সহানুভূতির স্পর্শ শমিতার ভাল লাগল। এখনও সমীরের মন তাহলে কঠিন শিলায় পরিণত হয়নি। অনুভূতির উত্তাপ এখনও তার মধ্যে একটুখানি রয়েছে। শমিতা বলল, তোমার অসুখ করেছে, শুয়ে পড়।

শমিতার মনের আগ্নেয়গিরিটা এখন যেন নিবু নিবু। যোগমায়ার ওপরও তার মনের আক্রোশ কমে এসেছে। বিচিত্র মনের গতি। শমিতা ভাবতে লাগল, পুরনো দিনের কথা। যখন শমিতা এ বাড়ীতে বধূ হয়ে এল তখন যোগমায়া তাকে কত যত্নই না করেছেন। নিজের পুরনো গয়না ভাঙ্গিয়ে হাল-ফ্যাশনের গয়না তৈরী করে দিয়েছেন তিনি শমিতার জন্যে। সুন্দরী বউকে সাজিয়ে গুজিয়ে খুশী হয়েছেন তিনি। কেউ বউয়ের রূপের প্রশংসা করলেও তিনি গর্ব্ব অনুভব করেছেন। কিন্তু পরে শমিতা বুঝতে পেরেছে। এও যোগমায়ার আত্মবিলাস। শুধু মুখোস পরা উদারতার ভানটা ওঁর নিজেরই অহংকারের তৃপ্তির অভিব্যক্তি মাত্র। যোগমায়া ভেজালের কারবারী। ঘুষ দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখার এটা একটা অপচেষ্টা। যাতে সমীরকে সে কবলিত না করে এ তারই চেষ্টা। দাক্ষিণ্যটাই তাঁর কাছে প্রবঞ্চনা করার হাতিয়ার। শমিতার মন আবার বিরূপ হয়ে ওঠে। এতই যদি ছেলে-পাগল, তবে ছেলেকে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?

সমীর উৎসাহ নিয়ে ব্যবসাতে নেমেছিল, কিন্তু বেশী দিন সে ব্যবসা চালাতে পারল না। ব্যবসা চালাতে যে কর্ম্মনিষ্ঠার দরকার, সমীরের তা ছিল না। তাই লাভের চাইতে লোকসানের অঙ্ক ভারী হতেই তাকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হল। সেই যে সে ঘরে এসে বসল, ছ'মাস কেটে গেল তবুও ঘর ছেড়ে নড়বার নাম নেই। মধ্যবিত্তের সংসার আয় ছাড়া চলা ভার। অগত্যা শমিতাকে চেষ্টা করে একটা কাজ যোগাড় করে নিতে হল। সমীরের পরিবর্ত্তে শমিতাকে কাজে বেরুতে হচ্ছে এতে যোগমায়া খুশীই হলেন। ভালই হল, সমীরকে কষ্ট করে কাজে বেরুতে হবে না। মায়ের আদুরে দুলাল, মায়ের কাছেই থাকবে। তাই তাঁর মনে তৃপ্তি।

শমিতার কাজ হয়েছিল একটি প্রচার-সংস্থায়। তারই একজন শিল্পী সুহাস সেনের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। আফিসের কাজে সুহাসের সে সাহায্য পেত। সুহাসের ব্যবহারও চমৎকার। ওর ষ্টুডিওতে ওর আঁকা ছবি দেখতে শমিতা অনেকবার গিয়েছে। সুহাসের ছবির প্রদর্শনীতেও শমিতাকে একবার উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রদর্শনীটি বেশ সুনাম অর্জ্জন করতে পেরেছিল। ছবি সাজানো থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন, দর্শকদের নিয়ে ঘুরে ফিরে ছবি দেখানো। এ সবই তাকে করতে হয়েছিল। সুহাস ত খুবই খুশী। সে স্বীকার করেছিল শমিতার সহযোগিতা না পেলে প্রদর্শনীটি এমন সফল হত না, ছবি বিক্রীও এত হত না।

এই উপলক্ষে কয়েকদিন শমিতার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছিল। তাই নিয়ে যোগমায়া তাকে আবার নানা কথা শোনাতে আরম্ভ করেছিলেন। মজা বেশ, ছেলেকে কাজে বেরুতে দেবেন না অথচ শমিতাকে যদি কাজের জন্য একটু রাত করেই বাড়ী ফিরতে হয় তাহলে নিন্দা আর অনুযোগ। সুহাসের দিকটাও শমিতার না দেখলে চলবে কেন ? প্রথম চাকুরিতে গিয়ে শমিতা কত সাহায্য পেয়েছে সুহাসের কাছ থেকে। উপকারের প্রতিদানে একটা কিছু করার সুযোগ যে সে পেয়েছে সেটাই বা কম কি ? নিজের ভাল লাগার তুলনায় পরিশ্রমই বা তাকে কতটুকু করতে হয়েছে ? সামান্যই বলা চলে। যোগমায়া বিরক্ত হলে সে কি করতে পারে ?

সমীর একদিন বলেছিল—অত তোমার কি কাজ যে রাত করে বাড়ী ফিরতে হয় ?

শমিতা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছিল, উত্তাপহীন রাতের চাঁদের আলোর

উৎস কোথায়। যোগমায়া সমীরকে তার পেছনে লাগিয়েছেন। মা যা বলেন সমীর তাই শোনে। বিচারের বুদ্ধিটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

শমিতা রাগ করে বলল—বেশ, তুমি একটি চাকরি যোগাড় করে নাও, আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

তারপর সমীর তৎপর হয়েই একটি চাকরি জোগাড় করে ফেলল। কাজেও বেরুতে লাগল নিয়ম করে।

সমীর কাজ করুক যোগমায়া এটা চাননি। হিতে বিপরীত হল দেখে তিনি শমিতার ওপর আরও চটে গেলেন। কিন্তু সমীরকে এবারও বেশীদিন চাকরি করতে হল না। ঘেরাওর হিড়িক পড়েছে। সমীরের ছাপাখানায় তার ঢেউ লাগল। সুপারভাইজার সমীরকে প্রেসের কর্মীরা একদিন ঘেরাও করে রাখল। শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে তাকে মুক্ত করল বটে, কিন্তু সমীরের মনের রোগ আবার দেখা দিল তারপর থেকেই।

যোগমায়া শমিতাকে নিয়ে আবার পড়লেন। শমিতার জন্য সমীর চাকরিতে বেরুতে গিয়েই এই বিপত্তি আবার দেখা দিয়েছে এই তাঁর মত। যুক্তি অকাট্য। এতে শমিতার ঘরের শান্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। বাইরেই সে এখন শান্তি খোঁজে। যতক্ষণ অফিসের কাজে থাকে সে ভালই থাকে। সুহাসের ষ্টুডিওতেও আনন্দের তার অভাব হয় না। দেয়ালের টাঙ্গানো রঙ্গীন ছবির উজ্জ্বলতায় তার মন ডুবে যায়। পার্থিব জগতের গ্লানির উর্ধ্বে তার মন আনাগোনা করে। সুহাস প্রিয়ভাষী। নানা কথা বলে ওর মন ভোলায়। সুহাসের প্রিয়বাদিতায় সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ওর আঁকা একটি নগ্নিকাকে দেখে শমিতা যেদিন চমকে উঠেছিল, সুহাস বলেছিল—এমন আঁতকে ওঠার কিছু নেই। রূপ যেখানে সত্য তাকে আবৃত করে রাখা কৃত্রিমতারই নামান্তর। এই তত্ত্বকথার অর্থ ভাল করে বুঝতে পারেনি সেদিন শমিতা। সুহাসের হাজারো কথার ভিড়ের নীচে সে তলিয়ে গিয়েছিল, কোনও খেই খুঁজে পায়নি চেষ্টা করেও।

কিন্তু বাড়ীতে এলেই শমিতার শান্তি মেলে না। সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিতেও সে পারে না। সমীরের প্রতি অনুরাগের বা বিরাগের খতিয়ান মিলিয়েও কিছু যাচাই করতে যায়নি সে। শাশুড়ীর প্রতিও বিরূপতা যাতে কমে যায় তারই চেষ্টা সে করেছে। কিন্তু ফল কি কিছু হয়েছে? শুধু অপবাদের বোঝা বয়ে চলাই তার সার হয়েছে চিরদিন।

যোগমায়া যেবার এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেন, রক্তের দরকার হলে তাকে শাশুড়ীর জন্য রক্ত দিতে হয়েছিল। শমিতার রক্ত পেয়েই সেবার তিনি বেঁচে উঠেছিলেন। শমিতা ভেবেছিল, বেশ খুশী মনেই ভেবেছিল—শোধবোধ, ওঁর দাক্ষিণ্যকে রক্তের দামে শোধ করে দিয়েছে সে। কলসীর কানার বদলে কোল দিয়েছে। সেদিন শমিতা গর্ব্বে ফুলে উঠেছিল। কিন্তু বিনিময়ে শাশুড়ীর সে মন পায়নি সেটাই দুর্ভাগ্যের কথা।

ডাক্তার সমীরকে রাঁচীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এতে যোগমায়া ত রাজী হনই নাই, শমিতার মনও সে ব্যবস্থায় সায় দিতে পারেনি। "মনের ওপর রঙের প্রভাব" এই নামের একখানা বই শমিতা পড়েছিল কয়েকদিন আগে। জার্মানীতে অনেক মানসিক ক্লিনিকে নাকি রঙ্গিন আলো ও দেয়ালে বিশেষ রঙের পর্দা টাঙ্গিয়ে রোগের চিকিৎসা করা হয়। বইখানি পড়ে শমিতাকে যেন পাগলামিতে পেয়েছিল। লাল রঙ ঝিমিয়ে পড়া মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে বলে, শমিতা ঘরে লাল পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিল, যদি এতে সমীরের উপকার হয়, মনের অসুখ সারে। ওর নিস্তেজ মন আবার স্বাভাবিক হয়, সবল হয়।

ষ্টুডিওতে কাজ করতে করতে সেদিন শমিতা দেখল, সুহাস মৃতসঞ্জীবনীর বোতলের একটা ছবি আঁকছে। বোতলের ভেতরে তরল লাল পানীয়। শমিতাকে আবার লালের নেশায় পেল। সমীরের মনে কি তরল পানীয় সজীবতা ফিরিয়ে আনতে পারে না? সমীর দিন দিন যে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। ওকে সতেজ করতে পারে কি এই রঙ্গীন সুধা?

শমিতাকে আনমনা হয়ে বোতলটার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সুহাসের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল সেদিন।

—তেষ্টা পেয়েছে ত? এক চুমুক খেয়ে দেখ না। আমার নিজেরই লোভ হচ্ছে।

শমিতা চমকে উঠল, লজ্জা পেয়ে বলল, কি যে বল।

—এতে লজ্জার কি আছে? লজ্জা মেয়েদের ভূষণ হলেও অফিসে ওটা বাড়তি পোশাক। বাড়ীতে ওটা আলনায় টাঙ্গিয়ে রেখে এস।

সুহাসের বেয়াড়া রসিকতায় সে আরও লজ্জা পায়। সুহাস মদ খায়। প্রাণের প্রাচুর্য কি সে ওতেই পায়? সুহাসের রসিকতায় লজ্জা পেলেও শমিতা বিরক্ত হতে পারে না। সে একটু উদার হওয়ার চেষ্টা করে। শমিতার খবরের কাগজে পড়া একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল এবার। আমেরিকার একটি অফিসে একজন পুরুষ ছাড়া সকলেই মেয়ে কর্মী। এই একটিমাত্র অভাগার ওপর নানা ভাবে নির্যাতন চালাত ওরা। শেষ পর্যন্ত তাকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পালাতে হয়েছিল ওদের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে। সে তুলনায় শমিতা ত এখানে যথেষ্ট সমাদরে আছে। সামান্য ব্যাপারে এমন স্পর্শকাতর হলে চলবে কেন? ছেলেরা কি মেয়েদের চাইতে বেশী ভদ্র? ওরা তো তাকে একা পেয়েও খুব কমই বিরক্ত করে।

শমিতা গোপন কোপ প্রকাশ করে বলল,—রাখ ত তোমার ফাজলামো। মুখে আর কথা আটকায় না। ওর রাগ দেখে সুহাস হো হো করে হেসে উঠেছিল।

সেদিন শমিতা বাড়ী ফিরেছিল হাতে লাল গোলাপের তোড়া নিয়ে। সমীরের পরিচর্যার দিকে তার মন গিয়েছে আজকাল। ওর শিয়রের কাছে ফুলদানীতে সে তোড়াটা সাজিয়ে রাখল। তারপর ওতে নাক ডুবিয়ে জোরে নিশ্বাস টেনে টেনে ফুলের গন্ধ নিতে লাগল। খেয়াল বশে তোড়া সমীরের নাকে ছোঁয়াতেই সমীর ওর হাত দিয়ে সরিয়ে দিল তোড়াটা। কি যে বাবা! ওঁর যে ফুলের গন্ধও সয় না। তাহলে এঁর জন্য শমিতা করবেটাই কি? ভূত ছাড়াতে লঙ্কা পোড়া নাকে ছোঁয়াতে হবে নাকি? কিন্তু মনটা আবার একটু শান্ত হলে ভাবে, রোগী মানুষ, ওর কি আর কিছু বোঝার শক্তি আছে?

অফিসে শমিতা বেশ থাকে। বাড়ীর একঘেয়েমি অফিসে নেই। পেছনে-লাগা আছে বটে, তাহলেও কাজের ব্যস্ততা, সহানুভূতি, আনন্দ, দায়িত্বও রয়েছে। জীবনকে ধরে রাখার, সার্থকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি পরিপূর্ণ পরিবেশ ওখানে, তাও ত হেলা-ফেলার নয়। জিবে লালা ঝরানোর স্বাদ—টক, নুন, ঝাল সব স্বাদই এখানে আছে, কিছুরই অভাব নেই। ভাল লাগবে না কেন?

বাড়ীর একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সুহাসের সঙ্গে শমিতা কখনও কখনও বেড়াতে যায়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা নিয়ে সুহাসের সঙ্গে আলোচনা করে। এতে অনেক কিছুরই সমাধান হয় না বটে। তবে শমিতার মনের বোঝা অনেকটা হাল্কা হয় বলে সে মনে করে। তা না হলে রুদ্ধ পরিবেশে সে শ্বাস রোধ হয়ে হয়ত মারা যেত। বন্ধুত্বের সদর রাস্তা তাকে অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। একদিন ছবির শুটিং দেখতে সিনেমা ষ্টুডিওতে গিয়ে সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার বিমুগ্ধ ভাব দেখে সুহাস বলেছিল —নামবে নাকি ছবিতে?

—নামতে চাইলেই নামা যায় নাকি, কত সুন্দরী ডাইরেক্টরদের পেছনে ঘুরে ঘুরে জেরবার হয়ে গেলেন।

—তুমিও ত সুন্দরী কম নও। চেষ্টা করতে দোষ কি?

—সুন্দরী হওয়াটাই একমাত্র যোগ্যতা নয়, তুমি তা জান।

শমিতার ইচ্ছে আছে ভেবে সুহাস বলল,—আমি তাহলে চেষ্টা করব। যোগ্যতার কথা পরে ভাবা যাবে।

শমিতা কিন্তু একটা 'না' বলে প্রসঙ্গের ওপর ইতি টেনে দিল। শমিতার দৃঢ় কণ্ঠের না শুনে সুহাস হকচকিয়ে গেল। সুহাসের অনেক সময়েই শমিতাকে হেঁয়ালি মনে হয়। শমিতা বিবাহিতা, একথা সুহাস প্রায়ই ভুলে যায়। তাই এই অনীহার কারণ সে খুঁজে পায় না। সেভাবে পরিপূর্ণ জীবনকে দেখবার সাহস শমিতার নেই। পঙ্গু জীবনের প্রতি সুহাসেরও প্রীতি নেই। আলো আঁধারের খেলায় সুহাস হাঁফিয়ে ওঠে। আলোর ঝলকানির প্রতি ওর আগ্রহ। সেটাই তার কাছে বেশী সত্য, বেশী প্রিয়।

একদিন অফিস-ফেরত বাড়ী গিয়ে শমিতা শুনল যোগমায়ার গুরুদেব এসেছেন। তিনি নাকি সমীরের চিকিৎসা করবেন এবং সুস্থ হলে দীক্ষা দেবেন। চিকিৎসা হোক শমিতার আপত্তি নেই, কিন্তু দীক্ষার কথায় শমিতার মন সায় দিল না। কিন্তু তার অমত হলে কি হবে, শাশুড়ীর ইচ্ছা। শমিতার কথা তিনি শুনতে যাবেন কেন? কবেই বা তার কথা শুনেছেন। এমন কোন কারণও ঘটেনি যে শমিতার আপত্তিতে কান দেবেন।

এই কথাটা সে একদিন সুহাসের কাছে তুলেছিল এক রেঁস্তোরাঁতে বসে। সুহাস ত কথাটা শুনে হেসেই অস্থির। সে বলল—দূর, দীক্ষা ফিক্ষা, একেবারে ফাঁকিবাজী, ভড়ং। ভগবান্ বিলকুল একটি ব্লাফ, গ্যাস।

সুহাসের উপহাস শুনে শমিতা থ হয়ে গেল। সুহাস বলে কি? ভগবান্ একটি ব্লাফ? এ যে ব্ল্যাসফেমি, এ যে ঘোর নাস্তিকের কথা। দীক্ষাকে ভড়ং বলতে শমিতার আপত্তি নেই। কিন্তু ভগবান্‌কে নিয়ে বিদ্রূপ। সুহাস একটি বিচ্ছু, কেউটে। এত বড় নাস্তিককে নিয়ে তার চলা ভার।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমীরের লকলকে জিহ্বা তখনও থামেনি।

—ভগবান চন্দ্রলোক ছেড়ে পালিয়েছেন। বিজ্ঞানীর কাছে তাঁকে আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দিতে হবে।

সুহাস বেশী বাড়াবাড়ি করছে শমিতার মনে হল। সে উত্তর না দিয়ে পারল না।

—তারী ত তোমার বিজ্ঞান। লোকের অসুখই সারাতে পারে না, তা নিয়ে আবার বড়াই।

সুহাস দমবার পাত্র নয়, বলল,—নাই বা পারল অসুখ সারাতে। পারবে ঠিকই অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সময় দিতে হবে না? ভক্তের ভগবান্ মুনি-ঋষিদের মরণের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন কোনদিন?

এমন বেয়াড়া তর্কের শেষ নেই। পরাজিত না হয়েই শমিতা বলল,—কয়েকটা নুড়ি পাথর কুড়িয়েই তোমরা ফড়ফড় করছ।

শমিতা গম্ভীর মুখেই ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিল। সুহাসের হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে চায়ের কাপের ধোঁয়ার সঙ্গে মিলে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। সুহাস অনেকক্ষণ এই ধোঁয়ার খেলা লক্ষ্য করছিল। শমিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুহাসের বুঝতে বাকী রইল না, শমিতা ভীষণ রাগ করেছে। একটু হেসে বলল, তোমার নিউটনের কোটেশন আমাকে মোক্ষম ঘা দিয়েছে।

শমিতা বুঝতে পারল না এটা বিদ্রূপ, না, আরও তর্কের পূর্ব্বাভাস অথবা সন্ধির প্রস্তাবনা। সে চুপ করেই রইল। শমিতার দিক্ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সেও বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল—যুদ্ধ লেগে গেছে। দারুণ যুদ্ধ।

শমিতা শঙ্কিত হয়ে ওর কথার তাৎপর্য বুঝবার জন্য সুহাসের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। এবার সুহাস ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে দেখিয়ে বলল—নিকোটিন ট্যানিনের যুদ্ধ। দুটোই বিষ। কোন্‌টা জিতবে মনে কর? শমিতা তখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। সুহাস বলে চলল—কোনটাই নয়, বিষে বিষক্ষয়।

শমিতা এবার ওর দুষ্টুমি বুঝতে পেরে বলল—দূর ছাই, কি যে আবোল তাবোল বল কিছু কি বোঝা যায়? আমি তোমার কাছে কি পরামর্শ চেয়েছিলাম আর তুমি কি সব বাজে কথা বকে গেলে।

সুহাস সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ভয় নেই, গুরুদেব সমীরের দুর্ভেদ্য দুর্গে ঢুকতে পারবেন না। কাজেই দীক্ষা-টিকা বাতিল হয়ে যাবে।

শমিতা অবাক্ হয়েছিল এই কথা ভেবে যে সত্যি গুরুদেবের জারিজুরি শেষ পর্যন্ত সমীরের ওপর খাটেনি। তাঁর চিকিৎসা আর মাদুলিতে কোন ফল হয়নি সমীরের। কাজেই দীক্ষার আর প্রশ্নই আসেনি। যে বিধাতাকে সুহাস বিশ্বাস করে না তার কথা ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতা অর্জ্জন করল কি করে? শমিতার কাছে এটা দুর্বোধ্য মনে হয়। দীক্ষার হাত থেকে না হয় বাঁচা গেল কিন্তু সমীর ত ভাল হল না। এতে শমিতার সান্ত্বনা কোথায়?

সমীর ভাল হল না। যোগমায়াও কিছুদিন পরে রোগে পড়লেন। শুচিবাইগ্রস্ত বৃদ্ধা অনিয়ম অত্যাচারে মারা গেলেন। সমীর শ্মশানে গেল না, সে তার আত্মবিস্মৃতির খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকল। যোগমায়ার মৃত্যুতে শমিতা বেশ মুষড়ে পড়েছিল। হাজার হোক যোগমায়াই সমীরের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখন সকল দায়িত্ব বর্তাল শমিতার নিজের ওপর। দূর সম্পর্কের একজন মাসীকে শমিতা আনিয়ে নিল, বাড়ী ও সমীরের তদারকের জন্য। বাড়ীতে রেখাও একা একা রয়েছে।

দিন গড়িয়ে চলল। অফিসের কাজেও যেন শমিতা আজকাল তেমন আনন্দ পায় না। সমীরের অবুঝপনায় তার মন এক-একবার বিদ্রোহ করে। দূর ছাই, এঁকে রাঁচি পাঠিয়ে দিলে ত চিকিৎসা হয়, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অন্ততঃ। কিন্তু কাজে তা সম্ভব হয় না। সমীর বাড়ীতেই থেকে যায়।

অফিসের টিফিনের ছুটিতে সুহাস একদিন শমিতাকে বলল—সিনেমায় যাবে নাকি? দুখানা কমপ্লিমেন্টারী টিকিট পেয়েছি। সেই যে একটা ছবির শুটিং দেখেছিলে, মনে আছে? সেখানা রিলিজ হয়েছে।

ওর কথায় শমিতার শুটিং দেখার কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন শুটিং দেখে তার ভাল লেগেছিল, তাই সে রাজী হয়ে গেল। ছবি সে অনেকদিন দেখেনি। তাছাড়া আংশিক দেখা ছবির গোটাটা দেখার আগ্রহ স্বাভাবিক।

সিনেমা-হলে হাজির হওয়ার একটু পরেই ছবি আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ ছবি দেখার পরই শমিতার আগ্রহে একটু ছেদ পড়ল। সুহাস পাশের সিটে বসে যেন বড্ড উসখুস করছে। শমিতা সেজন্য ছবিতে ভাল করে মন দিতে পারছিল না তার ছবি দেখা অসমাপ্তই বুঝি থেকে যায়। শমিতার সেজন্য দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। সবকিছুরই কি শেষ আছে নাকি? সব গল্পেরই আগেও অনেক থাকে, শেষেও অনেক থেকে যায়। যা হোক, শমিতা আবার গল্পে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটু পরেই তার পিঠে একটা কোমল ব্যগ্র স্পর্শে সে চমকে ওঠে। সে একটু বোঝবার চেষ্টা করে সুহাসের হাতটা তার পিঠে কি কথা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার মনটা কেন যেন শক্ত হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে সুহাসের হাতটা তার পিঠের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সিটের বাঁ পাশে একটু সরে বসে বলে—আমি বাড়ী যাব।

সুহাস বিরক্ত হয় কিন্তু কোনও কথা বলে না। এই ঘটনায় শমিতার ছবি দেখার আনন্দ যেন কমে যায় অনেকটা।

বাড়ী ফিরে তার মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়। সমীর না খেয়ে নাকি শুয়ে আছে। তার মনের দ্বন্দ্ব তাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে ফেলতে চায়। তবুও সে নিজেকে সামলে নিয়ে সমীরকে ডেকে খেতে বসায়। শমিতা ডাকতে গেলে সমীর কোন আপত্তি না করেই উঠে আসে। শমিতাকে সমীর আজকাল ভয় করে। অথচ, শাশুড়ীর জীবিতকালে, সমীর তাকে গ্রাহ্যই করত না। মাকেই ছিল তার যত ভয়। তবে; এই পরিবর্তন কেন? মা নেই, আদরযত্নের অভাব, এসব কি সমীর এখন বুঝতে পারে? তার কি সে বোধ এখনও আছে? ওকে দেখলে ত মনে হয় একটি জরদগব, একটি জড় পদার্থ। নড়চড়া করে বটে, কিন্তু অনুভূতি নেই।

না, ভুল বলা হল, শুধু ভয়, ভয়ের প্রকাশ আছে তার মধ্যে।

সিনেমার ঘটনার থেকেই শমিতার মনটা বড্ড এলোমেলো হয়ে গেছে। এই দুমড়ে পড়া মনের অবস্থা নিয়ে শমিতার অফিস যেতে ইচ্ছে হল না। কয়েকদিন ছুটি নিল সে। ইচ্ছে, নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়া। কিন্তু ঘরেও মন টিকতে চায় না। ঘরের হাওয়া ভারী—রুগ্নতায় নীলচে। কখনও হলদেটে, ভয়ে ফ্যাকাশে।

ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো সুহাসের আঁকা একটি ছবি বিচিত্র রং-এর আভায় এই বিবর্ণতার মধ্যে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করছে। এই ছবিটি সুহাসই ওকে উপহার দিয়েছিল ওর ছবির প্রদর্শনীটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর। ছবিটির নাম 'টাইপিস্ট'। কিন্তু শমিতার সন্দেহ, ছবিতে আঁকা টাইপিস্টের মুখের সঙ্গে তার নিজের মুখের বেশ কিছুটা আদল আছে যেন। শমিতা বিষণ্ণ মনে ঘরে বসেছিল আর নিজের মনে সন্দেহটা ঠিক কি না তা যাচাই করতে গিয়ে আয়নাতে নিজেকে বারবার দেখছিল। কিন্তু সন্দেহ তার সঙ্গে শুধু লুকোচুরি খেলে তাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। এই বিভ্রান্ত লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সে এবার সমীরের দিকে নজর দিতে বাধ্য হল। এবার যদি সে শান্তি পায়। না হলে দুটানায় পড়ে সে যে মরতে বসেছে।

অদ্ভুত একটা খেলায় মাতল সে এবার। এটাকে খেলা অথবা পরীক্ষাও বলতে পারা যায়।

সমীরের হাতে একটুকরো রুটি দিয়ে সে বলল—পাপিকে তুমি রুটিটা খাইয়ে দাও দেখি। দেখি পার নাকি। তোমার কাছে ত ও খেতে ভালবাসে।

সমীর যখন ভাল ছিল, সে একদিন একটি কুকুরের বাচ্চা বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এই বাচ্চাটি বড় হয়েছিল সমীরের কাছেই। সমীরের বেশ ভক্ত ছিল তখন এই কুকুরটি। পাপি সমীরের হাতে রুটি দেখে ওর কাছে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। কিন্তু সমীর কোনও সাড়াই দিল না। রুটি হাতে বসে রইল। শমিতা ধমকের সুরে তাড়া দিল—বসে আছ কেন? খেতে দাও ওকে। দেখছ না খেতে চাইছে?

তাড়া খেয়ে সমীর ভয়ে ভয়ে বলল,—আমি পারব না আমার ভয় করে।

না, শমিতা নিরাশ হল। অন্য কোনও অনুভূতি জাগাতে পারল না সমীরের মনে। ও ভয়েই মরে যাচ্ছে। তবুও শমিতার হার মানলে চলবে না। নতুন আশায় বুক বাঁধল আবার সে। এবার সাজতে বসল সে। খুব ঘটা করে সাজতে লাগল। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে তারিফ করে বলল- দেমাক বজায় থাকবে ত তোমার, চাতুরালি? দেখো, ব্যর্থতার চাপে ভেঙ্গে পড়ো না যেন শেষে। কেন এই সাজের ঘটা? ওর মনে কি আছে কেজানে? নাকি পাগল হল সে? পাগলের সঙ্গে পাগলই হয় বোধহয় লোকে।

এবার সমীরের সামনে এগিয়ে গিয়ে সে বলল—কেমন লাগছে আমাকে বল ত?

সমীর শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। মুখে কোনও কথা নেই।

—কি, কিছু বলছ না যে? বল না, ভাল না খারাপ দেখতে?

সমীর এবার ভয়ে ভয়ে বলল—ভাল।

শমিতার মনে কিন্তু আবার সন্দেহের দোলা। তার মনটা খুসিতে ডগমগ হয়ে উঠছে না কেন? ভয়ে বলা ত, মিথ্যে বলা। সে কি প্রতারিত হয়েছে? পাগলের কাছে প্রতারিত হয়েছে সে? সে স্বীকার করল না প্রতারিত হয়েছে সে। সমীর ফসিলে পরিণত হয়নি এখনও। শমিতাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওর অহংকারের মর্যাদা রেখেছে। সে এমনি ভাবতে লাগল নিজেকে খুশী করার জন্য। প্রত্যাশা সফল হয়েছে ভেবে নিজেকে প্রতারণা করে খুশী হল সে। শমিতা যখন খেলা আর এলোমেলো চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, বাইরে থেকে তখন সুহাসের ডাক শোনা গেল। শমিতা ত্রস্ত পায়ে ঘরের দরজা খুলে দিল। সে যেন সুহাসকে মনে

মনে সেই মুহূর্তেই কামনা করছিল। একটা সমাধান সুহাস নিশ্চয়ই করে দিতে পারবে। তাকে তার যেন বড়ই প্রয়োজন এখন।

সুহাস ঘরে ঢুকে শমিতাকে দেখে অবাক্ হয়ে গেছিল। সে বলল—কি? কোথাও বেরুবে নাকি? সাজগোজ করেছ যে।

শমিতা উত্তর না দিয়ে হাসল শুধু।

উত্তর না পেয়ে সুহাস বলল—অফিস যাওনি যে এ ক'দিন।

এবার শমিতা উত্তর দিল—শরীর ভাল নেই তেমন।

সুহাসকে দেখে সমীর ভয়ে ভয়ে শমিতাকে জিজ্ঞেস করল—পুলিশ?

—পুলিশ হতে যাবেন কেন? তুমি ত এঁকে চেন, কতবার দেখেছ। সমীরের পুলিশকে যে কেন এত ভয় শমিতা বুঝতে পারে না। শমিতার কথা সমীর বিশ্বাস করল কি না। সে আবার ভয়ে ভয়ে বলল বোঝা গেল—দরজা বন্ধ করে দাও। পুলিশ আসবে।

শমিতা এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। ধমকে উঠে সে বলল—কি যে পুলিশ পুলিশ করছ। যত সব বাজে ভয়।

শমিতার কেন যেন কান্না পেয়ে গেল, সে চোখে আঁচল দিয়ে সুহাসের পাশেই বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে সে সুহাসকে বলল—দেখ ত সুহাস, আমার চোখে যেন কি পড়েছে।

সুহাস ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—কোন্ চোখে বল ত?

শমিতার চোখ ছলছল করছিল। সে উত্তর দিল—ডান চোখে।

সুহাস ওর গোলাপের পাপড়ির মত চোখের পাতা টেনে টেনে দেখে বলল—কই, কিছু দেখতে পাচ্ছি না ত?

—তোমার দেখতে হবে না। বলে রাগ করে সে মুখ সরিয়ে নিল। সমীর তার বোবা চোখ মেলে ওদের দেখছিল।

—জান শমিতা, গলাটা পরিষ্কার করে সুহাস বলল, —আমার দিল্লীতে ট্রান্স্ফারের অর্ডার এসে গেছে। একটা লিফ্ট্ পেলাম। প্রথম যাব না ভাবছিলাম। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলাম সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। তাই রাজী হয়ে গেলাম।

শমিতা কথাটা যেন ভাল বুঝতে পারছে না এমনি কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সজাগ হয়ে উঠে বলল—কনগ্র্যাচুলেশনস্। খুব ভাল খবর। তোমার জন্যে চা তৈরী করে নিয়ে আসি। একটু বস।

একথা বলে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আধুনিক হিন্দী ভাষা

ডাঃ অমল সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধ হিন্দী সাহিত্যের এক বিশেষ যুগ ; এই সময় হিন্দী সাহিত্যাকাশে এক নব জ্যোতিষ্কের রূপে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের (১৮৪৯-৮৩ খৃঃ) আবির্ভাব হয় এবং হিন্দী সাহিত্যে এক নূতন যুগের হয় সূত্রপাত। ভারতেন্দুবাবুই সর্বপ্রথম হিন্দী সাহিত্যে গদ্যের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং গদ্য-সাহিত্য রচনায় সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলেন। এই গদ্য-সাহিত্য কোন্ ভাষায় রচনা করলে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে সেদিকেও ভারতেন্দুবাবুই প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গদ্যের এমন এক ভাষা হওয়া উচিত যা সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে এবং এদিক্ থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে কথ্য ভাষাই একমাত্র গদ্যের ভাষার স্থান অধিকারে সক্ষম। অবশ্য এইরকম একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা তখনকার ইংরেজ শাসক বর্গ আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং ভারতেন্দুবাবুর সময়ে তাঁরাও নিজেদের শাসনকার্য্য পরিচালনা এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচার নিমিত্ত এই ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে প্রাক্-ইংরেজ যুগে বিদেশী মুসলমানরাও চেয়েছিল এই দেশে স্বীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু ইংরেজ ও মুসলমান এই দুই বিদেশীর ধর্মপ্রচারের নীতি ছিল ভিন্ন। মুসলমান চেয়েছিল ক্ষমতার বলে, 'জেহাদ' ঘোষণা করে আপন ধর্ম কায়েম করতে আর চতুর ইংরেজ সাহিত্যকে করেছিল ধর্মপ্রচারের মাধ্যম। কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজ আরও বুঝতে পেরেছিল যে আপন নীতির, তা রাজনীতিই হক আর ধর্মনীতিই হক, প্রচার ও প্রসার যদি সাহিত্যের মারফৎ করতে হয় তাহলে সেই সাহিত্যের ভাষা গদ্য হওয়া উচিত এবং তাও এমন গদ্য হওয়া সমীচীন যা সাধারণ জনতা অতি সহজে গ্রহণ করতে পারে। ক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই ভাষা যদি জনতার কথ্য ভাষা হয় তবেই সকল উদ্দেশ্য অতি সহজে সাধিত হবে। এইভাবে গদ্যের ভাষা তৎকালীন কথ্যভাষার রূপ গ্রহণ করল। এই কথ্য ভাষাকেই, আজ আমরা 'খড়ী বোলী' 'স্ট্যাণ্ডিং ডায়লেক্ট্' আখ্যা দিয়ে থাকি। 'খড়ী বোলী'র উৎস সন্ধানে আগে 'খড়ী বোলী' এই শব্দটির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা অনুচিত হবে না।

ভাষাবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে হিন্দী, উর্দু ও হিন্দুস্তানীর মূল আধার হল 'খড়ী বোলী' এবং এই ভাষা দিল্লী মীরাটের বা পচ্ছিম এলাকার গ্রামীণ ভাষা। গ্রিয়ারসন 'খড়ী বোলী'কে 'ভার্ণাকুলার হিন্দুস্তানী' আখ্যা দিয়েছেন এবং সুনীতিকুমার এর নাম দিয়েছেন 'জনপদীয় হিন্দুস্তানী'। কোন কোন সমালোচক অবধী, ব্রজ আদি ভাষাকে (যেগুলি প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের ভাষা ছিল) আলাদা করে দেখবার জন্যে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে 'খড়ী বোলী' সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। এইদিক্ থেকে 'খড়ী বোলী'কে স্ট্যাণ্ডার্ড হিন্দী বললে অতিশয়োক্তি হবে না। 'খড়ী বোলী'র প্রারম্ভিক অর্থ সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। কেউ বলেন খড়ী বোলী'কে ব্রজভাষার সঙ্গে একাসনে সমাসীন করা যেতে পারে এবং লল্লুলালের (১৮০৩ খৃঃ) বহু পূর্বেই এই ভাষার এক নিজস্ব স্থান ছিল। ব্রজভাষার তথাকথিত মিষ্টত্বের সঙ্গে এই ভাষার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল এবং কালক্রমে এই ভাষা থেকেই স্ট্যাণ্ডার্ড হিন্দী ও উর্দু'র বিকাশ হয়।১ তাসী ও চন্দ্রবলী পাণ্ডে প্রমুখ বিদ্বানদের মতে 'খড়ী বোলী'র সঙ্গে উর্দু'র বহুল পরিমাণে সামঞ্জস্য আছে এবং 'খড়ী বোলী' উর্দু'র

পরিশুদ্ধ গ্রামীণ রূপ ছাড়া আর কিছু নয়।২ অন্য এক দল সমালোচক মনে করেন যে 'খড়ী বোলী'র অর্থ 'সুস্থির, সুপ্রচলিত ও সুমার্জিত ভাষা' অর্থাৎ এ ভাষা পরিষ্কৃত ও পরিপক্ক।৩ সুনীতিকুমারের মতে উত্তর ভারতের 'ও' কারান্ত ব্রজ প্রভৃতি ভাষাকে যদি আমরা 'পড়ী বোলী' আখ্যা দিই তাহলে এগুলির বিপরীত ভাষাকে 'খড়ী বোলী' বলা যাতে পারে।৪ এই মতকে অবলম্বন করে কেউ মনে করেন যে রেখতা (উর্দু) শৈলীকে 'পড়ী' এবং এই ভাষাকে 'খড়ী' বলা যুক্তি-সঙ্গত।

'খড়ী বোলী'র 'খড়ী' শব্দটি যে গুণবাচক বিশেষণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, উর্দু প্রভৃতি এই ভাষার অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে শব্দটি 'খড়ী' না 'খরী'। মধ্যযুগে আমরা এই রকম কোন শব্দের উল্লেখ পাই না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই শব্দের প্রথম প্রচলন হয়। লল্লুলাল এই শব্দটি দুই বার সদল মিশ্র তিন বার এবং জন গিলক্রায়েস্ট ছয় বার ব্যবহার করেছেন। লল্লুলাল ও সদল মিশ্র যথাক্রমে 'প্রেমসাগর' ও 'নাসিকেতো-পাখ্যান' নামক দুটি গ্রন্থ নাগরী লিপিতে লিখেছিলেন এবং এই দুটি গ্রন্থেই 'খড়ী বোলী' শব্দের উল্লেখ আছে। 'রামচরিত্র' নামক গ্রন্থেও 'খড়া বোলী' শব্দ দুটি পাওয়া যায়। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে হিন্দু লেখকগণ খড়ী শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'প্রেমসাগরে'র রোমানলিপিতে লেখা মুখবন্ধে 'খরী' (Kharee) শব্দটি মুদ্রিত আছে। রোমানলিপিতে হিন্দী ড্ অথবা ড় কে r অথবা r-এর নীচে ফুটকি দিয়ে দিয়ে লেখা হয়। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই হিন্দীর 'খড়ী'কে 'খরী' (Kharee) লেখা হয়েছে। এবং বিদেশী ইংরেজ বোধ হয় কেবলমাত্র 'খরী' (Kharee) শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিল। উচ্চারণের বন্ধনের জন্য ইংরেজরা 'খড়ী' কে 'খরী' বলবে কারণ তাদের পক্ষে হিন্দী ড়-এর উচ্চারণ জানা কষ্টসাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে ভারতীয় 'ধ্বনিবিকাসে' 'র' ও 'ড়'-এর মধ্যে পারস্পরিক সান্নিধ্য অনস্বীকার্য্য এবং উচ্চারণের দিক্ থেকে 'খড়ী' ও 'খরী' এই শব্দ দুটির খুব নিকট সম্বন্ধ।

সদল মিশ্র, লল্লুলাল এবং গিলক্রায়েস্টের 'খড়ী বোলী' শব্দের উক্তি থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে 'খড়ী বোলী' ব্রজভাষা অপেক্ষা কর্কশ বা কটু ছিল। তা ছাড়া যদি উনবিংশ শতাব্দীর আগে ব্রজভাষার বিরোধী ভাষা হিসাবে 'খড়ী বোলী'র ব্যবহার হত তাহলে স্ট্যাণ্ডার্ড উর্দু, হিন্দী ও হিন্দুস্তানী সকল ক্ষেত্রেই এই শব্দের প্রচলন পাওয়া যেত, কারণ ভাষা-বিজ্ঞান বিচারে এই তিনটি ভাষারই উৎস হল 'খড়ী বোলী'। লল্লুলাল 'লাল পত্রিকা'র ভূমিকায় বলেছেন যে তিনি স্বরচিত গ্রন্থে 'ব্রজ' 'খড়ী বোলী' ও 'রেখতা' এই তিন ভাষার ব্যবহার করেছেন। আগেই বলা হয়েছে সে মিশনারীগণ ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য 'খড়ী বোলী'র মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 'খড়ী বোলী'র তেমন প্রসার হয় নি এই বিদেশীগণের হাতে। ভারতেন্দুবাবু সর্বপ্রথম 'খড়া বোলী'তে লেখার প্রোৎসাহন দেন এবং যাঁরা ব্রজভাষায় লেখা পছন্দ করতেন তাঁদের বোধ হয় 'খড়ী বোলী'র প্রতি একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল এবং তাঁরাই হয়ত 'খড়ী বোলী'কে ব্রজভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কর্কশ ও কটু মনে করতেন। সে যাই হক, 'খড়ী' শব্দটি 'খড়া' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ এবং এর সাধারণ অর্থ পরিপক্ক, প্রচলিত বা স্থির। 'খড়ী বোলী' কোন এক বিশেষ প্রান্তে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর অন্ত-প্রান্তীয়তার কারণে সিন্ধু-গুজরাটের স্বামী প্রাণনাথের 'কুলজন স্বরূপে', পঞ্জাবের লালাদাসের 'বীতকে', পাতিয়ালার রামপ্রসাদ নিরঞ্জনে 'যোগবাশিষ্ঠে', রাজস্থানের দৌলতরামের 'পদ্মপুরাণে' এবং বিহারের সদল মিশ্রের 'নাসিকেতোপাখ্যানে' এই ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়।৫ দিল্লী, আগ্রার আশেপাশে উর্দু শৈলীতে লেখা হিন্দীর বেশী প্রচলন ছিল এবং উর্দু'র

মিল ছিল 'যামিনী' (ফারসী-আরবী) ভাষার সঙ্গে। গিলক্রায়েস্টের আগে হেলহেড এই ভাষাকে মিশ্রিত (mixed) হিন্দুস্তানী আখ্যা দিয়েছিলেন। 'খড়ী বোলী' সেই হিন্দী বা হিন্দুস্তানী যার শৈলী উর্দু অপেক্ষা শুদ্ধ (ভারতীয়) হিন্দীর সঙ্গে বেশী সম্বন্ধিত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দী, হিন্দুস্তানী, ও উর্দু শব্দের একই অর্থ ছিল এবং প্রায় এই সময়ে হিন্দীর শুদ্ধ রূপ প্রচলিত হল 'খড়ী বোলী'র মাধ্যমে। আর এইদিক্ থেকেই 'খড়ী বোলী'র অর্থ করা হল শুদ্ধ, পরিষ্কৃত, পরিমার্জিত প্রচলিত ভাষা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর 'খড়ী বোলী' ও হিন্দীর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকল না এবং 'প্রেমসাগরের' (১৮৪১ খৃঃ) সংস্করণের ভূমিকাপৃষ্ঠে 'হিন্দী' ও 'খড়ী বোলী'র মধ্যে নামগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিন্দী, হিন্দুস্তানী ও উর্দুর মূল আধার ব্রজভাষা নয়, 'খড়ী বোলী'ই অর্থাৎ দিল্লী মীরাটের জনভাষাই হল এদের উৎস। প্রাচীন কুরু জনপদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে কেউ কেউ 'খড়ী বোলী'-কে 'কৌরবী' আখ্যা দিতে ইচ্ছুক কিন্তু এই আখ্যার যথার্থতা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। 'খড়ী বোলী' নিম্নোক্ত স্থানগুলির গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হয় মীরাট, বিজনৌর, মুজফ্ফরনগর, সাহারণপুর দেরাদূনের সমতল ভূমি, আম্বালা, কলসিয়া, পাতিয়ালার পূর্ব্বাংশ, রামপুর, মোরাদাবাদ, বাংগরু, অথবা জাট অথবা হরিয়ানী ভাষা, পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী মিশ্রিত 'খড়ী বোলী' এলাকা। এই ভাষা দিল্লী, করনাল, রোহতক, হিসার, পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দের গ্রামেও প্রচলিত। 'খড়ী বোলী' এলাকার পূর্ব্বভাগে ব্রজভাষা, দক্ষিণ-পূর্ব্বে নেবাতী, বা দক্ষিণ পশ্চিমে পশ্চিমী রাজস্থানী, পশ্চিমে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবী এবং উত্তরে পাহাড়ী ভাষা ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে 'খড়ী বোলী'র প্রারম্ভিক প্রয়োগ 'গোরখবাণী' কবীন্দ্র শরবংশজের বাণীতে পাওয়া যায়। হটযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক গোরখপন্থ গ্রন্থে 'খড়ী বোলী'র প্রয়োগ উল্লেখনীয়, সেগুলির রচনাকাল ১৪০৭ সম্বতের কাছাকাছি। এই সময়ের গদ্যরচনার নমুনাস্বরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:—'শ্রীগুরু পরমানন্দ তিনকো দণ্ডবত হৈ। হৈঁ কৈসে পরমানন্দ, আনন্দস্বরূপ হৈঁ সরীর জিন্‌হিকো, জিন্‌হিকে নিত্য গাএ তেঁ সরীর চেতন্নি অরু আনন্দময় হেতু হৈ।' এর আগেও সাম্প্রতিক রূপে 'খড়ী বোলী'র যে অস্তিত্ব ছিল তা রাজা ভোজের সমকালীন রচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'ভা ভল্লা হুয়া জু মারিয়া বহিনি মহারা কন্তু।' (ভগিনী, ভালই হয়েছে যে তোমার পতি-মৃত্যু বরণ করেছেন)। অথবা 'সোউ জুধিষ্ঠির সঙ্কট পয়ো দেবক লেখিঅ কোন মিটাঅ' (অনন্তর যুধিষ্ঠির সঙ্কটে পড়লেন, দেবতার লিখন কে খণ্ডাইতে পারে)। এরপর ভক্তিকালে (১৩২৫-১৬৫০ খৃঃ) নির্গুণবাদী সন্ত কবিরা 'সধুক্কড়ী' ভাষায় 'খড়ী বোলী' শব্দের ব্যবহার করে চললেন। কবীর দাসের (সম্বত ১৪৫৬) 'দোহা' ও 'সাখীর' কয়েকটি উদাহরণ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:—

দিন ভর রোজা রহত হৈ, রাতি হনত হৈ গায়।
যহ তো খূন বহ বন্দগী, কৈসে খুসী খুদায়॥

[সারাদিন ধরে রোজা করে রাতে গরু চুরি করা, এরূপ কাজ তো হত্যা করার সমান এবং ভগবান তাহলে কেমন করে খুশী হবেন।]

লালী মেরে লাল কী, জিত দেখো তিত লাল।
লালী দেখন মৈঁ চলি, মৈঁ ভী হো গয়া লাল॥

(আমার প্রিয়তমের রক্তিম আভা, যেদিকে তাকান যায় সেইদিকেই সেই আভা দৃষ্টিগোচর হয়। সেই রক্তিম আভা দেখতে আমি যখন যাই আমি নিজেই সেই আভার মধ্যে বিলীন হয়ে যাই।)

আকবরের সময় গঙ্গ কবি 'চন্দ ছন্দ বরণন্ কী মহিমা' নামক এক গদ্য গ্রন্থ 'খড়ী বোলী'তে লিখেছিলেন। নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে যে গঙ্গ 'খড়ী বোলী'র ব্যাপক প্রয়োগ করেছিলেন—'সিদ্ধি শ্রী ১০৮ শ্রী শ্রী পাতসাহিজী শ্রীদলপতিজী আকবর সাহজী আম-

খাস মেঁ তখ্‌ত উপর বিরাজমান হো রহে। ঔর আম-খাস ডরনে লগা হৈ জিসমেঁ তমাম উমরাব আয় আয় কুর্নিশ বজায় জুহার করকে অপনা বৈঠক পর বৈঠ জায়া করে অপনা অপনা মিসল সে'। উদ্ধৃত অংশের ভাষা নিঃসন্দেহে হিন্দী 'খড়ী বোলী', উর্দু ভাষা নয়। এর আগে পর্য্যন্ত খড়ী বোলী, সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় 'খড়ী বোলী' বিভিন্ন প্রদেশে শিষ্ট সমাজের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং এই সময় থেকেই 'খড়ী বোলী'তে পুস্তক রচনা আরম্ভ হয়েছিল।

বিট্‌ঠল নাথের 'শৃঙ্গার রস মণ্ডন'-এ ভাষা যদিও পরিমার্জিত নয় তবুও কথ্যভাষার যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়—'প্রথম কী সখী কহতু হৈ। জো গোপীজন কে চরণ বিষে সেবক কী দাসী জো ইনকে মন্দ হাস্য নে জীতে হৈ।'

সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে রচিত 'চৌরাসী বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা' এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের পরে রচিত 'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা' কথ্য ব্রজভাষায় লিখিত কিন্তু এই দুই গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আরবী ও ফারসী শব্দ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থটির নিম্নলিখিত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে সাহিত্যক সৌষ্ঠবের দিকে লেখকের দৃষ্টি ছিল না,-'সো শ্রীনন্দগাম মেঁ রহতো হতো সো খণ্ডন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পঢ়্যো হতো। সে জিতনে পৃথ্বী পর মত হে সবকো খণ্ডন করতো, ঐসো বাকো নেম হতো। যাহী তেঁ সব লোগন নে বাকো নাম খণ্ডন পার্য্যো হতো। সো একদিন শ্রীমহাপ্রভুজী-কে সেবক বৈষ্ণবন কী মণ্ডলী মে আয়ো।' নাভাদাসের (স.১৬০০, ১৬৬০ খৃঃ) রচিত 'অষ্টযামে' কিছুটা পরিমার্জিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, যেমন, 'তব শ্রীমহারাজ কুমার বসিষ্ঠ মহারাজকে চরণ ছুই প্রনাম করতে ভয়ে। ফির উপর বৃদ্ধ সমাজ তিনকো প্রণাম করত ভয়ে।' লক্ষ্য করবার বিষয় যে 'খড়ী বোলী' প্রয়োগের পদ্ধতি এই রচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৬৮০ সম্বতে ১৬২৩ খৃঃ। বৈকুণ্ঠমণি 'অগহন মাহাত্ম্য' ও 'বৈশাখ মাহাত্ম্য নামে দুখানি ছোট ছোট পুস্তক রচনা করেছিলেন। 'বৈশাখ মহাত্ম্যে' ব্রজভাষায় গদ্য পূর্ব্বেকার রচনাগুলি অপেক্ষা অনেক পরিশুদ্ধ দেখা যায়ঃ 'সব দেবতন কী কৃপা মেঁ বৈকুণ্ঠমণি মুকুল শ্রীমহারাণী চন্দ্রাবতী কে ধরম পড়িবে কে অরথ যহ জসরূপ গ্রন্থ বৈশাখ মহাত্ম ভাষা করত ভয়ে। একসময় নারদ জু ব্রহ্মা সভা সে উঠি কৈ সুমেরু পর্ব্বত কো গএ।' সুরতি মিশ্র (স.১৭৬৭-১৭১০ খৃঃ) সংস্কৃত থেকে বেতালপচিসীর ব্রজভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং পরবর্তীকালে লল্লুলাল এই গ্রন্থের 'খড়ী বোলী'র রূপ দান করেন। উপরোক্ত গ্রন্থগুলির আলোচনা থেকে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে 'বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা'র মত সুষ্ঠু রচনা ব্রজভাষা গদ্যে আর পাওয়া যায় না। এবং পরবর্তীকালে 'খড়ী বোলী' তে গদ্য লেখার প্রয়াস এবং 'খড়ী বোলী'তে কথ্য ভাষার সুষ্ঠুরূপ দেওয়ার বিষয়ে এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রভাব আছে বলে মনে হয়। মূল গ্রন্থগুলি যতটা সহজবোধ্য ছিল তেমনই দুর্ব্বোধ্য ছিল গ্রন্থগুলির টীকা। 'শৃঙ্গারশতকের' নিম্নোক্ত টীকা থেকে এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে।

উন্মত্তপ্রেমসংরং ভাদালভন্তে-যদঙ্গনা।
তত্র প্রত্যুহমধাতুং ব্রহ্মাপি খলু কাতরঃ॥

এই টীকায় যেভাবে শব্দ বিন্যাস করা হয়েছে তাতে সহজে কিছুই বোধগম্য হয় না। কাজেই 'খড়ী বোলী'র প্রচলন যে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?

এরপর ১৭৯৮ সম্বতে রামপ্রসাদ 'নিরঞ্জন' যে 'ভাষা যোগবাশিষ্ঠ' নামক গ্রন্থের রচনা করেন তা পরিমার্জিত 'খড়ী বোলী'তে লেখা হয়েছিল। পাতিয়ালা দরবারের রামপ্রসাদের 'ভাষা যোগবাশিষ্ঠের সঙ্গে পরিচয় হলে বোঝা যায় যে সদাসুখলাল ও লল্লুলালের ৬২ বছর আগেও পুস্তকরচনায় 'খড়ী বোলী'র বিশুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছিল। এখনও পর্য্যন্ত সে সব 'খড়ী বোলী'তে প্রাচীন রচনা পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে 'যোগবাশিষ্ঠ'ই

সর্ব্বোৎকৃষ্ট। 'প্রথম পরব্রহ্ম পরমাত্মা কো নমস্কার-হৈ জিসসে সব ভাসতে হৈঁ উর জিসমে সব লীন ঔর স্থিত হোতে হৈঁ...জিস আনন্দ কে সমুদ্র কে কণ সে সম্পূর্ণ বিশ্ব আনন্দময় হৈঁ, জিস আনন্দ সে সব জীব জীতে হৈঁ। ....কেবল কর্ম্ম সে মোক্ষ নেহীঁ হোতা ঔর ন কেবল জ্ঞান সে মোক্ষ হোতা হৈঁ, মোক্ষ দোনোসে প্রাপ্ত হোতা হৈ। হে রামজী! জো পুরুষ অভিমানী নহীঁ হৈ বহ শরীরকে ইষ্ট অনিষ্ট মে রাগদ্বেষ নেহীঁ করতা ক্যোঁকি উসকী শুদ্ধ বাসনা হৈ।......... মলিন বাসনা জন্মো কো কারণ হৈ।' এত সহজে ও সাবলীল ভাবে খড়ী বোলী'র প্রয়োগ ঐ সময়কার অন্য কোন রচনায় পাওয়া যায় না।

রামপ্রসাদের পর ১৮১৮ সম্বতে ১৭৬১ খৃঃ মধ্য-প্রদেশের বসওয়ানিবাসী পণ্ডিত দৌলতরাম হরিষেণা-চার্য কৃত জৈনগ্রন্থ 'পদ্মপুরাণে'র অনুবাদ করেন। ৭০০ পৃষ্ঠার কিছু বেশী গ্রন্থটির ভাষা 'যোগবাশিষ্ঠে'র ভাষার মত রুচিমার্জিত নয়, তবে এই গ্রন্থটি থেকে বোঝা যায় যে মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যে ভাষা ব্যবহার করত তাতে উর্দু ফারসীর প্রভাব ছিলনা। মুসলমানদের রচনা থেকে আমরা 'খড়ী বোলীর' যে রূপ পাই, রামপ্রসাদ রচিত 'যোগবাশিষ্ঠে'র অথবা দৌলতরাম অনূদিত পদ্মপুরাণের 'খড়ী বোলী'র রূপ সে রূপ থেকে একেবারে ভিন্ন। এই দুটিতে বিদেশী ভাষার এতটুকু প্রভাব নেই, ভাষা শুদ্ধ দেশীয়। কাজেই যাঁরা মনে করেন যে 'খড়ী বোলী' বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা প্রতিপালিত ও প্রসারিত হয়েছিল তাঁদের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। 'খড়ী বোলী'র নিজস্ব ভারতীয় রূপ ছিল এবং এর ওপর আরবী, ফারসী বা উর্দু'র একটুও ছাপ পড়েনি এবং এই ভাষাতেই রামপ্রসাদ ও দৌলতরাম রচনা করেছিলেন।

১৮৩০ (১৭৭৩ খৃঃ) ও ১৮৪০ (১৭৮৩ খৃঃ) সম্বতের মাঝামাঝি রাজস্থানের এক অজানা লেখকের 'মণ্ডোবর কা বর্ণন' নামে একটি 'খড়ী বোলী' গ্রন্থ পাওয়া যায়। এর ভাষা নেহাৎই কথ্য ভাষা—'অবল মেঁ যহাঁ মাণ্ডব্য রিসী কা আশ্রম। ইস সবব সে ইস জগে কা নাম মাণ্ডব্যাশ্রম হু।' এই যা 'খড়ী বোলী' যে লোক পরম্পরায় ব্যবহৃত হচ্ছিল তার প্রমাণ আমরা 'খড়ী বোলী'তে রচিত গীত থেকে পাই। আমীর খুসরোর 'পহেলী'গুলো পূর্ণমাত্রায় 'খড়ী বোলী'তে রচিত হয়েছিল। মুসলমানী প্রভাবে এদেশে বিদেশী ভাবাপন্ন যে ভাষা গড়ে উঠছিল সেই ভাষাকে ভূষণ, সূদন প্রভৃতি হিন্দী কবিরা গ্রহণ করেছিলেন বলে 'খড়ী বোলী'কে মুসলমান ভাষা বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাক্-মুসলমানী ও মুসলমানী যুগেও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে দেশীয় 'খড়ী বোলী'র প্রচলন ছিল। এবং ধারে ধারে আমরা দেখতে পাই যে ইংরেজ শাসনকালে এই 'খড়ী বোলী' ভারতের শিষ্ট সমাজের কথ্য ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে মোল্লা মৌলবীরা যেমন উর্দু'র ব্যবহার করে চললেন ঠিক তেমনি সাধু, পণ্ডিত ও মহাজনেরা 'খড়ী বোলী' কে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলেন। এঁদের ভাষা স্বভাবতঃই একটু সংস্কৃত ঘেঁষা হয়ে পড়ল।

রীতিকালের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা ভারতের ওপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করল এবং ভারতের ভাষা শেখা ইংরেজদের পক্ষে অনিবার্য্য হয়ে পড়ল, কিন্তু বিড়ম্বনা হল এই নিয়ে যে কোন্ ভাষা তারা শিখবে, সাধারণ দেশীয় ভাষা না দরবারী উর্দু ভাষা। ইংরেজরা যদিও বিদেশী ছিল কিন্তু তারা এটা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে উর্দু ভারতের দেশীয় ভাষা নয় এবং এই ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা জনতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যাবে না। এই কারণে দেশীয় ভাষা শেখার একান্ত প্রয়োজন হল আর এই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হল গদ্যে লিখিত উর্দু ও শুদ্ধ 'খড়ী বোলী'র পুস্তকের। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে রাজকার্য্য ও ধর্মপ্রচারের জন্য গদ্যই একমাত্র মাধ্যম, পদ্যের দ্বারা এ কাজ সমাধা করা নিতান্তই দুষ্কর। গদ্যে লিখিত পুস্তকের প্রয়োজন হল বটে কিন্তু উর্দু অথবা হিন্দী কোন ভাষাতেই এরকম পুস্তক তখনও পর্য্যন্ত ছিল না। এই

সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এই ধরণের পুস্তকের লেখার বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ামে 'যোগবাশিষ্ঠ' জাতীয় পুস্তক রচনার দু-এক বছর আগেই 'খড়ী বোলী' গদ্যে মুন্সী সদাসুখলাল 'জ্ঞানোপদেশে'র এবং ইন্সা অল্লা 'রাণী কেতকী কী কহানী' লিখে ফেলেছিলেন। অতএব-এটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না যে ইংরেজরাই হিন্দী গদ্য রচনায় প্রথম উৎসাহ প্রদান করেন—উৎসাহ আগেই ছিল, ইংরেজরা সেই উৎসাহকে কার্য্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা করে দেয়। যখন থেকে বাদশাহী দিল্লীর অবস্থা পড়ে গেল, দিল্লীর এবং দিল্লীর চারপাশের ব্যবসায়ীরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন থেকেই হিন্দী 'খড়ী বোলী'তে গদ্য রচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এবং বোধ হয় এই কারণেই ১৮৬০ সম্বতে (১৮০৩ খৃঃ) যখন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গিলক্রায়েস্ট সায়েব দেশী ভাষায় গদ্য পুস্তকের রচনার ব্যবস্থা করলেন তখন তিনি উর্দু ও হিন্দী রচনার পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত করলেন। উর্দু'র সঙ্গে দেশী হিন্দী 'খড়ী বোলী'র প্রভেদ গিলক্রায়েস্ট সায়েব বুঝতে পেরেছিলেন তাই দুরকম রচনার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টায় মিশনারীদের রচনা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব ধর্ম্ম প্রচারকদের হিন্দী ভাষা কত বিশুদ্ধ ছিল তা দু-একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে :—'তব যীশু যোহন সে বপতিস্মা লেনে কো উস পাস গালীল সে যর্দন কে তীর পর আয়া। পরন্তু যোহন যহ কহকে উসে বর্জনে লগা কি মুঝে আপকে হাথসে বপতিস্মা লেনা অবশ্য হৈ ঔর ক্যা আপ মেরে পাস আতে হৈঁ।' ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে 'দাউদ কে গীতেঁ' নামে একটি পুস্তক ছাপা হয়, এর এক বছর পরে আগ্রায় পাদরীদের স্থাপিত 'স্কুল বুক সোসাইটি' ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ১৮৩৭ সালে মার্শম্যান সায়েবের 'প্রাচীন ইতিহাস'-এর অনুবাদ 'কথাসার' প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতাতেও এই রকম একটি স্কুল বুক সোসাইটির স্থাপনা হয় এবং এই সোসাইটি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'পদার্থ বিদ্যাসার' নামে একটি বিজ্ঞান সম্বন্ধী পুস্তক প্রকাশ করেছিল। ১৮৫৫-৬২ সালের ভেতর মির্জাপুরের 'অরকান প্রেসে' শেরিং সায়েবের সম্পাদনায় ভূচরিত্রদর্পণ, ভূগোলবিদ্যা, মনোরঞ্জক বৃত্তান্ত, জন্তু প্রবন্ধ, বিদ্যাসাগর, বিদ্বান্ সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অসী ও জন নামে দুজন ইংরেজের রচিত ভজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রায় এই সময় হিন্দী 'খড়ী বোলী'র চারজন প্রথম ও প্রধান লেখকের আবির্ভাব হয়। এঁরা হচ্ছেন —সদল মিশ্র, সদাসুখলাল, ইন্শা অল্লা ও লল্লুলাল। ১৮৬০ সম্বতের কাছাকাছি এঁদেরই ওপর ন্যস্ত ছিল 'খড়ী বোলী'র উন্নতিও প্রসারের কার্জ এবং এই চারজনকে বলা যেতে পারে হিন্দী 'খড়ী বোলী'র চিত্তাকর্ষক প্রাসাদের চতুস্তম্ভ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানেই লল্লুলালজী গুজরাতী 'খড়ী বোলী'তে 'প্রেমসাগর' এবং সদল মিশ্র বিহারী 'খোড়ী বোলী'তে 'নাসিকেতোপাখ্যান'-এর রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে নিয়ে হিন্দী 'খড়ী বোলী'র এই চারজন কৃতী লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কার্য্যাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত করা হল। সদাসুখলাল ছিলেন দিল্লীর বাসিন্দা। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয় এবং ১৮২৩ সালে মৃত্যু হয়। মির্জাপুর জেলার চুনারে ইনি কোম্পানীর এক ভাল চাকরী করতেন। এঁর নিজের রচনা 'মুন্তখ-সুত্ত বারীখ' থেকে জানা যায় যে ৬৫ বছর বয়সে ইনি চাকরী ছেড়ে প্রয়াগে চলে যান এবং ভগবদ্‌ভজনে শেষ জীবন কাটিয়ে দেন। এই রচনাটির (১৮১১ খৃঃ) ছ বছর পরে এঁর মৃত্যু হয়। 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে কয়েকটি উপদেশ-মূলক প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি একটি পুস্তক লিখেছিলেন কিন্তু এই পুস্তকটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নি। 'যোগবাশিষ্ঠে'র মত মার্জিত গদ্যে সদাসুখলাল যে এই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন তা নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—'জো ক্রিয়া উত্তম হুই তো সো বর্ব মেঁ চাণ্ডাল সে ব্রাহ্মণ হুয়ে, ঔর জো ক্রিয়া ভ্রষ্ট হুই

তো তুরন্ত হী বহ ব্রাহ্মণ সে চাণ্ডাল হোতা হৈ। যত্তপি ঐসে বিচার সে হমে লোগ নাস্তিক কহেঙ্গে, হমে ইস বাত কা ডর নহী। জো বাত সত্য হোয় উসে কহনা চাহিয়ে, কোঈ বুরা মানে কি ভলা মানে।...... তোতা হৈ সো নারায়ণ কা নাম লেতা হৈ; পরন্তু উসে জ্ঞান তো নহী হে।' এই গদ্য মুন্সীজী কোন ইংরেজের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে লেখেন নি। পূর্ব্বপ্রদেশে ঐ সময় যে কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল সেই ভাষায় তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই গদ্য গ্রন্থের রচনা করেছিলেন। এবং স্থান বিশেষে তৎসম সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করে ভবিষ্যতে সাহিত্যিক ভাষার রূপ কি হওয়া উচিত তারও আভাস দিয়েছিলেন। ফলকথা এই যে দিল্লীর পূর্বদিকের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের প্রচলিত কথ্য-ভাষাকে তিনি সাহিত্যিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 'স্বভাব করকে বে দৈত্য কহলাএ', 'উন্হী লোগোঁসে বন আবৈ হৈ, জো বাত সত্য হৈ' আদি উদাহরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে কাশীর পণ্ডিতগণের মত সদাসুখলালও নিঃসঙ্কোচে প্রচলিত দেশী শব্দের ব্যবহার করেছেন।

ইন্শা অল্লা খাঁ দিল্লীর 'একজন বিখ্যাত উর্দু কবি ছিলেন কিন্তু দিল্লীর মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেলে তিনি লক্ষ্ণৌতে চলে আসেন। ইন্শার পিতা মাশা অল্লা খাঁ কাশ্মীর থেকে দিল্লীতে এসে মোগল দরবারের রাজবৈদ্য হন। কিন্তু কিছুদিন পর যখন মোগল বাদশাহের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তখন তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে চলে আসেন। মীরজাফরের চক্রান্তে সিরাজের মৃত্যুর পর যখন বাংলার 'বিপর্য্যয় ঘটল ইন্শা তখন বাংলাদেশ ছেড়ে দিল্লী চলে যান এবং দ্বিতীয় শাহ আলমের দরবারে স্থান নিলেন। ইন্শার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং কবি হিসাবে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায় যে এই সময়ে আপন প্রতিভা দ্বারা তিনি দেশের বড় বড় কবিদের 'মুশায়েরে' হারিয়ে দিতেন। কথিত হয় যে এই সময় গোলাম কাদির নামে এক আমলা বাদশাহকে অন্ধ করে দিল্লীর রাজকোষের সমস্ত ধন-দৌলত লুট করে নিয়ে চলে যান। এইরকম অবস্থায় ইন্শার পক্ষে দিল্লীতে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ চলে যান। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সাদত আলি খাঁ সিংহাসনে বসলে ইন্শা বেশ কিছু দিন ভালভাবে দিন কাটাতে লাগলেন কিন্তু একটা সামান্য ব্যাপারে ইন্শার বেতন-ভাতা সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মৃত্যু (১৮১৭ খৃঃ) পর্য্যন্ত তাঁকে খুব কষ্ট পেতে হয়।

১৭৭৭-৮২ খৃঃ-এর মধ্যে ইন্শা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'উদয়ভান চরিত' অথবা 'রাণী কেতকী কী কহানী'র রচনা করেন। তিনি কেন যে এই গ্রন্থ লেখেন তা তিনি নিজেই এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—'এক দিন বৈঠে বৈঠে যহ বাত অপনে ধ্যান মেঁ চঢ়ী কি কোই কহানী ঐসী কহিএ জিসমেঁ হিন্দবী ছুটে ঔর কিসী বোলী কা পুট ন মিলে, তব জাকে মেরা জী ফুল কী কলী কে রূপ মেঁ খিলে। বাহর কী বোলী ঔর গঁবারী কুছ উসকে বীচ মেঁ ন হো।......' অর্থাৎ তিনি এমন এক গ্রন্থের রচনা করতে চেয়েছিলেন যার ভাষা শুদ্ধ হিন্দী হবে, বিদেশী বা গ্রামীণ (ব্রজ, অবধী আদি) ভাষার কোন ছাপ থাকবে না। উদ্ধৃত অংশের আরও খানিকটা পরে ইন্শা লিখেছেন 'হিন্দবীপন ভী ন নিকলে ঔর ভাখাপন ভী ন হো'। এই প্রসঙ্গে 'ভাখাপন' শব্দটি প্রণিধান-যোগ্য —মুসলমানগণ 'ভাখা' শব্দের দ্বারা সাহিত্যিক হিন্দী ভাষা, তা সে ব্রজভাষাই হক বা 'খড়ী বোলী'ই হক, বুঝতেন, অর্থাৎ যাতে সংস্কৃত-বহুল শব্দ ব্যবহৃত হত। আর যে ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকত তাকে তাঁরা উর্দু আখ্যা দিয়েছিলেন। ইন্শা অল্লা নিজে মুসলমান হয়েও এমন এক ভাষায় রচনা করতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে 'ভাখাপন' (সংস্কৃতময়) ও 'মুঅল্লাপন' (উর্দুময়) না থাকে। কিন্তু মুসলমান হবার জন্য উর্দু শব্দ (মুঅল্লাপন) থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি। বাক্য বিন্যাসে অজ্ঞাতসারেই ফারসী-প্রভাব কখন কখন এসে গিয়েছিল যেমন 'সির ঝুকাকর নাক রগড়তা হূঁ অপনে বনানেবালে কে সামনে জিসনে

হম সবকো বনায়া।' ইন্‌শার ভাষা সদাসুখের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে সদাসুখের ভাষা স্বভাবতঃই গম্ভীর। এটা বোধ হয় তাঁর ধর্ম-ভীরুতার জন্য। অপর পক্ষে ইন্‌শা ধর্মকে বড় একটা আমল দিতেন না এবং তাই তাঁর ভাষায় সবসময় একটা হাল্কা ভাব দেখা যায়। ইন্‌শার ভাষার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল অনুপ্রাসের। একটা বাক্যের ছেদ পড়বার সময় প্রায়ই অনুপ্রাসের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—'জব দোনোঁ মহারাজোঁ মেঁ লড়াই হোনে লগী, রাণী কেতকী সাবন ভাদোঁ কে রূপ মেঁ রোনে লগী, ঔর দোনোঁ কে জী মেঁ যহ আ গই যহ কৈসী চাহত জিনমেঁ লহু বরসনে লগা ঔর অচ্ছী বাতোঁ কো জী তরসনে লগা।'

লল্লুলাল আগ্রার গুজরাটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁর জন্ম হয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮১২ সালে। সদাসুখের মত সংস্কৃতে এঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল তবে দেশী ভাষায় কবিতা লেখাতেও এঁর বেশ হাত ছিল। উর্দু'রও কিছু জ্ঞান ছিল। লল্লুলাল 'খড়ী বোলী' গদ্যে 'প্রেমসাগরে'র রচনা করেন। মহাভারতের দশম স্কন্ধ 'প্রেমসাগরে'র বিষয়বস্তু। যদিও 'ইনি ইন্‌শার মত শুদ্ধ হিন্দী ভাষায় লেখার কোন প্রতিজ্ঞা করেন নি তবে এঁর রচনা থেকে দেখা যায় যে ইনি বিদেশী শব্দ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে আরবী-ফারসী সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান ছিল তা না হলে রচনার সময় আরবী-ফারসী শব্দ বাদ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ কতকগুলো আরবী-ফারসী শব্দ এমনভাবে এ দেশের ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে ঐ ভাষা দুটোর জ্ঞান না থাকলে শব্দগুলির আসল পরিচয় বের করা সম্ভব নয়। 'খড়ী বোলী'র ব্যবহারে লল্লুলালের সঙ্গে আকবরের রাজত্বকালের গঙ্গ কবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়, প্রভেদ শুধু এই যে গঙ্গের রচনায় অনেক আরবী-ফারসী শব্দ পাওয়া যায়। লল্লুলালের প্রধান কীর্তি 'প্রেমসাগরে' কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার, প্রবাদ ও প্রবচনের শুদ্ধতা, ভাষা নিত্য ব্যবহার্য্য ভাষা-ময় এবং বিচারধারার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। উদাহরণ স্বরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল—'শ্রীশুকদেব মুনি বোলে—মহারাজ। গ্রীষ্ম কী অতি অনীতি দেখ, নৃপ পাবস প্রচণ্ড পশু-পক্ষী, জীব-জন্তুওঁ কী দশা বিচার, চারোঁ ওরসে দল-বাদল লে লড়নে কো চর আয়া।...... ইতনা কহ মহাদেবজী গিরিজা কো সাথ লে গঙ্গা তীর পর জায়, নীর মেঁ ন্হায় ন্হিলায়ে, অতি লাড় প্যারসে লগে পার্ব্বতী জী কো বস্ত্র আভূষণ পহিরাণে। নিদান অতি আনন্দ মেঁ মগ্ন হো ডমরু বজায় বজায়, তাণ্ডব নাচ নাচ, সঙ্গীত শাস্ত্র কী রীতি সে গায় গায় লগে রিসানে।'

লল্লুলাল ব্রজভাষায় লিখিত কথা ও কাহিনীকে উর্দু ও হিন্দী গদ্যে রূপান্তরিত করেন। এঁর রচনাগুলির নাম—'সিংহাসন বত্তীসা', 'বৈতাল পচিসী', 'শকুন্তলা নাটক', 'মাধোনল' ও 'প্রেমসাগর'। 'প্রেমসাগর' ছাড়া অন্য চারটি উর্দু রচনা। এই পাঁচটি গ্রন্থ ছাড়া ইনি, ১৮৬৯ সম্বতে রাজনীতি নামে ব্রজভাষা পদ্যে লিখিত হিতোপদেশ কাহিনীগুলির গদ্য ব্রজভাষায় রূপান্তরিত করেন। উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়াও এঁর 'বিহারী সতসই'র টীকা 'লালচন্দ্রিকা' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কলকাতার পটলডাঙ্গা 'সংস্কৃত প্রেস' নামে লল্লুলাল নিজের এক প্রেস চালু করেন। ১৮৮১ সম্বতে (১৮২৪ খৃঃ) যখন ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি এই প্রেস আগ্রায় স্থানান্তরিত করেন। আগ্রায় প্রেসের কাজ সুষ্ঠুভাবে শুরু করবার পর লল্লুলাল একবার কলকাতায় আসেন এবং এই সময় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ে 'সংস্কৃত প্রেসে'র বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল, কারণ লল্লুলাল এই প্রেসে আপন রচনা মুদ্রণ করা ছাড়াও রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণ এই প্রেসেই করেছিলেন।

পণ্ডিত সদল মিশ্র আরার (বিহার) শাক দ্বিপী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মিশ্র পরিবারের শুকদেব মিশ্র সর্বপ্রথম আরা জেলার ধ্রুপডীহা নামক গ্রামে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কৃষ্ণভক্ত শুকদেব একান্তে জীবন অতিবাহিত

করতে ভালবাসতেন, শ্রাদ্ধ, নিমন্ত্রণাদিতে ইনি কখনও অংশ গ্রহণ করতেন না। এই কারণে ঐ গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ শুকদেবকে খুব একটা ভাল চোখে দেখতেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত ইনি ঐ গ্রাম ছেড়ে ভদ্বর গ্রামে এসে বাস করতে লাগলেন। এই গ্রামের জমিদারের প্রথমে এঁর ওপর সন্দেহ হয় কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে ইনি একজন পরম সাত্বিক ও ভগবদ্ভক্ত তখন এঁকে বিশেষ সম্মান দেবার জন্য কতকগুলি গ্রাম দিতে চাইলেন কিন্তু শুকদেব কেবল হসনপুরা নামক গ্রামটি নিতে রাজী হলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত শুকদেব ও তাঁর বংশধরগণ এই গ্রামে অতিবাহিত করেন কিন্তু কুমার সিংহের সময় এঁরা আবার আরায় চলে আসেন এবং এখনও পর্য্যন্ত এই পরিবারের লোকেদের এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

শুকদেবের বংশে লক্ষ্মণ মিশ্রের তিন পুত্র ছিল—কৃষ্ণমণি, ধৈর্য্যমণি ও নন্দমনি। এদেরই বংশধরদের আজও আমরা আরা জেলায় দেখতে পাই। নন্দমণির তিন পুত্র হয়—'নাসিকেতোপাখ্যান' রচয়িতা সদল মিশ্র এঁদের একজন, অপর দুজনের নাম ছিল বদল ও সীতারাম। এই বংশে অনেক বিদ্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় সকলের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। শোনা যায় যে অসামান্য প্রতিভার জন্য সদলকে পাটনায় ডেকে পাঠানো হয় এবং পাটনা থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করবার জন্য ডাকা হয়। 'নাসিকেতোপাখ্যানে'র প্রারম্ভে সদল যা লিখেছেন তা থেকে ঠিক বোঝা যায় না যে ওঁকে কলকাতায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা উনি নিজেই কলকাতায় চাকরীর খোঁজে যান। তবে এটা নিশ্চিত যে সদল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী করতেন। বাবু শিবনন্দন সহায় লিখছেন যে সদলের বংশের একটি নামজতালিকা (১৯০৪ সম্বত ১৮৪৭ খৃঃ) তাঁর পৌত্র পণ্ডিত রঘুনন্দন মিশ্রের কাছে তিনি দেখতে পান। ১৯০৫ সম্বতে ১৮৪৮ খৃঃ আর একটি নামতালিকা পাওয়া যায় কিন্তু এতে সদলের বংশধরদের কেবল নাম আছে, সদলের নেই। এর থেকে মনে হয় যে ১৯০৪-৫ সম্বতের ১৮৪৭-৪৮ খৃঃ মধ্যে সদলের মৃত্যু হয়। এঁর বংশধরদের মতে সদল ৮০ বছর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। শোনা যায় যে সদলের বয়স যখন ২৫।২৬ তখন তিনি নাকি কলকাতায় আসেন—অতএব খুব সম্ভব ১৮৫০ সম্বতের (১৭৯৩ খৃঃ) কাছাকাছি সদল কলকাতায় এসে পৌঁছান। ১৮৬০ সম্বতে (১৮০৩ খৃঃ) তিনি 'নাসিকেতোপাখ্যানে'র অনুবাদ করেন। এ সম্বন্ধে অনুবাদক নিজেই বলেছেন যে এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। কিন্তু এখন সে সব গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। 'নাসিকোতাপাখ্যানে'র 'খড়ী বোলী'তে অনুবাদ প্রসঙ্গে সদলের উক্তি উল্লেখনীয়—'অব সম্বৎ ১৮৬০ মেঁ নাসিকোতাপাখ্যান কো কি জিসমেঁ চন্দ্রাবতী কী কথা কহী হৈ, দেববাণী সে কোই কোই সমঝ নহীঁ সকতা। ইসলিয়ে খড়ী বোলী মেঁ কিয়া।'৬ ১৮৮৮ সম্বতে ১৮৩১ খৃঃ সদলজী ১১০০০ টাকায় সিগহী, বয়গুলকা এবং হাসানপুর এই তিনটে গ্রামের পাট্টা নিয়েছিলেন। এর থেকে মনে হয় যে কলকাতায় ৩০।৩৫ বছর কাজ করে সদল প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ১৮৬৭ সম্বতে (১৮১০ খৃঃ) সদল গোস্বামী তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'এর এক সংশোধিত সংস্করণ মুদ্রিত করেন।৭ ১৮৯৩ সম্বতে (১৮৩১ খৃঃ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ হয়ে যায় এবং মনে হয় এর আগেই সদল দেশে ফিরে যান।

প্রায় একই সময়ে সম্বৎ ১৮০৩ খৃঃ (১৮৬০) লল্লুলালের 'প্রেমসাগর' ও সদলের 'নাসিকেতোপাখ্যান' রচিত হয়েছিল। কিন্তু এঁদের দুজনার ভাষার প্রভেদ ছিল। লল্লুলালের ব্রজভাষার বাহুল্য সদলের ভাষায় পাওয়া যায় না এবং কাব্যভাষার পদাবলীর ব্যবহারও, যা 'প্রেমসাগরে'র অনেক যায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, সদলের রচনায় নেই। সদলের ভাষা ছিল সেই সময়ের ব্যবহারিক ভাষা এবং যতদূর সম্ভব সদল 'খড়ী বোলী'র প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন। সে যাই হক, সদলের ভাষা লল্লুলালের ভাষা অপেক্ষা সে অধিক স্পষ্ট ও

মার্জিত ছিল তার নিদর্শন 'নাসিকেতোপাখ্যানে'র নিম্নোক্ত অংশ থেকেই প্রতীয়মান হয় :—

'ইস প্রকার সে নাসিকেতমুনি যম কী পুরী সহিত নরক কা বর্ণন কর ফির জৌন কর্ম কিএ সে জো ভোগ হোতা হৈ সো সব ঋষিয়োঁ কো সুনানে লাগে কি গৌ, ব্রাহ্মণ, মাতাপিতা, মিত্র, বালক, স্ত্রী, স্বামী, বৃদ্ধ, গুরু, ইনকো জো বধ করতে হৈঁ, বো ঝুটী সাক্ষী ভরতে, ঝুট হী কর্ম মেঁ দিনরাত লগে রহতে হৈঁ, অপনী ভার্যা কো ত্যাগ দুসরে কী স্ত্রী কো ব্যাহতে ঔর জো অপনে ধর্ম সে হীন পাপ হী মে গড়ে রহতে হৈঁ বো মাতাপিতা কী হিত কী বাত নহী সুনতে, সব সে বৈর করতে হৈঁ, ঐসে জো পাপী জন হৈঁ সো মহা ডরাবনে দক্ষিণ দ্বার সে জা নরকোঁ মেঁ পড়তে হৈ।

এইভাবে সদল, সদাসুখ, ইন্সা ও লল্লুলালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'খড়ী বোলী'র মাধ্যমে আধুনিক হিন্দী সাহিত্য ও ভাষার বুনিয়াদ গড়ে উঠল। এবং ধীরে ধীরে শুধু গদ্যে নয় পদ্যেতেও কেবল মাত্র 'খড়ী বোলী' ব্যবহৃত হতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে হিন্দী সাহিত্যের যে ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তার সবটুকুই 'খড়ী বোলী' এবং এই ভাষাকেই কখনও কখনও 'পশ্চিমী হিন্দী'৮ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

---

১) বংশীধর বিদ্যালঙ্কার, উর্দু, ভাগ ১৪, পৃঃ ৪৭১ ; ধীরেন্দ্র বর্মা, হিন্দীভাষাকা ইতিহাস, তৃ. সং, পৃঃ৩৪।

২) তাসী, ইস্তোয়ার দ লা হিন্দুই এ হিন্দুস্তানী, প্র. সং, ভা. ১, পৃঃ ৩০৭ ; চন্দ্রবলী পাণ্ডে, খড়ীবোলী কী নিরুক্তি, উর্দু কা রহস্য, পৃঃ ৫৪-৬৮।

৩) টি. গ্রাহামবেলী, দি হিস্টরী অফ উর্দু লিটারেচর পৃঃ ৪ ; G.R.A., 1936, Oct. p. 71.

৪) সুনীতিকুমার Origin and Development of Bengali Literature, p. 11 ও ভারতীয় আর্যভাষা ঔর হিন্দী, পৃঃ ১৬৫।

৫) 'খড়ী বোলী কী নিরুক্তি'র উপক্রমণিকায় চন্দ্রবলী পাণ্ডে বলেন যে 'খড়ী বোলী' সদল মিশ্রের নিবাসস্থান বিহারের প্রচলিত ভাষা নয়। কিন্তু উপরোক্ত রচনাগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে এই সময় 'খড়ী বোলী' সকল প্রান্তের ভাষা ছিল।

৬) রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস পৃঃ ৬৪।

৭) এই সংস্করণের একটি প্রতি এখনও কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

৮) একেই আজ 'Basic' হিন্দী বলা হয়। 'Basic' শব্দটির বিশ্লেষণ এইভাবে করা যেতে পারে—B= ভারতীয়, a=এসিয়, s=সংস্কৃত-বহুল এবং is= ইসলামিক চালু অর্থাৎ যে ভাষা এই চতুর্মুখী শব্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং এই সমন্বিত ভাষাই হল আজকের হিন্দী ভাষা।

বিবাহে বৃক্ষ বরণ

ভাগবতদাস বরাট

আমার বন্ধু অমিতের বিয়ে। আমরা সবাই বরযাত্রী। আর আমিই বরকর্তা। বরযাত্রীর সংখ্যাও কম। গুনোগুনতি পাঁচজন। মেয়ের বাবার অবস্থা অসচ্ছল জেনে আমরা খুব কম জনই এসেছি। বরাসনে বর বসেছে। আমরা ওকে ঘিরে বসেছি। টিমটিমে একটি হ্যাসেক লাইটে সারা ঘরটা দিনের মত আলো করার ব্যবস্থাটা আমার কাছে প্রহসন বলেই মনে হয়েছিল। হ্যাসেকের আগমনে ঘরের সামনের আঁধার এক ছুটে সরে গেলেও ঘরের কোণের আঁধার পরম নিশ্চিন্তে জমাট বেঁধে জমজমাট ছিল। যথা সময়ে মেয়ের বাবা আমাদের কাছে কন্যা সম্প্রদানের অনুমতি নিতেই অমিতের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ছাদনা তলায় হাজির হলাম। আর ওর পিছনেই বসে পড়লাম।

রাত দশটা। লগ্নের স্রোত বহে চলেছে। হেথা হোথা শঙ্খনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। বর কনে যেন বলির পাঁঠা! একজনের সঙ্গে অপরকে জড়িয়ে ফেলাই তো বলির সামিল। বিয়ের পিঁড়েয় অমিত বসেছে। এই লগ্নেই ওর সঙ্গেও জড়িয়ে পড়বে অপর একজন। গাছের সঙ্গে যেমন লতার অবলম্বন, তেমনি নারীর অবলম্বন পুরুষ। অমিতকে কেমন যেন আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল। যদিও এসব ব্যাপারে সে খুব পাকাপোক্ত, তবু ওকে বোকার মত দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ ওকে পিঁড়ে হতে তুলে দেওয়া হল। বিয়ে হবে না। আমি আশ্চর্য্য। এবং সেই সঙ্গে সবাই অবাক। ভাবি, এ কেমন ব্যবস্থা। এ যে ডেকে এনে অপমান। গরুদানের পর জুতা মারা। বললাম,—সে কি মশায়, বিয়ে হবে না কেন? রোজগারী পাত্র। আমাদের সহকর্মী। বয়সটা না হয় একটু বেশী। আগের পক্ষের না হয় কয়েকটি ছেলে মেয়ে আছে। আর তা জেনে শুনেই তো এগিয়েছেন। এখন এই অবস্থায় পিছিয়ে পড়া তো চলবে না। জল সমেত গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। বলছেন, জলপান নিষেধ। এ কেমন ব্যবহার। অমিতের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেও বেশ তেতে উঠেছে। ব্যাপারটা ওর কাছেও অপ্রীতিকর মনে হল।

আমি আরও বললাম,—বয়স বেশী হলেও রোজগারী শিক্ষিত পুরুষ। আর পাত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধেও তো আপনারা ওয়াকেফহাল। আরো যেন কিছু বলতাম, কিন্তু বলা হল না। পাত্রী পক্ষের একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসতে হাসতে কাছে এসে বললেন,—বিয়ে হবে না কি বলেন? বিয়ে ঠিকই হবে। তবে বিয়ের আগে পাত্রকে পত্নীরূপে একটি কলাগাছ বরণ করতে হবে।

এ আবার কি কথা? বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। শুনলাম, তৃতীয়া পত্নী গ্রহণ কালে আমাদের দেশের প্রত্যেক পুরুষকেই বিয়ের আগে কলাগাছকে বরণ করে তৃতীয়া পত্নীকে চতুর্থ স্থানীয়া করে নিতে হয়। অমিতের প্রথমা ও দ্বিতীয়া ভার্য্যা বিয়ের পর একে একে পরলোক গত হওয়ায় এই বিয়ে তার তৃতীয়া স্ত্রী গ্রহণ। অতএব এই ক্ষেত্রে ওকে চিরাচরিত নিয়মের অনুষ্ঠান মানতে হবে। কিন্তু কেন? তা তো জানি না। আর এই ক্রিয়াকর্ম্মের বিশেষত্বই বা কি তা নিয়ে সেদিন কোন চিন্তা ভাবনাও করিনি। মনে হয়েছিল ইহা কুসংস্কারের নামান্তর। কিন্তু পরে জেনেছি যে শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সমাজের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। আর বৃক্ষকে কেন্দ্র করেই প্রতীক।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু আছে। প্রাজাপত্য-

গান্ধর্ব, ব্রাহ্মী প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ ভাবে অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়াও দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান বিবাহ প্রণালীর মধ্যে ক্রমশঃ ঢুকে পড়েছে। এবং এই সব দেশাচার, লোকাচার ও কুলাচার স্থান বিশেষে এমনভাবে মিশে গেছে যে প্রাচীন পদ্ধতি যে কি ছিল তা জানা দুরূহ। বিচিত্র বিবাহ পর্য্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ব্যতীত বৃক্ষলতা এবং একাধিক প্রতীক চিহ্নকে বিবাহে বরণ করা হয়। সাধারণতঃ দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগান্তে তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ কালে বিভিন্ন স্থানে প্রথমে উদ্ভিদের সাথে যথারীতি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নির্দ্ধারিত কন্যার পাণি গ্রহণ সুসম্পন্ন হয়। বাংলা দেশে কোথাও পুষ্পবৃক্ষ এবং কোথাও বা কদলী বৃক্ষ এতৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। পাঞ্জাবে হিন্দুরা পুষ্প বৃক্ষের পরিবর্ত্তে আখ কিম্বা বাবলা গাছকে পত্নীত্বে বরণ করে, তৃতীয়া স্ত্রীর পাণিগ্রহণের আগে।

হিমাচল প্রদেশে পাত্র তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করার আগে একটি পল্লবিত আম্র বৃক্ষকে পত্নীত্বে বরণ করে। ভারতের উত্তর প্রদেশের লোকাচারে পাত্র তৃতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করার সময় প্রথমে একটি আখ গাছকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে নির্ব্বাচিতা কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। মাদ্রাজে পুনঃ বিবাহ কালে কদলী বৃক্ষকে পত্নীত্বে বরণ করার বিধান আছে। মুণ্ডারী, কোল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির প্রথা অনুযায়ী বিবাহ কালে গাত্র হরিদ্রার সময় পাত্রের একটি আম গাছের সঙ্গে এবং কন্যার মহুয়া গাছের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

বাংলা দেশে প্রচলিত নিয়মানুসারে গৌরী দান একটি পুণ্য কর্ম্ম। আগে গৌরী দান প্রথা খুবই চালু ছিল। সেই সময় যথাকালে সৎপাত্র না পেলে কন্যার পিতা গৌরীদানের অক্ষয় পুণ্য লাভের মানসে আসন্নযৌবনা কিশোরী কন্যার সঙ্গে একটি কলাগাছের যথাবিহিত অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করে রাখতেন। পরে সেই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে সৎপাত্র অনুসন্ধান করে পুনর্ব্বার তাকে দান করা হত। নেপালের নেওয়ার জাতির কন্যাদের বয়সকালে প্রথমে একটি শ্রীফল বা বেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, এবং বিবাহান্তে সেই ফলটি নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়ে কন্যাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হতে রক্ষা করা হয়। পরবর্ত্তী কালে এই কন্যার একাধিকবার বিবাহের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

কাঙ্গড়া জেলায় বিয়ের পাত্র অপছন্দ হলে পাত্রী নিজ মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বনগমন করে। কন্যার সন্ধানে অভিভাবকরা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করার আগেই কন্যা উন্মুক্ত স্থানে একটি নির্ব্বাচিত গাছের সামনে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই বৃক্ষকে পতিত্বে বরণ করে। অভিভাবকরা মেয়ের খোঁজে বনে এসে বৃক্ষমূলে হোমাগ্নির চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে নির্দ্দিষ্ট পাত্রকে পাত্রী অপছন্দ করেছে। যে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তখন প্রথা অনুযায়ী পূর্ব্বের স্বিরীকৃত বিবাহ সম্বন্ধ নাকচ হয় এবং কন্যার মনোনীত পাত্রের সঙ্গেই কন্যার বিয়ে হয়ে থাকে।

গোয়া এবং গুজরাটের কোন কোন স্থানে প্রথমে একটি পুষ্প বৃক্ষের সহিত কন্যার বিবাহ পর্ব্ব সম্পন্ন হয়। সার্ভিয়ায় আপেল বৃক্ষের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয়ে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন সভ্য জাতির মধ্যে আদিম প্রথা অনুযায়ী এখনও বৃক্ষ বিবাহ প্রচলিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতেও বিবাহে বৃক্ষ বরণের রীতি এখনও প্রচলিত আছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় 'মাল' কথার দ্রাবিড় অর্থ পাহাড়ী। এরা রাঢ় অঞ্চলের তথা পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী একটি অনুন্নত জাতি। এদের বিবাহ কালে বিবাহ মণ্ডপে একটি মহুয়া বৃক্ষের পরিবর্ত্তে উক্ত গাছের একটি ডাল পুঁতে রাখা হয়। বিবাহের সময় ওদের সমাজের নেতা সেই মহুয়া গাছের ডালটি তুলেই পাত্র ও কন্যার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে। আর মুখে বলে "—হরিবোল, বোল হরি।" এই হরিধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ পর্ব্ব শেষ হয়। তারপর যথারীতি সিন্দুর দান ও গাঁটছড়া বাঁধা ইত্যাদি নানা ক্রিয়া-কর্ম্ম শেষ করে।

এদের এই অনুষ্ঠান দেখে মনে হয় আগে অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালে এরা হয়ত মহুয়া বৃক্ষকে সাক্ষী রেখে উক্ত গাছের তলদেশে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হত। এখন হয়ত তৎপরিবর্তে বিবাহ মণ্ডপে মহুয়া বৃক্ষের শাখা পোঁতা হয়। অসুবিধা বোধে সুবিধার সৃষ্টি। এদের এই রীতি অনুযায়ী অনুমান হয় যে বিবাহের পূর্ব্বে এদের কনে বউ প্রথমে মহুয়া গাছকেই পতিত্বে বরণ করত। কারণ, এদের সমাজে বিধবা নারীর পুনঃ বিবাহ মোটেই দোষাবহ নয়। এমনকি স্বামী বর্ত্তমানেও এরা সেই স্বামী ছেড়ে অন্যজনকে পতিরূপে গ্রহণ করে। এই প্রকার বিবাহকে এরা বলে সাঙা। খুব সম্ভব সখা শব্দ থেকে সাঙা কথার সৃষ্টি। পতিকে সখা অর্থাৎ বন্ধুরূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে এদের নারীরা একাধিক স্বামী বরণের অধিকার রাখে। হয়ত পূর্ব্বে এরা মহুয়া বৃক্ষকে বিয়ের আগে পতিরূপে গ্রহণ করত বলেই মেয়েদের এহেন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। যাক্ সে কথা! মানুষ কেন যে বৃক্ষকে বিবাহ করে সেই প্রশ্নের খোলাখুলি আলোচনায় আসা যাক।

মনুষ্য সমাজে বৃক্ষের আসন অটল। উদ্ভিদ মনুষ্য সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আজ কাল নয়, বহুযুগ আগে থেকেই মানুষ বৃক্ষকে অতি সমাদরে সমাজের উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছে। সেই থেকে গাছ-গাছালি আজও মিতালি পাতিয়ে আমাদের সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বৃক্ষ সমাদৃত। বৃক্ষ পূজা মানব সমাজে একটি বিশিষ্ট প্রথা। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। জল, বায়ু ও তাপের মত উদ্ভিদও আমাদের জীবন ধারণের যে বিশিষ্ট উপকরণ তা মানুষ বুঝতে পেরে গাছকে সমাদরে গ্রহণ করেছে। গাছ আছে বলে আমরাও বেঁচে আছি। একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে আমাদের খাওয়া পরা ইত্যাদি সবকিছু সমস্যার সমাধান গাছই করে আসছে। তবু মানুষের অত্যাচার গাছের উপর কম নয়।

বৃক্ষ আপন পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, কাষ্ঠ, সুগন্ধ, রস, সারক্ষার, অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা সকলের কাম্য বস্তু বিতরণ করে। অন্যকে ছায়া প্রদানে নিজেরা রৌদ্র তাপে দগ্ধ হয়। এমন কি ছেদন-কারীকেও ছায়াদানে বঞ্চিত করে না। বৃক্ষের সদ্গুণ অপরিসীম। সেইজন্য মানুষ বৃক্ষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সম্মানিত করেছে। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশের মানব সমাজ বৃক্ষকে বিবাহের প্রতীক রূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে কৃতজ্ঞতায় পরিচয় দিয়েছে। এতে তরুবর ধন্য হয় নি, মানুষ গাছকে মহান ভেবে নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় জাহির করেছে। তাই মানুষ আজ গাছের কাছে মানুষ নামের যোগ্য। যদিও গাছের কাছে মানুষের এহেন আচরণ জুতা মেরে গরু দানের সামিল।

কিন্তু মানুষের দোষ কি? সে যা করে তা তো বাঁচার তাগিদে। জগৎ জোড়া যে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। মানুষ টিঁকে আছে। গাছই টিঁকিয়ে রেখেছে মানুষকে।
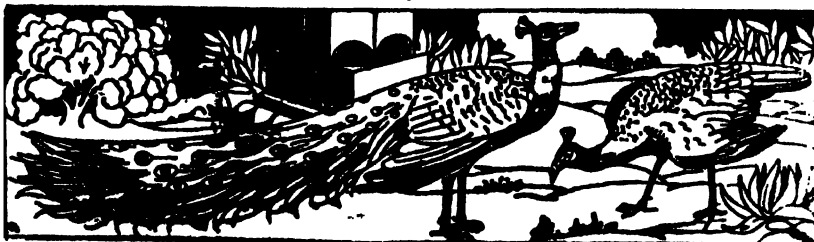
কংগ্রেস স্মৃতি

(চত্বারিংশ অধিবেশন—কানপুর—১৯২৫)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

দেশের কাজ হবে জনসাধারণকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা। যাতে প্রয়োজনীয় শক্তি ও প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করা যায় তজ্জন্য কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য বিশেষ করে চরকা ও খদ্দর জনপ্রিয় করা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য বর্ধন, অস্পৃশ্যতা পরিবর্জন, অবদমিত সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নয়ন এবং মদ্য ও মাদক দ্রব্য পরিহার সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষাদান। এই গঠনমূলক কার্যের অন্তর্গত হবে স্থানীয় সংস্থাগুলি দখল, গ্রামগুলির উন্নতি সাধন, উভয় প্রকারের শ্রমিক সংগঠন, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এবং ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধ্যে সমস্যার সমাধান এবং দেশের জাতীয়, অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের উন্নতি সাধন।

দেশের বাইরে কংগ্রেসের কাজ হবে নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন।

১৯২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বিধানসভায় ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ও স্বরাজ পার্টি প্রস্তাবে পাশ করে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য যে সর্তগুলি গভর্ণমেন্টের নিকট দিয়েছে দেশের পক্ষ থেকে কংগ্রেস তা মেনে নিচ্ছে। এবং যে হেতু গভর্ণমেন্টে এখন পর্য্যন্ত উক্ত সর্তগুলি সম্পর্কে কোন সাড়া দেয়নি অতএব কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক :—

(১) কেন্দ্রীয় বিধানসভায় স্বরাজ্য পার্টি প্রথম সুযোগেই উপরোক্ত শর্তগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করবে এবং যদি ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করা হয় অথবা ঘোষিত সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটী অথবা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী যদি কোন সদস্য মনোনীত করে তা হলে সেই সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের গঠিত স্পেশাল কমিটী সন্তোষজনক মনে না করে তা হলে স্বরাজ্য পার্টী উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে বিধানসভায় কক্ষে গভর্ণমেন্টকে জানিয়ে দেবে যে পার্টি আর পূর্বের মত—বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে কাজ করবে না। বিধান পরিষদে স্বরাজী সদস্যরা অর্থ বিল (ফিনান্স বিল) অগ্রাহ্য করার জন্য ভোট দেবেন মাত্র। এবং তার পরেই তাঁরা আসন ত্যাগ করবেন। সেই সময়ে যদি কোন প্রাদেশিক বিধানসভায় অধিবেশন চলতে থাকে তা হলে সভার স্বরাজী সদস্যগণ তাঁদের আসন ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন এবং স্পেশাল কমিটীর নিকট সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়ে পরবর্তী উপদেশের জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁরা পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থিত হবেন না এবং অনুরূপ ভাবে বিশেষ কমিটীর নিকট রিপোর্ট দেবেন।

(২) আসন শূন্য বলে ঘোষণা করায় বাধা দানের উদ্দেশ্য এবং প্রাদেশিক বাজেট অথবা কোন নূতন ট্যাক্স বসানোর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কাউনসিল অব ষ্টেট, কেন্দ্রীয় বিধানসভায় অথবা কোন প্রাদেশিক বিধানসভায় স্বরাজ্য দলের কোন সদস্য যোগদান করবেন না।

প্রকাশ থাকে যে তাঁদের আসন ত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার পূর্ব্বে বিভিন্ন বিধানসভায় স্বরাজী সদস্যগণ তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিধানসভায় দলের বর্তমান রুল অনুসারে অনুমোদিত কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারবেন।

আরও প্রকাশ থাকে যে, যেকোন বিধানসভায় স্বরাজী সদস্যগণকে যোগদানের অনুমতি স্পেশাল কমিটী দিতে পারবে যদি তাদের মতে কোন বিশেষ ও অদৃষ্টপূর্ব কারণে এই যোগদান অত্যাবশ্যক হয়।

(৩) স্পেশাল কমিটী ১নং উপবিধি অনুসারে রিপোর্ট

পাওয়া মাত্র কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির পারস্পরিক সহযোগিতায় দেশব্যাপী কাজের জন্য একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করবে।

(৪) উক্ত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে উপরের ১ ও ২ নং ধারায় উল্লিখিত কর্মসূচীর বাছাই করা বিষয়গুলি যে নীতি (পলিসি) অবলম্বন করা হয়েছে তৎসম্বন্ধে ভোটারদের শিক্ষাদান এবং পরবর্তী নির্বাচন কি ভাবে কংগ্রেস পরিচালনা করবে তার পথ নির্দেশ এবং কোন ইস্যুর জন্য কংগ্রেস নির্বাচনপ্রার্থী হবে তা পরিস্কার ভাবে জানানো।

প্রকাশ থাকে গভর্ণমেণ্টের কোন অফিসে যোগদান না করার নীতি অপরিবর্তিত থাকবে যতক্ষণ না কংগ্রেসের মতে উপরোল্লিখিত আপোসের সর্ত সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে সন্তোষজনক সাড়া না পাওয়া যায়।

(৫) এই কংগ্রেস এতদ্বারা বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকর সমিতিকে বিধানসভা ও স্ব স্ব প্রদেশ থেকে কেন্দ্রীয় বিধানসভার জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন যথাসম্ভব শীঘ্র করার ক্ষমতা দিচ্ছে।

পূর্বোল্লিখিত এসেমব্লির প্রস্তাব মত মিটমাটের শর্ত সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্পেশাল কমিটী কর্তৃক সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তা অনুমোদন বা বর্জন করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী স্থির করার জন্য অবিলম্বে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করতে হবে।

(৭) উপরোল্লিখিত কারণানুসারে স্বরাজীরা বিধানসভা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কংগ্রেস বা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তন সম্পর্কে স্বরাজ পার্টির সংবিধান এবং তদনুসারে রচিত নিয়মাবলী বিধানসভায় মেনে চলতে হবে।

(৮) ৩ ও ৪ নং উপধারায় উল্লিখিত কাজ আরম্ভ করতে প্রচারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী আবশ্যক বলে বিবেচনা করে তা উক্ত কমিটী ব্যবস্থা করবে। তদতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে তা ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দেশে জনসাধারণের নিকট হতে তোলা হবে।

প্রস্তাবটি ইংরজীতে পাঠ করে তার অনুবাদ হিন্দীতে শোনালেন। তিনি প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন ভাষণ না দিয়ে বললেন যে এই প্রস্তাবের অনেকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হবে সুতরাং তিনি তাঁর বক্তৃতার অধিকার সম্প্রতি রিজার্ভ রাখলেন।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁর বক্তৃতাও রিজার্ভ রাখলেন।

তারপর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাঁর সংশোধন প্রস্তাব বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উপস্থিত করলেন।

তিনি তাঁর সংশোধন প্রস্তাবে মূল প্রস্তাবের পরিবর্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য বললেন :—

এই কংগ্রেস গত ২২শে সেপ্টেম্বর পাটনায়, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী সভায় গৃহীত প্রস্তাবের 'খ' অংশের স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং প্রস্তাব করছে যে বিধান-সভায় ভিতরে এবং বাইরে দেশের স্বার্থে যে সকল রাজনৈতিক কাজ প্রয়োজন হবে তা কংগ্রেস গ্রহণ করে কার্য্যকর করবে এবং এই উদ্দেশ্যে যে অর্থ ও সম্পত্তি প্রস্তাবানুসারে স্পীনার্স এসোশিয়েশনের নিজস্ব বলে ঘোষিত হবে এবং যে সম্পত্তি ও অর্থভাণ্ডার (ফাণ্ড) তার উপর পৃথক ভাবে ন্যস্ত হবে তা ছাড়া—সমুদয় প্রশাসন যন্ত্র ও অর্থভাণ্ড কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজের জন্য নিয়োজিত হবে।

এবং এই কারণে কংগ্রেস নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করছে :—

১। বিধানসভাগুলির কাজ এমন ভাবে চালাতে হবে যাতে শীঘ্র দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সুযোগের জন্য সেগুলি ব্যবহার করা যায়। জাতীয় লক্ষ্যের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন হলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করতে হবে।

২। মূল প্রস্তাবের 'ক' ধারা।

৩। মূল প্রস্তাবের 'খ' ধারার অনুরূপ।

৪। মূল প্রস্তাবের 'গ' ধারা।

মূল প্রস্তাবের (১) উপধারায় পরিবর্তে সংশোধনী প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে :—

এই কংগ্রেস বিধানসভায় স্বরাজী সদস্যদের প্রথম সুযোগেই গভর্ণমেণ্টকে উক্ত সর্ত সম্বন্ধে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে অনুরোধ করার নির্দেশ দিচ্ছে, এবং যদি করা হয় অথবা যদি ঘোষিত সিদ্ধান্ত অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী সন্তোষজনক মনে না করে. তা হলে উক্ত কমিটী—মে মাসের শেষের দিকে এ সম্বন্ধে পন্থা অবলম্বন এবং দেশকে উপদেশ প্রদানের জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করবে।

সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করে মালবীয় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ হিন্দীতে দিলেন।

এম আর জয়াকর ইংরেজীতে প্রস্তাব সমর্থন করে আগামী কালের জন্য বক্তৃতা রিজার্ভ রাখলেন।

তার পর স্বামী গোবিন্দানন্দ (সিন্ধু) একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে মূল প্রস্তাবের মুখবন্ধ থেকে "কিন্তু উপলব্ধি করছে যে দেশ এখন এর জন্য প্রস্তুত নয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে" কথাগুলি তুলে দিয়ে তৎস্থলে "এবং তদনুসারে" কথাগুলি— বসাতে বলা হয়েছে।

শাম্বমূর্ত্তি মশায় এবং টি এস রামভদ্র ওডেয়ার এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

আরও একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন সিন্ধুর কিসেন দাস এইচ লুল্লা মশায়।

এই প্রস্তাবে মূল প্রস্তাবের খ ধারার ৩ নং উপধারায় "আসন" শব্দের পর নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংযোগ করা হোক :—

"এর অন্তর্গত হবে বিধানসভায় এবং তার বাইরের নির্বাচিত অথবা মনোনীত সকল পদ এবং বিধানসভা এবং তার বাইরের কমিটী অথবা কমিশনের সকল পদত্যাগী সদস্যগণকে দেশের আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিয়োজিত করা হবে।

এই প্রস্তাবও যথারীতি সমর্থিত করলেন মহারাষ্ট্রের এন ভি গ্যাডগিল মশায়।

আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্বেই দ্বিপ্রহর ১২টার সময় পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতুবি রইল।

পরদিন ২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের তৃতীয় দিবসের অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হল।

জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সৈয়দ মজিদ বক্স (বাংলা) আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন।

সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে—মূল প্রস্তাবের (গ) ধারায় ২ নং উপধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা গ্রহণ করা হোক :—

কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে জাতীয় দাবি আদায় করা, জাতীয় সম্মানের মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং আমলা-তন্ত্রকে কংগ্রেসের মতে চলতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস—একটি কমিটী গঠন করছে, যার ক্ষমতা হবে, প্রয়োজন বোধ করলে, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সহিত পরামর্শ না করেই যে কোন অবস্থায়, যে কোন স্থানে. যে কোন সময়ে, যে কোন প্রকারে আইন অমান্য আরম্ভ করতে এবং স্থগিত অথবা বন্ধ রাখতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত সমুদয় কংগ্রেস কমিটী ও ভারতের জনগণের উপর বাধ্যকর হবে।

মজিদ বক্স মশায় সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তিনি মূল প্রস্তাবের সহিত, তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবের পার্থক্য ব্যাখ্যা করে শোনালেন। মূল প্রস্তাবে কেবলমাত্র আইন অমান্যের অবস্থা পুনঃ স্থাপনের কথা আছে। তিনি পণ্ডিতজীর প্রস্তাব দৃঢ়তর করতে চান। তিনি চান না তাদের পুনঃ পুনঃ বলা হোক যে দেশ প্রস্তুত নয়। পণ্ডিতজীর ভাষা মডারেট। মডারেটরা একপাল গরুর মত বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজের ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কংগ্রেসী ও স্বরাজীরাও কি সেই রকম হবে। বাংলাদেশ কি আইন অমান্যের জন্য

এখনও প্রস্তুত নয় যখন বাংলার দুইশত যুবক সহ সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য নেতারা কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দীজীবন যাপন করছেন।

বসন্তকুমার মজুমদার মশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জোরালো ভাষায় এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তার পর জয়াকর মশায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি জানালেন যে পণ্ডিত মতি-লাল নেহেরুর মূল প্রস্তাবটি স্বরাজ্য পার্টীরও গৃহীত প্রস্তাব। তিনি মূল প্রস্তাবের বিরোধী। এই কারণে অস্বস্তিকর অবস্থা পরিহারের জন্য এবং শুধু নাগরিকের স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য কেলকার মুঞ্জে মশায়দের সঙ্গে তিনি স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগ করেছেন।

তিনি বললেন যে পণ্ডিত মতিলালের মত ব্যক্তির সঙ্গে মতবিরোধ হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর নিজের পক্ষে এটা খুবই দুঃখপ্রদ।

তিনি বললেন যে তাঁদের সম্মুখে দুটি পথ উন্মুক্ত আছে। হয় তাঁরা কাউন্সিলের কর্মসূচীতে বিশ্বাস করেন অথবা করেন না। উভয় মতই ভাল। তাঁর বন্ধু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং শাম্বমূর্তি মশায়দের কাউনসিলের কর্মসূচীতে বিশ্বাস নেই। অন্যদের তাতে বিশ্বাস আছে। যদি তাঁরা কাউনসিলে প্রবেশ করে তার কাজে আস্থা হারিয়ে থাকেন তা হলে তাঁরা কাউনসিলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যান এবং দেশকে প্রস্তুত করুণ এমন কাজ করতে যার জন্য দেশ প্রস্তুত আছে। অন্যথা দেশকে কাজের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে নিতে হবে। যদি দেশের লোক কাউনসিলে থাকতে চান তা হলে পণ্ডিত মালবীয়জী যা বলেছেন তদনুসারে এথেকে তার শেষ ফলটুকু বের করে নিন।

তিনি তার পর অনুরোধ করলেন যে দেশ কাজের জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে যেন মুখ বন্ধ করে রাখেন। সেটাই হবে সৎ পন্থা।

তিনি আইন অমান্যে বিশ্বাস করেন না। একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটা বোঝেন সেই মহাত্মা গান্ধীর উপর এ বিষয়ের ভার ছেড়ে দিয়েছেন এবং সকলকে তাঁর দ্বারা পরিচালিত হতে বললেন।

তারপর তিনি মূল প্রস্তাব তীব্র ভাবে সমালোচনা করে আসন গ্রহণ করলেন।

সভানেত্রী মহোদয়া তখন যতীন্দ্রমোন সেনগুপ্তকে মূল প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আহ্বান করলেন।

সেনগুপ্ত মশায় মূল প্রস্তাবের সমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে খুব সম্ভব অধিকাংশ প্রদেশে কাউনসিলের নির্বাচনে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। বিধানসভাগুলিতে এবং বিধান পরিষদে স্বরাজ্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে। তা হলে সকলে দেখতে পাবেন যে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে সংবিধান অনুসারে গভর্ণমেন্টের কাজ চালান বন্ধ হয়ে যাবে। যে সকল বন্ধু আইন অমান্য করতে চান তাঁদের তিনি আশ্বাস দিলেন তখন তাঁরা ভারমুক্ত হয়ে কাউনসিল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন। যদি তাঁরা অধিকাংশ প্রদেশে গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারেন তাহলে অন্ততঃ বাংলার স্বরাজীদের পক্ষ থেকে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাঁরা আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তাঁদের নিকট উপস্থিত হবেন না।

তিনি পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়ের সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করে বললেন যে পণ্ডিতজী ঐক্যের কথা বলেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে ঐক্য কিভাবে হবে? ঐক্য তখনই হবে যখন কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্যের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব ভিন্ন মতাবলম্বীরাও মেনে নেবেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেও কংগ্রেসের ভিতর থেকে কাজ করবেন এবং পৃথক দল সৃষ্টি করবেন না।

একজন প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলেন—"গয়ায় কি হয়েছিল?"

সেনগুপ্ত মশায় উত্তর দিলেন যে গয়াতে তাঁরা দল সৃষ্টি করেছিলেন কারণ তাঁরা তাঁদের কর্ম্মসূচীতে বিশ্বাসী ছিলেন।

অনেকেই প্রত্যুত্তরে বললেন যে তাঁরাও তাঁদের কর্ম্মসূচীতে আস্থাবান্। তাঁরা কেবল স্বরাজীদের পদাঙ্কানুসরণ করছেন।

যুক্ত প্রদেশের এস্ কে দত্ত পালিওয়াল হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

অভয়ঙ্কর মশায় মূল প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তীব্রভাবে জয়াকর মশায়কে আক্রমণ করলেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য্য দেশ এবং আজ তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন। পণ্ডিত মালবীয় এবং জয়াকর মশায় যাঁরা লোকমান্য তিলকের জীবিতকালে তাঁর ১০ মাইলের মধ্যেও উপস্থিত থাকতেন না তাঁরা আজ লোকমান্যের মৃত্যুর পরে তাঁর নামের আশ্রয় নিচ্ছেন। লোকমান্য তিলক বেঁচে থাকলে তিনি তাঁদের প্রস্তাব সমর্থন করতেন, এই উক্তি তিলকের নামের অবমাননা।

পণ্ডিত মালবীয় তাঁদের বলেছেন পার্টির প্রতি দৃষ্টি না রেখে দেশের প্রতি দৃষ্টি দিতে। তিনি ভুলে গেছেন যে মহাত্মা গান্ধীর মতে এবং লর্ড বার্কেনহেড ও লর্ড রেডিংয়ের মতে স্বরাজ্য পার্টীই দেশের একমাত্র পার্টি।

তারপর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মশায় মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আবেগময়ী ভাষায় ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন যে অত্যন্ত হৃদয় বেদনার সহিত তিনি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলছেন কারণ এই প্রস্তাব তাঁর নেতা মহাত্মা গান্ধীর মৌন অথবা ব্যক্ত সমর্থন পেয়েছে। গত কাল সন্ধ্যার সময় প্যাটেল মশায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রস্তাবের বিরোধিতার জন্য মনস্থির করার পূর্বে তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি না এবং তিনি তাঁকে মহাত্মাজীর নিকট নিয়ে গেলেন। মহাত্মাজীকে দেখে তাঁর এই ধারণাই হল যে যুগে যুগে মহাপুরুষদের জীবনে যে ট্রাজেডী দেখা গেছে তাঁর মধ্যে সেই ট্রাজেডীর আভাস দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন তিনি মহাত্মাজীকে যে ভাবে দেখলেন; মৌলানা মহম্মদ আলী এবং তিনি যে ভাবে মহাত্মাজীর মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষন করলেন তাতে তাঁর মনে হল যে এই প্রস্তাব গ্রহণ তাঁর পক্ষে গুরুতর মর্মপীড়াদায়ক হবে—তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন মর্মপীড়া।

চক্রবর্ত্তী মশায় প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে সর্ব প্রকার রাজনৈতিক কাজের নীতিই হবে আত্মপ্রত্যয়, তার পরেই বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস দেশের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বরাজপার্টী গভর্ণমেন্টের নিকট যে মিটমাটের শর্ত্ত দিয়েছে তা গ্রহণ করছে ইত্যাদি। তিনি প্রশ্ন করলেন যে এটা কি প্রকারের আত্মপ্রত্যয়ের নীতি যা তাঁদের দৃষ্টি গভর্ণমেন্টেরপ্রতি নিবদ্ধ করছে, তাঁরা কি মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর প্রভাবশালী অনুচর চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গৃহীত অসহযোগের কর্ম্মসূচী দ্বারা চিরকালের জন্য গভর্ণমেন্টের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার নীতি চিরদিনের মত ছুঁড়ে ফেলে দেন নি?

উপসংহারে তিনি বললেন যে প্রতিনিধিরা যেন স্মরণ রাখেন যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় সমস্ত পৃথিবীকে এই ধারণাই দেওয়া হবে যে তাঁরা, আত্মনির্ভরতার নীতি পরিত্যাগ করে সহযোগিতার নীতি—তা যে প্রকারেরই হোক—গ্রহণ করছে।

তারপর লালা লাজপত রায় জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাঃ মুঞ্জে হিন্দীতে পণ্ডিত মালবীয়র সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ মশায় হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বিতর্কে উঠে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি ও হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হলেন। তিনি হিন্দীতে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করলেন। বক্তৃতা শেষ হতেই ইংরেজী ইংরেজী শব্দ উঠতে লাগল।

পণ্ডিতজী বললেন যে এখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া তিনিও ক্লান্ত এবং প্রতিনিধিরাও ক্লান্ত। এই বলে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর পণ্ডিত মালবীয় উঠে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায়ের মন্তব্য যে তিনি দেশবন্ধু ও লোকমান্যকে ভুল-ভাবে মিশ্রিত করেছেন তা ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসের কার্য্য বিবরণীর সাহায্যে খণ্ডন করলেন।

প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়ার সময় সভানেত্রী মহোদয়া জানালেন যে সৈয়দ মজিদ বক্স মশায় সভায় উপস্থিত না থাকায় তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থক বসন্ত কুমার মজুমদার মশায় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছেন।

অনুমতি দেওয়ার পর প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হল।

তারপর কংগ্রেসের অনুমতিক্রমে শ্রীকিষেণ দাস এবং লুল্লা মশায় তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন।

তারপর স্বামী গোবিন্দানন্দের সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হল।

অনুরূপভাবে পণ্ডিত মালবীয়জীর প্রস্তাবও ভোটে অগ্রাহ্য হল।

তারপর বিপুল ভোটাধিক্যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

মূল প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক গিরিধারীলাল জানালেন কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীর অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলি সভানেত্রী মহোদয়া স্বয়ং উপস্থিত করবেন।

তদনুসারে সভানেত্রী মহোদয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি পেশ করলেন :—

এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে কংগ্রেসের সংবিধান নিম্নলিখিত মত সংশোধন করা হোক :—

কংগ্রেসর কাজ যতদূর সম্ভব হিন্দুস্থানীতে পরিচালনা করা হবে। বক্তা হিন্দুস্থানী বলতে অসমর্থ হলে অথবা আবশ্যক হলে ইংরেজী অথবা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা চলবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কাজ সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট প্রদেশের ভাষায় চালান হবে। হিন্দুস্থানীও ব্যবহার করা চলবে।

এই কংগ্রেস বহির্ভারতে ভারতীয়দের স্বার্থ দেখার জন্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং বিদেশী দেশগুলিতে তাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষামূলক প্রচারের জন্য বৈদেশিক বিভাগ খোলার ক্ষমতা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে দিচ্ছে।

কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, বি এফ ভারুচা এবং সোয়েব কুরেশীকে তাঁদের সেবার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে।

কংগ্রেস আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিয়োগ করবে :—

সাধারণ সম্পাদক—(১) ডাঃ এম্ এ আনসারী
(২) শ্রী এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার
(৩) পণ্ডিত কে সন্তানম্

কোষাধ্যক্ষ—(১) শেঠ রেবাশঙ্কর জগজীবন ঝাবেরী
(২) শেঠ যমনালাল বাজাজ

কংগ্রেস আগামী বৎসরের জন্য মেসার্স দালাল ও শাহকে হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করছে।

কংগ্রেস প্রস্তাব করছে কংগ্রেসের আগামী বৎসরের অধিবেশন আসামে হোক।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

তারপর সাধারণ সম্পাদকের ১৯২৫ সালের কার্য্য বিবরণী কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত করা হল।

কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হল।

এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ মুরারীলাল প্রতিনিধিবর্গকে হিন্দীতে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের বহুবিধ ত্রুটির জন্য প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক গনেশ শঙ্কর বিভার্থীও প্রতিনিধিদের নিকট তাঁদের নানা প্রকার অসুবিধা ও ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলকে ধন্যবাদ দিলেন।

প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় অভ্যর্থনা সমিতিকে যথোচিত ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

সর্ব্বশেষে সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহোদয়া তাঁর বিদায়ী অভিভাষণ দেওয়ার জন্য বক্তৃতা মঞ্চের দিকে বিপুল হর্ষধ্বনি ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে অগ্রসর হয়ে মঞ্চে আরোহন করলেন।

প্রথমেই তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের, স্বেচ্ছা-সেবকদের এবং অন্যান্য সেবাব্রতীদের উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর তিনি বললেন যে পৃথিবীর কেবল সভ্যদেশ গুলিতেই নয়, পৃথিবীর অতি আদিম জাতিদের মধ্যেও প্রথা আছে যুদ্ধের প্রাকালে তাদের সমাজের পুরুষ, স্ত্রী ও কবিদের একত্রিত করা। যুদ্ধ যাওয়ার প্রাকালে নারী হস্ত রাজপুতদের তরবারি তীর ধনুক ও বর্শার দ্বারা সাজিয়ে দিত এবং নারীরা তাঁদের পুরুষদের বলতেন যেন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সম্মুখে অস্ত্রাঘাত নিয়ে ফিরে আসেন। পশ্চাতে অস্ত্রাঘাত নিয়ে ফিরে যেন না আসেন কারণ রাজপুত মহিলারা ভীরুকে তাঁদের আত্মীয়রূপে পেতে চান না। চারণগণ যোদ্ধাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অতীতের বীরদের পুরাতন কীর্তির কথা শোনাত যাতে তাঁরা যুদ্ধের সময় মনে বল লাভ করতে পারেন।

তারপর তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে বললেন "বন্ধুগণ, আমি একজন নারী এবং একজন কবি। নারীরূপে আমি আপনাদের বিশ্বাস ও সাহসের অস্ত্র দিচ্ছি এবং আপনাদের সন্তানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেতে আপনাদের অতি উচ্চমানের বীরত্বের ঢাল দিচ্ছি। কবিরূপে আমি মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের সঙ্গীত এবং পদ্মিনীর গান স্মরণ করতে বলছি যে গান তিনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন এই আশা করে যে তাঁর প্রভু, তাঁর ভালবাসার পাত্র যোদ্ধার ক্ষত-চিহ্ন ধারণ করে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবেন। আপ-নারা একজন রমণীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন যে আপনাদের নারীর সম্মান রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে নির্দ্দেশ দিচ্ছে। একজন কবির শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন যে বলছে "আপনারা অতীতের গৌরবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না কারণ আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য উত্তরাধিকার রেখে যেতে হবে। অতীতের গৌরবের উপর আপনাদের ভীরুতা এবং নির্বুদ্ধিতার কলঙ্কের দাগ যেন না পড়ে এবং আপনাদের কাজগুলি যেন স্বাধীনতার অবিস্মরণীয় দান বলে গণ্য হয়। ভবিষ্যৎবংশীয়েরা যেন দাঁড়িয়ে না বলেন হে ভীরু, কেন তোমরা আমাদের দাসত্বের জন্য বিকিয়ে দিয়ে'ছো? যখন উষার আলো দেখা দেবে তখন যেন নারী, কবি এবং ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বলতে পারে, আমাদের পুরুষদের সাহস আমাদের সন্তানদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যেন কবিরা বলতে পারে, যারা আমাদের স্বপ্নের উত্তরাধিকারী তাদের জন্য ভাণ্ডার রেখে গেছে,কবিত্বের স্বর্ণময় ভাণ্ডার। এটা যেন আপনাদের সৌভাগ্য হয়। যেন কবিরা এই স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎবংশীয়দের যুবকরা যারা স্বপ্ন দেখছে এবং যুবতীরা যারা প্রেমের স্বপ্ন দেখছে—তাদের কাছে পৌঁছে দেন। বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করে তিনি অভিভাষণ সমাপ্ত করলেন।

তারপর বন্দেমাতরম্ ও আনন্দধ্বনির মধ্যে কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

২৮শে তারিখ অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধি-বেশন হল, উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নির্বাচিত হলেন :—

মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, লালা লাজপত রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অভয়ঙ্কর, যমনাদাস মেহেতা এবং তিনজন সেক্রেটারী এবং দুজন কোষাধ্যক্ষ।

নির্ব্বাচনের বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি প্যানেলও গঠিত হল।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ সহ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে স্পেশাল কমিটী গঠিত হল :—

বঙ্গদেশ—সাতকড়ি রায়, কিরণ শঙ্কর রায়, তুলসী চরণ গোস্বামী এবং ওয়াহেদ হোসেন।

যুক্তপ্রদেশ—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মৌলানা শওকত আলী এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়।

পঞ্জাব—লালা দুনিচাঁদ, ডাঃ সত্যপাল, সরদার শার্দুল সিং এবং আগা সফদার।

তামিল নাড়ু—এস্ সত্যমূর্তি, আর কে সম্মুখম্ চেট্টি এবং ডাঃ বরদা রাজালু নাইডু।

অন্ধ্র—প্রেমস্বামী এবং গোপাল কৃষ্ণায়া।

বিহার—মহম্মদ সফী, ব্রিজকিশোর প্রসাদ এবং বাবু কিষণ সিং।

আসাম টি ফুকন।

মহারাষ্ট্র—এন সি কেলকার এবং ডি ভি গোখলে।

বর্মা—মদনজিত।

বেরার—এম্. এস্ আনে।

হিন্দুস্থানী মধ্যপ্রদেশ—গোবিন্দ দাস।

মারাঠী মধ্যপ্রদেশ—ডাঃ মুঞ্জে।

দিল্লী—হাকিম আজমল খাঁ।

কেরল—কৃষ্ণ মেনন।

সিন্ধু—চৈতরাম।

উৎকল—বি দাস।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর আমরা কয়েকজন বাংলার প্রতিনিধি কানপুরে সহর পরিদর্শনের জন্য ২।৩ দিন কানপুরে অবস্থান করলাম। কানপুর যুক্ত প্রদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। এখানে বহু মিল ও ফ্যাক্টরী আছে। শহরও বেশ বড়।

সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি মণ্ডিত স্থানগুলি আমরা বিশেষ করে দেখলাম। যে কুপে সিপাহীরা ইংরেজদের নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল সেটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্মরণ চিহ্ন হিসাবে রেখে দিয়েছে। কূপের অভ্যন্তরে আবদ্ধ-দৃষ্টি ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর একটি বেদনা-কাতর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। গঙ্গাবক্ষে যেখানে নানা সাহেবের সৈন্যাধক্ষের আদেশে ইংরেজ মহিলা ও শিশু বোঝাই নৌকা বন্দুকের গুলিতে নিমজ্জিত হয়েছিল সেই স্থানটি আমাদের গাইড বিশেষ করে দেখাল।

একদিন কানপুরের কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম নেতা নানা সাহেবের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। দেখলাম যে প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। কেবলমাত্র প্রাসাদের ভিত্তি অবশিষ্ট আছে।

কানপুর সহর দর্শনের পর কলকাতায় ফিরে এলাম।

ক্রমশঃ

মন্থরা হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অযোধ্যাধিপতি প্রজারঞ্জক রাজাধিরাজ রামচন্দ্র যেদিন পুণ্যসলিলা সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন পূর্বক পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার অভিন্নহৃদয় মহাযশা অনুজদ্বয়,—ভরত ও শত্রুঘ্ন,—তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মর্তলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেদিন মহানগরী অযোধ্যার এবং নগরোপকণ্ঠস্থিত নন্দিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা জনগণ সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিবার জন্য দলে দলে নগরসীমান্তে নদীতীরস্থ বিশাল প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিল। সেই সাগরসদৃশী মহতী জনতার মধ্যে ইতস্ততঃ গো এবং অশ্বযোজিত উত্তুঙ্গধ্বজশোভিত বিচিত্র রথসমূহ এবং মেরু পর্বত তুল্য মহাকায় গজযূথ দৃষ্ট হইতেছিল। সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় সেই সকল যানবাহনের উচ্চ মঞ্চে আসীন বা দণ্ডায়মান হইয়া যাহারা সেদিন রামতিরোধান দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল তাহারা, অর্থাৎ সামন্ত রাজ, রাজপুরুষ ও ধনিবৃন্দ,—সকলেই সকরুণ নেত্রে নদীর দিকে চাহিয়া আপনাদিগের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল। তদ্ভিন্ন ভূমিতলে দণ্ডায়মান এবং প্রান্তর-পার্শ্বস্থ প্রাসাদ ও বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষদেশে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ পুরবাসী—ধনী নির্ধন ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে শোকার্ত নরনারী নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল। বিজয়, মধুমত্ত, মঙ্গল, সুমাগধ প্রভৃতি শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন পারিষদবৃন্দ প্রভুবিরহিত জীবন অসহ্য বিবেচনা করিয়া নিজনিজ আত্মীয়গণের নিকট বিদায় লইয়া একে একে সলিল প্রবেশ করিলেন। ছত্রধারিণী সুসঙ্গতা, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী বাসবী, বেত্রবতী বসুধারা প্রভৃতি নৃপতির একান্ত অনুগতা অনুচরীবৃন্দ এবং সারথি সুমন্ত্র, দৌবারিক অরিন্দম, অঙ্গসংবাহক সোমদত্ত, সূপকার শীতল প্রভৃতি রামগতপ্রাণ অনুচরগণও স্ব স্ব গলদেশে রজ্জুবদ্ধ কলস লম্বিত করিয়া অকম্পিত পদে তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিল। মাতৃগণ পূর্বেই গতাসু হইয়াছিলেন, বর্ষীয়সী দশরথপত্নী যে কয়জন তখনও জীবিতা ছিলেন তাঁহারা উর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতি রাজকুলবধূদিগের সহিত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অযোধ্যার পুরনারী এবং পার্শ্ববর্তী জনপদবাসিনীদিগের মধ্যেও তুমুল ক্রন্দন-কোলাহল উত্থিত হইল। লোকনয়নাভিরাম কমললোচন রামচন্দ্রের নদীমধ্যে অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সরযূর উভয়তীর হইতে শত শত নরনারী উন্মত্তের মতো নদীজলে লম্ফপ্রদান করিয়াছিল. তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর উঠে নাই। কেবল ভীরু এবং অব্যবস্থিতচিত্ত কয়েক ব্যক্তি অল্পক্ষণে পর্যুদস্ত হইয়া অর্থাৎ জলে হাবুডুবু খাইয়া তীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেই সুবিপুল জনসমাবেশের মধ্যে সকলেই যে সেদিন নিঃস্বার্থ স্নেহ বশে শোকজ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কতিপয় মোদক প্রভৃতি অন্ন ব্যবসায়ী বিবিধ জাতীয় ক্ষীরনারিকেলগর্ভ লড্ডুক, আমিক্ষীয় অর্থাৎ ছানার দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন, দধি, পিষ্টক, তৈলভর্জিত পর্পটিকা, তুষার-শীতলিত মধুর পানীয় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সেদিন বহু দূরাগত ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণানিবারণ পূর্বক যুগপৎ ধর্ম ও অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল। অনেক লঘুহস্ত চতুর ব্যক্তি অসতর্ক দর্শকদিগের গ্রন্থিচ্ছেদন দ্বারা এবং অনেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হারকুণ্ডল পাদুকাদি সংগ্রহ দ্বারা লাভবান্ হইয়াছিল। তদপেক্ষা চতুর সন্তরণাভিজ্ঞ কয়েক ব্যক্তি সরযূ জলতলে সন্তরণ করিয়া বহু সলিল-

নিমজ্জিত নরনারীর বস্ত্রালঙ্কার হরণ পূর্বক ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরে গিয়া তীরে উঠিয়াছিল এবং যথাকালে ও যথাস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের কেয়ূর, শত্রুঘ্নের কটিনিবদ্ধ কৃপাণ, ভরতের মণিহার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন আর কাহারও স্বেচ্ছামৃত্যু দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না তখন নগরবাসী অধিকাংশ নরনারী সাশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিল। পল্লীবাসী ও বাসিনীরাও তাহাদের শূন্য দধিভাণ্ড ও শক্তুকলসাদি মস্তকে ধারণপূর্বক, কেহ আত্মীয় প্রতিবাসীদের ডাকাডাকি করিতে করিতে, কেহ বিভিন্ন ব্যক্তির অবিবেচনার জন্য নিন্দাবাদ করিতে করিতে কেহ বা পুত্র কন্যা বা পত্নী হারাইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল। কেবল কয়েকজন তপস্বী ধ্যানধারণার্থ নির্জন নদী-সৈকতে নীরবে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই ঘটনাস্থল প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল।

সেদিন যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি শোকবশে মোহ-গ্রস্ত না হইয়া নির্মম চিত্তে নিজ নিজ কর্তব্যসম্পাদনে রত ছিলেন তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু বংশের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ বহু পূর্বেই কুশ-লব, এবং অন্যান্য রাজান্তঃ-পুরিকাদিগের অবসন্ন দেহ বিভিন্ন শিবিকা, দোলা বা রথে স্থাপন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিলেন, মহর্ষি জাবালি সমাগত সামন্ত নৃপতি, অবশিষ্ট রাজ সভাসদ্‌ও মুনিগণকে নানা প্রকারে সান্ত্বনাদান পূর্বক গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন; কেবল ভবিষ্যতে 'দুর্মুখ' নামে অভিহিত সভাসদ্ ভদ্র শেষ পর্যন্ত যতদূর সম্ভব সেই বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধানের জন্য সানুচর সচেষ্ট ছিলেন। অনেকগুলি জানপদ নারী ও শিশুকে আত্মীয়হস্তে এবং কতিপয় দুর্বৃত্তকে রাজ-পুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি সেদিন বহুজনের আশীর্বাদ এবং অল্প কয়েকজনের শাপ ভাজন হইয়াছিলেন। সর্বশেষে কয়েকটি আত্মীয়দলচ্যুত রোরুদ্যমান শিশুর ভার নগরপাল বসুদত্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি অল্প কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে গৃহাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন গৃহ হইতে তখন রোদনশব্দ শ্রুত হইতেছিল। নির্বাক্ ও নিরশ্রুনয়ন অমাত্য ভদ্রকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে কি শোকানল জ্বলিতেছিল তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। মশালালোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পথিমধ্যে কয়েকজন নগরবাসী 'ঐ সেই পাপিষ্ঠ ভদ্র' বলিয়া ধিক্কার দিল। জনৈক পথচারিণী পুরমহিলা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মন্তব্য করিলেন, "অষ্টকুণ্ডীর পুত্রকে যমরাজ কি ভুলিয়া গিয়াছেন?" অপর কোনো দয়াবতী বলিলেন, "মাতা জানকীর যত দুঃখের মূল এই দগ্ধ-মুখকে কেহ গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল না কেন?" সঙ্গিনী বলিলেন, "আহা, তাহা হইলে যে সরযূ শুখাইয়া যাইত।" আর একজন আশ্বাস দিলেন, "যমরাজ নূতন নরক নির্মাণ করিতেছেন, শেষ হইলেই উহার ডাক পড়িবে। চিন্তা কি?"

মশালালোকে পথ দেখাইয়া যে প্রতিবেশীরা অগ্রে চলিতেছিলেন তাঁহারা একে একে স্ব স্ব গৃহে প্রবিষ্ট হইলে ভদ্র অন্ধকারে নিজ গৃহের দ্বারদেশে পৌঁছিয়া দেখিলেন কপাট রুদ্ধ রহিয়াছে। বারংবার করাঘাত করিলেন, পত্নী দাসী এবং পুত্রের নাম, ধরিয়া ডাকিলেন। প্রায় দুই দণ্ড কাল অপেক্ষার পরেও যখন কেহ দ্বার খুলিল না তখন ভদ্র বুঝিলেন, তাঁহাকে আর সেই গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া পত্নী সুতপার ইচ্ছা নহে, সেই জন্যই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে না। তাঁহাকে সীতা নির্বাসনের কারণ স্বরূপ জানিয়া বাড়ীর লোকেও ঘৃণা করিত, ইতঃপূর্বে অনেকদিন অনেক কঠোর কথা সে-জন্য তাঁহাকে পত্নীর মুখে শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু নিজ গৃহ প্রবেশে বাধাপ্রাপ্তি এই তাঁহার প্রথম। শোকে, ক্রোধে সুতপার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, এখন তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত না ঘটাইয়া পথে রাত্রিযাপনই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় ভদ্র রাজমার্গে অবতরণ করিলেন। রাজাজ্ঞায় নিশীথ ভ্রমণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অদ্য অবস্থা একটু অন্যরূপ। বাহিরের অন্ধকারের সহিত

অন্তরের শোক ও অপমানের অন্ধকার মিশিয়া যেন পদে পদে তাঁহার পথরোধ করিতে লাগিল। পথের দুইপার্শ্বে আপণ-শ্রেণীর দ্বার অর্গলাবদ্ধ, এখানে ওখানে দুই-চারিজন নগরবাসী নিজ নিজ গৃহদ্বারে বা দীপহীন অলিন্দে বসিয়া নিম্নস্বরে রামকথা আলোচনা করিতেছে। সীতাপবাদে রামনিন্দা শুনিয়া একদিন রামভক্ত অমাত্যের কর্ণকুহর জ্বলিয়া যাইত, তাঁহার অপরাধ তিনি সে-কথা প্রভুর কল্যাণ কামনায় তাঁহার শ্রুতিগোচর করিয়াছিলেন। আজ পথে পথে সতীসীমন্তিনী সীতা দেবীর এবং আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা তাঁহার কর্ণে মধুবর্ষণ এবং অন্তরে কৌতুক সঞ্চার করিতে লাগিল। একদা এই অব্যবস্থিতচিত্তদের প্রশংসা লাভের জন্য তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিজের প্রতিও এতদিন পরে ধিক্কার জন্মিল। অল্পক্ষণ পরেই চারিদিক নিঃশব্দ হইয়া গেল, পথে আর দ্বিতীয় পথিক দৃষ্টি হইল না।

সেদিন রাত্রিতে দ্বাদশযোজনায়তা মহানগরী অযোধ্যার কোনো গৃহে প্রদীপ জ্বলে নাই। বিচিত্র কারুকার্য মণ্ডিত কপাটতোরণান্বিত শত সহস্র সপ্তভূমিক অট্টালক এবং সুবিশাল শিখরসমন্বিত স্বর্ণচূড় মন্দির-সমূহ অন্ধকারে নিঃশব্দ নির্জন গিরিশ্রেণীর মতো পথে পথে দণ্ডায়মান ছিল। সেদিন নগরীর শত শত নাট্যশালার একটিতেও নৃত্যগীত হয় নাই, এমন কি কোনও দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধ্যারতি পর্যন্ত হয় নাই। শোকাচ্ছন্ন নগরীর বায়ু চন্দন, অগুরু ও পুষ্প গন্ধহীন; জনহীন পথে বিড়ালেরা সঞ্চরণ করিতেছে, কদাচিৎ কোনও পেচকের কর্কশ কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতেছে। যে বিদগ্ধ নাগরিক এবং নাগরিকারা অন্যদিন গৃহশীর্ষে বীণাবেণু মৃদঙ্গ মন্দিরারবের সহিত আপনাদের গীতধ্বনি মিলাইয়া নিশাকাশ মুখরিত করিয়া রাখিত আজ তাহারা শোকে মুহ্যমান অথবা দিবসের উত্তেজনার ক্লান্তিতে উপস্থিত সুখসুপ্তির প্রসাদে নীরব। উদ্দেশ্যহীন ভাবে পাদচারণ করিতে করিতে অমাত্যপ্রবর ভদ্র রাজ প্রাসাদাবলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহাপথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় কালিমায় আবৃত শাল. তমাল, চন্দন, চম্পক, পুন্নাগ, কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষবীথিকাশোভিত সুবিস্তীর্ণ উদ্যানমধ্যে রাজা এবং রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের উত্তুঙ্গ এবং বিবিধ ভাস্কর্য ও অলঙ্করণে সমৃদ্ধ সৌধরাজি বিকীর্ণ-মূর্ধজা বিধবার মতো নিঃশব্দ হাহাকারে আকাশ আচ্ছন্ন করিতেছিল। সেই উচ্চাবচ পুররাজির মধ্যে সর্বোচ্চ ও বিশালতম সৌধ রামভবনের সমীপবর্তী হইয়া ভদ্র বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন তোরণদ্বার উন্মুক্ত, অথচ দ্বারে প্রহরী নাই, নিকটে দূরে জনপ্রাণী নাই। সপ্তভূমিক মহাপুরীর শতাধিক কক্ষের মধ্যে একটিরও পাষাণ জালায়নে আলোকরশ্মির চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। কেবল একটি শ্বেতবসনা বৃদ্ধা নারীর ছায়ামূর্তি একবার যেন প্রাসাদের ত্রিতলের একটি বাতায়নে দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। সীতানির্বাসনের পর হইতে রামচন্দ্রের প্রাসাদে সন্ধ্যার পর রাজমাতৃগণ ভিন্ন কোনও স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, ভদ্র মনে করিলেন দশরথের কোনও অন্তঃপুরিকা হয়তো রাম-বিয়োগ দুঃখ অপনোদনের জন্য রামস্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন। সহসা প্রাসাদশীর্ষে চন্দ্রোদয় হইল, তরল জ্যোৎস্নায় চারিদিক স্বপ্নময় হইয়া উঠিল, সৌধচূড়ার স্বর্ণকলসটি দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো জ্বলিয়া উঠিল। সেই দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অমাত্য নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন, প্রাসাদরক্ষার ভার এ রাত্রির মাতা তাঁহাকেই লইতে হইবে। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে ভদ্রের কোনও আহার্য উদরস্থ হয় নাই, বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; নিরুপায় অমাত্য কটিবন্ধের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া আপাততঃ তাহাকে দমিত করিলেন। রাজভবনের সম্মুখস্থ পথের অপর পার্শ্বে তরুবীথিকার ছায়ায় কোষবদ্ধ তরবারি ভূতলে রাখিয়া তিনি রাত্রিযাপন করিতে বসিলেন।

সভাসদ্ ভদ্রের দৃষ্টিগোচর না হইলেও সেদিন সেই অন্ধকার রাজপুরীতে সেই সময়ে মানুষের অভাব ছিল

না। তোরনদ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরীদের বাসস্থান, সেখানে শতাধিক প্রহরী দীর্ঘকাল রোদনের পর অবসন্ন হইয়া অথবা শোকোপনোদনের জন্য মাধ্বী, গৌড়ী, তাড়ী প্রভৃতি সুরাপান করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। পিতৃবিয়োগকাতর কুশ এবং লব সরয়ূতীর হইতে ফিরিয়াই অভুক্ত অবস্থায় প্রাসাদের সপ্ততলে তাঁহাদের নিজ নিজ শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। উর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি নিজ নিজ প্রাসাদে গিয়া দুঃসহ শোকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, রামতনয়দের সান্ত্বনাদান দূরের কথা,— নিজ নিজ তনয়দিগকে সান্ত্বনাদানের শক্তিও তাঁহাদের ছিল না। রামভবনের অন্যান্য তলে বিভিন্ন কক্ষে রামের আশ্রিত শত শত পৌরজন এবং পোষ্য আত্মীয় কুটুম্ব রামের শোকে এবং নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে অকালে নিদ্রাগত হইয়াছেলেন। রন্ধনশালায় সুপকারেরা রন্ধন করে নাই, ভোজনশালায় কিঙ্করগণ অন্নপাত্র ও আসন দেয় নাই, সুতরাং সকলকেই সে রাত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অভুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। কেবল কয়েকটি ক্ষুধাতুর বৃদ্ধ গোপনে সঞ্চিত লড্ডুক, শক্তু বা চিপিটক দুই এক গ্রাস খাইয়া কোনও মতে পিত্তরক্ষা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই যথোচিত শয্যায় শায়িত এবং নিদ্রাগত। নিঃসঙ্গ প্রেতের মতো কেবল দুইটি সঞ্চরমান মনুষ্যদেহী সেই সময়ে সেই বিশাল প্রাসাদে সম্পূর্ণ সজাগ এবং স্বার্থসাধনে সচেষ্ট ছিল। একজন দশরথ-মহিষী কেকেয়ীর কেকয়দেশীয়া কুখ্যাতা পরিচারিকা মন্থরা, আর একজন রাজানুগৃহীত স্বর্ণকার এবং কোশল রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পী বিশাখদত্ত। একজন সম্মুখের পথে এবং অপরজন উদ্যানমধ্যস্থ গুপ্তপথে পুরী প্রবেশ করিয়াছিল, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কেহ কাহারও নয়নপথবর্তী হয় নাই, তবে তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্যই যে সাধু ছিল না তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন অযোধ্যায় লক্ষ লক্ষ পুরবাসীর মধ্যে এই দুইজন কেবল সরয়ূতীরে না গিয়া রাত্রির জন্য শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল।

শৈশবে পঞ্চনদ প্রদেশের জলবায়ুতে বর্ধিত হওয়ায় মন্থরার শরীরে এখনও শক্তি ছিল, দণ্ডের সাহায্য ভিন্নই সে চলিতে ফিরিতে এবং সোপান আরোহণ ও অবরোহণ করিতে পারিত; কিন্তু তাহার কুব্জ সমন্বিত ন্যুব্জ দেহ জরার ভারে আরও ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছিল, স্বভাব-কুৎসিত মুখ বলিরেখান্বিত এবং শীর্ণ হইয়া আরও বীভৎস দেখাইতেছিল। শেষবয়সে করুণাময় রামচন্দ্রের দয়ায় তাহার অভাব বলিতে কিছুই ছিল না, কৈকেয়ী দেবীর দেহান্তের পর কাজ বলিতেও কিছু ছিল না। রাজযোগ্য আহার্য পানীয়, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সুসজ্জিত বাসকক্ষ ভিন্ন পরিচর্যার জন্য একজন সেবাদাসীর ব্যবস্থাও তাহার জন্য হইয়াছিল, তথাপি তাহার মনে একদিনের জন্যও শান্তি নাই। অনুতাপ? মন্থরা অনুতাপ করিবে কিসের দুঃখে? সে যাহাদের ভালবাসিয়াছিল, যাহাদের কল্যাণ চাহিয়াছিল—তাহারা তাহার সুপরামর্শের মূল্য বুঝিল না, করতলগত ঐশ্বর্য কাজে লাগাইল না,—সেজন্য,অনুতাপ করিবে কেন? যে যাহার কর্মফল ভোগ করিয়াছে,তাহার কি দোষ? সীতা অলোকসামান্য রূপ লইয়া চিরদুঃখিনী হইয়াছেন, তবু তিনি রামের মতো স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম পাইয়াছিলেন, যত অল্পদিনের জন্যই হউক তাঁহাকে লইয়া ঘর করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; আর মন্থরা? অলোকসামান্য কুরূপ লইয়া সে চিরদুঃখিনী হইয়াছে। দাসীর কন্যা দাসী, অযৌবন পুরুষের প্রেমে বঞ্চিতা; সকলের ঘৃণা ভিন্ন সে যে জীবনে কিছুই পাইল না। একজনের জন্য দেশশুদ্ধ লোক হাহাকার করিতেছে, আর একজন মন্দভাগিনীর দুঃখের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না। এই তো সংসারের বিচার। মূর্খ কৈকেয়ী,মূর্খ ভরত, ততোধিক মূর্খ রাম। অজ্ঞ মূঢ় কয়েকটা প্রজার নিন্দা-নিঃসারিণী রসনা ছিন্ন না করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রীকে বনে বিসর্জন দিয়া তাহার বিরহে শেষ জীবনটা কি কষ্টই না পাইল। তাও বলি, নির্বাসন দিয়াছিলি তো দিয়াছিলি, ব্রহ্মচারী হইয়া দিন কাটাইবার কি প্রয়োজন ছিল? রাজচক্রবর্তী রাজার

কখনও সুন্দরী স্ত্রীলোকের অভাব হয়? পিতার কোনও গুণই ছেলেটা পাইল না, কেবল তাহার অন্তঃপুরের ছাগী শূকরীর পাল পুষিয়াই মরিল। যাক, মন্থরার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, উহারা সকলেই মরিয়াছে। সেজন্য সে দুঃখিত নহে, সে আর কাহাকেও চাহে না। যে ভরতকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, যাহার উন্নতির জন্য সে অবিনশ্বর দুর্নাম কিনিয়াছে সে ইদানীং পথে দেখা হইলে কথা কহিত না, পাশ কাটাইয়া যাইত। শত্রুঘ্ন তাহাকে যে অপমান করিয়াছিল সে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না, মন্থরা আজও ভুলিতে পারে নাই। কৈকেয়ী তাহার বুদ্ধিতে চলিয়াই একদিন মূঢ় দশরথকে করায়ত্ত করিয়াছিল, কৌশল্যাদি সপত্নীগণকে যথোচিত অপমান করিয়া পদতলে রাখিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত তাহারই পরামর্শে স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। আবার পুত্রের ভর্ৎসনায় সহসা তার মতি পরিবর্তন হইল একরাত্রে ডিগবাজী খাইয়া সে সাধ্বী সাজিয়া বসিল, কৌশল্যার এবং রামের চরণে দাসখত লিখিয়া দিল। ইদানীং সেও,—তাহার কন্যার বয়সী কন্যাসমা প্রভুনন্দিনীও—তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না, একমহলে থাকিয়াও কেশরচনা বা অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিত না। ইহাকেই বলে যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে তস্কর। মন্থরার মায়া স্নেহ মমতা সবই একদিন ছিল, বড়ো বেশী ছিল বলিয়াই সেগুলো ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিতে বড়ো বেশী কষ্ট হইয়াছে, বুকের মধ্যে তাহার জ্বালা যেন জুড়াইতে চাহে না। আজ ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নাই রঘুবংশের উপর,—কেকয়রাজ অশ্বপতির বংশের উপর, মানব সমাজের উপর, বিশ্বের উপর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যদি কেহ কোথাও থাকেন তবে তাঁহার উপর তীব্র বিদ্বেষ ভিন্ন মন্থরার অন্তরে আজ আর কিছু নাই। যাঃ নিশ্চিন্ত। রাম নাই, ভরত নাই, অন্তঃপুরের প্রবেশপথে প্রাসকার্মুক ও বিবিধ শস্ত্রধারী প্রহরিগণ এবং বিভিন্ন কক্ষদ্বারে কাষায়-বসন পরিহিত বেত্রধারী অন্তঃপুররক্ষকগণ নাই। সর্বত্র মৃত্যুর নিস্তব্ধতা, সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা। রামের প্রাসাদেরও কি আজ রাত্রে এই অবস্থা? একবার দেখিয়া আসিলে হয় না? ক্ষমার অবতার রামচন্দ্রের কিছু ঋণ শোধ করিয়া আসিলে হয় না? ত্রিতলের বিরাট চিত্রশালাটি মনে পড়িল, রামের শয়নকক্ষে যাইবার পথে সেখানে ঘরে ঘরে কত ছবি, কত মূর্তি! মাঝের একখানি প্রকাণ্ড ঘরের চারিদিকের দেয়াল জুড়িয়া রামায়ণ চিত্র। সেই ভিত্তিচিত্রখানির মধ্যে একটি অংশে মন্থরার কুমন্ত্রণা বর্ণিত আছে। প্রথমে রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া কৈকেয়ী মন্থরাকে কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া দিতে যাইতেছেন, আর সে চক্ষু পাকাইয়া "মূঢ়ে" বলিয়া তর্জন করিতেছে, তারপর কৈকেয়ীর ভূমিশয্যায় রোদন, দশরথের বরদান। সমস্তই জীবন্তবৎ মূঢ় শিল্পী মন্থরার সেই বয়সের অবিকল প্রতিকৃতি আঁকিয়া তাহার কলঙ্ক অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সেই পাপ দূর করিবার আজই সুযোগ। এই পাপপুরী ত্যাগ করিবারও এমন সুযোগ আর হইবে না। একবার ভয় হইল, বৃদ্ধ বয়সে এই নিরাপদ্ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে? ভরতের পুত্ররা তক্ষশিলায় এবং পুষ্কলাবতীতে তাহাকে আশ্রয় দিবে বলিয়া মনে হয় না, কেকয়েও তাহার স্থান হইবে না মনে হয়। তাহাতে কি হইয়াছে? তাহার বহু মণিরত্ন আছে, বহু স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত আছে, তাহার সাহায্যে কোনো দূর দেশে কোনো নিভৃত গ্রামে একটি পর্ণকুটীর গড়িয়া সে এখনকার চেয়ে শান্তিতে থাকিতে পারিবে না? না পারে, না হয় মরিবে, সে মৃত্যু তাহার বর্তমান জীবনের চেয়ে গৌরবেরই হইবে। মনস্থির করিয়া মন্থরা সাজিতে বসিল, তাহার অলঙ্কারগুলির জন্য পেটিকা বহিয়া বেড়ানো অপেক্ষা সেগুলি শরীরে যেখানে যেটি ধরে পরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হইল। সে শুনিয়াছিল রামরাজ্যে হিমালয় হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত কোন সুন্দরী রত্নভূষিতা হইয়া একাকিনী ভ্রমণ করিলে কেহ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে না। আজ রামরাজত্বের শেষদিন, এখনই কিছু সে নিয়মের ব্যত্যয় হইবে না। বহুদিন

পরে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্থরা সাজিতে বসিল। কেয়ূর, কঙ্কণ, মণিহার কুণ্ডল,কিরীট, নূপুর, চীনাংশুক,—পেটিকা খুলিয়া একটির পর একটি বাহির করিল। না, রামনির্বাসনের দিন কৈকেয়ী তাহাকে যে বিচিত্র বসন ভূষণে সাজাইয়াছিলেন, কয়েকদিন পরেই শত্রুঘ্নের প্রহারে যেগুলি ছিন্নভিন্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুই আর ব্যবহারযোগ্য নাই। চৌদ্দবৎসর পরে রামবনিতা সীতাদেবী যখন স্বামীর সহিত অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন তখন দয়াময়ী ক্ষমাবতী তিনি স্বহস্তে মন্থরাকে এগুলি উপহার দিয়াছিলেন। এতদিন সে ঘৃণায় এগুলি স্পর্শ করে নাই, আজ প্রয়োজনবোধে একে একে যথাস্থানে পরিল। অন্ধকারে প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া সে অরণিঘর্ষণ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিল, একখানি স্বর্ণ দর্পণে মুহূর্তকাল নিজের ছায়া দেখিল। কি কুৎসিত দৃশ্য। ক্ষোভে লজ্জায় করধৃত দর্পণ মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দীপ নিভাইয়া সে অনেকক্ষণ ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিল। শৈশবের যৌবনের বার্ধক্যের অনেক দুঃখ সঞ্চিত ছিল, অনেক ব্যথা অপমানের স্মৃতি, রোদনের কারণ,—পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল। মন্থরা কখনও লোকচক্ষুর সমক্ষে কাঁদিতে পারিত না, আত্মাভিমানে বাধিত। আজ তাহার পরিচারিকার অনুপস্থিতির সুযোগে রাজপুরীর নির্জন কক্ষে তাহার বহুদিনের অবরুদ্ধ অশ্রুস্রোত বাঁধ ভাঙ্গিয়া নামিল। পাষাণ কুট্টিমে মাথা কুটিতে কুটিতে সে বলিতে লাগিল: "একবার যদি সুযোগ পাইতাম, দরিদ্রতম গৃহস্থের গৃহে একদিনের জন্য যদি পতিপুত্র লইয়া সংসার করিতে পারিতাম তবে নারী জন্ম সার্থক হইত, পৃথিবীর লোক আমার অন্য মূর্তি দেখিত। দয়ায় ক্ষমায় প্রেমে আমি মর্তে স্বর্গ রচনা করিতাম।"

প্রায় দুইদণ্ডকাল কাঁদিয়া মন্থরা অশ্রুকলুষিত আরক্ত নয়ন মুছিয়া উঠিয়া বসিল, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। বাছিয়া বাছিয়া মূল্যবান্ মণিমুক্তাগুলি একটি থলিতে ভরিয়া আপন কঞ্চুলিকার অভ্যন্তরে কুব্জের উপরে স্থাপন করিয়া কঞ্চুলিকা আঁটিয়া পরিল, চিরদিনের সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ আর একটি দীর্ঘ থলি কটিদেশ বেষ্টন করিয়া জড়াইয়া বাঁধিল। আবার দীপ জ্বালিল দীপ হইতে একটি উল্কা জ্বালাইয়া লইল। কৈকেয়ী ভবনের ত্রিতল হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া দেখিল প্রহরীদের কক্ষে কেহ নাই, ভিত্তিগাত্র-বিলম্বিত একটি লঘুভার পরশু খুলিয়া লইয়া সে উদ্যানপথে রামভবনের দিকে চলিল। কিছুদূর অন্তর প্রাচীর, প্রতি প্রাচীরে অন্তঃপুরিকাদের যাতায়াতের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সংলগ্ন ছিল। মন্থরার নিকট কুঞ্চিকাগুচ্ছ থাকায় রামভবনে প্রবেশের পক্ষে তাহার কোন অসুবিধা হইল না। সেখানে প্রশস্ত চত্বরে পৌঁছিয়া দেখিল জনপ্রাণী নাই। সে সোপান আরোহণ করিয়া ক্রমে ত্রিতলে উঠিল। কটিতে স্বর্ণভার, পৃষ্ঠে মণিরত্ন ভার, হস্তে পরশুর ভারও নগণ্য নহে, তথাপি মন্থরা কোন ভারকেই ভার বলিয়া গ্রাহ্য করিল না, ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিল। তখন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, বক্র প্রস্তরনির্মিত জালায়ন পথে তাহার স্নিগ্ধরশ্মি গৃহভিত্তিতলে শতধারায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন্থরা হাসিল, প্রকৃতির কোনো দাক্ষিণ্যেই আজ তাহার মন ভুলিবে না, আজ সে প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। আঘাতের পর আঘাতে ভিত্তিচিত্রের মন্থরা কৈকেয়ী সংবাদের চিত্র নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়াই তাহার তৃপ্তি হইল না, সে দশরথ এবং কৌশল্যার চিত্র যেখানে যতবার পাইল পরশুপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া উল্কাশিখা দ্বারা তাহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিয়া দিল। সীতাদেবীর এবং রামচন্দ্রের চিত্রেও মাঝে মাঝে সে কুঠারাঘাত করিল বটে কিন্তু কি জানি কেন তাঁহাদের মুখচ্ছবি বিকৃত করিতে আজিও তাহার হস্ত উঠিল না। সীতাহরণ চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার শুধু ভাবিল, সীতা কি ভাগ্যবতী। আমাকে কেহ যদি এইরূপ হরণ করিত?

ঝিল্লীমুখরিত নিস্তব্ধ রাত্রি। দণ্ডের পর দণ্ড কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া মন্থরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কত অমূল্য প্রতিকৃতি এবং চিত্রপট, কত বিচিত্র ভিত্তিচিত্র, শিলা ও দারুমূর্তি সেই রাত্রে রাজপ্রাসাদের চিত্রশালায় ও বিভিন্ন

কক্ষে ছিঁড়িয়া পুড়িয়া ভাঙিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল কে বলিবে? রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যখন তাহার করধৃত উল্কা শেষ দীপ্তি দিয়া তৈলাভাবে নিভিয়া গেল তখন মন্থরা সবেমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের শয়নকক্ষের মুক্তদ্বারে পা দিয়াছে। তাহার সম্বিত ফিরিল, ভাবিল, "যাক, যথেষ্ট হইয়াছে। আর কাজ নাই।" তাহার বাহুদ্বয় শ্রান্ত, দেহ অবসন্ন। ভাবিল, "নাই বা কোথাও গেলাম; এই বিশৃঙ্খল পুরীতে কে এগুলি নষ্ট করিয়াছে তাহার কোন সাক্ষী নাই, তাহার মতো বৃদ্ধা দাসীকে কেহ সন্দেহ করিবে না। মাথাটা হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, মিথ্যা কতগুলা কুকার্য করিলাম। যাহা হইবার হইয়াছে, এইবার পরশু ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে ফিরিয়া নিদ্রা দেওয়া যাক।"

মন্থরা ফিরিতে গিয়া সহসা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। এ কি দেখিতেছে সে? ঘরের মধ্যে রামচন্দ্রের স্বর্ণ-পর্যঙ্কের পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণমণ্ডিত সুখাসনে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী একজন রমণী উপবিষ্টা। বাতায়নপথে চন্দ্রালোক আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কিরীটে কুণ্ডলে মণিমাণিক্যখচিত বস্ত্রালঙ্কারে ঝলমল করিতেছিল। মন্থরার কিছুক্ষণের জন্য বাক্যস্ফূর্তি হইল না। মুগ্ধবিস্ময়ে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে আত্মস্থ হইল, সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কে?"

উত্তর নাই। মন্থরা দ্বিতীয়বার কম্পিতকণ্ঠে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, আপনি কে?" রমণী নীরব। তিনি মন্থরার কথা শুনিতে পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না, নিমেষহীন নেত্রে পূর্ববৎ বাতায়ন পথে বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। মন্থরা এইবার সাহসে ভর করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, কহিল, 'দেবী, উত্তর দিন, আপনি কে? কোথা হইতে আসিলেন?" তখনও উত্তর নাই। এই-বার মন্থরা আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে রমণীর মুখোমুখি দাঁড়াইল। পরক্ষণেই শিহরিয়া পিছাইয়া আসিল, তাহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বাহির হইল। এই ভুবনমোহন রূপ মনুষ্য-জগতে যে কেবল একজনেরই ছিল, মন্থরার চক্রান্তে রাজনন্দিনী রাজরাণী সে চিরদুঃখিনী হইয়া জীবন কাটাইয়াছে, শেষ পর্যন্ত অসহ্য অপমানে পাতালপ্রবেশ করিয়াছে। সে কি আজ পাপিষ্ঠা মন্থরাকে শাস্তি দিবার জন্য পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে? কিন্তু মন্থরার তো মরিবার ইচ্ছা নাই, মৃত্যুর পর নরকের যে বিভীষিকা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, সে তাহাকে যতদিন সম্ভব ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। সীতার তো হাতে অস্ত্র নাই, তিনি কি শূন্য হস্তেই তাহার ঘাড় মটকাইবেন? মন্থরার হাতে পরশু কিন্তু সে জানিত বিদেহী আত্মার নিকট মানুষী অস্ত্রশস্ত্র নিরর্থক। সে নিরুপায় হইয়া আবার সাহসে ভর করিল। হস্তধৃত কুঠার এবং নির্বাপিত উল্কা মাটিতে ফেলিয়া বহুকষ্টে নতজানু হইয়া বলিল "মহাদেবী, জানি আমি আপনার ক্ষমার যোগ্য নহি, তবু আপনাকে আজ আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি পাপীয়সী, কিন্তু আপনি তো মহীয়সী। জীবনে আপনি কখনও কাহারও ক্ষতি করেন নাই, মৃত্যুর পর অসহায়া আশ্রয়প্রার্থিনী আমাকে হত্যা করিলে আপনার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।' সীতাদেবী প্রসন্নহাস্যোদ্ভাসিত মুখে পূর্ববৎ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, মন্থরার কাতর প্রার্থনা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তখন ভয়ে এবং নৈরাশ্যে ব্যাকুলচিত্তা দাসী সবলে তাঁহার স্বর্ণনূপুর-শোভিত অলক্তরঞ্জিত পদদ্বয় দুইবাহু বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া ছাড়িয়া দিল এবং পিছাইয়া আসিল। এ কি কঠিন শীতল স্পর্শ! এ তো মনুষ্যদেহের স্পর্শ নয়, অশ্রবত্তাঙ্গী নবনীতকোমলা সীতাদেবীর দেহে পুষ্পপেলবতার পরিবর্তে এই ধাতব কঠিনতা আসিল কেমন করিয়া? পরক্ষণেই ভয় ভাঙিয়া হাসি পাইল, মন্থরা উন্মত্তের মতো 'হা, হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাই বলো, স্বর্ণ সীতা? কি ভয়টাই না দেখাইয়াছিল মূর্তিটা। না, এ পাপও আর রাখিয়া কাজ নাই, ইহাই তাহার অদ্য রজনীর শেষ বলি হউক। মন্থরা হাসিতে

হাসিতে জ্যোতির্ময়ী স্বর্ণপ্রতিমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পরশু উঠাইল। দয়াময়ী! সতী! না, না, মন্থরার আজ দয়া করিলে চলিবে না। এক দণ্ডে হউক, এক প্রহরে হউক, সারারাত্রি জাগিয়া হউক, এ মূর্ত্তি সে ধ্বংস করিবে। এ পুরীতে সীতার স্মৃতি অসহ্য, তাঁহার অনবদ্য রূপের এই জীবন্ত বিগ্রহ কি করিয়া রাখা চলিতে পারে? ছবিগুলার মুখাগ্নি না করা অপরাধ হইয়া গিয়াছে।

মন্থরার শ্রান্ত দুই বাহুতে সহসা যেন যৌবনের বল ফিরিয়া আসিল। দুই হস্তে পরশু তুলিয়া সে প্রাণপণ বলে স্বর্ণ সীতার মস্তকে আঘাত করিতে গেল; কিন্তু সে আঘাত যথাস্থানে পৌঁছিল না। দাসীর শীর্ণ হস্ত কাহার পেশীবহুল সবলহস্তে বাধা পাইয়া মধ্যপথে থামিয়া গেল। পশ্চাদ্দেশ হইতে একটা প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি যেন অতর্কিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এক নিমেষের জন্য তাহার সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে পরশু খসিয়া পড়িল, সেও আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে উন্মাদের মতো একটা বিকট চীৎকার করিয়া সংজ্ঞা হারাইল। তাহার হতচেতন দেহ বাতাহত কদলীবৃক্ষবৎ সশব্দে গৃহকুট্টিমে পতিত হইয়া দুই-একবারে স্পন্দিত হইল, তারপর ক্রমে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেদিন মধ্যরাত্রে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের শয়নকক্ষে মন্থরাকে স্বর্ণসীতার মূর্তি ধ্বংস করিতে বাধা দিল তাহার নাম পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রধানতঃ স্বর্ণকার বলিয়া পরিচিত হইলেও বিশাখদত্ত ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং ভাস্কর, তাহার রচিত বহু অনবদ্য মূর্তি সেদিন অযোধ্যার বহু মন্দিরগাত্রের এবং রাজপথের শোভাবর্ধন করিত; বহু রাজামাত্য, শ্রেষ্ঠী এবং সামন্ত নৃপতি তাহার রচিত মূর্তি দিয়া নিজ নিজ অট্টালিকা সাজাইতে বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেন। বিশাখদত্ত রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিল, অন্তঃপুরেও তাহার যাতায়াত ছিল। রামরাজ্যাভিষেকের সময় সীতাদেবীর জন্য বহু বিচিত্র অলঙ্কার সে রচনা করিয়াছিল, সেই সঙ্গে রূপের পূজারী সে, গোপনে তাঁহার একটি সুন্দর পূর্ণাবয়ব সিকৃথ-প্রতিমা, অর্থাৎ মোমের মূর্তি নিজ অবসর বিনোদনের জন্য রচনা করিতেছিল। সীতানির্বাসনের পর যজ্ঞকার্যের সহায়তার জন্য রামচন্দ্র যখন তাহাকে স্বর্ণসীতা নির্মাণের ভার দিলেন তখন রাজদত্ত স্বর্ণ এবং মণিরত্নাদির দ্বারা সেই সিকৃথ-প্রতিমার ছাঁচের সাহায্যে সে সীতাদেবীর এক অবিকল অপরূপ স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া রামচন্দ্রকে এবং দেশবাসীকে বিস্মিত করিয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে সেই দুঃসাধ্য কর্তব্য পালন করিয়া সে প্রচুর রাজপ্রসাদও লাভ করিয়াছিল। সর্বসাধারণের নিকট সম্মান এবং ধনী ও রাজন্যগণের নিকট প্রতিকৃতিনির্মাণের জন্য নিয়োগ ও অর্থলাভ করিয়া বিশাখদত্ত নিজে আজ নগরীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং মানী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত। বহু স্বর্ণকার এবং রূপদক্ষ তাহার কর্মশালায় ছাত্র এবং কর্মিরূপে নিযুক্ত। তবু বিশাখ দত্তের মনে সুখ নাই, তাহার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ সীতা-প্রতিমার মতো দ্বিতীয় প্রতিমা সে আজ পর্যন্ত আর নির্মাণ করিতে পারিল না। ঢালাই করিবার সময় তরল স্বর্ণ যখন তাহার মোমের পুতুলটিকে গলাইয়া তাহার স্থানাধিকার করিল তখন বিশাখদত্ত অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। যাহারা তাহার স্বর্ণপ্রতিমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিল তাহারা কেহই তাহার নিভৃত কর্মশালার সিকৃথ-প্রতিমা দেখে নাই। সে লাবণ্য, সে মাধুর্য্য এবং জীবন্তবৎ ভাব কঠিন ধাতুতে অবিকৃত রাখা সম্ভব নহে। যাহাই হউক, আজ সীতা ও নাই, তাঁহার সে সিকৃথ-প্রতিমূর্তিও নাই, স্বর্ণসীতাই বর্তমানে তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। সে নিজে তাহার মূল্য যত বুঝিবে সীতাপতি রামের অবর্তমানে কে আর তত বুঝিবে? বিশাখদত্ত আপনার মনকে বুঝাইয়াছিল, শিল্পের মর্যাদা যে দিতে জানে, কলাবস্তুর উপর তাহার দাবীই সর্বাধিক। এ ক্ষেত্রে সে নিজে যে প্রতিমার রচয়িতা, সে প্রতিমার প্রকৃত অধিকারী যখন দেহত্যাগ করিয়াছেন তখন তাহা তাহারই অধিকারে ফিরিয়া আসা ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মূঢ় দেশবাসী এবং রামের বংশধরগণ তাহার দাবী স্বীকার করিবে

বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল না, তাই আজ নগরব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগে সে তাহার অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টি স্বর্ণসীতাকে হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল। রাজান্তঃপুরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সোপান-শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্তম্ভান্তরালে তাহার বিশেষ বিশস্ত চারিজন ক্রীতদাস একটি শিবিকা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সে নিজে একটি কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ে দেহ এবং অনুরূপ আর একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মুখ এবং নাসিকা আবৃত করিয়া ত্রিতলে আরোহণ করিয়াছিল। একটি পূর্ণাবয়ব মনুষ্যদেহ ধারণে সক্ষম মহিষচর্ম নির্মিত দৃতি এবং বস্ত্রখণ্ড তাহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, কটিবন্ধে কোষবদ্ধ ছুরিকা, হস্তে প্রয়োজনমত অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য অরণিপ্রস্তর। মধ্যরাত্রে সতর্ক পদক্ষেপে রামচন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিশাখদত্ত সহসা সেখানে মন্থরাকে দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইয়া গিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বাধা দেয়। দ্রুতবেগে পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া সে দৃঢ়মুষ্টিতে কুব্জার দুই হস্ত ধরিয়া ফেলায় সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমাটি সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

মন্থরাকে চিনিতে বিশাখদত্তের ভুল হয় নাই, সে রূপ দূর হইতে একবার দেখিলে কাহারও পক্ষে জীবনে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহার অতর্কিত আবির্ভাব শিল্পীকে বড়োই বিপদে ফেলিল, তাহার সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করিয়া দিল। সে কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিল, মন্থরার আর্তনাদে এবং পতনশব্দে আকৃষ্ট হইয়া পুরবাসী কেহ আসে কি না। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে সভয়ে পর্যঙ্ক-পাদদেশে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল, কয়েকপল অতিক্রান্ত হইলেও যখন কেহ আসিল না তখন ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া মন্থরার মনিবন্ধ দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া তাহার নাড়ীর গতি অনুভব করিল। যখন তাহার প্রত্যয় হইল যে কুব্জা মরে নাই তখন তাহার সাহস এবং বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে নিজের মুখাবরণ খুলিয়া মন্থরার মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিল, সঙ্গে আনীত রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিল, তারপর তাহার সংজ্ঞাহীন দেহটা স্বর্ণপর্যঙ্কের তলদেশে ঠেলিয়া দিয়া শয্যায় আস্তৃত দুগ্ধশুভ্র কৌষেয় আস্তরণ খানি আভূমি বিলম্বিত করিয়া দিল। অতঃপর ক্ষিপ্রহস্তে সীতাদেবীর শূন্যগর্ভ স্বর্ণপ্রতিমাখানিকে সুখাসন হইতে নামাইয়া গৃহকুট্টিমে শায়িত করিয়া সে সেটিকে মহিষ দৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দৃতির মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর সন্তর্পণে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দাসদিগকে ডাকিতে গেল।

কক্ষদ্বারের বহির্দেশে অলিন্দপথে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি এতক্ষণ নিঃশব্দে মন্থরা ও বিশাখদত্তের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি অন্ধকারে দ্বারপ্রান্তে সরিয়া দাঁড়ানোয় শিল্পীর সঙ্গে তাঁহার অঙ্গসংঘর্ষ ঘটে নাই। বিশাখদত্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্রুতহস্তে দৃতিমুখের বন্ধন খুলিয়া সীতা-প্রতিমাটিকে টানিয়া বাহির করিলেন। এক নিমেষের জন্য চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত স্বর্ণসীতার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি উদ্গত অশ্রু রোধ করিলেন, একবার নতজানু হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। তারপর শয্যা-প্রান্তে বিলম্বিত আস্তরণ ঈষৎ উত্তোলন পূর্বক পর্যঙ্কতল শায়িনী হতচেতনা মন্থরার পদদ্বয় ধরিয়া তাহাকে হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন এবং সেইস্থানে স্বর্ণ সীতাকে সযত্নে স্থাপন করিলেন। সীতা-প্রতিমা শয্যা-স্তরণের অন্তরালে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে তিনি মন্থরাকে মহিষদৃতির মধ্যে ভরিয়া দৃতির মুখবন্ধন করিতে করিতেই কক্ষ বহির্দেশে কয়েক ব্যক্তির মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিজেও নিমেষমধ্যে সেই সুপ্রশস্ত পর্যঙ্কতলদেশে আত্মগোপন করিলেন।

বিশাখদত্ত সানুচর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারজন কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত বাহকের দ্বারা বাহিত একটি ময়ূরপঙ্খী নৌকাকৃতি বহুমূল্য রজতময়ী শিবিকা। শিবিকাভ্যন্তরে একজন আরোহী স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া বা উপবেশন করিয়া যাইতে পারে। দুইটি

স্বর্ণ মকরমুখ মণ্ডিত রৌপ্যদণ্ড শিবিকারে দুইদিকে সংলগ্ন ছিল। বাহকেরা বিশাখ দত্তের ইঙ্গিতে শিবিকা নামাইয়া ভূমিমধ্যস্থা মহুরাকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া উহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সচেষ্ট হইল। এমন সময় বাহিরে কিসের যেন শব্দ শ্রবণগোচর হওয়ায় বিশাখদত্ত চকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমরা শীঘ্র আমাকে অনুসরণ কর, আমি পথ পরিষ্কার আছে কি না দেখিতেছি।" সে চলিয়া যাইবার পর মুহূর্তেই ভৃত্যেরা মহুরাকে শিবিকাভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া উহার চতুর্দিকে ক্ষৌমবস্ত্রাবরণ ঝুলাইয়া দিল। দুইদিকের দণ্ডে স্কন্ধ সংযোগ পূর্বক শিবিকা উত্তোলন করিয়া অতঃপর তাহারা ধীরপদে কক্ষত্যাগ করিল। হতভাগিনী মহুরার অপহৃতা হইবার বড়োই সাধ ছিল, কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে সেই দুর্লভ সুযোগ যখন তাহার জীবনে আসিল তখন তাহার মাধুর্য সজ্ঞানে উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, যাহারা তাহাকে হরণ করিল তাহারও জানিল না কোন্ নারীরত্নকে তাহারা হরণ করিয়া লইয়া চলিল, এইরূপ নিষ্কাম নারীহরণের জন্য কি শাস্তি তাহাদের অদৃষ্টে অপেক্ষা করিতেছে!

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বাহকগণ বিশাখদত্তকে অনুসরণ পূর্বক প্রাসাদান্তঃপুরের প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নামিল। উহা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইতেই বিশাখদত্ত কবাট উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা শিবিকাসহ আর কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া একটি ক্ষুদ্রপথে গিয়া পড়িল। ঐ পথ অদূরে রাজপথে গিয়া মিলিয়াছিল। বাহকেরা দৃষ্টি পথের অন্তরালবর্তী না হওয়া পর্যন্ত বিশাখদত্ত নির্নিমেষ নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর নৈশ্চিন্ত্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিল, একজন দীর্ঘকায় সৈনিকপুরুষ তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। স্বীয় উষ্ণীষাগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার মুখের নিম্নভাগ আবৃত, তাঁহার হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। তিনি কোনও কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে বিশাখদত্তের নিশ্চল দেহের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন, নিজ উলঙ্গ কৃপাণশীর্ষ তাহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে অগ্রসর হইতে বলিলেন। ভয়বিহ্বল শিল্পীর মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে সৈনিকের নির্দেশে যন্ত্রচালিতের মতো আবার সেই প্রাঙ্গণ পার হইয়া সোপান-পাদদেশে আসিল। বিস্তৃত সোপানশ্রেণীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার ছিল, সেখান হইতে আর একটি সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী ভূগর্ভে কারাগারে নামিয়া গিয়াছিল। অন্তঃপুরিকারা কেহ কোনও গুরুতর অপরাধ করিলে প্রাচীনকালে সেই ভূগর্ভস্থ বন্দীশালায় বন্দিনী থাকিত। রামচন্দ্রের সময়ে দীর্ঘকাল সেই সোপান বা কক্ষ ব্যবহৃত হয় নাই; দ্বার খুলিবামাত্র নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন শ্রুতিগোচর হইল, চর্মচটিকার দুর্গন্ধে শিল্পীর বমনোদ্রেক হইল। বিশাখদত্ত সেই সোপানপথে কিয়দ্দূর অবতরণ করিতেই তাহার মাথার উপর লৌহদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। নিস্তব্ধ প্রাসাদে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত সারস ময়ূর কোকিলাদি কয়েকটা গৃহপালিত পক্ষী একবার কোলাহল করিয়া উঠিল, প্রাসাদবহির্দেশস্থ পথে কয়েকটা সারমেয় তাহাদের ঐকতানে যোগ দিল। অমাত্য ভদ্র প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখনও পুরবাসী জাগিল না, কেহ সন্ধান লইতে আসিল না। কোলাহল নীরব হইলে ভদ্র ত্রিতলে উঠিয়া গেলেন, স্বর্ণসীতাকে যথাস্থানে রাখিয়া নামিয়া আসিলেন এবং প্রাসাদতোরণে গিয়া তরবারি হস্তে প্রহরায় নিযুক্ত রহিলেন।

ক্রমশঃ

মহাকবি ও নাট্যকার ভাস

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

যশস্বী নাট্যকার ভাস ছিলেন কালিদাসের পূর্ব্বসূরী। প্রাক্ কালিদাস যুগে শক্তিমান্ নাট্যকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর নাটকাবলীর গৌরব কালিদাসের সময় কালেও অক্ষুন্ন ছিল। কালিদাস সে কথা তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে স্বীকার করেছেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় কবি পারি-পার্শ্বিকের একটি সংলাপ অংশে নিজ মনের সহজ অনুভবকে প্রকাশ করে বলেছেন,—

'বহুখ্যাত ভাস সৌমিত্র ক-কবি পুত্রাদির অভিনয়-যোগ্য রচনাবলী তুচ্ছ করে একান্ত নবীন কবি কালিদাসের রচনাকে লোকে এত সমাদর করছে কেন?'১

এই উক্তি হতে একটি বিষয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, ভাসের নাট্যকর্ম একসময় শ্রেষ্ঠতার মহামর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসের রচনা গৌরব সম্বন্ধে কালিদাস একসময় অতি সচেতন ছিলেন। কবির উপরোক্ত মন্তব্যটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তাই বলে নাট্যরচনায় নিজের খ্যাতিলাভ সম্বন্ধে তিনি কখনো শঙ্কা বা সংশয় বোধ করেন নি। এ সম্পর্কে অহেতুক সংশয় তুলে যাঁরা বিপরীত মন্তব্য করে থাকেন, তাঁরা বোধহয় সেই নবীন কালিদাসকে প্রাচীন ভাসের তুলনায় একটু খাটো করতে পারলেই খুশী। তাঁদের এই সংশয় নিছক অনুমান মাত্র; আর অনুমানের ওপর নির্ভর করে কখ'নো কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনায় ভাসের প্রতি উক্ত মন্তব্যটিতে কালিদাস নিজেকে নবীন নাট্যকার বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, নাট্যারম্ভে তিনি এই রচনাটিকে নতুন বলে, অভিহিত করেছেন।২ তাঁর এই উক্তির সূত্র ধরে অনেকে অনুমান করেন 'মালবিকাগ্নিমিত্র' গ্রন্থটি তাঁর প্রথম নাট্য রচনা; কিন্তু এ অনুমানও সঠিক নয়। কবির এই উক্তি বিনয়ের এক অভিব্যক্তি হতে পারে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' গ্রন্থেও কবির অনুরূপ একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।৩ তাই বলে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' রচনাটিকে কেউ কালিদাসের প্রথম রচনা বলে স্বীকার করবেন না। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কালিদাস রচিত গ্রন্থগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য আজও অবিসম্বাদিত রূপে নির্ণীত হয়নি; কারণ কবি তাঁর কোন রচনায় সময় কালের প্রতি কোথাও কোনরূপ ইঙ্গিত রেখে যান নি। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটিকে কবি নতুন বলে অভিহিত করলেও অনেকের মতে রচনাটি কবির দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ।৪ অতএব 'মালবিকাগ্নি-মিত্র' নাটকে উল্লেখিত শ্লোকটিকে কালিদাসের সংশয়োক্তি বলে ধরে নেওয়া যায় না। এমন কি এর সাহায্যে কালিদাস রচনাবলীর কালানুক্রম সম্পর্কেও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শ্লোকটি নেহাৎই কবির কৌতূহলী মনের এক ভাবোচ্ছ্বাস কিংবা বিনয় অভিব্যক্তির এক অভিনব প্রকাশ মাত্র। কালি-দাসের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন কবির পক্ষে এরূপ উক্তি অস্বাভাবিক নয়। কবির অসামান্য রসসৃষ্টি ক্ষমতা ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিচয় লক্ষ্য করে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তিনি সুকবি রূপে সারস্বত সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ব্বে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' গ্রন্থটি রচনার পূর্ব্বেই তাঁর কাব্য প্রতিভার সুনিশ্চিত পূর্ব্বাভাস পরিলক্ষিত হয়েছিল।৫

তার প্রথম নাটক 'বিক্রমোর্বশী' লিখেও তিনি যশো-লাভ করেছিলেন। একথা স্বীকার করে নিলে, কি করে ভাবা যায় যে, কালিদাস তাঁর দ্বিতীয় নাটক রচনাকালে এরূপ সংশয় প্রকাশ করতে পারেন। যে বস্তু অধ্রুব, তার পেছনে ছুটলে কি পরিণতি হতে পারে, আশা করি কালিদাসের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন কবির অজানা ছিল না। উপরন্তু নাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে যখন কবির সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা কোন প্রকারে বিঘ্নিত হয় না, তখন প্রখ্যাত নাট্যকার ভাসের রচনা গৌরব সম্পর্কে চিন্তা করে হতাশ হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ প্রশ্নমনস্কতা নিছক ভিত্তি হীন।

যুক্তি বিচার করে দেখা যায়, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় [॥৫॥ ও '৬॥ পঙ্‌ক্তি] কালিদাসের ভাস-নিষ্ঠার পরিচয় সুব্যক্ত। তৎকালীন পাঠক কুলের চিত্তলোক মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল, কালিদাসের ঐ উক্তি-সমূহ তারই ঘনীভূত নির্য্যাস। এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, ভাস-প্রভাব এক সময়ে পাঠক কুলের মানসলোকে একটা অদ্ভুত বৈদ্যুতিক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় সৃজনী শক্তির অধিকারী হয়ে মহাকবি ভাস তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ মহলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কালি-দাস তার পূর্ব্বসূরীর সেই গুণ গৌরবের কথা বিস্মৃত হন নি; কারণ তাঁর সময় কালেও যশস্বী ভাসের শিল্প মর্যাদা পূর্ণ মাত্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। ভাসের রচনাদর্শ কালিদাসকে সৃজনশীল সাহিত্য কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল, গভীর জীবনবোধে প্রেরণার উৎস জুগিয়েছিল। তাই ভাস-গৌরবের তিনিও একজন স্তুতিবাহক,—ভাস রচনাদর্শের একনিষ্ঠ পরিপোষক। তার প্রমাণ স্বরূপ কালিদাসের রচনায় ভাস প্রভাব পরিলক্ষিত।৬ ঐ মহাকবির মহান্‌ প্রতিভালোকে সে যুগের নবীন কবি কালিদাস প্রদীপ্ত হয়েছিলেন,—প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। সর্ব্বোপরি ঐ স্মরণীয় কবির মহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জীবন ব্যাপী সাধনা, প্রেরণা, এষণায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে কথা স্মরণ করেই কবি তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ভাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ভাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর মতে, ভাস পাণিনি এবং কৌটিল্যের পূর্ব্বসূরী। অতএব তাঁর আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ ২য় বা ৩য় শতকের মধ্যে। পণ্ডিত তিলকের মতে, ভাসের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতকের মাঝামাঝি। পণ্ডিত ফণী-ভূষণ তর্কবাগীশ বলেছেন,''ভাস খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন।" এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, অধুনালুপ্ত 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত সারদা রঞ্জন রায় ভাসের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'ভাস খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী তৃতীয় শতাব্দীর লোক হতে পারেন।' এরূপ অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে লেখক বলেছেন, 'ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং 'বালচরিত' নাটকদ্বয়ের শেষার্দ্ধে রয়েছে,—

'মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ'।
(স্বপ্নবাসবদত্তা)

'ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ'।
(বালচরিত)

অর্থ দুয়েরই এক;—আমাদের রাজসিংহ সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। শ্লোকার্দ্ধে 'রাজসিংহ' শব্দের বার বার আবৃত্তি দেখে মনে হয়, ভাস রাজসিংহ নামে কোন রাজার অধিকারে বাস করতেন। নাটকান্তে শ্লোকচ্ছলে কবি স্বএভুর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছেন। অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, খৃষ্টের পর তৃতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য বংশে রাজসিংহ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব ভাস, ঐ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, একথা অসম্ভব নয়।৭ কিন্তু পণ্ডিত জয়-সওয়াল (Jayaswal) একথা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, ভাস কখনো খৃষ্টের পরবর্ত্তী শতকের লোক হতে পারেন না। যাই হোক, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভাস কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাসের নাটকগুলির

ভাষা ও রচনাভঙ্গী বিচার করলে দেখা যায়, তার মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ অধিক। সেগুলি কালিদাসের সময় কাল হতে অন্যূন পক্ষে ৫০০ বছর আগের রচনা। কালিদাসের আবির্ভাব কাল যদি খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে হয়, তাহলে ভাস অবশ্যই খৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন। তবে অসাধারণ প্রতিভা গুণে ভাসের জনপ্রিয়তা কালিদাসের সময় কালেও অক্ষুন্ন ছিল এবং কালিদাস ঐ গুণগৌরব প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভারতের কোন প্রদেশে ভাসের জন্ম তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। অনেকের মতে, ভাস দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে অবশ্য দু-একটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ ভাস ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণন লক্ষ্য করা যায়। শিব বা অন্যান্য দেবতার স্তুতি একরকম নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়তঃ, ভাসের গ্রন্থ-সমূহ দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ প্রকাশের অধ্যক্ষ গণপতি শাস্ত্রী (T. G. Sastri) ভাসের সমস্ত গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেছেন। এ পর্য্যন্ত ১৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র এই দুইটি যুক্তি সম্বল করে ভাসের দেশকাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভাসের আত্যন্তিক বিষ্ণুভক্তি লক্ষ্য করে মনে হয় না যে তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পুরাকালে দাক্ষিণাত্য লঙ্কেশ্বর রাবণের অধিকার ভুক্ত ছিল। রাবণ ছিলেন শৈব-ধর্মাবলম্বী এবং ঘোরতর বিষ্ণু-বিদ্বেষী। বিষ্ণুভক্তের ওপর তিনি কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর এই ধর্ম্মবিদ্বেষে অতিষ্ঠ হয়ে বৈষ্ণবেরা দলে দলে দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করে আর্য্যাবর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্য ক্রমে কেবল শৈবের আবাসভূমি রূপে পরিণত হয়। এখনও দক্ষিণ অঞ্চলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায় শৈবের সংখ্যা অধিক। অতএব ভাস বৈষ্ণব হলেও, তিনি যে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী এ কথা নিঃসংশয়িত ভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। উপরন্তু, ভাসের গ্রন্থরাজী যেহেতু দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গেছে, সেই হেতু তাঁকে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী বলে মেনে নিতে হবে, এমন যুক্তি নেহাৎই ভিত্তিহীন। প্রাচীন গ্রন্থরাজী যে কোন সময়ে যে কোন ভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সুতরাং ভাসকে আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী বলে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই; বিশেষ করে এর স্বপক্ষে যখন প্রকৃষ্টতম যুক্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবি ভাসের দেশকাল' প্রবন্ধের লেখক সারদা রঞ্জন রায় ভাসকে উত্তর ভারতের অধিবাসী বলে গ্রহণ করেছেন। এরূপ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি লিখেছেন, 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং 'বালচরিত' নাটকেয় ভারতবাক্য এই :

ইমং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহ প্রশাস্তু নঃ॥

ভাসের চোখে পৃথিবীর দক্ষিণে ও বামে বিন্ধ্য ও হিমালয় এই পর্ব্বতদ্বয় রয়েছে। অতএব ভাসের পৃথিবী পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, তার দেহ হিমালয়ের উত্তরেও নেই, বিন্ধ্যের দক্ষিণেও নেই। অতএব আমরা বলতে পারি, যে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর,—এই চতুঃসীমায় বদ্ধ ভূমণ্ডলকে ভাস মহী বলে জানতেন। এই সীমার মধ্যে কোথাও তাঁর বাস ছিল। সুতরাং তাকে উত্তর ভারতের লোক বলে মনে করা অন্যায় নয়।'

ভাস বৈষ্ণব হলেও, তাঁর ধর্মমতে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাঁর গ্রন্থে কোথাও কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপর বিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করা যায় না। জ্ঞান-তাপস ভাস ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী। বিষ্ণুনিষ্ঠা তাঁকে দুরবগাহ জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন করেছিল। কবির অনন্তচিত্ত বাস্তব অনুরাগের মধ্যেও সম্পৃক্ত হয়েছে বিষ্ণু-চেতনা বিমথিত ব্যাকুলতা। এই আধ্যাত্মিক চেতনাই কবিকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মবোধে প্রণোদিত করেছিল। ফলে, কবির

সাহিত্য কর্ম্মে জ্ঞান-গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশ্বজনীন অনুভব-তন্ময়তা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর এই অনুভব-বেদ্যতার মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে একটি সুমহৎ মানবিক মূল্যবোধ যা সমকালীন যুগ-সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। সেই হেতু ভাসের সাহিত্য কর্ম্ম একদা কালজয়ী শিল্পরূপের মর্য্যাদা পেয়েছিল।

মহা-মহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর পরিচালনাধীনে ভাসের যে সমস্ত নাট্য রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি যথা ক্রমে, 'স্বপ্নবাসবদত্তা' 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ,' 'পঞ্চরাত্র', 'অবিমারক,' 'বালচরিত', 'মধ্যমব্যায়োগ,' 'চারুদত্ত,' 'দ্যূতঘটোৎকচ,' 'কর্ণভার,' 'উরুভঙ্গ', 'অভিষেক নাটক,' 'দূতবাক্য,' এবং 'প্রতিমানাটক'। শেষের তিনটি অসমাপ্ত রূপক এবং ঐগুলি পরে আবিষ্কৃত হয়। অবশ্য কোন নাটকেই রচয়িতার নাম এবং সময় কালের উল্লেখ নেই। অতএব ভাসের জীবনী আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁর সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্য, আনন্দ বেদনা কোন কিছুরই ছাপ তিনি রেখে যান নি তাঁর রচনায়। শুধু ব্যক্তিগত নয়, দেশগত এবং কালগত খণ্ড সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, সমস্যা মীমাংসার কোন ইতি বৃত্তই পাওয়া যায় না তাঁর রচনায়। ফলে, উপরোক্ত নাটকগুলি সত্যই ভাসের রচনা কি না, এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এমন কি এই নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে নানা যুক্তিতর্কেরও অবতারনা করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি প্রামাণিক তথ্যের অভাবে আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে যার বলে অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐ নাটকগুলি ভাসেরই রচনা। পণ্ডিত সমাজেও আজকাল এই তথ্যগুলি মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত।

বিষয়বস্তু বিচারে নাটকগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—(১) ঐতিহাসিক (২) পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক এবং (৩) সামাজিক। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং 'প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণ' নাটক দুটি ঐতিহাসিক।

উভয় নাটকের মুখ্য চরিত্র বৎসরাজ উদয়ন ঐতিহাসিক পুরুষ। 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক দ্বয়ের কথাবস্তু রামায়ণ সংশ্লিষ্ট। 'মধ্যমব্যায়োগ' 'দূতবাক্য' 'দ্যূতঘটোৎকচ' 'কর্ণভার' উরুভঙ্গ' ও 'পঞ্চরাত্র'—নাট্যরচনাগুলি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'বালচরিত' এবং 'অবিমারক' রচনা দুটি পুরাণাশ্রিত নাটক। 'বালচরিত'এ প্রেমময় কৃষ্ণ নাটকের আরাধ্য দেবতা। যদিও কৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ, তবু ভক্তিরসই এই নাটকের প্রাণ। ধর্ম্মতত্ত্বই এখানে মুখ্য। অবিমারকে একটি পুরাণাশ্রিত কাহিনী নাট্যরূপ পেয়েছে। সৌবীররাজ বিষ্ণুসেন নাটকের মুখ্য চরিত্র। 'অবি'.নামক এক অসুরকে হত্যা করে বিষ্ণুসেন 'অবিমারক' নামে আখ্যায়িত হন। ঐ সময়কালে তিনি দীর্ঘতপা নামে এক ঋষির অভিশাপে চণ্ডালরূপে জীবনযাপন করছিলেন। একসময় ঘটনাচক্রে অবিমারক তাঁর মাতুলকন্যা কুরঙ্গীকে এক মত্ত হস্তীর আক্রমন থেকে উদ্ধার করে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। তারপর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কিভাবে শেষ পর্য্যন্ত নারদের প্রচেষ্টায় তাঁদের মিলন ঘটে, তারই সবিশেষ ইতিবৃত্ত এই নাটকটির বিষয়বস্তু। 'চারুদত্ত' একটা সামাজিক নাটক। নাটকের মুখ্য চরিত্র, বণিক চারুদত্ত এবং নায়িকা, বসন্তসেনা। বসন্তসেনা একজন গণিকা। বণিক চারুদত্ত রূপেগুণে সর্ব্বাফলাযুক্তা গণিকা বসন্তসেনার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দর্শনেই দু'জনার পারস্পরিক আসক্তি জন্মে। অতঃপর কোন এক কারণে বসন্তসেনাকে চারুদত্তের গৃহে সাময়িকভাবে কিছুদিন আশ্রয় নিতে হয়। সেই সময়ে তিনি নিজের অলঙ্কারাদি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অলঙ্কারসমূহ চারুদত্তের গৃহ হইতে অপহৃত হয়। চারুদত্ত তার পরিবর্তে বসন্তসেনাকে একটা কণ্ঠহার উপহার দেন। পরিশেষে বসন্তসেনার সঙ্গে প্রেমানুরক্ত চারুদত্তের প্রকাশ্য মিলন সংঘটিত হয়। নাট্য কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি। চার অঙ্কে সমাপ্ত 'চারুদত্ত, নাটকখানি বিচার করলে দেখা যায়, রোমান্টিক প্রণয় কথার ওপর ভাস-এর আদর্শবাদী ভাবকল্পনা প্রেম

তপস্যার মহিমা প্রচার করেছে। এই নাটকখানি একটি উল্লেখ্য রচনা হিসাবে যুগান্তকারী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কালিদাসোত্তর যুগেও সেই জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার শূদ্রক ভাস-এর 'চারুদত্ত' অবলম্বনে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্ম 'মৃচ্ছকটিক রচনা করেছিলেন।

ভাস রচিত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র 'উরুভঙ্গ' নাটকখানি বিয়োগান্তক। নাট্যকার দ্বিতীয় কোন বিয়োগান্তক নাটক রচনা করেন নি। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ নাটকটিই একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক। বিদগ্ধ সমালোচক Winternitz-এর ভাষায়,—'What is most remarkable, it is the only tragedy in the whole Sanskrit literature' [Readership lecture, delivered at the Calcutta University—1923] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভাসের নাটকগুলি বিচিত্র বিষয়ক। তাঁর রচনায় বিষয়ানুগত বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকে তখনো গদ্য সংলাপ সুগঠিত হয়নি। তাই ভাসের রচনায় গদ্য অপেক্ষা পদ্যায়ত ভাষার ব্যবহার অধিক। বিশেষ করে সংলাপ অংশে পদ্যের আতিশয্য অতিমাত্রায় চোখে পড়ে। বোধ হয় ঐ সময়ে সংস্কৃত নাটকের পক্ষে আগাগোড়া গদ্য স্বভাবিত সংলাপ রচনা সম্ভব ছিল না বলেই নাট্যকার তা করেননি। তাছাড়া ভাস ছিলেন কবি-স্বভাবিত। তাঁর কবিকল্পনা নিশ্চয় তাঁকে পদ্যায়িত রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

ভাসের নাটকগুলি পুরোপুরি সংস্কৃত নাট্যকলার আদর্শে রচিত হয়নি। রচনাশৈলীতে প্রাচীনত্বের ছাপ অধিক। ভাষা ভঙ্গীতেও অনেক স্থলে ব্যাকরণ-দুষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারের কোন নাটকেই বিদূষকের চরিত্র নেই; কিন্তু তা হলেও নাট্যকারের শিল্পদৃষ্টির যথাযথ্য ও চরিত্রায়ণের পুঙ্খানুপুঙ্খতা অভিনব। নাট্যকর্মে ভাসের যুগান্তকারী সফলতার মূলে ছিল তাঁর প্রাণময় জীবনানুভব ও পরিচ্ছন্ন প্রকাশ-ক্ষমতা। ভারত-ধর্মিতা তাঁর নাট্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভারত-ধর্মী শিল্পীপ্রাণ নাট্যদেহে সুগঠিত রূপ চেতনা সম্পর্কে সদা সচেতন ছিল। শিল্পীর এই উদ্ভাসিত প্রাণময়তা নাটকগুলিকে ভারতীয় জীবন ধর্মে সমৃদ্ধ করেছে। এখানেই ভাসের যথার্থ শিল্প-সফলতা।

ভাসের নাট্যকীর্তির মধ্যেই তাঁর কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি একাধারে যশস্বী কবি ও নাট্যকার। তাঁর কবিখ্যাতি স্বকীয় নাট্যকীর্তির চেয়ে কম ছিল না। সিদ্ধকাম শিল্পীর রচনায় তাই ঐ দুটিই সচেতন কলাকৃতির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ভাসের কবিপ্রাণ তাঁর নাট্যরচনায় পরিপূর্ণ-রূপে প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যদেহে নবীন রূপবিন্যাসই ছিল তাঁর কবিকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই হেতু প্রাণের অনুভব-ধারাকে তিনি অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন বিচিত্র নাটক রচনায়। ভাস সেখানে নিঃসন্দেহে সিদ্ধকাম কবি।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে ভাস উৎকৃষ্ট রচনা-শক্তির অধিকারী ছিলেন। এদিক্ থেকে তিনি সঞ্জীবনী প্রতিভার দাবী করতে পারেন। কবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে ভাসের নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, 'সূত্রধার থেকে শুরু করে বহুবিধ চরিত্রের সংস্থানে নাটক রচনা করে ভাস সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।' 'দশকুমার' রচয়িতা দণ্ডী লিখেছেন, 'নাট্য সাহিত্যের মধ্যেই ভাস যশোমণ্ডিত হয়েছেন।' অতএব ভাস যে এককালে অতুল নাট্যকীর্তির অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বহুখ্যাত নাটক। তাঁর নাট্য কর্মের মধ্যে এই নাটকটি, অনেকের মতে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমালোচ্য নাটকের নায়ক বৎসরাজ উদয়ন। অবন্তি রাজকন্যা বাসবদত্তা উদয়নের স্ত্রী। তাঁদের পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি নেই। রাজ্যেও শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়মের অধীন। সুতরাং উদয়নের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কিছুদিনের মধ্যেই উদয়নের অধিকাংশ রাজ্য অরুণি নামে এক প্রবল শত্রু দখল করে বসল। শেষে একদিন উদয়নের

রাজধানী কৌশাম্বী শহরটিও হাতছাড়া হয়ে গেল। রাজা তখন রাজধানী ছেড়ে লাবানক গ্রামে বাস করতে লাগলেন। তাঁর মনে সুখ নেই। রাজ্যেও সর্বত্র অশান্তি। কি করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা যায়, তাই নিয়ে মন্ত্রীরা গভীর চিন্তায় মগ্ন। এই সময়ে সিদ্ধ জ্যোতিষিকেরা গণনা করে বললেন, মগধের রাজা দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হলে রাজা পুনরায় তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পাবেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়; কারণ এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে রাজা কখনো দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করতে পারেন না। শেষে রাজার এক সুযোগ্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এক কৌশল অবলম্বন করলেন। একদিন রাজা উদয়ন মৃগয়ায় গেলে, যৌগন্ধরায়ণ সকলের অজান্তে পরিব্রাজকের বেশ ধরে বাসবদত্তাকে নিয়ে অন্যত্র পাড়ি দিলেন। যাবার আগে রাজার অস্থায়ী রাজপ্রাসাদটিকে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে গেলেন। তারপর যৌগন্ধরায়ণ অতি গোপনে বাসবদত্তাকে নিয়ে মগধের এক তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে সহরে প্রচার হয়ে গেছে, রাণী বাসবদত্তা গৃহদাহে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও তাঁর অনুগামী হয়েছেন। অতঃপর তপোবনে যৌগন্ধরায়ণ এবং বাসবদত্তা ভিন্ন পরিচয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। বাসবদত্তা তখন অবন্তিকা নামে পরিচিতা। একদিন মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী এক বিশেষ কাজে সেই তপোবনে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে যৌগন্ধরায়ন ও অবন্তিকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। কথা প্রসঙ্গে যৌগন্ধরায়ণ জানালেন, অবন্তিকা তাঁর ভগিনী। তার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হলে, সে ভায়ের আশ্রয়ে রয়েছে। কিন্তু তিনি পরিব্রাজক। তাঁর কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই; অথচ ভগিনীকে আশ্রয়হীন অবস্থায় ফেলে যেতেও পারেন না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাঁরা তপোবনে বসবাস করছেন। শেষে যৌগন্ধরায়ণের মুখে সবকিছু শুনে পদ্মাবতী বিচলিত হলেন। এই করুণ কাহিনী তাঁর মনে এক প্রতিক্রিয়া শুরু করল। সুযোগ বুঝে চতুর যৌগন্ধরায়ণ তখন তাঁকে অনুরোধ করে বসলেন, অবন্তিনগর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি যেন তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এদিকে রাজা উদয়ন মৃগয়া থেকে ফিরে এসে শুনলেন, তাঁর স্ত্রী এবং সুযোগ্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিদাহে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর তিনি সুস্থ হলে, মন্ত্রীদের পরামর্শে মগধরাজ দর্শকের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে দর্শকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। আলাপ আলোচনা কালে মগধরাজ যখন জানতে পারলেন, উদয়ন রাজ্যহীন, তখন তিনি নিজের ভগিনী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ প্রস্তাব আনলেন। উদয়ন আশ্রয়-দাতার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সমবেত প্রচেষ্টায় উদয়ণ কি ভাবে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন, তাই এই নাটকে দেখান হয়েছে।

'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে তৎকালীন সমাজের যে চিত্রগুলি ভাস ধরেছেন তা সত্যই অনবদ্য। তৎকালীন সমাজ ছিল নীতিনিষ্ঠ এবং নৈতিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত। জ্ঞানসাধনা, ধর্মসাধনা ও কঠোর চরিত্রানু-শীলনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক নতুন জীবনবোধ,—এক নবতর জীবনাদর্শ। সে যুগে আর্য্য ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য সমাজ-শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই আধিপত্য জনসমাজকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে পরিচালিত করেছিল। তৎকালীন সমাজ-বিন্যাস আচার আচরণ, ধর্ম্মীয় আদর্শ সকলই ছিল আর্য্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্যেই জাতির প্রাণশক্তি স্ফুরিত হয়েছিল। সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল গৃহী বার্দ্ধক্য কালে সংসার হতে বিযুক্ত হয়ে তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তাঁরা তপোবনের নিভৃত পরিবেশে কাটিয়ে আধ্যাত্ম সাধনায় মনোনিবেশ করতেন। তাই নাটকে দেখা যায়, মগধরাজ দর্শকের মাতা বার্দ্ধক্যহেতু আশ্রমবাসিনী। তাঁর কন্যা পদ্মাবতী এসেছেন জননীর সঙ্গে দেখা করতে। এক্ষেত্রে স্মরণ

করা যেতে পারে যে, আর্য্যব্রাহ্মণ্য সাধনার রূপ ছিল, সর্ব্বভূতে বিরাজমান সেই সর্ব্বশক্তিমানের স্বরূপকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা এবং সেই সঙ্গে অমৃত সাধনায় ব্রতী হওয়া। সামাজিক ধর্ম্মাচরণের মধ্যেই এই আধ্যাত্ম সাধনার স্বরূপ মন্ত্র নিহিত ছিল। রাজা ছিলেন সমাজের সর্ব্বময় কর্তা। তাঁরা সামাজিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনমানসকে ন্যায় ও সুনীতির পথে পরিচালিত করতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রজাদের কাছে রাষ্ট্র-প্রধানের প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের আসন উচ্চ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরা ছিলেন প্রজাবৎসল,—প্রজাদের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। রাজার প্রতি প্রজাদেরও আন্তরিকতা ছিল সুগভীর। রাজ্যহীন, রাজ্ঞীহীন উদয়নের চরম দুর্দিনে তাঁর মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজাগণ অকুণ্ঠ সমবেদনা প্রকাশ করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন,—নিজেদের বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।......ভাসের সময় কালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল। যে কোন কাজে ঈপ্সিত ফললাভের জন্য তারা উন্মুখ হয়ে থাকত এবং সেইহেতু শুভকাজ শুরু করার পূর্ব্বে তারা নক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, শুভাশুভ কাল নির্ণয় ইত্যাদি ব্যাপারে আসক্তি প্রকাশ করত। অতিথি সেবা ছিল মানুষের পরম ধর্ম্ম। এ ব্যাপারে সমাজে কোন শ্রেণী বিচার ছিল না। উদয়ন, বাসবদত্তা এবং যৌগন্ধরায়ণের প্রতি মগধরাজ দর্শক এবং তাঁর ভগিনী পদ্মাবতীর আতিথেয়তা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জন্মান্তর, কর্ম্মফল, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে মানুষের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। নাট্যকাহিনীর এক স্থানে অবজ্ঞাতা বনবাসিনী বাসবদত্তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলছেন,—'অজ্ঞাত ভাগ্য এইরূপই অনাদৃত হইয়া থাকে।' নাট্যকার ভাসের যুগে তপোবন ছিল, অতিথিদের নিজ গৃহ। পদ্মাবতী প্রথম সাক্ষাতে তাপসী বাসবদত্তাকে বন্দনা করলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করে বললেন, চিরজীবিনী হও, এস বৎসে, তপোবন অতিথিদেরই নিজ গৃহ।' ভাস আলোচ্য নাটকে তপোবনের একটি সহজ সুন্দরস্বচ্ছ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, -'তথায় হরিণ সকল স্থানের প্রত্যয়ে বিশ্বস্ত সচকিত ভাবে বিচরণ করিতেছে। বৃক্ষগুলি পুষ্পফলে শোভিত শাখায় ভূষিত হইয়া সদয়ভাবে রক্ষিত হইতেছে; কপিল গোধন সকল দলে দলে রহিয়াছে। কোন দিকে ক্ষেত্র নাই, প্রচুর পরিমাণে ধূম উঠিয়া সমস্তই ছাইয়া ফেলিতেছে। এই সকল দেখিয়া সে স্থানটিকে নিঃসন্দেহে তপোবন বলিয়া মনে হইল।' ভাস যুগের সমাজ সংস্কারবর্জ্জিত ছিল না। শুধু সে যুগে কেন, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে বিবিধ সংস্কারের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য গ্রন্থে বিভিন্ন সংস্কারের উল্লেখ আছে। ভাসের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এমনি কতকগুলি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ পুরুষ সমাজে নিন্দনীয় ছিল। নারী নির্য্যাতন সমাজে অতীব নিন্দনীয় এবং গর্হিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা সমাজে উচ্চ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। সমাজে সাধারণ ভাবে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাদর ছিল। গার্হস্থ্য জীবনে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক আর একটি উল্লেখ্য বিষয়। সেখানে যথেষ্ট শিষ্টতা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাসের উদয়ন এবং বাসবদত্তা কত শান্ত, কত কোমল, কেমন তাঁদের আত্মসংযম।

উদয়ন কথা অবলম্বনে ভাস তাঁর দ্বিতীয়-নাটক "প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ" রচনা করেছেন। নাটকটি বীর-রস-প্রধান। উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোত এবং বৎসরাজ উদয়ণ, নাটকের দুই প্রধান চরিত্র। দু'টি চরিত্রই মানবিক গুণ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। রূপদক্ষ শিল্পী ভাস অতি নিপুণভাবে চরিত্র দু'টি এঁকেছেন। উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোত এবং বৎসরাজ উদয়ন, এই দুই ব্যক্তির অটল অভিলাষ এবং সুদৃঢ় সংকল্পের এক আশ্চর্য্য সংঘাত ঘটেছে এই নাটকে। খ্যাতি এবং বংশমর্য্যাদায় উদয়ন অতুল্য। তাঁর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ একজন বিশদদর্শী। পক্ষান্তরে, বলবান্ রাজা প্রদ্যোত একজন সুযোদ্ধা ও সমর-কুশলী। এই কারণে অন্যান্য দেশের রাজপুরুষেরা তাঁর অনুগ্রহ-প্রার্থী। কিন্তু উদয়ন তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি।

বোধহয় সেইজন্যই প্রদ্যোতের মনে বৎসরাজের প্রতি একটি তীব্র আকর্ষণ। অবশ্য তাঁর মনে অপর একটি অভিপ্রায়ও ছিল; নিজের কন্যা বাসবদত্তাকে সুযোগ্য উদয়নের হাতে তিনি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উদয়ন যেন সব ব্যাপারেই উদাসীন। শেষে প্রদ্যোতের মন্ত্রীরা একটা কৌশল অবলম্বন করে অন্যমনস্ক উদয়নকে বন্দী করলেন। বন্দী উদয়নকে উজ্জয়িনীরাজের সম্মুখে উপস্থিত করলে, রাজা তাঁকে অনুরোধ করে বসলেন, তিনি যেন রাজকন্যা বাসবদত্তাকে বীণা বাজান শেখান। উদয়ন যে একজন কুশলী বীণাবাদক, সে বিষয় কারও অজানা ছিল না। যাই হোক, রাজা প্রদ্যোতের এই সামান্য অনুরোধটুকু উদয়ন উপেক্ষা করতে পারলেন না। সেই দিন থেকে উদয়ন আচার্য্যরূপে উজ্জয়িনীতে রয়ে গেলেন। বাসবদত্তা প্রতিদিন তাঁর কাছে বীণা বাজান শেখেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হল। প্রদ্যোত তাই লক্ষ্য করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এদিকে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজা ও বাসবদত্তাকে জোর করে নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত করলেন; কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল। শেষে প্রদ্যোত নিজেই উদয়ন ও বাসবদত্তাকে তাঁদের রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। নাট্যোপাখ্যানের এখানেই সমাপ্তি।

ভাসের যুগে সামাজিক আদর্শ ছিল সবচেয়ে গৌরবময় বস্তু। মানুষের জীবনবোধ ও চিত্তবৃত্তির বিকাশ এই আদর্শের মধ্যেই প্রতিফলিত। সে যুগে দেশের রাজা কেবল সর্ব্বময় কর্ত্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতির সমাজ-পিতা, সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে দেখা যায়, জনসাধারণের প্রতি রাজার সেই মহিমাময় আদর্শের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। সেদিন ছিল একান্ন পরিবারের যুগ। তাই ঐক্য রক্ষার জন্য আদর্শের প্রয়োজন ছিল এত বেশী। উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত এবং বৎসরাজ উদয়ন দু'জনেই মানবিক আদর্শের প্রতীক;– সত্য ধর্ম্মের সাধক। তাঁদের এই আদর্শের মধ্যেই ভারতের সেই সনাতন ও সত্যধর্ম্মের স্বরূপ নিহিত। একে আশ্রয় করেই একদা জাতির প্রাণশক্তির উজ্জীবন ঘটেছিল। এরই অনুরাগে ও অনুশীলনে একদিন জাতির সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছিল। ভাস ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুগামী। সেই হেতু আর্য্য সাহিত্যে তিনি এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র রূপে মর্য্যাদা পেয়েছেন।

গার্হস্থ্য সৌন্দর্য্যের কয়েকটি নিখুঁৎ ছবি 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে বিধৃত হয়েছে। এখানে রাজা, প্রজা সকলেই যেন একই হৃদয়বৃত্তির সুরে বাঁধা। এই বর্ণনায় সেকালের সকল শ্রেণীর লোকের জীবন ও জীবিকা, দুঃখ ও আনন্দ, জন্ম ও বিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয়ের পরিচ্ছন্ন ও শিল্প-সঙ্গত বিবরণ পাওয়া যায়। গার্হস্থ্য জীবনে শ্বশুর, শাশুড়ী ইত্যাদির সঙ্গে বধূ ঘর করত। বিবাহের পর স্বামীগৃহে বধূর শ্বশুর-পরিচর্য্যার কথা এবং কন্যা সাবালিকা হলে তার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করা ইত্যাদি কয়েকটা গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলির সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তা নাট্যকার কোন সময়ে বিস্মৃত হননি। সে সময় আমোদ প্রমোদের মধ্যে নৃত্য-গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। 'প্রতিজ্ঞা' নাটকের বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

দাম্পত্য জীবনে প্রেম প্রীতির সম্পর্কটি ছিল সুমধুর। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞা' উভয় নাটকে উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রেম প্রণয়ের চিত্রগুলি অতি মনোরম এবং বাস্তবানুগ। সেখানে কোথাও এতটুকু নীতিহীনতা চোখে পড়ে না। বলা বাহুল্য, তখনকার লোকেরা ছিল জীবন-রস-রসিক। নানা ভোগ সামগ্রীর উপাচারে তারা জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে উপভোগ করত। তাই বলে তাদের জীবনভোগ সর্ব্বস্বতায় পরিণত হয়নি। জীবনের তাৎপর্য্য নিরূপণে তারা ত্যাগমন্ত্রকেও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। ভোগ ও ত্যাগের আধারেই তাদের জীবন-বোধ স্ফুরিত হয়েছিল। ফলে, তাদের জীবনসাধনা ছিল এক উপলব্ধির সাধনা,—জীবনকে পরিপূর্ণ করার সাধনা। নিঃসন্দেহে এ এক পরম সুখবাদ।

ভাসের 'চারুদত্ত' নাটকে গণিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে গণিকাগণ সমাজে সম্মানিত আসন অধিকার করত। ধর্ম্মে তাদের ঘৃণ্য বলে বর্ণনা করলেও, নাগরিক জীবনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা চৌষট্টি কলায় শিক্ষিতা হয়ে গণিকা বৃত্তি গ্রহণ করত। 'চারুদত্ত' নাটকের নায়িকা বসন্তসেনা এমনি একজন শিক্ষিতা গণিকা। সে সমস্ত গুণে-পারদর্শিনী—নৃত্য-গীত বাদ্য ইত্যাদিতে বিশেষ ভাবে নিপুণা। সে যুগে গণিকারা নিজ বৃত্তি ত্যাগ করে বিবাহ করতে পারত। এই বিবাহকে 'মানব' বিবাহ বলা হত। সমালোচ্য নাটকে চারুদত্তের সঙ্গে বসন্তসেনার মিলন, 'মানব' বিবাহেরই এক দৃষ্টান্ত।

ভাস ও কালিদাস কৃত নাটকগুলির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্য ডাঃ বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেছেন,'ভাসের গদ্য রচনা কালিদাসের গদ্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর সুসংহত হইয়াও যাথার্থ্য ব্যঞ্জক। সংস্কৃত ভাষাকে কোনও বিশেষ ভাবের বাহন রূপে নিযুক্ত করিবার যে ক্ষমতা তাহা ভাসের পক্ষে সহজ,—তাহা লাভ করিবার জন্য ভাসকে চেষ্টা করিতে হয় নাই। পক্ষান্তরে, কালিদাসকে যেন তাহা আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। ভাসের গদ্য রচনায় তাহা দেখা যায় না'।৮ তবু মনে একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায়। ভাসের মত যশস্বী কবি কি কারণে এমন ভাবে কালের কপোল তলে তলিয়ে গেলেন? এরূপ প্রশ্নমনস্কতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর উত্তর ভাস নিজেই দিয়ে গেছেন;—'কালক্রমে জগতের পরিবর্ত্তমান ভাগ্য পংক্তি আর শ্রেণীর মতই কখনও বা উচ্চে আবার কখনও বা নিম্নে গমন করিয়া থাকে' ('স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বাসবদত্তার প্রতি যৌগন্ধরায়ণের উক্তি)। অর্থাৎ ভাগ্যের কোন চিরস্থায়ী রূপ নেই। কথাটি খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং জীবন ও বস্তুবাদের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। জীবন যেমন, সাহিত্য ঠিক তেমনি হবে। জীবনে যা ঘটে, সাহিত্যে তার প্রতিফলন হবে। সাহিত্যের রীতি যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন রূপ নেয়। তাই এক যুগের কবি ও নাট্যকার অন্য যুগে বিস্মৃত হয়।

---

১) প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লককবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ৌ কথা বহুমানঃ (মা' বিকাগ্নিমিত্রম্ ॥ ৫ ॥)

২) নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভি: (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্)

৩) পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্। (মালবিকাগ্নি মিত্রম্ ॥ ৬ ॥)

৪) (অধ্যাপক সারদা রঞ্জন রায় রচিত 'A Chornological Survey of Kalidasa's Works'-এ লেখক মন্তব্য করেছেন—'বিক্রমোর্ব্বশী নাটকটি কালিদাসের প্রথম নট্যগ্রন্থ। পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ অনুরূপ একটি মন্তব্য করে বলেছেন, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' বোধ হয় কালিদাসের দ্বিতীয় নাটক। 'বিক্রমোর্ব্বশী' লিখিবার পর ইহা হয়ত লিখিয়াছিলেন। ['কালিদাসের গ্রন্থাবলী' (প্রথম ভাগ) আদর্শ সংস্করণ: পৃঃ ৪৯৩] বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫) কালিদাস-রচনাবলীর-কালানুক্রম; মনোমোহন ঘোষ (বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪)

6. 'In language and style the dreams are nearer to Kalidasa than to Asvaghosa... [Some Problems of Indian Literature: By Winternitz].

৭) 'মহাকবি ভাসের 'দেশ ও কাল'; সারদা রঞ্জন রায় ('মানসী' পত্রিকা ১ম বর্ষ, প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা)

৮) 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা': ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

একটি আবির্ভাব

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মাঘের কোমলসূর্য্য মেলিয়া অযুত বাহু অযুত নয়ন
শীতাতুর ধরণীতে রাখে স্নিগ্ধ পরশন ; আপাদ ললাট,
নগর পর্বত সিন্ধু নদী পল্বল প্রান্তর হাট বাট মাঠ,—
মৃত্যুহীন নিত্য জন্ম তার, নিত্য অবসান।
মহাশূন্যের সম্রাট !
সন্ধ্যা তারে প্রতিদিন ঘুম পাড়াইয়া রাখে।
উষা দের জানাইয়া বিহঙ্গের ডাকে
লোকে লোকে জানায় আহ্বান।

*   *   *   *   *

তুমিও মাঘের সূর্য্য কোমল নয়ন দুটি, উজ্জ্বল ললাট।
প্রতি বর্ষে জন্ম নিতে আস দেশের সবার ঘরে প্রাসাদে কুটীরে
নাই কোথা অট্টালিকা। নাই প্রাসাদ রাজ্যপাট।
নহ রাজা মহারাজা অথবা সম্রাট। নাই সাম্রাজ্য বিরাট।
সূর্য্যের মতই যেন আলোর বর্ত্তিকা হাতে
আদিঅন্তহীন এক মহাশূন্যের পথিক।
লোকে লোকে দিকে দিকে দেশে দেশে যে এসেছে
গৃহ ছাড়ি পথে পথে তাদের দেখাতে বুঝি দিক্।
বর্ষে বর্ষে তাই তব জন্মতিথি করে তারা উলুধ্বনি দিয়া
বাজাইয়া শাঁখ।
আপনারই মত গৃহহারা দেশহারা পান্থ জনে
যেন দিয়ে যাও ডাক।
এ এক আশ্চর্য্য জন্ম। নহে কৃষ্ণ-রাম-জন্ম-তিথি।
কোথা নাই তিরোধান।
মৃত্যুহীন মহা আবির্ভাব—তার নব রীতি।

পাড়ি

সন্তোষকুমার অধিকারী

যন্ত্রণাসাগরে পাড়ি দিয়ে
উড়ে যায় সি-গাল কোথায়।
কতদূরে আছে দ্বীপ সবুজের ছায়ার নিভৃতে।
পায়ে শুধু তরঙ্গমথিত ফেণা
বুকে তৃষ্ণা ক্ষীরসাগরের ;
শোণিতে প্রবল জ্বালা, চোখে নাচে
মৃত্যুর আভাস ;
সে যাবে কোথায় ?

প্রবালের রক্ত জমে' দ্বীপের পাহাড়,
সে চায় অনেক উর্ধ্বে কোথাও আকাশ
ছিঁড়ে ফেলে
পার হতে অবমাননার
পুঞ্জ পুঞ্জ গ্লানি।
হৃদয়ের কোষে কোষে প্রতিদিন রক্তের উদ্‌গার
প্রতিদিন করে কানাকানি
তবু এই পৃথিবী আবার।
ইচ্ছার জটিল গ্রন্থি বাঁধে পাকে পাকে,—
মুক্তি কোথা তার ?

ধূমাঙ্কিত কালি শুধু, দীপশিখা অন্ধকার ছেড়ে
চলে যেতে চায়,
ঘৃণার প্রবল লজ্জা অদৃশ্যের
বুকে মাথা খোঁড়ে
হৃদয় তবুও তার পুড়ে পুড়ে মথিত শিখায়
ধূম হয়ে ওঠে শুধু।
—সে যাবে কোথায় ?
যন্ত্রণাসাগরে আমি ভাসালাম মন।

সমস্ত পৃথিবী, নীল দিগন্তে ফিরিয়ে পিঠ
চোখ রাখি আঁধারের বুকে—;
কোথায় আমার মুক্তি,
রক্তের বাঁধন থেকে আবার আলোয়
এ মনের কবে উন্মোচন ?

বেদবাণী

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্ত্যেষ্টি

"বায়োর্ অনিলম্"

দীর্ঘকাল পালিত এ দেহ
আছে তায় যতেক ইন্দ্রিয়,
যা আমার সবচেয়ে প্রিয়—
হে পাবক। হে পরম দ্যুতি।
তোমারেই দিলাম আহুতি।
যত দোষ ; যতেক স্খলন,
কলুষ যা আছে এর সাথ—
সকলি তা করো ভস্মসাৎ ॥
প্রাণবায়ু অসীম গগনে
মৃত্যুহীন মহাবায়ু সনে,
হয়ে যাক, হয়ে যাক লয়।
যাহা ভালো, যাহা ভালো নয়,
করেছি যা আমি আমরণ—
বার বার করি তা স্মরণ।।

যজুর্বেদ (বাজসনেয়ি), ৪০।১৫

"মধুবাতা ঋতায়তে"

আকাশ ভরিয়া মধু, বাতাস বহিছে মধু,
স্রোতস্বিনী বহে মধুধারা—
দিবস মাধুর্যে ভরা, রজনী মধুক্ষরা,
মধুময় চন্দ্র, সূর্য, তারা।
মধুময় বনস্পতি, ওষধি মধুর অতি,
মধুময় এ বিশ্বনিচয়—
মধু অন্ন, মধু নীর, মধুর গাভীর ক্ষীর,
ধূলিকণা তাও মধুময়।

ঋগ্বেদ, ১।৯০।৬

৮ এর পাতার পর

অসংখ্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা বলিয়ামানিয়া লইয়াছেন সেই সকল রাষ্ট্রেরই বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে আন্তর্জাতিক অভিযোগ চালাইতে হইবে। মানব ইতিহাসে বৃহত্তর রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া একাধিক নব রাষ্ট্রগঠন বার বার দেখা গিয়াছে। কখন শান্তিপূর্ণভাবে কখনও বা বিদ্রোহ বা বিপ্লব করিয়া। ভারতকে দ্বিখণ্ড করিয়া যে পাকিস্থান গঠিত হইয়াছিল তাহাও এইরূপ বিভাগের একটা প্রকট উদাহরণ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল তাহাও একটা উদাহরণ। চীনের সহিত তিব্বতের একত্র হওয়া দুই রাষ্ট্রকে বলপূর্বক এক করিবার একটা বিপরীত ধরণের কাহিনী। বাংলাদেশ যে পাকিস্থান হইতে ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক কারণ-জাত এবং ইতিহাস-গ্রাহ্য। অত্যাচার, শোষণ ও সুনীতি বর্জ্জিত ব্যবহার ছিল বাংলাদেশের বিদ্রোহের মূলে। ভুট্টো যাহাই চাহেন তাহা বিশ্বমানবের সম্মুখে প্রমাণ করা সম্ভব হইবে না। কোথাও একটা যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধে যাহারা লিপ্ত নহে সেই সকল বালক বালিকা, শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, এইরূপ প্রত্যুত্তরের কোনও ন্যায়শাস্ত্র অনুগত মূল্য থাকিতে পারে না। ভারত যে যুদ্ধবন্দীদিগকে এত কাল স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দেয় নাই তাহার সপক্ষে বলা যায় যে যুদ্ধবন্দীগণ ভারত-বাংলাদেশের নিকট মিলিতভাবে বন্দী। উভয়দেশ একমত হইলে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া চলে। এখন অবধি একমত না হওয়ায় ছাড়া হয় নাই। তাহাতে ভারতের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কোনও সুবিধা বা লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এবং পাকিস্থানও কয়েক লক্ষ বাংলাদেশ-বাসীকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে যাহার কোনই উপযুক্ত কারণ নাই।

এখন যদি তিন দেশের এরূপ মত হয় যাহাতে সকল বন্দীগন নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতে পারে তাহা হইলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ উপর উপর ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরে যে বিষ আছে, পাকিস্থানের ভারত বিরোধের তীব্র অনুভূতির মধ্যে, তাহা এই সকল বন্দী বিদায়ের ফলে দূর হইয়া যাইবে না। পাকিস্থান আমেরিকা ও চীনের সাহায্যে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে এবং পাকিস্থান যদি কখনও সুবিধাবোধ করে তাহা হইলে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে দ্বিধা করিবে না। তাহা অবিলম্বে না করিলেও তাহার সম্ভাবনাই ভারতের একটা মহা সমস্যা। শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারতকে সেইরূপ সামরিক সাজসরঞ্জামের সমাবেশ করিতে হয় যাহাতে আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্রপুষ্ট পাকিস্থান ও চীনের আক্রমণ প্রতিরোধে ভারত সকল সময় সমর্থ থাকে। রুশিয়া ভারতের সহায়ক থাকিলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন জাতিই কোন বিশেষ সহায়তার উপরে একান্ত-ভাবে নির্ভরশীল থাকা সমীচীন বোধ করে না। আত্ম-রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় আত্মরক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থির নিশ্চয় ব্যবস্থা।

সাময়িকী

সিকিমে গণবিক্ষোভ

ভুটান, তিব্বত ও ভারতের দার্জ্জিলিং অঞ্চলের সন্নিকটস্থ যে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য সিকিম আছে তৎস্থলের অধিবাসীগণ সম্প্রতি সেখানের রাজা মিওরাজ চোগিয়াল চোম্প্যা পান্ডেন থণ্ডুপ নামগিয়ালের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে ও তাহার ফলে রাজা ভারত সরকারের নিকট তাঁহার দেশে শান্তি রক্ষা করিবার ও আইন বলবৎ রাখিবার জন্য ভারতীয় সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভারত সরকার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়া সিকিমে সৈন্য প্রেরণ করেন ও তাহাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতা রাজপ্রাসাদ ও অপরাপর রাজকীয় কর্ম্মকেন্দ্রের উপর আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজেদের অভিযোগ ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট উত্থাপন করেন। ভারত সরকার সিকিমবাসীদিগের অভিযোগ অন্যায় মনে করেন নাই এবং সিকিম অধিপতি চোগিয়াল নামগিয়ালকে তাঁহারা জানান যে ঐ রাজ্যে রাষ্ট্রীয় বিলিব্যবস্থা যথেষ্ট অদল বদল করা আবশ্যক। যে সকল অভিযোগ আছে তাহা দূর না করিলে সিকিমবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার ন্যায়-সঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান জগতে সকল দেশের সকল নাগরিকই অনেকটা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া থাকেন ও সেইরূপ অধিকার প্রাপ্তি একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিকিমেও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব হিমালয়ের এ রাজ্যে প্রধানতঃ লেপচাদিগের বাস। ইহাদিগের সহিত অনেক ভুটিয়া ও নেপাল আগত গোরখাও সিকিমে বাস করেন। ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া সিকিমের সীমানা হ্রাস বৃদ্ধি বহুবার হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বৃটিশের সহিত সিকিমের একটা সন্ধি হয় ও সেই সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী ভাবে ১৯৪৭ অবধি সিকিম বৃটিশের সহায়তা লাভ করিয়া থাকে। ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারত হইতে বৃটিশ চলিয়া যাইবার পরে সিকিম ১৯৫০ খৃঃ অব্দে ভারতের সহিত সন্ধি করিয়া ভারতের সাহায্যে দেশ রক্ষা ও বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। চোগিয়াল সিকিম শাসন কার্য্যে যে সিকিম কাউনসিল-এর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাতে ১৮ জন সভ্য আছেন। এই সকলের মধ্যে ৭জন ভুটিয়া ও লেপচা, ৭ জন নেপালী ও অন্য চার'জন ধর্ম্ম ও জাতির প্রতিনিধি। সিকিমে অনেকগুলি রাজ নৈতিক দল আছে। প্রধান মন্ত্রী কিন্ত রাজা চোগিয়াল নামগিয়ালের ইচ্ছামত নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও তাঁহার কথামতই শাসন কার্য্য চালাইয়া চলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বনবিভাগ, আবকারী, কৃষিকার্য্য, খাদ্য, যানবাহন প্রভৃতি নানা বিষয়ের কার্য্যভার রাজার নির্দ্দেশ অনুসারেই প্রধান মন্ত্রীর আদেশে বিভিন্ন কর্ম্মচারীর উপরে ন্যস্ত হইয়া থাকে।

সিকিমের বিস্তার ৭২৯৮ বর্গ কিলোমিটার ও জন-সংখ্যা (১৯৭১) ২০৮৬০৯। রাজধানী গ্যাংটকের নাগরিক সংখ্যা ১৫০০০ মাত্র। অধিকাংশ সিকিমবাসীই মহাযান বৌদ্ধ অথবা হিন্দু। কিছু কিছু খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মানুবর্ত্তী ব্যক্তিও আছেন।

সিকিমে ১৬৪টি প্রাথমিক শিক্ষালয় আছে। মাধ্যমিক শিক্ষালয় ২৭টি। প্রায় ২০০০০ বালক বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ মান পর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য বেতন লাগে না। তদুপরে অল্প বেতন লাগে। বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রায় ৩০০ শত সিকিমী উপাধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। সিকিমে ৫টি হাসপাতাল আছে। মোট রোগী রাখিবার স্থান আছে ২৯২ জনের মত। ঔষধালয় আছে ২৬টি ও ডাক্তারের সংখ্যা কুড়ি। ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া সকল স্থলেরই দশ মাইলের মধ্যে একটি হাসপাতাল বা ঔষধালয় আছে।

চাষবাস সিকিমের প্রধান আর্থিক অবলম্বন। এলাচ, কমলা লেবু, আপেল, আলু, চাল, ভুট্টা, জুনেরী-বাজরা,

সইয়া সীম ও আদা মূল চাষ লব্ধ ফসল। পৃথিবীর মধ্যে সিকিম প্রধান এলাচ উৎপাদক দেশ। সিকিমে ১০০ মাইল পাকা রাস্তা আছে। ৪৮টি সেতু আছে। ৫৩০টি টেলিফোন ও ৩২টি বেতার কেন্দ্র আছে। ভ্রমণ-কারীদিগের জন্য নানান ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সকল বিষয় বিচার করিলে দেখা যায় যে সিকিম প্রগতিশীল দেশ। কিন্তু জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ঐ দেশে যথাযথ ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে রাজার একাধিপত্যই প্রবল। সেই কারণেই এই জন বিক্ষোভ ও গোলযোগ।

দুর্নীতির স্থলে ন্যায় ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় দুর্নীতি অপসারণ করিয়া তৎস্থানে ন্যায়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ইহা সহজ কার্য্য নহে; তবে চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? সিদ্ধার্থ শঙ্কর পশ্চিম বঙ্গে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছেন। ইহার মূলে আছে যুব শক্তির সংগঠন ও ও সাহায্য গ্রহণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেও যদি যুব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া আসা যায় তাহা হইলে সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফলতা অর্জ্জন করিবে। এই বিষয়ে "যুগবাণী" সাপ্তাহিকে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অনেকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গত ২১শে মার্চ বুধবার, বিধান সভায় রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সরকারী অর্থ যারা অপচয় করে, যারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ায় এবং কালোবাজারী ও ভেজালকারী, সকলেই আমাদের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে সকলকে জেহাদ ঘোষণা করার জন্য শ্রী রায় অবেদন জানিয়েছেন।

শ্রী রায় স্পষ্ট করেই বলেন আপনাদের সৎ হতে হবে। আপনাদের দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। এর জন্য আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, গরীবদের রক্ষা করতে হবে। যাঁদের কথা শোনবার কেউ নেই, তাঁদের কথা আপনাদের শুনতে হবে।

এই কথাগুলো যে আমরা নতুন শুনছি তা নয়। যে বা যারাই মুখ্যমন্ত্রীর আসনে থেকেছেন তাঁদের কাছ থেকে এরকম উপদেশ সাধারণ মানুষকে আগেও শুনতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে, আশা করি ভবিষ্যতেও শুনতে হবে। তিনি যদি বিধান সভায় সভ্যদের উদ্দেশে বলে থাকেন এবং বিশেষ করে নিজের দলের সদস্যরা যদি তাঁর আবেদনে প্রথমে সাড়া দিতে থাকেন তবেই অন্যেরা মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিতে আগ্রহী হবেন সন্দেহ নেই। 'নিজ আচরি ধর্ম অপরে শেখায়' কথাটা আমাদের দেশের মনীষীরা বহুকাল আগেই বলেছিলেন। কিন্তু আমরা আধুনিক হবার ফলে, আচরণ করার থেকে উপদেশ বিতরণেই দক্ষতা অর্জন করেছি বেশী।

জাতির জনক গান্ধীজী বলেছিলেন,—আমার জীবনই আমার বাণী। কিন্তু গান্ধীশিষ্যরা বলেছেন, আমার জীবন, আচরণ বিচার করো না, আমার বাণীকেই সার বলে জেনো। যত গোলমাল এখানেই। কথায় ও কাজে ফাক দূর করতে না পারলে সৎ হওয়া যাবে কি করে?

দুর্নীতির জন্মদাতা এবং রক্ষক ত সরকার। সরকার নিরপেক্ষ হতে পারেন না বলেই ত দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন না। প্রশাসন যাদের হাতে, তাঁদের উন্নতির জন্য মন্ত্রীদের, এম এল এ-দের, তোষামোদ না করলে চলে না। মন্ত্রী বা এম এল এ-রা আবার অনুগত ভক্তদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা না করতে পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এভাবে একে অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে হয়। শুধু আমলাদের দায়ী করলে, আসল কথা বলা হয় না। মন্ত্রীরা এবং এম এল এ-রা যদি ন্যায়ের পথে চলতে অভ্যাস করতে পারেন তবে আমলারাও নিরপেক্ষ সৎ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন। নতুবা নয়।

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বিষয়ে রাজ্য সরকার বহু উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও গ্রহণ করবেন। কিন্তু এম এল এ-দের ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়রাই যদি অগ্রাধিকার পেতে থাকেন, তাকে স্বজন-পোষণ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

বেআইনী অস্ত্ররাখা নিষিদ্ধ একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আজও অন্য দলের মত সরকারী দলের আশ্রিত ব্যক্তিদের হাতেও অনেক বেআইনী অস্ত্র যে দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিবিধান কে করবে? মুখ্যমন্ত্রী কি এসব খবর রাখেন না? কোন্ কোন্ এম এল এ এইসব মস্তানদের আশ্রয়দাতা শ্রী রায় নিশ্চয়ই জানেন।

কালোবাজারী, ভেজালকারীর হাত গুঁড়িয়ে দেবার কথা মন্ত্রী ডাঃ আবেদিন ঘোষণা করেছেন। উত্তম কথা, তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কালোবাজারী, ভেজালকারীদের পকেটে যারা হাত ঢুকাতে ওস্তাদ হয়ে গেছেন, তাদের হাতগুলো আগে গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার নয় কি?

শ্রী রায় বলেছেন এম এল এ কেনা-বেচার চেষ্টা হচ্ছে। টাকা যাদের আছে তারা চেষ্টা করবেই। কিন্তু সমস্ত যুব-ছাত্র সমাজকে যারা অনৈতিকতার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছেন তাদের ক্ষমা করা যায় না। জাতির আশাভরসার স্থল হল ছাত্র-যুব গোষ্ঠী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—

'দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র জীবনেই হওয়া উচিত।'

কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বর্তমানে যুব ও ছাত্র সমাজ দেশমাতৃকার চরণে বা কোন আদর্শের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার চাইতে ব্যক্তিবিশেষের চরণেই যেন তারা আত্মনিবেদন করা শ্রেয়ঃ মনে করছেন।

এই ব্যক্তি বিশেষদের কোন্ মহৎ গুণের জন্য এঁরা এত গদ গদ হয়ে পড়েছেন আমাদের জানা নেই।

দেওয়ালে দেওয়ালে 'যুগ যুগ জিও' বলে যাঁদের নাম দেখি, তারা নিজেরা ঐ সকল লেখা দেখে তৃপ্ত পান— না লজ্জিত হন, জানার উপায় নেই। তবে এইসব দেখে আমরা লজ্জিত হই। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ নেতাজীর দেশে এঁরা কারা? এঁদের যুগ যুগ জিইয়ে রাখার জন্য আমাদের যুব ছাত্ররা এত ব্যাকুল কেন? এর মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

কিন্তু যুব ও ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা দেখে কিছুটা নিরাশ হলেও, আমরা হতাশ হইনি। কারণ যুগে যুগে, দেশে দেশে অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতির দাপটে যখন একটা জাতি বিপর্যয়ের প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়ায়, তখন যুব সমাজকেই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল। এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী যুবছাত্র গোষ্ঠী শুধু কংগ্রেসের শিবিরেই ভিড় করেছে, এমন মনে করার কারণ নেই। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের বাইরেও হাজার হাজার নির্লোভ ছাত্র-যুব নিশ্চয়ই আছে। প্রশাসন যন্ত্র ও সারা সমাজদেহকে যদি দুর্নীতিমুক্ত করতে হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়কে এই নির্লোভ যুবশ্রেণীর সাহায্যেই তা করার প্রয়াস করতে হবে। কর্তাভজা লোকদের সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। মনে রাখা দরকার যে নির্লোভ, নির্ভয়, উদার ও ত্যাগী যুব ছাত্রগোষ্ঠীই বর্তমান অবক্ষয় থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারে।

তাই নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য চাই নতুন সামাজিক মূল্যবোধ। এই নতুন মূল্যবোধের ধারক-বাহক যুব ছাত্র সমাজের হওয়াই স্বাভাবিক। তাদের পক্ষেই দুর্নীতির ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে খান খান করে দেওয়া সম্ভব। যুব ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক দলকে অফিস স্কুল, কারখানা, কলেজ ইত্যাদিতে কর্মীরা যাতে ঠিক সময়ে কাজে আসে, নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে, উপরি পাওনা কেউ আদায় না করতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কম পারিশ্রমিকের ধুঁয়া তুলে কর্তব্য পালনে ত্রুটি, বিচ্যুতি ক্ষমা করা যায় না। কর্তব্যপরায়ণ হওয়া এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধির আন্দোলনে কোন বিরোধ নেই। একটাকে অবহেলা করে, অন্যটাকে যারা জোর দেন, তাদের দুর্নীতিপরায়ণ বলাই সঙ্গত। এরূপ মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। পাড়ায় পাড়ায় ভেজালকারী, মুনাফাশিকারীদের খুঁজে বার করার দায়িত্বও এই স্বেচ্ছাসেবক দলকে করতে হবে।

সব শেষে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই যে সরকার দুর্নীতির একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করতে চান, তাঁরা যেন পরিষ্কার বুঝতে পারেন, কোনটা সুনীতি আর কোনটা দুর্নীতি। এইরূপ দুর্নীতি-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করাই প্রাথমিক কর্তব্য। সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই। নতুবা দুর্নীতিবাজ লোকদের দিয়ে দুর্নীতি দমন করার প্রচেষ্টা আকাশকুসুম কল্পনায় রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

জাতীয়করণের পরে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্কের পরিণতি

"স্টেটসম্যান" দৈনিকের বোম্বাইএর একজন বিশেষ প্রতিনিধি যে সকল ব্যাঙ্কগুলি গভর্ণমেণ্ট জাতীয় করিয়া লইয়াছেন সেইগুলির জাতীয় হইবার পরের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৭২ খৃঃ অব্দে অপরাপর ব্যবসাদার ব্যাঙ্কগুলি যে ভাবে টাকার লেনদেন চালাইয়াছেন তাহার সহিত তুলনায় যে ১৪টি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্ক ১৯৬৯ খৃঃ অব্দে জাতীয় প্রতিষ্ঠান করিয়া লওয়া হইয়াছিল সেইগুলির কার্য্যকলাপ অত্যন্তই অকর্ম্মণ্যতা দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হইবে। ব্যক্তিগত পরিচালনায় যে সকল ব্যাঙ্ক আছে সে সকল ব্যাঙ্ক নিজেদের কাজ অতি উত্তমরূপেই সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জাতীয়করণ উন্নত ও সক্ষম পরিচালনার সহজ ও সরল উপায় নহে।

ঐ সকল জাতীয় করিয়া লওয়া ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকগণ এখন ১৯৭২ খৃঃ অব্দের কার্য্যকলাপ ও হিসাব নিকাশের বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন ও তাহাদের লাভ লোকসানের বর্ণনা যখন প্রকাশিত হইবে তখন সম্ভবতঃ তাহা হইতে তাহাদের ১৯৭২এ প্রকৃত অবস্থা কি ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইবে না। ইহার কারণ, অবনতির পথে দ্রুতগতিতে গমনশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও লাভ দেখান বহুক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে।

১৪টি জাতীয় করিয়া লওয়া ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ১৯৭২ খৃঃ অব্দে শতকরা ১৫·৫০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পরিচালিত ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা ২১·৮০ টাকা হারে। যে টাকা লগ্নি করা বা ঋণ দেওয়া হয় তাহার বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় করা ব্যাঙ্কগুলির অবনতি আরও প্রকট ভাবে দেখা যায়। ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের টাকা খাটাইবার কাজ বর্দ্ধিতভাবে করিয়া ১৯৭২ খৃঃ অব্দে শতকরা ১৩·২০ টাকা অধিক করিয়া লাভজনক ভাবে ব্যবহার করেন। এই ক্ষেত্রে জাতীয় করিয়া লওয়া ব্যাঙ্কগুলির লগ্নি বা টাকা খাটাইবার কার্য্য বৃদ্ধির পরিমাণ দেখা যায় মাত্র শতকরা ৪·১০ টাকা হিসাবে হইয়াছিল। ১৯৭১ খৃঃ অব্দের শেষ শুক্রবার হইতে ১৯৭২ খৃঃ অব্দের শেষ শুক্রবার পর্য্যন্ত হিসাব দেখিলে দেখা যায় যে,জাতীয় করিয়া লওয়া ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে তিনটি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের কার্য্য বৃদ্ধি ত হয়ই নাই, বরঞ্চ কার্য্য পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাসই হইয়াছিল। এই ব্যাঙ্কগুলির নাম করা হইয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া। আমানত প্রাপ্তিতেও এই ব্যাঙ্কগুলি শতকরা ১২।১৩ টাকা মাত্র বৃদ্ধি প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দফতর উভয়ই মনে করেন যে, যখন এই সকল জাতীয় করিয়া লওয়া ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনার অবনতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়া যাইবে তখন জাতীয়করণ ও সরকারী বিলি ব্যবস্থার সমালোচনায় পার্লামেণ্ট ও অপরাপর আলোচনা-কেন্দ্রগুলি মুখর হইয়া উঠিবে। সরকার বাহাদুরের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা কাজ চালাইবার রীতিনীতি পদ্ধতি তীব্র প্রতিকূল বিচারের হাওয়ায় সর্ব্বত্র আন্দোলিত হইবে। বৃহৎ বৃহৎ জাতীয় করিয়া লওয়া ব্যাঙ্ক পরিচালনা ক্রমশঃ লোকসানের খাতায় গিয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সরকারী কার্য্যধারার অনুসরণ করিতে পূর্ব্বের তুলনায় এই সকল ব্যাঙ্কের পরিচালনার

ব্যয় বৃদ্ধি এতটা হইয়াছে যাহাতে চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। তাহার উপরে যদি আয় বৃদ্ধি না হইয়া ঘাটতি হয় তাহা হইলে অবস্থা নিঃসন্দেহ সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইবে।

১৯৭২ খৃঃ অব্দে বৃহৎ বৃহৎ জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যপরিচালনা ক্ষেত্রে যে কষ্টকর অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মহলে ঐ সকল ব্যাঙ্কগুলির দ্রুত শাখা বিস্তার সম্বন্ধে মত পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন একথা স্থির নিশ্চয় ভাবেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি এখন হইতে অত শীঘ্র শীঘ্র সাধিত হইবে না। পরিচালনা ক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষমতা যে ভাবে সুগঠিত হইয়া উঠা আবশ্যক জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কগুলির কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সেইরূপ কর্ম্মশক্তি গড়িয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। শাখার পর শাখা খোলা হইয়াছে কিন্তু সেগুলিকে যথাযথ ভাবে চালাইবার কর্ম্মচারী সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাব থাকাতেই জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে আরম্ভ করে এবং এখন অবধি সেই অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বসন্ত রোগ

ডাঃ জলধিকুমার সরকার "উদ্বোধন" পত্রিকায় বসন্ত রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

বসন্ত (smallpox) অতিপুরাতন রোগ। প্রাচীন চীনা, আরবীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই টিকার সাফল্য সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত সন্দেহের অবকাশ হয় নাই, তথাপি আজও কয়েকটি দেশে এই রোগের প্রভাব অপ্রতিহত রয়েছে। এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি একটু ভাববার বিষয়।

বহু পূর্বে পৃথিবীর অনেক দেশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহার প্রতিরোধের জন্য নানা দেশে নানা পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বসন্তের গুটিকাগুলি শুকালে উপরে যে চামড়ি (scab) হয়, চীনারা সেগুলিকে গুঁড়া করিয়া বসন্ত-প্রতিরোধের জন্য নস্য হিসাবে লইত। ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, এবং মধ্য-প্রাচ্যের অনেক দেশে, পূর্বৎসরের সঞ্চিত চামড়িগুলি গুঁড়া করিয়া সুস্থ লোকের চামড়ায় ক্ষত করিয়া তাহার উপর ঘষিয়া দিত। বংশগত পেশা হিসাবে একশ্রেণীর লোক এই কার্যে দক্ষতালাভ করেছিল। চামড়িতে বসন্তরোগের জীবাণু জীবন্ত থাকে, এবং তাহার ফলে যে সব ব্যক্তি এই ভাবে টিকা লইত তাদের কেহ কেহ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগপ্রসারে সাহায্য কোরত।

এই স্থানে রোগের জীবাণু সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কিছুদিন আগে একবার বলেছি যে, ইহা একটা ভাইরাস (virus)-জনিত রোগ। অর্থাৎ এর জীবাণু (বা জীব-পরমাণু) টাইফয়েড কলেরা প্রভৃতির ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) জীবাণু হতে অনেক ছোট। মানুষের যে কেবল বসন্তরোগ হয় তা নয়, অনেক জন্তু-জানোয়ার পশুপক্ষীরও বসন্ত হয়। তবে তাদের ভাইরাসগুলি সমগোত্রীয় হলেও মানুষের ভাইরাস হতে বিভিন্ন। গরুর বসন্ত সেইরূপ সমগোত্রীয় ভাইরাস দ্বারা হয় এবং সেই ভাইরাস দ্বারা মানুষের বসন্ত হয় না। গরুর বসন্ত-গুটিকাগুলি বিশেষতঃ তাদের স্তনদেশে ওঠে। ইংলণ্ড যখন বসন্তরোগ জর্জরিত এবং ও-দেশের মহিলাসমাজ যখন ওই রোগজনিত সৌন্দর্যনাশের ভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত সেই সময় এডওয়ার্ড জেনার নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক লক্ষ্য করলেন, যে-সব গোপরমণী দুগ্ধ দোহন করেন তাঁদের সকলেরই মুখশ্রী সুন্দর ও বসন্তের কোন ছাপ নাই। অনুসন্ধানে জানলেন যে, তাঁদের হাতের আঙুলে সামান্য একটি গরু-হ'তে পাওয়া বসন্ত-গুটিকা উঠার জন্যই তাঁরা ভবিষ্যতে ভয়াবহ বসন্তরোগ হ'তে নিষ্কৃতি পান। তারপর চলল জেনার সাহেবের গবেষণা যার ফলে জন্ম নিল বসন্তরোগের বর্তমান টিকা।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, যে-রোগের প্রতিকার এত সহজসাধ্য, সেই রোগ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছে কেন? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation)-র কাছেও কয়েক বৎসর আগে ঐ প্রশ্ন

জেগেছিল। তাঁরা অনেক বিচার বিবেচনা করে স্থির করলেন যে, পৃথিবী হতে এই রোগের দূরীকরণ সম্ভব ও সহজসাধ্য। সেইজন্য তাঁরা গত সাত-আট বৎসর ধরে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন এই পথে এবং বহুলাংশে সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় আফ্রিকা-মহাদেশের বহু দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি অনেক স্থান—যেখানে বসন্তরোগ যুগ যুগ ধরে বাসা বেঁধে ছিল, আজ বসন্তমুক্ত। ১৯৪৫ সালে ৯১টি দেশে বসন্তের রোগী ছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে মাত্র ১৭টি দেশে এই রোগ দেখা গিয়াছে। বর্তমানে ইহা মাত্র সাতটি দেশে সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয়, ভারত পাকিস্থান এই বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে এবং আরও দুঃখের বিষয়, পশ্চিম-বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি খুবই অস্বস্তিকর। যাই হোক, এ সত্ত্বেও ভারত সরকার ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এই দেশকে বসন্তরোগমুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় এই রোগ সম্বন্ধে যে সব নূতন তথ্য জানা গেছে, সেগুলি আমাদের সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সকলেই জানেন, এই রোগ এবং অন্যান্য অনেক রোগের নিবারণের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে জনসাধারণের অজ্ঞতা। দেশকে মহামারী-মুক্ত করতে হলে জনসাধারণকে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হবে। এক একটি বিষয় ধরে এ বিষয় আলোচনা করব।

(১) মানুষ কি অন্য জীবজন্তু হতে বসন্তরোগ পেতে পারে?

আগেই বলেছি যে, অন্যান্য অনেক জীবজন্তু পশুপক্ষীর বসন্তরোগ হয়, কিন্তু তাদের রোগের জীবাণু হতে মানুষের বসন্ত হয় না। যাঁরা সারা পৃথিবী হতে বসন্তরোগের উচ্ছেদের কথা ভাবছেন, তাঁদের কাছে এ প্রশ্নটা খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ মানুষ যদি অন্যান্য জীবজন্তু হতে এই অসুখ পায়, তা হলে মানবসমাজকে বসন্ত-রোগমুক্ত করতে হলে, সেইসব জীবজন্তুকেও রোগমুক্ত করতে হবে, এবং সে ক্ষেত্রে সমস্যাটা যে শুধু খুবই জটিল হবে তা নয়, এর সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অনেকেই কই মাগুর প্রভৃতি মাছ হতে মানুষের বসন্ত হওয়ার কথা শুনেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা ল্যাবরেটারিতে গবেষণা করে যা জেনেছি, তাতে এরকম বিশ্বাসের কোন ভিত্তি পাই নাই। বানরের বসন্তের সঙ্গে মানুষের বসন্তরোগের অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় সম্প্রতি অনেক গবেষণা হয়েছে এই নিয়ে। আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে পাঁচ-সাতটি লোকের বানর হতে বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়া প্রমাণিতও হয়েছে। এই অঞ্চলের লোকেরা শুধু যে বানরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে তাই নয়, বানরের মাংসও তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। বহু অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে এরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম, দুইপ্রকার রোগের জীবাণুর পার্থক্য আছে, এবং ওইভাবে মানুষ কচিৎ আক্রান্ত হলেও, বানর-বসন্তরোগের ভাইরাস এক ব্যক্তি হতে অন্যের দেহে সঞ্চারিত হয় না। যাই হোক, বর্তমানে ইহাই ধারণা যে, একজনের বসন্তরোগ হতে হলে সে কেবল অন্য একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হতেই এই অসুখের জীবাণু পেতে পারে।

(২) বসন্তের টিকা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে: (ক) তরল (liquid) ও শুষ্ক করা টিকা বীজ (freeze dried vaccine lymph): এখন সারা পৃথিবীতে শুষ্ক করা টিকার বীজ ব্যবহৃত হয়। তরল বীজ ব্যবহার করা বন্ধ করা হয়েছে, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপে অনেক জীবাণু তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। তাছাড়া তরল বীজে যে-সংখ্যক জীবাণু ব্যবহৃত হোত, এখনকার শুষ্ক বীজে তার চেয়ে অনেক বেশী জীবাণু থাকে। শুষ্ক করা জীবাণু গরমে নষ্ট হত না। ছোট বড় সকলকেই এই বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া যেতে পারে।

(খ) কত ছোট বয়সে টিকা লওয়া যায়? আমাদের দেশে যেখানে বসন্তরোগ প্রতি-বৎসর দেখা যায়, সেখানে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরই টিকা হওয়া উচিত। তবে শিশু জন্মিবার সময় যদি সেই শহরে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব না থাকে অর্থাৎ বসন্তরোগের ঋতু না হয়, এবং মায়ের যদি

নিয়মিতভাবে টিকা লওয়া থাকে তবে চার-পাঁচ মাস পরে টিকা দেওয়া যেতে পারে।

(গ) কতদিন অন্তর টিকা লওয়া উচিত? সাধারণভাবে, একবার টিকা ঠিকমত উঠলে বৎসরতিনেক টিকা না নিলেও চলে। তবে যে সব দেশে প্রতিবৎসর বসন্তরোগ দেখা দেয় প্রতি বৎসর টিকা লওয়া নিরাপদ।

(ঘ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে টিকা লওয়া উচিত?

যখন আশেপাশে বসন্তরোগ দেখা দেয়, তখন কোন অবস্থাতেই টিকা লওয়া বারণ নয়। তবে অন্য সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে টিকা না নিতে পারে অথবা বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে টিকা নিতে হয়, যেমন লিউকিমিয়া (leukaemia) প্রভৃতি কঠিন অসুখে ভুগছে, অথবা খুব জ্বর, একজিমা বা এ্যালার্জির রোগী ইত্যাদি। সন্তান-সম্ভাবনা-অবস্থার পূর্বে জন্মটিকা লওয়া থাকলে নির্ভয়ে টিকা নিতে পারে।

(ঙ) কতদিন পরে আবার টিকা নিলে টিকা উঠবে আশা করা যায়?

টিকার বীজ যদি ভাল হয় তবে একবৎসর পরেই শতকরা আশিজনের টিকা উঠবে আশা করা যায়। তবে মনে রাখবেন পুনঃ পুনঃ টিকা নিলে, জন্মটিকা বা প্রথম বারের টিকা উঠার মত বড় হয় না। পাঁচ ছয় দিন পরে যদি সামান্য ফুস্কুরি বা ফুলার সহিত ছোট চামড়ি বর্তমান থাকে, তাকেই টিকা "উঠা" বলা হয়।

(৩) জলবসন্তের (chickenpox) জীবাণু কি বসন্ত বা আসলবসন্তের (smallpox) জীবাণু হতে আলাদা?

হাঁ, সম্পূর্ণ আলাদা। বসন্তের টিকা নিলে জলবসন্তকে প্রতিরোধ করা যায় না। জলবসন্ত হয়েছে এরূপ অবস্থাতেও দরকার হলে বসন্তের টিকা নিতে পারে।

(৪) বসন্তের ভাইরাস কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে?

রোগের জীবাণু রোগীর হাঁচি কাশি বা কথা-বার্তার সময় যে সামান্য থুতুর টুকরা ভাসে, সেগুলির মধ্য দিয়া ভাইরাস আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে। বিছানায় লাগা বসন্তের স্ফোটকের রস, বা শুষ্ক চামড়ির (scab) গুঁড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকেও অসুখের সৃষ্টি করতে পারে, এমন কি রোগীর প্রস্রাব এবং চোখের জলেও রোগের জীবাণু পাওয়া যায়।

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে বসন্তরোগ হয় না সেখানকার লোকেরাও পৃথিবী হতে এই রোগের উচ্ছেদ চান। সেটা যে কেবল পরোপকার করবার জন্য তা নয়। তাঁরা জানেন যে, বর্তমান যুগে যানবাহন বা যাতায়াতের সুবিধার জন্য পৃথিবীর যে-কোন অংশে বসন্তরোগ থাকলে তাঁরাও নিরাপদ নন। সম্পূর্ণ সজাগ না থাকলে লেলিহান অগ্নিশিখার মত তাঁদের দেশেও মহামারীর আগুন ছড়িয়ে যেতে পারে।

দিল্লীতে সি পি আই-এর মিছিল

"লালতারা" পাক্ষিক পত্রিকায় দিল্লীর সি পি আই আয়োজিত মিছিল সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে :—

রাজধানীতে যে রাজকীয় মহামিছিলের আয়োজন ভারতের 'কমিউনিস্ট পার্টি' করেছিল তাকে তারা বলছে ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক বটে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ সেজে, ভারতের গণকণ্ঠের দাবীদার হয়ে, শ্রমিকশ্রেণী তথা ব্যাপক জনগণের আপোষহীন সংগ্রামের চেতনাকে তারা যে শ্রেণী সহযোগিতার রাস্তায় মহড়া দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে—এটা তাদের ঐতিহাসিক কৃতিত্বই বটে।

তাদের এই দিল্লী অভিযান দিল্লীশ্বরদের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল না ভারতের জনগণের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তপ্রভু, মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে। তারা দিল্লী গিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর "সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তি" যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে ইন্দিরার হাত শক্ত করতে। তারা দিল্লী গিয়েছিল শাসক ও শোষকদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে—তারা তাদের সঙ্গেই আছে।

এই অভিযানের পূর্ব্বে মাসাধিককালব্যাপী তারা প্রস্তুতি চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করেছে। তারা যে প্রচারপত্র দিয়েছে, তাতে তারা বলছে—দেশের এই যে সংকট, এত যে দারিদ্র্য, তার সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে দিল্লীতে। দিল্লীতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা অর্থাৎ দিল্লী থেকে আইন পাশ করলেই এইসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। অর্থাৎ দিল্লীর মসনদ থেকে কিছু ফতোয়া জারী করলেই আমরা সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাব।

এইসব আইনী মার্কসবাদীদের কাছ থেকে এ ধরণের বক্তব্যই স্বাভাবিক। তারা রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রটিকে আড়াল করে রাখছে। শ্রেণী শত্রুদের তারা চিহ্নিত করছে শ্রেণী মিত্র হিসাবে। তারা আবার নতুন করে সব ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের সুপারিস জানিয়েছে। দাবী জানিয়েছে কারখানা পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের। অথচ বিগত কয়েক বছরে যে কয়েক ডজন 'জাতীয়করণ' হল তার নীট ফল সবাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আর কারখানা পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের এই দাবী তারা করছে একদল সুবিধাভোগী বাবু শ্রমিক তৈরীর বাসনায়—যার ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব-পূর্ণ পর্দা হিসাবে কাজ করবে। আসলে তারা বর্তমান অর্থ-নৈতিক সম্পর্কের উচ্ছেদ চাইছে না, চাইছে না শোষণের অবসান, চাইছে সরকারী পরিচালন ব্যবস্থা। তারা পুঁজির বর্তমান চেহারার বদলে চাইছে আমলা-তান্ত্রিক চেহারা—আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে তারা চাইছে সোভিয়েত মডেল, কারণ এদেশে তারাই হচ্ছে সোভিয়েত লুটেরাদের খাস উকিল।

শাসকগোষ্ঠী বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাষ্ট্রীয়করণকে অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মচারী প্রতিনিধি রেখে পুঁজির সামাজিক চেহারা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আর এই সমস্ত জঞ্জালকেই তেরঙার ছত্রছায়ার লালিতপালিত মার্কসবাদীরা সমাজ-তান্ত্রিক পদক্ষেপ বলে তারস্বরে চীৎকার করছে।

সংবাদে প্রকাশ এই 'ঐতিহাসিক' মিছিলে শ্রমিকদের সামনে ভাষণদান কালে পার্টির সেক্রেটারী কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে। এই ঐক্য প্রয়োজন দেশের একতা রক্ষার জন্য। চমৎকার! এত বহুল প্রচারিত, বহু বিঘোষিত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি শাসকদের সঙ্গে ঐক্যের বাসনা জ্ঞাপনে!

দিল্লীশ্বরেরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত করেন নি। বস্তুতঃ বহু আগেই তারা তাদের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। নিন্দুকেরা বলছে এই ঐতি-হাসিক মিছিল সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিনা পয়সায় বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, যার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, যার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বাক্যবাণের ফুলঝুরি সেই দিল্লী মদৎ দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে।

তারা নিজেদেরকে যত বড় শ্রমিক-কৃষক দরদী বলে জাহির করবার চেষ্টা করুণ না কেন ইতিহাসের চাকাকে তারা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে না। তাদের এই বিরাট কর্মকাণ্ড শ্রমিকশ্রেণী তথা ব্যাপক জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে শ্রেণী সমঝোতার নির্লজ্জ নিদর্শন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কনফুসিয়াস

শ্রীরমেন গুহ "বরেন্দ্রভূমি" সাপ্তাহিকে মহাত্মা কনফুসিয়াসের বিষয় বলিয়াছেন :—

একটি মহাজীবন—যার অবদান আজও চীনের জন মানসকে প্রভাবিত করে। যে জীবনবেদ তিনি দিয়ে গেছেন, সেটা কি শুধু চীনের জনসাধারণের পক্ষেই প্রযোজ্য? নিশ্চয়ই না, কেননা সেই সুদূর অতীতে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যা বলে গেছেন সেটা সবকালের সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই প্রযোজ্য।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে যে সময় চীনে সম্রাট লেবংএর রাজত্ব চলছিল সে সময় বর্ত্তমানে যেটা সাটুং রাজ্য,

সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্পবয়েসেই তিনি ঋষিকল্প লাউৎসে ও মহাপণ্ডিত চেংশির জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০৫ অব্দে তিনি চীন সম্রাট কর্ত্তৃক বিচারক রূপে ও পরে প্রধানমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হয়ে ধর্ম অবলম্বনে রাজনীতি ও সমাজনীতি সংস্কারে ব্রতী হন।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি উপলব্ধি করেন যে দেশের জনসাধারণের নীতিজ্ঞানকে যদি ঠিক-ভাবে জাগ্রত করতে না পারা যায় তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ কখনই সাধিত হবে না। তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যদি রাজার চরিত্র দৃঢ় না হয় তবে প্রজার চরিত্র সংশোধন অসম্ভব। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ঈশ্বর ও ধর্মীয় মতবাদের প্রতি সবস্তরের মানুষের গভীর অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারলেও পার্থিব ব্যাপারে কতগুলো সুনিয়ম পালন করাতে পারলে দেশের হিত-সাধন সম্ভব। সেজন্য তিনি জাতির সর্ববিধ সংস্কার এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতিকল্পে একটি মহৎ পরিকল্পনা রচনা করেন ও সেজন্য ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তিমান ও নির্ম্মল বুদ্ধিযুক্ত দশজন ব্যক্তিকে তাঁহার শিষ্যত্বে আনয়ন করে কার্য্যারম্ভ করেন।

জাতীয় কয়লা খাদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানের ইংরেজী নাম The National Coal Development Corporation বা সংক্ষেপে NCDC. ইহা গঠিত হয় উন্নত প্রণালীতে কয়লা উত্তোলন কার্য্য সাধন প্রবর্তনের জন্য। পোলাণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে কয়লা খনির কর্মী আনাইয়া ভারতের মাল কাটা দিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ শিখাইবার ব্যবস্থাও NCDC করিয়াছিলেন। ১৯৭২-৭৩ এ ঐ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক হিসাবে দেখা যায় ২ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। এই সংবাদ আসানসোল হইতে প্রকাশিত Coal Field Tribune পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে NCDCর লোকসান হইয়াছিল ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বের তুলনায় কিন্তু NCDCর কয়লা উত্তোলন অধিক হইয়াছে। পরিকল্পনা ছিল এক কোটি ষাট লক্ষ টন তুলিবার, কিন্তু তোলা হইয়াছিল মাত্র এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টন। এই পরিকল্পনায় পূর্ব্বে স্থির হয় NCDC এক কোটি আশি লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু পরে উহা হ্রাস করিয়া ক্রমে ক্রমে ১·৭ কোটি ও ১·৬৯ কোটি নির্দ্ধারণ করা হয়। সরকারী ব্যবস্থা বিশেষভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধার জন্য করা হইলেও NCDC ওয়াগন না পাইয়া কার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই কারণে তাঁহাদিগের যাহা উচিত ছিল ততটা কাজ হয় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা উত্তোলন কার্য্য ভারতে হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। কয়লাখনি জাতীয়করণ-এর একটা কারণ দেখান হইয়াছিল এই যে ব্যক্তিগত পরিচালনা যথাযথ নহে। এবং তাহাতে ভারতের কয়লার সম্পদ অপচয় হইতেছে। অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে খনির কার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য সরকারীভাবে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকর হয় নাই। এখন সকল খনিগুলিকেই জাতীয়-ভাবে পরিচালনা করিলে গভর্ণমেন্ট আশা করিতেছেন যে কয়লার উত্তোলন কার্য্যে এর অপচয় ঘটিবে না।

দেশ-বিদেশের কথা

কারখানা বা কারবারের উন্নতিসাধন কাহাকে বলে

যখন বলা হয় যে কোন একটা কারখানা, কারবার অথবা অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর ভাবে পরিচালিত হইতেছে বা তাহার বাস্তব পরিস্থিতি পূর্ব্বের তুলনায় অধিক উৎপাদন ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে, তখন সেই কথার সত্যতা বিচার করিতে হইলে তৎসংশ্লিষ্ট নানান বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরিদর্শন করিতে হয়। দেখিতে হয় যে উৎপাদন কার্য্য অথবা ব্যবসায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবে হইতেছে কি না। উৎপাদন যদি টনের হিসাবে ধরা হয় তাহা হইলে তাহা যত টন হওয়া উচিত তত টন হইতেছে কি না। এবং কম হইলে লক্ষ্যের অপেক্ষা শতকরা কত টন কম হইতেছে। যদি দেখা যায় উৎপাদন যত হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা শতকরা কুড়ি টনেরও অধিক হ্রাসের দিকে আছে, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে উৎপাদন কার্য্য যথাযথ ভাবে চালিত হইতেছে না। ইস্পাতের কথা ধরা যাউক। যদি কোনও কারখানায় মাসিক ১০০০০০ টন ইস্পাত হওয়া উচিত হয় এবং দেখা যায় যে পঁচিশ হাজার টনও হইতেছে না, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষ সংস্কার আবশ্যক। উৎপাদন লক্ষ্যের হিসাবে অর্দ্ধেক হইলে যন্ত্রপাতি অদল বদলের কথা বিচার করিতে হয় ও তাহার জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার আনুমানিক পরিমাণ ন্যায়-সঙ্গত কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে ইতিপূর্ব্বে কোনও হিসাব হইয়াছিল যে-হিসাবে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ধার্য্য হইয়াছিল ও এখন হিসাব হইতেছে ৩০ কোটি টাকা তাহা হইলে ব্যয় প্রায় তিন গুণ বাড়িয়া যাওয়ার স্পষ্ট সহজবোধ্য কারণ প্রদর্শনের কথা অবশ্যই উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এই সকল কথার কোনও উত্তর না দিয়া যদি নানাবিধ অবান্তর বিষয়ের আলোচনা ও উৎপাদন কার্য্যের সহিত সম্বন্ধহীন বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তাহা হইলে জনসাধারণের সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে। যদি বলা হয় যে অধিক ব্যয় করিয়া উৎপাদনের পূর্ব্ব-প্রকল্পিত লক্ষ্যের পরিমাণ ১০০০০০ লক্ষের অধিক করা হইতেছে তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে সেই উৎপাদন-আধিক্য ব্যয়াধিক্যের তুলনায় যথেষ্ট হইতেছে কি না। অর্থাৎ ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যদি বাৎসরিক এক লক্ষ টন মাত্র অধিক উৎপাদন হয় তাহা হইলে যদি এক টন ইস্পাতের মূল্য ৭০০ সাত শত টাকা ধরা হয় তাহাতে অধিক উৎপাদনের আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় মাত্র সাত কোটি টাকা। এই অধিক উৎপাদন অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া যথেষ্ট বলিয়া মনে না হইলে এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যবস্থাও সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। উপরন্তু যদি তিনগুণ অধিক ব্যয় করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি যথাযথভাবে না হয় তাহা হইলে বিষয়টা আরও জটিল রূপ ধারণ করিবে।

পুরাতন পন্থা অনুসরণে যদি পূর্ব্বে বাৎসরিক নয় লক্ষ বা ততোধিক টন মাল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমানে নূতন নূতন পরিচালনা নীতির অবতারণা করিয়া ও সেই নীতি প্রতিষ্ঠার বর্দ্ধিত ব্যয় ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সহজ পথ ছাড়িয়া কঠিন দুরারোহ পথে চলিবার পরিকল্পনা অর্থনীতির দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শে কাজ চালান একটা পুরাতন রীতি। বর্ত্তমানে কয়লার খনি, ইস্পাতের কারখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জাতীয়করণ বা তাহাতে জাতীয় ভাবে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্তি, কোনও বিদেশী পরামর্শদাতাদিগের মতে

প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না আমরা বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের জনসাধারণের নিকট সে কথা ব্যাক্ত করা হয় নাই। ভারতের রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির মালিক ভারতবাসীরাই এবং তাহাদিগকে পদে পদে সকল কথা জানাইয়া করাই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। জনসাধারণকে না জানাইয়া কোন নূতন পন্থা অবলম্বন উচিত কার্য্য নহে। ইহাতে যদিও সাময়িকভাবে দল ভারী হইতে পারে, তাহা হইলেও শেষ অবধি ইহার দ্বারা শাসকদিগের উপর জনসাধারণের আস্থা সুরক্ষিত থাকে না।

পানামা রাষ্ট্র ও পানামা খাল

মধ্য আমেরিকাব পানামা খাল সম্বন্ধে কলিকাতার রুশ কনসুল প্রকাশিত "বাকগ্রাউণ্ডার" বার্ত্তা পত্রে লেখা হইয়াছে :—

১৬ কিলোমিটার প্রশস্ত ভূখণ্ড—পানামা খাল অঞ্চল পানামারই অংশ। একটি অন্যায্য চুক্তির বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ভূখণ্ড কুক্ষিগত করেছে। এক উপকূলভাগ থেকে অপর উপকূলভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ৬৫.২ কিলোমিটার দীর্ঘ খালটির ২৫টি বাঁক আছে। এই খাল অতিক্রম করতে একটি জাহাজের ৮ থেকে ১১ ঘণ্টা লাগে। এই খালে সর্বোচ্চসংখ্যক জাহাজ চলাচল করতে পারে দিনে ৫৮টি।

পানামার জনগণ খাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের পথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে। ১৯০৩ সালের শৃঙ্খলবৎ চুক্তির বিরুদ্ধে খাল অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে মার্কিন সৈন্যদল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে ২০ জনকে হত্যা ও কয়েক শত ছাত্রকে আহত করে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে মার্কিন-পানামা সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে।

পানামাকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকার থেকে থেকে মধ্য আমেরিকায় নতুন খাল কাটার বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে। অন্যত্র খাল কাটা হলে পানামায় অর্থ-নৈতিক সংকট দেখা দেবে এই ভয় দেখিয়ে পানামাকে কাবু করার জন্যই এই সব প্রস্তাব তোলা হয়। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করেন যে, অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় একটি নতুন খাল কাটাবে পরিকল্পনা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলা হল যে, অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল আগে তৈরী পানামা খাল একেবারেই পুরনো, অগভীর ও সংকীর্ণ এবং এ খালে যথেষ্ট দ্রুত বেগে জাহাজ চলাচল করতে পারে না। এই কারণেই নতুন খাল কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় নি এবং পরিকল্পনাটি ধামাচাপা পড়ে।

খাল অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লগ্নীর পরিমাণ অনুমান দেড় শতাধিক কোটি ডলার (প্রকৃত অঙ্ক জনসাধারণের কাছে কখনও প্রকাশ করা হয় না) এবং এর মধ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ ধরা হয় নি। পানামায় ১৪টি বিদেশী (মার্কিন) সামরিক, বিমান ও নৌঘাঁটি আছে।

খাল অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য থাকায় এর থেকে সে কোটি কোটি ডলার মুনাফা করে। ১৯০৬ সালের চুক্তি অনুসারে খাল অঞ্চলে শুধু মার্কিন সম্পত্তি থাকতে পারে। খাল সংক্রান্ত ১৯৫৫ সালের নতুন চুক্তিতে পানামার বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীকে কিছু কিছু অর্থ-নৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খালের রণনৈতিক গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয় বললেই চলে। খাল অঞ্চল সংক্রান্ত আন্দোলনই হল পানামার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মেরুদণ্ড। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্তিলাভের জন্য পানামার জনগণ লড়ছে।

১৯৫৮ সালের ছাত্রবিক্ষোভ, ১৯৫৯ সালে খাল অঞ্চলে পানামার পতাকা উত্তোলন এবং ১৯৬২ সালের ছাত্র ধর্মঘট পানামার জনগণের গভীর অসন্তোষের অভিব্যক্তি। ১৯৬৩ সালের ৯ই জানুয়ারি জন-আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। খাল অঞ্চলে মার্কিন নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়ায়।

১৯৬৮ সালে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যে পরিস্থিতিতে একদিকে শাসকচক্রের আর শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা থাকে না এবং অপর দিকে গণ-আন্দোলনে দৃঢ়সঙ্কল্প বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এক গোলমেলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলে বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর কয়েকটি অংশের এক শিথিল জোট ক্ষমতাসীন হয়। রাজনৈতিক সংকট আসন্ন হয়ে উঠলে দেশের একমাত্র সংগঠিত শক্তি জাতীয় রক্ষী বাহিনী (ন্যাশনাল গার্ড) বিদ্রোহ করে ১৯৬৮ সালের ১১ই অকটোবর আরিয়াস সরকারকে উৎখাত করে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফল দাঁড়াল এই যে, সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হল, নির্বাচনের ফলাফল নাকচ করা হল এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হল। পানামার বিশেষ অবস্থায় অভ্যুত্থানের অন্যান্য ফলও হল। জাতীয় পরিষদ বা সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন পানামা খাল চুক্তি, সামরিক চুক্তি এবং একটি নতুন খাল সংক্রান্ত চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকল না। এটা হল একটা দিক, আর একটি দিক হল, সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ায় এবং রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত শাসকচক্রের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ল।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী, সি আই এ-র চর এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অফিসাররা বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ, পানামা প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টিকাল থেকে এ যাবৎ যত মার্কিন নির্ভর সরকার দেখা গেছে তাদের কর্মনীতির থেকে নতুন সরকারের কর্মনীতি স্বতন্ত্র।

যাইহোক, ১৯৬৯ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থান একদিকে প্রাক্তন শাসকচক্র ও সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরদিকে জেনারেল তোরিজোসের সামরিক সরকারের মধ্যে তীব্র হয়ে-ওঠা বিরোধকে উদ্ঘাটিত করে দিল। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে গেল: নতুন সরকার সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করলেন এবং কমিউনিষ্ট সহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন। সরকার কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীর তৎপরতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং কয়েকজন রাজনীতিবিদের গতিবিধির স্বাধীনতা সংকুচিত করলেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন শুরু হল। আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার (ও এ এস) একটি অধিবেশনে পানামার প্রতিনিধিরা সংস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। রিও আতো বিমান ঘাঁটির ইজারার মেয়াদ (১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে মেয়াদ শেষ হয়) বাড়ানোর জন্য মার্কিন প্রস্তাব এবং পানামা খাল, সামরিক সহযোগিতা ও নতুন খাল খনন সংক্রান্ত মার্কিন সরকারের খসড়া চুক্তিগুলি আলাপ-আলোচনার পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য বলে পানামা সরকার অগ্রাহ্য করেছেন।

ইসরায়েল কর্তৃক লিবিয়ার যাত্রী বিমান ধ্বংস

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানগুলি একটি লিবিয়ান যাত্রীবিমান-এর উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাকে গুলি ও রকেট মারিয়া সিনাই অঞ্চলে ভূপাতিত করে ও তাহার ফলে শতাধিক নির্দোষ নরনারী শিশু প্রাণ হারান। এই ঘটনাতে বিশ্বের সর্বত্র ইসরায়েল-এর এই ঘোরতর অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদের সূচনা হয়। ইসরায়েলের যুদ্ধবিমানগুলির পক্ষে লিবিয়ান যাত্রী-বিমানটিকে যাত্রীবিমান ব্যতীত অপর কোন প্রকারের বিমান বলিয়া ভুল করিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না এবং তাহারা যে ভাবে ঐ যাত্রী-বিমানটিকে গুলি ও রকেট মারিয়া ধ্বংস করে তাহা করিবারও সভ্য জগতে অনুসৃত কোন রীতি ছিল না। সুতরাং ঐ কার্য্য ইসরায়েলের চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচায়ক ও তজ্জন্য বিশ্বের বহু কেন্দ্র হইতেই ঐ কার্য্যের প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে আরম্ভ হয়। কাইরো হইতে আরবদিগের দ্বারা প্রকাশিত একটি পুস্তিকাতে ঐ সকল সমালোচনার অনেকগুলি সন্নিবদ্ধ

করা হয়। আমরা তাহার কিছু কিছু এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক কুর্ট ওয়াল্ড-হাইম বলেন যে এই ঘটনাটি চরম ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরভাবে নির্দ্দোষ ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে প্রাণে মারিবার একটি ইতিহাসে বিরল উদাহরণ। তিনি এই ঘটনাটি সম্বন্ধে পূর্ণ অনুসন্ধান যাহাতে হয় তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পোপ ষষ্ঠ পল একটি বার্ত্তাতে বলেন যে তিনি এই ঘটনার কথা জানিয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পরমেশ্বরের নিকট নিহত ব্যক্তিদিগের আত্মার চিরশান্তির ও তাঁহাদের পরিবারের সকলের সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এবং এই নিদারুণ অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে অশেষ নিন্দামূলক ঘোষণা করিতেছেন।

রাষ্ট্রপতি ইয়োসিপ ব্রোজ টিটো ইসরায়েলের এই কার্য্যকে বর্ব্বরতার নিদর্শন বলেন।

চ্যান্সেলর উইলি ব্রাণ্ট ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সিনাই-এর শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে জার্মান জাতির মনোকষ্টের কথা জ্ঞাত করান। চ্যানসেলরের সহকারী সম্পাদক গুন্থার ভ্যান ওয়েল ইসরায়েলের রাজদূত বেন হোরিনকে বলেন যে ইসরায়েলের এই কার্য্যের ফলাফল বহুদূর বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত হইতে থাকিবে ও সেই কথা ভাবিয়া জার্মান জাতি উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেছেন। ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্বন্ধ মন্ত্রী মোরিস সুমান ইসরায়েলের প্রতিনিধিকে ডাকিয়া বলেন যে ফ্রান্স ইসরায়েলের এই কার্য্যের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে প্রতিবাদ করিতেছেন। ঐ বিমানে ফরাসী চালক ইত্যাদি থাকাতে এই প্রতিবাদ আরও রাষ্ট্রীয় আকার ধারণ করিতেছে। ফরাসী রাষ্ট্র এই কার্য্যকে বেআইনী বলিয়া মনে করেন। আরও মনে করেন যে এই কার্য্য হিংসাত্মক ভাবে শক্তি প্রদর্শন ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতার মধ্যে পার্থক্য বোধের অভাব প্রমাণ করে। ইসরায়েলের ফরাসী প্রতিনিধি ইসরায়েলের বৈদেশিক মন্ত্রী আব্বা এবানের সহিত দেখা করিয়া বলেন যে এই বিমান ধ্বংসের ফলে মধ্য এশিয়ায় একটা করাল ছায়া পড়িয়াছে। ফরাসী জনসাধারণ ইহাতে বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ইতালীয় সরকার এই ঘটনাকে নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী আদম মালিক বলেন যে ইসরায়েল এই বিমান ধ্বংসের যে প্রকার সাফাইই দিন না, কেন ইহার একমাত্র অর্থ পূর্বকল্পিত ভাবে হত্যা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রীর তরফ হইতে বলা হয় যে এই কার্য্যের জন্য কোনও ভাবেই দোষক্ষালন সাধন সম্ভব হইতে পারে না। ইহাতে সকল মানবীয় সুনীতির আদর্শ বিনাশ করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার কোনও সমর্থন কেহ কোনও ভাবেই করিতে পারে না।

আফঘান সরকার ইসরায়েলের এই কার্য্যের ঘোরতর নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ব্যবহারে যথেচ্ছাচার সম্বন্ধে বিশ্বমানবীয় বিরুদ্ধতা জাগরণের বিষয় ইঙ্গিত করেন। সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক ইসরায়েলের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ একান্ত দ্ব্যর্থবর্জ্জিত ভাবে ইসরায়েলকে জানাইয়াছেন। বৃটিশ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্র ইহাকে ইসরায়েলের অপরাধ প্রবণতার নিদর্শন বলেন এবং ইহাও বলেন যে ইসরায়েল অপরাধ যাহাতে না হয় সে চেষ্টার পরিবর্ত্তে ক্রমাগতই অপরাধ বৃদ্ধির দিকে চলিতেছেন। ইহার ফলে কদাপি মধ্য এশিয়ার শান্তি স্থাপন সম্ভব হইবে না।

আরও বহু রাষ্ট্র ও অপর প্রতিষ্ঠান এই বিমান ধ্বংস সম্বন্ধে তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। সেই সকলের উত্থাপনা এই স্থলে সম্ভব নহে।

কোপারনিকাসের পঞ্চশত জন্মবার্ষিক [illegible] লন

শ্রীযুক্ত উইক্টর ক্লিনেস্কি পোলাণ্ডের রা[illegible]দূত। তিনি বিখ্যাত জ্যোতি[illegible] নিকে[illegible]

পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলেন যে কোপারনিকাস সূর্য্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের তথ্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মানুষের অজ্ঞানতার শৃঙ্খল এই আবিষ্কারের ফলে আরও অধিক করিয়া খুলিয়া গিয়াছিল। এই কারণে বিশ্ববাসী কোপার্নিকাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন কেননা ঐ মহাপুরুষ সূর্য্যকে নিজ কেন্দ্রে গতিহীন করিয়া বসাইয়া গিয়াছেন এবং পৃথিবীকে চক্রাকার পথে চলনশীল করিয়া রাখিয়াছেন। কোপারনিকাসের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী শুধু পোলাণ্ডেই মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে না; পৃথিবীর নানা দেশেই ঐ উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভের দিকে কোপার্নিকাস জয়ন্তীর সময় ঠিক করা হইয়াছে। তিনি নিজ দেশ পোলাণ্ডের কি করিয়া উন্নতি হইবে সর্বদাই এই চিন্তা করিতেন। ১৯৭৩ খৃঃ অব্দকে পোলাণ্ডের বিজ্ঞানের বৎসর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই বৎসরের আরম্ভ কালে পোলাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিয়টর জরৎসেভিসৎস ভারতে আগমন করেন ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নিকোলাস কোপার্নিকাসের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি উপহার দিয়া যান। বলা যাইতে পারে যে ঐ সময় হইতেই ভারতবর্ষে কোপোর্নিকাসের জন্মবার্ষিকী আরম্ভ করা হইয়াছে। "পোলিস ফ্যাক্টস অন ফাইল" পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে এখন হইতেই পোলাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষ্টি ও বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে মিলিত প্রচেষ্টার ব্যবস্থা হইবে। একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হইবে। তবে তাহাতে বিলম্বও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কিনেসকি আরও বলেন যে তাঁহারা আশা করেন যে এই বৎসর সেপ্টেম্বরে ভারত হইতে অনেক বৈজ্ঞানিকেরা কোপারনিকাস পঞ্চশত জন্মবার্ষিকীতে যোগদান করিতে পোলাণ্ড গমন করিবেন। ঐ সময় ঐ দেশে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্ সম্মেলনের বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। আরও বলা হয় যে কোপার্নিকাসের জীবন ও জ্যোতিষ শাস্ত্র ক্ষেত্রে অবদান লইয়া একটি চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহা ভারতবর্ষে দেখান হইবে। ভারতবর্ষে যে কোপার্নিকাসের জন্ম পঞ্চশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান ব্যবস্থা করা হইয়াছে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত কিনেসকি ভারত সরকার ও এই দেশের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠান পোলাণ্ডের তরুণ নামক স্থানে হইবে। ঐ স্থানেই পাঁচশ বৎসর পূর্বে কোপার্নিকাস জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অপরিণতবয়স্কদিগের মধ্যে সুরাপান প্রচলন

মাদক দ্রব্য ব্যবহার ভারতবর্ষে নানান জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। যথা সন্ন্যাসীদিগের গঞ্জিকা অথবা বয়স্ক রুগ্ন ব্যক্তিদিগের অহিফেন সেবন সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সভ্য সমাজে সুখে সময় কাটাইবার জন্য গঞ্জিকাদি ব্যবহার পূর্ব্বে কখনও কোথাও দেখা যাইত না। পূজা পার্ব্বণে সিদ্ধির সরবত পান চলিতে দেখা যাইত, কিন্তু তাহা হইত বৎসরে দুইচারি দিন মাত্র। মদ্যপান সৌখিন মহলে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ যাহাদের অবস্থা অতি সচ্ছল তাহারা আনন্দে সময় কাটাইবার জন্য মদ্য পান করিতেন। দরিদ্রদিগের মধ্যে চোলাই মদ অথবা ইহার মূলে ছিল থ ভুলিবার চেষ্টা। অপকর্ষমূলক অভ্যাস র ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই প্রসার অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যথা দেখা যাইতেছে যে, আজকাল অপরিণতবয়স্ক স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মদ্যপান রীতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভোজনাগার প্রভৃতিতে এই সকল ছাত্রছাত্রীগন বিনা দ্বিধায় 'বিয়র' প্রভৃতি—মাদক পানীয় ক্রয় করিতেছে এবং ইহাতে তাহারা কোনও দোষাবহ কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহাদের মনে হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে কিছু কিছু ধনবান্ তরুণ-তরুণীগণ মদ্যপান করিত; কিন্তু এখন সেই রীতি মধ্যবিত্ত-দিগের মধ্যেও প্রচলন প্রাপ্ত হইতেছে। ১৯৭১-৭২ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ৪০ লক্ষ বোতল 'বিয়র' বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৭২-৭৩ খৃঃ অব্দে সেই স্থলে বিক্রয় হইয়াছিল ৫০ লক্ষ বোতল 'বিয়র'। অর্থাৎ এক বৎসরে 'বিয়র' পান শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে।

আর একটা বিষয় আরই ঘোরতর ভাবে দূষণ য

হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা হইল ছাত্রছাত্রী মহলে গঞ্জিকা, চরস প্রভৃতি মাদক বস্তু ব্যবহার। পাশ্চাত্ত্যে 'হাশিশ' বা 'মারিজুয়ানা'(চরসের বিদেশী নাম) ব্যবহার খুবই হইতেছে এবং আমাদের দেশে গঞ্জিকা সেবন ছাত্রদিগের মধ্যে দেখা দিয়াছে। ইহার মূলে আছে সম্ভবত "হিপি" ও অন্যান্য সেই জাতীয় বিদেশী ভবঘুরেদিগের প্রভাব। এই সকল বিদেশী; যাহাদিগের মধ্যে আমেরিকানদিগেরই সংখ্যা সর্ব্বাধিক; ছিন্নবন্ধন যথেচ্ছাচারীগণ নিজেরাও সকল সামাজিক নিয়ম বর্জ্জন করিয়া চলে ও অপরদিগকেও সেই শিক্ষা দান করে। রীতি নীতি জলে ফেলিয়া দিয়া যেমন অভিরুচি তেমন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ মানব জাতির উন্নতির দিক দিয়া সহজ ও সরল পন্থা নহে। জাতীয় সর্ব্বনাশের উপায় খুঁজিলে এই রূপ রীতি নীতি বর্জ্জনই তাহার সহজতম উপায়। বিদেশী-দিগের মধ্যে অনেকে আছে যাহারা ভারতশত্রুদিগের গুপ্তচর ও ভারতীয়দিগকে কুপথের পথিক করিতে সক্রিয়। ভারত সরকারের উচিত ইহাদের উপর নজর রাখা। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মের অভিনয় করে এবং হিন্দু সাজিয়া হিন্দুদিগের চরিত্র যাহাতে প্রাচীনতার পথ ছাড়িয়া প্রগতির পথে না চলিতে পারে সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। ভারত সরকার যদিও যেখানে বিপদ নাই সেখানে বিপদ আবিষ্কার করিতে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; তাঁহারা কিন্তু বিপদের প্রকট লক্ষণ দেখিলেই বহু স্থলে চক্ষু নিমীলিত করিয়া অবস্থা নির্ণয় চেষ্টা করেন। এশিয়ার মানুষ যাহাতে পাশ্চাত্ত্যের দোষগুলি শিখিতে পারে ও নিজেদের প্রাচীনতাজাত উন্নতি-দমন-কারক অভ্যাসগুলিও আঁকড়াইয়া থাকিয়া বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমর-কুশলতার পথে অগ্রগমন করিতে না পারে; এই চেষ্টা ইয়োরোপ আমেরিকা বরাবরই করিতে থাকিবে। আমাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু প্রগতির অন্তরায় হইতে পারে সেই সকল-কিছুকেই পশ্চিমের মতলবসিদ্ধির গুপ্তচরেরা যথাসাধ্য সমর্থন করিয়া আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা দিবার ব্যবস্থা করিবে, একথা আমাদের জানা উচিত। ধর্ম্মগতপ্রাণ এশিয়াবাসী যদি ধর্ম্মের গভীরেই ডুবিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের বিজ্ঞানের পথে অগ্রগমন কখনও সহজ ও সবল গতিতে সাধিত হইবে না। এশিয়ার যুবজন যদি গঞ্জিকা, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতির নেশায় নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি অসম্ভব হইবে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল অভ্যাস দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, যথা রাত্রিজাগরণ করিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিত ভাবে নৃত্য, অতিরিক্ত সুরাপান ইত্যাদি; সেই সকল রীতির ক্রমবর্দ্ধনশীল পরিচালনা চেষ্টা আজকাল সর্ব্বত্রই করা হইতেছে। ইহার মূলে বিদেশী-দিগের প্রভাব সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বর্ত্তমান আছে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিদেশীদিগের প্রভাবে আমাদের অর্থনীতি বিশেষভাবে বিনাশের পথে চালিত হইয়াছে একথা সর্ব্বজনজ্ঞাত। এখন যে আমাদের জাতীয় ঋণের বোঝা অকারণে চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার মূলে আছে পণ্ডিত নেহেরুর বিদেশীর উপর নির্ভর। এখন যদিও সেই দোষ কাটাইয়া স্বাবলম্বনের পথে চলা সম্ভব হইয়াছে তাহা হইলেও বিদেশীর প্রভাব নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে জাতির অকল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির প্রসার

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির কেন্দ্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শুধু চন্দ্রে গমন, সমরকুশলতা ও ধনরত্ন সংগ্রহেই নিবিষ্ট থাকে এমন নহে, ঐদেশের অপরাধপ্রবণতাও সর্ব্বব্যাপ্ত ও বিস্ময়কর। সম্প্রতি যে-সকল কথা নানা ভাবে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে নির্ব্বাচন কালে যাহা ঘটে ও ঘটিতে পারে তাহা [illegible] দের দেশের নির্ব্বাচনকালীন দুর্নী[illegible] আমাদের মতই মনে [illegible] দফতরের দরজা

মন্ত্রণাগৃহের নানা স্থলে গুপ্তভাবে বৈদ্যুতিক শ্রবণযন্ত্র লাগাইয়া দিয়া তাহারা কে কখন কি পরামর্শ করিতেছে তাহা জানিবার ব্যবস্থা করা, ইহাত করা হইয়াই থাকে; উপরন্তু কোটি কোটি টাকা উৎকোচ দিবার আয়োজন ও সেই টাকা সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি নির্ণয় ইত্যাদির তুলনায় আমাদের দেশের বেনামীতে চোরাই ভোট দেওয়া অথবা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে টাকা দিয়া গোপনে উল্টাদিকের কাজ করাইবার চেষ্টা একপ্রকার ছেলেখেলাই মনে হইতে পারে। অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও আমেরিকায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কার্য্য-সিদ্ধির জন্য না করিতে পারেন এমন অসম্ভব কার্য্য কিছুই দেখা যায় না। ইহাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও বাদ যান না। বেআইনীভাবে সকলের উপর নজর রাখিবার আয়োজন, চোরের ন্যায় নানাস্থলে প্রবেশ, জাল জুয়াচুরি, ভয় দেখাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া, সরকারী চাকুরে-দিগকে নির্ব্বাচনে সহায়তা দিবার জন্য প্ররোচিত করা, ইত্যাদি অন্যায়ের উদাহরণ আমেরিকায় যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা সভ্য জগতে অপর কোনও দেশে ঠিক পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা ব্যতীত আছে আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত দুর্নীতির রাষ্ট্রীয় ভাবে সমর্থিত প্রতিষ্ঠান সি আই এ। এই প্রতিষ্ঠান নিজ প্রভাব বিশ্বের সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা লতায় পাতায় কোথা হইতে কোথায় গিয়া পৌঁছায় তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কাহারও পক্ষে নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব হয় না।

এখন আমেরিকার জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছে যে, দুর্নীতির বিষ রাষ্ট্রের সকল স্তরেই ছড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রপতির অতি নিকটস্থ উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে ত সন্দেহ করা হইয়াছেই; এমন কি রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধেও নানা প্রকার ইঙ্গিত করা হইতেছে। যাহা[illegible] ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্[illegible]রিতে বলিয়াছিলেন [illegible] রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরা[illegible]তিরিক্ত কার্য্য সাধন [illegible]মন করিয়াছিলেন কি [illegible]হা রাষ্ট্রপতির জ্ঞাতসারে করা হইয়াছিল কিনা; ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন অনেকের মনে জাগ্রত হইতেছে। যে-সকল অভিযোগ আদালতে পেশ করা হইয়াছে তাহার শুনানি যথাযথভাবে হইতেছে কি না, এবং যদি না হইতেছে তাহা হইলে কাহারও উপর কেহ চাপ দিতেছে কি না, ইত্যাদি কথাও উত্থাপিত হইতেছে। চাপ দিবার যিনি প্রবলতম ব্যক্তি তিনি হইলেন রাষ্ট্রপতি নিকসন। তিনি যদি নানান কর্ম্মচারীকে দিয়া নানা ভাবে আইন বিরুদ্ধ কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই সকল কর্ম্মচারী যে তাঁহার নির্দ্দেশেই সেইরূপ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ সহজে পাওয়া যাইবেনা। তাহা ব্যতীত উপরওয়ালা আইন ভাঙ্গিতে বলিলে যদি কেহ আইন ভাঙেন তাহাতে আইন ভঙ্গকারীর দোষ স্খলন হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রপতি নিকসনকে ঐ সকল ব্যাপারে জড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া আইনের ক্ষেত্রে কোনও লাভ হইতে পারে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপরাধপ্রবণতার জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত। নরহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল স্তরের অপরাধই ঐ দেশের সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। যেখানে টাকার জোর আছে সেখানে টাকা পাইলে পরের দোষ নিজ স্কন্ধে লইবার লোকের অভাব হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নিকসনকে অপরাধী প্রমাণ করা আরও কঠিন হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সাধারণতন্ত্রী দেশে আমেরিকার এই দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রীয় দলের ব্যক্তিবর্গের কার্য্যকলাপ লইয়া একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক দেশে একটা আতঙ্কেরও সঞ্চার হইয়াছে যে, এই অপরাধপ্রবণতার তোড় অতলান্তিক পার হইয়া ইয়োরোপেও আসিতে পারে। ইংরেজদিগের বিশ্বাস—যে তাহাদের জাতীয় চরিত্রে সুনীতি অনুসরণের এরূপ একটা দৃঢ় সংকল্প প্রতিষ্ঠিত আছে যাহার জন্য তাহাদের দেশে আমেরিকান ঢং-এর অপরাধপ্রবণতা কখনও আসিতে পারিবে না। এই বিশ্বাস অবশ্য ইংরেজদিগের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণে জন্মলাভ করিয়াছে কিম্বা ইহা

জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণের ফলে সত্যানুসন্ধান হইতে লব্ধ তাহা লইয়া আলোচনা হইতে পারে। তবে একথা ঠিক যে ইংরেজ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অন্যায় কার্য্য বিশেষ একটা করে না। নিয়ম আছে যে ইংলণ্ডে নির্ব্বাচনে কেহ ১০০০ পাউণ্ডের অধিক ব্যয় করিতে পারিবে না। ইংরেজ সর্ব্বদাই এই নিয়ম মানিয়া চলে। অন্যান্য বিভিন্ন জাল জুয়াচুরিও নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে বিশেষ একটা দেখা যায় না। সাধারণতন্ত্র চালাইতে রাষ্ট্রীয় দল, তাহার বিভিন্ন প্রতিনিধি ও নির্ব্বাচনপ্রার্থী-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাবে নির্ব্বাচিত হইবার আয়োজন ইত্যাদির উপস্থিতি থাকিতে বাধ্য। ইহার মধ্যে যদি মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা প্রকটভাবে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয় তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রের স্বরূপ নিজের সত্যতা রক্ষা করিতে সক্ষম থাকে না। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জাল প্রতিনিধি হইলে সাধারণ-তন্ত্র একটা নিদারুণ মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া যায় ও জালিয়াতদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণ জালিয়াতদিগের দাসত্বে বাঁধা পড়িয়া যায়।

সরকারী বিশেষজ্ঞদিগের অনভিজ্ঞতা

সরকারী ভাবে কোন কাজ চালাইলে তাহা ব্যক্তিগত লাভের আশায় কাজ চালান অপেক্ষা উন্নততর ভাবে চলিবে এইরূপ আশা করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা সকল সময়েই শ্রমিক অথবা ক্রেতাদিগের মঙ্গল কিম্বা দেশের অর্থ-নীতির দীর্ঘকালস্থায়ী হিসাবে শক্তিবৃদ্ধির কথা এক কোণে সরাইয়া রাখিয়া শুধু ঐ অতি নিকটস্থ লাভের বিষয়টাই বিচার করিয়া চলিতে থাকে। ফলে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্তিগত লাভ যে টুকু হয়; পরোক্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকসান দেশের ও দশের হইতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু সরকারী পরিচালনা যেমন ব্যক্তিগত লাভ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়, অনেক সময় তাহা লোকসানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ব্যবসায়টিকেই অচল করিয়া তোলে। ইহার কারণ, লাভ সম্বন্ধে উদাসীন কর্ম্মপরিচালকদিগের মনে বহু ক্ষেত্রেই লোকসান সম্বন্ধেও নিরপেক্ষতার সৃষ্টি করিয়া দেয়। তাহার উপরে থাকে সেই চিরপুরাতন "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" মনোভাবের আবির্ভাব। সরকারী কাজ লাভে চলিলেও কাহারও লাভ নাই এবং লোকসানে চলিলেও সে লোকসান কাহারও গায়ে লাগিবে না। অতএব সরকারী কাজ যথেচ্ছা চালাইয়া চলাই রীতি; তাহাতে কোনও অর্থনীতির বাঁধনের উপস্থিতি নাই, থাকিবার আবশ্যকতাও লক্ষ্য করা যায় না। সরকারও পরিচালনা কার্য্য যেমন তেমন করিয়া চালাইয়া চলেন। বয়লার-যন্ত্র-পরিচালক নিয়োগ করিয়া বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র পরিচালনা কিম্বা বয়ন-কর্ম্মবিশারদকে দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কার্য্য করান সরকারের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। প্রবল প্রতাপশালী রাজশক্তি; তাহার পক্ষে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ান যেমন সহজ ও সরল; নরুণ দিয়া কূপ খনন অথবা কোদাল দিয়া ক্ষৌরকার্য্য সাধনও তেমনই অকঠিন। অর্থাৎ পিছনে যদি থাকে রাজশক্তি তাহা হইলে কর্ম্মকুশলতা আপনা হইতেই গজাইয়া উঠে। আইনজ্ঞ যন্ত্রকৌশলীর কাজ করে এবং যন্ত্রবিদ্ ভার লয় শিশুশিক্ষার অথবা নারী প্রগতির। এই যে অনায়াসলব্ধ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদতা; যাহা সরকারী পরোয়ানা হইতে সকল মানুষের মধ্যেই অবাধে উদ্ভূত হয়, ইহাই আছে সরকারী কর্ম্মপরিচালনার অক্ষমতার মূলে। যাহাকে খুশি যে কোনও কর্ম্মভার দেওয়া এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছাকে সকল শিল্প বিজ্ঞান কলাকৌশলের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া সকল কার্য্যে অবনতি আনয়ন, ইহাই হইল রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহারের চূড়ান্ত নিদর্শন। সম্প্রতি যে সকল কাজ কারবার সরকারী কবলে আনা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই যথোপযুক্তভাবে চালাইতে হইলে বিশেষ জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। এখন পর্য্যন্ত আমরা যে-সকল পরিচালকদিগের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছি, তাঁহাদের বিষয়ে একটা কথাই শুধু আমরা বুঝিয়াছি। ইঁহারা সকলেই রাষ্ট্রীয় মোড়লদিগের বিশ্বস্ত ...

ব্যাঙ্ক, কয়লার

পরিচালনার ক্ষমতা আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে; কিন্তু কার্য্যভার প্রাপ্তির পূর্ব্বে কে কতটা ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কোথায় এবং কিভাবে, তাহা জনসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। হইতে পারে যে ব্যারিষ্টার হইলে কিম্বা কোনও পার্টি বিশেষের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকিলে মানুষ সকল কর্ম্ম-কৌশল সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। কিন্তু সে কথা যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে হইতে নাও পারে। সুতরাং সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, কর্ম্মকৌশল কে কোথায় কেমন করিয়া কতদিন ধরিয়া আহরণ করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিলে সরকারী কর্ম্ম পরিচালনার কার্য্য আরও উন্নততর ভাবে চালাইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। বিদ্যা, কৌশল ও অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি দিগকে উপরে উঠাইয়া বসাইয়া দিলেই তাহাদের পরিচালনা শক্তি আপনা হইতেই জাগ্রত হইয়া দেখা দেয় না। সকল বিষয়ের একটা শিক্ষার দিক থাকে। শিক্ষাকে অবহেলা করা অসফলতার বৃহত্তম কারণ।

মে দিবস

১লা মে বিশ্ব শ্রমিক জগতে মুক্তি ও শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দিবস। পূর্ব্বকালে শোষিত উৎপীড়িত কর্ম্মীদিগের প্রাপ্যের কথা কেহ চিন্তা করিত না। অতি অল্পবয়স্কদিগকেও সেই যুগে দৈনিক দশ বার ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হইত। বয়স্কদিগেরত কথাই ছিল না। স্বাস্থ্যের, সুবিধার বা সুখের বিষয় কেহই দেখিত না। স্ত্রীলোকদিগকে কয়লার খাদে গাড়ী টানানর জন্য নিয়োগ করা ইংলণ্ডে সেদিনও প্রচলিত ছিল। যথাসময়ে বেতন না দেওয়া, নানান অজুহাতে বেতন হইতে টাকা কাটিয়া লওয়া, যথেচ্ছা জরিমানা করা, খুসী মত কাহাকেও উচ্চে ওঠান অথবা [illegible] নামান, বরখাস্ত করা কিম্বা কার্য্য হইতে বসাইয়া [illegible]া, ইত্যাদি জুলুমের শেষ ছিল না। ইহার উপরে দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা। এক কথায় কর্ম্মীগণ যদিও মালিকের ক্রীতদাস বিবেচিত হইত না, তাহা হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রা দাসত্বভাবে ভারাক্রান্তই থাকিত। এবং ইহার কোনও প্রতিকার চেষ্টা কেহই কোথাও করিত না। আজ যে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রমিক নানাভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইয়াছে তাহা দীর্ঘকাল মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। তাহা হইলেও, শোষণ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। এখনও বঙ্গদেশে বহুক্ষেত্রে শ্রমিক যাহা পায় তাহাতে সে কোনও মতে জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়। তাহার প্রতি অবিচার এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। সমাজ এখনও শ্রমিককে সেই মর্য্যাদা দিতে পারিতেছে না যাহা তাহার প্রাপ্য। মে দিবস তাই এখনও সংগ্রামের আহ্বান জানাইবার দিন। মানুষ যাহাতে সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার মানবীয় প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় পাইতে সক্ষম হয় এদিন বিশ্ব মানবের অন্তরে সেই কথাই বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়।

উত্তর প্রদেশে ডাকাইতি ও লুঠপাট

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে উত্তর প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে এমন কি দিনের বেলায়ও রাজপথে যাতায়াত নিরাপদ থাকিতেছে না। ডাকাইত ও লুঠেরাগণ ঐ সকল স্থলে পথে গাড়ী থামাইয়া যাত্রীদিগের ধনসম্পত্তি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে এবং পদব্রজে যাহারা যায় তাহাদেরও ইহারা বাদ দিতেছে না। বহুকাল পূর্ব্বে বিহারেও এইরূপ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পাটনার আশে পাশের রাস্তাগুলিতেও গাড়ী করিয়া চলাফেরা করা বিপদজনক হইয়াছিল। তাহার পরে সম্ভবতঃ বিহার সরকারের চেষ্টায় ঐ সকল স্থান হইতে লুণ্ঠনকারীদিগকে বিতাড়িত করা হয় এবং তৎপরে আর লুঠের কথা শুনা যায় নাই। উত্তর প্রদেশে অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক বিদেশী ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী গাড়ী করিয়া যাইবার সময় গাড়ী বিকল হওয়াতে ভদ্রলোক পত্নীকে গাড়ীতে রাখিয়া সাহায্য সন্ধানে যান। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন পত্নীকে ডাকাইতগণ হত্যা করিয়া জিনিসপত্র লুঠ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই ঘটনার পরে একটা মহা আন্দোলন হয় ও তৎপরে লুণ্ঠনাদি বহুকাল চলে

নাই। এখন আবার ইহা আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ সরকারের উচিত হইবে ইহা বাড়িতে না দিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব ইহার দমন ব্যবস্থা করা। পুলিশ গ্রাম ও শহর অঞ্চলে কে কোথায় লুঠপাট করিয়া দিনগুজরান করে সে খবর উত্তমরূপেই রাখিয়া থাকে। পুলিশ ইচ্ছা করিলে ঐ সকল ব্যক্তিকেই কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। ইহা যে তাহারা কেন করে না তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

আনবিক অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

বিশেষজ্ঞদিগের মতে যে সকল রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ার করিয়া লইতে পারে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। আন্তর্জাতিক অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতের যে সকল বিরুদ্ধ পক্ষ আছে তাহার মধ্যে একটি জাতি ব্যতীত অপরগুলির সকলেরই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং যেইটির নাই সেও যে কোনও সময় তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ভারতের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ার করিয়া রাখা জাতীয় নিরাপত্তার দিক হইতে একান্ত ভাবে আবশ্যক। বিশেষতঃ ভারতের বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র কৌশলের দিক হইতে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে ভারতের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্রের গঠন সহজেই হইতে পারে। না হইবার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ হইল অর্থের অভাব। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবস্থা বহু ব্যয়সাধ্য। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র থাকিলে মামুলি সৈন্যদল ও তাহাদিগের অস্ত্রভার তেমন আকারে ও পরিমাণে রাখিতে হয় না। ইহাতে যে অর্থব্যয় কম হয় সেই অর্থে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবস্থা হইয়া যাওয়া সম্ভব। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র থাকিলে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস, করা যতটা সম্ভব মনে হয় বস্তুতঃ ততটা সৈন্য হ্রাস করা কখনও হইয়া উঠে না। দ্বিতীয় কারণ হইল ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে ভারত কখনও পারমাণবিক অস্ত্রব্যবহার করিবে না এইরূপ একটা প্রতিশ্রুতি ভারত বারবার বিশ্ব জাতি-সংঘের নিকট করিয়াছে। অবশ্য অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিলে নীতিও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও হয়। অতএব পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের কথা এখন ভারতবর্ষ সক্রিয় ভাবেই বিচার করিতে পারে।

সরকারী গুপ্ততথ্য প্রকাশ কখন অপরাধ

যে সকল তথ্য সরকারীভাবে জনসাধারণের গোচর করা হয় না তাহা যদি কেহ প্রকাশ করিয়া দেয় তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য সকল সময়ে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। দুই বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ওল্ড বেলি আদালতে সরকারী গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয় ও তাহার বিচারফল প্রকাশ কালে বিচারপতি তাঁহার রায়-এ বলেন যে, যদি কোন খবর এরূপ হয় যাহা প্রকাশ করিলে দেশের শত্রুদিগের দেশের অপকার করিতে সুবিধা হয় তাহা হইলে ঐরূপ গোপন কথা প্রকাশকে অপরাধ বলা যাইতে পারে। নতুবা, একটা খবর যেহেতু সরকারী দফতর হইতে কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই সুতরাং তাহার প্রকাশ অপরাধ এইরূপ ধারণা ন্যায়তঃ গ্রাহ্য হইতে পারে না। গোপন কথা এমন হইতে পারে যাহা সর্ব্বজনজ্ঞাত হইয়া যাইলে তাহার ফল জনমঙ্গলকর হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই প্রকাশ কার্য্য দেশের ক্ষতিকর নহে বলিয়া সরকারী গুপ্ত তথ্য প্রকাশের অপরাধ তাহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। ইংলণ্ড অতি সভ্য দেশ ও ঐ দেশের মানুষের ন্যায়বোধ ও মানবীয় দায়িত্বজ্ঞান অপর দেশের অধিবাসীদিগের তুলনায় কিছু অধিক পরিণত। কিন্তু রোডেশিয়ার মত একটা অন্যায়ের কেন্দ্রস্থলেও কোন্ কথাটা জনহিতের দিক দিয়া গোপন থাকা আবশ্যক এবং কোন্ কথা সম্বন্ধে সেই ধারণা প্রয়োগ করা চলে না তাহা তদ্দেশের আদালতে যথাযথ ভাবে বিচার করা হয়। ঐ দেশেও একটা অভিযোগের বিচারান্তে বিচারপতি বলেন যে, কোন কথা গোপন থাকিলেই তাহা প্রকাশ করা অপরাধ বলা চলে না। যদি সেই প্রকাশের ফলে দেশের শত্রুদিগের দেশের বিরুদ্ধতা করিতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেই গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ

কোনও অপরাধের কথা উত্থিত হইতে পারে না ও তাহা-দিগকে সেই কারণে খালাস করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইল। আমাদের দেশে বিদেশী গুপ্তচর আছে এবং তাহারা আমাদের রাষ্ট্রীয় দফতরের নানান প্রকার সাধারণের অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার চেষ্টা করিয়া থাকে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গোপন কথা জানিতে পারিলে তাহা প্রকাশ করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের সাংবাদিক মহলেও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অন্য দেশের মতই এদেশেও অধিকাংশ গুপ্তচরেরাই ধরা না পড়িয়া নিজ অপকর্ম সাধন করিয়া নিরাপদে দিন কাটাইতে সক্ষম হয়। কে কোথায় গুপ্তচরের কাজ করিতেছে তাহার অনুসন্ধান আমরা বড় একটা করি না, এবং যে যেমন ভেক ধরিয়া চলিতে চায় এ দেশে তাহার পক্ষে সেই ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করা সহজেই চলিতে পারে। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরদিগের নানান ছদ্মবেশের কথা উল্লিখিত আছে। এখনও সম্ভবতঃ গুপ্তচরেরা সেই সকল ছদ্মবেশই ধারণ করিয়া সমাজে বিচরণ করে। কেহ সন্ন্যাসী, কেহ ভিক্ষুক, কেহ বা উন্মাদ সাজিয়া সর্বত্র প্রবেশ চেষ্টা করে। ইহা ব্যতীত চিকিৎসকগণ, নৃত্যগীত অভিনয় ইত্যাদির ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিও দেখা যাইত। এখনকার ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী, সাধু, যোগী, জ্যোতিষী, গায়ক, বাদ্যকর, অভিনেতা প্রভৃতির কোনই অভাব নাই। ইহাদিগের মধ্যে বিদেশীও আছে। তাহা ছাড়া নূতন আবির্ভাব হইয়াছে নানা প্রকারের অদ্ভুত বেশ-ধারী ভ্রমণকারী, তথাকথিত সমাজ-সেবক ও তত্ত্বানুসন্ধানকারী পরিদর্শকের। কে ইহাদিগের উপর নজর রাখে ইহারা গোপনে কিছু করে কি না দেখিবার জন্য ?

রোডেশিয়াতে এবং আমাদের দেশেও আইনের প্রয়োগই শাসকদিগের একমাত্র শক্তি প্রদর্শনের উপায় নহে। শাসকগণ আইনতঃ কাহাকেও কারাবদ্ধ না রাখিতে পারিলে তাহাদিগকে হুকুম দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারেন। এই রীতি মানব স্বাধীনতার আদর্শ-বিরুদ্ধ হইলেও ইহা এখনও ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা হইলেও আইনের প্রয়োগ যত দিন প্রকৃষ্টভাবে ন্যায়ানুগমন করিয়া চলে ততদিন সভ্যতার আদর্শ অধিক জোরাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। এই কারণে আদালত ও বিচারকদিগের নিজেদের বিচার অধিকার শাসক-দিগের প্রভাব মুক্ত থাকা মানব স্বাধীনতার দিক হইতে একটা অতি কার্য্যকর কথা। আদালত ও বিচারকগণ যদি শাসকদিগের হুকুমের বশ হইয়া যান তাহা হইলে জনসাধারণ আর নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে উপযুক্তরূপে সক্ষম থাকিতে পারেন না।

ফ্রান্সের হাইড্রোজেন বোমা

যত প্রকার পারমাণবিক বিস্ফোরণ মানুষ করিতে পারে তাহার মধ্যে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম বিস্ফোরণ অপেক্ষা বহু শক্তিশালী হইল হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ। ফ্রান্স সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে এইরূপ একটা বিস্ফোরণের আয়োজন করিতেছে বলিয়া ঐ স্থলের নিকটবর্ত্তী দেশ,অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্সের নিকট আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ঐ কার্য্য যাহাতে না হয় সেই চেষ্টা করা হইতেছে। ফ্রান্স কিন্তু ইহাতে কান দিতেছে না। ফ্রান্সের মতে ফরাসীদিগের এরূপ বোমা ফাটাইয়া সামরিক অস্ত্র পরীক্ষা করিবার অধিকার পূর্ণ-মাত্রাতেই আছে এবং অন্য কোন দেশের পক্ষে বাহির সমুদ্রে কি করা হইতেছে তাহা লইয়া আপত্তি করিবার কোনও আইনতঃ গ্রাহ্য অধিকার থাকিতে পারে না। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মতে পারমাণবিক বোমা ফাটাইলে তাহার ফলে যে মহা বিষময় ও মারাত্মক তেজ বিকিরণ ঘটে ও নিদারুণ ক্ষতিকর বিস্ফোরণ পরবর্ত্তী অবশিষ্টাংশ মহা শূন্য হইতে ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার ফল হইতে সকলের বাঁচিবার চেষ্টা করিবার অধিকার আছে।

জাপান প্রভৃতি আরও অনেক দেশের প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষা সম্বন্ধে আপত্তি আছে এবং ফ্রান্সকে বহুজাতির সহিত তর্ক

বিতর্কে অবতীর্ণ হইয়া তবে এই কাজ করিতে হইবে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন কোন জাতি বিশ্ব-আদালতে অভিযোগ করিবেন বলিয়াও শুনা গিয়াছে কিন্তু ফ্রান্স তাহাতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করেন না। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা লইয়া শতশত বিস্ফোরণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাধিক বিস্ফোরণ করিয়াছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ৬০০ শতের অধিক যতটা মনে হইতেছে। তৎপরে যে দেশের স্থান তাহা হইল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ইহারা সম্ভবত শতাধিক বার নানা প্রকার বিস্ফোরণ করিয়াছে। মাটির নিচে, জলের ভিতর ও হাওয়ায়। বৃটেন ফ্রান্স, চীন, প্রভৃতি দেশ ২০।২৫ বারের অধিক এই জাতীয় পরীক্ষা করে নাই। কিন্তু সকলের পক্ষেই পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা না করাই কর্তব্য। কারণ ইহার ফলে, ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হইয়া মানব জীবন ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া যাইতেছে। ইহার যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ব্যাপকভাবে নরহত্যাকার্য্য সিদ্ধ করা তাহাও মানব জাতির মহা অকল্যাণকর। শুধু সামরিক শক্তি বৃদ্ধি লইয়া রেষারেষির জন্যই পারমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ চলিতেছে। তাহার মানব হিতকর কোন মূল্যই আছে বলিয়া কেহ মনে করেন না।

খাবার না পাইলে ভারত ত্যাগ করিব

বোকারো ইস্পাত কারখানা হইবে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে শেষ পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ-অথবা ততোধিক টন মাল উৎপন্ন হইবে বলিয়া পরিকল্পনা। এই কারখানা রুশিয়ানদিগের দ্বারা স্থাপিত হইতেছে এবং এই জন্য রামগড় (বোকারো) অঞ্চলে বহুসংখ্যক রুশ-দেশীয় কর্ম্মী ইস্পাত কারখানা স্থাপনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা সম্প্রতি বিহারের খাদ্যাভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষ. ত ২৫ বৎসর স্বাধীনতা লাভ করিবার পরেও নিজের কারখানা নিজে গঠন করিতে পারেন না; তদুপরি যদি বাহিরের কর্ম্মী ও মাল মশলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সেই কারখানা স্থাপন ব্যবস্থা হয়] ও তৎপরে যদি সেই কর্ম্মীদিগকে অনাহারে থাকিতে [হয় তাহাতে ভারতবর্ষের বিশ্বের দরবারে খ্যাতি বৃদ্ধি হয় না। রামগড়ের রুশিয়ানদিগের যখন খাদ্যাভাব ঘটিল তাঁহারা তখন অনন্যোপায় হইয়া ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জানাইলেন যে তাঁহারা যদি যথাযথরূপ ময়দা চিনি প্রভৃতি না পা'ন তাহা হইলে তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। বলা বাহুল্য এইরূপ ভয় দেখাইবার পরে তাঁহারা ময়দা পাইয়াছিলেন ও ১লা মে দিবসে তাঁহাদের খানাপিনা উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

বুদ্ধির অঙ্ক

আমাদের বাল্যকালে (সে বহুকাল আগের কথা) আমরা একপ্রকার অঙ্ক কষিতে শিক্ষালাভ করিতাম সেইগুলির নাম ছিল বুদ্ধির অঙ্ক। একটা অঙ্ক প্রায়ই সকলের বুদ্ধিতে নাড়া দিত সেটা ছিল একটা বানর একটা তৈলাক্ত বংশ-দণ্ড বাহিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মিনিটে সে বার ইঞ্চি উঠিতেছে কিন্তু আবার পাঁচ ইঞ্চি পিছলাইয়া নামিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ মিনিটে সে মাত্র সাত ইঞ্চি উপরে যাইতেছে। পাঁচ মিনিট গত হইলে বানরের আরও একটা অতিরিক্ত পতন ঘটিতেছে। তাহা হইল এগার ইঞ্চি। এই অবস্থায় বানর ছয় মিনিটে মাত্র দুই ফুট উর্দ্ধে উঠিতেছে। এখন তাহার ঐ ত্রিশ ফুট বংশদণ্ড বাহিয়া উপরে উঠিতে কত সময় লাগিবে? বিষয়টা বিচার করিয়া উত্তর দেওয়া কঠিন নহে; কিন্তু বানর তৈলাক্ত বংশ-দণ্ডে ও নামা ওঠার কথা থাকায় কিছুটা জটিল। তাহা হইলেও বুদ্ধি থাকিলে বুদ্ধির অঙ্ক কষিয়া ফেলা অসম্ভব ছিল না। বর্ত্তমানে একটা বুদ্ধির অঙ্ক সর্ব্বজন সমক্ষে প্রায়ই কষিয়া উত্তর নির্দ্ধারণের জন্য উপস্থিত করা হয়। ইহা হইল বেকার সমস্যার সমাধানের অঙ্ক। ইহাতে আছে প্রথমতঃ (ধরা যাউক) ৫০ লক্ষ বেকার। এই বেকার-দিগের মধ্যে মাসিক দশ হাজারের চাকুরী হইতেছে;

(এরপর ২৪০ পৃষ্ঠায়)

শক্তিবাদের বিবর্তন

সলীল চৌধুরী

॥ এক ॥

দূর আস্তৃত অতীতের কোন বিস্মৃত উষায় বিশ্বের মানব-মনে বিশ্বধাত্রী দেবশক্তিকে 'মাতৃ' রূপে বন্দনা এবং অর্চনা করার প্রথম প্রবর্তনা ফুটে উঠেছিল—গভীর গবেষণায় সে সত্য আজও যথার্থ রূপে আমরা জানতে পারি নি। তবে দেবশক্তিকে 'মাতৃশক্তি রূপে পূজা করার ইতিহাস অনুশীলন করলে আমরা জানতে পারি যে,—কেবল ভারতের সনাতন ভূমিতেই নয়,—বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বিস্তীর্ণ পরিসরের নানা দিকে এই 'মাতৃশক্তি' আরাধনার অবিচ্ছিন্ন রীতি—নিয়ম অনুসৃত হয়ে আসছে। গ্রীসের 'রহী'দেবী, ইজিপ্টের 'ইস্থার', 'ইসিস্' এবং এশিয়া মাইনরের 'সিবিলি' দেবীর ইতিকথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভূমধ্য সাগরের ক্রীট্ দ্বীপে কোন এক সময়ে যে সিংহ আরোহিতা এক 'পার্বতী' দেবীর লোকায়ত পূজা—অর্চনা প্রচলিত ছিল -তার অনস্বীকার্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।১ এই সব ঐতিহাসিক সত্য এবং তার সম্ভাব্য গতি ধারা অনুসরণ করে একথা বলা যায় না যে,—নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সেই রহস্যলোকে নতুন কোন তথ্য এবং তত্ত্ব আবিষ্কারের রোমাঞ্চিত মুহূর্তের প্রহর গুনছে না। তবে, আবিষ্কৃত তথ্য-তত্ত্বের ঐতিহাসিক পরিজ্ঞানে এ কথা বুঝতে এবং বলতে পারি যে,—বিশ্বধাত্রী দেবশক্তিকে 'মাতৃ'-শক্তিরূপে স্বীকৃত পূজা—অর্চনার ইতিহাস অতীতের লোকায়ত জীবন-চারিত্র থেকেই উৎসারিত হয়েছে। ইতিহাসের এই সাহজিক বিশ্বাস থেকে ঐতিহাসিক এবং শক্তিবাদের গবেষকগণ একটি সহজ সত্যে পৌছান যে,—ভারতের আদিম মানুষেরাই 'মাতৃ' পূজার প্রথম পুরোহিত।

আদিম মানব সমাজে এই 'মাতৃ' পূজার প্রবণতা কেন উৎসারিত হলো—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। এ প্রশ্ন আলোচনা করে একটি সাধারণ উত্তর উচ্চারিত হয় যে,—উত্তর দিনে 'মাতৃ'পূজা এবং শক্তিসাধনা আর্য সংস্কৃতির প্রসাদ গুণান্বিত হয়ে উঠলেও আদিম মুহূর্তে এই প্রবণতা আর্য-সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত হয় নি। বৈদিক আর্য-পুরুষেরা সমাজ ব্যবস্থায় 'পিতৃতন্ত্রী' ছিলেন—এবং সেই জন্যেই বৈদিক ধর্ম ও ধর্মের অনুশাসনে পুরুষ-দেবতাদেরই অনিবার্য প্রাধান্য দেখতে পাই। কিন্তু ভারতের আর্য-পূর্ব বা আর্যেতর জাতি-সমূহ, 'মাতৃতান্ত্রিক' সমাজ-বিন্যাসের জীবনধর্মের অনুচারী ছিল। এই মাতৃতান্ত্রিকতার অনতিক্রম্য প্রভাবের ফলেই—তাদের সমাজ-মানসে 'মাতৃ' দেবতার এবং উপাসনার প্রবণতা দেখা দেয় এবং তাদের লোকায়ত জীবন-ধর্মে এই প্রবণতাই স্বস্থ পরিণতি লাভ করে।

সাম্প্রতিক দিনে এই নৃতাত্ত্বিক তাথ্যিক এবং তাত্ত্বিক উচ্চারণের গবেষক মনে আর গভীরভাবে রেখাপাত করছে না। উত্তর দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এই উত্তর-বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছে। নৃতাত্ত্বিক তথ্যটির গভীরে একটি গহীন অর্থ নিহিত কিন্তু এই আছে বলেই—বিগত দিন-গুলোতে আমরা এই সমাধানটিকে অত্যন্ত সহজ ভাবেই স্বীকার করে এসেছি।

মানুষের ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটাই স্বাভাবিক ভাবে পরিস্ফুট হয় যে,—ব্যবহারিকতার নানান গোছাল—অগোছাল কারণে যাকে ঘিরে সমাজ-মানসের কেন্দ্রীভবন এবং ঘনীভবন গড়ে ওঠে,২— তাই উত্তর দিনে সামাজিক-মানসে ধর্মের আদর্শে এবং অনুষ্ঠানে রূপান্তর লাভ করে। ইতিহাসের এই অনস্বীকার্য সত্যের স্বীকৃতিতে এ কথা সহজ অনুভব্য

যে, আদিম আর্য-পূর্ব মানব সমাজগুলির সমকালীন বিন্যাসে অনেকগুলো সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, কারণ এবং আচরণবাদের ফলে পারিবারিক 'মাতা'-সামাজিক মানসিকতার কেন্দ্রীভবন এবং ঘনীভবনের 'আদি-শক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এই সমকালীন সমাজে 'মাতা'র মর্যাদা স্বীকৃতির অনিবার্য কারণ এই যে,—এই সমাজ বিন্যাসের অনুস্যুতিতে বিবাহ প্রথা শ্লথ-শিথিল থাকার ফলে সন্তানের 'পিতৃ'-পরিচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত ছিল ; সুতরাং এই সমাজে মাতৃ'-পরিচিতি-ই সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতির অনিবার্য পাথেয় ছিল। এই প্রতিবাদ্য কারণের ফলেই চলতি-সামাজিক প্রবণতায় 'মাতা'-সমাজ-নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেন।—কিন্তু অনেক সমাজতাত্ত্বিক আবার এ কথাও মনে করেন যে, কৃষি-নির্ভর অনার্য সমাজে কৃষি-কর্মের এবং শস্য সংরক্ষণের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনায় সমকালীন সমাজের মহিলারা-ই অগ্রণী থাকার ফলে সমাজের আর্থিক জীবনে 'মাতা'র প্রভাব অনিবার্য ছিল। এই সব কারণের ফলে-ই সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতা সামগ্রিক স্বীকৃতির মর্যাদা লাভ করে এবং, উত্তর দিনে ধর্মীয় চর্যায় 'মাতৃ'-আরাধনার চিত্তপ্রবণতার জাগরণ আনে।

কিন্তু আদিম আর্য-পূর্ব সমাজের মাতৃতান্ত্রিকতা ই যে,—মাতৃপূজার এক মাত্র কারণ এবং উত্তর দিনে এই প্রবণতাই যে আর্য-চর্যা ও সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারিত এবং উচ্চকোটির তত্ত্ব-অভিসিঞ্চিত হয়ে অধ্যাত্ম-স্ফূর্তি লাভ করেছে—শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানী ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সে কথা সর্বাংশে স্বীকার করেন না। তিনি মাতৃ-আরাধনা এবং শক্তি-সাধনাকে—"সম্পূর্ণ রূপে অবৈদিক বা অনার্য—এ কথা বলিবার কোন কারণ"—দেখতে পাননি এবং—"যাহা কিছু অবৈদিক তাহাই যে অনার্য এমন কথা মনে করিবারও আমাদের কোন কারণ নাই।" — ডঃ দাশগুপ্তের এই বলিষ্ঠ অভিমত 'সামাজিক মাতৃতান্ত্রিকতা থেকেই মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা'র প্রসঙ্গে নতুন

পুরোনো পৃথিবীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-বিন্যাস-ই যদি 'মাতৃ'-আরাধনার প্রবর্তন এবং প্রসারণের একমাত্র কারণ হ'য়ে থাকে—তা' হ'লে পৃথিবীর আরও চিহ্নিত বিস্তৃতিতে এ জাতীয় মাতৃ-আরাধনার প্রচলন, চর্যা এবং রীতির অনুস্যুতি দেখা যেত।—এবং বহু, প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ পরিসরে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-বিন্যাসের ধারার অবিচ্ছিন্ন গতিশীলতা অব্যাহত রয়েছে সেখানে এই রীতি এবং নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যেত না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস এই সহজ সত্য প্রতিপাদনের ইতিভাষ্য বহন করছে না।

সমাজের মাতৃতান্ত্রিক বিন্যাস এবং মাতৃ-আরাধনার রীতি—চর্যা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এক—চিত্তাকর্ষক নতুন—লোকের আহ্বান এনেছে। মাতৃ-আরাধনা এবং শক্তিসাধনার ইতিহাস—পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এই তথ্য এবং তথ্য-নিহিত তত্ত্বের অস্বীকৃতি বাঞ্ছিত সত্য-উত্তরণের অন্তরায় হ'য়ে ওঠে।

ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপের সিংহ-আরোহিণী 'পার্বতী' দেবীর প্রচলিত পূজার কথা বলেছি। শুধু এই সিংহবাহিনী-ই নন,—ভূমধ্যসাগরীয় ভূমি-ভাগে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বহু প্রাচীন 'নারী' প্রতিকৃতির আবিষ্কার এনেছে। এই 'নারী' প্রতিকৃতিগুলো এই ভূমি-ভাগের আঞ্চলিক আদিম সমাজের 'মাতৃ'-পূজা প্রচলনের স্মারক—এই গৃহীত সত্যের প্রেক্ষিতে গবেষণা করে নৃতত্ত্ববিদগণ—কোন সময়ে এই আদিম-আঞ্চলিক সমাজে যে 'মাতৃ'-পূজার চর্যা এবং রীতি প্রচলিত ছিল—সে সম্পর্কে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ভূমধ্যসাগরীয় গবেষণা এখানেই ছেদ টানে নি। এই আঞ্চলিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এমন মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেছে—যার পর্যালোচনা আলোচ্য বিষয়ের ওপর নতুন আলোক পাত করে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে

নর-কঙ্কাল পরীক্ষা করে জানা গেছে যে,—এই যুগ্ম কঙ্কাল নারী এবং পুরুষের,—এবং এই পুরুষ তার অন্তিম শয্যা-সঙ্গিনী অপেক্ষা বয়সে অগ্রণী ছিল। ইতিহাসের এই ফসিল-নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে,—এই (১) যুগ্ম কঙ্কাল স্বামী এবং স্ত্রীর হ'তে পারে, (২) এই আদিমতা বিস্তৃত সমাজে ভারতের সহমরণ জাতীয় কোন প্রথার প্রচলন ছিল এবং (৩) পুরুষের বয়স 'অগ্রণীতা' সমকালীন সমাজ-জীবনে 'মাতৃতান্ত্রিকতা' থেকে 'পিতৃতান্ত্রিকতা'-র ইঙ্গিত-ই বহন করছে। এই তথ্য নিহিত সত্যের পর্যালোচনায় এ কথা বলা যেতে পারে যে,-যদিও নৃতত্ত্ব বিদ্যা এখনও নিশ্চিত অন্তিম সিদ্ধান্ত ঘোষণার বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা অর্জন করে নি,৪ তবুও বিশ্বাস অর্জিত হ'তে পারে যে,—সমাজ-মানসে 'মাতৃ'-পূজার চিন্তপ্রবণতা, চর্যা এবং রীতি একান্ত ভাবে সমাজের একান্তবাদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক 'মাতৃতান্ত্রিক' বিন্যাস এবং অনুসৃতি নির্ভর নয়। সুতরাং, মাতৃ-পূজা এবং শক্তি-সাধনার উৎস ভূমি হিসেবে—'অনার্য আদিম সমাজের চর্যায়ণের-'প্রতি'-আর সহজ অঙ্গুলি উত্তোলন সম্ভব নয়। এই উচ্চারণ যে অনিবার্য প্রশ্ন বহন করে আনে—তার উত্তর-সন্ধান ভিন্নায়ন প্রেক্ষিত-প্রচেষ্টায় অবকাশ রাখে। কিন্তু শক্তিবাদের বিবর্তন ধারার পর্যালোচনায় প্রেক্ষিতে এই প্রামিতিক সত্যকে স্মরণ রাখতেই হবে।

॥ দুই ॥

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক বিন্যাস এবং মানস প্রবণতায় 'মাতৃ'-পূজার চর্যা এবং রীতির স্বাক্ষর দেখা গেলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে এই 'মাতৃ'-পূজার চর্যা এবং রীতি ভারতীয় সমাজ-মানসে যেমনি একটি সজীব অনবদ্য ধর্ম-হিসেবে পরম-দার্শনিকতত্বে সমন্বিত হয়ে ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং লোকায়ত ও লোকোত্তর আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক অভিব্যঞ্জনায় পরম পরিণতির রূপান্তর অর্জন করে আবার এই সামগ্রিক জীবন—প্রবাহকেই প্রভাবান্বিত করেছে—তেমনি আর কোথাও দেখা যায় না। এই শক্তি-দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে,—ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাক্ত-প্রভাব এবং রীতির অনুসৃতি পরিলক্ষিত হ'লেও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমের কাশ্মীর, তিব্বত, ভূটান, নেপাল, কামরূপ, আসাম এবং বাংলাদেশ (অবিভক্ত) নিয়ে একটি বিশেষ 'শাক্তভূমি' গড়ে উঠেছিল। বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক এবং উপনিষদে যদিও শক্তিবাদের নিহিত বীজ দেখা যায়,—তবুও 'তন্ত্রশাস্ত্রে'-ই শক্তি ধর্মের দর্শন, সাধনা-প্রণালী এবং এবং রীতি-নীতির বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে;—মূলতঃ,—'তন্ত্রশাস্ত্র'-ই শক্তিবাদের বিশ্বকোষ। এই তন্ত্রশাস্ত্রের পাঠক-পাঠিকা মাত্রই জানেন যে,—তন্ত্রে 'চীন' দেশ বা 'মহাচীন'-নামে একটি ভূমি-ভাগ বর্ণিত আছে। আমার বিশ্বাস, এই চিহ্নিত 'শক্তিভূমি'-ই 'চীন'দেশ বা 'মহাচীন' নামে তন্ত্রে অভিহিত এবং বর্ণিত হ'য়েছে। তন্ত্রের আচারণ 'চর্যা' যে কেবল 'চীনাচার' নামে খ্যাত তা'-ই নয়,—একটি সহজ-শ্রুত কিংবদন্তীতে বলা হয় যে,—সাধক শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই 'চীন' বা 'মহাচীন' থেকেই তন্ত্রের আচরণ-চর্যা লাভ করেছিলেন। সুতরাং, এ সত্য স্মরণ রাখ্তে হ'বে যে,—শক্তিবাদের বিবর্তনে এই ভূমি-ভাগের গণমানসের কাল প্রেক্ষিত ক্রমিক প্রভাব অনিবার্যত প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতের জীবন-দর্শন এক ফলময় সমন্বয়বাদের পরম-আত্মিক দার্শনিক সত্যের ওপর গড়ে উঠেছে। '"নানা সংস্কৃতির ও ধর্মের পলিমাটির স্তর পড়িয়া ভারতের ধর্ম-ভূমি গড়িয়া তুলিয়াছে।"৫ ভারতের কোন একটি ধর্মবাদ এবং তার আদর্শ একক-বিচ্ছিন্ন নয়;—এক পরমাত্মিক সামগ্রিক অথচ স্বতন্ত্র্যতীক্ষ্ণ হ'য়েই তার স্বরূপের অভিব্যঞ্জনা প্রকাশিত হ'য়েছে। সেমেটিক ধর্মবাদের সংজ্ঞা এবং আদর্শের প্রেক্ষিতে তাই ভারতের ধর্মীয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা কেবল অযৌক্তিক নয়,—অন্যায়ও বলে মনে করি। ভারতের শক্তিবাদও তাই সনাতন ভূমির এই পরমাত্মিক জীবন-দর্শন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গড়ে ওঠে নি।

শক্তিবাদের বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে—প্রবুদ্ধ ভারততত্ত্ববিদের—"There is no doubt that this Goddess and her cult do unite traits of very different deiteis, Aiyan as well as Non-Aryan"৬—উচ্চারণ-টি স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকার করতে হয়। সাম্প্রতিক মাতৃরূপ, তার আত্মিক দার্শনিকতা এবং উপাসনার রীতি-নীতির মধ্যে যে—"বহু যুগের ওপার থেকে"—যুগ সঞ্চিত বিচিত্র সংস্কৃতি এবং চিত্ত প্রবণতার নানা ধারা-উপধারা এসে সামঞ্জস্যিক বিমূর্তি লাভ করে জননী "আদিভূতা সনাতনী"-র পরম ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছে—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ভূ-বিদ্যা, নৃ-বিদ্যা এবং প্রত্নতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ করলে এই সত্যের পটতলেই উত্তীর্ণ হতে হয় যে,—"from time immemorial India is the home of the worship of Prakriti or later Sakti."৭

ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্য এবং আর্যেতর দু'টি মৌলিক ধারা উত্তর কালে অপূর্ব মেলবন্ধন রচনা করলেও—এই দু'টি ধারার মধ্যে সংঘাত এবং সংঘর্ষের একটি চিহ্নিত যুগও লক্ষ্য করা যায়। ভারত-ভূমিতে আর্য-পদার্পণের পূর্বে এই সনাতন ভূমিতে একটি—"অবৈদিক বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল।"৮ আর্য-পূর্ব এই 'সংস্কৃতি ও ধর্ম' মূলতঃ ভক্তি-প্রধান দ্রাবিড় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পরিচয় বহন করছে। এই অনার্য 'সংস্কৃতি ও ধর্ম'—আর্য সংস্কৃতি এবং ধর্মের কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী-ই ছিল না,—বহু কাল পর্যন্ত আর্য সমাজ এই আর্য-পূর্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিন্দা করে এসেছে। আর্য সংস্কৃতির সাহিত্য এবং ইতিহাসে এই সংস্কৃতি ও ধর্মের আচরণবাদীদের 'অনাসা' (noseless), 'শিশ্নদেবা' (Worshiper of phallic emblems), 'অযজ্বা' (never performed Sacrifices) এবং 'অন্যব্রতা' (follower of Strange Laws)—নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। 'ব্রাহ্মণ'-এই মানব সমাজকেই "বায়াংসি সপ্তজ"—বলে চিহ্নিত করেছে। আর্য সমাজ ও সংস্কৃতির ভাষ্যকারগণ তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য পূর্ব এই 'সংস্কৃতি ও ধর্মে'র স্বরূপ স্বাতন্ত্র নির্ণয় নির্ণয় করতে এই দু'টি ধারাকে—"দৈবাসুরশ্চৈব" এবং "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব"—বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণ অর্থে,—এই অনার্য 'সংস্কৃতি ও ধর্মে'-র সামাজিক মানবেরাই পুরাণে, মহাকাব্যে এবং ইতিহাসে- রাক্ষস, দৈত্য, দানব, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, নিগ্রোবটু, অষ্ট্রিক জনসমাজ, দ্রাবিড় ও অন্যান্য আদিবাসী জন হিসেবে চিহ্নিত হ'য়েছে।

এই মানব-সমাজের মানস-ভূমিতেই 'মাতৃ-উপাসনার প্রথম অঙ্কুর উন্মীলিত হ'য়েছিল। তাদের সমাজের মাতৃকেন্দ্রিক (Matriarcal) বিন্যাসের জন্যেই মাত্র নয়,—আরও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নানান প্রবণতার কারণেই যে 'মাতৃ'-আরাধনার চিত্তপ্রবণতার জাগরণ এসেছিল—তা'তে কোন সন্দেহ নেই।—"সেই আদি যুগে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যখন ইঁহারা প্রথম ধর্মের পরিকল্পনা করিলেন,"৯ তখন-ই 'আদিভূতা—সনাতনী'র রূপ-কল্পনা এবং অর্চনার চিত্তপ্রবণতায় তাঁরা মাতৃ-উপাসক হ'য়ে উঠলেন – আমি এই সহজ সিদ্ধান্তকে অনৈতিহাসিক বলে মনে করি। কারণ,—"আদিম মানবের ধর্ম একান্তভাবে ভীতি-ভিত্তিক.........এই মনোভাব একটি অন্ধ সংস্কার,—যার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন", ১০ বিজ্ঞান-মনীষী আইনস্টাইনের এই অভিমত পরম সত্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। অধিকন্তু, সনাতন-ভূমি ভারত-সংস্কৃতির কোন ধর্মই—আমার বিশ্বাস—'ভয় ও বিস্ময়' থেকে উৎসারিত হয় নি। সেমেটিক এবং ভারতীয় ধর্ম-সূচনা এবং আদর্শে এখানেই অনতিক্রম্য মৌলিক ব্যবধান। ভারতীয় জীবন-বোধির আত্মধর্মের সাথে পরিচিত জন-ই এই সত্যের মর্মার্থ উপলব্ধি করবেন।

কিন্তু ইতিহাসের চক্র বিবর্তনে এই বিপুল আদিম মানব সমাজের প্রতিটি বর্ণের উত্তর-পুরুষ আজকের পৃথিবীতে আর নেই। নিগ্রোবটুর অস্তিত্ব পৃথিবীর ভূমিতল থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,—অথবা উত্তর কালে এই জন-সমাজ অষ্ট্রিক জাতির সঙ্গে 'এক দেহে

লীন' হ'য়ে স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করেছে। আধুনিক মানব-ইতিহাসের কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জন-শাখা এই অষ্ট্রিক জাতিরই উত্তর পুরুষ রূপেই পরিচিত।

আধুনিক নগর সভ্যতার ছোঁয়া বাঁচানো অরণ্য পর্বতের দুরান্ত পরিবেশের শিকার এবং কৃষি-নির্ভর এই জন-সমাজ-আর উপাসনার ধারাই বহন করে চলছে। হরিবংশে বর্ণিত দেবীর 'কর্ষকানাং চ সীতেতি' এবং 'বনদুর্গা' নামগুলি এই অরণ্যচারী কৃষি এবং শিকার নির্ভর অষ্ট্রিক জনশাখা থেকে এসেছে বলে মনে হয়।

ইতিহাসের ইতিবৃত্তে জানা যায় যে,—প্রাচীন কালের দিনগুলোতে যে মঙ্গল বা তিব্বতীয় চৈনিক জনশাখা চীন এবং তিব্বতের সাংস্কৃতিক মানস প্রবণতা নিয়ে অনেক মিশ্র কারণের ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অরণ্য-সঙ্কুল গিরি-দুর্গম পথে ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল,—আসামের আধুনিক পার্বত্য জাতি—নাগা, গারো, কোচ এবং কিরান্তী—প্রাচীন সাহিত্যে যাদের নাগ—কিরাত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে—সেই জনশাখার-ই উত্তর পুরুষ এবং এই জন সমাজ মাতৃকা শক্তির-ই উপাসনা করে। কিন্তু এই জন সমাজের চিত্ত প্রবণতায় যে মাতৃকাশক্তির ভাবমূর্তি ঘনীভূত ছিল—সেই 'মাতৃকাশক্তি'—আমার মনে হয় প্রথমে—'আদিভূতা সনাতনী'র ভাব-প্রতীক ছিলেন না। কারণ,-এই জন সমাজের আদি পুরুষ মঙ্গল জাতি এক জন ভ্রষ্টা চরিত্রা পতিহীনা রমণীকে তাদের আদি জননী হিসেবে মনে করে। "The soberest story on record that their ancestor Budantsar was miraculously conceived of a mangal widow"[১১]—এই স্মারণিকা-ই এই প্রাবাদিক উৎস। সুতরাং পূজা-অর্চনার প্রাথমিক স্তরে তাঁরা এই 'বিধবা রমণী'র প্রতি-ই মানস প্রাবণিক ছিলেন। উত্তর দিনে মানব প্রগতি এবং সভ্যতার গতিধারায় এই আদিম প্রবণতা চিৎ-ভৌতিক (Psycho-material) গুণাত্মিক এবং অগুনুতি সঞ্জন ও আদর্শের দ্বৈত-প্রক্রিয়ার সংযোজন বিয়োজনের শক্তি প্রভাবে চৈতন্য-দীপনায় অমোঘ প্রতীকে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। জনমিশ্রণ সভ্যতার একটি অনিবার্য অগ্রগতির সোপান। চৈনিক ভূমি-আগত মঙ্গলীয় রক্তধারা উত্তর দিনে বৈশালীর বৃজি লিচ্ছবি বংশে এবং দ্রাবিড় জাতির ধমনীতে-ও সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এমন কি, অনেক ঐতিহাসিক বাঙ্গালী রক্তেও মঙ্গলীয় রক্ত মিশ্রণ অনুমান করেন।[১২] তবে, এই রক্ত-মিশ্রণ যে, সংস্কৃতি এবং ধর্মেরও মিশ্রণ বা সমন্বয় এনেছিল—এ কথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।--অনেক গবেষকের অভিমত. অনুসারে বাঙ্গালীর মাতৃ-আরাধনার রীতি এবং চর্যায় মঙ্গলীয় প্রভাব দেখা যায়। কারণ,—তাঁরা বলেন,- বাঙ্গালীর 'মঙ্গলচণ্ডী' মঙ্গলদের-ই উপাস্য দেবতা এবং 'তন্ত্র'-বর্ণিতা 'তারা' ও 'মহাচীন তারার' মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিব্বতীয় লামাদের 'শক্তি'-র উগ্রচণ্ডা ভয়ঙ্করী রূপ-প্রীতি-ই নাকি হিন্দু-তন্ত্রের 'ডাকিনী'-র রূপ কল্পনা এনেছে;—এমন কি, —শক্তি-পূজার অঞ্জলি-পুষ্প 'রক্তজবা' চীন থেকে আনীত বলে ইংরেজীতে—'China Rose'—নামে অভিহিত।—আমার মনে হয় এই অভিমত এবং,—এমন কি ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের অভিমত-ও সর্বাংশে গ্রহণ-যোগ্য নয়।[১৩]

কিন্তু এই সব অনগ্রসর—সংস্কৃতিচেতন জন-সমাজের সমান্তরালে ভক্তিবাদী দ্রাবিড় জন-সমাজ ভারতভূমিতে এক আর্য-পূর্ব প্রগতিশীল সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।—সত্য বলতে, আর্য-আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় সভ্যতাই ভারতের সভ্যতা ছিল এবং এই সভ্যতা স্থবির বা বন্ধ্যা ছিল না। দ্রাবিড় শক্তি—উত্তর-পশ্চিমের বেলুচিস্থান থেকে উত্তর-পূর্বের আসাম, বাংলাদেশ এবং হিমালয়ের পাদভূমি থেকে সিংহল অবধি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা এই জন-সমাজ-ই সৃষ্টি করেছিল।

ভূমধ্যসাগরীয় আঞ্চলিক গবেষণা এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর গবেষণার ফল একই সত্যে এসে

মেলবন্ধন রচনা করেছে। গবেষণার ফলে এই ঐতিহাসিক সত্য জানা গেছে যে,—সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার রচয়িতা জনসমাজ মাতৃ-উপাসক ছিলেন। এবং এঁদের মাতৃ-উপাসনা দূর-বিস্তৃত অতীতের উৎস থেকে উৎসারিত ছিল। "The clay figures and phallic beautylic stones suggest that Durga and Siva worship was a very much greater antiquity in India, than has hitherto been supposed।"[১৪] সিন্ধু উপত্যকার গবেষণার প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকের এই অভিমত মেনে নিতেই হয়।

সুতরাং আর্য-পূর্ব দিনে ভারতের নানা শ্রেণীর জন-সমাজে যে মাতৃশক্তি আরাধনার মানস-প্রবণতা বর্তমান ছিল এ সম্পর্কে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। তবে, সমাজের মাতৃতান্ত্রিক বিন্যাস এবং অন্যান্য ভিন্নায়ত কারণের ফলে এই চিত্ত-প্রবনতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল—কি ওঠে নি—এ প্রশ্নের উত্তর অন্যতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সাম্প্রতিক 'আদিভূতা সনাতনী'—যে প্রাথমিক স্তরে এই আদিম জন-সমাজের পূজিতা ছিলেন—এ সত্য শুধু ইতিহাসের আধুনিক গবেষণাতেই জানা যায় না,—আর্য শাস্ত্রেও 'দেবী'কে-কিরাত, শবর এবং পুলিন্দপ্রভৃতি জনশাখার 'উপাস্যা' রূপে অভিহিত করা হ'য়েছে।[১৫] তবে, আর্যরচনাবলীও আধুনিক ইতিহাস গবেষণার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

॥ তিন ॥

আর্য-পূর্ব জন-মানসের শ্রদ্ধা-অভিষিক্ত 'আদিভূতা সনাতনী'র আদিম প্রাথমিক স্বরূপ-ব্যঞ্জনা ততদিন পারমাত্মিক ভাবপ্রকাশে প্রমূর্ত হ'য়ে উঠতে পারে নি, —যতদিন আর্য সাহিত্যে তাঁর 'প্রথমা, আদ্যা, নিত্যা'—রূপাঙ্কন অপূর্ব ব্যঞ্জনা-স্নিগ্ধ ভাষাতে পরম মর্মময় আদর্শের রূপায়ণ-সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে নি।

আর্য এবং আর্যেতর মেলবন্ধনের ভিতর আর্য সমাজ কেবল প্রদানই করে নি;—পূর্ব্বায়ত সংস্কৃতি ও ধর্মের নিবিড় নৈকট্য থেকে গ্রহণও করেছিল। আর্য-সাহিত্যে 'স্ত্রী-দেবতা'র কোন স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত আস[ন] ছিল না;—পুরুষ-প্রধান আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মের দেব[তা] শক্তি রূপে পুরুষের-ই অনির্বাদ নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠ[া] দেখতে পাই।—"অগ্নিমীলে—পুরোহিতং যজ্ঞস্য দে[বম্] ঋত্বিজম্। হোতরং রত্নধাতমম্" - উচ্চারণ করেই আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মের,—এমন কি বিশ্বের সর্ব প্রাচীন রচন[া] 'ঋক্'-বেদের উদ্বোধন হ'য়েছে। বৈদিক সাহিত্যে যদিও 'সরস্বতী'কে 'অম্বিতমে' এবং 'দেবীতমে'—বলে অভিহিত করা হয়েছে,—তবুও তাঁর স্বতন্ত্র শক্তি দী[প্ত] স্বাতন্ত্র্য-চারিত্র চিহ্নিত করা হয় নি। সরস্বান্-নদী[র] পরিণীতা হিসেবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। এমনি ভাবে, পৃথিব[ী] উষা এবং রাত্রি—যে দেবীর কথাই তুলি না কেন—তাঁ[র] পুরুষ-প্রভাব বিযুক্ত জীবনের কোন অস্তিত্ব, নেই। কিন্ত আর্য-পূর্ব লোকায়ত মানস অনুভূত 'আদিভূতা সনাতনী —দেবী-পার্বতী' কেবল মহেশ্বরের ছায়ামাত্র নন,—তিনি—স্বতন্ত্র - "শক্তি রূপে সংস্থিতা।" উত্তর দিনে এই অবৈদিক সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাবেই আর্য-সাহিত্য মাতৃশক্তির অর্চনা, সাধনা এবং স্বীকৃতির মানস-প্রবণতা[য়] প্রাণিত;—আদিম মানব সমাজের 'দেবী'-রূপ কল্পন[া] আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে পরমাত্মিক ভাব-বোধি[ত] জ্যোতির্লোকে অনিন্দ্য-সৌন্দর্য ব্যঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে।

আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মের গূঢ় এষণা এই যে,—"সৃষ্টি[র] মূলে রয়েছে এক পরমাত্মা বা আধ্যাত্মিক শক্তি (spirit) …পরমাত্মার অখণ্ড বিকাশ এবং বিবর্তনের অভিপ্রায়কে স্বীকার করলেই মানুষের জীবনও উদ্দেশ্য এবং আদর্শম[য়] হ'য়ে ওঠে।"[১৬]—"আর্য ঋষিরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে,—

The whole complex range of human lif[e] becomes shallow, aimless and unsatisfying i[f] it is not shot through with a sense of the eternal." [১৭]

এই আত্মিক প্রেরণা থেকেই পরমাত্মার ভাব মাধুরী অভিব্যঞ্জনা, চিৎ-জাগৃতির নিবিড়তায় সম্বেধী 'সত্তা' (spirit) আনন্দ প্রবতার প্রসাদ নিবৃত্তিতে জীবনে

অস্তিত্ব এবং বোধির প্রেয়-পূর্ণতার শাশ্বতি অর্জন করে। এই পরানুভূতের—সত্য-দীপনায় 'মাতৃকা শক্তি'—উত্তর দিনে পরম স্বরূপ অর্জন করলেন। আর্য-পূর্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের 'আদিদেবী'—আর্য-সংস্কৃতিতে 'প্রথমা, আদ্যা—নিত্যা'—রূপে বন্দিতা হলেন।

আর্য সাহিত্যের আদি রচনা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রথম—'আদি শক্তিদেবতা'—রূপে মাতৃকা শক্তির অর্চনা—ঋক্'-উচ্চারিত হতে দেখি। অম্ভৃণ-ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী 'বাক্'—সৃষ্টির অন্তর্লীন পরম কারণকে মাতৃকা শক্তি' রূপে উপলব্ধি করে তাঁর আগমন-উচ্চারণ করলেন :—

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।"১৮

—ঋগ্বেদের এই সূক্তেই দেবী—'রাষ্ট্রী,' 'চিকিতুষী,' 'সংগমনী-বসুনাং,' 'প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্,' 'পুরো দেবী পর এনা পৃথিবী,' এবং 'এতাবতী মহিনা সংবভূব'—রূপে বন্দনা-অভিহিতা হয়েছেন—দেখতে পাই। আর্য-পূর্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের উপাস্যা—'দেবী আদিভূতা সনাতনী' —কালান্তরায়ত বিবর্তিত জীবন ধর্মের মানস প্রবণতার উত্তরণে এই প্রথম নিগূঢ় দার্শনিকতার সূক্ষ্মতায় অভিসিঞ্চিতা হ'য়ে—একাধারে বিশ্ব-উত্তীর্ণ এবং বিশ্ব-লীন স্বরূপ ব্যঞ্জনায় পরমাত্মা ব্রহ্মের দিব্য স্বরূপ অর্জন করেছেন। ঋগ্বেদের এই সূক্তই উত্তর দিনের তান্ত্রিক শক্তি-সিদ্ধান্তের মূল-উৎস বলে সহজ স্বীকৃতি পেতে পারে। ঋগ্বেদের রাত্রি সূক্তেও দেবীর অপূর্ব স্বরূপ বর্ণনা দেখতে পাই। এই রাত্রি-সূক্ত পড়তে পড়তে সমগ্র সত্তার নিবিড় অনুভূতির গভীরতা ঘিরে দেবীর—"কাল রাত্রি মহা রা ত্রি মো হ রা ত্রি"—রূ পা—"ম হা কা লে র মনোমোহিনী"-র ভয়াল-সুন্দর রূপ-প্রতিমা যেন প্রতিভাত হ'য়ে উঠতে থাকে।—ঋগ্বেদে শক্তির 'তমময়ী' স্বরূপ কল্পনা-ও দেখতে পাই। ঋগ্বেদের এই রাত্রি সূক্তের সমান্তরালে-'ময়ূর পুচ্ছ ভূষণা, পাশহস্তা' শবরীর সামবেদের রাত্রি-সূক্তের নিবিড়তম উচ্চারণ স্মরণ করতে পারি :—

"ওঁ রাত্রি প্রপদ্যে পুনর্ভূ র্ময়োভূং কন্যাং—
শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম্।"—

—আরও বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী মন্ত্রের সপ্তলোক-চারিণী অর্যমা বরণীয় দ্যুতি, ধি-র নিয়ন্ত্রী শক্তি-পরমাময়ীকে স্মরণ করতে পারি। ঋক্ ও সামবেদের সমিক বিবর্তন ধারায় পরমাত্মিকা আদ্যাশক্তি পরিণতিতে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন—এ সত্য সহজ ভাবেই অনুভব করা যায়।

শক্তিবাদের বিবর্তন ধারার ইতিভাষ্যের প্রেক্ষিতে অথর্ব বেদ একটি অনিবার্য স্বাতন্ত্র্য পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। অথর্ব বেদে-ই শক্তি অর্চনা এবং চর্যার সামগ্রিক ক্রিয়া এবং রীতি পদ্ধতি একটি আনুপূর্বিক সংহত রূপ লাভ করেছে। অথর্ব বেদে শক্তি-উপাসনার কেবল তত্ত্ব-আদর্শ-ই নয়,—"অভিচারাণি, স্ত্রীকর্মাণি, পৌষ্টিকানি, আয়ুষ্যাণি এবং ভৈষজ্যানি"—ইত্যাদি মন্ত্র ভাগের ভেতর দিয়ে শক্তি-আচরণ-গ্রাহ্য দীক্ষা, যজ্ঞ, বিবাহ, সংস্কার, মন্ত্রসিদ্ধ যাদু-বিদ্যার সাধনা, দানবীয় শক্তির স্তুতি, ভৌতিক ও ঐন্দ্রজালিক বিচিত্র বিষয়ের রূপায়ণ দেখতে পাই। অথর্বন এবং অঙ্গিরাদের এই বেদের প্রধানতম বিষয়বস্তু অনুশীলন করলে পৃথিবীর নানা জাতি—উপজাতির ১৯ চিত্ত-প্রবণতা প্রভাবান্বিত আনুষ্ঠানিক চর্যাবলীর এক আদিম অতীতের পরিচিতি দেখতে পাই। আমার মনে হয়,—অথর্ব বেদকে যতটা অর্বাচীন কালের বলে সাধারণত মেনে নেওয়া হয়—এই বেদ ঠিক ততটা অর্বাচীন কালের নয়,—এবং এই বেদের নিহিত স্তর বেয়ে আদিম মানবের সমাজ-মানসের একটি অন্তর্লীন প্রবাহ বয়ে চলেছে। অথর্ব বেদ,—এক অর্থে —আদিম মাতৃপ্রবণ সমাজ-মানসের রূপচ্ছবি ;—মনে হয়, ঠিক এই নিহিত কারণেই দীর্ঘকাল ধরে অথর্ব বেদ অন্য তিনটি বেদের ('যজুর্বেদ'-কে একটি প্রকরণ ধরে) সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। এই বেদ সম্পর্কে

'অথর্ববেদন্ত যজ্ঞানুপযুক্ত ক্রিয়া পাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব'—ই আর্য-ঋষির অভিহিতি ছিল।২০

কোন আদি মুহূর্তে আদিম মানস সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শিব ও শক্তির অপূর্ব দ্বৈতাদ্বৈত লীলা অনুভব করেছিল—ইতিহাস তার সন্ধান জানে না,—কিন্তু অনাদি কাল ধরে সৃষ্টির মাধুর্যে শিব-শক্তির লীলা ব্যঞ্জনার কল্পনা এবং যুগ্ম-সাধনার ক্রমিকতা চলে আসছে। বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব শিবতন্ত্রে যেন একটি বিশিষ্ট রূপায়ণে পূর্ব-প্রবৃত্ত হ'য়ে উঠেছে। এই সাধনার প্রভাবেই যোগাচার যেমনি তন্ত্রাচারে প্রভাব বিস্তার করেছে,—তেমনি তন্ত্রাচার-ও যোগাচারে প্রভাব ছড়িয়েছে এবং তারই এক একাত্ম ধারায় 'ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী'—আদিভূতা সনাতনীর সাধনার অবিচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করি। বেদ-উত্তর উপনিষদগুলিতেও এই 'চিন্ময়ী'—ভগবতীর অনতিক্রম্য প্রতিফলন দেখতে পাই।

মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, প্রভৃতি অথর্ব বেদের উপনিষদ সমূহ এবং সংহিতায় যোগ এবং শক্তি-পূজার নির্দেশ দেখতে পাই। এমন কি ত্রিপুরোপনিষদে'পঞ্চ—ম'-কার সাধনারও বর্ণনা রয়েছে। অন্যান্য বৈদিক সংহিতার উপনিষদ সমূহে মাতৃকা শক্তির—'রুদ্রপত্নী' রূপে অম্বিকা, অগ্নিশিখা রূপে কালী, করালী এবং ব্রহ্ম শক্তি রূপে উমা হৈমবতী'র রূপ কল্পনা করা হ'য়েছে। এমন কি,— 'আদ্যা শক্তি দেবী'কে

'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো
বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বামিতি।"২১—

বলে অভিহিত করা হ'য়েছে।

কিন্তু,—যদিও উপনিষদগুলিতে দেবীকে 'ব্রহ্ম-বিদ্যা স্বরূপিণী'—রূপে অভিহিত করা হ'য়েছে—তবুও কোথাও তিনি সর্বান্তর্যামী সর্বভূতান্তরাত্মা পরম ব্রহ্ম'-এর স্বরূপায়তা নন,—তিনি পরম ব্রহ্মের 'শক্তি'—রূপেই চিহ্নিত এবং স্বীকৃত হ'য়েছেন।

বেদান্ত এবং সাংখ্যাদর্শনের 'মায়া এবং প্রকৃতিতত্ত্বে 'নিত্যা-শক্তি'-র ক্রমিক অনুস্যূতি ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। বৈদান্ত অভিমত অনুসারে দৃশ্য-জগৎ মায়ার রচনা হলেও 'মায়া'ই একান্ত নয়;—কারণ,—'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম'-এবং অন্তিমে ব্রহ্মই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

বেদান্ত দার্শনিক শংকরাচার্যের অন্যান্য রচনাও শক্তিবাদের বিবর্তনিক উপাদান রূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

অনেকেই যে সুপ্রাচীন 'প্রপঞ্চসার তন্ত্র-কে শংকরাচার্যের রচনা বলে মনে করেন,—কোন সন্দেহ-ই নেই যে,—সেই গ্রন্থ-ই তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি রচনার ওপর অমোঘতম প্রভাব বিস্তার করেছে। এই গ্রন্থের—

"প্রসীদ প্রপঞ্চ স্বরূপ প্রধানে,
প্রকৃত্যাত্মিকে প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞে।
প্রাণো তু প্রভো প্রারম্ভে প্রাঞ্জলিস্তাং
প্রকৃত্যাহপ্রর্তক্য প্রকাম প্রবৃত্তে।"—

এই 'পরাপ্রকৃতি'-র স্তবটি সমুন্নত শক্তিতত্ত্বের আদর্শেরই ব্যঞ্জনা আনে, রবীন্দ্রনাথ শংকরাচার্যের যে 'সৌন্দর্যলহরী'—স্তোত্রটিকে শেলীর 'Ode to Intellectual Beauty-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন—সেই স্তোত্রটির আদিশ্লোক:—

'শিব শক্ত্যা যুক্ত যদি ভবতি শক্তঃপ্রভাবিতুম্।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"-

এই শ্লোক-টিকে কি শক্তিতত্ত্বের নির্যাস বলা যায় না?

শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্র-থেকে শাক্ত দার্শনিক প্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু, শংকরাচার্য্যের সঙ্গে মৌলিক অর্থে শাক্তবাদীদের মাটি-আকাশ ব্যবধান মনে রাখতে হ'বে। বেদান্ত-দার্শনি-কের—"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা—" অভিমত শাক্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য নয়,

বেদান্ত প্রতিবাদী দার্শনিক কপিল রচিত সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বানুসারে সামগ্রিক সৃষ্টির মৌলিক কারণ,— 'পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব'-হলেও 'প্রকৃতি এবং পুরুষ'ই প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতি-ই অন্যান্য তত্ত্বগুলির মূলীভূত

কারন;—এখানে পুরুষ 'অকর্তা'-এবং 'দ্রষ্টা' রূপে অভিহিত হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে 'প্রকৃতি'—অন্ধ জড় শক্তি হলেও এই প্রথম আর্য সাহিত্যে পুরুষের প্রভাব মুক্ত 'নারী শক্তি'র স্বতন্ত্র সার্বভৌম পরিচিতি স্বীকৃত হ'লো। অবশ্য,—প্রকৃতির জড়ত্ব এবং অন্ধত্বকে ঘিরে অন্য ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে।

এই সাংখ্য দর্শনকে ঘিরেই উত্তর দিনে 'পুরাণ' এবং 'তন্ত্রে'-র শাক্ত তত্ত্ব, দেব—দেবশক্তির 'প্রতিমা' এবং 'তত্ত্ব'—রূপিত হয়ে উঠেছে।

বেদ এবং বেদান্ত দর্শনে বর্ণিত অচিন্ত্য ব্রহ্মতত্ত্বের লোকায়ত রস-রূপায়ণ পুরাণগুলিতে মাতৃকা শক্তি অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। পুরাণের বিশাল জগৎ ঘিরে 'আদ্যা শক্তি সনাতনীর অনিবার্য প্রভাব;—এই বিস্তীর্ণ জগতী-তলে কোথাও তিনি—'সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মা-র শক্তিরূপে—'ব্রাহ্মণী'—'আদিদেব'-শিবের শক্তিরূপে 'শিবানী,'—পালক দেবতা বিষ্ণুর শক্তিরূপে 'বৈষ্ণবী' এবং 'সত্ত্ব, রজ ও তমো'-গুণের প্রতীক হিসেবে অভিহিতা হয়েছেন। ঋগ্বেদের দেবী এবং রাত্রি-সূক্তে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল—পুরাণে তারই ফলিত পুষ্প-পল্লবিত বিস্তার দেখতে পাই। দেবী এখানে 'স্বরূপতঃ পরাশক্তি,' এবং 'বিশ্বচর্ষণী [২২]' রূপে অভিহিতা; তিনি-'মহামায়া মূলভূতা' [২৩] এবং তিনি 'কি নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি'"[২৪] বলে "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মম পরা" [২৫] রূপে নিজেকে অভিহিত করেন। এই 'অদ্বিতীয়া'-দেবীর-ই অবিচ্ছিন্ন স্বরূপ সত্তা 'পরাত্মন কাত্যায়নী'র উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশিত গোপবধূজন পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছে।[২৬] এই পুরাণগুলিতেই ব্রহ্মঅবিচ্ছিন্না দেবীর 'প্রতিমা' এবং 'তত্ত্ব' মহিমাময় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

শক্তিসাধনার বিশ্বকোষ 'তন্ত্রশাস্ত্রে-ই 'আদ্যাশক্তির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করেছে। 'তন্ত্র'-উত্তর নানান রচনায় দেবীর বিচিত্র মহিমার এবং সক্রিয়তার বিস্তার দেখতে পাই।

তন্ত্রশাস্ত্রে যদিও আদিদেব মহেশ্বর, পালক দেবতা বিষ্ণু এবং গনেশ,-এমন কি 'মহানির্বাণতন্ত্রে'-'সর্বভূতান্তরাত্মা' ব্রহ্মারও অর্চনার নির্দেশ দেখতে পাই,—তবুও, 'সগুণেশ্বরী' দেবী-ই "সর্বশক্তিস্বরূপা সর্বদেবময়ী তনুঃ"[২৭] এবং তিনিই "মহাবিদ্যাং মহামায়া মহাযোগেশ্বরীং পরাং"[২৮] তিনিই—"সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী," 'আদ্যা, অদ্বিতীয়া, অক্ষরা এবং পুরাণী,' "স্বয়মেকা পর ব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা"[২৯] রূপে বরণীয়া হয়েছেন।

অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্রের—যামল, ডামর এবং আগম ও তন্ত্র—প্রকারবিভিন্নতায় শক্তি'র তত্ত্ব এবং উপাসনা পদ্ধতি-ই বর্ণিত হয়েছে। 'এই আদিভূতা সনাতনী-ই সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি, উষা, উমা, লক্ষ্মী, রাধা, শীতলা, ষষ্ঠী এবং মঙ্গলচণ্ডী—প্রভৃতি বৈদিক, পৌরাণিক এবং লৌকিক দেবীগণের আদি শক্তি,—তিনি বিশ্ব প্রকৃতির প্রতীক, তিনি-ই "শত লক্ষ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে"[৩০] রূপে অভিহিতা হ'য়েছেন। কিন্তু দেবীর এই 'শত লক্ষ মহাবিদ্যা'র মধ্যে—

> "কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
> ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
> বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
> এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

'তন্ত্র' আর্য প্রণীত;—তবুও তন্ত্রে তত্ত্ব এবং সাধনা নির্দেশনায় আদিমতম সংস্কৃতির অন্তর্লীন ধারা প্রবাহ দেখতে পাই। তন্ত্রে বেদ-আচার এবং দক্ষিণাচারের নির্দেশ থাকলেও তন্ত্রের দেবতা এবং দেবার্চনা লোকায়ত মানস-প্রবণতারই স্বাক্ষর বহন করছে। তন্ত্রের আর্য এবং আর্যেতর সংস্কৃতি এবং ধর্মের মেল-বন্ধনের, ভিত্তিরে বেদে সংহিতায়, আরণ্যক—উপনিষদে, দর্শনে এবং পুরাণে অনুসৃত আদিম জনমানসের মাতৃপ্রবণতা একটি সংহতির রূপায়ণ অর্জন করেছে। তন্ত্র-পূর্ব সাহিত্যে—মাতৃ-মানস প্রবণতার অনুসৃতি, তন্ত্রে—সমন্বয়। তাই তন্ত্রে ভৌতিক (material) এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, অর্থহীন এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক মন্ত্রাবলী, কাব্য, দার্শনিকতা এবং আভিচারিক ষট্ কর্ম—মারণ, উচাটন, বিদ্বেষণ, স্তম্ভন, বশী-

করণ এবং শান্তি, বৈধ অবৈধ আচারের এক সমীভবন দেখতে পাই। তন্ত্র শাস্ত্রে এক দিকে যেমন—

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেবচ
ম-কারং পঞ্চদেবেশি শীঘ্রং সিদ্ধি প্রদায়কম্ ;৩১

আবার অন্য দিকে তেমনি—

"যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥...
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্।"—

—এই ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক, অপরা এবং পরাজ্ঞানের সমন্বয়েই তন্ত্র রচিত হ'য়েছে।

মাতৃকা শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রভাব নিয়ন্ত্রিত তন্ত্রের স্বরূপ প্রেক্ষিতে এ সত্য সহজেই মেনে নেওয়া যায় যে,—

"The Great Sakti, the Great Mother, the Goddess, who inspite of her countless names (Durga, Kali, Chanda etc) is only One, the One Highest Queen (Parameswari).৩২

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পেনসরের—

"an infinite and eternal Energy from which proceeds everything"-ই যেন তন্ত্রের—

"মহাদাদ্যন্ত পর্যন্তযৎ খদেতং সচরাচরম্
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ"-এ৩৩

পুনরুচ্চারিত হয়েছে। বস্তুত, 'আদ্যাশক্তি মহামায়া' —তন্ত্রেই অব্যক্ত, পরা, চিদ্ঘন আনন্দস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি-রূপে পূজিতা হ'য়েছেন;—তন্ত্রেই তাঁর পূর্ণতম পরিণত বিকাশ দেখতে পাই।

তন্ত্র-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যে, অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতে, বৈষ্ণব-পদাবলী এবং শাক্ত গীতিকবিতায় শক্তিবাদ ব্যঞ্জনাময় ক্রমানুসৃতিতে প্রকাশিত হ'য়েছে।

মানব ইতিহাসের—'All honoured, wisest best, most pitiful"৩৪ ভগবান্ তথাগত সকল রকম যজ্ঞ, হিংসাত্মক কার্য-চর্যা, পৌত্তলিকতা-প্রতিকূল যে ধর্ম-দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন এবং "দুক্খং দুক্খ সমুপ পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং"-ই যে ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য ছিল—তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সে ধর্মাদর্শে-ই শক্তিবাদের মানস প্রবণতা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে।

ধর্মাদর্শ এবং ধাত্রীমাতা 'মহাপজাপতী গোতমী'-র ইচ্ছানুসারে বৌদ্ধ সংঘে আর্যেতর জন এবং নারীর প্রবেশ বৌদ্ধ ধর্মে যে রূপান্তর এনেছিল—তথাগতের পরিনির্বাণ-উত্তর সামান্য সময়-সীমা পেরিয়ে সেই পরিবর্তনক্রম বৌদ্ধ-মানসিকতায় তন্ত্রাচার, যৌন-যোগাচার এবং নানান বিমিশ্র উপাদানের সংমিশ্রণ প্রবণতা নিয়ে আসে।

খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে কনিষ্কের রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্ম হীনযান এবং মহাযান শাখায় বিভক্ত হ'য়ে পড়ে এবং মহাযান শাখা হিন্দু শাস্ত্রের অনুশাসন এবং দর্শন অনুপ্রাণিত হ'য়ে বুদ্ধ এবং বুদ্ধের প্রধান শক্তিরূপে তারা, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁদের বিভিন্ন শক্তি দেব-দেবতার রূপ কল্পন এবং প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে।

উত্তর দিনে এই মহাযান শাখাই আবার বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযানে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে;—এবং এই বজ্রযান উপশাখায় হিন্দু সমাজদর্শন অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় পূজা-মন্ত্র, মণ্ডল, জপ ও হোম-চর্চার নির্দেশক অগণিত তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল। মনীষী হরপ্রসাদ, ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ যে 'বৌদ্ধ তন্ত্রাবলী' এবং 'সাধনমালা ও নিষ্পন্নযোগাবলী'—সম্পাদনা করেছেন—তার মধ্যে অগণিত 'শক্তি'-দেবীর স্বীকৃতি বর্ণিত হ'য়েছে। বৌদ্ধ মনীষী বসুবন্ধু, শান্তিদেব, কমলশীল, নাগার্জুন এবং অসঙ্গ—প্রমুখ আচার্যবৃন্দ অনেক তন্ত্রশাস্ত্র রচনা এবং সংগ্রহ করে এবং এই সব রচিত, সংগৃহীত তন্ত্রাবলীর টীকা রচনা করে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে বারো শতক অবধি এই সব রচনাবলীর একটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।৩৫ এই সমৃদ্ধ রচনাবলীর প্রভাব ভারতীয় শাক্ত ভূমির সীমানা পেরিয়ে তিব্বত, চীন, এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া অবধি বিস্তার লাভ করেছিল; তাই—"এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির রামায়ণ, মহাভারতের আর্য-চর্যা এবং শাক্ত ধর্মের প্রভাব দেখা যায়।"৩৬

বজ্রযানের রূপান্তরিত উপশাখা সহজযান যদিও পূজা অর্চনা অপেক্ষা দার্শনিকতাই গ্রহণ করেছিল—তথাপি এই উপশাখাই অদ্বয় জ্ঞান লাভের প্রথম পাদ রূপে যৌন-মূলক প্রক্রিয়ায় করুণা ও শূন্যতারযোগে মহাসুখ লাভকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল। এই উপশাখা দেবতা এবং মন্ত্র মণ্ডলের অর্চন আচরণ চর্যার পরিবর্তে হৃদয় ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেও—মূলাধার স্থিতা কুলকুণ্ডলিনীর রূপ-কৃতিকে 'চণ্ডালী' ও 'ডোমনী'র পরিকল্পনায় শাক্তের দেহতত্ত্ব, নাড়ী ও চক্রের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি সহজ যান উপশাখাতেই শাক্ততন্ত্র এবং ধর্মীয় প্রভাব একটা সংহত রূপ পেয়েছে। তাই বৌদ্ধ সহজযানী অনুশীলন করে এ সত্য স্বীকার করতেই হয় যে,—

"If we analyse and examine the ideal of the Buddhist Sahajiyas we shall find that as an offshoot of Tantric Buddhism, it embodies the heterodoxy of Buddhism in general mixed up with the Spirit of Tantricism."৩৭

বারো এবং তেরো শতকের সন্ধি মুহূর্তটি বাংলার জীবন ধর্মে একটি স্মারণিক হ'য়ে আছে। এই সময় বাংলায় মুসলমান আক্রমন সংঘটিত হয় এবং এই জঙ্গম শক্তির আঘাতে বাংলার রাজনৈতিক আর্থনীতিক এবং সামাজিক জগতে যে আবর্তন, বিবর্তন এবং পরিবর্তন এসেছিল - তার ফলে বাংলায় ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, নিম্নবর্ণ লোকযানের লৌকিক সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার মিশ্রণ অনিবার্য হ'য়ে উঠেছিল। এই অনিবার্য সমন্বয় অনেক লৌকিক ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর আর্য-শাস্ত্র সিদ্ধি নিয়ে আসে। এই সব দেব-দেবীর কাহিনী গাথাই বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত। এই কাব্যগুলিতে বৌদ্ধ সংঘের মাতৃকা দেবী এবং লৌকিক মাতৃকা পৌরাণিক মহিমায় সিদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'গজগ্রাসিনী' 'কমলে কামিনী' বৌদ্ধ দেবতা;—খুল্লনার আরাধ্যাদেবী চণ্ডী আরণ্যক লোকযানের আরাধ্যা লৌকিক দেবী এবং 'মহিষমর্দিনী চণ্ডী'—পৌরাণিক দেবী। মনসাদেবীর স্বরূপ কল্পনায়ও এমনিতর তিনটি ধারার মিশ্রণ দেখতে পাই। তন্ত্রের কালী এবং দুর্গা—ধর্মমঙ্গলের 'চণ্ডীদেবী'র রূপান্তর অর্জন করেছেন। মঙ্গল কাব্যের দেবী-স্বরূপ অনুশীলন করলে পৌরাণিক প্রভাবের প্রতিফলনই বেশি দেখা যায়। এই কাব্যগুলির 'চৌতিশা'-য় তন্ত্র শাস্ত্রের প্রভাবও পড়েছে।

দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' বর্ণিত যোগে কুণ্ডলিনী যোগ এবং "হৃদি পদ্মেতে বসি' হংসে করে নানা কেলি"—ছত্রে 'হংস-যোগের' অনিবার্য প্রভাব দেখা যায়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যে তন্ত্রের যোগ এবং বামাচার সাধনার স্বীকৃতি ও ইঙ্গিত ধরা পড়ে।৩৮ কালিকামঙ্গল কাব্যে 'কামরূপা' মাতৃকাদেবীর স্বরূপ-বর্ণনাতে অদ্বৈতের কল্পনার প্রভাব স্ফুটতর হ'য়ে উঠেছে। বামাচার সিদ্ধ শব সাধনা এবং চিতা সাধনের প্রভাবও কালিকামঙ্গল কাব্যে দেখতে পাই।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা অনুবাদ সাহিত্যেও শাক্ততত্ত্ববাদের অনুস্যূতি দেখতে পাই। কৃত্তিবাসের 'যোগাদ্যার' বন্দনা, গোপগণের 'হরগৌরী' এবং কাশীদাসীর চণ্ডিকা-পূজা৩৯ শক্তি মাহাত্ম্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বাংলা ভাবানুবাদ 'দুর্গামঙ্গল'-কাব্যগুলিতে মাতৃপূজার পৌরাণিক পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলার জীবন-ধর্মের সঙ্গে অন্তরে পরতে জড়িত বৈষ্ণব সাহিত্যেও শক্তিসাধনায় প্রতিফলিত প্রভাব দেখতে পাই। প্রাক্-চৈতন্য কাল থেকেই প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মে শক্তি প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করতে পারি। বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলীতে শক্তি সাধনার অমোঘ প্রতিফলন এক গভীর অর্থ ব্যঞ্জনা এনেছে।

বাংলাদেশে পূর্ব থেকেই ভাগবতের বিশুদ্ধ প্রেম এবং তান্ত্রিক প্রভাব পুষ্ট বৈষ্ণব কবিতার দ্বৈতধারাই প্রবাহমান ছিল। জয়দেব-পূর্ব সংস্কৃত এবং প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলী থেকে এই দুটি ধারাই যে প্রাণরস সংগ্রহ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় এইসব কারণেই

বৈষ্ণবতত্ত্বে এবং সাধনায় শক্তি প্রভাব অনেক আগে থেকেই সূচিত হয়েছিল।

বৈষ্ণব-ধর্ম সাধনার প্রামাণিক 'গ্রন্থ-'গৌতমীয়তন্ত্রে' শাক্ত-তন্ত্র-অনুসারে বীজ মন্ত্রাদির সাধন সম্পর্কিত দীক্ষা, পূজা, ন্যাস এবং প্রাণায়াম-নির্দেশিত হয়েছে। 'রাধাতন্ত্রে'র—

"কুলাচারং বিনা পুত্র—
ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শক্তিহীনস্তু তে সিদ্ধিঃ
কথং ভবতি পুত্রক—"৪০

স্পষ্টতই শক্তি প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'রাধাতন্ত্রের মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ কেবল—'কুলাচারস্তু সিদ্ধ্যর্থং পাদ্মনীসঙ্গমাগতঃ''-ই নন,—তাঁর ব্রজলীলা শক্তি-সাহচর্যে মহাবিদ্যার উপাসনার-ই নিহিত অর্থ বহন করছে। 'হরিভক্তি বিলাসে'—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রতিফলন অনিবার্য ভাবেই শাক্ত-প্রভাব এনেছে। ভক্ত কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের-মেঘৈর্মেদুর অম্বরং বনভুবঃ শ্যামলস্তমালদ্রুমৈ"—শ্লোকটিতেও এই পুরাণের প্রভাব অনুরণিত হ'য়েছে। বৈষ্ণবের 'পঞ্চরাত্রে' শক্তি এবং শাক্তমানের অভেদত্ব পরিকল্পন শক্তি তত্ত্বেরই প্রভাব পুষ্ট বলে মনে করি।

বৈষ্ণব কবিতাবলীর ক্রমিক উত্তর অনুসৃতির প্রেক্ষিতে 'রাসেশ্বরী রাধিকা'-র চরিত্র চিত্রণ অনুশীলন করলে 'আদিভূতা সনাতনী'র অনিবার্য প্রতিফলন দেখতে পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কামগায়ত্রী গ্রহণ এবং 'রাসেশ্বরী রাধিকা'-কে শক্তিরূপে কল্পনার মধ্যে তন্ত্র প্রবণতা নিহিত রয়েছে,৪১—এবং সামগ্রিক ভাবে 'পরমেশ্বরী শ্রীরাধিকা'র চরিত্র চিত্রণের—"বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধনার শক্তিবাদে।" এবং "সেই সাধারণ শক্তিবাদ-ই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে;—সেই ক্রম-পরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তি—রাধাবাদ।"৪২—শুধু আধুনিক সমালোচকই নন,—শ্রীরূপ গোস্বামীও বলেন যে—

"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ
সর্বশক্তি বরীয়সী।
তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।"৪৩

উত্তর দিনে বিরচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের "অহো নিশি যোগ ধেয়াই। মন পবন গগনে রহাই"৪৪ পদটিতে তান্ত্রিক যোগাচারের অনুরণন শুনতে পাই। চৈতন্য পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীতে 'তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা' মহাভাব-ময়ী—শ্রীমতী রাধিকার অনিবার্য জয়-উচ্চারণ দেখতে পাই। এমন কি গোবিন্দ দাসের নায়িকা শ্রীরাধিকাও যেন অভিসার যাত্রার জন্যে তন্ত্রাচার কঠিন উপযোগ অভ্যাস করছেন।৪৫

সহজিয়া বৈষ্ণব সাধন প্রণালীতে পরমশিবের সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীর মিলন প্রতীকে রাধাকৃষ্ণের মিলন এবং রস ও রতির কল্পনা এনেছে। তান্ত্রিক বল্লাল সেনের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ৪৬—উত্তর দিনে সহজিয়া বৈষ্ণব পদাবলী বিস্তৃত পূর্ণতা লাভ করেছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং বড়ু চণ্ডীদাস, হোসেন শাহ এবং যশোরাজ খানের রচনাবলীতে-ও শক্তিবাদের ক্রমিকতা অনুসৃত হ'য়েছে। বৈষ্ণব রাগাত্মিকা পদাবলী তান্ত্রিক যোগ সাধনার অনুসরণ করেই যেন দেহ-মহাভূত ইত্যাদি তত্ত্ববাদে দেহের মধ্যে ষট্‌চক্রের অবস্থান, কুণ্ডলিনী এবং পরম শিব—ইত্যাদির রূপ-কল্পনা করেছে বলে অভিহিত করা যায়। সুতরাং, বৈষ্ণব সহজিয়া প্রসঙ্গে এ কথা সত্য স্বীকার্য যে,—

"Psycho-physio-logically yogic processes frequently referred to in the lyrical songs of the Vaisnava Sahajiyas and......the doctrine of the cult, are fundamentally the same as are found in the Hindu Tantras as well as the Buddhist Tantras and the Buddhist songs and dohas."47

উত্তর দিনে শক্তিবাদের এই বিবর্তন ধারার ক্রমিকতায় শাক্ত পদাবলী তত্ত্ব ও কাব্য মাধুর্যের অপূর্ব উত্তরণ এনেছে। এই শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যে একটি অমৃত নিঃসৃত অধ্যায় রচনা করেছে।

বাংলার আউল, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া গানে গানে শক্তিতত্ত্ব মাধুর্য ক্ষরিত হলেও 'শাক্ত পদাবলী'-ই যেন শক্তিতত্ত্বের নন্দন তাত্ত্বিক প্রমূর্তি রচনা করেছে। শক্তি সাধনার ধারা বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র স্তরে প্রবাহিত হলেও এমন দিব্যভাবের অমৃত-ঘন প্রকাশ আর কোথাও দেখা যায় না। 'শাক্ত পদাবলী'র লীলা পর্ব, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকুতি এবং উপাস্য ও উপাসনা প্রভৃতি পর্বে পর্বে কেবল 'আদিভূতা সনাতনী'-র তত্ত্ব ও দর্শনই প্রকাশিত হয়নি, যে মর্মাকুল ভাব-দীপনা বাঙ্ময় হ'য়েছে—বিশ্ব-সাহিত্যে এমন চিদ্ঘন আন্তর প্রকাশের তুলনা মেলে না। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের—

"Full of the freedom of metre and courage of expression"—৪৮

উক্তিও যেমনি শাক্ত পদাবলী সম্পর্কে সত্য,—তেমনি—"It is divine, divine and divine"—৪৯ও সার্থক প্রযোজ্য বলে মনে করি।

শক্তিবাদের এই বিবর্তিত ইতিহাস অনুশীলন করলে এই সত্য-ই অনুভূত হয় যে, সুদূর অতীতের কোন এক বিস্মৃত মুহূর্তে আদিম মানুষের মানসিকতায় শ্রেষ্ঠা শক্তি যে মাতৃত্বের ভাব-প্রবণতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল,—উত্তর কালের মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম-আদর্শের কালানুক্রমিক গ্রহণ, বর্জন, ভাবনা-ভাবাত্মিক—প্রবণতা, অনুভাব, অনুভূতি এবং আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অপরা-পরা সাধনার বক্র—জটিল অনির্বাদ অনুসৃত প্রবাহের ভেতর দিয়ে সেই প্রবণতাই সাম্প্রতিক শাশ্বত প্রমূর্তির অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনায় স্বকীয় স্বরূপ অর্জন করেছে। দর্শনের মৌলতত্ত্ব অনুশীলন করলে এই সত্য-ই ব্যঞ্জিত হ'য়ে ওঠে যে,—সৃষ্টির আন্তর-তলে একটি পরম নিহিত শক্তি বিচিত্র সাময়িক গতিধর্মের অনির্বাদ প্রকাশ ব্যঞ্জনায় সৃষ্টির শ্যামলিম বিস্তৃতিতে পরমাত্মক মাধুর্যে মানবাত্মার অনন্ত মুক্তিকে অমৃতঘন আনন্দ লোকে উন্নীত করে তুলছে।

সৃষ্টির এই স্বরূপ চেতনা জানতে গিয়ে মানুষ এই পরাশক্তির সান্নিধ্য অর্জন করে; এবং এই শক্তি-ই তাকে এক পারমার্থিক আদর্শের প্রেরণায় বিশ্বের শুষ্ক উদ্দেশ্যহীন নিরানন্দময় বিস্তৃতিকে অতিক্রম করে এক অনাদিত্বের জ্যোতির্লোকে প্রাণিত করে। এই পরমাত্ম শক্তির ব্যাখ্যা নিয়েই বারে বারে পৃথিবীতে নানা মত ও পথের দর্শন বিরচিত হ'য়েছে। হেগেল একেই 'Absolute idea' বলেছেন, সোপেনহাউয়ার একেই 'Blind Will' এবং একেই আবার বের্গসোঁ 'Elan Vital'—রূপেই দেখেছেন। ভারতীয় দর্শনে এই 'বিশ্বধাত্রী'—'পরম' এবং 'আনন্দ'। এই পরমানন্দেরই চিদাত্ম আদর্শায়িত আরাধনার পথানুসৃতিতে শক্তিবাদের বিবর্তন পরম সার্থকতা অর্জন করেছে।

: পাদটীকা :

১/৪ : Social Evolution. :—Gordon Childe.

২/৩ : বাংলার শাক্ত ধর্ম : (বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র) ১৩৬২ :—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৩৭/৪২/৪৭ : Obscure Religious Cult :—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনেও সাহিত্যে :—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৫/৮ : ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা :—ক্ষিতিমোহন সেন।

৬/১৯/৩২ : A History of Indian Lit. Vol. I. Winternitz,

৭ : History of Ancient India : R. S. Tripathy.

৯ : শক্তিপদাবলী ও শক্তিসাধনা : জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

১০ : Religion and Scienee : Prof. Albert Einstein.

১১ : Encyclopaedia Britannica.

১২ : Cambridge History of India. Vol. I

১৩ : সাধনমালা ও নিষ্পন্ন যোগাবলী : (সম্পাদিত)—ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য।

১৪ : Pre-Historic Ancient and Hindu India : Donald A. Mackenzie.

১৫ : খিল হরিবংশ : বিষ্ণুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।

১৬/৩৬ : নেতাজীর মতও পথ : অধ্যাপক সমর গুহ। আত্মীয়ের দেশ ইন্দোনেশিয়া : অধ্যাপক সমর গুহ।

১৭ : My Search for the Truth : Radhakrishnan.

১৮ : ঋক-বেদ ১০।১২৫ : ১০।১২৭ : (সম্পূর্ণ ঋক্‌দল)

২০ : অথর্ব্ব বেদ : প্রস্থানভেদ :

২১ : কেন উপনিষদ : ১।৪

২২ : মার্কণ্ডেয় পুরাণ :

২৩ : কালিকাপুরাণ : ৭৪ অধ্যায়।

২৪ : দেবীভাগবত : ৩য় স্কন্দ : ৬ অধ্যায়

২৫ : শ্রীশ্রী চণ্ডী : ১০ম অধ্যায়

২৬ : ভাগবত : ১১ অধ্যায়

২৭/৩১/৩৩ : মহানির্বাণতন্ত্র

২৮ : কালীতন্ত্র : ১ম পটল :

২৯ : রুদ্রযামল : ৪৭ পটল :

৩০ : সিদ্ধযামল :—— —

৩৪ . Light of Asia. Edwin Arnold.

৩৫ : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ বিমান বিহারী ভট্টাচার্য

৩৮ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ডঃ পূর্বার্দ্ধ : ডঃ সুকুমার সেন :

৩৯ : গোবিন্দমঙ্গল : দুঃখী শ্যামদাস

৪০ : রাধাতন্ত্র : দ্বিতীয় পটল

৪১ : Early History of Vaisnava Faith and Movement : Dr. S. K. Dey.

৪৩ : উজ্জ্বলনীলমণি : শ্রীরূপ গোস্বামী

৪৪ : শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন : বিরহ খণ্ড

৪৫ : গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ : ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার

৪৬ : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস নগেন্দ্রনাথ বসু

৪৮ : The Religion of An Artist : Rabindra Nath Tagore

৪৯ : What India is ? Dr. Houzzarman.

উপবাসী গণেশ উবাচ

সুশীতল দত্ত

জীবন যাতনায় কাতর মানুষের দৈনন্দিন জীবন। জীবন যাত্রার দুঃসহ ভারে ওষ্ঠাগত মানুষের প্রাণ। অথচ প্রজাতন্ত্রী ভারতের আমরা নাগরিক—সমাজতন্ত্র আমাদের ঘোষিত মন্ত্র। গণতান্ত্রিক কাঠামে পরিচালিত রাষ্ট্রতন্ত্র, গণ-নির্ব্বাচিত ব্যক্তি প্রশাসনের কর্ণধার—আর নীতি নির্দ্ধারক। স্বাধীনতার ২৫ বছর গত হয়েছে। রজত-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে সরকারী অর্থে, কলকাতার অন্ধকারে আশাহত জনাকীর্ণ শহরের বুকে দেখেছি আলোক মালার ঝলমলানি, সুরেলা সঙ্গীত আর কিছু কিছু প্রদর্শনীর। এর মধ্যে অগণিত সাধারণ মানুষের ছিল কি অন্তরের সাড়া? শুনে আসছি বিভিন্ন রঙীন প্রতিশ্রুতি, দেখে আসছি রাজনীতির তামাসা। জাতীয় আয়ের শ্রীবৃদ্ধির কথা, বৈষয়িক উন্নতির জয়ঢক্কা। মুষ্টিমেয় মানুষ ঐ আনন্দের শরিক আর বাকী লোকেরা বঞ্চিত-প্রপীড়িত-লাঞ্ছিত, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ও জীবন ধারণের অন্নের জন্যে হন্যে হয়ে সংগ্রাম করছে। কিন্তু পারছে না পেট ভরতে, ছেলেমেয়েদের পেট ভরাতে। ৪০% শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নীচে আছে সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে। সারাদেশ ঘুরে দেখলে দেখতে পাবে আরো বেশী। এমনিতেই মানুষ অর্দ্ধাহারী—আজ আবার ভোজ্য দ্রব্য আর ভোগ্য সামগ্রী মানুষের নাগালের বাইরে। জনসাধারণ আজ উপবাসী,—উলঙ্গ প্রায়—ওষ্ঠাগত প্রাণ—বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যেই দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, কর্ম্মক্ষম বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আশাহত যুবক—অন্ধকারময় বাকী জীবনপথ আদর্শহীন। হারিয়ে বসেছে আত্মপ্রত্যয়—জীবন হয়ে গেছে মূল্যহীন। অভিভাবকের দল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, হারিয়ে গেছে তাঁদের জীবনের আনন্দ, ভুলে গেছে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—সহজ-সরল জীবন কামনা আজ মানুষের কাছে আকাশ কুসুম কল্পনামাত্র।

চারিটি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে দেশের বৈষয়িক উন্নতি হয়নি একথা বলা যায় না, দেশকে এখন আর অনুন্নত দেশ বলেও নাকি আখ্যা দেওয়া চলে না। আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি উপলব্ধি করা যায় না। তাহলে পরিকল্পনায় একটা কিছু বিচ্যুতি আছে, পরিকল্পনা রূপায়ণে সন্দেহ আছে, পরিকল্পনাকারদের মনেও।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারতের মোট আয়ের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ আসে কৃষিজাত দ্রব্যাদি থেকে আর শিল্পজাত দ্রব্যাদি থেকে আসে মাত্র ১৪ শতাংশ এর মধ্যে ৬ শতাংশ আসে ছোট শিল্প কারখানা থেকে। মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ১·৮ শতাংশ পণ্য খনিজ দ্রব্যাদি।

যাই হউক আমাদের আজকের বক্তব্য দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ও মুজুরীবৃদ্ধি ও দরিদ্র জনসাধারণের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত গতিতে। এই গতিকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখায় আটকে রাখতে সরকার পারছে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার যন্ত্রণা ধৈর্য্যের সীমার বাইরে চলে গেছে। ঘর সামলাতে গিয়ে মানুষ বেসামাল হয়ে যাচ্ছে।

গত পঁচিশ বছরের দ্রব্য মূল্য কি ভীষণভাবে-বেড়ে চলেছে—নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয় কত ভীষণ হয়ে উঠেছে:—

"প্রথম পরিকল্পনার শেষে চাউলের দাম ছিল মণপ্রতি ১৯·০০ টাঃ
দ্বিতীয় " " " " " " ২৫·০০ টাঃ
তৃতীয় " " " " " " ৪৫·০০ টাঃ
বর্তমানে দর হল মণ প্রতি—৯০·০০ টাকা।

	১মপরিঃ	২য়পরিঃ	৩য়পরিঃ	বর্ত্তমান দর
ডাল প্রতি মণ	১৬·০০	১২·০০	৫০·০০	১০৫·
চিনি " কেজি	০·৭১	১·১২	১·১২	৩·৭০
গুড় " মণ	১৪·০০	২২·০০	৩৬·০০	৮০·০০
তৈল " কেজি	১·২৫	২·২৫	৩·৫০	৬·০০
কয়লা " মণ	১·৫৬	২·২৫	০·৮৭	৫·৮০
মাছ " কেজি	১·৫০	৬·২৫	৪·৫০	১০·০০
কাপড় কাচা				
সাবান প্রতি কেজি	·৫০	·৫৬	·৬০	২·২০
কেরোসিন " বোতল	০·২২	০·২৫	০·৩০	০·৭০
ডিম " জোড়া	০·২৫	০·৩৭	০· ০	০·৭৬
মাংস " সের/কেজি	২·৫০	৩·২৫	৫·	৯·
কাঁচা সবজি গড়ে	০·২৫	০·৫০	০·৭০	১·০০
বেবী ফুড ১টিন	৫·০	৬·২৫	৭·৫০	১১·৫

প্রসাধন সামগ্রীর কথা আলোচনায় কাজ নেই—আমরা পেট ভরে খেতে পাই না প্রসাধনের ধার ধারি না। ভগবান যা রূপ দিয়েছেন তাই টিকিয়ে রাখতে পারি কি না সেটাই হলো আসল চিন্তা। তবু সমাজে চলতে গেলে কিছু প্রসাধন বস্তু মাখবার সাধ মন থেকে মরেনি—তাই একটু ভাবনা। তারপর আছে পরিধেয় কাপড় জামার ভাবনা—আর ভেবে বা করাই যাবে কি, যেখানে একখানা গামছার মূল্য ২·২৫ থেকে তিন টাকা? আচ্ছা এ না হয় যেন তেন প্রকারেণ লজ্জা নিবারণ করে অন্য প্রতিবেশীদের লজ্জায় ফেলে দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পেটে যদি না ক্ষুধায় অন্ন জোগাতে পারি তবে জীবনটা হয়ে উঠে গ্লানিকর, ভাবনা-চিন্তায় বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে, চরমে উঠে মেজাজ, ভালমন্দের তখন সীমারেখা মেনে চলতে পারি না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছি না অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার বেড়াজালে পড়ে। ভারতের অর্থনীতিকে কি করে বেগবান [illegible] যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্যে পরলোক[illegible] প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল-নেহেরু অধ্যাপক নিকো[illegible] কালডরকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। অধ্যা[illegible] কালডর ট্যাক্স ফাঁকি, চোরাকারবার প্রভৃতি কয়ে[illegible] বিষয়ে কিছু সুপারিশ করেছিলেন। পণ্ডিত নেহ[illegible] অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তা কার্য্যকর করা যায় বা করা হয়নি। আমরা পরে এর কারণ বিশ্লেষ[illegible] চেষ্টা করব।

এবছর অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন স্য[illegible] জন হিকস। তিনি এসেছিলেন কলকাতার দ্বারভা[illegible] হলে; কথা প্রসঙ্গে এই প্রবীন অর্থনীতিবিদ্ বলেছিলে[illegible] —ভারতীয় অর্থনীতির কি করে উন্নতি ঘটানো সম্ভব [illegible] তিনি বুঝতে পারেন নি। কাজটা খুবই কঠি[illegible] এমনকি প্রায় দুঃসাধ্য বলেই তিনি ইঙ্গিত করেছে[illegible] কাজটি খুবই কঠিন—তবে তার সমাধান অসম্ভব নয় ব[illegible] আমরা মনে করি।

আমাদের মত মানুষের জীবন যাপনও প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছে। তার গভীরতা কতটুকু, তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে কি আছে ভবিষ্যতের অন্ধকারে—মানুষকে বর্তমান অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা কোথায় কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে আমরা প্রথমে তাই আলোচনা করছি—।

জনগণকে বাদ দিয়ে মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ও বন্টনের পথ হচ্ছে পুঁজিবাদী পথ। এই পুঁজিবাদী অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। জাতীয়করণ আর সমাজতন্ত্রকরণ এক নহে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই মানবতাদরদী সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি সুতরাং মানুষই এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তাই শুধু তার ক্ষেত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে হবে।

তাত্ত্বিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই অধিকারও নেই। তা জমা থাক রাজনৈতিকদের জন্য ও অর্থনীতির পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য। আমরা দেখছি আমাদের পেটে লাথি পড়ছে, সন্তান সন্ততিরা গোল্লায় যাচ্ছে, এই অর্থনৈতিক দুঃসহ জ্বালার তাড়নে।

প্রয়োজনভিত্তিক সরবরাহ না হলে বাজার দর চড়া থাকে এই কথা সকলেই জানেন। দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা দেশের সম্পদ না হয়ে আজ চূড়ান্ত বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে—তাই জনসংখ্যা কমানোর জন্য সরকার চেষ্টা করছেন—এতে সমস্যার সমাধান হবে কি? কৃষি উৎপাদনের জন্য কোটি কোটি টাকার সার আমদানি হয়েছে। দেশে প্রস্তুত হচ্ছে সার জমির ফলন বাড়াবার জন্য। নিবিড় চাষের মাধ্যমে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য মালিক শ্রমিকের সহযোগিতা, প্রয়োজন। তারজন্য তাদের সম্পর্ককে উন্নত করার চেষ্টা আরো জোরদার করার প্রয়োজন। কৃষিজাত দ্রব্যের ফলনও বাড়ছে কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে না। তার মধ্যে খরা প্লাবনেও ফসল নষ্ট করছে। উন্নত সেচের ব্যবস্থা করে মাটির তৃষ্ণাকে মেটাতে পারলে ফলন বহুগুণে বাড়বে—এদিকে সক্রিয়াত্মক প্রচেষ্টা নিপুণভাবে চালাতে হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা এই অকল্পনীয় দৈনন্দিন মূল্যবৃদ্ধি মানুষের সৃষ্টি। চাউলের মন আর ১৮, টাকায় খেতে পাব না একথা জানি। কিন্তু তার দাম কেন ৯০, টাকা মন হবে তা' হিসাব করে বুঝতে পারছি না। সরষের তেলের দাম সরকার বেঁধে দিলেন ৫.৭৫ টাঃ, তেল উধাও হয়ে গেল। খুঁজে পেতে যখন জোগাড় হলো তখন দাম দিতে হলো ৬.৩০টাঃ। এর কোন যুক্তি আছে কি না জানি না। কিন্তু কত কষ্ট হয় ঐ তেল জোগাতে, মুখের গ্রাস তুলে নিতে আর কাচ্চা বাচ্চাদের মুখে তুলে দিতে তা হাড়ে হাড়ে সকাল সন্ধ্যা টের পাচ্ছি। মুখে কেউ আর মিষ্টি কথা বলতে পারছি না চিনি খেতে পাই না বলে। গুড় খাব? তারও দাম ৮০টাকা মন। তাও আবার বালি মাটি আরো কত কি মেশানো। চিনিকে চেনাই যায় না। খাবার তেলের দাম জোটাতেই প্রাণান্ত; কর্তাব্যক্তিদের পায়ে আর তেল মাখাব কি দিয়ে? ফলে উপযুক্ত ছেলেকে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি না—গিন্নির মনকে খুশী রাখব কি—তাকে শান্তই রাখতে পারছি না। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে তাঁর পছন্দমত জোগান দিতে পারি না—তিনি পারেন না সন্তানদের দু'মুঠো খাবার দিতে, ঘরে তিনি উগ্রচণ্ডী, বাইরে আমি রুদ্রমূর্তি—এই তো শহর জীবন, যাদের কিছু না কিছু রোজগার আছে। গ্রামবাংলার খবর দেখুন—সেখানে বহুগ্রামে জনসাধারণ একবেলার অন্ন জোটাতেই পাগল, সুখ নেই, শান্তি নেই ঘরে। তবু জনসাধারণ মুখ বুজে ধৈর্য্য ধরে বেঁচে আছে জীবনভোর সংগ্রাম করে। কিন্তু যখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবে তখন এরাই সমাজ শাসন ভাঙবেন।

যেমন জনসংখ্যা বেড়েছে তেমনি খাদ্য দ্রব্যের ফলনও বেড়েছে। সাদা হিসাবে তো দেখছি ৩৮কোটি লোক ৫৫ কোটিতে এসে পৌঁচেছে অথচ ১৮,টাকার চাল

হয়ে গেছে ৯১০০টাকা। অন্যান্য জিনিষেরও একই অবস্থা মূল্যের দিকে—দুরবস্থা গুণের দিকে। ভেজালহীন কোন খাদ্যবস্তু বাজারে নেই। একদিন কথা প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলেছিলাম এক বন্ধুকে যে "খাঁটি মানুষ আজ আর দেখা যায় না।" তার উত্তরে পাশেরই এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"কি করে পাবেন মশাই। ভেজাল খেয়ে খেয়ে মানুষগুলোও ভেজাল হয়ে গেছে।" মানুষের মনও হয়ে গেছে তিক্ত তাই মিষ্ট কথা আর কেউ বলতেও পারছে না—সরস হাস্য বা কৌতুক তো একেবারে উঠেই গেছে।

মূল্যবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি রোধ করতে না পারলে জনসাধারণকে এই দুঃসহ জ্বালার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। ব্যবসায়ীদের অতি লোভকে সম্বরণ করাতে না পারলে—সরকারী প্রশাসনের দুর্নীতিগুলোকে দাবাতে না পারলে এই সর্ব্বনাশা মূল্যের উর্ধ্বগতি রুদ্ধ হবে না। মানুষ যদি খেতে না পায়, পরতে না পায়, শুতে না পায় তবে মানুষ অস্থিরমনা উন্মত্তপ্রায় হতে বাধ্য। তার পরবর্তী অবস্থা হলো সামাজিক উচ্ছৃখলতা; প্রচলিত নিয়ম কানুনের বিরোধিতা—আইনকে অবহেলা করা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতা ও অকারণ হানাহানি—না, একে অকারণ বলে বিদ্রুপের মত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই হানাহানির মূলে কাজ করছে দারিদ্র্যের চরম আঘাত—বেকারত্বের নিকষ কালো ঘোর অন্ধকার ভবিষ্যতের ইসারা। একাজ আত্মপ্রত্যয়হীন এক জীবন্ত যৌবনের। একাজ একটি ভীষণ ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতমাত্র।

হ্যাঁ, অধ্যাপক কালডর ট্যাক্স ফাঁকি, চোরা কারবার ও মজুত প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন কিন্তু তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেগুলির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকর পন্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মত জন-প্রিয় অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনীষী রাজনৈতিক কর্তা-ব্যক্তির পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি .কেন? ঐ একটা বিরাট জিজ্ঞাসা। এর কারণ তাঁর ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। আমলাতন্ত্রের শক্তিমান পুরুষেরাও কালোবাজারীদের অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মুনাফাখোরদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ও ট্যাক্স ফাঁকিবাজের প্রসাদ লাভের আশায়। এদের ক্ষমতা আজকাল আরো বেড়েছে—প্রশাসন ক্ষেত্রের দুর্নীতি বেড়েছে বহুগুণ। কাজে অকর্মণ্যতা হয়েছে প্রবল। অপশাসন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দাপটে জনসাধারণ হয়েছে আরো দুর্ব্বল, সবল প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে গেছে, ক্ষীণ হয়েছে প্রতিবাদের কণ্ঠ। এতে সুবিধা হয়েছে ঐ দুষ্টচক্রের—আজ অর্থের বিনিময়ে এঁরা যে কোন রাজপুরুষকেও বশ করতে পারছেন। প্রশাসনের কর্ত্তাব্যক্তিরা আজ আর লাগাম টানতে পারছেন না। কারণ দলের স্বার্থের জন্য এদের বিবেকও আজ আবদ্ধ। জন-সাধারণের স্বার্থ দলিত, দেশের সামগ্রিক কল্যাণের পথ রুদ্ধ।

তাই দিনের পর দিন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। চিনির দর বাড়ছে—বনস্পতির দাম বাড়ছে আষাঢ়ের বৃষ্টির মেঘ বাড়ার মত। সরকার বাহাদুর বৃহৎ ব্যবসায়ীদের আব্দার মেনে নিচ্ছেন। কর ফাঁকি-বাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। মজুতদারদের উপর হাত দিতে চাইছেন না। চোরাকারবারী ও ভেজালকারীদের গায়ে আঁচড় লাগছে না। ভেজালের জ্বালায়, চোরাকারবারীদের সদম্ভ দাপটে মজুতদারদের কারচুপিতে আর প্রশাসনের কপট হুঙ্কারের মধ্যে মর্ম্মে মর্ম্মে ভুগছে দেশের মানুষ জীবনযন্ত্রণায়। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের জনগণ অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে বাঁচার জন্য ধুঁকছে।

ঐ অবস্থার শুভ পরিবর্তন না হলে জনসাধারণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে—ঘটবে বিপর্য্যয়। কাজেই এই বিষম পরিবেশের পরিবর্তনের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা আরম্ভ করতে হলে খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্য সামগ্রীর ক্রম বর্দ্ধমান মূল্যের অগ্রগতিকে বন্ধ করার প্রয়োজন। কারণ আজকের সমস্যা খাদ্যাভাব নয়, সমস্যা যতটা সুষ্ঠু বন্টনের। এই সুষ্ঠু বন্টনের ভার হাতে নিতে

হলে উৎপাদন-সংগ্রহ ও বন্টনের ভার নিতে হবে রাষ্ট্রের, নিতে হবে জনসাধারণের সমবায়িকার হাতে। সমস্ত ভারতে খাদ্য শস্যের অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে—রাখতে হবে সুষ্ঠু পরিবহনের ব্যবস্থা। "কন্‌ট্রোল" নামীয় ভৌতিক কাজটিকে কবরে দিলে ভাল হয়।

সমস্ত জমির চাষ আবাদে ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিয়ে কোঅপারেটিভের হাতে দিলে ভাল হয় এবং ঐ কো-অপারেটিভের স্বত্ব থাকবে বর্তমান ভূমির মালিকদের হাতে। সেখান থেকে সরকারী তত্ত্বাবধানে শস্য সংগ্রহ করে সমবায়িকার মাধ্যমে বন্টনের ব্যবস্থা করা হলে দ্রব্যমূল্যের মান স্থিতিশীল থাকবে। অবশ্য এই ব্যবস্থা চালু করার জন্যও প্রশাসনকে সৎ হতে হবে।

আমরা সকলেই বর্তমান আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চিৎকার করি অথচ একটা কথা মানতে চাই না যে সৎ সমাজ না হলে সৎ প্রশাসন হতে পারে না। আর সৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান আমলাতন্ত্রের পরিবর্তন শুধু ব্যক্তি বিশেষ পরিবর্তনে হবে না। তার জন্য চাই বর্তমান স্বার্থান্বেষী ও লোভী মানসিকতার পরিবর্তন। মানব কল্যাণবোধের জাগরণ চাই—সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার উন্মেষ সাধন, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন—শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন।

কথায় ও কাজে নেতৃত্বকে হতে হবে সৎ, স্থির, ধীর। নীতি হবে সমাজ কল্যানমুখী। আইনকে করে তুলতে হবে সত্যনির্ভর শাসন নির্ভীক। ন্যায়ের বিচার যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হবে, যতক্ষণ না মানুষ আবার আইনের প্রতি আস্থা স্থাপনা করছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের নৈতিক মান উন্নত হতে পারবে না। এই নৈতিক মান অবনমন থেকে মানুষকে উন্নত করতে হলে—অরাজকতা থেকে উদ্ধার করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ন্যায়ের বিচার। অর্থাৎ মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করার জন্য নেতৃত্বের সর্ব্বাত্মক প্রয়াস করতে হবে।

ভেজালদারদের, চোরাকারবারীদের, কালো-বাজারীদের কাজকে বন্ধ করতে হবে। এর জন্য শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। প্রণীত আইনের সঠিক প্রয়োগও হওয়া চাই। কঠোর শাস্তি চাই, এদের অপরাধের ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত। কর ফাঁকিবাজদের শাস্তি চাই—কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ও প্রয়োগের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকলেই কর ফাঁকি বন্ধ হবে। এদের রুখতে যদি প্রচলিত আইন সহায়ক না হয় তবে আইনের পরিবর্তন সাধনই কর্তব্য। কারণ মানুষের প্রয়োজনেই আইন সংগঠিত হয়েছে। তাই আইনকে যুগপ্রয়োজন ভিত্তিক করে নিতে হবে। তবে-সর্ব্বোপরি চাই নৈতিক উন্নতি সাধন।

আজ সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে দেশের জনসাধারণের কথা—এদের দুঃখের কথা। এই অমানুষিক মূল্য-বৃদ্ধির বিড়ম্বনার কথা। মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি যদি না হয়, কিছু সংখ্যক দুষ্ট-চক্রের আনন্দের আরামের জন্য যদি জনমানুষের এই যন্ত্রণা লাঘবের কাজ বিঘ্নিত হয় তবে গণেশের রুদ্ররোষের আগুনে পুড়ে একদিন ছাই হবে সমাজ, সংসার আর এই প্রশাসন। আগ্নিধৌত হয়ে জন্ম নিবে নির্মল শোষণহীন এক নূতন পবিত্র সমাজ জীবন।

ছাত্র ও রাজনীতি

সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল

ভারত-ভাগ্য-বিধাতা রাজতন্ত্র নির্মূল ক'রে সারাদেশে রাজনীতির শাসন ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাজা নেই, কিন্তু রাজ-নীতি আছে। আর সেই রাজনীতির ঢেউ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন তট-প্রান্তে ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি—আজ সব কিছুই রাজনীতি শাসিত। অনুপ্রবেশ যখন সার্বিক, তখন শিক্ষায়তনও তা'র প্রভাব-মুক্ত নয়। ছাত্রেরা তাই রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে, সভা-সমিতি করছে, শোভাযাত্রা করছে, দলের জন্য চাঁদা তুলছে, জন-সংযোগ বাড়াচ্ছে, দল এবং সরকারের নীতি-নির্ধারণে অংশ নিচ্ছে।

ছাত্রদের এই রাজনীতি-সচেতনতা সেই পুরাতন প্রশ্নকে আবার নূতন ক'রে তুলে ধরেছে—ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত কি? এ-শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বারে বারে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হ'য়েছে। অনুশীলন সমিতি গড়ার সময় এ-প্রশ্ন ছিল; অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও এ-প্রশ্নের নিরসন হয় নি। আবার এই শতকের উপান্তে দাঁড়িয়ে নূতন ক'রে তুলতে হ'চ্ছে সেই পুরাতন জিজ্ঞাসা। স্পষ্ট উত্তর না পেলেও ছাত্র-সমাজ বারে বারে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে পরোক্ষ ভাবে। প্রতি বারেই বিপুলতর সংখ্যায় তারা মিলিত হ'য়েছে রাজনীতির অঙ্গনে—ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে রাজনীতির পতাকা।

কিন্তু এই পরোক্ষ জবাব কি নির্ভুল? বিতর্কিত এই প্রশ্নটি ঘিরে জন-মানস দ্বিধা-বিভক্ত। একদল বলেন, ছাড়ো; অন্যদল বলেন, ধরো।

এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে ছাত্র-জীবন কর্ম-জীবনের মুখবন্ধ। তাই ছাত্র-জীবন মূলতঃ প্রস্তুতিপর্ব। আগামী দিনে জীবন-যুদ্ধের উপযুক্ত সৈনিক হ'তে গেলে নিশ্চয়ই প্রয়োজন প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণ। সে-প্রস্তুতি দেহ এবং মন দু'য়েরই। সার্থক প্রস্তুতির মূলে থাকে নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং নিমগ্নতা। আন্তরিকতার সঙ্গে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করার নাম নিষ্ঠা। কোন কাজ একমনে করার নাম একাগ্রতা। আর নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সম্মিলনে আসে নিমগ্নতা। সেই নিমগ্নতাকে যদি বাইরের কোন প্রবল শক্তি বারংবার আঘাত করে, তবে খুব সহজেই প্রস্তুতি বিঘ্নিত হয়। দই পাতার কিছুক্ষণ পর পর দধিপাত্রটি আন্দোলিত হ'লে দই বসতেই পারে না। সিমেন্ট কংক্রিটের ভিত শক্ত হওয়ার আগেই যদি টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে যায়, তবে তা' দৃঢ়তা ও ভারবহন-ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। তাই ছাত্র-জীবনকে বাইরের প্রভাব থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখাই শ্রেয়। এ-জীবনের প্রধান কাজ শরীরকে সুগঠিত, বুদ্ধিকে শাণিত এবং হৃদয়কে প্রসারিত করা; জগতের যা' কিছু সুন্দর, রমণীয় এবং মহনীয় আছে তা'র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

অন্য ভাবেও কথাটা বলা যায়। জন্মসূত্রে প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যা' পাই তা' বিভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া একটা পিণ্ড মাত্র। তা'র মধ্যে খাতসহ ধাতু থাকে, অসার অংশও থাকে। সেই পিণ্ডকে কঠিন পরীক্ষার আগুনে গলিয়ে পিটিয়ে, প্রয়োজন মত অন্য উপাদান মিশিয়ে, কার্য্যক্ষম ক'রে তুলতে হয়। এই গঠনের কাজটি যদি ঠিকমত সম্পাদিত না হয়, তাহ'লে ধাতুপিণ্ডের কার্য্যকারিতা অপরিণত থেকে যায়। আর গঠনের পূর্বেই যদি তাকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে সুষ্ঠু কাজ তো হয়-ই না, উপরন্তু তা'র অবলুপ্তিই ত্বরান্বিত হয়। রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বে ছাত্রকে তাই আপন শক্তিকে সংহত করা দরকার।

এই বক্তব্যের অনুসরণে ছাত্র-জীবনকে বীজ-বপনের কাল বলা চলে। উপ্ত বীজটির ঠিক ঠিক অঙ্কুরণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ মহীরুহের আবির্ভাবকে সম্ভব করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। ছাত্র-জীবনেই উপ্ত হবে ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনের বীজটি। সে-বীজ-জ্ঞানের উন্মেষ, শক্তি এবং দক্ষতার উদ্বোধন। এই জ্ঞানানুশীলন এবং চারিত্রিক শক্তি অর্জনের জন্য ছাত্রেরা একান্তভাবেই তাদের শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকের সাহচর্যে ধীরে ধীরে তা'রা পরিশ্রমী নম্র, বিনয়ী, বিদ্বান্ এবং চরিত্রবান্ হ'য়ে ওঠে; কর্ম-জীবনের উপযুক্ত হয়।

উপযুক্ত বয়সে ছাত্রেরা রাজনীতিতে যোগ দেবে বৈকি। ছাত্রাবস্থাতেই তা'রা দেশের রাজ-নৈতিক গতি-প্রকৃতির তাত্ত্বিক দিকগুলি অনুধাবন করছে, বিভিন্ন মত ও পথের পরিচয়ও পেয়েছে। কর্মজীবনে পছন্দমত দল বেছে নিয়ে তা'রা কাজ করুক। তখন সে কাজের গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চয়ই বাড়বে এবং দেশেও তা'তে উপকৃত হবে।

কিন্তু যে-বয়সে কৈশোরের কিশলয় সবেমাত্র যৌবনের শ্যামল গৌরবে পর্যাবসিত হ'চ্ছে, রাজনীতি তখন মোটেই অনুকূল প্রভাব নয়। কারণ. রাজনীতি সূর্য্যকিরণের মত প্রাণময় ঔজ্জ্বল্যে জীবনকে উদ্ভাসিত করে না, মুক্ত বাতাসের মত কোমল সৌরভে মনকে প্রফুল্ল করে না, নির্ম্মল জলের মত সারাদেহ নিষ্কলুষ করে না। রাজনীতি অত্যন্ত জটিল। সর্পিল তা'র পথ, বঙ্কিম তা'র গতি। তা'তে মত্ততা আছে, প্রচার আছে, আড়ম্বর আছে, আত্মম্ভরিতা আছে; কিন্তু যুক্তির স্থান, সাধুতার স্থান, সততার স্থান সেখানে গৌণ। আমাদের দেশের রাজনীতি প্রায়ই জনসেবার মুখোস-পরা স্বার্থসন্ধ মানুষের মিছিল। সজ্ঞান কপটতা সেখানে মস্তবড় ধর্ম। তাই সার্থক ভাবে রাজনীতি করতে গেলে মানুষকে অনেক কারচুপি, অসদাচার এবং অশিষ্টতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়।

সেই কারণে তরুণ বয়সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হ'লে তা'র বিষবাষ্পে নির্ম্মীয়মাণ জীবনখানি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বার্থশূন্য ভালবাসা যে বয়সে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে শিক্ষা তখনও হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হঠাৎ সেখানে কুটিলতা, দলীয়তা এবং স্বার্থপরতার ঘূর্ণি ঝড় উঠলে সারল্য ও পবিত্রতার শিশু তরুটি ভূমিসাৎ হওয়ারই প্রবল সম্ভাবনা। কারণ, ঝড় থেকে আত্মরক্ষার কৌশলগুলি তখনও তা'র অনায়ত্ত। তা'র বুদ্ধি অপরিণত, তাই রাজনীতির জটিল আবর্ত ঠিক ঠিক অনুধাবন করা প্রায়ই তা'র পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই অল্প বয়স এবং অপরিণত বুদ্ধির জন্য রাজনীতিতে ছাত্রদের ভূমিকা সাহায্যকারী ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। তা'রা নির্ব্বাচিত হ'তে পারে না, অধিকাংশ কম বয়সের জন্য ভোটার ই নয়। সুতরাং শক্তির খেলায় তা'রা ক্রীড়নক মাত্র। চৌকস কোন বয়স্ক খেলোয়াড় নিজের স্বার্থের জন্য তাদের কাজে লাগায়; তাদের কর্ম-শক্তি, সারল্য এবং সেবার সাহায্যে নিজের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে। ছাত্রেরা এ ভাবে অন্যের হাতের যন্ত্রে পরিণত হ'লে তাদের নিজেদের ই ক্ষতি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষতিও বটে। সরল বিশ্বাসী এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র কর্মীর উপস্থিতি দেশের রাজনীতিকে বস্তুনিষ্ঠ না ক'রে আবেগ-ধর্ম্মী ক'রে তোলে। সস্তা শ্লোগানের তলায় চাপা প'ড়ে যায় বিশ্লেষণ ধর্ম্মী বিচার বুদ্ধি। তাই দেশের স্বার্থেই ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। কর্মজীবনকে অযথা ছাত্রজীবনের মধ্যে টেনে এনে ছাত্রজীবনকে কীটদষ্ট এবং কর্ম্ম-জীবনকে পঙ্গু ক'রে ফেলা জাতির পক্ষেই ক্ষতিকর।

তা'ছাড়া ছাত্রজীবনে রাজনীতিকে টেনে আনলে অন্যদিক দিয়েও ছাত্রের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ছাত্রের রাজনীতি যদি তা'র শিক্ষক বা শিক্ষালয় প্রধানের মতের বিরুদ্ধে যায় তাহ'লে সেই শিক্ষকের হাতে ছাত্র হিসাবে তা'র প্রকৃত মূল্যায়ন নাও হ'তে পারে। এই আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তাহ'লে, সেই প্রতিকারহীন অবমূল্যায়নের ফলে ছাত্রের ভবিষ্যৎ কর্ম-

জীবন চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে বাধ্য। রাজনৈতিক কারণে শান্তিলাভের অভিযোগ আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, বিশেষত: উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে।

আরও বলা যায় যে, প্রতিটি কাজের জন্য অনুকূল সময় এক নয়। যখনকার যা' তখনকার তা'—এটা কেবল লোকশ্রুতি নয়। পরীক্ষিত সত্য। একমাত্র নন্দনকাননেই সকল ঋতুর ফুল ও ফল একসঙ্গে তাদের প্রসন্নহাসি তুলে ধরতে পারে, কিন্তু এই মাটির পৃথিবীতে তা' অবাস্তব। শরতের শিউলি জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত প্রভাতে ফুটবে না, শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পিক-কলরব শোনা যাবে না। শিক্ষার জন্য যদিও কোন বয়স-সীমা নির্দিষ্ট নেই, তবু ছাত্র-জীবনই শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট সময়। কর্মজীবনে এখন অনেককেই দেখা যায়, যাঁরা তাঁদের নিরুপদ্রব এবং নিশ্চিন্ত ছাত্রজীবনের দিনগুলি হেলায় অপচয়ের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত। কিন্তু অনুশোচনা যতই তীব্র হোক না কেন, কৈশোরের সেই উচ্চ-সংবেদনশীল এবং সূক্ষ্মতন্ত্রী-বিশিষ্ট স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি আর ফিরে পাওয়া যায় না; হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগও তাই আসে না। সেজন্য সময় এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন ছাত্র-জীবনেই।

তাই রাজনীতি-ছাড়ো-গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্ম-জীবনের প্রয়োজনেই ছাত্র-জীবনকে গড়তে হবে। শরীর, মন এবং চরিত্রগঠন-ই এই জীবনের প্রধান কাজ। জ্ঞানলাভ এবং পেশাগত যোগ্যতা অর্জন এই-জীবনের প্রধান তপস্যা। রাজনীতি নিয়ে ছাত্রেরা নিশ্চয়ই পড়াশুনা করবে, আলোচনা করবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেবে না, কোন দলের কর্মী হিসাবে কাজ করবে না। সার্থক রাজনৈতিক জীবনের প্রয়োজন এবং সুষ্ঠু ছাত্র-জীবনের প্রয়োজন এক নয়। তাই একটির সঙ্গে অন্যটি মিশিয়ে ফেল্‌লে কোনটাই সুগঠিত এবং সম্পূর্ণ হয় না।

রাজনীতি-ধরো-গোষ্ঠীর সমর্থকগণ বলবেন, বেশ তো, ছাত্র-জীবন যে অধ্যয়নের জীবন সে তো অনস্বীকার্য। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথিভিত্তিক অধ্যয়নই কি যথেষ্ট? স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা যদি রাজনৈতিক দিক্ দিয়ে সচেতন না হয়, দেশের এবং সমাজের প্রয়োজনে যদি তা'রা এগিয়ে না আসে, তবে সেই প্রাণহীন শিক্ষার মূল্য কি? কতকগুলো তত্ত্ব মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিলেই কি শিক্ষা হ'ল? —না কি, সেই তত্ত্বগুলো মাথায় নিয়ে একবার নিজ নিজ এলাকায় যদি ছোট আকারেও কাজ শুরু করা যায়, তবেই শিক্ষার সার্থকতা? পুঁথিগত শিক্ষার ব্যর্থতা আমরা দেখেছি, দেখেছি তা' কেমন ক'রে ছাত্রকে আত্ম-হননের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। পুঁথি প্রকাণ্ড হ'য়ে কিভাবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শ্বাসরোধ করে, তাদের বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তিকে পঙ্গু ক'রে দেয়, তা' আমরা দেখেছি, দেখছি। তাই পুঁথির সঙ্গে প্রয়োজন প্রাকৃটিক্যাল্ কাজ। কাজের সঙ্গে যুক্ত যে-শিক্ষা তা'-ই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা স্কুল-কলেজে ইতিহাস-ভূগোল পড়ছি। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা আর ভূগোলের জ্ঞানকে স্কুল-কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে রেখে যে-শিক্ষা আমরা পাই, তা' কু-শিক্ষা। ছাত্রেরা যদি অবসর সময়ে বেরিয়ে এসে গ্রাম অঞ্চল এবং দেশকে দেখে, ইতিহাসের ধারা দেশের উপর দিয়ে কোন্ পথে প্রবাহিত হ'চ্ছে তা' যদি একবার প্রত্যক্ষ করে, তবে তাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বস্তু-সংস্পর্শের এক বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে যাবে। তা'তে তাদের ধ্যান-ধারণা নূতন পথ নেবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি মুখস্থ করতে হিম্-শিম্ খায়। তাদের যদি কিছুটা প্রাকৃটিক্যাল্ রাজনীতির সংস্পর্শে আনা যায়, তবে সেই দুরূহ তত্ত্বগুলি স্বচ্ছ হ'য়ে উঠবে মুহূর্তের মধ্যে। সুতরাং রাজনীতি শিক্ষার বিরোধী ব'লে যে-ধারণা গ'ড়ে উঠেছে, তা' মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। রাজনীতির উদ্দেশ্য দেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করা। শাসন-ক্ষমতা হাতে থাকলেই তবে দেশ বা সমাজের কাজে লাগা যায়।

রাষ্ট্র-যন্ত্রই সমস্ত সম্পদের নিয়ামক। রাষ্ট্রযন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার উপর নির্ভর করছে শান্তি-শৃঙ্খলা, আয়-

উন্নতি, অর্থসমৃদ্ধি। ছাত্রদের জীবন ও কার্যক্ষেত্রও নির্ধারিত হ'চ্ছে রাষ্ট্র-যন্ত্রে। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই রাষ্ট্র-শক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং পরিচালনার দিকে ছাত্রদের নজর রাখা দরকার।

তা'ছাড়া, রাজনৈতিক সাহচর্য পাঠ্য বিষয়গুলিকে শুধু সহজবোধ্য ও জীবন্ত ক'রে তোলে তা'ই নয়; মনকে জাগ্রত ক'রে নূতন নূতন বিষয় ছাত্রের আগ্রহের জনক হিসাবে ও কাজ করে। ছাত্রের চরিত্র গঠনের প্রধান সহায়ক রাজনীতি। বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার, লোককে প্রভাবিত করার, নূতন নূতন সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাজনীতি ছাত্রদের মধ্যে এনে দিতে পারে। কঠোর পরিশ্রম, নিরলস সেবা, কর্তব্য-নিষ্ঠা, সততা ইত্যাদি গুণগুলি জেগে ওঠে দলগত শৃঙ্খলা-বোধের মধ্য থেকে। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুনতে শুনতে সমস্যাগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে মনের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে ওঠে। বহুলোকের সংস্পর্শে আসতে হয় বলে মনের অহমিকা, আত্মম্ভরিতা এবং বিচ্ছিন্নতা বোধ কেটে যায়। মানুষ ধীরে ধীরে নিজের শক্তি, অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে। তা'র আচরণ মার্জিত এবং বিনয়-মধুর হ'য়ে ওঠে।

অবশ্য এ-কথা সত্য যে, ছেলেদের বয়স অল্প, তাই তারা নির্ব্বাচিত হতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের রাজনীতিতে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয় বা হচ্ছে। নিজে নির্ব্বাচিত হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ করা তো একান্ত প্রয়োজন। নইলে নেতা হয়ে সাধারণ কর্মীর সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা সে কেমন করে বুঝবে? নেতা হওয়ার আগে তাই ভাল কর্মী হওয়া দরকার এবং ভাল কর্মীরাই কালক্রমে নেতার আসন পেয়ে থাকে। আর, ছেলেদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করার সাহস বা সুযোগ কোন রাজনৈতিক নেতার নেই। কারণ ছাত্ররাই সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশ। তাদের মন খাঁটা, তাই ন্যায়, সত্য এবং পবিত্রতার প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক। অন্যায়, অবিচারকে তা'রা খুব সহজেই বুঝতে পারে এবং সোজাসুজি তার প্রতিবিধান দাবী করে থাকে। তাই ছাত্রদের নিয়ে কাজ করায় প্রতিটি দলকেই যথেষ্ট সাবধানে চল্‌তে হয়। নীতি-নির্ধারণে ছেলেদের মতামতকে যথেষ্ট বিবেচনা করতে হয়। ছাত্রদের উপস্থিতি, তারুণ্যের সাহচর্য দলকে প্রগতিশীল নীতি অবলম্বনে বাধ্য করে এবং দলের ঊর্দ্ধতন নেতাদের ভুল-ভ্রান্তি দূরীকরণে সাহায্য করে। সেজন্য ছাত্রদের ভূমিকা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা ক্রীড়নক নয়, রাজনীতির অঙ্গনে তারাই তো সাক্ষাৎ জ্যোতিঃপুঞ্জ।

সে-কারণে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে শাসক-শক্তি যখন বিপথগামী, মানবিক অধিকার যখন পদদলিত, তখন ছাত্ররাই প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে ওঠে। শত ক্ষুদিরাম তখন জাগ্রত হয় দিকে দিকে। কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান তা'র জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। পতনশীল এই পৃথিবীতে তা'রা-ই মূর্ত্তিমান্‌ লবণ-কণিকা —The students are the salt of the Universe; if they lose their savour, where else will it be salted?—এই জিজ্ঞাসা চিরন্তন। পড়ার ক্ষতির মিথ্যা অজুহাতে তারুণ্যের প্রাণ-বন্যাকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যাবে না। নিষেধের ডোরে কখনোই এই মহৎ শক্তিকে বন্দী রাখা যায় না। তাই এই শক্তির প্রকাশের জন্য সুপরিকল্পিত তটরেখা অত্যাবশ্যক। রাজনীতি-ই একমাত্র নদী-গর্ভ, যা' এই প্রচণ্ড শক্তিকে বহন করতে পারে, তটের সীমায় সীমায়িত করতে পারে। তাই ছাত্র-জীবনে রাজনীতি চাই, নইলে তারুণ্যের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বহুদিনের যত্ন-লালিত সৃষ্টিও বিনষ্ট হ'তে পারে।

তা' ছাড়া, প্রত্যক্ষ রাজনীতির বিরুদ্ধে যত বিশেষণ-ই প্রয়োগ করা হোক না কেন, ছাত্রেরা রাজনীতির যতটুকু কাজ করে তা'কে বোধ হয় জটিল, কুটিল, সর্পিল ইত্যাদি বলা যায় না। কারণ ছাত্রেরা প্রধানতঃ যে কাজ ক'রে থাকে, তা' জন-সংযোগ এবং তা'-ও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এলাকায়। সতীর্থদের মধ্যে দলের নীতি ব্যাখ্যা, জনসাধারণের মধ্যে দলের কার্যসূচী প্রচার, সংবাদ সংগ্রহ, সভা-মিছিল সংগঠন,

ত্রাণ প্রভৃতি কাজ ছাত্রেরা করে। এ-কাজগুলির মধ্যে জটিলতা নেই, জটিলতা আছে পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে এবং সে-জটিলতার মধ্যে ছাত্রদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং দলের কাজকর্ম্মের গহনতায় ছাত্রদের প্রবেশ করার প্রশ্ন-ই ওঠে না।

ঠিক তেমনি, ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিষময় ফলের কথা বোঝাতে গিয়ে দধিপাত্র, ভিত্তি-প্রস্তর বা ধাতু সংশ্লেষের যে সমস্ত চটকদার উপমা দেওয়া হয়, সেগুলি আপাত দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'লেও বিচারসহ নয়। কারণ, দুধকে দধিতে রূপান্তরিত করা, ইট পাথর সিমেণ্টকে দৃঢ় করা কিংবা খনিজ ধাতুপিণ্ডকে ঘাতসহ করা ইত্যাদি ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা যান্ত্রিকতার নামান্তর। প্রাণহীন বস্তুর বিশ্লেষ বা সংশ্লেষ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারেই সম্পাদিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু মানব মনের গঠন ঠিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই রাজনীতির ভয়ে যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের মনের গঠন যান্ত্রিকতার ছক কাটা ধারাবাহিকতার মধ্যে আমরা সম্পন্ন করতে চাই, তা'তে কতটুকু সুফল পাওয়া যাবে? দেশের চলমান জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে একটা কৃত্রিম নিস্তরঙ্গতায় যদি আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের আবদ্ধ ক'রে রাখি, তা'হলে ছাত্রজীবন শেষ ক'রে তা'রা যখন কর্ম্মজীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে বাস্তবের প্রচণ্ড স্রোত এবং উত্তাল তরঙ্গে নাকানি চুবানি খেতে থাকবে, তখন কোন্ পুঁথির কোন্ শিক্ষা তাদের মনে সাহস এবং শক্তি যোগাবে? সেদিন অসার শিক্ষা এবং অপরিণামদর্শী শিক্ষাগুরুদের উদ্দেশে তা'রা কি বারংবার ধিক্কার জানাবে না? তাই রাজনৈতিক সচেতনতা চাই ই।

রাজনীতি-ধরো গোষ্ঠীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁদের যুক্তিগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা যতই ত্রুটিহীন হয়ে উঠবে, ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থনে তাঁদের যুক্তিগুলি ততই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে। শিক্ষা-সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। শিক্ষা আদৌ পুঁথি-নির্ভর এবং জীবন বিমুখ হবে না। পাঠক্রমের আমূল সংস্কার ক'রে শিক্ষাকে জীবন-ভিত্তিক ক'রে তুলতেই হবে। দেশ, কাল, সমাজ এবং জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠবে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা। ইতিহাস হোক, ভূগোল হোক, বিজ্ঞান হোক আর অর্থনীতিই হোক, প্রত্যেকটি বিষয়ই মুক্ত দুনিয়ার বিরাট বীক্ষণাগারে পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের পথে শিক্ষা দিতে হবে। গঠনমূলক শত সহস্র কাজের মধ্যে তারুণ্যকে নিয়োজিত করতে হবে এবং সেই কাজগুলি পাঠক্রমের মধ্যেই থাকবে, তা'র জন্য ছাত্রদের কোন দল বা উপদলের দ্বারস্থ হ'তে হবে না।

আর-শিক্ষা সংস্কার যদি বিলম্বিত হয়ও, তবু ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান সমর্থনীয় নয়। কারণ, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি কেবল রাজনৈতিক সচেতনতা থেকেই উপজাত—এ কথা সত্য নয়। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র কিংবা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা জ্ঞানে কর্ম্মে, সাহসে—কেউই ছাত্র জীবনে সচেতনভাবে বিশেষ কোন শৌর্যে দীপ্ত পৌরুষের যে বিজয় পতাকা উড্ডীন ক'রে গেছেন তা' অবিনশ্বর। আসলে, নৈতিক বলই মানুষকে শক্তিমান্ করে। সত্য, প্রেম, সাধুতা এবং পবিত্রতাই সেই শক্তির উৎস। প্রতিটি মানুষই এই শক্তির আধার। আর অন্তর্নিহিত এই শক্তির বোধনে আমরা আমাদের গুরুজন এবং শিক্ষকদের কাছে যতটা সাহায্য পেতে পারি, কোন দলনেতার পক্ষে ততটা সাহায্য দেওয়া অসম্ভব। কারণ, দলনেতার কাছে দলই মুখ্য, মানুষ গৌণ; শিক্ষক বা অন্য গুরুজনের কাছে মানুষই মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্র-বিন্দু। একটি পতাকা আন্দোলিত করতে করতে কয়েকটি বাঁধা বুলি তার-স্বরে উচ্চারণ করার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করার যুক্তি

আকাশ-কুসুম-কল্পনা মাত্র। দায়িত্বশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, সেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আহরণ করতে গেলে পার্টি অফিস নয়, বিদ্যালয়ই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দেশের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবে না। বেশীর ভাগই সুনাগরিক হ'য়ে বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করবে। অল্প দু'চারজন হয়তো রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাই বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরাই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবে। তাই বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ের-ই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ একান্তই নিষ্প্রয়োজন। দু'-চার জনের জন্য শিক্ষালয়কে রণাঙ্গনে পরিণত করা সুস্থ পরিমাণবোধের পক্ষে দারুণ পীড়াদায়ক। আসলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য তরুণদের প্রস্তুত করার কাহিনী আদৌ সত্য নয়, প্রতিটি দলের লক্ষ্য সমর্থকদের সংখ্যার দিকে। আজকের তরুণ কয়েক বছর পরেই পূর্ণ-বয়স্ক হবে, ভোটাধিকার পাবে। তাই আগে ভাগেই সমর্থন নিশ্চিত করা চাই। পরিণত মনকে বোঝানো শক্ত, তাই অপরিণত আবেগ-প্রধান মনগুলিকে হাত করা চাই। মিথ্যা সচেতনতার মরফিয়া দিয়ে তরুণ মনকে সূক্ষ্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার এ-এক সুচতুর পরিকল্পনা। স্বাধীনতার নামে এ এক অদ্ভুত রেজিমেন্টেশন্।

এই রেজিমেন্টেশন্ পর্বের সহায়ক হিসাবে তারুণ্যের জয়গান উপকথার শৃগাল কর্তৃক কাকের স্তুতিগানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হে তরুণ, তুমিই যুগে যুগে আমাদের পরিত্রাতা। তোমার প্রদীপ্ত তেজে অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ বারে বারে ভূ লুণ্ঠিত হয়েছে। হীনবল হতোদ্যম মানবিক অধিকারকে তুমিই আপন বক্ষ-রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে বসিয়েছ। আহা, কী সুন্দর পলায়নী মনোবৃত্তি! পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা, অবিচার অত্যাচার দূর করার দায়-দায়িত্ব অপরিণতবুদ্ধি তরুণদলের উপর চাপিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীন বয়োজ্যেষ্ঠদের কী নির্লজ্জ পশ্চাদপসরণ! এই রাজনীতি। এর মধ্যে ছাত্রের লাভ কোথায়? তা'র মৃত্যু এবং বক্ষ-রক্তের বিনিময়ে কেনা সাফল্যের স্বর্ণ-মুকুট তো তা'র দলনেতার শিরোভূষণ হ'য়ে থাকবে। যুগে যুগে স্বার্থপর রাজনীতির এই ঢক্কা-নিনাদের মাঝে ছাত্রমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। জঘন্য এই চক্রান্তের বলি হ'য়েছে হাজার হাজার তরুণ প্রাণ।

রাজনীতি-ওরো' গোষ্ঠী আরও ব'লে থাকেন যে, ছাত্রাবস্থায় যেটুকু কাজ দলের জন্য করতে হয় তা'র মধ্যে কোন জটিলতা নেই। তা' কি ক'রে সম্ভব? নেতৃত্বের জন্য যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' নীচের কর্মী মহলে রেখাপাত করবেই। উপরতলার বাদ-বিসংবাদ নীচের তলায় অজ্ঞাত থাকতে পারে না। নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তি তাঁর নিজের দল বা উপদলের দিকে কর্মীদের টান্‌তে চেষ্টা করবেনই। আর তা' হলেই ছাত্র কর্মীরাও একই দ্বন্দ্বের অংশীদার হ'য়ে উঠবে।

তাই মনে হয়, ছাত্রজীবনে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া অনুচিত। রাজনীতির মধ্যে ছাত্রের কোন প্রকৃত কল্যাণ নেই, থাকতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকাতলে যে-সমস্ত ছাত্র সমবেত হ'চ্ছে, তারা মত্ততার শিকার, স্বার্থচক্রের বলি। তা'দের ত্যাগ এবং কর্মশক্তির উদ্দেশে যে বন্দনাগান উচ্চারিত হয়, তা' আসলে নিশির ডাক; তা' পথভ্রষ্ট করে, দুঃখ দেয়; তা' কখনোই মঙ্গল আলোকে জীবনকে পবিত্র করে না, চেতন্যকে উদ্দীপ্ত করে না, বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করে না।

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দশ

এ একটি কাকতালীয় যোগাযোগ—coincidence নয় যে কেম্ব্রিজে আমি যখন নানা মুখর সিংহনাদের মধ্যে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত মতন হ'য়ে পড়েছিলাম ঠিক সেই দুর্গ্রহেই এই সর্ব্বত্যাগী সাধু আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে ও অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন নানাদেশের ছাত্রদের কাছে খৃষ্টবাণীর প্রচারকল্পে। আমার কাছে আরো এসেছিলেন ভজন শুনতে—যে কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। কারণ, সাধুজি গড়পড়তা মিশনারিদের শাসক সুরে "খৃষ্টকে না ভজলে নরকবাস হবে" ব'লে ভয় দেখাতেন না। বলেছি তিনি হিন্দুধর্মের ও গুরুগ্রন্থের গুণগ্রাহী ছিলেন আশৈশব—হিন্দু যোগীদের কাছে আসন প্রাণায়ামের দীক্ষাও নিয়েছিলেন। তবু কেন তিনি ধর্ম্মান্তর-বরণে আত্মবোধ চেয়েছিলেন ভাবতাম আমি থেকে থেকে। উত্তর পেয়েছিলাম পরে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে—যে ইংরেজ হ'য়েও নিজেকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিত ও বৃন্দাবনের রজ-কে ছুঁয়ে বলত: "এ-ই আমার স্বদেশ।" ঠাকুর কাকে যে কোন্ পথে ঠেলে দিয়ে কোথায় উত্তীর্ণ করতে চান এ-রহস্যভেদ কেউই করতে পারে না—না জ্ঞানী, না দৈবজ্ঞ। অলডাস হাক্সলি বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা যে, আমরা আমাদের কর্ম্মের ফল দেখতে পাই মাত্র দু-তিন পা—তার পরে আমাদের কর্ম্ম বা সাধনার ফল আমাদের নিয়তিকে কি ভাবে গ'ড়ে তুলবে—কোন ঢেউয়ের বৃত্ত কোন তটে ঘা দিয়ে পাড় ভাঙবে বা পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলাবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। সাধু সুন্দর সিং নিজেও জানতেন না—যখন তিনি বাইবেল পড়িয়েছিলেন—যে, সেই ধূমের (পাতঞ্জলির ভাষায়) "ধর্মমেঘে" খৃষ্টের মুখ ফুটে উঠবে, শুনবেন তিনি তাঁর ক্রসের ডাক, যে-ডাক একবার শুনলে আর সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। মহাভারতে বলেছে বটে: "ন জাতু কামান্ন ভয়াৎ ন লোভাৎ ধর্ম্মং ত্যজেৎ জীবিতস্যাপি হেতোঃ—কাম লোভ বা ভয়ের ফেরে প'ড়ে প্রাণ গেলেও ধর্ম্ম ছেড়ো না।" কিন্তু এখানে ধর্ম শব্দটির টীকা নানারকম হ'তে পারে। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুবরণ করেছিলেন যে-দুর্নিবোধ তাগিদে সে-তাগিদের ভাষ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষে এসে নিজের জন্মযোগিনী ভাবরূপ উপলব্ধি ক'রে—দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর দেহ খৃষ্টানের রক্তমাংসে গ'ড়ে উঠলেও দেহবাসী আত্মা ছিল নিছক ভারতীয় হিন্দু আত্মা। সাধু সুন্দর সিংও তেমনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনি দেহে শিখ পিতামাতার সন্তান হ'লেও আত্মায় কেবলমাত্র খৃষ্টশিষ্য নন, খৃষ্টের messenger—বাণীবাহ। এ-ও আর এক সমস্যা। খৃষ্টান হ'য়ে জন্মালেই কিছু খৃষ্টের বাণীবাহ হওয়া যায় না—কি দুর্নিবার তাগিদে বার বার প্রাণকে বিপন্ন করে উধাও হওয়া যায় না তিব্বতের মতন নিষ্ঠুর গোঁড়া ধার্মিকদের দেশে যারা বিধর্মীকে অরুন্তুদ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করাকেও বৌদ্ধধর্ম্মের আদেশ ব'লে ভাষ্য করে। সাধু সুন্দর সিং প্রথমবার যখন তিব্বতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি জানতেন না কী ভয়াবহ বিপদ তাঁকে পাকে ফেলবে। কিন্তু শেষবার ১৯২৩ সালে যখন তিনি ফের তিব্বতে যান তখন সব জেনেও গিয়েছিলেন, না গিয়ে তাঁর উপায় ছিল না ব'লেই। এরই নাম খৃষ্টের call of the cross, কৃষ্ণের বাঁশির ডাক। এই হয়েছিল তাঁর শেষ অগস্ত্যযাত্রা—তিব্বত থেকে এ-মহাপ্রাণ খৃষ্টদুলাল আর ফেরেন নি—যেমন স্বামী রামতীর্থ ফেরেন নি কাশ্মীরে গঙ্গাস্নান থেকে। শ্রীহর্ষ

নৈষধচরিতে ঘোষণা করেছিলেন যে জীবন্মুক্ত মহামানবের চারটি কর্তব্য আছে: "অধীতিবোধাচরণ-প্রচারণৈঃ" অর্থাৎ অধ্যয়ন, উপলব্ধি, আচরণ ও প্রচার—যা শিখেছি তার অকুণ্ঠ বিতরণ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়:

> ছাড়ো বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল।
> স্বার্থহীন প্রেমই সম্বল.........
> দাও আর ফিরে নাহি চাও
> থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।

স্বামীজির এ-উদ্দীপনাময়ী বাণীটির কথা কেন জানি প্রায়ই মনে হ'ত বিলেতের নানা মনীষীর সঙ্গে সংস্পর্শে এসে। তখনো রাসেলের দেখা পাই নি তাই বলতে পারি অকুণ্ঠেই যে, যাঁদের ওখানে নামডাক তাঁদের কাউকে দেখেই মনে হ'ত না তাঁদের হৃদয়ে কিছু ভাগবত "সম্বল" আছে। আর পুঁজি যার নেই সে দেবে কোত্থেকে? সাধু সুন্দর সিং-এর মুখে অভী হাসি, চোখে চোখে পুণ্য দীপ্তি, প্রতি ভঙ্গিতে আত্মবোধের প্রত্যয় ঝরত।

এগারো

এই সময়ে আমি আর একটি মহৎ প্রভাবের মধ্যে পড়ি যাকে নিছক শিল্পীর মনোলোকের প্রভাব বলা চলে না। তিনি রোমা রোলাঁ। তাঁর জন ক্রিস্টফার প'ড়ে আমার মনে হল—টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির পরে এমন উদ্দীপনা আর কোথাও পাই নি। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম—মনে হ'ত যেন ধর্মের বাণীই ঝরছে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। বিশেষ ক'রে জন ক্রিস্টফার, অলিভিয়ের ও গ্রাৎসিয়ার চরিত্রের দীপ্তি আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হ'ত—এরই তো নাম high seriousness! সৌন্দর্যের মাধ্যমে রসের নির্ঝর প্রতি শিল্পেরই স্বধর্ম। কিন্তু সে-রসস্বের সঙ্গে যখন মহত্বের ও ঐকান্তিকতার আলো নামে তখনই সে-কৃতি উপাধি পায় high seriousness-এর। বাংলায় এ-মনোভাবটির তর্জমা করা সহজ নয়, তবে বোধহয় "তপস্বী নিষ্ঠা" বললে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। জীবন ও রূপশ্রী, প্রেম ও কর্তব্য, মহত্ত্ব ও ঔদার্য সার বেঁধে শোভাযাত্রা করেছে রোলাঁর এ-মর্মস্পর্শী উপন্যাসটিতে। সমগ্র য়ুরোপের আত্মিক অভীপ্সার ঝঙ্কার বেজে উঠেছে এর ছত্রে ছত্রে। অথচ সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে গড়পড়তা মানুষের নানা হীন বৃত্তির ব্যাপকতা, শাসকদের দুরপনেয় তামসিকতা, কাপুরুষের আদর্শবিমুখতা, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টির শোচনীয়তা। রোলাঁ দেখিয়েছেন—গতানুগতিক স্থূল দৃষ্টি দিয়ে মহনীয় স্বপ্নচারণের সত্যতানির্ণয় করা যায় না, ঘরোয়া চেতনা দিয়ে শিখর চেতনার নাগাল পাওয়া যায় না। পরে আমাকে তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন: "Toujours, une minorite d'esprits seront de plusieurs siecles en avance sur la foule qui les entourent. Ils peuvent comprendre cette foule. Ils peuvent meme (ils doivent) l'aimer. Mais cette foule ne les comprendra pour ce qu'ils sont. Ou bien elle les bafoue, et parfois les crucifie. Ou bien elle les acclame, et parfois les deifie pour ce qu'ils ne sont pas." (Villeneuve, Novembre 29, 1922)

(ভাবার্থ: চিরদিন কতিপয় মহাজন তাঁদের আশপাশের জনতাকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যাবেন। তাঁরা এ-জনতাকে বুঝতে পারবেন, এমনকি তাদের ভালোবাসতেও পারবেন—বাসা উচিত। কিন্তু এ-জনতা পারবে না তাঁদের আসল সত্তার নাগাল পেতে। তাই এ-জনতা হয় তাঁদের উপহাস করবে, নয় শূলে চড়াবে—কখনো তাঁদের জয়ধ্বনি করবে, কখনো বা তাঁদের ভগবানের বেদীতে বসাবে তাঁরা যা নন তাঁরা তা-ই ভেবে।)

অন্য ভাষায়, বাস্তববাদীরা বলেন—আদর্শবাদ আমাদের ভুল পথে চালায় দৈনন্দিন শ্রীহীনতাকে অস্বীকার করে—চর্মচক্ষে যা দেখি তাকে পাশ কাটিয়ে চলার দীক্ষা দিয়ে, কতিপয় মহাজনের মহত্ত্ব ফোটাতে অগুন্তি দীনহীন দুর্বলের দুরবস্থাকে "নাস্তি" ব'লে ঘোষণা ক'রে। দু-চারজন উচ্চাভিসারী প্রতিভাধর শিখরের খবর পেলেও সাড়ে পনেরো আনা মানুষ যে

বসবাস করে নিচু জমিতে, ধ্বনি ধূ পঙ্কের আবহে এ-অনস্বীকার্য শোকাবহ সত্যটিকে ভুললে জীবনকে বোঝা যাবে না। তাই—বলেন বস্তুবাদীরা সঘনে—মানুষের হীনতম প্রবৃত্তির খবর নিতে হবে, শুধু 'কতিপয় মহাজনের' ছবি এঁকে ইন্দ্রধনুবিলাসী হ'লে চলবে না, জঘন্যদেরও চিত্রায়ণ আবশ্যিক। রোলাঁ তার নানা উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকে এই সস্তা Art-for-Art's-sake জিগিরের বিরুদ্ধে ঝাণ্ডা ওড়ালেন অকুতোভয়ে, লিখলেন তাঁর "জঁ্যা ক্রিস্তফ"-এ (Jean Christophe):

"Art for Art's sake!.........O wretched men! Art is life tamed. Art is the Emperor of life.........Like those artists who turn to profit by their deformities, you manufacture literature out of your deformities and those of your public. Lovingly do you cultivate the diseases of your people, their fear of effort, their love of pleasure, their sensual minds, their chimerical humanitarianism."*

শোপেনহয়েরের সঙ্গে তিনি মতৈক্য ঘোষণা করেছিলেন তাঁর এ-মহনীয় উপন্যাসে যে: "Von Schlechten kann man nie zu wenig and das Guete nie zu oft lesen."§

ঝোঁকের মাথায় রোলাঁকে লিখলাম চিঠি (তাঁর প্রকাশকের ঠিকানায়) যে, আমি তাঁর জন ক্রিস্টফার প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি, একবার তাঁর দর্শন চাই।

উত্তরের আদৌ আশা করিনি। এক অজ্ঞাতকুলশীল তার উপরে ভারতীয় যুবকের সঙ্গে দেখা করবার সময় তাঁর তো না থাকারই কথা। কিন্তু মনে আছে—কী আনন্দ! তাঁর স্বহস্তে লেখা চিঠি এল—তিনি সুইজর্লণ্ডে শূনেক নামে এক গ্রামে একটি হোটেলে আছেন—সেখানে গেলে তিনি আমার সঙ্গে প্রসন্ন হ'য়েই দেখা করবেন। দেখা হয়েছিল ১৯২০ সালে জুলাই মাসে।

আমি তখন ফরাসী ভাষায় একটু আধটু কথা বলতে পারি, অভিধানের সাহায্যে সহজ বই বুঝতে পারি। কিন্তু ফরাসী ভাষায় সুভদ্র সম্ভাষণ করা এক, আলাপ আলোচনা করা আর। তাই সুইজর্লণ্ডে গিয়ে মহা বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম যখন রোলাঁ কাছে ডেকে সাদরে বসিয়ে বললেন তিনি ইংরেজী জানেন না। শেষরক্ষা হ'ল তাঁর বিদুষী বোন মাদলীন রোলাঁ-র দোভাষী দাক্ষিণ্যে। শ্রীমতী মাদলীন ইংরাজী ভাষা বেশ ভালো'ই জানতেন। কিন্তু দোভাষীর মাধ্যমে আর কতটুকু কাজ হাসিল করা যায়? তাই পরদিনই বিদায় নিতে হ'ল রোলাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে—যে পরের বার তাঁর সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথালাপ করবই করব। শুনে তিনি প্রীত হ'য়ে বলেছিলেন: "খুব ভালো কথা, কেবল ঐ সঙ্গে জর্মন ভাষাও শিখো—তুমি যখন গায়ক তখন য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দরকার—অর্থাৎ জর্মন সঙ্গীত।"

---

* শিল্প শিল্পের জন্যে? হায় দুর্ভাগা! শিল্প জীবনকে সংযত করে, শোভন করে। শিল্প জীবনের সম্রাট্। যে-সব শিল্পী তাদের সহজাত কুশ্রীতাকে ভাঙিয়ে খায় তোমরাও তাদেরই দলে নাম লেখাচ্ছ। সাদরে আমল দিচ্ছ গণমনের নানা দুষ্ট ব্যাধিকে, তামসিকতাকে, ভোগেচ্ছাকে, ইন্দ্রিয়দাস মনকে, কল্পনাবিলাসী মানব প্রেমকে।

§ মন্দ বই যত কম পড়া যায় আর ভালো বই যত বেশি পড়া যায় ততই ভালো।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

মহাবলীপুরম্

এবার মহাবলীপুরম্। মাদ্রাজ থেকে সোজা পথে ...স মাত্র ৬০ কিলোমিটার। রেলগাড়িতেও আসা ...। নামতে হয় চিঙ্গেলপুট স্টেশনে। সেখান থেকে ...ীবাস্ ধরেও আসতে হয়। সমুদ্রতীরে ছোট্ট গঞ্জমত ...গা। হাজার দুই মাত্র লোকের বাস এখন। কিন্তু ...ীতে এর সমৃদ্ধির কাহিনী স্বদেশের সীমা অতিক্রম ...। দূর দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

মামাল্লাপুর বন্দর নামে তখন এটি পরিচিত ছিল। ...য় শতাব্দীতে পল্লভ রাজাদের অন্যতর প্রধান বাণিজ্য ...র এই মামাল্লাপুরে দেশবিদেশের বাণিজ্যতরীও ...ত।

মন্দিরাদি দেখতে যাবার আগে আমরা একটি নিরা-...। ভোজনাগারে মাধ্যমিক আহারাদি সেরে নিলাম। ...কণী ভাত ডাল দই। এ খাদ্য আমাদের রুচিকর ...না না। টক ও তরকারী দিয়ে রান্না ডালকে এঁরা ...র বলেন। আমাদের টকের সম্বরার সঙ্গে এর কোন ...গ নেই। নাম না জানার জন্য রুচিকর কোন খাবার ...ছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। যা-...ক-করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে উঠে পড়া গেল।

মহাবলীপুরমে সাধারণত কেউ রাত্রিবাস করেন না। ...রাজ থেকে এসে দেখে চলে যান। যাঁরা থাকেন ...রা প্রায়ই বিদেশী মানুষ। সেজন্য থাকবার ভাল ...বস্থা আছে, দক্ষিণার হারটিও বেশ চড়া। টুরিস্ট ...ডলেপমেন্ট কর্পোরেশনের কুটীরটি এক বারে সমুদ্র-...নারে। এর কৌলীন্য বেশী। এছাড়া আছে অপেক্ষা-...ও কম ভাড়ায় সরকারী ইনস্পেকশন বাংলো।

সমুদ্র এখানে শান্ত। এই শান্ত সমুদ্রগর্ভে ...বলীপুরমের প্রাচীন বন্দরটি লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিলীন হয়েছে অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত ছ'টি মন্দির। চলতি ভাষায় একে শোর টেম্পল বলে অভিহিত করা হয়। একটি মন্দির এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। পূজা অর্চনার কোন ব্যবস্থা নেই। মন্দিরে বিগ্রহও কিছু নেই। তবে মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে।

খানকটা দূরে রয়েছে আস্ত এক-একটা পাহাড় কেটে কুটে খোদাই করে তৈরী দু'সারি ঘর। এর গঠন-বৈচিত্র্য আকার-আকৃতি পৃথক। প্রথম ঘরটি বাংলার চারচালা ঘরের অনুরূপ। এটি নিরাভরণ। মনে হয় সম্পূর্ণ করার আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবু স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরা। অন্যগুলি যথেষ্ট কারুকার্য মণ্ডিত এবং আকারে বড়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এগুলি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছে। বৌদ্ধ বিহারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে এগুলিকে বলা হয় পাণ্ডব রথ। পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য চারখানা এবং দ্রৌপদীর একখানা। নকুল ও সহদেবের জন্য একটি গৃহ নির্দিষ্ট হয়েছে। পাশেই একটি বিশাল ঐরাবত। সবই একটি পাহাড় কেটে করা।

সরকারী ভাষ্যকার বল্লেন—মহাভারতের নায়কদের নামে এখন চিহ্নিত হলেও আদিতে তা ছিল না। দূর অতীতের কোন শিল্পী-সমাজ আপন খেয়ালে বা শিল্প সাধনার অঙ্গরূপে সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে এগুলি নির্ম্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালের মানুষ উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগ সাধনের, আজকালকার ভাষায় ন্যাশনাল ইন্টি-গ্রেশনের, উপায় হিসাবে পাণ্ডবদের নামে ও-গুলির নামকরণ করে থাকবেন। সত্য মিথ্যা যাই হোক, সরকারী ভাষ্যকারের বক্তব্য আমার ভাল লাগে নি। এই প্রচারের পিছনে মানসিকতাটি ক্ষতিকর।

এখান থেকে আমরা গেলাম ভুবনবিখ্যাত অর্জ্জুন তপস্যা দেখতে। পথে পড়ল সরকারী স্থাপত্যচার ট্রেনিং সেন্টার। ভারতের আর কোন রাজ্যে বোধহয় এমন স্কুল নেই। ভাস্কর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মহাবলীপুরমকে কে নির্ব্বাচন করেছিলেন জানি না—তবু সেই অজানা ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা জানালাম। ঐ স্কুলের জন্য এর চেয়ে ভাল কোন কেন্দ্র হতে পারে না।

পাহাড়ের অসমান দেহকে চেঁচে-ছুলে কেটে-কুটে সমান করে নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যস রিলীফ ছবি খোদাই করা হয়েছে এখানে। অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রের জন্য তপস্যা, হিমালয় থেকে গঙ্গাবতরণ, পঞ্চতন্ত্রের গল্প ইত্যাদি বিচিত্র সব ভাস্কর্য। দেব-দৈত্য-দানব নর-নারী পশুপক্ষী সবই আছে এখানে। এটি ২৭ মিটার দীর্ঘ এবং নয় মিটার চওড়া।

তপস্যাজীর্ণ উধ্বর্বাহু অর্জ্জুনের পাঁজরার হাড়গুলো পর্যন্ত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে রসের জোগানও রয়েছে। ভাল করে দেখলে দেখতে পাবেন, একটি বিড়ালও উধ্বর্বাহু হয়ে তপস্যার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই থেকে বোধ করি বিড়াল তপস্বী কথাটার উদ্ভব হয়ে থাকবে। আমাদের কর্মজীবনে পশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে ধর্মজীবনেও তাদের স্থান রয়েছে। আনন্দের আধাররূপেও তারা স্বীকৃত। আলোচ্য পবত দেওয়াল ভাস্কর্যে পশুপক্ষীর উপস্থিতি বেমানান হয়নি। সেগুলি বহুক্ষেত্রে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

প্রথম দর্শনে সবৎসা একটি বিশাল হস্তিনী যে কোন জনের দৃষ্টি কেড়ে নেবে। একেবারে নিরেট শিল্পজ্ঞান-হীন মানুষকে এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবেই। আর আছে সিংহ, বাঘ, হরিণ, গাধা বা ঘোড়া, বানর, ময়ূর ও অন্য কিছু পাখি এবং বিড়াল, ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি। সব ছবিগুলিই জীবন্ত। ওড়িশার মন্দিরগাত্রে কাম ছবির ছড়াছড়ি দেখেছি। এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এটিকে দ্রাবিড় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে দাবী করা হয়ে থাকে। শিল্পী দ্রাবিড় হলেও মূর্তিগুলির মধ্যে আর্যাবর্তের মানুষের রূপ ফুটে উঠেছে বলেই মনে হয়। দ্রাবিড় শিল্পী তার সমাজের মানুষের মূর্তি গড়লেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাই নি।

গুহা মন্দিরকে মণ্ডপ বলা হয়। পাহাড়ের গায়ে পোর্টিকোর মত করে কাটা ঘর। এই রকম গোটা আষ্টেক মণ্ডপ আছে। এর শিল্পকলাও অপূর্ব। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ছবিটির সামনেই রয়েছে একটি বড় গাভী। জনৈক ব্যক্তি নিশ্চিন্তে দোহনকার্য করছেন। জন-জীবনের আরও কত ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। কত শতশত বছর কেটে গেছে কিন্তু ছবিগুলির আবেদন হ্রাস পায়নি। অক্ষত আছে।

মহিষাসুর-মর্দিনী গুহাটির প্রতি বাঙ্গালীরা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। দেবী এখানে সিংহারূঢ়া অষ্টভূজা এবং অসুর-বধ কার্যে নিরতা। সে কি দৃপ্ত ভঙ্গী! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঁধা সময়ে কতটুকু আর দেখা যায়। এক-আধ-দিন নয়, বহুদিন ধরে প্রত্যহ দেখলে এর সত্য স্বরূপ জানা যেতে পারে। যতই দেখা যাক না কেন, এ কোন দিন পুরনো হবে না, শিল্প ও সৌন্দর্য প্রেমিক মানুষ কোনদিন ক্লান্তি বোধ করবেন না। এখানে ছোট একটি যাদুঘর আছে। কিন্তু কখন খোলা থাকে তা জানা গেল না। কোন লোক নেই তার ত্রিসীমানায়।

এবার ফেরার পালা। আকাশ এখন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। সমুদ্রকিনার দিয়ে সোজা সড়ক ধরে আমরা ফিরেছিলাম। সমুদ্র শান্ত। তবু তার আহ্বান কানে বাজে। ইচ্ছে করে কাছে যাই। না, সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। শুধু চেয়ে দেখা। মধ্যে মধ্যে সযত্নরচিত ঝাউ-বন দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। সমুদ্রতীরে একেবারে জলেরধারে জেলেদের কয়েকখানা করে কুটীর ছাড়া জন-বসতির আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না।

যাবার সময় গিয়েছিলাম মাউণ্ট রোড ধরে, ফিরলাম সমুদ্রকিনারের পথ সাউথ বীচ রোড বরাবর। কুসুমিত পুষ্পবীথিকার বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে আনন্দিত মানুষের অকারণ পুলকেচঞ্চল এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটি মাদ্রাজ শহরের গৌরব। এই পথে ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে

ইংরেজদের অনেক মূর্তি আছে। তামিলনাড়ু সরকার নির্বিচারে সব ইংরেজ মূর্তি অপসারণ না করে ইতিহাসের প্রতি সুবিচারই করেছেন বলতে হবে। ইতিহাসকে বিকৃত করা অন্যায়। বিকৃত ইতিহাসকে মগজ ধোলাই বলে। চীন ইতিমধ্যে তার ইতিহাস তিনবার লিখেছে। রাশিয়ার লেখা হয়েছে দু'বার। এগুলি ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র।

শহরে ঢুকবার মুখে আডিয়ার। এখানে মাদাম হেলেনা পেট্রনভা ব্লাভাটস্কীর বিশ্ব থিওসফিকাল সোসাইটির সদর দপ্তর। যাত্রীরা ইচ্ছে করলে এখানে নেমে পড়তে পারেন। তবে ফিরবার ব্যবস্থাটা নিজেদেরই করতে হয়। বাস্ পাওয়া যায়, কোন অসুবিধা নেই।

কথিত আছে মাদাম ব্লাভাটস্কী তাঁর গুরু জনৈক তিব্বতী সাধুর নিদেশে আডিয়ারে থিওসফিকাল সোসাইটির মূল কেন্দ্রস্থাপন করেন। অনেকে বলেন এই স্থানটি বিশ্বের কেন্দ্র স্থল বলে মাদাম এখানে কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। থিওসফিকাল সোসাইটি আধ্যাত্মবিদ্যার এ প্রতিষ্ঠানটি কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার করে নি। সব মানুষ তার নিজের নিজের ধর্ম যথাযথভাবে অনুসরণ করুন—এই ছিল সংস্থার মূল কাজ। থিওসফি এক সময় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে বেশ প্রচারলাভ করেছিল কিন্তু স্থায়ী আসনলাভ করতে সমর্থ হয় নি। আডিয়ারের প্রতি আমার আকর্ষণ থিওসফির জন্য নয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যাশনাল কনফারেন্স উপেক্ষা করে এই আডিয়ারে জাতীয় কংগ্রেসের বীজ উপ্ত হয়েছিল। ভারত সভার আন্দোলনের ফলে দেশে গণজাগরণ ঘটেছিল। কংগ্রেস স্থাপনের ফলে আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। তাতে জনশক্তির কোন ভূমিকা থাকে না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতনেতৃবর্গের কঠোর পরিশ্রম অর্জিত সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হয়। হিউম কর্তৃক কংগ্রেস স্থাপনের ফলে ভারতবাসীকে জনশক্তির পুনর্জাগরণের জন্য ত্রিশ বৎসরের বেশী অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

থিওসফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র আডিয়ারে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে সারা ভারত থেকে সদস্যগণ মিলিত হতেন। এদের বহুজনে মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের বাড়িতে বসে ১৮৮৪ সনে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয় আলোচনা করেন। সেই সভায় কলকাতার নরেন্দ্র নাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ এবং সি. সি. মিত্র উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন যদিও ১৮৮৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল আসলে এর পরিকল্পনা রচিত হয় পূর্ববৎসর আডিয়ারে, মাদ্রাজে।

পণ্ডিচেরি

মাদ্রাজের অনেক দর্শনীয় বস্তুই আমাদের দেখা হয় নি। তবু যা দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার। মহাবলীপুরম্ থেকে ফিরে আমরা পণ্ডিচেরি রওনা হলাম। পণ্ডিচেরি যাবে মিটার গেজের গাড়ি। ছাড়ে মাদ্রাজ এগমুর স্টেশন থেকে। মাদ্রাজ সেনট্রাল স্টেশন থেকে দেড় দুই কিলোমিটার হবে। ট্যাকসীতে মিটার যন্ত্র বসানো আছে, কিন্তু কাজের বেলায় তার কোন দাম নেই। চুক্তি ভাড়া করতে হয়। তিন টাকা দক্ষিণা দিয়ে দেড় কিলোমিটার পথ আসতে হলো।

মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর তিরুচ্চিরাপল্লী বা ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, পণ্ডিচেরি প্রভৃতি দূর দূর অঞ্চলে রাজ্য সরকারী পরিবহন বাস্ যাতায়াত করে। অনেকে তাই বাসেই পণ্ডিচেরি যান। রাত্রে ট্রেনে ঘুমিয়ে যেতে পারব, তাতে শ্রান্তি দূর হবে, এবং দিনের বেলাকার সময় নষ্ট হবে না—এই ভেবে আমরা ট্রেনেই যাই। পরের দিন সকাল সাতটার কাছাকাছি সময়ে পণ্ডিচেরি পৌঁছেছিলাম। তখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

আড়াই শ' বছর ফরাসী শাসনের পণ্ডিচেরি এখনও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে। এটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। একটি অতি সাধারণ রেল স্টেশন। যাত্রীসংখ্যা বেশি নয়। রিকশাই একমাত্র যান। শহরের অভ্যন্তরে ট্যাকসী আছে। কিন্তু গাড়ীর সময় স্টেশনে আসে না।

একটা রিকশা করে প্রথমে আমরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অতিথি দপ্তরে গেলাম। সেখান থেকে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো কেন্দ্রীয় আপিসে। কলকাতার শৃধন্ত পত্রিকার জনৈক বন্ধুজনের একখানা সুপারিশ পত্র ছিল আমাদের কাছে। সেই সুবাদে সহজেই আশ্রয় পাওয়া গেল নিউ সুইট হোমের এক-তলাতে। নবনির্ম্মিত এই বাড়িটিকে আশ্রমসংলগ্ন বলাই চলে। নিকটে থাকতে পাওয়ার সুবিধা অনেক। খাওয়া ও নানা কাজে কেন্দ্রীয় আপিসের কাছাকাছি বারবার আসতে হয়। আবাসটি দূরে হলে যখন-তখন যোগাযোগের অসুবিধা ঘটে। হাঁটার কষ্ট স্বীকার করতে হয় অথবা রিকশা ভাড়া লাগে।

নিউ সুইট হোম নতুন বাড়। মোজেইক করা হল ঘরের মেজেতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। দারোয়ান একখানা মাদুর বিছিয়ে আমাদের জায়গাটি নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেখানে তখন জনা-ছয়েক যাত্রী রয়েছেন, সকলেই বাঙ্গালী। স্নান শৌচাগারের সুবন্দোবস্ত আছে।

কম্যুনিটি কিচেনের খাবার খেলাম দুপুরে। সেজন্য আমাদের নিকট আগাম টাকা চাওয়া হয়নি। আশ্রম থেকে একখানা পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে, সেটিও কেউ দেখতে চাইলেন না। মোট চারখানা ঘরে খাবার আসন পাতা। শ' দেড়েক লোক একত্রে বসে খেতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই সকলেই প্রায় একই সঙ্গে খেতে আসেন।

সকালের প্রাতরাশ পাওয়া যায় পৌনে সাতটা থেকে পৌনে ৮টা পর্যন্ত। মধ্যাহ্ন ভোজন মেলে ১১৷৷.টা থেকে ১২৷৷. পর্যন্ত। বিকেলের বা সন্ধ্যার খাবার পৌনে ৬টা থেকে ৬টা অথবা পৌনে ৮টায়। তিন বছরের কম বয়স্ক শিশু অথবা চাকরদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। কারণ এখানে অনেকটা কাজ নিজের হাতে করে নিতে হয়। শিশুর পক্ষে সেটা সম্ভবপর নয়, আর চাকর দিয়ে সে কাজটা কেউ করিয়ে নেন এটাও অভিপ্রেত নয়। তবে বহুজনকেই টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে যেতে দেখলাম। একজনে একাধিকজনের খাবার নিচ্ছেন।

শতাধিক ব্যক্তি যাচ্ছেন অথচ কোলাহল হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চিৎকার নেই—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। শান্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে নীরবে সব কাজ হচ্ছে। ভাত যিনি দিচ্ছেন তাঁর হাতের কাছে থালা সাজানো আছে। একখানা থালা আপনি হাতে তুলে নিলে তিনি আপনার প্রয়োজন মত ভাত দেবেন। রুটি চাইলেও পাবেন। এগিয়ে চলুন, পরের সরবরাহকারী আপনাকে একবাটি সত্তরকারী ডাল দেবেন। পরের জনকে আপনার বলতে হবে দুধ চাই না দই চাই। আপনার পছন্দ মত দুধ বা দই এবং দু'টি কলা আপনি পাবেন এখান থেকে। দরকার হলে একটি চামচ ও এক টুকরো লেবু চেয়ে নিন। চলে আসুন খাবার ঘরে। চেয়ার টেবিল ও ভূমি-আসন দু রকম ব্যবস্থাই আছে। ভূমি আসনের ছোট ছোট জলচৌকি পাতা। তার একটির উপর ভাতের থালা রেখে খাবার জল আনুন। জলের কুজোর নিকট গ্লাস আছে।

খাওয়া শেষ হলে বাসনগুলি কুড়িয়ে নিন। চলে যান ধৌতাগারে। কলার খোসা ও খাদ্য-অবশেষ ফেলবার জন্য দু'টি পৃথক পাত্র আছে। তারপর রয়েছে কতকগুলি জলভরা চৌবাচ্চা ও একটি বালতি। তার কোনটিতে থালা, কোনটিতে গ্লাস বাটি এবং বালতিতে চামচে রেখে মুখ হাত ধোবার কলে চলে যান। এমন পরিচ্ছন্ন পারবেশ সচরাচর দেখা যায় না। এখানে আশ্রমিক ও শিক্ষার্থী মিলে প্রায় দু হাজার লোক আছেন। তারপর আছেন বহিরাগত অতিথি ও দর্শনার্থী। এর একটা বড় অংশ এই ভোজনালয়ে যান। এত লোক দিনে তিনবার করে খাওয়া দাওয়া করছেন তবু কোথায়ও বিন্দুমাত্র নোংরা বা দুর্গন্ধ নেই। ভারতবাসীর নিকট এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

সমস্তই আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত বিধি ব্যবস্থা। বাসনগুলো ভীম জাতীয় জিনিস দিয়ে ধোওয়া হয়। কিন্তু খাবার ঘরে পাঠাবার আগে নির্দিষ্ট সময় ধরে গরম

জলে ফুটিয়ে কর্ম্মীরা সুন্দর করে মুছে দেন। অধিকাংশ কাজকর্ম আশ্রমিকেরাই করেন। নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে তাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকেই নীরবে, আনন্দচিত্তে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুচারুরূপেই নির্দিষ্ট কাজ করছেন। আশ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার পূর্ণ দায়িত্ব আশ্রমের।

খুশি মত কেউ আশ্রমে যোগদান করতে পারেন না। কাকে নেওয়া হবে তা শ্রীমা-ই ঠিক করেন। তিনি এই আশ্রমের সর্বময়ী কর্ত্রী। শ্রীঅরবিন্দ থাকতেই এই কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। মা এই আশ্রমে আসবার পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ সহকর্ম্মীদের সঙ্গে একাসনে বসতেন, একত্রে শয়ন ভোজন করতেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আশ্রমে নানা নিয়ম ও স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আশ্রমে কেউ গৃহীত হলে তার সমগ্র পার্থিব সম্পদ্ আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হয়। আর প্রত্যেক আশ্রমিক ও আশ্রমিকাকে চারটি নিষেধাত্মক বিধি মেনে চলতে হয়। সেগুলি হলো :—

(১) ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, (২) মগ্যাদি পান করা চলবে না, (৩) রাজনীতির উধ্বে থাকতে হবে, এবং (৪) যৌন জীবন পরিহার চলতে হবে।

দুপুরে খাবার আগে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যে ক'জন বাঙ্গালী প্রথম এসেছিলেন, ইনি তার অন্যতম। বর্তমানে তিনি আশ্রমের দ্বিতীয় ব্যক্তি। বয়সের ভারে দেহ অশক্ত তবু কাজের চাপ খুব। সেজন্য একটু ক্লান্ত মনে হলো। কলকাতার শৃঙ্খল পত্রিকার অমলেশ বাবুর কাছ থেকে একটি পরিচয় পত্র নিয়ে এসেছিলাম্। কোন কাজ হলো না। মায়ের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা তো দূরে থাক, তিনি আমাদের সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বল্লেন না। হয়তো কাজের চাপ ছিল বা ছিল অভ্যন্তরীণ কোন ঝামেলা।

শ্রীঅরবিন্দ যে গৃহে জীবনের চল্লিশটা বছর বসবাস করে গেছেন সেই তীর্থগৃহ দর্শন করেছি। এজন্য পূর্বাহ্নে অনুমতি পত্র নিতে হয়। বেলা বারোটার পূর্ব্বে সিঁড়ির নিচেয় আমাদের জমায়েত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বারটার অল্প পরেই জনৈক মহিলা এসে আমাদের নামগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে উপরে উঠবার অনুমতি দিলেন। পুরু কার্পেট বিছানো পরিচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠলাম। সামনেই শ্রীঅরবিন্দের সেই ঐতিহাসিক কক্ষ। সবকিছু পরিপাটি করে গোছানো, ঝকঝকে তকতকে। সাধারণ ছোট একটি ঘর। শ্রীঅরবিন্দের একখানা বিরাট ছবি আছে। পদযুগল প্রসারিত করে কৌচে-বসা সেই বিখ্যাত ছবির কৌচটিও রয়েছে। ছোট্ট খাটখানা মধ্যস্থলে পাতা। বিছানাটিও তেমনি আছে। বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কয়েকটি আলমারি ভিন্ন আর কোন আসবাব-পত্র নেই।

সামনের বারান্দাটা ঘেরা। ঘরের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। ওরই বাঁ হাতের ঘরে শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের একটি যুগল ছবি আছে। কেউ কেউ সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করছেন। সর্ব্বত্র ফুল ও ধূপের বহুল ব্যবহার সহজেই চোখে পড়ে।

আসবার পথে এই বাড়িরই এক তলায় ধ্যানের ঘরটি দেখলাম। এ ঘরের ছাদটি উজ্জ্বল এলুমিনিয়ম দিয়ে খিলানের আকারে তৈরি করা। এক প্রান্তে আশ্রম-প্রতীক আঁকা একটি কাচের বাক্সের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের একখানা ছবি এমন করে বসানো যে দেখলেই মনে হয় তিনি বহু দূর থেকে এক মর্ম্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছেন। পরিবেশের প্রভাবে মনটা আপনা থেকেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

নামবার সময় সিঁড়ির একটি বাঁকে "Cling to truth"—সত্যে নিষ্ঠ থাক, মায়ের এই বাণীটি আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। গান্ধীজি বলেছেন সত্যই হলো ভগবান্। অতএব মানুষকে সত্য-নিষ্ঠ করে তুলতে পারলে তার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হবে, সে ভগবান্ হয়ে যাবে অন্য কোন সাধনা ব্যতিরেকেই।

এই বাড়িটির সামনে নিমগাছ তলায় শ্রীঅরবিন্দের নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হয়েছিল। তার উপর শ্বেত পাথরের

একটি অতি সাধারণ বেদী রচনা করা হয়েছে। কিন্তু দেখতে সেটি খুবই চমৎকার। সারাদিন ধরে এখানে পুষ্পার্ঘ্য দেবার কোন সরকারী ব্যবস্থা আছে। প্রচুর ফুল, ধূপ ও ভক্ত মানুষের নীরব শ্রদ্ধা জায়গাটি ঘিরে রেখেছে। স্থানটির মাহাত্ম্য সহজেই অনুভূত হয়। আমরা আমাদের নীরব প্রণামটি রেখে এলাম এই বঙ্গ সন্তানের উদ্দেশে. স্মরণ করলাম তাঁর উপেক্ষিতা সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে।

শ্রীমাধব পণ্ডিত মায়ের দর্শনের ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি জানালেন এ সপ্তাহে আর কোন দর্শন হবে না। মায়ের বয়স হয়েছে। চুরানব্বই বছরের বয়সের কোন মহিলার পক্ষে হাজার হাজার মানুষের সুবিধা মত দর্শন দেওয়া কথনই সম্ভব হতে পারে না। তাই দর্শন না পেলেও দুঃখিত হলাম না। তবে আশ্রম কর্তৃপক্ষ লোকবিশেষের জন্য কিছু ব্যবস্থা যে করে থাকেন তার নমুনা আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই পেয়েছিলাম। এখন বৎসরে চারটি দিন মায়ের সর্ব্বজনীন দর্শনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন (১৫ই আগস্ট) সিদ্ধির দিন (২৪ নভেম্বর), মায়ের জন্মদিন (২১ ফেব্রুয়ারি) এবং তাঁর আশ্রমে স্থায়ী ভাবে যোগদানের দিন ২৪শে এপ্রিল।

প্রথম দর্শনে মনে হবে পাঁওচেরি শহরটা আশ্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি আশ্রমের কাজকর্মের পরিচালক। কিন্তু সর্ব বিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব মায়ের হাতে। আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ক্ষেতে খামারে শাকসব্জি ফলমূল ও শস্যাদি উৎপাদন থেকে শুরু করে ডেয়ারি, পশু-পাখি পালন, ইট-টালির ভাটা, গেঞ্জী-মোজার কল, রুটি-বিস্কুটের কারখানা, তেলের ঘানি, দর্জিখানা, রেস্টরেন্ট, প্রেস, মটোরগাড়ি সারানোর দোকান ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়।

আশ্রম পরিচালনা ও সংরক্ষণের নানা বিভাগ আছে। এ ছাড়া আছে নানা রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ কর্মী আশ্রমিক ও আশ্রমিকা। সর্ব্বাধিক কাজকর্ম ঈশ্বর সেবার অঙ্গরূপেই সম্পাদিত হয়। মা বলেন এটা তাঁর নির্দেশও বটে, ঈশ্বরের জন্য কাজ করার অর্থ দেহের দ্বারা প্রার্থনা করা। এখানে কর্মবিভাগ আছে কিন্তু ছোট বড় ভাগ নেই। কর্মীর পদমর্যাদার উচ্চ নিচ নেই। ব্যক্তি মানুষের যোগ্যতা বা দক্ষতা প্রাধান্য পায় না, প্রয়োজনীয়ও বিবেচিত হয় না। কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা এবং শক্তি অনুসারে সর্বোত্তম রূপে তা সম্পাদনের উদ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে।

আশ্রম বলতেই শহরের কোলাহল থেকে দূরে নিভৃত স্থানে পত্রপুষ্প বেষ্টিত একটি শান্ত স্থানের কথা আমাদের মনে পড়ে। তার কোন চিহ্ন নেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। এখানে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও কোন নিয়ম নেই বলেই মনে হলো। যার-যা-অভিরুচি তিনি তেমনি পোশাক পরেই চলা-ফেরা কাজ-কর্ম করছেন দেখলাম। তবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু নিয়ম আছে। কাজের সময় স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকেই হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট পরতে হয়। প্রাচীন আশ্রম জীবনে প্রাচুর্যকে পরিহার করে চলার রীতি ছিল, এই আশ্রমে প্রতিপদে প্রাচুর্যের অফুরন্ত স্পর্শ।

আশ্রমের একটি বিক্রয় কেন্দ্র আছে সম্পাদকীয় দপ্তরে। এখানে জিনিস-পত্রের দাম বাজার দরের তুলনায় অনেক বেশি। "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম" নামক একখানা ২৩ পৃষ্ঠার ১/১৬ ক্রাউণ্ড সাইজের চটি বইয়ের দাম এক টাকা। চামড়ার একটি সাধারণ মানিব্যাগের মূল্য দশ টাকা। হ্যাঁ তবে থাকা-খাওয়াটা বাজার দরের তুলনায় বেশি নয়। সাধারণ অতিথিদের জন্য থাকা খাওয়ার সর্বনিম্ন জনপ্রতি দৈনিক ব্যয় এই রকম থাকার জন্য ঘর ভাড়া একটাকা। সকালের চা, দুপুরের ভাত এবং রাত্রের রুটির দাম মোট আড়াই টাকা। সর্বসাকুল্যে এই ৩॥০ টাকায় ভদ্রভাবে থাকা যায়। বিকেলে একবার চা জলখাবার বাইরে খেয়ে নিতে হয়। আশ্রমের রেস্টরেন্টে একটি চপ ও এক কাপ কফির দাম সত্তর পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস ও দিব্যচেতনার আলোর অবতরণ ব্যাপারটি আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারি না। যেটা সহজে বুঝি তা হলো, মানুষ তার সত্যাশ্রয়ী আচরণ ও সেবাময় জীবনধারণের দ্বারা সকল জৈব দুর্বলতা পরিহার করে ক্রটিমুক্ত হলে দেবত্বলাভ করতে পারে। মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার আধার। অতিমানস ইত্যাদি না বুঝলেও শ্রীঅরবিন্দের মহত্ব অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। তিনি বলেছেন—আমরা সরকার বা বাইরের জাগতিক কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের বিবিধ প্রয়োজন মেটাবার প্রত্যাশা করি। এটা ভুল। মানুষ তার আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এই কথা বুঝতে বা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না। মানুষ পরনির্ভরতা ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হোক্—এটা তো সকল মনের প্রার্থনা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল কথাটি ছাত্রদের বোধ-গম্য করে আশ্রম প্রকাশ করেছেন। তাতে পাই: "প্রকৃতির আছে এক উধ্বর্মুখী ক্রমগতি—তা চলেছে পাথর থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে পশুতে, পশু থেকে মানুষে। আপাততঃ পৈঠার শেষ ধাপ বলে মানুষ নিজেকে এই উন্নতির চরম বলে মনে করে, মনে করে পৃথিবীতে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এটা তার ভুল। স্থূল প্রকৃতিতে এখনো সে প্রায় পুরোপুরি পশুই, একটা চিন্তাশীল, বাক্যশীল পশু, কিন্তু তবুও পশু, শারীরিক অভ্যাসে এবং প্রবৃত্তিতে। প্রকৃতি এই ক্রটি-পূর্ণ ফল নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না; তাঁর প্রয়াস এমন জীব গড়ে তুলতে যার সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হবে মানুষ আর পশুর মধ্যেকার পার্থক্যেরই মত, এমন জীব যা শুধু আকারেই থাকবে মানুষ, কিন্তু তার চেতনা মন ছাড়িয়ে, অজ্ঞানের দাসত্ব মুক্ত হয়ে বহু দূরে উঠে যাবে।"

পৃথিবীর মানুষ আজ বিজ্ঞান ও যন্ত্রকুশলতার শ্রীবৃদ্ধির ফলে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। বহির্জগতের এই অমিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে মানুষের মনোরাজ্যের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। পি. বি. এস হিলারি Sri Aurobindo & The Future Evolution of Man নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

"Without an inner change man can no longer cope with the gigantic development of the outer life...If humanity is to survive a radical transformation of humau nature is indispensable."—

(শ্রীসমর বসুর মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থে উদ্ধৃত।) শ্রীঅরবিন্দ এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার একটা উপায়ও নির্ধারণ করেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি তাঁর নিজের সাধনালব্ধ শক্তির দ্বারা বিশ্ববাসীকে এই কাজে সাহায্য করছেন।

মা বলেছেন ১৯৫৬ সনে একটি স্বর্গীয় আলোক শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ফলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে নেমে এসেছে। সমগ্র বিশ্বে এখন তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া যেমন দেহকে উষ্ণ বা শীতল রেখে আমাদের সুস্থ রাখে, এই দিব্য আলোর অবতরণ আমাদের আত্মার উন্নয়নে সাহায্য করবে। এর দ্বারা দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্বিশেষে বিশ্বের তাবৎ মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে। মানুষ স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হবে। আমি এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে অসমর্থ হলেও বিশ্বাস করতে চাই। যন্ত্রের দ্বারা মানুষ যে উন্নত হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুনিঋষিরা এই পথের অনুসন্ধান করতে গিয়েই তো বলেছিলেন—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জান।

মানুষ অমৃতের পুত্র। দিব্য জীবনলাভের স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে সে জন্মেছে। অতএব বুঝি বা না বুঝি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনতত্ত্বে বিশ্বাস করি। জীব মাত্রই নারায়ণ এই হলো সনাতন ভারতবর্ষের সাধনা ও ও বাণী। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন তাই ভারতবাসীর নিকট নতুন কথা নয়। সোনাও অব্যবহারে ধূলামাটির সংস্পর্শে উজ্জ্বলতা হারায়, কাজের বার হয়ে পড়ে। তেমনি আমাদের অন্তরস্থ নারায়ণও কাজের হেরফেরে

সুপ্ত থেকে যান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকেই জাগ্রত করে লোকহিতব্রতী করাতে চেয়েছেন বল্লে বোধ হয় বেশি ভুল হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করবার জন্য যোগ ও ধ্যানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গীতায় যোগকে কর্মের কৌশল বলা হয়েছে। ধ্যান ও কর্মের গুরুত্বও যতটা স্বীকৃতি লাভ করেছে সন্ন্যাস ততটা নয়। শ্রীঅরবিন্দের অভিধ্যানকে কর্মের মধ্যে রূপায়িত করবার অন্যতম উপায় হিসাবে ১৯৪৩ সনে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এখন নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫০-এ শ্রীঅরবিন্দের পরলোক গমনের পর তার স্মারকরূপে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুচনা করা হয় ১৯৫২ সনে। নাম দেওয়া হয় 'শ্রীঅরবিন্দ ইণ্টারন্যাশনাল 'ইউনিভার্সিটি'। শোনা গেল রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিতে হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের নামে বিশ্ববিদ্যালয় হোক সেটা একশ্রেণীর স্থানীয় ছাত্র ও রাজনৈতিক মানুষ পছন্দ করেন নি। তাঁরা দাবি করেছিলেন স্থানীয় কোন মানুষের নামে বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে। সহজবোধ্য কারণেই অরবিন্দ সোসাইটির পক্ষে এমন কোন দাবি মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। আর বিরোধিতা সত্ত্বেও কিছু করতে গেলে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। আশ্রম খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিহার করে চলেন। তবুও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বদা এড়ানো সম্ভব হয় নি। আশ্রমের উপর সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত হয়েছে।

সেই অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এখন শ্রীঅরবিন্দ ইনটারন্যাশনাল সেণ্টার অফ এডুকেশন। এ পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৫৯ সনে। আশ্রম থেকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় কিণ্ডারগার্টেন থেকে উচ্চতম পর্যায়ের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ইত্যাদির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। বিশেষত্ব হলো পঠন-পাঠনের রীতি-পদ্ধতি ও পরীক্ষা বর্জন এবং কোনপ্রকার সার্টিফিকেট ডিগ্রি-ডিপ্লোমা না দেওয়া। এঁরা বিশ্বাস করেন —চরিত্র গঠনের জন্য জ্ঞানার্জ্জন। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ব্যবস্থা তার সহায়ক হয় না।

আমরা বলি দেহে আত্মা আছে। এখানে দেহের প্রাধান্য। এঁরা বলেন আত্মা দেহের আধারে অবস্থান করছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এই দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রত্যেকের সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুসারে তিনি যাতে পূর্ণতা পেতে পারেন তার সর্ববিধ আয়োজন রয়েছে এই শিক্ষাকেন্দ্রে। চলতি ছাত্র-শিক্ষক, শ্রেণী, পঠন-পাঠনের ধারণা এখানে অচল ও অপ্রচলিত।

The child is a soul with a body, life-energy and mind to be harmoniously and integrally developed. দেহ, মন ও শক্তির সমন্বিত বিকাশের জন্য সুস্থ স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাস্থ্যদীপ্ত ছাত্রছাত্রীদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সকলেই সুগঠিত স্বাস্থ্যবান্ এবং উৎসাহে ভরপুর। স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চললে প্রতিটি কিশোর-কিশোরীই এমন সুন্দর হতে পারে—পশ্চিম বাঙলার স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক কর্তৃপক্ষদের এটা একটু জানা দরকার।

শিক্ষকরা পড়ান না, সাহায্য করেন। কোন্ বইতে আছে, কোথায় আছে, কেমন করে হয়, ছাত্রদের বই সব তথ্য সরবরাহ করে, শিক্ষকগণ সাহায্য করেন। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের একটি বাক্য স্মরণ করা যেতে পারে।—The first principle of teaching is that nothing can be taught, অর্থাৎ কিছুই শেখানো যায় না এই হলো শিক্ষার প্রথম নীতি। এই নীতি এখানে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়।

এঁরা বলেন Education is a process of the discovery of one's true place and function in the totality of existence and of the progressive lifting of one's station to the highest possible

reach of consciousness and action. শিক্ষা হলো জীবজগতে মানুষের সত্য স্থান এবং কর্তব্য নির্দ্ধারণ এবং ধীরে ধীরে চৈতন্য ও কর্মের শিখায় উন্নীত হওয়া।

মায়ের একটি কথা এ বিষয় স্মরণ করি। তিনি বলেছেন উন্নতিকে বাধাবন্ধহীন হতে হবে। কোন্ উন্নতিকে আমরা নির্বাধ বলব? তাঁর নির্দেশ হলো: যে উন্নতি বাইরের প্রভাব বর্জিত এবং চলতি বিধিবিধান ও ধ্যান ধারণার দাসত্ব মুক্ত হয়ে আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয় সেটাকে আমরা নির্বাধ অগ্রগতি বা উন্নতি বলব।

আশ্রমের শিক্ষায়োজন এই ধ্যান-ধারণানুসারেই গড়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরা বই যেমন পড়েন, তেমনি আশ্রমের নানা কাজে শারীরিক শ্রম করেন। গান বাজনা খেলাধূলার বিবিধ ক্ষেত্রেও সমান তালে এগিয়ে চলেন। পাঠক্রমে অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও নৃত্যের স্থান স্বীকৃত হয়েছে। ছাত্র চিত্তের উদ্বোধন ও দৈহিক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে আশ্রমের শিক্ষা সার্থক হচ্ছে বলেই আমার ধারণা।

কী পড়ানো হয় সেটা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম তিন বছর কিণ্ডারগার্টেন। পরের পাঁচ বছর প্রাথমিক শিক্ষা। এটা শেষ হলে চার বছর ধরে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় ভাষা, ইংরেজী, ফরাসী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্রাঙ্কন, উদ্যান রচনা, টাইপরাইটিং ইত্যাদি হাতের কাজ হলো শিক্ষণীয় বিষয়। মাধ্যমিক স্তরের পরের পড়াশুনাকে বলা হয় হায়ার কোর্স বা উচ্চতর পাঠক্রম।

হায়ার কোর্সের দুটি ভাগ রয়েছে। কলা ও বিজ্ঞানের স্নাতক পাঠক্রম আর প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রথম বিষয়ের জন্য তিন বছর এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রযুক্তি বিদ্যার জন্য দু'বছর পঠন-পাঠনের সময় ধার্য আছে। ধ্যান ও যোগ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। যোগীর দৃষ্টিতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ব্যবহার দিব্যজীবনে প্রবেশের উপায় বলে কথিত হয়। যে সম্পদ ও সামর্থ্য (means) ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তার পূর্ণ ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা যাতে আত্মার চৈতন্যময় ভ্রান্তিহীন বিকাশ ঘটে এবং আমরা আনন্দময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হই সেইজন্যই তো জ্ঞান আহরণের আয়োজন। দেহ বা মনের সৌন্দর্য পরিতৃপ্তির মধ্যে কলাবিদ্যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভবও এই কলাবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হয়েছে।

পাঠক্রমে যাহাই নির্দিষ্ট হোক না কেন, শিক্ষার্থী কি পড়বেন তা বহুলাংশ তিনিই ঠিক করে নেবার অধিকারী। পড়াশুনার বিষয়াদি নির্দ্ধারণ করবার জন্য বছরের শুরুতে বিদ্যার্থীদের আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষকগণ এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেন কিন্তু স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। কোন্ শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করবেন, কার অধীনে অনুসন্ধান কার্যে রত হবেন তাও বেছে নেবার অধিকার ছাত্রদের। এও এক প্রকার গুরুবরণ। প্রচলিত স্কুল-কলেজে যেমন ক্লাস নেওয়া হয় এখানে সাধারণত তেমনটি করা হয় না। তবে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অনুরোধ এলে তেমন ক্লাস কখনো কখনো করা হয়ে থাকে। আমার ধারণা হয়েছে, সমগ্র বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে এক দিকে ছাত্রচিত্ত উদ্বোধনের প্রয়াস যেমন রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলছে। আজকের পৃথিবীতে এই সমন্বয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক। সুতরাং শিক্ষার যে আদর্শ এখানে রূপ পরিগ্রহ করছে অথবা শিক্ষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কালক্রমে সেটাই হতে পারে মানবসমাজকে অরবিন্দ আশ্রমের শ্রেষ্ঠ দান।

আশ্রম শিক্ষালয়ে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রারের নিকট ২০শে অক্টোবরের মধ্যে পাঠানোর নিয়ম। ভর্তির পর যোগ্যতা বিচারের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর পাঠক্রম বা পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণ নির্ভর করে। ছ' বছরের কম বয়সের শিশু ভর্তি করা

হয় না। মা নিজেই আবেদনপত্রগুলি বিচার-বিবেচনা করে আদেশ দিয়ে থাকেন। কোনরকম মাস মাইনে নেই। তবে থাকা খাওয়া ও স্কুলের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য মাসে দেড়শ' টাকা দিতে হয়। আশ্রমের সাধারণ খাবার যাঁরা খাবেন না তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। সাধারণ পরিচ্ছদাদি বাড়ি থেকে দিতে হয়।

ভারতে শিক্ষা আদর্শ কোন দিন কোন পার্থক্যকে স্বীকার করে নি। বিত্ত সম্পত্তির তারতম্যে এ যুগে শিক্ষার্থীর শ্রেণীবিভাগ ঘটেছে বটে, কিন্তু সেটা আমাদের ভাল লাগে না। জনমানসে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেরলের কলেজী শিক্ষা নিয়ে সংকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তার মূল এখানেই। প্রাচীন ভারতের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

কংসবধের পর কৃষ্ণকে সন্দীপন মুনির আশ্রমে পড়াশুনোর জন্য পাঠানো হয়। মুনিবর শ্রীকৃষ্ণকে এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্র সুদামকে একসঙ্গে রাখলেন। উভয়কে একই ভাবে থাকতে হতো, একইরকম কাজ করতে হতো। আর্য ভারতে রাজার কোন বিশেষ অধিকার ছিল না গুরুকুলের উপর। বর্তমানেও অনুরূপ কথা শ্রুত হচ্ছে। আদালতের সর্ববিধ ব্যয় সরকার নির্বাহ করেন কিন্তু তার উপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই। নইলে শিক্ষিত-চরিত্র মানুষ গড়ে তোলা যাবে না।

আর্য সভ্যতা মূলতঃ আশ্রম সভ্যতা। ক্রমশঃ

মন্থরা হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

কোশলরাজধানীর প্রায় ষোড়শ ক্রোশ উত্তরে নদীতীরে নির্জন বনাচ্ছাদিত গ্রামপ্রান্তে একটি সুপ্রাচীন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী এক সময়ে ঐ অঞ্চলের দস্যুদিগের আরাধ্যা ছিলেন। রাম-রাজত্বকালে দস্যুরা সাধু হইয়া নগরে চলিয়া গিয়াছিল, বণিক্ পুরোহিত, বৈদ্য প্রভৃতি সমাজসেবক রূপে প্রকাশ্যে রাজানুমতি লইয়া মানুষের প্রাণহরণ ও ধনলুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল, সেজন্য ইদানীং পূর্ব্বোক্ত দেবীর আর তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন কয়েকজন পল্লীবাসীর চেষ্টায় তাঁহার একবেলা কিছু ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল, নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ দৈনিক একবার আসিয়া তাঁহাকে কিছু তণ্ডুলকদলী প্রদর্শন এবং পুষ্পবিল্বপত্র প্রদান করিয়া যাইত। দেবীর সর্ব্বাঙ্গ রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত, পুষ্পসজ্জা এবং বস্ত্রাবরণের অবকাশে তাঁহার মুখের যে অংশটুকু দৃষ্টিগোচর হইত সেটুকুও সিন্দুর-চন্দনের অবলেপে সম্যক্ রূপে বুদ্ধিগোচর হইত না। মন্থরা-হরণের পরদিন মধ্যাহ্নকালে একখানি দ্রুতগামী দ্বাদশ-ক্ষেপণিযুক্ত তরণী সেই বিরলবসতি নদীতীরে মন্দিরের অদূরে খর্জ্জুরকাণ্ডখণ্ড রচিত ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। তরণীর মধ্যে একটি বস্ত্রাবৃত শিবিকা রক্ষিত ছিল, সকলে মিলিয়া সেটি সযত্নে নামাইল, তারপর চারজন বাহক শিবিকা লইয়া বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেলে বাকী আট জন নৌকার অদূরে বসিয়া গঞ্জিকাধূমসেবন করিতে লাগিল।

শিবিকাগর্ভে ক্ষুৎপিপাসাতুরা জীবন্মৃতা কুব্জা হতবুদ্ধি অবস্থায় চর্ম্মপেটিকাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল। শিবিকাবাহকেরা তাহাকে নৌকায় তুলিবার পরেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু সে তখন জীবিতা কি মৃতা, পৃথিবীতে আছে না নরকে পৌঁছিয়াছে স্থির করিতেনা পারিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। মহিষচর্ম্মের দুর্গন্ধে শ্বাসরোধকর উত্তাপে সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রহরের পর প্রহর এই ভাবে সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই দগ্ধ সন্দংশিকাহস্ত কোনো যমদূতের সাক্ষাতের আশঙ্কায় তাহার শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু তাহার বিবেচনায় শতাব্দীকাল পরেও যখন তেমন কেহ দেখা দিল না. কেহ তাহাকে তপ্ত লৌহকটাহে বা পুরীষকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল না, তখন সে বুঝিল, সে নিশ্চয় বাঁচিয়াই আছে। অতঃপর সে নড়িবার এবং বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল কিন্তু মুখ এবং হস্তপদ আবদ্ধ থাকায় কিছুই করিতে পারিল না, সাহায্যের জন্য চীৎকার করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

বিশাখদত্তের নির্দেশ মতো তাহার অনুচরেরা শিবিকাটিকে মন্দিরচত্বরে আনিয়া নামাইল। একজন

বলিল, "ঐ তো সেই মন্দির। ঐ তো দক্ষিণে শাল্মলী বৃক্ষ, ঐ তো তাহার পার্শ্বেই কূপ। ঐ কূপেই তো এক বৎসরের জন্য প্রতিমাটিকে বিসর্জন দিবার নির্দেশ আছে। গোলমাল থামিলে আবার লইয়া যাওয়া যাইবে। "লও, মূর্তিটাকে নামাও।" সকলে ধরাধরি করিয়া মূর্তিগর্ভ মহিষদৃতি নামাইল। তখন আর একজন বলিল, "যাই বলো, বাপু, আমার সন্দেহ হইতেছে। সীতার মূর্তি সর্ব্বদা সিংহাসনে এক পা মুড়িয়া এক পা নামাইয়া উপবিষ্ট থাকিত, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার তলদেশই প্রশস্ত হইবার কথা। এ মূর্তি সে তুলনায় দৈর্ঘ্যে বড়ো, অপ্রশস্ত তলদেশে মহিষদৃতি কুঞ্চিত হইয়া আছে, দেখিয়া মনে হয় কোনো ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া আছে। এদিকে আবার মধ্যস্থলে এক স্থানে প্রস্থ অনাবশ্যক রূপে অধিক। কোনো ভুলভ্রান্তি হইল না তো?

আর একজন বলিল, "যাহা আছে তাহাই আছে, কর্তা নিজে ভরিয়াছেন, আমাদের কূপে নিক্ষেপ করিতে পারিলেই চুকিয়া গেল। আর্দ্রকো ব্যবসায়ীর সমুদ্রপোতের সন্ধানে কি প্রয়োজন?"

তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল, "তবু একবার খুলিয়া দেখিলেই তো হয়, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনে হইয়া যায়। কূপে নিক্ষেপ করিতে তো সময় লাগিবে না, সন্দেহটা আমারও যেন হইতেছে।"

ঐ সময় মন্থরার কর্ণে বাহকদের কথা কেমন করিয়া একটু যেন প্রবেশ করিল, তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ হইতেছে বুঝিয়া সে মরিয়া হইয়া বন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, মহিষদৃতি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। বাহকেরা দেখিয়া ভয় পাইল। একজন বলিল, "ভাখ, ভাখ, মূর্তিটা নড়িতেছে। প্রভু কোনো জীবন্ত মানুষকে হত্যা করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠান নাই তো?"

আর একজন বলিল, "কিছুই আশ্চর্য নহে। ধনী ব্যক্তিদের অসাধ্য কর্ম কিছু নাই। না ভাই, মূর্তিটাকে বাহির করাই যুক্তিযুক্ত। মহিষদৃতিশুদ্ধ কূপে ফেলিলে একটা বিপদও আছে। এ মন্দিরে বেশী মানুষের যাতায়াত না থাকিলেও এক বৃদ্ধ পুরোহিত প্রতিদিন একবার আসেন, এই কূপ হইতে জল তুলিয়া দেবীর পূজা করেন। মহিষদৃতি পচিয়া অচিরে জল দুর্গন্ধ হইবে, তিনি সে সংবাদ গ্রামবাসীকে দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের লোক আসিয়া মূর্তি উঠাইবে। মহিষচর্ম্ম ফেলিয়া কূপ অপবিত্র না করাই ভালো।" তখন সকলে যুক্তি করিয়া চর্মস্থালীর মুখ খুলিল। তখন একজন উঁকি দিয়া বলিল, "সত্যই তো, স্বর্ণমূর্তি কোথায়? স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে শুভ্র শনের মতো কি দেখা যাইতেছে যেন।" আর একজন বলিল, "দূর মূর্খ, ওটা কোনো বৃদ্ধার পক্ব কেশ। ধর ধর, টানিয়া বাহির কর।"

সকলে মহিষচর্ম মধ্য হইতে মন্থরাকে বহুকষ্টে বাহির করিল। যে ব্যক্তি প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, সে বলিল, "যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইল। এই বৃদ্ধাকে আমরা জীবন্ত মারিতে যাইতেছিলাম। নারীহরণ তো হইয়াছেই, নারীহত্যার পাতকে লিপ্ত হইতে আমি সম্মত নাহি।"

চতুর্থ ব্যক্তি একটু ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন, বিবেকের বিরুদ্ধে সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে আসিয়াছিল, কুসংস্কারও তাহার বেশী। এতক্ষণ কিছু বলে নাই, এখন বলিল, "সতী মাতার অভিশাপে তাঁহার স্বর্ণপ্রতিমা ডাকিনী মূর্তি ধরিয়াছে, আজ আমাদের কাহারও নিস্তার নাই। চলো, এখনও পলায়ন করি।"

সত্যই আবদ্ধমুখ হস্তপদ মন্থরার চক্ষুর্দ্বয় তখন ক্রুদ্ধা ডাকিনীর মতো জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু দেখিলে ভয় পায় না এমন মানুষ সংসারে বেশী নাই। বাহক দলের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী পিঙ্গল তবু বলিল "ডাকিনী হইলেও মানুষ তো বটে, উহার মুখেই শোনা যাক না ব্যাপারটা কি? লও, খোলো বন্ধন।"

সকলে মিলিয়া মন্থরার হস্তপদ এবং মুখের বন্ধন মোচন করিল। তাহার সর্বাঙ্গ তখন আড়ষ্ট, কিছুক্ষণ সে নড়িতেই পারিল না। তাহার এক পার্শ্বে ফিরিয়া

শয়ন করা অভ্যাস, কুব্জের উপর ভর দিয়া সারাদিন থাকিতে বাধ্য হওয়ায় পৃষ্ঠদেশ অসম্ভবরূপ টনটন করিতেছিল। অনেকবার, উঃ, আঃ প্রভৃতি শব্দ করিয়া সে বহু কষ্টে উঠিয়া বসিল। বাহকেরা প্রশ্ন করিল, "আপনি কে? এই মহিষদৃতির মধ্যে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন?"

মন্থরার ততক্ষণে সাহস ফিরিয়াছে। সে দন্ত কট-কটায়িত এবং চক্ষু আবর্তিত করিয়া বলিল, "আমি কে তোমরা জানো না? অযোধ্যায় রাজপুরী হইতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, এখন ন্যাকা সাজিয়া আমাকেই প্রশ্ন করিতেছ 'আমি কে'? ওরে নির্লজ্জ পাপিষ্ঠের দল, যদি অবিলম্বে আমাকে অযোধ্যায় যথা-স্থানে পৌঁছিয়া না দিয়া আইস তবে আমি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিব।"

মন্থরাকে কথা কহিতে শুনিয়া কেহ বা ভয় পাইল, কাহারও বা ভয় ভাঙিল। রহস্যপ্রিয় গন্ধর্ব নামক এক ব্যক্তি বলিল, "হায়, আমাদের দগ্ধ ললাট। হরণ করিলাম তো করিলাম, তোমার মতো একটা বৃষকাষ্ঠকে হরণ করিলাম? অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে আর নারী ছিল না?" সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, "ভালো-বিপদেই পড়া গিয়েছে" তখন পিঙ্গল বলিল, "তোমার শাপকে ভয় করি না, শাপ দিবার মতো শক্তি থাকিলে কল্য অর্ধেক রাত্রি হইতে অদ্য দ্বিপ্রহরের মধ্যে তুমি আমাদের বহু পূর্ব্বেই ভস্ম করিয়া ফেলিতে। এখন ও সব বক্তৃতা ছাড়ো, স্বর্ণসীতাকে কোথায় পাচার করিলে এবং নিজে কিভাবে এই চর্ম্মস্থালীর মধ্যে ঢুকিলে বলো। যদি সহজে সত্য কথা না বলো তবে পিটাইয়া তক্তা বানাইব, বলিতে পথ পাইবে না।" পিঙ্গলের রঙ্গপ্রিয় বন্ধুটি বলিল, "আমরা ডাকিনীমেধ যজ্ঞ করিতেছি। এক শত আটটি ডাকিনীকে ঐ কূপে নিক্ষেপ করার কথা, তন্মধ্যে একশত সাতটিকে ইতঃপূর্বে শেষ করিয়াছি, এখন তোমাকে ফেলিতে পারিলেই আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ হয়।" তাহাদের সাহসে সাহসী হইয়া অন্যান্য বাহকেরাও মন্থরার চারিদিকে ঘনাইয়া বসিল, তখন সে নিজের অবস্থা বুঝিয়া ভয় পাইল। যথাসম্ভব কোমল স্বরে বলিল, "তাতগণ, সত্য বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না। অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে শ্রীরামচন্দ্রের শয়নকক্ষে আমি ধূপ জ্বালিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম"—

পিঙ্গল ধমক দিল, "আবার মিথ্যা কথা? মধ্যরাত্রে ধূপ দিতে ঢুকিয়াছিলি? ঘরে ধূপগন্ধ ছিল না, নিশ্চয় কোনও কু-অভিসন্ধি লইয়া তুই সেখানে গিয়াছিলি। কেন গিয়াছিলি বল্, নহিলে এখনই কূপে"—

মন্থরা বলিল, "আহা, ক্রুদ্ধ হন কেন? আপনারা আমার ধর্ম্মপিতা, আপনাদের কাছে কি মিথ্যা বলিতে পারি? সীতাদেবী আমাকে বড়োই স্নেহ করিতেন, তাঁহার নির্ব্বাসনের পর হইতে স্বর্ণ সীতাই তাঁহার স্থান লইয়াছিল, সেটিতে আমি সুযোগ পাইলেই একটু হাত বুলাইতাম, মা জানকীর স্নেহ মনে পড়িত। কল্য মধ্য রাত্রে আমি স্বর্ণসীতার অঙ্গস্পর্শ করিবার লোভেই রামভবনে গিয়াছিলাম, কিন্তু মূর্তিটি স্পর্শ করিবার পূর্বেই কে যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হস্ত ধারণ করিল' আমি চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর কি ঘটিয়াছে আমি কিছুই বলিতে পারিব না। মারুন, কাটুন, ইহার বেশী আমার জানা নাই সুতরাং যদি কিছু বলিতে হয় মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া বলিতে হইবে।"

বাহকদের এবার মন্থরার কথায় বিশ্বাস জন্মিল, কিন্তু অতঃপর কর্তব্য কি তাহা তাহারা নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ বলিল, "স্বর্ণসীতার পরিবর্তে এই কুরূপা দাসীকে লইয়া আসিয়াছি জানিলে প্রভু আমাদের অন্ধকূপে পচাইয়া মারিবেন।" কেহ বলিল, "রাজবাড়ীর দাসীকে আমরা হরণ করিয়া আনিয়াছি জানিলে রাজা আমাদিগকে শূলে দিবেন।" অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল, তাহারা কেহ আর দেশে ফিরিবে না, হিমালয় পাদদেশে অন্য কোনো রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইবে এবং কায়িক পরিশ্রম করিয়া বা কৃষিকর্ম্ম করিয়া খাইবে। অযোধ্যাতে তাহাদের গৃহ সংসার বা আপন জন বলিতে কেহ ছিল না, পরাধীন

জীবনে মৃত্যুমুখে ফিরিয়া যাওয়ার চেয়ে স্বাধীন জীবনে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়োজ্ঞান করিয়া তাহারা দেশত্যাগী হইল, বিশাখদত্ত তাহাদিগকে পুরস্কারের অর্ধেক অগ্রিম দিয়াছিল। অর্থের অভাব ছিল না।

কিঙ্করেরা চলিয়া যায় দেখিয়া কুব্জা ব্যাকুল হইয়া বলিল, "তোমরা আমাকে এই অপরিচিত বনমধ্যে একাকিনী ফেলিয়া কোথায় চলিলে? আমি কিরূপে বাঁচিব, কি করিব বলিয়া যাও।"

গন্ধর্ব নামক রহস্যপ্রিয় কিঙ্করটির প্রচুর সহিত রাজান্তঃপুরে যাতায়াত ছিল, দাসীর পৃষ্ঠ দেশে বিশাল কুঁজ দেখিয়া সে তাহাকে এতক্ষণে চিনিয়াছিল। সে বিনীত ভাবে বলিল, 'ঠাকুরাণী, তুমি তবু একটা ইষ্টক গৃহের আশ্রয় সম্মুখেই দেখিতেছ, কাছাকাছি লোকালয়ও আছে। মা জানকীকে এক সময়ে তোমার চক্রান্তে ইহার চেয়ে দুর্গম অরণ্যে উন্মুক্ত আকাশতলে কতদিন বাস করিতে হইয়াছে মনে পড়ে? তুমি রাজকুমার রাজবধূকে বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করাইয়াছ, নিজে দুই-চারিদিন ভগ্ন মন্দিরে বাস করিতে পারিবে না? যাক, তোমার বনবাস এবং হরণকার্যটা হইয়া গেল, এখন কেবল অভিষেকটা বাকী।"

পিঙ্গল হাসিয়া বলিল, "তুমিই বুঝি মন্থরা'? তাহা হইলে তোমাকে আমরা আর কি শিখাইব? তোমার ঐ কুঁজের মধ্যে সাতজন ব্যবহার জীবের চাতুর্য পুঞ্জীভূত আছে, ইচ্ছা করিলে তুমি উহার সামান্যমাত্র ব্যয় করিয়া অচিরে সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে। আমরা তোমাকে ইচ্ছাপূর্বক আনি নাই, তোমার শরীরের অলঙ্কার হরণ করিলে এ সময়ে উপকার হইত কিন্তু স্বভাবতঃ তস্কর নহি বলিয়া সে লোভও সংবরণ করিলাম। আমাদের বিদায় দাও, তোমার জন্য আমাদের জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। নৌকাখানি আমরা লইয়া চলিলাম, শিবিকা আমাদের কাজে লাগিবে না, তুমি উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে আশা করি। শুনিয়াছিলাম তোমার মুখ দেখিলে পাপ হয়, এখন তাহা অস্থিতে অস্থিতে অনুভব করিতেছি।"

কিঙ্করেরা চলিয়া গেলে নিরুপায় মন্থরা উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া উঠিয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। ভিতরে পত্রপুষ্পের স্তূপের মধ্যে অর্ধসমাহিত ক্ষুদ্র পিত্তলময়ী দেবীপ্রতিমা। মন্থরা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই জলের সন্ধান করিল; দেখিল, এক কোণে একটি মৃন্ময় কলসের তলদেশে কিছু জল পড়িয়া আছে। মন্থরা দুই হস্তে কলস তুলিয়া আকণ্ঠ জল পান করিল। খাদ্যের সন্ধান কোথাও কিছু মিলিল না, ভাবিল, "পুরোহিতটা কি লোভী; সমস্ত ভোগ নিজে লইয়া যায়। যাক্, আজ নিশ্চয় একবার পূজা দিতে আসিবে, তখন জাগ্রত দেবীর মুখ হইতে নৈবেদ্য কিরূপে রক্ষা করে দেখিব।" কতদিন মন্দিরে ঝাঁট পড়ে নাই কে জানে, বোধ হয় কয়েক বৎসর হইবে। বুদ্ধিমতী মন্থরা বহু অনুসন্ধানে একটি জীর্ণ সম্মার্জনী আবিষ্কার করিয়া দেবীর সম্মুখে গৃহ-কুট্টিমের একাংশ পরিষ্কার করিল দেবীমূর্তির চতুষ্পার্শ্বে যে আবর্জনা ও পর্যুষিত পুষ্পপত্রাদির স্তূপ জমিয়াছিল তাহাতে দুইচারিটা ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকা অসম্ভব ছিল না, সর্পের তো কথাই নাই। মন্থরা একটা ভগ্ন বৃক্ষশাখার সাহায্যে বহুক্ষণ সেগুলি নাড়িয়া দেখিল, হিংস্র জন্তু কিছুই বাহির হইল না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া দেবীমূর্তিটিকে বহু কষ্টে বেদী হইতে নামাইয়া শায়িত অবস্থায় পুষ্পপত্রের দ্বারা আবৃত করিল। তৎপূর্বে দেবীমূর্তির মুখলিপ্ত চন্দন জলে ভিজাইয়া নিজের মুখে মাখিল, ললাটের তৈলসিক্ত সিন্দুর নিজ ললাটে লেপন করিল, দেবীর ধূলিধূসরিত রক্তবস্ত্রখানি দিয়া নিজ উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকিয়া কেবল মুখ এবং চক্ষুর একাংশ বাহিরে রাখিয়া অবগুণ্ঠন রচনা করিল। তারপর ধীরে সুস্থে বেদীতে বসিয়া নিজের চারিদিকে পত্রপুষ্পের স্তূপ এমন ভাবে বিন্যস্ত করিল যে তাহার দেহের তিন ভাগ তাহাতে আবৃত হইয়া রহিল। সে এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া বসিবার অনতিকাল পরেই বাহিরে কাষ্ঠপাদুকার খট্‌খটাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, এক প্রৌঢ় পূজারী ব্রাহ্মণ দ্বারপথে

দেখা দিল। তাহার এক হস্তে তাম্রপাত্রে কিছু ফলমূল, জলসিক্ত আতপতণ্ডুল এবং তদুপরি স্থাপিত আর একটি ক্ষুদ্রতর পাত্রে পুষ্প বিল্বপত্র দূর্ব্বাদি, অপর হস্তে কোশাকুশি, কুশাসন এবং ঘণ্টা। ব্রাহ্মণ ঈষৎ ক্ষীণদৃষ্টি, ঘরের পরিবর্তন কিছুই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। সে নৈবেদ্যপাত্র এবং পুষ্পপাত্র দেবীর বেদীর সম্মুখে নামাইল, অন্যান্য দ্রব্য তাহার অদূরে রাখিল। দুই হস্তের ভার নামাইয়া সে হস্তদ্বয় কয়েকবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া সংবেদন ফিরাইয়া আনিল, তারপর উত্তরীয়প্রান্ত আন্দোলন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ বায়ু সেবন দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিল। পরে কক্ষকোণে রক্ষিত কলস ও রজ্জু তুলিয়া কূপ হইতে জল আনিতে গেল। কুব্জা এই সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিল না, কিছু তণ্ডুল, একটি মোদক, কয়েকটি কদলীখণ্ড এবং আম্রখণ্ড ক্ষিপ্র হস্তে তুলিয়া গলাধঃকরণ পূর্ব্বক আবার যথাস্থানে দেবী সাজিয়া বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জলপূর্ণ কলস লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, কলসের জলে কোশা পূর্ণ করিয়া কুশাসন পাতিয়া মৃন্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া পূজায় বসিল। প্রথমতঃ আচমন করিয়াই সে নৈবেদ্যের উপর খানিকটা ফুলজল ছিটাইয়া দিল, "গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" বলিয়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়াও কিছু ফুলজল নিক্ষেপ করিল। তারপর মুদিত নেত্রে অনর্গল অশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে এবং ঘণ্টা নাড়িতে আরম্ভ করিল। মন্থরা যখন দেখিল ব্রাহ্মণ আর চক্ষু খুলিতেছে না তখন বেদীর উপর হইতে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া সম্মুখস্থ আমান্ন নৈবেদ্যের থালা হইতে টপ করিয়া আর একটি কদলীখণ্ড তুলিয়া মুখে পুরিল। তখনও ব্রাহ্মণের চক্ষু উন্মীলিত হইল না দেখিয়া কুব্জার সাহস বাড়িল, সে বেদী হইতে হাত বাড়াইয়া একে একে দুইটি আম্রখণ্ড, একটি মোদক এবং দুইটি পনসকোষ তুলিয়া ভক্ষণ করিল। শেষবার নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার সময় ন্যুব্জ দেহের ভারসাম্য স্থির রাখিতে না পারিয়া সে অধঃপতিত হইতে যাইতেছিল, কোনোরূপে নৈবেদ্যপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া 'টাল' সম্বরণ করিল। পাত্র সশব্দে নড়িয়া গেল, মাটি কাঁপিল। মন্থরা কোনও মতে বেদীতে যথাস্থানে উঠিয়া বসিতেই দেখিল পূজারী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। অগত্যা সে রমণীসুলভ লজ্জায় চক্ষু মুদিত করিয়া জিহ্বাগ্র বাহির করিল।

পূজারীর বয়স ষাট বর্ষের অধিক হইবে না। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহের তুলনায় মস্তকটি কিছু বৃহৎ, নাসিকা ঈষৎ দীর্ঘ, চক্ষুর্দ্বয় আয়ত, গুম্ফশ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখখানি দেখিতে ভালোই। তাহার পিতৃদত্ত নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার মস্তকের কেশ, বিশেষতঃ শিখাটি সর্ব্বদাই ঊর্ধ্বমুখ হইয়া থাকিত বলিয়া গ্রামবাসী তার নূতন নামকরণ করিয়াছিল 'ঊর্দ্ধমুখ'। বিদ্যাচর্চা অপেক্ষা দেশভ্রমণেই কৈশোর যৌবনে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল, দুষ্টবুদ্ধিও কিছু অধিকমাত্রায় ছিল বলিয়া শ্রুতিস্মৃতির সহিত তেমন পরিচয় হয় নাই, গুরুগৃহে গোচারণ এবং ফলমূল আহরণ যেমন শিখিয়াছিল, ব্যাকরণ এবং শাস্ত্রাদি তেমন অধিগত হইয়া উঠে নাই। কাশী হইতে উত্তরে তক্ষশিলা এবং দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে ঘুরিতেই কাটিয়া গেল, পিতৃবিয়োগের পর গ্রামে ফিরিতেই সংসারের ভার স্কন্ধে পড়িল, সুতরাং আর কিছু হইল না। কয়েকটি দরিদ্র যজমান ঠকাইয়া কদাচ কখনও দুই-একটি রৌপ্য মুদ্রা মিলিত, এই বনমধ্যস্থ মন্দিরে পূজার জন্য গ্রামপ্রধানের নিকট যে সামান্য বৃত্তি ও দৈনিক সিধা পাইত তাহাতে তাহার স্ত্রীপুত্রসহ কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। বহুপূর্বে একবার রাজসভায় দান লইতে গিয়া সে বহু পণ্ডিতের সম্মুখে নিজের নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, সেই হইতে সভায় সে বড়ো আর যাইত না, সেজন্য রামরাজত্বের স্বর্ণযুগেও তাহার কিছু উন্নতি হয় নাই। সে যতই ক্ষীণদৃষ্টি হউক, তাহার নৈবেদ্যের থালী যে ক্রমেই শূন্য হইয়া আসিতেছে তাহা তাহার দৃষ্টির এড়ায় নাই। চক্ষু মুদিত থাকিলেও তাম্রপাত্রে যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতেছে তাহা পুষ্পপত্রের মর্মরে এবং নৈবেদ্যপাত্রের ঈষৎ স্থানচ্যুতির মৃদু শব্দেই সে বুঝিতে

পারিয়াছিল, সুতরাং সন্দিগ্ধ চিত্তে মধ্যে মধ্যে চক্ষু পিট পিট করিতেছিল। নৈবেদ্যস্থালী যখন সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া গেল, একটি কঙ্কনমণ্ডিত হস্ত যখন একে একে তাহার নিবেদিত সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিল তখন দেবী তাহার পূজায় জাগ্রতা হইয়াছেন মনে করিয়া সে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়াছিল, কিন্তু দেবী যখন সশব্দে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইতে রক্ষা পাইলেন, তখন সম্পূর্ণরূপে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেবীর দেহ সর্বাভরণভূষিত, রক্তবস্ত্রাবরণের মধ্য দিয়াও অলঙ্কারের দ্যুতি দৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তাঁহার এ কি মূর্তি? শণপিণ্ডের মতো শুভ্র কেশ, কোটরগত শ্যেনচক্ষু, বলিকুঞ্চিত চর্ম, প্রকটাস্থি দেহ। বিকট দন্তহীন মুখে দেবী পনসকোষ চোষণে নিযুক্তা ছিলেন, সৃকণী বাহিয়া পনসরস ধারাসারে নামিতেছিল সেই অবস্থায় জিহ্বা নিঃসরণ করিতে গিয়া শোষণাবশিষ্ট পনসের ছিবড়া হড়াৎ করিয়া গৃহকুট্টিমে আসিয়া পড়িল। উচ্ছিখ ভয় পাইল। দেবী সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা, একবার যখন জাগিয়াছেন তখন তাহাকেও ঐ পনসকোষের মতো চুষিয়া খাইতে কতক্ষণ? অবশ্য দেবীর মুখে দন্ত দৃষ্ট না হওয়ায় সে কিছু ভরসাও পাইল; রক্ত চুষিয়া খাইলেও দেবী তাহার অস্থিমাংস চর্বণ করিতে পারিবেন না। উচ্ছিখ অতঃপর সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া করযোড়ে বলিল, "দেবী প্রসীদ।"

বুদ্ধিমতী মন্থরা ততক্ষণে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রাহ্মণের দেহ কিছু কৃশ হইলেও লোকটা মোটের উপর সুপুরুষ, ইহাকে লইয়া সংসার পাতিলে মন্দ হয় না। অবশ্য বয়স হইয়াছে। তা হোক, মন্থরার উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইলে ইহার মতো পৌত্র হইতে পারিত, সেজন্য তাহার কোনও অভিযোগ নাই। এখন ইহাকে সম্মত করানো যায় কি প্রকারে। আপনার বায়সবিনিন্দিত কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া মন্থরা হাস্যোদ্ভাসিত বদনে দক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কহিল, "ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পূজায় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার কোন্ সাধ পূর্ণ করিব বলো?"

উচ্ছিখ আশ্বস্ত হইল। উঠিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। বোঝা গেল সে বড়োই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে গদ্গদকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, "দেবী আমার অনেক সাধ, আপনি কয়টা পূর্ণ করিবেন? আমি জন্মদরিদ্র, জীবনের ভোগ কিছুই আমার হয় নাই। আমি রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ সুখাদ্য খাইতে চাই, সপ্তভূমিক প্রাসাদে হেমপর্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ কুসুমকোমল শয্যায় শয়ন করিতে চাই, রাজোচিত বসনভূষণ, যানবাহন, দাসদাসী, সম্মান প্রতিপত্তি চাই। আমি ইচ্ছামতো ব্যয় করিতে, ভ্রমণ করিতে, আনন্দ করিতে চাই।"

মন্থরা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ এককথায় তুমি অর্থ চাও? তজ্জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছ?"

উচ্ছিখ মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিল, "দেহত্যাগ ভিন্ন যাহা বলিবেন করিতে প্রস্তুত আছি। অর্থের জন্য আমি নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

মন্থরা কহিল, "যদি তোমার অন্য সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয় তবে তাহার পরিবর্তে কোনো কুরূপা নারীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ?"

উচ্ছিখ এবার ভয় পাইল, মন্থরার মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু আমার যে স্ত্রীপুত্র আছে?"

মন্থরা বলিল, "তাহাতে কি হইয়াছে? পুরুষের একাধিক বিবাহ দোষের নহে। আমার তত মন সঙ্কীর্ণ নহে, সপত্নীতে আমার আপত্তি নাই।"

উচ্ছিখ কাতর স্বরে কহিল, "আপনি দেবী হইয়া মানবকে বিবাহ করিবেন? সে কি কথা!"

মন্থরা বলিল, "দেবী হইলেও উপস্থিত আমি শাপভ্রষ্টা হইয়া মানবী দেহ ধারণ করিয়াছি, সুতরাং সেজন্য বাধা হইবে না। আমি বহুদিন রাজান্তঃপুরে ছিলাম, সেখানে তোমার সাক্ষাৎ না পাইয়া এই বনমধ্যে তোমাকে বরণ করিতে আসিয়াছি। তুমিই একমাত্র আমার শাপমোচন করিতে পারো। আমাকে গৃহে লইলে তুমি জীবনে কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে না।"

উচ্ছিখের মুখ শুকাইল, সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি জীর্ণ পর্ণাচ্ছাদিত মৃন্ময়কুটিরে বাস করি আমার গৃহিণী অত্যন্ত কটুভাষিণী। পত্নীরূপে আপনাকে গৃহে লইয়া গেলে তিনি সম্মার্জনী হস্তে আমাদের উভয়কে আক্রমণ করিবেন। আমি প্রহার সহিতে অভ্যস্ত, আপনার তাহা সহ্য হইবে না।"

মন্থরা বলিল, "সম্মার্জনী চালনায় আমিও অপটু নহি। কিন্তু তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ, এখনই তোমার পত্নীর নিকট আমাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে কেন?"

উচ্ছিখ বলিল, "তবে কি বলিব? পিতামহী? আপনি আমার পিতামহীর বয়সীই হইবেন মনে হয়।"

মন্থরা বলিল, "না, না, আমার বয়স অত অধিক নয়। অম্লশূল রোগে ভুগিয়া গণ্ডদেশ ঈষৎ তুবড়াইয়া গিয়াছে এবং চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে। আমার দন্তহীন মুখ এবং শণগুচ্ছসদৃশ কেশ দেখিয়া মনে করিয়ো না আমি নিতান্ত বৃদ্ধা। যাহা হউক, পিতামহী বলিয়া পরিচয় দিলে তোমার স্ত্রী যদি সন্তুষ্টা হন তবে আমার তাহাতেও আপত্তি নাই।"

উচ্ছিখের উদ্বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই। বলিল, "কোনদিন আমার পিতামহীকে দেখি নাই, কারণ আমার জন্মের পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে মরিতে দেখিয়াছিল এমন বৃদ্ধ বৃদ্ধা এখনও গ্রামে আছে। সহসা এখন তাঁহার পুনরাবির্ভাবে সকলে সন্দেহ করিবে না কি?"

মন্থরা বলিল, "আরে, আমি কি তোমার নিজের পিতামহী? আমি তোমার পিতার দূরসম্পর্কিত পিতৃব্য-পত্নী, নিঃসন্তানা বিধবা। যথেষ্ট অর্থ আছে কিন্তু কোনো নিকট আত্মীয় উত্তরাধিকারী নাই। বৃদ্ধ বয়সে যে আমার সেবা করিবে, আমাকে তীর্থ দর্শন করাইয়া বেড়াইবে এরূপ একটি আত্মীয়ের সন্ধানে ছিলাম, অযোধ্যায় তোমার এক পিতৃবন্ধুর কাছে তোমার পরিচয় পাইয়া তোমাদের গ্রামে আসিয়াছি। তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইলে তোমাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া যাইব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এই কথা বলিয়া দেখ, তোমার পত্নী কি বলেন।"

ব্রাহ্মণের দ্বিধাভাব কমিল। বলিল, "ও কথা বলিলে বোধ হয় গৃহিণী আপত্তি করিবেন না। এখন আমি ভাবিতেছি, আপনার জাতিগোত্র না জানিয়া আপনাকে ধর্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে কি না।"

মন্থরা হাসিয়া বলিল, "এখনই তুমি অর্থের জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত ছিলে, ইহার মধ্যেই মত পরিবর্তিত হইল? বেশ, আমি স্বীকার করিতেছি আমি ব্রাহ্মণী নহি কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহ তো শাস্ত্র সিদ্ধ? তুমি আমাকে বিবাহ করিলে লোকাচারেও বাধিবে না, কারণ, আমি সধবা বা বিধবা নহি, অদ্যাবধি অবিবাহিতা। অবশ্য কুৎসিত বলিয়া যদি আমাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি থাকে তবে সাধ্য-সাধনায় কাজ নাই। অদূরে আমার শিবিকা রহিয়াছে, তুমি আমাকে অযোধ্যায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করো। সেখানে অর্থের মূল্য বুঝিবে এরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অভাব হইবে না। তোমার মতো হতভাগ্যের সহিত বাক্যব্যয় করাই আমার অন্যায় হইয়াছে। লক্ষ্মীর প্রসাদ জীবনে বার বার যাচিয়া আসে না, আশা করি যে সুযোগ ছাড়িলে তাহার জন্য পরে অনুতাপ করিবে না।"

মন্থরা পত্রপুষ্পের স্তূপ ঠেলিয়া দাঁড়াইল, রক্ত-বস্ত্রের আচ্ছাদন ফেলিয়া দিল, দীপালোকের সহিত মিশিয়া দ্বারপথে আগত অপরাহ্নের ম্লান সূর্যরশ্মি তাহার দেহে পড়িল, সর্ব্বাঙ্গে মণিরত্ন ঝলমল করিয়া উঠিল। যতক্ষণ সে গুরুভার পাষাণের মতো তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছিল ততক্ষণ উচ্ছিখ তাহাকে কোনও মতে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে যখন নিজেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল, তাহার ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ দীপ্ত মোহজাল বিস্তার করিল, তখন দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণের মনে হইল, এ সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা হইবে। দারিদ্র্যের জ্বালায় সে চিরদিন জ্বলিয়াছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা,

পত্নীর কুবাক্য, প্রতিবেশীর অবজ্ঞা, উত্তমর্ণের অপমান তাহার নিত্য সঙ্গী। এতদিন পরে এই সমস্তের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিবার প্রলোভন সে জয় করিতে পারিল না। বলিল, "আমি সম্মত আছি, এখন কি করিতে হইবে বলো।"

মন্থরা বলিল, "আপাততঃ আমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইবে, দুইটি মাল্য চাই। বন হইতে কিছু পুষ্পচয়ন করিয়া আনো।" উঞ্ছবৃত্ত পুষ্প আনিল, কুব্জা বিনাসূত্রে মাল্যরচনা করিতে অভ্যস্ত ছিল, দেখিতে দেখিতে দুইটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া ফেলিল। তারপর তন্মধ্যে একটি উঞ্ছবৃত্তকে দিয়া বলিল, "এস, কন্দর্প দেবকে সাক্ষী রাখিয়া আমরা পরস্পরকে মাল্যসহ হৃদয়দান করি।" কুব্জা উঞ্ছবৃত্তের কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিল, অগত্যা উঞ্ছবৃত্তও মনে মনে "জয় মা শ্মশানকালী, রক্ষা করিয়ো মা" বলিয়া কুব্জার কণ্ঠে মাল্য দিল। মন্দিরগাত্রস্থ একটা গৃহগোধিকা ঠিক ঠিক শব্দে তাহাদের এই মিলন অনুমোদন করিল। মন্থরা অতঃপর ব্রাহ্মণের অঙ্গুলিবদ্ধ কুশাঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়া পরিল, নিজের অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় লইয়া ব্রাহ্মণের অনামিকায় পরাইয়া দিল। উঞ্ছবৃত্ত বলিল, "এখন কি কর্তব্য?"

মন্থরা সহসা নিজের কটিদেশবিজড়িত থলিটি খুলিয়া প্রায় পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা গৃহ কুট্টিমে ঢালিয়া দিল, ক্ষীণালোকিত গৃহের দীপালোক সেই সুবর্ণরাশিতে প্রতিফলিত হইয়া গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে উঞ্ছবৃত্তের নয়নদ্বয়ও লোভে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দুই হস্তে সেই স্বর্ণরাশি নাড়িতে লাগিল। মন্থরা হাসিয়া বলিল, "অজ্ঞ উঞ্ছ, অদ্য হইতে আমি তোমার হইলাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হইল। সুখে দুঃখে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়োনা। উপস্থিত এই স্বর্ণমুদ্রাগুলির কয়েকটি লইয়া সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করো। সপ্তাহ কালের মধ্যে আমাকে তীর্থযাত্রায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করো। ইহার শতগুণ মূল্যের মণিরত্ন আমার অলঙ্কারে আছে, আমার কুঞ্জের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। যখন প্রয়োজন হইবে তখনই পাইবে।"

ব্রাহ্মণ পুলকিত হইয়া কহিল, "প্রিয়তমে, অদ্য হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম। তোমার শিবিকাবাহকদের কোথায় সন্ধান পাইব? এই বনমধ্যে এত অর্থ লইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা নিরাপদ্ নহে।"

মন্থরা বলিল, "আমি জানিতাম তুমি আমার বিধিনির্দিষ্ট স্বামী, সুতরাং ফিরিব না স্থির করিয়াই আসিয়াছিলাম। বাহকদের আমি বিদায় দিয়াছি। তুমি একটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া গ্রাম হইতে কয়েকজন বাহক সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। আর তোমার পত্নীকে আপাততঃ দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আমার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে বলিয়া আইস।" কোশার জলে দেবীর রক্তবস্ত্র ভিজাইয়া মন্থরা নিজের মুখ ও হস্ত পদ পরিমার্জনা করিতে লাগিল।

উঞ্ছবৃত্ত দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিল এবং কয়েক দণ্ডের মধ্যেই চারিজন বাহক এবং বহু প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, তথাপি কয়েকজন অতিরিক্ত উৎসাহী ব্যক্তি উল্কা জ্বালাইয়া লইল। সেই উল্কালোকে বনপথ আলোকিত করিয়া বিচিত্র কারুকার্যময় শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক কুব্জা যখন ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরদ্বারে পৌঁছিল তখন প্রতিবেশিনীরা লাজবর্ষণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাকে বরণ করিলেন, ব্রাহ্মণী সসম্মানে পাদদ্বয় ধৌত করাইয়া তাহাকে গৃহে তুলিলেন। উঞ্ছবৃত্তের পিতামহীর রূপ দেখিয়া অনেকেই অন্তরালে হাসিল, বিধবার শরীরে আবার এত অলঙ্কার কেন বলিয়া কেহ কেহ বক্রোক্তি ও নিন্দাও করিল, কিন্তু সম্মুখে সকলেই তাহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে দরিদ্র উঞ্ছবৃত্তকে ডাকিয়া কথা বলিত না তাহারা তাহার অভাবনীয় সৌভাগ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহাকে ভ্রাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক বিবিধ সুখাদ্য পাঠাইল। মোদক ক্ষীর ও সুপক্ক আম্র-পনসাদি দ্বারা রাত্রির আহার

শেষ করিয়া কুব্জা শয়ন করিতে গেল। ব্রাহ্মণের নিত্য ব্যবহার্য ছিন্নকন্থার উপর গৃহিণী তাঁহার বিবাহের সময়ে প্রাপ্ত পট্টবস্ত্রখানি পাতিয়া দিলেন এবং সারা রাত্রি জাগিয়া তাহাকে তালপত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে এবং তাহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। উঞ্ছিখের পুত্র পঞ্চশিখ যুবাপুরুষ, সবে গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মন্থরার মন ঈষৎ চঞ্চল হইয়াছিল, সহসা তাহার পিতাকে বিবাহ করিয়া ফেলার জন্য অনুতাপও হইয়াছিল, কিন্তু সে কিছুই মুখভাবে প্রকাশ পাইতে দিল না। তাহাকে কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেকটা বশ করিয়া ফেলিল, শেষ পর্যন্ত মিষ্টান্ন খাইবার জন্য পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে সে প্রপিতামহীর পদধূলি লইয়া ধন্য হইল। পরদিন অযোধ্যা হইতে স্থপতি প্রভৃতি আনিতে লোক ছুটিল, কারণ উঞ্ছিখের প্রাসাদ নির্মাণ করিবার উপযুক্ত ইষ্টক নির্মাতা, দারুশিল্পী প্রভৃতি কিছুই সে গ্রামে ছিল না। মন্থরার অর্থে গ্রামের মধ্যেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রীত হইল, শিল্পীরা কাজে লাগিল। প্রাসাদ নির্মাণের ভার পঞ্চশিখের উপর দিয়া সপ্তাহ কাল পরে উঞ্ছিখ পিতামহীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রাম বাসীকে একদিন চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় বিবিধ আহার্য্যে পরিতৃপ্ত করিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগকে একটি করিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা ভোজন-দক্ষিণা দিয়া মন্থরা সকলের হৃদয় জয় করিল। অনেকগুলি বৃদ্ধ বৃদ্ধা তীর্থদর্শন মানসে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য উৎসুক ছিল কিন্তু কত বৎসর পরে তাহারা ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই জানিয়া এবং গঙ্গোত্রী মানস-সরোবর প্রভৃতি দুর্গমতীর্থে যাইবার পথে মৃত্যু-সম্ভাবনা আছে শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইল। বলা বাহুল্য, গৃহনির্ম্মাণের এবং কয়েক বৎসরের মতো সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা সে উঞ্ছিখ-পত্নীর নিকট রাখিয়া গেল।

ক্রমশঃ

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে দুদিন

ডাঃ গৌরমোহন দে

ছাত্রাবস্থায় মেরী করেলীর থেলমা বইটী পড়ে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। নরওয়ের মাঝ রাত্রিতে সূর্য্যের আবির্ভাব আর থেলমার প্রণয় অভিযান পড়ে নরওয়েকে খুব দেখবার ইচ্ছা ছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হ'ত নরওয়েতে এসে সেই থেলমার বংশধরদের সঙ্গে মাঝ রাত্রিতে সূর্য্যের আলোয় বসে আমি আলাপ করে যাব। ষ্টকহোমের বিমান বন্দরে বসে আছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নরওয়েতে পৌঁছে যাব। কিন্তু সেখানে গিয়ে থেলমার বংশধরদের কি কাছে পাব? বিমানে ওঠবার ডাক আসতেই আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। বিমানে উঠে বসলাম। নরওয়ের রাজধানী অসলোতে যখন আমরা ষ্টকহোম থেকে বিমান পথে পৌঁছলাম তখন সূর্য্যদেব মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিম গগনে ঢলতে আরম্ভ করেছেন। অসলোর বিমান বন্দরের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সেরে তাদের বাসে করে আমরা বিমান কোম্পানীর সহরের অফিসে এসে হাজির হলাম। এখান থেকে আমাদের হোটেলটা বেশী দূরে নয় কিন্তু আমাদের ব্যাগেজগুলি সঙ্গে নেবার জন্যে আমাদের ট্যাক্সি ডাকতে হল। এখানকার প্রায় সব ট্যাক্সিই নতুন জার্ম্মানি নির্ম্মিত মারসিডেজ বেঞ্জ গাড়ী। ব্যাগেজ-গুলো জমা দিয়ে এই সামান্য রাস্তাটুকু পায়ে হেঁটে ডলার বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু আমরা আমাদের পোষাকগুলি দুদিন ধরে পরে আছি, সেগুলো ছেড়ে নতুন পোশাক পরবার সুযোগ পাইনি। এর কারণ, যখন আমরা মস্কো ভ্রমণ শেষ করে ফিনল্যাণ্ডে যাই তখন মস্কোর বিমান বন্দরের অফিসার আমাদের ব্যাগেজগুলি ভুল করে ষ্টকহোমে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে অন্য একটি হাত ব্যাগে যা কাপড়চোপড় ছিল সেগুলি আমরা ব্যবহার করি। ষ্টকহোম থেকে আর আমরা ব্যাগেজ নিই নি। সরাসরি আমরা অসলো বিমান বন্দরে আমাদের ব্যাগেজ নিয়ে সহরে চলে আসি। এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসার সমস্ত দেশে দেশে আমাদের জন্যে দিনপ্রতি আট ডলারে হোটেল ঠিক ভাড়া করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই সব দেশে পা দিয়েই হোটেলে ফোন করে জানতে পারি যে এয়ার ইণ্ডিয়া হোটেল ঠিকই ভাড়া করে রেখেছে কিন্তু তার ভাড়া আট ডলার নয়, কোনটা বিশ ডলার আবার কোনটা সতের ডলার। ফিনল্যাণ্ড আর ষ্টকহোমে ত তাঁদের ঠিক করা হোটেলই আমরা পাইনি। এঁদের ওপর বিশ্বাস করে বিদেশে যাত্রা করাটা বেশ সমীচীন হবে বলে আমার মনে হয় না।

আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেলে এসে পৌঁছলাম। জিনিষপত্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েই আমি গরম আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে বাথ-টাবটী ভর্ত্তি করে তার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগলাম। সারাদিন ধরে ষ্টক-হোমে টুর নিয়ে অসলোতে পৌঁছেই আমরা খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখন এই বাথটাবে শুয়ে পড়ে আমি এত আরাম বোধ করছিলাম তা লেখায় প্রকাশ করা যায় না। স্ত্রী খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকেই বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

বাথটাবে শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরেটা বেশ দেখা যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মেঘের গর্জনও মাঝে মাঝে কানে আসছে। ষ্টকহোমে শুনে এসেছিলাম অসলোতে বেশ শীত পড়তে পারে কিন্তু এখানে এসে তেমন শীত অনুভব করলাম না। সেদিন ১৯৭১ সালের ২৮শে মে শুক্রবার। রাত্রি ৮টার পর দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। আমি স্নান সেরে জামা কাপড় পরে বড় গরমের ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে খাদ্যের সন্ধানে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। একটা ছোট্ট দোকান থেকে কিছু মাখন, একটিন জ্যাম, আর একটা পাউরুটি আর কিছু ফল কিনে নিয়ে এলাম। তারপর হোটেলের কর্ম্মচারীকে ডেকে দুকাপ চা আনালাম। খাবার পর আমরা মনে ও দেহে কিছুটা বেশ শক্তি পেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চায়ের বিলটা যখন আমাদের কাছে এ'ল তখন বিলটা দেখে আমাদের মানসিক শক্তিটা বেশ কিছুটা হ্রাস পেল। ঘরে বসে দুকাপ চা খেতে আমাদের লাগল প্রায় দেড় ডলার। "আমি আর অসলোতে চা খাব না" স্ত্রীকে বল্লাম। কিন্তু স্ত্রীকে চা বা কফি খেতে বারণ করলাম না, কারণ নেশাখোরেরা নেশার জিনিষ না খেতে পারলে হুলুস্থুলু করে ছাড়ে। আমার স্ত্রীটি খাদ্যদ্রব্য না পেলেও কিছু বলবেন না কিন্তু চা বা কফি না পেলে আর রক্ষে নেই। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজ ২৯শে মে শনিবার ১৯৭১ সাল, ভোরে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে দেখলাম—রাস্তা বেশ জলে ভিজে গেছে। বোঝা গেল যে রাত্রে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল। আজকে সকাল দশটার টুর না নিলে গতকাল কোপেনহাগানে যাওয়া যাবে না। টুরের টিকিট কিনতে হলে আমাকে প্রায় একমাইলের বেশী হেঁটে গিয়ে টুরিষ্ট অফিস থেকে টিকিট কিনতে হবে। অন্যান্য দেশে হোটেলেই টুরের টিকিট কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু এই হোটেলে তারা টুরের করে না। সকাল বেলা কিছু জলযোগ করার পর স্ত্রীকে হোটেলে রেখে আমি একলাই বের হয়ে পড়লাম। রাস্তায় কোন ইংরেজী জানা লোক আমি দেখতে পেলাম না। হোটেল থেকে একটা সহরের ম্যাপ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি, রাস্তার লোকজনদের ম্যাপটা দেখালে আমায় তারা হাত মুখ নেড়ে আমার গন্তব্যস্থল দেখিয়ে দেয়। এদিকে ট্রাম ও বাস সবই যাতায়াত করছে। কোন ট্রামে বা কোন বাসে চড়লে আমার গন্তব্যস্থলে আমি পৌছতে পারব তা আমি তাদের ইশারায় জিজ্ঞাসা করি। পথচারীরা আমার ঈশারাটা বুঝে আমায় ইশারায় জানিয়ে দেয় যে আমার গন্তব্যস্থানটা বেশী দূরে নয়। হেঁটে যাওয়াই উচিত স্থির করে আমি হাঁটতে থাকি। রাস্তার দুপাশের বাগানে নাম না জানা বড় বড় গাছের ছোট ছোট অগণিত হলুদ ফুলগুলি গাছটার নীচে পড়ে রয়েছে। মনে হয় কে যেন একটা বড় হলুদ রঙের গালচে পেতে রেখেছে। রাস্তার আশে পাশে কফির ষ্টল খোলা আছে। অনেকে সেখানে বেঞ্চি বা চেয়ারে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পে মত্ত দেখলাম। এইসব কফির দোকানগুলো যেখানে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়। একটু দূরেই একটা বড় ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। তার সামনে ছোট্ট একটা বাগান, সেই বাগানের মধ্যে টেবিল ও চেয়ার সার সার সাজানো রয়েছে। একটু বেলা হলে সেখানে খরিদ্দারের আগমন হয়। এইসব জায়গা রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত খরিদ্দারদের জন্যে খোলা থাকে। আশেপাশের বড় বড় দোকান আর অফিসগুলোতে সব তালা ঝোলানো রয়েছে। সকাল বেলায় সব দোকানপাট বন্ধ থাকে। শনিবার দিন অফিস খোলা থাকলেও ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে। ইউরোপে ঘোরার সময় পরে দেখেছিলাম যে সপ্তাহে পাঁচদিন মাত্র ব্যাঙ্কগুলি খোলা থাকে। শনিবার আর রবিবারে একবারে বন্ধ। আমি কয়েকটা ট্রাভলার্স চেক বিমান পোতে ভাঙ্গিয়ে এনেছিলাম, সেগুলোই এখন খরচ করছি, বিমান পোতে বা হোটেলে চেক ভাঙ্গালে অনেক কম টাকা পাওয়া যায়। সেজন্যে আমি সবসময়

ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙ্গাতাম। শনিবার যে ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকে তার খবর আমি অসলোতে এসে জানতে পারলাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন সদ্য আগত জার্ম্মান ছাত্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। ছেলেটী ভাল ইংরেজী বলতে পারে না। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা বলে। রাস্তায় চলতে চলতে তার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। সে এদেশের স্কলারশিপ পেয়ে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে। প্রথম প্রথম এদেশে এসে তার খুবই খারাপ লাগত। সে এদের এক বর্ণ ভাষা জানত না আর তার জন্যে এদের সঙ্গে ভালভাবে মিশতে পারত না। কিছুদিন এদেশে থাকার পর এদের ভাষা এখন সে বেশ বুঝতে পারে আর কিছু কিছু সে বলতেও পারে। দেশের বাইরে না বেরুলে ছাত্ররা চালাক চতুর হয় না বলে সে মন্তব্য করল। কয়েক মিনিট ধরে তার সঙ্গে হাঁটার পর আমাকে আমার গন্তব্যস্থানটী বুঝিয়ে দিয়ে সে অন্য দিকে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ পরে টুরিষ্ট অফিসে এসে ঢুকলাম। ওখানকার কর্ম্মচারীরা আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে সেদিন দুটো টুর আছে সকাল দশটা থেকে একটা পর্য্যন্ত Fjords টুর। এই টুরে মোটর চোটে করে শুধু Fjords ঘোরাবে। আর দুটো থেকে ছটা পর্য্যন্ত অসলোর আশেপাশের দ্রষ্টব্যস্থানগুলো আর অসলো শহরটী দেখান হবে। আমি একটা টুর নেব না দুটো টুর নেব ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে হোটেলের পথে পা বাড়ালাম। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে টিকিট কিনব। দুটো টুরের খরচ একশত ত্রিশ ক্রোনার আমাদের একশত ত্রিশ টাকার মত আর তার ওপর লাঞ্চের জন্যে দুজনের খরচ পড়বে চার ডলার। সঙ্গে ডলার খুবই কম রয়েছে। আর বিশ্বভ্রমণ মাত্র আমরা শুরু করেছি। ওঁরা আমাদের জানিয়ে দিলেন যে সিটি হলের কাছে অসলো হারবারে একটী ছোট্ট টিকিট ঘর আছে, সেখান থেকেও টিকিট কিনতে পারা যাবে। তবে অসংখ্য টুরিষ্ট এসেছেন স্থান পাওয়া খুবই কষ্টকর। আমি যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে টিকিট কিনি তা না হলে আমাদের আজ যাওয়া হবে না। পথে কিছু রুটি জ্যাম আর ফল কিনে নিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি মহিলার মুখ ভার কারণ আমি বাইরে একা একাই ঘুরে আনন্দ করে এলাম বলে। কত যে আনন্দ করে এলাম তা আমি নিজেই বুঝি। মহিলারা সবাই সমান, ঘরে বাইরে, বিদেশে এঁদের কোন প্রভেদ নেই। তাই কোন জবাব না দিয়ে আহারে মনোনিবেশ করতে বসি তা নাহলে টুর পাওয়া যাবে না।

তিনি আর কোন কথা উচ্চবাচ্য না করেই তাড়াতাড়ি আহারে মনোনিবেশ করলেন। আমরা ব্রেকফাষ্ট খেয়েই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভদ্রমহিলা আমায় হাঁটতে দেখে খুব ক্ষুন্ন যে হয়েছেন তা বুঝতে পারলাম। তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে চলেন। আমি তাঁকে পাটা একটু জোরে চালাতে বলি। তিনি তখন ট্যাক্সি খুঁজছেন। তিনি পদব্রজে যেতে খুব আপত্তি করলেন। মাইল খানেক রাস্তা ট্যাক্সিতে গেলে ট্যাক্সিওয়ালা আমার কাছ থেকে এক্ষুণি চারটী ডলার যে নেবে তা তাঁকে বুঝিয়ে বলি। তারপর টুরের কত খরচ তাও বলি। ভদ্রমহিলা আর দ্বিরুক্তি না করে আমার সঙ্গে সঙ্গে চললেন। অসলো শহরটী সমতল ভূমির ওপর নয়। কখনও নীচে নামছি কখনো উপরের দিকে উঠছি। মাইল খানেক পদব্রজে যাবার পর আমার স্ত্রী ট্যাক্সিতে ওঠবার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র দেখলাম। বুঝিয়ে বলি যে আমরা এসে গেছি। এখানে ট্যাক্সিতে উঠলে তারা আমাদের বিদেশী দেখে কয়েক মাইল বেশ ঘুরিয়ে তবে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এনে ফেলবে। তাতে খরচ খুবই বেশী পড়ে যাবে। একজন পথচারীকে হারবার কতদূর জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটী বড় বাড়ী দেখিয়ে বলেন যে ঐটী সিটি হল আর সিটি হলের পেছনেই হারবার: সেখানে টুরিষ্টদের জন্যে মোটর বোট দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকে বেশী দূর নয়। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলে হারবার এক মাইলের চেয়েও কম দূর। অতি সাবধানতায় আমি

সোজা পথ দিয়ে চলেছি কিন্তু এতটা দূর হয়ে পড়বে তা ভাবিনি। কথায় বলে যারা অতি সাবধানী তাদেরই বেশী বিপদ হয়। কপালের গুণে আমি সোজা রাস্তায় যেতে যেতে রাস্তা ভুল করে ঘুর পথে চলে এসেছি তাই আমাদের বেশ কষ্ট হ'ল। এদিকে বেশ কয়েকটী বড় বড় দোকান টুরিষ্টদের জন্যে সুন্দর করে সব জিনিষ সাজিয়ে রেখেছে। টুরিষ্টরা বেশ কেনাকাটা করছেন, আমার স্ত্রীর দৃষ্টি ওদিকে পড়েছে দেখলাম। যেখানেই উনি দেখতে ঢুকবেন সেখানেই উনি নাতি নাতনী বা নিজের ঘর সাজাবার জন্যে কয়েক ডলারের জিনিষপত্র কিনবেনই। মস্কো, (Moscow) হেলসিনকি আর ষ্টকহোম থেকে বেশ কয়েকটী ডলার খরচ করে জিনিষ' পত্র কিনেছেন। কিন্তু পকেটের ডলার ধীরে ধীরে কমে আসছে। যাক ভাবলাম, "যার টাকা নেই তার কেউ নেই।" আজকাল লোকে ঈশ্বরের চেয়েও ডলার বা টাকাকে ভক্তি করে থাকে। বাড়ীতে যার টাকা নেই, ছেলে মেয়ে বা জামাই সব পর হয়ে যায়, এ তো বিদেশে আমরা এসেছি। এদেশে এরা স্বামী বউ ছেলের চেয়েও আমেরিকান ডলারকে বেশী ভালবাসে, এই ডলারের কল্যাণে অপ্রাপ্য জিনিষও সহজেই প্রাপ্য হয়ে যায়। সেই ডলারের ঘাটতি আমার পকেটে, তাই পকেটটী টিপে টিপে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছি। ভদ্রমহিলা আর হাঁটতে পারছেন না, ক্রমাগত গজ গজ করতে করতে চলেছেন। "আরও হাঁটতে হবে?" বলে তিনি বেঁকে বসেন। "না আর বেশীদূর হাঁটতে হবে না। ঐ যে শহরের সবচেয়ে বড় বাড়ী সিটি হল, তার পেছনেই অসলো হারবার।" তিনি মুখ বুজে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। স্বামীর ওপর যে তিনি বেশ রেগে গেছেন তা প্রৌঢ়ার শ্বেতবর্ণের মুখের ওপর অস্তমিত সূর্য্যের লালিমার মত লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে, দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সিটি হলের পেছনে পৌঁছে গেলাম। সিটি হলের সামনেই একটী বড় উদ্যানের মধ্যে কয়েকটী স্মৃতিস্তম্ভ, কয়েকটী নগ্ন নরনারীর মূর্ত্তি, একটী মা ও শিশুর মূর্ত্তি কয়েকটী জলের ফোয়ারা আর উন্মুক্ত মাঠ রয়েছে। মাঠের ধারে ধারে জনসাধারণের বসবার জন্যে কয়েকটী বসবার আসন রয়েছে। দূরে ফিয়োডের জলরাশি নীল আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। বাগানটী পার হলেই ফিয়র্ডের পাশ দিয়ে চলে গেছে প্রশস্ত রাজপথ। রাজপথে প্রচুর যানবাহন চলাফেরা করছে। এরা সকলেই রাস্তার দক্ষিণ দিক দিয়ে গাড়ী চালায়। ফিয়োড হচ্ছে সাগরের উপকূলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অসমতল জায়গা। এই গুলির মধ্যে সাগরের জল অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেতরে ঢুকে গিয়ে জমি উর্ব্বরা করে দিয়েছে।

পদব্রজে আমার স্ত্রী খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তার ওপর নিরীহ স্বামী বেচারার ওপর খুব রাগও হয়েছে। আসতে আসতে বসবার স্থানগুলি দেখতে পেয়েই তিনি জোরে জোরে পা ফেলে বসবার জায়গাটী দখল করে আরাম করতে লাগলেন। আমাকে তিনি বসতে বলে একটু কার্টসিও দেখালেন না। আমি একটী বড় এয়ার ব্যাগে প্রায় পঁচিশসের ওজনের মাল নিয়ে ঘুরছি। আমিও বেশ ক্লান্ত অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার আর বসা হ'ল না কারণ হাতে আর সময় নেই, টুরের টিকিট কিনতেই হবে। তাই উনি যখন জোরে জোরে পা ফেলে ফেলে বসবার স্থান যোগাড় করে ফেললেন দেখলাম তখন আমি বেচারা বিশ্রাম না নিয়ে আরও জোরে জোরে পা চালিয়ে টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে লাইন দিলাম। আমার ভয় হয়েছিল, হয়ত টুরের টিকিটগুলো সব বিক্রি হয়ে যাবে।

এখন দশটা বেজে গেছে সাড়ে দশটায় মোটর বোট ছাড়বে। হারবারের কাছে আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের টুরিষ্টদের দলের লোকেরা সব দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। লাইন দিয়ে দুটী টিকিট পেলাম দাম নিলে একশত ত্রিশ অসলো ক্রোনার। স্ত্রী ও নিজেকে কষ্ট দিয়ে ট্যাক্সি ও খাবার খরচটা কমিয়ে দিলাম বটে কিন্তু টুরের খরচা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। আধ বেলার টুরটা নিলে হ'ত খরচ কমে যেত কিন্তু বেরালের ভাগ্যে শিকে

একবারই ছেড়ে দ্বার নয়। নরওয়েতে আবার আসব এ কল্পনাটা স্বপ্নের চেয়েও অলীক তাই দুটো টুরই নিলাম। নিজেদের শারীরিক মানসিক আর ক্ষুধার কষ্টটা নিজেরাই একরকম সামলে নিতে পারব, কারও দয়ার ওপর তা নির্ভর করবে না। কিন্তু ওদেশের লোক টুরের টিকিটের দাম কমিয়ে টুরিষ্টদের দয়া দেখাবে কেন? দু বছর পূর্ব্বে যা তারা নিত দু বছর পরে যা নিচ্ছে তাতে আকাশ পাতাল তফাৎ। এই কয়েক মাসই ত এ দেশের লোকেরা আমাদের মত যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ উপার্জ্জন করে থাকে। শীতকালে এখানে আর কোন টুরিষ্ট আসে না আর এরাও টুরিষ্টদের জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকে না। তাই এরা যতটা পারে টুরিষ্টদের কাছে থেকে এই সময়ে শোষণ করে থাকে।

টিকিট কাটার পর গিন্নীকে হাতছানি দিয়ে তাঁকে এদিকে আসতে বলি কারণ মোটর বোটটী ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে আর ভাল ভাল বসবার আসনগুলি লোকেরা দখল করতে আরম্ভ করেছেন। উনি আমার হাতছানির ডাকটা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে আসতে থাকেন। কাছে এসে দেখি ভদ্রমহিলার মুখ ভার। বুঝতে পারি তাঁর খুবই পরিশ্রম হয়েছে। বাড়ীতে একপাও হাঁটেন না, বাড়ীতে মোটর কার আছে। মেজ মেয়ে মাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে। তিনি সবই বুঝতে পারছেন যে শতদোষ হচ্ছে নিজের দেশের সরকারের। সরকার এক টি এস এ (ফরেণ ট্রাভেল স্কীম) বিদেশ বেড়াবার জন্যে লোকের টিকিট কেনবার টাকা ছেড়েছেন আর তাদের বিদেশে গিয়ে হোটেল ভাড়া, খাওয়া খরচ ও টুরের খরচের জন্য শুধু একশত ডলার সরকার হাতে দিয়েছেন। এই একশত ডলারে যে গোটা তিনেক দেশের খরচ শুধুই চলে সেটা তাদের জানা উচিত ছিল। আমরা ওদের প্লেনে দিল্লী থেকে মস্কো যাই নি বলে ঐ একশত ডলারও আমরা পাই নি। এয়ার ইণ্ডিয়া পাকিস্থানের গোলমালের জন্যে দিল্লী থেকে মস্কো পাড়ি দিচ্ছিল না। রাশিয়ান বিমানে করে যাত্রা করেছিলাম বলে এরোফ্লোট কোম্পানী আমাদের মস্কো ও হেলসিঙ্কির যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। আমেরিকা প্রবাসী সেজ মেয়ে আমাদের ফিনল্যাণ্ডে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বলেই আমরা অন্যান্য দেশগুলি দেখে আসতে পেয়েছিলাম।

মোটর বোটটা আনকোরা নতুন আর খুবই সুন্দর দেখতে। আমার স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল দেখে বুঝতে পারলাম যে ওখানে বিশ্রাম করে ক্লান্তির কিছুটা অপনোদন হয়েছে আর নতুন মোটর বোটটি দেখে তাঁর ভালও লেগেছে। বোটে গিয়ে আমরা দুটী আসন দখল করলাম। বোটের ওপরটা সব খোলা, মাথায় কোন ছাউনি দেওয়া নেই। সকালেও বৃষ্টি ঝির ঝির করে পড়ছিল কিন্তু এখন আর বৃষ্টি নেই। দূরের নীল আকাশে মেঘগুলো যদিও খণ্ড খণ্ড হয়ে ভাসছে, তবে বৃষ্টি আর হবে বলে মনে হচ্ছে না। সূর্য্যদেবের আগমনে টুরিষ্টদের মধ্যে একটু চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সূর্য্যদেব দেখা দিয়েছেন। এই প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ ঢাকা দেবার জন্যে অনেক মহিলারা মাথায় স্কার্ফ বাঁধতে শুরু করলেন। আর আমার স্ত্রী মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিলেন। পুরুষদের শক্তি অসীম তাই আমরা সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে বসে সূর্য্যদেবকে চ্যালেঞ্জ করলাম। ধীরে ধীরে মোটর বোটের সমস্ত আসনগুলি ভর্ত্তি হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে একজন চব্বিশ পঁচিশ বছরের তন্বী যুবতী মেয়ে। তার পরণে ছিল নবম শতাব্দীর ভাইকিংদের মেয়েদের মত পোশাক। পিঠে ঝোলানো লম্বা বেণী, সবুজ বর্ণের অক্ষিগোলক আর গোলাপী রঙের লম্বা চেহারা তার সঙ্গে ছিল মিষ্টি হাসি। যার জন্যে তাকে আমাদের সকলেরই ভাল লেগেছিল। মেয়েটী আমাদের গাইড, নামে ক্রিষ্টি। সে ছিল অসলো ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের ছাত্রী। সে ইংরেজী আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনর্গল কথা বলে আমাদের সমস্ত টুরটী বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

আমাদের মোটর বোটটী হারবার থেকে ছেড়ে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে এগুতে লাগল। আর ক্রিষ্টিও

এক-এক করে তার বর্ণনা করতে করতে চললো। আমাদের সামনের যে সিটি হলটা ছেড়ে এলাম এটা নরওয়ের নয়শতবর্ষ বার্ষিক উৎসবে ১৯৫০ সালে তৈরী হয়। এর মধ্যে অনেক পুরাকালের ঐতিহাসিক জিনিষ পত্তর রাখা হয়েছে। অনেক টুরিষ্টরা ওর মধ্যে গিয়ে দেখে অসেন। আমরা Fishing Port-এর পাশ দিয়ে এগিয়ে চল্লাম। মাছ ধরার কৌশলে দেখলাম। এখানে এত মাছের আঁশটে গন্ধ যে আমরা আমাদের নাক রুমাল দিয়ে ঢাকতে বাধ্য হলাম। এত মাছ ধরা হচ্ছে সব চালান দেবার জন্যে। অসলোতে মাছের দাম অত্যাধিক,সেজন্যে ওখানে আমাদের মাছ খাওয়া হয়নি। আমরা সব দেশেই মুরগীর মাংস খেয়ে খেয়ে এসেছি। মুরগীর মাংস যেতেও ভাল আর দামেও কম। মস্কোতে বার দুই মাছ ভাজা খেয়েছিলাম। দাম এখানকার চেয়ে সস্তা ছিল। বিদেশে গরুর মাংসটাই খুব সস্তা আর সকলেরই প্রিয়। আমাদের মত লোকের বিদেশে বেড়াতে আসা উচিত হয় না কারণ আমাদের খাবার জিনিষের বড় বাছ বিচার ছিল। অনেক সময়ে বিমানে ঐ সব হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস পরিবেশন করেছে, আমরা সেই সব খাদ্য ছুঁতাম না। তার ফলে আমাদের অনাহারী থাকতে হ'ত। তবে অনেক সময় ষ্টুয়ার্ডেসরা মাংসের পরিবর্তে আমাদের রুটী মাখন জ্যাম, ফল খেতে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আমাদের জন্যে বেশ দরদ ছিল দেখতে পেতাম। অনেকে আবার আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না।

আমাদের বোট চলেছে ধীরে ধীরে কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপের পাশ দিয়ে আর আমাদের গাইড ক্রিষ্টি অনর্গল তার বর্ণনা দিতে দিতে চলেছে। এর মধ্যে আবার একটা ছোট্ট চা ও কফির ষ্টল খোলা হয়েছে। সেখানে সব কিছু পাওয়া যায় যেমন, চা, কফি, বিস্কুট, কেক, টফি, চকোলেট, কোক, পেপসি। তবে এই সবের দাম বাজারদরের চেয়ে চারগুণ বেশী। অল্প একটী মেয়ে প্রত্যেক টুরিষ্টকে জিজ্ঞাসা করে চা, কফি, কোক বা বিস্কুট দিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে দামও নিয়ে নেয়। অনেক আমেরিকান ত কোন 'জিনিষের অর্ডার দিলেন না। তাঁরা জিনিষের দাম শুনে আঁৎকে ওঠেন। আমি সরাসরি তাঁদের জিজ্ঞাসা করে ফেলি "এগুলো কি আমেরিকায় সব সস্তাদরে পাওয়া যায়?" আমার কথার প্রশ্নে তাঁরা আমার দিকে তাকান। আমি আবার তাঁদের বলি যে আমি ষ্টেটসে যাচ্ছি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বল্লেন, "না সস্তা হবে কেন? এখানকার চেয়ে ও ওখানে আরও তিনগুণ বেশী দাম হবে। তবে সে আমেরিকা আর এ নরওয়ে, গরীবের দেশ।" কথাগুলো শুনে আমার বেশ খারাপ লাগল।

আমি মেয়েটীর কাছ থেকে একটী কোক নিলাম আর আমার স্ত্রী নিলেন এক কাপ গরম কফি। মেয়েটীকে দাম মিটিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে বাংলায় আর কিছু না নিতে বল্লাম। তিনিও দাম শুনে সত্যই অবাক্ হয়ে যান। তিনি যে এখন দামের মহিমাটা বুঝতে পেরেছেন তা জেনে আমি সুখী হলাম। আমার স্ত্রী আমার সামনে জলের ধারে বসেছেন আর আমি তাঁর পেছনে। মুভি ও অন্যান্য দৃশ্য তুলতে একটু সুবিধা হবে বলে সেই স্থানটী আমি পছন্দ করেছিলাম। আমার বাঁ পাশে একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের ইংরেজ যুবক বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেই হয়, তা না হলে ভাল দেখায় না। খোদ ইংল্যাণ্ডের লোক, আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহাপ্রভুদের বংশোদ্ভব। গিন্নী আমাদের কথা একটু একটু সামনে বসে শুনছেন। খোদ ইংল্যাণ্ডের লোক শুনে আমার গা টিপে জানালেন যে আমি ওর সঙ্গে যেন আবোল তাবোল ভাবে রাজনীতি চর্চ্চা না করি। বিদেশে বেড়াতে চলেছি। লোকের সঙ্গে এতদিন ভাষা বিভ্রাটের জন্যে কথা কইতে না পেরে আমার পেটটা ফুলছিল, এখন এঁর সঙ্গে কথা কয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এঁর সঙ্গে বেশ কথা হলো। বাড়ীর খবর, দেশের খবর, কাজ কর্ম্মের খবর তিনি আমার সব প্রশ্নের উত্তর বেশ ভাল ভাবেই দিলেন। এখনও ইংরেজেরা বেশী

কনজারভেটিভ কি না জানতে চাইলাম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তর দিলেন যে পূর্ব্বের ইংরেজ আর এখনকার ইংরেজের ছেলেদের মধ্যে তুলনা করা চলে না। এরা এখন পুরাতনদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। আমি নিজে ত যাচ্ছি সেখানে, গেলেই সব পরিবর্ত্তন আমরে চোখে পড়বে বলে জানালেন।

আমাদের মোটর বোটটী Hovedoya আর Bleikoya দ্বীপ দুটীর মধ্যে দিয়ে Gresshl আর Langoya দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এখানে অনেকগুলি ছোট বড় বাড়ী হয়েছে। আর প্রত্যেক বাড়ীর বাগানের মধ্যে নানা রকমের ফুলগাছ, অন্যান্য গাছ আর সেই সব গাছে অসংখ্য নানা রঙের ফুল ফুটে বাগানটীকে সুন্দর করে তুলেছে। মোটর বোটের মধ্যে ক্যামেরার ক্লীক্ ক্লীক্ শব্দ আর হৈ হল্লা চলেছে। সকলেই আনন্দে বিভোর। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ফোটো নিচ্ছে। এখানে সাদায় কালোয় কোন প্রভেদ দেখলাম না। আমাদের সঙ্গে অনেকে উপযাচক হয়ে কথা কইতে এলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অনেকের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এঁরা বেশীর ভাগই আমেরিকান টুরিষ্ট। ওঁরা খুব হৈ হল্লা করতে ভালবাসেন আর প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলে চলেছেন। আমরা ওঁদের ফোটো তুলে দিলাম। আমাদেরও ওঁরা আমাদের ক্যামেরাতে ফোটো তুলে দিলেন। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বেশ কয়েকটী প্লেন উড়ে চলে গেল। এখন বুঝতে পারলাম যে এই ফিয়োর্ডের ওপর দিয়েই বিমান বন্দরে নেমেছিলাম।

ক্রমশঃ

৺ভূপতি মজুমদার

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সেকালের আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার গত ২৭শে মার্চ পরলোক গমন করলেন।

পরিচয় সম্বন্ধে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। সম্পর্কে তিনি আমাদের পরিবারের একজন কুটুম্ব ছিলেন।

সেকালের মতই তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আমার কয়েক বছর আগেও ছিল না। সহসা 'প্রবাসী'তে লেখা সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আলাপ ও পত্রালাপ হয়।

তারপর একদিন দেখা করতে আসেন গড়িয়াহাট রোডে শ্রীযুক্ত শৈবাল গুপ্তের বাড়ী।

অনেক গল্প শোনার পর বলেছিলাম, এই সব বিগত দিনের কিছু স্মৃতিকথা লিখে রাখুন না। কিংবা প্রকাশ করুন না।

লোকে জানতে পারবে সেকালের বিপ্লব ও বিপ্লবীর দেশমর্মীর কত কাজের কথা। আশা কল্পনার কথা। যে কথা প্রায় ৭০ বছর আগের ইতিহাস। একটু হেসে বলেছিলেন, দেখি, কি করতে পারি।

লোকান্তরের পর ২রা এপ্রিল গেলাম বাড়ীতে দেখা করতে। নাঃ, লেখা আছে কি না তাঁরা জানেন না। হয়ত আছে। নয়ত নেই। ভাই শৈলেশ

মজুমদার বললেন, "দাদা বলতেন আমার কথা আর কি লিখব, তোমরা যতীনদার (বাঘা যতীন) কথা খুঁজে লেখ।"

অথচ তাও তো তাঁরই স্মৃতির কোটরের মধ্যে থেকে আমাদের পাবার কথা। এবং একটী দুটী মানুষের পিছনে পাশেও তো অনেক লোক ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে তাঁদের বাড়ীর যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।"

শৈলেশ বললেন, আমাদের হুগলীর বাড়ীর কাছাকাছি একটী বাড়ীতে যতীন মুখুজ্যেরাও ছিলেন। আর আমার এক ভাই, তাঁরও নাম যতীন ছিল, দুজনে খুব বোধ হয় ভাব হয়ে যায়। অনেকদিন পরে মেজদাদা (ভূপতিবাবু) যখন বি. এ. পড়েন তখন একদিন যতীন দাদা (বাঘা যতীন) বাবা আর মাকে এসে বলেন, 'আপনাদের তো আরো ছেলে আছে, একজনকে ভূপতিকে আমাদের কাজে দিয়ে দিন্‌না।'

পিতা নীলকণ্ঠ মজুমদার, তখন হুগলী জেলা কোর্টের একজন বড় উকীল। প্রস্তাবটা তাঁর ভালো লাগল না।

ছেলে কৃতী হবে—খ্যাতিতে বিত্তে সংসারে পুত্র-কলত্রে। পুত্র বিত্ত যশ কাম্য চিরকালের। সম্মতি দিলেন না।

সেকালের জননী। কিন্তু মত দিলেন। তাঁর নামটী জানতে পারিনি। মনে পড়ল তিব্বতীদের একটী সন্তানকে লামা করে দিতে হয়। কর্মে উৎসর্গিত হন।

সেকালের ঐ ধরণের সকলের মতই এই বিপ্লবপন্থীও জেলে যেতে পারেন। লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পথে পথে ঘুরবেন আশ্রয়হীন ভাবে। বিশেষ অপরাধ করলে দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসীও যেতে পারেন।

এসব দেশসেবীরা কোনো পুরস্কার বা মন্ত্রিত্বের অথবা 'ভাতা' 'তাম্রপত্র' পেনশনের কথা ভাবতে জানতেন না।

পরে তখন মন্ত্রী। মন্ত্রিত্ব প্রসঙ্গে একবার লিখলেন চিঠির জবাবে ৭।১১।৬৮........."আপনার মন্ত্রীর ব্যাখ্যা আমি আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছি। 'মনকে' 'ত্রি'ভাবে ভাগ করে নিতে হবে। জনসমাজে যে মন—তাকে দরজায় রেখে মন্ত্রীভবনে কাজ করতে হবে। আর মন্ত্রণা ভবনের মনকে সেই ভবনেই রেখে তার দ্বার বন্ধ করতে হবে। আর ১৷৩ অংশ দলীয় ভবিষ্যৎ স্বজন বন্ধুবান্ধবের ভাবনায় নিয়োজিত রাখতে হবে। এ ত্রিধা বিভক্ত মন নিয়ে যে চলতে পারে সেই মন্ত্রিত্বে পাকা হয়।............

"মেয়েরা গত শতকে নানাদেশে সকল সাহিত্য ও শিল্প কর্ম কাব্য সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের তুলনায় সংখ্যায় কম। দৈহিক তথা মানসিক কারণ সংসার বজায় রাখা দায়িত্বে কম বেশী সুযোগ আছে বৈকি।

এক অংশ অপর অংশকে "নদীর এপার ওপারকে সব গৌরবের অধিকারী মনে করে বৈকি...... ।

"রবীন্দ্রনাথের কথা আসবার সময়ে ইষ্টেষনে মালপত্র পোটলা পুঁটলী কিছু কিছু বদল হয়ে যায়......।"

লোকটী সাহিত্যরসিকও ছিলেন।

এবং সেকালের মানুষের মতই 'প্রবাসী' পত্রিকার ওপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল। তার নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

'প্রবাসী' যখন আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে তখন প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌহার্দ্যও ছিল। একবার পত্রে লেখেন।

বিপ্লবী জীবনের দুঃখ কষ্ট গ্রাহ্য করেননি। তখন পুরস্কারের কল্পনাও করেননি।

সংসার যাত্রা বা জীবন যাত্রায় কোনো ক্ষোভ অভাব বোধ এই ৮৩ বছরের আনন্দময় পুরুষের ছিল না।

"কি পাইনি তার হিসাব" নিকাশ তিনি না করেই মুক্ত পথিকের মত সহজ পায়ে দীর্ঘ আশী বছরের পথ অতিক্রম করে চলে গেছেন।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন :—

আগামী ১৯২৬ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে সংশোধন সাপেক্ষে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুসারে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টি পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত হবে। বিধান পরিষদে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউনসিলে কংগ্রেসীদের সাধারণ নীতি হবে সরকারের যে সকল কাজ জাতির অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা করবে তা দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া এবং প্রতিরোধ করা এবং বিশেষ করে কংগ্রেসী সদস্যগণ গভর্ণমেন্টের নিকট থেকে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত (ক) গভর্ণমেন্টের কোন পদ গ্রহণ না করা (খ) ওয়ার্কিং কমিটীর অনুরূপ নির্দেশ বিনা অনুরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের ব্যয় মঞ্জুর এবং বাজেট পাশ-না করা (গ) আমলাতন্ত্র তাদের ক্ষমতা দৃঢ় করার জন্য যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করবে তা নাকচ করা (ঘ) জাতির শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতি, কৃষি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির প্রয়োজনে প্রস্তাব ও বিল উত্থাপন করা (ঙ) কৃষিজীবী রায়তদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য জমিদারদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে রায়তী স্বত্বের স্থিতাবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করা এবং (চ) সাধারণ ভাবে কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা এবং ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের এবং শিল্পপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা।

মাননীয় রামদাস পান্টলু এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাঃ মুঞ্জে মূল প্রস্তাবের পরিবর্তে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে—কানপুর কংগ্রেসের ৭নং প্রস্তাবানুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলি বিভিন্ন বিধানসভার সদস্যপদ দখল করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে যতদূর সম্ভব সমস্ত পদগুলির জন্য কংগ্রেস থেকে পদপ্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক যাতে আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসীরা স্থায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে।

বিভিন্ন বিধান সভাগুলি অচল করার উদ্দেশ্যে স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিরামহীন বাধাদানের কর্ম্মসূচী পরীক্ষা মূলক ভাবে গ্রহণ করা হোক। বিরামহীন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে গভর্ণমেন্টের সকল কাজ, তা ভাল মন্দ যাই হোক না কেন, তা বাতিল করা এবং কোন প্রস্তাব বা বিল উপস্থিত না করা বা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করা যাতে মনে হতে পারে গভর্ণমেন্টের আমলাতান্ত্রিক অনাচার উৎপাটনের পরিবর্তে কাউনসিলে সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং বিধান সভা বা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক গঠিত কোন কমিটীতে আসন গ্রহণ না করা।

সাধারণ নির্ব্বাচনের পর অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসীরা সংখ্যাধিক্য অর্জনে অপারগ হলে এই কমিটী সুপারিশ করছে যে বিভিন্ন বিধান সভার কংগ্রেস পার্টিকে একক ভাবে অথবা সংশ্লিষ্ট কাউনসিলের অন্যান্য জাতীয় দলের সঙ্গে একত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের অনুমতি দেওয়া হোক যার অর্থ হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব গভর্ণমেন্টের বর্তমান শাসন যন্ত্র দখল করা যার ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং গভর্ণমেন্টের কার্য্যে বাধাদানের শক্তি অর্জন হবে।

অভয়ঙ্কর আইনগত আপত্তি তুলে বললেন—যে গভর্ণমেন্টের কোন চাকুরি গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং এই প্রস্তাব 'আউট অব অর্ডার'।

মৌলানা মহম্মদ আলী অভয়ঙ্করকে সমর্থন করলেন।

সভানেত্রী মহোদয়া প্রস্তাবটি আউট-অব-অর্ডার ঘোষণা করলেন।

আরও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায়

পর কানপুর কংগ্রেসে নিযুক্ত বিশেষ কমিটী প্রাদেশিক বিধান সভা বর্জন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বরাজ্য কাউনসিলের অনুরোধ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

যুক্তপ্রদেশ এ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কমিটী স্থির করল যে বর্তমানে যুক্তপ্রদেশ কাউনসিলে প্রজাসত্ব ও রাজস্ববিল এবং বঙ্গীয় বিধান সভায় প্রজাস্বত্ব ও রাজস্ব বিল এবং বঙ্গীয় বিধান সভায় প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপিত হয়েছে। এগুলি কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে খুব গুরুতর সুতরাং যখন ঐ বিলগুলি বিবেচনার জন্য বিধান সভার অধিবেশন হবে তখন স্বরাজী সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট কাউনসিলের অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল।

বোম্বাই কাউনসিলে উন্নতি মূলক বাজেট—(বম্বে পরিকল্পনা) এবং ট্যাক্স বিল অগ্রাহ্য করার জন্য স্বরাজী সদস্যগণকে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল।

আসাম ও মাদ্রাজের স্বরাজীদের তাঁদের বিধান সভায় যোগদানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হল।

॥ ৪ ॥

৯. ৩. ২৬ তারিখে মধ্য প্রদেশ বিধান সভা মন্ত্রীদের বেতন না মঞ্জুর করায় তথাকার মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটল।

এই রকম সময়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে আর একটি নূতন দলের সৃষ্টি হল। ২৫শে মার্চ দিল্লীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টী গঠিত হল। পার্টীর নাম হল 'ন্যাশনালিষ্ট পার্টী'। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ রাজনৈতিক, নাগপুর কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিজয় রাঘবাচারিয়া। রাজা স্যর রামপাল সিং, লালুভাই শ্যামলদাস (পরে স্যর উপাধিভূষিত—গগনবিহারীলাল মেহেতার পিতা), লালা রামশরণ দাস, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, বি. দাস (ওড়িশার তৎকালীন নেতা), পণ্ডিত শ্যামলাল নেহেরু (পণ্ডিত মতিলালের ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রভৃতি নূতন পার্টীর সদস্যগণ সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বড়বাজারের একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহকারে আর্য্যসমাজের শোভাযাত্রা উপলক্ষে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। একটি হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা হয় এবং তার মধ্যকার দেবমূর্তি ভগ্ন করা হয়। এই হাঙ্গামায় শতাধিক ব্যক্তি হতাহত হয়। তদানীন্তন কলকাতার পুলিশের ডেপুটী কমিশনার পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী (ইনি পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন এবং বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কার্য্যকলাপের জন্য কুখ্যাত হয়েছিলেন) এই দাঙ্গা ব করার জন্য প্রশংসাজনক কাজ করেছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ নাখোদা মসজিদের অভ্যন্তরে লুকায়িত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ বাহিনী সহ উক্ত মসজিদে চড়াও হওয়ার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। বিশেষতঃ তদানীন্তন বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য স্যর আবদর রহমনের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। ফলে তাঁকে পুলিশের চাকুরি থেকে বিদায় নিতে হয়।

এই দাঙ্গার জের পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল ও কুমিল্লাতে চলেছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া বিহারের পাটনা শহরে এবং অন্যত্রও দেখা দিয়েছিল।

কলকাতার দাঙ্গা সাময়িকভাবে থামলেও পুনরায় বড় বাজারে দেখা দিল। ১৯২৬ সালে গোটা এপ্রিল মাস উত্তর কলিকাতায় ভীতির রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল।

এই দাঙ্গার সময় প্রথম দেখা গেল যে হিন্দুরা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যখন একদল উন্মত্ত মুসলমান জনতা—লোয়ার সার্কুলার রোড (বর্তমান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) থেকে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট (বর্তমানে কেশবচন্দ্র ষ্ট্রীট) দিয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের (বর্তমান রামমোহন রোড) দিকে এগিয়ে আসছিল তখন—চন্দ্রকান্ত এবং যতীন্দ্রনাথ নামক দুজন সাহসী যুবক তাদের প্রতিরোধ করে লোহার ডাণ্ডা হাতে এগিয়ে গেল। পশ্চাতে অন্যান্য লোকদের সঙ্গে একদল কালোয়ারও লোহার ডাণ্ডাসহ

তাঁদের অনুগমন করছিল। আমহার্স্ট ষ্ট্রীট ও মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে এই প্রতিরোধের মুখে আক্রমণকারীরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং পশ্চাৎ অপসরণ করল। কিন্তু অতিশয় পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এই দুই বীর চন্দ্রকান্ত এবং যতীন্দ্রনাথ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট ও মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে অবস্থিত একজন বড়লোকের বাড়ীর ছাদ থেকে তাঁদের গুলি বর্ষণ করে হত্যা করা হল। এই ভাবে দুই বীরের জীবনাবসান ঘটল। বাড়ীর কর্তা জনৈক হিন্দু। বোধ হয় কর্তৃপক্ষের কৃপালাভের আশায় তার এই দুষ্কর্মে মতি হয়েছিল। এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকের প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে সেই বাড়ী ত্যাগ করে দক্ষিণ কলিকাতায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার উপায় অবলম্বন করার জন্য বৌবাজারের ভারত সভা গৃহে ৩০শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যর আবদার রহিম, ডঃ আবদুল্লা সুরাবর্দী, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বর্ধমানের মহারাজা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, এইচ্. এম্ সুরাবর্দী, প্রভৃতি।

আলোচনান্তে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হল।

॥ ৬ ॥

দেশ ও কংগ্রেসকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক সর্বদলের একটি সভা সবরমতী আশ্রমে আহূত হল।

দুই দিন ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হল :—

অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীরা একমত হল যে ১৯২৬ সালের ৬ই ও ৭ই মার্চ তারিখের অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে গৃহীত। প্রস্তাব অনুসারে প্রদেশ সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হবে যদি সাফল্যের সহিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপর ভার দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এই সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং ইনিসিয়েশন পর্য্যাপ্ত কি না তা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু জয়াকরকে নিয়ে গঠিত কমিটীর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেই প্রদেশের বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্যগণ। আরও স্থির হল যে, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, বেরার এবং মারাঠী মধ্য প্রদেশগুলিতে প্রার্থী নির্বাচন সম্বন্ধে বিরোধ উক্ত কমিটী মীমাংসা করবে। এই চুক্তি নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিয়েছেন এবং এই চুক্তি অনুমোদনের জন্য স্বরাজ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা পার্টিগুলির নিকট পেশ করা হবে এবং আগামী ৫ই ও ৬ই মে তারিখে সবরমতীতে আহূত অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হবে। ইতি—সরোজিনী নাইডু, মতিলাল নেহেরু, লাজপত রায়, এম্. আর. জয়াকর, এন্. সি. কেলকার, বি. এস্. মুঞ্জে, এম্. এস্. আনে, ডি. ভি. গোখলে, জি. এ. ওগলে।

সবরমতী—২১/৪/১৯২৬

কিছুদিন পরে বোম্বাই শহরে পারস্পরিক সহযোগীর দল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নিকট থেকে একটি প্রস্তাব পেলেন তাতে সবরমতী চুক্তির নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা তা মেনে নিতে পারলেন না এবং সবরমতী অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন, পরে তাঁরা মত পরিবর্তন করে ৫ই মে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে উপস্থিত হলেন বটে কিন্তু সবরমতী প্যাক্টটি ভেঙ্গে গেল।

॥ ৭ ॥

এই রকম সময়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হল। আলী

ভ্রাতৃদ্বয় এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের অভিযোগ খণ্ডন করে ১লা মে তারিখে স্বামীজী একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তাতে তিনি বলেন যে খিলাফতের অবসানের পর খিলাফৎ কমিটীর প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এখন খিলাফৎ কমিটীর অস্তিত্ব রাখার কোন মানে হয় না। দেখা যাচ্ছে যে উভয় আলী-ভ্রাতাই গোঁড়ামির স্বপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত যদি তা দ্বারা খিলাফৎ কমিটীর তহবিল বৃদ্ধি করা যায়। স্বামীজী ঘোষণা করেন যে মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও যদি এ সম্বন্ধে খিলাফতীদের সঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হলেও তাঁদের সিদ্ধান্তে কেউ কর্ণপাত করবে না। তিনি তাঁদের নিকট আবেদন করেন যেন তাঁরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি মুসলমান নেতা এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় উদ্ভাবন করেন।

৪ঠা মে তারিখে একটি সভায় মৌলানা মহম্মদ আলী অন্যান্য কথার পর বলেন যে কতকগুলি বিবেচনাহীন হিন্দু কলকাতা শহর থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল। যখন মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন তখন তাঁরা কিরূপে নীরবে থাকবেন।

ক্রমশঃ মৌলানা মহম্মদ আলীর সুর চড়তে লাগল। বোম্বাই শহরে ১২ই মে একটি মুসলিম জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে ইসলাম বিপন্ন এবং যারা তা ধ্বংস করতে চায় তাদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে। তিনি কোরাণের বাণী উদ্ধৃত করে বললেন তারা হিন্দুদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছে। হিন্দুরা যদি তা গ্রহণ না করে সংগ্রাম করতে চায় তা হলে ভারতের ৭ কোটি মুসলমান ২৩ কোটি হিন্দুকে পরাজিত করবে।

অনুরূপ উক্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৌলানা শওকত আলী ১০ই মে তারিখে বোম্বাইতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন।

১৯০৬ সালে সমস্ত বৎসরই ভারতের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বাদ্যভাণ্ড সহকারে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় খড়্গপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। ফলে একজন হিন্দু রুটি-প্রস্তুতকারক নিহত হয়।

ক্রমশঃ

নেট বাবু

গোপাল ভট্টাচার্য

হাফ-প্যান্ট পরার বয়স থেকেই ওঁকে আমি চিনি। অনেক মানুষকেই তো আমি চিনি। কারুর মুখের অদ্ভুত গড়ন, কারুর নাক, কারুর বা চোখ আমায় আকর্ষণ করে, আমার মনে ছাপ ফেলে, অনেক পরে দেখলেও চিনতে পারি। তার ওপর আছেন আত্মীয়—তার আবার দূর সম্পর্কের, নিকট সম্পর্কের—উপরন্তু বন্ধু-বান্ধব; তাহ'লে চেনার জগৎটা নেহাৎ কম কী। এঁকে কিন্তু আমি অন্য ভাবে চিনি।

সে এক বিচিত্র ধরণের চেনা। ওকে দেখলেই সবে ফুল-প্যান্টস-ধরেছে-এমন ছেলেরা, বয়স কিছু হয়েছে এমন যুবকেরা ওকে দেখিয়ে বলত, "অয় 'নেট' বাবু চলেছেন।"

বড়ো অদ্ভুত নাম, খটকা লাগাই স্বাভাবিক। বোকার মতো বড়োদের দিকে চেয়ে থেকে ('নেট'বাবু আবার কী!), পরে জিজ্ঞেস ক'রে জানতে পারি, ভদ্রলোক ফুটবল খেলার পয়লা নম্বরের ভক্ত, আর মুখে যেন 'নেট' ছাড়া কোনো কথা নেই। ব্যাপারটা একটু ভিন্নরকম। তা এই: কলকাতার একটা নাম করা ক্লাবের উনি সমর্থক, গোঁড়া সমর্থক বললেও ভুল বলা হবে না। আর তাই জন্য ফুটবলের মরশুমে কেউ যদি ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, 'খেলার ফল কী হবে!' অমনি ডান হাতের দু'আঙুল—তর্জনী ও মধ্যমা—উঁচিয়ে বলবেন, "দুখানা 'নেট' করবেই।" আর অত্যন্ত নরম বা দুর্বল বিপক্ষ থাকলে তিনটে, কী চারটে আঙুল উঁচিয়ে বলবেন, "কমসে কম এতগুলো তো হবেই।" আর একটা কথা ঠিক, 'নেট' বাবু কোনোদিন অন্যমনস্ক ভাবেও ব'লে ফেলেন নি ওঁর টিম নেট করতে পারবে না, কিংবা ড্র করবে, বা হেরেও যেতে পারে। ওর টিম 'নেট' করবেই, নিদেন পক্ষে একখানা তো নিশ্চয়ই।

মুখে মুখে গল্পটা চালু হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে একদিন ভদ্রলোকের নামকরণ হয়ে গেল 'নেট' বাবু আর এমন নাম, ওই নামেই ওকে চিনে ফেললাম।

ভাব'লে এই নামকরণের জন্য যে রাগ-তাপ করা চেঁচামেচি, ওসব কিচ্ছুটি ছিল না, বরং আনন্দ ছিল ভাবখানা এইরকম: এই ছাখো তোমরা, আমি ক্রীড়ারসিক ব'লেই আমায় অমন নাম দিয়েছে ফুটবল খেলাকে আমি ভালোবাসি 'লেই আমা আদুরে নাম হয়েছে 'নেট' বাবু।

কেবল প্রথম প্রথম ওই নামে কেউ ডাকলে মুখ-মণ্ড শিউলি ফুলের মতো হেসে উঠতো। ক্রমে ক্রমে শিউলি ফুলের হাসি গেল; এখন অবশ্য ওষ্ঠও অধ সামান্য সরে যায় দাঁতের পাটি-দুটোকে দৃশ্যমান করা জন্য।

'নেট' বাবু কানে সামান্য খাটো। শুনতে পান তবে কিছু জোরে বললে তবে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন। তাই কেউ কথা বললে একটু জোরেই বলে কিছু বেশী জোরও হয় সময় সময়, কিন্তু 'নেট' বা কোনো সময়ে ভাবেন না, কেউ তাঁকে অপমান করছে কানে কম শোনেন ব'লে ওঁকে নিয়ে হাসাহাসি যে কে করত না, তা নয়, বরং হাসাহাসি করত যারা করার কিন্তু 'নেট' বাবু কিছুই গায়ে মাখতেন না। এ ব্যাপা

এক খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাবের পরিচয় দতেন।

অথচ আশ্চর্য্য পাঁচ নম্বরের ফুটবলে কোনোদিন পা ছোঁয়ান নি উনি।

অবশ্য 'নেট' বাবুর ভাবনার মধ্যে, খেলার ামালোচনার মধ্যে পক্ষপাতিত্বের অপরাধ থাকত। মার তা থাকলে ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। অন্ততঃ ওনার তা হত। সকলের তা হয় না যদিও। কেউ কেউ আছেন যাঁদের মনের পক্ষপাতিত্বের অপরাধ বুকের চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে রাখেন, কণ্ঠের বেড়া টপকে সেসবকে জিবের ডগায় আসতে দেন না। উনি তা পারতেন না। উপরন্তু জিবের আগায় লেগেই থাকত, 'দুখানা তো 'নেট' হবেই। নিদেন পক্ষে একখানা. নিশ্চিত।"

কিছু ফলত, কিছু ফলত, না। তাতে কী? সমস্ত কিছুই কি ঠিক ঠিক ফলে। তাহ'লেও ওঁর এই যুক্তিহীন আত্মবিশ্বাস এবং নিজের প্রিয় টিমের প্রতি অহেতুক ভালোবাসা টলত না।

বোধ করি মানুষ মাত্রেরই একটা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, ঠিক মতো তার অনুশীলন হ'লে, সুযোগ সুবিধে পেলে সেটা বিকশিত হয়। না হ'লে 'নেট' বাবু হয়ে যায়। ওটাকে ধরা চাই, ওই বৈশিষ্ট্যকে। ওটাকে উস্কে দেওয়া চাই। উৎসাহিত করা চাই। অন্ততঃ 'নেট' বাবুর ক্ষেত্রে তা হয় নি।

কেননা তবু বাপ যতদিন জীবিত ছিলেন যৎসামান্য কিছু আনছিলেন চানাচুর, শোনপাপড়ি, বরফ ইত্যাদি বিক্রী ক'রে। হঠাৎ ধড়কা মড়কা জ্বর এলো একদিন, টোটকা টুট্‌কি করতে করতেই ওঁর চোখের সামনে বাবা নিথর হয়ে গেলেন এক রাতে।

এবং তখন, যখন বাবা জীবিত ছিলেন, উনি বল্ খেলতেন, রবারের বল। আরও একটু বড়ো হ'লে টেনিস বল। তিন নম্বরের ফুটবলে একদিন, কি দুদিন পা ঠেকিয়েছেন। বাবা গেলেন মারা। চানাচুর, বরফ নিয়ে বেরুবার মতো বয়সে পৌঁছন নি তখনও, তাছাড়া অতটুকু বয়স, চায়ের দোকানের 'বয়' গিরিই সহজ কাজ। এরও পরে অনেক 'পর' আছে। ঠেকতে ঠেকতে কারখানায় চলে এলেন। বহু কষ্টে অর্ধাহারে, প্রায়-অনাহারে থেকে হাতের কাজ শিখলেন। কাজ পেলেন, কাজ গেল, আবার পেলেন, এভাবে জীবনসংগ্রাম চালিয়ে চললেন, দমলেন না মোটেই।

মা ছিলেন সামনে। তিনিও একদিন একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন ওপারের আহ্বানে। একা, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, হাতদুটোকে, চোখদুটোকে আর মনের অনমনীয় দৃঢ়তাকে সম্বল ক'রে চালিয়ে যেতে থাকলেন।

তাব'লে স্তব্ধ হলো না ওনার ভালোবাসার প্রবাহ, ওনার ফুটবল-প্রেম। নিরেট, শুক্‌নো তারের মধ্য মধ্য দিয়ে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলে, তেমন নীরস, শুষ্ক জীবনকে অগ্রাহ্য ক'রেই ওনার রক্তের ভেতর দিয়ে ভালোবাসার প্রবাহ, ফুটবল খেলার প্রতি ভালোবাসা দিনক্ষণ বছর পেরিয়েও অপ্রতিহত গতিতে আগিয়ে গেছে। পা দিয়ে পাঁচ নম্বরের ফুটবল উনি খেলতে পান নি, কিন্তু মনের ভেতর ঝোঁকটা থেকেই গেছে, ফলে তা খেলা দেখায় রূপান্তরিত হয়েছে। নিজে উনি সামান্যও একজন খেলোয়াড় হ'তে পারেন নি, কিন্তু খেলোয়াড়ের খেলার সমালোচনা করতে শিখেছেন।

সেই এতটুকু বয়স থেকেই, যতই কাজ থাক, পাড়ার ছেলেদের খেলা থাকলে—অবশ্য সে খেলা দেখতে যাওয়া যদি বেশী পয়সা খরচের ব্যাপার হয় তাহলে মন খারাপই সম্বল হলো—উনি খেলা দেখতে যাবেনই।

কাজের ক্ষতি হলো, পয়সার লোকসান অবধারিত, কিন্তু মনের আনন্দ যা পেলেন তা যে অমূল্য। বলা যেতে পারে,ওনার ভালোবাসা চরিতার্থতা পেল,ঝোঁকটা তৃপ্ত হলো। উনি জুয়ো খেলতে যান নি, অন্যান্য প্রকারের জুয়া খেলে বা সিনেমায় লাইন মেরে সময় ও পয়সা নষ্ট করেন নি। কেমন যেন নিশ্বাস নেওয়ার মতো হয়ে গেল খেলা দেখাটা। যত খেলা দেখেন তত

যেন মনে হয় ওনার, উনি বেঁচে রয়েছেন। আর খেলা দেখতে না পেলেই মনে হয়, গায়ে ব্যথা, মাথা ধরেছে যেন, মেজাজ খারাপ হয়েই আছে, মনে জং ধ'রে যাবে বুঝি। অমনি হাঁপিয়ে ওঠেন, মাঠে ছোটেন।

সেই কিশোর বয়স থেকে যারা ওঁকে দেখে আসছে, তারা দেখেছে, সেই বয়েসই উনি ফুটবল খেলাই দেখুন, আর পায়ে-টেনিস খেলাই হোক, গোলের সীমানায় বল ঢুকলেই, অবশ্য ওনার সমর্থনপুষ্ট দল হওয়া চাই, উনি চেঁচাতেন, 'নেট নেট'। আর বয়স বাড়লে গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে সেইরূপই চেঁচাতেন, 'নেট' 'নেট'। এখনও গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে ওই ভাবেই চেঁচান তখনও খেলোয়াড়দের নাম ধ'রে 'নেট নেট' করতেন, এখনও করেন। যেন 'নেট' মানেই শুট্, আর শুট করলেই গোল। তা তাড়াতাড়ি বলার জন্যই বোধ করি উনি বাদসাদ দিয়ে একেবারেই 'নেট' বলতেন।

কত আর বয়স তখন, নয় কি দশ, ঢুকেছিলেন চায়ের দোকানে, কত বছর কেটে গেল, যৌবনে পা দিলেন, বয়স থেমে থাকল না, খেলা দেখার ঝোঁক, ফুটবল খেলার প্রতি ওনার ভালোবাসা কমল না, বরং বাড়ল বলাই ভালো।

ইতোমধ্যে বয়স আরও বাড়ল, যৌবন শেষ হয় হয়, 'নেট' বাবুর আত্মীয়-স্বজনরা বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, যেমন : এভাবে ভেসে বেড়ালে চলবে? বুড়ো বয়সে কে দেখবে? তোর বাবার বংশটাকে শেষ ক'রে দিবি?"

ফুটবল মরশুমের ক'মাস 'নেট' বাবু মাতাল হয়ে থাকেন। কোনোদিকে দৃক্পাত নেই, মেজাজ মন সব সময়ে তুঙ্গে, লণ্ডভণ্ড যা হয় হোক, দিনে রাতে শয়নে স্বপনে উনি খেলা নিয়েই আছেন। শুধুমাত্র জেগে থেকেই নয়, ঘুমের মধ্যেও 'নেট' 'নেট' ক'রে চীৎকার করেন।

ফুটবলের মরশুম বড়ো জোর পাঁচ ছমাস। অসময়ে কোন বছর বাইরের টিম এল, আরও দুচার দিন জমল ফুটবলের আসর; পাড়ার, কাছে-পিঠের ফুট-টেনিস প্রতিযোগিতার বাড়তি কিছু দিন, বছরের আর বাকি দিন গুলো 'নেট' বাবু সম্ভাব্য দল পরিবর্তন নিয়ে, নতুন খেলোয়াড় আমদানী নিয়ে, কি বাইরে কোনো দল খেলতে গেলে তা নিয়ে আলোচনা ক'রে, পশ্চিম বাংলার বাইরের প্রতিযোগিতামূলক খেলার রিলে শুনে কাটান।

ফুটবল ছাড়া কোনো নেশা নেই 'নেট' বাবুর। মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া, সিনেমা, থিয়েটার, মাছ ধরা, পান, বিড়ি, নস্যি পর্যন্ত না। 'নেট'বাবু বলেন, 'খেলোয়াড়ের সামান্যমাত্র নেশা থাকা উচিত নয়।' আশ্চর্য, উনি খেলেন না, কিন্তু মনেপ্রাণে, কাজে, আচারে ব্যবহারে উনি একজন খেলোয়াড়।

তাই আত্মীয়রা বিয়ের কথা বললে উনি বলেছিলেন, 'বিয়ে করা আমার উচিত নয়।' ওঁরা তর্ক তুলেছিলেন নানাবিধ প্রশ্নও, কিন্তু 'নেট'বাবু ওদিকে পা না বাড়িয়ে শুধুমাত্র মাথা হেঁট রেখেই পরিত্রাণ পাবার অধ্যবসায়ে রত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছেন।

তত্রাচ ফাল্গুন, চৈত্রের দখিনা বাতাস, শীতের দীর্ঘ রাত্রি, বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা মনকে এলোমেলো নিশ্চয়ই করে। উন্মনা। ফাঁকা ফাঁকা। তবুও চাপাচাপি করলে 'নেট' বাবু উত্তর দিয়েছেন মাথা হেঁট রেখেই, 'ভাড়া বাড়িতে থাকা, বাঁধা চাকরী নেই, আমার কি বিয়ে করা উচিত?'

এর জবাবে তাঁরা বলেছেন, তাহ'লে দেখছি কোনো মেয়েরই বিয়ে হয় না।' 'নেট' বাবু প্রশ্ন করছেন, 'কেন?' তাঁরা বলেছেন, 'বাঁধা মাইনের চাকরী, হাতের কাজ জানো, সৎ স্বাস্থ্যবান্ ছেলে, এর বেশী কী চাই?' 'নেট' বাবু বলেছেন, 'পরের মেয়েকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া। এ বেশ আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি, পোষাচ্ছে কাজে যাচ্ছি, না পোষালে যাচ্ছি না, কারুকে তোয়াক্কা করি না।' হিতৈষীরা ওর পথ আগলেছে, 'বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এ ভাবে হেলায় ফেলায় জীবনটাকে নষ্ট হ'তে দেব না। জীবনকে সার্থক করতে হবে।'

আইবুড়ো থাকলে চিরকাল, আর খেলা দেখে

বেড়ালে কেমন ক'রে যে জীবন অসার্থক রয়ে গেল তা ওঁর মাথায় ঢোকে নি। তবে এইসব শুনতে শুনতে একটা জিনিষ মাথায় ঢুকেছে, একটি যুবতী মেয়ে, ওঁর বউ, ওঁর জন্য রাঁধছে, বাড়ছে, ঘরসংসার দেখছে, ছেলেমেয়ে—এই সব মিলিয়ে একটা ছবির মতো, যথাযথ কিছু না, অস্পষ্ট আলোয় তোলা ফোটোর মতো। বিশেষ বছরের যে সময়ে একেবারে কোথাও খেলা থাকে না, সে-সময়ে এমনি সব ফোটো চোখের সামনে ভাসত।

কিন্তু ফুটবল। 'নেট' বাবু'র অমনি ভয় হয়েছে। কেননা উনি ভেবেছেন, খেলা দেখলে পয়সায় টান পড়বেই তখন বউ নিশ্চয় বাধা দেবে। ওনার মাও চেঁচাতেন, কিন্তু মায়ের চেঁচানি আর বউয়ের চেঁচানিতে তফাৎ আছে। মা'র সঙ্গে যে জোরে পারা যায়, বউয়ের সঙ্গে কি সে জোর খাটে? মা'র ছেলে উনি, কিন্তু বউ পরের মেয়ে। আর বউ বাধা দিলেই অশান্তি, মন-কষাকষি, ঝগড়া—সে এক বেয়াড়া কাণ্ড; তার চেয়ে উনি ভেবেছেন, এ বেশ আছি। স্থায়ী চাকরী হ'লে তাও কথা ছিল। বউ খেতে পাবে না, ছেলেমেয়ে উপোস করবে, উনি খেলা দেখবেন। আর সন্ধ্যেবেলায় বাসায় ফিরে দেখবেন হাঁড়ি চাপেনি, বউয়ের মুখ শুকনো, ভয়ে, কিংবা লজ্জায় বলতে পারছে না, সে এক নোংরা কাণ্ড। আবার বউ, ছেলেমেয়ের জন্য মাঠে যেতে পারবেন না, সেও যে অসহ্য।

কিন্তু আত্মীয় বন্ধুরাও ছাড়বেন না। সময় ও সুযোগ পেলেই ওঁকে খিঁচতে লাগলেন। এই খিঁচুনি, বয়স, রক্ত; সংসার, বউ, ছেলেমেয়ের অস্পষ্ট ছবি, কী ক'রে যে কী হয়ে গেল, দুম ক'রে বিয়ে করলেন 'নেট' বাবু।

বউ ভালো হলো। স্বভাবে ভালো, দেখতেও ভালো। বড়ো আনন্দ পেলেন 'নেট' বাবু। খেলার মাঠে যান, বাড়ি ফিরে বউকে খেলার গল্প শোনান, বোঝান, আপনার মনের সঙ্গী ক'রে নিতে চান। কারখানায় খাটেন প্রাণপণ, আর ভাবেন, বৃথাই এতগুলো বছর নষ্ট করলাম। 'নেট' বাবু ভেবেছিলেন, ওনার মনকে দু ভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ, ওনার নিজের জন্য, সেখানে ওনার মাঠ, খেলা, খেলোয়াড়; আর এক ভাগ সংসারের জন্য, সেখান বউ, ছেলেমেয়ে, দায়িত্ব। তা যে হয়নি তাতে ওনার বড়ো স্বস্তি। অপিচ বউ নির্মলা সংসারের চৌহদ্দির মধ্যেই নিজেকে রেখে সন্তুষ্ট, সেই গণ্ডীর ভেতরে 'নেট', বাবু যতটুকু থাকলেন, ওঁকে যেটুকু পেলেন তাতেই ওঁর তৃপ্তি, সুখ, এর বেশী ওনার দাবী নেই। তাছাড়া পুরুষ মানুষ একটু বাইরে থাকেই, তার ওপর 'নেট' বাবুর কোনো বদ্ নেশা তো নেই। ওঁরা দুটিতে যেন একই বৃন্তে দুই ফুল, কিংবা একই শাখে দুই পাতা।

আত্মীয় বন্ধুরা প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, কেমন?'

'নেট' বাবু আনন্দ চাপতে মাথা হেঁট করলেন।

শরতের স্বচ্ছ নীলাভ আকাশের বুক দিয়ে হালকা মেঘের উড়ে যাওয়ার মতো দিনগুলো উড়ে যেতে লাগল।

সব সংশয় প্রায় ঝেঁটিয়েই একরকম ওঁদের দ্বৈত জীবন বসন্তের বাতাসে প্রায় গড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে একটি দুটি ক'রে মানব সন্তানের জন্ম হলো, সংসার বাড়ল। ছিলেন ওঁরা দুজন, এখন সেখানে আরও চারজনের বেঁচে থাকার, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগের সরব দাবী উচ্চারিত হলো।

'নেট' বাবু অপরিসীম খাটেন, যা পান ধ'রে দেন নির্মলাকে। নির্মলাও গতরকে পিষে ফেলেন সংসারের জন্য, কিন্তু কোথায় যে কী হয়ে গেল, পুরাতন হাঁপানি রুগীর মতো সংসারটা ধোঁকে, ওপর ওপর মলম লাগান, মালিশ করেন, রোগ ভত্রাচ বাড়তেই থাকে। নির্মলা 'নেট' বাবুর দিকে তাকান; 'নেট' বাবু সেই ফেলে আসা যৌবনের দিনগুলোর পানে ফেরেন যখন খেলার শেষে চিনেবাদাম ও মুড়ি নিয়ে সবুজ পুরু ঘাসের গদির ওপর ব'সে শুয়ে, বাদাম মুড়ি টুকতেন আর হাওয়ায় শরীর মন তৃপ্ত করতেন, ঠাণ্ডা; ওপরে মেঘেরা ছুটত, আকাশের গায়ে একটা একটা ক'রে নক্ষত্র হেসে উঠত। কখনও কখনও দূরের গাড়ির হর্ণ বেরসিকের

মতো চমকে দিত। সেসব দিনগুলো যদি আর একবার ফিরে আসে! আবার ভাবেন, আচ্ছা এমন দিন কি পুনরায় তৈরী করা যায় না? সেইরকম আনন্দের দিন, পুরো নিজের দিন!

এখনও এক-এক দিন, তবে তা বড্ড কম, মাঠের ঘাসের গালচেতে শোন 'নেট' বাবু, কিন্তু পকেটে বাদাম মুড়ি থাকে না, আকাশে নক্ষত্রও ফোটে না, মেঘও ওড়ে না, দূরের রাস্তায় গাড়ীর হর্ণ চমকাতেই পারে না, কেননা মনকে যে কোথায় রাখবেন, কেমন ক'রে রাখবেন ভাবতে ভাবতেই ধড়মড়িয়ে উঠে প'ড়ে আউটরাম ঘাটের দিকে ছোটেন। ওদিক দিয়ে গেলে কম পয়সায় হয়। নদী পেরিয়ে বাকিটা হেঁটেই মেরে দেন।

ওনার বড়ো মেয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি খেলা দেখা ছাড়তে পারো না বাবা! মিছিমিছি পয়সা নষ্ট, কাজের ক্ষতি, শরীরের এই কষ্ট!'

জবাব দেন না 'নেট' বাবু। নির্মলাও স্বামীকে কিছু বলতে পারেন না, মেয়েকেও কিছু বলতে পারেন না।

অবশ্য 'নেট' বাবু মুখে মেয়েকে কিছু না বললেও মনে মনে বলেন, "তোদের জন্যেই যে যেতে হয় মা। অনেক কষ্ট ক'রেও যেতে হয়। যাওয়া যদি বন্ধ করি, তাহ'লে 'নেট' বাবু কি বাঁচবে মা, ও ঠিক মরে যাবে। যা হোক কিছু তো পাচ্ছিস খেতে, পরতেও পাচ্ছিস, 'নেট' বাবু শেষ হয়ে গেলে কিছুই যে পাবি না মা তোরা! বল্, বাপ হ'য়ে তোদের মেরে ফেলতে পারি? তোরা তো ওপরের কষ্টটাই দেখলি, কিন্তু ভেতরের কষ্টটা যদি দেখতিস তা'হলে বুঝতে পারতিস তা কতখানি!"

ছেলেরা যখন প্রশ্ন করে, "বাবা, আমাদেয় 'নেট' বাবুর ছেলে বলে কেন?" বুকটা অমনি ধক্ ক'রে ওঠে, আনন্দে কি দুঃখে কে জানে? তবে উনি কোনো উত্তর দিতে পারেন না। কেমন যেন অপরাধীর মতো. চুপ ক'রে থাকেন।

অবশ্য তখন 'নেট' বাবু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা সূত্র আবিষ্কারের জন্য গম্ভীর হয়ে, সংসারের রুগ্ন চেহারাটা চোখের সামনে নিয়ে আর খেলার মাঠ, খেলোয়াড়, অগণিত মানুষের ছবি সামনে রেখে মনে মনে বলেন, "তোরা বড়ো হ, একদিন আসবে যেদিন এ প্রশ্নের উত্তর তোরা নিজেরাই খুঁজে পাবি। আমি কি বলব বল্!"

শিক্ষায় মাধুকরী বৃত্তি

কণা সেন

এ-যুগে শিক্ষানিরপেক্ষ জীবনের ধারণা আমরা কেউ করতে পারি না। শুধু এ-যুগে কেন মানুষের জীবনে সভ্যতার যেদিন প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের সূচনাও প্রায় তখন থেকেই। গুহা-মানবের শিল্পকলা চর্চার কথা ছেড়েই দিই। খৃষ্টপূর্ব আড়াই থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যে (আধুনিক পণ্ডিতদের অনুমান, আরও কিছু বেশী) সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক সুমেরীয় সভ্যতার কালে যে লিখন-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল, তাকে আজও বিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতার এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য সে লিখন-পদ্ধতি ছিল প্রায় এক হাজারের মতো প্রতীক চিহ্নের সমষ্টিমাত্র এবং সে-সব প্রতীক-চিহ্ন আঁকতে শেখা ও পড়তে পারা বড় সহজ অধ্যবসায়ের কাজ ছিল না। তাই সে-যুগেও লেখাপড়া জানা মানুষের কদর ছিল খুব। কারণ, সমাজের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য লিপিকরদের উপর নির্ভর করতে হতো। সমাজে লিপিকরদের বৃত্তিও ছিল অতি সম্মানের বৃত্তি। ফলে জ্ঞানার্জনের স্পৃহায় না হোক, সামাজিক মর্যাদা ও সমৃদ্ধিলাভের জন্যও অনেকে লেখাপড়া শেখার দিকে আকৃষ্ট হতো।

বলা বাহুল্য, তখন পর্যন্ত শিক্ষার আলাদা কোনো সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। তখনো মানুষকে কেউ বলে দেয়নি যে, মানসিক শক্তি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য; তার মধ্যে যে এক পূর্ণশক্তি স্বমহিমায় বিরাজিত, তাকে জাগিয়ে দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য (Education means manifestations of the perfection already in the man)।

একটি মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও শক্তির এই পূর্ণ স্বীকৃতিই হলো আধুনিক যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ। যেমন প্রকৃতির স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় জীবনকে গড়ে তুলতে পারলে প্রত্যেক মানুষেরই সাধারণ স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত নীরোগ ও বলিষ্ঠ হয়ে থাকে, তেমনই শিশু মাত্রকেই নিয়মিত শিক্ষার সূর্যালোকে বেড়ে উঠতে দিলে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটা সুপরিণত মানসিক স্বাস্থ্যের দীপ্তি আমরা আশা করতে পারি।

সেই জন্যই বোধহয় আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদেরা বলে থাকেন, "Education is not for life, it is life itself।"

জীবনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তার দায়িত্ব শুধু ব্যবহারিক জীবনে মানুষকে কুশলী কারিগর তৈরি করে দেওয়া নয়, তার শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন (All round development of total personality)। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার এই শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব উদ্‌যাপিত হচ্ছে কি? এক কথায় সকলেই বোধহয় একমত হয়ে বলবেন, না। হচ্ছে না তার কারণ, এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের নিছক মস্তিষ্ক চর্চার অনুশীলনের দিকেই সম্পূর্ণ ঝোঁকটা দেওয়া হয়, 'ব্যক্তিত্ব' নামক বস্তুটা মুখস্থবিদ্যার তলায় চাপা পড়ে থাকে। এখানে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথকে একবার স্মরণ করা যেতে পারে, "...শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি-বিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।...বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।"

অবশ্য মাণবক-মাণবিকাদের পক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষভাবে মস্তিষ্ক চর্চা করাটাকে কোনোভাবেই

গৌরবের পর্যায়ে ফেলা যায় না, সেটা তাদের পক্ষে গৌরবের কথাই। বিশেষ করে আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা যখন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ক্রমাগত শিক্ষার ফলে (শারীরিক ও মানসিক) শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া মস্তিষ্ককোষের RNA বা রিবো নিউক্লিক অ্যাসিডের গুণগত মানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিনেরও সৃষ্টি হয়। সুতরাং সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষাধারায় একটি সুস্থ-সবল সাধারণ মেধার শিশুকে নিশ্চয়ই দেশের পক্ষে অপরিহার্য একটি মানুষে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকছে কি ? থাকছে না, থাকা সম্ভব নয় বলেই।

আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এত বেশী পুঁথিগত বিদ্যাসর্বস্ব, যার ভিতর থেকে প্রাণরসটুকু ছেঁকে নেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য।

শিক্ষার এই পুঁথিসর্বস্ব মাধুকরী বৃত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কোনো ফল হয় নি। এখন, অনিবার্য ভাবেই কালের কুটিল গতিতে এ শিক্ষা-পদ্ধতি suggestion নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরীক্ষাপদ্ধতি ও তাই। এবং, এই suggestion-নির্ভর শিক্ষা ও পরীক্ষা-পদ্ধতি এখন কতদূর হাস্যকর পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে সে-বিষয়ে একটি চমৎকার ব্যঙ্গগল্প আজ থেকে বছর চব্বিশ-পঁচিশ আগে একটি মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। নকল করার অভিযোগে একটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গল্পটি রচিত। বাতিল পরীক্ষা কেন্দ্রে কি ঘটেছিল লেখক কল্পনায় তার একটি ছবি এঁকেছিলেন গল্পের মধ্যে। এর যে স্থানগুলিতে তিনি তীব্রব্যাঙ্গে আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতিকে আক্রমণ করেছেন, আমি শুধু সেইটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি। অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা মিলিয়ে দেখুন, পঁচিশ বছর পরেও অবস্থার আদৌ কোনো উন্নতি হয়েছে কি না, অথবা লেখকের ভবিষ্যৎ-কল্পনা এখন মর্মান্তিক ভাবে সফলতার পথে। তাঁর ব্যঙ্গের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে নকল করা অনিবার্য। কারো সাধ্য নেই তাকে ঠেকায়।

গল্পের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের হয়ে পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে এম-এ পাস কাকা ধরা পড়েছেন এবং পরীক্ষা-পরিচালকের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলছেন, "......কিছু শেখার কথা যে বলছেন, তাই যদি এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হত তাহলে নোট মুখস্থ করে পাস করা সম্ভব হয় কি করে ?...কিছু শেখানোই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হত তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতি এবং পরীক্ষা-পদ্ধতি এরকম থাকত না। না শিখে পাস করায় যদি আপনারা বাধা দিতেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে কবে উঠে যেত।" (অর্থাৎ, নকল করে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় পাসের সুযোগ দানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যার সমাধান।)

এরপর উচ্চশিক্ষিত খুল্লতাতের মোক্ষম ব্যঙ্গ নিজেকে নিয়ে, "......আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এমনই নির্বোধ যে কোথায় টুকতে হবে তা জানে না, আর আমি এম-এ পাস করেও না টুকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করতে পারব না জেনেই টুকছি। কোথায় টুকতে হবে এম-এ পাস করে এই চতুরতাটি লাভ করেছি, আমার এম-এ পাসের সার্থকতা এইখানে।"

(বাতিল পরীক্ষার কাহিনী : পরিমল গোস্বামী, প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫৫ ।)

এই নকল-সর্বস্ব পরীক্ষার বোঝা আজও আমরা টেনে চলেছি। বরং আরও খারাপভাবে দিন দিন বোঝা শুদ্ধ তলিয়ে যাবার ব্যবস্থা পাকা করছি! গল্পের মধ্যে এক জায়গায় লেখক যে শিক্ষিত-বেকার-সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন এখন তা সরকারের আয়ত্তের প্রায় বাইরে চলে গিয়েছে।

দেশটা যদি সমাজতান্ত্রিক হতো তাহলে শিক্ষার এই ঘুণে ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য ঐ একটি ব্যঙ্গগল্পের আঘাতই যথেষ্ট ছিল তখন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় মোড়া আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে বহু অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ্, শিক্ষাবিদ্ এবং দূরদর্শী ব্যক্তির চিন্তার ফসল

সব পোকায় কাটছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হার মেনে গিয়েছেন। আমরা পরমানন্দে নকল সোনায় জীবনতরণী বোঝাই করে ছুটছি সার্থকতার মোহনার দিকে, কিন্তু পৌঁছতে পারছি কি?

কোনো পারমার্থিক সার্থকতার কথা এখানে বলছি না। বলছি, নিতান্তই ঐহিক সার্থকতার কথা। শিক্ষার যত সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, সবগুলোকে একত্র করে সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে সেখানো, ভাবতে শেখানো এবং সুস্থ, সমৃদ্ধিময় জীবনধারণের উপযোগী রাস্তাগুলোকে খুঁজে বার করবার ইঙ্গিত দেওয়াই শিক্ষার আসল কাজ। মনে করা যাক, আমাদের দেশের শতকরা নব্বই ভাগ কিংবা একশ ভাগ মানুষ যদি শিক্ষিত হতো তাহলে কি হতো? নিঃসন্দেহে দেশ অনেকখানি প্রগতির পথে এগিয়ে যেত। কিন্তু যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষকে সচেতন করে তোলার কোনো সক্রিয় পরিকল্পনা নেই, সে শিক্ষায় শতকরা একশভাগ মানুষ সাক্ষর হলেও, প্রকৃত মানুষ গঠনের কোনো উপায় নেই। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় অধিকাংশ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল সাধন, তাহলে এই কাঠামোর ভিতরে থেকে তার কোনো উপায় নেই। লিখতে-পড়তে শিখলেই মানুষ ভাবতে শিখবে এবং ভাবতে শিখলেই সক্রিয় হয়ে উঠবে দেশের এবং নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য—বর্তমানের পঙ্গু শিক্ষা-ব্যবস্থার কাছ থেকে শিক্ষার এই আশীর্ব্বাদ আশা করা বোধহয় বাতুলতা মাত্র। (আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার নগণ্য হলেও স্বাধীনতা-পূর্ব-যুগের তুলনায় বেশ কিছু বেড়েছে, কিন্তু দেশ কতটুকু এগিয়েছে?) কেন একথা বলছি তার কিছু খোলাখুলি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিম্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত (প্রধানত বিদ্যালয়ের) যে পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস রয়েছে তা প্রায় পুরোপুরি পুঁথি-সর্ব্বস্ব। তার জন্য গাদা গাদা শুধু বই পড়াতে এবং পড়তে হয়। সে পাঠ্যক্রমের তালিকাতেও থাকে এমন সব অনাবশ্যক শিক্ষণীয় বস্তু, যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের বিশেষ কোনো যোগ থাকে না। না হয় তো, থাকে এমন সব অপরিহার্য বাস্তবশিক্ষা, যা বাস্তবভাবে শেখাবার কোনো ব্যবস্থা বিদ্যালয়গুলিতে থাকে না।

ধরা যাক, বিজ্ঞান শিক্ষা। এর জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগার: যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষক (বিজ্ঞানের চর্চা করাই যার সাধনা) ক'টি বিদ্যালয়ে আছে? আদৌ কি আছে? বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ বলতে আমি শুধু রুটিন মাফিক পরীক্ষাগারে দুচারটে রাসায়নিক কিংবা জীবতত্ত্ব অথবা উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষাগ্রহণের কথা বলছি না, বলছি ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শেখানোর কথা, তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটানোয় সাহায্য করার কথা। এদেশের প্রাথমিক স্তরে এ জিনিস এখনো কল্পনাতীত। অন্য স্তরেও কল্পনা কতটা বাস্তবে রূপ নিতে পেরেছে অভিজ্ঞজনেরা ভালো বলতে পারবেন।

তারপর ধরা যাক, ইতিহাস শিক্ষার কথা। এরই বা উপযুক্ত পরিবেশ এবং উপযুক্ত শিক্ষক কটি বিদ্যালয়ে আছে? তৃতীয় শ্রেণী থেকে যে ইতিহাস শিক্ষার শুরু হয়, তা সেরেফ মুখস্থবিদ্যা। আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বই হাতে পেলে আর অন্যভাবে পড়াতে চান না কিংবা পড়াতে পারেন না। অপরাধ তাঁদের নয়। এদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা Jack of all trades but master of none; মুখস্থ-বিদ্যা-সর্বস্ব স্কুল ফাইনাল কিংবা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাসের বিদ্যা সম্বল করে শিক্ষকতা করতে এসে তাঁদের সমস্ত বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে হয়।

ট্রেনিং সেন্টারগুলিতেও বিজ্ঞান-বিষয়ক (ইতিহাস একটি সমাজ বিজ্ঞান) বিষয়গুলিতে ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিম দেবার বিশেষ কেন, কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ যে কোনো বিজ্ঞানই এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্কে নিজের অন্তত কিছুটা 'বিশেষ জ্ঞান' অর্জিত না হলে এবং আধুনিকতম কালের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের চিন্তার যোগ না থাকলে, কোনো শিক্ষকের

পক্ষেই ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নতুন চিন্তার পথে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং সেটি শেষ পর্যন্ত মুখস্থবিদ্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এরপর আসি ভূগোলের কথায়। এটিও একটি বিজ্ঞান। শ্রেণীকক্ষে কয়েকবার ম্যাপ দেখিয়ে এবং বই মুখস্থ করিয়ে ভূগোল সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মনে গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তাই করি। এখানেও উপযুক্ত পরিবেশ এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবটাই বড় কথা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের এই সার্বিক উন্নতির যুগে আমাদের দেশে বিজ্ঞান-বিষয়ক সবরকম শিক্ষার ক্ষেত্রেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গোড়া থেকেই শোচনীয় ভাবে অনগ্রসর। তারা যুক্তির ভিত্তিতে প্রায় কিছুই বুঝতে, ভাবতে কিংবা জানতে শেখে না, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে চালনা করতে অভ্যস্ত হয় না।

আমি কিছুক্ষণ আগে গোটা শিক্ষা-ব্যব কাঠামোর পরিবর্তনের যে কথা বলেছি তা প্রধানত দিকে লক্ষ্য রেখে। উপর-উপর শিক্ষা-সংস্কার চাই শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা থেকে বিদ্যাল সিলেবাস পর্যন্ত—সমস্ত কাঠামোর পরিবর্তন। সঙ্গে চাই পরীক্ষা-পদ্ধতি এবং বিদ্যালয় পরিচাল মান্ধাতা আমলের নানারকমের উদ্ভট, অযৌক্তিক নি কানুনের আমূল সংস্কার সাধন করে তাকে যুগোপযে করে নেওয়া। কিন্তু সেই উৎসাহ, দৃঢ়সংকল্প এবং র গতি কোনোদিকেই চোখে পড়ছে না।

'তোতাকাহিনী'র তোতাটার দিকে রাজার য নজর পড়েছিল সে তখন মরে ভূত হয়ে গিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারও কঙ্কালমাত্র সার হয়ে হাতুড়ে চিকিৎসায় তার স্বাস্থ্য ফিরবে না। কিন্তু অব যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষ ক্ষেত্রে একদল কালাপাহাড়ের আবির্ভাব না ঘটা প আমাদের মন্থরগমনের জড়ত্ব ঘুচবে না।

বৰ্দ্ধমান নৃপতিবর্গ ও সেকাল বাংলার অজ্ঞাত কবিকুল

ত্রিপুরা বসু

"অন্নদামঙ্গল" কাব্যের বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের যশস্বী কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, "শিবমঙ্গলের" কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মত সৌভাগ্যবান্ কবির সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে কম নয়। তখন ছিল এমন একটা সামন্ততান্ত্রিক যুগ যে কোন মানুষের মধ্যে ললিতকলার কোন প্রতিভা পরিলক্ষিত হলে রাজন্যবর্গ সেই শিল্পীদের সমাদর করে রাজসভায় আনতেন তাঁদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কবি কালিদাস ও রাজা গণেশের সভায় কবি কৃত্তিবাশ ওঝা বোধ করি তেমনি-ভাবেই স্থান লাভ করেন। এটি কোন রীতি নয়। রাজা-রাজড়ারা গুণী ব্যক্তির সমাদর করতেন বলেই গুণী ব্যক্তিদের গুণের যথেষ্ট কদর হত, একথা এক হিসেবে অস্বীকার করা যায় না। ফলে 'রাজসভার কবি' হয়ে অনেকে হয়তো দেশের সাধারণ মানুষের কথা কাব্যে বর্ণনা করতে ভুলে গিয়ে হাল আমলের কট্টর সাহিত্য সমালোচকের লেখনীর শিকার হচ্ছেন। যাই হোক, সেকালের সমস্ত কবি-শিল্পীর ভাগ্যে যে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-রাজড়াদের আনুকূল্য লাভ সম্ভব হয়েছিল বা সকলেই দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন এ কথা বলা যায় না। বর্ত্তমান কালের আয়াসসাধ্য গবেষণা কর্মের ফলে এমন অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত কবি যে নগর জীবনের সম্পূর্ণ বাইরে গ্রাম বাংলার শান্ত নিরালা প্রান্তে বসে রচনা করে গেছেন সুললিত কাব্য সম্ভার, তার প্রমাণ মিলছে। এখনও এমন কত অজ্ঞাত কবির পুঁথি যে গ্রাম বাংলার নানা প্রান্তে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

কবি ভারতচন্দ্র একদা তাৎকালিক বৰ্দ্ধমান রাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাই অনেকেই ধারণা করে বসেন বৰ্দ্ধমানের রাজারা বোধ হয় সংস্কৃতির ততখানি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না যতখানি ছিলেন সমকালীন অন্যান্য নৃপতিবর্গ। স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী নেতা শোভা সিংহের বিরুদ্ধাচরণ এবং এতদ্দেশে মুঘল শাসন বলবৎ করার প্রয়াসী হিসাবে বৰ্দ্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায় সেকালে স্বাধীনতাকামী কিছু সংখ্যক রাজন্যকুলের শত্রু হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন একথা কিয়দংশে সত্য বলে অনুমান করা যেতে পারে, যদিও তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু বৰ্দ্ধমান নৃপতিগণ সাহিত্য সংস্কৃতির যে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা বর্ত্তমানে আলোচনা করা যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে একপ্রকার অজ্ঞাত কবি শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর। মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া ও মানকর পরগনার সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম হাড়োয়াচকে তিনি ঠিক কত সালে জন্মগ্রহণ করেন তা আমরা জানতে পারিনি। তবে তাঁর "সত্যনারায়ণের সাত ভাই দুখীর পালা" নামক কাব্যের পুঁথিতে তিনি বলেছেন—

> 'সন এগার পঁচানব্ব সালে পির দিল বর।
> হুকুম মাফিক হন্দ রচিল কিঙ্কর॥"

শীতলামঙ্গল" কাব্যের এক স্থানে বলেছেন—

> "মহীর পিষ্টে মহী দিয়া গিরিবর।
> গগনে উঠিয়া গীত রচিল কিঙ্কর॥"

১১৯৫ সনে অথবা প্রহেলিকার অর্থানুসারে ১১৯০ সনে (মহী=১, গিরি=৯ গগন=০) তাঁর নানাকাব্য রচিত হয়ে থাকবে। সুতরাং ১৮ শতকের তৃতীয়ার্দ্ধ

কালে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর) কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর যে বর্ত্তমান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায় থেকে আবু রায়, ঘনশ্যাম, কৃষ্ণরাম রায়, জগৎরাম রায়, কীর্ত্তিচন্দ্র, মিত্রসেন, চিত্রসেন, তিলকচন্দ্র ও তেজচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণ সিংহাসনে আসীন ছিলেন। হাল আমলে আবিষ্কৃত কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর তাঁর সমকালীন বর্দ্ধমান রাজাদের বিদ্যোৎসাহিতার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :—

"বর্দ্ধমান অধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি
চিত্রসেন পুত্র ধনুর্দ্ধর।
কীর্ত্তিচন্দ্র কনেষ্টভ্রাত মিত্রসেন নরনাথ
তিলকচন্দ্র পুত্র রাজেশ্বর॥
ভকাতেতে তেজচন্দ্র স্বর্গের যেন রাজা ইন্দ্র
প্রতাপচন্দ্র তাহার নন্দন।
সে রাজার রাজ্যতটে ক্ষেপতে ক্ষেপাইপাটে
কৃষ্ণকিঙ্কর করিল রচন॥"

বর্দ্ধমানের বর্ণনা প্রসঙ্গে কিঙ্কর "শীতলার জাগরণ" পালা কাব্যে বলেছেন—

'আড়ে দিঘে পঞ্চাশকোটি জোড় জমি খান।
তার নাভিস্থল সুকোমল বর্দ্ধমান॥
রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্রসেন সহদর।
কীর্ত্তিচন্দ্র পুত্র চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
ব্রাহ্মণ্য পরগণা বাহান্ন লক্ষ জমিদার।
সালির লবাব পশ্চাৎ পুরস্কার॥
মিত্রসেন পুত্র তিলকচন্দ্র মহাশয়।
তেজচন্দ্র বাহাদুর তাহার তনয়॥
রাজাধিরাজেন্দ্র রাজা রাজ রাজেশ্বর।
দুজন...যেন মাঝে নিজ ঘর॥
সাকিম খেপুত পরগনে মানকুর।
রাইমৌজে খেপুত তরফ দাশপুর॥
বর্দ্ধমানে বীরসিংহ সাধু ধুশদত্ত।
খেপুতে খেপাইচণ্ডী করিল বেবর্ত্ত॥"

বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিস্মৃত মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল থানার অন্তর্গত বেঙ্গরালি গ্রামের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে বিদগ্ধসমাজে অনেকখানি পরিচিতি লাভ করেছেন। "চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে" তিনি বর্দ্ধমান রাজগণ সম্পর্কে বলেছেন—

মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র কৃতকীর্ত্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে॥
চিত্রসেনের তাত কীর্ত্তিচন্দ্র নরনাথ
রাজা জগৎরায়ের নন্দন।
বসিয়া তাহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
শ্রীযুত কবীন্দ্র অকিঞ্চন॥

কিন্তু তিনি যে কীর্ত্তিচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন না তা বোঝা যায় নীচের উদ্ধৃতিটি দেখলে—

"ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্দ্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন॥"

বর্দ্ধমান তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকাল ১৭৭০ থেকে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ। একালেই কবি অকিঞ্চনের কাব্য রচিত হয়।

"ধর্মমঙ্গল" কাব্যের বিখ্যাত কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে নিজ কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ১৬৩৩ শকাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ ঘনরামের কাব্য রচনা শেষ হয়। কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন :

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান॥"

তবে ঘনরাম রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন কি না তা জানা যায় নাই। কবি নিজেও একথা কোথাও স্বীকার করেন নি।

"ধর্ম্মমঙ্গলের" অপর এক বিস্মৃতপ্রায় কবি নরসিংহ

বসুর পিতামহ মথুরা বসু বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের কালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শাঁখারীতে এসে বসবাস করেন। তবে নরসিংহের কাব্যে অবশ্য কোথাও বর্দ্ধমান রাজগণের প্রশস্তি পরিলক্ষিত হয় না। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন।

অম্বিকা-কালনার অধিবাসী "গঙ্গামঙ্গল" কাব্য রচয়িতা প্রাণবল্লভ ঘোষ নিজকাব্যের ১১২ পৃষ্ঠায় বর্দ্ধমান নৃপতিগণ সম্পর্কে বলেছেন—

"যথায় ভূপতি বাবুরায়ের সন্ততি।
কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি॥
যাহার জননী যতি কৃষ্ণ পরায়ণী।
বহুরাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী॥
নবরত্ন সম সভা জগতে বাখানে।
অবন অতুল বিপ্র তুষিলেন দানে॥
তাহার আশ্রিত বংশী ঘোষের নন্দনে।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভনে গুরুর চরণে॥"

বিদ্যোৎসাহী বর্দ্ধমানরাজগণের আমলে বঙ্গদেশে নির্মিত অসংখ্য মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত লিপিফলক স্থাপিত হয় তাতেও তাৎকালিক বর্দ্ধমান নৃপতিগণের ভূয়সী প্রশংসা মিলে। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শহর চন্দ্রকোণার লালগড়ের অধুনা অবলুপ্ত একটি মন্দির গাত্রের সুবৃহৎ প্রস্তরফলকে নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগোকুল দাস ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন :—

"রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ রসিকা শ্রীবীরভানের্বধূখ্যা
ত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহেলরায়াত্মজা। মাতা
শ্রীযুতমিত্রসেন নৃপতের্বিখ্যাতকীর্ত্তে ক্ষিতৌ
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপভগিনী রম্য দদৌ
মন্দিরং॥" (সংক্ষেপিত)।

ঐ চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়ীর ঠাকুরবাড়ীর প্রধান ফটকের লিপি যে কোন্ কবি রচনা করেন তার সন্ধান আমরা পাইনি :—

"রঘুনাথের শ্রীমন্দির রম্য মনোহর।
লালজীর শ্রীমন্দির হনুমন্তসর॥
ভোগালয় ধনালয় নাট্যরম্যাগার।
বৃন্দাবেশ্ম সাসবেশ্ম পাকগৃহ আর॥
বাদ্যগৃহ প্রাচীর প্রস্তর যুগ্ম কূপ।
স্নানগৃহ সীতাকুণ্ড অট্ট অপরূপ॥
ধনবেশ্ম রাসগৃহের বারাণ্ডা যুগল।
সারিগৃহ পড়িসব প্রভৃতি সকল॥
চন্দ্রকোণায় রঘুনাথ যদুনাথ প্রীতে।
বর্দ্ধমানাবনিনাৎ বিষ্ণতে দৃ জগতে॥
নবোজ্জ্বল করিলেন নৃপ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীল তেজশ্চন্দ্র নৃপ ধন্য ধৌতকীর্ত্তি॥
শিবাক্ষী শিবাস্য সিন্ধু শশীক্ষিতি শকে।
অঙ্গনায় অংশুমান একবিংশতিকে॥"

রচনার ভারবৃদ্ধি আশঙ্কায় বাংলাকাব্যে তাৎকালিক বর্দ্ধমান নৃপতিগণের প্রভাব আরো কত অংশে সে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বারান্তরে এ বিষয় আরো আলোচনার ইচ্ছা রইল।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মহিলাকাব্য

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলা কাব্য জগতে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১২৪৪-১২৮৫) বিশিষ্ট হয়েও বিস্মৃত। তিনি নিজে কিছুটা প্রচার-বিমুখ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর কাব্যের যথোচিত সমাদরও হয়নি। নারী প্রগতির এই ক্ষিপ্রতম দিনেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মহিলা' (১৩০৩?) যে লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে এটাই তার প্রমাণ। অথচ এই গ্রন্থে কবির সব কিছু উৎকর্ষেরই পরিচয় আছে। বর্ণনাভঙ্গী, কল্পনাবিলাস, স্পর্শকাতরতা, সাবলীলতা এবং ছন্দোময়তা—সবই বিদ্যমান। নারীজাতির জয়গান গাওয়া এমন কাব্য বিশ্ব সাহিত্যে কতগুলি আছে জানি না, তবে উৎকর্ষের দিকে মহিলা কাব্য একক এবং অনন্য হতে বাধ্য।

মহিলা কাব্য দুটি অংশে বিভক্ত—মাতা এবং জায়া। মাতা অংশে একাশিটি স্তবক আছে; জায়া অংশ অপেক্ষকৃত দীর্ঘ, দু'শ-পঁয়ষট্টি স্তবকে বিধৃত। এছাড়া অবতরণিকা এবং শেষাংশে মাতৃস্তুতি সংযোজিত। মহিলাকাব্য রচনার অভিসন্ধি সম্পর্কে কবির কৈফিয়ৎ যেমন মনোরম, তেমনি যথোপযুক্ত—

> বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
> সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
> নির্মল নির্ঝর, মরু—বালুর সাগর,
> শীত-গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ত্তন;
> হৃদয়ে জেগেছে তান,
> পুলকে আকুল প্রাণ,
> গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
> মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।
>
> (অবতরণিকা)

কিন্তু কোন্ নারীর স্তুতি তিনি করবেন? তাঁর জননী অথবা জায়া—এই বিশেষ নারীর স্তুতি বন্দনা? না, তার জবাবও কবি দিয়েছেন। বিশেষ কোন নারী তাঁর কাব্যের উপলক্ষ্য নয়। কবির অভিপ্রায়—

> কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
> চাটু স্তুতি না চাই রচিতে;
> সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার
>
> (অবতরণিকা)

সমুদয় নারীজাতি নায়িকা কথাটা কবি সচেতন হয়েই বলেছেন, তাঁর পরিচয় কাব্যের প্রতিছত্রেই আছে। কি অপরিসীম মমতা থাকলে নারীজাতির এই বন্দনা করা সম্ভব—সেটা স্থিতধী পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। পুরুষ এবং প্রকৃতি, নর এবং নারী—জীবনে, সমাজে, দেশদশের ইতিহাসে অভিন্ন। তাই নারীর যথোচিত সমাদর না করে কোন ব্যক্তি শান্তি পায়নি, কোন দেশ বড় হতে পারেনি। নারী শুধুমাত্র রন্ধনশালের কর্ত্রী, অথবা লালসার শিকার,—এই স্থূল চিন্তা কোন সভ্য সমাজই বরদাস্ত করেনি। যুগ-বিশেষে, দেশ বিশেষে শুধু তাঁদের অধিকার থেকে কোথাও কোথাও বঞ্চিত করে রাখার অপচেষ্টা হয়েছে মাত্র। নারীর যথোচিত মর্যাদা যে দেশ দিয়েছে, যে জাতি দিয়েছে—বিপরীত ভাবে সেই দেশ, সেই জাতি সেই সম্মানই ফিরে পেয়েছে। যে দেয়নি সেই- নিজের সম্মান হারিয়েছে। কবির মনোরম ভাষায় বলতে গেলে—

> সেই দেশ সভ্য যথা ললনা পূজিতা,
> কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী-বর্ণনায়,
> সেই গৃহ, হৃদে যার নারী বিহরিতা
> পরিবার, নারী তুষ্টা যায়;
> অধ্যাত্ম বিদ্যার সার,
> রীতি-জ্ঞান ললনার;
> নারী কর্ম্ম ধর্ম্ম এ সংসারে;

সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে।

(অবতরণিকা)

মহিলা কাব্যের মাতা অংশে কবি নারীজাতির ওপর সমাজের অবিচার এবং অত্যাচার দেখে বিচলিত হয়েছেন। বাঙালী সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে নারীজাতির ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে—কবিমন তাতেই উজ্জীবিত হয়ে থাকবে। তাই পুরুষ জাতিকে উদ্দেশ করে কবি প্রশ্ন করেছেন—

পুরুষ! বিষয়ে রত
তুমি কি বুঝিবে তত!
জেনেছ কি জানু পেতে প্রসব-যতন?

(মাতা)

কবি উপলব্ধি করেছেন, এ হেন মাতাকে ব্যথা দিয়ে কোন ব্যক্তি, কোন জাতি বড় হতে পারে না। জননীকে ব্যথা দিয়ে সুখ ভোগ করা—এটা কবির কাছে অসম্ভব অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে—

জননীরে দিয়া দুখ,
যদি পেতে পারে সুখ,
পড়িয়া অনলে তবে শীতলতা পায়!

(মাতা)

কেন না—

বলহীন বপু যার
বিধাতা রক্ষক তার,
তারে পীড়া দিলে ভাল না হয় কখন;

(মাতা)

জীবজগতে পুরুষের প্রথম মিলন হয় জননীর সঙ্গে। সেই মাতৃভাবে পুরুষের প্রথম ললনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ। কিন্তু জীবনে সেই মাতৃভাব-জাত অনুভূতি কত প্রকট, কত বিসদৃশ হতে পারে, নারীজাতির ওপর দুর্ব্যবহার তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই কবি পরামর্শ দিয়েছেন—

মাতৃভাব বিচিন্তিয়া,
বুঝ ললনার হিয়া,
যাঁর সনে পুণ্য প্রেমে প্রথম মিলন!

কিন্তু সমাজে নারীজাতির ওপর ব্যবহার কবিকে একজন সমাজবিজ্ঞানীর মত বিচলিত করেছে। এই অবলা জাতির ওপর পুরুষ কি অত্যাচার না করেছে! তাকে যথোচিত অন্নবস্ত্র দেয়নি, গৃহবন্দী করেছে, মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে—করেছে শুধু লালসার শিকার! তাই বিচলিত কবি দ্বিধাহীন ভাবে এ ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা করতে ভোলেননি। তাঁর এই অনুভূতি যেন ঘৃণা এবং বিদ্রূপে স্ফটিকে পরিণত হয়েছে একটি ছত্রে—

বাঙালী বাহিরে যায়,
কোথায় না মারি খায়!
বাঙালী প্রবল মাত্র ঘরে আপনার।
সকলে প্রহারে যারে
সেই কেশে ধরে মারে
কি লজ্জা, কি অভাগ্য, হিন্দুর মহিলার!
অন্ন না থাকুক ঘরে,
আগে গিয়া বিয়া করে;—
প্রভুত্ব-লালসা-তৃপ্তি, প্রয়োজন তার।
রমণী-হৃদয়ানলে,
দীর্ঘশ্বাস-বায়ু-বলে,
হে ভারত, দগ্ধ তুমি স্বর্ণলঙ্কা প্রায়!
কত সীতা কান্দে দেখ সতত তোমায়!!

(মাতা)

আপাতদৃষ্টিতে কবির এই আক্ষেপকে পক্ষাপাতদুষ্ট অভিহিত করা যায়। কিন্তু কবি তারপরেই কিছুটা অন্য চিন্তা করেছেন। জননীর আধুনিক ভঙ্গি, কৃত্রিমতা তাঁর অন্তরে বেদনা দিয়েছে। তাই বলে কবি কিন্তু সে কথা বলতে দ্বিধা করেননি। সেখানেও তিনি অনুরূপ নির্মম ভাবে বলেছেন—

পরে সুত সমর্পিয়া,
অঙ্গরাগ অঙ্গে দিয়া,
রঙ্গে কাল কাটে,—বিষ্ঠামূত্রে অতিভয়!

জীব-লোক-সুধা যাহা,
যন্ত্রে নির্যাসিত তাহা।
অতি উচ্চ পীন কুচ নত পাছে হয়।
(মাতা)

সংযত ভঙ্গি এবং বাক্‌চাতুর্য কাব্যকে কতটা মহিমান্বিত করে এ পঙ্‌ক্তিটি তারও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাতা অংশে কবি যেখানে সব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারেননি, জায়া অংশে সেসব কথা বলেছেন। এখানে তিনি অনেক মুক্ত ভাবে নিঃসঙ্কোচে সেকথা বলতে পেরেছেন। নারী পুরুষের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধিবৃত্তি দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধুযাত্রী—পথহারা
তার যথা ধ্রুবতারা
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;—
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান।
(জায়া)

মহিলা কাব্যের রসাস্বাদনে এ পঙ্‌ক্তিটি বিশেষ মূল্যবান্‌। নারীকে কি চোখে তিনি দেখেছিলেন, এ অনুভূতি তারই সাক্ষী। কিন্তু তাই বলে কবি কোথাও নারী পুরুষের স্বাভাবিকতার কথা ভোলেন নি। যুবতীর রূপ বর্ণনায় যেমন অকপটে বলেছেন—

কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভায় ?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায় ?
শারদ সরসি বটে পরম শোভায় ;
বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মায়।
মদালস সে লোল লোচন লালসায়।
(জায়া)

তেমনি পরিপূর্ণ ভোগের কথাও বলতে ভোলেননি—

তুমি পরিপূর্ণ স্বর্ণ-পান-পাত্র প্রায় ?
মত্ত আত্মা লালায়িত আস্বাদিতে যায় ;
হিয়া হিয়া বিয়া করে দূতী তুমি তায় ;
প্রকৃতি-প্রিয়ার হায়
অনুরোধ পত্র প্রায়
যে আনে, সে নিতে পারে সকলি আমায় ;
কিছু না অদেয় তারে কাছে আছে যায়।
(জায়া)

নারীবন্দনা করতে গিয়ে কবির স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক অনুশাসনের কথা মনে পড়েছে। সেদিক থেকে তিনি প্রগতিবাদী মুক্তচিত্তের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। বাল্য বিবাহের রীতি তাঁর কোন ভাবেই ভাল লাগেনি। দেহ মনে পরিপূর্ণ বিকাশের আগেই বিবাহের ফলে নারীর ব্যক্তিগত এবং সমাজের যে ক্ষতি হয়েছে, তার দিকে আঙুল দিয়ে তিনি একজন সমাজ সংস্কারকের ভঙ্গিতে বলেছেন—

জননীর পালনের বয়ঃক্রম যার,
সে হলো জননী—সুত প্রসবিত তার।
অকালের ফলে শুভ না হয় কখন ;—
ভগ্ন বপু প্রসূতির
নিত্য পীড়া সন্ততির
অকালে জনমে প্রায় অকালে নিধন ;—
যদি বেঁচে রয়, হয় ব্যাধি নিকেতন।
(জায়া)

নারী পুরুষের কোন বৈষম্য কবি স্বীকার করেননি। এদিক থেকে তিনি চরম সাম্যবাদী। তাই পুরুষের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার পদ্ধতির বিনিময়ে বিধবা বিবাহও সমর্থন করেছেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের উদারতা দিয়ে তিনি প্রেয়সীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

হে প্রেয়সি ! বলি শুন মম অভিপ্রায়,
চিরস্থায়ী নয় কভু মানবের কায় ;
তব অগ্রে আমি যদি ছাড়ি এ ধরায়,—
স্নেহ-সুখ সম্ভোগিতে,

বাঞ্ছা যদি বাসো চিতে,
কুণ্ঠিত না হবে কভু সমাজ-শঙ্কায় ;—
করিবে বিবাহ পুন আপন ইচ্ছায়।

(জায়া)

তাঁর সাম্যবাদী মন স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষের ব্যভিচারের নজীর তুলে ধরেছে। সমাজরক্ষক শাস্ত্রকারদের দিকে তাই তিনি ঘৃণা ভরে প্রশ্ন তুলেছেন—

সতীত্ব শুধু কি হয় ধর্ম রমনীর ?
সতীত্ব কি ধর্ম হয় পুরুষ জাতির ?
উভয়ে সমান গণ্য পাপ ব্যভিচার।
পুরুষেরা অকাতরে
কেন ব্যভিচারে ভরে ?
কেন গুপ্ত দোষ শুধু হয় ললনার ?

(জায়া)

নারী পুরুষের কোন বৈষম্যই কবি স্বীকার করেননি ভাবতে অবাক লাগে প্রায় এক শতাব্দী আগে, একজন বাঙালী কবি নারীজাতির প্রগতি এবং স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী নারীকে লক্ষ্য করে তাঁর সংস্কারমুক্ত মন উদারতা দেখিয়ে সেই যুগেই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে—

আপনার ঘর হয় কারাগার কার ?
এ প্রহেলি উত্তর—"হিন্দুর-মহিলার।"
কেন না বাহিরে যেতে অধিকার তার ?
আত্মীয়-পুরুষ সনে,
কেন বাধা আলিপনে ?
কেন দোষ স্বামী সনে স্বাধীন ব্যভার ?
কেন অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভাব তার ?

(জায়া)

বিশ্ব জুড়ে আজকের এই প্রগতিশীল দিনে মহিলা কাব্যের বিষয়বস্তু স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু প্রায় আশি বছর আগে প্রকাশিত এই কাব্যের লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ের আগ্রহ, সাহস এবং আন্তরিকতাপূর্ণ উদারতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। সেদিক থেকে মহিলা কাব্য সাম্যবাদ এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস। কাব্যগুণ বিচারে কবির অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গি, বাক্‌চাতুর্য, ছন্দ এবং অনায়াস গতি তাঁর বাস্তব এবং দরদী দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে অনন্য সুষমা মণ্ডিত করেছে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকে। 'মহিলা কাব্য' যে বাংলা কাব্য জগতে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করতে পারেনি, সেটা কবির নয়—আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

অন্তরাগ

মানসী বসু

ফুটবল ম্যাচ থেকে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে খাবার ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলাম—বৌদি—চা—জলদি।

বৌদি খাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বল্লে—শুনেছ ঠাকুরপো, তোমার অনুদির যে বিয়ে হচ্ছে।

অনুদির আমি পরম ভক্ত- আমার এই ভক্তির জন্য বৌদি মাঝে মাঝে সরস টিপ্পনী কাটে আমাকে রাগিয়ে দিতে—কিন্তু এরকম মন্তব্যে আমার মেজাজ চড়ে গেল—ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—এ খবরটা তোমাকে কে পৌঁছে দিয়ে গেল?

বৌদি মৃদু হেসে বল্লে—আহা রাগ করছ কেন, আজকের ষ্টেটস্‌ম্যানটার—এনগেজমেণ্টএর কলমটা দেখনা বাপু।

লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা বৌদি আমার সামনে খুলে রেখে দিল। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। এ যেন বৌদিরই দোষ। কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ার ঘরে চলে এলাম। মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অনুদির বিয়ে হবে।

অনুদি আমার বন্ধু সুধীরের মামাত বোন। সুধীর ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়—সেই সম্পর্কেই সুধীরের মত আমি দিদি বলি। অনুদি—অনিন্দিতা মজুমদার কবি, সাহিত্য ক্ষেত্রে ওঁর নাম আছে, সাহিত্যিক দের প্রায়ই ওঁর সান্ধ্য আসরে দেখা যায়, সকল সাহিত্যিকরাই আপন আপন লেখা সেখানে পড়েন। আমি অনুদির ভক্ত—কারণ এইরূপ সুমার্জিত সংযত মহিলা আমি কম দেখেছি—আর উনিও সুধীরের মতই আমাকে ভাই-এর মত স্নেহ করেন। অনুদির রূপ আছে কিন্তু মুখ এমন একটা বিষণ্ণছায়া আছে যে সেটা প্রথমদিকেই আমি দেখেছিলাম। সুধীরের কাছে ওঁর জীবনীও শুনেছিলাম—কোন এক ষ্টেটের কুমারের সঙ্গে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ওঁর বিয়ে হয়েছিল—দুটি পুত্র সন্তানও রয়েছে কিন্তু ওঁর দুর্ভাগ্য যে মহারাজকুমারকে উনি স্বেচ্ছাচার থেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি—ফলে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। ঐ সাহিত্য সভায় মাঝে মাঝে এক-অসাহিত্যিক ব্যারিষ্টার আসতেন কিন্তু তিনি কখনও সভায় যোগ দিতেন না, বারান্দায় আলো আঁধারিতে ইজিচেয়ারে শুয়ে চুরুট খেতেন। অনুদি মাঝে মাঝে সভা ভঙ্গ হ'বার আগেই উঠে ওঁর মোটরে বেরিয়ে যেতেন। আমি প্রায়ই সভায় উপস্থিত থাকতাম, সকলেই জানত আমি সুধীরের বন্ধু ও অনুদির স্নেহের পাত্র। অনুদিকে আমি অনেক উঁচু আসনে বসিয়েছিলাম—আজ যেন মনে হতে লাগল উনি ধুলায় নেমে এসেছেন। মাত্র কয়েকদিন ফুটবল ম্যাচের জন্য আমি ঐ দিকে যাইনি—এর মধ্যে মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট ঘোষণা হল কেন? অনুদির শান্ত সংযত ব্যবহার মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমি নিজেই দেখেছি। তবুও অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্রকে অশ্রদ্ধার আসনে বসাতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হচ্ছিল—গায়ে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে সুধীরের উদ্দেশে গেলাম। সুধীরকে বাড়ীতে পেলাম না।

অন্যমনস্কভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখি অনুদির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। একবার ভাবলাম ফিরে

যাই কিন্তু তার আগেই অনুদির বুড়ো দরওয়ান আমাকে দেখে ফেলেছে—সেলাম করে জানাল খুকুদিদিজী উপরে আছে। ভিতরে ঢুকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। সাহিত্যের আসর বসেনি—কোন দিকে কোন সাড়া শব্দও নেই। ফিরে যাব ভাবছি কিন্তু হঠাৎ বারান্দায় দেখতে পেলাম আধা আলো আধা অন্ধকারে অনুদি ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন, বিস্মিত হ'লাম। মিঃ চক্রবর্ত্তীকেও দেখব আশা করেছিলাম। পায়ের সাড়া পেয়ে অনুদি জিজ্ঞাসা করলেন কে? বাধ্য হয়ে সাড়া দিতে হ'ল।

ও অমিত, এস আমি মনে মনে তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।

আমি নিঃশব্দে ওঁর পাশের চেয়ারটায় বসলাম এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কনগ্রাচুলেশন অনুদি—কিন্তু আজকে আপনি একা কেন?

অনুদি ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন—মনে হয় নিজেকে সামলে নিচ্ছিলেন—পরে মৃদু স্বরে বল্লেন—অমিত, তোমাকে আমি নিজের ভাইএর মতই মনে করি। আমার জীবনী তোমাকে শোনাব। এই অন্ধকারে বসে নিজের জীবন ইতিহাস আলোচনা করছিলাম কিন্তু বিচার করার একজন চাইছিলাম। তুমি আমার স্নেহের পাত্র, তুমিই বিচার কর ভাই।

বিব্রত হয়ে কিছু বলতে চাইছিলাম কিন্তু উনি আমাকে থামিয়ে দিলেন,—না, কথা নয়, আজকে আমার বলার দিন।

বাপ-মায়ের শেষ সন্তান আমি অতি আদরেই মানুষ হয়েছি—সকলেই বলত এ মেয়ের এত রূপ এত গুণ এই বয়সে—এই মেয়ে রাজার ঘরের যোগ্য। আমার মনেও রাজার ঘরণী হ'বার বাসনা জাগত। আর ঐ সময়ে অমুক ষ্টেটের দ্বিতীয় মহারাজকুমারও বাড়ীতে যাতায়াত করছেন। বিলাতে যাবার আগে মিঃ চক্রবর্ত্তী আমাকে প্রপোজ করাতে স্পষ্টভাবে রিফিউজ করলাম। বাবাও তখন মহারাজকুমার দেখে ভুলেছেন।

এরপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল বহু জাঁকজমকের সঙ্গে—তাতে গভর্ণর ভাইসরয় প্রমুখ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সকলেই বল্লে, হ্যাঁ, মেয়ের ভাগ্য বটে। একেবারে খোদ মহারাজকুমার এসে ধরা দিল। হীরার মুকুট মাথায় পরে স্বামীর ঘরে এলাম।

বিরাট মহল, দাসদাসী ঐশ্বর্য্যের কোন ত্রুটি ছিল না কিন্তু সুখ পেলাম না শান্তি নেই নেই আনন্দ।

কী করে পাব? যার জন্য তেরো নদী পেরিয়ে এলাম, তার কাছে আমি একটা ক্রীড়নক হয়ে রইলাম—যেমন ঘরে মুল্যবান্ আসবাব পত্র থাকে আমিও তেমনি তার কাছে। তিনি তাঁর শিকারের পরিষদদের বাইনাচের পার্টি, বিদেশী শিকারীরা এলে তাদের জন্য 'বলনাচে' মেতে থাকেন আর আমি মহলের ভিতর সেবক সেবিকা পরিবৃত হয়ে থাকি। প্রথম প্রথম কুমারের উপর রাগ দেখিয়েছিলাম, অভিমান করেছিলাম কিন্তু যে কুমার কলিকাতায় আমার সঙ্গে কোর্টশিপ করেছিল, সে কুমার তার নিজের কোর্টে অন্য মুর্ত্তিতে দেখা দিল। উনি রূঢ় ভাবেই জানালেন, বৌ-এর আঁচলের তলায় মহারাজকুমাররা থাকেন না, ওঁদের একটা আলাদা বাইরের জীবনও থাকে, আমি যদি বাইরে বেরুতে চাই তবে সব সময় লেডি সেক্রেটারী সঙ্গে থাকেন পরে জেনেছিলাম কুমার আমাকে বিশ্বাস করেন না—তাঁকে গার্ড দেবার জন্য পাঠান হয়। আমরা আধুনিক ভাবে বড় হয়েছি—স্কুল কলেজে পড়েছি—সমাজে সমান ভাবে সকলের সঙ্গে মিশেছি, তার এই জীবন কত দুঃখের ভাবতে পার?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, কী বলছেন অনুদি?

হ্যাঁ ভাই, ব্রিটিশ আমলের ষ্টেটের ব্যাপার ত? এই ভাবে ঐ জীবন তিন বৎসর কাটালাম তখন আমি দুটি পুত্রের মা—প্রথমবার বাবা প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন ওঁর কাছে নিয়ে যেতে কিন্তু উনি রাজী হলেন না। ভেবেছিলাম অন্ততঃ ছেলেদের নিয়ে শান্তি পাব, কিছুটা ভুলে থাকব। কিন্তু সে আশাও পূরণ হ'লো না। পরপর দুবছর দুটো বাচ্চা হলো কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোন

সম্পর্ক রইল না—জন্মাবার পরেই তাদের নার্সারীতে গভর্ণেস ও আয়ার তত্ত্বাবধানে নিয়ে চলে গেল—দর্শকের মত আমি দিনে ২।৩ বার গিয়ে দেখতে পেতাম। তখন উপরি উপরি দু'বছরে দুটো বাচ্চা হওয়ায় আমি নিজেও খুব অসুস্থ ছিলাম। প্রথম বেবি জন্মাবার পর যখন তাকে নার্সারীতে পাঠান হ'ল ভেবেছিলাম আমি প্রায় শয্যাগত বলে এই ব্যবস্থা—কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে জন্মাবার পরও যখন তাকে সরিয়ে নেওয়া হলো তখন আমি প্রতিবাদ করলাম কুমার্ বাহাদুর বোধ হয় বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে বুঝে ববিকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিলেন। বেবি প্রথম সন্তান, মায়ের আঁচলের তলায় সে থাকতে পারে না তাই অন্য মহলে তার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। আমি সেই মহলে গিয়ে তাকে দেখতে পেতাম কিন্তু সে গভর্ণেসের খবরদারির কাছে।

: ও অনুদি, এ যে বিশ্বাস হয় না—অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম আমি। হ্যা তাই বটে অমিত—কিন্তু এত গল্প কথা নয়।

—এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত—বেবি মা বলতে অজ্ঞান হ'ত কিন্তু তিন বৎসর হতেই ওকে একটু একটু করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হতে লাগল। তবুও আরো দুই বৎসর ওদের মায়ায় আমি আটকে ছিলাম।

কিন্তু ববি পাঁচ বৎসরের হতেই বেবির মত ওকে ফরাসী গভর্ণেস্এর হাতে দেওয়া হ'ল, তখন এই সাহিত্য সাধনাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল। একদিন কুমার বাহাদুরের দেখা পেয়ে বল্লাম, আমি ববির কাছে, কিছু দিনের জন্য যেতে চাই। বিদ্রূপের সঙ্গে উত্তর হ'ল ষ্টেটের বৌদের বাপেদের সাধারণ বাড়ীতে যাওয়া নিষেধ। বুঝলাম আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই উদ্দেশ্য কারণ আমার মনকে তিনি বশ করতে পারেন নি—আর আমি যে মনে মনে ওঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি, এটাও তিনি বুঝেছিলেন।

তখন ব্রিটিশ রাজত্ব, ষ্টেটের রাজাদের অত্যন্ত প্রতাপ। বিনা সেনসারএ কোন পত্রও পাঠাবার উপায় নেই। ঐদিনে মিঃ চক্রবর্ত্তীকেই মনে পড়ল। ওঁর নামে একটা পত্র লিখে নিজের ব্যাগে ভরে নিলাম। দোকানে যাব বলে মোটরে চড়লাম, যথারীতি লেডী সেক্রেটারী ও আমার সঙ্গে চলল। পোস্টাফিসের কাছাকাছি এসে মিস মিলার সেক্রেটারীকে বললাম এই টেলিগ্রামটা বাবাকে পাঠিয়ে দাও ত, ওতে শুদ্ধ নিজের ভাল খবর ছিল। টেলিগ্রামটায় চোখ বুলিয়ে সে ভিতরে চলে গেল—ড্রাইভারকে বললাম ওহঃ চিঠিটা দিতে ভুলে গেছি, সামনের ঐ বাক্সটায় ফেলে দাও ত—ধরা পড়বার ভয় ছিল কিন্তু তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। বিনা সন্দেহে ড্রাইভার চিঠিটা ফেলে দিয়ে এল। তারপর দুরু দুরু বক্ষে দিন গুনে যাই—কি হয়, কি হয়।

মিঃ চক্রবর্ত্তী কী করেছিলেন জানি না—তবে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বাবার একটা পত্র দিয়ে তাঁর হুকুম-নামা দিয়েছিলেন—বাপের বাড়ীতে উৎসব আছে, পাঠিয়ে দিতে। রেসিডেন্টের হুকুম রাজারা মানতে, বাধ্য ছিলেন যদিও ওঁরা বুঝেছিলেন আমি আর ফিরব না। ওদের দেওয়া কোন জিনিষ আমি নিইনি। ষ্টেটের সীমানা ছাড়াতেই আমি যেন নূতন জীবন ফিরে পেলাম, মুক্তির হাওয়া চারিদিকে বইতে শুরু করল। অনুদি চুপ করলেন।

তারপর অনুদি?

তারপর? মিঃ চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় সম্মানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদই হ'লো না, ওদের প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও রায় হলো যে ছুটির দুমাস ষ্টেটের বাইরে বাচ্চাদের রাখতে হবে এবং আমি রোজ তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারব কিন্তু—

আবার কিসের কিন্তু অনুদি?

প্রথম দুইবৎসর ওরা দার্জ্জিলিং ও কলিকাতায় ছিল—আমি ওদের দেখতে যেতাম,গেটের পাশে গেষ্ট হাউসে আমার অপেক্ষা করতে হত—সঙ্গে আমার কারুর আসবার অনুমতি ছিল না—শুধু লইয়ার হিসাবে মিঃ

চক্রবর্ত্তী গেটের সামনে অপেক্ষা করবেন এই হুকুমও উপর থেকে করিয়ে এনেছিলেন। ছেলেরা তখন সাত আট বৎসর করে। বেবি তার বাপের মত রুক্ষ স্বভাব পেয়েছিল—আর আমার জন্য তার কোন আগ্রহও ছিল না—কোনদিন সে ত আমাকে মা বলে পায়নি। কিন্তু ববি,—অনুদি চোখটা মুছে ফেল্লেন,—মা বলতে অজ্ঞান হত। যতদিন আমার কাছে থাকত আমাকে জড়িয়ে থাকত। আমার কানে কানে কতদিন বলেছে—বড় হয়ে মা আমি তোমার কাছে চলে যাব।

তৃতীয় বৎসর থেকে ওদের ছুটী কাটাতে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। যদি দেখতে চাও ত বিলাতে গিয়ে দেখ।

নরপশু। দাঁতের উপর দাঁত চেপে বলি।

—দানব—মিঃ চক্রবর্তী আমাকে বিলাতেও নিয়ে যেতে চাইতেন কিন্তু নেওয়ারও ত সীমা আছে—আমি রাজী হইনি। এই করে আরো দুই বৎসর কেটে গেল। কোর্টের মারফৎ আর কিছু করা যায় কি না—সেই চেষ্টা মিঃ চক্রবর্ত্তী করতে লাগলেন—এর মধ্যে শুনলাম ববি অতিশয় অসুস্থ, ওদের কলিকাতার প্রাসাদে ওকে চিকিৎসার জন্য আনান হয়েছে—সে নাকি মাকে ডাকছে। কিন্তু—অনুদি চোখ মুছলেন—তখন আমার সময় নয় কাজেই মিঃ চক্রবর্ত্তী বহু আবেদন নিবেদন করে, শুধু চোখে দেখবার অনুমতি আনালেন। আমাকে একা যেতে হবে, সঙ্গে কেউ থাকবে না।

মা, বাবা তখন দুজনেই গত হয়েছেন তাঁরা কিছু টাকা দিয়ে যান আর আমার গহনা বিক্রি করে এই বাড়ীটা করাই আর জীবিকার জন্য গানের স্কুলে কাজ করি, ২।৪টি ছাত্রছাত্রীকেও শেখাই, এই বাড়ীতেই তারা আসে।

কী করলেন? অধীরভাবে প্রশ্ন করি।

প্রাণের দায়ে রাজী হলাম—কিন্তু এই আবেদন নিবেদনে বহু সময় চলে গিয়েছিল। ভিতরে চলে গেলাম, কেউ কিছু বল্লে না—ঘ [illegible] ঘরে পৌঁছালাম। ডাক্তার, নার্স সকলেই রয়েছে—অনুদি কান্না চাপতে লাগলেন।

তারপর?

তখন শেষ সময়, তবু ওর কাছে যেতে পেলাম না।

এঁ্যা!

হ্যাঁ, ভাই এর পর কী করে যে দেওয়াল ধরে বাইরে এসেছিলাম—মনে নেই। মিঃ চক্রবর্ত্তী হাত ধরে মোটরে তুলে দিতে গাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে যাই। এ সব প্রায় পাঁচ বৎসর আগের কথা।

আমার মনে হচ্ছিল—এই মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্য আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বহুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। 'পরে একটু উসখুস করে বল্লাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অনুদি—কিছু মনে করবেন না।

না, বল—অনুদি বাস্তবে নেমে এলেন।

মিঃ চক্রবর্ত্তী কি তখন বিয়ে করতে চাননি?

উনি বহুভাবে বহুদিন নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—এও জানি আমার জন্যই উনি বিবাহ করেননি।

তবে? আপনি কি কখনও ওঁকে ভালবাসেন নি?

জীবনের প্রথম প্রভাতে ওঁকেই ভালবেসেছি—চির জীবন শ্রদ্ধা করে এসেছি। কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। উনি আমার আরাধ্য—ওঁর কাছে আমি অশেষ ঋণী—

তবে? বিমূঢ় ভাবে বলি।

সেইটাই তোমাকে আজ আমিত বলতে চাই। যখনি মিঃ চক্রবর্ত্তী বিয়ের কথা তুলেছেন আমি না শোনার ভান করেছি, সব সময়ে এই ভেবে যে বেবি কি ভাববে, যদিও বেবিকে কখনও কাছে পাইনি, আজ কত বৎসর হ'ল ওকে দেখি না তবুও আমিইত বেবির মা। যদি সে পছন্দ না করে, মন দিয়ে যদি আমার দুর্ভাগ্য না বিচার করে?

এখন—মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল।

বেবিকে আমি প্রায়ই পত্র দিতাম—একবার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয় তাও জানাতাম—এখন সে ত বড়

হয়েছে—অবশ্য পত্র সে কখনও দিত না—পত্র দিত তার গার্জেন টিউটর।

মামুলি পত্র। প্রায় দিন পনেরো আগে বেবির নিজের হাতে লেখা—ওর নামের ষ্টেটের সীল সমেত পত্র পেলাম—

কী লিখেছে—অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করি।

—লিখেছে—মায়ের স্বরূপ চিরদিনই তার কাছে অজানা—আর জানার ইচ্ছাও তার নেই। পিতার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে না হলেই সে খুশী হবে। আপনি দয়া করে আর পত্র লিখে আমায় বিরক্ত করবেন না। আমাকে সে মিস মজুমদার বলে সম্বোধন করেছে।

এঁ্যা, এ কি বলছেন। এ কি সম্ভব কখনও?

—হয়—অমিত। বেবি তার বাপের দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাপের আদেশে লেখেনি ত?

না—সে সংবাদ গত সপ্তাহে আমার বিলেতে যে সব আত্মীয় আছে তাদের কাছে পেয়েছি। সে তাদের বলেছে, আমাকে সে ঘৃণাই করে।

চুপ করে রইলাম—অনুদিই বলে চললেন।

—মনে হলো, মিথ্যা আশায় মিঃ চক্রবর্ত্তীর জীবনটা নষ্ট করি কেন? নিজেরও ত পরিণত বয়স হয়ে গেছে—এখনও কি আমাদের সুখী হবার অধিকার নেই?

অনুদি চুপ করে চোখ বুজলেন।

নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে ভাবতে লাগলাম—প্রভাতের পূর্বরাগে আকাশ যতই মধুর হয়ে উঠুক—সন্ধ্যার অস্তরাগের লালিমাও আকাশকে কম মহিমামণ্ডিত করে না।

বনফুলের ছোট গল্প

পরিতোষকুমার মিত্র

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প রচনায় 'বনফুল' একটি অসামান্য প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের উর্বর জমিতে ছোট গল্প রচনার শক্তিমান্ বীজ বপন করেছিলেন। তাকে পত্রে পুষ্পে বিকশিত বিরাট মহীরুহের পরিপূর্ণ রূপে বাংলার-পাঠক সমাজকে উপহার দিলেন বনফুল। ছোট গল্প রচনায় অন্যতম পথ প্রদর্শক, একক ও অদ্বিতীয় বনফুল ছোট গল্পের সূক্ষ্মতম শিল্প গৌরবের সাহিত্য গগনে স্বতঃই দেদীপ্যমান হয়ে আছেন।

শিল্পরীতি এবং চরিত্র সৃষ্টির বিশিষ্টতায় বনফুলের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর গল্পগুলিতে বিচিত্র চরিত্রের সমারোহ। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। অল্প কথায় একটি চরিত্রকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করার অপূর্ব কৌশল বনফুলের আয়ত্ত। এই আর্টের তিনি দক্ষতম শিল্পী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। পটভূমির উপস্থাপনায় তিনি বৈচিত্র্যের উপাসক।

ছোটগল্পের মৌলিকতা, বিষয় বিন্যাসে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, মানব জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আঙ্গিকের নব নব কলা কৌশল উদ্ভাবনে বনফুলের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁর গল্প-গুলি কেবলমাত্র আয়তনেই ছোট নয়—গীতি কবিতার মত

ব্যঞ্জনাধর্মী। গল্পের সমাপ্তির পরও তার রেশটি পাঠক মনে অনুরণিত হ'তে থাকে।

মানব জীবনের অফুরান বৈচিত্র্য বনফুলের ছোট গল্পের পাত্রটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে। সহজ জীবনের শান্ত ছন্দে মানব জীবনের কি রূপ ফুটে ওঠে বনফুলের গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবেশ শৃঙ্খলিত মানব সত্তা নয়, নানা বিপরীত ঝটিকায় আন্দোলিত, বিরুদ্ধ মতবাদের তাড়নায় অস্থির, প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনের নৈতিক আশ্রয়ের উন্মূলনে ভারকেন্দ্রচ্যুত সমাজ পটভূমিকা তাঁর গল্পগুলির অন্যতম উপজীব্য বিষয়। বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও মানব চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর অসামান্য ক্ষমতা পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। সহজ সরল ভাষা, অঙ্গিকের সাবলীলতা ও লালিত্য এবং ভাবের গভীরতা তাঁর ছোট গল্পগুলির বিশেষ সম্পদ। তাঁর ছোট গল্পগুলি পড়লে মনে হয় লেখক যেন মন প্রাণ সঁপে দিয়ে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন। বাংলা গল্পের খুব কম ক্ষেত্রেই লেখকের এই ধরনের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি বা একাগ্রতা দেখতে পাওয়া যায়।

মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক জীবনের প্রথা-বদ্ধতায় বিপর্যয় সাধিত হয়। রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পারিবারিক জীবনের ভাঙ্গন এই সময়কার বিশেষ চরিত্র লক্ষণ। মহাযুদ্ধ জনিত নিদারুণ অবক্ষয়ে মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি সংশয় ও অবিশ্বাস দেখা দিল, জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য বোধ রোমান্টিক বিদ্রোহের রূপে যৌন বিকৃতির কানা গলিতে পথ হারালো। যে যুগে জীবন বস্তু-পিণ্ডে ঠাসা, মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ প্রায় অসাড়, সে যুগেও বনফুল তাঁর সাহিত্যকর্মে নভোবিহারের রোমাঞ্চ ও নীলাকাশের আলোক ধারায় স্নানের শুচিতা বজায় রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জনক। তাঁর ছোট গল্পগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। বুদ্ধির প্রখর দীপ্তিতে তিনি সমাজ, মানুষ ও পটভূমিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি রাবীন্দ্রিক শিল্প-সৌন্দর্য বাদের উজ্জ্বল প্রতিভূ। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পে তাঁর সমাজ সচেতন সংবেদনশীল মনের প্রতিফলন। এছাড়া বীরবল, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, এবং অধুনা অতীন বন্দ্যোপাধায়. সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ ছোট গল্প রচনায় আপন আপন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু বনফুল এঁদের সকলের থেকে ভিন্ন। ছোটগল্প রচনায় তিনি এক বিশেষ রীতির প্রবর্ত্তক। মানুষের অন্তরের জটিলতা নয়, সমাজব্যবস্থার দুর্বোধ্য ও দুরতিক্রম্য প্রভাব, জীবন দৃশ্যের নানা অতর্কিত বিকাশ ও বর্ণ-বৈচিত্র্য তাঁর ছোট গল্পগুলির বিশেষত্ব। প্রগতির নামে প্রচার বা সস্তা চটুলতাও তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত। স্বল্পতম পরিসরে ঘটনার অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করে, অতর্কিতের ধাক্কায় পাঠককে খানিকটা চকিত করে তিনি গল্প শেষ করেছেন। তাঁর দ্রুত সঞ্চরণ-শীল ও বৈচিত্র্য পিয়াসী মন কোন এক স্থানে স্থির নয়। খেয়ালের দমকা হাওয়া, পরীক্ষার অদম্য কৌতূহল, অন্বেষণের বহুচারী প্রেরণা ও অসঙ্গতি আবিষ্কার এবং উপভোগের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী-ই তাঁর ছোট গল্পের প্রাণ-কেন্দ্র। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষামূলক মনোবৃত্তি ও হাস্যরসিকের উৎকেন্দ্রিকতা বিলাসের সাথে ঘটনার উপস্থাপনে তিনি আগ্রহশীল।

বনফুল তাঁর গল্পে বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করেন। ঘটনাগুলিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, হঠাৎ সমস্ত ঘটনাগুলিকে একটি সাধারণ পরিসমাপ্তির দিকে এমন ভাবে নিয়ে যান যে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি পরস্পরের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। এই নব পদ্ধতির আবিষ্কর্তা এবং সার্থক রূপকার একক ভাবে বনফুল।

ক্ষুদ্রতম আয়তনের ছোট গল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। ভাবের গভীরতায় ডুব না দিয়েও তিনি জীবনের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কত হাল্কা

ভাবে জীবনের প্রচণ্ডতম ট্রাজেডীকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। আবার কোন গল্পে সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কার প্রধান হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পের এই আঙ্গিক এই শিল্প সুষমা আমাদের অজানা ছিল। বনফুলই তার প্রথম সন্ধান দিলেন। গল্পের শেষে হঠাৎ করে পাঠকের মনকে নাড়া দিয়েছেন। সমস্ত গল্পের মেজাজ যে সুরে বাঁধা ছিল শেষ দৃশ্যে তা মিলিয়ে যায়। রেখে যায় কোনও বাস্তব জিজ্ঞাসা। এই ধরনের গল্পগুলির মধ্যে 'জ্যোতিষ' 'ভ্রান্তি' 'মানুষ' 'বুধি' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'জ্যোতিষ' গল্পের আরম্ভ থেকে সারা গল্প একটা হাল্কা মেজাজে বাঁধা রয়েছে। হঠাৎ শেষ দৃশ্যে জ্যোতিষের মৃত্যু আমাদের সামনে নূতন চিন্তা নিয়ে আসে। সমাজের নিরাপত্তা হীনতাই তখন আমরা চিন্তা করি। 'জ্যোতিষ' গল্পে নায়কের মৃত্যুর মধ্যে সেই সময়কার সমাজ জীবনের বিপর্যয় অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু কোন গভীর তত্ত্বের মধ্যে না যেয়ে কেবলমাত্র শেষ দৃশ্যে নায়কের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বনফুল যেভাবে নাগরিক বা সমাজ জীবনের নিরাপত্তার ভয়াবহ অভাব তুলে ধরেছেন, তা অতুলনীয়। গল্পটি তার স্বল্প আয়তনের জন্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বুধি' গল্পে সাম্প্রদায়িক সমস্যার দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু এর জন্য কোনও বিরাট প্রেক্ষাপটের দরকার হয় নি। গল্পের সমাপ্তিতে এসে মর্ম্মান্তিকভাবে আমরা এই সমস্যাকে অনুভব করতে পারি। গল্পটি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। আবার 'সৌরভ' 'ধূপ' প্রভৃতি গল্পে আমরা লেখকের মরমী মনের পরিচয় পাই। এত ক্ষুদ্র আঙ্গিকে জীবন সমস্যার এমন নিখুঁত প্রতিস্থাপনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'তাজমহল' গল্পে তিনি প্রেমের এক নিখুঁত ছবি এঁকেছেন—যে প্রেম শুচিস্নাত, পবিত্র, এই প্রেম যেন "নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাই তাহে"। তাঁর ছোটগল্পগুলিকে কেবলমাত্র গল্প না বলে জীবনের দর্পণ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। 'শ্রীমতী সীমা' গল্পে সীমা অবহেলিত মূল্যবোধের ভিতর এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিশদ তথ্যে না যেয়ে সীমাকে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে পৃথকভাবে দেখানোর জন্য তিনি গল্পের চরিত্রগুলির মানসিকতার গতিকে তুলে ধরেছেন। জীবনযাত্রার নানাপ্রকার কৌতুককর ও করুণ অসংগতি, নানা প্রকার সংস্কার ও বিশ্বাস, ব্যক্তির সাথে পরিবারের স্বার্থের সংঘাত ইত্যাদিও তাঁর গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে। আবার কতকগুলি গল্পে কাব্যানুভূতির সঙ্গে অপূর্ব্ব মনোবিকলন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ ও পরিবারের বহির্ভূত উদার মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র পরিচয় কয়েকটি গল্পে পরিস্ফুটিত। গল্পের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ ও বিন্যাসের নেপথ্যে রয়েছে একটি শাশ্বতভাব সত্যের অবিচল কেন্দ্র বিন্দু। বনফুল মানব চরিত্রের মাধ্যমে নিখিল রহস্যের সন্ধানী। 'বাড়তি মাশুল' গল্পে নিখিল পিতৃ-হৃদয়ের অপরূপ বাণী গল্পটির মধ্যে প্রকাশিত। গল্পের টেকনিক ও নাটকীয় শিল্প সমৃদ্ধ পরিসমাপ্তি কল্পনাতীত প্রতিভার পরিচায়ক। বনফুলের অনেক গল্পে সমাজ সমালোচনার মনোভাব রয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি উদ্‌ঘাটন ও তার সংশোধন প্রয়াস গভীরতম শিল্পবোধের প্রকাশ নয়। ছোট গল্পের সমাজ সমালোচনা ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বনফুলের গল্পে এই ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহারে—অঙ্গবিন্যাসের কলাকৌশলের বিচারেও বনফুলের দক্ষতা অসাধারণ।

বনফুলের প্রথম জীবনের গল্পগুলির লিপি চাতুর্য, স্বল্পতম আয়তন এবং শর-সন্ধান নৈপুণ্য আমাদের বিস্মিত করলেও, আমাদের মনকে সব সময় অনুভবের আনন্দে রসাপ্লুত করে না। গল্পগুলির দ্রুত গতিবেগ ও পরিবর্তনশীলতা পাঠক মনকে অবাক করলেও সমভাবে মুগ্ধ করে না। আর তা ছাড়া যে ভাবে তিনি গল্পগুলির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন তাতে বৈজ্ঞানিক জীবনবোধের অভাব রয়েছে। 'অজান্তে' 'বিধাতা' 'তর্ক ও স্বপ্ন' গল্পগুলি আয়তনে ছোট হলেও পাঠক মনে অনুরণন-সৃষ্টিতে সার্বিক ভাবে সফল নয়। 'সনাতনপুরের

অধিবাসীবৃন্দ' গল্পে তিনি সমাজের একশ্রেণীর মানুষের পরনিন্দার মনোবৃত্তিকে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

বাস্তব, কাল্পনিক, রূপক, প্রতীকময় সব রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর অলৌকিক রূপক 'বৈতরণী তীরে', বিচিত্র চরিত্র চিত্র, 'নাথুনির মা', 'ছোটলোক', 'বিজ্ঞান,' 'দেশী ও বিলাতী' সবই সার্থক সৃষ্টি। 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পটি আয়তনে বড়। গল্পটি অর্জুন মণ্ডলের জীবন বোধের ক্রমবিকাশের প্রতিরূপ। আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি অর্জুন মণ্ডল চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির আর একটি অনুপম দৃষ্টান্ত 'ঐরাবত' গল্পের ত্রিগুণানন্দ বাবুর চরিত্রটি। ত্রিগুণা বাবুর শরণাপন্ন হ'লে বখেড়া সহজেই মিটে যায়। আমাদের সমাজে এই ধরণের লোকের অস্তিত্ব কি অস্বীকার করা যায়? প্রসন্ন হিউমারের আবরণে তিনি গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষা সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। 'মৃগয়া' ও 'কিছুক্ষণ' গল্প দু'টি কেবল বলার ভঙ্গি ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় সরস ও শিল্পসুষমাসমুজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সাথে চলমান চিত্তের সংমিশ্রণে বিভিন্ন শ্রেণীর রস সৃষ্টি করেছেন। এই গতিশীল মনই পাঠককে উপহার দিয়েছে 'তৃণখণ্ড,' 'দ্বৈরথ', 'সেও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'অগ্নি', 'স্বপ্ন সম্ভব' প্রভৃতি গল্প।

আধুনিক সাহিত্যে বিজ্ঞানসম্মত মুক্ত দৃষ্টির প্রসার তাঁর বিরাট কীর্ত্তি। বৈজ্ঞানিকের মত তিনি অনিসন্ধিৎসু এবং নির্লিপ্ত। মানুষের দুর্বলতায় তিনি সমবেদনাশীল। তিনি তাঁর সাহিত্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন। প্রতিভার পূর্ণতার সাথে তাঁর গল্পগুলিতে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা প্রতীয়মান। শুদ্ধভাষার পরিবর্ত্তে চলিত বাংলার ব্যবহার সাবলীলতা বৃদ্ধি করেছে। প্রথম জীবনের গল্পগুলির অতি নাটকীয় পরিসমাপ্তির বদলে তাঁর পরিণত জীবনের গল্পগুলিতে সূক্ষ্ম যুক্তিবাদী মনের প্রতিফলন হয়েছে। তাঁর সাম্প্রতিক রচনাগুলির মধ্যে 'ধূপ', 'সৌরভ', 'শ্রীমতী সীমা' প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলিতে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের সাহিত্য রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। মরমী সাহিত্যিকের সংবেদনশীল মনের অপূর্ব দ্যোতনা গল্পগুলিতে পরিলক্ষিত হয়।

বনফুলের সমস্ত ছোটগল্পের আলোচনা এত স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প রচনায় বনফুল একজন দিকপাল। পরিশীলিত রুচিবোধ ও জীবন সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে স্থাপন করছে। যৌনতা, সমাজের ক্রুরতা, শঠতা, উচ্চবিত্ত সমাজের ভোগ লালসা, নিম্নবিত্ত সমাজের কদর্যতা যখন আধুনিক সাহিত্যের মূল উপজীব্য, তখন বনফুলের সাহিত্যে সমাজকে কেবল মাত্র সমাজের প্রেক্ষাপটে রেখে, মানুষকে কেবল মাত্র মানুষ রূপে চিত্রিত করার বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বনফুল কেবল মাত্র আঙ্গিক বা নূতন শিল্পরীতির প্রবক্তাই নন, তিনি নবতম জীবন চেতনার শক্তিমান্ প্রবক্তা। বাংলা সাহিত্যে কেবল মাত্র সার্থক ছোট গল্প রচনার জন্যই তিনি স্থায়িত্বের মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন—এর জন্য তাঁর অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

পরীক্ষা ঘরের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

॥ সাত ॥

আমি প্রতি বারেই অনুবাদের কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি বটে, কিন্তু অবশ্যই তা ছাত্রদের জন্য নয়। বর্তমানের ছাত্রদের পাঠ্যমান অনেক নিচে নেমে গেছে, তাই তারা অনুবাদে কোথায় অসঙ্গতি ঘটল তা ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। অতএব অনুবাদের নমুনা সবই বয়স্ক পাঠ্য রূপে দিচ্ছি, এর হাস্যকর দিকটা তাঁরা উপভোগ করবেন আশা করি। এবারেও দেব। কিন্তু তার আগে অন্যান্য দিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাউলারের নমুনা দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে

১। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর অনুকূলও অনেকটা ভাল ছিল।

২। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অক্সফোর্ড উপাধি পান।

৩। যুগে যুগে অনেক মহিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিষী রবীন্দ্রনাথ।

৪। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন নতুন ধ্যানে হবে লবান্ন।

৫। রবীন্দ্রনাথ আজীবন বাংলাভাষায় গান গাহিয়াছেন।

৬। রবীন্দ্রনাথের জরাজীর্ণ দেহ ২২শে শ্রাবণ স্বর্গধামে পৌঁছয়।

৭। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের দ্বারা বিশ্বের গান গেয়ে বর্তমান সমাজের রীতিনীতিকে ঘৃণা করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর বিষয়ে

১। বিদ্যাসাগরের হৃদয় কোমল অপেক্ষাও নরম ছিল।

২। বিদ্যাসাগর স্কুল হইতে পাস করিয়া মেট্রপলিটান কলেজে ভরতি হইলেন। সেখানে কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যাসাগর উপাধি পান।

৩। বিদ্যাসাগরের ভিতরটা কোমলের মত নরম, আর বাহিরটা বজ্রের ন্যায় কঠিন।

৪। বিদ্যাসাগর সকলকে খাইয়া নিজে খাইতেন।

৫। বিদ্যাসাগর নিজে কুলি সাজিয়া মোহগ্রস্ত বাঙালীকে dignity of a labour শিখাইলেন।

৬। বিদ্যাসাগরের পিতার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। বিদ্যাসাগর তালপাতার চটি পরিতেন।

বিবেকানন্দ বিষয়ে

১। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জনসেবায় উদ্ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

২। বিবেকানন্দ জাতিকে উদ্বৃত্ত করিয়াছেন।

৩। তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখিতেন, তাই তিনি স্বগর্ভে বলিতে পারিয়াছিলেন মুচি মেথর চণ্ডাল আমার ভাই।

সুভাষচন্দ্র বসু বিষয়ে

১। সুভাষচন্দ্রের পিতা সেকালের একজন কুখ্যাত এটর্ণি ছিলেন।

২। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দু ফৌজ লইয়া ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।

৩। অন্যায় ভাবে শত্রুকে বধ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

৪। শুনা যায় সুভাষ বসু একজন অস্ট্রেলিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেন।

জীবিত ও মৃত গল্পের কাদম্বিনী

১। কাদম্বিনী শব হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

২। কাদম্বিনীর জীবন তাহার হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

৩। কাদম্বিনীর আত্মা শ্মশান হইতে পলায়ন করিল, এমন কি সশরীরে চলিয়া গেল।...কাদম্বিনীর আত্মাটি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সে কাহাকেও বলে নাই যে সে মরিয়া গিয়াছে।

৪। কাদম্বিনীর মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল, অপর দুই জন ভূত হইয়া পলায়ন করিল।

৫। পথে কাদম্বিনীর একজন জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল।

৬। ঝি কাদম্বিনীকে দেখিয়া মেঝের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া গেল।

পোষ্টমাষ্টার গল্পের বিষয়ে

১। জায়গার উপর পোস্টমাস্টারের একেবারে বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল।

২। রতন পৃষ্ঠাহীন বালিকা।

৩। রতন আমাদের বিশ্বকবির এমন এক অপূর্ব্ব লেখনী ধারণ করিয়াছে যাহাতে রতনের প্রতি আমাদের স্নেহ জন্মে।

কাবুলিওয়ালা গল্পের বিষয়ে

১। কাবুলিওয়ালা আফগানিস্থান হইতে মোয়া বিক্রির জন্য কলিকাতা আসিয়াছিল।

২। মেয়ের হাতের ছাপ অতি সন্তর্পে বুকের ভিতর ধরিয়া রাখিয়াছে।

৩। কাবুলিওয়ালা একজন রুশদেশীয় মুসলমান।

৪। কাবুলিয়ালা মিনির ক্ষুদ্রলব্ধ হৃদয়টাকে অধিকার করিল।

৫। রহমত ভাবিল, তাহার নন্দিনীও এমনি কেসরী রূপ ধারণ করিয়াছে।

৬। রহমত মিনির লুপ্ত হৃদয়টুকু দখল করিয়া লইয়াছে।

৭। কাবুলিওয়ালার ব্রজ্যকঠিন হৃদয় কোমল হইল।

বাক্যরচনা ও ব্যাকরণের নানা

১। সে কি তোমার বাড়ীতে আসিবে, সে ত সোনায় সোহাগা।

২। রামবাবুর মেয়ে রূপেগুণে যেমন সুন্দর—আবার বি-এ পাসও করিল, রামবাবু যেন সোনায় সোহাগা। ('আহ্লাদে আটখানা'র সঙ্গে গণ্ডগোলটা বেধেছে, এবং অনেকেই এই অর্থে সোনায় সোহাগা ব্যবহার করেছে।)

৩। তোমাকে দেখিয়া আমার গায়ে ঝাল হইতেছে।

৪। প্রত্যেক জায়গায় তুমি আক্কেল সেলামির মত কথা বল। (কথাটির অর্থ 'নির্বোধ' ভেবেছে। কেউ ভেবেছে ঘুঁস দেওয়া।

৫। আমাদের দেশের মাঁহষীরা কৃচ্ছ্রশ্রমের দ্বারা বড় হইয়াছে।

৬। যাহা উচ্চারণে প্রাণে আঘাত লাগে তাহাকে মহাপ্রাণ বলে।

৭। যে ক্রিয়া সর্তানুযায়ী হয় না তাহাই যৌগিক ক্রিয়া।

৮। শহরে অনেক অট্টালিকা আছে।

একটি রচনার অংশ

এই রচনাংশটি উদ্ধৃত করার আগে আরো একবার কিছু ভূমিকার দরকার বোধ করছি। আমি পরীক্ষার খাতা দেখেছি ২১ বছর। তা থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নিয়ে অনেক গল্পও লিখেছি, যাতে গল্পের ভিতর দিয়ে রচনা লেখার কিছু ইঙ্গিত পায় পরীক্ষার্থী'রা। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি সে সব লেখা যাঁরা পড়ান তাঁরা পড়লে ছাত্রদের উপকার হত। রচনা শিক্ষার কয়েকখানা বই আমি দেখেছি, এবং খুব সম্প্রতি (মে ১৯৭৩) তার মধ্যকার একখানা নিয়ে যুগান্তরে আলোচনা করছি। রচনা যাতে কেউ নিজের বুদ্ধিতে ও ভাষায় লিখতে না পারে তার কি বীভৎস আয়োজন তাতে আছে। সমস্তই প্রায় অবাস্তব, সেকেলে ধরণের অলঙ্কারবহুল ভাষা এবং তার অনেকখানি উদ্দাম কল্পনা এবং ভুল তথ্যে বোঝাই। এ দেখে এখন আর

ভাবতে পারি না যে রচনা লেখায় ছাত্ররা যে ভঙ্গি এবং অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নেয়, তার জন্য তাদের কোনো দোষ আছে। এ বিষয়ে আগের দু-একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কোনো রচনা যদি ভ্রমণ বিষয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা নিয়েই তো লেখা যায়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সহজ ভাষায় লিখলে যে তা সবচেয়ে ভাল হয়, এ কথা ছাত্রকে কেউ শেখায় নি এ বড়ই আশ্চর্য ঘটনা। তাই ছাত্ররা ভাবে নাটকীয় কিছু না লিখলে বোধ হয় মার্ক পাওয়া যাবে না। এ কথা অবিশ্বাস্য যে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ঘর থেকে কখনো কোথাও যায়নি। সেই যে-কোনো স্থানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা গুছিয়ে লিখতে পারলেই যে তা "রচনা" হয়, একথা রচনা শিক্ষার বই যাঁরা লেখেন তাঁরাও জানেন না, যাঁরা পড়ান তাঁরাও না। অন্তত প্রমাণ পাইনি বই পড়ে এবং পরীক্ষার খাতা দেখে। পূর্বে ইংল্যাণ্ড, আফ্রিকা প্রভৃতি ভ্রমণের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এবারে রচনাংশটি উদ্ধৃত করছি—(বিষয়, কোনো স্মরণীয় ঘটনা।)

"....অরণ্যের পথে আমরা বন্দুক লইয়া বাঘ শিকারে বাহির হইলাম। আমরা গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিলাম। তারপর দেখিলাম যে তিন চারটি বাঘ মিলিয়া মারামারি করিতেছে। আমরা একটি গুলি করিয়া একটা বাঘ মারিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম কতগুলি হরিণ নদীর তীরে জলপান করিতেছে। রাত্রিতে বনের মধ্যে অনেক কিছু জীবজন্তুর দৃশ্য দেখিলাম। সকাল বেলায় আমরা মরা বাঘ লইয়া বন্ধুর বাড়ীতে আসিলাম। তারপর একটি ছোট ডিঙ্গি লইয়া মাছ ধরিতে গেলাম। মনের আনন্দে মাছ ধরিয়া গৃহে ফিরিলাম। বন্ধুর বাড়ীতে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করিয়া আবার দেশের দিকে যাত্রা করিলাম।...থাকব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটারে।"

সাধারণ কোনো ঘটনাই রচনা লেখার কাজে লাগে না, এই শিক্ষা ছাত্রদের মনে এমন ভাবে ছাপ মেরে পাকা করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা অসাধারণ এবং অবাস্তব ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। ছাত্রদের দোষ দিয়ে আর লাভ কি?

রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য মনীষীদের বিষয়েও শুধু কল্পনার আশ্রয়। একটি বাক্য রচনাও যেখানে যথার্থভাবে শেখানো হয় না, সেখানে আর কি আশা করা যাবে? তাই পরীক্ষার্থীদের যে-কোনো বিষয়ে লেখাই অন্য সবার হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাকরণের বোঝা শিশুকাল থেকে চাপানো হয়। দেখলাম ক্লাস-থ্রীতে পড়ে একটি বালিকাকে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাকে বলে শিখতে হচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড। আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনিও উদ্দেশ্য আর বিধেয় কাকে বলে তার উত্তর দিতে পারতেন না। হয়তো বলতেন, এই বুড়ো বয়সে আমাকে এমন প্রশ্ন করা তোমাদের বিধেয় নয়। খুব ভাগ্যের কথা যে শিশুরা ব্যাকরণ হাতে ভূমিষ্ঠ হয় না। তা যদি হত তা হলে কথা বলতে কত বছর বয়সে শিখত তা কল্পনা করা কঠিন নয়। ভূমিষ্ঠ হবার পরেই উদ্দেশ্য ও বিধেয় কি তা ভাবতেই তার অর্ধেক জীবন কেটে যেত। আর ভাবতই বা কোন্ ভাষায়? তাই মনে হয় পরীক্ষা ঘরের আবোল তাবোল আসলে শিক্ষা বিভাগের আবোল তাবোল। এ যেন ছেলেমেয়েদের হাত পা ভেঙে বিকৃতাঙ্গ করে দিয়ে তা দেখে আমরা হাসছি।

স্কুল ফাইনালে বাংলার পরীক্ষা আসলে ইংরেজি পরীক্ষা। তাদের না শেখানো হল বাংলা, না শেখানো হল ইংরেজি। যে ভাষা শিক্ষা প্রথমেই ব্যাকরণ দিয়ে আরম্ভ হয় সে ভাষাকে মৃত ভাষা বলে। অর্থাৎ ব্যাকরণ-সর্বস্ব ভাষা। ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা শিখতে গোড়াতেই ব্যাকরণ দরকার হয়। কিন্তু চলতি ভাষায় এমন ব্যাকরণের বোঝা কেন? স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত আমার মতে সাধারণ সন্ধি, সমাস, বিশেষ্য, বিশেষণ, দু-একটি কারক, এর বেশি শেখানো ভুল। শেখানোর চেষ্টা হয় বলেই ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভাষা শিক্ষার বা শিক্ষাদানের নমুনা অনুবাদে কি

পরিমাণ প্রকট তার পরিচয় আগে যথেষ্ট দিয়েছি। আরো একবার বাংলা পরীক্ষার নামে ইংরেজি পরীক্ষাও কি পরিমাণে সফল, তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

When people le:rnt about agriculture many developments took place. Some people hunted, others looked after their fields and ploughed. Then again as the time went on people learnt new trades. Another interesting result of tilling land was that men began to settle down in villages and towns. Before agriculture came people used to wander about and hunt. It was not necessary for them to live in one place. But now they had to stay near the land. They could not leave the land they had sowed. And so they worked there from harvest to harvest and villages and towns grew up.

অনুবাদ—১। যখন ছাত্রটি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে পড়িতেছিল তখন কতকগুলি বালক মাঠের দিকে তাকাইয়া ছিল। তারপর পুনরায় সেই ছাত্রদের পড়িবার সময় হইল তারপর সে জায়গাটা পাড়াগ্রামে হউক বা শহরেই হউক, জায়গা ঠিক করিতে বলিল। কিন্তু তাহারা এই স্থানটি উপযুক্ত স্থান নহে এই বলিয়া কোন একটা মাঠে গেল। কিন্তু এই মাঠেও থাকা যাইবে না বলিয়া চলিয়া গেল।

২। যখন উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রেরা অনেক নূতন উন্নতির স্থান পাইল তখন তাহাদের মাঠগুলি কর্ষিত হইবার পর অন্যদিকে তাকাইয়া কতগুলি ছাত্র শিকার করিয়াছিল। তারপর আবার এক সময়ে ছাত্ররা নূতন চূড়ার উপরে গিয়াছিল। দেশের মানুষ যে সহরে এবং গ্রামের নীচু আরও প্রসিদ্ধ স্থান নির্বাচন করিতে পারিয়াছিল তাহার ফল বলিয়াছিলাম। কৃষি কার্যের পূর্বে ছাত্ররা নীচে স্বীকার (শিকার) করিতে আসিয়াছিল।......

৩। অনেক নতুন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে লোকের শিক্ষার জন্য। কম লোকে এই পদ্ধতিতে চাষ করে। অপরেরা দেখে কি করিয়া লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ হয়। এইবার যে কোন লোক নূতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা শহর হইতে পাড়া গাঁ নীচে পড়িয়া থাকে।

৪। অন্যেরা তাকাইল পরে জমি চাষ করিল। পরে জোয়ার ভাটা শিক্ষা করিল।

People-কে pupil ভেবেছে এবং settled down এর down-কে 'নিচু' ভেবে কল্পনা চালিয়ে গেছে। অন্য কথাগুলির উৎপত্তি দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

ব্যাকরণ ও অন্যান্য

১। মাঠে বৃক্ষকার্য্য বেশ ভাল হয়।

২। ইংরেজরা কলিকাতায় দুর্গা তৈয়ার করিল।

৩। ধনা মনা নৌকা উল্টাইয়া অদৃষ্ট হইয়া গেল।

৪। দীর্ঘশক্রতা কাদের ক্ষতি করে।

৫। বর্ষায় ময়ূরেরা অন্নের সংস্থান ভুলিয়া গিয়া আনন্দে নৃ ্য করে। (বর্ষাকাল বিষয়ে রচনা।)

৬। হাতের পাঁচ—সব দিক দিয়া ভাল হওয়া। রামবাবুর এখন হাতের পাঁচ হইয়াছে, যে দিকে যাইতেছেন সেই দিক দিয়াই দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন।

৭। থিয়েটারে নামবার আগে কিছু হাতের পাঁচ খেয়ে যাও।

৮। বর্ষায় কাক চিল ভিজিয়া গোময় হইয়া যায়। (বর্ষা: রচনা।)

৯। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদে রাবণের শিরে সংক্রান্তি চাপিল।

১০। এখনো সিনেমায় যাচ্ছে, শিরে সংক্রান্তিতে পরীক্ষা।

১১। অন্ধমুনি দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে এই শাপ দেওয়াতে দশরথ শিরে সংক্রান্তি লাভ করিলেন।

১২। এই চাকুরিতে বেশ হাতের পাঁচ রহিয়াছে।

১৩। মানুষটি একেবারে শিরে সংক্রান্তি।

১৪। তিনি কোন মাইনের অডিটর, পাঁচশ টাকা

বেতন পান, তদুপরি তাঁর বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর এখন শিরে সংক্রান্তি।

১৫। মনীষীগণ-এর শুদ্ধরূপ লিখেছে মানুষগণ। (মনীষী ও গণ জুড়লে মনীষিগণ হয়, কিন্তু আমার মতে এই সমাসগত রূপটি বাংলায় কঠোরভাবে পালনীয় নয়। মনীষী গণ প্রাণী গণ লিখলেই চলে। গণটী কিছু পৃথক রাখতে হবে। শুধু সন্ধির বেলায় নিয়ম পালনীয়। তা ছাড়া এখন বাংলা শিক্ষার ভার নিয়েছে খবরের কাগজ। সেখানে প্রাতভ্র্মণ লিখলে ছাপা হয়ে আসে প্রাতঃভ্রমণ। বিকিরণ লিখলে বিকীরণ ছাপা হয়। লিপ্যন্তরের নিয়ম আছে একটা (—'ছিল' বলা ভাল,—কিন্তু তাও কেউ জানে বলে মনে হয় না।)

১৬। হরিশবাবুর ক্লাসে অঙ্ক না করে নিলে তিনি মিছরির ছুরি দ্বারা ছেলেদের প্রাণান্ত করেন।

১৭। রামবাবুর এখন শিরে সংক্রান্তি, প্রত্যেক ব্যবসাতেই লাভ।

১৮। যাহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই তাহাকে সম্বন্ধপদ কহে।

১৯। চ্যুত=উপত্যকা, চূত=নাক। শূর=বিষ্ণুলোক, সুর=অসুর।

২০। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের জন্য বিধাতা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (রচনা: সকলের তরে সকলে আমরা।)

২১। অ্যামেরিকায় দাশত্ব প্রথা ছিল।

পরীক্ষার্থীদের হাউলার এখানেই শেষ করি। এর অপেক্ষা বেশি আর দরকার আছে মনে করি না। এর পর পাঠ্য পুস্তকলেখকদের হাউলার উপহার দেব। সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে শিক্ষার গোড়ায় গলদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোড়ায় গলদ নাটকের নাম বদল করে শেষ রক্ষা নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষার গোড়ায় গলদের নাম আর বদল চলবে না। কারণ এ শিক্ষায় শেষ রক্ষা হতে পারে না। ঢেলে সাজতে হবে শিক্ষাকে।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টাঘাত বিহ্বলতা ও
মুষ্টিযুদ্ধজনিত চক্ষু আঘাত

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

মুষ্টিযুদ্ধের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে অনেকেই এই ক্রীড়া সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। ভয়াবহ আঘাতের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা জানি ফুটবল হকি প্রভৃতি ক্রীড়ায় আঘাতের ভয়াবহতা ও সংখ্যাধিক্য মুষ্টিযুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী। তবুও কিন্তু ঐ সকল ক্রীড়ার আঘাত দুর্ঘটনা অথবা Accident-এর পর্যায়ে পড়ে। মুষ্টিযুদ্ধের আঘাত কিন্তু সবটাই ইচ্ছাকৃত। এখানে এক প্রতিদ্বন্দ্বী অপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার জন্য পরস্পর পরস্পরকে মুষ্টাঘাত করেন। মুষ্টিযুদ্ধে আঘাত হানাটাই মুষ্টিবীরের চরম লক্ষ্য। এই জন্যই মুষ্টিযুদ্ধ জনিত কয়েকটি বিশেষ আঘাতের বিষয়েই কিছু এখানে উল্লেখ করা হবে।

মুষ্টিযুদ্ধ জনিত বিশেষ আঘাতের কথা আরম্ভ হলে প্রথমেই আমাদের মনে হবে মুষ্টিযুদ্ধ জনিত মস্তিষ্কাঘাতের কথা (Head Injury in Boxing)।

"মুষ্টিযুদ্ধে মস্তিষ্কের কোন স্থায়ী ক্ষতি (Permanent Injury) হয় না"—এ কথাটি বর্তমানে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মস্তিষ্কাঘাত সম্বন্ধে যাঁরা পূর্ণ জ্ঞান ধরেন এই রকম সব পেশাদার বৃত্তিধারী চিকিৎসক ও শল্য-চিকিৎসাবিদ্‌দের মতামত নিয়ে এখানে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আমরা জানি মুষ্টিযুদ্ধ জনিত মস্তিষ্কাঘাতের দরুণ প্রতি বৎসরই কিছু ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুষ্টিযুদ্ধে মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ পেলেই সমস্ত ক্রীড়া জগতে একটা প্রবল আলোড়ন উঠে। কিন্তু মৃত্যু ব্যতীতও মুষ্টিযুদ্ধ জনিত মস্তিষ্কাঘাতের জন্য কত ব্যক্তি যে Punch Drunk Syndrome বা মুষ্ট্যাঘাতে বিহ্বলতা উপসর্গে ভোগেন তাহার সংখ্যা বোধহয় আমাদের জানা নাই।

Dr. Karl Evang, M. D., F. R. S. M., Hon. FAPH নরওয়ের জন স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা-ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশ্ব-খ্যাতির জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (Worlds' Health Organisation) কর্তৃক তাঁহার উপর আরও কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্য বিভাগীয় উপদেষ্টার ভার অর্পণ করা হয়।

অসলোর (Oslo) কোন এক আন্তর্জাতিক সভায় তিনি বলেছিলেন, "মুষ্টিযুদ্ধে প্রতি বৎসরই কিছু মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বহুদিনের মতন অথবা চিরদিনের জন্য 'Punch Drunk' বা 'মুষ্ট্যাঘাতে মাতাল' নামে অভিহিত হন। ইহার জন্য কতজন মুষ্টিযোদ্ধা যে চিরস্থায়ী বুদ্ধি-ভ্রংশতায় ভোগেন তাহার সঠিক সংখ্যাও বোধহয় আমাদের জানা নাই।"

যুক্তরাষ্ট্রীয় শরীর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং শিকাগো সহরের জর্জ-উইলিয়াম কলেজের প্রফেসার Dr. A. H. Stenhaus দুইশত জন মুষ্টিযোদ্ধার মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত জনিত মস্তিষ্কাঘাত বিষয়ে অনুসন্ধান

করেন। তিনি এ-বিষয়ে Electro Encephalogram নামক যন্ত্রের দ্বারা আহত মুষ্টিযোদ্ধাদের Brain wave বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন যে জগতে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি যার দ্বারা আমরা মুষ্টি-যুদ্ধ জনিত আঘাতে মস্তিষ্কের অল্প-রক্ত ক্ষরণ বিষয়ে কিছু জানতে পারি। বহু দিবস ব্যাপী মস্তিষ্ক নিঃসৃত এইরূপ অল্প রক্তক্ষরণের জন্যই পরবর্তী-কালে মুষ্টি-যোদ্ধাদের মধ্যে Punch Drunk Syndrome দেখা যায়।

মস্তিষ্কের আকার প্রকৃতি এবং উপাদানের বিষয় চিন্তা করলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে দীর্ঘকালব্যাপী আঘাত প্রাপ্তির ফলে মানব শরীরের এই অনুভূতি-প্রবণ যন্ত্রটির নিশ্চয়ই কিছুটা ক্ষতি সাধিত হয়।

আমরা জানি মাথার খুলির অভ্যন্তরস্থ নরম মস্তিষ্কটির ওজন মাত্র তিন পাউণ্ড। প্রকৃত-পক্ষে শরীরের কোন অংশের সহিত ইহা যুক্ত নয়। মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লীর মধ্যে Cerebro-spinal Fluid (C.S.F) নামক এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে ইহা নিমজ্জমান অবস্থায় থাকে। মস্তকের উপর মুষ্ট্যাঘাতের সময় খুলি অভ্যন্তরস্থ মস্তিষ্কে প্রবল ঝাঁকুনির ফলে ইহার ভিতর একটি প্রবল আলোড়ন সঙ্ঘটিত হয়। অপেক্ষাকৃত বলশালী মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত মাথার খুলির প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে আঘাত প্রাপ্ত মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

একজন মুষ্টিযোদ্ধার ঘুঁসির ওজন অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে একজন দশ-ষ্টোন ওজনের মুষ্টিযোদ্ধা কখনও কখনও ৬০ পাউণ্ড ওজনের ঘুঁসি মারিতে সক্ষম। কেবল ভারী মুষ্ট্যাঘাতই যে মস্তিষ্কাঘাতের প্রকৃত পরিমাপ তাহা নয়। দীর্ঘকাল ব্যাপী হাল্কা ঘুঁসির লঘু আঘাতও মস্তিষ্কাঘাতের পরিমাপক রূপে গণ্য হতে পারে।

কিছু নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা হয়ত বা প্রকৃত মস্তিষ্কাঘাতের অশুভ কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মুষ্টিযোদ্ধার ক্ষেত্রে কয়েক বৎসর পর থেকেই তার মুষ্টিযুদ্ধের মান অবনয়নের ঘটনা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়।

মস্তিষ্কাঘাতের ফলে মস্তিষ্ক-কোষসমূহের ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে (Cerebral Atrophy)। মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয়ের জন্যই পরবর্তীকালে মুষ্টিযোদ্ধা আর পূর্বের ন্যায় সময় মতন সুযোগ মাফিক তেমন নির্দিষ্ট কোন ঘুঁসি মারিতে সক্ষম হন না। এই মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয়ের জন্যই তিনি আর উপযুক্ত ভাবে আত্মরক্ষা করিতেও সক্ষম হন না। এই জন্যই এই সময় থেকে তিনি মুষ্টিযুদ্ধ জগৎ থেকে পেছিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। মুষ্টিযোদ্ধার এই দুর্দিনে-তাঁর সুদিনের বন্ধুরাও অতঃপর তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান। সাধারণ্যে বিস্মৃত এই হতভাগ্য মুষ্টিযোদ্ধা অতঃপর তাঁর মোহমুক্তির পর এক তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য হন।

তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখময় পরিণতি এই যে এই অবস্থায় তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানসিক সুস্থতাও হারিয়ে ফেলেন। এই সময় তিনি তাঁর স্বাভাবিক মনঃসংযোগ ক্ষমতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁর স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতিবিধির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনেও ব্যাঘাত জন্মে। এই সকল কারণেই ভবিষ্যতে তিনি আর কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতেও সক্ষম হন না।

মুষ্টিযুদ্ধে মৃত্যুর ঘটনা মানুষের মনকে আলোড়িত করে। বিচলিত করে। এই জন্যই মানুষের মন মুষ্টি-যুদ্ধের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। কিন্তু বহুদিন ব্যাপী পুনঃ পুনঃ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা একজন সাধারণ মানুষও যে একজন অবনত মানের অল্প-বুদ্ধি মানুষে পরিণত হয় সে বিষয়ে কিন্তু কেহই আমরা বিশেষ সচেতন নই। সেই সকল ব্যক্তিরাই শুধু ইহা উপলব্ধি করেন যাঁরা কেবলমাত্র এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসেন।

আমরা জানি মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের কিয়দংশ (Frontal Lobe) Sphenoid অস্থির ধারালো অংশের উপর অবস্থান করে। প্রবল মুষ্ট্যাঘাতের ফলে

sphenoid অস্থির উপরোক্ত ধারালো অংশের সহিত উল্লিখিত মস্তিকাংশের প্রবল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলেই নিকটবর্তী মস্তিকাঞ্চল অথবা মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য উপরোক্ত স্থান সমূহ হইতে রক্ত ক্ষরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আঘাত প্রাপ্তির ফলে মস্তিষ্ককোষগুলিরও কিছু অংশ বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের উপরোক্ত আঘাত প্রাপ্ত অংশ মানুষের উচ্চ কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত (controls higher functions) করে। মস্তিষ্কের উপরোক্ত অংশ আঘাত প্রাপ্ত হলে মানুষের আত্মসংযম ক্ষমতা এবং আবেগ প্রবণতার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহার জন্য মানুষের সাধারণ গতিবিধির সামঞ্জস্য পূর্ণ সমন্বয় সাধনও বিঘ্নিত হয়।

মস্তিষ্কের অন্তর্গত Pons এবং Medullaর ভিতর পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ রক্তক্ষরণেও মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। কখনও কখনও মস্তিষ্কের উক্ত অঞ্চল সমূহে অল্প পরিমান রক্তপাত হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিযোদ্ধা অনেক সময় জ্ঞানহারা হন না। আমরা জানি মুষ্টিযুদ্ধে রত একজন মুষ্টিযোদ্ধা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্তির পর জ্ঞানহারা না হয়েও অনেক সময় অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় তাঁর মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থ হন। এই সময় মস্তিষ্কের উপরোক্ত অংশগুলি (Pons এব' Medulla) থেকে রক্তক্ষরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ক্রীড়াকালীন মুষ্টিযোদ্ধার উক্ত রূপ অর্দ্ধচেতন অবস্থাকে "out on his feet" বলা হয়। সাধারণতঃ অচেতন হয়ে পড়ার পূর্ব ক্ষণটিতেই মুষ্টিযোদ্ধার মস্তিষ্কে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তক্ষরণ সংঘটিত হয়। মস্তিষ্কের ঐ সকল অল্প অল্প রক্তক্ষরিত অঞ্চল কোন সময়েই কোন রঞ্জন রশ্মি (X Ray) পরীক্ষার দ্বারা ধরা পড়ে না। সুতরাং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষাও এ সম্পর্কে যথাযথ আলোকপাত করতে পারে না। কেবলমাত্র মৃত্যুর পরে শব ব্যবচ্ছেদাগারেই এই অনুমিত আঘাত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

Dr. Edwin J. Carrol আমেরিকান জার্ণাল অব মেডিক্যাল সায়েন্সে 'Punch Drunk' অথবা 'মুষ্টাঘাতে মাতাল' নামক প্রবন্ধে বলেছেন সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৬০টি লড়াইয়ের পর মুষ্টিযোদ্ধার মধ্যে পরিবর্তন (softens up) দেখা যায়। এই পরিবর্তনই Punch Drunkএর প্রথম বহিঃপ্রকাশ। প্রহারের ফলে আঘাত জনিত এই মস্তিষ্ক প্রদাহ (Traumatic Encephalitis) বহুদিন ধরে খুব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়।

স্নায়বিক এবং মানসিক উপসর্গ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এই সকল ব্যক্তির সাধারণ স্বাস্থ্য কিন্তু অটুট থাকে। এই জন্যই ঐ সকল ব্যক্তি তাহাদের উপরোক্ত দুর্বলতাগুলির বিষয়ে তেমন সচেতন না হওয়ার দরুণ চিকিৎসকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল রোগীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। এই জন্যই তাঁহারা নিজেদের সুস্থকায় ব্যক্তি মনে করিয়া আপনাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

Dr. Carrolএর মতে পাঁচবৎসরকাল পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে রত মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে শতকরা ৫ জনের মধ্যেই সাধারণতঃ মুষ্ট্যাঘাতে বিহ্বলতা বা Punch Drunk উপসর্গাদি দৃষ্ট হয়। শতকরা ৩০ জনের মধ্যেই মানসিক স্নায়বিক দৌর্বল্য (যথা ভাবালুতা প্রভৃতি) প্রকাশ পায়। অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও এই সকল লক্ষণগুলি রোগীর আত্মীয় স্বজনের নিকট কিন্তু সহজেই অনুভূত হয়।

মুষ্টিযুদ্ধজনিত চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যাবলীর প্রকৃতি জ্ঞাতার্থে Carrol মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে দুই বৎসর ব্যাপী বহু অনুসন্ধান করেছেন। তিনি কোন এক স্থলে বলেছেন, "মস্তক-দেশের কোন আঘাত থেকেই মুষ্টিযোদ্ধা অব্যাহতি পেতে পারেন না। চেতনাহরণকারী মস্তক-দেশের প্রতিটি মুষ্টাঘাতই (knock out blows) মস্তিষ্ক দেশের স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে।" তিনি আরও বলেছেন, "প্রতিটি কিশোর মুষ্টিযোদ্ধার মধ্যেই মস্তিষ্কের আঘাতজনিত পরিবর্তন ধীরে ধীরে দৃষ্ট হয় এবং মুষ্টিযোদ্ধা একটি মুষ্টাঘাত বিহ্বল বা Punch Drunk ব্যক্তিতে পরিণত হন।"

অধিক দিন আপনাকে মুষ্টিযুদ্ধে নিয়োজিত রাখলে মুষ্টিযোদ্ধার মুষ্টিযুদ্ধ মানের অবনয়ন লক্ষ্য করা যায়। মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সহ্যসীমা তার ক্রমশই অল্প থেকে অল্পতর হয়। চোয়ালে আঘাত প্রাপ্তির পর পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে তিনি আরও অধিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকেন। ঐরূপ বহু আঘাত প্রাপ্তির পর মুষ্টিযোদ্ধার আঘাত পাইলে শীঘ্র অচেতন হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও অধিক হয়। মস্তকে আঘাত প্রাপ্তির পর তিনি পদদ্বয়েও এখন কম্পন ও অবশতা অনুভব করেন। এই সময় মুষ্টিযোদ্ধার সুযোগ মতন সময় মুষ্ট্যাঘাত করার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই এখন অতীতের সেই কৃতী মুষ্টিযোদ্ধা বর্তমানে আর তেমন ভীতিবহুল ও আক্রমণ তৎপর থাকেন না। আত্মরক্ষা পদ্ধতিতেও মুষ্টিযোদ্ধার ক্রমাবনতি দৃষ্ট হয়। এইরূপে অতীতের সেই নিপুণ ভয়াল এবং কৃতী মুষ্টিযোদ্ধা বর্তমান পর্যায়ে একজন শ্লথ-গতিসম্পন্ন আত্মরক্ষায় অপারগ, অবনতমানের মুষ্টিযোদ্ধায় পরিণত হন। মন্থরগতি সম্পন্ন হওয়ার জন্যই মুষ্টিযোদ্ধাকে এখন প্রতিটি লড়াইয়ে অধিক শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়।

ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে মস্তিষ্কাঘাত হওয়া মাত্রই মুষ্টিযোদ্ধা অধিকাংশ সময়েই অচেতন অথবা অবচেতন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। রাউণ্ডের শেষে এই সময় নিজের আসনের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালেও মুষ্টিযোদ্ধাকে তার পা দুটি টেনে টেনে চলতে দেখা যায়। এখনও পর্য্যন্ত মুষ্টিযোদ্ধা নিজেকে কিন্তু পূর্বের ন্যায় সবল, সক্ষম ও তৎপর গতি সম্পন্ন মনে করেন। পূর্বে যে সকল মুষ্টিযুদ্ধে তিনি অনায়াসে জয়লাভ করতেন বর্তমান পর্যায়ে সেই সকল প্রতিযোগিতাতে তিনি বারবার পরাজিত হতে থাকেন।

বর্তমান পর্য্যায়ে মুষ্টিযোদ্ধা তাঁর মনঃসংযোগ ক্ষমতার বিচ্যুতি এবং স্মৃতিশক্তির হ্রাসও কিছুটা পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরের সহিত কথোপকথন কালে মুষ্টিযোদ্ধা অন্য কল্পনামূলক চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। এই কথোপকথনের মাঝেই হঠাৎ তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করেন। কোন কিছু আলোচনা কালে হয়ত তিনি একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এই সময় তিনি একজন বাক্য-বাগীশ মানুষে পরিণত হন। কথা বার্তা চলার কালে তাঁর বাক্য প্রবাহে কিছুটা যেন বাধার সৃষ্টি হয় (Impediment of Speech) এবং চোখ দুটি তাঁর অপরের নিকট উজ্জল এবং স্থিরদৃষ্টি সম্পন্ন বলে মনে হয় (Eyes slightly glazed and have staring expression)। এই সময় মুষ্টিযোদ্ধাকে একজন মদ্যপায়ী ব্যাক্তি বলে মনে হয়। এই সকল মানুষকে 'Punch Drunk' বা 'মুষ্ট্যাঘাতে মাতাল' বা 'মুষ্ট্যাঘাতে বিহ্বল মানুষ' বলে ডাকা হয়। এই সকল উপসর্গাদি আরম্ভ হওয়ার পর প্রায় বৎসর খানেক কাল ধরে ইহার মাত্রাধিক্য ঘটতে দেখা যায়। ইহার পর ঐ সকল উপসর্গাদির বেগ বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি Punch Drunk একটি ক্রম বর্ধমান মস্তিষ্ক ঘটিত রোগ নয় পরন্তু ইহা একটি স্বয়ং সীমাবদ্ধ ব্যাধি।

মুষ্টিযুদ্ধে মস্তিষ্কাঘাত বিষয়ে একজন বিখ্যাত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধার বিবৃতির উল্লেখ করাটা বোধহয় এখানে খুব অযৌক্তিক হবে না। মুষ্টিযোদ্ধাটি হলেন স্বনাম ধন্য মুষ্টি যোদ্ধা জিন টুনী (Gene Tunney)।

১৯৩২ সালে তিনি তাঁর আত্ম জীবনীতে মুষ্টিযুদ্ধ জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, "একদিন যখন আমি আমার অনুশীলন সঙ্গী—(Sparring Partner) Frank Muskieর সঙ্গে মুষ্টি যুদ্ধ অনুশীলনে রত ছিলাম ঠিক এই সময় আমাদের পরস্পরের মস্তকদ্বয়ের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই আঘাতের ফলে আমি তখন কি রকম যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। ঠিক এই সময়টিতে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা মাত্র প্রতিপক্ষের একটি প্রবল ঘুরানো ঘুঁষি (swing) আবার আমার চোয়ালে এসে সজোরে আঘাত করল। এই আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়ে না গেলেও তখন কিন্তু আমার সমস্ত

চেতনা শক্তি নিয়ে তখন আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে Muskie-কে নক আউট করার জন্য অগ্রসর হলাম।

"এরপর অপর অনুশীলন সঙ্গী Eddie Egan রিং-এ প্রবেশ করলে তার সঙ্গেও আমি ঐ একই রকম ভাবে তিন রাউণ্ড লড়েছিলাম এই সময়টিতে পূর্বের কোন ঘটনার কথাই তখন আমার স্মরণ ছিল না। সেদিন আমার চিন্তা শক্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছিল।"

"পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি নিজেই নিজের মধ্যে জানতে চেষ্টা করছিলাম—আমি কে? আমি কি করছিলাম? ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের কোন জবাবই সেদিন আমি আমার মধ্যে খুঁজে পাই নি। এরপর এই অর্দ্ধ চেতন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসতে আরম্ভ করল তখন নিজের এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে সত্যসত্যই সেদিন আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

"অবশেষে ধীরে ধীরে আমার নামটি স্মৃতি পটে উদয় হল। এরপর বুঝতে পারলাম আমি একজন মুষ্টি যোদ্ধা। অতঃপর বহু অসংলগ্ন চিন্তার পর মনে এল আমার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। আমার এই অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অশ্রুতপূর্ব অবস্থার কথা চিন্তা করে বাস্তবিকই সেদিন আমি শিউরে উঠেছিলাম।

"এই সময় আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমি বোধ হয় একটা দীর্ঘ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম, না,আমি, তবে স্বপ্ন দেখিনি। এরপর আমি বিছানা থেকে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে অতি সতর্কতার সঙ্গে আগের দিনকার ঘটনার কথা জানবার চেষ্টা করলাম।

"তিনদিন পর্যন্ত আমি আমার অতি পরিচিত বন্ধুদেরও নাম মনে আনতে পারিনি। এই সময় আমি আমার প্রশিক্ষণও বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। শুধু মাত্র খাওয়া আর বেড়ানর সময় ব্যতীত আমি আমার cabin পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করি নাই। সব জিনিষটাই আমার যেন কি রকম অদ্ভুত ঠেকেছিল সেদিন। সেই দিনগুলিতে মস্তিষ্ক ও চোখের ভিতর কি রকম যেন উত্তপ্ত প্রলেপের অনুভূতি অনুভব করতাম তখন।

"আমার কার্য্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহের জন্য এই সময় তিনজন পত্রিকা সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি এই রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা বাহিরে প্রকাশ করতে দেওয়া যায় না; সুতরাং সাংবাদিকদের প্রবঞ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই Egan ব্যতীত অপর কাহারও নিকটই আমি আমার এই অদ্ভুত অবস্থার বিষয় কিছু প্রকাশ করি নাই। এই সময় Eddie আমার বিষয়ে একটি রোজনামচা (Diary) রাখতেন। পরবর্তী কালে আমি যখন এই বিভ্রান্তিকর দিনগুলির কথা পড়ি তখন বাস্তবিকই মনের মধ্যে কি রকম যেন একটা কৌতুক বোধ হয়।"

পূর্বোক্ত ঘটনার পর থেকেই মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের চিন্তা টুনীর মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিল। এই ঘটনার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে টুনীর ভেতর Punch Drunk উপসর্গাদির সম্ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছিল।

মুষ্টিযুদ্ধে মস্তিষ্কাঘাতের কারণ এবং উহার ফলাফল বিষয়ে বর্তমান কালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সকলেই প্রায় একমত। এই বিষয়ে প্রাণী এবং মনুষ্য মস্তিষ্কের প্রতিকৃতি অথবা প্রতিরূপ নিয়ে ইতিপূর্বে বহু পরীক্ষা হয়েছে। শব ব্যবচ্ছেদাগারেও বিষয়টি নিয়ে বিশদ পরীক্ষা হয়েছে। দীর্ঘদিন এইরূপ প্রচেষ্টার পর ইহা অতঃপর সর্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে—মস্তকদেশে তীব্র মুষ্ট্যাঘাতের জন্য মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।'

Dr. H. S. Martland ১৯২৮ সালে Journal of American Associationএ প্রকাশিত Punch Drunk নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "যাঁরা অধিকদিন নিজেদের মুষ্টিযুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই উপরোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। মাত্রার তারতম্য অনুসারে কেউ বা অল্প অথবা

কেউ অতিরিক্ত স্নায়ুঘটিত উপসর্গাদিতে ভুগতে পারেন.........।"

এই উক্তির পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন যে—মুষ্টিযুদ্ধে মস্তিষ্কাঘাতই ইহার একমাত্র কারণ।

মস্তিষ্কাঘাতের পর মুষ্টিযুদ্ধ জনিত চক্ষু আঘাত সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানার প্রয়োজন আছে।

Moorfield চক্ষু হাসপাতালের শল্য চিকিৎসাবিদ্ Mr. G. H. Doggart, M. D., F.R.C.S. বহুক্ষেত্রেই আহত মুষ্টিযোদ্ধার চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করেছেন। যুক্ত রাষ্ট্রের কোন জায়গায় একবার বক্তৃতাকালে তিনি অতীত দিনের কোন কোন মুষ্টিযোদ্ধার "Cauliflower Eye" নামক একরকম আঘাত জনিত চক্ষুরোগের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ অপথেলমোলজিক্যাল সোসাইটিতে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন "যাঁরা চিকিৎসা সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত তারা মুষ্টিযুদ্ধের স্থায়ী (Permanent) এবং সাংঘাতিক আঘাত সম্বন্ধে যথেষ্টই অবগত আছেন। এই বিষয়ে মানুষের চক্ষু যন্ত্রের উপর আঘাত নিয়েই একটি উপাখ্যান রচনা করা যায়। দৃষ্টি হানির জন্য শুধু আঙুল অথবা দস্তানা পরিহিত আঙুলই যে কেবল একমাত্র উপলক্ষ্য, তা নয়। পারস্পরিক মস্তকের কঠিন সংঘর্ষের ফলেও চক্ষুতে আঘাত পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। প্রচণ্ড আঘাতের পর মুষ্টিযোদ্ধার ভূলুণ্ঠিত হওয়ার কালেও কপোল দেশের সহিত ভূমির কঠিন সংঘর্ষেও তিনি চক্ষুতে আঘাত পেতে পারেন। মুষ্টিযুদ্ধ কালীন সময়ে চক্ষুর পাতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনাও খুব একটা বিরল নয়। মুষ্টিযুদ্ধ ক্রীড়ায় আঘাতের জন্য চক্ষু পেশীর (Oblique Muscle) পক্ষাঘাতের ঘটনাও প্রায়ই দেখা যায়।

চক্ষু যন্ত্রের সম্মুখভাগের আঘাতের মধ্যে নিম্নলিখিত আঘাতগুলিই প্রধান, যথা—Scleraর বিচ্ছিন্নতা (Rupture of sclera) কর্ণিয়া ছড়ে যাওয়া (Abrasion of Cornea), চক্ষু লেন্সের স্থান চ্যুতি এবং আঘাত জনিত চক্ষুর হানি। অক্ষিদেশের আঘাত জনিত উপসর্গের কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে "Cauliflower Choroid" নামক একপ্রকার চক্ষু রোগের সন্ধান পাওয়া যায়। অক্ষি গোলকের মধ্যে পীতাভ ধূসর (Greyish yellow) অনিয়মিত খাতের ন্যায় অংশকেই Cauliflower Choroid বলা হয়। Choroidএর উপর পূর্ববর্তী রক্তক্ষরণের জন্যই বোধ হয় এই প্রকার Cauliflower Choroidএর সৃষ্টি হয়।

ব্রিটিশ অপথ্যালমোলজিক্যাল সোসাইটির এই প্রেসিডেন্ট একবার বলেছিলেন, তাঁর চক্ষু রোগীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক রোগী ছিলেন মুষ্টিযোদ্ধা। এঁদের মধ্যে Bill Softly নামক একজন মুষ্টিযোদ্ধাকে

তিনি Moorfield হাসপাতালে চিকিৎসা করেছিলেন। Bill এই সময়ে মুষ্টিযুদ্ধে চোখের Superior oblique পেশীতে আঘাত পেয়ে Dr. Doggart দ্বারা চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্য লাভ করেন। এরপর পুনরায় চক্ষুতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে Bill যখন দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট চিকিৎসার জন্য আসেন তখন Billকে তিনি একটু পরিহাস ছলে বলেছিলেন, "কোন জিনিষকে দুটো করে দেখা বড়ই অসুবিধা জনক।"

উত্তরে Bill তাঁকে বলেছিলেন' "হ্যাঁ সত্যিই তাই। বক্সিং রিং-এ আমি একই সঙ্গে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখি। আমি যখন এদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করে ঘুঁষি মারি তখন বুঝতে পারি বোধ হয় সে সেখানে নেই। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিপক্ষের প্রবল মুষ্টাঘাতের জন্য বুঝতে পারি সে তবে সেখানেই আছে।"

Dr. Doggart এরপর অপর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি সত্যই খুব দুঃখজনক। পরবর্তী কালের এই রোগীটি একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। এই ভদ্রলোকের দুই চোখের রেটিনাই স্থান চ্যুত হয় (Double detachment of Retina)। ইহার ফলে এই ভদ্রলোক একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েন। Dr. Doggart অপেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যেও রেটিনার স্থান চ্যুতির ঘটনা লক্ষ্য করেছেন।

ক্রীড়াজনিত আঘাতের বিষয় চিন্তা করে যদিও এখানে মুষ্টি যুদ্ধের ভয়াবহ আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবুও কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন যে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তির উপরে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি, অন্যান্য অনেক ক্রীড়ার তুলনায় মুষ্টিযুদ্ধ জনিত ভয়াবহ আঘাতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ইহা ব্যতীত অনেকেই মুষ্টিযুদ্ধকে একটি পুরুষোচিত ক্রীড়া বলে মনে করেন। এই ক্রীড়ায় নিয়ম কানুনের প্রতি দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারি মুষ্টিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজন শক্তি, সামর্থ্য, নিষ্ঠা, আত্ম-সংযম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তৎপরতা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ঐ কয়টি গুণের একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই অনেকে এই ক্রীড়াকে ক্রীড়া সমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া বলে মনে করেন। একথাও সত্য যে অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে উপযুক্ত নিয়মাবলী পালনের দ্বারা উপযুক্ত ওজনের মুষ্টিবিদ্‌দের মধ্যে মুষ্টি ক্রীড়ায় সাংঘাতিক আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল।

ছেলেদের পাততাড়ি

অলৌকিক ঘটনা

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগে ভারতবর্ষে নানা রকমের ইউরোপীয়ান এসেছিল। এদের মধ্যে পর্তুগীজরা একদল। তাদের সঙ্গে বহু প্রকৃতির লোক আসে, যথা, নাবিক, বণিক্, যোদ্ধা, ধার্ম্মিক ও নানা জাতীয় কর্ম্মকার। এরা ভারতের পশ্চিমে ঘাঁটি বেঁধে ছিল ও সে জায়গার নাম দিয়েছিল গোয়া। এসব ঘাঁটিগুলির উত্তরে ছিল এখনকার মহারাষ্ট্রপ্রদেশ এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মহীশূর প্রদেশ। বেশ কিছুটা এর সমুদ্রের উপকূল। গোয়ার পাশের দুটি ছোট ছোট দ্বীপের নাম তারা দেয় দামান ও দীউ। এখানের লোকেরা খুবই সরল প্রকৃতির, বেশীর ভাগ চাষবাস করে বা মাছ ধরে। সেইখানে উপকূলে নারকোল গাছ ছড়াছড়ি। এগুলির থেকে লোকেদের কিছু আয় আসে।

৩০০ বছর আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন খৃষ্টধর্ম প্রচারক বিখ্যাত মহর্ষি জেভিয়ার (St Xavicr) যাঁর মৃতদেহ আজও জগতের বহুলোক গোয়ায় দর্শন করতে আসে। এই তীর্থে দশ বছর অন্তর নানা দেশের খৃষ্টানরা একত্র হয়। তখন মহর্ষি জেভিয়ারের দেহ বিরাট মিছিল করে গোয়ার প্রধান নগর পাঞ্জিমের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় লোকমুখে বহু অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা শোনা যায়।

এরকম একটি ঘটনার কথা লোকমুখে বহু যুগ ধরে প্রচলিত। প্রায় দুশো বছর আগে' মহর্ষি জেভিয়ারের দেহ যে বছর মিছিলে বার করা হবে সেই বছর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে দীউ দ্বীপে। সে বছর তীর্থ করতে এসেছিল ভারতের নানান জাতীয় খৃষ্টানরা বহুদূর থেকে। দলে দলে এরা গোয়ায় এসেছে; আর শেষ পর্য্যন্ত মিছিলের সময় পাঞ্জিম শহরে আর লোক ধরে না। প্রত্যেকটি ধর্মশালা, হোটেল, বাড়ি সবই ভরে গেছে, গরীব লোকেরা রাস্তায় তাঁবুর নিচে আশ্রয় নিয়েছে বা গির্জ্জার প্রাঙ্গণে বাস করছে। আশেপাশের ছোট ছোট দ্বীপগুলি থেকেও চাষী, জেলে ও মাঝির দল শহরে এসে পড়েছে। সহরে বেশ গমগমে ভাব, দোকান পাট খুব লাভে ব্যবসা করছে, কারণ তীর্থের সময় সকলের উপার্জ্জন ভালই হয়।

দীউ দ্বীপে কতগুলি তীর্থযাত্রী এক সঙ্গে বসে পরদিন পাঞ্জিমে যাবার ব্যবস্থা করছে। এরা জেলে, সারাদিন মাছ ধরে সেগুলি বেশ ভাল দামে বিক্রি করতে পেরেছে কারণ এই সময় সকলের ব্যবসা ভাল হয়। সকলের মন উৎসাহে ভরা। রাত্রে খেয়ে নিয়ে তারা বসে আছে এমন সময় বাইরে দরজায় কে জোরে আওয়াজ দিল।

জেলেদের সর্দ্দার উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল যে একজন অচেনা লোক, হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সর্দার আগে ভাল করে দেখে বলল "তুমি কে হে? কোথা থেকে এসেছ? এত রাত্রে তোমার কি চাই?"

লোকটা বলল, আমি দীউ দ্বীপ থেকে কিছু দূরে একটি দ্বীপে বাস করি। এবারে তীর্থ করবার সখ ছিল তাই এখানে এসেছি নৌকা করে। নৌকা তো ওইখানে বেঁধে রেখেছি কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় কাটাব তাই ভাবছি। আমি তো অতি গরীব, বেশী পয়সা খরচ করতেও পারব না।"

সর্দার বলল: "চল ওই একটু দূরে এই গাঁয়ের একমাত্র ধর্মশালা দেখা যাচ্ছে। আজ রাত্তিরের মত তোমাকে সেখানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কারণ আমার বাড়ী তো লোকে ভরা।"

লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে সর্দার অন্ধকারে সেই ধর্ম্মশালার দিকে চলল। দূরে সমুদ্র্র ঢেউ দেখা যাচ্ছে; সারি সারি নারিকেলের গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয় এগুলির ছায়া বালির উপরে বড় দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। সর্দার লোকটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলেছে, তারও মনে ভয়। কি জানি কেন গা ছম্ ছম্ করছে তার; তাকে তো একলা ফিরতে হবে।

ধর্ম্মশালায় পৌঁছে তারা দেখল যে সব দরজা সেখানে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করবার পর দু'জন লোক দরজা খুলে বাইরে এসে তাদের জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্তিরে দরজায় আওয়াজ দিচ্ছ কেন তোমরা?"

সর্দার এগিয়ে গিয়ে বলল" আরে, ডাক্রুজকে বলো, যে জেলেদের সর্দার একজন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। তাকে আজ রাত্তিরের মত যেমন করে হোক আশ্রয় দিতে হবে তোমাদের এখানে।"

দরজা বন্ধ করে ধর্ম্মশালার লোকদুটো ডাক্রুজকে ডাকতে গেল ভিতরে। কিছুক্ষণ পর ডাক্রুজ এসে বলল" দেখ সর্দার, আমার এখানে তো একেবারে জায়গা নেই। তুমি ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।"

সর্দার নাছোড়বান্দা, সে বলল "না বাবা, যেখানে পার ওকে রাতটুকু কাটাতে দাও। সকালে উঠে ও তো চলেই যাবে।"

ডাক্রুজ তখন বলল, "সর্দার, ওই গোয়াল ঘরের পিছনে খড় খোল যেখানে রাখা হয় ওখানে যদি ও থাকতে পারে তবে আজ রাত্তিরটা ও এখানে কাটাতে পারে।"

লোকটা তক্ষুণি গোয়াল ঘরে যেতে রাজি হলো ও সর্দার তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিয়ে তারপর বিদায় নিল। জেলেও সারাদিন পরিশ্রম করে অতি ক্লান্ত হয়েছিল। সে কিছু খড় খোল একসঙ্গে জড় করে একটা বিছানা তৈরী করে শুয়ে পড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে কিসের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশের ঘর থেকে কাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জেলে আধঘুমন্ত অবস্থায় তা শুনতে লাগল।

হেঁড়ে গলায় কে বলছে, "আমি জানি ওই নারকোল গাছের গোড়ায় সোনা পোঁতা আছে। বহুদিন আগে বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক আলফোন্‌সো ডি এল্ বুকার্ক (Alfonso de Albuquerque) এই বন্দরে বহু জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন। এখান থেকে বহু মালপত্তর ধন-দৌলত নিয়ে দেশে ফিরে যাবার সময় একটি জাহাজ এখানে ডুবে যায়। আর ওই সব সোনাদানা এখানে ওই গাছগুলির নীচে পোঁতা আছে। আমাকে একজন পাদ্রি বলেছিলেন যে, যে সময় মহর্ষি জেভিয়ারের দেহ সকলে দর্শন করে সেই সময় ওই নারকোল গাছগুলি রাত্রে গুঁড়ি ছেড়ে জলের ভিতরে চলে যায়। আর তখন কেউ চেষ্টা করলে সেই সব সোনা দানা খুঁজে নিয়ে নিতে পারে।"

মিহি গলায় কে বলল, "এ তো বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। আমাদের তবে আজই রাত্রে এক্ষুণি গিয়ে সমুদ্রের ধারে গাছগুলির উপর নজর রাখতে হবে। যদি সত্যি সেগুলি নড়ে তবে তাড়াতাড়ি সোনা খুঁজে নিয়ে পালাতে হবে।"

এবার তিন-চারজনের গলা একসঙ্গে শোনা গেল "তাহলে দেরি করে লাভ নেই। চলা যাক।"

এই সব কথা শুনে জেলের ঘুম একেবারে কেটে গেলো। সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। গায়ে চাদরটা মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সে ধর্ম্মশালা

ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সামনেই দেখতে পেল চারজন লোক চাদর মুড়ি দিয়ে লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলেছে। জেলে কিছু দূরত্ব রেখে তাদের পিছন পিছন চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর দূরে সমুদ্রের জল দেখা গেল, তার তীরে বড় বড় নারকোল গাছগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে যেন বরকন্দাজের মত লাইন বেঁধে। মানুষগুলি একটি বালির ঢিপির পিছনে বসে পড়ল আর জেলেও তাদের দেখাদেখি কিছু দূরে আর একটি ঢিপির পিছনে লুকিয়ে রইল।

ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হলো। চাঁদ যেন সরে এসে আকাশের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল। সমুদ্রের ঢেউগুলি উঁচু হতে হতে প্রায় মেঘে গিয়ে ঠেকেছে, এমন সময় প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে নারকোল গাছের মাঝখানের যেটি সবচেয়ে বড় সেটি নিজের গুঁড়ি ছেড়ে তীব্র বেগে সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগল। সে এক অদ্ভুত আর ভয়াবহ দৃশ্য। যেন একটি দানবের মত সেই গাছটা এগোচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে চড় চড় মড় মড় করে আওয়াজ হতে লাগল চারিদিক থেকে। এরপর এক এক করে সব গাছগুলি সেই প্রথমটার পিছন পিছন চলল। সকলে হতভম্ব হয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগল। জেলে তো হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করল।

গাছগুলি যখন সমুদ্রের জলে বেশ কিছুদূর এগিয়ে চলে গেছে তখন সেই চারটি লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গাছের গুঁড়িগুলির দিকে গেল। সেখানে পৌঁছে তারা গুঁড়ির নিচের মাটি খুঁড়ে সোনা খুঁজতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পরে একজন "পেয়েছি পেয়েছি" বলে চীৎকার করে উঠল। এরপর চারজনে চেঁচাতে শুরু করল। এবার জেলে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখল যে চারজনে দুহাতে মুঠো মুঠো করে মোহর তুলছে আর সেগুলি কোঁচড়ে পুরছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিৎকারের প্রতিধ্বনি চারিদিক থেকে শোনা গেল। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড।

কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আকাশ যেন অন্ধকার হয়ে গেল। চাঁদ আর অত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, এমন সময় বিরাট আওয়াজ করে ঢেউয়ের উপর চড়ে সেই গাছগুলি তীরে এগিয়ে এল। হতবাক্ জেলে দেখল সেই দানবের মত গাছগুলি সারি দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে ওই চারটা চোরের দিকে। তাদের তো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা তখনও সোনাদানা মাটি খুঁড়ে বার করছে আর কোঁচড়ে ভরছে। জেলে তাদের সাবধান করবার জন্য চিৎকার করতে গিয়ে দেখল যে ভয়ে তার গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। দেখতে দেখতে গাছগুলি একেবারে চোরগুলির কাছে এসে পড়ল। তারপর একে একে চারটে চোরের উপর গিয়ে লাফিয়ে পড়ে তাদের মেরে ফেলে গাছগুলি নিজের নিজের জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে গেল। একটি গাছ বাদে—সেটা আরো এগিয়ে যেখানে জেলে লুকিয়ে বসেছিল সেইদিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

জেলে এবার মরিয়া হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, "হে প্রভু আমাকে রক্ষা কর। আমি সোনা রূপা কিছুই চাই না আমার প্রাণ গেলে আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার সব না খেয়ে মরবে।"

গাছ কিন্তু তখনও এগিয়ে আসছে। জেলে এবার গলার ছোট ক্রসটা বের করে সামনে তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা ঘুরে গিয়ে অন্য গাছের দিকে চলে গেল। জেলে তখন সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় এগিয়ে এসে সেই চোরগুলির সব মৃতদেহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে জেলে দেখল যে সেই চারটে লোকের কোন চিহ্ন নেই। নারকোল গাছগুলি দেখে কে বিশ্বাস করবে যে গতরাত্রে এদের কি ভয়ানক রূপ দেখা গিয়েছিল? জেলে কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে নিজের চাদরখানা গায়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সোজা পাদ্রিমের পথে রওনা হলো। প্রাণ রক্ষার জন্য মহর্ষি জেভিয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে হবে তাকে। যা শুনেছিল, যা দেখেছিল সে কথা কিন্তু কখনও কাউকে বলা চলবে না। অলৌকিক যা তা যত অজানা থাকে ততই পাপ ও অধর্মের সম্ভাবনা কম থাকে।

বেতন কমিশনের সুপারিশ

যুগবাণী সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

তৃতীয় বেতন কমিশন তাঁদের সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করেছেন। এই সুপারিশের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এই সুপারিশের সুবিধাদি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ৪০ লক্ষ কর্মচারীরাই পাবেন। প্রতিরক্ষা ও রেলওয়ে বিভাগের কর্মচারীরা এই কমিশনের আওতায় পড়বেন কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলির প্রায় আট লক্ষ কর্মচারীরা এর কোন সুবিধা পাবেন না।

বেতন কমিশন নতুন যে বেতন কাঠামো খাড়া করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন বেতন ১৮৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ বেতন ৩৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। পার্থক্যটা ১৮ গুণ। এখানে এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে দরিদ্র ভারতবর্ষে সরকারের কোষাগার থেকে মাসে দশ হাজার, পাঁচ হাজার টাকা ভাতা পান এমন ব্যবস্থাও সংবিধানে করা হয়েছে। এটা যে আমাদের সমাজতন্ত্রী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু বর্তমানে যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'গরীবী হঠাও' আন্দোলনকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন এবং ধনবৈষম্য দূর করার জন্য নতুন করে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন এবং সারা দেশ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই সময়ে বেতন কমিশন কোন্ যুক্তিতে কর্মচারীতে কর্মচারীতে বৈষম্য বৃদ্ধিতে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন? আমরা বিস্ময় বোধ করছি যে, বেতন কমিশন নিম্ন পর্যায়ের কেরানীদের বেলায় বেতন বৃদ্ধি করেছেন ১২ টাকা, মধ্য পর্যায়ের কেরানীদের ১৯ টাকা—আর অবর-সচিব ও তদূর্ধ পদাধিকারীদের বাড়িয়েছেন মাসিক ১২০ টাকা থেকে ৩০০ শত টাকা। এ কোন্ দেশী সমতা বিধান? আমলাদের কার্যকলাপ নিয়ে যখন শাসকদল বেশী সোচ্চার, তখন ভাল ছেলে আমদানীর অজুহাতে আই এ এস এবং আই সি এস ইত্যাদির মাসিক ৩০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নয় কি? অন্য চাকুরীওয়ালারা সবাই কি খারাপ ছেলে?

বেতন কমিশনের এই সব উদ্ভট যুক্তি জাতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী বলেই আমরা মনে করি।

১৯৬০-৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য বেতন বাবদ মোট খরচ হত ৫১১ কোটি টাকা, ১৯৭০-৭১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১১৮৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের ২৮% কর্মচারীদের বেতন দিতেই ব্যয় হয়। বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হলে আরও ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বাড়বে।

কিন্তু এই বাড়তি বেতন পেয়েও কর্মচারীদের কোন সুরাহা হবার নয়। দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ছে, বেতন বৃদ্ধির হার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না ফলে অসন্তোষ থেকেই যাবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন যতক্ষণ বাড়ানো না যাচ্ছে, ততক্ষণ বেতন, ভাতা বৃদ্ধি হলে জীবনধারণের মান বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে এই বেতন বৃদ্ধি হেতু সরকারকে বাজেটের ঘাটতি মোটাবার জন্য নতুন নোট ছাপাতেই হবে। তার ফল দাঁড়াবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। এ ছাড়া আরও মনে রাখা দরকার যে ৪০ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গই ভারতবর্ষের সব নয়। সারা ভারতবর্ষে সরকারী বেসরকারী বেতনভুক কর্মচারীর

সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এই ৪০ লক্ষ কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির কথা ভাবলেই চলে না বাকী ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কথাও মনে রাখা দরকার।

প্রশ্ন হচ্ছে ; আমরা কি বর্তমানে যাঁরা কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন এবং কিছু না কিছু রোজগার করছেন তাঁদের দিকেই নজর দেব, না যাঁরা বেকার, আধা বেকার, যাঁরা দরিদ্র রেখার নীচে পড়ে আছেন, তাঁদের দিকে দৃষ্টি ফেরাব। সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য কি ৪০ লক্ষ বা ১ কোটি ৭০ লক্ষের জন্য আরও একটা সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা, না যারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তাঁদের বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি, সব সম্পদ নিয়োজিত করা? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু সরকার নয়, সকলকেই দিতে হবে।

কারণ বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার কথা কেউ বললেই ট্রেড ইউনিয়ন আঁৎকে উঠবেন এবং কলকারখানা সব বন্ধ করে দেবেন। এ গোলকধাঁধাঁর অবসান চাই। গরীবী যদি হঠাতে হয়, এবং সেই শ্লোগান যদি আন্তরিক হয়, তবে গরীবী দূর করার কাজে সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৬৯-৭০ সালে সারা ভারতের মাথা পিছু আয় বছরে ছিল ৫৮৯ টাকা। গত দু'বছরের হিসেব এখনও প্রকাশিত হয়নি। যদি ইতিমধ্যে তা বেড়ে ৬০০ টাকাও হয়ে থাকে, তবে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৫০ টাকা। এই গড় আয়ের বিশ গুণ বেশী যদি সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারণ করা হয় তবে মাসে কারো বেতন ১০০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। সর্বনিম্ন বেতন গড় আয়ের পাঁচগুণ বেশী ধরলে দাঁড়ায় মাসে ২৫০ টাকা। প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন যেখানে ৩১৪ টাকা হওয়া উচিৎ বলা হচ্ছে সেখানে ১৮৬ টাকা কি করে ধার্য হল? নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের প্রতি বেতন কমিশন সুবিচার করতে পারে নি। তাঁরা তেলামাথায় তেল ঢালার নীতি অনুসরণ করেছেন। আয় বৈষম্য দূর করতে হলে সর্ব ভারতীয় বেতন কাঠামো বেঁধে দেওয়া কর্তব্য। সরকারী বেসরকারী সব ক্ষেত্রেই একই নীতি চালু না করলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার একটা জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে সকল ক্ষেত্রে কর্মচারীদের একই বেতন হার চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন, এটাই কাম্য।

বিজ্ঞানের নানা কথা

একটি আমেরিকান সরকার প্রচারিত বিবরণে নিচের খবরগুলি পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক দিগের ইহা হইতে প্রেরণালাভ সম্ভব হইতে পারে।

সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

ওয়াশিংটন, ডি সি—বিজ্ঞানীদের ধারণা, সূর্য্য পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে পারে। এখন প্রশ্ন, কেমন করে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই প্রশ্ন সমাধানের ভার দিয়েছে গবেষকদের চারিটি দলের ওপর।

পৃথিবীর ৩৫ হাজার কিলোমিটার উর্ধ্বে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে একটি সৌর শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের যে সব প্রযুক্তিগত সমস্যা আছে তা এই গবেষকদলগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন। এই কেন্দ্রটি একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপরে থাকবে আর সৌর-শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করবে এবং তা পৃথিবীতে পাঠাবে মাইক্রোওয়েভ রশ্মির সাহায্যে। পৃথিবীতে এই বিদ্যুৎ শক্তি প্রচলিত উপায়েই বিতরণ করা হবে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সৌরশক্তি থেকে বিরাট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে এই পদ্ধতির তুলনা করে কোন্‌টি বেশী কার্যকরী তা যাচাই করে দেখবে।

সমুদ্রে দূষিত তৈল নির্ধারণে বিমান

ওয়াশিংটন, ডি সি—তেলের দ্বারা জল দূষিতকরণ প্রতিরোধ করার কাজে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলবাহিনীর বিমানে একটি নতুন যন্ত্র স্থাপন করে এই বছরেই পরীক্ষা করে দেখা হবে। বিমানবাহিত একটি অনুভূতিশীল যন্ত্র

উদ্‌ভাবন করা হয়েছে। দেড় কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ২৩০০ বর্গ ফুটের মত ক্ষুদ্রায়তন অঞ্চলেও তেলের স্তর যন্ত্রটিতে ধরা পড়বে।

বিমানে দুটি যন্ত্র বসানো হবে। তাতে দূষিত তেলের স্তর থেকে অতিবেগনী রশ্মি নিঃসরণ ধরা পড়বে আর জলের উপরিভাগের তাপমাত্রার পার্থক্যও নির্ধারিত হবে। তেলের স্তর জলের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বদলে দিতে পারে। তাপমাত্রা নির্ধারক যন্ত্রটি তাপমাত্রার এক ডিগ্রির এক পঞ্চমাংশ পার্থক্যটিও জানাতে পারবে। যন্ত্রটি থেকে এই তথ্য বিমানের মধ্যে রক্ষিত আর একটি যন্ত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সমুদ্রের ১৫ হাজার পাঁচশ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল প্রত্যহ পর্যবেক্ষণ করার কাজে উপকূলবাহিনী ছয়টি বিমানে এই যন্ত্র স্থাপিত করবে। ম্যাসাচুসেটস, ফ্লোরিডা, মিসিগান, ক্যালিফোর্ণিয়া ও টেকসাসে এই সব বিমান থাকবে।

প্রাচীন অট্টালিকা সংরক্ষণ

নিউ ইয়র্ক সিটি —চুনাপাথর, বেলেপাথর ও মার্বেল পাথরের অট্টালিকা ও স্মৃতিমন্দির সংরক্ষণের একটি পদ্ধতির জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চারূ কলার একজন অধ্যাপককে একটি পেটেন্ট মঞ্জুর করেছে। পদ্ধতিটির নামকরণ হয়েছে বেরিয়াম এথিল সালফেট পদ্ধতি। ইরানের পারসিপলিস, এথেন্সের পারথেনন, ওয়াশিংটনের লিঙ্কন স্মৃতিসৌধ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

পদ্ধতিটি উদ্‌ভাবন করেছেন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সিনিয়র কেমিষ্ট ডঃ এডওয়ার্ড ডেল সেরি। এটি ব্যবহারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে শিকাগোর সেন্টৌন করপোরেশনকে।

এই পদ্ধতিতে জলে গোলা সালফেট কোনও পাথরের ছিদ্রযুক্ত অংশটিতে পুরে দেওয়া হয়। পাথরটিকে কঠিন ও সঙ্কুচিত করার জন্য সালফেট ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। যে সব পাথরে শতকরা অন্ততঃ পাঁচভাগ ওজনের ক্যালসিয়ম কার্বনেট আছে সেই সব পাথর সংরক্ষণের কথাই পদ্ধতিটি সম্পর্কে পেটেন্টে বলা হয়েছে।

কমপিউটারে আলোচনা

মারে হিল, নিউ ইয়র্ক—মুদ্রিত ইংরেজী লেখাকে সুবিন্যস্ত ইংরেজী বক্তৃতায় পরিণত করার জন্য একরকম কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন বেল ল্যাবোরেটারীর দুজন গবেষক কর্মী। কম্পিউটারে শিক্ষাদান পদ্ধতি, সহজে ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন এবং অন্ধদের জন্য পুস্তক পাঠযন্ত্র উদ্‌ভাবনের সম্ভাবনা থাকবে এই কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে। অবশ্য এ সব এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে।

এর জন্য কোন অনুবাদ বা মানুষের রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হবে না।

একটি ছাপা ইংরেজী কাগজ টেলিটাইপ রাইটার থেকে কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে কম্পিউটারটি বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করে তাতে সময় ও জোর চিহ্নিত করে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য তার স্মৃতিভাণ্ডারে জমা করে রাখে। একটি বিন্যাস-কারক যন্ত্র কৃত্রিম স্বর সৃষ্টি করে। কম্পিউটারটি স্বরোৎপাদন, বক্তৃতার ধরণ ও লিখিত ও কথ্য ভাষার মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিন্যাসকারক যন্ত্রটিকে নির্দেশ দেয়।

লেসার রশ্মি সাহায্যে চক্ষুচিকিৎসা

ষ্ট্যানফোর্ড, ক্যালিফোর্ণিয়া—যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউটস অব হেলথ এর অনুদানের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে লেসার রশ্মির সাহায্যে নিরাপদে চক্ষু চিকিৎসার একটি যন্ত্র ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আবিষ্কার করেছেন। এই প্রণালীটিকে বলা হয় 'লেসার ফটোকোয়াগুলেশন'। চোখের রেটিনা বিচ্যুতির চিকিৎসা, টিউমার নিরাময়, রোগ ছড়ানো বন্ধ করা ও অন্যান্য কাজেও এটি ব্যবহার করা যায়।

চোখের একটি অংশ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা বেছে নিয়ে যন্ত্রটি সেই জায়গায় লেসারের তীব্র শক্তি প্রয়োগ করে কারণ, চোখের টিসু ফটো কোয়াগুলেশনে ধ্বংস

হয়। দূরবীক্ষণের মত একটি পর্যবেক্ষণ যন্ত্র বা একটি স্লিট ল্যাম্প যন্ত্রটিতে থাকে। সেই আলোর সাহায্যে রশ্মিটি ঠিক জায়গায় পড়ে এবং জায়গাটার আয়তনও নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যালো অ্যাল্টোর কোহেরেন্ট র‍্যাডিয়েশন ল্যাবোরেটারিজ যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করছে এবং ইতিমধ্যে এইরকম ১৫০টি যন্ত্র বিক্রি হয়েছে।

হুক-ওয়ার্মের আক্রমণ

সিবা রিসার্চ সেণ্টার, বম্বের প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক ডাঃ এইচ জি সেন, এম এস পি-এইচ ডি, "চিকিৎসক সমাজ" পত্রিকায় হুক-ওয়ার্মের আক্রমণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে এই রক্তশোষক কৃমি মানব জীবন ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও অধিক ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে খবর পাইতেছি যে 'বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৩২০০ মিলিয়ন লোক বাস করে।......এর মধ্যে প্রায় ১০০ মিলিয়ন লোকের দেহে এমন একটি পরজীবী প্রাণী রয়েছে যা ক্রমাগত তাদের জীবনী শক্তি হ্রাস করছে। মানব দেহের অনিষ্টকারী হিসাবে সাম্প্রতিককালে ম্যালেরিয়া এবং হুক-ওয়ার্ম সংক্রমণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ম্যালেরিয়ার পরাক্রম এখন স্তিমিত প্রায়। কিন্তু হুক-ওয়ার্মের অভিযান অব্যাহত। ১৯৪৭ সালে এক ব্যাপক সমীক্ষায় পৃথিবীর মানুষের মলের প্রায় এক পঞ্চমাংশে হুক-ওয়ার্মের উপস্থিতি ধরা পড়েছে এবং এতদিনে তা আরও বেড়েছে। সেইজন্যই অন্য কোন কৃমির আক্রমণ চিকিৎসকদের এমন চিন্তিত করেনি।

"১০ কোটি লোক আক্রান্ত কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাবে এমন কথা নয়। উপযুক্ত খাদ্যমান থেকে বঞ্চিত মানুষের, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে যা খুবই স্বাভাবিক, দেহে পঞ্চাশের অধিক কৃমির উপস্থিতি সাধারণতঃ রোগ লক্ষণ প্রকাশ করে। আমাদের দেশে এই সংক্রমণের হার ভয়াবহ শতকরা প্রায় ৮০—৯০ ভাগ বিশেষ করে খান ও কৃষি অঞ্চলে। অনুন্নত দেশ সমূহে হুক-ওয়ার্মের প্রাদুর্ভাব বেশী, মুখ্যত অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবের জন্য।

"হুক-ওয়ার্ম প্রধানতঃ দু প্রকারের নেক্টের আমেরিকানাস এবং অ্যাঙ্কাইলো স্টোমা ডিওডিন্যালী। প্রথমটি তুলনায় নবাগত, ১৯০২ সালে আমেরিকায় প্রথম দেখা যায় এবং তখন একে 'মার্কিণ' হত্যাকারী বলে অভিহিত করা হয়েছিল। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ইয়োরোপে। নেক্টের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি এবং উষ্ণদেশে শতকরা ৯০ ভাগ হুকওয়ার্ম সংক্রমণ হয় এদের দ্বারা। স্বাভাবিক ভাবেই আফ্রিকার ক্রীতদাসদের শরীর মাধ্যমে আমেরিকায় এদের আবির্ভাব। প্রায় তিন হাজার পুরুষ ধরে হুকওয়ার্ম মানুষের দেহাভ্যন্তরে এরা বসবাস করছে বলে মনে করা হয়।

....

"যদিও চামড়ার মধ্য দিয়েই হুকওয়ার্মের সংক্রমণ হয় কিন্তু হুকওয়ার্মের লার্ভা দ্বারা সংক্রামিত কোন ফল না ধুয়ে খাওয়ার জন্যও অনেক সময় রোগাক্রান্ত হতে হয়।

....

"......হুকওয়ার্ম রোগ নিয়ন্ত্রণে সমাজে মল নিকাশন ও বিনাষ্ট বিষয়ে জনসাধারণের সম্যক্ জ্ঞান ও শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। শহরাঞ্চলে সিউয়েজ ব্যবস্থায় এ সমস্যা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নয়। গ্রামাঞ্চলে স্যানিটারি পিট, বোর হোল লেট্রিন প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চালু করা উচিত। দেশের পরিবেশ, খাদ্যের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে গরীব শ্রেণীর পুষ্টির মানোন্নয়ন ও সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ দিয়ে গণচিকিৎসা না হলে এই সংক্রামক রোগ তাড়াতাড়ি দেশ থেকে নির্মূল করা কখনও সম্ভব হবে না।"

সাময়িকী

কেন্দ্রীয় সরকার কি ধনীদের সহায়তা করেন ?

কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয় না যে তাঁহাদের ধনীদিগের প্রতি কোনও সহানুভূতি আছে। বরঞ্চ ইহাই মনে হয় যে তাঁহারা ধনীদের উচ্ছেদ করিয়া সরকারী ধননীতিরই প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিতেছেন। তৎসঙ্গে হয়ত আমলাদিগের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির আয়োজনও কিছু কিছু চলিতেছে। যুগজ্যোতি সাপ্তাহিকের মতামত বিচার করিলে মনে হয় যে কেন্দ্রীয় দফতরে এমন এমন উচ্চপদস্থ আমলা আছেন যাঁহারা ধনীদিগের সুবিধার জন্য শাসনযন্ত্র নানা ভাবে চালাইয়া সেই সকল সমাজবিরোধী ধনপতিদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। যথা ঐ পত্রিকায় বলা হইয়াছে :

গরিবী হটানেওয়ালী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে যে-সকল কর্মচারী ধনীদের স্বার্থে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদেরই বদলী করা হইতেছে। অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহাদের সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। অতীতে কলিকাতার অ্যাডিশনাল কলেক্টর অফ কাষ্টমস্ শ্রীবাস্তব কতগুলি শ্রেষ্ঠীপতিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া সে সম্পর্কে তদন্ত করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অবিলম্বে ঐ পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল এবং তাঁহার আনীত অভিযোগগুলি অসীমশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে একটি কর্মহীন পদে নিয়োগ করিয়া হায়দ্রাবাদে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে আয়কর বিভাগের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী সরোজকুমার ঘটক কতগুলি হাঙ্গরকে বেড়াজালে ঘিরিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কয়েকজনকে হাতেনাতে ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের গুপ্ত আডডাগুলিতে খানা-তল্লাসী করিয়াছিলেন এবং গাদাগাদা মূল্যবান্ দলিল-পত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। হাঙ্গরদের আর জাল হইতে বাহির হইয়া যাইবার কোন উপায়ই ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে সূত্র আকর্ষিত হইল ও তাঁহাকে ঐ পদ হইতে সরাইয়া লওয়া হইল। তিনি এখন ত্রিপুরা সরকারের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি আবার স্পেশাল এনফোর্স ডিরেক্টরেটের ডেপুটি ডিরেক্টর দেবকুমার গুহের উপরও আয়কর বিভাগে বদলীর আদেশ আসিয়াছে। তিনি প্রায় ১০০ কোটি টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে কারচুপির জন্য কয়েকটি মামলা আরম্ভ করিয়াছেন। এই মামলাগুলিতে সংশ্লিষ্ট আছেন আমীনচাঁদ পিয়ারিলাল এণ্ড কোম্পানীর জিৎপাল, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আর টি শাহ, বিড়লা গোষ্ঠী ও অধুনা সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কল্যাণ বসু।

১৯৬৮ সালে ঐ পদে নিযুক্ত হইবার পরেই দেবকুমার গুহ জিৎপাল ও অন্য কয়েকজন সিন্ধীর বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা লইয়া কারচুপির অভিযোগ আনা হইয়াছিল। তিনিই ঐ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি বৃহৎ শ্রেষ্ঠীপতিদের বিদেশী মুদ্রা লইয়া নানারূপ জুয়াচুরি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশের পুলিশ ও অন্যান্য সংগঠনের সহিত গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হইয়াছে কল্যাণ বসুর বিরুদ্ধের মামলায় তাহা প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। দেবকুমার জানিতেন যে তাঁহাকে বদলী করা হইবে—তাই তিনি কাগজপত্র এমনভাবে তৈয়ারী করিয়াছেন যে তিনি উপস্থিত না থাকিলেও ঐ হাঙ্গররা যাহাতে জাল কাটিয়া বাহির হইয়া না যাইতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে শুধু তাঁহার বদলী নয়-ঐ কাগজপত্রগুলি হস্তগত করাও প্রয়োজন। দেবকুমার গুহ ঐ কাগজপত্রগুলি নিজের কাছেই রাখিতেন এবং অফিসের পর সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিতেন, একথা ঐ হাঙ্গরদের অজানা ছিল না।

বদলীর হুকুম আসিবার সাথে সাথেই তাঁহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। কোনরূপ গ্যাস প্রয়োগে বাড়ী শুদ্ধ লোককে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং শ্রীমতী গুহের বালিশের তলা হইতে চাবি বাহির করিয়া লইয়া আলমারী খুলিয়া সকল কাগজপত্র বাহির করিয়া সেগুলি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তবে তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আসল কাগজগুলি তাহারা পায় নাই। ঐ দিনে ফিরিতে রাত্রি হওয়ায় শ্রীগুহ ঐ কাগজগুলি সেদিনের মত অফিসের সিন্ধুকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ডাকাতরা অবশ্য আলমারী হইতে ৪০ ভরি সোনার গহনাও লইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শ্রীগুহের বাসভবন বেলতলা রোডে মুখ্যমন্ত্রীর গৃহের অতি নিকটে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য ঐ অঞ্চলে বিরাট পুলিশী টহলের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ডাকাতরা বিন্দুমাত্র ভীত হয় নাই এবং নির্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শ্রীগুহের বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি তিনি হাঙ্গরদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিবার সময়ই তাঁহাকে 'ধীরে চলিবার" পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আজ সেই 'হঠকারিতা'র-ই প্রতিফল পাইলেন বলিয়া মনে হয়।

বিচারক ও শাসক সম্বন্ধ

রাষ্ট্রীয় সুনীতির প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে যে কথাটা বিশেষ ভাবে রাজনীতিবিদ্‌গণ সম্মুখে রাখিয়া চলেন তাহা হইল আইন-প্রণয়ন কারী, বিচারক ও শাসনকার্য্যকারী ব্যক্তিদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধে নিজ নিজ স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থার কথা। এই তিন জাতীয় ব্যক্তিগণ স্বাধীন ভাবে চলিতে পারিলে জাতির স্বাধীন ভাবে চলিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। ডাঃ এম সি শীতলবাদ, ভারতের এক সময় যিনি অ্যাটর্ণি জেনারেল ছিলেন, তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় টেগোর ল লেকচারার হইয়া আসিয়া যে ভাষণ দিয়াছেন সে সম্বন্ধে যুগজ্যোতি সাপ্তাহিকের মন্তব্য অনুধাবন-যোগ্য। আমরা তাহা নিম্নে অংশত উদ্ধৃত করিতেছি :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টেগোর ল' লেক্‌চার' দিবার প্রারম্ভে ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইন-বিশারদ ডঃ এম সি শীতলবাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকবর্গ-ই যে কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তিস্বরূপ। ঐ সরকারের মূল ও প্রধান কর্তব্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র সম্পর্কে ভীতি বা অনুরাগ শূন্য বিচারকবর্গের দ্বারা বিচার কার্য্য পরিচালনা ব্যতীত আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনা করাও যায় না। আধুনিক জনকল্যাণ রাষ্ট্রগুলি নাগরিকদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বগ্রাসী আইনের গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই রাষ্ট্রের অবিচার হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কার্য্য পরিচালিত হয়, সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তিনি বলেন—বিচার কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে যেরূপ পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাহার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এই যে যাহাদের নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জনগণের অন্তরে পূর্ণ আস্থা বিরাজ করে, প্রশাসকদের কবল হইতে নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া জনগণের পক্ষে যেন কঠিন না হয়।

উপরোক্ত ধরণের বিরোধের মীমাংসার ভার যুক্তরাষ্ট্রিয় (কেন্দ্রীয়) প্রশাসকদের হাতে ন্যস্ত করা যায় না, কারণ তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রিয় ও রাজ্য আইন সভা গুলির (সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা সমূহের) উপর প্রশাসকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রিয় আইনসভা (সংসদ) এর হাতেও এই অধিকার অর্পণ করা চলে না, কারণ তাহা হইলে নিজের ও রাজ্য আইন-সভাগুলির কাহার কি ক্ষমতা তাহা নির্ধারণ করিবার অধিকার তাহার উপরই বর্তিবে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রিয় আইন সভা (সংসদ) রাজ্য বিধানসভাগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে ও তাহার ফলে

যুক্তরাষ্ট্রিয় (Federal) প্রশাসন ব্যবস্থায় মূল লক্ষ্যই বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। অতএব বিচার বিভাগই একমাত্র বিভাগ যাহার হাতে এই অধিকার সমর্পণ করা যাইতে পারে।

শীতলবাদ যাহা বলিয়াছেন তাহার সম্পর্কে কোন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরই মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে বাধ্য যে জনগণের যদি স্থায়ী ভাবে কোন মৌলিক বা জন্মগত অধিকার না থাকে এবং কোন ব্যাপারে নাগরিকের কতটুকু অধিকার থাকিবে তাহা স্থির করিবার ও সুবিধামত যখন তখন তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা যদি সংসদের হস্তে ন্যস্ত করা হয় তাহা হইলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অধিকারী প্রশাসকবর্গের অবিচার হইতে বিচারকগণ নিরপেক্ষ হইলেও কিভাবে জনগণকে রক্ষা করিবেন বা তাহাদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবেন? সরকারের নিপীড়নে নিজ অধিকার ক্ষুন্ন হইলে কেহ যদি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত হয় এবং বিচারকরা যদি সরকারের ঐ কার্যকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে নূতন আইন করিয়া ঐ নিপীড়ন বা অধিকার-হরণ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবার মত হিংস্রতা ও জিদ যে আমাদের প্রশাসকদের আছে, তাহা গত ২ বৎসরে বারে বারেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতের উচ্চতম আদালতের বিচারক দিগের উপর যাহাতে আমলাতন্ত্র পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রীয় দলপুতিগণ কোনও ভাবে প্রভুত্ব করিতে না পারেন, জাতীয় স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের দিক হইতে তাহা একান্ত ভাবে আবশ্যক। অধুনা যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে এই সকল কথা আরও প্রকট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জাতির সকল ব্যক্তির এখন এই বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

ফ্রান্সের পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষা

ফ্রান্স যে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে অস্টেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ আপত্তি করিতেছেন। সম্প্রতি প্যারীসে অস্ট্রেলিয়ার বিচার মন্ত্রী লাওনেল মার্ফি একটি টেলিভিশন বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে ফ্রান্সের এই সকল পরীক্ষার ফলে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকটি মানুষই শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি প্যারীসে থাকিতে ফ্রান্সের পারমাণবিক পরীক্ষা-বিশারদদিগের সহিত এই সকল পরীক্ষা পরিচালনার মানবীয় ক্ষতির বিষয় বিচার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকটি নরনারী শিশুর দেহে ক্ষতিকর পারমাণবিক কণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাইতেছে এবং ইহার কারন একমাত্র ফ্রান্সের দ্বারা অনুষ্ঠিত পারমাণবিক পরীক্ষাগুলির মধ্যেই লক্ষিত হইতেছে। অস্ট্রেলিয়ার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এই সকল পারমাণবিক কনিকার উপস্থিতি মানব জীবনকে নানা রূপে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে, বর্ত্তমানে কিম্বা সুদূর কালান্তিত অবস্থায় আঘাত করিতে পারে। ইহাতে মানব শরীরে জন্মগত নানা প্রকার ব্যাধির সৃজন হইতে পারে এবং এই কারণে অস্ট্রেলিয়াকে ফ্রান্স যাহাতে তাঁহাদের পারমাণবিক পরীক্ষা পরিচালনা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে না করেন সেইরূপ ব্যবস্থা চেষ্টা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে অস্ট্রেলিয়াকে এই জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের নিকটও অভিযোগ উত্থাপন করিতে হইতে পারে।

দেশ-বিদেশের কথা

লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

উরুগুয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সভার প্রথম সম্পাদক রোদনি আরিসমেনদি কলিকাতার রুশিয়ান কনসুল কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক বিবরণে লিখিতেছেন :

গত বছর ফিদেল কাস্‌ত্রো ও সালভাদোর আলেনদের সোভিয়েত দেশ সফর লাতিন আমেরিকায় অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন তুলেছিল। লাতিন আমেরিকার জাতিগুলির কাছে এই সফর সত্যিকারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে এনেছে। এই সব সফর আবার সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যকে তুলে ধরেছে।

কিউবায় সমাজতন্ত্র দৃঢ়মূল হয়েছে এবং চিলিতে জন ঐক্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ায় লাতিন আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের আরও প্রসার লাভের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে।

সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে বিরোধের, আমাদের যুগের প্রধান বিরোধের আলোকে এই ঘটনা এক আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমেরিকা মহাদেশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রগতিশীল চরিত্রকে এই ঘটনা উদ্‌ঘাটিত করেছে। আমাদের সমস্ত জাতির বড় আকারের মুক্তি সংগ্রাম এবং দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের উপর কিউবার বিপ্লব এবং চিলির বৈপ্লবিক, প্রভাবের ফলাএল দূরপ্রসারী।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মহাদেশে 'আর একটি কিউবা'র আবির্ভাবে বাধা দানের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 'প্রগতির জন্য মৈত্রী' কর্মসূচী সহ নানাবিধ সাহায্যকে কাজে লাগিয়েছিল; বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য বিশেষ সৈন্যদলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং কিউবা-বিরোধী, কামউনিষ্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' শুরু করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক একনায়ক সরকার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

চিলি ও কিউবায় প্রক্রিয়ার রূপ ও পন্থার পার্থক্য সত্ত্বেও দু'টি ঘটনার ঐতিহাসিক আধেয় একই রূপ। অবশ্য, চিলির বিপ্লব এখনও পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে 'উপনীত হওয়ার পথে' রয়েছে। এই সবই কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞা সূত্রাকারে গ্রথিত করা সম্ভব করেছে।

প্রথম—কিউবা বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক পথে উত্তরণের পন্থা নির্ধারণে নিঃসন্দেহে ফিদেল কাস্‌ত্রো ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর সাথীরা নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এই উত্তরণ ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা নয় অথবা কোন ব্যতিক্রমও নয়। এই উত্তরণের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই উত্তরণ দ্রুত সাধিত হয়েছে। এর পিছনে যে কারণ ছিল তা' হল সমাজের গভীর ও অপ্রতিরোধ্য সংকট আর এ সংকট আমাদের সমস্ত দেশেই বর্তমান। সারা দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক সংগ্রামে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তি সমাবেশের নতুন নতুন পরিবর্তনের কালে লাতিন আমেরিকায় ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের কর্মনীতির সংকটকে কিউবার বিপ্লব একই সময়ে তুলে ধরেছে।

দ্বিতীয়—কিউবায় বিপ্লবের জয় এবং চিলির বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর যত গুরুত্বই থাক না কেন তাতে নিশ্চয়ই এই মহাদেশের মুক্তির সমগ্র প্রক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অবিরাম আরও বেশী বেশী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে থাকায় মুক্তি আন্দোলন বেড়েই চলেছে। এর ফলে বিপ্লবের দিকে যাওয়ার নির্দিষ্ট 'পথগুলি' উন্মুক্ত হচ্ছে। এর প্রমাণ হল এমন সব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাঁরা

বুনিয়াদী সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত করছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী হুকুমবরদারী থেকে নিজেদের মুক্ত করছেন (যেমন পেরুতে এবং কিছুটা পরিমাণে পানামায় এবং খুব নির্দিষ্টভাবে না হলেও কোন কোন ব্যাপারে ইকুয়াডোরে। অথবা এমন সব সরকারও আছেন যেগুলির প্রগতিশীল প্রবণতা আছে, যেমন বলিভিয়া)। সম্প্রতি কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনী অনিবার্যভাবেই মুক্তির প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়ে যাবে।

১৯৭০ সালে আমাদের পার্টির ২০তম কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদের ও জন-বিরোধী চক্রগুলির জোয়াল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের জাতিগুলির ঐতিহাসিক সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ তরঙ্গোচ্ছ্বাস আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আন্দোলনগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার রূপগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক দেশে বৈপ্লবিক ধারা নির্দ্ধারণে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণেরপ্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাত্রায় পার্থক্য আছে। তবু বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্তর, রূপ ও পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির স্বতন্ত্র শ্রেণীসত্তা সত্বেও মোটের উপর এইসব আন্দোলন লাতিন আমেরিকার নতুন বাস্তবতা এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রমাণ দিচ্ছে।

অতএব সমগ্র প্রক্রিয়ায় একটিও বুনিয়াদী ও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত দিক উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এগুলি হল : আন্দোলনের চরম লক্ষ্য এবং বিপ্লবের প্রবেশপথের প্রসার ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের বিকাশের পথগুলিও স্মরণ রাখা উচিত।

আজ লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি প্রতিষ্ঠা একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাজ, কেবলমাত্র তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞা নয়। এটা রাজনৈতিক কৌশলের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যেহেতু পরিণত সামাজিক ও ঐতিহাসিক সমস্যাগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন সেইহেতু বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়ার জটিল প্রক্রিয়ার কোন কোন সময়ে গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক শক্তিগুলি ঘটনাবলীর পথ নির্দেশ করে। আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকশ্রেণী ও তার দলগুলির প্রকৃত রাজনৈতিক সম্ভাবনাসমূহ সব সময় তার সামগ্রিক ঐতিহাসিক ব্রতের সঙ্গে খাপ খায় না। এই ব্যাপারটি সমগ্রভাবে প্রক্রিয়াকে জটিল ও আরও কঠিন করে তোলে। গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রূপান্তরের সংগ্রামে সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা চালানোই হল এইরূপ অবস্থায় একমাত্র কার্যকর সূত্র।

লাতিন আমেরিকা ও পৃথিবীর বাকী অংশের নতুন বাস্তবতাগুলি বিচার করে এই কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। সমগ্র লাতিন আমেরিকার উপর কিউবার দৃষ্টান্ত ও চিলির জনগণের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার প্রভাব, আমাদের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জনগণের আন্দোলনের মধ্যে সংহতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরাট আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভূমিকা ক্রমেই বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করছে। এ সব অনুকূল আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে সব দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক সরকারগুলি ক্ষমতাসীন রয়েছে সেইসব দেশে বিপ্লবের অব্যাহত বিকাশ সুগম করতে পারে। এই কারণেই আমাদের পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আজকাল লাতিন আমেরিকার ভবিতব্যের এক সন্ধিক্ষণে ইতিহাস আমাদের উপর অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যভার অর্পণ করেছে—এই কর্তব্য হল বিপ্লবের সমীপবর্তী হওয়ার সম্ভাব্য মৌলিক পথগুলি খুঁজে বের করা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের মধ্যে, সমস্ত দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য কাজ করা।

তৃতীয়—লাতিন আমেরিকায় বৈপ্লবিক সংগ্রামের দু'টি দিককে জীবন তুলে ধরেছে: ক) বিভিন্ন দেশের বিকাশের স্তর ও হারের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে; খ) মোটামুটিভাবে ৫০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে আলোচ্য সমগ্র ঐতিহাসিক কাল জুড়ে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং লাতিন আমেরিকায় অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ যে চরমে উঠেছে তা' এইসব অভ্যুত্থান দেখিয়ে দিয়েছে। অবশ্য, প্রত্যেক দেশ বা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি, তাদের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর, তাদের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার বৈচিত্র্য এবং হাজার হাজার অন্যান্য উপাদান যা জাতীয় অনন্যতা নির্দ্ধারণ করে এবং শ্রেণীশক্তিসমূহের সমাবেশ ও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা পথের বৈচিত্র্য এবং সার্বজনীন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু অভিন্ন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন দেশে সামাজিক অর্থ-নৈতিক সংকটগুলির অনুরূপ কারণগুলি—যেমন, অভিন্ন নির্যাতনকারী ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী রণনীতিতে লাতিন আমেরিকাকে কাজে লাগানোর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম—এ সবই আমাদের দেশগুলির বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্ত করার শক্তিশালী উপাদান।

বেশ সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে, লাতিন আমেরিকাতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে এবং সেখানে যে কোন ঐতিহাসিক মোকাবিলার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণে যেরকম স্বাভাবিক সেই রকম কিছু কিছু ব্যর্থতা ও সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও বৈপ্লবিক আন্দোলন এখনও তুঙ্গে ওঠে নি। আমাদের মতে এটা পরিস্থিতির চমৎকার মূল্যায়ন। লাতিন আমেরিকায় এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যখন বৈপ্লবিক পূর্ব্ব উপাদানগুলি বাস্তবভাবেই পরিণত হয়ে উঠছে বা ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছে, যখন শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক তাত্ত্বিক ভিত্তি সংকীর্ণতর হচ্ছে, যখন সংস্কারের দাওয়াই দ্রুত তাদের প্রথম দিকের শক্তি হারাচ্ছে, নতুন নতুন সামাজিক স্তর বিপ্লবের স্রোতকে বাড়িয়ে তুলছে, সামাজিক অর্থ-নৈতিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্যে নিহিত বাস্তব কারণে যখন রাজনৈতিক অ-স্থিতিশীলতা প্রতিদিনের বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই অ-স্থিতিশীলতার অচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখা দিয়েছে শাসকশ্রেণীর গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতাগুলি এবং তাদের উগ্র অভিব্যক্তি—'গেরিলাদের' চক্রান্তে ঘন ঘন আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং শ্রমিক ও জনগণের প্রবল আন্দোলন।

এই রকম সব অবস্থায় কোন না কোন দেশে বৈপ্লবিক সংকট থেকে থেকে দেখা দিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব সংকটের ফলে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু অগ্রগামী শক্তিগুলি ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম না হওয়ায় এই নতুন পরিস্থিতিতে সম্ভাবনা থাকে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন ও গণআন্দোলন তখন সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার অবস্থায় না থাকার ফলে বিক্ষোভ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর অগ্রগামী শক্তিগুলি পরাজিত হয়।

গত দশ বছরেরও অধিককালের মধ্যে সংগ্রামের অসংখ্য রূপ দেখা গেছে, যেমন ধর্মঘট, রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, ছাত্র ও জনগণের ব্যাপক অংশের গণ-সংগ্রাম, বিভিন্ন ধরণের গেরিলা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সৈন্য বাহিনীর বিদ্রোহ, জনগণের সংগ্রাম (যেমন ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে বা বলিভিয়ায় হয়েছিল), বৈধ গোপন আন্দোলন, পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সশস্ত্র যুদ্ধ। শ্রমিক ও জনগণের ব্যাপক অংশের গণআন্দোলনই বিশেষভাবে ব্যাপক আকার লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনায় উল্লেখ করা যায়।

এইসব অবস্থায় লাতিন আমেরিকায় জীবন বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর সামনে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলি তুলে ধরেছে। এর জন্য বিগত দশকের বিপুল অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সামান্যীকরণের, যে সব পথে শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সব পথের প্রসার ও বিস্তারের, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভূমিকা বৃদ্ধির এবং কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে সংহত করে প্রত্যেক দেশে তাদের প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অগ্রবাহিনীতে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বিগত দশকে আমাদের পার্টিগুলি বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সমস্ত অসুবিধা ও বোধগম্য বিরতি সত্ত্বেও মোটের উপর লাতিন আমেরিকায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সংহত হয়েছে এবং কমিউনিস্টদের সংখ্যা ও আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব বেড়ে গেছে।

(২১৮ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাড়ে সাত হাজারকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে। ইহাতে বেকার সংখ্যা মনে হইবে যে আড়াই হাজার হ্রাস হইবে। কিন্তু নূতন বেকার আসিয়া জুটিতেছে মাসে তিন হাজার। ফলে বেকার সংখ্যা না কমিয়া বরঞ্চ মাসে পাঁচশত বাড়িয়াই চলিতেছে। এখন বুদ্ধিমান ছাত্রদিগকে শুধু কত বেকার বৃদ্ধি হইতেছে সেই প্রশ্নের উত্তরই দিতে বলা হইতেছে না; প্রশ্ন হইতেছে নুতন নিয়োগ বাড়িলেই যদি তাহার ব্যবস্থা হয় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বরখাস্ত করিয়া তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থার কি মূল্য থাকে? দ্বিতীয়তঃ যদি নুতন বেকার সংখ্যা কমাইতে হয় তাহা হইলে তাহা কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে? ভারতবাসীদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া, জন্ম নিয়ন্ত্রন করিয়া অথবা মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া লোক সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিয়া? কোন উপায়টাই সহজ সাধ্য মনে হয় না। মানুষ যদি চাকুরী না খুঁজিয়া নিজ শক্তিতে নিজের ও পরিবারের সকলের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে তাহা হইলেই বেকার সমস্যা দূর হইতে পারে। চাকুরী সৃষ্টি করিয়া ৫০ লক্ষ কিম্বা এক কোটি মানুষকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা একটা প্রায় অসম্ভব কার্য্য।

বিহারে খাদ্যাভাব—

সরকারীভাবে পাইকারী খাদ্যবস্তু ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইবার পরে বিহারে সরকারী সমর্থিত খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রগুলি বিক্রয়বস্তুর অভাবে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কালোবাজার প্রবল শক্তিতে কার্য্য ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার মূলে আছে সরকারীভাবে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কাহারও মাল বিক্রয় অনিচ্ছা। শুনা যায় সরকার গমের ক্রয় মূল্য স্থির করিয়াছেন ৭৬ টাকা কুইন্টাল হিসাবে। জনসাধারণের মতে এই মূল্যে গম বিক্রয় করিলে চাষীর গমের চাষের খরচও উঠে না। বাজারে গমের মূল্য একশত টাকা কুইন্টালেরও অধিক এবং সরকারী রীতিনীতির কথা পূর্ব্ব হইতেই আন্দাজ করিয়া লইয়া যাহাদের গম ছিল তাহারা সেই গম সরাইয়া নানা স্থানে অল্প অল্প করিয়া রাখিয়া দিয়াছে ও নানা স্থান হইতেই ক্রেতাদিগকে মাল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। সরকার নাকি মাত্র কয়েক শত মন গম ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতঃপর কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? জোর জুলুম করিয়া অল্প মূল্যে গম কিনিবার চেষ্টা করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে। নয়ত সরকার যদি চাষ করিবার ভারও নিজ হস্তে লয়েন তাহা হইলে হয় মাল উৎপাদন বন্ধ হইবে নয়ত তাহার খরচা এত অধিক হইবে যে তাহাতে খাদ্য বস্তুর মূল্য সদ্য দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইবে।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ প্রথম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৮০ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিমান দুর্ঘটনা কেন হয়?

কোনও প্রকার দুর্ঘটনাই যে কেন হয় তাহা বলা সহজ নহে। কারণ দুর্ঘটনা সচরাচর অজানা অবস্থার আকস্মিক উদ্ভবের ফলেই হয় এবং যাহা অজানা তাহা হঠাৎ কেন উদ্ভূত হইল সে প্রশ্নের উত্তর স্থিরনিশ্চয় ভাবে দেওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। বহু ব্যক্তির বহু অনুমান, অজ্ঞাত ও অর্দ্ধজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনা ও তৎসংক্রান্ত জল্পনা কল্পনা কোন্ পথে চলে, অথবা তাহার ভিতরে বাস্তব অথবা সত্যভিত্তিক তথ্য কতটা থাকা সম্ভব; এই সকল কথাই নিশ্চয়তার সীমার বাহিরের ও নির্ভরযোগ্য হইতেও পারে বা না হইতেও পারে বলিয়া ধার্য্য করিতে হয়। অতএব যখন কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তখন সে দুর্ঘটনা কেমন করিয়া হইল সে সম্বন্ধে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবেই এবং হয়ও। সত্য সত্য কি কারণে, কাহার দোষে, অবহেলায়, বা কোন অবস্থাবিপর্যয়ে কি হইয়াছিল তাহার বিচার সহজসাধ্য নহে এবং সকল যান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্য্যকর ছিল কি না তাহা নির্ণয় করাও দুর্ঘটনা-বিদ্ধস্ত যন্ত্রাদি বা সেইগুলির ভগ্নাবশেষ হইতে স্থির করা আরও কঠিন।

সম্প্রতি যেখানে যেখানে যেরূপ দুর্ঘটনাই ঘটে, সকলেই প্রথমতঃ কোন আততায়ীর গুপ্ত দুষ্কর্ম্মের সম্ভাবনা আছে কি না চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। রেলের লাইন ঢিলা করিয়া দেওয়া, উঠাইয়া দেওয়া প্রভৃতি হইতে পারে কি না, বিমান হইলে তাহাতে কোনও বিস্ফোরক রাখিয়া দিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা ফাটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল কি না;

এই জাতীয় সম্ভাবনার আলোচনা প্রায়ই হইয়া থাকে। ইহার কারণ যে, শত্রুতা করিয়া বহু নির্দোষ লোকের প্রাণনাশ করিতে পারে এইরূপ বিবেকহীন নরপশুর অভাব পৃথিবীতে নাই। কোনও দেশের প্রতি আক্রোশ থাকায় সেই দেশের বিমান ধ্বংস করিলে যদি অপর দেশের যাত্রীদিগের মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে তাহাতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অথবা জেদ বজায় রাখিবার খাতিরে নরহত্যার অপরাধ নিজেদের স্কন্ধে লইতে অনেক জাতিই প্রস্তুত থাকে। ইহার কারণ যে, আন্তর্জাতিক আইনে কোনও একটা কারণ দেখাইতে পারিলেই এক-একটা জাতি নিজ অধিকারের নজির দেখাইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারে এবং তাহার ফলে যদি বহু বিদেশীর মৃত্যু হয় তাহাতেও নরঘাতক জাতিকে কোনওভাবে দণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় না। এই ভাবেই ইসরায়েল একটা অপর জাতির যাত্রীবিমানকে গুলি চালাইয়া ধ্বংস করে ও তাহাতে বহুলোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহা লইয়া ইসরায়েলের নরহত্যার অপরাধ বিষয়ে অপর জাতিরা কোনও গোলযোগ করিল না। যাহারা বিমান চুরী করিতে গিয়া বিমানের ক্ষতি করে অথবা বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে নির্দোষ লোকের প্রাণহানীর কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহাদেরও সচরাচর বিশেষ কোনও শাস্তি হইতে দেখা যায় না। সুতরাং গুপ্ত আক্রমণ কিম্বা প্রকাশ্যে ট্রেন, বিমান, প্রভৃতির উপর আক্রমণ ব্যবস্থা করিলে অপরাধী মনে মনে চিন্তা করে যে ঐরূপ কার্য্য করিয়া তাহারা নিজেরা কোন বিপদে পড়িবে না। এই সকল কারণে "স্যাবোটেজ" অথবা গুপ্তভাবে বিস্ফোরণ আয়োজন করিয়া অথবা যন্ত্রাদি লইয়া সেগুলিকে অচল করিবার ব্যবস্থা করিলে যে বা যাহারা সেইরূপ করে তাহাদিগের নিজেদের কোনও কিছু হইবে না, এই বিশ্বাসেই অপরাধকারীগণ দুষ্কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে সাহস পায়।

যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে ও যাহাতে বহু লোকের মৃত্যু হয় তাহার মূলে শত্রুতাজাত গুপ্ত বা প্রকাশ্য আক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। সুতরাং তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া ঐরূপ দুর্ঘটনা নিবারণ ব্যবস্থা বিশেষ অগ্রসর হইবে বলিয়া কেহ মনে করেন না। গুপ্তঘাতককে কি ভাবে অক্ষম করিয়া দেওয়া যায় তাহা অসম্ভব না হইলেও নানা প্রকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা ব্যতীত সেই ক্ষেত্রে আর কিছু করা সহজ নহে। যাত্রীদিগকে ও তাহাদিগের মালপত্র উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলে বিস্ফোরক আছে কি না, বিমান-চোর কেহ হইতে পারে কি না প্রভৃতি বুঝা যাইতে পারে। ঐ প্রকার পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকিলে গুপ্ত শত্রুগণ সাহস করিয়া দুষ্কার্য্যে লিপ্ত না হইতেও পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিস্ফোরক আছে কি না তাহাও বোঝা যাইতে পারে এবং সেই ভাবেই কেহ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিমানে আরোহণ করিতেছে কি না তাহাও বোধগম্য হইতে পারে। যে বিমানগুলি এক দেশ হইতে অপর কোনও দেশে যায় সেইগুলিতে এইরূপ পরীক্ষা অতি সাবধানে করিবার ব্যবস্থা আবশ্যক। দেশের ভিতরেও যাতায়াতের বিমানগুলিতে এইরূপ পরীক্ষা কার্য্যকর হওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর আমরা যদি বিমানের যন্ত্রাদির কথা লইয়া আলোচনা করি তাহা হইলে প্রথম কথা হইবে যে আধুনিক বিমানগুলির দোষগুণ আলোচনা করিলে কি দেখা যায়? আধুনিক বিমান অতিক্রুতগতি ও মহাবেগে ধাবমান হইয়া সেগুলি ক্রমে ক্রমে গমন কাল হ্রাস করিয়া আজকাল অসম্ভব অল্প সময়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে বিমান ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যাইতে যে সময় লইত, বর্ত্তমানে তাহার এক তৃতীয়াংশ সময়ে বিমান সেই যাত্রা সম্পূর্ণ করে এবং ইহার জন্য তাহার গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এমন হইয়াছে যে পূর্ব্বকালে কেহ তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিত না। অতিক্রুত গতিবেগ যন্ত্রকে সকল সময়েই অল্প বিস্তর ভঙ্গপ্রবণ করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত বিমানের সর্ব্বাঙ্গ যে ধাতু নির্মিত সেই ধাতুর মধ্যে কণায় কণায় ধাতব ক্লান্তির উদ্রেক হইয়া

বিমানের যন্ত্রতন্ত্র ভাঙ্গন শুরু হওয়া সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ বিমানকে দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে চালাইবার ফলে যদিও গমন কাল দুই-এক ঘন্টা হ্রাস হইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার ফলে বিমাণ নিজ হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য মনে হয় গতিবেগ ততটা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া দুই চারি ঘন্টা অধিক সময় লাগিতে দিয়া মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন হইত। যন্ত্র মাত্রেরই একটা পরমায়ু আছে। সেই পরমায়ু গতিবেগ চরমে উঠিতে দিলে কমিয়া যায়। অধিক পরিশ্রম যেমন মানুষের জীবন বিপন্ন করে যন্ত্রও তেমনি ক্রমাগত মহাতেজে চলিতে থাকিলে নিজ জীবন রক্ষা করিতে ক্রমে ক্রমে অসমর্থ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা যে ঠিক কোন সময়ে একটা বিপদ্‌জনক অবস্থায় আসিয়া পড়ে তাহার কোনও লক্ষণ পূর্ব্ব হইতে প্রকাশ না হইতেও পারে। সুতরাং যন্ত্রগুলিকে অধিক করিয়া না চালাইয়া এমনভাবে চালনা করা উচিত যাহাতে যন্ত্রের জীবনীশক্তি সকলের অজান্তে কমিয়া না যাইতে পারে। বিজ্ঞানের নেশায় বিভোর মানুষ প্রকৃতি বিজয়ের অধীর আগ্রহে মত্ত হইয়া বিমানের গতিবেগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল স্থানে পৌঁছাইতে পূর্ব্বে জাহাজে একমাস দুই মাস লাগিত পরে জাহাজের গতি-বৃদ্ধি করিয়া তাহা অর্দ্ধেক সময়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বিমানের প্রথম যুগে বিমান পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়া সেইপথ তিন কিম্বা চারদিনে অতিক্রম করা হইয়াছে। এখন সাধারণ ইঞ্জিন হইতে "জেট" ইঞ্জিন ও তাহার পরে রকেটের উদ্ভাবনা হইয়াছে। জেট ইঞ্জিন যে দ্রুতগতি সম্ভব করিয়াছে তাহাতে বিমান একদিন হইতেও কম সময়ে ভারত হইতে ইংলণ্ড গমনে সক্ষম হইতেছে। এ অবস্থায় যন্ত্র ও বিমানের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে চাপ ও আণবিক আলোড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে তাহাতে সে সকল বস্তুর এমন একটা ভিতর হইতে ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইতেছে যাহার ফলে অনেক সময়েই সম্ভবতঃ বিমানের ক্ষতি হইতেছে। ইহা কি ভাবে কতটা কোথায় হইতেছে ও হইয়াছে তাহার পূর্ণ ইতিহাস কেহ প্রস্তুত করিয়া বিশেষজ্ঞদিগকে দিতেছে কি না আমরা জানি না। দিলেও তাহা কোনও একটা দুর্ঘটনা সম্বন্ধেই হয়ত দেওয়া হইতেছে। বিষয়টার পূর্ণ বিচার ও অনুসন্ধান করা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

ইহারও পরের কথা হইল বিমানবন্দরের বিমান যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা। বন্দরে অবতরণ পথ ও বন্দর হইতে আকাশ মার্গে আরোহণ পথ যতটা উত্তম ও নিরাপদ্‌ভাবে রক্ষিত হইবার কথা তাহা সকল সময়ে রক্ষিত হয় কি না তাহা ক্রমাগতই দেখা আবশ্যক। সে কার্য্যের জন্য দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সুশিক্ষিত কর্ম্মচারী আছে কি না, অথবা কার্য্যের ভার যেন তেন প্রকারে যাহার তাহার উপরে ন্যস্ত করা হইতেছে কি না তাহাও বিশেষ করিয়া দেখা প্রয়োজন। তাহা যে সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য তাঁহারা সে কার্য্য কখন কি ভাবে করিতেছেন তাহার সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক। বিমান-বন্দরগুলিতে যে সকল যন্ত্রাদি রাখা হয় ও যাহার সাহায্যে বিমান অবতরণ আরোহণ প্রভৃতি নিরাপদে সাধিত হয় সে সকল যন্ত্র উপযুক্ত ও যথাযথ কি না ও তাহা ঠিকমত ব্যবহার করা হইতেছে কি না তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আবশ্যক এবং যদি তাহার কার্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সে সকল যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

এক কথায় বিমান ও বিমানবন্দর ঘটিত যাহা কিছু সকলই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে শুধু বিমান উত্তরোত্তর দ্রুততর বেগে চালাইয়া চলিলে মধ্যে মধ্যে অতি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিতেই থাকিবে ও তাহার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিবে। দুর্ঘটনা একেবারে বন্ধ কখনও হয় না। তাহার কারণ মানুষের পক্ষে সকল অবস্থা নিজের সংযমন, নিয়মের অধীনে আনয়নের অসম্ভাব্যতা। দুর্ঘটনা যাহাতে যথাসম্ভব অল্প সংখ্যক হয় তাহারই জন্য এই আলোচনা।

রাষ্ট্রক্ষেত্রের কলহের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।

রাষ্ট্রক্ষেত্রের কলহের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইল যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও পারস্পরিক খুনাখুনির মধ্যে। আমাদের দেশের

রাষ্ট্রীয় কলহ ছিল পূর্ব্বে বৃটিশের সহিত, তাহা চালিত হইত বাক্যে, প্রচারে, হিংসাত্মক কার্য্যে এবং বৃটিশের তরফ হইতে ধরপাকড় ও কখন কখন চরম শাস্তি বিধান গুলি চালনা করিয়া। আমাদের দিক্ হইতেও অনেক সময় বৃটিশদিগের কর্ম্মচারী (দেশী ও শ্বেতকায় উভয় জাতীয়) প্রভৃতির উপর গুলি ও বোমা চালাইয়া ও অপর ভাবে তাহাদের আক্রমণ করিয়া রাষ্ট্রীয় মতবিরোধ ব্যক্ত করা হইত। যে সকল স্থলে রাষ্ট্রীয় মতের ক্ষেত্রে বিভেদ দেখা যাইত, যথা চরমপন্থী "এক্স্ট্রিমিষ্ট" অথবা মধ্য পথের পথিক "মডারেট", এমন কি বৃটিশের সমর্থক খয়ের খাঁদিগের মধ্যে; সে ক্ষেত্রে কেহ কাহাকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করিত বলিয়া দেখা যাইত না। মহাত্মা গান্ধীর সময়ে যেমন একদিকে অহিংসা প্রবলভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অপরদিকে তেমনি হিংসাও মধ্যে মধ্যে প্রকটভাবে দেখা দিত। এই যুগের শেষের দিকে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ ভীষণ হইয়া উঠে এবং বহু স্থলে বহু সহস্র ব্যক্তি ঐ সকল কলহজাত দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। কিন্তু সে দাঙ্গাগুলির মধ্যে কোনও মতবাদের কথা ছিল না। শুধু হিন্দু অথবা মুসলমান হইলেই পরস্পরকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইত। এক প্রকার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধেরই মত ছিল সে বিবাদ। তাহার পর আসিল স্বাধীনতা ও বৃটিশ রাজশক্তির অপসারণ। ইহার ফলে বিদেশীর সহিত বিবাদ আর রহিল না কিন্তু নিজ দেশের ভিতরেই দেশ বিভাগ হইয়া কিছু স্বদেশীয় মানুষ বিদেশী শত্রুর রূপ ধারণ করিল। তাহাদের সহিত যে শত্রুতা তাহা হইল তাহাদের ভারত দখলের চেষ্টা উদ্ভূত; কোনও রাষ্ট্রমত বিরুদ্ধতা জাত কারণে নহে। রাষ্ট্রমত লইয়া যে দেশের ভিতরে দেশবাসীর মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল তাহার মূলে দেখা দিল নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় দল গঠন চেষ্টা। ইহার কারণ হইল রাষ্ট্রীয় শক্তি করায়ত্ত করিবার চেষ্টা এবং দল গঠন ব্যতীত সে কার্য্য সাধন অসাধ্য ইহা ধরিতে পারা। দল গঠন করিলেই মতবাদ কিছু কিছু অপর দলের তুলনায় পৃথক না হইলে চলে না এবং তাহা হইলেই কলহ ব্যক্তিগত শত্রুতার স্তর হইতে উঠিয়া আদর্শ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া যায়। এই সকল কারণে দলীয় মতদ্বৈধ ক্রমে ক্রমে কঠিন বৈপরীত্যে পরিণত হয় ও তাহা হইতেই আরম্ভ হয় মারাত্মক দ্বন্দ্ব বিরোধ। এই বিরোধ পরে সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং দলের মতবাদের সীমা ছাড়াইয়া নানা প্রকার রূপ ও আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। দলের ভিতরেও ফাট ধরিয়া একের স্থলে দুই বা তিন দলের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে অনেক প্রদেশেই এ দল ছাড়িয়া ও-দলে চলিয়া যাওয়া একটা রীতিমত অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে ও ফলে কোন দলই কোন প্রদেশে কতকাল অধিকার রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে তাহা কেহ স্থির নিশ্চয় ভাবে বলিতে পারে না। কি উপায়ে এই দলত্যাগ করাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহাও সহজে বুঝা যায় না। ইহা আইন করিয়া বন্ধ করা যাইবে কি না তাহাও অভিজ্ঞ লোকে "বিল" পেশ করিয়া বিচার করিতেছেন কিন্তু সেরূপ আইন সংবিধান সম্মত হইবে কি না তাহাও আলোচ্য বিষয়। যাহা হউক, এই দল ছাড়িয়া বেদলে যোগ দেওয়া ইহাও একটা কলহের কারণ। এইরূপ পরিস্থিতিতে কাহারও কোনও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিরাপত্তা থাকিতেছে না দেখা যাইতেছে এবং তাহা লইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রের সকল ব্যক্তিই অস্থিরতা আক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। অনেকগুলি মানুষ এদিকে ওদিকে খুন জখম হওয়াতে অবস্থা আরই বিপদজনক আকার গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলেই আশা করিতেছেন যে ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ মিলিতভাবে এই সমস্যার কোনও একটা উপযুক্তরূপ সমাধান ব্যবস্থা করিবেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ক্রমাগতই একইভাবে খারাপের দিকেই যাইতেছে। ফলে দেশবাসীর জীবন-ধারণ বিশেষভাবে কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেকেই ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া একপ্রকার ডাল-ভাত খাইয়া দিন কাটাইতেছেন; কারণ তরকারী, মৎস্য, মাংস ক্রয় করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। নিম্নোদ্ধৃত দরগুলি আমরা 'যুগবাণী' সাপ্তাহিক হইতে পাইয়াছি।

	একমাস পূর্ব্বের দর কে জি প্রতি	বর্ত্তমান দর কে জি প্রতি
স: তেল	টা ৫·৩০	টা ৬·৪০
হলুদ	২·২৫	৫·০০
ধানা	২·৯১	৬·৫০
না: তেল	৯·৫০	১০·৫০
মুসুরী ডাল	১·৪৫	২·০০
জিরে	৫.০০	৭·০০
গুড়	২·৪৫	১·৬৫
আটা	১·০০	১·২০
খইল	৬৫·০০ কু: প্রতি	৭১·০০

অপর সকল অবশ্য ব্যবহার্য্য বস্তুর দর দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই মূল্য বৃদ্ধিই হইয়াছে এবং সেই ধারা একই মুখে একইভাবে চলিতেছে। কোন সময়েই মূল্য হ্রাসের কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় ভারত সরকার নানা উপায়ে এই বৃদ্ধি দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহা এখনও অবধি সফল হইতেছে না। আশা, ভবিষ্যতে হইবে হয়ত। দেশবাসী সেই অপেক্ষাতেই রহিয়াছেন।

মৌলানা ভাসানির ভারত-বিরোধ

মৌলানা ভাসানি শেখ মুজিবুর রেহমানের বিপক্ষে এবং চীনপন্থী অল্প কিছু পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নেতা। চীনের সপক্ষে থাকিয়াও তিনি কি করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান রহিয়াছেন সে-কথা তিনিই জানেন কারণ চীনাগণ কোন ধর্মে অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বিজ্ঞান ও বাস্তব যাহা তাহা ব্যতীত কোন কিছু মানেন না। মুসলমান ধর্ম্মের মূলকথা হইল, আল্লা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান ও হজরত মহম্মদ তাঁহার প্রেরণাপ্রাপ্ত ঐশ্বরিক বার্ত্তা ঘোষণাকারী 'প্রফেট'। সুতরাং মৌলানা ভাসানির চীন-প্রীতির মূলে ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত অপর কিছু আছে এবং তাহা সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কোন মতলব সিদ্ধির চেষ্টার সহিত জড়িত। চীনের ইচ্ছা পূর্ব-ভারতবর্ষে কোনও উপায়ে একটা এমন স্থান করিয়া লওয়া যাহাতে কোনভাবেই চীনের তিব্বত দখল অথবা সাক্ষাৎভাবে ও পাকিস্থানের সহিত মিলিত হইয়া যে কয়েক সহস্র বর্গমাইল ভারতীয় ভূখণ্ড চীন দখল করিয়া রহিয়াছে তাহা হইতে বিরত হইয়া সে-সকল দেশ ও ভূভাগ ত্যাগ করিতে না হয়। বাংলাদেশ যদি চীন-পন্থী ভাসানিকে মানিয়া লয় তাহা হইলে ঐ নবগঠিত রাষ্ট্র অনায়াসেই চীনকে তাহার বাঞ্ছিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারে। ভাসানির দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার অনুচরগণ কোনভাবেই মুজিবুর রেহমানের সমর্থকদিগকে পরাজিত করিয়া দেশের শাসনভার নিজেদের হস্তে লইতে পারিতেছেন না।

রাজা রামমোহন রায়ের বাসগৃহ

আমরা বহুবার লিখিয়াছি যে রাজা রামমোহন রায়ের বাসগৃহ জাতীয় ইতিহাসের দিক্ হইতে বিশেষ-ভাবে সংরক্ষণযোগ্য এবং ঐ মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য গৃহটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে একটি বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া আবশ্যক। এই প্রকার চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিতেও ছিলেন কিন্তু সেই চেষ্টার ফল কি হইয়াছে আমরা এখনও জানি না। শুনা যায় যে রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ বাসগৃহের কিছু কিছু অংশ কালোয়ারগণ ক্রয় করিয়া তাহাতে পুরাতন লৌহ ও ইস্পাতের গুদাম করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল; কিন্তু সে চেষ্টা নাকি সরকারী চেষ্টায় বন্ধ করা হইয়াছিল। এ-সকল বিষয় সম্বন্ধে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ঠিক কি দাঁড়াইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ইহার কারণ, আমরা কিছুকাল হইতেই আশা করিয়া আছি যে ঐ গৃহ শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া কোন একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কিন্তু এখন অবধি আমাদের সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। অন্যান্য নানান পত্রিকায় এই বিষয়ে লেখালেখি হইতেছে; অর্থাৎ জনমত আমরা যাহা বলিতেছি সেইপ্রকারই। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্র শীঘ্র এই কার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া

দিলে সকলের মনেই আনন্দের সঞ্চার হইবে বলিয়া মনে হয়। সরকার বিষয়টিকে অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা বলিয়া ধার্য্য করিয়া লইলে তবেই ইহা সম্পন্ন হইবে। সেইরূপ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই অতি প্রয়োজনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে উত্তর কলিকাতার গৌরমোহন মুখার্জ্জি স্ট্রীটস্থ যে গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১২ই জুন জন্মগ্রহণ করেন সেই গৃহটি বর্ত্তমান গৃহস্বামীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইবেন। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই স্থির করিবেন যে উক্ত গৃহটি কিভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিলে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি রক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন ও অপর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত এই বিষয়ে অতঃপর আলোচনা করা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় মানুষকে যে-সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত শরীর-সাধন, দেশভক্তি, দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ ও চরিত্র গঠন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে এই-সকল বিষয়ে দেশবাসী যাহাতে অধিক করিয়া জাগ্রত হইতে সক্ষম হ'ন সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা উচিত। কি করিয়া সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজ হইতে পারে তাহাই গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অবশ্য এ-সকল কথাই উত্তমরূপে জানেন। তাহা হইলেও কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন জনমত কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশের মহামানবদিগের স্মৃতি রক্ষা জাতির মহা কর্ত্তব্য-কার্য্য।

ইরানের যুদ্ধশিক্ষা

আমেরিকা ইরানের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। উদ্দেশ্য ইরানের সৈন্যগণ যাহাতে আধুনিক অস্ত্র-ব্যবহারে সক্ষম হইতে পারে তাহার আয়োজন করা। এই ব্যবস্থাতে শুধু পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইবে না। অপর সকল-কিছুই শিখান হইবে। শিক্ষার জন্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ইরানে যাইবে; এবং যাইবে বহুসংখ্যক আমেরিকান অস্ত্র-বিশারদ বিশেষজ্ঞ। একটা অস্ত্র সরবরাহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল সাতশত হেলিকপ্টর বিমান। আমেরিকান সেনাদল অরণ্যে বা অসমতল যুদ্ধক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্রকায় যত্রতত্র-অবতরণক্ষম বিমান ব্যবহার করিয়া থাকে। এই হেলিকপ্টরের মাথার উপরে পাখা ও তাহার সাহায্যে ইহা মাটি হইতে সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে পারে এবং মাটিতে সোজা অবতরণও করিতে পারে। ইরান পাঁচ বৎসরে সাতশত হেলিকপ্টর বিমান পাইবে। ইরান বলিয়াছে যে ইরানের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্থান শক্তিশালী হইয়া বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি ভুট্টোকে ইরানের শা নিমন্ত্রণ করিয়া নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া বহু আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ভুট্টো এই আমন্ত্রণে খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এখন ধারণা হইতেছে যে ইরানের আমেরিকান-শিক্ষিত ও তদ্দেশীয় আয়ুধ-সজ্জিত সেনাদলের সাহায্য পাইলে তাঁহার ভারতের নিকট হইতে কোন ভয় থাকিবে না।

বিহারে ছেলেধরার ভয়

পাটনাতে ১৬ জন ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া প্রাণে মারা হইয়াছে; তাহার কারণ, জনসাধারণ তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং তাহারা মানুষের মাথা সংগ্রহ করে এরূপ ধারণাও কাহারও কাহারও মনে জাগিয়াছিল। মৃত ব্যক্তিরা ব্যতীত বহুলোক মার খাইয়া আহত হইয়া হাসপাতালে রহিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। তাহারাও ছেলেধরা, মস্তক শিকার অথবা বিষ প্রয়োগে নরহত্যা করিবার সন্দেহে প্রহৃত হইয়াছিল। এখন প্রায় একশ' জনকে বিহার পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র গাড়ীতে মাইক বসাইয়া প্রচার করিয়া সকলকে বুঝাইবার ব্যবস্থাও পুলিশ করিতেছে যাহাতে লোকমনে ঐ-সকল উদ্ভট কল্পনা জাগ্রত না হয়। এইরূপ প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে ছেলেধরার আতঙ্ক কিছুটা কমিয়া

আসিয়াছে এবং যাহাকে তাহাকে ধরিয়া প্রহার করা অনেকটা থামিয়া আসিতেছে। বিহার প্রদেশে এইরূপ ভাবে তেত্রিশ জন মানুষকে প্রাণে মারা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাটনায় ষোল জন, মজফফরপুরে চার জন, কাটিহারে তিনজন, খাগারিয়াতে তিনজন এবং এক-জন করিয়া জাহানাবাদে, সোনপুরে, বেগুসরাইয়ে, ভাগলপুরে, মধুবনীতে, দারভাঙ্গায় ও আরায় নিহত হইয়াছে। অপর সূত্রে খবর প্রকাশ হইয়াছে যে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা উনচল্লিশজন ও তাহার মধ্যে কেহ কেহ আহত হইবার পরে হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নরহত্যা

পশ্চিমবঙ্গে চারমাসের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে সতের জন মানুষ আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম চার-মাসে আটষট্টিটি রাষ্ট্রীয় নরহত্যা ঘটিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় কারণ বর্জ্জিত নরহত্যা দেখা যায় বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসর হইতে অধিক সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ঘটিত হইয়াছে। জানুয়ারী-এপ্রিল গত বৎসরে দুশ'টি মানুষ নিহত হইয়াছিল। এই বৎসরে বলিতেছে দুই-শত পঞ্চাশটি নরহত্যা ঘটিয়াছে। ডাকাতির ফলাফল বিচার করিলে দেখা যায় যে, গত বৎসর ডাকাতি হইয়া-ছিল পাঁচশত ছাব্বিশটি এবং এই বৎসর হইয়াছে চারশত উনত্রিশটি। এই সকল সংখ্যা বিচার করিলে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুটা ভাল হইয়াছে। যাঁহারা বলেন অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় খারাপ হইয়াছে তাঁহাদের সহিত একমত হওয়া যায় না। কারণ, অবস্থা সত্যই পূর্ব্বের তুলনায় কিছুটা ভালই হইয়াছে। তবে রাষ্ট্রনীতিগত হত্যাকাণ্ড চলিতে দেওয়া একেবারেই উচিত নহে। ইহা সভ্যতার আদর্শ-বিরুদ্ধ এবং ইহা বোধ না করিলে দেশের সুনাম রক্ষা হইতে পারে না।

বৃটেন হইতে কৃষ্ণকায়দিগকে বিতাড়ন

বৃটেনের 'হোম' মন্ত্রী পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে যে-সকল ব্যক্তি এই বৎসর জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে বে-আইনী ভাবে বৃটেনে প্রবেশ করিয়া ঐ দেশে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের সকলকেই বৃটেন হইতে বিতাড়িত করা হইবে। এই রীতি হইবে বৃটেনের কৃষ্ণকায় বিরুদ্ধতার ও বৃটেনকে শ্বেতকায়ের দেশ হিসাবে সুরক্ষিত রাখিবার একটা জোরাল উপায়। বৃটেনের আইন-কানুন যাহা আছে তাহাতে যে-সকল ব্যক্তি আইনকে পাশ কাটাইয়া বৃটেনে প্রবেশ করে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার পথ আছে এবং এইসকল আইন প্রয়োগ করিলে বৃটেন হইতে সম্ভবতঃ দশ হাজার অথবা ততোধিক সংখ্যক ব্যক্তি ভারত ও পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। উপরন্তু পাকিস্থান বৃটিশ কমন্‌-ওয়েল্‌থ ত্যাগ করিবার ফলে পাকিস্থানের লোকেদের বৃটেনে বাস করা আরও কঠিন হইবে। বৃটেনে যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায় বিরুদ্ধতায় বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার নাম হইল ইনথ পাওয়েল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বৃটেনে কৃষ্ণকায়গণ অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিতে কিংবা বাস করিতে না পারে। বৃটেনে কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁহারা ইনথ পাওয়েলের নীতির সমর্থন করেন না এবং কৃষ্ণকায় বিরুদ্ধতাও করেন না। এইসকল ব্যক্তি ইয়োরোপে মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ সভার সাহায্যে বৃটেনের অন্যায় বর্ণ-বিদ্বেষের প্রতিকার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এই চেষ্টায় কতটা সফলকাম হইতে পারেন তাহাও শুধু একটা অনুমানের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। শ্রীমতী গান্ধী বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এই বিষয় লইয়া বৃটেনের শাসকদিগের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বালুচিস্থানে পাকিস্থান-বিরুদ্ধতা

বালুচিস্থানে অনেককাল হইতেই পাকিস্থান-বিরুদ্ধতা প্রবল আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি চাহেন যাহাতে বালুচিদিগের হস্তেই নিজদেশের শাসন-ব্যবস্থা পূর্ণতরভাবে ন্যস্ত থাকে ও অপর প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ বালুচিস্থানে বালুচিদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে না

পারে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা ১৫ই জুন হইতে দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। এই পার্টি ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের অঙ্গীভূত বলিয়া ঐ ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী দলের নেতা বালুচিস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার আত্তাউল্লা খান মেঙ্গালকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন ঐ আন্দোলন এখন আরম্ভ না করেন। বালুচিস্থানের পূর্ব্বকার প্রদেশ-শাসক মীর ঘাউস বক্স বিজেঞ্জো ইসলামাবাদ হইতে কোয়েটা গমন করিয়াছেন। তাঁহার কি প্রচেষ্টা সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। রাষ্ট্রপতি ভুট্টোও চারদিনের জন্য কোয়েটা গমন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি প্রবল বিক্ষোভ আক্রান্ত মারি ও মেঙ্গাল অঞ্চলে থাকিবেন বলিয়া সকলকে জানাইয়াছেন। উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি যথাযথভাবে বুঝিবার চেষ্টা।

পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরণের বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা, যেখানে পাঠানদিগের বাস, উভয়ক্ষেত্রেই পাকিস্থানের রাজ্যশাসন-নীতি বিরুদ্ধতা ক্রমে ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করিতেছে। কারণ একই। পাঞ্জাবী পাকিস্থানী ও কিছু কিছু উর্দ্দুভাষাভাষী ভারত হইতে আগন্তুক ব্যক্তিদিগেরই কথায় পাকিস্থান শাসিত হয়। বাংলাদেশ যে পাকিস্থান হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে তাহার মূলেও ছিল ঐ ধরণেরই অন্যায়ের কথা। অন্য প্রদেশগুলিতেও ঐ একই বিষ প্রবেশ করিয়াছে।

মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ

ইংলণ্ডের "নিউ স্টেটস্‌ম্যান্" পত্রিকায় প্রকাশ যে মহারাষ্ট্রে ২॥০ কোটি মানুষ খাদ্য ও জলাভাবে নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাইতেছে। বহু শিশু এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের হাম বা জল-বসন্ত হইলেও তাহারা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বর্ত্তমানে অল্প-সংখ্যক শিশুই প্রাণ হারাইয়াছে কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অনেকেরই মৃত্যু হইবে। জালনা (মহারাষ্ট্র) হইতে ডাঃ অ্যান্ জনষ্টন্ "নিউ ষ্টেটস্‌ম্যানে"র লেখক জন্ পিলজারকে বলিয়াছিলেন যে বহু শিশুরই হাম হইতেছে ও অপরাপর কারণেও তাহারা শারীরিক শক্তি হারাইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক শিশুই প্রাণ হারাইবে। শতকরা নব্বইটি শিশুই জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় কোনমতে বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় বিয়াফ্রাতে যেভাবে অসংখ্য নর নারী-শিশুর প্রাণ গিয়াছিল মহারাষ্ট্রে ঠিক সেই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে এবং সময় থাকিতে যদি খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই দুর্ভিক্ষ ও তাহার ফলে বহুলোকের মৃত্যু কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে পশ্চিম ও পূর্ব্ব বঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছিল। সেই সময় ইংরেজ রাজত্ব ছিল ও ইংরেজ ও কিছু কিছু এই দেশবাসী মিলিত হইয়া মানব-প্রাণের পরিবর্ত্তে নিজেদের লাভের ব্যবস্থা করিয়া অবস্থা চরমে লইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে সেইরূপ কিছু ঘটিতে পারে না। এবং একটা বিশ্ব মহাযুদ্ধও চলিতেছে না। সুতরাং স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবস্থা করিয়া খাদ্য আমদানি করিলেই মহারাষ্ট্রের লোকেদের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। তাহার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

ভাষাজননীর চরণে কয়েকটি পুষ্পার্ঘ্য

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

প্রলয়ঙ্করী ঝড়

সেদিন ঢাকার একটি সংবাদপত্র হাতে নিয়েই দেখলাম খুব বড় বড় অক্ষরে শীর্ষলিপি ছাপা হয়েছে "প্রলয়ঙ্করী ঝড়"। বলতে পারব না অভূতপূর্ব্ব কিছু-একটা দেখলাম, কারণ, এই ক'দিন আগেই কলকাতা বেতারে শোনা গিয়েছিল, "প্রলয়ঙ্করী ঝড়"। অবশ্য এদিকের ঢেউ ওদিকে গিয়েছে, না, ওদিক্ থেকেই ঢেউটা আগে এদিকে এসে লেগেছিল সেটা বলা সহজ নয়। কে, কবে এবং কোথায় কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, সেটা একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে, যেমন গবেষণার বিষয় হতে পারে কে, কবে এবং কোথায় কর্তৃবাচ্যে 'অনীয়' প্রত্যয় করে ইংরেজী attractive অর্থে 'আকর্ষণীয়' কথাটাকে প্রথম ভাষার আসরে এনে উপস্থিত করেছিলেন; প্রথম বলেছিলেন কিংবা লিখেছিলেন, 'দৃষ্টি-আকর্ষণী' প্রস্তাব, 'সংশোধনী' প্রস্তাব, 'উদ্বোধনী' সঙ্গীত; জাতির 'উদ্দেশ্যে' ভাষণ, স্মৃতির 'উদ্দেশ্যে' শ্রদ্ধা-নিবেদন, গৃহের 'উদ্দেশ্যে' যাত্রা; ফল বা পরিণাম অর্থে 'ফলশ্রুতি'; প্রচণ্ড উত্তাপ বোঝাতে 'দাবদাহ'; ঢেলে সাজা-র স্থলে ঢেলে সাজানো, ইত্যাদি। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের বাংলা ভাষা ও তার গতি-প্রকৃতি নিয়ে যাঁরা লিখবেন, তাঁরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানতে চাইতে পারেন, এই কৃতিত্বগুলি কাদের প্রাপ্য। পথিকৃৎ হিসাবে তাঁদের নাম অবশ্যই ভাষার ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য।

কার্যকরী সভাপতি

'প্রলয়ঙ্করী ঝড়'-এর কথায় ফিরে আসা যাক। বাংলাদেশের কথা বলতে পারব না, বাংলারাজ্যে কিন্তু এর জন্যে জমি তৈরি হচ্ছিল বহুদিন থেকেই। পত্র-পত্রিকায়, বক্তৃতা-ভাষণে, বেতারের বার্ত্তা-পাঠে লিঙ্গ-বিচার-বিবর্জ্জিত ভাবে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত 'কার্য্যকরী' বিশেষণটির ব্যবহার এখন ত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্য্যকর কথাটা আর চোখেই প্রায় পড়ে না, একেবারে অকার্য্যকর (অকার্য্যকরী?) হয়ে গিয়েছে বলা যেতে পারে।

তিন বৎসর আগে প্রথম উদাহরণ টুকতে আরম্ভ করেছিলাম:

'ইঞ্জিনিয়ারিং বেতন বোর্ডের সুপারিশ অবিলম্বে কার্য্যকরী করার দাবীতে......'

—(কলকাতার একটি সংবাদপত্র, ১৬।৫।৭০।)

'সরকারী আদেশ প্রচার অবিলম্বে কার্য্যকরী'...

ঐ ১৭।৫।৭০।)

এরপর প্রায় প্রত্যহ দেখেছি এবং বেতারে শুনেছি, পরামর্শ কার্য্যকরী হচ্ছে কিংবা হচ্ছে না, উপদেশ কার্য্যকরী হচ্ছে কিংবা হচ্ছে না ধরণের বাক্য রচনায় এমন আরও অনেক শব্দ, লিঙ্গবিচারে যারা স্ত্রীলিঙ্গের পর্য্যায়ে পড়ে না, পড়তে পারে না, তাদের অবলীলায় এই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণটি দ্বারা বিশেষিত করা হচ্ছে। অপপ্রয়োগটিকে তার পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে কলকাতা বেতারকেন্দ্র ২।৭।৭১ তারিখে 'কার্য্যকরী সভাপতি' কথাটা আমাদের শুনিয়ে দিলেন। তারপর ২৬।১।৭৩ তারিখের একটি সাপ্তাহিক পত্রে দেখলাম, 'কার্য্যকরী পরিচালক, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, ডাঃ শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।'

পরামর্শ যদি কার্য্যকরী হতে পারে ত সভাপতির কার্য্যকরী হতে বাধা কি? আর সভাপতি যদি কার্য্যকরী হতে পারেন ত পরিচালকই বা কেন তা হতে পারবেন না? সুতরাং ঝড়েরই বা প্রলয়ঙ্করী হতে দোষ কি? আশা করে আছি, এরপর পড়তে এবং শুনতে

পাব, একটি রোমাঞ্চকরী উপন্যাস, ব্যাপারটা খুবই হাস্যকরী, দেওঘর একটি স্বাস্থ্যকরী স্থান, ভয়ঙ্করী দৃশ্য, চাঞ্চল্যকরী সংবাদ, এবং হয়ত বা, পিকাসো একজন জগদ্বিখ্যাত চিত্রকরী।

কিন্তু স্ত্রীপ্রত্যয়টির কেন এই অপব্যবহার? কার্য্যকর সভাপতি, বা কার্য্যকর পরিচালক বললে বা লিখলে তাঁদের সম্বন্ধে আমরা যা বলতে চাইছি তা কি অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ থেকে যায়? ঝড়কে প্রলয়ঙ্করী না বলে প্রলয়ঙ্কর বললে কি তার বিধ্বংসী রূপের কথা কিছু কম করে বলা হয়?

অবশ্য একটু নরম-নরম- একটু মিষ্টিমিষ্টি, শব্দের প্রতি বাংলাভাষীদের একটু স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে। যেজন্যে স্ত্রীলিঙ্গাত্মক শব্দ, সানুনাসিক শব্দ, এমনকি এক-আধটু আদিরসাশ্রিত শব্দের খাতির আমাদের কাছে একটু বেশী।

সরণী

সরক থেকে সড়ক। সরক এবং সরণী দুটোই সংস্কৃত শব্দ, একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এবং একই অর্থ বহন করে। তফাতের মধ্যেএকটি সানুনাসিক এবং স্ত্রীলিঙ্গাত্মক, অন্যটি ও দুটোর কোনোটাই নয়। সম্ভবতঃ সেইজন্যেই যেটাকে কথায় বলতে আমরা বলি রাস্তা, বলি পথ, বা বলি সড়ক, সেটার নামকরণ করতে হলেই সরণিকে স্মরণ না করলে আমাদের চলে না। কেন চলে না জিজ্ঞাসা করুন, উত্তরে যা শুনবেন তার একটা অস্পষ্ট রকমের অর্থ হবে, ওটা শুনতে ভাল।

মার্কিনী

আমেরিকা-বাসী লোক বা আমেরিকা-জাত দ্রব্য ইত্যাদিকে এতকাল আমরা মার্কিন বলে অভিহিত করতাম, কিছুকাল হল সে-জায়গায় 'মার্কিনী' কথাটা চালু হয়েছে। মার্কিনী চক্রান্ত, মার্কিনী অর্থ-সাহায্য, মার্কিনী নৌবহর। এই দীর্ঘ ঈকারটা কেন জানতে চাইলে কোনো সদুত্তর পাবেন না। আমেরিকান থেকে থেকে মার্কিন, সুতরাং আমেরিকানী, এবং তারপর গ্রীকী, রুশী, পর্তুগীজী, স্কচী, বেলজিয়ানী এবং 'জার্মান' অর্থে জার্মানীও কি ক্রমশঃ চালু হবে?

ধারাবিবরণী

সদুত্তর পাবেন না যদি জানতে চান running commentary বা 'মন্তব্য সহ ধারাবাহিক বিবরণ'কে ধারাবিবরণ না বলে ধারাবিবরণী কেন বলা ও লেখা হয়, বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে বিবরণী কথাটার আভিধানিক অর্থ 'বিবরণ-সম্বলিত পুস্তিকা'। 'বিবরণী—বিবরণ-লিপি',—চলন্তিকা। সরণী, ধারাবিবরণী বলতে পেলে যাঁরা খুশী হন তাঁরা বলুন। এই বিশেষ্য পদগুলির বাস্তবিক লিঙ্গ-প্রকৃতি কিছু নেই বলে ওগুলিকে স্ত্রী-লিঙ্গাত্মক করে ভাবলে বা বললে মারাত্মক আপত্তির কারণ কিছু ঘটে না। কিন্তু বিশেষণগুলিকে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করে ব্যবহার করতে হলে বিশেষিত শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গাত্মক কি না সেটা অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। যাঁরা সেটা করতে রাজী নন, তাঁরা যদি এমন লোক হন যাঁদের লেখা পড়ে বা 'ভাষণ' শুনে আমাদের ছেলে-মেয়েরা প্রভাবিত হতে পারে, তবে তাঁদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি আমরা দাবী করব,—ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার খাতায় "লেকের ধারে একটা বেঞ্চিতে একটি পরমা সুন্দরী ছেলেকে বসে থাকতে দেখলাম," লিখে রেখে এলে তাদের 'নম্বর' কাটা যাবে না।

বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণগুলিকেও তৎসম-শব্দবহুল বাক্য ভিন্ন অন্যত্র প্রায়শঃ স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করা হয় না। সেক্ষেত্রে স্ত্রী-পুং-ক্লীবলিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত শব্দ সম্পর্কে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলি ব্যবহার করার রীতিই কি চলবে?

উদ্দীপনাময়ী ভাষণ

'প্রধানমন্ত্রীর উদ্দীপনাময়ী ভাষণ' ধরনের' বাক্য প্রয়োগ করা কি বিধেয়? (কলকাতার একটি সংবাদ-পত্রের শীর্ষলিপি, ১৯।১২।৭২।)

অবশ্য স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির এই জাতীয় অপপ্রয়োগ যাঁরা করেন তাঁরা বলতে পারেন, বেছে বেছে আমাদের পিছনে কেন এমন করে লেগেছেন? চারদিকে এই ধরনের কত কিছু ত কতকাল ধরে হয়ে চলেছে, সেগুলোর কথা আপনারা ভাবছেন না কেন?

দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রস্তাব

এই ত চলন্তিকায় পাচ্ছি : "আকর্ষণী = আকর্ষণ-সম্বন্ধীয়া : আকর্ষণী শক্তি।" হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে আছে "আকর্ষণ বিণ [অন (ল্যুট্)-ক ; স্ত্রী-ণী।] আশুতোষ দেব সঙ্কলিত ছাত্রবোধ অভিধানে দেখছি : "আকর্ষণী = আকর্ষণকারিণী। [আ+কৃষ্+অন কর্তৃবা+ঈপ্ স্ত্রীং।] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে রয়েছে: "আকর্ষণী—[আ-কৃষ (কর্ষণ করা)+অন (ভাবে অনট্) স্ত্রী ঈপ্।] অভিধানকাররা প্রচুর পরিশ্রম করে অভিধান-সঙ্কলন করে থাকেন। তাঁরা সবাই বলছেন 'আকর্ষণী' একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। কিন্তু এঁরা তাঁদের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না। 'প্রস্তাব' কথাটা নিশ্চয়ই স্ত্রীলিঙ্গ নয়, কিন্তু এঁরা অবলীলায় লিখে এবং বলে চলেছেন "দৃষ্টিআকর্ষণী প্রস্তাব।" আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে, আর যাই আমরা আশা করি, বাংলা ভাষায় লিঙ্গবিচার-নির্ভর শব্দপ্রয়োগ আশা করা এরপর নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবই কেবল নয়, সেই সঙ্গে সংশোধনী বিলও অবাধে চলেছে, যদিও কোনো অভিধানে 'সংশোধনী' কথাটা নেই। তাছাড়া আছে "উদ্বোধনী সঙ্গীত", "আগমনী গান", ইত্যাদি। এগুলির বেলায় লিঙ্গ-বিচারের কথা কেন ওঠে না?

এসব কথার জবাব কিছু নেই। কেবল "আগমনী গান"-এর পক্ষ নিয়ে বলা যেতে পারে : 'আগমনী' গান কি? না, 'আগমনী' নামে পরিচিত উমার পিত্রালয়ে আগমন সম্পর্কিত গান। 'আগমনী' একটা নাম, বিশেষ্য পদ,—ওটাকে বিশেষণ মনে না করলেই আর কোনো গোলযোগ থাকে না।

নন্দা শুক্লা

গুলজারিলাল নন্দা, হরিচরণ শুক্লা আজকাল সবাই বলছেন এবং লিখছেন। আকারটা কি হিন্দী অকারের অনুবানান? তাহলে নান্দা নয় কেন? হারিচারাণই বা লেখা বা বলা হয় না কেন?

তামিল নাড়ু

এই নারকেল নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, সরের নাড়ুর দেশে তামিল নাড়ু কথাটা বেশী দিন চলেনি, ওটা তামিল নাড়ুতে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির মধ্যকার ironyটা হচ্ছে এই যে, বেচারা তামিলভাষীরা লড্ডুক-ভক্ত একেবারেই নয়। তামিল ভাষায় সুপণ্ডিত তামিলভাষী একাধিক ব্যক্তিকে দিয়ে বলিয়ে শুনেছি, কথাটার উচ্চারণে ডটা ঠিকই আছে, উকারটা একটু উ-ই মেশানো, কিন্তু সব জড়িয়ে নাড়ুরই কাছাকাছি। ওটার উচ্চারণ নাড়ু হতেই পারে না। কিন্তু নাড়ু একে ত নাড়ুর মত এত বেশী কর্কশ নয় শুনতে, তদুপরি তার ভাবানুষঙ্গ রসনায় রসসঞ্চারী। অতএব তামিল নাড়ু।

রমণ (রামন)

রাম-নাম যে আমাদের মুখে আসে না তা ত নয়। তবু আমরা বেঙ্কটরামনকে ভেঙ্কটরমণ, সি ভি রামনকে সি ভি রমণ (ভদ্রলোক নিজে "আমি রমণ নই, রামন" লিখে জানাবার পরেও) এবং মহাযোগী রামন মহর্ষিকে বলি এবং লিখি রমণ মহর্ষি। যাঁরা জানেন না তাঁরা একটি অভিধান খুলে কথাটার প্রচলিত প্রধান অর্থটা যে কি তা যেন দেখে নেন। যে কথাটা প্রকৃতপক্ষে রামন সেটাকে ঐরকম একটা কদর্থবহ শব্দে রূপান্তরিত করা একমাত্র এই রতীশ, রমণীরঞ্জন, কামিনীমোহন বাবুদের দেশেই সম্ভবপর।

উদ্দেশ্যে (উদ্দেশে)

কিছুদিন হল 'উদ্দেশে' কথাটা যেন প্রায় নিরুদ্দেশই হয়ে গিয়েছে। আগে যে সব জায়গায় তার দেখা পাওয়া যেত, এখন নিজের পশ্চাদ্দেশে একটা য-ফলা লাগিয়ে সেইসব জায়গাতে সে ঘুরছে। প্রত্যহ চোখে পড়ছে এবং কানে আসছে, জাতির 'উদ্দেশ্যে' ভাষণ, ছাত্রদের 'উদ্দেশ্যে' উপদেশ' কলম্বোর 'উদ্দেশ্যে' যাত্রা, পরলোকগত নেতার 'উদ্দেশ্যে, শ্রদ্ধানিবেদন জাতীয় সব কথা। অথচ এইসব অর্থে, অর্থাৎ প্রতি, অভিমুখে, সন্ধানে, স্মরণে, বোঝাতে কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম

চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায়, রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেবিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোথাও 'উদ্দেশ্যে' কথাটির ব্যবহার নেই, সর্বত্র 'উদ্দেশে' আছে। 'উদ্দেশ্যে' নেই এই কারণে যে, এইসব অর্থে ওটা ব্যবহার করা ভুল।

একদিকে আমরা পাকা ব্যবসায়ী এবং নিদারুণ হিসাবী মানুষের মত বানানের সরলীকরণ করছি বলে রেফে দ্বিত্ব বর্জ্জন করে একটি দুর্ব্বল ধ্বনির ভাষাকে দুর্ব্বল-তর করছি, আবার অন্যদিকে সেই আমরাই শব্দের গায়ে একটা যফলা বসিয়ে বা একটা ঈকার জুড়ে শুদ্ধ কথাগুলিকে অশুদ্ধ করে দিচ্ছি। এটা কোন্ জাতীয় হিসাবী মানুষের মত কাজ হচ্ছে তা জানি না।

করো, করছো, করেছো, করবো, করলো, করছিলো, করেছিলো, করতো

এই ধরণের ক্রিয়াপদগুলিকে ওকার দিয়ে বানান করার অর্থ কি? বানানের সরলীকরণের নমুনা এগুলি নিশ্চয় নয়। যদি বলেন এতে বানানকে উচ্চারণ-অনু-সারী করা হচ্ছে, ত প্রশ্ন হবে, 'চলিয়া গেল লিখতে ওকার দিতে হয় না, চলে গেল'না লিখে ওকার দিয়ে চলে গেলো' কেন লিখতে হয়? গেল আর গেলো-র উচ্চারণ দু জায়গায় কি ভিন্ন প্রকার? তাছাড়া অকারান্ত ক্রিয়াপদগুলি উচ্চারণে ওকারান্ত কি না সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁরা ওকার ঘেঁষা অকার এবং ওকারের তফাৎটা ঠিক ধরতে পারেন না, তাঁরাই সম্ভবতঃ কথাগুলি ওকার দিয়ে লেখেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবি রইল। মোট কথা বাংলা ভাষায় কোনো শব্দের অকারের উচ্চারণ সোজাসুজি ওকারও যদি হয়, সেটাকে অকারান্ত করে লেখাই আমাদের আবহমান কালের রীতি। আর যে ভাষার প্রায় বারো আনা বানানই উচ্চারণ-অনুসারী নয়, তার একটা দিকে বিপ্লব ঘটিয়ে বানানকে ধ্বনি-অনুসারী করার চেষ্টাকে অপচেষ্টা ছাড়া আর কি বলব?

ঢেলে সাজানো (ঢেলে সাজা)

'ঢেলে সাজানো' কথাটা কিছুদিন যাবৎ খুব চলছে। অনেকেরই দেখছি ওটাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কথাটা আসলে 'ঢেলে সাজানো' নয়ই, কথাটা 'ঢেলে সাজা'। ওটা তাম্রকূট-সেবন সম্পর্কিত পশ্চিম বাংলার একটি ইডিয়ম। হুঁকো থেকে আগে ব্যবহার-করা জলটা ঢেলে ফেলে দিয়ে নূতন জল ভরে, কল্কে থেকে পোড়া তামাক ঢেলে ফেলে নূতন করে তামাক সাজাকে বলে 'ঢেলে সাজা'। তামাক কেউ সাজায় না, সাজে;—সম্পূর্ণ সেই কারণেই ঢেলে সাজানো লেখা ভুল।

মনে রাখা দরকার যে 'ঢেলে সাজা' একটি গাঁটছড়া বাঁধা কথা, সেজন্যে 'সাজার' সঙ্গেই 'ঢেলে' চলতে পারে, 'সাজানো'র সঙ্গে নয়। "উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে নূতন করে সাজানোর যে উদ্যম চলছে" (কলিকাতার একটি সংবাদপত্র, ৯।৪।৭৩) এই বাক্যাংশ থেকে একটা জিনিষকে নতুন করে সাজাবার চেষ্টা হচ্ছে সেটা বোঝা গেল, কিন্তু সে চেষ্টা যাঁরা করছেন, তাঁরা যা ঢালছেন সে বস্তুটি কি? পুরনো শিক্ষাব্যবস্থা? বেশ, কিন্তু তাহলে ঢেলে কথাটার অর্থ কি হবে? বদলে, বর্জন করে? তা যদি হয় ত ঐ অর্থে কথাটাকে কি অন্যত্রও ব্যবহার করা চলবে? বলা চলবে কি, এই জায়গাটা ঢেলে নূতন করে লেখ, বা এই দেয়ালটা ঢেলে নূতন করে গাঁথ, বা এই গানটা ঢেলে এই নূতন সুরে গাও?

দাবদাহ

প্রচণ্ড উত্তাপের জ্বালা বোঝাতে 'দাবদাহ' কথাটা কিছুকাল যাবৎ খুব চলেছে। "গ্রীষ্মের দাবদাহ ও বর্ষার ধারাবর্ষণ থেকে বাসযাত্রীদের রক্ষা করবার জন্যে" (কলকাতার একটি সংবাদপত্র ৬।৪।৭৩), শীর্ষলিপিতে দেখেছি, বেতারেও বহুবার শুনেছি "গ্রীষ্মের দাবদাহ" অভিধানগুলি এ বিষয়ে কি বলে দেখা যাক।

১। দাব—বন (˚—দাহ। দাবানল। মৃগদাব') বনাগ্নি। অগ্নি, তাপ।—চলন্তিকা।

২। দাব—বন; বনাগ্নি, দাবানল; অগ্নি। তাপ দাবদগ্ধ—বনাগ্নি দ্বারা কৃতদাহ, দাবানল-সন্তপ্ত।

—সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল ছাত্রবোধ অভিধান

৩। দাব—বনাগ্নি, দাবানল। অগ্নি। তাপ।

—আশুতোষ দেবের ছাত্রবোধ অভিধান।

৪। দাব—তাপ। বন। প্র (অর্থাৎ প্রয়োগ) দাবদাহ; দাবাগ্নি। অনল। অগ্নি (বিরল)।

—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

৫। দাব—অরণ্যবহ্নি, বনজাত অগ্নি। দাবদাহ—বনবহ্নিজ্বালা।

—বঙ্গীয় শব্দকোষ,হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারে অভিধানগুলির এই সাক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করা যাক।

পাঁচটি অভিধানের দুটিতে দাবদাহও নয়, 'দাব' কথাটারই অর্থ বনাগ্নি, বনজাত অগ্নি, অরণ্যবহ্নি, দাবানল। এদের একটিতে গৌণার্থে তাপ-এর উল্লেখ আছে। দুটিতে মুখ্যার্থ বন, তারপর তাপ। একটিতে মুখ্যার্থ তাপ, তারপরের অর্থ বন। কিন্তু সবচেয়ে যেটা লক্ষ্য করার মত সেটা হ'ল এই যে দাবানল, দাবদাহ, দাবদগ্ধ, দাবাগ্নি, সমাসবদ্ধ পদগুলিতে 'দাব' কথাটির অর্থ কোথাও তাপ নয়, সব কটি অভিধানে সর্ব্বত্রই বন। দাবদগ্ধ=দাবানলে অর্থাৎ বনের আগুনে দগ্ধ। দাবদাহ দাবনল, forest fire। যে অভিধানটিতে দাব অর্থই দাবানল, সেটিতে দাবদাহ কথাটির অর্থ 'বনবহ্নিজ্বালা'। কলকাতায় বনবহ্নি অথবা বনবহ্নিজ্বালা, বঙ্গোপসাগরে ধূলির ঝড়ের মত একটু অদ্ভুত শোনায় না কি?

ফলশ্রুতি

'ফলশ্রুতি' কথাটা নূতন নয়। যে পাঁচটি অভিধান আমার পাশে রয়েছে তার প্রত্যেকটিতে কথাটি আছে এবং অর্থ যা দেওয়া আছে তা হল এই:

১। ফলশ্রুতি—ফললাভের পূর্ব্বপরম্পরাগত বাক্য।

—সুবল মিত্রের সরল ছাত্রবোধ অভিধান।

২। ফলশ্রুতি—কোন পুণ্যকর্ম্ম করিলে যে ফল হয় তাহা শ্রবণ বা তাহার বিবরণ।

—চলন্তিকা' রাজশেখর বসু।

৩। ফলশ্রুতি—কর্মের ফল শ্রবণ।

—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

৪। ফলশ্রুতি—কর্ম্মের ফল শ্রবণ। আশুতোষ দেবের সংকলিত ছাত্রবোধ অভিধান।

৫। ফলশ্রুতি—কর্মফল শ্রবণ, বৈদিক কর্মের ফল প্রতিপাদনার্থ শব্দ।

—বঙ্গীয় শব্দকোষ,হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেখা যাচ্ছে জোড় মেলানো ফলশ্রুতি কথাটিতে অর্থের দিক্ দিয়ে ফল এবং শ্রুতি এ-দুয়েরই স্বকীয় এক-একটি স্থান আছে।

'ঢেলে সাজানো' এবং 'দাবদাহ' এই দুটি জোড় মেলানো কথার বেলায় দেখেছি, জোড়া কথা দুটির একটিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করে অন্যটির মনগড়া একটা অর্থ করে নেওয়া হয়েছে। 'ফলশ্রুতি'তে অবস্থাটা আরও চমৎকার। শ্রুতি কথাটা থেকেও নেই। ওটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ফল, পরিণাম বা পরিণতি বোঝাতে 'ফলশ্রুতি' বলা এবং লেখা হচ্ছে।

প্রচুর পরিমাণে ভাষাজ্ঞান না থাকলে সাধারণতঃ কেউ অভিধান সঙ্কলনে হাত দেন না। অন্ততঃ প্রতিপদে সেই জ্ঞান তাঁদের আহরণ করে চলতে হয়। যে পাঁচজন অভিধানকারের নাম করা হ'ল তাঁদের প্রত্যেকেরই বেলাতে এর ব্যতিক্রম হয়েছে মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কি? যদি না থাকে ত তাঁরা কেউ 'ফলশ্রুতি'র বিভিন্ন অর্থের মধ্যে 'ফল' কথাটার উল্লেখ করেননি কেন?

আসলে ছোট ছোট এইটুকুন কথায় আমাদের মন ভরে না, আমরা চাই বেশ বড় বড়, হৃষ্টপুষ্ট, গালভরা শব্দ ব্যবহার করতে, সেই সঙ্গে কথাগুলি যদি স্ত্রীলিঙ্গাত্মক করে নেওয়া যায় ত আরোই ভাল। সুতরাং ফলশ্রুতি। শ্রুতি কথাটার নাই বা অর্থ কিছু থাকল? ধরে নিলেই হল ওটা 'চবৈতুহি'-র মত একটা ব্যাপার।

তাই নাহয় ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, 'চবৈতুহি'-র 'চ' নিয়ে আপনারা 'ফল'কে

''ফলশ্রুতি' বলছেন এবং লিখছেন, এখন কেউ যদি 'বৈ' নিয়ে সেটাকে করতে চান 'ফলস্মৃতি', কিংবা 'তৃ' নিয়ে করতে চান 'ফলদর্শন', কিংবা 'হি' নিয়ে 'ফলশ্রবণ', সব ঐ ফল বা পরিণাম অর্থে, ত আপনারা তাঁদের কি বলবেন? অন্ততঃ 'ফলশ্রবণ'কে ত চলতে দিতেই হবে, 'ফলশ্রুতি' যদি চলে। যদি বলেন, না, ফল অর্থে ফলস্মৃতি, ফলদর্শন ত চলতে পারেই না, ফলশ্রবণও চলতে পারে না, ত কেন পারে না সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে।

এছাড়া আরও কথা আছে। ফল এবং ফলশ্রুতি যদি সমার্থকই হয়, এই ধরণের কথাগুলিকেও চলতে দিতে হবে: ছাত্র-ছাত্রীরা যদি লেখে, "আমাদের দীর্ঘকালের সাধনা আজ সফলশ্রুতি হবে," কিংবা "এ নিয়ে এখন অনুশোচনা করা নিষ্ফলশ্রুতি," কিংবা "ডাক্তারদের সকল চেষ্টা বিফলশ্রুতি হল," কিংবা "এই দুষ্কর্মের প্রতিফলশ্রুতি তোমাকে পেতেই হবে," ত সেগুলিকে ভুল বলে কাটা চলবে না।

আকর্ষণীয়

ইংরেজী attractive কথাটা বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদে হয় 'আকর্ষক'। কিন্তু চুম্বকও ত আকর্ষণ করে এবং সেহেতু সেও ত আকর্ষক? তাই যেখানে মন নিয়ে কথা, সেখানে এতকাল আমরা attractive-এর অনুবাদ করেছি হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক এই-সব কথা দিয়ে। কিন্তু বিগত দশ-বারো বৎসর ধরে ঐ অর্থে 'আকর্ষণীয়' বলে একটা কথা চলছে।

"ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে ধাতু বলে......কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অনীয় প্রত্যয় হয়। যথা পা পানীয়, চি চয়নীয়, শী শয়নীয়, কৃ করণীয়, স্মৃ স্মরণীয়, দৃশ্ দর্শনীয়......"

(ব্যাকরণ-কৌমুদী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।)

"নীচে বাঙ্গালায় আগত সংস্কৃত শব্দে প্রাপ্ত কৃৎ প্রত্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল.........অনীয়-অনীয়র্; কর্মবাচ্যে ভাববাচ্যে 'যোগ্য অথবা কর্তব্য' এই অর্থে..."

(সংক্ষিপ্ত ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।)

কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে অনীয় প্রত্যয় হয় বলার অর্থ হল, কর্তৃবাচ্যে অনীয় প্রত্যয় হয় না। কথাটাকে আরও বিশদ করে বলা যায়, যে-ধাতু বা ক্রিয়াপ্রকৃতিতে অনীয় প্রত্যয় হয়, প্রত্যয়যুক্ত সেই ধাতুটি সেই ক্রিয়ার কর্তাকে নির্দেশ করে না। যেমন দৃশ্+অনীয়= দর্শনীয়, কিন্তু দর্শন যে করে তাকে দর্শনীয় বলা হচ্ছে না; যে বা যা দর্শন করার যোগ্য, যাকে দর্শন করা কর্তব্য তাকেই বলা হচ্ছে দর্শনীয়। তেমনি আকর্ষণীয় বললে যে বা যা আকর্ষণ করে, ঐ ক্রিয়াটির যে কর্তা, তাকে বোঝায় না, যে বা যা আকর্ষণ করার যোগ্য যা বা যাকে আকর্ষণ করা কর্তব্য তাকেই বলা যেতে পারে আকর্ষণীয়! ট্রেণের কামরায় হঠাৎ আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হলে বিপৎজ্ঞাপক সংকেতের শিকলটাকে বলা যেতে পারে আকর্ষণীয়, তা সেটা দেখতে যতই unattractive হোক।

নিকটতম জ্ঞাতিশব্দটিকে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যাক।

কৃষ্ থেকেই আকৃষ্। যে-জমিকে কর্ষণ করা যায় বা কর্ষণ করা উচিত তা কর্ষণীয়। কর্ষণ যে করে সে কর্ষণীয় নয়, সে কর্ষক বা কৃষক। এই একই সূত্রে, যে বা যা আমাকে আকর্ষণ করে, সে বা তা আকর্ষণীয় নয়, আকর্ষক। কৃষক/কর্ষককে কর্ষণীয় বললে যে ভুল হয়, অন্ধকার সিনেমা-হলের দর্শকদের দর্শনীয় বললে যে ভুল হয়, আকর্ষণ যে বা যা করছে, যে বা যা আকর্ষণকারী, attractive, তাকে আকর্ষণীয় বললেও সেই একই ভুল হয়।

বস্তুতঃ কর্তৃবাচ্যে অনীয় প্রত্যয়, ভাষাগত একটি প্রথম শ্রেণীর অনাচার। সংস্কৃত ভাষার আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে সে ভাষার দৌহিত্রী বা প্রদৌহিত্রী বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রযুগের অবসান পর্য্যন্ত এ অনাচার কারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়নি। আমরা যে এত হাজার বৎসর পরে সেটাকে সম্ভব করতে পেরেছি, এ আমাদের খুবই বড় একটা achievement বা কৃতিত্ব তা বলতেই হবে।

যে জন্যে বলেছিলাম, কর্তৃবাচ্যে অনীয় প্রত্যয় করে আকর্ষক অর্থে আকর্ষণীয় কথাটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর নামটা জেনে নিতে পারলে ভাষার ইতিহাসে তাঁকে একটা স্থান করে দেওয়া যায়। কথাটা নিশ্চয়ই ত একজন কেউ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন? অতঃপর অবশ্য চিত্তাকর্ষণীয় লেখা চলবে এবং ছাত্রছাত্রীরা যদি তা লেখে তবে তাদের 'নম্বর' কাটতে পারা যাবে কি না সেটা দশ বার ভাবতে হবে।

ছাত্রছাত্রীদের কথা বারবার কেন উঠছে, আশা করি সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

আজকালকার শক্তিমান্ ও শক্তিমতী লেখক-লেখিকাদের মধ্যে দু'তিনজনকে বলতে শুনেছি, "ব্যাকরণ আগে, না ভাষা-সাহিত্য আগে? আমরা ব্যাকরণ মানি না। আমরা লিখে যাব, তারপর ব্যাকরণের ভাবনা অন্যেরা ভাববে।" এটা অবশ্যই একটা ভাববার মত কথা। কিন্তু এটা ত কেবল ব্যাকরণেরই কথা নয়? প্রত্যয়টির অর্থের কথাটাও ভাবতে হচ্ছে যে! কোনো অর্থ নেই অথচ একটা উপসর্গ লাগালাম, কোনো অর্থ নেই অথচ একটা প্রত্যয় জুড়ে দিলাম, ব্যাকরণ না মানলেই কি এরকমটা করা সম্ভব? "যোগ্য অথবা কর্তব্য, এই অর্থে" অনীয়; প্রয়োগটা সেই অর্থে হচ্ছে কি না সেটাও কি দেখতে হবে না? এঁরা যদি বলেন, ব্যাকরণ ত মানিই না, অর্থও মানি না, তবে বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াও নিরর্থক হবে।

আজ থেকে আট বৎসর আগে সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ লিখেছিলাম: "মনে করুন, একটি সুন্দরী তরুণীর আগুল্ফলম্বিত কেশপাশ দেখে আকৃষ্ট হয়ে আপনি তাঁকে বললেন, 'আপনার চুলগুলি আকর্ষণীয়।' বাংলাভাষার জ্ঞান যদি তাঁর কিছু থাকে, তবে আপনার এই কথা শুনে আপনার গণ্ডে তিনি সশব্দে একটি চপেটাঘাত করতে পারেন। আর, তা যদি তিনি করেন ত তা নিয়ে আইন-আদালত করতে গেলে হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কোনো লাভই আপনার হবে না।"

যুক্তিটা ছিল ব্যাকরণ ও অভিধান-নির্ভর। কিন্তু এখন দেখছি একটি অভিধানেও আকর্ষক অর্থে-'আকর্ষণীয়'-র অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এটি একটি English-Bengali Dictionary। সুগভীর পাণ্ডিত্য, বহু শ্রমসাধ্য গবেষণা, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় বহনকারী খুব কার্যোপযোগী একটি অভিধান। ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত এর তৃতীয় সংস্করণের ৬১ পৃষ্ঠায় আছে "attractive আকর্ষণীয়"। ৩২৫ পৃষ্ঠায় আছে "enchanting—অতীব আকর্ষণীয়"। তারপর ৩৩১ পৃষ্ঠায়, "fascinating-আকর্ষণীয়", এবং ৬৮০ পৃষ্ঠায় "noble-আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট"।

আকর্ষণীয়ের আকর্ষণ খুবই যে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেত্রটি এমন যে, এটাকে একটা বড় রকমের দুর্লক্ষণ মনে করা ছাড়া উপায় নেই!

ভূত যদি সরষের মধ্যেই ঢুকতে শুরু করে, কোনো সরষে-পড়া দিয়ে এরপর আর তাকে কাবু করতে পারা যাবে কি?

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অরবিন্দ আশ্রমে প্রাধান্য পেয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা, তথাপি তাঁরা যে আদর্শ অনুসরণ করেছেন তার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবত্রয়ের মিল আছে। এই তিনটি প্রস্তাবের মর্ম্ম হ'ল—(১) আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস এবং শ্রমের সম্মান। (২) জাতীয়তাবোধ ও সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে ছাত্র শিক্ষকের সম্মিলিত সমাজসেবা। এবং (৩) ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধি।

অরবিন্দ আশ্রমের কাজকর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্র উভয় স্থান থেকে প্রতিযোগিতার কাঁটাটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। এখানে প্রমোশনের সুযোগ নেই, মাইনেও বাড়ে না। একজন অপরজনকে অতিক্রম করে যেতে পারেন একটি মাত্র ক্ষেত্রে তা হলো ধ্যান ও যোগ সাধনা। ফলে ঈর্ষা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার কোন সুযোগ নেই। শিক্ষার বেলায়ও তেমনি—প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করার রেওয়াজ নেই। এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই প্রথম হন। যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাতে পাশ ফেল নেই, প্রথম দ্বিতীয় নেই। আমাদের মধ্যে যে সব গুণ আছে সুশিক্ষার দ্বারা সেগুলির বিকাশ ঘটে। আশ্রমের শিক্ষা এই পথে পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষিত ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। ফলে কারো সঙ্গে কারো প্রতিযোগিতা নেই। এই প্রচেষ্টার ফল কী তা যথাযথ জানবার অবকাশ হয়নি। তবে অরভিলে দেখেছি শ্রমিক, মজুর, ইঞ্জিনিয়ার, কালা মানুষ, সাদা মানুষ, দেশী-বিদেশী, স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই একত্রে কাজ করছেন। নেংটি পরা এক স্থানীয় মজুর একটি শিকের একদিক ধরেছেন আর জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার অপর প্রান্ত ধরে কাজ করছেন—নির্মিত হচ্ছে বিশ্বশান্তি নীড়ের মধ্যমণি মাতৃ-মন্দির।

আশ্রমের কেউ প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী নয়। তাই মায়ের অবর্তমানে এত বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযুক্ত কর্মীর অভাব ঘটবে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসীরা আছেন তাই দিন দিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আজ কলেবরে অনেক বড় হয়েছে কিন্তু কবি যা করতে চেয়েছিলেন তা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। অরবিন্দ আশ্রমে সন্ন্যাসী না থাকলেও কর্ম-যোগী আছেন। সুতরাং আশঙ্কার বড় বেশী কারণ নেই।

বর্তমান আশ্রমের মাইল পাঁচেক দূর থেকে আন্তর্জাতিক শহর অরভিল শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত শহরের আয়তন হবে বেশ কয়েক বর্গ কিলোমিটার। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ বিকেলের দিকে জনপ্রতি পাঁচ টাকা ভাড়ায় বাসে করে অরভিল দেখানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। আমরা যখন গেলাম তখন বর্ষার জন্য এ ব্যবস্থা স্থগিত

রাখা হয়েছিল। অরভিলের মধ্যে পথঘাট এখনো ঠিকমতো তৈরী হয় নি। যা হয়েছে সেগুলি বর্ষা একটু বেশী হলেই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। মেরামত না করে বাস চালানো সম্ভবপর হয় না। আমাদের হাতে অপেক্ষা করার মত সময় ছিল না। তাই আমরা উচ্চ মূল্য দিয়ে একখানা ট্যাকসী ধরলাম জহরলাল নেহেরু রোডের পেট্রল পাম্প থেকে।

অরভিলের শুরু পর্যন্ত জাতীয় সড়ক। সুন্দর তরু-বীথি সমন্বিত রাজপথ। নারকেল কুঞ্জ, কাজু বাদামের বন,—আরও সব কত চেনা-অচেনা গাছপালা। পথে একটি হাসপাতাল শহর পড়ে। নামটি এর চমৎকার, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন ধন্বন্তরি। তাঁরই নামে এই শহরের নাম করা হয়েছে ধন্বন্তরি নগর।

প্রথমেই আমরা অরভিলের কেন্দ্রবিন্দু মাতৃমন্দির নির্মাণ কেন্দ্রে গেলাম। ১৯৬৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই আন্তর্জাতিক শহরের ভিত্তিশিলা ন্যাস করা হয়। অনন্য সুন্দর উপায়ে এর আন্তর্জাতিকতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই ভিত্তি রচনায়। ভিত্তি প্রস্তর হ'ল মোচার আকারে গঠিত একটি পাত্র। পৃথিবীর বহু দেশের যুবক যুবতী এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসবার সময় তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে এক মুঠো করে মাটি সঙ্গে আনেন। ভিত্তি স্থাপনের শুভ লগ্নে সেই মাটি তাঁরা নিজের হাতে ঐ ভিত্তিপাত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ স্বপ্ন দেখতেন—There should be somewhere upon the earth a place which no nation could claim as its sole property; a place where all human beings of goodwill sincere in their aspiration could live freely as citizens of the world obeying one single authority, that of the Supreme Truth" বিশেষ কোন জাতির কর্তৃত্ব বহির্ভূত বিশ্বনাগরিকের শহর রচনায় এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিচ্ছেন অরবিন্দ সোসাইটি। এইখানে এই অরভিলে খুব সঙ্গত কারণেই এই আন্তর্জাতিক শহরের প্রতিভূ হয়েছেন ইউনেসকো।

অরভিল শব্দের অর্থ উষা নগরী—City of Dawn. মানব সভ্যতার নতুন প্রভাত এখান থেকে যে শুরু হবে না সে কথা কে বলতে পারে? সকল মানুষের সার্বিক ঐক্যের স্বীকৃতি দিতে না পারলে মানুষের নতুন অভ্যুদয় ঘটতেই পারে না। অরভিলে সেই প্রাথমিক বাধা নেই। সব মানুষ এক নয়। তবু সকল মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই মানুষকে এগোতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের মধ্যেও এই একই ভাবনা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কবি জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে তাঁর শেষ জন্মদিনের বাণীতে আশা প্রকাশ করেছিলেন পূর্বদিগন্ত থেকেই মানব সভ্যতার নতুন অভ্যুদয় হবে। আমাদের ভাবতে ভাল লাগে বাস্তব ক্ষেত্রে সেই মহান্ কাজ বুঝি শুরু হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের অরভিলে।

অরভিল আপাতত পঞ্চাশ হাজার মানুষের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। শহরটিকে শিল্পে স্থাপত্যে অপরূপ সুন্দর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বাড়িগুলির মডেল দেখলেই বিস্মিত হতে হয়। সমগ্র এলাকাটি চারটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত হয়েছে। (১) বসবাসের এলাকা, (২) সাংস্কৃতিক পাড়া, (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র, এবং (৪) শিল্পাঞ্চল। পৃথিবীর সব দেশ তার সর্বোত্তম বিদ্যা বুদ্ধি ও সম্পদ দিয়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্যারীসে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯৬৮ সনের অক্টোবর-নভেম্বর অধিবেশনে (পঞ্চদশ অধিবেশন) অরভিলের অন্তর্নিহিত আদর্শ এবং তার বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ্বশান্তি ও মানব ঐক্যের ক্ষেত্রে অরভিলের সুমহান সম্ভাবনা সম্পর্কে

ইনেসকোর ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ ম্যালকম আদিশেশিয়া বলেছেন :

"We in UNESCO and outside of Auroville have tried other ways of living together and have seen them ending in stark tragedy. We have arrived everywhere--in Europe as in Asia, North America, Africa—at a stage which drives home to us the faith that for us there is no way forward except a conscious spiritual development.

And so now we turn to Auroville and to its founding. The founding of Auroville is a new kind of spirituality, a new consciousness which is lacking in our world to day.........on, behalf of UNESCO............ ..I hail Auroville its conception and realisation, as a hope for all of us..............."

দ্বন্দ্ব সংঘাত পীড়িত বিশ্বে অরভিলের কল্পনা সকলকেই আশান্বিত করবে। মিলে মিশে বেঁচে বর্তে থাকার একমাত্র উপায় হ'ল সচেতনভাবে অধ্যাত্মবাদের বিকাশ সাধন। স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতবর্ষ তো এই কথাই বলে আসছে।

মাতৃমন্দিরকে কেন্দ্র করে অরভিল গড়ে উঠবে, এ কথা আগে বলেছি। চারটে পিলারের উপর একটি গোলাকৃতি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এই পরিকল্পনার একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। আমরা তা জানতে পারি নি। থাকবে সঙ্গে চারটি বাগান। কাছেই একটা বট গাছ আছে। তাকে ঘিরে তৈরি করা হবে ত্রয়োদশ বাগান বা ঐক্য কানন। মা বলেছেন মাতৃমন্দির হচ্ছে মানুষের পূর্ণতার, আকাঙ্ক্ষার ঐশ্বরিক পূর্তি। এখন নির্মাণের কাজ চলছে (অক্টোবর. ১৯৭২)। অরবিন্দ ও মায়ের ছবি পাশে রেখে কর্মীরা কাজ করছেন। ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে।

অরভিলে পৃথিবীর অধিকাংশ সব দেশের সরকার একটি করে কেন্দ্র গড়ে তুলতে স্বীকৃত হয়েছেন। ভারত সরকার 'ভারতনিবাস'টি গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। পরিকল্পনাটি এর খুবই চিত্তাকর্ষক। একটি অঙ্গনের মধ্যে মূল ভবনের সঙ্গে যুক্ত ১৯টি একই প্যাটার্ণের পৃথক পৃথক বাড়ি হবে ভারতবর্ষের ১৯টি রাজ্যের প্রতীক রূপ। সঙ্গে থাকবে রেষ্টরেণ্ট, সাংস্কৃতিক মণ্ডপ ইত্যাদি। 'ভারতনিবাস' সম্পূর্ণ করতে মোট ব্যয় হবে আড়াই কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে, খরচ হবে ৪০ লক্ষ টাকা।

একপ্রকার জনহীন এই প্রান্তরে কিছু কিছু কর্মী ইতিমধ্যে বসবাস করতে শুরু করেছেন। দেশী বিদেশী মিশ্র ধরণের বিচিত্র সব আবাস। নানা ক্ষেত্রে কাজ চলছে। একটি স্কুল আছে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলছে। দেখবার বড় বেশী কিছু নেই, তবে ঘুরে এলে এর বিশালতার আন্দাজ পাওয়া যায় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা প্রত্যয়ও হয়।

আমাদের পণ্ডিচেরী অবস্থান শেষ হয়ে এসেছে। ছেড়ে আসবার পূর্বে সংগোপনে একবার জানতে চেষ্টা করলাম শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে এদের মনোভাব কি। অনেকে নামটি পর্যন্ত শোনেন নি। আশ্রমের কোথায়ও তাঁর একখানা ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। বিবাহিত ভারতীয় সাধকদের স্ত্রীগণকে, কোন বিচার না করেই ভারতবাসী পূজা করে এসেছেন। সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আধুনিক কালের বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, কস্তুরবা গান্ধী প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বিবাহ কোন আকস্মিক ঘটনা বলে আমরা মনে করি না।

আশ্রমের নানা কাজে প্রচুর কর্মী রয়েছেন। অধিকাংশ-গুরুত্বপূর্ণ পদে এখনো বাঙালী আছেন। মায়ের পুত্র ম'সিয়ে অঁাদ্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী। আশ্রমের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও মা নিজের ছেলের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা

করেন নি। আশ্রম জীবনে যোগদান করার পর কেউ কেউ মতাদর্শের গোলমাল প্রভৃতি বিবিধ কারণে সংস্রব ত্যাগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীঅনিলবরণ রায় গোস্বামী প্রভৃতি।

সমুদ্রতীরে অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত বাড়ি নিয়ে আশ্রম। শহরের নানা স্থানে এখন নতুন নতুন অনেক বাড়িঘর নির্মিত হচ্ছে। আশ্রমে নারী পুরুষে কোন ভেদাভেদ করা হয় না। ছাত্রীরা সকলেই হাফ-প্যান্ট হাফশার্ট পরেন, সাইকেল চড়েন। মেলামেশা অবাধ। নারীকে নানা বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে আমরা অভ্যস্ত। এখানে সে সব নিয়ম অচল। নারীপুরুষের সমানতা খুবই সুন্দর মনে হ'ল। নারীকে অনুগ্রহ করে, তাদের আমরা অপমান অসম্মান করেই থাকি। গান্ধীজী বলেছেন নারী পুরুষ উভয় উভয়ের পরিপূরক। ঐ সত্যটি এখানে অনুভব করা যায়। মনু বলেছেন মানুষকে মা ও কন্যা থেকেও সর্তক থাকতে হবে। এ দিক থেকে আশ্রম বোধ হয় একটি নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষাই করছেন।

ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য আশ্রম সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের ধারণা কি তা জানতে পারি নি। আড়াই শ' বছর ধরে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত থাকার ফলে রাস্তাঘাটের নামে ফরাসী ভাষার আধিক্য তো চোখেই পড়ে। জনজীবনে তার কি প্রভাব তাও জানবার অবকাশ হ'ল না। আশ্রমের কেন্দ্র থেকে স্থানীয় লোকদের নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে দেখা গেল। আশ্রমের সঙ্গে এদের যোগ ঘনিষ্ঠ। এরা সকলেই সাধারণ মানুষ। যেচে আলাপ করলেও কোন কথা বলতে চান না। ভাষার অসুবিধা ছাড়া এ ক্ষেত্রে আর কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে একশ্রেণীর স্থানীয় মানুষ আশ্রমের উপর প্রসন্ন নন তা বেশ বোঝা গেল। কিছুকাল আগে একবার সশস্ত্র হামলাও নাকি হয়েছিল।

আশ্রমের পুরণো কর্মী মরিস সাহেব—স্থানীয় খ্রীস্টান। পঁচাত্তর বছরেরও বেশি হবে তাঁর বয়স। তিনি অনেক খবর রাখেন। আর্য পত্রিকা যে প্রেসে ছাপা হ'ত সেখানে তিনি প্রুফ বয় ছিলেন। প্রুফ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট যাতায়াত করতেন। প্রায় প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত আশ্রমের রূপান্তর তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। মায়ের স্বামী যে নির্বাচন লড়েছিলেন পণ্ডিচেরি থেকে তাও তিনি মনে করতে পারেন। নির্বাচনের কাজেই তাঁরা প্রথম পণ্ডিচেরি আসেন। সে সম্পর্কে গল্প বলতে বেশ উৎসুক। অনেক কথা তিনি জানেন। কিন্তু কোন এক দুর্বোধ্য কারণে মুখ খুলতে চান না! কোন দুর্বল মুহূর্তে এক আধটা কথা বের হয়ে গেলে প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন চট্ করে। তবে তিনিও বুঝে ফেলেছেন, মা মারা গেলে আশ্রমের ভার কোন তামিল লোক বা মাড়োয়ারী-পাবেন না, পাবেন শ্রীনলিনীবাবু। অরবিন্দের সঙ্গে যে ক'জন বঙ্গ সন্তান এসেছিলেন শ্রীনলিনীকান্তগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। তিনি এখন অরবিন্দ সোসাইটীর সম্পাদক এবং আশ্রমে মায়ের পরেই তাঁর স্থান।

সার্বজনীন ভোজনালয়ে দুপুরে খেয়ে সাড়ে বারটার বাস ধরে প্রায় ৪টায় সময় আমরা চিদাম্বরম্ এলাম। বৃষ্টির জন্য রাস্তা খারাপ ছিল, তাই একটু বেশি সময় লাগল। সাধারণত দু ঘন্টার বেশি সময় লাগে না। চিদাম্বরম্ বাস টারমিনাস থেকে রেল স্টেশন কাছেই। আমরা স্টেশনে এসে উঠেছিলাম। এটা ভুল। হ'ল শহরের মধ্যস্থলে নামলে একটা ধর্মশালায় বিনামূল্যে জিনিসপত্র রেখে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় ও নটরাজ মন্দির দেখে আসা সুবিধাজনক।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি কারণে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের যোগ হ'ল প্রধান কারণ। আর দ্বিতীয় কারণটি অপ্রত্যক্ষ হলেও আমার নিকট বেশ মূল্যবান্। গান্ধীজী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যোগদান করতে যাবার পথে জনতার হাতে আটকা পড়েছিলেন। জনতার দাবি, তাদের পঙ্ক্তি-ভোজনে

গান্ধীজীকে একবার যেতেই হবে। গান্ধীজী বলেছিলেন কার্যসূচিতে ওটা নেই, অতএব যাওয়া হবে না। জনতা নাছোড়বান্দা, গান্ধীজীও অটল। মহাত্মার সঙ্গী ডাঃ রাজন জনতাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন, জনতার সঙ্গে তাঁর উত্তেজিত কথাকাটাকাটি হচ্ছে। এই অবসরে গান্ধীজী সকলের সলক্ষ্যে গাড়ি থেকে নেমে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে পালিয়ে গেলেন। পেছন থেকে আর একটা গাড়ি তাঁকে তুলে নিল। জনতা এবার বুঝল ব্যাপারটা। গান্ধীজী তখন তাদের নাগালের বাইরে। রাগটা গিয়ে পড়ল ডঃ রাজেনের উপর। নিগৃহীত হতে হল তাঁকে। গান্ধী-জীবনে পালিয়ে থাকার দ্বিতীয় ঘটনা দুর্লভ।

নটরাজন্ মন্দিরটির খ্যাতি খুব। শিবের রুদ্র মূর্তির উপর বাঙালীর একটু বেশি আকর্ষণ আছে। নটরাজের মূর্তির পরিকল্পনা ও শিল্প-সুষমার আবেদন সর্বজনীন। শ্মশানের চিতাভস্মের উপর নবজন্ম পরিগ্রহ করে এই বিশ্বাসের দ্বারাই মৃত্যু অমৃত হয়েছে। মা কালীকে তাঁর রুদ্রে ভীষণ ও ভয়ঙ্কর মূর্তিতেই আমরা পুজা করি, ভালবাসি। কেননা বাইরের কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমরা আলোর বন্যা প্রত্যক্ষ করি। অন্ধকারের পরপারেই তো আলো। আলো পেতে হলে তা অতিক্রম করতেই হবে ধ্বংস তো একরকম সৃষ্টির উৎসব। নটরাজের প্রলয় নাচন সৃষ্টিকে রসাতলে পাঠিয়েই শেষ হয় না: নূতনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আসে।

চিদাম্বরম্ ছোট জায়গা। অনেকে গোবিন্দ রাজাও দেখতে যান। তা গেলেও এখানে রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয় না।

সন্ধ্যার অল্প পরে আমরা তাঞ্জোর যাত্রা করলাম। দূরত্ব বেশি নয়। গাড়িতে ভিড় ছিল না একেবারে। রাত দশটা নাগাদ তাঞ্জোর স্টেশনে পৌঁছাই। তাঞ্জোরের নতুন নাম তাঞ্জাভুর। আমরা তাঞ্জোরই বলব। দারুণ বর্ষা হচ্ছিল বলে আমরা রেলের রিটায়ারিং রুমে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। দোতালায় ঘর। ব্যবস্থাদি ভাল কিন্তু ছাদ ফুটো, মেজের জল থৈ থৈ করছে। স্টেশন এলাকার বাইরেই অনেক ভাল থাকা-খাওয়ার জায়গা আছে, খরচও সেখানে কম।

চিদাম্বরম্ থেকে তাঞ্জোর আসার পথে কুম্ভকোনম্ পড়ে। সেখানে মুগ্ধ হয়ে দেখবার যোগ্য কয়েকটি বিখ্যাত সগোপুরম্ মন্দির আছে। প্রধান দুটি মন্দির হ'ল শিব ও বিষ্ণুর। জনৈক সহযাত্রী এখানে নামবার জন্য আমাদের পীড়াপীড়ি করলেন। তাঁর ধারণা কুম্ভকোনম্, না দেখলে দক্ষিণ ভারতের কিছুই দেখা হল না। বিশাল ভারতের সব কিছুই দেখা একবার বেরিয়েই শেষ করে ফেলব এমন কোন দুরাশা আমরা পোষণ করি না। সহযাত্রীর নিজ বাসভূমির গৌরব-সচেতনতা বুঝতে কষ্ট হয় না। এরকম মানসিকতা আমাদের অনেকেরই আছে। তাই তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে আমাদের অক্ষমতা জানালাম। ভ্রমণের সূচিতে রাত্রিটা বিশ্রামের সময়' গাড়িতে আজকাল ঘুমোবার ব্যবস্থা করা যায়। তাই প্রয়োজনে রাত্রিতে রেল ভ্রমণ করাই বিধেয়। অতএব এরই মধ্যে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে নিলাম।

খুব ভোরে উঠে মালপত্র গুছিয়ে স্নানাদি সেরে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রির ধারাবর্ষণের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। প্রসন্ন সূর্যালোকে আলোকিত শহরে সবই শুকনো খটখটে। স্টেশনের বাইরে গরুতে টানা টাঙ্গাগাড়ি। চিদাম্বরমেও দেখেছি এমনি যান। গরুগুলি ছোটখাটো কিন্তু শিং তাদের দর্শনীয়। তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শিং জোড়া খাড়া হয়ে উঠেছে সমান্তরাল ভাবে। শিংএর শীর্ষবিন্দুতে পিতলের টোপরও কেউ কেউ পরিয়েছেন। এই বিচিত্র যানে সওয়ার হওয়ার লোভ সম্বরণ করতে হল। কারণ চিদাম্বরমেই তাদের মন্থরগতির পরিচয় পাওয়া গেছে। আমাদের সময় এখন ঘন্টা-মিনিটে বাঁধা। তাই দ্রুতগামী যানবাহন ছাড়া উপায় নেই। প্রথম আমরা বৃহদেশ্বর মন্দিরে গেলাম।

সরকারী প্রচারপুস্তিকায় বলা হয়েছে, কাবেরী

উপত্যকায় সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হ'ল তাঞ্জোর। বৃহদেশ্বর মন্দির তার বিশালতা, শিল্পরীতি, স্থাপনার কৌশল এবং সুরক্ষার বন্দোবস্তের অবশেষ দেখে সহজেই এর পূর্ব সমৃদ্ধির কথা অনুমান করা যায়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ। বাইরের পাঁচিলটি দোতলা বাড়ির সমান উঁচু। সমগ্র পাঁচিলটির শীর্ষদেশে কয়েক ফুট অন্তর অন্তর উপবিষ্ট বৃষমূর্তি। পাঁচিলের সঙ্গে ব্যারাক টাইপ অজস্র ঘর। মনে হয় এগুলি সৈন্যদের আবাস ছিল। প্রবেশপথে একখানা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে লেখা আছে ৮০০ ফুট × ৪০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৯০ বিঘা পরিমিত ভূমিখণ্ডে মন্দিরটি স্থাপিত।

মূল মন্দিরটিতে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য বহু মন্দির এই চত্বরে রয়েছে। শিবলিঙ্গের এখানে ছড়াছড়ি। দুর্গা ও শিবের ভিক্ষুক মূর্তি, আমরা যাকে অন্নপূর্ণা বলি,লক্ষ্মী, সরস্বতী, অর্ধনারীশ্বর, নটরাজ, কার্তিক সবই আছে। ইংরেজপূর্ব ভারতের রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মবোধ, ঐশ্বর্য ও শিল্পরুচির যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল, এই মন্দিরটি তার নির্ভুল সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। যেদিনকার রাজারা দেবতার প্রতিনিধি হয়েই রাজ্যশাসন করতেন। রাজ্যের সমস্ত সম্পদ্ দেবতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রাজা নিজে যে কদাচিৎ কিছু গ্রহণ করতেন না তা নয়, অধিকাংশই তা সেবকের মনোবৃত্তি নিয়েই নিতেন। নানা উৎসব অনুষ্ঠানের, পালা ও পার্বণের মধ্য দিয়ে রাজভাণ্ডারের ধন জনসাধারণের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ত। খারাপ দু-চারজন যে ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম মাত্র। আজকের দিনেও, ব্যবস্থা যত ভাল হোক না কেন, মানুষটি খারাপ হলে তা কোন কল্যাণ করতে পারে না। আওরঙ্গজেবের মত অত্যাচারী মুসলমান সম্রাট্ কোরাণ নকল করে যে পারিশ্রমিক পেতেন তা থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখনকার সমাজবোধ ও বিচারবোধে এটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। তাঞ্জোর তাই আমাদের সামনে সমগ্র ইতিহাসটা জীবন্ত করে তুলে ধরে।

বৃহদেশ্বর শিব মন্দির। সুতরাং নন্দী থাকবেই। এই মন্দিরের নন্দী মহারাজ বেশ বড় এবং দেখতে ভাল। আমার চোখে চামুণ্ডি পাহাড়ের মূর্তি অপেক্ষা সুন্দরতর মনে হয়েছে।

কার্তিকের একটি মন্দির বিশেষ করে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এত অল্প পরিসরে এমন সুন্দর শিল্পরস সমৃদ্ধ রচনা খুবই কমই আছে।

বৃহদেশ্বর মন্দির থেকে আমরা সরস্বতী মহলে এলাম। এটি মারাঠাদের কীর্তি। সামান্য কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে দারোয়ান আমাদের রাজবাড়ীটি দেখালেন। অযত্ন-রক্ষিত। ইতিহাসের অনেক পর্ব এই কক্ষে অভিনীত হয়েছে। লাইব্রেরীটি বন্ধ ছিল। যেমন তেমন বন্ধ নয়। তালাগুলি পর্যন্ত সিল করা। তা থেকে অনুমান করলাম, অনেক মূল্যবান্ নথীপত্র, পুস্তক পাণ্ডুলিপি এখানে রয়েছে। শুনেছি সংস্কৃত পুঁথির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার এটি। বহু গবেষক নানা বিষয়ে এখানে গবেষণায় রত আছেন। তাঁদের জন্য এই পাঠাগারে একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে।

পাঠাগারের প্রবেশপথে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের একটি ছোট মন্দির। রামদাস বাবাজীরও ছবি আছে এই মন্দিরে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সরস্বতীর বরপুত্রদের সাক্ষাৎ মিলল না। পাশেই ছিল একটি নির্মীয়মান যাদুঘর। নগদ দক্ষিণা দিয়ে সেটাই ঘুরে ফিরে দেখলাম। নতুন কিছু নেই। মাদ্রাজ শহরের মিউজিয়ম দেখার পর এ সব কারো চোখে ধরবে না। সঙ্গে একটি আর্ট-গ্যালারিও আছে। দেখবার অবকাশ হয়নি। একজন ভাস্কর বসে কাজ করছেন। তিনি দুইটি মূর্তি করে রেখেছেন—আম্মাদুরাই ও রবীন্দ্রনাথের—লোকজন ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন। প্রথমে মনে হল পয়সা চাইবেন। তাই আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। পরে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দেখে গেলাম সেখানে। ফিরে আসবার সময় তাঁকে কিছু দিতে গেলে তিনি সবিস্ময়ে তা নিতে অস্বীকার করলেন।

দুপুরে আমাদের ত্রিচিনাপল্লী রওনা হতে হবে। ত্রিচিনাপল্লীর নাম হয়েছে তিরুচ্চিরাপল্লী। আমরা পুরণো ত্রিচিনাপল্লীই ব্যবহার করব, এটা অনেক মধুর নাম। তাঞ্জোর-এর দূরত্ব মাত্র ৫৬ কিলোমিটার। অধিকাংশ লোক বাসেই যান। আমরা ষ্টেশনে মালপত্র রেখে বেড়াতে বেরোবার সুবিধা হবে বলে গাড়ীতেই গেলাম।

তাঞ্জোরে ভাষা-বিভ্রাট, খাদ্য-সঙ্কট। এখানে খুব কম লোক ইংরেজী বা হিন্দী জানেন। খাদ্য আমাদের গলা দিয়ে নামে না। সে তুলনায় ত্রিচিনাপল্লী স্বর্গ। ষ্টেশনেই একজন রেলকর্মী বিনা ভূমিকায় বললেন, পাঞ্জাবি দেখেই ধরে ফেলেছি বাংলা থেকে আসছেন। তিনি হাওড়া আমতা রেলের কর্মী। ঐ রেল বন্ধ হওয়ায় কর্মীদের অধিকাংশকে দক্ষিণ ভারতে বিকল্প চাকরী দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সকলেই যুবক, তাই বেপরোয়া ভাবটা আছে। ভাল লাগল এঁদের কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে। এঁরাই পথঘাটের হদিস দিলেন, ভাল হোটেলের সন্ধান দিলেন।

ষ্টেশনে মাল জমা দিয়ে আমরা খেয়ে নিলাম। এত সুন্দর খাবার দক্ষিণে পদার্পণ করে জোটেনি। হাফপ্লেট বিরিয়ানি একজনের পক্ষে খেয়ে ওঠা কষ্টকর। দামেও সস্তা।

ষ্টেশন থেকে এক নং বাস যায় শ্রীরঙ্গম্ রকফোর্ট ও রঙ্গনাথ মন্দিরে। প্রথমে আমরা রঙ্গনাথ মন্দিরে গেলাম। ভারত সরকারের দপ্তর থেকে আমি যে সাইক্লোষ্টাইল করা ভ্রমণসূচি পেয়েছিলাম তাতে রঙ্গনাথ স্বামী মন্দিরের নাম নেই। আমাদের পথের বন্ধু টেলকোর যুবক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই মন্দিরের কথা বিশেষ করে আমাদের বলেছিলেন। বিশাল মন্দির। কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তা বুঝতে সময় লাগে। এক-দুদিনে ঠিকমত জেনে নেওয়া অসম্ভব। মূল মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ। তাই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছিলাম। ফলফুল কাপড়চোপড় বাসনকোসন চা জলখাবার এমন কি আনাজপত্রের দোকান পর্যন্ত রয়েছে মন্দির চত্বরে। এর জায়গায় দেখলাম মন্দিরে প্রাপ্ত কাপড়চোপড়ের নিলাম হচ্ছে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে হয়তো কিছু সন্দেহ হয়ে থাকবে—শ্রী ই. সম্পত নামে জনৈক বাঙ্গালোরবাসী উপযাচক হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কি না। আমাদের ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি ভাঙ্গা বাংলায় বললেন—অনেকদিন আমি কলকাতা ছিলাম। সে বছর কুড়ি হল। তখনকার খেলাধূলার জগতে সম্পত বাবুর একটা পরিচয় ছিল। আরও বললেন—বাংলার প্রতি তাঁর অনুরাগের ফলে তিনি বাঙ্গালী পেলেই যেচে আলাপ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। ব্যাপারটা যাই হোক তিনি ভগবানের আশীর্বাদ হয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য ছাড়া ত্রিচিনাপল্লীর মন্দির দেখা সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও প্রথমে আমরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারিনি। বিদেশ বিভূঁই, কার মনে কি আছে কে জানে। গোড়ায় তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশঙ্কা আচরণে নিশ্চয়ই অপ্রকটিত ছিল না। ভদ্রলোক তা বুঝতে পারেন নি, এমনও নয়। তবু তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়েন নি। পরে বুঝেছি, তিনি নবকুমারের সমধর্মী মানুষ। আমাদের চিত্তের ক্ষুদ্রতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি।

সম্পত বাবু বাঙ্গালোরে 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' কাগজের কর্মী। টিরুচিতে তাঁর বাড়ী। তাঁর দাদা এখানে থাকেন। মা অসুস্থ তাই ছুটি নিয়ে এসেছেন। স্থানটি যেমন তিনি চেনেন, এখানকার বহুজনেও তাঁকে জানে।

মন্দিরের আহ্বান সম্পতবাবুর নিকট অপ্রতিরোধ্য। নগ্ন পদে মন্দির পরিক্রমা করা ওঁর নিত্যদিনের কাজ। ভক্ত মানুষ তিনি। আধুনিক শিক্ষা এই দক্ষিণের মানুষের হৃদয় থেকে ভক্তি ও বিশ্বাসের আসনটি টলাতে পারে নি। গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিনোবাজী

বলেছেন, জ্যামিতির প্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে আমরা বিনা তর্কে মেনে নিই ক খ গ একটি ত্রিভুজ। শুরুতেই যদি তর্ক তুলি তা হলে সবই তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অথচ ভগবানের বেলায় এতটুকু ঔদার্য অনেকের নেই। ক, খ, গ একটি ত্রিভুজ মনে করতে পারি কিন্তু বিগ্রহের শিলাখণ্ডে ঈশ্বর রয়েছেন এটা মনে করতে পারব না কেন? এই মনে করতে না পারলে অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে অসমর্থ হলে ঈশ্বর লাভ তো দূরের কথা, জ্যামিতিই শেখা হয় না। আমরা একজাতীয় তথাকথিত বুদ্ধিমান্ মানুষ অন্ধবিশ্বাস ব'লে একটা কথা আবিষ্কার করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাদের বিকৃত বুদ্ধির ওপর কশাঘাত করেছেন দু'টি মাত্র কথায়—বিশ্বাস বিশ্বাসই, চক্ষুষ্মান বা অন্ধ বিশ্বাস বলে কিছু নেই।

সম্পতবাবু প্রায় তিন ঘন্টা ধরে ঘুরে ঘুরে বিশাল এই মন্দির কমপ্লেকসটি আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখান। তাঁর মুখে এর অতীত ইতিহাস, নানা অলৌকিক কাহিনী আর কিংবদন্তি মিলে মন্দিরের নির্মাণ কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সহস্রাধিক বর্ষের ইতিহাস ছায়াছবির মত ভেসে উঠেছিল। সে এক দুর্লভ আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শুধু গল্প শোনানো নয়, প্রয়োজন মত ডেমনষ্ট্রেশনও দিচ্ছিলেন। একটা বিশেষ স্থানে গিয়ে বললেন এবার তাকান ঐ গবাক্ষ দিয়ে। মন্দিরের স্বর্ণচূড়া আর মন্দির রক্ষকের বিগ্রহ এত সুন্দর আর কোনখান থেকে নাকি দেখা যায় না। মূল মন্দির আর মন্দিরের শস্য গোলার মধ্যে একটি দীর্ঘ ও সুউচ্চ পাঁচিল আছে। তার পাশে এসে বললেন—চিৎকার করে কাউকে ডাকুন। আমরা আর কাকে ডাকব? সবাই চুপ করে আছি। তিনি নিজেই চিৎকার করে কাউকে আহ্বান জানালেন। মিনিট খানেক ধরে সেই ধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। এরপর আমরাও দু'একবার চিৎকার করেছিলাম।

কোন্খানে শুরু আর কোথায় শেষ তা বোধ করি চার-দশ দিনে মালুম হবার নয়। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ধরে এসেছিল, ক্লান্তিতে আমরা ভেঙে পড়েছিলাম। হাজার বছরের পুরণো এই মন্দিরটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শহর বিশেষ। ওঁরা বলেন 'মন্দির নগর'। পর পর সাতটা পাঁচিল দিয়ে মন্দিরটি ঘেরা। সেই ঘেরা চত্বরের মধ্যেই জনবসতি, দোকান, বাজার, অসংখ্য দেব দেবী, পশু-পক্ষীশালা, শস্যগোলা, অফিস, ভাণ্ডার ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিগ্রহের নিত্য পূজা অর্চনা, সেই সঙ্গে ভক্তবৃন্দের সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য হাজার হাজার বিঘা জমি ছিল। উৎপন্ন ফসল সংরক্ষণেরই বা কি চমৎকার ব্যবস্থা। সাত সাতটা পাকা দোতালা গোলাঘরের ভগ্নাবশেষ এখনও এই মন্দির সীমানার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পশুশালায় একদা বহুসংখ্যক হাতী, ঘোড়া, গাই, বৃষ ইত্যাদি ছিল। এখন একটি হাতী ও গোটা-কয়েক গাই মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। পক্ষীশালার আয়তনও হ্রাস পেয়েছে, দু'টি খাঁচায় সীমাবদ্ধ হয়েছে।

মূল মন্দিরে সর্পশয্যায় শায়িত শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ। অনন্ত শয়নে বিষ্ণু। ওরা বলে রঙ্গনাথজী বা রঙ্গনাথ স্বামী। বহুজনের বিশ্বাস, ঐশ্বরিক নির্দেশে একরাত্রে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু উপচার সংগ্রহে ত্রুটি ঘটায় শেষ পাঁচিলটি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই রাত শেষ হয়ে দিনমনির আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং দেবলোকের মিস্ত্রিরা কাজ শেষ না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হন। আজও শেষ পাঁচিলটি অসম্পূর্ণ রয়েছে। এটিকে সম্পূর্ণ করার কোন চেষ্টাই কেউ করেন নি কেন তাও আর এক বিস্ময়। দানিকেন সাহেবের এই মন্দিরটি দেখবার অবকাশ হলে—হয়তো গ্রহান্তরের মানুষের আর একটা অসম্পূর্ণ কাজের উদাহরণ তাঁর বইতে যোগ করতে সমর্থ হতেন।

ভারতের সর্বত্রই একরাত্রে দেবস্থান নির্মাণের বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে, বহু মানুষ তা বিশ্বাস করে থাকেন। গ্রহান্তরের মানুষ একদা পৃথিবীতে এসে এসব শিল্পসমৃদ্ধ স্থাপত্যাদি নির্মাণ করেছেন তাঁদের উন্নততর যন্ত্রবিদ্যা ও প্রযুক্তিজ্ঞান প্রয়োগ করে। সাধারণ মানুষের

অসাধ্য নানাবিধ কারুকর্মের নিদর্শন, এমন কি বুদ্ধির অগম্য (যেমন, দিল্লীর লৌহ স্তম্ভে মরচে পড়ে না কেন) বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে দানিকেন সাহেব গবেষণা করছেন। মানুষের পক্ষে গ্রহান্তরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি অপেক্ষা করা যে সম্ভবপর নয় তা তো আমরা জানি। অনুরূপ ভাবে গ্রহান্তর থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের পক্ষেও ঘন্টা মিনিট ধরে পূর্ব্ব নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই পৃথিবী ত্যাগ করতে হত। তাই সময় হলে, হাতের কাজটি শেষ হোক বা না হোক, তাঁদের ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকার কথা নয়। দূর অতীতের এই রকম কোন ঘটনার থেকে জাতীয় কিংবদন্তির উদ্ভব হওয়ার বিষয় যাঁরা অনুমান করেন তাদের কথা এখন আর চট করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মন্দিরে মন্দিরে কত যে দেব দেবী তার কোন হিসাব করা শক্ত। একটি মন্দিরে মূর্তির স্থাপনা বিচিত্র ধরণের। সর্বত্র আমরা মূর্তিগুলি পাশাপাশি স্থাপিত দেখেছি। এখানে লাইন করে দাঁড় করানো। সম্মুখে যিনি তাঁর আকার সব চেয়ে ছোট, নাম রঙ্গনায়িকা। তাঁর পশ্চাতের জন একটু বড়, নাম—শ্রীভূমি দেবী। সর্ব পশ্চাতে আছেন শ্রীদেবী এবং তিনিই সর্ববৃহৎ। মন্দিরের দেওয়ালে আলপনা আঁকা। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির প্রতীকটিই যেন আলপনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভূমিদেবী বোধ হয় ভূমাতা। এঁর কোন মূর্তি দেখিনি অন্য কোনখানে। তবে একখানা প্রার্থনা পুস্তকে একটি সুন্দর মন্ত্রে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে। 'হে বসুন্ধরা মাতা। সমুদ্র তোমার বস্ত্র, পর্ব্বত তোমার স্তন, বিষ্ণু তোমার স্বামী, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি পা দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করে থাকি, তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করো।" ভূমিদেবী বিষ্ণুর শ্রী বলেই এখানে তাঁর অবস্থান অপরিহার্য।

মূল মন্দিরে ঢুকবার দর্শনী পঁচিশ পয়সা। তারপর দরজায় দরজায় প্রণামী দিতে হয়। পাণ্ডা পুরোহিতের অবশ্য জুলুম নেই। সামান্য কিছু দিলে প্রসন্ন আশীর্বাদ পাবেন। না দিলে মুখটা অপ্রসন্ন হয় কদাচিৎ। দান সংগ্রহের জন্য ছোট বড় নানা আকারের সছিদ্র লোহার সিন্দুকও বসানো হয়েছে বেশ কয়েকটি।

সৌভাগ্যক্রমে রক টেম্পলে সন্ধ্যারতি ও এই মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। রঙ্গনাথজীর একটি দণ্ডায়মান মূর্তি সুবেশী ব্রাহ্মণেরা বাদ্য ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে সুসজ্জিত শিবিকায় বহন করে মন্দির থেকে অঙ্গনে খানিকটা দূর নেমে এলেন। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ও পূজা করা হ'ল। বিগ্রহসহ শিবিকা কাঁধে করে বাহকেরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। পূজা পাঠ সমাপ্ত হলে তাঁরা পিছু হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শিবিকাটি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করবামাত্র একটা ড্রপসিনের মত ভারী বড় পর্দা ফেলে দেওয়া হ'ল। মন্দিরটি ও বেদী ফুল ও মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল।

আর এক জায়গায় দেখা গেল মালাকারের দল ফুল পাতার সাজ তৈরী করছেন। এই সজ্জা রচনায় নারকেল পাতার ব্যবহার প্রচুর। উৎসব-অঙ্গন নারকেল পাতা আর কাঁদি সমেত কলাগাছ দিয়ে সাজানো হয়।

মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে পুকুরও আছে। নাম তার চাঁদ পুকুর। গোল একটি পুকুর ইট দিয়ে বাঁধানো। ঠাকুরের জল বিহারের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী। বৃষ্টিতে জল এক দিকে উপচে পড়ছে, তাতে অগুনতি তেলাপিয়া মাছ। ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পুকুর-ঘাটে একটু বসে নিলাম। উৎসবের দিন ছেলেরা এখানে নানা রকম সাঁতারের কসরৎ দেখায় বলে সম্পৎ বাবু জানালেন।

পুকুর থেকে উঠে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটি কলাপ্সিবল গেট দিয়ে বন্ধ হল ঘরের সামনে এলাম। সম্পৎবাবু বললেন—এটি সহস্র স্তম্ভ গৃহ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে অনেক মন্দিরেই নাকি সহস্র স্তম্ভের মণ্ডপ আছে। সম্পৎবাবু বললেন প্রায় সব মন্দিরে এই রকম একটা মণ্ডপ আছে, কিন্তু সংপ্রেটি স্তম্ভ আর কোথায়ও নেই। এই স্তম্ভের অনেকগুলিতে হাতের আঘাতেই

নাকি বাজনার বোল তোলা যায়। অনুরূপ স্তম্ভ আরও কয়েকটি মন্দিরে আছে।

এই মন্দিরের দণ্ডায়মান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি আর তাঁর গলার শালগ্রাম শিলার মালা, দুটোই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মালাটি নাকি নেপালের মহারাজার অর্ঘ্য। পুরোহিতরা সেটা বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন। বলবার মত কথাই বটে। সারা পৃথিবীতে নেপালের মহারাজাই একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজা। হিন্দু মন্দিরে তাঁর প্রদত্ত অর্ঘ্য বিশেষ মর্যাদা পাবে না কেন?

আমাদের চেয়ে সম্পতবাবুর আগ্রহই যেন বেশী। অন্যান্য মন্দির থেকে এই মন্দিরের নৃসিংহ মূর্তি, গরুড় ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য কি তা আমাদের বিশদভাবে বোঝাতে চাইলেন। আমাদের তখন শোনবার ধৈর্য নেই, মনও ছিল না। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, আমাদের মনের অবস্থা বুঝে বললেন—চলুন, 'ক্লেভার কাবেরী' দেখে আসি। দুষ্ট সরস্বতীর কথা শুনেছি। নদীর বেলা পাগলা, প্রমত্তা, কীর্তিনাশা ইত্যাদি বাংলায় ব্যবহৃত হয়। ক্লেভার বা চতুর বিশেষণ ইতিপূর্বে কোন নদনদীর ক্ষেত্রে শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলাম এই অঞ্চলের ঐশ্বর্যের সিংহ ভাগ কাবেরীর দান—অথচ আপনারা তাকে চতুর বলে কটাক্ষ করছেন কেন? সম্পতবাবু বললেন—কাবেরী যেমন সম্পদ তেমনি বিপদও বটে। বন্যা ও গতিপরিবর্তন নাকি নিত্যকার ঘটনা।

মন্দিরের খানিকটা দূর থেকে কাবেরী দুটো ভাগ হয়ে মন্দির ভূভাগকে দ্বীপের আকৃতি ও নিরাপত্তা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা নদীতীরে এসে পড়েছি। সম্পতবাবু কোন কথা না বলে তরতর করে হাঁটু অবধি জলে নেমে পড়লেন। আমাদেরও আহ্বান করলেন। আমরা ইতস্তত করছি দেখে তিনি বললেন, নামলেই 'চতুর কাবেরী'র একটা পরিচয় হাতে হাতে পেয়ে যাবেন। এবার নামতেই হ'ল। নদীর জল যথেষ্ট উষ্ণ। বৃষ্টিবাদলার দিনে স্রোতস্বিনীর জলে একটু গরমের আমেজ পাওয়া যায়; এটা তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী। কেন এমনটি ঘটে সম্পতবাবু তা বলতে পারেন না।

কাবেরীর যে ঘাটে আমরা নেমেছিলাম তার পাশেই এ অঞ্চলের বিখ্যাত শ্মশান। নারকেল কুঞ্জের পট ভূমিকায় নদীতীরে বাঁধানো একটি চত্বর পোড়া কয়লা ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দেখে বুঝা যায় আজই এই স্থানটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের চোখে এর কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল না। জনৈক সাংবাদিক বলেছেন মাদ্রাজী শবযাত্রা, কাবুলীওয়ালার বউ এবং পাঞ্জাবী ট্রাম কণ্ডাকটর কলকাতায় নেই। কয়েক ঘণ্টা আগে এলে অন্তত শবদাহটার রীতিনীতির কিছু দেখা যেত।

মন্দির থেকে নদী সামান্য পথ। তারই মধ্যে দু-চারটি চালা ঘর ও বসতি দেখা গেল। এ[illegible] [illegible]ারে গ্রামের আবহাওয়া। কাছাকাছি ভাল ও ব[illegible] গ্রাম থাকতে পারে মনে করে সম্পতবাবুকে বললাম, অ[illegible]দের একটি গ্রাম দেখিয়ে দিন। একজন জানা চেনা লোক না থাকলে গ্রামে যাওয়ার অনেক অসুবিধা; তাতে পরিশ্রমই সার হয়, জানা হয় না তেমন কিছু। কেরলে গিয়ে বুঝেছিলাম একেবারে গ্রামে ইংরেজি জানা লোক একান্তই বিরল। তা ছাড়া স্থানীয় সামাজিক আদব-কায়দা রীতি-নীতি জানা না থাকলে লোক-ব্যবহার সম্ভব নয়। সম্পতবাবু আমাদের প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বললেন—গ্রামে কিছুই নেই দেখবার। তিনি প্রায় সারা ভারত ঘুরেছেন—বাংলার চেয়ে (অবিভক্ত) সুন্দরতর গ্রাম কোথায়ও পান নি। তিনি বিশেষ করে বাড়ি করার বাঙলা পদ্ধতি এবং ঘরগুলির গঠন নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সম্পতবাবু পূর্ববাংলা দেখেন নি। পূর্ববাংলার কোন কোন এলাকায় গ্রামগুলি ছবির মত সাজানো। এ দেশে গ্রামের সে সৌন্দর্য নেই।

আবার ফিরে এলাম মন্দিরে। কারণ মন্দিরের মধ্য দিয়েই পথ। অন্য পথ আছে কিন্তু নৈকট্যের জন্য এটাই সকলে ব্যবহার করেন। যা দেখেছি তার শতাংশের

একাংশও লেখা সম্ভবপর নয়, মনেও থাকে না সব। এখানেই এ মন্দিরের কথা শেষ করি। শেষেরও শেষ কথা হিসেবে বাঙালী পাঠককে একটা কথা বলা দরকার এখানেও নানা আকারের দুর্গা মূর্তি দেখেছি। দুর্গা বটে কিন্তু আমাদের মা দুর্গা নন।

কখন যে সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি এ'ল খেয়াল করতে পারি নি। মন্দির ও পথের উজ্জ্বল আলোর বন্যা থেকে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারলাম বেশ রাত হয়েছে। হাতে আমাদের সময় কম। অতএব জম্বুকেশ্বর ও রক টেম্পল দুটো দেখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। শরীরও আর বইছে না। ওদিকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। অতএব কেউ কেউ সরাসরি স্টেশনেই ফেরার প্রস্তাব করলেন। বাদ সাধলেন সম্পতজী। তিনি একেবারে রা রা করে উঠলেন। তাঁর কথার মর্ম হ'ল জম্বুকেশ্বর মন্দিরে না গেলেও চলবে, অমন মন্দির আরও অনেক আছে এ দেশে। কিন্তু রক টেম্পলে যেতেই হবে, নইলে ত্রিচি (ত্রিচিনপল্লীকে ছোট করে ত্রিচি বলেন স্থানীয় জনেরা) আসা মিথ্যে হয়ে যাবে। একরকম জোর করে তিনি আমাদের বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। চোখের সামনে তৈরি করে দেয় এমন একটি আইস ক্রীমের দোকানে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে নিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন।

আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি সম্পতজী জোর জবরদস্তি না করলে আমরা একটি দুর্লভ জিনিস দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম। এই মন্দিরের প্রবেশ পথে রয়েছে শহরের প্রধান বাজারটি। দেওয়ালী এসে পড়েছে তাই বাজার এখন জমজমাট। দেওয়ালী এ অঞ্চলের অন্যতম উৎসব হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মূল নাকি সমাজের গভীরে তেমন প্রবেশ করে নি। তাই এটা বহুলাংশে পোশাকী উৎসব। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পঙ্গাল নামে নতুন চাল ও নববস্ত্রের যে উৎসব হয় সেটাই এদের সত্যকার জাতীয় উৎসব। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ছোট হলে কি হবে—ভ্রমণকারীদের কল্যাণে বেশ সমৃদ্ধ। বাজারে একাধিক শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত দোকান, এমন কি, সেলুন পর্যন্ত আছে।

পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির তাই বুঝি নাম হয়েছে রক টেম্পল। সদর রাস্তা থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি রাস্তা চলেছে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির প্রারম্ভ পর্যন্ত। তার দুপাশেও দোকানপাটে ঠাসা। বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্য-কোটি-সমপ্রভ—গণেশ ঠাকুরের মন্দির। সিঁড়ির গোড়াতেই একটি বেশ বড় সড় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা কোন কারণে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে সমর্থ হন না তাঁরা এখানেই পূজা নিবেদন করে তৃপ্ত থাকেন। উপরে যাঁরা ওঠেন তাঁদেরও পক্ষেও এই মূর্তির পূজা করে ওঠা বিধেয়।

সম্পতবাবুর নির্দেশে আমরা কিছু কর্পূরের প্যাকেট কিনে নিলাম। তার থেকে একটু প্রথম গণেশ ঠাকুরের পূজারীর রেকাবীতে দিলাম। তিনি সেটি প্রজ্বলিত করে ঠাকুরের আরতি করে অগ্নিশিখাটি আমাদের সামনে ধরলেন। সেই শিখার উপর হাতের তালুটি ঘুরিয়ে হাতখানা কপালে ও মুখে সকলে বুলিয়ে নিলাম। এটাই প্রচলিত নিয়ম। এর তাৎপর্য জানতে পারি নি। আমাদের দেশে শ্মশান থেকে ফিরলে অগ্নি স্পর্শ করতে হয়।

বঙ্গে হোমের যেমন গোলাকৃতি ফোঁটা দেওয়া হয় এখানে তেমনটির প্রচলন নেই। তবে ভস্ম মাখেন প্রায় সবাই। শৈব যাঁরা তাঁরা কপালে তিনটি সমান্তরাল রেখা টেনে মধ্যে ফোঁটা কাটেন। আর বিষ্ণুভক্তগণ হাড়িকাঠের উপরাংশের মত একটি চিত্র আঁকেন এবং তার দু বাহুর মধ্যস্থলে ফোঁটা দেন। অনেকের কপালে এই ফোঁটাটি রক্তবর্ণ দেখেছি। যত্ন করে ভস্ম পরার সময় না হলে কপালে লেপ্টে নেন অনেকেই। বহু স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কপালে ভস্ম দেখেছি সর্বত্র। আমাদের এয়োস্ত্রীদের সিঁদুর পরার আর একটা রূপ কি এই ভস্ম মাখা? মানসিকতা ঐ একই।

মূল মন্দিরটি পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড় কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। বিজলি আলোয় সর্বত্র আলোকিত। সিঁড়িগুলি রং চং করা। সম্পত বাবুকে অনুসরণ করে

আমরা উঠতে শুরু করেছি। অধিকাংশ পথটাতে মাথার উপর আচ্ছাদন আছে মনে হ'ল। এক জায়গায় দেখা গেল অনেক উঁচু খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে সিঁড়ি চলেছে, মাথার উপর খোলা আকাশ। পাহাড়টির উচ্চতা বেশি নয়। তবু ক্লান্ত দেহে উঠতে আমাদের বেশ কষ্ট হ'ল। কিন্তু শীর্ষদেশে উঠে সে কষ্ট ভুলে গেলাম। মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়তি পাওনা জুটল। আলোকিত ত্রিচি শহরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে। দীপাবলীর উৎসবে সজ্জিত আলোকোজ্জ্বল শহরটি মনে হ'ল বাস্তবের ধরা-ছোঁয়ার অতীত আমাদের নাগালের বাইরে সুন্দর এক স্বপ্নপুরী। শহরটি যে বেশ বড় তা এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়।

পর্বত শীর্ষ-মন্দির প্রাঙ্গণ তখন জনবিরল। আমরা কয়েক জন ছাড়া অন্য কোন দর্শনার্থী দেখলাম না। তবে ঐ রাতের বেলাতেও সেখানে একটি ছাগল চরতে দেখা গেল। কি খেতে ও এসেছে এই পাহাড়ের চূড়ায় তা মালুম হ'ল না। সবুজ ঘাসের গন্ধ নেই এর ত্রিসীমানায়। সবই কঠিন জমাট বাঁধা পাথর। আর ও উঠল কেমন করে সে ও এক বিস্ময়। একটি হনুমান বাহাদুরও নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ির রেলিংএ বসে আছে। মন্দিরের কাছাকাছি সিঁড়ির শেষ বাঁকটিতে নানা প্রকার টুকি টাকি কিউরিয়োর একটি ছোট দোকানও আছে।

বিগ্রহ দর্শনের পর মন্দির প্রদক্ষিণ ভক্ত জনের অবশ্যকরণীয় কাজের অন্যতম। প্রদক্ষিণের সুবিধার জন্য পর্বতশীর্ষের এই মন্দিরটির চারি পাশে বারান্দা করা হয়েছে। সেই বারান্দায় নানা স্থান থেকে তলদেশ এক-দেড়শ ফুট পর্যন্ত গভীর। দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য বারান্দাগুলি মজবুদ গ্রীল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সম্পত বাবু বললেন, গ্রীল দিয়ে ঘেরা হয়েছে হাল আমলে। কিছুকাল আগে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতাশ কিছু মানুষ বা দেবতার পায়ে জীবন্ত উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প ভক্তগণ এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন আহুতি দিতে শুরু করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে মন্দির কর্তৃপক্ষ বারান্দাগুলি ঘিরে দিয়েছেন।

কয়েকদিন আগে এই শহরে ডি এম কে ও আন্না ডি এম কে দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সে উত্তেজনা তখনও পূর্ণ প্রশমিত হয় নি। জনজীবনে তার প্রভাব কিন্তু সামান্যই। তবুও অধিক রাত করা সমীচীন হবে না। এমনিতেই সাধারণ নিয়মে রাত আটটার পর পর্বত শীর্ষে উঠতে দেওয়া হয় না। তাই আমরা বেশী দেরি না করে নেমে এলাম। নামতে কষ্ট কম। তখন ধীরে সুস্থে নামলে সিঁড়ির দু পাশ সহজে একটু মন দিয়ে দেখা যায়। সিঁড়ির পাশেই নানা ফলক বসানো। তার একটি থেকে জানা যায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড রীডিং ১৯২৩ সনের ৭ ডিসেম্বর এই মন্দিরে বিজলি আলো জ্বালিয়ে দেন। ১৯২৩ সনে সারা ভারতে যে ক'টি স্থানে বিজলি আলোর ব্যবহার ছিল তা তো হাতে গুনে ফেলা যায়। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকে মন্দিরটির জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধ হয়।

পাহাড়ের স্তরে স্তরে মন্দির সাজানো। একটি শিব মন্দিরে ভোগ আরতি দেখবার সুযোগ হ'ল। বিচিত্র সব বাজনায় আকৃষ্ট হয়ে আমরা সেদিকে গিয়েছিলাম। সম্পত বাবু ঐ বাজনার মানে জানেন। অর্থাৎ বাজনা শুনেই বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কি ঘটছে। তাই বললেন, চলুন দেখে আসি।

ঐ পাহাড়েও নানা দেব দেবীর অর্চনা হয়। একটি শিব মন্দিরে আরতি হচ্ছিল। বৈকালিক ভোগ নিবেদন করার পর আরতি শুরু হয়। ভোগের সময় মুহূর্ত খানেকের জন্য দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। প্রথমে দীপাবলী আরতি। একই দণ্ডে একাধিক প্রজ্বলিত প্রদীপ সাজানো—দেখতে ভারি সুন্দর। আবার কলসের আকৃতি প্রদীপেরও আরতি করা হ'ল। তারপর কর্পূরের আলোর আরতি। তিনটিতে মোট মিনিট দুই সময় লেগেছিল। সানাইয়ের মত লম্বা লম্বা বাঁশি, এরা বলেন নাদস্বরম্, দামামার মত ঢোলের বাজনা ছিল সঙ্গে। জনৈক সাহায্যকারী

পুরোহিতের হাতে খুবই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং একান্ত অনুগত ভঙ্গীতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তুলে দিচ্ছিলেন। আরতি শেষ হওয়া মাত্র অন্য এক ব্যক্তি সেগুলি সরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং তৃতীয় এক জন দুর্বোধ্য গান শুরু করে দিলেন। মিনিট খানেক মাত্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হ,ল দীর্ঘকাল আচরিত কর্মের প্রাণহীন অনুবর্তন করা হচ্ছে। একদা এই অনুষ্ঠান নিত্য নবনব সৃষ্টির আনন্দ ও ভক্তির লাবণ্যে যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্খলন কেবল মন্দির এবং পূজা-আরতিতে সীমাবদ্ধ নেই। জীবনের সব ক্ষেত্রেই তো এই রকম দায়সারা গোছের কাজ করছি আমরা সকলে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, spirituality is the fouudation of Indian culture। আমরা ভারত সংস্কৃতির সেই মূল ভিত্তি অধ্যাত্ম-চেতনা থেকে সরে এসেছি বলেই হয়তো এই বিড়ম্বনা।

তুলনামূলক ভাবে রামেশ্বর মন্দিরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। পূজা ও আরতির সুষমা অনেক বেশি এবং হৃদয়গ্রাহী।

এই চত্বরেই কার্তিক ঠাকুরের ছয় মুখ বিশিষ্ট একটি মূর্তি আছে। কার্তিক এ দেশে জনপ্রিয় দেবতা। অনেক নামেই তাঁকে অভিহিত করা হয়। সুব্রহ্মণ্য, মুরুগা, সাম্বা, প্রভৃতি নামগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। তবে তাঁর ষড়ানন নামটি বাঙ্গালী জানে। কিন্তু ছয় মুখের ছবি বা মূর্তি ইতিপূর্বে দেখি নি। ছ'টি মুখ বা মাথা ভগবানের ষড়্‌গুণের প্রতীক। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বল, কীর্তি, শ্রী এবং ঐশ্বর্যকে এই ষড়্‌গুণ বলা হয়। অন্য মতে কার্তিক ঠাকুর চার মুখে চতুর্দিক দেখেন আর অবশিষ্ট দুইমুখে উর্ধ্ব'ও অধোদেশের প্রান্ত নজর রাখেন। ছ'টা যখন মুখ তখন দুখানা হাত শোভন হতে পারে না। চারখানা হাতের তিনি অধিকারী এখানে। আজকাল বিদ্যুৎ শক্তিকে হর্স' পাওয়ার বা অশ্বশক্তির হিসাবে নির্ণয় করা হয়। পৌরাণিক যুগে শক্তিধর মানুষের শক্তির তারতম্য অনুসারে দুহাতের বদলে চার, আট বা দশ দেখানোর রেওয়াজ হয়েছিল কি না তা আজ জানবার উপায় নেই। তেমনি বুদ্ধি বুঝি বা নির্ণীত হত মাথার সংখ্যা দিয়ে।

ক্রমশঃ

জমিদারি মর্জি

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

সিংভুমের একটি মফঃস্বল শহরে রবিশঙ্করের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। এখন আর তাকে সেই রবি বলে চিনতে পারিনি। সে যদি না ডাকত, আমি সাহস করে তাকে রবি বলে ডাকতে পারতাম না। সেই ফুটফুটে রং, দীর্ঘাকৃতি, উন্নত নাসা, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টি, কোমল কান্তি, চেহারাতেই জমিদার-পুত্রের আভিজাত্য বিদ্যমান ছিল। ঢাকাতে আমাদের সহপাঠী ছিল।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগনার এক অংশের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আশুতোষ রায়ের পুত্র রবি, আজ যেন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের উপরে কালো মেঘের আস্তরণ পড়েছে। কালস্রোতের অমোঘ গতি কাকে কোন্ ঘাট থেকে নিয়ে কোন্ ঘাটে আছড়ে ফেলে দেয়, এ শুধু বিধাতা পুরুষই জানেন। স্বভাবে, চেহারায়- অত সুন্দর ছেলে, আজ বিষণ্ণ, কোটরগত-চক্ষু, মলিন বসন ভূষণে রিক্শা স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রিক্শাচালকদের তদারকি করছে। এখন এই-তার জীবিকার উপায়।

মনে হলো হায়রে জীবন দেবতা!

·দের বিক্রমপুরের চক-মেলান বাড়ী। এক এক বেলায় খান পঞ্চাশ পাতা পড়ত। কত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল ছিল ঐ বাড়ী। পুকুর, বাগান, কত।

আবার ঢাকা শহরের প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী, জুড়ি গাড়ী, পাইক বরকন্দাজ। সে এক এলাহি ব্যাপার। একবার ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে ওর বাবার লড়াই হয়েছিল।

একদিন রবির বাবা আবিষ্কার করলেন বাড়ীতে কলে পর্যাপ্ত জল আসছে না। ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, মিউনিসিপ্যালিটিকে জানান,-আমার বাড়ীতে পাঁচটি কলের লাইন বসিয়ে দিতে হবে তিনদিনের মধ্যে। ম্যানেজার বাবু একজন আইনজ্ঞ লোক, তিনি বললেন, সেটা কি সম্ভব হবে? আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, অসম্ভব—সম্ভব করতে হবে। না হলে আমি কর দেব না, পাড়ার কাকেও দিতে দেবনা, দেখি, ওরা কি করতে পারে।

ম্যানেজার বেগতিক দেখে এক লিখিত আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জানিয়ে দিল, সে অসম্ভব। এক বাড়ীতে একটির বেশী লাইন কোন মতেই দেওয়া চলবে না।

সে চিঠি পেয়ে আশুবাবু গম্ভীর হয়ে হাতদুখানা পিছনে রেখে পায়চারী করতে লাগলেন। খানিকবাদে ম্যানেজারকে বলে দিলেন, এঅঞ্চলের সমস্ত কর বন্ধ করে দি'ন। পাড়ার সবাইকে একথা জানিয়ে দি'ন।

প্রতিবেশীরা প্রমাদ গণলেন। তাঁদের জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। আশুবাবুকে তাঁরা বাঘের চেয়েও ভয় করতেন। মিউনিসিপ্যালিটির শাসানি তো আছেই। এখন কি উপায়? শেষে প্রতিবেশীরা পরামর্শ করে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে গিয়ে ধরলেন, ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলবার জন্য।

চেয়ারম্যান কাউন্সিলারদের ডেকে একটা ব্যবস্থা করতে বললেন। ওঁরা পরামর্শ করে দু'জন ধুরন্ধর অফিসারকে পাঠালেন, আশুবাবুকে বুঝিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার জন্য। বলে দিলেন, খুব নম্রভাবে আলোচনা করে আশুবাবুকে শান্ত করতে। আইন রক্ষা করে যতটা করা চলে, মিউনিসিপ্যালিটি তা করবে।

অফিসার দু'জন অনেক শলা-পরামর্শ করে নিলেন, যে গিয়েই জমিদার বাবুর পায়ে হাত দিয়ে, প্রণাম ক'রে, ভক্তি দেখিয়ে কাজ আরম্ভ করবেন। প্রতাপশালী লোকেরা অনেক সময় অনুগতকে স্নেহ করেন। তাঁদের আক্রোশ থাকে সমকক্ষদের প্রতিই

বেশী। সমকক্ষকে ঘায়েল করাই ধনী দাম্ভিক-ব্যক্তিদের প্রধান চিন্তার বিষয়। এটা চিরকালই আছে।

অফিসার বাবুরা আশুবাবুর বাড়ীতে গিয়ে সদর দরজার দ্বাররক্ষককে জানাল যে তারা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এসেছে, জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। দরোয়ান ওঁদের বৈঠকখানায় বসিয়ে জমিদার বাবুর কাছে গিয়ে জানাল। জমিদারবাবু শুনে শুধু একটি 'হুঁঃ' শব্দ ক'রে দরোয়ানকে বিদায় দিলেন।

দরোয়ান অনেক দিন আছে, বাবুকে বিলক্ষণ চিনত। এই-'হুঁঃ' শব্দটির অর্থ যে অমঙ্গলসূচক, তা সে বুঝত। সে এসে বলল, "বাবু, আপনারা আজ চলে যান, বাবুর মেজাজ ভাল নেই। আজ বিশেষ কথাবার্তা হবে না বোধহয়।" বাবুরা ভাবলেন ও বললেন, "আমরা তো কোন গোলমাল করতে আসিনি, শুধু দেখা করতে চাই। একটু বসি, উনি সময় করে ডাকলেই দেখা করব।" এই বলে ওঁরা বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিক বাদে সিঁড়িতে চটি-জুতোর চঞ্চল আওয়াজ শোনা যেতেই দরোয়ান এবং বৈঠকখানার হুঁকোবরদার শঙ্কিত হ'য়ে উঠল। কারণ জমিদার বাবুর গতিবিধির সঙ্গে তারা খুবই পরিচিত।

মুহূর্তের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জমিদারবাবু ঘরে ঢুকেই হাতের হান্টার দিয়ে মিউনিসিপ্যাল অফিসের বাবু দু'টির পিঠে পায়ে শপাশপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। বাবু দু'টি আচমকা এ আঘাতে বিহ্বল হয়ে খানিকটা ঘরময় ছুটোছুটি করে বাইরে বেরিয়ে একেবারে ছুটে সদর রাস্তায় পড়লেন, সেখানে গিয়েও তাঁরা আশ্বস্ত হতে পারলেন না, ত্বরিত পদে ও এলাকা ছাড়িয়ে তবে গতি মন্থর করে ব্যাপারটা অনুধাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁদের সমস্ত জীবনে এমন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন দূরে থাকুক এমন কথা কানেও তাঁরা শোনেন নাই। লজ্জায়, দুঃখে, ব্যথায় কাতর হয়ে ওঁরা সোজা অফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানের সামনে কেঁদেই ফেললেন। চেয়ারম্যান শুনেই অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে হাজির হলেন। সমস্ত বিবরণ দিয়ে থানায় এজাহার লিখিয়ে অবিলম্বে তদন্ত চাইলেন।

এদিকে জমিদার বাবুও তেজের বশে কাজটি ক'রে একটু যে বিচলিত ন. হলেন তা নয়। ছেলেদের ডেকে পরামর্শ করতে চাইলেন। দুই-ছেলে তাঁর। তারা বাবার এই দাম্ভিকতা মনে মনে সমর্থন করত না। কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করার সাহসও তাদের ছিল না। তারা বলল, ম্যানেজার কাকাকে ডেকে দেই। তিনি সব বোঝেন, তিনিই সামলাবেন সব। আমাদের তো ভয়ই করছে, এখন পুলিশ কেস হবে। ওসব আমরা বুঝিনা।

সত্যি, ছেলেদের তো তিনি কোনদিকেই বড় হতে দেননি পড়াশুনা স্কুল পর্যন্তই শেষ হয়েছে। জমিদারির কাজেও দুই পুরুষের মত বিরোধের ভয়ে ছেলেরা বেশী এগোত না। কাজেই, খাও দাও, হুকুমমত চল, বেশ।

জমিদারের সম্ভ্রমরক্ষার্থে পোষাক পরিচ্ছদের আনুকূল্য ছিল। এরা নিজেদের মনকে প্রসারিত করবার রাস্তা খুঁজে পায়নি।

এদিকে পরের দিনই পুলিস কোর্ট থেকে সমন এসে হাজির। বাড়ীর সবাই তো ভেবে অস্থির, এ কি বিপদ ডেকে আনলেন কর্তা।

ম্যানেজার বাবু দেশের একটি মামলার তদ্বির করতে গিয়েছিলেন। জরুরি ডাকে তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে এলেন। আশুবাবু ডেকে বললেন, তুমি ল'-ইয়ার, আইনের প্যাঁচ কষে ওদের জব্দ করবার ব্যবস্থা কর। কাজটি ভাল হয়নি। কিন্তু আমি কিছুতেই ওদের কাছে নতি স্বীকার করব না। বুঝে শুনে সব ঠিক কর।

ম্যানেজারবাবু তো ভেবে অস্থির হলেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের বাড়ীতে পেয়ে চাবুক মারা, এ যে কত বড় অন্যায়। এ কুকর্মের শাস্তি থেকে কি ক'রে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, কি জানি। কয়েক দিন চিন্তা ক'রে এক উপায় স্থির করলেন। মামলার শুনানীর দিন ভোরে

উঠে জমিদার বাবু স্নান-আহ্নিক তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর চোখে মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ বিদ্যমান। তিনি ম্যানেজারকে বললেন, আমি কোর্টে যাব না। তোমাকে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা লিখে দিচ্ছি যত টাকা লাগে, তুমি মামলা চালাও।

ম্যানেজার বাবু খুব শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, না বাবু, আপনাকে যেতে হবে, না হলে কেস্ খারাপ হয়ে যাবে। আমি সঙ্গে থাকব। আপনি একবার গেলেই কেস্ মিটে যাবে। বার বার আপনাকে যেতে হবে না। সময়ও নিতে হবে না। আমি মান-বাঁচানর পথ একটা খুঁজে পেয়েছি।

জমিদার বাবু তখন অসহায় শিশুর মত ম্যানেজার বাবুর কথামত চলতে লাগলেন। উপযুক্ত সময়ে কোঁচান ফরাসডাঙ্গা ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি প'রে সিল্কের চাদরটি কাঁধে ফেলে ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে জুড়ি গাড়ীতে চড়ে কোর্টের দিকে রওনা হলেন।

গাড়ীতে একান্তে বসে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, বল, কি রাস্তা ধরেছ ওদের জব্দ করতে ম্যনেজারবাবু আত্মরক্ষা এবং ওদের জব্দ করবার জন্য যে বুদ্ধি ঠিক করছেন, ওঁকে বুঝিয়ে দিলেন। যথাসময়ে কোর্টে ডাক হতেই আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর, দুটি লোক ভদ্রলোকের মুখোস প'রে আমার বাড়ীর ভিতর ঢুকে বাড়ীর মেয়েদের সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করেছিল, এ সংবাদে আমি রাগে অন্ধ হয়ে তাদের শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। এর জন্য যে আমাকে কোর্টে টেনে আনবেন, ভাবতেই পারিনি।

কোর্টে দাঁড়িয়ে এত বড় একজন সম্মানিত ব্যক্তি এই কথা বলতে কোর্টশুদ্ধ লোক লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। জমিদার বাবু ম্যানেজার বাবুকে নিয়ে দৃঢ়পদে বাড়ী ফিরে এলেন। ম্যানেজার বাবুর পাচটাকা বেতন বৃদ্ধি হল।

এই প্রতাপশালী, দাম্ভিক জমিদারের অসংখ্য কীর্তি হল। তার ভিতর উল্লেখযোগ্য আর একটি কাহিনীর স্থির সাক্ষীদের মধ্যে আমিও একজন। বিস্মৃতপ্রায় সে সব কথা আজ দুর্দশাগ্রস্ত জমিদার-পুত্র রবিশঙ্করকে দেখে মনের ফলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আশুবাবুর দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, সকলেই খুবই সুন্দর, সুশ্রী দেখতে। স্বাস্থ্যে এবং সৌন্দর্যে মাতা-পিতা উভয়েরই সম্মান রেখেছিল তারা।

মেয়ে মমতার বয়স বার তের হতেই তার বিবাহ দিবেন স্থির করে চারিদিকে ঘটক পাঠালেন। তখন তো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের রীতি এমন ব্যাপক ভাবে প্রবর্তিত হয় নি।

ঘটকের মুখে বার্তা পেয়ে, জমিদারের প্রতাপের কথা মনে করে লোভ হলেও অনেকে ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। আবার সাহস এবং লোভের বশে অনেকে এগিয়েও এলেন। জমিদারবাবুর একটি মাত্র সুন্দরী মেয়ে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্র সমাবেশ, লোভ একটু হয় বৈকি? কয়েকটি পার্টিকে তিনি বাজিয়ে দেখে একটিকে অগ্রসর হবার সাহস দিলেন।

ছেলেটি সুশ্রী, বি-এ পাশ করে সরকারী অফিসে একটি কাজ করে। বাড়ী বিক্রমপুর পরগনার মাইজ-পাড়া গ্রামে। বর্ধিষ্ণু গ্রামের বংশমর্য্যাদায় উচ্চঘর। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সুশীল। বাবা অনন্ত মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষরা খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। কাজেই উপযুক্ত ঘর-বরই মনে হল। ঐশ্বর্যবান লোকেরা নিজের চেয়ে ঐশ্বর্যশালী লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করে সুখ পান না।

পাত্র-পক্ষ মেয়ে দেখার প্রস্তাব করলে, চতুর আশুবাবু জানালেন, "আমাদের বাড়ীর সবাই-ও পাত্রটিকে দেখতে চান! ছেলের আত্মীয়রা যে-যে আসতে চান, ছেলেকে নিয়ে আমার এখানে আসুন, কাজ সহজ হয়ে যাবে।"

পাত্র-পক্ষ ভাবলেন, মন্দ কি। জমিদার বাড়ীর হালচালও ভাল করে দেখে আসা যাবে, আবার চর্ব্য চোষ্য দিয়ে তৃপ্তি লাভ করাও হবে।

যুবক সুশীল কৌতূহল এবং লজ্জায় দোল খেতে লাগল। বন্ধুদের কাছে মৃদু আপত্তিও জানাল ঢাকা

যেতে। কিন্তু তখন পিতামাতা বা গুরুজনদের সামনে মুখ তুলে প্রকাশ্যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারত না।

কাজেই নীরব পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রের প্রায় সমবয়সী দুই দাদা ঢাকায় রওনা হয়ে গেলেন। পাত্রের সঙ্গে তো গুরুজনেরা যেতে পারেন না। জমিদার-বাড়ীর সুন্দরী মেয়ে, ধন-ঐশ্বর্যের পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে বাড়ীতেই তো আসবে। তখন যত ইচ্ছা দেখা যাবে। এই সব প্রবোধবাক্য স্মরণ করে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন ওদের প্রত্যাবর্তনের।

ওদিকে জমিদার বাড়ীর অন্দরের বাগানে তক্তপোষের উপর রঙীন ফুল কাটা চাদর, তাকিয়া দিয়ে ওদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্বেতপাথরের টেবিলে রূপার থালা গ্লাসে আহারের প্রচুর আয়োজন। বাগানের সুসজ্জিত গাছপালার স্নিগ্ধ মৃদু মন্দ হাওয়া, নানা ফুলের সুবাসে স্থানটিকে স্বপ্নময় লাগছিল। যৌবনের রঙীন চোখে নেশা লেগে গিয়েছিল।

ওরা খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়ে পাত্রীর আগমনের অপেক্ষা করছে। একটু খস্ খস্ শব্দ হলেই ভাবছে, এবারে দরজা খুলেই শ্রীমতী আসবে।

না, এলেন স্বয়ং আশুবাবু, তিনি উপস্থিত হয়ে ওদের নমস্কার ক'রে বললেন, আপনারা তৃপ্তিলাভ করেছেন ত? কোন ত্রুটি হয়নি ত? আচ্ছা তাহলে এবারে আসুন। আমি শুভদিন ঠিক করে লোক পাঠাব আপনাদের বাড়ীতে। পাত্র এবং সঙ্গীরা অপ্রস্তুত হলেন কিন্তু কি করবেন, বিদায় হয়ে গেছে, আর তো মেয়ে দেখার জন্য বসে থাকা চলে না; নিজেদের দেখিয়েই চলে এলেন। তবে আদর-আপ্যায়ন, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে ওঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। ফিরবার পথে নৌকাতে বসে নানা হাসিঠাট্টার সঙ্গীরা মুখর হয়ে উঠলেন। সুশীল কিন্তু একটু গম্ভীর হয়েই রইল। সে বড়লোকের এই হেঁয়ালী বরদাস্ত করতে পারছিল না।

এ কেমন ধারা? আমরা কি সত্যি নিমন্ত্রণ খেতে ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম? বাকী উদ্দেশ্যটি উহ্যই থাকল! মুখে কিছু প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, চুপ করেই রইল।

এযুগে যেমন মেয়ের রূপ, দৈর্ঘ্য, এবং ছেলের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইউনিভারসিটির গেজেট খোঁজা, অফিসের ফাইল থেকে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উন্নতির হদিশ আবিষ্কার করা বিবাহের প্রধান তাৎপর্য হয়েছে, সে যুগের ধারা তেমন ছিল না।

কৌলীন্য, বংশ পরিচয়, বাড়ীঘর, এবং জমিজমা দেখলেই পাত্রী সম্প্রদানের বা পাত্রী গ্রহণের পথ পরিষ্কার হয়ে যেত। পাত্র, পাত্রী দেখাটা গৌণ ছিল।

কাজেই সুশীলের সঙ্গীদের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কর্তারা আগ্রহী হয়ে আশুবাবুর খবরের অপেক্ষায় রইলেন।

দিন কয়েক পরে নায়েবমশায় এসে আশুবাবুর সদিচ্ছা নিবেদন করলেন,—তিনি শুভ কার্যের দিন স্থির করতে চান, এখন এঁদের আপত্তি না থাকলে সামনের সপ্তাহেই সব পাকাপাকি করতে ওঁরা আসবেন। এ খবর শুনে পাত্রের বাড়ীতে খুশির বন্যা বয়ে গেল। সকলে শুভদিনের জল্পনা কল্পনায় মশগুল হয়ে উঠল।

সুশীল কিন্তু কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ল। অত বড় ধনীর সঙ্গে আত্মীয়তা করাটাকে সে ভয়ের চক্ষে দেখতে লাগল।

যথাসময়ে খুব সমারোহ সহকারে পাতিপত্র হয়ে গেল; দেনা পাওনার কথা কিছু উচ্চারণই করলেন না পাত্র পক্ষ। প্রথম থেকেই যেমন সমারোহ হচ্ছে, কিছু চাইতে গিয়ে শেষে ঠকে যাবেন নাকি?

নায়েব মশায় জানালেন, বরযাত্রীদের জন্য বড় বড় পাঁচখানা পানসী নৌকো আসবে, তাতে প্রায় দুশ লোক যেতে পারবে। শুনে তো গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গেল। ছেলের দল সকলে কাপড় জামা কাচাতে দিল, কেহবা পাঞ্জাবিতে গিলে করতে লাগল। গ্রামের মধ্যে যে মেয়ে বেশ সুক্ষ্ম কাপড় কোঁচাতে পারে, তার আর স্নান, খাওয়ার অবসর মেলা ভার হল।

সুশীলের বাবা অনন্তবাবুও খুব তৎপর হয়ে

উঠলেন। দেশের নিয়ম, বরযাত্রীরা রওনা হবার দিন পাত্রের বাড়ীতে সমবেত হয়ে সেখানেই খাওয়া দাওয়া ক'রে তবে বরানুগমন করে। উদ্‌যোগ আয়োজন পুরো দমেই চলতে লাগল।

সুশীলের মনটা খুব প্রফুল্ল হতে পারছে না। মেয়ে দেখার হেঁয়ালী,—আবার পাত্তিপত্রের দিনও মেয়ের বাবা, কাকা কেহ আসেন নাই। নায়েব কর্ম্মচারী দিয়ে মেয়ের এক ভাইকে পাঠিয়েছেন। যেন পুরো সহযোগিতা হচ্ছে না। কিন্তু কাকেও কিছু বলতে লজ্জা করে। যাক, যা হয় হবে, বলে সে গা ভাসিয়ে দিল।

ওদিকে আশুবাবুর বাড়ীতে মহা ধুমধাম আরম্ভ হ'ল। গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের, আত্মীয় স্বজনদের নৌকো পাঠিয়ে পাঠিয়ে এনে তিনি ঢাকার বাড়ী পরিপূর্ণ করে তুললেন। ঐশ্বর্যশালী আশু রায়ের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, আয়োজনের বর্ণনা করা কি সহজ? সোরগোল ধুমধামের ভিতর দিয়ে ক্রমেই বিয়ের দিন এগিয়ে এল।

মেয়ের মা কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েকে কাছে টেনে বসিয়ে আদর করতে করতে নিজে কেঁদে মেয়েকেও কাঁদান। আসন্ন বিরহ উভয়কেই বিষন্ন করে তোলে। যে সব অনুষ্ঠান শহরে বসে করা অসুবিধা, তা দেশ থেকে করে আনা হ'ল, যেমন বৃদ্ধির ধান ভানা, হলুদ কোটা ইত্যাদি। দেশ থেকে রোজই নৌকো বোঝাই হয়ে জিনিষপত্র ও লোকজন আসতে লাগল। মিঠাই মিষ্টি তো ঢাকাতেই প্রচুর ভাল জিনিষ তৈরী হয়। সিরাজদীঘি থেকে ক্ষীর আনার ব্যবস্থা হ'ল। দেশের দীঘি থেকে বড় বড় রুই কাৎলা মাছ ধরিয়ে আনার কথা হ'ল।

বরযাত্রীদের থাকবার জন্য জমিদারদের অন্য শরিকের প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী তাঁরা প্রায় ছেড়ে দিয়ে সবাই এ বাড়ী চলে এলেন। ওখানে আট-দশখানা ঘর ফরাস বিছানা দিয়ে প্রস্তুত করা হ'ল। জনা পনর ফরমাস খাটবার লোক নিযুক্ত করা হল। তিন দিন ওঁরা থাকবেন, যেন কোথাও কোন ত্রুটি না হয়। সমস্ত ব্যবস্থা নিপুণ ভাবেই হ'ল। বিয়ের দান-সামগ্রী, যৌতুক, আসবার পত্রে একখানা বড় ঘর সাজিয়ে রাখা হ'ল।

দেখতে দেখতে শুভদিন এসে গেল। অধিবাসের দিন সন্ধ্যেবেলা বাজনাদারেরা এল প্রায় ত্রিশ জন। নাকাড়া, টিকারা, ব্যাগপাইপ, বাঁশী, কাঁসি ইত্যাদি! বাজনার আওয়াজে চারিদিক আনন্দমুখর হয়ে উঠল।

বর-বরযাত্রীদেরও বিয়ের আগের দিনই আনানর ব্যবস্থা হয়েছে। জলের পথ, কি জানি, ঝড়বৃষ্টি হলে অসুবিধা হবে। তাঁরাও সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছলেন।

যজ্ঞিবাড়ী, জমজমাট হয়ে উঠল। হুলুধ্বনি, শাঁখ, বাজনার শব্দে কারুর কথা কেউ শুনতে পায় না। চিৎকার, ছুটোছুটিতে কাজের লোক, অকাজের লোক সকলেই ব্যস্ত।

ভালভাবে বিয়ে, বাসি বিয়ে মিটে গেল। ফুলশয্যার দিন সকালে বরকর্তা, কন্যাকর্তাকে জানালেন তাঁরা এবারে ছেলে-বউ নিয়ে ফিরতে চান। আশুবাবু সবিনয়ে বৈবাহিককে বললেন, ফুলশয্যার নিমন্ত্রণটা খেয়ে পরের দিন যাবেন। দেশে এ রীতি খুবই প্রচলিত ছিল, কাজেই বরকর্তা রাজি হলেন। তবে চিন্তিত হলেন, তাঁর বাড়ীর কাজ এবারে সামনে, বউভাতের নিমন্ত্রণ। তাঁর বাড়ীও আত্মীয়-কুটুম্বে ভরপুর

কিন্তু আশুবাবুর আকিঞ্চন, সাড়া দিতেই হয়।

বিয়ে উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদের অনেক রকম হয়েছে, যাত্রাগান, কলকাতা থেকে বাইনাচ প্রভৃতিও তিনি আনিয়েছেন, বরযাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য।

অল্পবয়সী বরযাত্রীরা ভাল খাওয়া-দাওয়া, আদর আপ্যায়ন, নাচ গানে মশগুল হয়ে আছে। বাড়ী ফিরবার চিন্তাই নেই।

বরকর্তা ফুলশয্যা এখানে করতে রাজি হয়েছেন, কাজেই ফুলশয্যার ব্যবস্থার কথা বলতে আশুবাবু অন্দর মহলে গেলেন। গিয়ে দেখেন, মমতা তার মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদছে। মা-ও মেয়েকে ছেড়ে কি করে থাকবেন এই চিন্তায় কাতর হয়ে মেয়েকে প্রবোধ দিতে

নিজেই কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। আশুবাবু এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হলেন। পর মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলে নিয়ে হাতদুখানা পিছনে দিয়ে চিন্তিত মনে বাইরে চলে গেলেন। গভীর চিন্তার সমাধানের সময় এইরূপ পদচারণাই তাঁর স্বাভাবিক রীতি কিন্তু অন্য সকলে শঙ্কিত হয়।

আনন্দের সঙ্গেই ফুলশয্যার রাত্রি কেটে গেল। দেখে শুনে সুশীলও অনেকটা এখন চিন্তামুক্ত।

এবারে বিস্ময়ের পালা। পরের দিন সকালে সূর্যদেব রক্তিম বর্ণে উদিত হলেন, না কৃষ্ণবর্ণে, অনন্তবাবু ভেবে ঠিক করতে পারলেন না, যখন শুনলেন, আশুবাবু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মেয়েজামাই পাঠাবেন না, অনন্তবাবু বরযাত্রী দল নিয়ে রওনা হয়ে যেতে পারেন, নৌকো প্রস্তুত।

অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। কেউ কি কখনও শুনেছে যে ছেলের বাবা ছেলের বিয়ে দিতে এসে ছেলে শুদ্ধ বউ দান করে রিক্ত হয়ে ঘরে ফেরে? কেমন করে তিনি বাড়ী যাবেন? বাড়ী গিয়ে কি বলবেন? আত্মীয় কুটুম্বের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

অত্যন্ত করুণ ভাবে তিনি আশুবাবুকে বললেন, আমার বউমাকে দেখবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে। তাদের আমি কি বলব? বউভাতের নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে গ্রামশুদ্ধ লোককে। দয়া করে আপনি মত পালটান। আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু হায়, এ রোদন অরণ্যেই হ'ল। ছেলের বাবার মেয়ের বাবার কাছে এ দীনভাব বড়ই করুণ। যে শুনছে, সেই হতবাক্। আশুবাবু বললেন, নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে দিন গিয়ে। যারা বউ দেখতে চান তাঁদের এখানে পাঠিয়ে দিন, দেখে যাবে।

জমিদারী চাল যে এত বেচাল, কেউ ধারণা করতে পারে না। বরযাত্রীরা বিচলিত হয়ে উঠল এর প্রতি-বিধানের জন্য, কিন্তু অনন্তবাবু থামিয়ে দিলেন। তাঁর ছেলে যে ওঁদের ঘরে বন্দী।

আশুবাবুর দাদা জনার্দনবাবু ছুটে এসে বললেন, আশু, এ কি করছ? এখন মেয়ে-জামাই শুভক্ষণে রওনা করে দাও। পরে না হয় এনে বেশ কিছুদিন কাছে রাখবে। ওদের মঙ্গল তো দেখতে হবে। কুটুম্বের মুখ হাসান তো সম্মানের কথা নয়। আশুবাবু নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে সরে গেলেন। মুখ দেখে বোঝা গেল, সব আবেদনই নিষ্ফল হ'ল। জনার্দনবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন, অনন্তবাবুকে বললেন, এখানে থেকে অপমানের বোঝা আর না বাড়িয়ে বাড়ী গিয়ে যা হয় করুন।

অনন্তবাবু ছেলের সঙ্গেও দেখা করবার সুযোগ পেলেন না। জমিদারবাবু মেয়ে জামাইয়ের ঘর পূর্ব্বাহ্ণেই বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন।

বেচারী সুশীল! মেঘ সরে গিয়ে সবে মনে একটু খুশির আমেজ এসেছিল। এ কি বজ্রাঘাত!

বিয়ে করতে এলে ছেলেরা প্রথমবার বউ নিয়ে বাড়ী ফিরবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। শেষে না হয় শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ির মত মনে হয়। এ বন্দীদশা যে তার কাছে মৃত্যু-যন্ত্রণা। প্রথমেই তার মন বিগড়ে গিয়েছিল মেয়ে দেখতে এসে। এই অমানুষিকতার পূর্ব্বাভাস তখনি যেন সে পেয়েছিল। সুশীলের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কেন সে তার অভিজ্ঞতার তিক্ততা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করল না! বড়লোকের সোনার ফাঁদে পা দিতে গেল! এখন উপায়?

মমতা সব দেখে শুনে হাপুসনয়নে কাঁদতে লাগল। তার মাও উলটো সুরে কাঁদতে লাগলেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানর জন্য তো ছেলেবেলা থেকে কত রকমের উপদেশ দেওয়া হয়। বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠানর জন্যই ব্যস্ততা, তখন যে কান্না, সে ত বিরহের সঙ্গে সুখের মিশ্রণ। এতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল, সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম।

গিন্নী বলতে লাগলেন, এ কি করলেন কর্তা?

বাড়ী ভরতি আত্মীয়স্বজন তো থ' মেরে গেল। তখন যে-যার বাড়ী পালাতে লাগল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ দেখেছে বলে মনে হ'ল না। জামাইয়ের বাড়ীর কথা ভেবেও অনেকে দুঃখ করতে লাগলেন। প্রকাশ্যে কোন কথা বলার সাহস কারো হ'ল না।

বিয়েবাড়ীর ঝলমলে আলোর উপরে বিষাদের কালোছায়া নেমে এলো। মেয়ে এবং মায়ের বিরহের কান্না দেখে স্নেহে অভিভূত হয়ে কর্তা এই অসামাজিক কাণ্ড করে বসলেন। এটাকে ত কেউ সমর্থন করতে পারছে না!

আশুবাবুর ছেলেরা বাবার ব্যবহারের লজ্জায় দুঃখে মনমরা হয়ে গেল। বড়ছেলে ঢাকেশ্বরী বাড়ীর পুকুর ঘাটে গিয়ে উদাসভাবে বসে রইল। ছোটছেলে বন্ধুদের সঙ্গে রমনা খেলার মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

লোকালয়ের কাছে থাকতে সাহস হ'ল না, পাছে কেউ জিজ্ঞেস করে বসে, তোর বাবা এ কি কাজ করলেন? এর উত্তর তো কিছু নেই। কাজেই মুখ লুকিয়ে যতক্ষণ থাকা যায়।

মুখরোচক আলোচনা মুখে মুখে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে জমিদারবাড়ীটির দিকে তাকিয়ে সমস্ত যেন উপলব্ধি করে নিলেন। বিশেষ করে জামাইটি কি করছে। কেহ বলল, সেত বেশ মজাতেই আছে। জমিদারবাড়ীর আদুরে জামাই, খাও, দাও হাসি তামাসায় বেশ কাটিয়ে দাও। জামাইয়ের বাড়ীর কথা ভেবে দেখ, কি কেলেঙ্কারী হয়েছে তাদের বাড়ী। দু'একজন জামাইয়ের দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করে বলল, ঘরজামাই থেকে সুখ আছে নাকি? নিজের স্বাধীনতা খুইয়ে বড়লোকের কৃপাপ্রার্থী হয়ে বেঁচে থাকার কি সুখ!

সব উত্তেজনাই ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। সুশীল নজরবন্দী হয়ে রইল ঢাকা শহরে। ঢাকা শহরে সে যা দেখতে চায়, করতে চায়, কিছুতেই বাধা নেই. তবে সব সময় সঙ্গে লাঠি কাঁধে দরোয়ান পার্শ্বচর হয়ে থাকে। শহরের বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। মাঝে মাঝে জমিদারের টম্‌টম্ গাড়ীতে করে মমতাকে সঙ্গে দিয়ে ঢাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে পাঠান হত, সুশীল মনের চক্ষে কিছু দেখেছে কি না সন্দেহ।

হায়রে অবোধ অহঙ্কার। টাকার খেলায় কি সব সময় মন জয় করা যায়? মনের জগতেও যে উন্মুক্ত প্রশান্ত আকাশ আছে। মনকে ঘুড়ির নাটাইয়ে বেঁধে উড়ান যায় না।

সুশীল মুখে বিশেষ কথা বলে না, যথাসম্ভব হ্যাঁ, না দিয়েই চালিয়ে যায়। ঘরে যতক্ষণ থাকে জানালার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটায়, বাইরে গেলেও তার মুখে হাসি দেখা যায় না। হাসি বা আনন্দ যেন তাকে ছেড়ে কোন সুদূরে হারিয়ে গেছে।

রবির সঙ্গেই শুধু সে মন খুলে একটু কথা বলত। তাও একটু ভয় যে ছিল না, তা নয়। কোন্ কথায় আবার জমিদারেরা কি মনে করে বসবে। চাকরী তো তার শেষ হয়ে গেছে। বিয়ের জন্য একমাস ছুটি নিয়েছিল। সে তো মাস খানেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল, যদি আর কিছুদিন ছুটি মেলে; রবির সঙ্গে পরামর্শ করে মাবাবাকেও চিঠি দিয়েছিল,কিন্তু কোন জবাবই পায়নি। মমতা সহজ, সরল, কিশোরী, সে বলেছে যে সুশীলের সমস্ত চিঠিপত্রই আগে জমিদারী সেরেস্তায় যায়, এবং পরীক্ষা করে সেখানকার বিধানমত দু'একখানা পাঠান হয়। সুতরাং কোন চিঠিই জায়গামত পৌঁছায় নি তার জবাব আসবে কি করে?

সে রোজ ভাবে, তার বাবা কেন মামলা করে সুশীলকে উদ্ধার করে নিচ্ছেন না। তার যে এই জীবন্মৃত অবস্থা, মা-বাবা কি এটা বুঝতে পারছেন না? না, অভিমান বশে চুপ করে আছেন? সুশীলকে বিয়ে দিয়েই তাঁদের এই দুঃখ, অপমান। আবার ভাবে, মামলা করে তাঁর বাবা পারবেন কেন জমিদারের সঙ্গে! তিনি তো শান্তিপ্রিয়, ছা-পোষা লোক।

মমতা মমতাময়ীর মত সুশীলের দুঃখে দুঃখিত। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, চল, আমরা লুকিয়ে তোমার মা বাবার কাছে চলে যাই। আবার বাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। গোপনে পালাবার চেষ্টা সুশীল করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। রবি ওর সহায় হয়ে অনেক রকম মতলব করেছিল, কোনটাই ঠিক হয়নি। শেষে রবি সুশীলকে বলল, ম্যানেজার কাকার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখবে। ওঁর অসাধারণ

উপস্থিত বুদ্ধি। ওঁকে বললে নিশ্চয়ই একটা পথ বাতলে দেবেন। তিনিও তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল।

শুনে সুশীলের চোখদুটি ক্ষণকালের জন্য একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার ভয়ে ভীত হয়ে বলল, আমি কিছু বলতে গেলে আবার বিপরীত ফল না হয়, তুমিই আমার হয়ে ওঁকে একটু বল না। আমি কি করব, বুঝতে পারছি না। এমন দুর্ভাগ্যও মানুষের হয়।

সুশীলের দুঃখে রবি সব সময়েই দুঃখিত। সে এক দিন সাহসের সঙ্গে ম্যানেজার কাকার সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করল। ম্যানেজারবাবু বললেন, বড়বাবু যদি সম্মতি দেন এবং সাহায্য করেন, তবে জামাইবাবুকে মুক্ত করা খুব সহজ হবে। কর্তাবাবু বড়বাবুর কার্য কলাপে সব সময় সম্মতি দিয়ে থাকেন। তাঁর-বিচার বুদ্ধির উপরে ওঁর আস্থা আছে। বড়বাবুর এ বিষয়ে মতামত কি, তুমি যদি অতি সাবধানে জেনে নাও, তখন আমি যা হয় বলব।

একথায় রবি উৎসাহ পেয়ে একদিন দাদার সঙ্গে সদরঘাটের দিকে বেড়াতে গেল, এবং পথে চলতে চলতে বলল, "দাদা, এটা কি ভাল হচ্ছে? একটি ছেলেকে এমনি করে আটকে রেখে তিলে তিলে ক্ষয় করে মেরে ফেলা হচ্ছে। আর কিছুদিন থাকলে সুশীল হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

শুনে দাদা বেশ উৎসাহিত হয়ে বললেন, তুমি ও বিষয়ে ভাবছ? আমি তো মাঝে মাঝে ভাবছি, বাবাকে কিছু বলব কি না? এ ব্যাপারটা এত খারাপ লাগছে। আমার মনে হয় আমি কোথাও চলে যাই বাড়ী ছেড়ে, বাবা তখন বুঝবেন ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে গেলে কেমন লাগে। সুশীলের মা-বাবার কথা ভাবলে আমার লজ্জা ও দুঃখের অবধি থাকে না। কিন্তু বাবাকে কি বললে আবার তিনি কি ব্যবস্থা নেবেন, বুঝি না, হিতে বিপরীত না হয়।

তখন রবি সাহস পেয়ে বলল, ম্যানেজার কাকার সঙ্গে এ বিষয় পরামর্শ করলে কেমন হয়? তিনি নিশ্চয়ই একটা সহজ পথ আবিষ্কার করে দেবেন।

দুভাই মিলে কথাবার্তা ঠিক করে রবি ম্যানেজার কাকার কাছে গিয়ে দাদার মতামত সব জানাল। উনি বললেন, ওদের একদিন বেড়াতে পাঠিয়ে দাও। তার আগে বুড়িগঙ্গায় নৌকো ঠিক করে লোকজন দিয়ে ওদের ব্যবহারের প্রয়োজন মত জিনিষপত্র গুছিয়ে নৌকোয় পাঠাও। ওরা বেড়াতে যাবে, কাজেই সঙ্গে দারোয়ানকে যেতে দিও না। মার তো সম্মতি আছে, তাঁকে সব জানিয়ে ব্যবস্থা কর। পরশু বিকেলে লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ীতে একটি উৎসব আছে, কর্তাবাবুকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উনি সেখানে যাবেন, আমিও সঙ্গে যাব। সেখান থেকে আমরা একটু দেরী করে আসব। সেই সময়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। কর্তাবাবুকে শুধু জানিয়ে রাখবে যে, ওরা একটু বেড়াতে যেতে চায়, পাঠিয়ে দেব তো? কর্তাবাবু কিন্তু নিষ্ঠুর নন। ঝোঁকের মাথায় এক-একটা কাজ করে বসেন, শেষে সম্মানের কথা এসে পড়ে বলে গম্ভীর হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারটার দোষগুণ উনিও উপলব্ধি করছেন না কি? কিন্তু মাথা নত করতে রাজি নন। তবে ওঁর হয়ে অন্য কেহ যদি দোষক্ষালন করে দেয়, উনি বিশেষ আপত্তি করেন না। হঠাৎ চটে যান, এমন মানুষেরা শান্ত হলে অতি শান্ত। সেদিন মমতার কান্না ওঁর পিতৃহৃদয়কে বড় বিচলিত করেছিল। না হলে এসব প্ল্যান আগে ভাবেন নি। তুমি মাকে ও দাদাকে বলে ওদের রওনা করে দাও। মমতার শ্বশুর-বাড়ী যাবার আগ্রহ হয়েছে জানলে আর বিশেষ কিছু বলবেন না। হয়ত ওদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি বলে উদ্বিগ্নই হবেন। রবি উৎসাহিত হয়ে বলল, বেশ, বাবাকে কিন্তু আপনি সামলাবেন।

ম্যানেজারবাবুর পরামর্শমত রবি, তার দাদা, মা সবাই মিলে সুশীল আর মমতাকে সাধ্যমত সাজিয়ে গুজিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা করে দিল। আগের দিনই সুশীলের বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল সুশীলরা যাচ্ছে বলে। দুমাস পরে সোনার শিকলকেটে পাখী দিগন্তে ডানা মেলে দিল।

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ বারো ॥

রোলাঁর স্নিগ্ধ সহশীলতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম—আরো এই জন্য যে, শুনেক গ্রামে আমি গান করে তাঁর আন্তরিক তারিফ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন এ-শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকোবিদ (musicologue)। তাই আমার ফরাসী ভাষা শেখার উৎসাহ ঝোড়ো হাওয়ায় আগুনের মতন দীপ্ত হয়ে উঠল: আমি স্থির করলাম রোলাঁকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছি,—তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করব ফরাসী ভাষায়—সে প্রতিশ্রুতি না রাখতে পারলে মান থাকবে না।

অথ, আমি প্রায় প্যারিসের উপকণ্ঠে সেভ্র্-এ (Sevres) মসিয়ে জ্যুল ব্লকের অতিথি হলাম। তিনি ছিলেন অতি সদাশয়, আমার কাছ থেকে এক ফ্রাঁ-ও দক্ষিণা নিলেন না। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তিনি ও শ্রীমতী ব্লক দুজনেই চমৎকার ইংরেজী বলতে পারতেন। তাই সেখানে দু সপ্তাহ থেকে ফরাসী বোলচালে বিশেষ উন্নতি না করেই বিদায় নিলাম, হরিষে বিষাদ।

হর্ষ এই জন্য যে, তাঁর কাছ থেকে বিশেষ লাভ করেছিলাম তাঁর পাণ্ডিত্যে। তিনি ছিলেন ইণ্ডলজিস্ট। তাঁর কাছে নানা প্রাচ্যকোবিদ পণ্ডিত আসতেন যাঁদের মধ্যে কেবল লক্ষ্মী শাস্ত্রীর কথা মনে আছে। তিনি অনর্গল ফরাসী ভাষায় কথালাপ করতেন মসিয়ে ব্লকের সঙ্গে। শুনতে শুনতে কান একটু তৈরী হ'ল, বিশেষ ফরাসী সন্ধির গ্রন্থি মোচনে সক্ষম হয়ে, যাকে বলে liaison; বিদেশীর কাছে liaison হয়ে দাঁড়ায় এক দুস্তর বাধা। তবে শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্। এক লাফে তো শিখরে ওঠে যায় না।

মসিয়ে ব্লকের সঙ্গে ইংরেজীতে কথালাপ করে আনন্দ পেয়েছিলাম বৈকি—তাঁকে আমাদের নানা গান শুনিয়ে হয়ত কিছু আনন্দও দিয়ে থাকব, কিন্তু আমি যে তাঁর আতিথ্যে ইংরেজীতে কথাবার্তা কয়ে ফরাসী কথালাপে বিশেষ পোক্ত হতে পেরেছিলাম একথা বললে ডাহা মিথ্যা কথা হবে। বিষাদের মূল এই-ই। তবে এই বিষাদের ফলেই রুখে উঠে পণ নিলাম যে, ভবিষ্যতে এমন ফরাসী পরিবারে ছাড়পত্র পেতে হবে যেখানে কেউ ইংরেজী জানে না।

এরোখকে বলা চলে মহৎ রোখ। কারণ, এর পরে দু দুটি ফরাসী পরিবারে পর পর প্রবেশ করলাম যেখানে পারি বা না পারি ফরাসী না বলে উপায় ছিল না—যেহেতু গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী আদৌ ইংরেজী জানতেন না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যারিসের বিশিষ্ট ফরাসী রাজপুরুষ—functionnaire—যেমন সদাশয় তেমনি আলাপী। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—বেশ একটু উন্নতি হ'ল ফরাসী কথালাপের। আমার হোস্ট-এর নাম মনে নেই কিন্তু, আশ্চর্য, মনে আছে তাঁর একটি চাকরাণীর একবৎসরের নয়নমোহন

শিশুকে। আমার বন্ধু কর্তা বললেন: "চাকরাণীটিকে তার প্রণয়ী ভুলিয়ে এনে তার সর্বনাশ ক'রে গায়েব হয়েছে আর-এক প্রেয়সীর উল্লাসে।" আমার তাই আরো মায়া করত। আহা, এই কুলহারা শিশু—ফুলের মত শিশু—ভবিষ্যতে সমাজে পাসপোর্ট পেতে না জানি কী বিষম বেগ পাবে। কিন্তু যে-ছবিটি অবিস্মরণীয় সেটি এই যে, আমাকে দেখলেই সে অপরূপ হেসে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকত, আর আমি তাকে সাদরে কোলে তুলে নিতাম। মনে পড়ত পিতৃদেবের 'জীবন-পথের নবীন পান্থ' কবিতার দুটি চরণ:

> এ-বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই—রাশি রাশি
> হয়েছে সৃষ্ট,
> তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই—শিশুর হাসিটি
> যেমন মিষ্ট।

অতঃপর একটা লম্বা ছুটিতে লণ্ডনে এসে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমন্ত্রণ পেলাম এক ফরাসী পরিবারে—হ্যামারস্মিথে। গরিব পল্লী কিন্তু আমার গৃহকর্ত্রীর অনবদ্য গৃহিণীপনায় গৃহটি হ'য়ে উঠেছিল সত্যিই আরামনিলয়। সেখানে একদিন সুভাষ এসে আমাকে ফরাসী বলতে দেখে কী যে খুশী! কিন্তু বলল: "এই সঙ্গে জর্মন ভাষাটাও শেখা চাই। ওদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে, ওরা উঠছে, ফরাসীরা পড়ছে—'ডেকাডেন্ট'।" আমি বললাম: "কিন্তু ফরাসীদের জাতিগত অবক্ষয়—হয় হোক না সুভাষ, ওদের ভাষা যে মধুময়।" সুভাষ তখন জেরা শুরু করল: "কিন্তু ফরাসীদের এক মহাশিল্পীও তোমায় বলেন নি কি জর্মন ভাষা শিখতে?"

"সে তো জর্মনদের গানের জন্যে।"

"গান ছাড়া কি জর্মনির আর কিছুই নেই বলতে চাও?"

এই ধরণের তর্কাতর্কি। সুভাষ জর্মন জাতির তেজস্বিতা, গঠনকৈপুণ্য, নিয়মানুবর্তিতা, ডিসিপ্লিন প্রভৃতি গুণের বিষম অনুরাগী হ'য়ে উঠেছিল—একদা ফন হিণ্ডেনবার্গ-এর সঙ্গে দেখাও করেছিল। পরে জর্মন ভাষায় সে অনর্গল বক্তৃতাও দিতে পারত। কিন্তু ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষা সে জানত না তো? জিৎ কার? বলা কঠিন বৈ কি।

এবার আমার ফরাসী ভাষা চর্চার তৃতীয় অধ্যায়ে আসি—হ্যামারস্মিথে—এর্ণু-পরিবার-পর্বে।

আমি আসার পরে দেখতে দেখতে এ-পরিবারটির সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গেল—যে কথা আমি আমার প্রথম উপন্যাস "মনের পরশ"-এ লিখেছিলাম ১৯২৪ সালে। চল্লিশ বৎসর পরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ "ভাবি এক হয় আর"-এ 'এ-স্নেহশীল পরিবারটির কথা বাদ দেই। এতে ক'রে উপন্যাসটির গতি নিটোল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যাদের কাছে অঢেল প্রীতি ও সেবা পেয়েছিলাম এবং যাদের সঙ্গে নিরন্তর কথালাপে আমার ফরাসী ভাষায় আলাপ করার শক্তি দ্রুতবেগে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তাদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্যে মন আমাকে ধমকাত। তাই মনে হ'ল—আমার "স্মৃতির শেষ পাতা"-য় এর্ণু পরিবারের কাছে আমি কী পেয়েছিলাম তার স্বাক্ষর রেখে যাই সকৃতজ্ঞে।

গৃহকর্তা মসিয়ে এর্ণু আমাকে নানা ফরাসী বই পড়বার নির্দেশ দিতেন সানন্দেই। মাদাম এর্ণু আমাকে দিদির মতনই স্নেহ করতেন ও রকমারি ফরাসী রান্না ক'রে জোর ক'রে খাওয়াতেন এ ও তা—ঠিক যেমন বাংলা দেশের স্নেহময়ীরা করেন। শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি মনে পড়ে—(পুনরুক্তি হয় হোক)—"সংসার ছেড়ে বৈরাগী হব কেমন ক'রে?—যেখানেই যাই মা বোন জুটে যায় যে।"

কিন্তু সবচেয়ে অবিস্মরণীয়া—মাদাম এর্ণুর অষ্টবর্ষা ফুটফুটে মেয়ে—জ্হান (Jane)—যে হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আমার ফরাসী আলাপের নিয়ন্ত্রী। ফরাসী ভাষা যে এত শ্রুতিমধুর হ'তে পারে হয়ত আমি জ্হানকে ভালো না বাসলে জানতে পারতাম না। আমার ফরাসী উচ্চারণে বা পদগঠনে কোথাও ভুল হ'লে সে কী খিল খিল ক'রে হাসি তার—মনে হ'ত ইংরেজী উপমা—tinkling bell। আমি এমন মধুর আনন্দময়ীকে

ভালোবাসব এতে বিচিত্র কিছু নেই—স্নেহ নিম্নগামী নজিরওতো হাজির। বিচিত্র তার আমাকে ভালোবাসা। আমি দুদিনে সত্যিই হ'য়ে উঠেছিলাম তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, খেলার সাথী তথা "chevalier errant" (বলতেন মসিয়ে এর্ণু)। যখন তখন গুটি গুটি এসে পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরবে। গলা জড়িয়ে টানবে। আমার কোলে এসে গদিয়ান হ'য়ে অনর্গল ব'লে চলবে কত কী—তার স্কুলের কথা, সখীদের কথা, পুতুলের কথা, সিনেমার কথা—কিসের নয়? আমাকে ওরা ডাকত মসিয়ে রোওয়া (Roi-এর উচ্চারণ ফরাসীতে রোওয়া)—মাদাম এর্ণু থেকে থেকে আমাকে বাঁচাতে দুম দুম ক'রে এসে তাকে ধমকাতেন: "Va-t'en (যাঃ পালাঃ)। মসিয়ে রোওয়াকে দিক করিস নি, তাঁর তোর অফুরন্ত গালগল্প শোনা ছাড়াও কাজ আছে।" জ্হান বিষম অভিমানিনী—থর থর ক'রে তার ঠোঁট ফুলে উঠত। অমনি তাকে আমি কোলে টেনে নিয়ে বলতাম (ফরাসী ভাষায়) "Non ma cherie, je suis a ta service toujours"—(না মণি, আমি তোমার সেবাই করতে চাই চিরদিন) অম্নি তার চোখের জলে ফুটে উঠত হাসির ইন্দ্রধনু। মা স্নেহে গদ্ গদ হ'য়ে বলতেন: 'মেয়ে আমার সোজা মেয়ে নয়, জানে কী ক'রে মা-র ওপরেও এককাঠি যেতে হয়..." ইত্যাদি। এইভাবে আমার ফরাসী আলাপে দেখতে দেখতে উন্নতি হয়—নিরন্তর জ্হানের সঙ্গে কথালাপ ক'রে। এমন মধুর শিক্ষয়িত্রী, তার উপর মধুর ভাষা—হবে না উন্নতি? পরে বার্লিনে আমাকে বিখ্যাত বহুভাষী কবি ৺শহীদ সুরবর্দি বলত প্রায়ই, "প্রসিদ্ধি আছে—ইতালিয়ানই সব চেয়ে শ্রুতিমধুর। কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে মধুর ভাষা রুশ, তারপরেই ফরাসী।" রুশ ভাষা আমি জানি না—তবে আমার রুশ বন্ধু-বান্ধবীর তথা শহীদের মুখে এ-ভাষায় কথালাপ শুনতে সত্যিই খুব ভালো লাগত। ইতালিয়ান আমি পরে শিখেছিলাম—(বেশিদূর এগোতে পারি নি, তবে কথাবার্তা অল্প স্বল্প চালাতে পারতাম, সহজ বই পড়তেও পারতাম, ইতালিয়ান গান গাইতে পারতাম নিখুঁৎ।—তাই শহীদের একথায় সায় দিয়ে বলতাম: "ভাই, তোমার একথায় আমার পূর্ণ সায় আছে। তবে ফরাসী ভাষা যে এত শ্রুতিমধুর জ্হানকে ভালো না বাসলে বোধ হয় পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারতাম না।" শহীদের মুখে আগল ছিল না (তার কথা বলব যথাকালে) সে বলত পিঠ পিঠ চোখ ঠেরে, "ফরাসী ভাষার মধুরিমা আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারতে ভাই, যদি কার্তিয়ে লাতাঁয় (Quartier Latin) প্রণয়িনীর সঙ্গে গৃহস্থালি করতে করতে তোমার এ-ভাষায় হাতে খড়ি হ'ত।"*

ত্র শহীদের চটুল পরিহাস সম্বন্ধে বলতে চাই—মীরা যে গেয়েছিলেন—"প্রেম বিনা নহি মিলে নন্দলালা"—এ স্মারকোক্তিটি শুধু নন্দলালা নয় সব লালা-র সম্বন্ধেই খাটে। তাই ভাষা-লালাকেও ভালো না বাসলে পাওয়ার মতন পাওয়া যায় না। আমি ফরাসী ভাষাকে ভালোবেসেছিলাম বলেই প্রথম জ্হানের কাছে ও পরে জর্মনিতে আমার চার পাঁচটি রুশ বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করে ফরাসী ভাষায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলাম—সেকথা বলব যথাকালে।

যাকে ভালোবাসা যায় তার প্রতি মনের স্বতঃই পক্ষপাত হয় এ একটি সর্বস্বীকৃত সত্য। কিন্তু পক্ষান্তরে কোনো কিছুকে ভালো না বাসলে যে তার রূপগুণ-মহিমার যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে না এ-ও সমান সত্য। ভালো না বাসলে যেমন মহাজনের মধ্যে নানা খুঁৎ চোখে পড়ে, তেমনি ভালোবাসলে মলিনের মধ্যেও নির্মলিনের সন্ধান মেলে। আমি একথার একটি চমৎকার প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯২১-২২ সালে জর্মনিতে জর্মন ভাষায় ও গানে তালিম নেওয়ার সময়। জর্মন ভাষা আমি যতদিন ভালোবাসতে পারি নি ততদিন এ ভাষায় আমার তেমন প্রগতি হয়নি, ওর শুধু কঠোর ধ্বনিই কানে ঠেকত। কিন্তু যেই ওর কাব্যরসমহিমা ও সাঙ্গীতিক ওজস্বিতা আমাকে মুগ্ধ করল সেই আমি জর্মন ভাষার মধ্যে নানা ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম যা আগে পারি নি। বিশেষ করে জর্মন গানকে (শুবার্ট,

শোপ্যাঁ, ব্রাহ্‌ম্‌) আমি প্রেমের বরণমালা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলাম কেন রোলাঁ আমাকে জর্মন ভাষা শিখতে বলেছিলেন। ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে। তাই এবার লণ্ডনের হারানো খেই ধরি ফের।

মসিয়ে এর্ণু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন বলে ছাত্রদের পড়াতে একটি সহজ পটুতা অর্জন করেছিলেন। আমি এ সুবিধা ছাড়িনি—তাঁকে যখন তখন ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেখানে বুঝতে পারছি না বুঝে নিতাম। আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল মলিয়ের-এর বিখ্যাত Bourgeois Gentilhomme আর Malade Imaginaire।—এই সময়ে মূল ফরাসীতে পড়ি রোলাঁর Jean Christophe একখণ্ড আর Clerambeau—এবং আরো দু-একটি ফরাসী বই। কিন্তু বইয়ের ফিরিস্তি দেওয়ার সার্থকতা দেখি না। শুধু ব'লে রাখি—আমি না প'ড়ে পণ্ডিত হওয়ায় বিশ্বাস করি না বলে মসিয়ে এর্ণু যে যে বই পড়বার নির্দেশ দিতেন পড়তাম সাধ্যমত। এবার মাদাম এর্ণুর কথা বলার পালা।

জ্‌হানকে ভালোবাসার পরে মাদাম আমাকে ভাই (frere) সম্বোধন করতেন বলে আমিও তাঁকে ডাকতাম দিদি (soeur) ব'লে। তিনি আমার চেয়ে আট দশ বৎসরের বড় ছিলেন। জ্‌হান ছিল তাঁর নয়নতারা। তাই ভাই বোন জ্‌হানের প্রসাদেই পরস্পরের এত কাছে এসেছিল। কত কাছে—বলি।

একদা আমি তাঁকে একটি পতিব্রতা মেয়ের প্রসঙ্গে বলি—"আমাদের দেশে পতিব্রতা স্ত্রী-কে সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে।" বলতে তিনি হেসে বললেন, "তাহলে ভাই তোমাদের দেশে আমাকে সবাই দূর ছাই করবে নিশ্চয়ই যেহেতু আমি, "মসিয়ে এর্ণুর স্ত্রী নই—প্রণয়িনী মাত্র।" ব'লে বলেন তাঁর কাহিনী যা মেয়েরা সহজে অনাত্মীয়কে—বিশেষ করে বিদেশীকে—বলতে চায় না। তাঁর কাহিনী ছিল দীর্ঘ, সব মনে নেই, তবে অবিস্মরণীয় অংশই জীবনে সবচেয়ে বেশী পাথেয় যোগায়, তাই বলি তাঁর কাছে কী পেয়েছিলাম তাঁর সত্যনিষ্ঠ আত্মকথন থেকে। আমার কাছে তাঁর কনভেশন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরে শুনেছিলাম মসিয়ে এর্ণুও চাইতেন না যে, গৃহিণী স্বেচ্ছায় স্ত্রীর মর্যাদা হারায় সত্যবাদী হ'তে চেয়ে। কিন্তু মাদাম এর্ণু কোনো দিনই রাজী হন নি তিনি যা নন তাই বলে নিজের পরিচয় দিতে। ফলে মসিয়ে এর্ণুর নানা অসুবিধা হয়েছিল, বলাই বেশি। কারণ ফরাসী দেশে না হ'লেও সেযুগে ইংলণ্ডে প্রকাশ্যে কেউ কোনো প্রণয়িনীর সঙ্গে ঘর করলে তার নাম দেওয়া হ'ত living in sin (আজও হয় তবে এ-পঞ্চাশ বৎসরে জগতের সর্বত্রই নীতিবাদের ভিৎ শিথিল হয়ে গেছে—এমন কি আমাদের দেশেও খুব কম পুরুষই প্রণয়িনীকে প্রকাশ্যে স্ত্রীর মান-মর্যাদা দিতে সাহস পান)। রক্ষিতা রাখা আর সমাজে থেকে তার সঙ্গে ঘর করা এ দুয়ের মধ্যে এখনো তফাত আছে। আমি কেবল একজনকে জানি যিনি ধনী হয়েও বিবাহ না করে প্রণয়িনীকে প্রকাশ্যে গৃহিণী পদে বরণ করেছিলেন। সে আজ বিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা—এখন তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধের কী ধরণের পরিণতি হয়েছে খবর রাখি না।

কিন্তু মাদাম এর্ণু ছিলেন শুধু সত্যবাদিনী নন: তেজস্বিনী। ধনীর কন্যা। বিবাহ করেন বোর্দো-র এক সুরাবণিককে। জ্‌হানের জন্ম হবার পরেই—বৎসর দুইয়ের মধ্যেই—বণিক স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে গায়েব হন আর-একটি মেয়ের পিছু নিয়ে। মাদাম এর্ণু স্বামীকে ডাইভোর্স করার পরে মসিয়ে এর্ণু তাঁর সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে তাঁকে বিবাহ করতে চান। মাদাম বলেন বিবাহে তাঁর আর বিশ্বাস নেই। তাই মসিয়ে যদি বিবাহ না করে তাঁকে ঘরণী করতে রাজী হন কেবল তাহ'লেই তিনি তাঁর সঙ্গে সহবাস করবেন, নৈলে নয়। মসিয়ে এর্ণু অনেক চেষ্টা করেও সুন্দরী তেজস্বিনীর পণ ভাঙতে না পেরে রাজী হন ও লণ্ডনে অধ্যাপক হ'য়ে আসেন। কিন্তু মাদাম শর্ত করেন, বন্ধুবান্ধবের কাছে মসিয়ে এর্ণু বলতে পারবেন না যে, গৃহিণী তাঁর পরিণীতা স্ত্রী। মসিয়ে

এর্ণ্ তাঁকে সত্যি ভালোবেসেছিলেন ব'লেই রাজী হয়েছিলেন এ-সর্তে—লণ্ডনে এক কলেজে অধ্যাপনা শেষ করে ঘরে ফিরে আসতেন—কখনও গৃহে পার্টি দিতেন না। নিশ্চয়ই তাঁর এমন বন্ধু ছিল যারা মাদামকে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নয় জেনেও পার্টিতে আসতে রাজী হত, জানি না, তবে যেটা জানি সেটা এই যে, মাদাম ছিলেন সত্যকথনে অনমনীয় ও মসিয়ে কিছুটা বিব্রত।

আমার এই দিদিটির স্নেহ আমি ভুলিনি। দেশে ফিরেও তাঁকে লিখতাম, তিনিও ভাই 'রোওয়া'-কে' লিখতেন দীর্ঘ পত্র তাঁর নয়নতারা জ্হানের খবর দিয়ে। প্রতি পত্রেই লিখতেন জ্হান আমাকে তেমনিই ভালোবাসে—আমার চিঠি পেলে আহ্লাদে আটখানা হয়।

একটি ঘটনা মনে পড়ে, বলবার মত—কত স্নেহ করতেন আমাকে এ-তেজস্বিনী সমাজে যাঁর নাম "ভ্রষ্টা" আমার হঠাৎ একদিন দাঁতে ব্যথা হয়ে মুখ ফুলে ওঠে। তিনি সারারাত আমার গালে ফোমেন্ট করে গাল-ফোলা সারিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিন দাঁতটি তুলে ঘরে ফিরে তাঁকে ধন্যবাদ দিতেই তিনি হেসে বললেন: "ধন্যবাদ তো আমারই তোমাকে দেওয়ার কথা ভাই, তোমার ও-গালফোলা মুখ দেখার যন্ত্রণা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলে ব'লে।"

ফরাসী রসিকতার নমুনা হিসেবেও উক্তিটি উল্লেখ-যোগ্য—তথা অবিস্মরণীয়—অন্ততঃ তাঁর নির্মল স্নেহ পেয়ে যে ধন্য হয়েছিল তার কাছে।

কিন্তু আমি সুভাষকে তাঁর কথা খোলাখুলি বলতে সাহস পাইনি।

* কার্তিয়ে লাত্যাঁ-য় ফরাসী ছাত্ররা অকুতোভয়েই প্রণয়িনীর সঙ্গে থাকে—যাঁরা ছাত্রসমাজে স্ত্রীর মান পেয়ে থাকেন। আমার "দোলা" উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ

মন্থরা হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে বিচারসভা বসিয়াছিল। প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে নহে, রামভবনের অন্তঃপুরমধ্যস্থিত উদ্যানমধ্যে। একটি প্রফুল্লপুষ্পাচ্ছাদিত মর্মরশিলা-সোপানযুক্ত পদ্মসরোবরের তীরে নীলাশোক, স্বর্ণপলাশ পিয়াল, কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষরাজি বেষ্টিত একটি পুষ্পিত বকুলতরুমূলে মরকতশ্যামল মণিবেদিকায় মহারাজ কুশ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে এবং পশ্চাদ্দেশে স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্মিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ও চামর লইয়া ছত্র ও চামরধারিণী, প্রতিহারী এবং কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক দণ্ডায়মান। তাঁহার সম্মুখে অনতিদূরে দুইজন প্রহরী দুইদিক্ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশাখদত্তের কটিবন্ধন-রজ্জু ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের বামভাগে আনুমানিক দুইহস্ত দূরে অমাত্য ভদ্র ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অবস্থিত ছিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল তিলক আমলক মধুক পনস প্রভৃতি পল্লবঘন বৃক্ষরাজির শাখাপ্রশাখায় বিলম্বিত শতশত কিঙ্কিণী বায়ুচালিত হইয়া নিনাদিত হইতেছিল এবং বিভিন্ন ছায়াপাদপের পত্রান্তরাল হইতে কচিৎ বিহংগকূজন শ্রুত হইতেছিল।

মহাবাহু রামাত্মজ কুশ কন্দর্পকান্তি যুবাপুরুষ। পূর্বদিনের মানসিক উদ্বেগ, শোক এবং অনিদ্রা বশতঃ তাঁহাকে ক্লান্ত দেখাইতেছিল, নিতান্ত কর্তব্যানুরোধেই তিনি প্রাতঃকালে বিচার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি সম্মুখস্থ বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বিশাখদত্ত, তোমাকে গতকল্য মধ্যরাত্রে আমার অন্তঃ-পুর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" কুশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্দীর দিকে চাহিয়া নীরব হইলেন, বিশাখদত্তও নীরবে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। কুশ তখন পুনরায় কহিলেন, "বন্দী রাত্রিকালে বিনানুমতিতে রাজান্তঃপুরে প্রবেশের শাস্তি প্রাণদণ্ড, তাহা তুমি নিশ্চয় অবগত আছ। তোমার কটিবন্ধে ছুরিকা ছিল, প্রাসাদের অনেকগুলি ভিত্তিচিত্র, পট এবং শিলামূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য তুমি কতদূর দায়ী এখনও তাহায় মীমাংসা হয় নাই। আমার স্বর্গগত পিতৃদেব তোমাকে স্নেহ করিতেন, সেজন্য আত্ম-পক্ষসমর্থনের সুযোগ না দিয়া আমি তোমাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি না। এখনও তোমার কি বলিবার আছে বলো।"

বিশাখদত্ত তখনও, কিছু বলিল না নিরুত্তর রহিল। কুশ বলিলেন, "তবে কি বুঝিব তোমার বক্তব্য কিছুই নাই? তুমি রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগে আমার ক্ষতি এবং প্রাণনাশ চেষ্টায় আসিয়াছিলে? কোন্ মন্দ-বুদ্ধি সামন্ত নৃপতি অথবা জাতিশত্রু তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহাও বলিবে না? প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান দিলে এযাত্রা তোমার প্রাণরক্ষা হইতে পারিত; অন্যথা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

সীতা-মূর্তি হরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজপুরীতে প্রবেশের সময়েই বিশাখদত্ত অধর্মভয় পরিত্যাগ করিয়াছিল, এখন নিজের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সে ভাবিল 'মরিতেই যদি হয় তবে একা মরি কেন।' সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিল, "মহারাজ, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন।"

কুশ বলিলেন, "বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইলে অবশ্যই বিশ্বাস করিব।"

বিশাখদত্ত ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "মহারাজ, কি যে বিশ্বাসযোগ্য আর কি যে অবিশ্বাস্য তাহা

বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেও বুঝিয়া উঠা কঠিন। শক্তিশালী হইলে সে সন্ধিচ্ছেদক-শর্বলা লইয়া গৃহস্থকে আক্রমণ করে। অমাত্য ভদ্রের হস্তে তরবারি ছিল, আমার হস্তে ছিল না সুতরাং আমি আপনার হিতকামী হইয়াও বন্দী এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাধুপ্রবর অমাত্য কি মহদুদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা কি মহারাজ কর্তব্য বোধ করিতেছেন না?"

কুশ দৃশ্যতঃ বিচলিত হইলেন। তাঁহাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া বিশাখদত্ত বলিল, "অমাত্যের অপেক্ষা আমার উদ্দেশ্য হয়তো সাধুই ছিল, নিজের স্বার্থহানির সম্ভাবনায় তিনি আমাকে শুধু বন্দী করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, চিরদিনের মতো পৃথিবী হইতে অপসৃত করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছেন। রক্ষিগণের অসতর্কতার সুযোগে তিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি কোনও আত্মীয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া এই অঞ্চলে আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে মুক্তদ্বার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাসাদের ত্রিতলে সঞ্চরমান উল্কাশিখা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া এখানে প্রবেশ করি। দুঃখের বিষয় আমি পৌঁছিবার পূর্বেই অমাত্যের কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছিল মনে হয়, আমার অপরাধ আমি তাঁহাকে বাধা দিতে পারি নাই। মহারাজের যে বহুমূল্য সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে অমাত্যের সশস্ত্র অনুচরেরা বস্ত্রাবৃত শিবিকা যোগে তাহা লইয়া গিয়াছে—"

মহারাজ কুশ নবীন যুবক, বাল্যকাল তপোবনে অতিবাহিত করায় নাগরিক-সুলভ কৃত্রিম হাবভাবাদি তাঁহার সম্যক্ আয়ত্ত হয় নাই। এতক্ষণ গম্ভীর মুখে বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও তিনি এইরূপ বিচার ও শাস্তিদানে অভ্যস্ত ছিলেন না, ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। বিশাখদত্তের শেষ কথায় তিনি আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার বহুমূল্য সম্পত্তির মধ্যে বৃদ্ধা কুব্জা দাসী মহুয়া গতরাত্রে অপহৃতা হইয়াছে শুনিতেছি। তা বলো কি শিল্পী, তুমি অমাত্য-প্রবরকে শিবিকা যোগে মহুয়াহরণ করিতে সজ্ঞানে স্বচক্ষে দেখিয়াছ? স্বপ্ন দেখ নাই তো? অমাত্য ভদ্র, আপনার এ কি প্রবৃত্তি? গৃহে সুন্দরী পত্নী থাকিতে শেষে কুব্জার রূপে মজিলেন?

বিশাখ দত্ত সহসা এই সংবাদ পাইয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। তাহার পদদ্বয় অবশ হইয়া যাওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে বসিয়া পড়িত, কেবল দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন বলবান্ প্রহরী তাহাকে ধরিয়া থাকায় বসিতে না পারিয়া সে অপ্রকৃতিস্থের মতো টলিতে লাগিল। স্বর্ণসীতার জন্য সে যে কেবল স্বেচ্ছায় পরকাল এবং ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাহাই নহে, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছে, দ্বাদশজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অগ্রিম দশটি করিয়া সুবর্ণমুদ্রা দিয়াছে, একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত মুক্তাজালালংকৃত বহুমূল্য বিচিত্র শিবিকা সঙ্গে দিয়াছে। সমস্তই পণ্ড হইল? একদিকে রাজদণ্ডের ভয়, অন্যদিকে আশাভঙ্গের মনস্তাপ তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। এমন সময় অমাত্য ভদ্রের দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বিশাখদত্ত মুক্ত অবস্থায় থাকিলে ছুটিয়া গিয়া হয়তো দুই হস্তে তাঁহার গলদেশ টিপিয়া ধরিত, তাহা না পারিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দৃষ্টি দ্বারাই যেন দূর হইতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রয়াসী হইল। পরে তাহার গণ্ডদেশ আপ্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা নামিল, সে অধোবদনে গদ্গদস্বরে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার যে শাস্তি বিধান করিতে হয় করুন, আমি আর কিছু বলিব না।"

মহারাজ কুশ স্পষ্টতঃই বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অমাত্য ভদ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর্য, আপনি আমার পিতার বয়স্য এবং আমার শুভানুধ্যায়ী। বিশাখদত্তের অভিযোগ শুনিলেন।

মন্থরা হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে বিচারসভা বসিয়াছিল। প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে নহে, রামভবনের অন্তঃপুরমধ্যস্থিত উদ্যানমধ্যে। একটি প্রফুল্লপুষ্পাচ্ছাদিত মর্মরশিলা-সোপানযুক্ত পদ্মসরোবরের তীরে নীলাশোক, স্বর্ণপলাশ পিয়াল, কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষরাজি বেষ্টিত একটি পুষ্পিত বকুলতরুমূলে মরকতশ্যামল মণিবেদিকায় মহারাজ কুশ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে এবং পশ্চাদ্দেশে স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্মিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ও চামর লইয়া ছত্র ও চামরধারিণী, প্রতিহারী এবং কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক দণ্ডায়মান। তাঁহার সম্মুখে অনতিদূরে দুইজন প্রহরী দুইদিক্ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশাখদত্তের কটিবন্ধন-রজ্জু ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের বামভাগে আনুমানিক দুইহস্ত দূরে অমাত্য ভদ্র ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অবস্থিত ছিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল তিলক আমলক মধুক পনস প্রভৃতি পল্লবঘন বৃক্ষরাজির শাখাপ্রশাখায় বিলম্বিত শতশত কিঙ্কিণী বায়ুচালিত হইয়া নিনাদিত হইতেছিল এবং বিভিন্ন ছায়াপাদপের পত্রান্তরাল হইতে ক্বচিৎ বিহগকূজন শ্রুত হইতেছিল।

মহাবাহু রামাত্মজ কুশ কন্দর্পকান্তি যুবাপুরুষ। পূর্বদিনের মানসিক উদ্বেগ, শোক এবং অনিদ্রা বশতঃ তাঁহাকে ক্লান্ত দেখাইতেছিল, নিতান্ত কর্তব্যানুরোধেই তিনি প্রাতঃকালে বিচার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি সম্মুখস্থ বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বিশাখদত্ত, তোমাকে গতকল্য মধ্যরাত্রে আমার অন্তঃ-পুর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" কুশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্দীর দিকে চাহিয়া নীরব হইলেন, বিশাখদত্তও নীরবে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। কুশ তখন পুনর্বার কহিলেন, "বন্দী রাত্রিকালে বিনানুমতিতে রাজান্তঃপুরে প্রবেশের শাস্তি প্রাণদণ্ড, তাহা তুমি নিশ্চয় অবগত আছ। তোমার কটিবন্ধে ছুরিকা ছিল, প্রাসাদের অনেকগুলি ভিত্তিচিত্র, পট এবং শিলামূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য তুমি কতদূর দায়ী এখনও তাহায় মীমাংসা হয় নাই। আমার স্বর্গগত পিতৃদেব তোমাকে স্নেহ করিতেন, সেজন্য আত্ম-পক্ষসমর্থনের সুযোগ না দিয়া আমি তোমাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি না। এখনও তোমার কি বলিবার আছে বলো।"

বিশাখদত্ত তখনও, কিছু বলিল না নিরুত্তর রহিল। কুশ বলিলেন, "তবে কি বুঝিব তোমার বক্তব্য কিছুই নাই? তুমি রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগে আমার ক্ষতি এবং প্রাণনাশ চেষ্টায় আসিয়াছিলে? কোন্ মন্দ-বুদ্ধি সামন্ত নৃপতি অথবা জ্ঞাতিশত্রু তোমাকে প্রের[illegible] করিয়াছিল তাহাও বলিবে না? প্রকৃত অপরাধী সন্ধান দিলে এযাত্রা তোমার প্রাণরক্ষা হইতে পারিত অন্যথা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

সীতা-মূর্তি হরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজপুরী[illegible] প্রবেশের সময়েই বিশাখদত্ত অধর্মভয় পরিত্য[illegible] করিয়াছিল, এখন নিজের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া [illegible] ভাবিল 'মরিতেই যদি হয় তবে একা মরি কেন।' [illegible] দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিল, "মহারাজ, আপ[illegible] কি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন।"

কুশ বলিলেন, "বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইলে অব[illegible] বিশ্বাস করিব।"

বিশাখদত্ত ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "মহার[illegible] কি যে বিশ্বাসযোগ্য আর কি যে অবিশ্বাস্য ত[illegible]

বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেও বুঝিয়া উঠা কঠিন। শক্তিশালী হইলে সে সন্ধিচ্ছেদক-শর্বলা লইয়া গৃহস্থকে আক্রমণ করে। অমাত্য ভদ্রের হস্তে তরবারি ছিল, আমার হস্তে ছিল না সুতরাং আমি আপনার হিতকামী হইয়াও বন্দী এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাধুপ্রবর অমাত্য কি মহদুদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা কি মহারাজ কর্তব্য বোধ করিতেছেন না ?"

কুশ দৃশ্যতঃ বিচলিত হইলেন। তাঁহাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া বিশাখদত্ত বলিল, "অমাত্যের অপেক্ষা আমার উদ্দেশ্য হয়তো সাধুই ছিল, নিজের স্বার্থহানির সম্ভাবনায় তিনি আমাকে শুধু বন্দী করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, চিরদিনের মতো পৃথিবী হইতে অপসৃত করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছেন। রক্ষিগণের অসতর্কতার সুযোগে তিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি কোনও আত্মীয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া এই অঞ্চলে আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে মুক্তদ্বার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাসাদের ত্রিতলে সঞ্চরমান উল্কাশিখা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া এখানে প্রবেশ করি। দুঃখের বিষয় আমি পৌঁছিবার পূর্বেই অমাত্যের কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছিল মনে হয়, আমার অপরাধ আমি তাঁহাকে বাধা দিতে পারি নাই। মহারাজের যে বহুমূল্য সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে অমাত্যের সশস্ত্র অনুচরেরা বস্ত্রাবৃত শিবিকা যোগে তাহা লইয়া গিয়াছে—"

মহারাজ কুশ নবীন যুবক, বাল্যকাল তপোবনে তিবাহিত করায় নাগরিক-সুলভ কৃত্রিম হাবভাবাদি তাহার সম্যক্ আয়ত্ত হয় নাই। এতক্ষণ গম্ভীর মুখে বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও তিনি এইরূপ বিচার শাস্তিদানে অভ্যস্ত ছিলেন না, ভিতরে ভিতরে হাইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশাখদত্তের শেষ কথায় তিনি আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার বহুমূল্য সম্পত্তির মধ্যে বৃদ্ধা কুব্জা দাসী মন্থরা গতরাত্রে অপহৃতা হইয়াছে শুনিতেছি। তা বলো কি শিল্পী, তুমি অমাত্য-প্রবরকে শিবিকা যোগে মন্থরাহরণ করিতে সজ্ঞানে স্বচক্ষে দেখিয়াছ? স্বপ্ন দেখ নাই তো? অমাত্য ভদ্র, আপনার এ কি প্রবৃত্তি? গৃহে সুন্দরী পত্নী থাকিতে শেষে কুব্জার রূপে মজিলেন?

বিশাখ দত্ত সহসা এই সংবাদ পাইয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। তাহার পদদ্বয় অবশ হইয়া যাওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে বসিয়া পড়িত, কেবল দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন বলবান্ প্রহরী তাহাকে ধরিয়া থাকায় বসিতে না পারিয়া সে অপ্রকৃতিস্থের মতো টলিতে লগিল। স্বর্ণসীতার জন্য সে যে কেবল স্বেচ্ছায় পরকাল এবং ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাহাই নহে, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছে, দ্বাদশজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অগ্রিম দশটি করিয়া সুবর্ণমুদ্রা দিয়াছে, একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত মুক্তাজালালংকৃত বহুমূল্য বিচিত্র শিবিকা সঙ্গে দিয়াছে। সমস্তই পণ্ড হইল? একদিকে রাজদণ্ডের ভয়, অন্যদিকে আশাভঙ্গের মনস্তাপ তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। এমন সময় অমাত্য ভদ্রের দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বিশাখদত্ত মুক্ত অবস্থায় থাকিলে ছুটিয়া গিয়া হয়তো দুই হস্তে তাঁহার গলদেশ টিপিয়া ধরিত, তাহা না পারিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দৃষ্টি দ্বারাই যেন দূর হইতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রয়াসী হইল। পরে তাহার গণ্ডদেশ আপ্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা নামিল, সে অধোবদনে গদ্গদস্বরে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার যে শাস্তি বিধান করিতে হয় করুন, আমি আর কিছু বলিব না।"

মহারাজ কুশ স্পষ্টতঃই বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অমাত্য ভদ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর্য, আপনি আমার পিতার বয়স্য এবং আমার শুভানুধ্যায়ী। বিশাখদত্তের অভিযোগ শুনিলেন।

মধ্যরাত্রে কি অভিপ্রায়ে আপনি, রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিবেন কি? প্রকারান্তরে আমার স্বর্গীয়া জননীর নির্বাসনের জন্য দায়ী জানিয়াও সত্য-বাদিতার জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আশা করি সত্য সাক্ষ্য দ্বারা আপনি আমাদের সন্দেহের নিরসন এবং রহস্তের সমাধান করিবেন।"

তখন অমাত্য ভদ্র করপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি সত্য কথাই বলিব। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ অনুসারে আমি দিনে রাত্রে স্ববেশে এবং ছদ্মবেশে অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখের সংবাদ লইবার জন্য প্রাসাদে কুটিরে পথে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত। রাজান্তঃপুরে এমন কি মহারাজের শয়নকক্ষে দিনে রাত্রে, প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রবেশ করিবার জন্য অধিকার মহারাজ রামচন্দ্র স্বয়ং আমাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রাঙ্কিত এই অনুমতিপত্র দেখিলেই আপনি তাহা অবগত হইবেন।"

অমাত্য বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পত্র বাহির করিয়া নতজানু হইয়া নৃপতির হস্তে সমর্পণ করিলেন, কুশ তাহা পাঠ করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইয়া আবার তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "তারপর?"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, গতকল্য রজনীতে নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। এই অঞ্চলে আসিয়া লক্ষ্য করিলাম রামভবনের তোরণদ্বার উন্মুক্ত এবং অরক্ষিত। অগত্যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রহরায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মধ্যরাত্রে অন্ধকার রাজপুরীর ত্রিতলে সঞ্চরমান আলোকশিখা দেখিয়াও প্রথমে আমি কোনো সন্দেহ করি নাই, বহুক্ষণ গত হইলেও যখন উহা নির্বাপিত হইল না, উপরন্তু কোনওরূপ অস্ত্রাঘাতের শব্দ চারিদিকের অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল তখন আমি ত্রিতলে আরোহণ করিয়া দেখি, পাপিষ্ঠা মন্থরা ঘরে ঘরে কুঠার এবং উল্কা হস্তে ভ্রমণ করতঃ মূর্তি এবং চিত্রসমূহ বিনষ্ট ও বিকৃত করিতেছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তাহাকে অনুসরণ করি। পরিচরে উল্কা নির্বাপিত হইলে কুব্জা অন্ধকারেই আপনার পিতৃদেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে আপনার মাতৃদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা দেখিয়া সে প্রথমে অভিভূতা হয়, প্রেতমূর্তিজ্ঞানে তাহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করে। পরে মূর্তিস্পর্শ করিয়া উহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবামাত্র কুঠার উত্তোলন করিয়া মূর্তিতে আঘাত করিতে যায়। আমি অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করি আর এক ব্যক্তি দ্বারসমীপস্থ হইয়াছে,আমি কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এই বিশাখদত্ত দ্রুতবেগে গিয়া মন্থরাকে ধরিয়া ফেলে, কুব্জা অকস্মাৎ আক্রান্তা হইয়া ভয়ে হতচেতনা হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের পর্যঙ্কতলে লুক্কায়িত করিয়া বিশাখদত্ত স্বীয় স্কন্ধবিলম্বিত মহিষদৃতির মধ্যে স্বর্ণসীতাকে ভরিয়া উহা অপহরণের জন্য নিজ অনুচরদিগকে ডাকিতে যায়। আমি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ইত্যবসরে মহিষদৃতি হইতে স্বর্ণসীতাকে বাহির করিয়া বিগতচেতনা মন্থরাকে তন্মধ্যে ভরিয়া রাখি। অনতিকাল পরে বিশাখদত্তের অনুচরগণ উক্ত মহিষদৃতি মধ্যস্থা মন্থরাকে একটি বস্ত্রাবৃত শিবিকা মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রাসাদ-বহির্দেশে লইয়া গেলে আমি বিশাখদত্তকে বন্দী করি। সুরাবিহ্বল কয়েকজন প্রহরীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহাদের প্রহরায় নিযুক্ত করি। উষাকালে আপনাকে সংবাদ দিয়া বিচারসভা আহ্বান করিতে অনুরোধ জানাই। মহারাজ, যাহা বলিলাম তাহার একবর্ণ মিথ্যা নহে। অতঃপর আপনি যাহার যাহা শাস্তি বিধান করিতে হয় করুন।"

অমাত্য ভদ্র নীরব হইলেন। মহারাজ কুশ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অমাত্যের বিবৃত কাহিনী শুনিতেছিলেন, তিনি কৌতুকোৎফুল্ল মুখে কিছুক্ষণ শিল্পী ও অমাত্য উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন তারপর বলিলেন, "বিশাখদত্ত, আর্য ভদ্র যাহা বলিলেন তাহা তুমি শুনিয়াছ। এক্ষণে তোমার বক্তব্য কি?"

বিশাখদত্ত নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "মহারাজ, অমাত্যের কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমার স্বহস্তনির্মিত স্বর্ণপ্রতিমায় লোভ করিয়াছিলাম, অমাত্যের নিকট আমি চাতুর্যে

পরাজিত হইয়াছি। আমার ইহকাল পরকাল উভয়ই গিয়াছে।”

তাহার বক্তব্য শুনিয়া মহারাজ কুশ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন, “বিশাখদত্ত, তুমি তস্কর এবং দণ্ডার্হ মহাপাপী হইলেও কল্যরাত্রে তুমি আমার মাতৃদেবীর স্বর্ণপ্রতিমাটিকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছ। সেজন্য আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড দিলাম না। তোমার অনুচরগণ মন্থরাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহা তুমি নিশ্চয় অবগত আছ। আর্য ভদ্রকে সন্ধান দিলে তিনি অবিলম্বে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন আশা করি। যতদিন তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া না যায় ততদিন তুমি নিজগৃহের বাহিরে যাইতে পারিবে না। আমার পিতৃদেবের একটি স্বর্ণমূর্তি তুমি বিনা পারিশ্রমিকে নির্মাণ করিয়া বৎসরান্তে আমার নিকট উপস্থিত করিবে, মূর্তিরচনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ অবশ্য তুমি রাজকোষ হইতে পাইবে। সাবধান, গতকল্য রাত্রির বৃত্তান্ত যেন নগরবাসী কাহারও কর্ণগোচর না হয়। মন্থরাহরণের জন্য প্রজাগণ আমাকে দায়ী করিতে পারে। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমার আদেশ পালিত না হইলে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।”

রাজাজ্ঞায় কর্মকার আসিয়া বন্দীর শৃঙ্খল মোচন করিল, প্রহরীরা তাহার কটিদেশ হইতে বন্ধনরজ্জু খুলিয়া লইয়া তাহাকে প্রাসাদ-বহির্দেশে রাখিয়া আসিল। অতঃপর আর কয়েকজন প্রহরী অমাত্য ভদ্রের ইঙ্গিতে বিংশতিজন অন্তঃপুর-রক্ষককে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সেখানে উপস্থিত করিল। তাহাদের তখন সুরাবিহ্বলতা কাটিয়াছে, ‘খোঁয়াড়ি’-জনিত অবসাদে সকলেই কাতর। কুশকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইল, তাহাদের অশ্রুস্রোতে উদ্যানপথ কর্দমাক্ত হইয়া গেল। মহারাজ কুশ সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহারা অস্ফুট গদ্গদ কণ্ঠে যাহা বলিল তাহার সরলার্থ, “মহারাজ, আমরা পিতৃতুল্য মহারাজ রামচন্দ্রের বিহনে অনাথ হইয়াছি। তাঁহার বিরহ-দুঃখ ভুলিবার জন্য সামান্য সুরাপান করিয়াছিলাম মাত্র। তারপর আর কিছুই জানি না।”

করুণাময় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত হওয়ায় মহারাজ কুশ স্বভাবতঃই কোমল-হৃদয় ছিলেন, বিশেষতঃ গতরাত্রে পিতৃশোক ভুলিবার জন্য তিনিও সুরাপানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন, কেবল জন্মাবধি অভ্যস্ত নহেন বলিয়া সুরাপাত্র স্পর্শ করেন নাই। রক্ষকগণের শোকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি তাহাদের লঘুদণ্ড দিলেন, তাহাদিগকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া অনুতাপ করিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর অন্যান্য প্রহরী ও অনুচর-অনুচরীদিগকে দ্বিতীয়বার “রাত্রির ঘটনা যেন প্রকাশ না পায়” এইরূপ নির্দেশ দিয়া বিদায় দিলেন। তারপর স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্বক অমাত্য ভদ্রের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিতে চলিতে বলিলেন, “অমাত্যবর, আপনি বুদ্ধিবলে দুর্বুদ্ধি শিল্পীকে পরাজিত করিয়া আমার মাতৃদেবীর স্বর্ণপ্রতিমাটি রক্ষা করিয়াছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যাহাই বলুন না কেন, একটি জড় পদার্থের জন্য একটি অমূল্য মনুষ্যজীবনকে আপনি বিপন্ন করিয়াছেন, ইহা আপনার মতো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্তব্য হয় নাই।”

ভদ্র বলিলেন, “মহারাজ, আমি আমার কার্যের গুরুত্ব সে সময়ে বুঝিতে পারি নাই। নিমেষ মধ্যে মহিষদৃতির মধ্যে স্বর্ণপ্রতিমার পরিবর্তে একটি গুরুভার অপর বস্তু প্রবেশ করাইতে হইবে,—এইটুকু কেবল আমার চিন্তার বিষয় ছিল। নিকটে আর কিছু না পাইয়া কুব্জাকেই ব্যবহার করিয়াছি। হয়তো কুব্জার উপর পূর্বাবধি আমার বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই অন্য উপায় আমি সন্ধান করি নাই। কুব্জা কেবল আপনাদের পারিবারিক সুখশান্তিই হরণ করে নাই, সীতাহরণের জন্য মূলতঃ সে-ই দায়ী হইলেও সীতাপবাদ শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণগোচর করার অপরাধে আমি বহু নগরবাসীর নিকট, এমন কি স্বগৃহে ঘৃণার্হ হইয়াছি।”

কুশ বলিলেন, “আর্য ভদ্র, আমি সমস্তই বুঝি।

মন্থরার উপর আমিও সন্তুষ্ট নহি। গতকল্য রাত্রে সে আমার প্রাসাদের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা অল্প নহে, আমার মাতাপিতার জীবনে তৎকৃত ক্ষতির তো তুলনাই হয় না। কিন্তু সে তো অল্পবুদ্ধি অদৃষ্টের ক্রীড়নক। দেবকার্য সিদ্ধির জন্য,—রামচরিত্রের মহিমা প্রকাশের জন্য এবং স্ফুরণের জন্য তাহার প্রতিকূলতার প্রয়োজন ছিল। মন্থরা না থাকিলে রাবণবধ হইত না, রামায়ণ লিখিত হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অবিলম্বে বিশাখদত্তের গৃহে যান এবং তাহার নিকট সন্ধান জানিয়া মন্থরাকে ফিরাইয়া আনুন।"

অমাত্য ভদ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি পরমকারুণিক রামচন্দ্রের পুত্রের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। যতদিন না মন্থরাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি ততদিন আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব না। নিত্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই নির্বাসনদণ্ড আমি স্বেচ্ছায় লইলাম।"

কুশ বলিলেন, "আর্য আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা করিতেছেন! মন্থরা হয়তো বিশাখদত্তের গৃহেই কোনো গুপ্ত গৃহে লুকায়িত আছে, এক প্রহরের মধ্যেই আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবেন। বিশাখদত্ত আর আমার বিরুদ্ধতা করিতে সাহসী হইবে মনে হয় না।"

ভদ্র বলিলেন "না মহারাজ, আমি সে বিশ্বাস রাখি না। শিবিকাবাহকদের বিদায় দিবার অব্যবহিত পূর্বে বিশাখদত্ত মৃদুস্বরে যে নির্দেশ দিতেছিল দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে আমি তাহার মধ্যে কয়েকটি শব্দ শুনিয়াছি। 'নদীতীরে বনমধ্যে ভগ্ন দেবীমন্দির পার্শ্বে কূপ' এই কয়েকটা কথা স্পষ্ট আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমার বিশ্বাস পাপিষ্ঠ বিশাখদত্তের ধারণা হইয়াছিল, স্বর্ণসীতার সন্ধানে নগরপাল অযোধ্যানগরীর প্রাসাদ কুটির কূপ সরোবরে সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান চালাইবে, তাহার গৃহও বাদ দিবে না। সেজন্য সে উপস্থিত স্বর্ণসীতা কোন দূরবর্তী লোকালয়-বহির্ভূত স্থানে কূপমধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পাঠাইয়াছে, কারণ সে জানিত, এক বা দুই বৎসর পর আপনার অনুচরেরা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্বর্ণসীতার সন্ধানে বিরত হইবে, তখন এক সুযোগে সে মূর্তিটিকে আবার গোপনে স্বগৃহে লইয়া আসিয়া কোন গুপ্ত কক্ষে রাখিয়া দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এখানে আমার ভয় হইতেছে, পাপিষ্ঠ বিশাখদত্তের অনুচরেরা স্বর্ণসীতাভ্রমে দৃতিমধ্যস্থা মন্থরাকে কূপে না নিক্ষেপ করিয়া থাকে. আমি নারীহত্যার জন্য দায়ী না হইয়া থাকি।"

কুশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নারীহত্যার জন্য দায়ী হইতে কি আপনি এখনও অভ্যস্ত হন নাই ?" ভদ্র লজ্জায় অধোবদন হইলে কুশ অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, 'কিছু মনে করিবেন না, আমরা বোধহয় কেহই কিছুর জন্য দায়ী নহি। যাহা হউক আপনি জীবিতা কিংবা মৃতা মন্থরাকে লইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিবেন আশা করি। আমি বনে পালিত অনভিজ্ঞ যুবক। পিতৃদেবের তিরোধানে রাজ্য বিশৃঙ্খল, অসময়ে আপনার মতো বিচক্ষণ বন্ধুর সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন জানিবেন। উপস্থিত আমার দ্বারা আপনার আর কোনও প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ?"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, দয়া করিয়া আমার পত্নী-কে জানাইবেন গুরুতর রাজকার্যে আমাকে দূরদেশে যাইতে হইতেছে কবে ফিরিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। আমার অনুপস্থিতিতে তাহাদের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য—'

কুশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি গৃহে একবার দেখাও করিয়া যাইবেন না ? তাহাতে ক্ষতি কি ছিল ?"

ভদ্র বলিলেন, মহারাজ, মন্ত্রগুপ্তির জন্য সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন আমি না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি, এখনও হয়তো দ্রুত পৌঁছিতে পারিলে মন্থরার জীবন রক্ষা হইতে পারে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান্।"

কুশ বলিলেন, "আপনি তবে একপল অপেক্ষা করুন, আমি আপনাকে আমার মুদ্রাঙ্কিত একটি অনুমতিপত্র

দিব। সেই পত্র দেখাইলে আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্যের রাজা এবং রাজপুরুষেরা আপনাকে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। উপস্থিত একটি দ্রুতগামী নৌকা লইয়া যাইবেন, প্রয়োজনমতো অর্থ আমার অনুচর আপনাকে এখনই দিয়া যাইতেছে।" কুশ দ্রুতপদে প্রাসাদসোপান আরোহণ করিতে করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আর এক কথা। আমি দুই-চারি দিবসের মধ্যেই কুশাবতীতে ফিরিয়া যাইতেছি। অযোধ্যা হৃদয়বিদারক শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিতা, ইহাকে উদ্ধার করিবার শক্তি আমার নাই। নগরীর ঘরে ঘরে পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্রকন্যা কেহনা-কেহ গতকল্য সরযূসলিলে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট আছে তাহারা আমার সঙ্গে আমার মতো রুদ্ধশোকাগ্নিতে জ্বলিতেছে, আর কিছুদিন এখানে থাকিলে উন্মাদ হইয়া যাইবে। আমি অবিলম্বে নগর-বাসী সকলকে জানাইয়া দিতেছি, যাহার ইচ্ছা নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমার অনুগমন করিতে পারে। চতুর্দিকের সহস্রস্মৃতিপূর্ণ রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ হইতে নূতন রাজ্যে গিয়া শান্তি পাইতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি সপ্তাহকাল পরে আসিলে হয়তো দেখিবেন, পরিত্যক্তা নগরীতে জনপ্রাণী নাই। সুতরাং আপনার পত্নীপুত্রের যাত্রার আয়োজন না করিয়া দিয়া আপনার অযোধ্যা ত্যাগ করা এসময়ে সমীচীন হইবে না। মন্থরার যাহা হইবার এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস; সেই পাপীয়সীর জীবন সহজে যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহার জন্য আপনি আপনার আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করিলে ধর্মে পতিত হইবেন।"

ভদ্র নৃপতির বাক্যে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন। তখন কুশ বলিলেন, "আমি আপনার প্রভুপুত্র। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও আশা করি আমার আদেশ অমান্য করিবেন না?"

ভদ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "উপস্থিত আপনিই আমার অন্নদাতা এবং প্রভু। আপনার কি আদেশ বলুন?"

কুশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার আত্মীয় পরিজন সকলকে সঙ্গে লইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আমার সঙ্গে কুশাবতীতে গমন করিবেন। সেখানে তাহাদের বাসগৃহের সুব্যবস্থা করিয়া আপনি মন্থরার সন্ধানে গমন করিবেন।"

ভদ্র করপুটে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য করিলাম। তবে কি মন্থরাকে পাইলে কুশাবতীতেই লইয়া যাইব?"

কুশ বলিলেন, "হ্যাঁ। তৎপূর্বে আমাকে সংবাদ দিবার জন্য আমার কুশাবতী প্রাসাদশিখরে প্রতিপালিত কয়েকটি সংবাদবাহী পারাবত আপনার সঙ্গে দিব। আপনার সাফল্যের সংবাদের জন্য আমি উৎকণ্ঠিত থাকিব বুঝিতেই পারিতেছেন।"

অমাত্য ভদ্র নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। নিজ গৃহের দ্বারদেশ উন্মুক্তই ছিল, তিনি দ্বিতলে উঠিয়া সেই অবস্থাতেই শয্যার আশ্রয় লইলেন। সুতপা পূর্বরাত্রে স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দিয়া অনুতপ্তা ছিলেন, তাঁহার সাড়া পাইয়া একটি রৌপ্যপাত্রে কিছু আহার্য সামগ্রী লইয়া আসিয়া দেখিলেন, তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি নীরবে শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

বিস্মৃত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান যুবক ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উদাত্ত-স্বরে ঘোষণা করেন—"যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বিপ্লবের প্রথম আচার্য্য আদি প্রবর্ত্তক।" সেই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথকেই আমরা আজ ভুলিতে বসিয়াছি। এমনই আত্ম-বিস্মৃত জাতি আমরা। তাঁহারই বিস্ময়কর জীবনকাহিনী বলিতে চেষ্টা করিব।

কার্য্য-মাত্রেরই একটি বিশেষ কারণ থাকে। প্রতি পরিবর্তনের পূর্ব্বে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ দেখা দিবার পূর্ব্বেও সেইরূপ একটি প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যায়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় "আত্মীয়সভা" প্রতিষ্টিত করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পান। দেশের কুসংস্কারগুলও দূর করিতে নিযুক্ত হন।

তাঁহার উত্তরসূরী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮.৯ খৃষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভার সদস্য হন সে যুগের গুণীজ্ঞানী অনেকেই—চন্দ্রশেখর দেব, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয়-কুমার দত্ত প্রভৃতি। সেই সভা হইতেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়া দেশে নবযুগের প্রবর্তন করে; এবং নূতনতর চিন্তার খোরাক যোগাইতে থাকে।

এই যুগেই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও অনুশীলন তত্ত্ব' দেশবাসীদিগকে দেশ হিতৈষণার প্রেরণা যোগায়। নব-গোপাল মিত্রের হিন্দু মেলা স্বাদেশিকতা প্রচারে প্রভৃত সাহায্য করে, যুবকদিগকে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চায় উৎসাহ দেয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তাঁহাদের এক পয়সা মূল্যের "সুলভ সমাচারের" ভিতর দিয়া রাজ-নৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুরে "গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক স্থানে উহার শাখা-প্রশাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশত্ব বোধ সৃষ্টির আয়োজনও আরম্ভ হয়।

এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে বর্দ্ধমান জেলার চান্না গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে .৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর, বাংলা ১২৮৪ সালের ৪ঠা আশ্বিন, বুধবার যতীন্দ্রনাথের জন্ম। সকল জাতির বাস থাকিলেও এই গ্রামে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ছিল। অনেকগুলি টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। যতীন্দ্রনাথের পিতা কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত অধ্যাপকের সন্তান হইয়াও ইংরেজী পড়িয়া কোর্টের সেরেস্তাদারের চাকুরী গ্রহণ করেন। বংশগত সংস্কারের ফলে সংস্কৃতচর্চ্চা একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই। অবসর মত বেদান্ত, উপনিষদাদি পড়িতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীশ্রী-চণ্ডী পাঠ করিতেন। জ্ঞানবাদী হইয়াও তিনি ভক্তি-মার্গের লোক ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের মাতা বিদুষী না হইলেও বিশেষ বুদ্ধিমতী ও সন্তানবৎসলা ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের একটি মাত্র পুত্র। আর একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়া শৈশবেই মারা যায়। কন্যা দুইটি—সুশীলা ও রাণী।

যতীন্দ্রনাথদের খড়ে-ছাওয়া দোতলা মাটির বাড়ী, প্রশস্ত উঠান। বাড়ীতে কুন্দী নামে একটা গাই-গোরু ছিল। তাহার দুধ পান করিয়াই যতীন্দ্রনাথ বড় হন। কুন্দী যতীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। কুন্দীও যতীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভালবাসত। কুন্দীর মৃত্যুর পর বাড়ীর সম্মুখের পথের অপর পারে তাহার সমাধি দেওয়া হয়। সমাধি-স্থানটি সিমেন্ট বাঁধান ও রেলিং দিয়া ঘেরা আছে,—যতীন্দ্র-নাথের পশুপ্রীতির নিদর্শন।

যতীন্দ্রনাথ সুপুরুষ ছিলেন। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষপট, বৃষস্কন্ধ আজানুলম্বিত বাহু, আয়ত নেত্র, গৌর-বর্ণ।

কর্ম্ম ব্যপদেশে যতীন্দ্রনাথের পিতাকে অনেক সময় বিদেশে থাকিতে হইত। মায়ের কাছেই মানুষ হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ কৈশোরে বিশেষ দুরন্ত হইয়া উঠেন। লেখা-পড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। খেলাধুলা মারামারি ও দল গঠনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম খেলা ছিল ডাণ্ডাগুলি ও হা-ডু-ডু। বৈদেশিক কোন খেলাই তাঁহার পছন্দ হইত না। খেলায় তাঁহার আজীবন বিশেষ ঝোঁক ছিল। সন্ন্যাস জীবনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরও সাঁওতাল বালকদিগের সহিত তাঁহাকে মাঝে মাঝে খেলিতে দেখা যাইত।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। এগার বৎসর বয়সে এক ভুতুড়ে বাগানে গভীর রাত্রে ভূত ধরিতে যান। ভূতের দেখা না পাইয়া দুঃখিত মনে ফিরিয়া আসিয়া বলেন—ভূত একটা পেলে নিশ্চয়ই ধরে আনতেম।" তখনই ভূত শব্দটির এরূপ ব্যাখ্যা করেন—"ভূত মানে অতীত,যাহা চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে নাই। সুতরাং ভূত নাই, থাকিতে পারে না। অতীত কি কখনও বর্ত্তমানে থাকিতে পারে?" এই সময়েই পাড়ার চাটুয্যে মহাশয়দের বাগানের সব কাঁচা আম পাড়িয়া আনেন—তাঁহাদের উপর রাগ করিয়াই। সংস্কারমুক্ত ছিলেন তিনি ছোট-বেলা থেকেই। পরোপকারেও ব্রতী ছিলেন। ডোমেদের মরা পুড়াইয়া আসিয়া তিরস্কৃত হইলে বলিতেন, "মড়ার আবার জাত কি?"

গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁহার পড়াশুনা আরম্ভ হয়। তাহার পর বর্দ্ধমানরাজ স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলের "বোর্ডিং-এই থাকার ব্যবস্থা হয়। পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগী না হইলেও স্বভাবচরিত্র, খেলাধুলায়ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য তিনি শিক্ষক মহাশয়দিকের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠেন। বাড়ীতেই ভূরিভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন। একটি কাঁঠাল একলাই খাইয়া ফেলিতেন। বোর্ডিং-এ আসিয়াও সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। স্কুলের বোর্ডিং সুপারিনটেনডেন্ট নবান্ন উপলক্ষে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য এক কাঁদি কলা, এক হাঁড়ি ক্ষীর, ও এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ একাকীই জিনিসগুলি সব খাইয়া ফেলেন। এই জন্য তাঁহার মা বলিতেন, যতীন আমাদের মধ্যম পাণ্ডব।"

যতীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও মাতৃভক্তি প্রবলা ছিল। নিজে কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না, কেহ মিথ্যা বলিলে তাহাও সহ্য করিতে পারিতেন না। সাধারণ লোকমত এবং জনশ্রুতিতে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। বিচারে উহার সত্যতা প্রমাণিত হইলে তবে তাহা বিশ্বাস করিতেন।

এক সময় চান্না গ্রামের নিকট এক সাধু আসিয়া আসন করেন। তিনি অসীম শক্তিমান্, বন্দুকের গুলিও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, এরূপ কিংবদন্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। যতীন্দ্রনাথের পিতা এক দিন পুত্রকে লইয়া সাধুর কাছে যান, উদ্দেশ্য সাধুর আশীর্ব্বাদে তাঁহার পুত্র যদি সুমতি হয় এবং লেখা পড়ায় মন দেয়। যতীন্দ্রনাথ এদিকে পিতার অগোচরে তাঁহার পিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যান, ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখা, সাধুর শরীর সত্যই অচ্ছেদ্য অভেদ্য কি না। পিস্তল দেখিয়া সাধুটি আত্মার অমরত্বই ব্যাখ্যা করিলেন। যতীন্দ্রনাথ তখন শান্ত হইয়া পিস্তল ব্যবহারে বিরত হন।

বাড়ী ফিরিয়া গ্রামের অধ্যাপকদিগের নিকট গিয়া যতীন্দ্রনাথ জানিয়া আসেন, আত্মার অমরত্ব কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, এবং উহা বিচারসহ কি না। সাধুর কথা শুনিয়াও তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

বর্দ্ধমানরাজ স্কুল হইতে যতীন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা, পুত্র সংস্কৃত পড়ুক। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার মাকে গিয়া বলিলেন—টোলে পড়ে টুলো পণ্ডিত হতে চাই না, মা। ইংরেজীটাই বেশী করে শিখতে হবে। কলেজে পড়ব আমি। ইংরেজী শিখে ইংরেজকেই বুঝিয়ে দিতে হবে, এ দেশে শাসন ও শোষণ আর চলবে না। ওদের ভাষাতেই এ কথা বুঝাতে হবে, না হলে বুঝবে কেন?

কালীপদবাবু তখন যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেটের পেশকার ছিলেন। পরীক্ষার পর যতীন্দ্রনাথ একাকীই তাঁহার নিকট যাইবার সময় শিয়ালদহ স্টেশনে আরোহীবিহীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তৃতীয় শ্রেনীর একটী গাড়ীতে উঠিয়া বসলেন। কিছুক্ষণ পরেই কোটপ্যান্টধারী এক ফিরিঙ্গী সাহেব সেই গাড়ীতে উঠিয়াই যতীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"নেমে যাও, না হলে লাথি মেরে বের করে দেব।" যতীনও আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার রুদ্রমূর্ত্তি ও সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া সাহেব ভীত হইলেন, এবং নীরবে এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেই গাড়ীতেই বসিয়া রহিল।

সাহেবটির এরূপ অভদ্র ব্যবহার যতীন্দ্রনাথের মনে দাগ কাটিয়া গেল। যশোহরে কিছুদিন থাকিয়া পিতার কার্যে কিছু সাহায্য করিতে গিয়া বৃটিশের শাসনপ্রণালী তাঁহার লক্ষ্যপথে আসিল। বাড়ী ফিরিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাস পাঠে মন দিলেন। এই সময় স্বামী অভেদানন্দের India and Her People, রমেশ দত্তের Economic History of India, মেজর বি ডি বসুর Rise of Christian Power in India, Ruin of Arts and Industries of India, Education during the East India Company প্রভৃতি পুস্তক যতীন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া পড়া বিশেষ বিচিত্র নয়।

কলেজে পড়াইবার প্রশ্ন উঠিলে, কোথায় কি করিয়া পড়ান যাইবে পিতামাতার মনে সে চিন্তাও জাগিল কারণ তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না যতীন্দ্রনাথের এক মামা এলাহাবাদে রেলওয়ে অফি[illegible] চাকুরী করিতেন। পড়াশুনা করিবার জন্য তাঁহাকে সেখানে পাঠানো স্থির হইল। মামার অবস্থাও বিশে[illegible] ভাল ছিল না। তিনি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ধরিয়া বলিলে[illegible] তাঁদের ভাগিনেয়ের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া দিবা[illegible] জন্য। কায়স্থ পাঠশালা নামে পাঠশালা হইলেও উহ[illegible] একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল।

রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথকে নিজের বাড়ীতেই আশ্র[illegible] দিলেন। এবং কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভ[illegible] করিয়াও লইলেন।

কলেজে ভর্তি হইবার সময় রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথে[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন—"কলেজে পড়িতে চাও কেন সরকারী চাকুরী করিবে?"

যতীন্দ্রনাথ সবিনয়ে উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে [illegible] স্যার, গোলামী করিব না। যাহারা আমাদিগকে গোল[illegible] করিয়া রাখিতে চায়, তাহাদিগকে গোলামী করাইব জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাই। ইংরেজ সরকার[illegible] চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চাই, তাহাদে[illegible] অত্যাচার কিরূপ চরমে উঠিতেছে। ইহারই [illegible] প্রয়োজন ভাল ইংরেজী শিখা। তাহাদের ভাষা আ[illegible] করা।"

রামানন্দবাবু বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞা[illegible] করিলেন—"পারিবে তো?"

যতীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"চেষ্টা করিয়া দেখি দোষ কি?"

রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথকে নিজ গৃহে আশ্রয় দি[illegible]

এবং কলেজে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। উঁহার অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তিগুলির স্ফুরণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্রনাথকে প্রথমেই পড়াইলেন—ভারতে ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি। শাসন বনাম শোষণ নীতি। তাহার পর ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত, খণ্ডবিখণ্ড ইটালী কি করিয়া অখণ্ড ইটালীতে পরিণত হইল তাহাও রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিতে ভুলিলেন না। সিপাহী বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, এবং উহাদের নিষ্ফলতার কারণও সম্যক্‌ আলোচনা করিলেন। তাঁতিয়া টোপীর রণচাতুর্য্য, নানাসাহেব, প্রতাপাদিত্য, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর দৃঢ়তা ও অমনণীয় মনোভাব, রাণা প্রতাপের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, বাদলের বীরত্ব, শিবাজীর রণকৌশল ও সংগঠনশীলতার আলোচনা কালে মুগ্ধ যতীন্দ্রনাথের বীরহৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের পথনির্দেশ তখনই তিনি পাইয়া গেলেন।

ছোটখাট ছুটিতে রামানন্দবাবু যতীন্দ্রকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বেড়াইতে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে পশ্চিম দেশের গ্রাম্য জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং গ্রাম্য হিন্দী ভাষা শিক্ষা লাভ হইল। বাংলা দেশের দারিদ্র্যপীড়িত পল্লীজীবনের সহিত যতীন্দ্রনাথের ইতঃপূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। মনে হয়—দেশের দারিদ্র্য, এবং সাধারণ মানুষের দুরবস্থা দূর করিবার সংকল্প এই সময় হইতেই তাঁহার মনে জাগে।

শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বিশঙ্ক সাংবাদিক হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে কতটা দেশপ্রেমিক, দেশের প্রকৃত হিতসাধনে কিরূপ দৃঢ়সংকল্প ছিলেন তাহা যতীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও বুঝা যায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার অপূর্ব্ব সখ্যে, এবং নিবেদিতার উদ্দীপনাময় রচনা তাঁহার মডার্ণ রিভিউ (Modern Review) পত্রিকায় প্রকাশ করায় রামানন্দবাবুর জীবনের এই দিকটা গবেষণার যোগ্য মনে করা অযৌক্তিক নয়।

দুই বৎসর পরে "এফ্‌-এ" পাশ করিয়া যতীন্দ্রনাথ নিজ জন্মভূমি চান্না গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন সুস্থ সবল দেহ, এবং নানাবিধ জ্ঞানে ভরা মন লইয়া। বাঙ্গালীর সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, যতীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব উঠিল। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার মাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়া দিলেন—তিনি বিবাহ করিবেন না। মায়ের যুক্তিতর্ক ও অনুরোধে যতীন্দ্রের সে সংকল্প শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। বৈঁচ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে আবার পড়াশুনার কথা চলিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বলিয়া বসিলেন—তিনি আর কেতাবী লেখাপড়া করিবেন না। শিক্ষায়তন-গুলি ইংরেজ জাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোলাম তৈয়ারীর কারখানা মাত্র। উহাদের দরকার মত শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সেখানে। "আমার যেটুকু দরকার তাহা আমি শিখিয়াছি। এখন যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে চাই।"

সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী বলিয়া কোথাও কোন স্থান পাইলেন না। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে নিষিদ্ধ। দেশীয় রাজ্যগুলি ঘুরিয়াও কোন ফল হইল না। তাহাতেও তিনি উদ্যম ছাড়িলেন না। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল রাজ্যে গিয়া বিদ্রোহী ভীল দিগের দ্বারা আক্রান্ত হন। ভীল সর্দার ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাঁ হাতখানি ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে ভরতপুর রাজ্যে আসিয়া এক বাঙ্গালী মোহন্তের মঠে আশ্রয় লন। যতীন্দ্রনাথের সংকল্প শুনিয়া মোহন্তমহারাজ পরামর্শ দিলেন—তিনি যেন বরোদার মহারাজের খাস সচিব (Private Secretary) ও বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সহিত দেখা করেন। তিনি চেষ্টা করিলে বরোদারাজ্যের সৈন্য

দলে প্রবেশের সুযোগ করিয়া দিতে পারেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার মহারাজ শ্রীঅরবিন্দকে ইংল্যাণ্ড হইতে খাস সচিব করিয়া ভারতে লইয়া আসেন।

মোহন্ত মহারাজ আরও বলিয়া দিলেন—সেনাদলে প্রবেশ করাই যখন তাঁহার উদ্দেশ্য তখন তিনি যেন সেখানে বাঙ্গালী বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। তদনুসারে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় গিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত দেখা করেন, এবং তাঁহারই সাহায্যে বরোদারাজ্যের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। বলাবাহুল্য যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিয়া অবাঙ্গালীর বেশে যতীন্দ্রনাথ শারীরিক পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষার সাফল্য দেখিয়া পরীক্ষক মণ্ডলী বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং সাধারণ সৈন্য অপেক্ষা আরও উচ্চতর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চান, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সে পদ গ্রহণ না করিয়া গোড়া হইতেই সকল কাজকর্ম্ম শিখিতে মনস্থ করেন।

তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, সৈনিকেরাও সন্ন্যাসী; কারণ তাহারা পরহিতার্থেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি।

অতি দ্রুতগতিতে সকল প্রকার রণকৌশল একটির পর একটি আয়ত্ত করিয়া তিনি দুই-হাজারী মনসব্দার পদে উন্নীত হইয়া মহারাজের বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নিযুক্ত হয়।

আর একজন বাঙ্গালী ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার অভিলাষে কয়েকজন বন্ধুর সহিত গোয়ালিয়র রাজ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি স্বনামধন্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইঁহার জীবন কাহিনী লিখিয়া প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৭২ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

বরোদায় থাকিতেই শ্রীঅরবিন্দের সহিত যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। সেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ হৃদ্যতায় পরিণত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি, সেই কংগ্রেসে কেবল আবেদন নিবেদনের পালা চলিত। যতীন্দ্রনাথের উহা মনঃপূত হইত না। বয়সে কয়েক বৎসরের ছোট হইলেও যতীন্দ্রনাথই শ্রীঅরবিন্দকে সক্রিয় রাজনীতিতে টানিয়া আনেন। তাহার ফলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের "ইন্দুভূষণ" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ একটি প্রবন্ধে লিখিলেন—"কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন মুষ্টিমেয় কয়জন শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই হইয়া থাকে। কোটি কোটি দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণের তাহাতে কোন উপকারই হয় না। সুতরাং এরূপ আন্দোলন করা উচিত যাহাতে দরিদ্র অশিক্ষিত ইংরাজ প্রভূদেরও সাধারণ লোকের উপকার হয়, এবং চৈতন্যের উদয় হয়।

ঠিক এই সময়েই "বিশ্ববিবেক" বিবেকানন্দ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম্ম সভায় উদাত্তকণ্ঠে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন ; ভারতবাসীদিগকেও আহ্বান করিয়া বলেন—"শক্তিমান্ হও, পৌরুষ লাভ কর, দরিদ্র সাধারণকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর।" ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও এই সভায় ভারতের প্রতিনিধিরূপে—"এশিয়ার নিকট সমগ্র জগৎ কতটা ঋণী" সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলেন।

দেশের এইরূপ পরিস্থিতিতে যতীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে বরোদায় 'তরুণ সঙ্ঘ'র সৃষ্টি। ওদিকে মহারাষ্ট্রে জাতীয় জাগরণের পুরোধা বালগঙ্গাধর তিলকের নির্দেশে পুনায় 'হিন্দুধর্ম সঙ্ঘ' বরোদার তরুণ সঙ্ঘের সহিত মিলিত হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুইটি সম্মিলিত গুপ্ত সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। সমিতির লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব, এবং আনন্দমঠ বিপ্লবীদিগের শিক্ষার আদর্শ। কর্মপ্রণালীর সূচিতে 'সন্তান-এর ব্রতগ্রহণ, ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হইল। আরও স্থির হইল ভবানী পূজা ও ভবানী স্তব সারা ভারতবর্ষে প্রচার করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা লিখিয়া প্রকাশ করিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিলেন, সঙ্গে আনিলেন শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে সরলা

দেবীর নামে একখানি পরিচয়পত্র, এবং কিছুসংখ্যক 'ভবানী মন্দির।'

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী। তিনি অল্প বয়স হইতেই দেশের বালক-বালিকাদিগকে সুস্থ সবল ও সাহসী করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণান্তর "বীরাষ্টমী ব্রত" প্রবর্তন করেন। শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী পুজার দিন প্রতি বৎসর এই ব্রত-উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হয়। সেদিন ছেলেমেয়েরা স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া নানাবিধ ব্যায়াম-কৌশল, লাঠি ছুরি ও তরবারি খেলা দেখাইতে থাকে।

এই সময় বাঙ্গলা দেশে অনেক ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর সার্কাসও গড়িয়া ওঠে। কলিকাতা ঠনঠনিয়ার বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের উৎসাহী যুবক সতীশ-চন্দ্র বসু জেনারেল এসেমব্লী কলেজে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) জিম্‌ন্যাষ্টিকের এক আখড়া খুলিলেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ওয়ান (Wann) সাহেব তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনই এই আখড়ার উদ্দেশ্য হইল।

কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যখন লাঠি খেলা শিখার অনুমতি পাওয়া গেল না, তখন সতীশবাবু হেদুয়ার (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) সন্নিকটে মদন মিত্রের লেনে ছোট লাঠি খেলার আখড়াখুলিয়া দিলেন। তাহার পাশেই একটি ঘরে 'আপিস' বসিল, পরম বিদ্যোৎসাহী গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের (New Indian School) প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই ব্যায়াম সমিতির নামকরণ করিলেন—"ভারতীয় অনুশীলন সমিতি"। সতীশবাবু মহা উৎসাহে কাজ করিয়া চলিলেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, এবং আরও অনেক অভিজ্ঞ কর্তা ব্যক্তি ও নেতৃস্থানীয় মনীষীদিগের নিকট হইতে যুক্তিপরামর্শ ও উপদেশ লইতে লাগিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ, ১৩০৮ সালের দোল পূর্ণিমার দিন, ১০ই চৈত্র সোমবার, "ভারতীয় অনুশীলন সমিতি"র জন্ম।

সকলের শ্রদ্ধাভাজন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম জীবনে শিক্ষাব্রতী হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গঠনকালে উহার প্রথম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এরূপ সৎ, সহানুভূতিশীল ও সংগঠক শিক্ষক সে যুগে বিরল ছিল। তাঁহার ভিতর ও বাহিরে সবই ছিল সুন্দর।

কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সোদপুর। তন্নিকটবর্ত্তী তেঘরার শশীভূষণ চৌধুরী একদিন সতীশবাবুকে ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর নিকট লইয়া গেলেন। সমিতির উদ্দেশ্য শুনিয়া আশু চৌধুরী মহাশয় সতীশবাবুকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া পরিচয় পত্রসহ তাঁহাকে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রমথনাথ মিত্র পি. মিত্র নামেই বিশেষ পরিচিত। মিত্র মহাশয়ের বাড়ী নৈহাটী কাঁঠালপাড়ায়। তিনি দেশমাতার পায়ের শিকল কাটিবার প্রেরণা পান স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট।

সরলাদেবীর মাধ্যমে পি. মিত্রের সহিত যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। মিত্র মহাশয় সতীশবাবুর সহিত যতীন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দেন। তখন স্থির হয় যতীন্দ্রনাথ কিশোর ও যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবেন। অনুশীলন সমিতির ব্যায়ামাগার সে সময় ছিল মদন মিত্র লেনে। সুকিয়া ষ্ট্রীটে,-বর্তমান কৈলাস বসু ষ্ট্রীট,—থানার নিকট ১০৮নং আপার সার্কুলার রোডেও (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) আর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। এই বাড়ীতে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের ব্যায়াম অভ্যাস করান এবং বিপ্লবাত্মক কাজ শেখান হইত। মদন মিত্র লেনে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রহিল।

যতীন্দ্রনাথের বরোদার দলের সহিত ভারতীয় অনুশীলন সমিতির মিলন ঘটিলে, উভয়ে মিলিয়া "অনুশীলন সমিতি" নাম গ্রহণ করিল। "ভারতীয়" কথাটি তুলিয়া দিল। এই সংযুক্ত দলের সভাপতি হইলেন পি. মিত্র;

সহকারী সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, ও অরবিন্দ ঘোষ; এবং কোষাধ্যক্ষ হইলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দলে নূতন যোগ দিলেন ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ হালদার।

সম্মিলিত সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি হইল। (১) আভ্যন্তরিক বিভাগ (inner circle) ও বহির্বিভাগ (outer circle)। আভ্যন্তরিক বিভাগে চলিল গুপ্তসমিতির কার্য্যাবলী, এবং বহির্বিভাগে চলিল অনুশীলন সমিতির কর্ম্মগুলি।

শিক্ষার বিষয় স্থির হইল—ডন, বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, ডম্বল সাহায্যে ব্যায়াম, যুযুৎসু, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি ও ছুরি খেলা, অসিচালনা, বন্দুক ও পিস্তলের ব্যবহার।

প্রতি সদস্যকে এমনভাবে শিখান হইতে লাগিল যাহাতে তাহারা সকলে পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী ও নিয়মানুবর্ত্তী হয়। সকল শ্রেণীর কাজই যাহাতে ঠিক সময় নিখুঁতভাবে করিতে পারে। যত সামান্য কাজ হউক না কেন তাহা যেন সযত্নে করে।

মানসিক স্বাস্থ্যোৎকর্ষের জন্য নিয়মিতভাবে পড়ান হইতে লাগিল—স্বদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, দেশবিদেশের বীরচরিতমালা, স্বাধীনতা যজ্ঞের হোতাদিগের জীবনকাহিনী। সম্মুখে আদর্শ ধরা হইল শিবাজী, রাণা প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুর-এর জীবনব্রত। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব, অনুশীলন তত্ত্ব, রমেশ দত্তের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, টডের রাজস্থান, ফ্রান্স ও ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, এবং রাশিয়ার নিহিলিষ্ট রহস্য আবশ্যক পাঠ স্থির হইল। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, রণনীতি, ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইবারও ব্যবস্থা রহিল।

সর্ব্বোপরি স্থান দেওয়া হইল নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপর। তাহার নিমিত্ত বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ এবং সংযম শিক্ষা পড়ান চলিল। জাতীয় সংস্কৃতির সহিত সংযোগ রাখিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদাদি পড়াইবারও ব্যবস্থা রহিল। মেলা, যোগস্নান, ও বড় বড় জাতীয় উৎসবে জনসাধারণের যাহাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইল। আনন্দের জন্য খেলাধূলারও ব্যবস্থা বাদ পড়িল না।

উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব হইল না। সখারাম গণেশ দেউস্কর রাজনীতি, অর্থনীতি ও জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় শিখাইতে লাগিলেন। শৈলেন্দ্র মিত্র শিখাইতে লাগিলেন বড় লাঠিখেলা। যতীন্দ্রনাথ ভার লইলেন ঘোড়ায় চড়া ও ছোরা, তরোয়াল, বন্দুক, পিস্তলের ব্যবহার শিক্ষা দিবার। ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি Riding clubএরও সৃষ্টি হইল।

অনুশীলন সমিতিতে বালক ও যুবকদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইত। নিজের রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত। উহাতে মন্ত্রগুপ্তি এবং বিনা বিচারে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিবার কথা থাকিত।

সমিতি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে থাকিলে তাহার উচ্চ আদর্শে জনসাধারণ আকৃষ্ট হইল। যুবকেরা দলে দলে আসিয়া যোগ দিল। তখন উহার সম্প্রসারণের প্রয়োজন বোধ হইল। কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, হরিপাল প্রভৃতি স্থানে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বরাহনগরে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল কুঠিঘাট রোডে, বর্ত্তমান ১৩ নং বটকৃষ্ণ মৈত্র রোড যে স্থানে বরাহনগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বাড়ী উঠিয়াছে, সেইস্থানে ভুবনদত্ত মহাশয়ের একটি অব্যবহার্য বাড়ীতে বাড়ীর সংলগ্ন একটু ফাঁকা জায়গাও ছিল। নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই এই শাখা সমিতির প্রাণ ছিলেন। পরে উহা বাজাল মাঠে উঠিয়া যায়। বাজাল বাগান ছিল বর্ত্তমান অতুল কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি লেনে শিবরাম সার্ব্বভৌম প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সন্নিকটে। অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র হইতে প্রথমে কোন লোক না আসায় নগেন্দ্রবাবুই লাঠি খেলা শিখাইতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গাল বাগানে গিয়া অস্ত্র ব্যবস্থা হয়।

নগেন্দ্রবাবুর সহকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বসু (নাড়ুবাবু), মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বসু, তারাভূষণ ভট্টচার্য প্রভৃতি। উত্তর বরাহনগরে বা আলমবাজারে সংগঠক ছিলেন তুলসীদাস ঘোষ। নাড়ুবাবু ও কেশববাবু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অনুশীলন সমিতি সন্ত্রাসবাদ গ্রহণ করিলে তাঁহারাই দুইজন প্রথমে বোমা তৈয়ারী, এবং তৈয়ারী বোমা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

বরাহনগর ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের ঠিক সম্মুখের রাস্তার অপর পারে একটি পুরাতন বাড়ীতে এক নিম গাছের তলায় মাটির ভিতর গর্ত্ত করিয়া বোমা রাখা হইত। বাড়ীটি উত্তর বাংলার কোন এক জমিদারের ছিল। পালপাড়ার মধ্যেও বোমা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় ইঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই দলে পরে যোগ দেন এবং সন্ত্রাসবাদের একজন প্রধান কর্মী হইয়া উঠেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেকগুলি কিশোর ও যুবক কাজ করিত। শুনা যায়, পরিশেষে কয়েকজনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রায় সকলেই ধরা পড়েন, এবং শাস্তি ভোগ করেন।

বালীতে রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরে অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ ও জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এবং হরিপাল ও তারকেশ্বর ডাক্তার আশুতোষ দাস শাখা-সমিতিগুলি পরিচালনা করেন।

প্রচারের উদ্দেশ্যে চন্দননগরে গিয়া যতীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মতিবাবু বলিলেন—বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতির সহিত অর্থ-নৈতিক কার্যপ্রণালীও গ্রহণ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে যাহাতে কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই নিজ নিজ কাজ করিয়া দুই মুঠা অন্ন সংস্থান করিতে পারে। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া কয়েকজন কর্ম্মিষ্ঠ কিশোর বালক মিলিল। তাহাদের লইয়া গঠিত হইল "সুহৃৎ সমিতি"। এই দলে রাসবিহারী বসু ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার বয়স ছিল তখন পনেরো বৎসর মাত্র। এই রাসবিহারী বসুই জাপানে পলাইয়া গিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইনিই ইণ্ডিয়া লীগের প্রতিষ্ঠাতা, এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম সভাপতি।

অতঃপর মেদিনীপুরে প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল। হেমচন্দ্র কানুনগো, এবং স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু যতীন্দ্র-নাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সত্যেন্দ্রনাথ বসুই কানাইলালের সহিত একযোগে আলিপুর জেলের মধ্যে সরকারী সাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে গুলি করিয়া হত্যা করেন।

তাহার পরে দলে যোগ দিলেন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীই সর্বপ্রথম বোমার আঘাতে মজঃফরপুরে নরহত্যা করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরে গড়িয়া উঠিল 'তরুণ সঙ্ঘ' 'ভবানী মন্দির' প্রভৃতি গুপ্ত সমিতিগুলি। সত্যেন্দ্র নাথের উপর ভার দিয়া যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাহার পরেই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মেদিনীপুরে গিয়া কয়েকটি উত্তেজক বক্তৃতা দিয়া আসেন। তাহার ফলে মিঞা বাজারের প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুল কাদের সাহেবের বাড়ী ভাড়া লইয়া আরও একটি আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও ছেলেদের সকলপ্রকার বৈপ্লবিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইল।

পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গলায় প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইলে

ঢাকায় গেলেন পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল। সেখানেও অনুশীলন সমিতি গড়িয়া উঠিল। বিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিন দাসের উপর সমিতি সংগঠনের ভার পড়িল। তিনি মিত্র সাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঢাকা অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির প্রায় ছয়শত শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলি সুপরিচালনে যত্নবান্ হন।

এই ভাবেই বরিশালে "স্বদেশ বান্ধব সমিতি", এবং ফরিদপুরে 'ব্রতী সমিতি" স্থাপিত হয়। নামে বিভিন্ন হইলেও সকলগুলির উদ্দেশ্য এক—বিপ্লব প্রচার ও কিশোর ও যুবকদিগের শরীর ও মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন। বরিশালের সমিতিগুলির নৈতিক শিক্ষার ভার লইলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উত্তর বঙ্গের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমনাথ মিত্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন যতীন্দ্রনাথ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচারে বাহির হইলেন। বহরমপুরে স্থাপিত হইল "ব্যায়াম সমিতি"। ব্যায়ামকুশলী ভোলানাথ পাঠক ইহার ভার লইলেন, এবং ইহার অনেকগুলি শাখাও প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অনুশীলন সমিতির রীতিনীতি, কর্ম্মপদ্ধতি ও অগ্রগতির সকল বিষয়ই শ্রীঅরবিন্দকে জানান হইত। তিনি ইতিমধ্যে একবার বরোদা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়া সমিতির কাজকর্ম্ম দেখিয়া যান।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা হয়। এই স্থানেই ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাঘাযতীন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলন ঘটে। তাঁহারাও গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন।

মিত্র মহাশয়ের সহিত দীক্ষা লইয়া বারীন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া গেলেন, এবং সমিতির সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই দেবব্রত বসু, এবং স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তসমিতির সদস্য হন।

কলিকাতায় জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে, শিবমন্দিরের আঙ্গিনায় অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় যুবকেরা ঐ স্থানে আসিয়া ব্যায়াম করিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথও এই আখড়ায় যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ সমিতির জন্য গান লিখিয়া স্বয়ং সমিতিতে আসিয়া সেই সকল গান গাহিয়া সদস্যদিগকে শুনাইতেন, যাহাতে তাহারা ঠিক সুরে গানগুলি গাহিতে পারে।

বারীন্দ্রনাথ ঘোষ সমিতিতে যোগ দিবার পর প্রচার পত্রের প্রয়োজন অনুভূত হইল। তখন বিপ্লবী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী "পিপল্ এণ্ড প্রতিবেশী"—(People & Pratibeshi"—মাসিক পত্র প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক সংবাদ পত্র "সন্ধ্যা" বাহির হইল। বরিশাল হইতে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা "নবশক্তি" পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজীতে "নিউ ইণ্ডিয়া" (New India) পত্রিকা বাহির করিলেন যতীন্দ্রনাথ "ভারতী" পত্রিকায় ইতালীর বিপ্লববাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।

সভাসমিতিও হইতে লাগিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগ্মী-প্রবর বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতায় দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। বরিশালের সুকবি ও সুগায়ক মুকুন্দদাস দেশাত্মবোধক নাটক লিখিয়া গ্রামে গ্রামে যাত্রা গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট হইতেই তিনি এই প্রেরণা পান।

শিক্ষিত যুবকেরা গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে চাকুরী লইয়া কিশোর ও যুবকদিগের মধ্যে বিপ্লব বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন ২৪পরগনা আড়বেলিয়া গ্রামের ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া অনুশীলন সমিতির সদস্য সংগ্রহে মন দিলেন। সেখানে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার মিলন ঘটিল—যেন সোনায় সোহাগা।

সুরেন্দ্রনাথ সেন তখন কিশোরগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১৩১২ সালের ১৩ই শ্রাবণ, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুবার্ষিকী সভায় উদ্যোগ করিলেন। সেই সভায় উপস্থিত হইলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, আরও অনেক সুবক্তা ও নিপুণ কর্মী। আমেরিকার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সুরেন সেন বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম হইল "ফার্স্ট বয়কটার"।

তাহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, ১৩১২ সালের ২২শে শ্রাবণ, কলিকাতার টাউনহলে বিরাট সভা আহূত হইল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাঙ্গলার সমস্ত রাজা মহারাজা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন রাসবিহারী ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতির সদস্যদিগকে লইয়া সেই সভায় থাকিয়া সংগঠন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এ সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বিদেশী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ, ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহার পর বরিশালে সভার আয়োজন হইলে পুলিশের অত্যাচার চরমে উঠিল। তবুও সভার কার্য্য বন্ধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাঙ্গলায় প্রায় সকল নেতাই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছেলেরাও সব ছিল। সেই সময়েই সুরেন্দ্রনাথের নব নামকরণ হয়—'Surrender Not'।

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে বিলাতী সাবান, সিগারেট, লবণ উঠিয়া গেল। বিড়ি ও চুরুটের প্রচলন হইল। দেশী সাবান প্রস্তুত হইতে লাগিল। সৈন্ধব ব্যবহার আরম্ভ হইল।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ছেলেরাও এ আন্দোলনে মনে প্রাণে যোগ দিলেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা স্থান হইতে দেশী জিনিস সংগ্রহ করিয়া "স্বদেশী ভাণ্ডার" নামে একটি দোকান খুলিলেন। "মাতৃভাণ্ডার" নাম দিয়া আর একটি বেশ বড় দোকান খুলিবার জন্য অর্থসংগ্রহ চলিতে লাগিল। এই সময়েই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "ভারতমাতা" চিত্রখানি অঙ্কিত করেন।

স্বদেশী আন্দোলনে বৃটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা হইল। ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠিল। অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, এ রসুল, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি সকলে একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ এ প্রতিবাদ বিফল হইল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন বাঙ্গলা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। সেই দিনই অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। রাখীবন্ধনের প্রবর্ত্তক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং অরন্ধনের পরামর্শদাতা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন কাহিনী ১৩৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিপ্লববাদ ব্যষ্টি ছাড়াইয়া যাহাতে সমষ্টিতে গিয়া পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা করা হইল। জনসমাজের প্রধান চারিটি অঙ্গ কৃষক, মজুর, ছাত্র ও সৈনিক। প্রতি অঙ্গই যাহাতে বিপ্লববাদ গ্রহণ করে সেইরূপ প্রচার চলিল। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসব আরম্ভ করিলেন। উৎসবের আনুষঙ্গিক মেলায় সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা হইল। শিক্ষিতদের জন্য তো সভা সমিতি ও সংবাদ পত্র আছেই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতির মনসাতলার মাঠে আরম্ভ হইল প্রতাপাদিত্য উৎসব। ১৯০৩

খৃষ্টাব্দে পান্তির মাঠে আরম্ভ হইল শিবাজী উৎসব। এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল সেখানে ছিল পান্তির মাঠ। কয়েকদিন উৎসব চলিল। বালগঙ্গাধর তিলক এলেন, এলেন সুরসিক খাপার্দে। সকলেই বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। পাঞ্জাবে সৈন্যবিভাগেও গোপনে প্রচার-কর্ম্ম আরম্ভ হইল। পরে রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমে স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্রসমিতি গড়িয়া উঠিল। সার্কুলার রোডে, অধুনা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে মূকবধির বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ছিল গ্রীয়ার পার্ক। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছাত্রেরা সভা করিল। সভাপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এই সভাতেই প্রথম ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হয়। জাতীয় পতাকা ছাত্রদেরই দান। ইহার পরই ছাত্রদিগের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। তখনই সরকারী 'সার্কুলার' বাহির হইল "ছাত্রেরা পড়াশুনা লইয়াই থাকিবে, কোন সভা-সমিতিতে যোগ দিতে পারিবে না।" ইহার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যের জন্য এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি (Anti Circular Society) প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার সভাপতি হইলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র।

জাতীয় পতাকার উদ্ভব যেমন বঙ্গদেশেই হয়, "ভারত ছাড়" মন্ত্রও সেইরূপ প্রথম উদ্গীত হয় বাঙ্গলাতেই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, সিপাহীযুদ্ধের প্রায় এগার বৎসর পরে, স্বদেশপ্রেমিক তারাপদ চক্রবর্ত্তী একদিন এক সভায় বলিয়া বসিলেন, "যতদিন না ইংরেজেরা ভারত ছাড়িয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইবে, ততদিন আমাদের মন প্রকৃত স্বাধীন হইবে না।"

মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গলায় প্রচারকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেশে লোকও সজাগ হইয়া উঠিতেছে। তখন যতীন্দ্রনাথ চলিলেন উত্তর ভারতে প্রচার কার্য্যে। সেখানে সর্দ্দার অজিত সিং এবং তাঁহার ভাই কিষেণ সিং যতীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদিগের মাধ্যমে হরদয়াল সিং ও গুরুদিৎ সিং-এর সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইল। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় পাঞ্জাবে আন্দোলন চালাইবার ভার লইলেন।

পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়, মহরাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, এবং বাঙ্গলায় বিপিনচন্দ্র পাল, এই "লাল-বাল-পাল" হইলেন ভারত স্বাধীনতাকামীদিগের ইষ্টমন্ত্র দাতা।

হরদয়াল সিং আমেরিকায় গিয়া "গদর পার্টি" বা বিপ্লবী দল গঠন করিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় সেখানে যুগান্তর দলও গড়িয়া উঠিল।

যতীন্দ্রনাথ পাঞ্জাব হইতে গেলেন আম্বালায়। অম্বালার ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, পেশোয়ারের ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, এবং শিয়ালকোটে ডাক্তার লালা অমরদাস বিপ্লববাদে দীক্ষিত, হইলেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও ইঁহাদিগের সহিত যুক্ত হইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রমথ-নাথ মিত্রের সহিত পথ ও মত লইয়া ঠোকাঠুকি বাধিল। বারীন্দ্র চাহিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আর মিত্র মহাশয় চাহিলেন দেশের যুবকদিগকে সুসংহত করিয়া দেশে গঠনমূলক কাজে ব্রতী করা, দেশহিতৈষণায় উদ্দীপিত করা। বারীন্দ্রের দল সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করিলেন। যতীন্দ্রনাথ ইহাতে মত দিতে পারিলেন না। ভগিনী নিবেদিতা এই সন্ত্রাসবাদীদিগের সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" গঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। এখানে কেতাবী লেখাপড়ার সহিত টেক্‌নোলজি" ও "ইন্‌জিনিয়ারিং" শিক্ষার ব্যবস্থা রহিল। যাদবপুরে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা সুবোধ মল্লিক, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে মুক্ত হস্তে দান করিলেন। শিক্ষাব্রতীরও অভাব হইল না। ভগিনী

নিবেদিতা এই সকল কাজে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। বিপ্লবীদের সহিত সহানুভূতি থাকায় তাঁহাকে ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইয়াছিল।

উত্তর ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীন্দ্রনাথ দেখিলেন বাঙ্গলায় ঘোর দলাদলি চলিয়াছে। মত-পার্থক্যের জন্য তিনি অনুশীলন সমিতি হইতে অপসারিত হইলেন। মনে দুঃখের বোঝা লইয়া তিনি আবার উত্তরাখণ্ডের পথ ধরিলেন। নৈনীতালে গিয়া পৌঁছিলেন মহাজ্ঞানী তিব্বতী বাবার শিষ্য সোহহম্ স্বামীর আশ্রমে। সোহহম্ স্বামী পূর্ব্বাশ্রমে ছিলেন প্রসিদ্ধ পালোয়ান শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রিক্তহস্তে বন্য ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন। মাসখানেকের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথ তিব্বতী বাবার নিকট সন্ন্যাস লইয়া নূতন নাম পাইলেন--নিরালম্ব স্বামী।

তিব্বত, আফগানিস্থান, এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে ভ্রমণ করিয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্প্রতি তিরোভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার "সন্ধ্যা" পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এখন পরিচালকবর্গ তাঁহাকে "সন্ধ্যা" সম্পাদনার ভার দিলেন। তিনি প্রথম দিনই লিখিলেন—"মরি-নাই—আমি আসিয়াছি—"এক অতি তেজোদীপ্ত প্রবন্ধ। পরিচালকমণ্ডলী এরূপ উদ্দীপনা-পূর্ণ লেখা পছন্দ করিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে "সন্ধ্যা" পত্রিকার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইল। তাহার পর আসিয়া উঠিলেন অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে। যুগান্তরের পরিচালকেরা সেখানে যাতায়াত করিতেন। অনেকে কবিরাজ-মহাশয়ের সাহায্যও পাইতেন। তখন যুগান্তর পত্রিকা পরিচালনা করিতেন —নিখিল মৌলিক, কার্ত্তিক দত্ত, এবং আরও কয়েকজন। বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য 'যুগান্তর" পত্রিকা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অন্নদা কবিরাজের বাড়ী হইতে যতীন্দ্রনাথ আবার সোহহম্ স্বামীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সন্ন্যাসজীবনই যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ী দেবীও স্বামীর সন্ধানে একাকিনী সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনিও সোহহম্ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন এবং পাইলেনও। তখন তাঁহার নামকরণ হইল "চিন্ময়ী মাতা"।

বেশ কিছুদিন পরে সন্ন্যাসীদিগের রীতি অনুসারে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া উভয়েই মায়ের কথায় মায়েরই তৈয়ারী চান্না-আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। আশ্রমটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। নিকটেই প্রাচীন বিশালাক্ষী-মন্দির। কথিত আছে সাধক কমলাকান্ত এই স্থানে শক্তিসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করেন। তাঁহার সিদ্ধাসন বিশালাক্ষী-মন্দিরের সন্নিকটে আজও বিদ্যমান। চান্নার নিকট মাহীনগরে সিদ্ধবাবার আশ্রম ছিল। তিনিও প্রথিতযশা সাধু ছিলেন।

চান্না আশ্রমে থাকিয়া চিন্ময়ী মাতা স্বামীর সকল কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নিজের তপশ্চর্যাও চলিল। কয়েক বৎসর পরে এই স্থানেই তাঁহার দেহাবসান হয়। আশ্রম-প্রাঙ্গনেই তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়, এবং তাহার উপর একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। পরে সেই মন্দিরের মধ্যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী দেবীর মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড চেষ্টায় সন্ত্রাসবাদ দমিত হইল। যতীন্দ্রনাথও আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষদিগের সহিত আসামী-ভুক্ত হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান।

চান্না আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিরালম্ব স্বামী গ্রাম-বাসীদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘন্টা সমাগত দরিদ্র রোগীদিগের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার অতিবাহিত হইত। হোমিওপ্যাথি মতেই তিনি চিকিৎসা করিতেন। প্রয়োজন মত পথ্যাদিও আশ্রম হইতেই দেওয়া হইত।

আশ্রমনিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির অনেক যুবক মাঝে মাঝে আসিয়া নিজ নিজ জীবনের সমস্তাবলী স্বামীজীর নিকট হইতে সমাধান করিয়া লইয়া যাইতেন। ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী যুবকেরা অনেক সময় ছদ্মবেশে আসিয়া স্বামীজীর সুপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অনেক জমিজমার মালিক প্রায়ই স্বামীজীর নিকট তাঁহাদের বৈষয়িক সমস্তার জন্তও যুক্তিপরামর্শ লইয়া যাইতেন। তিনিও সানন্দে সকল বিষয় সকলকে সাহায্য করিতেন।

গরীব চাষীদের প্রয়োজনমত অর্থ দিয়াও সাহায্য করিতে হইত। অমিতব্যয়িতার জন্ত তাহারা তিরস্কৃতও হইত। দরকার পড়িলে আশ্রম হইতে খাতাদিও সরবরাহ করা হইত।

মারামারি লাঠালাঠি করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির বিত্তবান্ লোকেরা আশ্রমে আসিয়া স্বামীজীর নিকট ভর্ৎসিত হইতেন, আবার সুপরামর্শও পাইতেন। খুনী আসামীরাও আসিয়া তাহাদিগের সুখদুঃখের কথা স্বামীজীর নিকট বলিত। সকলকেই তিনি উপদেশ দিতেন—

"সুখ শুধু পাওয়া যায়, সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
দিবানিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।"

চান্না গ্রামে যতীন্দ্রনাথের (স্বামী নিরালম্বজীর) সংশ্রবে যাহারাই আসিতেন তাঁহাদিগের সকলকেই তিনি শিক্ষা দিতেন —"দুঃখকষ্ট গ্রাহ্য করিয়াই মানুষ বৃথা কষ্ট পায়। ভগবানের দান বলিয়া যদি তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন কষ্ট থাকে না। কারণ দুঃখ অভিশাপ নয় আশীর্বাদ। মানুষ গড়ার অমন উৎকৃষ্ট উপাদান মনুষ্য সমাজে আর কিছুই নাই।

যে যেরূপ সংসারে যাদৃশ সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেন। পল্লীগ্রামের মানুষ সাধারণতঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহাদের সে কুসংস্কার ত্যাগ করিতে শুধু উপদেশই দিতেন না। যাহাতে তাহা দূর হইয়া যা সেরূপ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতেন। জনসেবার দৃঢ়ভিত্তি গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করিতেন। আমার মতই সব, এই ধারণাতেই নিরালম্ব স্বামী অভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া ছুটিয়া যাইতেন আর্ত্ত, আতুর, দীন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিতে।

আহার বিষয়ে তিনি শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিতেন। সকলকেই এই উপদেশ দিতেন –"আহারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আহরণ করা যায়। সুতরাং তাহার বিষয়ে সতর্ক না থাকিলে কোন্ সূত্রে যে মালিন্য আসিয়া মনের কোনে প্রবেশ লাভ করিবে বুঝিতে পারা যাইবে না। মন মলিন হইলে নিজে শুদ্ধ ও পবিত্র থাকা যাইবে না।"

সকলকেই প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া চলিতে বলিতেন। ভারতের ঐক্যই তাঁহার কাম্য ছিল। যে কোন প্রদেশের অধিবাসী যে কোন লোক হউক না কেন সর্বাগ্রে তিনি ভারতবাসী, এবং ভারতমাতাই তাঁহার পূজ্যা। সেই ভারতমাতার বন্ধন মোচন করাই সকলের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণের কথা।

চান্না আশ্রমে সাধুসন্তদিগেরও যাতায়াত ছিল। তাঁহার নিজ শিষ্য প্রজ্ঞানপাদ তো আসিতেনই। আর আসিতেন স্বামী ইচ্ছানন্দ। তিনি ইচ্ছামত যে কোন কাজ করিতে পারিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার সিদ্ধাই। তবে সকল সময় সে শক্তি প্রয়োগ করিতেন না। আর আসিতেন সোহহম্ স্বামীর গুরু পরমহংস তিব্বতী বাবা। একবার আসিয়া তিনি নিরালম্ব স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখনও দেশ দেশ স্বরাজ স্বরাজ 'বাতিক' আছে নাকি বাবা?" নিরালম্ব স্বামী উত্তর দিলেন—"না মহারাজ, আর নয়। সে সকলের পূর্ণাহুতি হইয়া গিয়াছে।" ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি আগুনে পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে অগ্নিযুগের কাহিনী লেখা ছিল। একখানি প্রকৃত ইতিহাস চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে আসিয়া তিনি কলিকাতায় জয় মিত্রের বাড়ীতে থাকিতেন। সেখানেও সকল শ্রেণীর লোকের

সমাগম হইত। বরাহনগরে যোগেন্দ্র বসাক ষ্ট্রীটে বসাক-মিত্রের বাড়ীতেও অনেক সময় আসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের সহিত বাঙ্গলার বাহিরেও কয়েকবার গিয়াছিলেন।

শেষ শয্যাও তাঁহার বরাহনগরে। চান্না আশ্রমে স্বামীজীর গড়গড়ার নলটি দৈবক্রমে তাঁহার পায়ের উপর উপর পড়িয়া পায়ের খানিকটা ছাল উঠিয়া যায়। সেই উপলক্ষ করিয়া রক্তদুষ্টি (Sepsis) ঘটে। চান্নায় চিকিৎসার সুবিধা না হওয়ায় বরাহনগরে বসাকবাবুদের বাড়ীতে তাঁহাকে আনা হয়। মাননীয় চিকিৎসক নীলমণি দাস মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত সুবিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে আনিয়া দেখান হয়। তিনি পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে চান। স্বামীজী কিছুতেই অস্ত্রোপচারে স্বীকৃত হইলেন না। ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৩৩৭ সালের ১৯শে ভাদ্র শুক্রবার তাঁহার দেহত্যাগ হইল। দেখিয়া মনে হইল ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এক মুহূর্তের জন্যও কোনও দিন জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নাই।

রোগশয্যায় অনেক ভক্ত ও সাধু তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে তিব্বতী বাবা ও স্বামী প্রজ্ঞানপদ (যোগেশ্বর) অন্যতম। স্বামীজীর শেষ ইচ্ছায় যোগেশ্বর মহারাজই চান্না আশ্রমের ভার গ্রহণ করেন।

নিরালম্ব স্বামীর মরদেহ কাশীপুর চন্দ্রকুমার রায় লেনে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে আনা হইলে সেই স্থানে মহা সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভক্তেরা চিতাভস্ম চান্না আশ্রমে লইয়া যান, এবং পুন নির্দেশে চিন্ময়ী মায়ের সমাধিমন্দিরেই সমাহিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী যুগের বিপ্লববাদের সমাধি হইল।*

---

* সাপ্তাহিক "অমৃত" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীত্রিভঙ্গ রায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ—'সংলাপে' অগ্নিযুগস্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমৎ স্বামী নিরালম্ব) হইতে অধিকাংশ উপাদান সংগৃহীত। বরাহনগরের কথা—বরাহনগরের অনুশীলন সমিতির কোন প্রাক্তন সদস্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অন্যান্য পত্র ও পুস্তিকা হইতেও কিছু কিছু সংগৃহীত।

কংগ্রেস স্মৃতি

(একচত্বারিংশ অধিবেশন—গৌহাটি—১৯২৬)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

এই রকম সময়েই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় কৃষ্ণনগরে ২২শে মে তারিখে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নির্ধারিত সভাপতি বীরেন্দ্র শাসমল। প্রথমে 'বিদ্রোহী' কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর একজন সহযোগীর সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

তারপর যথারীতি জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বসন্তকুমার লাহিড়ী ওঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন।

তারপর সভাপতি শাসমল মশায় তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। অভিভাষণ অর্দ্ধেক পড়ার পর সন্ত্রাসমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য পাঠ করার সময় তিনি সহসা থেমে গেলেন এবং বললেন যে, তাঁকে জানানো হয়েছে যে যাঁরা তাঁকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করেছেন তাঁদের অনেকেরই এই মন্তব্যে আপত্তি আছে। তিনি আপত্তিকর অংশটি তাঁর অভিভাষণ থেকে বাদ দিতে প্রস্তুত আছেন। তারপর তিনি প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করলেন এতে কারও আপত্তি আছে কি না। তৎক্ষণা চতুর্দ্দিক থেকে আপত্তি উঠতে লাগল, এর ফলে সভাপতি মশায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ বন্ধ করে 'শেম' 'শেম' ধ্বনির মধ্যে সভাগৃহ ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলেন। এতে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হল। সভাস্থল নানাপ্রকার গুঞ্জনধ্বনিতে পূর্ণ হল।

এইভাবে ১০ মিনিট কেটে যাওয়ার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রতিনিধিদের নিকট গণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য আবেদন করলেন। আবেদনের ফলে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে সভাপতি মশায়কে সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য ফিরিয়ে আনলেন। সভাপতি মশায় আপত্তিকর অংশটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অভিভাষণ পড়ে শোনালেন।

পরদিন ২৩শে মে প্রাতঃকালে নির্ব্বাসনী সভায় একটি প্রস্তাব দ্বারা সভাপতি মশায়ের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে মন্তব্যের নিন্দা করা হয়। সভাপতি মশায় প্রস্তাবটি তাঁর প্রতি আস্থাহীনতা প্রস্তাব গণ্য করে সভাপতির আসন ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলেন।

যখন দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হল তখন এই সংবাদ বসন্তকুমার লাহিড়ী মশায় সভায় জ্ঞাপন করলেন, তারপর যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে সভাপতির পদে বরণ করে সভার কাজ চালানো হল।

এদিনের সভার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, বিপুল ভোটাধিক্যে তিন বৎসর পূর্ব্বে সিরাজগঞ্জের অধিবেশনে স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাশের যে বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়েছিল তা অগ্রাহ্য করা হল। স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরা এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করার জন্য নানাপ্রকার কৌশল ও বাধার সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। ফলে প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁরা একযোগে কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু এতে কনফারেন্সের অধিবেশন বন্ধ হয় নি, কারণ উপস্থিত ৭০০ প্রতিনিধির মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২১।

অপরাহ্ণের অধিবেশন যাতে বন্ধ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরা প্রচার করতে লাগলেন যে কনফারেন্সের আর অধিবেশন হবে না কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি অধিবেশন চালানোর দাবীর ফলে যথাসময়ে অধিবেশন আরম্ভ হল বটে কিন্তু শুরু থেকেই এত গণ্ডগোল হতে লাগল যে সেনগুপ্ত মশায় শৃঙ্খলা

স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা না করেই সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অধিকাংশ প্রতিনিধি এই ঘোষণা না মেনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা জে চৌধুরী ব্যারিস্টার) মশায়কে সভাপতি পদে বরণ করে সভায় কার্য্য চালিয়ে গেলেন। কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি হল।

আমার অভিজ্ঞতায় এরূপ ঘটনা আর হয় নি।

॥ ৯ ॥

অল্পকাল বিরতির পর পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হল।

জুলাই মাসে বড় বাজারে একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য সহকারে রাজরাজেশ্বরী শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়া উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হল। মুসলমানরা প্রথমে শোভাযাত্রা আক্রমণ করে, হিন্দুরা প্রতি আক্রমণ করে।

উল্টোরথের শোভাযাত্রার সময় পাইকপাড়ায় অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা গেল।

৪ঠা জুলাই পাটনায় মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালায়। ঐ মাসেই অনুরূপ ঘটনা রংপুরে ঘটল, পূর্ব বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু মুসলমানদের বিরোধের ফলে অশান্তির সৃষ্টি হল।

এই সময় হিন্দুমুসলমানের মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আসেন।

অক্টোবর মাসে এলাহাবাদ ও হাওড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে জনৈক বাঙ্গালী মুসলমান মহাত্মা গান্ধীর নিকট পত্র লিখে তাঁকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। তদুত্তরে গান্ধীজী পত্রপ্রেরককে ধন্যবাদ দিয়ে জানান যে এই আবেদন তাঁর অহঙ্কারকে তৃপ্তি দিতে পারত কিন্তু তাঁর এখন কোন অহঙ্কার নেই। তিনি তাঁর অযোগ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল। যদি তাঁর হস্তক্ষেপ সামান্যমাত্র সফলতার সম্ভাবনা থাকত তাহলে তাঁর নিভৃতবাসের সিদ্ধান্ত তাঁকে বাধা দিতে পারত না। তাঁর নিকট এখন চরকাই প্রিয় বস্তু। তিনি বিশ্বাস করেন যে দারিদ্র এবং অধঃপতন থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে উদ্ধার করার ক্ষমতা এর আছে।

এদিকে ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সতীন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। কয়েকমাস ধরে সত্যাগ্রহ চলে এবং শত শত সত্যাগ্রহী ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। দীর্ঘ দিন সত্যাগ্রহ করার পর আন্দোলনের নেতা যতীন্দ্রনাথ সেনকে গভর্ণমেন্ট বিনা শর্ত্তে মুক্তি দেয়।

এই সময় দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কঠিন অসুখের সংবাদে সমস্ত দেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। তিনি ২৬শে নভেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাঁর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে এবং ৬ই ডিসেম্বর অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। ৮ই ডিসেম্বর ডাঃ আনসারীকে ডেকে আনা হয়, তাঁর চিকিৎসাধীনে স্বামীজীর অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দিল কিন্তু তার গতি খুব মৃদু। তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন।

॥ ১০ ॥

এই রকম পটভূমিকায় গৌহাটীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হল, বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সুপারিশ বিবেচনার পর মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় গৌহাটী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

মহাত্মা গান্ধী স্থির করেন যে তিনি আমেদাবাদ থেকে ওয়ার্দ্ধায় গিয়ে যমনালাল বাজাজের সঙ্গে সপ্তাহ দুই থাকবেন। তারপর সেখান থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অনুরোধে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি গৌহাটী রওনা হবেন এবং কর্ম্মময় জীবন পুনরায় আরম্ভ করবেন, কারণ তখন তাঁর নিভৃত বাসের প্রতিজ্ঞার সময় উত্তীর্ণ হবে। তবে তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবেন মাত্র কিন্তু তা নির্ব্বাক্ দর্শক হিসাবে বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে। তিনি কোন দলের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন না। তদনুসারে তিনি ৩রা ডিসেম্বর ওয়ার্দ্ধার

প্রজাতন্ত্রী নেত্রী শ্রীমতী হেস্টিংস এবং তাঁর দলবলসহ সত্যাগ্রহ আশ্রমে দু সপ্তাহ বাস করার জন্য ওয়ার্দ্ধা রওনা হলেন।

১লা ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ইলোরের অধিবেশনে আইন অমান্যের প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবের পক্ষে ১০১ এবং বিপক্ষে ৬০ ভোট পড়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয় যে দেশ এখন আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত। কমিটী সাব্যস্ত করে যে আগামী কংগ্রেসে ব্যাপকভাবে আইন অমান্যের জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হবে।

কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি আয়েঙ্গার মশায় গৌহাটী কংগ্রেসে যোগ দিতে সকল দলের নেতাদের আহ্বান করলেন।

নির্বাচিত সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তামিল নাড়ু ও অন্ধ্রের বহু প্রতিনিধিসহ মাদ্রাজ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর রওনা হয়ে ২১শে তারিখে কলকাতায় পৌছেন এবং সেখানে একদিন বিশ্রাম নেন।

এদিকে লালা লাজপত রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আগামী কংগ্রেসে যোগদান করবেন কি না স্থির করার জন্য তাঁরা পারস্পরিক সহযোগী দল এবং কংগ্রেসের নির্দল সদস্যদের এক সভা ২১শে ডিসেম্বর কলকাতায় আহ্বান করেন। সভা কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং অন্যান্য নেতাসহ ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ২৪শে ডিসেম্বর পাণ্ডু ষ্টেশনে পৌছেন। ষ্টীমার ঘাটে তাঁদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। পাণ্ডু ঘাট ষ্টেশন থেকে তাঁদের শোভাযাত্রাসহ কংগ্রেস নগরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিষ্ঠুর হত্যার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তরুণরাম ফুকনের নির্দেশে শোভাযাত্রা পরিত্যক্ত হয়।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের কলকাতা হয়েই গৌহাটী যেতে হবে, কাজেই একটি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ট্রেণটি ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ১১টার সময় শিয়ালদহ থেকে রওনা হয়। আমিও বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রতিনিধির সঙ্গে ঐ ট্রেণে রওনা হলাম। প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময় ট্রেণ সান্তাহার পৌছল। এখানে ব্রডগেজের ট্রেণ ছেড়ে মিটার গেজের ট্রেণে উঠতে হয়। সান্তাহারের থেকে তিন মাইল দূরবর্তী নওগাঁতে আমার পৈতৃক বাসভবন। সেখান হতে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজনী মোহন সান্তাহারে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজসাহী ও পাবনা জেলার বহু প্রতিনিধিও সান্তাহার থেকে স্পেশাল ট্রেণে উঠলেন। সন্ধ্যা ৬টার পর সান্তাহার থেকে ট্রেণ আমিনগাঁও অভিমুখে রওনা হল।

ট্রেণে বেশ আনন্দেই রাত্রি কাটানো গেল। ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৭টা নাগাদ একটি ছোট ষ্টেশনে ট্রেণটি থামল। এখানে ট্রেণটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে। এই রেল রাস্তায় ডবল লাইন নেই। একটি বিপরীতগামী ট্রেণকে পথ দেওয়ার জন্য আমাদের ট্রেণকে থামতে হয়েছে।

ট্রেণ থেকে সবাই নেমে পড়লেন। শীতের প্রাতঃকালে রৌদ্র উপভোগ করতে করতে প্রতিনিধিরা আলাপ আলোচনায় এবং হাস্যপরিহাসে সময় কাটাচ্ছিলেন। গত কানপুর কংগ্রেসের সময় বালমুকুন্দ মিল নামক একটি খাঁটি স্বদেশী মিলে প্রস্তুত গরম কাপড় কিনে আমি একটি গলাবন্ধ কোট তৈরী করিয়েছিলাম। তার রং ছিল নীলাভ। সেই কোট আমি পরেছিলাম। মাথায় ঐ রংএর একটি গান্ধী টুপি ছিল। আমার এই বেশ দেখে কিরণশঙ্কর রায় ঠাট্টা করে বললেন যে আপনি একেবারে মারাঠী সেজেছেন। সেই সময় মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁর প্রসিদ্ধ পত্রিকা কমরেড প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি খুব ভাল ছিল। মৌলানা সাহেবী ইংরেজী খুব ভাল লিখতেন। তাছাড়া পত্রিকাতে সুন্দর সুন্দর ব্যঙ্গ চিত্র (কার্টুন) বেরুত। আমি ঐ পত্রিকার একজন গ্রাহক ছিলাম। বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম দিতে হত। এবার

চাঁদা দেওয়ার কিছু পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, এখন মৌলানা সাহেবকে প্ল্যাটফরমে দেখে তাঁর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে কবে কাগজ বেরুবে। তিনি উত্তরে তাঁর আঙুল দেখিয়ে বললেন দেখছেন ত আঙুলে হুইটলো হয়েছে, এখন লিখব কি করে। অবশ্য পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয়নি। প্ল্যাটফরমের নানাস্থানে প্রতিনিধিরা চা পান ও খোস গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলে এমন সময় হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত সংবাদ পাওয়া গেল যে, দিল্লীতে জনৈক মুসলমান আততায়ীর হাতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হয়েছেন। এই সংবাদে সকলে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে বিষাদের ছায়া পড়ল।

পরে জানা গেল, ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টার অব্যবহিত পরে আবদুল রসির নামক একজন মুসলমান দিল্লীর স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে এবং তাঁর জনৈক সেবক ধরম সিংকে বলে যে তাঁর প্রভুর সঙ্গে সে ইসলামের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায়। ধরম সিং তাকে গৃহ-প্রবেশের অনুমতি দিতে ইচ্ছুক ছিলনা কিন্তু স্বামীজী তাঁর ঘর থেকে আগন্তুককে দেখেছিলেন। তিনি ধরম সিংকে আবদুল রসিদকে ভিতরে আনতে বললেন। ভিতরে নীত হয়ে আততায়ী স্বামীজীকে তার উদ্দেশ্যের কথা বলল তাতে স্বামীজী দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন যে তিনি সম্প্রতি অতিশয় দুর্বল সুতরাং সেদিন তিনি কোন ধর্মালোচনা করতে সক্ষম নন এবং তাকে আর একদিন আসতে উপদেশ দিলেন। আততায়ী তখন বলল যে সে পিপাসার্ত্ত এবং এক গ্লাস জল খেতে ইচ্ছুক। তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে জল দেওয়া হল। আততায়ী বাইরে গিয়ে জল খেয়ে গেলাস ধরম সিংহের হাতে দিল। সে গেলাস নিয়ে ভিতরে চলে গেল। এই সুযোগে আততায়ী গুলি করে স্বামীজীকে হত্যা করল। গুলির শব্দ পেয়ে ধরম সিং দৌড়ে এসে আবদুল রশিদকে ধরে ফেলল এবং উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হল। ধরম সিংও গুরুতর আহত হয়েছিল।

যাই হোক, এইরকম শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে আমরা আমিনগাঁও পৌছে ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে পাণ্ডুতে উপস্থিত হলাম। ষ্টীমার ঘাটে স্বেচ্ছাসেবকরা মোতায়েন ছিল, তারা আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

এবার অতি মনোরম স্থান কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। গৌহাটী শহর থেকে তিন মাইল দক্ষিণে পাণ্ডু ষ্টেশন ঘাটের অনতিদূরে কংগ্রেস নগর স্থাপিত হয়েছিল। পশ্চিমে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পূর্ব নীলাচল পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ কামাখ্যা মন্দির স্থানটির শোভা বর্দ্ধন করেছিল। পরপারে আমিনগাঁও ও তার পশ্চাতে পর্ব্বতশ্রেণী সুন্দর দৃশ্য রচনা করেছিল। এই স্থান কিছুদিন পূর্ব্বেও বন্যজন্তু অধ্যুষিত জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, এখন যেন যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে খদ্দর নির্মিত সুরম্য একটি নগরীতে পরিণত হয়েছিল। স্থানে স্থানে আম্র ও সুপারি বৃক্ষ পরিবেষ্টিত অসমীয়া চাষীদের বাসগৃহ দেখা যাচ্ছিল। প্যাণ্ডেলের অনতিদূরে প্রতিনিধি ও দর্শকদের জন্য যে সকল আবাসগৃহ নির্ম্মিত হয়েছিল সেগুলির দেয়াল, ছাদ সবই চটের (হোসয়ান) ছিল।

প্যাণ্ডেল থেকে এক মাইল দূরে মনোরম দৃশ্যের মধ্যে সভাপতির জন্য বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল এবং তার সন্নিকটে প্রসিদ্ধ নেতাদের জন্য প্রস্তুত গৃহগুলি শোভা পাচ্ছিল।

প্যাণ্ডেলটি চতুষ্কোণ বেষ্টনী দ্বারা ঘেরা হয়েছিল এবং প্রত্যেক দিকে একটি করে গেট নির্মিত হয়েছিল। গেটগুলি সুদৃশ্য। স্তম্ভের উপরিভাগ সুন্দর সুন্দর গম্বুজে শোভিত হয়েছিল।

প্যাণ্ডেল, প্রতিনিধিদের আবাস ভবন এবং সপরিবারে বাস করার জন্য কুটীরগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমান উন্মুক্ত স্থান ছিল।

॥ ১১ ॥

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন

হল। শ্রীমতী নাইডু কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার নব নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের উপর অর্পণ করে সভাপতির আসন ত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বৎসরে তাঁকে সভানেত্রীর পদে বরণ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁদের সম্মুখে বর্তমানে যে কাজ তার গুরুত্ব আরও বেশী। তাঁর জীবনের স্বপ্ন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জোড়াতালি না দিয়ে দৃঢ়ভাবে ঐক্য স্থাপনের জন্য কাজ করতে অনুরোধ করলেন। তার পর তিনি আসন ত্যাগ করে নব নির্বাচিত সভাপতিকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

সমুচিত উত্তরদানের পর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির আসন গ্রহণ করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

তারপর উক্ত সভা বিষয়-নির্বাচনী সভাতে রূপান্তরিত হল। এই সভায় বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সুপারিশ আলোচনা করা হয়। তারপর কয়েকটি প্রস্তাব স্থির করার পর সভা পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মুলতুবি হল।

২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় উপরিউক্ত সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারীকে তীব্র নিন্দা করে স্বামীজীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। তারপর উমর শোভানীর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের পর মহাত্মা গান্ধী কেনিয়ার পোল ট্যাক্সের নিন্দাসূচক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে গোল টেবিলের অভিনন্দন সূচক প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং সেগুলি গৃহীত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে নির্যাতিত ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের পক্ষে প্রশংসাজনক কাজের জন্য সি এফ এনড্রুসকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী প্যাণ্ডেলের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর জাতীয় পতাকার জন্য একটি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত ছিল। দণ্ডের সম্মুখে সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বিদায়ী সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বি জি হর্ণিম্যান, গুলজারি লাল নন্দ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মৌলানা শওকত আলী প্রভৃতি নেতাগণ ও মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হলেন। তারপর পেথিক লরেন্স ও শ্রীমতী লরেন্সও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সহ উক্ত প্রাঙ্গণে এসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসবে যোগ দিলেন।

হিন্দুস্থান সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকগণ ডাঃ হরদিকরের পরিচালনায় প্যারেড করে সেখানে উপস্থিত হল। কানপুর কংগ্রেসের কমিটির ব্যাণ্ড পার্টি প্যারেডের সময় বাজনা বাজিয়েছিলেন।

মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পতাকা প্রোথিত দণ্ডের শীর্ষদেশে উত্তোলন করলেন, ডাঃ হরদিকর ও হিন্দুস্থান সেবাদলের স্বেচ্ছা সেবকগণ জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করল। স্বেচ্ছাসেবকগণ হিন্দী ও অসমীয়া ভাষায় রচিত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত গাইল।

এই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন, তিনি ডঃ হরদিকর ও স্বেচ্ছাসেবকদের সম্বোধন করে বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, আজ যে পতাকা তিনি উত্তোলন করলেন তা চিরকাল উন্নত থাকবে এবং তাঁরা যেন মহান্ পতাকার সম্মানের উপযুক্ত কাজ করেন। মাতৃভুমির সেবার জন্য তিনি তাঁদের আশীর্বাদ দিলেন।

তারপর জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" সমবেত কণ্ঠে গীত হল। জাতীয় সঙ্গীতের সময়ে সকলে দণ্ডায়মান ছিলেন।

॥ ১৫ ॥

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে দর্শক ও প্রতিনিধিগণ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সুবৃহৎ প্যাণ্ডেলটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন দশ হাজারের উপর দর্শক ও প্রতিনিধিগণ।

এর মধ্যে প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার।

পাণ্ডবনগরের খদ্দরে নির্ম্মিত প্যাণ্ডেলটির আয়তন ছিল বিপুল। প্রতিনিধিদের ও দর্শকদের জন্য আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রবর্তিত ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল। প্যাণ্ডেলটির অভ্যন্তর অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ভিতরে স্থানে স্থানে বহু মাটি রাখা হয়েছিল। মটোগুলি ছিল—'জালিয়ানওয়ালাবাগ ভুলো না' 'দেশের মেরুদণ্ডই দেশের জনসাধারণ' 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার' 'চরকা আমাদের কামধেনু' 'জাতি স্বয়ং গঠিত হয়' 'আমাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খলাবস্থার কথা মনে রেখ' 'আমরা আপন দেশেই ক্রীতদাস' ইত্যাদি।

কাঁটায় কাঁটায় ২টার সময় একটি তোপধ্বনি সভাপতি মশায়ের উপস্থিতি ঘোষণা করল। সভাপতি মশায় একটি শোভাযাত্রা করে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' 'শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কি জয়' ধ্বনির মধ্যে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করেন। শোভযাত্রার পুরোভাগে হিন্দুস্থানী সেবাদল "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তাদের পশ্চাতে ছিল একটি স্বেচ্ছাবাহিনী। তাদের পশ্চাতে ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও তাঁর সেক্রেটারী লালা গিরিধারীলাল। তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা শওকত আলী, বিঠলদাস প্যাটেল, টি. প্রকাশন, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ সত্যপাল, বি. জি. হর্ণিম্যান. শেঠ যমনালাল বাজাজ, বল্লভভাই প্যাটেল, তরুণরাম ফুকন এবং গোপীনাথ বরদলই। শোভাযাত্রা ডায়াসের নিকট পৌঁছার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তরুণরাম ফুকন সভাপতি মশায়কে আসনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে পুষ্পমাল্যে শোভিত করলেন এবং সভাপতির ব্যাজ বুকে পরিয়ে দিলেন।

যাঁরা ডায়াসে আসন গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধী (পরবর্তীকালে তিনি কস্তুরবা নামে পরিচিত হন)। সস্ত্রীক লিষ্টার সাহেব, দাদাভাই নৌরজীর পৌত্রী শ্রীমতী পেরিন, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, শ্রীমতী উর্মিলা দেবী, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, রাও বাহাদুর কোণ্ডাস্বামী চেট্টী, স্বামী ভেঙ্কটাচলম চেট্টি, এম্, এস্, আনে, ডাঃ মুঞ্জে, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, সৈয়দ মুস্তাফা সাহেব, সোয়েব কুরেশী, সি ভি বেঙ্কটারামন আয়ার. কিরণ শঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, প্রভৃতি।

বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত ব্লকে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক পেথিক লরেন্স, ডঃ মার্টিন লরেন্স, সুইজারল্যাণ্ডের সাংবাদিক ডঃ মার্টিন হর্ণিম্যান এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ দেওয়ান বাহাদুর সি, ভি, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। পেথিক লরেন্স দম্পতির জন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য সকলে বাইরে জুতা রেখে ফরাশে বসেছিলেন।

কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই একজন স্বামীজী কংগ্রেসের উদ্দেশে একটি ম্যানিফেষ্টো বিতরণ করেন। তাতে জমির সুষ্ঠু বণ্টন, খাদ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার বেশী শ্রমিকদের কাজ না করার জন্য আইন প্রণয়ন, জীবনধারণের পক্ষে ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মসূচীর জন্য সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে একটি জনসংঘের দল স্থাপনের আবেদন ছিল।

একজন অসমীয়া তরুণী কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমেই রোগশয্যা থেকে প্রেরিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বাণী 'ভারতবাসীগণ ঐক্যবদ্ধ হও' পাঠ করা হল।

আততায়ীর হস্তে জীবনাবসানের পর স্বামীজীর এই বাণী সকলের মনে বিষাদের চিহ্ন এঁকে দিল।

এবার সভায় কার্য্য পরিচালনায় একটি বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা গেল। চিরাচরিত প্রথানুসারে জাতীয় সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। তারপর সভাপতি মশায় তাঁর ভাষণ

দেন। এবার তার পরিবর্তে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর উপরোক্ত ভাষণগুলি পঠিত হল। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অমানুষিক হত্যার জন্য শোক প্রকাশ কর্তব্য বিধায় এই ব্যতিক্রম করা হল।

মহাত্মা গান্ধী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কাপুরুষোচিত ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ হত্যার জন্য হয় এবং 'ইনডিগনেশন' প্রকাশ করছে এবং যে বীর ও উদার দেশপ্রেমিক তাঁর জীবন এবং সমস্ত সাধনা জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন এবং যিনি নিম্ন-শ্রেণীর পতিত ও দুর্বলের পক্ষাবলম্বন করে নির্ভীকভাবে তাদের সেবা করেছেন তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি কংগ্রেস রেকর্ড করছে।

মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব উপস্থিত করে অন্যান্য কথার পর বললেন যে স্বামীজীর জীবনাবসান প্রকৃতপক্ষে শোকের ব্যাপার নয়। প্রত্যেক শহীদই এইভাবে মৃত্যু বরণ বাঞ্ছনীয় মনে করেন। যাঁরা এইভাবে জীবনাবসান করেন তাঁরা পরম শক্তিমানের অনুমোদন লাভ করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ন্যায় বীর পুরুষেরা সকল সময়েই এই-রকম মৃত্যুকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন। স্বামীজী মহান্ দেশ-ভক্তদের অন্যতম ছিলেন এবং তিনি অবশ্যই একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তা মৃত্যুবরণ দ্বারা পালন করেছেন।

তারপর মহাত্মাজী বললেন যে স্বামীজীর প্রতি ভালবাসার জন্য তাঁদের কর্তব্য হবে মুসলমানদের ভাই বলে গ্রহণ করা।

তারপর তিনি বললেন যে তাঁর ভ্রাতা রসিদ আলী দ্বারা স্বামীজী হত হয়েছেন। তিনি আবদুল রসিদকে ভ্রাতা বলেছেন। এটা সুচিন্তিতভাবেই বলেছেন। তিনি তাকে দোষ দিতে পারেন না, এর জন্য যদি কেউ দায়ী হয় তা হবে কংগ্রেসে উপস্থিত সকলেই এবং তিনি নিজে, এবং পণ্ডিত মালবীয় ও লালাজী। গীতা আমাদের নির্দেশ দিয়েছে যে উচ্চতম হতে হলে নিম্নতম পর্য্যন্ত সমুদয় জীবিত প্রাণীকে ভালবাসার সহিত দেখতে হবে, সুতরাং আবদুল রসিদও একজন ভাই। যদি তাঁরা স্বরাজ চান তা হলে যেন তাঁরা মুসলমানদের শত্রু বলে মনে না করেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, জেল থেকে মুক্তির পর তিনি দেশের একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন। তিনি দীর্ঘকাল দিল্লীতে বাস করেছেন। এই নগরী একসময়ে মিলনের কেন্দ্র স্থল ছিল এবং এখন তা সর্ব্বপ্রকার বিভেদের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর তিনি স্বামীজীর হত্যার উল্লেখ করে বললেন যে এই সংবাদ নির্মল আকাশ থেকে বজ্রপাতের ন্যায় সকলকে বিদ্ধ করেছে।

আবদুল রসিদ স্বামীজীর নিকট ধর্মালোচনার জন্য গিয়েছিল, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিল এবং তারপর তাঁকে হত্যা করেছিল, এই ঘটনা অতিশয় ঘৃণ্য।

তারপর তিনি স্বামীজীর নানাপ্রকার গুণের উল্লেখ করে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং ভাবাবেগে তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। তারপর মৌলানা সাহেব দরবিগলিত অশ্রুধারায় রুদ্ধকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় বাংলার প্রতিনিধিদের ব্লক থেকে নাটোরের সতীশচন্দ্র সরকার দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "মিষ্টার মহম্মদ আলী তোমার কুম্ভীরাশ্রু বন্ধ কর।" সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ব্লক থেকে একজন তরুণ শিখ উঠে বললেন, "এ তো তুমহারই তারিকা হ্যায়।" মৌলানা সাহেব বক্তৃতা বন্ধ করে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর ক্রমশঃ গোলমাল বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমন অবস্থা হল যে মৌলানা সাহেবের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তখন মহাত্মা গান্ধী জনতাকে শান্ত করতে মঞ্চোপরি উঠে সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। ক্রমে সভা শান্ত হল।

সভাগৃহ শান্ত হলে মৌলানা সাহেব পুনরায় ভাষণ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন যে, যদিও তিনি প্রস্তাবের সহিত একমত তথাপি তিনি বলতে বাধ্য যে

স্বামীজীর কর্মপদ্ধতি তাঁর মনঃপূত ছিল না। স্বামীজীর কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি বিরুদ্ধমত থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেন যে স্বামীজী একজন নিষ্ঠাবান্ জাতীয় কর্মী ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম্মের একজন দৃঢ়চেতা অনুগামী তিনি ছিলেন। স্বামীজির মৃত্যুর জন্ম দেশের অপূরণীয় ক্ষতি অন্যান্য সকলের সঙ্গে অনুভব করেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে স্বামীজী তাঁর কলেজ জীবন থেকে বন্ধু এবং এই বন্ধুত্ব তাঁরা বরাবর বজায় রেখেছেন। দিল্লীতে সামরিক শাসনের সময় তিনি গুর্খা সৈন্যদের বাধাদান উপেক্ষা করে উন্মুক্ত বুকে তাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। স্বামীজীর মৃত্যু থেকে তাঁদের শিক্ষা নেবার সময় এসেছে, তিনি সকলকে সমবেতভাবে সাম্প্রদায়িক জিগীর বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন।

তারপর প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলেন পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন, যারা অন্যায়ভাবে চিন্তা ও কাজ করে তারা তাদের ধারণা প্রকাশ করতে ভীত হয় কিন্তু স্বামীজী কোনদিনই তাঁর বিশ্বাসমত কাজ করতে কুণ্ঠিত হন নি কারণ তিনি কখনই কোন প্রকার অন্যায়ের পক্ষে ছিলেন না।

উপসংহারে এই অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত আছেন তিনি তাদের সকলকে স্বামীজির মৃত্যুর জন্য শোক-প্রকাশ করতে আহ্বান করলেন এবং হৃদয় উন্মুক্ত করে মাথার উপর ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে তাঁদের লেখনী অথবা নিভৃত আলোচনা বা সমাবেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা না করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে বললেন।

তিনি আরও বললেন যে, তিনি শুনেছেন যে, কয়েকটি মুসলমান পত্রিকা এই মৃত্যু সমর্থন করেছে। তিনি মনে করেন যে এই মনোভাব অত্যন্ত নিন্দার্হ এবং তিনি আশা করেন যে কেউ এই মনোভাব অনুমোদন করবে না।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ক্রমশঃ

ইন্‌সেন্‌টিভ্‌

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

ইন্‌সেন্‌টিভের চিঠিটা হাতে পেতেই মিঃ নন্দীকে সবাই ঘিরে ধরল।

অশোক বলল, আমাদের খাওয়াতে হবে। মিঃ স্যাণ্ডির এই পাওনা তো আমাদেরও বটে। পাশ থেকে অপূর্ব বলল, মিঃ স্যাণ্ডি যে আমাদের ভালোবাসেন আমরা তার প্রমাণ চাই, ইন্‌সেন্‌টিভের টাকায় মিষ্টি খেয়ে।

গালে হাত দিয়ে মিঃ নন্দী খানিক ভাবেন। সবার মুখের দিকে একবার চেয়ে টেবিল চাপড়ে বলেন, আমি পেলাম ইন্‌সেন্‌টিভ্‌, মিষ্টি খাবি তোরা? এ কি মামার বাড়ি পেয়েছিস না কি?

অপূর্ব বলল, জানই তো আজকালের মামাদের কাছে মডার্ণ ভাগ্নেদের পাত্তা মেলে না। তবে আমরা মিঃ স্যাণ্ডিকে কখনোই অমন কেয় ক'রে দেখি না।

মিঃ নন্দী বুক চাপড়ে বলেন, স্যাখ্‌—এই ইন্‌সেন্‌টিভ্‌ কোম্পানী আমাকে মুখ দেখে দেয়নি। এটা হ'ল কোম্পানীর কাছে আমার বহু বছরের লয়্যালটির রিওয়ার্ড্‌।

অশোক অপূর্ব ওরা একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

সমর বলে, নিশ্চয়ই। সে কি আর বলতে। আমরা তো জানি মিঃ স্যাণ্ডি বহু বছর ধ'রে কিভাবে কোম্পানীর বিজনেস্‌ বাড়িয়ে আসছেন। আর এও জানি মিঃ স্যাণ্ডির রিটায়ারমেন্টের পর আমরা একজন সত্যিকারের সাচ্চা মানুষকে হারাব।

সমরের কথার কোন উত্তর না দিয়ে টেবিলের ওপরকার টুকরো কাগজে হিজিবিজি কাটতে থাকেন মিঃ নন্দী।

মুরারি বলে, ভাবছ কি নন্দী?

—ভাবছি তোদের কথা।

সমর বলে, আমাদের কথা এত ভাবার কি আছে? যাহোক তবু তুমি আমাদের কথা ভাবছ।

আঙুল উঁচিয়ে মিঃ নন্দী বলেন, স্যাখ্‌—তোরা চলিস্‌ ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। ভেবেছিস আমি খুব বোকা।

অপূর্ব বলে, যাঃ বাবা। এতে আবার ডাল পাতার কি এল? তুমিই বা বোকা হ'তে যাবে কেন? তুমি ইন্‌সেন্‌টিভ্‌ পেয়েছ, আমরা খেতে চেয়েছি। এই আর কি? কিন্তু তুমি না খাওয়ালে আমরা তো আর জোর ক'রে খেতে পারি না?

সমর বলল, এতে অবশ্য আমাদের কিছুই হ'বে না। ফর্‌ ইওর প্রেস্‌টিজ্‌ সেক্‌ আমরা খেতে চেয়েছিলাম।

—তোদের দেওয়া ওই প্রেস্‌টিজের আমি নিকুচি করি। তোরা আমার প্রেস্‌টিজ্‌ না দিলে আমার কি কিছু আটকে থাকবে রে?

মুরারি বলে, আটকাবে কেন? কেউ কারও প্রেস্‌টিজ্‌ যেমনি আটকাতে পারে না, তেমনি দিতেও পারে না। ওটা পুরোপুরি নিজের ব্যাপার।

হঠাৎ মিঃ নন্দী একটু নরম হ'য়ে পড়েন।

ডট্‌-পেন্‌টায় কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলেন, এই তো সেদিন ভবেশ রায় ইনসেন্‌টিভ্‌ পেল। কই, খাওয়াল তোদের?

সমর বলল, আমরা তো আর যার তার কাছে খেতে চাইতে পারি না।

—তা পারবি কেন? তোরা যে চামচিকের দল।

অপূর্ব বলল, তুমি আমাদের চামচিকেই বল আর ছুঁচোই বল মিষ্টি আমরা চাই-ই। আচ্ছা মিঃ

স্যাণ্ড, জীবনে কোনদিন ভালো জামা জুতো পরলে না, ভালো মন্দ খেলে না। ব'লতে পার তোমার ওই লাখখানেক ব্যাংক-ব্যালান্স্ আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কি হবে?

মিঃ নন্দীর মেজাজটা আবার তিরিক্ষি হ'য়ে ওঠে। টেবিল চাপড়ে বলেন, আমার টাকা আমি যা খুশি ক'রব। মরার আগে পুঁটলি বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে যাব। টাকা তো আর আকাশ থেকে পড়েনি, ডিমও পাড়েনি। আমার এই ফর্‌টি ইয়ার্সের মেহনতের রোজগার।

অশোক বলে, হ্যাঁ—মেহনৎ তুমি করেছ। কিন্তু তার বিনিময়ে কি পেয়েছ ওই টাকাগুলো জমানো ছাড়া? কোম্পানীই বা কি দিয়েছে তোমাকে? তুমি বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াও 'আই অ্যাম্ দ্য সিনিয়রমোষ্ট এম্প্লয়ি ইন্ দিস্ কন্‌সার্ণ'। কিন্তু কোনদিন কি চোখ খুলে চেয়ে দেখেছ তোমার আশপাশ থেকে পাঁচ-দশ বছরেই অনেকে অফিসার হ'য়ে গেল? আর তুমি সেই বি গ্রেড্ কেরানীর চেয়ার থেকে একচুলও ন'ড়তে পারলে না।

খানিক কি ভাবেন মিঃ নন্দী।

তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সবই নসিব, বুঝলি অশোক। ওসব কপালে লেখা না থাকলে হয় না রে।

সমর বলে, ওসব কথা চুলোয় যাক্। টাকা তো এ্যাদ্দিন জমালে। এবার একটু খাও দাও ফুর্তি কর। নইলে সবই যে ভূতে খাবে।

ভ্রূ কুঁচকে মিঃ নন্দী বলেন, ভূতে খাবে কেন রে? আমার ছেলে রয়েছে কি করতে?

সমর বলে, তবেই হ'য়েছে। ও আজকালের ছেলে। একবারটি তুমি টেঁসে গেলে আর ওকে পায় কে। খুব ফুর্তিসে টাকা ওড়াতে শুরু ক'রবে। একেবারে ম'য় ম'য় মকার ক'রে ছাড়বে

—থাক্, তোদের আর দরদ দেখাতে হবে না। তোদেরকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। কই, আমি যেদিন হার্ট-ট্রাব্‌ল্-এ রাস্তায় প'ড়ে গিয়েছিলাম সেদিন তো কাউকে দেখিনি। আজ তোরা মধুর গন্ধ পেয়েছিস্?

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ মিঃ স্যাণ্ড। তুমি এ কি বলছ? এই সমর চক্রবর্তীই সেদিন তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল।

আবার খানিক ভাবেন মিঃ নন্দী। অনেক কথাই মনে পড়ে তাঁর। মনে পড়ে সুদূর রেঙ্গুনের কথা। কোম্পানীর রেঙ্গুন ব্রাঞ্চের সেই দিনগুলো আজ দূর অতীতে। সেই দিনকাল গেছে বদলে। কোম্পানীর 'সিনিয়ার-মোষ্ট' কর্মী হিসেবে যে সম্মান তাঁর পাওয়া উচিত তাঁর কি আংশিকও পেয়েছেন তিনি? ভাবতে গেলে অশোকের কথাটাই বুকের কাছে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসে। 'নসিব' বলেও তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন না। আর তখনই এই চাকরি-বাকরির ওপরে একটা বিতৃষ্ণা এসে যায়।

অবশ্য কোম্পানীর কাছ থেকে খানিকটা বদান্যতা পেয়েছেন বৈ কি। বয়স আর স্বাস্থ্যের অজুহাতে কোম্পানীর সব চাইতে পুরনো কর্মী হিসেবে ঘণ্টা দু'য়েক দেরীতে আপিসে আসা আবার চারটের পরই চলে যাবার লিখিত অনুমতি তাঁর করা রয়েছে। অবশ্যই এ ব্যাপারে এরিয়া-ম্যানেজার মিঃ তলোয়ারের সুপারিশের জন্যে কৃতজ্ঞ মিঃ নন্দী। রোজ চারটের সময় স্ত্রী আসেন মিঃ নন্দীকে নিতে।

মিসেস্ নন্দী এলেই বালেশ্বর এসে হাঁক দেয়, নন্দীবাবু। মেমসাব আয়া।

হাজার কাজ থাকলেও সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েন মিঃ নন্দী।

সেদিন আপিসে আসার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন মিশন রো'-তে। ক'দিন থেকেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল। ব্লাড্-প্রেশার বাড়লেই এমনি হয়। প্রেশারটা দেখিয়ে উঠতে পারেননি।

সেদিন অবশ্য সমরই মিঃ নন্দীকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার এনে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ক'রেছিল।

চিন্তার ঘোর কাটতে মিঃ নন্দী যখন বাস্তবে ফিরে এলেন সমর অপুর অশোকরা তখন যে যার টেবিলে ফিরে গেছে।

—সমর, একবার শুনে যা।

সমরকে ডাকলেন মিঃ নন্দী।

নিজের টেবিল থেকে হাত জোড় ক'রে সমর বললে, থাক্—অনেক হ'য়েছে নন্দী সায়েব। আমি আর শোনাশুনির মধ্যে নেই।

—শুনেই যা না।

নিতান্ত অনিচ্ছার ভান ক'রেও মিঃ নন্দীর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় সমর।

মিঃ নন্দী একটু খাটো গলায় বলেন, আই উইল্ পে থার্টি রুপিজ্। বাট্ ইট্ ইজ্ অন্‌লি ফর্ ইউ।

টেবিলে এক চাঁটি মেরে সমর বলে, তুমি ঠিক বলছ তো মিঃ ন্যাণ্ডি—আমি ঠিক বিশ্বাস......থ্রি চিয়ার্স ফর্ মিঃ ন্যাণ্ডি, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে......।

টেবিলের সামনে দু'বার ঘুরপাক খায় সমর। সমরকে ঘুরপাক খেয়ে থ্রি চিয়ার্স দিতে দেখে ছুটে আসে অশোক। তারপর অপূর্ব মুরারি ওরা।

মিঃ নন্দীর দিকে হাত বাড়িয়ে সমর বলল, যেমনি কথা তেমনি কাজ। নো ডিলে এ্যাট্ অল। নিকলো রুপাইয়া।

ঘুরে অশোকদের বলে, গ্র্যাণ্ড কিষ্ট্। ইউ ফলো মি।

মিঃ নন্দী পকেট থেকে তিনটে করকরে দশ টাকার নোট বের করে সমরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

সমর এক ঝটকায় নোটগুলো লুফে নিয়ে বলল, লং লিভ্ মিঃ ন্যাণ্ডি।

অশোক অপূর্ব ওরা বলে; লং লিভ্, লং লিভ্।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে সমর বলে, থ্রি চিয়ার্স ফর মিঃ ন্যাণ্ডি।

আর সবাই বলে হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে.........।

ওরা সবাই বেরিয়ে যায় সমরের পেছন পেছন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই কেমন একপ্রকার নীরবতা মিঃ নন্দীকে ঘিরে ধরে। চেয়ারে গা এলিয়ে দেন। গালে হাত দিয়ে চিন্তায় ডুবে যান। চাকরি......ইনসেনটিভ্......সমর অপূর্ব ...ইত্যাদি ইত্যাদি। চোখের সামনে একেকটা ছবি ঘুরপাক খেতে থাকে।

মি. নন্দীর পেছনের চেয়ারে বসে পঞ্চানন এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল! অশোকরা বেরিয়ে যেতে টুক্ করে মিঃ নন্দীর চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায়।

পঞ্চাননই জিগ্যেস করে, হ্যাঁগো নন্দীদা? যাবার সময় ওরা তোমাকে ডাকল না?

পঞ্চাননের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মিঃ নন্দী।

টেবিল চাপড়ে বলেন, হ্যাঁরে পঁচা? তোরা কি আমায় বাঁচতে দিবি না?

পঞ্চানন জানে মিঃ নন্দীর এই রাগ সাময়িক। তাই সাহস করে পঞ্চানন বলে, আমি তোমার কি করলুম।

—আমি তোকে হাড়ে হাড়ে চিনি। যতই ভেক্ সেজে থাকিস্ না কেন তুইও ওদের দলে।

—যাঃ বাবা। আজকালের দিনে ভালো কথাও কাউকে জিগ্যেস করতে নেই। তোমার কাছে আমি মিষ্টিও খেতে চাইনি, তোমাকে হিপ্ হিপ্ হুর্‌রেও দিইনি। আমি শুধু জানতে চাইলাম, তুমি ওদের এক-কথায় অতগুলো টাকা দিলে, অথচ ওরা ভদ্রতা করে তোমায় ডাকল কি না? এতে আমার লাভ লোকসানের কি আছে? তাছাড়া নন্দীদার কাছে আমি ওভাবে খেতে চাইবই বা কেন? আমি কি জানি না অমন দু'পাঁচ জনকে খাওয়াবার ক্ষমতা মিঃ নন্দীর সব সময়ই থাকে।

পঞ্চাননের কথায় মিঃ নন্দী আবার নরম হয়ে পড়েন।

—আমার বুকটায় হাত দিয়ে ভাখ্ এখানটা মেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমার কি ইচ্ছে করে না ইন্‌সেনটিভের টাকায় আমি তোদেরকেও খাওয়াই? এই যে আমার পাশে বসে রয়েছে মিঃ দত্ত। যদিও

নিউকামার এ্যাণ্ড ফার জুনিয়র টু মি, তবু ওকেও খাওয়ানো আমার কর্তব্য। হি ইজ মাই কলিগ এ্যাণ্ড ফ্যামিলিয়ার টু মি।

পঞ্চানন সায় দিয়ে বলে, ছি ছি ছি নন্দীদা। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ভদ্রতার খাতিরেও একবার তোমায় ডাকল না?

—ভাখ পঁচা, ওই টাকা ওদেরকে আমি ভিক্ষে দিয়েছি। আমি তোদেরকেও খাওয়াব। ওদের চাইতে ভালো করে—

বলতে বলতে ফোনটা তোলেন। ক্যানটিনে ডায়াল ক'রে বলেন, হ্যালো ম্যানেজার? আমি মিঃ নন্দী বলছি। আমার টেবিলে এখুনি তিন কাপ স্পেশাল কফি পাঠিয়ে দিন। রিসিভার রাখতে যেয়ে চমকে ওঠেন। দরজার দিক থেকে মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ আসে, মিঃ নন্দী, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে.........।

ওরা খাওয় দাওয়া সেরে আসছে। শরীরে এক অসহ্য জ্বালা অনুভব করেন মিঃ নন্দী। জোরে রিসিভারটা রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দেন। অন্যমনস্কতার ভান করে উত্তরের দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চেয়ে থাকেন। অশোকদের কথাবার্তার টুকরো কানে আসছে আর শরীরের জ্বালাটাকে দ্বিগুণ করে দিচ্ছে।

ফোনটা বেজে ওঠে। বিরক্তির সঙ্গে রিসিভারটা কানে ধরেন মিঃ নন্দী। ওপার থেকে ক্যানটিন্ ম্যানেজারের গলা ভেসে আসে, হ্যালো মিঃ নন্দী? আমি ম্যানেজার বলছি। কফি ফুরিয়ে গেছে। চা খান তো পাঠিয়ে দিই।

—ড্যাম্ ইওর চা। নো নো—আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টি। আই ওয়াণ্ট কফি, স্পেশাল কফি।

পটাস্ করে রিসিভারটা ফোনের ওপর চেপে ধরে বলে ওঠেন, ষড়যন্ত্র। আমার বিরুদ্ধে সবাই ষড়যন্ত্র করছে। নইলে আজ আমি কফি খেতে চেয়েছি, আর আজকেই কিনা কফি নেই। পঁচা......? যা তো, বাইরে থেকে তিন কাপ স্পেশাল কফি নিয়ে আয়। কফি আজ খেতেই হবে।

পঞ্চানন কফি আনতে চলে যায়।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার ঘড়িটার দিকে তাকান মিঃ নন্দী। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা পাচটার দিকে ধাওয়া করেছে। দশ টাকার তিনটে নোট যেন ওই কাঁটার মতনই এসে মিঃ নন্দীর বুকে বিঁধতে থাকে।

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে দুদিন

ডাঃ গৌরমোহন দে

আমাদের বোটটী এখন Neso ও Gasoya দ্বীপ-দুটী পার হয়ে Langara আর Bromoya দ্বীপ-দুটীর মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের এত হৈ হল্লা আর ফোটো তোলার মধ্যেও ক্রিষ্টি তার কর্তব্য কাজ করে চলেছে। আমরা কোথায় দিয়ে চলেছি তার প্রত্যেকটা বর্ণনা সে আমাদের বোঝাতে বোঝাতে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা এবার পশ্চিমের অসংখ্য দ্বীপগুলির মধ্যে দিয়ে হারবারের দিকে ফিরে চলেছি বুঝতে পারলাম। কি সুন্দরই না এই দ্বীপগুলি। প্রকৃতি আর মানুষের সাহায্যে দ্বীপগুলিকে মনোমত করে সাজানো হয়েছে। এই সব দ্বীপগুলির মধ্যে রয়েছে ধনীদের গ্রীষ্মাবাস। তাঁরা ঐ সব বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিজেদের ছোট ছোট মোটর বোটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখতে পেলাম। মাঝে মাঝে কতকগুলি 'বয়া' (buoy) ভাসতে দেখলাম। কেউ যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট করে বসে তাই ওগুলিকে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে।

আমরা দূর থেকে Bygdoy দ্বীপটী দেখতে পেলাম। ওখানে কারখানার ধাঁচে তৈরী বাড়ী দেখলাম। আমাদের গাইড বলে দিলে যে ওটি কারখানার বাড়ী নয়। ওটী হচ্ছে Fram নামক জাহাজের যাদুঘর। ওর মধ্যে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের তৈরী মেরু অভিযানের জন্য ব্যবহৃত Fram জাহাজটি রয়েছে। জাহাজটি ভাসতে ভাসতে ঐখানে ফিয়োর্ডের জলে এসে আটকে যায়। অসলোর অধিবাসীরা Fram জাহাজটীকে ডাঙ্গায় তুলে একটী মিউজিয়াম তৈরী করে তার মধ্যে জাহাজটীকে রেখে দিয়েছেন। টুরিষ্টরা দর্শনী দিয়ে ওর মধ্যে দেখতে ঢোকেন। আমাদের দর্শনী টুরের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে বলে আমরা আর দর্শনী দিলাম না।

ক্রিষ্টি আমাদের এই জাহাজটীর ইতিহাস বলে চলল। এই জাহাজটী তৈরীর পর Fridtjot Nansen ১৮৯৩ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত উত্তর মেরু অভিযানের জন্যে এটাকে ব্যবহার করেন। তারপর Otto Sverdrup ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকার উত্তর দিক আবিষ্কার করতে এই জাহাজটীর সাহায্য নেন। আবার ১৯১০ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত Roald Amundsen দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করবার জন্যে এটাকে কাজে লাগান। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই Fram Museumএর কাছে এসে পৌঁছলাম। ফিয়োর্ডের পাশেই একটী কাঠের পাটাতন জেটীর মত তৈরী করা আছে তার ওপর দিয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম। আমরা বিকালের টুরও নিয়েছি সেজন্যে আমরা গাইডের পেছন পেছন চললাম। যারা বিকালের টুর নেননি তাঁরা হারবারের কাছে নেমে যাবেন বলে মোটর বোটে বসে রইলেন। একটু পরেই মোটর বোটটী স্বস্থানে ফিরে যাবে। আর যাঁরা বিকালের টুর নেননি অথচ ফ্রাম আর কনটিকি মিউজিয়াম দেখবেন বলে স্থির করেছেন তাঁরাও আমাদের সঙ্গে চলেছেন। তাঁরা মিউজিয়ামের প্রবেশ পত্র কিনে নিজে নিজে দেখে বাসে করে সিটি হলের কাছে ফিরে যাবেন। ফ্রাম Museum-এর বাড়ীর ছাদটী ত্রিভূজাকৃতির মত তৈরী আর বেশ বড় আর উঁচু দেখলাম। এই বাড়ীটীর মধ্যেই Fram জাহাজটীকে রেখে দেওয়া হয়েছে। মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকতেই মেরুর দুটী মৃত শ্বেত ভল্লুককে দুপাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এইখানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ক্রিষ্টিকে দাঁড় করিয়ে ফোটো তুলে নিলাম। ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক জাহাজটীর গা ঘেঁসে। নীচে চার পাশে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

দেয়ালে নানা মেরু অভিযানের ফোটো টাঙ্গানো রয়েছে দেখলাম। কোন কোন ছবিতে Nansenএর কার্য্যকলাপের ছবি কোনটা Amundsen-এর ছবি আবার কোনটা জাহাজের অনেক নাবিকদের ছবি।

নীচে ঘুরে ঘুরে দেখার পর আমরা সিঁড়ি বেয়ে জাহাজটার ওপরে উঠে এলাম। Nansen আর Amnndsen-এর ব্যবহৃত জিনিষপত্তর সবই রয়েছে দেখলাম। জাহাজটার প্রত্যেক ঘরগুলো আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। প্রথমে জাহাজের ডেকের ওপর উঠে দেখলাম। পূর্ব্বেকার মাস্তুল দড়ি বসবার জায়গাগুলো। সেগুলো সব অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। প্রথমে আমরা রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের উনুন রয়েছে তারপর হাতা, খুন্তি, খাবার থালা বাটি গেলাস সব টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কয়লা বা কাঠের জ্বালানীর ধোঁয়ায় রান্নাঘরটায় কালোর দাগ সব জায়গায় বর্ত্তমান দেখলাম। তারপর জাহাজের ডাইনিং রুমে ঢুকলাম। সেখানে একটা টেবিলের ওপর খাবারের থালা গেলাস পাতা রয়েছে আর তার চারপাশে কতগুলো মূর্তিকে শীতের পোশাক পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে, যেন তারা ওখানে বসে বসে তাদের আহার সমাধা করছে। তারপর আমরা জাহাজের ক্যাপটেনের ঘরে ঢুকলাম। সেখানে ক্যাপটেন ও অন্যান্য অফিসারের মূর্ত্তিকে শীতের পোশাক পরিয়ে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে॥ তাঁরা এক ম্যাপ খুলে নিজেদের মধ্যে যেন আলোচনা করছেন। তারপর ইঞ্জিন ঘরে নেমে গেলাম। সেখানেও ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য নাবিকের মূর্ত্তি সেখানে দাঁড়িয়ে যেন কাজকর্ম করছে। এই সব মূর্ত্তিগুলো দেখে মনে হল যে এঁরা এখানে যেন উত্তর মেরু আবিষ্কারে রত আছেন। তারপর আমরা জাহাজের অন্যান্য ঘরগুলো দেখে Kon Tiki মিউজিয়ামটা দেখতে গেলাম। এই মিউজিয়ামটা ফ্রাম মিউজিয়ামের কয়েক গজ দূরে অবস্থিত।

Kon Tiki মিউজিয়ামটা ১৯৫৭ সালে তৈরী হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর বালসা গাছের তৈরী ভেলার সাহায্যে আদি ইনকা ইণ্ডিয়ানরা (Pre-Inca Indians) যে আটলান্টিক্ মহাসাগরের মধ্যে পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করতে কখনও পারেনি বৈজ্ঞানিকরা তা বিশ্বাস করতেন। এশিয়াবাসীরাই শুধু ঐসব দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করতেন ও অনেকে ওখানে বসবাস করেছিলেন। এখন যে সব পলিনেশিয়ানরা বাস করছেন তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এশিয়াবাসীরাই, বৈজ্ঞানিকরা মন্তব্য করেছিলেন। ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭ সালে কনটিকি অভিযান আরম্ভ হয়। বালসা গাছের ভেলার সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা ঐসব দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করতে সক্ষম ছিল কি না এই উদ্দেশ্য নিয়েই কনটিকি অভিযান হয়। পেরুর ক্যাল্লাও (Callao) জায়গা থেকে ছয়জন যাত্রী, Knut Haugland, Bengt Danielsson, Thor Heyerdahl, Erik Hasselferg, Torstein Raaby, ও Herman Watzinger ১০১ দিন ধরে দিবারাত্র দাঁড় বেয়ে প্রায় ৪৩০০ মাইল অতিক্রম করে পলিনেশিয়ার কোরাল দ্বীপ রারোইয়াতে (Raroia) ১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্ট পৌছন! সমুদ্রযাত্রার মধ্যে অনেকবার এঁরা হাঙ্গরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভেলাটার নাম ছিল কনটিকি (Kon Tiki)। বালসা বৃক্ষ থেকে ভেলাটা তৈরী হয়েছিল। এই সব বৃক্ষগুলি Ecuador-এর জঙ্গলে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব যুগের ইনকা ইণ্ডিয়ানদের মডেলে এই ভেলাটা তৈরী হয়েছিল। নরওয়েবাসী পর্যটক Thor Heyerdahl ১৯৭০ সালের ১২ই জুলাই পুনরায় আর একটা সামুদ্রিক অভিযান করেছিলেন। তিনিও তাঁর সহকর্মীরা প্যাপিরাস নির্ম্মিত একটা ভেলায় করে মরক্কো থেকে বারবাডোসের (Barbados) ব্রিজটাউনের উপকূলে নিরাপদে পৌছেছিলেন। এই ভেলাটির নাম RA II ও মরক্কো থেকে ব্রিজটাউনের দূরত্ব ছিল ৩২০০ মাইল। এই ভেলাটা কনটিকি মিউজিয়ামে পাঠানো হবে বলে আমরা সেখান থেকে শুনে এসেছি।

পলিনেশিয়ানদের দেবতা Kon Tiki। সেজন্যে তাঁরা দেবতার মূর্তিটা তাঁদের ভেলার পালে এঁকে সাগরে

নৌকাটী ভাসিয়েছিলেন। এই মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকলেই দুটী বড় বড় পাথরের মূর্ত্তি দুপাশে দণ্ডায়মান রয়েছে দেখা যাবে--একটী Konএর আর একটী Tiki-র। Kon ওদের সূর্য্যদেব আর Tiki সূর্য্যদেবের স্ত্রীর নাম। এর মধ্যে একটী ছোটখাটো কৃত্রিম সমুদ্র তৈরী করা হয়েছে। জলের ওপর আসল ভেলাটী ভাসছে, তার ওপরে ছোট ঘরের পাশে অভিযানকারীদের মূর্ত্তিগুলি রয়েছে তাঁরা সকলেই কাজে ব্যস্ত। ভেলাটীর নীচে নানারকমের কৃত্রিম সামুদ্রিক প্রাণী ও হাঙরের দল, আর রয়েছে সামুদ্রিক গাছপালা। তার পাশের ঘরে রয়েছে আদিম যুগের গুহা। ওখানকার আদিবাসীরা পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিদের দেহগুলো ঐ গুহাতে ফেলে চলে আসত। মাঝে মাঝে পর্ব্বের দিনে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সেই অস্থিগুলি ধোওয়া মোছা করে আসত। সেই ঘটনাটী এখানে ভাল ভাবে দেখানো হয়েছে। আমরা এইগুলি দেখে Folk Museum-এর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হওয়াতে গাইড আমাদের সকলকে একটী বাগানবাড়ীর রেষ্টরেন্টে নিয়ে এল। পূর্ব্বে থেকে এখানেই আমাদের আহারের আয়োজন করা ছিল। আমরা স্বামী স্ত্রী ও দুটী অনূঢ়া প্রৌঢ়া ফরাসী মহিলা এক টেবিলে বসে আহার করলাম। তাঁরা নরওয়ের সুদূর উত্তরাংশ থেকে প্লেনে করে বেড়িয়ে ফিরছেন। সেই সব জায়গায় লোকজনের বসতি খুব কম আর শীতও খুব বেশী। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার আমাদের বাসে করে বেশ কিছুদূর নিয়ে গিয়ে সেখানে গাইডের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়ে বাসটী চলে গেল। গাইডের সঙ্গে পায়ে হেঁটে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটী পুরানো বাড়ী ও একটী পুরানো গির্জ্জার কাছে এসে পৌছালাম। বাড়ীটী ও ঐ গির্জ্জাটী দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কার। এ দুটি বড় বড় তখনকার বৃক্ষের গুঁড়ি ও বড় বড় ডালপালা দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

বাড়ীটীর মধ্যে আমরা সকলে গেলাম। বাড়ীর ভতরে একটি মাত্র ঘর। ঘরের এক পাশে শোবার খাট রয়েছে, সেটী গাছের দুটী মোটা মোটা ডাল কেটে তৈরী। বাড়ীর কর্ত্তা, গিন্নী, ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনী, অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরা ঐ একটা ঘরেই পাশাপাশি শুয়ে থাকত। এখানকার জন্যে অন্য একটী বয়স্কা মহিলা আমাদের গাইড হয়ে বুঝিয়ে দিলেন। অনেকে মহিলাটিকে এক ঘরে সকলে কেমন করে রাত কাটাত জিজ্ঞাসা করাতে মহিলাটি হেসে ফেলে বললেন যে এটাই ছিল সে যুগের প্রথা। ঘরটির এক কোণে রান্না করবার বড় একটা উনুন, পাশে বড় বড় কড়াই ও থালা বাসন রয়েছে দেখলাম। সবগুলোতেই রান্নার কালির দাগ রয়েছে। এগুলি কোনটা লোহার ও পিতলের তৈরী। ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের গুঁড়ির টেবিল ও বসবার আসন। ওখানেই ঐ সব গৃহস্বামী ও তার পরিজনরা আহার সমাধা করত। এরপর আমরা গির্জ্জার কাছে গেলাম। সকলেই মাথা নীচু করে গির্জ্জাটাকে সম্মান দিলেন। ঐ দিন ঐ গির্জ্জাতে একটি বিবাহ সমাধা হ'ল। গাইড বুঝিয়ে দিলেন যে এই সব দ্বাদশ শতাব্দীর লোকেরা সবসময়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি করত তবুও এই গির্জ্জাটাকে তারা খুব ভক্তি করত। সেই জন্যে এর গায়ে কেউ কখনও হাত তোলেনি। তাই এখনও এটা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এইগুলি দেখবার পর আমরা আবার বেশ খানিকক্ষণ বনপথ দিয়ে হেঁটে চললাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা আবার কতগুলি পুরানো বাড়ীর নিকট এসে পৌঁছালাম। এগুলিও গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা দিয়ে তৈরী। এই বাড়ীগুলি Norsemen Vikingদের বাড়ী। এখানে আবার অন্য একটী গাইড আমাদের বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল। এ মেয়েটীও ক্রিষ্টির সমবয়সী ও এক ক্লাসেরই ছাত্রী। পরনে ভাইকিংদের মেয়েদের মত পোশাক। এই সব জায়গায় ১৫০টী পুরানো কালের বাড়ী আসল জায়গা থেকে উঠিয়ে এনে রাখা হয়েছে। যে সব জায়গা থেকে এই সব বাড়ী সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সব জায়গার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য এখানে হুবহু নকল করা হয়েছে। আমরা এর কয়েকটী বাড়ীর মধ্যে

ঢুকলাম। এগুলি সব নবম শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মতনই এদের বাড়ীর ভেতরটা, তবে এরা এদের শস্য রাখবার জন্যে বাড়ীর পাশেই আর একটা বড় বাড়ী করত। সব ঘরগুলি ই একরকম গাছের পাতা দিয়ে মাথাগুলো ছাওয়া। নবম শতাব্দী বা তার পূর্ব্বেও ভাইকিংরা এই সব ঘরে বাস করত। এই বাড়ীগুলি একটু উঁচু জায়গায় বসানো হয়েছে। দুই সারি বাড়ীর মধ্যে দিয়ে সরু এক ফালি মেটে রাস্তা চলে গেছে।

এদিকটায় গাছের ছায়াতে বেশ অন্ধকার লাগল। সূর্য্যের প্রখর আলো এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারছিল না। আমরা এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ভাইকিং মিউজিয়াম দেখতে চললাম। গাইড ক্রিষ্টির সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। কেন জানি না ওকে আমরা আমেরিকান টুরিস্টদের সঙ্গে মিশতে দেখলাম না। ও বেশীর ভাগ আমার স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলতে বলতে চলল। আমি ওদের পাশে পাশে চলেছি ওদের কথাবার্ত্তা সব কানে আসে। আমার স্ত্রীকে ক্রিষ্টি বলে যে তার দেহে এখনও ভাইকিংদের রক্ত বইছে। সে যে ভাইকিংদেরই বংশধর তা সে আমার স্ত্রীর কাছে প্রমাণ করতে চায়। কারণ আমার স্ত্রী ওকে প্রথমে জানিয়েছিলেন যে, নরওয়েবাসীদের রক্তে নানা দেশের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। ওদের মধ্যে জার্ম্মান ও অন্যান্য দেশের রক্তের মিশ্রণ যে আছে তা সে পুরাপুরি মানতে চায় না। ভাইকিংরা জঙ্গলে বাস করত। যখন তাদের লোকসংখ্যা বাড়ত তখন তাদের মধ্যে অনেকে বড় বড় নৌকা তৈরী করে সাগরে ভেসে পড়ত। তাদের ব্যবসা ছিল অন্যের জাহাজ লুঠ করা বা অন্য দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের কাছ থেকে খাবার বা অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে নিজেদের ভোগে লাগান। ওখানে গিয়ে যদি তারা দেখতে পেত যে দেশের মধ্যে খাওয়া থাকা ও স্ত্রীলোক বেশ পাওয়া যায় তাহলে তারা সেখানেই থেকে গিয়ে সংসারী হয়ে পড়ত। এদের গির্জ্জার ওপর ভক্তি ছিল না। ঐ সব গির্জ্জার মধ্যে ঢুকে টাকাকড়ি লুঠ করে পালিয়ে যেত। তখনও পর্য্যন্ত এরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেনি। আমরা গল্প করতে করতে Viking Museum-এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এখানেও গাইড আমাদের জন্যে প্রবেশপত্র কিনল দেখলাম। মিউজিয়ামের সামনেই প্রকাণ্ড মাঠ ও ফুলের বাগান রয়েছে। আমাদের বাসটা এইখানেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দেখে এলাম।

ভাইকিং মিউজিয়ামটার মধ্যে প্রকাণ্ড তিনটা হল্ ঘর রয়েছে। মাঝের হল্ ঘরটি সবচেয়ে বড়। এর পাশে কয়েকটি ঘর রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে নরওয়ের পুরানো যুগের সূঁচের কারুশিল্প, মৃৎপাত্র, গহনা আর হেনরিক ইবসেনের (Henric Ibsen) হাতের লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি। তারপর আর একটী ঘরে রয়েছে ১৫০টী পুরানো যুগের সুন্দর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

মিউজিয়ামে ঢুকতেই সামনের প্রকাণ্ড হল ঘরে রয়েছে ভাইকিংদের তিনটি পুরানো নৌকা বা জাহাজ। নৌকার বা জাহাজের ভেতরটা দেখতে হলে পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরের পাটাতনে উঠে দেখতে হয়। সকলেই সেখান থেকে দেখছে, কেউ কেউ ফোটো নিচ্ছে। আমরাও এক এক করে লাইন দিয়ে ওপরে উঠে দেখলাম ও ফোটো নিলাম। এই জাহাজগুলির নাম Oseberg, Gokstad, ও Tune। এই তিনটী জাহাজকেই অস্‌লোর ফিয়োর্ডের (Fjords) মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুনলাম এই জাহাজগুলি প্রায় এক হাজার বছরের বেশী পুরানো। এই তিনটী জাহাজের মধ্যে Oseberg ও Gokstad দুটী জাহাজই উচ্চতায় ও দৈর্ঘ্যে বেশ বড়। এদের মুখের দিকগুলো খুব ছুঁচালো (pointed) আর মাস্তুলগুলি খুব লম্বা। এর এক-এক দিকে ষোলটা করে দু পাশে বত্রিশটী দাঁড় থাকে। এর খোলটা খুব গভীর নয়, সেজন্যে নদী বা যে কোন জলের ওপর এদের নিয়ে তাড়াতাড়ি যাতায়াত করা যেত। এগুলির নাম ছিল ড্রাগন জাহাজ। এই জাহাজের দাঁড়গুলিতে ভয়ঙ্কর মাথা আঁকা রয়েছে। তারা বিশ্বাস করত যে এই ভয়ঙ্কর মাথা আঁকার জন্যে দুষ্ট মৃত আত্মারা এদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এই সব মাথা

গুলির আকৃতি ড্রাগনের মাথার মত দেখতে নয়। দেখে মনে হ'ল যে এইসব মাথাগুলির আকৃতি সমুদ্রের সর্পের মত দেখতে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানরা Vikকে বলে উপসাগর বা ছোট নদী। পূর্ব্বেকার লোকেরা উপসাগর ও ছোট ছোট নদী দিয়ে যাতায়াত করত বলে তাদের ভাইকিং বলা হ'ত।

৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ভাইকিংরা চতুষ্কোণ মাস্তুল ও অনেক দাঁড় বাহিত তিনটী ছুঁচালো মুখ জাহাজে অনেক লোক নিয়ে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে এসে প্রথম আক্রমণ করেছিল। এই সব নেতা ও তাদের অনুচরদের লম্বিত শ্মশ্রু ছিল। তাদের হাতে গোলাকার ঢাল, বর্শা, দুমুখো তরোয়াল আর ধারাল কুঠার থাকত। তারা ঐ উপকূলে অবতরণ করেই নিকটস্থ শহরগুলিতে লুটতরাজ করে ফিরে যায়। সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করল ও বেশ কয়েকজন ঐ দেশের লোককে জোর করে ধরে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। এই সব লোকদের আজীবন ক্রীত-দাসে পরিণত করা হয়। আর লুটপাট করে এই সব জাহাজে চড়ে তারা দ্রুত পালিয়ে যেতে পারত।

ভাইকিংদের দেশ অনেক দীর্ঘ উপকূল আর ছোট ছোট দ্বীপে ভর্ত্তি ছিল। এরা জমি ছেড়ে জলেই বাস করতে ভালবাসত। ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডেও এদের দেখা গিয়েছিল। তার-পর ৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ধীরে ধীরে এই দেশের মধ্যে গিয়ে এরা লুটতরাজ আরম্ভ করেছিল। এরা মধ্য যুগে এই দেশের সমুদ্রের ধারে ধারে অনেকগুলি কেল্লা তৈরী করে বাস করত। পরে ৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন শহরে এরা এদের রাজধানী স্থাপন করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে এরা সমুদ্রোপযোগী আরও দ্রুতগামী জাহাজ তৈরী করেছিল। তখনকার দিনে অন্য কোন দেশ ওদের মত জাহাজ তৈরী করতে পারত না। আর এদের নেতা মারা গেলে তাকে তার নিজস্ব জাহাজে তার নিজস্ব জিনিষপত্রের সঙ্গে কফিনের মধ্যে পুরত ও পরে সেই জাহাজটিকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত। Oseberg ও Gokstad দুটি জাহাজেই এদের নেত রাজা বা রাণীকে এদের অনুচরেরা কফিনের মধ্যে পু তাদের নিজস্ব জিনিষপত্রের সঙ্গে অসলোর ফিয়ো ডুবিয়ে দিয়েছিল। যখন এ দুটি জাহাজ ফিয়োর্ড খে তোলা হয় তখন একটিতে রাজার আর অন্যটিতে রাণী কঙ্কাল ও জিনিষপত্র দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম যুগে এরা আয়ারল্যাণ্ড দেশটাকেই খুব বেশ আক্রমণ করত। তারপর তারা জলপথ দিয়ে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের ওপর প্রায়ই আক্রমণ চালাত। তখন এইস দেশের লোকেদের মধ্যে একতার অভাব ছিল আর তা জন্যই ভাইকিংদের ঐসব দেশ আক্রমণ করার খুব সুবিধ হত। নবম শতাব্দীর শেষভাগে এরা প্যারিসকে অবরু করে লণ্ডনকে আক্রমণ করেছিল। পরাজিত পক্ষে নেতারা এদের স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড দিয়ে এদের কাছ থেকে শান্তি কিনতে বাধ্য হয়েছিল।

৮৫৬ সালে ভাইকিংদের প্রধান Ivan the Bone less ও তার অনুচরেরা ইংল্যাণ্ডের ওপর আক্রমণ চালা ও ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তারা এর উত্তরপূর্ব উপকূল পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়। পূর্ব উপকূল তখন Donelew বলে অভি হিত হ'ত। Wessexএর যুবক রাজা Alfred th Great-এর (৮৭০–৮৯৯) বুদ্ধি ও সাহসের জন্য এর ইংল্যাণ্ডের সমস্ত ভূভাগ জয় করতে পারে নি।

দশম শতাব্দীতে Rolloর (৮৬০-৯৩১) অধীনে আরও একটি বড় দল যুদ্ধ করতে করতে ফ্রান্সের সী (River Seine) পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তখন ফ্রান্সে রাজা ছিলেন Charles the Simple (৮৭৯-৯২৯) তিনি Rolloকে জানালেন যে যদি তিনি খৃষ্টধ দীক্ষিত হন ও অন্যান্য ভাইকিংদের হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করেন তাহলে রাজা চার্লস তাঁকে ফ্রান্সের একটি প্রদেশ স্থায়ীভাবে উপহার দেবেন। Rollo রাজী হন ও তিনিই প্রথম Duke of Normandy হন এই Rolloর বংশধরেরা সেখানে বাস করতে থাকে আর তাদের মধ্যে থেকে অনেকে Christian knight হয়েছিলেন। আর অন্যান্য Northmanরা ভাইকি

আক্রমণকারীদের সঙ্গে এসে তাদের দখল করা জায়গা ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করল।

৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান প্রধান রুরিক (Ruric) ভাইকিংদের একটি দল নিয়ে নদী ও হ্রদের ওপর দিয়ে রাশিয়ার নভোগোরড সহরে আসেন। পরে তাঁর লোকেরা সেখান থেকে ৯০৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসাগরের ওপর দিয়ে প্রাচীর ঘেরা নগরীকে আক্রমণ করেছিল। এই প্রাচীর ঘেরা নগরীটাই হ'ল ইস্তামবুল। বাইজানটাইন সম্রাট তাদের অর্থ ও অবাধ বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে তাদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইসব ভাইকিংদের মধ্যে সকলেই শুধু লুঠতরাজ করবার জন্যে আসত না। তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য ও দেশ আবিষ্কারের নেশায় আসত।

৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নরওয়েবাসী দুই ভাই লেফ (Leif) ও ইনগল্ফ্ (Ingolf) কয়েকজন নরওয়েবাসীকে হত্যা করে নরওয়ে থেকে পালিয়ে যায়। পালাবার সময় তারা তাদের পরিবারবর্গ ও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে নিয়ে যায়। প্রথমে তারা তাদের নতুন আবিস্কৃত দেশ আইসল্যাণ্ডে (Iceland) এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। সেখানে ভেড়া চরানো, জন্তু শীকার করা ও সমুদ্রের মাছ ধরাই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। তাদের দেখাদেখি অনেক নর্থমেনরা (Northmen) সেখানে যেতে আরম্ভ করল। তারা তাদের সমাজজীবন সুষ্ঠু করবার জন্যে সারা দ্বীপবাসীদের নিয়ে একটি পার্লামেণ্ট তৈরী করে তার নাম দিল অলথিং (Althing)। এই পার্লামেণ্টটি ৯৩০ সালে গঠিত হয় ও ৯৯৮ সাল পর্য্যন্ত এটা চালু থাকে। গ্রীস দেশের পরই এটাই প্রথম গণতন্ত্র দেশ বলে অভিহিত হয়। ৯৮২ খৃষ্টাব্দে হত্যার অভিযোগে ওদের একটা দলনেতা (Eric the Red) এরিক দি রেডকে আইসল্যাণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এরিক তার অনেক পরিবারবর্গ, অনুচর, ও অনেক সঙ্গী নিয়ে পঁচিশটা জাহাজে করে অন্য একটা আবিষ্কৃত দ্বীপে চলে যায়। এটা হচ্ছে গ্রীনল্যাণ্ড। সে আরও অনেককে প্রলোভন দেখিয়ে আইসল্যাণ্ড থেকে এই দ্বীপে নিয়ে আসে। তখন এই দ্বীপটা উত্তর মেরুর একটা শস্যহীন দ্বীপ ছিল।

এর অনেক পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আইসল্যাণ্ড থেকে কতগুলি লোক একটি জাহাজ করে গ্রীনল্যাণ্ড পরিদর্শন করতে যায়। তারা মনে করেছিল যে তারা এরিক ও তার সহচরের বংশধরদের দেখতে পাবে। এই সব লোকেদের কোন সংবাদ কয়েক শতাব্দী ধরে না পেয়ে তারা তাই তাদের দেখতে এসেছিল। সেখানে পৌছে তারা কাকেও দেখতে পায় নি। সমস্ত দ্বীপটি জনমানবশূন্য ছিল। পরে শোনা যায় যে ১০০০ খৃষ্টাব্দে এরিকের এক ছেলে লেফ এরিকসন (Lief Ericson) গ্রীণল্যাণ্ড থেকে ৩৫ জন অনুচর নিয়ে জাহাজে করে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছিল। তারা আমেরিকার দুটো জায়গাতে অবতরণ করে। একটা জায়গার নাম Helluland, the land of the flat stone আর দ্বিতীয় জায়গাটির নাম Markland বা Woodland দিয়েছিল। এখানে তারা বসবাস না করে আর একটা জায়গাতে অবতরণ করেছিল। সেখানে তারা সবুজ দূর্বা, প্রচুর জন্তু ও জলে স্যামন মাছ (Salmon) দেখতে পেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চেষ্টা করল। এরা এই জায়গাটির নামকরণ করল গ্রীণল্যাণ্ড। কিন্তু এখানকার Red Indianদের অত্যাচারে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারল না। সেই দেশটি তারা ছাড়তে বাধ্য হ'ল। এর পরেও এদের লোকেরা তিন-তিনবার সেখানে গিয়ে বসবাস করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্যে বাস করতে পারে নি।

ভাইকিংরা যে আমেরিকাতে একদিন এসে কিছুদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল তা কেউ বিশ্বাস করত না। যেখানে তারা অবতরণ করেছিল সেই জায়গাটি এখনকার Newfoundland প্রদেশের মধ্যে ছিল।

১৯৬৩ সালে একজন নরওয়েবাসী এই প্রদেশের একটা অংশ খনন করে নয়টা গৃহের ধ্বংসাবশেষ ও

একটী কামারশালা আবিষ্কার করেন। এগুলি যে ভাই-কিংদের ধ্বংসাবশেষ তা তিনি প্রমাণ করলেন। এই আবিষ্কৃত জিনিষগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এগুলি এক হাজার বছরের পুরানো জিনিষপত্তর। আমেরিকাতে কলম্বস আসার পাঁচশত বছর পূর্বে ভাই-কিংরা সেদেশে প্রথম গিয়েছিল তা প্রমাণিত হ'ল। এই সব বাড়ীগুলোর ধ্বংসাবশেষ লেফ এরিকসন বা অন্য কোন ভাইকিংদের হতে পারে। ইংল্যাণ্ডের ওপর ভাই-কিংদের শেষ আক্রমণের তারিখ ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ। তখন রাজা হেরল্ড সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যুদ্ধে নেমেছিলেন। এই যুদ্ধে রাজা হেরল্ড ও ভাইকিংদের প্রধান Hardvada দুজনেই নিহত হন।

ভাইকিং মিউজিয়ামটি দেখে আমরা পাশের মেরি-টাইম মিউজিয়ামটা দেখব বলে স্থির করলাম। কিন্তু এটা বেলা ৩টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তখন চারটা বেজে গেছে সেজন্য আমরা এটা দেখতে পাই নি। শুনলাম এখানে পুরাকালের কতগুলি নৌকা, নানা রকমের নৌকার মডেল ও মাছ ধরবার সাজসরঞ্জাম আছে।

এরপর আমরা সকলে ভাইজিল্যাণ্ড (Vigeland) উদ্যানটী দেখতে বাসে উঠলাম। এ জায়গা থেকে উদ্যানটী বেশ কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা এতক্ষণ ধরে Bygdoy দ্বীপেই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এখন আমরা দ্বীপটা ছেড়ে উত্তরদিকে এগোতে লাগলাম। অসলো শহর ও আশে পাশের জায়গাগুলি পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। সেজন্যে আমরা যখন শহরে হাঁটছিলাম তখন রাস্তাগুলি খুব উঁচু-নিচু থাকায় আমাদের হাঁটতে খুব কষ্ট হয়েছিল। তাই বাসটি যখন উত্তর অভিমুখে ছুটল তখন আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে সমস্ত জায়গাটী একটী বড় পাহাড়ের ওপর তৈরী হয়েছে। আমরা প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে চলেছি,দুধারে ক্ষেতের জমি রয়েছে। শুনলাম সেইসব ক্ষেতে আলু, রাই, আর ওট (oat)চাষ হয়ে থাকে। তারপর আমরা যেতে যেতে আরও কয়েকটী চাষের জমি দেখলাম সেগুলি খুব সমতল নয়। এরপর দেশটী সমস্তটাই পর্বতময়, সেজন্যে ফিয়োর্ডের আশে পাশে ও Glommen Valleyতেই চাষ আবাদ হয়ে থাকে। এদেশে কয়লার খনি নেই সেজন্য এরা নদী থেকে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার তৈরী করে সমস্ত কাজ চালায়। যেতে যেতে দুপাশে গোচারণ ভূমি দেখতে পেলাম। আর সেখানে বলিষ্ঠ গাভীদের চরতে দেখলাম। এদেশের ধনসম্পত্তি বলতে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। সেখান থেকে এরা জাহাজী কাঠ আর কাগজ তৈরী করবার গাছ প্রচুর পরিমাণে আহরণ করে নানা দেশে রপ্তানী করে। তারপর আছে নদী ও সাগরের জলে প্রচুর মাছ। নানা দেশে মাছ ও মাছের তেল (cod liver oil) আর হাঙরের তেল রপ্তানী করা হয়ে থাকে। বাসটী খুব দ্রুত চলেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ এখনও হ্রাস পায়নি। কাচের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাগুলোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আবার বাসটী যখন পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে উঠতে থাকে তখন মাঝে মাঝে আমরা ছায়া পাই আর অন্যধারের যাত্রীদের মুখে গিয়ে পড়ে সূর্য্যের প্রখর তাপ। এদিক দিয়ে কোন ট্রেনের লাইন পাতা দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে নরওয়ে দেশটী পর্বতময়। সমস্ত জায়গায় রেল লাইন পাতা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই দক্ষিণ দিক দিয়ে একটী রেল লাইন পাতা হয়েছে, সেটী অসলো শহর দিয়ে Trondheim শহরের মধ্য দিয়ে Bergen শহরে গিয়ে মিশেছে। Bergen শহরটী সুদূর পশ্চিমে উত্তর সাগরের ধারে অবস্থিত। অসলো শহরটী ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহ্যাগেনের উত্তর পশ্চিমে ৩০০ মাইল আর ষ্টকহোমের পশ্চিমে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

বেশ কয়েক মাইল ঘুরতে ঘুরতে আমরা Vigeland উদ্যানের গেটের ধারে এসে পৌঁছালাম। এখানে আমাদের সকলকে নামিয়ে দিয়ে বাসটী চলে গেল। গাইডের সঙ্গে আমরা দলবল চলেছি। সূর্য্যের তাপ এখনও অসহ্য তারপর ঘুরে ঘুরে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা আর সঙ্গীদের সঙ্গে পা ফেলে

চলতে পারলাম না। ওঁরা এগিয়ে চলেছেন আর আমরা ধীর গতিতে চলেছি। প্রশস্ত রাস্তার দু পাশের ছোট ছোট সুন্দর ফুলে ভরা বাগানটী ও ছোট ছোট শিশুদের ফোয়ারার জলে স্নান করা দেখতে খুব ভাল লাগল। একটু দূরে ছোট্ট একটা হ্রদে নরনারীদের সন্তরণ আর হাসির হৈ হল্লা আমাদের কানে এসে পৌছায়। চোখ মেলে তাদের দেখি। নারীরা তাদের অর্দ্ধনগ্ন দেহবল্লরী এলিয়ে দিয়ে দয়িতদের বুকে আশ্রয় নিয়ে সূর্য্যস্নান করছে। রাস্তার দু ধারে থামের পর থাম চলছে। সেই থামের গাত্রে আধুনিক ভাস্কর্য্য শিল্পের নমুনা দেখে আমরা হতবাক্ হয়ে গেলাম। নগ্নমূর্তিদের প্রেমালাপ সাধারণের চক্ষে যদিও খুব দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় তবুও ঐ সব মূর্তিগুলো দেখে শিল্পীর শিল্পকলাকে প্রশংসা না করে আমরা থাকতে পারলাম না।

আমাদের গাইড ক্রিষ্টি আমাদের দুজনকে তাদের সঙ্গে দেখতে না পেয়ে ছুটাছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। ও মনে করেছিল যে আমরা বোধ হয় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ও আমাদের কাছে এসে দেখল যে, আমরা খুব ধীর গতিতে শিল্পকলা দেখতে দেখতে চলেছি। আমাদের কাছে এসে সে বেশ অস্থিরতা প্রকাশ করে বলল যে, দূরের সুউচ্চ মিনার আর তার আশেপাশের ভাস্কর্য্যগুলি না দেখে ফিরলে উদ্যানটীতে আসার কোন মানে হয় না। ওর সঙ্গে সঙ্গেই পা ফেলে মিনারের দিকে এগিয়ে চললাম। মেয়েটী এত ভাল যে তার আমাদের ওপর একটু রাগও হলো না। আমাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে কইতে চলল। প্রকাণ্ড উদ্যানটী ৭৫ একর জমি নিয়ে তৈরী হয়েছে। বিখ্যাত স্থপতিবিদ্ Adolph Vigeland (৮৬৯-.৯৪৩) এই উদ্যানটির স্রষ্টা। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থ এই উদ্যানের জন্যে উৎসর্গ করে গেছেন। যে সব ভাস্কর্য্যের শিল্পের নিদর্শন দেখলাম আর মিনারের কাছে গিয়ে দেখব তা সবই পাথর লোহা আর ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েক বছর ধরে তিনি এটিকে দর্শনীয় করে তুলেছেন। এখানে ১৫০টি মূর্তি রয়েছে।

আমরা আমাদের পরিশ্রান্ত দেহ ও ক্লান্ত পদযুগল নিয়ে ক্রিষ্টির সঙ্গে মিনারের ধারে এসে উপস্থিত হলাম। ক্রিষ্টি সেই যে আমাদের সঙ্গে উদ্যানটির খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে করতে এসেছে তা মিনারের কাছে এসেও থামল না। সেই বর্ণনা করে আর প্রত্যেক শিল্পের ভাব বুঝিয়ে চলেছে। ওখানে গিয়ে যা দেখলাম তার তুলনা নেই। অসংখ্য নগ্ন মনুষ্য ও শিশুদের মূর্তি নিয়ে এই মিনারটি গড়া। তার চারধারে অসংখ্য সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে মিনারের পাদদেশে পৌছালাম। সেই সিঁড়িগুলির চারপাশে অসংখ্য মূর্তি দেখলাম। মানব জীবনের দুঃখময় জীবনটিকে ঐ সব নগ্ন মূর্তি বসিয়ে জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে। তারপর উত্তর পার্শ্বে মিনারের নীচে একসারি মূর্তি রাখা হয়েছে। এই মূর্তিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের দশ-দশা দেখান হয়েছে। নিপুণ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের কারুকার্যে সেই সব ভাস্কর্য্যের মূর্তিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে এটি মানবের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই উদ্যানটি Hoffsbyen নামক জায়গায় অবস্থিত। আমরা উদ্যানটি দেখে বাসে উঠে পড়ে Holmenkollenএর দিকে অগ্রসর হলাম। এখান থেকে ঐ জায়গাটি অনেক মাইল হবে। Fram মিউজিয়াম থেকে Vigeland যেতে যতদূর, Vigeland থেকে Holmenkollen প্রায় তার তিনগুণ দূরে অবস্থিত। এখানে দেখবার জিনিষ হচ্ছে বিখ্যাত স্কী টাওয়ারটি।

আমাদের বাসটী পাহাড়ের ওপরের রাস্তা দিয়ে এঁকে বেঁকে চলল। দুপাশে এদিকে বেশ বড় বড় ফার গাছ দেখতে পেলাম। দূরে জঙ্গলময় পর্ব্বত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নানা রকমের পাখী গাছে গাছে বসে কলরব করছে। শুনলাম এই সব জঙ্গলে ও উত্তর মেরুর দিকের জঙ্গলে মেরু খেঁকশিয়াল, বরফে বাসকারী পেঁচা (snowy owl), স্নো বার্ড, আর বলগা হরিণ খুব পাওয়া যায়। আমরা বেশ কিছুক্ষণ পরে একটী বড় পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌছালাম। এখানে এসে বাসটী

আমাদের সকলকে নামিয়ে দিলে। সামনেই স্কী টাওয়ারটী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটী উচ্চতায় ১৮৪ ফুট, এখানে লিফট (lift) আছে। লিফটে করে এর ওপরে ওঠবার জন্যে প্রবেশপত্র আমাদের কেনা ছিল কিন্তু ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বলে আমাদের ওর ওপর ওঠা হয়নি। অন্যান্য টুরিষ্টরা ওর ওপরে উঠে সব দেখে এলেন। প্রত্যেক বছর এখানে স্কী প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। অন্যান্য দেশ থেকে অনেকে এখানে প্রতিযোগিতা করতে আসেন। অনেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরা এখানে এসে প্রতিযোগিতা দেখে গেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গতঃ জহরলাল নেহেরু, ও অন্যান্য দেশের রাজা রাণী ও প্রেসিডেন্টরা। প্রতিযোগীরা ঐ স্কী টাওয়ারের ওপরে উঠে—নীচের একটী নির্ম্মিত রাস্তা দিয়ে সরাসরি একটী বড় কৃত্রিম হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই রাস্তাটী টাওয়ারের ওপর থেকে অনেক নীচে হ্রদের কাছ পর্য্যন্ত এসে থেমে গেছে। জন সাধারণের জন্য বসবার গ্যালারীটী এই হ্রদটীর তিন পাশে রয়েছে।

বাস ষ্ট্যাণ্ডটীর কাছেই স্কী মিউজিয়াম রয়েছে। এর মধ্যে নানা রকমের পুরাতন ও নতুন স্কী (ski) ও তাদের পরপর পোশাক সব সাজানো রয়েছে। ওর মধ্যে ঢুকলেই ওখানকার কর্ম্মচারী আসল স্কী খেলার সবাক্ চিত্র আমাদের দেখালেন। অগণিত দর্শকের ভিড় আর প্রতিযোগীদের স্কী থেকে ঝাঁপ দেওয়া দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। শীতকালেই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে কেননা শীতকালে এই দিকটা সব বরফে ভরে যায়।

এখন প্রায় সন্ধ্যে সাতটা বাজে তবে সন্ধ্যের কোন চিহ্নই এখানে নেই। এখানে সন্ধ্যে হয় রাত দশটায়। আমরা এবার অসলো বিশ্ববিদ্যালয় (১৮১১ সালে স্থাপিত) ও Akershis দুর্গটী (১৩০০ সালে নির্ম্মিত) দেখলাম। এই দুর্গে পূর্ব্বে নরওয়ের রাজারা বাস করতেন। এই পুরাতন দুর্গটীকে খুব ভালভাবে সারানো ও সজ্জিত করা হয়েছে। এই দুর্গে নরওয়ের রাজা উৎসবের সময়ই আসেন। এখন যিনি রাজা আছেন তাঁর নাম Olav V King। ইনি ১৯৫৭ সাল থেকে রাজপদে আসীন আছেন। তারপর আমরা ১৮৪৮ সালে নির্ম্মিত রাজ-প্রাসাদের কাছে এলাম। প্রাসাদের সামনে রয়েছে সুন্দর ফুলে ভরা একটী উদ্যান। দ্বারদেশে প্রহরীরা বন্দুক কাঁধে প্রহরা দিচ্ছে। এখানে রাজা প্রাসাদে থাকলে প্রত্যহ বেলা দেড়টার সময় guard changing ceremony হয় তারপর সেটী কনসার্ট বাজিয়ে সমাধা হয়।

এদেশে রাজার কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম্মই জনসাধারণের দ্বারা নিযুক্ত মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত থাকে। কোন মহিলা নরওয়ের রাজসিংহাসনে বসতে পারবেন না, এই নিয়মটী চিরকাল চলে আসছে। এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর নাম Per Borten। ইনি ১৯৬৫ সাল থেকে আছেন।

১০৪৮ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের প্রথম রাজা তৃতীয় হেরল্ড বা Haardradl III অসলোতে রাজধানী স্থাপন করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নরওয়ে যখন ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অসলোর মূল্য অনেকখানি কমে যায়। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে অসলো শহরটী আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। চতুর্থ Kristianএর সময়ে আবার নতুন ভাবে একটী নগরী তৈরী হল। তার নাম হল Kristian। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে যখন স্বাধীন হল তখন Kristian (ক্রিষ্টিয়ান) নরওয়ের রাজধানী হল। ১৯২৪ সালে দেশের লোক আইন করে Kristian নামটী কে পরিবর্ত্তন করে অসলো নাম রাখলেন।

একটু দূরেই রয়েছে Stortings Gate রাজপথ। এর কাছে এদের জাতীয় থিয়েটার নির্ম্মিত হয়েছে। থিয়েটার ঘরের সামনে বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার Henric Ibsen ও Bjornstjerne Bjornsonএর ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে। আর একটু এগিয়ে গেলে Munch যাদুঘর। এখানে ৩৫০টী পেণ্টিং ও কয়েকটী ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কারুশিল্প রয়েছে। এটী Edward Munch নামক এক ধনী ভদ্রলোক অসলো নগরীকে দান করে গেছেন। এ সব ছাড়া আরও অনেক

থিয়েটারের বাড়ী, সুউচ্চ প্রাসাদ ও প্রশস্ত রাজপথ আসলো নগরীকে সুন্দর করে তুলেছে।

এ দেশে নারী-স্বাধীনতা অন্যান্য দেশের মত বেশ উন্নত দেখলাম। ক্রিষ্টি তার নিজের ঘরের কথা আমার স্ত্রীকে বেশ বলছে শুনতে পেলাম। অন্যান্য ছেলেমেয়ের মত সে তার বাবা-মার কাছে থাকতে চায় না কারণ আজকালকার ছেলেমেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা তাদের বাবা-মা ভালবাসেন না। তাঁরা পূর্ব্বের মত মেয়েদের ঘরেই রাখতে চান, বাইরে বেরুতে দিতে চান না। তাঁরা দেখাশোনার মাধ্যমে মেয়েদের বিবাহ দিতে চান, ভালবাসার মাধ্যমে বিবাহটা তাঁরা পছন্দ করেন না। কিন্তু ক্রিষ্টি চায় অবাধ স্বাধীনতা। তাই সে কলেজের ছুটিতে বাইরে কাজকর্ম করে পয়সা উপায় করে পড়াশোনা করে। মাঝে মাঝে অবশ্য বাড়ীতে গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসে। সে আবার বলতে থাকে যে, সে যদিও নরওয়ের মেয়ে তবুও তার নরওয়ে ভাল লাগে না। শীতকালে সেখানে খুব শীত। কয়েক মাস শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, দিনের আলো ওরা ভুলে যায়। আবার কয়েক মাস কেবল আলো আর আলো তখন ঘরের জানালা কপাট সব পুরু পর্দা দিয়ে ঘরটীকে অন্ধকার করে তবে তারা ঘুমুতে পায়। তাই তার এদেশ ভাল লাগে না। সে ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিহাসে ভারতের অনেক ঐতিহ্য কাহিনী সে পড়েছে তাই সে ভারতে আসবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করছে বলল। এক বার সে নিশ্চয়ই ভারত ঘুরে যাবার আশা রাখে। ওদের ধর্ম্ম আর শিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল যে তাদের জাতীয় ধর্ম্ম Evangelican Lutheran, তবে সমস্ত ধর্ম্মই এদেশে আছে। এদের সরকার গির্জ্জায় প্রতি বছর সাহায্য দান করে থাকে। সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিনা পয়সায় তাদের পড়ানো হয়। অসলো আর বারজেন শহরে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের বাসটী হারবারের কাছে এসে থেমে গেল। আমরা সকলেই বাস থেকে নেমে পড়লাম। গাইডকে অনেকে কয়েকটী ক্রোনার বকশিস করলেন। আমরা ওকে সত্যিই ভালবেসেছিলাম। ওকে আমরা ডলার বকশিস করলাম। অনেকে ওকে কিছু না দিয়েই চলে গেল। ওকে ছাড়তে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল। ওর হাসিমুখ দেখে ওকে বিদায় অভিবাদন দিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।
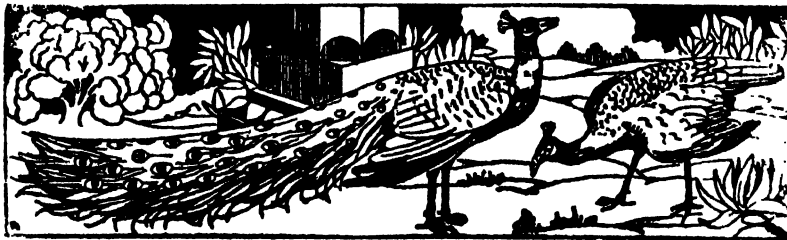
শিক্ষাগুরু প্রফুল্লচন্দ্র

বিমলকুমার ঘোষ

"এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখাইলে কিছু হইবে না।...তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন যাঁহার কিছু দিবার আছে; কারণ, শিক্ষাদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাদান অর্থে বুঝায় ভাব-সঞ্চার।...যে ব্যক্তি তাঁহার নিজের সত্তা, নিজের জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় ফল হয়।...যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয়মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলিই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, অভিধান সমূহই ত ঋষি।"[১] মহান্ শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের এই অমূল্য কথাগুলিই বিশেষ ভাবে মনে আসে। রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণা ও ভারতের রসায়ন শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ শক্তি, উত্তম ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাছাড়া দেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন, সমাজসেবা তথা দেশ-সেবা, হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনা প্রভৃতি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এককথায় তিনি ছিলেন একাধারে 'শিক্ষাগুরু, শিল্পপ্রবর্তক, চিন্তানায়ক, সমাজ-সেবক ও সঙ্কটত্রাতা।' কিন্তু এগুলি সব এখানে আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার আলোচ্য বিষয় আচার্য দেব সম্পর্কে স্বল্প-আলোচিত একটি দিক্—শিক্ষাগুরু হিসাবে আচার্যদেবের কৃতিত্ব। আমার মনে হয়, শিক্ষক হিসাবে আচার্যদেব যে প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন তাতে তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অন্যতমরূপে গণ্য করা যায়। তাঁর হাতে গড়া ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী প্রতিভাশালী ছাত্রদের কথা চিন্তা করলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

নিজে মনে প্রাণে শিক্ষক না হলে শুধু উচ্চ উপাধিধারী হলে যে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃত ভাব-সঞ্চার বা প্রতিভা বিকাশে সহায়তা অসম্ভব, একথা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই শিক্ষা-বিজ্ঞানের একটা কথার সঙ্গে পরিচিত: **Teachers are born and not made।** প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে অনেক অখ্যাত, আদর্শচরিত্র ও ত্যাগব্রতী জাত-শিক্ষক—যাঁদের কারো কারো জীবন প্রত্যক্ষ করবার ও সংস্পর্শ লাভের সুযোগ অনেকে ছাত্র জীবনে পেয়েছেন—তাঁদের কথা চিন্তা করলেই কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব। ১৯৩২ সালে আচার্যদেবের ৭০ বৎসর বয়সপূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সংসারে জ্ঞান-তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান্ করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।"[২] প্রকৃত শিক্ষকের এই হল যোগ্যতা আর এই জন্যই আচার্যদেবকে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের আসনে অভিষিক্ত করেছেন।

অপরদিকে তিনি ছিলেন সত্যিকার জ্ঞান-তপস্বী

প্রকৃত শিক্ষকমাত্রেরই যা অপরিহার্য গুণ। আজকাল শিক্ষকতার যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তম ছাপ। শিক্ষাদানের কাজে স্বাভাবিক আসক্তি, শিক্ষাব্রতীয় ত্যাগদীপ্ত আদর্শবোধ ও জ্ঞান-পিপাসার পরিচয় কতটুকু আছে সে বিষয়ে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকেও আচার্যদেবের বৈজ্ঞানিক মনের ধারণা কিরূপ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'অধ্যয়ন ও সাধনা' প্রবন্ধের এই কথা-কয়েকটিতে: "অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে সুবর্ণ পদক পেয়েছি বলে গর্ব করেন; এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন বলে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তারবাবু ১৮৭২ সালের অর্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেস্ক্রিপশন করেন, সেকালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন না; আলোচনা না করলে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়।"৩ আবার অতি-বিশেষজ্ঞদের অনেকের মধ্যে অবশ্যজ্ঞাতব্য বা সাধারণ অনেক বিষয়ে জ্ঞানের চর্চার অভাব ও অজ্ঞতাও তাঁর শিক্ষকোচিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। স্বকীয় তীক্ষ্ণ, নির্ভীক অথচ রসসিক্ত ভাষায় তিনি এঁদের শিক্ষার এই অসামঞ্জস্য বা অসম্পূর্ণতার ত্রুটি সংশোধন করে প্রকৃত শিক্ষিত হতে বলেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়: "যাঁরা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত, অর্থাৎ যাঁরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন তাঁদের দেখে সময় সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে তাঁরা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোকে চালান, দুনিয়ায় আর কোনদিকে চেয়ে দেখেন না। চর্মকারের কাছে যেমন Nothing like leather অর্থাৎ দুনিয়ায় চামড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞদের নিকট তেমনি তাঁর Special subject, বিশেষ বিষয়টি—Vibration of the Violin string, বেহালার তাঁতের অনুরণন বা অন্যকিছু।"৪ স্মরণ রাখা দরকার, আচার্যদেব রসায়নে একজন সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ হয়েও বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর এই জ্ঞানচর্চার ব্যতিক্রম হয় নাই। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন: "শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় তাঁহার একজন পাঠকের প্রয়োজন হইত। আচার্যদেব বৃদ্ধবয়সেও সেক্সপীয়র ও এলিজাবেথ যুগীয় ইংরাজী নাট্যসাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন। একবার তাঁহাকে পাড়াইয়া শুনাইবার আহ্বান পাইয়াছিলাম। আচার্যদেব পরে এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং উহা Calcutta Review-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।"৫

আজকের দিনের শিক্ষকদের নিকট সত্যই প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য:

"A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame....Truth not only must inform but also inspire."৬

আচার্যদেব ছিলেন আজীবন ছাত্র—অধ্যাপনার সঙ্গে অধ্যয়ন ও গবেষণা সমান নিষ্ঠার সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে চালিয়ে গেছেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসাস্পৃহা ছাত্রদের সামনে জীবন্ত উদাহরণ ও জ্বলন্ত প্রেরণার কাজ করেছে। তাঁর মত ঋষিতুল্য শিক্ষকের পক্ষেই এরূপ প্রেরণা সম্ভব। এ সম্পর্কে আচার্যদেবের নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "জ্ঞানের অনুশীলন আমি করে থাকি। আমি আজীবন ছাত্র ভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চলে গেছে বুঝতে পারিনি, আজ বার্ধক্যে পা দিয়েও আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘন্টা কাল ভাল পুস্তককে সঙ্গী করে কাটিয়ে দি—দিন সার্থক হয়।" পুনরায় তিনি বলেছেন, "আমি এখনও নিজেকে ছাত্র বলে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও

অন্তর্জীবনে পদার্পণ করেছি ব'লে মনে হয় না।"৭ কিন্তু এ কথা মনে করলে খুব ভুল হবে যে, আচার্যদেব খেলা-ধূলা ও বিশ্রামের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বই-এর পোকা হতে বলেছেন। ঠিক তার উল্টো। প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর মত তাঁর সবদিকে নজর ছিল, যাতে ছাত্রজীবন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পেয়ে সুসমঞ্জস ভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং ছাত্ররা প্রকৃত মানুষ হতে পারে। শুধু বই পড়ে নয়, হাতে কলমে ও প্রকৃতি থেকেও তিনি শিক্ষা নিতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "শেখবার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়তাম। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হত। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, 'বাঙ্গালীর ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিশের খোলে তুলো পুরে দেওয়া, কেবল ঠাসো আর দাগো।' তার উপর অভিভাবক সর্বনাশ করছেন—স্কুলের ছুটি হলেই মাষ্টার বাবুকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখবে। এঁরা হচ্ছেন murderers of boys অর্থাৎ বালকহন্তা; কারণ স্কুলের ছুটির পর অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই।...তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে।"৮

স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, উচ্চাঙ্গের বহু-মূল্য গবেষণাগারও বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে দেশে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষা-সমস্যা সহজতর হওয়া দূরের কথা, ক্রমশঃ জটিল পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ছাত্রজীবনেই অধিকাংশের জ্ঞানের স্পৃহা শুকিয়ে যাচ্ছে। যে শ্রদ্ধা ও বিনয় ছাত্রজীবনের প্রধান গুণ তার অস্তিত্ব আজ সমাধিস্থ হওয়ার পথে। কেন এমন হচ্ছে? অবশ্যই এর পিছনে বহু কারণ বর্তমান, যার অনেকগুলিই নিয়ন্ত্রণ করা শিক্ষকের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু এইজন্যই আজ আচার্যদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষকের বেশী প্রয়োজন। মানুষ অন্তর্নিহিত কতকগুলি গুণ বা যোগ্যতা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব তার সেই প্রতিভা বা যোগ্যতা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বর সম্পর্কিত কোন এক আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটা সুন্দর উক্তি মনে পড়ে: 'সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে; কিন্তু অন্তরে কি আছে জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে।"৯ অধিকাংশের ভিতরেই কোন না কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা থাকে—অল্পই হোক বা বেশীই হোক। কিন্তু উল্লিখিত কারণে পরিণামে 'অন্তরে সোনা চাপা'র মতই সে বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে যায়। কবি টমাস গ্রে-র সেই বিখ্যাত লাইনগুলি অনেকেরই স্মরণ হবে:

Full many a gem, of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear.
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air.১০

বস্তুতঃ এই প্রতিভা বা গুণগত বৈশিষ্ট্য ছাত্রজীবনে যখন বিকাশের সুযোগের অপেক্ষায় সুপ্ত থাকে তখন তা বিকাশের পরিবর্তে চাপা পড়ে যাচ্ছে বা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে সমাজে অবাঞ্ছনীয় সমস্যার সৃষ্টি করছে। পরবর্তী কর্মজীবনেও প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা একই ভাবে চাপা পড়ে। সেই জন্যই আচার্যদেবের মত ত্যাগাদর্শে শ্রদ্ধাবান্ জাত-শিক্ষকের আজ বেশী প্রয়োজন। ১৯৬১ সালে উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হল কিন্তু তরপরই সব স্তব্ধ। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন বা যে কোন স্মরণ অনুষ্ঠান তখনই সার্থক হতে পারে যদি আমরা তাঁর আদর্শ কিছুমাত্র গ্রহণ করতে পারি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আচার্যদেব শুধু শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আজীবন ছাত্র। বস্তুতঃ সেই জন্যই ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধের সেই কথা: 'যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে

শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাজুয্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনাপাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। .... যিনি জাত শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে।"১১ আচার্যদেব ছিলেন ঠিক এইরূপ শিক্ষক, যিনি শিক্ষক হয়েও ছাত্র, ছাত্র হয়েও শিক্ষক।

বহুমুখী প্রতিভা সত্ত্বেও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণা ছিল তাঁর প্রধান কাজ—আক্ষরিক অর্থেও তিনি ছিলেন আচার্য। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল একাধারে চিত্তাকর্ষক ও অভিনব। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়: 'তিনি ক্লাসে পড়াইতেনও চমৎকার। গল্পচ্ছলে শিক্ষাদান ছিল তাঁহার রীতি। তিনি প্রায়ই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করিতেন। ইহাতে পাঠ আরও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত। অন্ততঃ আমরা যে খুবই আনন্দ পাইতাম এবং আরও অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ আমাদের হইত তাহা এখনও আমার বেশ মনে পড়ে। ভ্যালেন্সি বুঝাইবার সময় প্রয়োজন হইলে তিনি কখনও কখনও একটি ছাত্রকে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাচিতেন। ইহাতে পড়ানো বেশ আকর্ষণীয় হইত। এক্সপেরিমেণ্টও দেখানো হইত সুন্দর।"১২ ছাত্রদিগকে কি প্রণালীতে তিনি পড়াতেন তা আচার্যদেব তাঁর আত্মজীবনীতে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন: "হাইস্কুল হইতে ছেলেরা যখন প্রথম কলেজে পড়িতে আসে, তখনই তাহাদের মন যথার্থরূপে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী থাকে। কুম্ভকার যেমন কাদার তাল হইতে ইচ্ছামতো মূর্তি গড়ে,—এই সময়ে, ছেলেদের মনও তেমনি ইচ্ছামতো গড়িয়া তোলা যায়। আমি কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ ধরিয়া পড়াইতাম না। ......বাজার চলতি কোন বই অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোন মৌলিক গ্রন্থ হইলে, আমি তাহা পড়িতে পরামর্শ দিই। ......আমি আমার ছাত্রদিগকে রসায়নের ইতিহাস, অক্সিজেনের আবিষ্কার, প্রিষ্টলে, লাভোয়াসিয়ার এবং শীলের আবিষ্কার কাহিনী এবং তাঁহাদের পরস্পরের কৃতিত্ব এই-সব শিখাই তারপর অকসাইড্স অব নাইট্রোজেন, পরমাণুতত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করি এবং ডালটনের আবিষ্কার কাহিনী বলি। এইরূপে নব্যরসায়নীবিদ্যার প্রবর্তকদের সঙ্গে ছাত্রদের মনের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করি। সংক্ষেপে আমি প্রথম হইতেই ছাত্রদের রসায়ন জ্ঞানকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি সভয়ে দেখি, অন্যান্য কলেজ ইতিমধ্যেই পাঠ্যগ্রন্থ অনেকখানি পড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এমন কি পুনরালোচনা চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে, বর্তমানে কলেজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যে প্রণালীতে পড়ানো হয়, তাহার কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। কেবল ছাত্ররা নয়, অধিকাংশ শিক্ষকও গতানুগতিক প্রথার দাস হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকগুলিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে গিয়া নূতন কোন কথা বলিতে চেষ্টা করেন, তবে ছাত্ররা বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে।"১৩

নিজে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন বলে প্রচলিত শিক্ষাদান-প্রণালীর ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। শিক্ষাদানের কাজে বহু অভিজ্ঞতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহজাত দক্ষতার ফলে উন্নত ও সফল শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আচার্যদেবের ধারণা ছিল খুব স্পষ্ট। তাঁর নিজের কথায়: 'সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার (সেকেণ্ডারী এডুকেশন) ব্যবস্থা যদি উন্নততর করা হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ বর্জন করা যাইতে পারে এবং তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ উন্নতি হইতে পারে। ...... (প্রচলিত পদ্ধতির) বিপরীত শিক্ষা প্রণালীর কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। অধ্যাপকরা ছাত্রদের নিকট কেবল কতগুলি গ্রন্থের নাম করেন এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে যে সব সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। ছাত্রেরা ঐ সমস্ত গ্রন্থ পড়ে, তাহাতে যে সমস্ত সমস্যার আলোচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে

চিন্তা করে, নিজেরাই সমাধানের উপায় আবিষ্কার করে এবং কলেজের তর্কসভায় অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সঙ্গে ঐ বিষয় তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই প্রণালীতে ছাত্রের বিশ্লেষণ ও সমীকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যদিও প্রথম প্রথম তাহার পক্ষে এই প্রণালী কষ্টকর মনে হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইহারই মধ্য দিয়া নিজের একটা 'ভাব-রাজ্য, গড়িয়া তোলে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নততর না হইলে এই প্রণালী প্রবর্তিত হইতে পারে না।"[১৪] কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নিছক পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ে বাঁধাধরা বক্তৃতাদানের প্রচলিত রীতি তিনি প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণালাভের অন্তরায় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বক্তৃতা দানের রীতি উঠিয়ে দিতে বলেন নাই, কিন্তু এ পদ্ধতির ত্রুটির প্রতিকারের জন্য তিনি সুস্পষ্ট ও কার্যকর উপায় নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়: "অধ্যাপকদের প্রধান কাজ হইবে মৌলিক গবেষণা। অধ্যাপক যেখানে মনে করেন যে, তাঁহার নতুন কিছু শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে, কেবল সেই স্থলেই তিনি বক্তৃতা দেন, আলোচনা করেন এবং এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের প্রবৃত্তি জাগ্রত করেন।" অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, "অধ্যাপক তাঁহার বক্তৃতায় যদি কেবল পুঁথিপড়া বিদ্যা উদ্গিরণ করেন, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।"[১৫]

ছাত্রজীবনে কোনরূপ অবহেলা বা অযত্ন তিনি সহ্য করতেন না এবং এ বিষয়ে ছাত্রদের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র বীরেশচন্দ্র গুহ তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন:

"Once he found a page from a book on my desk fluttering on the stair-case. He told me that he did not realise that he had such an irresponsible student working in his laboratory. When I tried to explain that it was a tattered book, he was still more angry and asked me why I had not got it bound at a small expense."[১৬]

প্রকৃত শিক্ষকের অন্যতম প্রধান গুণ নিয়মানুবর্তিতা। এবিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ছাত্রদের কাছে জীবন্ত আদর্শ। মেঘনাদ সাহা এ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: "আমি সার পি. সি. রায়ের মতন নিয়মানুবর্তিতা খুব কম লোকেরই দেখেছি। তিনি চিরকুমার ছিলেন বলেই আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে যাঁরা থাকতেন তাঁদের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করে সায়েন্স কলেজের বারান্দাতে পায়চারী করতেন। তারপর বেলা ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত পড়শুনা করতেন। সে সময় তাঁকে বিরক্ত করার সাহস কারও ছিল না। তারপর লেবরেটারীতে গিয়ে বেলা বারটা পর্যন্ত কাজ। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন ও একটু বিশ্রাম। তারপরেই আবার লেবরেটারীতে এসে গবেষণা, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া ইত্যাদি। চারটে নাগাদ বাইরের কাজের জন্য প্রস্তুত।"[১৭] আচার্যদেব বিদেশে থাকাকালেও কিভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন তা তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষ যদি ঠিক কাজ করে, তবে দশগুণ বেশী কাজ করতে পারে। ইংলণ্ড ও ইউরোপে কয়েকবার ভ্রমণকালে আমি যাহাতে ঠিক সকাল সাতটার মধ্যে প্রাতর্ভোজন শেষ করতে পারি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। তাহার ফলে বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে আমি দু'এক ঘণ্টা অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইতাম।"[১৮] স্মরণ রাখতে হবে যে, এরূপ কঠোর সময়ানুবর্তিতা ও পরিশ্রম যাঁর দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ সেই পি সি রায় ছিলেন চিররুগ্ন ও বরাবরই অসুখে ভুগতেন। এরূপ মহৎ জীবন সত্যই বিস্ময়কর ও বিরল।

আচার্যদেব চলে গেছেন, কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বহন করছে ভারতের মুখোজ্জলকারী তাঁর ছাত্ররা। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক ও সমাজসেবী হিসাবে কোন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর নাও রেখে যেতেন, তাহলেও

কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে—প্রথম শ্রেণীর এক দল বৈজ্ঞানিক ও প্রতিভাবান্ ছাত্রের স্রষ্টা হিসাবে অমর হয়ে থাকতেন। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস থেকে ফিরবার পর সহকর্মী ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁহাকে যে প্রীতি সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাতে প্রেসিডেন্সী কলেজের গুণগ্রাহী প্রিন্সিপাল এইচ আর জেম্স্ তাঁর বহু কৃতিত্বের মধ্যে শিক্ষক হিসাবে কৃতিত্বের এই দিক্‌টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন: "তাঁহার আর একদিকে কৃতিত্ব—এবং আমার মতে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব—ডাঃ রায় আমাদের এই লেবরেটারীতে একদল যুবক রসায়নবিদ্‌কে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার আরব্ধ কার্য এই সমস্ত শিষ্য-প্রশিষ্যরাই চালাইবে।"১৯ আচার্যদেব ছিলেন আধুনিক ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের জনক। রসিকলাল দত্ত, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, নীলরতন ধর, বি সি গুহ প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ ছাত্ররা ছাড়াও মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় পদার্থ বিদ্যাবিদ্ ও গণিত-বিদ্ ছাত্ররাও তাঁর কাছ থেকে প্রচুর অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। বস্তুতঃ ভারতে একদল প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদ্ সৃষ্টি তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল তাঁর জীবন। "বিশ্ববিদ্যালয় আমার স্ত্রী, আর ছাত্ররা আমার পুত্র"—রহস্য করে তিনি যে কথা বলতেন তাই ছিল তাঁর প্রকৃত পরিচয়। তাঁর মত সর্বত্যাগী দধীচিকল্প মহাপুরুষ ও সর্বকালের আদর্শ স্থানীয় শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ যেসব ছাত্র ও শিক্ষক পেয়েছেন তাঁরা ধন্য হয়েছেন। একাধারে বহুগুণের অধিকারী এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব দেশের বহুভাগ্যে ঘটে থাকে। আচার্যদেব যে কত উচ্চস্তরের শিক্ষক ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ঋষিতুল্য বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথায়: "এমনি সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ ও উচ্চ চিন্তাধারায় মিলিত ধারা সাধারণত দেখা যায় না। ......কোন দেশে কোন একক মানুষের ভিতরে এই বহুবিধ গুণাবলির সমন্বয় বাস্তবিক পক্ষে সুদুর্লভ; আগামী দিনের মানুষের কাছে এই পরমাশিক্ষকের জীবনাদর্শাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদাহরণ আর কিছু থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই।" ২০

তথ্যপঞ্জী

১। স্বামী বিবেকানন্দ—শিক্ষা-প্রসঙ্গ (স্বামীজির শিক্ষা সম্পর্কিত বাণী ও রচনার সংগ্রহ), পৃঃ ৬০, ৭৬, ৯৫ (১ম সং, ১৩৬২)।
'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত অনুবাদের সঙ্গে দু'এক স্থলে সামান্য পার্থক্য আছে। (দ্রষ্টব্য, অষ্টম খণ্ড—পৃঃ ৩৯৮)।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অভিনন্দন। ১৯৩২ সালের "প্রফুল্ল জয়ন্তী" সংখ্যা থেকে 'কল্যাণী' শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যায় (১৯৬১) পুনর্মুদ্রিত।

৩। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধ্যয়ন ও সাধনা, পৃঃ ১১ ('জনশিক্ষা সংস্করণ গ্রন্থমালা'র প্রথম প্রকাশিত সংস্করণ। প্রকাশের তারিখ অনুল্লিখিত (১৯৩২?))।

৪। ঐ—ঐ, পৃঃ ১৬।

৫। গোপালচন্দ্র মজুমদার—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও দৌলতপুর কলেজ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (১৮৬১—১৯৬১) জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ (দেবীপদ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য সম্পাদিত), পৃঃ ১৪৫।

৬। Rabindranath Tagore—Creative Unity, (Macmillan's) Indian Edition, 1925. P. 187 (An Eastern Universiiy).

৭। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধ্যয়ন ও সাধনা, পৃঃ ২, ২০।

৮। ঐ—ঐ, পৃঃ ৩২।

৯। শ্রীম-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৩ (৮ম সংস্করণ, ১৩৫৫)।

১০। Thomas Gray—Elegy Written In A Country Churchyard, lines 53—56.

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আশ্রমের শিক্ষা। বিচিত্রা, পৃঃ ২৬।

১২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বিজ্ঞানীগৌরব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭১। পৃঃ ৫৬।

১৩। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আত্মচরিত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫ (দ্বিতীয় ওরিয়েন্ট সংস্করণ, ১৩৬৮)।

১৪। ঐ—ঐ, ঐ, পৃঃ ২৩৭-৩৮।

১৫। ঐ—ঐ, ঐ, পৃঃ ২৩৮; ২৩১।

১৬। B. C. Guha—Acharya Prafulla Chandra Ray and Indian Science, The Statesman, August 2, 1961.

১৭। মেঘনাদ সাহা—আচার্যস্মৃতি। মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৫১, সংখ্যায় প্রকাশিত এবং মেঘনাদ-রচনা-সংকলন, পৃঃ ৫৭-তে পুনর্মুদ্রিত।

১৮। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আত্মচরিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

১৯। ঐ—ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪০।

২০। জগদীশচন্দ্র বসু—আর পি সি রায় প্রসঙ্গে। "প্রফুল্ল-জয়ন্তী" সংখ্যা থেকে 'কল্যাণী'র পূর্বোল্লিখিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

বসন্তে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আবার বসন্ত এলো ধরণীতে ফিরে।
বাতাবী-ফুলের গন্ধ দখিনা সমীরে
আমারে উন্মনা করে। মোর যৌবনের
হারানো সে দিনগুলি অবচেতনের
গভীর হইতে ভেসে ওঠে চেতনায়।
নিবিড় আনন্দে, কত তীব্র বেদনায়
কানায় কানায় তারা পূর্ণ হয়ে আছে।
দূরে যারা চলে গেছে—একদিন কাছে
ছিল তারা। ভালোবেসেছিনু যাহাদের
তাদের ভোলা যে দায়। হৃদয় কাঁদে রে
নিঃসঙ্গ—ঝড়ের রাতে ভগ্ননীড় পাখী।
ফাল্গুন ফিরিয়া এলো। পুষ্পে পুষ্পে শাখী
ভরে ওঠে। সিন্ধুপার হতে পিক আসে।
মানুষ চলিয়া যায়। আর ফেরে না সে।

পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

পরীক্ষার্থীদের আবোল তাবোল পর্যায় শেষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্দশার কারণ স্বরূপ পাঠ্যপুস্তক যাঁরা লেখেন তাঁদের কিছু পরিচয় দেব। অর্থাৎ এই জাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ করার ফলে প্রথম শিক্ষা থেকেই শিক্ষার্থীদের ভুল পথে চালিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী পাঠকালে যদি কখনো নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত পাঠ্যপুস্তক তাদের হাতে আসে, তবে আগের শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী শিক্ষার বিরোধ বাধবেই, এবং তার ফলে আগের শিক্ষা ভুলতে বাকি ছাত্রজীবনটা কেটে যাবার সম্ভাবনা। এইবার কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি।

ছবিতে ভূগোল ও বিজ্ঞান

৫ম সংস্করণ ১৯৬৬

প্রকাশক ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, ৩০।১ কলেজ রো।

১। মনে রাখ: উদ্ভিদের প্রাণ আছে এই কথা আবিষ্কার করেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি প্রমাণ করেন মানুষের মতই গাছেরও শোক, দুঃখ, আনন্দ সবই আছে।...

২। হাঁসের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তবে হাঁস নিজে ডিম ফোটাতে পারে না; মুরগী হাঁসের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে দেয়।

(হাঁস তা হলে গোড়া থেকেই গোঁড়া হিন্দুর হিন্দুত্বে আঘাত দিয়ে আসছে? কিন্তু মুরগী, ডিমপ্রতি কত চার্জ করে তার উল্লেখ নেই। এবং যে এলাকায় মুরগী পাওয়া যায় না, সেখানকার হাঁসদের দুরবস্থার কথা ভাবছি। তবে মনে হচ্ছে যেন কোনো হাঁসকে বাজারে ইনকিউবেটর কিনতে দেখেছি।)

৩। লোহার কড়াই, এ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্র...

৪। মনে রাখ—চাঁদ বরফে ঢাকা, খুব ঠাণ্ডা।

৫। কয়েকটি জানা তারার নাম—কালপুরুষ, সপ্তর্ষি মণ্ডল...

জ্ঞানের আলো

সর্বাধুনিক তথ্য সম্বলিত—১৯৭০

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮।১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থান—দীঘা দার্জিলিং সিমলা...

২। মাধ্যাকর্ষণ: জড়পদার্থের পরস্পর আকর্ষণ শক্তি, যার ফলে সমস্ত জীবজন্তু ও পদার্থ ভূপৃষ্ঠে স্থির থাকে।

৩। ভূমিকম্পের কারণ: কোন কারণে ভূগর্ভের উষ্ণ গলিত পদার্থ আলোড়িত হয়। তার ফলে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে।

৪। 'প্রাচ্যের লিভারপোল' সিঙ্গাপুর বন্দর। নিউ ইয়র্ক প্রাসাদময়ী নগরী। উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর

প্রথম বাঙালী বিদেশে নিত্য প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেন।

প্রথম ভারতীয় মহিলা রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।

৫। ধাতুনির্মিত ছাপার অক্ষর আবিষ্কার করেন গোটেন বার্গ।

৬। দূরবীণ আবিষ্কার করেন লিপার্তি।

৭। ফোটোগ্রাফি—ড্যায়লাপ।

৮। টাইপ-রাইটার—পোলস্।

৯। মোটর গাড়ি—বেলমার বেনজ।

১০। ম্যালেরিয়ার জীবাণু—ল্যাডার্ণ।

১১। এভারেস্ট—হিলারি ও তেনজিং।

(হিলারি ও তেনজিং করলেন এভারেস্ট আবিষ্কার, অথচ নাম হল এভারেস্ট সাহেবের—এ বড়ই অন্যায়। এক কালে রাধানাথ শিকদারের নামও উঠেছিল, কিন্তু তিনিও বিস্মৃত।)

১২। অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যাণ্ডের লেখক লুই ক্যারল।

১৩। লেলিন......যিনি লেলিন নামে বিশ্বে পরিচিত।...

*

সাধারণ জ্ঞানের কি ও কেন
ভারতী প্রকাশক, ৩ বিধান সরণী
নূতন পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৬৬

১। বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকা কে কে? (১) অনুরূপা দেবী (২) প্রভাবতী দেবী সরস্বতি। (বিংশ শতক শেষ হতে চলল, কিন্তু বাংলা উপন্যাস লেখিকা মাত্র দুজন। একজন আবার সরস্বতি! স্ত্রীশিক্ষার অধিক প্রচলন বাঞ্ছনীয় মনে হয়।)

২। পশ্চিমবঙ্গের চার জন বিখ্যাত গায়কের মধ্যে একজন—আলী আকবর খাঁ।

৩। একটি ভাল সাপ্তাহিক পত্রিকা—সাইন এডভান্স। (Cine-সাইন?)

৪। পৃথিবীর সব চেয়ে কম লোক বাস করে কোথায়?—ওশিয়োনিয়ায়। (এটি কোন্ দেশ? - সহজ ছিল সাহারা মরুভূমির নাম করা।)

৫। মেঘ উপরে থাকে কেন—উপরের বায়ু ঠাণ্ডা বলে। (অর্থাৎ নিচের বায়ু গরম সেজন্য মেঘ নিচে নামতেই চায় না?)

৬। সোনা খাঁটি কি না পরীক্ষা করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে—কারণ না, অ্যাসিডে সোনার দাগ পড়ে।

৭। শেকসপীয়ারের জন্ম স্থান ষ্ট্রথফোর্ড অন আভন।

৮। ইংলণ্ডের একজন বর্তমান (১৯৬৬) কবির নাম জর্জ ইলিয়ট।

৯। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা ঘড়ি তৈরি করে কেন?—সেদেশে কাঁচা মালের অভাব বলে, সেখানকার লোকেরা দামী অথচ ছোট জিনিস তৈরি করে। (কাঁচা মাল মানে কি? তিব্বতের লোকেরা ঘড়ি তৈরি করে না কেন, সেখানেও 'কাঁচা' মালের অভাব আছে, এবং সুইজারল্যাণ্ড থেকে বেশিই আছে।)

১০। কোন্ মহিলার প্রথম আকাশ জয়ের কৃতিত্ব—ভেলেণ্টিনা, তেরেস্কোভা, নিকোলায়েভ। (মাত্র তিনজন?)

১১। পৃথিবী দিনে একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে...এই ঘুরে আসাকে বলে আহ্নিক গতি। আর বছরের মধ্যে একবার পৃথিবী মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘুরে আসে। তাকে বলে বার্ষিক গতি।

১২। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী ধাতু সীসা।

১৩। বিভিন্ন যুগের পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য জিনিস কি কি? (যে ৭টির নাম দেওয়া আছে সেগুলির প্রত্যেকটিই কি সপ্তম আশ্চর্য? কোনো লোকেরও ৭ম সন্তান কি ৭টি থাকে?—প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি আশ্চর্য জিনিসের নাম কোথায় পাওয়া যাবে? শুধু ৭টি ৭ম আশ্চর্য? খুবই আশ্চর্য ঘটনা।)

১৪। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার

পেয়েছিলেন। তিনি...পুনশ্চ, শেষ, সপ্তক, ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ...মালিনী মুক্তধারা ইত্যাদি নাটক...রচনা করেছেন।

১৫। বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে সমগ্র জগৎ অশ্রুজলে সিক্ত হল। বিশ্ববাসী এই অমর মানবের জন্য পুষ্পার্ঘ অর্পণ করল।

*

জেনে রাখ : সাধারণ জ্ঞানের অভিনব পুস্তক
শিক্ষক পুস্তকালয়, এ-১৩০ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

১। কলিকাতায় দেখিবার জিনিসগুলির একটি প্ল্যানেটোরিয়াম।

২। প্রথম বাঙালী যাদুকর পি-সি সরকার।

৩। ভারতের সবচেয়ে বড় জনপূর্ণ প্রদেশ— পশ্চিম বঙ্গ। সর্বাধিক জনাকীর্ণ রাজ্য উত্তর প্রদেশ।

৪। প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতের প্রথম আই সি-এস—ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী।

৫। গ্রামোফোন আবিষ্কারক বার্লিনার।

৬। সবাক চিত্রের আবিষ্কারক এডিসন।

৭। ফুঁয়ের সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হয় বলিয়া ফুঁ দিলে আলো নিভিয়া যায়। (বাতাসে তো সব সময়েই ঐ গ্যাস থাকে তবে আলো জ্বলে কি করে? ঝড়েই বা আলো নেভে কেন? তখন কি ঐ গ্যাস বেশি জন্মায়? হাত পাখাতেই বা নেভে কেন?)

৮। ঘন মেঘ বাতাসে ভাসতে ভাসতে ধাক্কা লেগে শব্দ হয়। ওকেই বলে মেঘের ডাক। (ধাক্কা কিসের সঙ্গে লাগে?)

৯। বজ্রাঘাত হয় কেন?—বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বাতাস গরম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে বাতাসে ধাক্কা লেগে ভীষণ শব্দ হয়। ওকেই বলে বজ্রাঘাত। (বিদ্যুৎ প্রবাহ হল কোথায়? ছড়ানো বাতাসে ধাক্কা লাগল কার সঙ্গে? এবং সেই শব্দকেই বা বজ্রাঘাত বলা হল কেন? শব্দ তো মেঘ ডাকলেই আমরা সবাই শুনি, তাহলে সে সময় কি বজ্রাঘাত আমাদের সবার মাথাতেই হয়?)

১০। বুক পরীক্ষার যন্ত্রের নাম স্টেথিসকোপ।

১১। যে যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের ভিতরের ছবি তোলা যায় তার নাম রঞ্জন রশ্মি। (রশ্মির অর্থ যন্ত্র?)

১২। দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হয় হৃৎপিণ্ডে। (হৃৎপিণ্ড এই একস্ট্রা ডিউটি করে আয় বাড়িয়ে ফেলেছে মনে হয়। আয়কর বিভাগ জানে তো?)

১৩। মাছ চোখ দিয়ে শোনে।

১৪। তিমি মাছ ডিম পাড়ে না। (তিমি মাছ হলে তো এ কথা ওঠে?)

১৫। ব্যাং গা দিয়ে জল পান করে।

১৬। সাপ চোখ দিয়ে শোনে।

১৭। কুমীরের জিভ নেই।

১৮। শ্বাসপ্রশ্বাস না নিয়ে অনেক দিন বাঁচে কচ্ছপ।

১৯। হোমা পাখী উড়তে উড়তে ডিম পাড়ে।

২০। এক রকম কাঠ শুকিয়ে কর্পূর করা হয়।

২১। পৃথিবীতে তাল গাছ সবচেয়ে দরকারী। (তাড়ি হয় বলে? পরে এ বিষয়ে আরো বলব।)

২১। আণবিক বোমা ছুঁড়লে এক সঙ্গে বিশাল অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। (অণু = molecule, আণবিক = molecular, কিন্তু molecular bomb কাকে বলে?)

২২। বোমা বৌলার উপন্যাস জাঁ ক্রিসতফ। (চন্দ্রবিন্দু যেখানে সেখানে বসালেই ফরাসী উচ্চারণ হয় না, এবং কোথায় দিতে হবে, তা ঠিক করাও তো কঠিন।)

জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা প্রথম খণ্ড
সংশোধিত সংস্করণ (তারিখহীন)
বেলেঘাটা ভ্যারাইটি ষ্টোর, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড কলিকাতা-১০

১। গণ্ডারের চামড়া বন্দুকের গুলিতেও ফুটো হয় না।

২। তালগাছ সবচেয়ে দরকারী। ইহা ৮০০ রকম কাজে লাগে।

৩। হৃৎপিণ্ড একপ্রকার শারীরিক যন্ত্রবিশেষ।

৪। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণ...

৫। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ ১৯৬১।

৬। ভারতের মুদ্রার নাম টাকা।

৮। লণ্ডন শহরে যখন দুপুর ১২টা তখন কলকাতায় ৫।৫৪, মাদ্রাজে ৫।২১, দিল্লীতে ৫।৮। (ভারতের শহরগুলিতে পুনরায় লোক্যাল টাইম প্রবর্তিত হল কবে থেকে? 'গ্রীনিজ মীন টাইম' হিসাবে ভারতীয় সময় সবত্রই এক জানতাম এতদিন।)

৯। যুদ্ধ জাহাজ ইণ্টার প্রাইজ।

১০। ক্যামেরা আবিষ্কারক—ইষ্টম্যান কোডাক।

*

ছোটদের জ্ঞান সন্ধানী
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ—১৯৭০
রীডার্স হোম, ১২১ সি, তারক প্রামাণিক রোড কলিকাতা-৬

১। এই যানটিতে (রুশ চন্দ্রযান) আছে পতাকা, ...এবং লেলিনের প্রতিকৃতি......

২। প্রযুক্তি বিস্তার......প্রয়োগ কৌশল আয়ত্বে এনে......

৩। তিন নভশ্চর......চন্দ্রযানের ইঞ্জিনটি প্রজ্জ্বলিত করেন.. এই অভিযানে ৮ লক্ষেরও বেশী পথ অতিক্রম করেছে......

৪। দ্বিতীয় এশিয় হাইওয়ে মোটর র‍্যালি প্রতিযোগীতায়...........। ভারতে তৈরী সোভিয়েট সহযোগীতায় কলম্বাস.................বিশ্বভারোত্তলন প্রতিযোগীতায়.........কমনওয়েলথ প্রতিযোগীতায়...

৫। আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সের......(Buenos বুয়েন্স কি করে হয়? এবং Airesএর উচ্চারণ আয়রিস।)

৬। ডাঃ সত্যেন্দ্র সেনের পৌরহিত্যে......

৭। অখণ্ড ভারতের......প্রধান......নেতা ত্রৈলক্য চক্রবর্তী......। (তিনি ইহলকে থাকতেই কিন্তু তাঁর নামে এই বানান। অন্যলকেও আপত্তি করেনি?)

৮। লেলিন জন্মের শতবর্ষ পূর্তিতে কলিকাতার লেলিন সরণীর মুখে......

৯। চিড়িয়াখানায় লোকজনের দেখার জন্য বন্যজন্তু রাখা হয়। (চিড়িয়াখানায় চিড়িয়া কোথায় রাখা হয়?)

১০। স্নায়ুর কাজ দেহের যাবতীয় বিষয় মস্তিষ্কে পৌছানো (দেহের যাবতীয় বিষয় বলতে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজি—সবই বোঝায়। এসব বস্তুকে মস্তিষ্কে পৌছানোর কল্পনায় নতুনত্ব আছে বটে। পরিবহন সমস্যাও কিছু আছে বলে মনে হয় না।)

১১। কৃত্তিবাস—মূল সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদক। কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদক।

১২। জগদীশচন্দ্র আবিষ্কৃত বিজ্ঞান-তরঙ্গ পরবর্তীকালে 'অয়ারলেস টেলিগ্রাফ'-এর সৃষ্টি করে।

১৩। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি—প্রভাবতী দাসগুপ্ত। P. H. D. ব্যাপারটা কি? পাবলিক হেলথ ডিপ্লোমা?

১৪। দর্শনে উৎকর্ষ—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

১৫। প্রত্নতাত্ত্বিক—রাখালদাস......

১৬। সাহিত্যে—বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার প্রভৃতি। (অন্য নাম মনে না পড়লে কি আর করা যাবে।)

১৭। ব্যবসায়ে—ক্যাপ্টেন—নরেন্দ্র দত্ত।

১৮। ......ময়দানে অক্টোরলোনী মনুমেণ্ট........

১৯। বসুবিজ্ঞান মন্দির জগদীশচন্দ্র কর্তৃক ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

*

জানবার কথা (শিক্ষক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত, সংশোধিত নূতন সংস্করণ ১৯৭২)
সিটি বুক এজেন্সি
৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

১। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় তিনশত কোটি বছর আগে। পণ্ডিতগণ ইহাই অনুমান করেন। (কোন্ পণ্ডিতগণ ?)

২। ভূমিকম্প কি ? মাটির ওপরের জল চুইয়ে চুইয়ে মাটির নীচে ঢোকে। তা থেকে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। বাষ্পের প্রচণ্ড চাপে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। (এই একই 'জানবার কথা' অনেক বইতে দেখছি। একই ফ্যাক্টরি, লেবেল আলাদা।)

৩। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ -গৌরীশঙ্কর বা এভারেস্ট। (এভারেস্টের সঙ্গে যে কোন একটা শৃঙ্গের নাম জুড়ে দিলেই শুনতে বেশ লাগে। এ দুটি চূড়া যে একই, সে বিদ্যা লাভ হয়েছে কোন্ বই থেকে ? এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট (১২৮ নয়, শুধু ২৮) আর গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৩,৪৪০ ফুট। তবু দুটি এক ?)

৪। ভারতের প্রধান ভাষার একটি—তেলেগু। (অনেক বইতেই এই তেলেগু দেখি, খবরের কাগজেও দেখি এবং রেডিওতেও শুনি। ভাষাটির নাম কিন্তু তেলুগু। Telugu—তেলেগু হয় কি করে ? হনলুলুকে হনলেলু বললে কেমন শোনায় ?)

৫। বাংলা ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত শুধু বন্দে মাতরম্-এর নাম করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র জাতীয় সঙ্গীত জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে। বন্দেমাতরম্-এর যে অংশ জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃত, তা বাংলা ভাষায় রচিত নয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সম্পূর্ণ গানটিই তাই, মাঝে মাঝে দু-এক লাইন বাংলা আছে।

৬। স্মরণীয় ও বরণীয় বাঙ্গালীর তালিকায় সাহিত্য সাধনায়—বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ সপ্তম স্থানে। এবং এর পরেই রাজশেখর বসু, অনুরূপা, শরৎচন্দ্র, নজরুল, তারাশঙ্কর ও শিবরাম চক্রবর্তী।

বিভূতি বাঁড়ুজ্জে, বিভূতি মুখুজ্জে, মোহিতলাল, বনফুল, প্রমথ বিশী, প্রভৃতি স্মরণীয়ও নন, বরণীয়ও নন। লেখিকাগণ তো অন্ত্যজ। দেশের ও বিদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির বিচারের ভার এইসব অর্ধশিক্ষিত পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের হাতে ছেড়ে দিলে যা হয়।

৭। উদ্ভিদের কি প্রাণ আছে ?—হ্যাঁ, গাছের জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু থেকে তা বুঝা যায়। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু ইহা প্রমাণ করেছেন। (অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র গাছের জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু থেকে আমরা যা বুঝি, তা প্রমাণ করেছেন।)

৮। পৃথিবীতে তাল গাছ অধিক প্রয়োজনীয়। এর ভিন্ন ভিন্ন অংশ অনেক প্রয়োজনে লাগে।

(আমি নিজে ভাবছিলাম তাল গাছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাছ কেন। আমি জানি না কেন এবং পাঠ্যপুস্তক লেখকেরা জানেন কেন। একখানা বই কিনে আনলাম বাণিজ্য বিভাগ থেকে। তাতে যা যা পেলাম তার অংশ বিশেষ এই—

তালগাছের আঁশ থেকেই নাইলন সুতা তৈরি হয়।

ভারতবর্ষ থেকে বছরে ১০০ কোটি টাকার তালগাছ বিদেশে রপ্তানি হয়।

তাল গাছের গুঁড়ি থেকে প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ তৈরি হয়।

ডুবোজাহাজে যে টর্পীডো ব্যবহার করা হয় তা তালগাছ থেকে তৈরি। ভিতরটা কুরে ফাঁপা করে তাতে বিস্ফোরক পদার্থ পুরে দিতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধে যত যুদ্ধজাহাজ ডোবানো হয়েছে তা সবই এই তাল-গাছের টর্পীডোর সাহায্যে। তালগাছে তৈরি পেরিস্কোপ সবচেয়ে কাজের। ফাইটার বিমানের দেহের অর্ধাংশ তালগাছে তৈরি। হাইড্রোজেন বোমার খোল হিসাবে তালগাছ শ্রেষ্ঠ।

জর্জ ঈস্টম্যান প্রথমে এই তালগাছের পাতার আঁশ নাইট্রিক অ্যাসিডে ফুটিয়ে রোল ফিলম তৈরী করেন। এখানে সিনেমা ফিলম, তালপাতা থেকেই তৈরি হচ্ছে।

যতরকম অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা জগতে চলছে, তার প্রায় সবই তাড়িকে পুনরায় ফার্মেন্ট করে তৈরি।

ক্যামেরার, চশমার ও মাইক্রোস্কোপের লেন্স তাল পাতা থেকেই তৈরি এবং তা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাসম্প্রতি প্রমাণিতহয়েছে।এ লেন্সের চশমা পরলে হানি আপনা থেকেই সেরে যায়।

বর্তমান যুগে তালপাতার একটি বড় ব্যবহার হচ্ছে সিপাহী তৈরি করা। তালপাতার সিপাই ছিল বলে মিত্রপক্ষ গতযুদ্ধে জিতে গেল। হিটলার শেষে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু তালপাতা পাবেন কোথায়? তাই তিনি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

সব উল্লেখ করার স্থানাভাব। এসব ভাল করে না জেনে শুধু তালগাছ শ্রেষ্ঠ লেখা ঠিক নয়।)

৯। মানুষের একমাত্র উপকারী জন্তু গরু।

১০। বজ্রাঘাতের আলো শব্দের আগে আসে কেন?—আলোর চেয়ে শব্দের গতি কম। তাই বজ্রা-ঘাতের আলো আগে দেখা যায়।

(এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে: বজ্র কোনো মানুষের, গাছের বা বাড়ীর মাথায় আঘাত হানলে তবে আলো জ্বলে, এবং শব্দ হয়। কিন্তু বজ্রাঘাত না হলেও শুধু বিদ্যুৎ চমকালে আলো ও শব্দ হয় কেন?)

১১। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ২১ বছর বয়সে লেখা।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌঠাকুরাণীর হাট লেখেন ১৪ বৎসর বয়সে।

১৩। বাইসন—অ্যামেরিকায় বুনো ষাঁড়। (সব বাইসন অ্যামেরিকায় ষাঁড় হয়ে গেছে, খবরটা ভেবে দেখবার মতো। শুধু বাই-সন, বাই-ডটার: একটিও নেই?)

১৪। চাতক ও মাছরাঙা পাখী বৃষ্টির জল পান করে। (অর্থাৎ অনাবৃষ্টির ঋতুতে শুধু সোডাওয়াটার খায়? অথবা বৃষ্টির ঋতুতে কলসীতে বৃষ্টির জল ধরে রাখে ভবিষ্যতের জন্য?)

১৫। আকাশে ইথার নামে একপ্রকার বস্তুকণাও আছে।

*

প্রশ্নোত্তরে ভূগোল-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-সমাজ
ভৌমিক এণ্ড সন্স
১৪০ মাণিকতলা মেন রোড
কলিকাতা-১১

১। শহরে কি কি যানবাহন চলে? ট্রাম, বাস, মোটর,......তাছাড়া এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ীও শহরের যানবাহন।

২। আমাদের বাঙালী বলা হয় কেন?—বাঙলা দেশ আমাদের জন্মভূমি। বাঙলা দেশে আমরা বাস করি, বাঙলা ভাষায় আমরা কথা বলি। আমাদের চলাফেরা ও হাবভাব বাঙালীর মতো। তাই আমাদের বাঙালী বলা হয়।

৩। মরুস্থান কাকে বলে? (এই প্রশ্ন এবং উত্তরে সবস্থানে 'মরুস্থান' শব্দে হ্রস্ব উকার ব্যবহার করা হয়েছে।)

৪। বিশুদ্ধ বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করি। আর প্রশ্বাসের সঙ্গে দূষিত বায়ুসহ নাইট্রোজেন ত্যাগ করি। আমরা নাক দিয়ে শ্বাস টানি এবং প্রশ্বাস ছাড়ি।......আমরা নাক দিয়ে বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে যে অক্সিজেন টানি তাকে বলে শ্বাস। আর দূষিত বায়ুর সঙ্গে যে নাইট্রোজেন ছাড়ি তাকে বলে প্রশ্বাস।

(এই বৈজ্ঞানিক 'তথ্য' গুলির সঙ্গে একাধিক প্রশ্ন জড়িত আছে। প্রথমত শব্দার্থ। আমরা শুধু নিশ্বাস কথাটিতেই টানা ও ছাড়া দুটোই বুঝি। নিশ্বাস প্রশ্বাস মানে যা ছাড়ি ও যা টানি। প্রশ্বাস মানে নাকে যে বায়ু গ্রহণ করা হয়। এই লেখক ঠিক বিপরীত অর্থে প্রশ্বাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

তারপর আছে 'বায়ুর সঙ্গে যে নাইট্রোজেন ছাড়ি'— এ কথার অর্থ কি? লেখক 'বিশুদ্ধ বায়ু' অথবা বায়ু কি জিনিষ তা জানলে এরকম লিখতেন না। নাইট্রোজেন নামক গ্যাসের নামমাত্র শুনেই তার এমন অপপ্রয়োগ এ-জাতীয় বইতে থাকাই তো স্বাভাবিক।

*

প্রশ্নোত্তরে ভূগোল বিজ্ঞান স্বাস্থ্য ও সমাজ
সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭০
নারায়ণ পুস্তকালয় ৩২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

১। বাংলাকে কেন সোনার বাংলা বলে?— আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রচুর সোনার ফসল ফলে এই জন্য আমাদের দেশকে সোনার বাংলা বলা হয়। (সোনার দর তবু তোলা আজ ৪০০ টাকা কেন?)

২। বাংলায় ধান পাট আলু পটল ইত্যাদির সঙ্গে কফিও ফলে। কোন্ জেলায় উল্লেখ নেই।

৩। উদ্ভিদ কাহাকে বলে?—যে জিনিষ মাটি ভেদ করে উপরে উঠে তাকে উদ্ভিদ বলে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক বইয়ের প্রথম নাটিকা ছাত্রের পরীক্ষা মনে পড়ল। কালাচাঁদ মাস্টারের ছাত্র মধুসূদন। অভিভাবকের ইচ্ছা হল, কেমন পড়াশুনা হচ্ছে একবার পরীক্ষা করে দেখা। প্রথমেই সেই দৃশ্যটি।

অভিভাবক॥ কেমন রে মেধো, পুরোনো পড়া সব মনে আছে তো?

মধুসূদন॥ মাস্টারমশাই যা বলে দিয়েছেন সব মনে আছে।

অভিভাবক॥ আচ্ছা উদ্ভিদ কাকে বলে বল্ দেখি।

মধুসূদন॥ যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক॥ একটা উদাহরণ দে।

মধুসূদন॥ কেঁচো।......

এই বইতে উদ্ভিদের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তা পড়েও ঐ কেঁচোর কথা মনে হতে পারে। কিন্তু শুধু কি কেঁচো? জলও তো মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে।—

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল ছলছল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল......।

আগ্নেয়গিরি এলাকায় যে সব উষ্ণ প্রস্রবণ বা geyser আছে তারাও তো তাহলে উদ্ভিদ। এবং এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, সকল উদ্ভিদ মাটি ভেদ করে ওঠে না।

তবে পাঠ্যপুস্তক লিখতে আবার অতশত ভাবে কে?

এ বইতেও শ্বাসপ্রশ্বাসের সংজ্ঞায় একই ভুল।

*

জেনে রাখা ভাল
সর্বাধুনিক ও নির্ভুল খবরাখবর সম্বলিত ত্রয়োবিংশ
সংস্করণ—১৯৭০
রুবী পাবলিশার্স, ১৭২ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

১। ভূমিকম্প হয় কেন? — (পূর্বের বইগুলিতে যা লেখা আছে, এ বইতেও তাই আছে, অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।) এবং প্রাচ্যের 'পিভারপোল'ও একই উচ্চারণ। Liverpool যদি লিভারপোল হয় তা হলে যে সব fool এ রকম বই লেখেন তাঁরা কি সবাই 'ফোল')?

২। সবচেয়ে ভারী ধাতু কিসমাথ।

৩। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ৩০০০ কোটি বৎসর আগে।

৪। (তত্ত্বকথাও আছে, যথা) মানুষের সবচেয়ে ধ্রুব সত্য কি? —মৃত্যু। (জন্ম নয় কেন?)

৫। অক্ষিপট Ratina.

৬। নিমোনিয়া, ডিপথেরিয়া ইত্যাদির জীবাণু নাশক পেনিসিলিন। ডাক্তার ফ্লেমিং ইহা আবিষ্কার করেন। (অসুখের নাম যেমন নির্ভুল, পেনিসিলিন আবিষ্কারকের নামও তেমনি নির্ভুল। "নির্ভুল খবরাখবর সম্বলিত"—এই ঘোষণাতেই তার প্রমাণ।)

৭। কলেরা জীবাণুর আবিষ্কারক জার্মানির কস।

৮। কোন্ মাছে ও পাখীতে ডিম পাড়ে না? তিমি মাছে ও বাদুড়ে।

৯। অ্যালবাট্রস সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক প্রাণী। (তিমির চেয়েও বড়? সমুদ্রের কত ফুট জলের নিচে বাস করে?)

১০। হরিণের শিং আছে, হরিণীর শিং নেই। ('ক্যারিবু' জাতীয় হরিণী বিষয়ে কিছু জানা আছে কি?)

১১। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের সঙ্গে মুখ দেখাতে থাকে।

১২। বড় বড় প্রাণী ভক্ষণকারী বৃক্ষ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

১৩। সলোমান—বাইবেলে এই রাজা বিচারের কাজে প্রসিদ্ধ। (ইনি কি টমাস মানের পূর্বপুরুষ?)

১৪। রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমা (৫০ ম্যাগাটন) ইহা অ্যাটম অপেক্ষা ২৫০০ গুণ বড়। (এই 'ম্যাগাটন' ও '২৫০০ গুণ' এ দুটিতে যদি ওজন ও আকার বোঝায় তা হলে এই ওজন ও আকারের বোঝা বহন করে কে? এক মেগাটন মানে ১০ লক্ষ টন। ৫০ মেগাটন=৫০০ লক্ষ টন। এই ওজনের কোনো বোমা কোনো বিমান অথবা রকেট বহন করতে পারে কি?)

১৫। সাবমেরিন জলের তলা দিয়ে যায় এবং প্রয়োজন মত জলের উপর ভেসে উঠে শত্রুর জাহাজ দেখে নেয়।

১৬। প্যারিস্কোপ, রাজার বেকন, ডাইভ বম্বার, আণবিক বোমা,—(বানান, উচ্চারণ এবং তথ্য তুল্যমূল্য।)

১৭। এরোপ্লেন গ্যাসোলিন নামক একপ্রকার তৈল ও পেট্রল সাহায্যে চলে।

১৮। সিংকোনা গাছের পাতা থেকে কুইনিন তৈরি হয়।

১৯। ফোটোগ্রাফি আবিষ্কারক ডেগার ও নিবাজ।

২০। স্যার নলিনীরঞ্জন সরকারের বাল্যজীবন—(এই পুস্তকের লেখক নলিনীরঞ্জনকে 'স্যার' উপাধি কবে দিয়েছেন উল্লেখ নেই।)

২১। বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক কে ছিলেন? —ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের সিরাকিউসের অধিবাসী আর্কিমিডিস। ইনি 'ইউরেকা' তথ্যের বিশ্লেষক।

২২। সবচেয়ে দীর্ঘ জানোয়ার—জিরাফ। (তিমি নয় কেন?)

২৩। গরুর বসন্তের জীবাণু মানুষের রক্তে মিশিয়ে দিলেই ইত্যাদি। এ টিকার টীকা নিষ্প্রয়োজন।

ঐ একই বই—২৭ সংখ্যক সংস্করণ—১৯৭৩
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

স্বত্ব নামক কোনো শব্দ অভিধানে পাওয়া গেল না। কিন্তু তবু ভাগ্যের কথা যে এই বইয়ের স্বত্ব কেউ মারবে না। আগের ২৩ সংখ্যক সংস্করণের সমালোচনা করেছিলাম অন্যত্র। তার ফলে সামান্য কয়েকটি ভুল সংশোধিত হয়েছে মনে হল। তবে ভুলের সংখ্যা এত বেশি যে তার সকল নমুনা দেওয়া সম্ভব নয়।

এবং অধিকাংশ বইতে যে সব ভুল আছে—গাছের প্রাণ আবিষ্কার, কিংবা কোন প্রাণী মুখে মলত্যাগ করে, সে সবই আছে। এই মিথ্যা এবং কুরুচিপূর্ণ শিক্ষার প্রচলন চলছে এতকাল।

পঞ্চকন্যার একজন মন্দোদরী। বমারকে বম্বার লেখা, বমকে বম্ব এবং পরমাণু বোমাকে আণবিক বোমা লেখা ঠিকই আছে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান বেথেলহাম, রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলায় অনুবাদকারী কৃত্তিবাস

ও কাশীরাম দাস পূর্বের মতোই আছে। বিমান তারপিনে চলে—এটি নবতম সংযোজন। ফোটোগ্রাফির আবিষ্কারক ডেগার ও নিবাজের স্থলে লুই ডেগুয়েরে হয়েছেন। সবই অবশ্য ধ্যানলব্ধ কাল্পনিক নাম- যা পৃথিবীর কেউ জানে না। ডেমলার ডেইনমার হয়েছেন। এবং সেপটি রেজার, ডিপথেরিয়া প্রভৃতির ফ-কে প করা হয়েছে। থার্মোমিটারের আবিষ্কারক ফ্রান্সের ফারেনহিট। (প্রথমত স্থানটির নাম ফ্রান্স নয়, জার্মানি। দ্বিতীয়ত ভদ্রলোকের নাম ফারেনহিট নয়, ফারেনহাইট।) ভারতে যে সব স্থান ইস্পাত কারখানা আছে, তার একটি স্থানের নামে চিত্তরঞ্জন। উল্কা (meteor)-"যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছোটে, উহা উল্কা।" কোন্ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি উল্কা হয়ে ছুটে বেড়ায় তার নাম করা উচিত ছিল।

নলিনীরঞ্জন সরকার এ বইয়ের সপ্তবিংশতি সংস্করণেও 'সার' উপাধি ছাড়েননি। মোর্স টেলিগ্রাম আবিষ্কার করেছিলেন, নোবেল প্রাইজ পান কুরি। কোন্ কবি প্রথম জীবনে কৃষক ছিলেন?—রবার্ট বার্ন্স [ইংলণ্ডের]। নামটি বার্ন্স নয় বার্নস এবং স্থানটির নাম ইংলণ্ড নয়, স্কটল্যাণ্ড। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ডকটর উপাধি দিয়েছেন গ্রন্থকার, নলিনীরঞ্জন সরকারকে যেমন সার দিয়েছেন।

এ পর্যন্ত যা নমুনা দেওয়া গেল, তা অতি সামান্য। সব দিতে হলে রচনাটি আকারে অন্তত পাঁচ গুণ বেড়ে যেত।

ছাত্রদের হাউলার ও পাঠ্যপুস্তক লেখকদের হাউলার—দুরকমই রইল। দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশি হাস্যকর তা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন। ছাত্রদের অশিক্ষার ভিত্তি গড়েছেন এই সব লেখকেরা। তবে এতে শিক্ষাবিভাগ খুশী আছে, এটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

যবদ্বীপের ছায়ানাটক

সন্তোষকুমার দে

ঐতিহ্যমণ্ডিত সুবর্ণযুগে ভারতবর্ষ কূপমণ্ডূকের মত আপন দেশের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—দিগ্‌দিগন্তে সে ছড়িয়ে পড়েছিল আপন গৌরবে। কিন্তু সে ছড়িয়ে পড়াটা ঘটেছিল যোদ্ধৃ-বেশে নয়—অন্য দেশ বা রাজ্যের ওপর আপন আধিপত্য বিস্তার করা ছিল না তার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ নিকট ও দূর প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য সূত্রে আর বুদ্ধের অভয় ও অমৃত বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে; অর্থাৎ সে ছিল সংস্কৃতির বাহক। আচার্য সিল্‌ভাঁ লেভিও অনুরূপ উক্তি করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করলে জানা যায়, অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারকেরা তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ, জাপান, কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দূর ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতে সংস্কৃতি, অহিংসা ও শান্তির বাণী পৌঁছে দিতেন। নৌ-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ সেদিন প্রাধান্যলাভ করেছিল। তাই প্রধানতঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই—ভারতীয় বণিকরা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যে জায়গায় তাঁদের বাণিজ্যের বিশেষ রকম সুবিধে হত সেখানেই তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করতেন; তবে সে উপনিবেশ ঠিক বর্তমান যুগের কলোনি ছিল না। তাঁরা কোনদিনই রুদ্র রোষে ধ্বংসের মশাল হাতে নিয়ে যান নি। স্থানীয় অধিবাসী-দের সঙ্গে মিলেমিশে বন্ধুর মত থাকতেন, ভাবের আদান-প্রদান করতেন। কিন্তু একদিন কেন সেই নৌ-পরাক্রম অন্তর্হিত হল, সেই-সব রত্নভরা তরী সাগরজলে তলিয়ে গল, তার সঠিক বিবরণ ঐতিহাসিকরা আজও দিতে পারেন নি। ঐতিহাসিকদের ধারণা—যবদ্বীপ, বালী, সুমাত্রা, প্রভৃতি দ্বীপে ভারতের নৌ-বাণিজ্যিক উপনিবেশগুলি সাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত হয়ে ঐসকলদেশের সংস্কৃতিকে নতুন করে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে প্রধানতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে। ভারতীয় রাজন্যেরা এই-সব দেশে গেছেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার স্মৃতিসৌধ, মন্দির, শিল্পকলা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম, পুরাবৃত্ত প্রভৃতির মধ্যে এ সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখতে পাই।" কবির একথা এইসব দ্বীপাবলীর পক্ষে পরিপূর্ণ- ভাবে সার্থক হয়েছে।

তাই দেখা যায়, সংস্কৃত-ভাষা ও ভারতীয় কৃষ্টি-একদিন সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়া এবং তার আশে-পাশের দ্বীপগুলিতে প্রবেশ করেছিল এবং প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিল। এটা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরকম বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন,—"পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।"

আজকের ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতীয় ঐতিহ্য কিছুটা আপন রূপে, কিছুটা আবার রূপান্তরিত হয়ে প্রচলিত হয়েছে। শ্রীবিজয়, সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ, সর্বত্রই এই একই অবস্থা। সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার এক চমৎকা

সমন্বয় ঘটেছিল। তাই দেখতে পাই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় প্রতীক হল গরুড়—যা সংস্কৃত পুরাণ থেকেই আহৃত; তা ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত আজও সেখানে সর্বত্র প্রচলিত; বিশেষ করে যবদ্বীপে। এক কালে ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপাবলীর গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তার অনেক গেছে আবার কিছু কিছু এখনও অক্ষত আছে। ছায়ানাটক এমনিধারা এক সুদূর অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র। এই যোগসূত্রকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাগরিকা নামক কবিতাতে (বালী প্রভৃতি দ্বীপাবলী ভ্রমণ সময়ে রচিত) বলেছেন:—

"নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্র লেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে।"

সেই সঙ্গে দ্বীপাবলীকে অভয় দিয়ে মনে মনে বলেছিলেন,—

"রেখো না ভয় মনে—।
তনুদেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।"

ভারতীয় আভরণে বহু পূর্বেই সাগরিকার দেহ ঝলমল করে উঠেছিল।

এবার মূল বক্তব্য, যবদ্বীপের ছায়ানাটকের কথায় আসা যাক। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যবদ্বীপেই মনে হয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব সব চেয়ে বেশি এবং আজও তা অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। এইসব ছায়ানাটকের বিষয়বস্তু বেশীর ভাগ ভারতীয় রামায়ণ মহাভারত থেকেই আহৃত; অবশ্য ওদেশের পৌরাণিক উপাখ্যান থেকেও কিছু কিছু ছায়ানাটক রচিত হয়েছে। তবে রামায়ণ মহাভারত আশ্রিত ছায়ানাটকগুলির আদর সর্বাধিক। এই নাটকগুলি সন্ধ্যা রাতে আরম্ভ হয়ে, মধ্যরাত্রি পার করে, ভোর রাত পর্যন্ত একটানা ৮।৯ ঘণ্টা ধরে একবারও না থেমে অবিশ্রান্ত-ভাবে চলতে থাকে। দর্শকরাও এই দীর্ঘ সময় ধৈর্য না হারিয়ে বেশ আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে শ্রান্তি বা ক্লান্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

ছায়ানাটকের ইতিহাস

বিগত হাজার বছর ধরে যবদ্বীপ ও আশ-পাশের দ্বীপাবলীতে এই ছায়ানাটক স্থানীয় অধিবাসীদের অবসর বিনোদন ও আনন্দদানের সবচেয়ে লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। এক ঐতিহাসিক বলেন, ৮৪০ খৃঃ অব্দের আরও বহু আগে থেকে (অন্তত চার-পাঁচশ বছর) পূর্বযবদ্বীপের রাজাদের এটি একটি অবসর বিনোদনের প্রিয় বিষয় ছিল। এর থেকেই মনে হয় ছায়ানাটক স্মরণাতীত কাল থেকেই যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল। অবশ্য ছায়ানাটক বা পুতুলনাচের লিখিত বিবরণ যবদ্বীপে এগার শতাব্দীর আগে মেলে না। ঐসময় পূর্বযবদ্বীপের রাজা-রাজড়াদের সভায় বেশির ভাগ সময় এই-সব পুতুলনাচ দেখানো হত—গ্রামাঞ্চলেও যে দেখানো না হত তা নয়। সে সময় পুতুলগুলো হত খুব সাদামাটা ধরণের এবং সম্ভবতঃ তাদের হাত পা ও বাহু জোড়া না দিয়ে একখণ্ড গোটা চামড়াতেই তৈরি হত। তাই সেগুলো নিখুঁত অভিনয়ের উপযোগী ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে পুতুলগুলির অনেক সংস্কার সাধন করা হয়। তাদের হাতপা হল টুকরো টুকরো চামড়ায় জোড়া দেওয়া - ফলে পুতুলগুলো হাত পা, মুখ সব ইচ্ছা মত নাড়াতে পারল এবং অভিনয় হয়ে উঠল বেশ সজীব। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুরকর্তা ও যোগকর্তার (যবদ্বীপের দুটি ছোট রাজ্য) পুতুলনাচ দুটি বিভিন্ন ধারায় চলতে লাগল। যোগকর্তার ধারা হল সতেজ ও সরল আর সুরকর্তার ধারা হল মার্জিত ও মনোহর। যোগকর্তার পুতুলনাচে যুদ্ধের দৃশ্যগুলো হল খুব প্রাণবন্ত, পুতুলদের হাত-পায়ের গতি-ভঙ্গি খুব সাবলীল হওয়ায় তারা সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল; আর সুরকর্তার পুতুলগুলো হল আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট; কিন্তু অভিনয়ে যে সঙ্গীতের ব্যবস্থা হল, তা অতি উচ্চাঙ্গের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুতুল নাচে এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা করা হল—সেটা হল

গেরিলা যুদ্ধ দেখানো। ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করেছিল করেছিল, এটা হল তারই ফল। জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করবার জন্যেই এটা করা হয়েছিল; কিন্তু এ নাচে শিল্পের স্থান গৌণ হওয়ায় এটার আদর বেশি দিন থাকল না। দ্বীপবাসীদের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এর অবসান হল। যবদ্বীপের এই পুতুলনাচ কালক্রমে বালী, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল আর ঐসব দেশে নাট্যশিল্প হিসেবে এটা এখনও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ষোড়শ শতাব্দীতে যবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম অধিকৃত হওয়ায় এবং তার ফলে অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়ায়, পুতুলনাচে আবার কিছু পরিবর্তন আসে। সুলতান সুনান গিরি মানুষের আকারে পুতুল তৈরি করে পুতুলনাচ দেখানো ইসলাম-বিরোধী পৌত্তলিক আচার মনে করে বলেন, মানুষের আকারে পুতুল না করে ভিন্নভাবে পুতুলনাচ দেখাতে। কিন্তু সেটা সম্ভব না হওয়ায় পুতুলনাচ কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুনান কুদুস হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যানের পরিবর্তে মুসলিম বীর, আমির হানজার কীর্তিকাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা করে পুতুলনাচ দেখাবার এক ফতোয়া জারি করেন; কিন্তু হুকুম মাফিক ত শিল্প রচনা হয় না; কাজেই এই অভিনব শিল্প সৃষ্টি সম্ভব না হওয়ায়, আবার সেই পুরনো পৌরাণিক নাটকই চালু হল।

উৎপত্তি ও বিকাশ

যবদ্বীপের ছায়া নাটক বা পুতুলনাচ ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ অবদান বলেই অনেকে মনে করেন। চন্দ্রভান গুপ্ত The Indian Theatre (Benares, 1954) বলে যে পুস্তক রচনা করেন তাতে 'দূতাঙ্গদ' বলে একখানি ছায়ানাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে 'রূপরূপকম' কথাটি এবং মহাভারতের দ্বাদশ পর্বে 'রূপজীবন' কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, এগুলি ছায়া নাটক বা পুতুলনাচ ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় ছায়া নাটক প্রদর্শনের উল্লেখ ইতিহাসে মেলে। James. R. Brandon বলেন, ১২৪৩ সালে গুজরাটে 'দূতাঙ্গদ' বলে একখানি সম্পূর্ণ ছায়ানাটক প্রদর্শিত হয়েছিল। (চন্দ্রভান গুপ্তও অনুরূপ কথা বলেছেন)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, চামড়ার তৈরী পুতুল দিয়ে কাপড়ের পর্দায় ছায়া ফেলে ছায়ানাটক প্রদর্শন করা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনের এইসব ছায়ানাটকে রাজা ও রাজমন্ত্রীদের বিষয় নানা গল্প ও উপাখ্যান দেখানো হত। এসব প্রমাণ সত্ত্বেও দু-একজন সমালোচক বলছেন,—না, ছায়ানাটক যবদ্বীপের নিজস্ব শিল্প; এর জন্যে সে ভারতের কাছে কোন রকমেই ঋণী নয়। তাঁদের বক্তব্য হল, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যদিই বা ছায়ানাটক থেকে থাকে, তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে ছায়ানাটকের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বা অভিনয় সংক্রান্ত যেসব প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক আছে তাতে কোথাও ছায়ানাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আমাদের ধারণা, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পুতুল-নাচের বহুল প্রচলন ছিল, পরে রঙ্গমঞ্চে নরনারীরা নিজেরাই অভিনয় করতে আরম্ভ করলে পুতুলনাচের প্রভাব ম্লান হয়ে যায় এবং কালক্রমে লোকে এর কথা একেবারেই ভুলে যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির দীপ হতে যবদ্বীপ তার পুতুলনাচ-রূপ দীপটি জ্বালিয়ে নিয়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের আরও বিশ্বাস, ভারতীয় বণিক্ ও পর্যটকদের সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত যেমন যবদ্বীপ ও তার সন্নিহিত দ্বীপগুলিতে গিয়েছিল, তেমনি ভারতীয় ছায়ানাটকও ঐসব জায়গায় গিয়েছিল, তবে সে দেশের শিল্পীরা নিজেদের প্রয়োজনমত তাকে ভেঙ্গেগড়ে এমনভাবে নিজস্ব করে নিয়েছিল যাতে তাকে একেবারে খাঁটি যবদ্বীপের শৈল্পিক প্রকাশন বলে মনে

হতে পারে। এইরকম অনুমান করার কারণ হল, যবদ্বীপে পুতুলনাচ প্রচলিত হবার অনেক আগে থেকেই (সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী) ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাষ্ট্রতন্ত্র সবই ঐসব দেশে হিন্দু বণিক্ ও বৌদ্ধ প্রচারকদের মারফত পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেখানে ঐগুলি ওদেশের মাটিতে এমনভাবে শিকড় গজিয়েছিল যে তাদের আর সমুদ্রপার হতে আমদানী বিদেশী জিনিষ বলে চেনা যেত না, একেবারে খাঁটি স্বদেশী বলে মনে হত। এইসব ভারতীয় ভাবধারা ঐদেশে পুরাণ, কাব্য, লোকগাথা, গল্প-উপাখ্যানের সঙ্গে এমনভাবে মিশে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে তাদের আর বহিরাগত বলে জানবার উপায় ছিল না।

যবদ্বীপের ছায়ানাটক সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, এইসব ছায়ানাটকের উৎপত্তি হয়েছিল পূর্বপুরুষের পূজা থেকে। যবদ্বীপের ইতিহাসপূর্ব যুগে সেখানকার কলাবিদ্‌রা উপজাতীয় দলপতিদের আত্মাকে পুতুলের ছায়ায় রূপান্তরিত করে তাঁরা যে মৃত নন, তাঁদের বিদেহী আত্মা উপজাতীয় কল্যাণে এখনও পর্যন্ত ব্রতী, এটাই সাধারণ লোকের মনে গেঁথে দেবার জন্যে এই ছায়ানাটকের প্রচলন করেন। তাঁরা পূর্বপুরুষদের বিদেহী আত্মার কাছে জাতীয় কল্যাণের জন্যে এবং তাঁদের কাছে উপদেশ ও নির্দেশ পাবার জন্যে এই ছায়ানাটক প্রদর্শন করতেন। কিন্তু W. H. Rassers—Panji the Cultural Hero : A structural study of religion in Java নামক পুস্তকে বলেন, ভারতীয় ছায়ানাটকের অনুকরণে যবদ্বীপের অধিবাসীরা পূর্বপুরুষপূজার অনুষ্ঠানকে দৃশ্যশিল্পে পরিণত করে ছায়ানাটকের প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকেই যবদ্বীপবাসীরা এ বিষয়ে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল সেটি প্রমাণের জন্যে যুক্তি হল, ভারতীয় নাটকের সঙ্গে যবদ্বীপের ছায়ানাটকের অনেক সাদৃশ্য আছে। খৃষ্টের জন্মের পর থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে যবদ্বীপীয়রা ভারতীয় ছায়ানাটককে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একেবারে আপন করে নেয়, আর সেইজন্যেই দেখা যায়, ভারতীয় নাটকে বিদূষকরা যেমন এক অপরিহার্য পাত্র, যবদ্বীপের সব ছায়ানাটকেও তেমনি আছে সেমার (Semar)। সেমার ছাড়া সেখানে কোন ছায়ানাটক হতে পারে না। এছাড়াও ভারতীয় রামায়ণ ও মহাভারত থেকে এইসব ছায়ানাটকের বিষয়বস্তু আহরণ করার একটা কারণ হল, এগুলি ভারতীয় ছায়ানাটকের কাছে ঋণী। Sheppard নামে আর একজন সমালোচক বলেন, ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ছায়ানাটক কম্বোজে গিয়েছিল।

ছায়ানাটকের শ্রেণী

যবদ্বীপের ভাষায় এইসব ছায়ানাটককে Wajung Kulit বলা হয়। ওয়াজুং কথার অর্থ হল ছায়া আর কুলিট কথার মানে হল চামড়ার ছায়া। এইরকম বলার কারণ হল, পুতুলগুলি মোষের চামড়ার তৈরী। মোষের হাড়ের তৈরী তিনটি দণ্ড চামড়ার পুতুলের দুপাশে আর মাঝখানে লাগানো থাকে যাতে চামড়া গুটিয়ে না যায় আর ঝুলে না পড়ে। মাঝখানের দণ্ডটার সঙ্গে প্রধান দণ্ডটি অর্থাৎ যেটি ধরে পুতুলনাচিয়ে খেলা দেখাবে সেটি লাগানো থাকে।

এই ছায়ানাটক ওদেশে ব্যবসায় ভিত্তিতে চালানো হয় না, অর্থাৎ এই প্রদর্শনীর জন্যে কোন টিকিট বিক্রি হয় না। বিনা পয়সায় জনসাধারণ এইসব নাটক দেখতে পান। কোন সম্পন্ন গৃহস্থ জমিদার বা কখন কখনও গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এইসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। যেমন ধরুন ধান কাটার সময় যে পোষ্‌লী পর্ব পালন করা হয় তাতে এই পুতুল নাচের ব্যবস্থা করা হয়। তখন একে বলা হয় পোষ্‌লী পুতুল নাচ। ধান্যলক্ষ্মী, "দেবী শ্রী" সদয় হয়ে মাঠে মাঠে ধান ফলিয়ে লোকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, তাই সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে সেই উপলক্ষে দেবীর দয়া দাক্ষিণ্য ও ক্ষমতা দেখিয়ে যে নাটক (পোষ্‌লী নাটক) তৈরী হয়, তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

পোষ্‌লী পর্বের পর 'বরিশ দেশ' অর্থাৎ গ্রাম পরিষ্করণ নাটক দেখানো হয়। সমস্ত গ্রামখানি কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তাই নিয়ে এক নাটক

রচনা করে দেখানোর ব্যবস্থা হয়। গর্ভাধান, শিশুর নাভিকর্তনের সময়েও সময়োপযোগী রচিত নাটক দেখাবার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও নানারকম মানতের জন্যেও অনেক রকম পালা আছে। বিদগ্ধ, রুচিসম্পন্ন, কলাবিদ্, সন্তান কামনা যাঁরা করেন তাঁদের জন্যে অর্জুনের জন্ম (অর্জুন লাহির)। সুঠাম, সবল, পৌরুষ-প্রধান সন্তান কামনা করলে ভীমের জন্ম বা 'ভীম বংকুম' শান্তশিষ্ট সুন্দরী কন্যা কামনা করলে 'সুভদ্রার জন্ম' পালা দেখানো হয়। এইভাবের সময়োপযোগী নানা পালা বিভিন্ন সময় দেখানো হয়।

রঙ্গমঞ্চ

এই ছায়ানাটক দেখাবার জন্যে একটা রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চে একটা সাদা পাতলা কাপড়ের পর্দা একটা ফ্রেমে বেশ টানটান করে বাঁধা থাকে। পর্দার ওপর ও নিচে লাল কাপড়ের পাড় লাগিয়ে দেওয়া হয়। গরুড় বা ঈগলপাখীর আকারে ব্রোঞ্জে তৈরি বড় বড় প্রদীপে নারকেল তেল ভর্তি করে মোটামোটা সলতে পরিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হরিদ্রাভ আলোর ছায়া সুমুখের ঐ সাদা পর্দায় পড়ে। আজকাল আবার নারকেল তেলের প্রদীপের পরিবর্তে গ্যাস বা বিজুলী বাতির আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে; গ্যাস বা বিজুলী আলোয় পুতুলের ছায়া তেলের আলোর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট হয় এবং অনেকটা দূর থেকে বেশ ভালভাবে দেখা যায়; কিন্তু এর একটা দোষ হল, এই আলো স্থির ও নিশ্চল হওয়ায়, পুতুলের ছায়াগুলো যখন পর্দার ওপর পড়ে তখন তাদের ততটা সতেজ ও প্রাণবন্ত মনে হয় না। তেলের আলো বাতাসে একটু একটু কেঁপে কেঁপে পর্দার ওপর যখন ছায়া ফেলে, তখন তাদের ছায়াগুলোকে খুব প্রাণবন্ত বলে মনে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটির সময় তেলের আলোয় ছায়া খুব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ১৬।১৭ ইঞ্চি দূরে ঠিক পুতুলনাচিয়ের (দিলাং) মাথার ওপর আলোগুলো জ্বলতে থাকে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের আকারে বড় করে দেখাবার দরকার হলে, পুতুলগুলোকে আলোর খুব কাছে ধরা হয়। পুতুলগুলো সব তৈরি হয় চামড়ায়, কাজেই সেগুলো হয় দ্বিমাত্রিক। পুতুলনাচিয়ে এক হাতে একটা বা দুহাতে দুটা, কখন কখনও দু হাতে তিন চারটে পুতুল নিয়ে খেলা দেখান। এই খেলাকে ছায়ানাটক বা পুতুলনাচ দুই বলা যেতে পারে। দর্শকরা আপন আপন রুচি অনুসারে ছায়ানাটক বা পুতুলনাচ যে কোন একটা দেখতে পারেন। পর্দার সামনের দিকে যাঁরা বসেবেন তাঁরা দেখবেন পুতুলনাচ; আর যাঁরা পর্দার পিছনে বসবেন, তাঁরা পর্দায় প্রতিফলিত পুতুলের ছায়া দেখে ছায়ানাটকের রস উপভোগ করতে পারবেন। সেখানে পুতুলনাচিয়েকে দেখতে পাবেন না; মনে হবে ছায়া-পুতুলগুলো নিজে নিজে সব অভিনয় করছে।

আকাশে উড়ে যাওয়া, আংটির মধ্যে প্রবেশ করা, কি এক জনের প্রাণ আর একজনের মৃত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো প্রভৃতি দৃশ্যগুলো—যা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা, অভিনেত্রীর পক্ষে দেখানো একেবারেই অসম্ভব, সেগুলো এই ছায়ানাটকে আলোর কারসাজিতে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দেখানো সম্ভব হয়। এমন কি যুদ্ধে ক্লান্ত, কি দৌড়াদৌড়ি করে অবসন্ন নায়ক হাঁফাচ্ছেন, তাও এই ছায়ানাটকে বেশ ভালভাবে দেখানো সম্ভব।

পুতুলনাচিয়েকে ঘিরে ঘোড়ার খুরের আকারে বসে যায় গায়ক ও বাদকের দল। এরা ১২ থেকে ২০টি বাদ্যযন্ত্র বাজায় ও গান করে। খঞ্জনী, করতাল, মৃদঙ্গ, বাঁশী প্রভৃতি নানা রকম বাদ্যযন্ত্র থাকে। যে গান গাওয়া হয় তা বেশ শ্রুতিমধুর এবং ভাষা না বুঝলেও গান বেশ মিষ্টি লাগে। যন্ত্র-সঙ্গীতের বেলায় ঐ একই কথা বলা চলে।

আগেই বলা হয়েছে পুতুলগুলো তৈরি হয় মোষের চামড়ায়। চামড়া সাইজ করে কেটে দাঁত দিয়ে তাতে রং মাখানো হয়। তারপর তাতে দরকার মত নানা অলংকার পরিয়ে দেওয়া হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি করে জুড়ে দেওয়া হয়। তার ফলে পুতুলেরা ঘাড় বেঁকাতে, চোখের বিভিন্ন ভঙ্গি

দেখাতে, ঠোঁট কাঁপাতে, ঘুষি পাকাতে, অস্ত্র ধরতে, যুদ্ধ করতে সবই পারে।

পুতুলনাচিয়ের কাজ শুধু পুতুলগুলোকে নিয়ে অভিনয় দেখানই নয়। তাকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের বক্তৃতা, কথোপকথন সবই পুতুল নাচানোর সঙ্গে সঙ্গে করতে হয়। বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্যে স্বরগ্রামকে উঁচু নিচু বিভিন্ন পর্দায় আনতে হয়। বড় বড় পুতুলগুলো সাত আট সের পর্যন্ত হয়, কাজেই পুতুলনাচিয়ের গায়ে বেশ শক্তি থাকা দরকার।

অভিনয় ন-ঘণ্টা ধরে চলে এবং সেটা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটা রাত বারটার আগে শেষ করতে হয়, দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হবে মাঝ রাত (রাত বারটা) থেকে তিনটা পর্যন্ত আর তৃতীয় অংশ রাত তিনটে থেকে উষাকাল পর্যন্ত। সূর্যোদয়ের আগে খেলা শেষ না হলে, সেটা পুতুলনাচিয়ের দোষ বলে গণ্য হবে। আজকাল কিন্তু এ নিয়ম সব সময় মানা হয় না ; আর খেলাও ন ঘণ্টার বদলে আট ঘণ্টা থেকে সাড়ে আট ঘণ্টার বেশী হয় না। করুণ নাটক দেখে দর্শকরা যদি অভিভূত হয়ে চোখের জল না ফেলে, হাস্যরসাত্মক দৃশ্যে বিদূষকের অভিনয় দেখে দর্শকরা যদি হাসিতে না ফেটে পড়ে, তা হলে পুতুল নাচিয়েকে প্রথম শ্রেণীর নাচিয়ে বলা চলবে না। কাজেই পুতুলনাচিয়ের দায়িত্ব অনেক।

ছায়ানাটকের বিষয়বস্তু বেশির ভাগ হল হিন্দু রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নেওয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ওপর স্থানীয় রং চং দেওয়া হয়েছে। হাস্য-কৌতুকের জন্যে দেশীয় ভাঁড় (সেমার) স্থান পেয়েছে। বর্তমানে এই সব দ্বীপাবলী মুসলমান-শাসিত হলেও, এখনও পর্যন্ত নাটক আরম্ভ হবার আগে সফল অভিনয়ের জন্যে হিন্দু প্রথানুযায়ী ভগবানের কাছে প্রার্থনা ও পুরশ্চরণ করা হয়। রাজারাজড়া কি জমিদার বাড়ি অভিনয়ের ব্যবস্থা হলে পুতুলনাচিয়ে প্রথমেই গৃহকর্তার গৃহদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সংস্কৃত ওঁ উচ্চারণ করে প্রার্থনা জানায় এই ভাবে,—

ওঁ। হে গৃহদেবতাগণ, আপনারা যাঁরা ইতস্ততঃ বিচরণ করছেন,—হে পূর্বপুরুষের আত্মাগণ, আমাকে সাহায্য করুন, যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে। তারপর প্রার্থনা জানায় মুসলিম প্রথায়,—"হে আল্লা, আমাকে সাহায্য কর। আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর, স্ত্রী-পুরুষ দর্শক যাঁরা অভিনয় দেখতে এসেছেন, তাঁরা যেন অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হন। হে আল্লা, হে আল্লা, হে আল্লা।" এই মন্ত্র তিন বার উচ্চারণ করে ডান পায়ে তিনবার মাটির ওপর আঘাত করে তারপর আবার প্রার্থনা জানায়,—'হে মহাসর্প (বাসুকি ?), তুমি এই ধরণী ধারণ করে আছ। হে আকাশের দেবতাগণ, তোমাদের সকলের সাহায্য ভিক্ষা করছি, তোমাদের সকলের কাছে প্রণতি জানাচ্ছি ; যেন আমার অভিনয় শেষ হবার আগে দর্শকরা এখান থেকে চলে না যান, তাঁরা যেন নীরব থাকেন।" তারপর নারকেল তেলের যে প্রদীপগুলো জ্বলছে তাদের সলতে বেশ ভাল করে উস্কে দিয়ে আবার প্রার্থনা করে,—"ওঁ। পরমাত্মা, হে আলোর ঈশ্বর, এই আলোর শিখা যেন সারা পৃথিবীতে দীপ্তি পায়, দর্শকরা যেন আমার দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে আমাকে দয়া, ভালবাসা ও সৌজন্য দেখান।" এই ভাবে তিনবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে পুতুলনাচিয়ে অভিনয় আরম্ভ করেন।

মনে হয় বহু পূর্বে শুধু ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে পরমাত্মা, গৃহদেবতা ও হিন্দু দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হত ; পরে দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় এই সঙ্গে আল্লার নাম সংযুক্ত হয়েছে।

এই সব কারণেই মনে হয়, যবদ্বীপের ছায়ানাটক বা পুতুলনাচ ভারতবর্ষ থেকেই ও দেশে গিয়েছে, তারপর ও দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মুসলিম প্রভাব মিলে মিশে এক নতুন আকার ধারণ করেছে।

আরও মনে হয়, যবদ্বীপবাসীদের কাছে মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ছিল না। এদেশের বণিক্, ব্যবসায়ী, প্রচারকদের কাছে মুখে মুখে শুনে রামায়ণ-মহাভারত-আশ্রিত নাটকগুলো তারা রচনা করেছিল। তাই দেখা যায়, মূল রামায়ণ, মহাভারত থেকে অনেক ঘটনা যেন

কিছু কিছু বিকৃত ও বিভিন্ন। যেমন ধরা যাক কর্ণবধ পালায় ভীমের দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করার কারণ বলা হয়েছে, দুঃশাসন ভীমের পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করেছিলেন বলে; কিন্তু মহাভারতে আছে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিলেন বলেই ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের রক্তপান করবেন ও তাঁর রক্তে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করবেন। কর্ণের অর্জুনের কাছে পরাজয়ের কারণ, "কর্ণবধ" পালায় বলা হয়েছে, দেবর্ষি নারদ কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখবার জন্যে আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় কর্ণের নিক্ষিপ্ত এক বাণে নারদ আহত হওয়ায় তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। আরও বলা হয়েছে, অর্জুন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পাশুপত অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু মহাভারতে সে কথার উল্লেখ নেই।

তা ছাড়া মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বা মুখে মুখে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হওয়ায় বা সংস্কৃত শব্দ যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে মহাভারতের পাত্রপাত্রীদের নামের উচ্চারণ কিছুটা বিকৃত হয়ে পড়েছে। গোটাকতক এমন শব্দ উল্লেখ করা যেতে পারে,—সুভদ্রা হয়েছেন সুমভদ্রা, হনুমান হয়েছেন অনুমান, সীতা হয়েছেন সিংতা, শকুনি হয়েছেন সংগকুনী, লঙ্কা হয়েছে আলংকা, হিড়িম্বা হয়েছেন আড়িম্বা, হস্তিনাপুর হয়েছে আস্তিনা, কৃতবর্মা হয়েছেন কার্তবর্মা।

এ ছাড়া নাটকগুলিতে কিছু কিছু কালনিরূপণে ভ্রম (এনাক্রনিজম্) দেখা যায়। রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত নাটকে অর্জুন ও কর্ণকে আলিঙ্গনের বদলে করমর্দন করতে; বিদূষকদের সিগারেটের ধূমপান করতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য এগুলো সেযুগে হওয়ার কথা নয়। পরিবর্তন প্রগতির লক্ষণ হলেও, এগুলোকে মেনে নেওয়া যায় না।

সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভারত মহাসাগরের এইসব দ্বীপপুঞ্জের নাটকগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা আজও বেশ পরিস্ফুট। এর কারণ মনে হয়, ভারতীয়রা সেখানে দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে যায় নি। গিয়েছিল ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সৌহার্দ্য দৃঢ় করতে। পরকে আপন করতে, দূরকে নিকট করতে; তাই আজও তারা হিন্দু সংস্কৃতিকে রামায়ণ-মহাভারতের মাধ্যমে স্মরণ করে, বরণ করে, বন্দনা করে। এইরকম ঘটনাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কি প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি মহিমায় সে সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।"

আমাদের দেশও বারবার বিদেশী আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে; আমাদের ওপর তারা আধিপত্য বিস্তার করেছে; তাই আমরা তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি না। মন থেকে তাদের মুছে ফেলতে চাই। কারণ তারা এসেছিল তরবারি হাতে; কিন্তু ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসীরা আজও অজ্ঞাতসারে আমাদের স্মরণ করে, শ্রদ্ধা করে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা আবার মনে পড়ে যায়:—

"আমাদের দেশেও দিগ্‌বিজয়ের পতাকা হাতে বীরজাতির দেশ জয় করার কীর্তি হয়ত সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান্ দস্যুর নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।"

(গ্রন্থপঞ্জী:—(1) James Brandon—Indonesia's Wajang Kulit, (2) Claire Holt: Art in Indonesia, Continuities and Changes, (3) Moebirman—Wajang Purwa: The Shadow Play of Indonesia, (4) Ananda K. Coomaraswamy—History of Indian and Indonesian Art.)

সপ্তর্ষি

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।

পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, মরীচি ও বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা—
অত্রি জাগে সঙ্গী সনে মহাশূন্যে—রজনী গভীরা।
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিকুল,—আর জাগে সতী অরুন্ধতী,
স্বামী, সখা হয়তো-বা ধ্যান ভাঙ্গি উঠিবে সম্প্রতি
তাঁদের ধ্যানের লোক পুণ্যক্ষেত্র মহাকাশ হতে—
ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে পাপপুণ্য যেন কালস্রোতে।
যে শান্তি সঙ্গীত দিত তৃপ্তি-মন্ত্র লোক হতে লোকে—
পৃথিবী উতলা হেথা, শূন্য দিক্ আর্ত মহাশোকে।
উদ্বেলিত সিন্ধুবুকে জাগে ঊর্ম্মি অশান্ত-কল্লোল,
অতীতের সপ্তসাক্ষী দেখিয়াছ সিন্ধু উতরোল?
দেখিয়াছ মৎস্য, কূর্ম্ম অবতার বরাহ-বামন—
দেখিয়াছ হলাহল, নীলকণ্ঠ সমুদ্র মন্থন।
ঘনায়েছে কালছায়া ভার্গবের উদ্যত কুঠার,
দেখ নাই বোধিসত্ত্ব ক্ষমাহস্ত করুণা অপার?
লহ-লহ লোলজিহ্বা মহাকালী করালী ভীষণা,
অচঞ্চল বসি' দেখো অভয়ার আশিস্ এষণা।
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—নিদ্রাহীন, শ্রান্তিহীন স্থির—
তোমার তপস্যালোক অবিমিশ্র মধু সুগম্ভীর।
মহাভারতের সাক্ষ্য, রামায়ণী সুধা কাব্যগীতি,
প্রত্যক্ষ করেছ বসি' এক ভাবে আবর্ত্তিয়া নিতি।
পার্থিব মানুষ দেখে কালজয়ী তব আবর্তন,
কালের অতীত সাক্ষী চিরস্থির দৃষ্টি অকম্পন,
ধ্রুব তব কেন্দ্রবিন্দু স্থিত তব যাত্রার পাথেয়,
কি তোমার ধ্যান-কেন্দ্র? কে বা তব চির আরাধেয়?
লোকে-লোকে কালে-কালে ভাঙ্গাগড়া দেখেছ কত-না—,
ধ্বংস-যজ্ঞ কাল-অগ্নি উত্তুঙ্গ সে মহাম্বুধি ফণা।
তুমিই রয়েছ সাক্ষী, নটরাজ প্রলয়-নর্ত্তন—
বিশ্বত্রাস, বৃত্র, শুম্ভ, হিরণ্যাক্ষ,—উত্থান-হনন।
সূর্য্য, চন্দ্র, ছায়াপথ সবে হতে রহ বহুদূরে,—
কোনক্রমে ক্ষুব্ধ যদি, ব্রহ্মধ্যান যায় ভেঙ্গেচুরে!
সর্ব্বগ্রাসী থাবা নিয়ে সেজে আসে নিত্য যত ত্রাস,
বণিকের মানদণ্ড, রাজদণ্ড—করিবারে গ্রাস।
ভুলেছ গীতার বাণী—সাধুসন্ত পরিত্রাণ লাগি'
দুষ্কৃত দলন তরে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ-বিবাগী।
ধর্ম্মের রক্ষণ লাগি' যুগে যুগে আসতেন ধেয়ে—,
আর্ত্তের ক্রন্দনে আজ অশ্রু নাহি ঝরে চোখ বেয়ে!
সমুদ্র-মন্থন শেষে উঠিল কি সঞ্জীবনী সুধা?
হিটলার, মুসোলিনী—দেখোনি কি এ যুগের ক্ষুধা।
ধ্বংসোন্মুখ মানবতা দেখ আজ নম্র নেত্রপাতে—
হিরোসিমা, নাগাসাকি দেখ চূর্ণ দর্পী নখাঘাতে।
সার্থবাহ লালসায় ক্লেদ চায় নিতে রক্ত লুটি'—
বিপ্লবী ভিয়েৎনাম বণিকের ছুঁয়ে ক্লিন্ন মুঠি?
বঙ্গদেশ ছাড়ে শ্বাস, গ্রাসে তারে পাকিস্তানি লোভ,
অন্যায়ের প্রতিকারে বুকে তার ফুঁসিছে বিক্ষোভ।
প্রবলের শক্ত মুঠি দুর্ব্বলের টুঁটি টিপে ধরে,—
অসহায় আত্মা কাঁদে বুকে তার তপ্ত খুন ঝরে।
লক্ষ শহীদের রক্ত—মা-বোনের সম্মান বিলীন,
তর্পণ করিছ বুঝি অনুতপ্ত চিত্ত এতদিন?
সবলের এ-অত্যাচার দুর্ব্বলের জমে ওঠা ব্যথা,
জীবনে জীবনে প্রীতি গড়ে কেন ওঠে না কো হেথা?
নিরবধি কাল আর আদি-অন্ত জ্ঞানের পিপাসা,
অনন্ত গগন-প্রান্তে আবর্ত্তিছে উদ্যত জিজ্ঞাসা।

বঙ্কিম তর্পণ

(তিরোধান : ২৬শে চৈত্র, ১৩০০ সাল)

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

রাত্রি শেষে দু'একটি তারা
জলজ্বল আকাশের গায়,
অতিদূরে ভোরের ইশারা
স্তব্ধ গান বনের শাখায়।

২

তুমি এলে, আলোর নির্ঝর
পূর্বাকাশ বহিল প্লাবিয়া,
বিহগের কণ্ঠে গীতস্বর
বনে বনে চলিল ভাসিয়া।

৩

অতীতের স্বপ্ন নিয়ে এলে,
রণক্ষুব্ধ গড় মান্দারণ,
ঝড়ের দুর্যোগে দীপ জেলে
কারা করে প্রিয়েরে বরণ।

৪

অন্তহীন অকূল সাগর,
সাগররহস্যময়ী নারী,
ভীষণতা-বেষ্টিত সুন্দর,
রচিলে অপূর্ব ছবি তারি।

৫

আরো ক্ষুব্ধ আরেক সাগর,
সে সাগর মানবের মন,
কত কামনায় নিরন্তর
ভাঙে গড়ে অসংখ্য জীবন।

৬

প্রতিটি তরঙ্গলীলা তার,
চকিত কম্পিত আলো ছায়া
ধরা দিল তুলিতে তোমার,
শিল্প নয়, যেন দেবী মায়া।

৭

সূর্যমুখী সূর্যপানে চায়,
সে সূর্যে গ্রহণ লাগে বুঝি,
কুন্দকলি ধূলায় লুটায়
আঁধারে আশ্রয় খুঁজি খুঁজি

৮

থেমে যায় ভ্রমরগুঞ্জন,
বাপীতটে উদ্যান শুকায়,
রোহিণীর নিশার স্বপন
উল্কাসম চূর্ণ রেণুকায়।

৮

কত জীবনের ভগ্নতটে
শুনি কাল-সমুদ্রের গান,
ছায়াছবি আঁকি হৃদিতটে,
ছলছলি' ওঠে দু'নয়ান।

১০

অন্ধকার গ্রহণ নিশায়
অকস্মাৎ দেবী-আবির্ভাব
হে মনীষী, কোন্ সাধনায়
এ মূর্তি করিলে তুমি লাভ ?

১১

দিয়ে গেলে সর্বশেষ গানে
মৃত্যুঞ্জয় আত্মার সন্ধান।
কর্মব্রতে, কর্ম অবসানে
গড় হ'ল সন্ন্যাস-সোপান।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারে

করিমগঞ্জ আসাম হইতে প্রকাশিত যুগশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়:

শিলংএ একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য লোকসভায় একটি নতুন বিল উত্থাপনের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গত ৮ এপ্রিল অনুমোদন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রধানত উত্তরপূর্বাঞ্চলের দুটি পার্ব্বত্যরাজ্য মেঘালয় এবং নাগাল্যাণ্ডের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। শুরুতে আসাম এবং মেঘালয়কেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনার কথা ছিল। পরে আসামের পরিবর্ত্তে নাগাল্যাণ্ডকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ প্রধান মন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধীর নামে হবার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি থাকায় তা হচ্ছে না। লোকসভার চলিত অধিবেশনেই বিলটি আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কাজ ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে শুরু হবার কথা আছে।

ছাত্রদের স্বাবলম্বনের চেষ্টা

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানা প্রকার কাজ করিয়া উপার্জ্জন চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। হোটেলে খাদ্য পরিবেশন, বাসনপত্র পরিষ্কার করা, দোকানে বিক্রেতার কাজ কিম্বা কেরাণীর খাতা ইত্যাদি লেখা, সকল প্রকার কাজেই ছাত্রদিগকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে ছাত্ররা সচরাচর শুধু টিউশনিই করিয়া থাকে। অন্যান্য কাজ পূর্ব্বে তাহারা বড় একটা করিত না; কিন্তু সম্প্রতি তাহাদিগকে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখা যাইতেছে। যথা সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে যে কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় চার হাজার জন ছাত্র ট্রেনে ও অন্যত্র ফেরিওয়ালার কাজ করিতেছে। এই সংবাদ ফেরিওয়ালা সংঘের অস্থায়ী সভাপতির দ্বারা প্রকাশিত বার্ত্তায় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে ২০০০ সহস্র শিক্ষিত যুবক এই কার্য্য করিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন। ইঁহাদের মধ্যে ৫৫ জন বি এ উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিও আছেন। এই খবর খুবই আনন্দদায়ক খবর, কেননা ইহা দ্বারা আমাদের জাতির যে পরমুখাপেক্ষিতা দোষ আছে তাহা ক্রমশ: কাটিয়া গিয়া দেশবাসী স্বাবলম্বনের সুস্থ ও সবল পথে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন প্রমাণ হয়। শুনা যায় যে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছেন যাহারা ফাউন্টেন পেনের বিভিন্ন অংশ ক্রয় করিয়া তাহা দিয়া ফাউন্টেন পেন তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা আরোই প্রশংসনীয়। এই পথে চলিলে নানা প্রকার দ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভব হইবে ও বহুলোক তাহাতে রোজগারের উপায় দেখিতে পাইবেন।

বৈদ্যুতিক শক্তিসরবরাহে ব্যবস্থাহীনতা

যুগজ্যোতি পত্রিকায় বর্ত্তমান বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার অভাব উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে। আমরা ইহার অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

১৫ এপ্রিল—ব্যাণ্ডেল পাওয়ার ষ্টেশনের তিনটির মধ্যে একটি ইউনিট বয়লার পাইপে ফুটো হওয়ার দরুণ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বৃহত্তর কলিকাতায় তাহাদের বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ ১০ মেগাওয়াট হইতে ৪০ মেগাওয়াটে নামিয়াছে।

১৬ই এপ্রিল—বৃহত্তর কলিকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তি

সরবরাহ এইদিন স্বাভাবিকের তুলনায় সকালে ৫৩ মেগাওয়াট, অপরাহ্নে ৬০ মেগাওয়াট ও সন্ধ্যায় ৯০ মেগাওয়াট কম হইয়াছে। লোড শেডিংয়ের ফলে টেক্স-ম্যাকোর কারখানা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এখানকার ৪০০০ শ্রমিককে লে' অফ করা হইয়াছে।

১৭ এপ্রিল—বৃহত্তর কলিকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এইদিন স্বাভাবিকের তুলনায় সকালে ৬৫ মেগাওয়াট অপরাহ্নে ৮০ মেগাওয়াট ও সন্ধ্যায় ৯৮ মেগাওয়াট কম ছিল।

যখন তখন লোড শেডিংয়ের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে কাজকর্ম অচল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই জন্যই নাকি বি, এ, ; বি, এস, সি, ও বি, কম, পার্ট টু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যাইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী এ, বি, গণিখান চৌধুরী বৃহত্তর কলিকাতায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি বলিয়াছিলেন যে দুর্গাপুর প্রজেকট লিমিটেডের সরবরাহই সব চাইতে কম। তাহারা তাহাদের হ্রাস করা কোটা অনুযায়ী ৫৫ মেগাওয়াট শক্তি সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। তাহাদের প্রতিনিধি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে তাঁহারা শুক্রবারের মধ্যেই এই ত্রুটি সংশোধন করিবেন। ডি, ভি, সি-র সম্পর্কে মন্ত্রী বলিয়াছেন যে তাহারা ৭৫ মেগাওয়াটের স্থলে ৫৫ মেগাওয়াট মাত্র সরবরাহ করিতেছে। তাহাদের প্রতিনিধি নাকি অবিলম্বে ১৫ মেগাওয়াট সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রিসিটি বোর্ডও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ২০ মেগাওয়াট শক্তি সরবরাহ কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের প্রতিনিধিও শুক্রবারের মধ্যে ত্রুটি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। একমাত্র ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনই ঠিকমত কোটা অনুযায়ী শক্তি সরবরাহ করিতেছে। মন্ত্রী বলিয়াছেন যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলে ১লা মে হইতে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি না হইবার কোন কারণ নাই। ঐ সময় নাকি ডি, ভি, সি, আরও অতিরিক্ত ৫০ মেগা-ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিবে।

১৮ই এপ্রিল—লোড শেডিংয়ের ফলে গত একপক্ষ কালে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী এক কোটি টাকা কম হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে এখন হইতে মাসিক ২০৫০ কোটি টাকার রপ্তানী কম হইবে এবং শ্রমিকদের লে অফ করিতে হইবে এবং অর্ধেক বেতন দিতে হইবে।

১৯শে এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী গণিখান চৌধুরী বলিয়াছেন যে ২০শে এপ্রিল হইতে কলিকাতায় কখন কোন অঞ্চলে লোড শেডিং করা হইবে তাহা পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইবে। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এখন আর নূতন বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে আগামী কাল হইতে ব্যাণ্ডেলে তিনটি ইউনিট চালু হইবে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যাপারে কিছুটা সুরাহা হইবে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর বিহার সরকারকে তেনুঘাট হইতে জল ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাহা করিলে নাকি পাঞ্চেৎ হইতে দৈনিক অতিরিক্ত ২৫ মেগাওয়াট শক্তি পাওয়া যাইবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন একটি স্মারক লিপির মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে যন্ত্রপাতিগুলি বসাইবার সময় ইঞ্জিনিয়ারদের সহিত কোন যোগাযোগ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

গৃহস্থদের যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় তাহা সাময়িক ভাবে বন্ধ করিবার জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অনুসরণ করা হইতেছে না। ফলে দক্ষিণ কলিকাতায় কয়েকটি ক্ষুদ্র পকেট ব্যতীত সমস্ত অঞ্চলে মঙ্গলবার ৮ ঘণ্টা আবার বুধবারও ৭ ঘণ্টা সরবরাহ বন্ধ ছিল।

১৯শে এপ্রিল— সকালে ৬০ মেগাওয়াট এবং সন্ধ্যায় ৯০ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি কম সরবরাহ করা হইয়াছে। ঐ দিন কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন ২৮০ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়াছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ও দুর্গাপুর প্রজেকট মিলিত ভাবে ৮৪ মেগাওয়াট এবং ডি, ভি, সি, মাত্র ৩৫—৪৫ মেগাওয়াট সরবরাহ করিয়াছে। ঐদিন তাই কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে স্বাভাবিক ৫১০ মেগাওয়াটের স্থলে ৩৯০ মেগাওয়াট সরবরাহ করা হইয়াছে। তাহার ফলে পূর্বদিনের তুলনায় পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই।

পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের সংবাদে প্রকাশ যে ১১ই এপ্রিল হইতে লোড শেডিংয়ের ফলে উড়িষ্যার পাঁচটি বৃহৎ শিল্প বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গুজরাট বিদ্যুৎ পর্ষদ ১৪ এপ্রিল হইতে ধ্রুবরণ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধীন শিল্প এলাকায় শতকরা ৫০ ভাগ ও কৃষি অঞ্চলে দৈনিক ৪ ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ ছাটাই করিয়াছে। এ বিধান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকিবে। আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ যে লোড শেডিংয়ের ফলে কাপড়ের কলগুলির ১,২০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৬০,০০০ শ্রমিককে লে অফ করা হইয়াছে।

এই বৈদ্যুতিক সঙ্কটে জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। লে অফের ফলে শ্রমিক পরিবারগুলিকে অর্ধাশনে দিন কাটাইতে হইতেছে। কলিকাতায় নাগরিক জীবনও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আলো পাখার অভাবে প্রতিটি গৃহে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া যাঁহাদের জলের জন্য পাম্প ও ওঠা-নামার জন্য লিফট ব্যবহার করিতে হয় তাঁহাদের তো কথাই নাই। বাহিরের অবস্থাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়। সামগ্রিক ভাবে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কে, এল, রাও লোকসভায় যাহা বলিয়াছেন তাহার একটি অংশ উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট।

তিনি বলিয়াছেন যে গত ১২ মাসে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবের ফলে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা গত বৎসরের বন্যা, খরা ও সাইক্লোন দ্বারা মিলিত-ভাবে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার তুলনায় অনেক অধিক। তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে অতিরিক্ত ১৮ হইতে ২০ মিলিয়ন কিলোয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে দেশের অগ্রগতি পশ্চাদ্‌গামী হইবে।

ওয়েল্‌ডিং পদ্ধতিতে মাথায় চুল ওঠা বন্ধ করা

ফার্মিং ডেল, নিউ ইয়র্ক—যাদের মাথায় টাক অথবা যাদের মাথায় চুল উঠে যাচ্ছে, তাদের মনোকষ্ট অসীম। তাদের সেই কষ্ট দূর করার জন্য নতুন এক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। 'ওয়েল্‌ট্রন' নামে একটি যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। মাথায় যে কয়টি চুল অবশিষ্ট আছে এর সাহায্যে সেগুলি দীর্ঘ হতে থাকে অথবা ঐ চুল ঘন হয়। মানুষের তৈরি ফিলামেন্ট বা সূক্ষ্ম সুতোর মত পদার্থ শব্দাতিক্রমী পদ্ধতিতে মানুষের চুলের সঙ্গে ওয়েল্‌ডিং করে দেওয়া হয়। ঐ যন্ত্রটির সাহায্যে আসল চুলকে অনেক লম্বা করা যেতে পারে অথবা সেটির সঙ্গে চার পাঁচটি ফিলামেন্টও জুড়ে দেওয়া যায়। প্রকৃতিদত্ত আসল চুল আর মানুষের তৈরি ফিলামেন্ট একত্রিত করা হয়। তারপর স্পন্দন প্রক্রিয়ায় এক জাতীয় প্লাষ্টিকের একটি আবরণ দিয়ে ঐ দুটিকে জুড়ে দেওয়া হয়।

ফার্মিংডেলের আলট্রাসনিক সিষ্টেম, ইনকর্পোরেটেডের প্রেসিডেন্ট আর্থার কুরিসকে ঐ যন্ত্রটির পেটেন্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'ওয়েল্‌ট্রন' সম্ভবতঃ বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে। ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই ঐটি কাজে লাগবে।

বিশ্বের আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানে সুপারকম্পিউটার

অস্টিন, টেকসাস—ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়াররা এখানে এক নতুন ধরনের 'সুপারকম্পিউটার' নির্মাণ করতে শুরু করেছেন। এর সাহায্যে আবহাওয়াবিদদের পক্ষে শুধু

জলহাওয়ার গতানুগতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই নয়, আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তনের আভাসও বহুদিন আগে থেকেই জানানো সম্ভব হবে। ইঞ্জিনিয়ারগণ বলেন যে, এর সাহায্যে কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা যাবে। তাছাড়া জলহাওয়ার স্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতার অনুকরণ করাও এর দ্বারা সম্ভব হবে। আবহাওয়ার একদিনে যে পরিবর্তন ঘটবে তা মাত্র নয় মিনিটের মধ্যেই যন্ত্রটি ধরে ফেলতে পারবে। যন্ত্রটি যদি একনাগাড়ে ৬০ ঘণ্টা ধরে চালানো হয় তা হলে সেটি পুরোপুরি এক বছরের আবহাওয়ার রূপ ধরে ফেলতে পারবে। ফলে, আগামী এক বছরের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাসও কম্পিউটারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে।

ডালাসের টেকসাস ইনস্ট্রুমেন্টস, অষ্টিনে এই কম্পিউটারটি তৈরি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জাতীয় সামুদ্রিক ও আবহাওয়া প্রশাসন বিভাগের জিওফিজিক্যাল ফ্লুইড ডায়নামিক্স ল্যাবরেটরীর জন্য এইটি তৈরি করা হচ্ছে।

রোমঁ্যা রোলাঁর দৃষ্টিতে রামমোহন

তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উষাকালে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন প্রচারের ফলে আমাদের অজ্ঞানতা-জনিত কুসংস্কার, ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারের অত্যাচার, সামাজিক কু-প্রথা প্রভৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে। ঐ যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের প্রথম মনীষী রাজা রামমোহন রায় যুক্তি-বাদী চিন্তার আলোকে ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। পণ্ডিতের মূঢ়তাকে আঘাত করে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মের একেশ্বরবাদের উদ্ধার এবং বিচার-বিশ্লেষণ-সিদ্ধ মননশীলতার প্রয়োগ করে রামমোহন ভারতের জন-জীবনকে সত্য ও মঙ্গলের পথে প্রবাহিত করেন।

মধ্যযুগীয় তন্দ্রা ছিন্ন করে ভারতের মুমূর্ষু জাতীয় জীবনে সঞ্জীবন মন্ত্রের যে প্রাণবন্ত ধারা তিনি এনে-ছিলেন তারই ফলে দিকে দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়। ফরাসী মনীষী ও প্রাচ্যবিদ্ রোমঁ্যা রোলাঁ ঐ নব জাগরণের ধারা বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে অনুধাবন করেছিলেন। রোলাঁ লক্ষ্য করেছিলেন যে ঐ শতাব্দীতে ভারতের সমস্ত মনীষীর আদর্শ ছিল এক—তা হল, ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে মানব জাতির ঐক্য (unity of mankind through God)। রোলাঁ উপলব্ধি করেছেন যে ঐ নবজাগৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হল—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়মুখী সাধনা—পাশ্চাত্ত্যের শক্তিবাদ ও প্রাচ্যের বিশ্বাস, পাশ্চাত্ত্যের জীবনচর্যা ও প্রাচ্যের তত্ত্বজ্ঞান—এই দুইয়ের মিলনসাধনের অন্তহীন প্রচেষ্টা। তাঁর মতে—

"From the beginning to the end it is the question of co-operation, on a footing of equality of the East and of the West, of the powers of reasons with those—not of faith in the accepted uncritical sense which the word has come to bear among exhausted nations in a servile age—but an intuition vital and penetrating, like the eye on the forehead of the cyclops which completes, but does not render unnecessary the other two eyes"।

ঐ শতাব্দীর ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম গোঁড়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারেই, কিন্তু ইসলামিক সংস্কৃতির পরিবেশের মধ্যেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত, ইংলণ্ডে দিল্লীসম্রাটের রাষ্ট্রদূত রাজা তাঁর দেশের জনগণের ধর্মনৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরত আপোষহীন সংগ্রাম করে ষাট বছরের বীরত্বপূর্ণ কর্ম সাধনার ফলে ব্রাহ্মসমাজে সৃষ্টি করে গেছেন। এক মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণা ঐ ব্রাহ্মসমাজে তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার ধর্মনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার এক সমন্বিত রূপ দেবার চেষ্টা করেন রোলাঁর মতে এই ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষ ও এশিয়ায় এ

নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে : The universal church, the abode of the One Almighty, open to all without distinction of colour, caste, nationality or religion, is the Magna Carta Dei, the Dei, the Divine Magna Carta which has inaugurated a new era for Asia and India" ।

রাজা রামমোহনের মধ্যে কোন গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন মুক্তহৃদয় ঈশ্বরবিশ্বাসী, প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদী ও নীতিবাদী। রোলাঁ বলেন, "He extracted its ethical system from Christianity but he rejected the Divinity of Christ, just as he rejected the Hindu incarnations. He attacked the trinity no less than polytheism, for he was a passionate Unitarian" । রোলাঁ মনে করেন যে রামমোহনের ঈশ্বরতত্ত্ব—Absolute Vedanta ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের এনসাইক্লোপিডিক চিন্তা—নিরাকার ঈশ্বর ও যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

রামমোহন সকল ধর্মের সত্য গ্রহণ করে এক বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরোপাসনায় ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। রোলাঁ তাঁর ধর্মের বিশ্বজনীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। কারণ তিনি বলেন, "Roy excluded from it all forms of polytheism from the highest to the lowest. The man, who wishes to regard without prejudice the religious realities of the present day must take into account that polytheism, from its highest expression in the Three in One of the Christian Trinity to its most debased, holds sway over the two thirds at least of mankind" ।

রামমোহনের ধর্মের বিশ্বজনীনতাকে গ্রহণ না করলেও, রোলাঁ তাঁর সমাজসংস্কারের মহান্ প্রচেষ্টাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রাদেশিকতার তুচ্ছতার দ্বারা কলঙ্কিত হয়নি। রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উন্নতির কোন অন্তরায়কে তিনি গ্রাহ্য করেননি। রোলাঁ উল্লেখ করেছেন : "His newspapers were impassioned in the cause of liberty on behalf of all the nations of the world of Ireland, of Naples crushed under reaction, of revolutionary France in the July days of 1830" ।

সমগ্র মানবজাতির জন্যই রামমোহনের জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। এই স্বনামধন্য মনীষীর স্মৃতিরক্ষার্থে এখনও উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয়নি বলে রোলাঁ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি লিখেছেন :

"This man of gigantic personality, whose name to our shame is not inscribed in the pantheon of Europe as well as of Asia, sank his ploughshare in the soil of India, and sixty years of labour left her tarnsformed....and out of the earth of Bengal has come forth his harvest—a harvest of works and a harvest of men."

সাময়িকী

গুলি না চালাইলে কি চলে না ?

যুগবাণীর মতে বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতিতে বলপ্রয়োগ কিছু অধিক মাত্রায় চালিত হইতেছে। যথা :

গত এক সপ্তাহে দেখতে পাচ্ছি রাঁচি, ধানবাদ, নাগপুর, পুনা, হাজারীবাগ, আসানসোল জেলে সর্ব্বত্রই খাঁকি উর্দিপরা মানুষেরা মনের আনন্দে একের পর এক মানুষ শিকার করে চলেছে। শুধু বিহারেই ১৫ই এপ্রিল রাঁচীতে গুলিতে আহত ৩ জন, তার মধ্যে বিধানসভা সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী সুরযনারায়ণ সিংজীও আছেন। সুরযনারায়ণ সিংজী একজন খ্যাতনামা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতা, বিয়াল্লিশের বিপ্লবের অন্যতম নায়ক। তিনিও রেহাই পাননি। ১৮ই এপ্রিল ধানবাদে পুলিশের গুলিতে নিহত ৪ জন। আহত শ্রীজগদীশ নারায়ণ চৌবে, এম এল এ (কংগ্রেস)। চৌবেজী বলছেন নিহতের সংখ্যা ১০ জন। গুলিবর্ষণ চলছে সর্ব্বত্র। শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি কারো রেহাই নেই।

গুলিবর্ষণ করে সারা ভারতকে ঠাণ্ডা করা যাবে কি ? সরকারের তখ্‌তে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যদি চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজেরা খালাস হতে চান, তবে মুর্খের স্বর্গেই বাস করছেন।

কালীগঞ্জে চরম খাদ্যাভাব

কালীগঞ্জ ১৩ই মে। বিগত কয়েকদিন যাবত অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে লঙ্গাই, সিংলা, কাঁকড়া প্রভৃতি নদীতে ভীষণ জলস্ফীতি দেখা দেয়। কালীগঞ্জের বৃহদংশ বর্ত্তমানে জলের নীচে। আউস মুরালী প্রভৃতি ফসলের এবং হালিচারার বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ধান চাউলের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এবং জনসাধারণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ এক বেলাও পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারিতেছে না। ন্যায্য মূল্যের দোকানেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আটা বরাদ্দ করা হইতেছে না। আটার চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ জনসাধারণ তাহা প্রয়োজনমাফিক পাইতেছে না। ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত পর্য্যাপ্ত আটা বরাদ্দ করা না হইলে অবস্থার কোন সুরাহা হইবে না। গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ অনাথ বিধবা প্রভৃতিদের মধ্যে কিছুটা রিলিফের আটা বণ্টন করা অত্যাবশ্যক। এদিকে করিমগঞ্জের মহকুমাধিপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

আমেরিকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্যা ও তার প্রতিকার

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ১০,০০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়। এই খরচ মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ। কাজেই দেশের অভ্যন্তরীন উন্নয়নে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করা তেল ও গ্যাসের ওপরে বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিবছর তেল আমদানির জন্য আমেরিকার প্রায় ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে। ১৯৮০ সালের মধ্যে এই খরচ বেড়ে ১৫০০ কোটি ডলারে পরিণত হবে।

বিশ্বের জনসংখ্যার ছ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আমেরিকার জনসংখ্যা। কিন্তু মার্কিন জনসাধারণ বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে। ফেডারেল পাওয়ার কমিশনের হিসাব অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা চতুর্গুণ বেড়ে যাবে। এই চাহিদা পূরণের উপযোগী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাগুলিকে গড়ে তোলবার জন্য আনুমানিক ৪০,০০০ কোটি ডলার মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবন ও জাতীয় জীবনের মান বজায় রাখার জন্য প্রচুর বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন। অথচ আমেরিকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সরবরাহ হ্রাস পাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি তৈল সমৃদ্ধ দেশ ছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সে একটি তৈল আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। এটা অনুমান করা যায় যে, ১৯৮৫ সালের মধ্যে আমেরিকার ৬০ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় তেলের অধিকাংশই আমদানি করা হয় রাজনীতির ব্যাপারে অনিশ্চিত মধ্য প্রাচ্য থেকে। এই দেশগুলি নিজেদের খামখেয়াল মত আমেরিকায় তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে। বিশ্বের তেলের বাজার খুবই তেজী হয়ে উঠছে। এই কালো সোনা সংগ্রহের জন্য আমেরিকাও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। বিদেশের তেলের বাজার আমেরিকার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও তেলের দাম অসম্ভব বেড়ে যাবে। ফলে দেনা পাওনার হিসাবে ঘাটতি জনিত সমস্যা দেখা দেবে। আমেরিকার টাকা আমেরিকায়ই থাক সেটাই সকলের কাম্য। কিন্তু আমেরিকার অর্থনীতি পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

স্বদেশে তৈলকূপের অনুসন্ধানের কাজ অনেক হ্রাস পাচ্ছে। এটা একটা সমস্যা। বিদ্যুৎশক্তিশিল্প এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকেই দায়ী করতে চায়। দোষারোপ করা হয় তৈলসন্ধানের জন্য সমুদ্রের অদূরবর্তী অঞ্চল ইজারার ব্যাপারে। সম্প্রতি এই ধরণের একটি ইজারা হয়ে গেছে। একবার কোনও অঞ্চল ইজারা দেওয়া হলে সেই অঞ্চলের সম্ভাব্য সম্পদ উন্নয়নের কাজ তৈল শিল্প করে না। এমন সব বিধান প্রবর্তন করা প্রয়োজন যার ফলে তৈল শিল্প সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে তেলের উৎস আবিষ্কার করতে তৎপর হবে। তারপর আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেইগুলির উন্নয়নের জন্য ঐ সংস্থাগুলিকে বাধ্য করা উচিত। এই ধরণের কতগুলি বিধি-বিধানই ইউরোপের কয়েকটি দেশে আগে থেকেই রয়েছে।

তেলের মত প্রাকৃতিক গ্যাসের সমস্যাও কম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের যোগান দেয় প্রাকৃতিক গ্যাস। জ্বালানির উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটি ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ শিল্প যাতে তাদের দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারে সে বিষয়ে তাদের সাহায্য কল্পে মার্কিন কংগ্রেস ও মার্কিন সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। বিদ্যুৎ শিল্পের সরকারী সংস্থাগুলি যদি জনসাধারণের

প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সক্ষম না হয় তা হলে মার্কিন সরকার নিজেই হয়তো একদিন গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেবেন। এমন কি অবস্থা অনুসারে সমগ্র বিদ্যুৎ শিল্প পরিচালনায় সরকারের উদ্যোগী হওয়াও অসম্ভব নয়।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র দুই শতাংশ বিদ্যুৎ পারমাণবিক শক্তি থেকে পাওয়া যায়। ফেডারেল পাওয়ার কমিশনের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৯০ সালের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি আমেরিকার সমগ্র বিদ্যুৎশক্তির অর্ধেক যোগান দেবে। পারমাণবিক শক্তির কারখানা-গুলিকে অনেকেই খুব আশার চোখে দেখে থাকেন। তাঁরা আশা করছেন মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির আগামী ২০ বছরের বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা পারমাণবিক উৎস থেকেই পূরণ হবে।

বিদ্যুৎ সঙ্কটের সুরাহার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার সঙ্কুচিত করে বিদ্যুৎ শক্তির সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই ভাবে শতকরা চারভাগ থেকে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। পারমাণবিক উন্নয়নের জন্য ব্রীডার রিঅ্যাক্টর খাতে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তেমনি সৌরতাপ ও সৌরশক্তির গবেষণামূলক কাজেও অর্থব্যয় করা হচ্ছে। তবে এ বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ অল্প। মহাকাশ সংক্রান্ত কারিগরি বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবনও এর মধ্যে ধরা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ শক্তির অপ্রাচুর্যতা থেকে আমেরিকায় যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেগুলি খুবই গুরুতর। অবিলম্বে এই সব সমস্যার সমাধান না করা হলে দেশের অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের অবাধ অধিকার রয়েছে এবং বিদ্যুতের সরবরাহও সীমাহীন, একথা মনে করে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করা উচিত নয়। বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। সাহসের সঙ্গে এই সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সঙ্কটের সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

দেশ-বিদেশের কথা

পশ্চিম জার্ম্মানীর খবর

রুশিয় প্রচার পত্রে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে :

পশ্চিম জার্ম্মানীতে নির্ধারিত সময়ের আগে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর চারমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বুনডেসটাগ-এর (পার্লামেন্ট) ভিতরে ও বাইরে কয়েকটি বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাস্তব কর্ম্মনীতির পক্ষে ভোটদাতাদের রায় পাওয়ার পর সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল এবং কোয়ালিশন সরকারে তাঁদের অংশীদারদের (ফ্রি ডেমোক্র্যাট) নেতারা আগের চাইতে আরো বেশী জোর পাচ্ছেন। এখন পার্লামেন্টে তাঁদের যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিরোধীপক্ষে দল ভাঙ্গানোর আর কোন আশা নেই। অতীতে এই ধরণের চক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী উইলি ব্রান্টের যথোপযুক্ত রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে বহুবার বিপদ সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই রকম ব্যাপারই সরকারের স্থিতিশীল সংসদীয় ভিত্তি নষ্ট করে দেওয়াতেই নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করতে হয়। এখন বিরোধীপক্ষকে পার্লামেন্ট-কক্ষে অনেক জায়গা ছাড়তে হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে এতদিন যে কলহ-বিবাদ তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল তা' এখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।...

এ সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা হেলসিংকিতে ২৪টি রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ্‌রা যে নিখিল-ইওরোপীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করতে ব্যস্ত সেই সম্মেলনের "বিপদ"কে তুলে ধরতেই আরও বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন দলের সংসদীয় প্রতিনিধি মিঃ ওয়ারনার মার্কস মনে করেন যে, সম্মেলনের ফলে "পশ্চিম ইওরোপ একেবারে দুর্ব্বল" হয়ে যাবে, আমেরিকানরা "ইওরোপ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে" এবং স্বভাবতঃই সোভিয়েত ইউনিয়ন "পরিস্থিতি নিয়ন্তা" হয়ে দাঁড়াবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা যে প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনায় এবং জুন মাসের শেষে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে এ সব তথ্য এই রকম বিবৃতি যিনি দিয়েছেন তাঁকে কিছুমাত্র বিব্রত করে নি। হেলসিংকি বৈঠকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির চাইতে পুঁজিবাদী দেশগুলির সংখ্যা যে চারগুণ বেশী ছিল এই অতি সহজ অঙ্কও তাঁকে লজ্জা দেয় না। আর এইসব পুঁজিবাদী দেশ নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে তাদের "খেয়ে ফেলতে" দেবে না—একথারও তিনি ধার ধারেন না। মিঃ ওয়ারনার মার্কস যে ধরণের বিবৃতি দিচ্ছেন তার চরম অসঙ্গতি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরণের বিবৃতির মর্ম্ম উদ্ঘাটন করাই যথেষ্ট।...

তারা পরস্পরের সম্পর্কে যাই ভাবুক অথবা অন্যরা তাদের সম্পর্কে যাই ভাবুক না কেন দুই জার্ম্মানীর সহায়তা ছাড়া ইওরোপে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব?—এই প্রশ্ন তুললেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বললেন, "আমি সব সময়েই মনে করেছি এবং এখনও করি যে, এই প্রশ্নের জবাব হল—না।" তাঁর সিদ্ধান্ত যে বিবৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা' হল এই যে, ফেডারেল প্রজাতন্ত্র কখনই "ইওরোপে প্রস্তরীভূত শত্রুতার দ্বীপ" হয়ে থাকবে না। আর আমরা এর সঙ্গে এইটুকু যোগ করতে চাই যে, আগে ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রধানমন্ত্রীদের আমলে পশ্চিম জার্ম্মানীর দৃষ্টে এই বিপদই দেখা দিলেও বর্তমানে তার ঠিক বিপরীত ব্যাপারই ঘটতে চলেছে। শত্রুতার মনোভাবের কোন ভবিষ্যৎ নেই, বরং ভবিষ্যৎ আছে সহযোগিতার মনোভাবের। আজকের দিনে সুবিবেচনা-প্রসূত সুপারিশগুলি এইরূপই।

আর অতীতের কথা কি বলি? মনে হচ্ছে যেন

প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতারা যাঁরা অতীতের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা শক্রতার দ্বীপের উপরেই বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এখান থেকে তাঁরা নড়তে চান না, ভোটদাতাদের ক্রমাগত দাবি সত্ত্বেও নিশ্চিন্তমনে বসে আছেন।

লিওনিদ ব্রেঝনেভের গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র সফর সমাপ্ত

সোভিয়েত-গণতান্ত্রিক জার্মানি যুক্ত ইস্তাহার

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভ এবং জার্মানির সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এরিক হোনেকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা গত ১৩মে বার্লিনে সমাপ্ত হয়।

বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এই আলাপ-আলোচনা শেষ হওয়ার পর একটি যুক্ত ইস্তাহার গৃহীত হয়। দুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে: সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও জার্মানির সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির মধ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের বিকাশে লিওনিদ ব্রেঝনেভ এবং এরিক হোনেকার গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অটুট ভ্রাতৃত্ব ঐক্য ও বন্ধুত্বকে নিয়ত আরো গভীর ও সুদৃঢ় করার অনমনীয় সংকল্পের কথা তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও জার্মানির সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ইওরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগের অবসান হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার যুগ সুরু হয়েছে।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে, বর্তমানে ইওরোপীয় নীতির মূল কথা হল সারা ইওরোপ সম্মেলনের প্রস্তুতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র হেলসিংকিতে বহুপাক্ষিক আলোচনা অবিলম্বে শেষ করতে চায় এবং ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্তভাবে এই সম্মেলনকে সর্বপ্রকারে সফল করে তুলতে প্রস্তুত।

ইস্তাহারে আরো বলা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রথমত মধ্য ইওরোপে সশস্ত্র সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত আগামী দিনের আলোচনার উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই আলাপ-আলোচনা যাতে গঠনমূলক পদ্ধতিতে হয় মূলত তারই প্রস্তুতির জন্য তারা এগিয়ে আসছে।

ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার যে নীতিনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়ন চালাচ্ছে গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের নেতৃবৃন্দ তাকে স্বাগত জানান।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, ইওরোপে এবং পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইওরোপ মহাদেশে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের যে ধারা বইছে তাকে আর উল্টোদিকে ফেরানো যাবে না এবং সমাজতান্ত্রিক জার্মানিকে কূটনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নীতি যে একেবারে দেউলিয়া তাই প্রমাণিত হল।

দুই পক্ষই বলেছেন যে, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের নীতি সংক্রান্ত চুক্তি বলবৎ হওয়ার প্রশ্নটির এবং জাতিসংঘে তাদের সদস্যপদ লাভের গুরুত্ব অপরিসীম। ইস্তাহারে বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র ও ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র যাতে অদূর ভবিষ্যতে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৭১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সম্পাদিত পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত চতুঃশক্তি চুক্তি, সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র ও ফেডারেল

জার্মান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র ও পশ্চিম বার্লিন সেনেটের মধ্যে আনুষঙ্গিক চুক্তি সে-অঞ্চলে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই সব চুক্তি যদি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় তাহলে তা পশ্চিম বার্লিন বিষয়ে সকল পক্ষের পারস্পরিক বোঝাবুঝির গ্যারান্টি সৃষ্টি করবে।

চেকোস্লোভাকিয়া এবং ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সুরু হওয়ায় সভায় অংশ গ্রহণকারীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইস্তাহারে বলা হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে ইওরোপে শান্তির স্বার্থই রক্ষিত হবে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা ভিয়েতনামী জনগণের জয়ের বিরাট তাৎপর্যের কথা বলেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে, ইন্দোচীনের জনগণের ন্যায়সঙ্গত জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তাদানের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

দুপক্ষই একথা আবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা মনে করেন, প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সুবিদিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র এগিয়ে যাবে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এবং জার্মানির সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক জীবনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সুসমন্বিত, সদুদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মধারার সঙ্গে নিয়ামক শক্তিরূপে যুক্ত। বুর্জোয়া আদর্শবাদ, সংস্কারবাদ, দক্ষিণ ও বামপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠ সংগ্রামের কথাও বলা হয়েছে।

মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতির জন্য অবিচলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প দুপক্ষই আবার ঘোষণা করে।

।। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ।।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৮০

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে ফ্রান্সের অবজ্ঞা প্রদর্শন

ফ্রান্সের পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনার অন্তর্গত একটি প্রচেষ্টা হইল প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত উপহ্রদ পরিবেষ্টক প্রবাল দ্বীপ মুরুরোয়াতে একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ করিয়া পরীক্ষা করা যে ঐ জাতীয় বোমা যথাযথরূপে প্রস্তুত করিতে ফ্রান্স পারিতেছে কি না। মুরুরোয়া দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এবং তাহার দূরত্ব অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৪২ শত মাইল। পেরু হইতে তাহার দূরত্ব ৪১ শত মাইল এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে ২৭ শত মাইল ও হাওয়াই হইতে ৩২ শত মাইল। এই দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মতে পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত পতিত বিষাক্ত বস্তু হাওয়ায় ভাসিয়া ঐসকল দেশে গিয়া পড়িবে ও ফলে তদ্দেশের জনসাধারণের বংশানুক্রমিক ভাবে রোগ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। এ-কথা ঠিকই যে যদিও এক-দুইটি বিস্ফোরণ হইতে কোনও মহা ক্ষতি হইতে নাও পারে, তাহা হইলেও বারে বারে বিস্ফোরণ হইলে তাহার সমষ্টিগত ফল মহা ক্ষতিকর হইতে পারে। সুতরাং সময় থাকিতে ঐরূপ পরীক্ষাকার্য্য নিবারণ ব্যবস্থা করাই মানবীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দিক্ হইতে বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হেগের বিশ্ব-দরবারের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে এইরূপ পারমাণবিক পরীক্ষা নিবারণের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করাতে উক্ত বিচারালয় ঐ অভিযোগ শুনানির জন্য ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে আহ্বান করেন। ফ্রান্স ঐ আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্ব-বিচারালয়ের নিকট কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই এবং নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়া পৃথিবীর সকল জাতিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বিশ্ব-আদালত ফ্রান্সের "ঘরোয়া" কথা লইয়া বিচার করিতে কখনোই পারগ হইতে পারেন না। এই কথাটা প্রচার না করিয়া বিশ্ব-বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেই ঐ বিচারালয়ের সম্মান রক্ষা করা হইত কিন্তু ফ্রান্স সেই পথে না চলিয়া ঐ বিচারালয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের পথই অবলম্বন করিতে চাহিলেন। ফ্রান্সের মত একটি পুরাতন সুসভ্য জাতির পক্ষে ইহা ঠিক উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই।

ফ্রান্সের আর একটা প্রচারের বিষয় হইল যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করিলে তাহা হইতে তেমন মহাক্ষতিকর কিছু পতিত হইয়া অন্য দেশের অপকার করিতে পারে না। বিশ্ববাসী বহুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছেন যে ঐরূপ বোমা ফাটাইলে তাহা হইতে মহা ক্ষতিকর বিষাক্ত বস্তুসকল হাওয়ায় ভাসিয়া বহু দূরের মানুষেরও অপকার করে এবং সেই অপকার বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এখন ফ্রান্স যদি একটা নূতন কথা বলিয়া আধুনিক জাতিদিগকে ছেলেভুলান ভাবে ফ্রান্সের অপকর্ম্মের বিরুদ্ধতা হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে সে চেষ্টা সহজ-সাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। অপর জাতিরা বলিতেছেন যে, যদি পারমাণবিক বোমা ফাটান এতই নিরাপদ্ হয় তাহা হইলে ফ্রান্স সুদূর মুরুরোয়া প্রবাল দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বোমা না ফাটাইয়া নিজের ঘরের পাশে করসিকাতে উহা ফাটাইবার ব্যবস্থা করিলেই ত পারেন। ফ্রান্স এ-কথার কোনও উত্তর দিতে সক্ষম হয়েন নাই। ফ্রান্স ও চীনদেশ আকাশমার্গে পারমাণবিক বোমা ফাটাইয়া বিশ্ববাসীর যে ক্ষতি করিতেছেন একথা এখন সর্বজন-স্বীকৃত।

বিহারে মুখ্যমন্ত্রী বদল

নানা প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হইবার পরে নিজেদের মধ্যে দলাদলি করিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করিবার চেষ্টা সফলতার সহিতই সাধিত হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, গুজরাট, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ আগেই এইরূপ দলাদলির ফলভোগ করিয়াছেন, এবং এখন বিহারেও সেই একই রকমের ব্যাপার পুনর্বার অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীকেদার পাণ্ডের মন্ত্রিত্ব অকস্মাৎ নিজদলের সমর্থকদিগের আক্রমণেই বিধ্বস্ত হইয়া সংখ্যা-গুরুত্ব হারাইয়া শক্তিহীন হইয়া শ্রী পাণ্ডেকে গদিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। হঠাৎ অনেকগুলি সমর্থক কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন কার্য্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অসহায় অবস্থাতে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

কেদার পাণ্ডে সরিয়া যাইলে পরে কে মুখ্যমন্ত্রী হইবেন সে-কথার কোন মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে নানান্ ব্যক্তির নাম উত্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী মিশ্র তাঁহার ভ্রাতাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হইবে শুনিয়া তাহাতে বাধা দিয়া অন্য লোকের নাম করেন ও শেষ পর্য্যন্ত শ্রী আবদুল গফুরের নামই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ধার্য্য হয়। শ্রী গফুর কংগ্রেসের বহু পুরাতন নেতা ও বিহারে তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম আছে। তিনি এই কার্য্যভার লইতে আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহাকে দিল্লী গিয়া বর্ত্তমানে শ্রীমতী গান্ধীর সহিত মুলাকাত করাইয়া আনিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। দেখা যাউক তাঁহার সমর্থকগণ পুরাতন খেলা এখন স্থগিত রাখেন কি না।

শ্রী আবদুল গফুর কিন্তু অবিলম্বে দিল্লী না গিয়া সর্বপ্রথমে তাঁহার মন্ত্রীসভার বিভিন্ন সভ্যদিগের মধ্যে কার্য্যভার ভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থায় মনোনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহাকে যদি মুখ্যমন্ত্রিত্ব করিতে হয় তাহা হইলে তিনি সেই কার্য্য যথাসম্ভব নিজে বুঝিয়া করিবেন। অবশ্য দিল্লীর শাসনপন্থার রীতি-নীতি অনুসরণ করিয়াই কার্য্য পরিচালনা হইবে, কিন্তু তিনি কার্য্যক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দিল্লীর ছায়ার মতই থাকিবেন এরূপ ধারণাও ঠিক হইবে না। পরিচালনার কাজ তিনি নিজবুদ্ধি ও বিচার অনুসরণ করিয়াই চালাইবেন।

কয়লাখনির কর্ম্মচারীদিগের অভিযোগ

বর্তমানে প্রায় সকল কয়লাখনিই রাষ্ট্রকরতলে চলিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুন এখন ঐ-সকল কয়লাখনিতে প্রয়োগ করা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়লাখনির কর্ম্মচারীদিগের দলবদ্ধভাবে চলিবার উদ্দেশ্যে গঠিত একটা সভা আছে। এই সভা একটা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন যে, নূতন নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তনের ফলে তাঁহাদিগের পুরাতন সুখ-সুবিধার হানিকর নানাপ্রকার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া দেখা যাইতেছে ও এইভাবে বেতন ইত্যাদিতে হাত লাগান হইলে সেইরূপ কার্য্যে বাধা দিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন।

যথা' তাঁহাদের মতে নূতন বেতনের হার যাহা করা হইতেছে তাহাতে যাঁহারা পূর্ব্বে ২৫০০ টাকা মাসিক পাইতেন এখন তাঁহারা পাইবেন মাত্র ৮০০ টাকা। যাঁহারা ২০০০ টাকা পাইতেন তাঁহারাও পাইবেন মাত্র ৮০০ টাকাই। আরও দেখা যাইতেছে যে, নবনিযুক্ত নবীন কর্ম্মচারীদিগের আগমনের ফলে পুরাতন বয়স্ক ও বহুবৎসর কাজ করিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিরা নূতন লোকেদের অধীনে কাজ করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে। এইভাবে যদি বেতন ও অধস্তন বা উর্ধ্বস্থিত লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে কয়লাখনির কর্ম্মচারী সংঘ তাহার প্রতিবিধান হেতু অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

অর্থাৎ এইসকল নব নব নিয়ম-কানুন হইবার ফলে কয়লাখনির কার্য্যক্ষেত্রে অসহযোগ ও কার্য্য বন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার বাধার আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। শুধু নিয়মের খাতিরে নিয়ম করার কোনও অর্থ হয় না। সেইজন্য নূতন নিয়ম বা রীতিনীতি প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল বিচার করার একটা বিশেষ আবশ্যকতা আছে এই কথাটা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা দেখান প্রয়োজন। তাহা না করিলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কয়লা উৎপাদনে বাধা পড়িলে দেশবাসীর বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ফলে যাহাতে কোনওভাবে সরবরাহ হ্রাস অথবা উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি না হয় ইহার ব্যবস্থা সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। কিন্তু সব কাজই বুঝিয়া করিতে হইবে। কর্ম্মীদিগকে খুশী রাখাও একটা অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য মনে রাখিতে হইবে।

কৃষিজাত আয় ও কৃষি-মূলধন করের কথা

আমাদের দেশের যাঁহারা আয়কর, মূলধন কর ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করেন তাঁহারা কিছুকাল পূর্বে স্থির করেন যে ভারতবর্ষের যাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, ডাক্তারী, আইন বা যন্ত্রবিদের কার্য্য, কিংবা বাড়ীভাড়া ইত্যাদি হইতে রোজগার হইয়া থাকে ও তাহার জন্য যাঁহারা আয়কর, মূলধনকর, ব্যয়কর ইত্যাদি দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যদি জমিজমা থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের অপর আয় ও সম্পত্তির সহিত কৃষিজাত আয় ও কৃষির মূলধন প্রভৃতিও একত্রে হিসাব করিবার একটা আয়োজন করিলে এই খতে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি আদায়ের খরচের তুলনায় লাভজনকভাবেই হইবে। তাঁহারা যে হিসাব করেন তাহাতে গোড়ায় বাৎসরিক চার কোটি টাকা ও পরে আট কোটি টাকা করিয়া অধিক রাজস্ব আদায় হইবে বলিয়া ধার্য্য করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রথম বৎসরে আনুমানিক পরিমাণের এক-দশমাংশেরও অল্প আদায় হয়। অর্থাৎ সম্ভবতঃ যাহা এই আদায়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে তাহাও হয়ত উঠে নাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

যাঁহারা আয়কর দিয়া থাকেন তাঁহাদের কৃষিজাত আয় সম্ভবতঃ বিশেষ কিছু থাকে না। কারণ ডাক্তার, ব্যবসাদার, যন্ত্রবিদ্ বা আইনজীবী প্রভৃতির গ্রামে কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবিত্ত আত্মীয়দিগের নামেই সচরাচর লিখিয়া দিয়া খাজনা, আদায় প্রভৃতির গোলযোগ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই কারণেই হয়ত কৃষি-আয়-করের সহিত অন্যান্য আয়ের সংযুক্ত হিসাব করিয়া কোন বিশেষ লাভের পথ খুলিয়া যায় নাই। গ্রাম-দেশে সহরে রাজকর্ম্মচারীগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বিশেষ কিছু করিতে সক্ষম হইতে পারেন না; সেইজন্য এই দুইপ্রকার রাজস্ব একত্র করিয়া বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মানুষের মহাশূন্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

আমেরিকানদিগের মহাশূন্যে গমনাগমন করিবার সুবিধার জন্য যে মধ্যপথে অবস্থিত পৃথিবী পরিভ্রমণকারী আকাশযান বা skylab (আকাশ পরীক্ষাগার) আছে, তিনজন মহাশূন্যবিহারী আমেরিকান বিমানবীর কিছু দিন হইল রকেটযোগে সেই পরীক্ষাগারে গিয়া তাহাতে আটাশ দিন পঞ্চাশ মিনিট বাস করেন। এই সময়ে তাঁহারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে ওজনবিহীন-

ভাবে ঐ মধ্যপথবর্তী পরীক্ষাগারে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেছিলেন। ঐ তিন বিমানবীরের নাম হইল পীট কনরাড, জো ক্যারউইন ও পল ভাইৎস্। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহারা রকেটযানে আরোহণ করিয়া উহাকে উল্টাপথে চালাইয়া ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাদের জন্য অপেক্ষমান জাহাজের সাড়ে ছয় মাইলের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের সান ডিয়েগো হইতে আটশত ত্রিশ মাইল দূরে সমুদ্রজলে অবতরণ করেন। জাহাজটির নাম "তিকোনদারোগা" ও কনরাড জলে নামিবার পরেই রেডিওযোগে বলেন, "সকলের অবস্থা অত্যুত্তম"। অবতরণ কার্য্য একেবারে নির্ভুলভাবে সাধিত হয়। যাইবার সময় রকেটযানে যে সকল বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হয় ফিরিবার সময় সেরূপ কোনও কিছুই হয় নাই।

ইহার আটত্রিশ মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড পরে জল হইতে ঐ রকেট চালিত যানটিকে উঠাইয়া জাহাজে নামান হয়। যাহাতে বিমানবীরদিগের এতদিন মহাশূন্যে অবস্থানের ফলে কোনও প্রকার শারীরিক অবস্থান্তর না ঘটিয়া থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের রকেটযান হইতে বাহিরের হাওয়ায় বাহির হইতে দেওয়া হয়। এইদিকে দৃষ্টিদান করা সুবিচারের কার্য্য হইয়াছিল; কারণ, তিনজন বিমানবীরই বাহিরে আসিয়া কিছুটা অসোয়াস্তি বোধ করেন ও টলিয়া টলিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তারেরা তাঁহাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের ভিতর ফিরিয়া আসিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন ও এই দেখায় যে প্রয়োজন ছিল তাহা উত্তমরূপেই দেখা গিয়াছিল। আরও পরীক্ষা করা হয় যে, তাঁহাদের হৃদ্‌যন্ত্রের কিছু চিরস্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে কি না, অথবা তাঁহাদের অস্থিতে ক্যাল্‌সিয়াম্ হ্রাসের কোনও লক্ষণ দেখা গিয়াছে বা যায় নাই।

এইসকল শারীরিক পরীক্ষার ফল সঙ্গে সঙ্গেই কেহ জানিতে পারে না। কোন কোন ফল হয়ত ছয়মাস পরেও জানা যাইতে পারে। তবে সাধারণভাবে ইহা জানা যাইল যে, মানুষ অনন্ত শূন্যে বহুকালাবধি বাস করিতে পারে এবং তাহাতে যে-সকল কষ্ট বা ক্ষতি হয় তাহা নিয়ন্ত্রণ সংযমন-সাপেক্ষ।

তাঁহারা যে-সকল অনুসন্ধান কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শতকরা আশিভাগ তাঁহারা করিয়াছেন। পৃথিবীর ১৬,০০০ ও সূর্য্যের ৩০,০০০ ফোটোগ্রাফও তাঁহারা তুলিয়া আনিয়াছেন।

ইরান, পাকিস্থান ও আমেরিকা

আমেরিকা আজকাল যে পরিমাণে তৈল, গ্যাস প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন তাহার তুলনায় আমেরিকার নিজস্ব সরবরাহ যথেষ্ট হইতেছে না এবং আমেরিকা সেই কারণে অন্যান্য দেশ হইতে ঐ সকল দাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রুশিয়া, রুমেনিয়া ও ইরান প্রভৃতি দেশে তৈল ও গ্যাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেইজন্য আমেরিকা ঐ সকল দেশের সহিত ব্যবসা চালাইতে বিশেষ সচেষ্ট হইতেছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার মধ্যে ইরান-আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ ইরান আরবজাতি সমূহের সহিত ততটা সদ্ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ নহেন এবং ইরান ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাকিস্থানের সাহায্যের জন্যও আমেরিকান অস্ত্র সংগ্রহ করিতে সবিশেষ ইচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। তদ্ব্যতীত আমেরিকা বহুসংখ্যক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষককে ইরানে পাঠাইয়া ঐ দেশের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দিবেন ব্যবস্থা হইয়াছে ও তাহাতেও আমেরিকার ইরানের নিকট বহু অর্থ পাওনা হইবে। ইরান তৈলাদি সরবরাহ করিয়া আমেরিকার নিকট তাহার দেনা শোধ করিবে স্থির হইয়াছে। এবং বর্তমানে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র ইরানকে আমেরিকা পাঠাইবে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল সাতশত হেলিকপ্টর বিমান। এইগুলি আমেরিকা আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইরানে পাঠাইবেন।

ইরান এইসকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-সকল কথা

বলিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান কথা হইল যে তাঁহারা যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকার নিকট হইতে পাইবেন তাহা হইতে তাঁহারা যথেচ্ছা যাহা প্রয়োজন বোধ করিবেন তাহা পাকিস্থানকে দিবেন। উপরন্তু এ-কথাও ইরান বলিয়াছেন যে পাকিস্থানকে যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তাহা হইলে ইরান তাহার সকল সামরিক শক্তি লাগাইয়া পাকিস্থানের সহায়তা করিবেন। কারণ ইরানের মতে পাকিস্থানের অস্তিত্বের সহিত ইরানের অস্তিত্ব অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। ইরান এ-কথা বলেন নাই যে ভারতবর্ষ যদি প্রথমে পাকিস্থানকে আক্রমণ করেন ইরান তবেই সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাকিস্থানকে সাহায্য করিবেন। মনে হয় যদি ভারত পাকিস্থান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্যও পাকিস্থানকে প্রত্যাক্রমণ করেন তাহা হইলেও ইরান পাকিস্থানের সহায়তায় ভারতবর্ষের উপর হামলা করিবেন। যতটা বুঝা যায় সমস্ত ব্যাপারটি আমেরিকার দ্বারাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য, মধ্য এশিয়ায় যাহাতে আমেরিকার একটা সুদৃঢ় স্থান থাকে, যাহা হইতে ভারত মহাসাগরে রুশিয়ার বন্ধুর সংখ্যা আমেরিকার তুলনায় অত্যধিক না হয়। পাকিস্থান যাহাতে আরও টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া না যায় তাহাও একটা বড় কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণে জাপানী অভিযোগ

চীন মধ্যে মধ্যে আকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করিয়া নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করিতেছেন। এই বিস্ফোরণ হইতে হাওয়ায় যে বিষাক্ত বস্তুসকল নির্গত হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া নানাদিকে যায় তাহা যদি এরূপ পরিমাণে হয় যাহাতে মানুষের শারীরিক ও বংশানুক্রমিক ধারায় ক্ষতি হইতে পারে তাহা হইলে চীনের আশে-পাশের অপরাপর দেশগুলির আপত্তি করিবার কারণ উপস্থিত হইতে পারে। বর্তমানে চীন যে বিস্ফোরণ সাধন করিয়াছেন তাহার পরে জাপান চীনের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যাহাতে ভবিষ্যতে চীন আর ঐরূপ বিস্ফোরণ না করেন। জাপানের মতে চীনের বিস্ফোরণের নির্গত ও পতিত বিষাক্ত বস্তুসকল কিছু কিছু জাপানে গিয়া পড়িয়াছে এবং উপর্যুপরি যদি বৃহত্তর বিস্ফোরণ করা হয় তাহা হইলে জাপানের জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি হইবে এবং সেই স্বাস্থ্যহানির কুফল ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে যাহারা জন্মাইবে তাহাদেরও মধ্যে গিয়া পৌঁছাইবে। চীন বলিয়াছেন যে, জাপান পরমাণবিক বিস্ফোরণের এখন অবধি একমাত্র সাক্ষাৎ ভুক্তভোগী, এই কারণে জাপান ঐ বিষয়ে বিশেষভাবে সজাগ; কিন্তু চীন যাহা করিয়াছেন তাহা হইতে জাপানের কোনও ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া চীন মনে করেন না। সুতরাং চীন জাপানের অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না।

জাপান ব্যতীত নিউজিল্যাণ্ডও চীন সরকারকে জানাইয়াছেন যে, চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ হইতে নিউজিল্যাণ্ডের জনগণের ক্ষতি হইতে পারে ও চীন ভবিষ্যৎ ঐরূপ বিস্ফোরণ না করিলেই সকলের মঙ্গল। ইহা ব্যতীত চীনের দুই-একটি পারমাণবিক বোমা দিয়া চীন আমেরিকা অথবা রুশের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে করা একটা অসম্ভবের শেষ পর্য্যায়ের কথা। চীনের সহিত আমেরিকার তুলনা করিলে দেখা যায় চীন ১৫ ও আমেরিকা সেই স্থলে ৩০০০০ বোমা জমা করিয়াছেন। রুশিয়ার নিকট আছে ২৫০০০ ঐ জাতীয় বোমা। এ-অবস্থায় চীনের উচিত নহে শতশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পৃথিবীর জন-অহিতের কারণ সৃষ্টি করা।

সহরে আবহাওয়া বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি করে

জার্মানীর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে গ্রাম-দেশের সহিত তুলনায় সহরে বৃষ্টি-পাত অধিক হয়। জার্মানীর বড় বড় সহরগুলিতে তাহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য এলাকার তুলনায় শতকরা ষোলভাগ অধিক বৃষ্টিপাত হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঐ বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে, সহরে আবহাওয়াতে অনেক অধিক বস্তুকণাপূর্ণ ধোঁয়া, বাষ্প,

গ্যাস ও ধুলা ইত্যাদি থাকাতে আকাশের হাওয়ায় যে জলের অংশ থাকে তাহা শীঘ্র শীঘ্র জমিয়া জল হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এই কারণেই সহরে বৃষ্টিপাত গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হয়।

সহরের আবহাওয়ার ঐ পার্থক্যের কারণ যে-সকল দেখা যায় তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মোটরগাড়ীর এঞ্জিনের ধোঁয়া, কয়লা জ্বালানর ফলে যে ধোঁয়া হয় সেই ধোঁয়া এবং গাড়ীর চাকা ও মানুষের পদক্ষেপে উদ্ভূত ধুলা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত আছে কারখানার বাষ্প ও গ্যাস, রন্ধনের গন্ধবহুল হাওয়া ও অপরাপর ময়লা ও বিষাক্ত গ্যাস। সকল কিছু মিলিয়া মিশিয়া সহরে আবহাওয়াকে বাহিরের হাওয়া অপেক্ষা অনেক ঘন করিয়া তোলে ও সেই ঘন হাওয়া সহজেই জমিয়া ঠাণ্ডা হইয়া বৃষ্টিপাতের সূচনা করে। গ্রামাঞ্চলে এক বর্গমাইলে যতজন লোক বাস করে, সহরে তাহা অপেক্ষা ৫০।৬০ গুণ অধিক মানুষ থাকে। এই সকল মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যে হাওয়া তাহাও এমনি হাওয়া অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ঘন। স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, বাজার ইত্যাদির কথাও মনে রাখা আবশ্যক। সহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে বহুসংখ্যক জীব-জন্তুও বাস করে। তাহাদেরও ভুলিয়া থাকিলে চলে না।

অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার আবশ্যকতা

সমাজে যে-সকল মানব-উপভোগ্য বস্তু ও সেবাকার্য্য উৎপাদিত হয় ও ক্রয়-বিক্রয়ের সাহায্যে ভোক্তাদিগের নিকট পৌঁছায় সেইসকল বস্তু ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের কথাই অর্থনীতির বিষয়। উৎপন্ন বস্তু ও সেবার উৎপাদনের খরচার মধ্যে কাঁচামাল ইত্যাদির মূল্য, বহন-ব্যয়, কর্মীদিগের মজুরী, মূলধনের জন্য ব্যয় ইত্যাদি নানান্ খাতে খরচ লিখিত হয়। তাহার পরে থাকে লাভের কথা সকল খরচ ও লাভ একত্র করিয়া দ্রব্য অথবা সেবার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বড় কথা হইল লাভের কথা; কারণ লাভ কি বা কতটা ধার্য্য হইবে তাহা নির্ভর করে উৎবাদক ও বিক্রেতার বাজারে প্রতিষ্ঠা বিচার করিয়া। উৎপাদক যদি প্রতিযোগিতাবিহীনভাবে বাজারে একাধিপত্য করিতে থাকেন তাহা হইলে তিনি লাভ ততটাই করিতে সক্ষম হইতে পারেন যতটা লাভ করিলেও তাঁহার উৎপাদিত সকল মাল বাজারের ক্রেতাগণ ক্রয় করিয়া লইবেন। অর্থাৎ অধিক লাভ করিবার জন্য মূল্যবৃদ্ধি করিলে অনেক সময় মালের খরিদ্দার পাওয়া কঠিন হয় এবং মাল অবিক্রীতভাবে পড়িয়া থাকে। সুতরাং দুইটি কথাই মূল্য নির্দ্ধারণে বড় কথা। প্রথম এরূপ মূল্য স্থির করা যাহাতে অধিকতম মূল্যে অধিকাংশ মাল বিক্রয় হইয়া যায়; এবং দ্বিতীয়তঃ একাধিপত্য থাকিলে শুধু অধিকাংশ মাল বিক্রয় করিয়া খালাস করিবার কথাটাই বড় কথা থাকে এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে তাহাও বুঝিয়া চলিতে হয়। প্রতিযোগিতা মূল্যবৃদ্ধির প্রতি-বন্ধক। প্রতিযোগিগণ মূল্য বৃদ্ধি করিলে নিজেদের মাল সস্তায় ছাড়িয়া সেই কার্য্যে বাধার সৃজন করেন। এই কারণে একাধিপত্য বা "মনোপলি" গঠিত হওয়া ক্রেতাদিগের দিক হইতে সুবিধার কথা নহে। এই একাধিপত্য সরকারীভাবে উৎপাদন ও সরবরাহের কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইলে হইতে পারে এবং আমাদের দেশে পোষ্ট-টেলিগ্রাম-টেলিফোন-আকাশবাণী-রেলওয়ে পরিবহন-বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি নানান্ কার্য্যে এই প্রকার সরকারী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু লাভের কথা "মনোপলি" হিসাবে দেখিবার সুবিধা থাকিলেও সরকারকে জন-মঙ্গলের কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হয় ও লাভ করিলেও তাহা যথেচ্ছ করিবার কথা সংযমের সহিত ভাবিতে হয়। সরকার ঐ সকল ব্যবসায় ব্যতীত বর্ত্তমানে আরও বহুক্ষেত্রে নিজেদের উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রযুক্ত করিতেছেন। যথা —ব্যাঙ্কিং, কয়লা সরবরাহ, ইস্পাত উৎপাদন, বড় বড় যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি। এইসকল ক্ষেত্রে সরকারী উৎপাদন ও বণ্টন আরম্ভ হইবার পরে ঐ সকল বস্তুর মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কারণ মূলতঃ ইহা একাধিপত্যেরই ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

যদি অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিপত্যের

কথা আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে স্থানীয় ও সীমিতভাবে বহুক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "মনোপলি" প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও জনসাধারণকে নানাভাবে ব্যবসাদারগণ প্রবঞ্চনা করিয়া নিজেদের অতিরিক্ত লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে।

যথা—ধরা যাউক, খাদ্য-বস্তুর বাজারের কথা। মৎস্য, মাংস, তরকারী, চাউল, ডাল, মশলা প্রভৃতি সকল বস্তুরই বাজার দর স্থানীয় একাধিপত্যের ধাক্কায় সর্ব্বত্রই আকাশে উঠিয়া থাকে। মৎস্য যদিও কোথাও না কোথাও ৩।৫ তিন হইতে পাঁচ টাকা কিলোতে বিক্রয় হয় তাহা হইলেও বাজারে মৎস্য (কলিকাতায়) ১২।১৫ বার টাকা হইতে পনের টাকা কিলোতে বিক্রয় হয়। এক বাজার হইতে অপর বাজারে দুই-তিন টাকার তফাৎ হয়। একথা অবশ্য গ্রাহ্য যে খরিদ মূল্যের তুলনায় বিক্রয়মূল্য অতি অবশ্যই অন্ততঃ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। মাংসের ক্ষেত্রেও ঐ একইভাবে নানান বাজারে এক এক-রকম অতি-বর্দ্ধিত মূল্যে মাংস বিক্রয় করা হইয়া থাকে। অনেক সময় দূরের বাজারে, যথা বোম্বাইএ, যদি মাংসের মূল্য ১৫।১৬ পনের হইতে ষোল টাকা কিলো হইয়া যায় তাহা হইলে কলিকাতায় মাংসের বাজারে তাহার ছায়াপাত হইয়া মাংস দুর্মূল্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল "মনোপলি" বাজারে বাজারে গড়িয়া উঠে এবং কোনও প্রতিযোগিতা কোথাও হইতে পারে না। তাহার কারণ বিক্রেতাগণ সকলে একজোট হইয়া এক-এক বাজার একচেটিয়া করিয়া রাখে। তরকারীর বাজারেও ঐ জাতীয় একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা প্রায় সর্ব্বত্রই করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা মাছ-মাংস বিক্রয়ে যেরূপ পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত ততটা প্রবল নহে। এই কারণে কিছু প্রতিযোগিতা কোথাও কোথাও থাকায় তরকারীর বাজার-দর ঠিক মাছ-মাংসের মত ততটা প্রকটভাবে বাড়াইতে দোকানদাররা পারে না। ফলের বাজারে অবশ্য একাধিপত্য আরও জোরাল। চাল, ডাল প্রভৃতি বস্তু সহজে নষ্ট হইয়া যায় না এবং ক্রেতাগণ বহুদূর হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন বলিয়া প্রতিযোগিতা ঐ সকল বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে প্রবলতর। ইহা ব্যতীত বিক্রেতাগণও বাড়ী বাড়ী গিয়া ঐ সকল বস্তু বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইসকল কাঁচামাল বিক্রয় ক্ষেত্রে সরকারী একাধিপত্য স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা কোনও কোনও ক্ষেত্রে করা হইতেছে। যথা গমের ব্যবসায়ে। চালও রেশনিং মারফৎ কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিতভাবে বিক্রয় হয়। কিন্তু ঐ নিয়ন্ত্রণ কালো বাজার সৃষ্টি করিলেও খুব অধিক মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা দমন করিতেও সাহায্য করে।

সকল বাজার দেখিলে একটা কথা বিশেষভাবে বুঝা যায় যে প্রতিযোগিতা থাকিলে অর্থনীতির স্বাস্থ্যরক্ষা সহজ হয়। একাধিপত্য থাকিলে তাহাতে খরিদ্দারের স্বার্থরক্ষা কঠিন হয়। সুতরাং যদিও সরকারী একাধিপত্য জনসাধারণের হিতসাধনার্থে-ই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় তথাপি তাহাও যথাসম্ভব অল্প ব্যবসায়েই স্থাপন করা উচিত। অধিক রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনমঙ্গলকর হয় না। ইহার প্রধান কারণ সরবরাহের পরিমাণে এবং দ্রব্যের বা সেবার উৎকর্ষের ইহাতে হানি হয়। রুশ দেশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় দ্রব্যোৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা যতদিন একচেটিয়াভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন ভোগ্য বস্তুর অভাবে রুশ-দেশবাসী মহাকষ্টে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়া থাকিতেন; কিন্তু পরে কারখানা প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। কারণ একাধিপত্য-নীতি অপসারণ ও তৎস্থলে প্রতিযোগিতার পুনরাবির্ভাব ব্যবস্থা। চীনদেশে বরাবরই কিছু কিছু ব্যক্তিগত অধিকারে দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা হইয়াছে। এখনও হয়ত সেই রীতি কিছু কিছু অনুসৃত হইতেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থার নিদারুণ গোলযোগ লক্ষিত হইতেছে, যাহার ফলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা নষ্ট হইতেছে ও কোটি কোটি মানুষ

বৈদ্যুতিক শক্তি না পাওয়ায় নানাপ্রকার ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতালাভের পর হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বন্টন সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা দেশের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার একটা বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিচার করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকারে ঐ কার্য্য করা সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক ও বিক্রেতা ছিল কলিকাতা ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ এবং তাঁহারা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গার্ডেন রীচে একটি বিরাট শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র অংশতঃ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সরকার বাহাদুর বন্ধ করিয়া দেন ও ক্যালকাটা ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে তখন হইতে শুধু ডি ভি সি ও ডবলিউ বি এস্ ই বি (DVC and WBSEB)-র নিকট হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিবার কার্য্যেই নিযুক্ত করেন। ফলে ক্রমে ক্রমে শক্তি ব্যবহারের তুলনায় শক্তি সরবরাহ হ্রাস হইতে আরম্ভ করে ও বর্ত্তমানের বৈদ্যুতিক শক্তির দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে লক্ষিত হইতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন যথেষ্ট হইতেছে না এবং ব্যক্তিগতভাবেও কাহাকেও ঐ কার্য্য ব্যবস্থা করিয়া করিতে দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং অবস্থার উন্নতি যাহারা করিতে পারে তাহারা সে কার্য্য করিতে সক্ষম নহে এবং যাহারা সক্ষম তাহারা করিবার অধিকার পাইতেছে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় বিলি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন কার্য্য করিতে হইলেই তাহার প্রধান অন্তরায় সর্বদাই দেখা যায় বিদেশী মুদ্রার অভাব। পূর্বে যখন আমাদের রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকা তখন আমরা যেভাবে "হায় হায়" করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না; এখন যখন সেই খতে আমরা ১৭০০ কোটি টাকা রপ্তানিতে অর্জন করিতেছি, তখনও আমরা একই সুরে হা-হুতাশ করিতেছি। মনে হয় কোন্ জিনিস আগে আমদানি করা হইবে এবং কোন্ জিনিস পরে আসিবে তাহার হিসাবে সরকারী সুবিধার কথাই সর্ব্বাগ্রে বিচার করা হইত। সরকারী প্রয়োজনের মাল-মশলা পুরাপুরি জোগাড় হইয়া যাইলে পরে জনহিতকর বস্তুর আমদানি আরম্ভ করা হইত। সেই কারণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন-কার্য্য সর্বদাই যথাযথভাবে না করিয়া কিছু কিছু বাকি রাখিয়া চলা হইত ও বাকির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে হইতে এরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে সরকারী গাফিলি সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিল না। এখনও মনে হয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন জাতীয় প্রয়োজনীয়তার তালিকায় ততটা উর্দ্ধে তুলিয়া বসান হয় নাই যাহাতে দেশবাসী অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শীঘ্র শীঘ্র পাইতে সক্ষম হন। বিদ্যুতের অভাবে কারখানার যন্ত্র অচল, হোটেলে-গৃহে ঠাণ্ডা কল না চলার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যবস্তু নষ্ট, হাসপাতালে ও নার্সিং হোমে রুগীদিগের কষ্টভোগ ও অনেক সময় মৃত্যুর পথে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি অনেক কথাই এই সূত্রে উত্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহৎ কারবার ও সরকারী দফতরেও "লিফ্‌টে" মধ্যপথে আটকাইয়া দম বন্ধ হইয়াও রাজকর্মচারীদের দ্বারা এই অবস্থার কোন সুরাহা করা সম্ভব হয় নাই।

মীরাবাঈ

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভক্ত ও ভক্তিমূলক গানের অনুরাগীমাত্রের কাছে মীরাবাঈ একটি সুপরিচিত ও সুপ্রিয় নাম। মীরার ভজন শোনেনি এমন লোক ভারতবর্ষে বিরল। অর্থনীতির অধ্যাপক পরলোকগত সুপণ্ডিত বিনয়কুমার সরকার বলেছেন, "দিলীপের 'মীরাবাঈ' শুনতেও যখন তখনই রাজি আছি"। দিলীপকুমার রায় ও এম এস শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে মীরার ভজন শোনা একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। অন্য আরো বহু গায়ক গায়িকা মীরার ভজন হিন্দী ও বাংলা অনুবাদে প্রাণকাড়া ভঙ্গিতে গেয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। মীরার ভজন ভাষা ও সুর উভয় দিক্ থেকে সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতে অমরত্ব লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

মীরার ভজন শুনে তৃপ্তি লাভ করার পর শ্রোতার পর শ্রোতার উৎসুক মনে প্রশ্ন জাগে: কে এই মীরাবাঈ? এই প্রশ্নের কোন অবিসংবাদিত অবিতর্কিত উত্তর না পাওয়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়। এত ভাল ভজন বা ভক্তিমূলক গান যিনি লিখেছেন, তাঁর কোন নির্ভরযোগ্য জীবনী পাওয়া অসম্ভব, যদিও তিনি খুব বেশী দিন আগের মানুষ নন, এটা ভাবা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মীরাবাঈএর কোন প্রামাণিক জীবনী আমরা কেউ পাই নি এবং তাঁর ভজনাবলী আদৌ একজনের রচনা কি না, এমন-কি তাঁর নিজের রচনা কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। এই প্রবন্ধের অবতারণা সেই সন্দেহের কারণ বিবৃত করার উদ্দেশ্যে।

মীরাবাঈ রাজস্থানে বা রাজপুতানায় আদৌ জনপ্রিয় নন, এ-সত্য বহু বর্ষ আগে পরলোকগত সুসাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী উদ্‌ঘাটিত করেন। স্বামী ও সংসারের প্রতি কর্তব্য পালন না করে, মহাবীর যশস্বী কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামীর প্রেম উপেক্ষা করে তাঁর পবিত্র রাজকুলে কলঙ্ক আরোপের কারণ হয়ে গৃহত্যাগিনী রমণী তাঁর ভক্তিবিলাসের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকুন না কেন তা পদ্মিনীর অনুরাগী বীরত্বের পূজারী রাজপুত জাতির ভালো লাগেনি। প্রেমাঙ্কুরবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, রাজপুতানায় আদর্শ নারীচরিত্র রূপে পদ্মিনী সর্বত্র পূজিতা; কিন্তু মীরার নামও কেউ করে না দেখে তিনি খুব বিস্মিত হন।

মীরাবাঈএর যে-জীবনী সাধারণ্যে পরিচিত, তা আধুনিকতম ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন না সত্য ও প্রামাণিক বলে। কিন্তু তাঁরা মীরার জীবনী বলতে যা তুলে ধরেছেন, তা থেকে তাঁর মহিমার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মীরার সুপরিচিত জীবনটি রাজপুত চারণগীতিকায় গড়ে ওঠে এবং টডের রাজস্থান-কাহিনীতে তার অধুনা-অস্বীকৃত ঐতিহাসিক রূপটি পাওয়া যায়। এই জীবনীটি এখন প্রচারের জোরে ও ব্যাপকতায় সর্বত্র এমন পরিচিতি লাভ করেছে যে, জন-মনে তা একটা দুর্মর সংস্কারে পরিণত যার উচ্ছেদ প্রায় অসম্ভব। বাল্মীকি-বর্ণিত আর্য রাজকুমার যেমন পরবর্তী রামায়ণকারদের সাধনায় ভগবানের অবতারে পরিণত, মহাভারতের বাসুদেব কৃষ্ণ যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানে পরিণত, মেবার অঞ্চলের রাজকুলবধূ স্বামিসংসারবিতৃষ্ণ সঙ্গীতরচয়িত্রী মীরাও তেমনি ভক্তিপরায়ণা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাজ্যত্যাগিনী এক মহা সাধিকারূপে পরিগণিতা। তাঁর সম্বন্ধে প্রচারিত অলৌকিক ও ভিত্তিহীন জনশ্রুতিগুলি অবলম্বনে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বহু কাহিনী, কবিতা, আখ্যান, নাটক ও চলচ্চিত্র রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিকের অমোঘ ও নির্মম দণ্ডাঘাতে মিথ্যা মোহের সেই প্রতিমাগুলি চূর্ণ

হলেও সাধারণ লোকের মন থেকে ভক্তিবাদীদের দ্বারা প্রচারিত সংস্কারগুলি দূর করা যায়নি।

প্রথমে টডের দ্বারা সংগৃহীত কাহিনী থেকে মীরার যে-পরিচয় সাধারণ্যে প্রকটিত, যার ওপর ভক্তিবাদীরা মনের সুখে রং ফলিয়েছেন, সেটি খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্সে'র উদ্যোগে সংগঠিত চন্দ্রাবতী-দুর্গাদাস-পাহাড়ী-মলিনা-ইন্দুবালা অভিনীত মীরাবাঈ চলচ্চিত্র এবং ১৯৪৭ সালে সারা ভারত মাতানো শুভলক্ষ্মী-অভিনীত হিন্দীভাষী 'মীরা' চলচ্চিত্র—দুটিই টডের দেওয়া কাহিনীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা ছায়াছবি-দুটি দেখেছেন, তাঁরা নিয়ে প্রদত্ত কাহিনীর যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন।

মেবারের দিগ্বিজয়ী বীর মহারানা কুম্ভের সঙ্গে মের্‌তাবাসী রানা রতন সিংহের কন্যা পরম রূপলাবণ্যবতী মীরাবাঈএর বিয়ে হয়। মীরা আশৈশব কৃষ্ণানুরাগিণী ছিলেন; কৃষ্ণকেই তাঁর ইহ-পরকালের একমাত্র আরাধ্য এবং স্বামী বলে জানতেন ও মানতেন। সর্ব্বগুণান্বিত ভক্ত, কবি, সুপুরুষ, দিগ্বিজয়ী বীর যোদ্ধা স্বামী কুম্ভকে তিনি পছন্দ করতেন না। যৌন প্রেম যে তাঁর দু চোখের বিষ ছিল তা নয়; অন্য রাজকুমারীর প্রতি অন্য রাজকুমারের প্রেমকে তিনি সহানুভূতির চোখে দেখতেন, কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর আসক্তিটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। মেবারের মহারানী হয়েও রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন-ভজন গেয়ে এক শ্রেণীর জনতার সঙ্গে মিশে হুল্লোড় সৃষ্টি করার জন্যে তাঁর নামে বহু কলঙ্ক প্রচার করা হয়। রানা কুম্ভ তাঁকে সংযত করার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে শেষে তাঁকে বিদায় দিতে বাধ্য হন। কুম্ভ স্বয়ং ভক্ত ও কবি হওয়া সত্বেও মীরার সঙ্গে তাঁর কেন বনল না, তা বোঝা কঠিন। মীরা এর পর বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন। সেখানে রূপ-সনাতনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ভক্তবৃন্দ তথা ভক্তমাল গ্রন্থ অনুসারে রূপের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ও হয়। এ-প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের 'কলঙ্কাবতী' খণ্ডে প্রদত্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্য অতি উপভোগ্য। সম্রাট্ আকবরও নাকি চুপি চুপি তাঁর সভাগায়ক তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে মীরার সুকণ্ঠনিঃসৃত গান শুনে যান। তুলসীদাসও এসে মীরার সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীচৈতন্যবিষয়ক পদও মীরা কর্ত্তৃক রচিত হয়। তারপর তিনি দ্বারকায় চ'লে যান কৃষ্ণসমভিব্যাহারিণী হতে। প্রেমাঙ্কুরবাবু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, রাজস্থানের তুলনায় গুজরাতেই মীরা বেশি সমাদৃতা। যোদ্ধৃজাতি রাজপুতদের তুলনায় রণছোড়জীর উপাসক গুজরাতীরাই যে মীরার বেশি সমঝদার হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এমন স্ত্রীর মর্যাদা না বোঝার পাপে রানা কুম্ভের রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি শুরু হলে তিনি ভয়ে ভয়ে মীরাকে ফিরিয়ে আনলেন, কিন্তু গোপনে কৃষ্ণ-মন্দিরে মীরা তাঁর নিষিদ্ধ প্রণয়ের প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন সন্দেহে আড়ি পাততে গিয়ে কুম্ভ দেখলেন, মীরা কৃষ্ণবিগ্রহে লীনা হলেন।

এই হল সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত মীরা-কাহিনী। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আণ্ডালের যে কাহিনী দ্রাবিড় ভক্তিবাদীরা প্রচার করেছেন তার সঙ্গে এ আখ্যানের অদ্ভুত সাদৃশ্য। দক্ষিণী আণ্ডাল উত্তরাপথে এসে মীরা হয়েছেন, এ-বিষয়ে কারো সংশয় থাকলে তাঁকে হরিদাস দাস রচিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য" পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এ-কাহিনী যে মনোহর উপন্যাস মাত্র, তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এক মুহূর্তে বুঝতে পারেন। কিন্তু শতকরা আশিজন নিরক্ষরের দেশে এ-কাহিনী সহজেই কল্‌কে পায়। বিশেষত কল্‌কেটা যখন গাঁজার।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, কুম্ভের রাজত্বকাল ১৪৩৩-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ; সুতরাং মীরার সঙ্গে আকবর—তানসেন—যুবক বা বৃদ্ধ রূপ-সনাতন—হিন্দী রামায়ণকার শ্রীরামচরিত-মানস-প্রণেতা তুলসীদাস—এঁদের কারো দেখা হবার কোন উপায় ছিল না, মীরার পক্ষে ১৪৯৩ সালে কুম্ভকে বিয়ে করে শ্রীচৈতন্য বিষয়ক পদ রচনা করাও সম্ভবপর নয়, যে-বৃন্দাবন বাঙালী বৈষ্ণব সাধুরা ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বিশেষত মাধবেন্দ্র পুরী প্রমুখ সন্ন্যাসীদের

সাহায্যে নতুন করে গড়ে তোলেন, সেখানে এসে মীরার বসবাস করারও কোন কথা উঠতে পারে না। সুতরাং টডের কাহিনীর ভিত্তিতে এই ঘটনাগুলি কল্পনা করা চলে না।

ঐতিহাসিকরা যখন প্রমাণ করলেন যে, মহারানা কুম্ভের পত্নীরূপে মীরাবাঈ-এর পক্ষে ঐসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভবপর নয়, তখন ভক্তিবাদীরা ভিন্ন পথ ধরলেন। নবীন ঐতিহাসিকেরাও মীরা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, মীরার লেখা বলে পরিচিত কোন কোন র না স্বয়ং রানা কুম্ভের রচনা। তখন খুঁজতে খুঁজতে আর-এক মীরাবাঈ-এর সন্ধান পাওয়া গেল। ইনি রানা সঙ্গ বা মহারানা সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজরাজের পত্নী। কিন্তু দেখা গেল, সেক্ষেত্রে তিনি মেবারের মহারানী হতে পারেন না, কোন কালে হন নি, আকবর-মানসিংহ-তানসেনাদির সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তুলসী-দাসের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের আবিষ্কৃত তথ্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে :—

"মীরা নামটিকে ঘিরে অনেক উপকথা জড়ো হয়েছে এবং মেবারের শাসক পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও তারিখ নিয়ে লেখকদের মধ্যে বহু বিতর্ক আছে। টডের কাহিনী অনুসারে, তিনি মেবারের রানা কুম্ভের রানী ছিলেন যাঁর সঙ্গে ১৪১৩ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁকে রাগ-গোবিন্দ গ্রন্থের একজন রচয়িত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থের টীকার লেখিকারূপেও। মেবারের দুটি কৃষ্ণমন্দিরের মধ্যে একটি নির্মাণের গৌরব তাঁকে দেওয়া হয়, অন্যটির রানা কুম্ভকে। বেশির ভাগ আধুনিক লেখক টডের অভিমত ভ্রান্ত বলে মনে করেন এবং ধরে নেন যে, তিনি যোধপুর শহরের চল্লিশ মাইল পূর্ববর্তী এবং আজমীর শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মেরতার রানা রতন সিংহের কন্যা ছিলেন। তিনি হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে নয় ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে রানা সঙ্গের পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মথুরা এবং বৃন্দাবনে সাধুসন্তদের সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর তিনি সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বারকায় চলে যান এবং প্রায় ১৫৪৬ সালে সেখানে মারা যান। মীরা ও তুলসীদাসের মধ্যে চিঠিপত্রের বিনিময় সম্বন্ধে যে-গল্প প্রচলিত, তা ভিত্তিহীন; তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে মীরার কাছে আকবরের আগমন বর্ণনা করে যে আর একটি বিবরণ পাওয়া যায়, সেটিও তাই।" (৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠা, গ্রেট উইমেন অব ইণ্ডিয়া, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও স্বামী মাধবানন্দ সম্পাদিত, অধ্যাপক কালীকিঙ্কর দত্ত লিখিত।)

আমাদের দেশে ইতিহাসচর্চার এমন দুরবস্থা যে, মীরার আবির্ভাবের পর পাঁচশ বছর যেতে না যেতে তাঁর জীবনীতে বিবাহের যে দুটি স্বতন্ত্র তারিখ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মধ্যে ব্যবধান মাত্র দু-চার দিনের নয়, একশ তিন বছরের! টডের বিবরণীর সঙ্গে আধুনিক হিন্দীভাষী ঐতিহাসিকদের মতের প্রধান পার্থক্য মীরার স্বামী কে ছিলেন, তা নিয়ে। টডের মতে কুম্ভ, অন্যান্যদের মতে কুম্ভের প্রপৌত্র ভোজরাজ। টডের সুখপাঠ্য বিখ্যাত গ্রন্থ এ্যানাল্স্ এ্যাণ্ড এ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান যে নানা রকম ঐতিহাসিক ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, সে-কথা এখন সর্বজনস্বীকৃত। বিশেষত সন তারিখের খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে টডে প্রায়ই দু-চার বছরের এদিক-ওদিক দেখা যায়। তা হলেও টডের দেওয়া স্থূল বিবরণ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। আমরা অবশ্য মীরাবাঈ প্রসঙ্গে যথাসম্ভব নিখুঁত সালতামামি দেবার চেষ্টা করব।

১৫২৮ সালে ৩০শে জানুয়ারি সংগ্রামসিংহ মারা যান। সেই তারিখে তাঁর তিনটি পুত্র জীবিত ছিলেন: বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, রতন বা রত্নসিংহ এবং সর্বকনিষ্ঠ উদয়সিংহ। ভোজরাজ কোন সময়েই মেবারের রানা হননি এবং ১৫২৮ সালের ৩০শে জানুয়ারির আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অর্থাৎ ১৫২৮ সালে মীরা বিধবা ছিলেন। সংগ্রাম সিংহের পর রত্নসিংহ, বিক্রমজিৎ,

বনবীর, উদয় সিংহ এবং প্রতাপ সিংহ পর পর মেবারের মহারানা হন। ইতিমধ্যে মীরা সুনিশ্চিতভাবে মারা যান। কোন সময়েই তিনি মেবারের মহারানী হন নি। ভোজরাজও অতি অল্প বয়সে মারা যান। ভক্তিবাদীরা কুম্ভ ও মীরা সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী ভোজরাজ ও মীরার ওপর আরোপ করেন। সেগুলি বিশ্বাস করে দিলীপ-কুমার রায় তাঁর "ভিখারিণী রাজকন্যা" বা ইংরেজী বেগার প্রিন্সেস নাটকে লিখেছেন, "অন্তত এটুকু তো আমরা সবাই জানি—বিশেষ করে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকদের গবেষণায়—যে, তিনি ছিলেন রাজকন্যা, হয়েছিলেন মহারানী।" তিনি যে মেবারের মহারানী হয়েছিলেন, একথা টডের উক্তি মেনে না নিলে পৃথিবীর কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই সত্য বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আরও ক্ষোভের কথা, দিলীপকুমার লিখেছেন মীরার আয়ুষ্কাল ১৫৩২-৭৭ সাল। ক্ষোভের কারণ যদি কোন সরলমতি পাঠক বুঝতে না পারেন, তবে আর একটু খুলে বলা দরকার।

১৫২৮ সালে ভোজরাজ মৃত হয়ে থাকলে মীরার পক্ষে ১৫৩২ সালে জন্মে তাঁর স্ত্রী হওয়া অসম্ভব। নাটক অনুসারে ১৫৪৭ সালে ভোজরাজ মীরাকে বিবাহ করেন এবং ১৫৫৮ সালে তিনি মেবারের মহারানা হন। শুধু তাই নয়, তাঁর রাজধানী হচ্ছে উদয়পুর, যা ১৫৬৮ সালের ২৩শে ফেব্রুআরি চিতোরের পতনের পর উদয়সিংহ কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৫৫৮ সালে তানসেন এবং ১৫৬০ সালে আকবর ও তানসেন উভয়ে আসেন মীরার সঙ্গে দেখা করতে। ১৫৬০ সালে বিক্রমজিৎ মহারানা হন। ১৫৬২ সালে মীরা বৃন্দাবনে যান সনাতনের সঙ্গে দেখা করতে এবং দেখা পান। সব বৈষ্ণবই জানেন, সনাতনের দেহান্ত হয় ১৫৫৪-৫৫ সালে দশম টিপ্পনী রচনা শেষ করার অব্যবহিত পরে।

অর্থাৎ মীরাভক্তরা ইতিহাসকে নির্মম ভাবে হত্যা ক'রে মীরার মহিমা প্রচার ক'রে থাকেন। তাঁরা মীরার ভজনাবলীর কাব্যগুণের সুখ্যাতি করলে বা তাঁর কাব্যে বিকশিত ভক্তিকুসুমের সুগন্ধ আঘ্রাণ করলে কারো কিছু বলার নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিকৃতি সাধন ক'রে মীরার মহিমা বিস্তারের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। যে-আকবর ১৫৬৮ সালের ২৩শে ফেব্রুআরি তারিখে চিতোরে আট হাজার সৈন্যকে যুদ্ধে বধ করা ছাড়াও নির্দোষ ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে একদিনে হত্যা করিয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ মীরার ভজনের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এমন অবাস্তব কল্পনা না করলেও মীরার গানের সুশ্রাব্যতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা নেই।

রানা কুম্ভ সুলেখক ও সুকবি ছিলেন; "ভজন-হারাবলী" নামে তাঁর একটি ভজন গানের সঙ্কলন পাওয়া যায়। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি টীকা রচনা করেন। তাঁর কোন রানীর নাম মীরা হয়ে থাকবে। যেমন সপ্তদশ শতাব্দীতে পঞ্জাবের মুসলিম গায়ক কবি গোলাম নবি রসুল টপ্পা গানের প্রবর্তন ক'রে যশস্বী হলেও গানের ভণিতায় নিজেকে স্ত্রীর নামে সোরী মিঞা বা "সোরীর মানুষ" ব'লে উল্লেখ করেছেন, যার জন্যে তাঁর গান সাধারণ্যে সোরীর বা শোরীর টপ্পা ব'লে বেশি পরিচিত, ঠিক সেই রকম কুম্ভ তাঁর ভজনে মীরার নাম ভণিতায় প্রয়োগ ক'রে থাকবেন। এটা স্ত্রীকে ভালোবেসে করা, যেমন তিনি নিজের ও মীরার নামে দুটি কৃষ্ণমন্দির গড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভোজরাজের বিধবা পত্নী প্রকৃত মীরার পক্ষে মন্দির গড়ানো সম্ভব ছিল না। মীরার নামাঙ্কিত ভজনাবলীর মধ্যে একাধিক হাতের কাজ যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধিকা মীরার খ্যাতি বিস্তৃত হবার আগেই কুম্ভের পক্ষে "মীরার স্বামী" ভণিতায় ভজন লেখা সম্ভব, কারণ তাঁর কোন আদরিণী পত্নীর নামও মীরা হয়ে থাকতে পারে। চারণ কবিরা লিখিত ইতিহাস না রাখায় এবং স্মৃতিশক্তির ওপর বেশি নির্ভর করায় কুম্ভরানী মীরার সঙ্গে ভোজরাজবধূ মীরার মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকবেন। সেজন্যেই ভোজরাজ-পত্নী বিধবা সাধিকা মীরার জীবনকাহিনীর সঙ্গে কুম্ভপ্রিয়া মহারানী মীরার মহারানীত্ব মিশে গিয়ে থাকবে।

কারণ যাই হোক, মীরার নামাঙ্কিত ভজনাবলীর মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মতোই বহু হাতের কাজ খুঁজে পাওয়া যায়। বিখ্যাত গায়ক পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের হিন্দী মীরার ভজনে দেখা বা শোনা যায়, মীরা রাম নামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, যদিও সাধারণত তাঁকে রাধাকৃষ্ণ ভাবের উপাসিকা ব'লে মনে করা হয়। কিন্তু এটা খুব সম্ভব যে, রাজস্থানী মীরা রাম নামের মহিমা প্রচারে ব্রতী হয়ে লিখবেন, "জপো রে মন রাম নাম সুখ-দায়ী।" ভাষাতাত্ত্বিকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, মীরার ভজন মুখ্যত রাজস্থানী ভাষায় লেখা হলেও তাদের উত্তরাপথে ইচ্ছাকৃত ভাবে হিন্দী বা ব্রজভাষার মতো ক'রে রূপান্তরিত করা হয়েছে, আবার গুজরাতে তাদের প্রাচীন গুজরাতীর মত করে নেওয়া হয়েছে। মীরার ভজনের যে-বাংলা অনুবাদ কৃষ্ণচন্দ্র রেকর্ড করেছেন তাতে ভণিতায় কবি নিজেকে "মীরার গোঁসাই" ব'লে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত অবনীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ "রাজকাহিনী"-র "কুম্ভশ্যাম" কথাটি কারও ভোলা উচিত নয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি নির্ভয়ে নেওয়া যে যেতে পারে :—

(১) মহারানা কুম্ভ নিজে না গড়িয়ে দিলে তাঁর মহারানীর পক্ষে স্বামীনিরপেক্ষ ভাবে মন্দির নির্মাণ করা সে-যুগে একটু কঠিন এবং স্বামী যখন স্বয়ং কৃষ্ণভক্ত, তখন তার প্রয়োজনও নেই; রাজা নিজেই দুটি মন্দির গড়িয়ে একটি নিজের নামে অপরটি রানীর নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কোন আদরিণী রানীর নাম মীরা হয়ে থাকতে পারে।

(২) মহারানা কুম্ভের পাণ্ডিত্য ও ভক্তির খ্যাতি সুবিদিত; তিনি চারখানি নাটক, তিনখানি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ, জয়দেবের কাব্য ও চণ্ডীশতকম্-এর টীকা এবং নানা বিষয়ে আরো অনেক বই ও বহু ভজন রচনা ক'রে গেছেন। তাঁর কোন রানীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠার মতো, "পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী" কবি জয়দেব ও "শোরী মিঞা" গোলাম রসুলের মতো, তাঁর ভজনে নিজ নাম ও মীরার নাম, উভয়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। এ-ব্যাপারটি টডের মতো অক্লান্ত কর্মীকেও এত ভাবিয়েছিল যে, তিনি লিখেছেন :—

"Whether Mira imbibed her poetic piety from her husband or whether from her he caught the sympathy which produced the "Sequel to the Songs of Govinda," we cannot determine."

"মীরা তাঁর কাব্যানুরতি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, না তাঁর কাছ থেকে সহমর্মিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কুম্ভ গীতগোবিন্দের টীকাভাষ্যপরিণতি রচনা করেছিলেন, তা আমরা বলতে পারি না।"

কিন্তু কুম্ভের মনীষা প্রমাণ করে যে, তিনিই মীরার ভজনগুলির আদি রচয়িতা যাতে রামবন্দনা ছিল। পরে ভোজরাজপত্নী বিধবা সাধিকার রচনা তাতে মিশে থাকবে। ইনি চৈতন্যবন্দনাও রচনা করে থাকবেন। ইনি সনাতন ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িকাও বটেন। কারণ, এঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৫৬৩ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে।

(৩) মীরার রূপ গোস্বামীর সঙ্গে প্রণয়, তুলসী-দাসের সঙ্গে যোগাযোগ, আকবর ও তানসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ—এগুলি অলীক কল্পনা মাত্র। একমাত্র কুম্ভপত্নী মীরার পক্ষে মহারানী হওয়া সম্ভব, একমাত্র ১৫৪৩ সালে মৃতা বিধবা মীরার পক্ষে রূপ-সনাতনের কাছে দীক্ষা নেওয়া ও কৃষ্ণবন্দনার পদ রচনায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর। ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর পরিচয়-দানে অভ্যস্ত রাজপুত মহারানা ও মহারানীর রামবন্দনা করা বোধ স্বাভাবিক।

(৪) দিলীপকুমার-বর্ণিতা মীরা (১৫০২-৭৭) বা ইন্দিরা মালহোত্রার ধ্যানদৃষ্টা সংশ্রুতা মীরার সঙ্গে রাজস্থানী রাজকন্যা মীরার অর্থাৎ ঐতিহাসিক মীরার কোন সম্বন্ধ নেই।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, মীরাবাঈ-নামাঙ্কিত ভজনাবলী সুশ্রাব্য ও সুখপাঠ্য হলেও মহারানা কুম্ভের প্রতি মহারানী মীরার আচরণ সম্পর্কে যে-সব অমূলক লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে সেগুলিকে সর্বতোভাবে নিরুৎসাহ করা উচিত; কারণ, মীরা-চরিত্রের ঐ আদর্শ লোকস্থিতির একান্ত বিরোধী ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে স্বামীপুত্রের প্রতি নির্মমতার কোন সংযোগ নেই।

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তেরো

১৯২১ সালের মাঝামাঝি আমি বার্লিনে গিয়ে জর্মন ভাষা ও গান শিখতে শুরু করি। সেখানে নানা রুশ বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলাপ করে যখন সুইজর্লণ্ডে ভিলন্তভ শহরে রোলাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন আমি তাঁর সঙ্গে অনায়াসেই ফরাসী ভাষায় কথালাপ করতে পেরেছিলাম—যার অনুলিপি আমার দুটি বইয়ে প্রকাশ করেছি—"তীর্থঙ্কর" ও "Among the Great"; শুধু তাঁর সঙ্গে আলাপই নয়, তাঁর ফরাসী ভাষায় লেখা বহু পত্রই আমি পেয়েছিলাম দেশে ফিরে, যাদের মধ্যে কয়েকটির বাংলা অনুবাদ তীর্থঙ্করে ও ইংরাজী অনুবাদ Among the Great-এ ছাপা হয়েছে। আমার ভাগ্য ভালো যে, এ-বই দুটি এখনো বইয়ের বাজারে মেলে। কিন্তু ভাগ্যের সেরা ভাগ্য এই যে, রোলাঁ আমার মতন অচিন বিদেশীকেও তাঁর গভীর স্নেহদানে ধন্য করে আমার নানা প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিতেন। দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে আমার ভাবের লেনদেন কী ভাবে হত তার কিছুটা বর্ণনা বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে বলে রোলাঁ সম্বন্ধে শুধু আর একটি উক্তি করি শ্রদ্ধার তর্পণে। কথাটি এই যে, এ-যুগে রোলাঁ এসেছিলেন একটি বিশিষ্ট ভাবধারাকে পুষ্ট করতে - যার নাম আন্তর্জাতিকতা। দুঃখের বিষয় জাতীয়তা—nationalism—এখনো সারা বিশ্বে হুহুঙ্কারী। এ হুঙ্কার কমবেই কমবে, তবে কবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব—বিশেষ যখন চাক্ষুষ করছি দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধ্বংস-তাণ্ডবের পরেও জাতীয়তার সিংহনাদ স্তিমিত হয় নি।

চৌদ্দ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। আমি সাত সমুদ্র পার হয়ে কেম্ব্রিজে আসীন হই ১৯১৯ সালে। পৌঁছিয়ে প্রথম সে কী উল্লাস! - এসেছি এমন স্বাধীন দেশে যার আকাশে বাতাসে ব্যক্তিরূপের প্রতি সমীহ—respect for individuality—আকাশে বাতাসে ওতপ্রোত! শুধু পুরুষের ব্যক্তিরূপ নয় মেয়েরাও কী আশ্চর্য বেপরোয়া! এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, সে-সময়েও আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েরা পর্দানশীন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মতন দুচারটি খ্যাতনাম্নী সোচ্চার হয়ে উঠলেও যখন সাড়ে পনেরো আনা মহিলা চিকের বাইরে এসে পুরুষের সহযাত্রিণী হন নি। কেম্ব্রিজে ও লণ্ডনে প্রথম মিশবার সুযোগ পাই দুচারটি অন্ধ্রপ্রদেশের ভারতীয় ললনার সঙ্গে। মনে আছে—কী উল্লাস আমার মনকে চেতিয়ে তুলত এ-সংস্পর্শে। বাংলা দেশে তখন কেবল ব্রাহ্মসমাজের ও ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন পর্দা সরিয়ে বাইরে কর্মী হতে শুরু করেছেন—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের প্রভাবে, যার বাণী ছিল—মেয়েরা শুধু রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর ও সূতিকা গৃহের নেত্রী নয়, বাইরেও তাদের উপস্থিতির প্রভাব আকাশে বাতাসে চারিয়ে যাওয়া চাই। ১৯১৭-১৮ সালে যখন "সবুজ পত্রে" "ঘরে বাইরে" ধারাবাহিক ভাবে বেরুত তখন পরের সংখ্যার জন্যে আমরা—তরুণরা—সত্যিই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। বেশ মনে আছে—রবীন্দ্রনাথ যে নব নির্দেশ দেন নারীর নব কর্তব্যের—তার বাদী সুর এই যে, বাহিরের ডাকেও মেয়েদের সাড়া দিতেই হবে—অর্থাৎ শুধু গৃহকর্মে নয়, সর্বকর্মে। ঘরে বাইরের ছত্রে ছত্রে ফুটেছে এই বাইরের ডাক। যথা সন্দীপের নিখিলেশকে: "মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধ'রে বিরাজ করে, আমাদের (পুরুষদের) তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি, আজকের দিনে আমাদের

মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে।......" বিমলা ওরফে মক্ষীরাণীকে: "না না, আপনি লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরাণী। আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব। কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে"......ইত্যাদি।

কথাটা কিছু নতুন নয়। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে নারীর নাম পাই। তন্ত্রের একটি মূল বাণীই এই যে নারী পুরুষের শক্তি। শিব পার্বতীকে বলছেন: "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে"—শক্তির জ্ঞান না থাকলে মুক্তি হয়ে দাঁড়ায় কথার কথা, হাসির কথা। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর নানা লেখায় ও ভাষণে জীমূতমন্দ্রে ঘোষণা করেছিলেন যে, শক্তিস্বরূপিণী মেয়েরা স্বাধীন না হলে আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থান হতেই পারে না:

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।...শক্তির কৃপা না হ'লে কী ঘোড়ার ডিম হবে? য়ুরোপে আমেরিকায় কী দেখছি? —শক্তির পূজা, শক্তির পূজা।...

"দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহাতরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ-মৈত্রেয়ী-খনা-লীলাবতী-সাবিত্রী-উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনো নারীর এ-সাহস হইবে না?"*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে খবর পাই—রুশদেশেই মেয়েরা সবচেয়ে বেপরোয়া—এমন কি জারজ সন্তানও সেখানে সমাজে স্বাগত, মেয়েরা ভ্রষ্টা হলেও সমাজে ফিরে আসতে চাইলে দোর খোলা পান আবার স্ত্রী হবার, মা হবার। এ-ধরণের কথায় একটু চমকে উঠলেও নারী স্বাবলম্বিনী হোক এ আমরা সবাই চাইতাম। স্বাধীনতা পেলে প্রথম প্রথম তার সুপ্রয়োগে কেউই সিদ্ধ হতে পারে না, তাই পাশ্চাত্যে মেয়েরা অনেকে ভুল পথে চলে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে দেখা যায়। "কিন্তু তাতে কী?" বলতাম আমরা সঘনে, "ইউরোপে আকাশে বাতাসে মেয়েদের আনন্দময়ী মূর্তি কি চোখে পড়ে না?" সুভাষ তো নিবেদিতার নজির দিত উঠতে বসতে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার একটি খেদের কথাও মনে আসছে—সে বলত: "কিন্তু ভেবে দেখ দিলীপ, স্বামীজির শ্রেষ্ঠ সহকর্মী ও জীবনীকার ছিলেন কে? না, নিবেদিতা—যাঁকে আমদানি করতে হয়েছিল এ দেশ থেকে। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে এখন' মহীয়সীর দেখা পাব কবে?" আমি হেসে টুকতাম: "নিবেদিতার মতন মহীয়সী এদেশেও ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে না ভাই—যেমন শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাযোগীও আশ্রম মন্দির তপোবনে এক-আধটির বেশি দেখা যায় না। চাই বললেই কি হাতে চাঁদ আসে দাদা?" এ-ধরণের কথায় সুভাষ উদ্দীপ্ত হয়ে বলত: "এ তুমি কি বলছ দিলীপ? মহীয়সী বা মহীয়ান্ দুর্লভ বলে কি আমরা চিরদিন সুলভাকে নিয়েই ঘর করব? না না, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি নিবেদিতার মতন অসামান্যাদের দর কমাতে চাইছি না। আমি চাইছি—আমাদের দেশের মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মতন বীরবালা হোক—যারা গত যুদ্ধে অভয়া হয়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল নার্স ডাক্তার ধাত্রী হয়ে- যাদের ট্রাম বাস চালাতেও বাধে নি, যারা এমন কি, কল-কারখানায়ও পুরুষের সঙ্গী হয়েছিল চার বৎসর ধরে: অর্থাৎ, শুধু গৃহকর্মের নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে থেকে গৃহলক্ষ্মী হয়ে যাদের সাধ মেটেনি—রণসজ্জার গহন পথেও যারা হয়েছিল বাপ ভাই স্বামী ছেলের সহযাত্রী।"

সুভাষের এ-খেদ সত্যভিত্তিক। তাই গান্ধীজি নৈষ্কর্মের যুগে মেয়েদের ডাক দিয়েছিলেন—মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল দলে দলে ঘরের গণ্ডি ছেড়ে পুরুষের সহকর্মিণী হতে—শুধু হাটে বাজারে নয়, ফ্যাক্টরি-

* "স্বামীজীর আহ্বান" (উদ্বোধন কার্যালয়) ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা।

কারখানায়ও তরা কাজ নিয়েছিল—শুধু বন্দুক ধরে ফৌজ হওয়া বাকি ছিল—যার পত্তন হয় বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (ঠিক মনে পড়ছে না) বিশেষ করে রুশদেশে। (পরে মালয়ে সুভাষও গড়ে তুলেছিল ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্ট ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামিনাথমকে নেত্রীর পদে বসিয়ে।)

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে ঠিক পুরুষের সঙ্গে নারীর এভাবে পাল্লা দেওয়া বুঝতেন না—যেকথা স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় খণ্ডে আমি ফলিয়েই লিখেছি—১৭০-১৮৪ পৃষ্ঠায়। কবিগুরুর মূল বক্তব্যটি ছিল এই যে, নারী:

"প্রাণকে পূর্ণতা দেয়" (বাঁশরি) কেননা

"লভিলে হে নারী, তনুর অতীত তনু

পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু

নানা রশ্মিতে রাঙা;

পেলে রসধারা অমর বাণীর অমৃত পাত্র-ভাঙা।"

(বীথিকা, প্রত্যর্পণ।) আমাকে তিনি এ-সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার মূল বাণীটি ছিল এই যে, নারী পুরুষের পরিপূরক, প্রতিযোগী নয়, উভয়ের এলাকা আলাদা। এক কথায়, তার সমগ্র সত্তা ও শক্তি দিয়ে (বিশেষ করে সুষমায়, হার্মনিতে) পুরুষের চিত্তকে উদ্বোধিত ও প্রাণকে উচ্চকিত করাই তার স্বধর্ম, মঞ্চে চড়ে বক্তৃতা, বা রাজনীতির আখড়ায় মল্লযুদ্ধের কাজ তার পরধর্ম। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তার অনুলিপি থেকে কিছু উদ্ধৃত করি (স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃঃ):

"পুরুষ ও নারীর স্বভাব ও ছন্দ আলাদা, আর আলাদা বলেই সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য আজো ফুরালো না। যদি মেয়েরা স্বভাবে স্বতন্ত্র না হত তাহ'লে বিশ্বলীলার প্রকাশের ও লাবণ্যের প্রাণস্পন্দন থেমে যেত কবে। বস্তুতঃ, সৃষ্টির প্রেরণা নিজেকে নিত্য নতুন করে রচনা করতে চায় বলেই প্রকৃতি একজনকে অপরের প্রতিরূপ করে গড়তে চান নি। এককথায়, নারী ও পুরুষকে দুভাবে ভিন্নধর্মী করে তৈরি করা হয়েছে বলেই উভয়কে একলক্ষ্য হয়েও আলাদা ছন্দে চলতে হয়—যদি তারা কৃতকৃত্য হতে চায়।"

এ-সম্পর্কে একটি উপভোগ্য রসিকতা মনে পড়ে গেল—আমার 'ধর্ম বিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে লিখেছি শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী-র তর্পণে। উপভোগ্য তথা প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধৃত করতে কুণ্ঠিত বোধ করছি না।

"সুরবর্দি সেদিন কথায় কথায় একটি ফরাসী রসিকতা পেশ করে তুলসীর বাড়ীতে আমার গানের শেষে। ব্যাপারটা এই: ফরাসী লোকসভায় (Chambre des Deputes তর্কাঙ্গণে) মহাতর্ক—মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না। উগ্র পুরুষপন্থীরা হাঁকলেন: 'না। অসম্ভব।' উগ্রতর নারীপন্থীরা চটে বললেন: 'না? Sacrebleu! কেন শুনি?' প্রতিপক্ষ বললেন: 'Parce que il ya de la difference entre les hommes et les femmes' (পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে তফাৎ আছে।) সঙ্গে সঙ্গে সব সভ্য একজোটে উঠে দাঁড়িয়ে করলেন জয়ধ্বনি: 'Vive la difference!' (বেঁচে থাক এ-তফাৎ)।"

"তুলসী মিঠে মিঠে হেসে বলল: 'এ-তফাৎ লুপ্ত হ'লে ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো দাঁড়ায় সে-সম্বন্ধে আমিও বলি এর জুড়ি গল্প। এক নিরীহ ব্রাহ্ম ভদ্রলোক প্যারিসে এক 'কাফে'-তে বসে সন্ধ্যাবেলায় সামনের এক আলাপী অতিথির সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলেছেন—এমন সময় দোরের কাছে আর এক অতিথির অভ্যুদয়। ব্রাহ্মটি শুধালেন: 'এ কী বেশ? উনি কে বলতে পারেন? পুরুষ না মেয়েছেলে?' অতিথি আতঙ্কের সুরে বললেন: 'Tonnerre de Dieu! পুরুষ কেন হতে যাবে? ও যে আমার মেয়ে।' ব্রাহ্ম ভদ্রলোক সকুণ্ঠে বললেন: 'Je vous demande pardon, Monsieur, আমি জানতাম না যে আপনি ওঁর বাবা' এ-অপবাদে তিনি আগুন হয়ে বললেন: 'Mille tonnerres! আমি ওর বাবা হতে যাব কী দুঃখে? আমি যে ওর মা!'"

কিন্তু বিলেতে মাঠে-বাটে-ঘাটে-হাটে সর্বত্র বিদেশী ও বিদেশিনীকে হাত ধরাধরি করে চলতে বা সমতালে অকুণ্ঠে নাচতে দেখে মনে প্রায়ই খেদ হ'ত যে, আমাদের

দেশের মেয়েরা এমন স্বাধীন হ'তে পারে নি। আজ হয়েছে—যদিও তার ফল শুভ হয়েছে কি না সে নিয়ে অশ্রান্ত তর্ক করা চলে—যার নিষ্পত্তি হবার নয়। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির সংঘাতে কে কোথায় জিতেছে? শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'র একটি উপমা মনে পড়ে :

An inconclusive play is Reason's toil.
Each strong idea can use her as its tool;
Accepting every brief she pleads her case.
Open to every thought she cannot know.
The eternal Advocate, seated as judge,
Armours in logic's invulnerable mail
A thousand combatants for Truth's veiled throne
And sets on a high horseback of argument
To tilt for ever with a wordy lance
In a mock tournament where none can win.

[Savitri 2. 10]

অর্থাৎ

বিচিত্র বুদ্ধির লীলাখেলা। তার বাঙ্ময় যুক্তির
বহু প্রয়াসেরো অন্তে পায় না সে নিশ্চিতির দিশা।
প্রতি দীপ্ত ভাবধারা করে তাকে নিত্য আজ্ঞাবাহী।
বরণ করে সে প্রতি চিন্তা—তবু লভে না তো জ্ঞান।
একাধারে চিরন্তন ব্যবহারাজীব বিচারক
সত্যের-প্রচ্ছন্ন-সিংহাসনলুব্ধ লক্ষ যুধ্যমানে
ন্যায়ের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিয়া—করিয়া আসীন
তুঙ্গ-তর্ক-তুরঙ্গমপৃষ্ঠে করে উদ্দীপিত শুধু
তাদের অসার কথা-কথাসার মল্লযুদ্ধে—এক
মায়ারণাঙ্গনে—যেথা পারে না কেহই হ'তে জয়ী।

এ মৃদু ব্যঙ্গের নিশানা মানুষের মগজী-বুদ্ধির অনপনেয় অভিমান। মগজী-বুদ্ধি বলছি এইজন্যে যে, আমাদের উপনিষদে ইন্দ্রিয়কে ঘোড়া, দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি ও আত্মাকে রথী বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, তিনি বুদ্ধিরও ওপারে। হোক, তবু বুদ্ধিই যে আমাদের চালায় মগজী-চিন্তার লাগাম কষে এ-সত্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পদে পদে নিজেকে জানান দেয়। কিন্তু যে-বুদ্ধি দিয়ে ভগবান্‌কে জানা যায় সে মগজী-বুদ্ধি নয়, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন "শুদ্ধ বুদ্ধি"। অর্থাৎ যখন মানুষ কামনা-বাসনার পিছুটান কাটিয়ে উঠেছে জ্ঞানের ভূমিকায় তখন যে-নির্মল বুদ্ধি ফুটে ওঠে কেবল সে-ই পথ দেখাতে পারে পরম পদের—বোধির।

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে-বুদ্ধির তাঁবেদার হয়ে সংসারকে বুঝতে ও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই সে-বুদ্ধি মুখ্যতঃ মগজী বুদ্ধি— ইংরেজীতে যাকে বলে cerebral : শ্রীঅরবিন্দ Reason বলতে এই আটপৌরে বুদ্ধিকে নিশানা করেই তাঁর বিদ্রূপের তীরন্দাজি করেছেন, কেননা এ বুদ্ধি আত্মিক উপলব্ধির রস-কষের খবরদারি করতে পারে না, পারে শুধু বস্তুজগৎ ও বাহ্য-প্রকৃতির (Nature-এর) নানা শক্তিকে কাজিয়ে আমাদের বাহ্য জীবন ও মনোলোককেও (কতকটা) সমৃদ্ধ করে তুলতে। যে বুদ্ধিযোগের কথা গীতায় পাই সে এ-বুদ্ধি নয়—যাঁরা ভগবান্‌কে ভালোবেসে তাঁর সঙ্গে নিত্য-যোগ কামনা করেন কেবল তাঁদেরই তিনি এই শুদ্ধ বুদ্ধি দেন—"যেন মাম্ উপযান্তি তে"—যার সাহায্যে তারা ভগবান্‌কে পায়। উপনিষদেও যে-বুদ্ধিকে মান দেওয়া হয়েছে সে এই নিষ্কামনা নির্মলা বুদ্ধি—যাকে শ্রীঅরবিন্দ psychic উপাধি দিয়েছেন তাঁর যোগপরিভাষায়। কৃষ্ণপ্রেমও আমাকে বলত এই কথাই : যে, উপনিষদে যাকে বুদ্ধি বলা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ তাকেই psychic being নাম দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধি শব্দটির উঠতে বসতে ঘরোয়া প্রয়োগে সে এ-উচ্চ পদবী খুইয়ে বসেছে বলে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিভাষায় "শুদ্ধ বুদ্ধি" বলাই ভালো, নইলে চিন্তার স্বচ্ছতা আবিল হয়ে আসে। বিকশিত পরিভাষায় প্রতি শব্দের তাৎপর্য স্পষ্ট রাখাই চাই। উপস্থিত আমি বুদ্ধির চলতি ঘরোয়া প্রয়োগকেই বরণ করে বলতে চাই দু-একটি কথা।

আমরা যৌবনে—বিশেষ করে ইংলণ্ডে—মগজী বুদ্ধিকেই আমাদের সন্ধানের শ্রেষ্ঠ সহায় বলে বরণ করে নিয়েছিলাম। না নিয়ে উপায় ছিল না, কারণ মগজী

বুদ্ধিই বৈজ্ঞানিক টেকনলজির একাধারে প্রসূতি ও ধাত্রী। মানুষের বহির্জীবনে যে-ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে তার সারথি তো মগজী বুদ্ধিই বটে। হাল আমলে বৈজ্ঞানিকরা সবেমাত্র আভাস পেয়েছেন যে, তাঁরা মহত্তম আবিষ্কারের দিশা পান মগজী বুদ্ধির প্রসাদে নয় - ইনটুইশনের মাধ্যমে,—যার বাংলা প্রতিশব্দ স্বজ্ঞা। মগজী বুদ্ধি ঠিক আবিষ্কার করে না, স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানকে খাটিয়ে চমকে দেয়—বিশেষ করে টেকনলজির সাহায্যে। কিন্তু এ-চমক নিত্য-নব রূপচ্ছটায় আজকের মানুষকে মাতিয়ে তুলেছে, তাই সে মগজী বুদ্ধিকেই বরণ করে নিল জীবনের আদিনিয়ন্তা বলে। শ্রীঅরবিন্দের মুখে আমি প্রথম শুনি যে, এ-মগজী বুদ্ধির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য ও আশ্চর্য হলেও সে কোনো তত্ত্বেরই তল পায় না, শুধু বিচার করে, তর্ক করে, আভাস পায় সত্যের কিন্তু পৌঁছতে পারে না কেন্দ্রীয় তত্ত্বজ্ঞানের অলোক-লোকে। তাছাড়া—আমাকে তিনি একটি পত্রে লিখে-ছিলেন যে, যদুবাবু যদি বলেন তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধি যুক্তির নির্দেশে চলছেন তাহলে তাঁর প্রতিপক্ষ মধুবাবুও বলতে পারেন সমান জোরালো সুরে যে, তিনিও তাঁর বুদ্ধি যুক্তির নির্দেশে চলছেন। কোন্ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে তুমি যে যদুবাবু বা মধুবাবুর যুক্তিই ঠিক? দুই যুয্যমান দল আপ্রাণ চিৎকার করলেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। শেষমেশ সে-ই জেতে যে বেশী বলীয়ান্। আসলে এমন কোনো অভ্রান্ত বিশ্বজনীন যুক্তি নেই যে যুধ্যমান মতামতের সালিশ হতে সক্ষম। আছে শুধু তোমার যুক্তি, আমার যুক্তি, অগুন্তি ক, খ, গ, ঘ-এর যুক্তি। প্রতি মানুষই তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যুক্তি জোগায়, অর্থাৎ তার মানসিক গড়ন বা পক্ষপাতই তাকে চালায়।"*

---

*"His opinion is according to his reason. So are the opinions of his political opponents according to their reason, yet they affirm the very opposite idea to his. How is reasoning to show which is right? The opposite parties can argue till they are blue in the face—they won't be anywhere nearer a decision. In the end he prevails who has the greater force or whom the trend of things favours. But who can look at the world as it is and say that the trend of things is always (or ever) according to right reason—whatever this thing called right reason may be? As a matter of fact there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions; there is only my reason, yonr reason, X's reason, Y's reason multiplied up to the discordant innumerable. Each reasons according to his view of things, his opinion, that is, his mental constitution." (Letters on Yoga—To me 1, pp. 158-59)

ক্রমশঃ

বন্ধু

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

সকালেই বীরু এসেছিল। লোকটা বড় চালিয়াত। কথায় কথায় রাজা উজির মারে। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বড়লোকের ধামা ধরে উঠেছে উপরে। নীচে পড়বে শীগগীর। দেরী নেই। ঐ কথায় আছে না 'অতি-বাড় বেড়ো না'। বীরুটা আসলে নিরেট মুখ্যু। বরাত জোরে করে খাচ্ছে। ইস্কুলে দেখেছি তো ছেলেটার মাথায় কিছু ছিল না। বাপ ছিল পয়সাওয়ালা। মাস্টারদের ধরে করে ছেলেটাকে ক্লাসের গণ্ডী পার করাত। সেখানে আমি বরাবরই ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হতাম। সেই বীরে। বলে কিনা গাড়ী কিনছে। তা আর কিনবি না। বাপের টাকায় তুই বড়লোক। হুঃ। নিজের রোজগারে গাড়ী কিনবার মুরোদ আছে ছোকরার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের মত তো আর পায়ে দাঁড়ায় নি। গাড়ী কিনবে। তা কিনুক না। আজকাল কে না গাড়ী কেনে। রামা শ্যামা সকলে। ওতে কোনই বাহাদুরি নেই।

—'বাবা—'

মেজ ছেলেটা এসে সামনে দাঁড়াল।

—'কী বাবা বাবা করছিস্!' অস্বাভাবিক গলা চড়িয়ে বলি।

—'আমরা—আমরা সার্কাস যাব।' মিনমিনে গলায় বলে।

—'সার্কাস যাবে। পড়াশুনায় লালবাতি জ্বলেছে। যা পালা—' ছেলেটা তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

—'হাঁদার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন। সার্কাস দেখবে। কোন বিদ্যেটা শিখবে শুনি। ক্লাউন হবে। যা বই নিয়ে বস্ গে যা—'

ছেলেটার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মুখ নিচু করে চলে গেল। যাক্ গে। পড়াশুনা নেই সব। আজ এটা কাল সেটা। উচ্ছন্নে গেছে ছেলেপিলেগুলো।

—'কী হে শম্ভু বাড়ী আছ নাকি?'

অমূল্য। দূত্তোর। রবিবারের সকালটা মাটি করল। অমূল্যও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর বাড়ী কাছেই। মাঝে মধ্যে আসে।

—'এই যে অমূল্য। অনেকদিন পর।'

—'আর বলো না। নানা ঝামেলা। বউয়ের অসুখ। ছেলেমেয়ের পরীক্ষা। আমারও—'

আরম্ভ হ'ল প্যানপ্যানানি। 'ছুটি ছুটি' মেজাজের দফা শেষ।

—'রাখো বউয়ের অসুখ। ছেলেমেয়ের অমুক তমুক। নূতন কিছু খবর থাকে তো বলো।'

—'আমাদের আবার নূতন কি বা খবর? সংসারচক্রে—'

—'দোহাই সকাল বেলাটা ডাস্টবিনে ফেলে দিও না।'

অমূল্য অবাক্ চোখে আমার দিকে তাকায়।—'কী ব্যাপার? তোমার মেজাজটা যেন—'

—'পাঁচজনে মিলে মেজাজকে ছিবড়ে বানাচ্ছে।'

—'আমি উঠি তাহলে। আমি আসাতে মনে হচ্ছে তোমার অসুবিধে'—,অমূল্যটা বড় সেন্টিমেন্টাল।

—'না না। তুমি আসাতে কিছু না। আসলে বীরুটা এসে—'

—'বীরু এসেছিল নাকি? কখন?'

—'এই তো খানিক আগে।'

—'টাকাকড়ি কিছু চাইছিল?'

—'টাকা চাইবে কেন। ও তো মস্ত লোক।'

—'মস্ত লোক আর নেই রে ভাই। কয়েকদিন আগে আমার কাছে এসেছিল। কুড়িটা টাকা খসল।'

—'কিসে টাকা খসল ?' গলা বাড়িয়ে আমি প্রশ্ন করি। এতক্ষণে বোধহয় রবিবারের সকালটা সার্থক হতে চলেছে।

—'ছেলের পরীক্ষা। ফীস্ দিতে পারছে না। ধরে পড়ল। কী আর করি। আমি আবার জানো তো ঐ দুঃখ টুঃখু—'

—'তবে যে বীরু গাড়ী কিনছে!'—চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠি।

—'গাড়ী কিনছে! বলছ কী আবোল তাবোল।'

—'আমায় তো তাই বলে গেল।'

—'আহা। বেচারার বোধহয় মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। দুবেলা পেট ভরে ভাত খাবার অবস্থা নেই। আমি নিজে গিয়েছিলাম ওর বাড়ী। ওর বউ তো লজ্জায় বেরোলই না। বীরু বলল, বউয়ের কাপড় এত ছেঁড়া যে লোকের সামনে—'

—'বলছ কী! ওর বাপের যে বিরাট সম্পত্তি। আর ও নিজেও তো—'

—'সব ঘুচিয়েছে। শেয়ারের পোকা মাথায় ঢুকল। ব্যস। ঐ যে কথায় বলে অতি বাড়—'

রবিবারের সকালটা তার ফুরফুরে মূর্তিতে এবার আমার হাতের মুঠোয় ধরা দিচ্ছে! আমি চীৎকার করে মেয়েকে ডাকলাম।

—'খুকি, শীগগীর ভাল করে চা বানা। তোর অমূল্যকাকাকে কিছু খাবার টাবার—'

—'না ভাই আমি কিছু খাব না।'

—'আরে খাও খাও। সারা হপ্তায় একটা দিন। খেয়ে আড্ডা দিয়ে উসুল করো।'

—'আরে ভাই আর রোববার! আমার সব বারই সমান। এখুনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বউ নয়তো—চলি ভাই'—

অমূল্য চলে গেল। ও চলে যেতেই মেজছেলের নাম ধরে হেঁকে উঠি। ছেলেটা এল। মুখ শুকনো।

—'কি রে সমু! সার্কাস যাবি না?'

সমু ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল।

—'তোদের সব্বাইকে নিয়ে বিকেলে সার্কাস যাব।' হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম।

সমুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে আমারও। কিন্তু পরমুহূর্তে সমুর মুখের দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হ'ল বীরুর ছেলের পরীক্ষা। 'ফীস্' জমা দেওয়া হয়েছে কি? ছেলেটা পরীক্ষায় বসতে পারবে তো! রবিবারের ঝকঝকে সকালটার উপর নিমেষের জন্য একটা বিবর্ণ ছায়া পড়ল। পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। বিস্মৃতপ্রায় গানের একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। ছুটির দিনের সকালটাকে তারিয়ে তারিয়ে চেখে নিতে।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এদেশে অনেক মন্দিরে দেবদেবীর সঙ্গে সাধুসন্তদের মূর্তি রক্ষিত হয়। এখানে তাঁরা সংখ্যায় কিছু বেশি বলেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকবেন। মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি। গভীর অধ্যয়ন অনুধ্যান ছাড়া এর প্রকৃত ইতিহাস ও তাৎপর্য জানা যায় না। নানা পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে এঁরা মিশে আছেন। কিংবদন্তি ও পৌরাণিক ঘটনার চিত্রও রয়েছে কিছু কিছু। এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সংযোজন। এই মন্দিরের একটি বহু-আলোচিত ছবি হলো, দোলনায় শায়িত নবজাত শিশু, প্রসূতি ও দুই বৃদ্ধা—একজন চলমান, অন্যজন উপবিষ্ট। একটি মধুর কাহিনীর প্রতীক এটি। ভক্তের প্রয়োজনে ভগবান্‌কে অনেকবার ধরণীর ধূলায় নেমে আসতে হয়েছে তা আমরা জানি। বিদ্যাপতির অসমাপ্ত শ্লোকের পদ পূরণ করেছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধতে সাহায্য করছেন মা কালী—এমনি কত কাহিনী আমরা জানি। আলোচ্য ছবির প্রসূতি হলেন শিবভক্ত রত্নাবলী। শিশু তাঁর নবজাত সন্তান। চলমান বৃদ্ধা শিবঠাকুর এবং উপবিষ্ট বৃদ্ধা রত্নাবলীর জননী।

প্রসব-বেদনা-ক্লিষ্টা রত্নাবলী সাহায্যের জন্য মাতৃদেবীকে আহ্বান করেছেন। মা থাকেন কাবেরীর অপর পারে। ঝড় তুফানের দুর্যোগে তিনি নদী পেরোতে না পেরে সারা রাত সেখানেই অপেক্ষা করতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে রত্নাবলীর সাহায্য না হলে চলে না। শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি। তাই শিব ঠাকুর আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। রত্নাবলীর মায়ের রূপ ধরেই তিনি এলেন, তাঁকে প্রসবে সাহায্য করলেন ইতিমধ্যে রাত পোহাতেই রত্নাবলীর মা এসে উপস্থিত। তার কয়েক মিনিট আগে মাতৃরূপী শিব ঠাকুর প্রস্থান করেছেন। রত্নাবলী তো এ রহস্য জানেন না? তিনি মনে করলেন মা কিছু ভুলে গেছেন, তাই ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন করলেন: মা, তুমি যে আবার ফিরে এলে? মা বল্লেন—ফিরে এলাম কি রে? এই তো সবে আসছি। রত্নাবলী তো অবাক্। বুঝতেই পারেন না মা কি বলছেন! তবু প্রতিপ্রশ্ন করেন— এই আসবে কি, তুমি সারা রাত ধরে আমাকে সাহায্য করলে—এই তো কয়েক মিনিট হলো ব্যস্ত হয়ে চলে গেলে। মা মেয়ে এক সময় বুঝলেন স্বয়ং শিব ঠাকুর এসেছিলেন বিপন্ন ভক্তকে সাহায্য করতে।

গল্পটি নিয়ে অনেক উকিল তর্ক বিতর্ক করা যেতে পারে। সত্য হোক মিথ্যা হোক কাহিনীটির মাধুর্য অনস্বীকার্য। গল্পটি শুনতে শুনতে আমার মনে পড়েছিল মনু গান্ধীর একখানা ছোট্ট বইয়ের কথা - বাপু মাই মাদার।

মুগ্ধ বিস্ময় ও মধুর স্মৃতি নিয়ে এক সময় আমরা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জনাকীর্ণ রাজপথে বেরিয়ে এলাম।

এ এক ভিন্ন জগৎ। মন্দির থেকে বেরোবার পর কিছু সময় লাগে এই জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। হিসাবের বাইরে অনেক বেশি সময় খরচ হয়ে গেছে। অতএব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম স্টেশনে। আমরা স্টেশনে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। ভগবানের কি অসীম করুণা! দিনের বেলায় এমনি বৃষ্টি হলে সারাজীবনের মত আজকের দর্শনের আর সম্ভাবনা ছিল না। টাকা এবং সময় কোনটাই আমাদের জীবনে সুলভ নয় বলে দ্বিতীয় বার আসবার কথা কল্পনাও করতে পারি না। তাই নীরবে শ্রীভগবানের চরণে শত কোটি প্রণাম নিবেদন করে আমরা রামেশ্বরম যাত্রা করলাম। রামেশ্বরম, রেলপথে এখান থেকে ২৫৪ কিলোমিটার। ত্রিচি ছাড়বার আগে আর একটি উৎসবের কথা একটু বলা দরকার। এবার নতুন হলো এটি।

কাঞ্চী কামকোটি পিতমের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের (ইনি প্রধান শঙ্করাচার্য নামেও অভিহিত হন) নির্দেশে এবার সর্বজনীন মঙ্গল কামনায় সুভাষিণী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ জন সুমঙ্গলা নারী ৯ জন করে বারটি দলে ভাগ হয়ে এই পূজা করেন। গণেশ পূজা দিয়ে আরম্ভ হয়, পরে অন্নদান ও সমারাধনা হয় এতে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই শঙ্করাচার্য বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ একটি করে রৌপ্য মুদ্রা পাঠিয়েছেন। আমাদের দেশের সর্বজনীন পূজা থেকে এটি ভিন্ন। আমরা সকলে মিলে পূজা করি। এখানে পূজা হলো সকলের জন্য।

ত্রিচিনাপল্লী থেকে আমরা রামেশ্বরম প্যাসেঞ্জার গাড়ি ধরলাম। এতে সময় একটু বেশি লাগে বটে, কিন্তু শয়ন-যানে সহজেই জায়গা মেলে। ভ্রমণকারীর পক্ষে রাতের বিশ্রামটা অপরিহার্য। পরের দিন সকাল দশটায় আমরা রামেশ্বর এলাম। বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। নির্মল নির্মেঘ আকাশে দীপ্ত সূর্য। আমাদের চেনা পৃথিবীর সঙ্গে এর মিল নেই। লোকের ভাষা বুঝি না। ইংরেজী ও হিন্দী জানা লোক দুর্লভ। প্রকৃতি অপরিচিত। রক্তরঙ বালির পাহাড় জমে আছে এখানে সেখানে নানা স্থানে। আসতে এক জায়গায় দেখেছি একটা পাকা বাড়ির ছাদের কার্নিস পর্যন্ত বালির তলায় ডুবে আছে।

মণ্ডপম ও পামবান (পাম বন?) স্টেশনের মধ্যে দীর্ঘ পথ সমুদ্রের বুকে ট্রেনটি যেন ভাসতে ভাসতে আসে বলা চলে। সেতুটি সাধারণ কালভার্টের মত। উপরের দিকে ফ্রেম নেই, যেমন আছে হাওড়া বা দক্ষিণেশ্বরের ব্রিজে। যেদিকেই তাকাই কেবল দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি সামান্য স্থলভাগের আভাস, জলযান যে কিছু চোখে পড়ে না তা নয়, তবে তা আমাদের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেতুর পরে ট্রেনে বসে সমুদ্র দর্শনের আনন্দ ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সামান্য ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠা যাত্রীদের একেবারে নীরব করে রাখে। মনে পড়ল, এই তো সেদিন ১৯৬৫ সনে রামেশ্বর আর ধনুস্কোটির মাঝে একখানা যাত্রীবোঝাই পুরো গাড়ি সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেসে গিয়েছিল। কত লোক মারা পড়েছিল তা ঠিক মনে নেই। তারপর এ লাইন আজও খোলা হয় নি।

সেতুর নিচের জলের মধ্যে প্রচুর পাথর দেখা যায়। কেউ বলেন এটাই শ্রীরামচন্দ্র নির্মিত সেতু। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাকি এখানে এখানে একটা সেতু নির্মিত হয়েছিল, পাথরগুলি তারই ভগ্নাবশেষ। এ সব তথ্য নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সেতুটি যে এখন আছে, আমরা সহজে রামেশ্বর যেতে পারছি এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে। এই সেতুটির পুরণো আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। হাওড়া পুলের মত মধ্যে মধ্যে খুলে দেওয়া হয় জাহাজ চলাচলের জন্য।

রামেশ্বর স্টেশনের মজুরদের প্রত্যাশা একটু বেশি। দু-চার পয়সা বেশি দিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি হয় না, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে ঠকিয়ে নিতে চাইলে অথবা আমাদের অসহায়তার সুযোগে বাড়তি মুনাফা উঠাবার ফিকির করলে মনটা অপ্রসন্ন হয়। ঠিক এই জিনিস ঘটল স্টেশনের মজুরটির সঙ্গে। গণেশ নামে সামান্য

হিন্দী জানা একটি ছেলে আমাদের পিছু নিয়েছে স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গে। তাকে আমাদের প্রয়োজন নেই জানানো সত্বেও সে লেগে রয়েছে। মজুরের সঙ্গে গোলমালটার সময় সে নিরীহ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যা হোক, একটা ফয়সালা হয়ে যাবার পর সে যা বলল তার মর্ম হলো মজুরটি খুবই অন্যায় করেছে তবু সে কিছু বলতে পারে নি, তার কারণ ওদের সঙ্গে ভাব না রাখলে তার যাত্রী সেবার ব্যবসা অচল হয়ে যাবে। স্টেশন মাস্টারের নিকট থাকা খাওয়ার খোঁজ খবর করতে গিয়ে সুবিধা হলো না। ইতিমধ্যে সূর্যের প্রখরতা বাড়তে শুরু করেছে। অতএব কালবিলম্ব না করে আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। গণেশই একটা টাঙ্গা ডেকে এনে দিল। কারো আহ্বান বা সম্মতির অপেক্ষা না করেই চালকের পাশে উঠে বসল।

আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখেই রামেশ্বরে গণেশ আমাদের কাণ্ডারী হয়েই রইল। তার কথা মতই টাঙ্গা সমুদ্রকিনারে রামেশ্বরম দেবস্থানম কমিটির আপিসে হাজির হলো। মন্দিরের কাছাকাছি থাকার অনেক সুবিধা, স্বগতোক্তির মত করে গণেশ আমাদের জানিয়ে দিল। টাঙ্গাকে দাঁড় করিয়ে আমাদের নিয়ে আপিস ঘরে কর্মচারীর সঙ্গে কথা কইল। মন্দির স্টেশন থেকে দু কিলোমিটার হবে। তার পূর্ব দরজার অদূরে এই রামেশ্বরম দেবস্থানম কমিটি আপিস। দৈনিক আট টাকা ভাড়ায় মন্দির সংলগ্ন একটা পুরো বাড়ি পাওয়া গেল। রান্না ঘর, স্নান ও শৌচাগার সহ তিনখানা শয়ন ঘরের আধুনিক বাড়ি। আলো পাখা সবই আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা যায়। বাড়ির সুবিধার জন্য একটা দিন বেশি এখানে থাকা হবে সিদ্ধান্ত করে দু দিনের ভাড়া জমা দেওয়া হলো। বিশ্রামের আমাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু খেতে না পেয়ে বিশ্রাম আমাদের মাথায় উঠেছিল। পুরো একদিনের বাড়িভাড়া গচ্চা দিয়ে পরের দিনই রামেশ্বর ত্যাগ করেছিলাম।

তীর্থে এসে ধুলো পায়ে দেবতা দর্শনের বিধি। গণেশ আমাদের সে কথা মনে করিয়ে দিল তবে সে জানে দিনকাল পালটে গেছে—যাত্রীদের সুবিধা মত বিধি বিধান না দিলে কাজ কারবার ঠিকমত চালানো যায় না। তাই এক নিঃশ্বাসেই বলে ফেলল—এখন না গেলেও ক্ষতি নেই; স্নানাদি সেরে বিশ্রাম করে পবিত্র হয়ে একেবারে সেই সন্ধ্যারতির সময় গেলেই ভাল হবে। আমরা মুখ্যতঃ দেখতেই বেরিয়েছি। সঙ্গে বাড়তি পাওনা দেবপূজার পুণ্য। অতএব গণেশের নির্দেশ,—'এখন আরাম কর, পিছে যাবে' আমরা শিরোধার্য করে নিলাম।

ঘরদোর পরিষ্কারই ছিল। গণেশই চাবি আনল, টুকিটাকি কাজটুকু করে দিল। দুপুরের খাবারটা সে-ই আমাদের বাড়িতে আনিয়ে দিল। বাঙ্গালী হোটেলের ভাল খাবার এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গণেশ। কিন্তু তার অশেষ যত্ন এবং শ্রম সত্বেও কেউ আমরা তা খেতে পারি নি। পুরো খাবারটা নষ্ট হয়ে গেল। তিন টাকা করে এক একটা মিলের দাম গচ্চা দিলাম। বিকেলে একটি মহিলা দুধ নিয়ে এলেন। মোহনদা বল্লেন এত ভাল দুধ অনেক দিন দেখেন নি। এক লিটার গরম করে আনতে বলা হলো। ভাল দুধ গরম করতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেল; সেটাও ফেলে দিতে হয়েছিল।

রামেশ্বর বালুকাময় ভূভাগ। এখানে কিছু হয় না। দশ হাজারের বেশি লোকের বসতি এই দ্বীপে। দারিদ্র্য চিহ্ন এর সর্বঅঙ্গে। শুনলাম লবণাক্ত সমুদ্র বেষ্টিত হওয়া সত্বেও লবণটুকু পর্যন্ত বাইরে থেকে আনতে হয়। রামেশ্বর মন্দিরে যজন যাজন পূজা পার্বণকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। তীর্থযাত্রী পুণ্যার্থীর আনাগোনা প্রায় সারা বছর ধরেই চলে। তবে সব চেয়ে বেশি ভিড় হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। যাত্রীসেবা, থাকা খাওয়া ও বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর কাজেও অনেকের রুজি রোজগার হয়। মাছধরা অন্যতম প্রধান ব্যবসায়।

শুনলাম নানা অসুবিধার জন্য এর ব্যবসায়িক সাফল্য অপেক্ষাকৃত কম। দূর সমুদ্রে মাছ ধরা দিনদিন ব্যয়-বহুল হয়ে পড়ছে। সাধারণ জেলেদের হাত থেকে ব্যবসাটা তাই বিত্তশালীদের হাতে চলে যাচ্ছে। শঙ্খ আর ঝিনুকের নানা ক্ষুদ্রাকার কুটীর শিল্প সামান্য আছে। রাম সীতা মূর্তি আঁকা একটি শঙ্খের উপর ক্রেতার নাম লিখে দেবার মজুরী (শাঁখের দাম সমেত) আট আনার মধ্যে। ক্রেতার অভাবে উৎপাদকেরা সস্তা দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তালপাতার ব্যাগ টুপি খেলনা ইত্যাদি টুকিটাকি এঁরা সুন্দর করে তৈরি করেন। বহিরাগত যাত্রীরাই একমাত্র ক্রেতা। সকলেই সস্তা কিনতে চান। এঁদেরও না বিক্রি করে উপায় নেই। তাই লাভ বড় বেশি হয় না। তালপাতার চাটাই দিয়ে ঝুড়ির মত তৈরি করে মাছ চালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। আর আছে নারকেল।

যাই থাক, অধিকাংশ মানুষ কর্মহীনতার ফলে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না বলেই মনে হয়। প্রধান খাদ্য চাল ডাল। তার পুরোটাই বাইরে থেকে আনতে হয়। সুতরাং দাম একটু চড়া। একে রুজি রোজগারের অভাব, তায় চড়া দর। কিন্তু বয়স্ক সকলেই কিছু না কিছু কাজের চেষ্টা করেন। সকালে যখন জেলেরা মাছ ধরতে যায় তখন গৃহিণীদের কোন কাজ থাকে না। স্বামী সন্তানেরা জোয়ার ভাটার হিসাবে কখন মাঝ রাতে কখন শেষ রাতে মাছ ধরতে বেরোন। ফিরতে ফিরতে কোন কোন দিন দশটা এগারটা হয়। সেই মাছ বিক্রি করে চাল ডাল কেনার পর গৃহিণীদের কাজ শুরু হবে। ইত্যবসরে কেউ কেউ অবশ্য কিছু জ্বালানী সংগ্রহ, কেউবা ছেঁড়া জাল মেরামত বা অন্য কিছু টুকিটাকি কাজ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে একদিন মাছ ধরা কামাই পড়লে এদের সেদিন ধার করে চালাতে হয়, অথবা উপবাসে কাটে। এদের ছেলেগুলি ভিক্ষার দ্বারা কিছু উপার্জনের চেষ্টা করে থাকে। এই জন্য এখানে বালক-বালিকা ভিখারীর সংখ্যা বেশি বলেই মনে হবে। আর এদের ধৈর্যও অসাধারণ। রামজি রোখা (এরা বলেন রামঝরোকা) থেকে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা টাঙ্গার (স্থানীয় নাম ঝটকা) পেছন পেছন ছুটেছে ভিক্ষার প্রার্থনা জানাতে জানাতে। এক সঙ্গে একাধিক শিশু। সামান্য কিছু পেলেই হাসিমুখে ফিরে যায়। না দিলে গালাগালি করে।

সারাটা দিন ধরে একের পর এক শঙ্খ-বিক্রেতা দুধওয়ালা প্রভৃতি হানা দিয়েছিল। তার একমাত্র কারণ যাত্রী ছাড়া ক্রেতা নেই। তাই যাত্রীর গন্ধ পেলেই এরা পিলপিল করে এসে হাজির হয়। রামেশ্বরের মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে কাটিয়ে দেবার লোকও আছে কিছু। এঁরাই গল্প করলেন মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বভারতীয় নেতা কামরাজ একদা এখানে বস্তিতে বাস করতেন, মন্দিরের প্রসাদে জীবনধারণ করতেন। বিকেলের দিকে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন মন্দির দেখতে বেরিয়েছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে একটি টিলার উপরে এই মন্দির। টিলাটিকে বলা হয় গন্ধমাদন পর্বত। চলতি নাম রামঝরোকা বা রামজি রোখা। লঙ্কা বিজয়ের পর ফিরবার পথে শ্রীরামচন্দ্র এখানে থেমেছিলেন—রামজি রুখেছিলেন তাই এর এই বিচিত্র নাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল রাজা-ভাত-খাওয়া কোন বিশেষ কর্মের স্মরণে স্থানের নাম বড় বেশি নেই। সে যাই হোক গন্ধমাদনের চেহারা ও ক্ষুদ্রাকৃতি দেখে আমাদের পছন্দ হলো না। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সর্বদা তার আকার প্রকার সম্পর্কে যথার্থ ধারণা হয় না। আর এই গন্ধমাদনেরই একাংশই না আনবার পথে ভেঙে পড়েছিল কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবান্দ্রম যাবার পথে ভিরুৎ মালাই-এ। এখানকার জঙ্গলে এখনও বিস্তর ঔষধি গাছ আছে। এখানেই তো ইন্দ্র চিকিৎসিত হতে এসেছিলেন বলে পুরাণ কথায় উল্লিখিত হয়েছে।

পাহাড়ের চেহারা যাই হোক, শীর্ষস্থিত মন্দিরের ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্র-বেষ্টিত রামেশ্বর দ্বীপটিকে একবার দেখলে মুগ্ধ হবেন সবাই। সর্বাগ্রে মনে পড়বে

কালিদাসের রঘুবংশের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি দু'টি—যেখানে তিনি বলেছেন—ঐ দেখ লৌহ-চক্র সদৃশ লবণ সমুদ্রের দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান এবং তমাল তালীবন দ্বারা শ্যামবর্ণ তীরভূমি চক্রধারাশ্রিত কলঙ্ক-রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

উজ্জয়িনী থেকে এতটা পথ কবি যখন এসেছিলেন তখন পথঘাটের অবস্থা কি ছিল, মণ্ডপম থেকে মান্নার প্রণালী পার হয়েছিলেন কেমন করে ইত্যাদি কত কথাই না মনে পড়বে আপনার এখানে দাঁড়িয়ে। আর মনে হবে শত শত বছরেও প্রকৃতির যেন কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। কবি সেদিন যেমনটি দেখেছিলেন আমরাও ঠিক তেমনটি দেখছি। পার্থক্য হলো—কবি তা প্রকাশ করেছিলেন কালজয়ী কাব্যে, আমরা মূক, প্রকাশে অক্ষম; কিন্তু অনুভূতি যে এক তা হলফ করে বলা যায়। সূর্যালোকের শেষ রশ্মি পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ রূপের লীলা-সমারোহ হৃদয় ভরে দেখে নিলাম, জীবনে দ্বিতীয়বার এ সুযোগ আসবে বলে ভাবতেই পারি না। সুন্দরই সত্য হয়ে শিবত্ব লাভ করে এই অনুভূতি সহজেই অন্তরে জাগ্রত হয়।

মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের যুগল পদচিহ্ন পূর্বেই দেখে গেছি। দীপালোকে আর একবার দর্শন করলাম। পাথরের উপর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন। পুরোহিত কিন্তু ভীষণ-দর্শন; দেখলে ভয় হয়, ভক্তি জাগে না।

এবার ফেরার পালা। মন্দিরপথ জনবিরল। অল্প দূরেই একটি হনুমান মন্দির। আমরা হেঁটে হেঁটেই চললাম। সুন্দর পীচ্ ঢালা পথ। কিন্তু চতুর্দিক্ বালুকাময়। কাঁটাগাছের ঝোপ আর তাল-নারকেলের বনানী। আর কোন গাছগাছালি নেই বললেই চলে। তারই মধ্যে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ছোট ছোট তালপাতা বা নারকেল পাতার কুঁড়ে ঘর। শহরের কাছাকাছি অবশ্য পাকা বাড়িই বেশি।

সুধীরদা প্রশ্ন তুললেন, গন্ধমাদন পর্বত তো হনুমান লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে সেটা ফেরত আনল কে? মোহনদা বললেন—রামায়ণের লঙ্কাই হলো এই রামেশ্বর দ্বীপ। রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সাহায্যে যে সেতু বেঁধেছিলেন সেটা আমরা রেলগাড়ি চড়ে পার হয়ে এসেছি। আমার প্রশ্ন, রাবণের বংশধররা তা হলে গেল কোথায়? মোহনদা বলেন তারা সব পালিয়ে বর্তমান লঙ্কায় চলে গিয়েছিল, যেমন আমরা পালিয়ে চলে এসেছি পূর্ববাংলা থেকে। যারা পালাতে পারে নি তাদের অনেকেই মারা পড়ে। তারপরেও যারা ছিল তারা এই সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গণেশ ভাই আমাদের কয়েকটি কুণ্ড দেখালেন। ছোট ছোট পুকুর। ইট দিয়ে কুঁয়োর মত করে চার ধারে বাঁধানো। বালির দেশ—স্বাভাবিক ভাবে মাটি খুঁড়ে পুকুর কাটা যায় না। তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি কুণ্ডের পৃথক পৃথক নাম আছে রামায়ণের সঙ্গেই তার বেশি ঘনিষ্ঠতা। সীতাকুণ্ড লক্ষ্মণকুণ্ড ইত্যাদি। এগুলি একান্তই নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। এর জল যত পবিত্রই হোক আমরা স্পর্শ করতে পারিনি। পরিবেশও রুচিকর নয়।

কয়েকটি ছোট বড় নতুন পুরনো কুণ্ড ও মন্দির ঘুরে আমরা বাসায় না ফিরে শ্রীরামেশ্বর দর্শনে গেলাম। মন্দিরের একাংশে এখন সংস্কার কাজ চলছে। বিক্ষিপ্ত-ভাবে ঘোরাফেরা করে আমরা ফিরে এলাম। উজ্জ্বল বিজলি আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় রাত্রের দর্শনার্থীর কোন অসুবিধা হয় না। আরতির দেরি আছে। ইত্যবসরে আমরা সমুদ্রতীরেও খানিকটা ঘোরাফেরা করে নিলাম। তেমন চিত্তাকর্ষক মনে হলো না।

শ্রীরামেশ্বর শিব ছাড়া, গণেশ, পার্বতী, কাশী বিশ্বনাথ, হনুমান, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি বিস্তর বিগ্রহ এই মন্দিরের নানা অংশে স্থাপিত এবং নিত্য পূজিত। ধনুষ্কোটিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ গত প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর (১৯৬৩) এই মন্দিরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের দেবদেবীগণের মধ্যে

বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরপর সাজানো আটটি নারীমূর্তি। এক কথায় এঁদের অস্টলক্ষ্মী বলা হয়। জনৈক পুরোহিত আটজনের নাম বললেন—জয়লক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী বীরলক্ষ্মী, সন্তানলক্ষ্মী, ঐশ্বর্যলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী ও আদিলক্ষ্মী। আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মী নেই কেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিরুত্তর ছিলেন। ত্রিবান্দ্রমে দীপলক্ষ্মীও দেখেছিলাম।

এখানকার এই অষ্টলক্ষ্মীর প্রত্যেকটির চেয়ে আমাদের লক্ষ্মী প্রতিমা অনেক বেশি সুন্দর। আকার আকৃতি ও শিল্পসুষমায় এই মন্দিরের দরদালানের কোন তুলনা নেই। এর মোট দৈর্ঘ্য হলো চারহাজার ফুট। উত্তর দক্ষিণে ৪৫টি এবং পূর্ব পশ্চিমে ৪০টি কারুকার্য শোভিত স্তম্ভের উপর সমগ্র অলিন্দের ছাদটি রয়েছে। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সংযোজন বলেই মনে হয়। ছাদ অবধি দেয়ালে আবৃত না হলে এর মনোহারিত্ব আরও বেড়ে যেত। মনে হয় পরবর্তীকালে মন্দির সম্প্রসারণের জন্য এই কাজ করা হয়েছে।

পূর্ব দিকে মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথ। এই পথের দুধারে কতগুলি বেঢপ অসুন্দর নরমূর্তি আছে। এঁরা হলেন মন্দির নির্মাণের অর্থদাতা রাজন্যবৃন্দ। এই অসুন্দর মূর্তিগুলি কারা স্থাপন করেছেন জানতে আগ্রহী হলে—একজন পাণ্ডা বলেছিলেন, বর্তমান মন্দির কমিটি অর্থাৎ দেবস্থানম কমিটির কীর্তি এটি। এদের এই কাজের দ্বারা দুটো উপকার হয়েছে। প্রথম, মন্দিরের নানা মূর্তির সৌন্দর্য দর্শকের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ের মানুষের শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধ এবং ভাস্কর্য-দক্ষতা অতীত ভারতের তুলনায় যে একান্তই অকিঞ্চিৎকর তা বুঝতে পুথিপত্র পড়বার দরকার হয় না, এই মন্দির দর্শনই যথেষ্ট।

মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি কুয়ো আছে। এগুলিকেও কুণ্ড বলা হয়। পুণ্যার্থীরা এখানে স্নান করেন বলে শুনেছি। সমুদ্রের কিনারে মিষ্টি জলের এতগুলি উৎস শ্রীরামেশ্বরের কৃপা ভিন্ন হতে পারে না বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন।

পরের দিন ভোরে সমুদ্রস্নান করেই আর একবার মন্দিরে গিয়েছিলাম। ভোর থেকে মাইকে মিষ্টি সুরে মধুর মাঙ্গলিক ধ্বনিত হচ্ছিল। মন্দিরে সূর্যালোক প্রবেশ করে না বললেই চলে। সকালে বিজলি বাতি ছিল না। তবুও অন্ধকার নয় কোথায়ও। তৈল প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতে অপেক্ষাকৃত জনবিরল মন্দিরে শ্রীরামেশ্বর দর্শন হলো। রামেশ্বরম্ এখন আরও সুন্দর হয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলেন বলেই মনে করলাম।

স্বামী বিবেকানন্দ এই রামেশ্বরম্ মন্দিরে বলেছিলেন—'যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, যদি সেখানে অনেক অসাধু লোক বাস করে তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না।' স্বামীজির এই সতর্কবাণী যাঁরা সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বোধ হয় এখানে বেদবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

মন্দিরের পূর্বদিকে সমুদ্র—বঙ্গোপসাগর। মন্দির-চত্বরের পর রাজপথ। কয়েক গজ মাত্র গেলেই শান্ত স্বচ্ছ অপরূপদর্শন লবনাম্বুরাশি। এই হলো অগ্নি-তীর্থম্। পাশে শঙ্করাচার্যের একটি নবপ্রতিষ্ঠিত দ্বিতল মন্দির। দোতলায় খোলা বারান্দায় শঙ্করাচার্য সহ আরও কয়েকজন ঋষির মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। দর্শনীয় তেমন কিছু নয়। কি বলতে চাওয়া হচ্ছে এই প্রদর্শনীর দ্বারা তাও আমাদের বোধগম্য হয় নি। এইখান থেকে বাসায় ফিরবার পথে পড়ে চতুর্ধাম বেদবিদ্যালয় মোহনদা এটি আবিষ্কার করেন। সাধারণ একটি বাড়িতে মেজেয় বসে তিনটি কিশোর উচ্চকণ্ঠে সামবেদ মুখস্থ করেছেন। এঁদের মস্তক কপালের দিকে অর্ধ মুণ্ডিত। অন্যত্রও অর্ধমুণ্ডিত মস্তক অর্থাৎ বিদ্যাসাগরী রীতিতে চুল ছাঁটা ব্রাহ্মণ দেখছি। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণেরা এই রীতিতে চুল ছাঁটেন।

বেদবিদ্যালয়ের মেঝেতে আমরা কিছুক্ষণ নীরবে বসলাম। আমাদের উপস্থিতি তাদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটাল না। তারা যেমন পড়ছিল তেমনি পড়েই চলল। ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু বইয়ের লি

তামিল। ছাত্রদের উচ্চারণের ভিন্নতা অথবা আমাদের সংস্কৃতজ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আমরা একবর্ণও বুঝতে পারিনি। তবুও খুব আনন্দ হয়েছিল এই ছাত্রদের নিষ্পাপ মুখগুলি দেখে এবং বেদবিদ্যালয়ের মাটিতে বসতে পেরে।

এর খানিকটা দূরে (রেল স্টেশনের দিকে) জাহাজ-ঘাটা। এগুলিকে গৌরবে জাহাজ বলতে হয়। এমন সব স্টীমার পূর্বাংলায় অনেক পথে যাত্রী বহন করে থাকে। এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ শ্রীলঙ্কা বা সিংহল। পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করে এলে একবার সিংহল দেখে আসা যেত। যাতায়াত ব্যয় মাত্র ৩০ টাকা। নিজেদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার জন্য দুঃখ হলো। স্টীমার অবশ্য সব দিন ছাড়ে না। তবে সপ্তাহে একাধিক দিন যায় আসে। আজ স্টীমার ছাড়বার দিন। যাত্রী অনেক। কে মাদ্রাজী আর কে সিংহলী চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

আস্তানায় ফিরতে বেশ বেলা হলো। রৌদ্রের তাপ আমাদের নিকট দুঃসহ বোধ হচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করেও গলাধঃকরণ করা যায় এমন খাদ্য সংগ্রহ করতে পারা গেল না।

অতএব কালবিলম্ব না করে রামেশ্বরের পাট গুটিয়ে মাদুরা যাত্রার ফরমান জারি করলেন সুধীরদা। সঙ্গে সঙ্গে 'প্যাক্ আপ' হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রেল স্টেশনের উদ্দেশে। গণেশ ভাই সবক্ষণ নানা কাজে সাহায্য করেছেন। কি তাঁর প্রত্যাশা তা কখন মুখ ফুটে বলেন নি। খাবার দাবারের দামের পরে বাড়তি টাকা তার হাতে দিলে সে নম্রচিত্তে তা গ্রহণ করল। আরও বেশি পাবার দাবি তোলে নি। আমাদের সঙ্গে সে স্টেশনে যাবার জন্য যথারীতি ঝটকায় চেপে বসল। মোহনদা তাকে অনুনয় করে নিরস্ত করলেন। তারও যে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। নেমে গেল সে। যাবার সময় নমস্কার বিনিময় করে নিবেদন করল একবার সে কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে কলকাতা যাবে। কলকাতায় আমাদের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিল।

ক্রমশঃ

জগদিন্দ্রনাথ রায়ের 'সন্ধ্যাতারা'

শৈলেনকুমার দত্ত

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর কবি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য-রসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি যতটা, স্রষ্টা হিসেবে ততটা নয়। তার কারণ তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। সঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি হল, তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত" আলোচনা চক্রের একজন সবিক ছিলেন। তাঁর রসাবিষ্ট অন্তর, বুদ্ধিদীপ্ত শানিত আলোচনা এবং কোমল অন্তরের মেজাজী ঢং রবীন্দ্রনাথ সহ প্রমথ চৌধুরী, লোকেন পালিত প্রভৃতিদের আকর্ষণ করেছিল। হয়তো এই জন্যেই তিনি কবিখ্যাতির জন্য যে শ্রম, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন—সেটা করার সুযোগ পাননি। কিন্তু তাঁর অবদান ক্ষুদ্র হলেও অকিঞ্চিৎকর নয়।

জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮ ১৯২৫) মোট দুখানি কাব্য সন্ধ্যাতারা ও নূরজাহান এবং একখানি গদ্যরচনা শ্রুতিস্মৃতি প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু মাত্র সন্ধ্যাতারা কাব্যগ্রন্থের জন্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দাবী করতে পারেন। সন্ধ্যাতারা প্রকাশের সময় সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাহিত্য জগতে বহুদিন জগদিন্দ্রনাথ রায়ের নামের আগে 'সন্ধ্যাতারার কবি' বিশেষণ ব্যবহার করা হত। সন্ধ্যাতারা জগদিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে সর্ব সমেত সাতচল্লিশটি কবিতা নিয়ে 'সন্ধ্যাতারা' প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগই প্রেমের কবিতা, কিন্তু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেগুলি,—সেগুলি হল—বাঁশী, শ্রাবণ, আবেদন, সেই, অসময়ে, বসন্তে, মধুমাসে প্রভৃতি। ব্যক্তিজীবনে জগদিন্দ্রনাথ নাটোরের মহারাজা ছিলেন; 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন, কিন্তু তাঁর কর্মব্যস্ততার অন্তরালে তাঁর যে একটি বিশিষ্ট কবিমন ছিল, তার পরিচয় এ কাব্যের ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট। উৎসর্গ কবিতায় কবি নিবেদন করেছেন—

> ধৌত করি দিতে তব রক্তিম রাজীব পদতল
> অঞ্জলি ভরিয়া দিনু আজন্মের যত অশ্রুজল।

'সন্ধ্যাতারা সত্যি সত্যিই কবির ভাষায় 'আজন্মের যত অশ্রুজল', কিন্তু সে অশ্রুজল কাব্যরসিকের অন্তরে কোন বেদনা জাগায় না, অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ করে।

সন্ধ্যাতারা কবির পরিণত বয়সের রচনা, কবির নিজের কথায়—

> গোধূলি এসেছে জীবনে আমার
> আঁধার আসিছে নেমে,
> পরাণে 'ললিত' 'আশাবরী' যত—
> সকলি গিয়েছে থেমে।

তাই স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বপিতার কাছে আত্মসমর্পণ করার ঐকান্তিক বাসনা কাব্যের বিভিন্ন তরঙ্গে ঝংকৃত। 'জীবন-বন্ধু' কে উদ্দেশ করে তাই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন—

> দুর্দিনে যদি জীবন-বন্ধু
> এসেছ আমার পাশে—
> না হয় মোদের হয়নি মিলন
> দিবালোকে ওগো প্রিয়
> তোমার স্নেহের চির-নির্ভর
> অন্ধকারেই দিও। (অসময়ে)

নিজের দায়িত্ব-সচেতনতার কথা স্মরণ করে তিনি দেবতাকে জানিয়েছেন—

যেদিন যে ভার,
বহিতে দিয়াছ মোরে, দেবতা আমার,
অতি যতনে,
প্রাণপণে
করেছি বহন,
জান তাহা হৃদয়-রতন।
(ফিরে এস)

কিন্তু তবুও জীবনের নানা ঝঞ্ঝাট এবং কোলাহলের মধ্যে তাঁর অস্থির লাগে। তাঁর অন্তর এ থেকে মুক্তি চায়। তাঁর আন্তরিক বাসনা হল—

ইচ্ছা করে—সকল ছেড়ে ব্রজেই ফিরে যাই,
দুষ্ট নাশন, রাজ্যশাসন—কিছুরই কাজ নাই;
আমার রাধার গলা ধরে বেড়াই বনে বনে,
জীবন-মরণ বাঁধা যে মোর সেই চরণের সনে।
(অতীত স্মৃতি)

জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন আশাবাদী। যে স্নিগ্ধ চিন্তা চেতনায় সিঞ্চিত তাঁর অন্তর, তারই নির্যাসে সমৃদ্ধ তাঁর কাব্য। ব্যর্থতা, হাহাকার, ছলনা প্রবঞ্চনা সব কিছুর শেষে আছে পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ; এই বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনে গঠিত তাঁর কাব্য। আশাবাদ তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে—

জানি, বুকের-পাজর-ভাঙ্গা- দুখের এমন দিনও যাবে,
আমার, মাঝে দরিয়ায় ভাঙা তরী আবারও কূল পাবে।
আমার, নিখিল আঁধার যে জন বিনে
আমি, ডাকছি তারে রাত্রি দিনে,
জানি, একদিন তার করুণ আঁখি আমার পানে
চাবে।
(গান)

তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা হল—

এ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যর্থ কিছু নয়,
এ বিশ্ব-সৃজন
মিথ্যা নহে নহে কদাচন।
এই যে অপার
হৃদিস্থিত প্রণয় দুর্বার,
এই সারা বুকভরা স্নেহ
এ সুন্দর দেহ,
বিরহের নিবিড় বেদন,
অবিচ্ছেদ্য মিলনের লাগি প্রাণপণ,—
করো না করো না এরে হেলা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি এরে নিয়া করে নাই খেলা।
(সিদ্ধার্থের প্রতি)

প্রেমের কবিতায় তাঁর অনায়াস সিদ্ধিলাভ মূলত এই জীবনচেতনা থেকে উদ্ভূত। তাঁর মধুর ভঙ্গি এবং কোমল অন্তরের দ্যোতনা কাব্যকে যতটা স্বাভাবিক করেছে, ততটাই করেছে মধুর, অনবদ্য। বসন্তকে তিনি আবাহন করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অবিরাম ভঙ্গিতে—

এসো ঋতুরাজ!
এস আজ
পীত বাস পরি
অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া কাননের পুষ্পিত বল্লরী;
মাধবীর বিশুষ্ক বিতান
তোমার মোহন-মন্ত্রে জাগুক পাইয়া নবপ্রাণ;
মল্লিকার মধুময় বাস
প্রিয়-পরিরম্ভ সম রচে দিক সম্মোহন পাশ।
(বসন্তে)

কবির জীবনে এ অনুভূতি হয়তো যৌবনে আসেনি, এসেছে কিছুটা অপ্রস্তুত সময়ে। যখন—

তুলি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা
শূন্য পড়িয়া কুসুমের ডালা,
নিবিয়া আসিছে দিনের আলোক—
এখন আসিছে সাঁঝ

তাই কবি ব্যথার সঙ্গে জানিয়েছেন—

আসিতে হে যদি নবফাল্গুনে
ওগো রাজ-অধিরাজ
হৃদি-নিকুঞ্জ, ফুল-সম্ভার—
সব সঁপিতাম চরণে তোমার
মালতীর লতা এখন আমার

রিক্ত-কুসুম সাজ;
মরণের তটে কি দিয়ে বাসর
সাজাব বল গো আজ।

(অসময়ে)

কিন্তু এই ব্যর্থতায় তাঁর বিষাদ নেই, ব্যথা নেই। তাঁর ঐকান্তিক কামনা হল—

সাঁঝের বেলা শ্রান্ত পদে
যখন গৃহে ফিরি,
কোমল দুটি বাহুর পাশে
রাখিও মোরে ঘিরি;
পুলকে আঁখি মুদিয়া আমি
রাখিব শির বুকে,
কাটিবে মোর শেষের দিন
গরবময় সুখে।

(আবেদন)

ব্যক্তি-জীবনে জগদিন্দ্রনাথ খুব দরদী এবং উদার-হৃদয় ছিলেন। গড়ের মাঠে বেড়াবার সময় তাঁকে একটি মোটরে ধাক্কা দেয়, তিনি গুরুতর রূপে আঘাত পান। কিন্তু মৃত্যুর সময়েও উদারতা দেখিয়ে তিনি বলে গেছলেন—ঐ গাড়ির চালককে যেন কোন শাস্তি দেওয়া না হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর কবিমনেরও একটি সূক্ষ্ম সংগতি আছে। যে ভিত্তিতে তাঁর মানসিক কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তিতেই তাঁর কবিমনও প্রতিষ্ঠিত; জগদিন্দ্রনাথের কাব্যগুণ বিচারে এ সত্যটি অলঙ্ঘনীয়।

বিশ্বের বিস্ময়কর বিস্মৃত এক ডাক-হরকরা

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

ওলিম্পিক ইতিহাসের এক ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে নিয়েই আজকের এই গল্প। এই মানুষটি ওলিম্পিক প্রাঙ্গণের সকল দর্শক এবং প্রতিযোগীরই অন্তর জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন একদিন।

এই ক্ষুদ্র মানুষটি কিউবার (Cuba) কোন একটি পোষ্ট অফিসে ডাক-হরকরার কাজ করতেন। নাম ছিল তাঁর ফেলিক্স কার্ভেজাল (Felix Carvejal)। ১৯০৪ সালের সেণ্ট লুই ওলিম্পিকের ম্যারাথন রেসে তিনি প্রতি-যোগিতা করেছিলেন। ফেলিক্স এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে না পারলেও তিনি ক্রীড়ায় যে সীমা-হারা সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সেটি কিন্তু ওলিম্পিকের ইতিহাসে আজও অম্লান হয়ে আছে। ইতিপূর্বে ফেলিক্স কোনদিন কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি। তবুও কিন্তু তিনি হাভানা থেকে সেণ্ট লুই পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন শুধুমাত্র হৃদয়ের এক প্রবল দৌড়বাসনায়। এই সুদূর পথ পরিক্রমার শেষ পর্য্যায়ের ১০০ মাইল পথ তিনি কেবল পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট একটি দেশ কিউবা। ছোট্ট দেশের এই ছোট্ট মানুষটি স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই সেদিন ওলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করতে এসেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তেমন কিছু সাফল্য প্রদর্শন না করলেও ফেলিক্স কিন্তু ওলিম্পিক প্রাঙ্গণে সেদিন একজন সবার প্রিয় মানুষ রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। ফেলিক্স সম্বন্ধে আর একটি বিস্ময়কর তথ্য এই যে ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির পর আর কেউ কোনদিন ফেলিক্স সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে পারেন নি কখনও। ওলিম্পিক পরিসমাপ্তির পর ফেলিক্সও সেখান থেকে

নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকের মতে এই রহস্যময় ব্যক্তিটির মতন ওলিম্পিক প্রাঙ্গণের এমন নিবিড় ভালবাসা অদ্যাবধি বোধহয় কোন মানুষেরই ভাগ্যে কখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯০৪ সালের বসন্ত কালটাই ছিল ফেলিক্সের এই অবিশ্বাস্য গল্পের সুচনা কাল। এই সময়টিতে কিউবার তখন কোন নিজস্ব ওলিম্পিক দল না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সহযোগীদের বলেছিলেন যে পরবর্তী গ্রীষ্মে ওলিম্পিক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই সময়ে ওলিম্পিক অভিযানে যাওয়ার মতন তাঁর কোন আর্থিক সঙ্গতিও ছিল না তখন। কিন্তু এ বিষয়ে একটি গুণের অভাব ছিল না ফেলিক্সের—সেটি হল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প।

এই সঙ্কল্প চরিতার্থ করার জন্যই বোধহয় একমাত্র সাংসারিক অবলম্বন ডাক-হরকরার চাকুরিটিতে পর্য্যন্ত ইস্তফা দিতে তিনি কোনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি সেদিন।

চাকুরি থেকে বিদায় গ্রহণের পর তাঁর দৌড় পারদর্শিতার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হাভানার কোন একটি উদ্যানের চতুর্দিকে তিনি অবিশ্রান্তভাবে ছুটে চললেন। এই অভুতপূর্ব দৃশ্য দেখে যখন সেখানে এক বিশাল জনসমাগম হয়েছে তখন নিকটবর্তী কোন একটি কাঠের বাক্সের উপর লাফিয়ে উঠে জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর আবেদন জানাতে আরম্ভ করলেন। এই সময়ই সর্বসমক্ষে তাঁর আসন্ন পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি তাঁদের উদ্দেশে রাখলেন তাঁর আর্থিক আবেদন।

জনসাধারণও সেদিন তাঁর এই আবেদনে অকুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দিয়েছিলেন তখন। কয়েকবারের এই রকম আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১০০ ডলার সঞ্চয় করে অতঃপর ফেলিক্স তাঁর ওলিম্পিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। পথে বিশ্রামের জন্য নিউ অর্লিয়ান্সে (New Orleans) এসে তিনি তাঁর এই অভিযানে কিছু সময়ের জন্য বিরতি দেন। এই সময় কোন এক পাশা খেলার বাজিতে তিনি তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অর্থ হারিয়ে অভিযানের প্রথম দিকটায় সত্যসত্যই খুব হতাশ হয়ে পড়েন। এই অবস্থার কোন রকম সুরাহা না করতে পেরে অগত্যা এক রকম নিঃসম্বল অবস্থাতেই তিনি তখন সেন্ট লুই ওলিম্পিকের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

পথ পরিক্রমার এই সময়টিতে ভিক্ষার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে কোনক্রমে তিনি কালাতিপাত করেছিলেন তখন। নির্দিষ্ট সময়ে ওলিম্পিকে পৌঁছানর জন্য অত্যধিক শারীরিক নিপীড়ন সত্ত্বেও ফেলিক্স এই সময় এক প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পের বলেই তখন সেন্ট লুই অভিমুখে দৌড়তে আরম্ভ করলেন।

এই রকম অবস্থায় ৭০০ মাইল পথ পরিভ্রমণের পর শ্রান্ত ক্লান্ত অর্দ্ধভুক্ত ফেলিক্স অতঃপর মৃতকল্প অবস্থায় সেন্ট লুইয়ের ওলিম্পিক প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময় কয়েকজন আমেরিকাবাসী ওলিম্পিক ক্রীড়াবিদ্ তাঁর এই করুণ অবস্থা দর্শনে মর্মাহত হয়ে তাঁকে তাঁদের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর হৃতবল পুনরুদ্ধার করে পুনরায় তাঁকে ওলিম্পিকের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন।

১৯০৪ সালের ওলিম্পিক নির্দিষ্ট ম্যারাথন দৌড়ের দিনটি ছিল খুবই উত্তপ্ত। ওলিম্পিক সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই সরলমতি ডাকহরকরা গ্রীষ্মের সেই প্রখর উত্তাপে একটি পুরানো লম্বা হাতা জামা, ভারী লম্বা প্যান্ট এবং একজোড়া ছেঁড়া লম্বা তালি দেওয়া জুতা পায়ে দিয়ে সবার সঙ্গে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন। এই সময় ফেলিক্সের এই ক্রীড়া-বিরোধী পরিচ্ছদ দেখে তাঁরই কোন এক ওলিম্পিক বন্ধু সত্বর কাঁচি নিয়ে ছুটে এসে তাঁর জামার হাতা এবং প্যান্টের কিছু অংশ কেটে ছোট করে দিয়ে সেগুলিকে কিছুটা প্রতিযোগিতার উপযোগী করে দিলেন। কিন্তু আসন্ন দৌড় শুরুর সময়টি খুব নিকটবর্তী হওয়ার জন্য জুতার বিষয়ে আর কোনও ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়ে উঠল না তখন।

সেদিনকার সেই ওলিম্পিক অনুষ্ঠানে এই অজানা অচেনা ডাকহরকরা উপরোক্ত হীন ও অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও তৎকালীন পৃথিবী-বিখ্যাত দৌড়বীরদের

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এই প্রতিযোগিতায় অনভিজ্ঞ ফেলিক্স সেদিন এমন সব কৃতী প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহসী হয়েছিলেন যখন তাঁরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, খাদ্য বিষয়ক অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন বিজ্ঞানভিত্তিক দৌড় বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সকলেই তখন এক-একজন জগদ্বিখ্যাত দৌড়বীর হতে সমর্থ হয়েছেন।

একত্রিশ জন প্রতিযোগী সেদিন ম্যারাথন দৌড়ের যাত্রা-সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণটিতে ক্রীড়াঙ্গনে সেদিন খুবই গণ্ডগোল হয়েছিল। এই ক্ষণটিতে প্রতিযোগীদের সম্মুখে সেদিন এক বিশাল জনতার সমাবেশ হয়েছিল। প্রতিযোগীগণকে তখন ঐ বিশাল জনতা নিয়ন্ত্রণকারী অশ্বারোহী পুলিশ এবং বহু দ্বি-চক্রযানের মধ্য দিয়ে নিজেদের পথ তৈরী করে নিয়ে অতিকষ্টে ছুটতে হচ্ছিল। এই সময় ক্রীড়াবিদ্‌দের সম্মুখে যানবাহনাদির এমন বিরাট সমাবেশ হয়েছিল যে বহু ক্রীড়াবিদ্‌ই তখন সত্যসত্যই দিশেহারা হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও সেদিন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে নিজস্ব স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসি ঠাট্টা করতে করতে দৌড়পথ ধরে ধীর কদমে এগিয়ে চললেন ফেলিক্স। দৌড় চলার কালে কোন সময় হঠাৎ থেমে পড়ে তিনি কাঁচা ফল সংগ্রহান্তে খেতে খেতে ছুটে চললেন। আবার এই রকম কিছুক্ষণ চলার পর তিনি কোন একটি মোটর গাড়ী হাঁটকিয়ে কিছু পিচ ফল সংগ্রহ করে পুনরায় ছুটতে আরম্ভ করলেন। অস্বাভাবিক গরম আর অমানুষিক কষ্টের মধ্যেও দর্শকগণ সেদিন ফেলিক্সের ঐ হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী দেখে বাস্তবিকই প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে ওলিম্পিক চলেছে। গরম আবহাওয়া আর পথের উড়ন্ত ধূলার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-রত প্রতিযোগীরা তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দুরন্ত গরম আর উপরোক্ত অসহনীয় পরিবেশের মধ্যেও ওলিম্পিক ম্যারাথন দৌড় তখন এই রকম ভাবে চলেছিল। অনেক কষ্টে এই রকম ভাবে দৌড় চলার কালে প্রতিযোগীরা অতঃপর একের পর এক প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

তখনও পর্য্যন্ত ফেলিক্স কিন্তু ছুটে চলেছিলেন ঠিক একই রকম ভাবে। কিন্তু এইবার তাঁর পেট কামড়াতে শুরু করল। ইতিপূর্বে পথের মাঝে কাঁচা আপেল খাওয়াটাই এই বিপত্তির কারণ বলে জানা গেল। অমানুষিক কষ্ট ও নিদারুণ পেটের যন্ত্রণা নিয়েও ফেলিক্স সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তিনি কেবল কিছুক্ষণের জন্য পথের মাঝে থেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রতিযোগিতার দিনটিতে এমনই অস্বাভাবিক গরম পড়েছিল যে মোট ৩১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ১৪ জনই শুধু মাত্রাধিক কষ্ট সহ্য করে কোনক্রমে দৌড়ের শেষ সীমানায় এসে পৌছেছিলেন। শোনা যায় বাকী ১৭ জন তৎকালীন পৃথিবী-খ্যাত দৌড়বীর প্রচণ্ড গরমের দরুণ দৌড় থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই দিন প্রতিযোগিতাকালীন বহুবার চিকিৎসকগণকে অচৈতন্য ভূলুণ্ঠিত প্রতিযোগীদের পরিচর্য্যায় রত থাকতে দেখা গিয়েছিল।

এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু হাভানার সেই ছোট্ট ডাক-হরকরা তাঁর প্রচেষ্টা থেকে বিরত হননি সেদিন। বরং বিশিষ্ট প্রতিযোগীদের অনেককে পিছনে ফেলে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিলেন ফেলিক্স কার্ভেজাল। অবশেষে দৌড়ের শেষ অধ্যায়ে তিনি যখন স্টেডিয়ামের ভেতর প্রবেশ করলেন তখন তিনি ক্রমপর্য্যায়ের তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় ফেলিক্স ওলিম্পিক-বিজয়ী অপেক্ষা প্রায় পনের মিনিট পরে তাঁর দৌড় শেষ করেন। এই দৌড়ে বিজয়ীর সময় হয়েছিল ৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড। দৌড়ের সময় থেকেই বোঝা যায় কি দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে এই দৌড় প্রতিযোগিতা সংঘটিত হয়েছিল সেদিন।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ না হলেও ফেলিক্সের কার্য্যকলাপে সমস্ত স্টেডিয়াম সেদিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওলিম্পিক ক্রীড়াবিদেরা এই সময়ে তাঁর একটি নূতন নামকরণ করেছিলেন। সেটি হলো "Felix the Fourth"। ওলিম্পিক চলাকালীন সময়ে সবার প্রিয় ঐ নামটিই বোধহয় সদা সর্বদা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হত।

এই প্রতিযোগিতায় ডাকহরকরা ফেলিক্স চতুর্থ স্থান অধিকার করলেও তৎকালীন ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞরা তাঁর সম্বন্ধে কিন্তু বেশ উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। এই দৌড় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত এই ছিল যে, ফেলিক্স অন্যান্য প্রতিযোগীদের মতন যদি নির্দিষ্ট ক্রীড়ার জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেতেন তবে তাঁর পক্ষেও ১৯০৪ সালের ওলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান লাভ করা হয়ত বা অসম্ভব ছিল না। যারা প্রতি-যোগিতার সময়ে তাঁর ঐ পেট ব্যথার কথা জানতেন তাঁদের অনেকেই তখন বলেছিলেন, যদি পেট ব্যথার জন্য উক্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় বিরতি দিয়ে তিনি সময় নষ্ট না করতেন তবে হয়ত তিনিও এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে সমর্থ হতেন।

এই অসম্ভব কীর্ত্তিকলাপের পর ফেলিক্স ওলিম্পিক প্রাঙ্গণে আর মাত্র কয়েকদিন ছিলেন। এরপর একদিন হঠাৎ তিনি যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে কেউ কোনদিন আর তাঁর কোন সন্ধান পায়নি।

ফেলিক্সের কথা মনে এলেই আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠে একজন ফুর্তিবাজ কষ্টসহিষ্ণু অদমনীয় সবার প্রিয় ছোট্ট এক ডাকহরকরা যিনি ১০০ মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণের পরও অসহনীয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পৃথিবী-খ্যাত দৌড়বীরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে কোন রকম কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

মন্থরা-হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্ছিখ ব্রাহ্মণ যখন তাহার দৈবলব্ধ স্বয়ংবরা পত্নী, তথা পিতামহীকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, তখন তাহার ধারণা ছিল পথের কষ্টে বৃদ্ধা দুই-চারিমাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে, তারপর সে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও মণিমুক্তাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্বক দেশে ফিরিবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মন্থরার অত শীঘ্র মরিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তৎপরিবর্তে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই নানা উপায়ে সে যেন জরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়সঙ্কোচের জন্যও তাহার আগ্রহবৃদ্ধি হইতে দেখা গেল। প্রথম দিকে সে যেমন উদারভাবে অর্থব্যয় করিত, আজকাল আর সেরূপ করে না। ফলে সাংসারিক নিত্য-প্রয়োজনীয় ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত দৈনিক দুই-চারিটি রৌপ্যমুদ্রা হইতে বাঁচাইয়া উচ্ছিখের মাসিক দুই-চারি মুদ্রার বেশী সঞ্চয় হইত না। শিবিকাবাহকদের বেতন, দাসদাসীদের বেতন প্রভৃতি মন্থরা নিজহস্তে দিত, বিভিন্ন নগরে গ্রামে বাসগৃহের ভাটকস্বরূপ যেখানেই শতাধিক রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে হইত সেখানেই উচ্ছিখের হস্তে অর্থ দিয়া অবগুণ্ঠনবতী মন্থরা স্বয়ং উপস্থিত থাকিত। কার্যতঃ সমস্ত পরিশ্রম উচ্ছিখই করিত, পারিশ্রমিকস্বরূপ সুখাদ্য এবং সেবাও পাইত, কিন্তু পরনির্ভরশীল হইয়া এরূপ দিনপাত মাঝে মাঝে তাহার আর ভালো লাগিত না, সে গৃহে ফিরিবার জন্য চঞ্চল হইত। বুদ্ধিমতী মন্থরা যখনই তাহার এইরূপ মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিত তখনই বল্গারজ্জু শিথিল করিত, দিনকয়েক তাহাকে নির্বিচারে ব্যয় করিতে এবং বিলাসিতার স্রোতে ভাসিতে দিত, আদরে সোহাগে তাহাকে আবার বশ করিয়া ফেলিত। এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ ও নগর দর্শন করিল, কিন্তু দুর্গম পার্বত্য পথে কোনও তীর্থ-দর্শনে যাইতে মন্থরার আগ্রহ দেখা গেল না। অপর পক্ষে যখন যে নগরে উপস্থিত হইত সেখানেই মন্থরা স্থানীয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের নিকট যাতায়াত করিয়া নিজ কুব্জভার মোচন ও জরামুক্তির জন্য সহায়তা চাহিত। মথুরানগরে মহর্ষি অগ্নিবেশের শিষ্য বিখ্যাত শস্ত্র-চিকিৎসক আচার্য লোকপাল তাহার দেহে কঠিন অস্ত্রোপচার করিলেন, তাহার পৃষ্ঠের অস্থি-মাংস কাটিয়া, মেরুদণ্ডের বক্রতা ঘুচাইয়া তাহাকে কুৎসিত কুব্জের ভার হইতে মুক্তি দিলেন, তাহাকে যেন নবজন্ম দান করিলেন। তিনমাস শয্যাগত থাকিয়া মন্থরা যেদিন তাঁহার আরোগ্যশালা হইতে নির্গত হইল সেদিন তাহার আনন্দ আর ধরে না। হিমালয়-পাদদেশে মায়া অর্থাৎ কনখল নগরে মহর্ষি বিদিতের প্রদত্ত পার্বত্য ভেষজ সেবন এবং অঙ্গে মর্দন করিয়া মাত্র দুইমাসের মধ্যে তাহার সর্বাঙ্গের লোলকুঞ্চিত চর্ম বহুলাংশে বলিরেখাহীন হইল, তাহার গাত্র-

বর্ণ উজ্জ্বল এবং ত্বক্ কোমল সুখস্পর্শ হইল, কেশরাশি কুঞ্চিত, দীর্ঘ এবং ভ্রমরকৃষ্ণবর্ণ হইল। এইরূপে তাহারা যতই নগর হইতে নগরান্তরে যাইতে লাগিল ততই মন্থরার দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন হইতে লাগিল। অতঃপর পিতামহী ক্রমে পিতৃস্বসা ও তাহার পর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হইলেন, কারণ উচ্ছিখও মায়ানগরে অবস্থানকালে মন্থরার অগোচরে সঞ্চিত অর্থে গোপনে চিকিৎসা করাইয়া দেহের কিছু উন্নতিবিধান করিয়াছিল, তাহাকে এখনও মন্থরার চেয়ে কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ বোধ হইত। মন্থরা অতঃপর কেকয় রাজধানীতে প্রবেশ না করিয়া তদুত্তরস্থ তক্ষশিলা নগরে পৌঁছিল। সেখানে জনৈক যবন দন্তচিকিৎসক তাহাকে দুই পঙ্‌ক্তি কৃত্রিম দন্ত নির্মাণ করিয়া দিলে সেইগুলি পরিয়া সে বহুদিন পরে মাংস ভক্ষণ করিল। তাহার অবনমিত কপোলদ্বয় যুবতীজনোচিত না হইলেও অনেকটা পূর্ণতালাভ করিল। মন্থরা সেই কৃত্রিম দন্ত-বিকাশ করিয়া সুদর্শন যবন-বণিক্ অংতিওকসের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার সুন্দরী পত্নী কাসান্ড্রার নিকট রূপের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া মনোদুঃখে তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিল। মন্থরা অবশ্য সে কথা স্বীকার করিত না, তক্ষশিলায় ছলনাময়ী গন্ধর্ব এবং যবনীদের মোহপাশে পড়িয়া পাছে তাহার বুদ্ধি-হীন অপোগণ্ড কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেয় এই ভয়েই যেন সে সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জানাইল। অতঃপর তাহারা আরও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মালবের রাজধানী অবন্তীনগরে উপস্থিত হইল। অবন্তী সে-সময়ে অতিশয় শোভাবতী সৌধ-কিরীটিনী নগরীশ্রেষ্ঠা ছিল। তাহার সুবিভক্ত শতশত মহাপথ ও ক্ষুদ্রপথসমূহ সহস্র সহস্র বিপণিতে শোভিত ছিল। পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে সেখানে পণ্য-ভারবাহী উষ্ট্র, অশ্বতর ও বলদাদি পশুসহ বণিকেরা যাতায়াত করিত। অবন্তীর শ্রেষ্ঠী এবং মণিকারদের নিকট মন্থরা একে একে তাহার বহু মণি-মাণিক্য বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়লব্ধ অধিকাংশ অর্থ নিজ উপাধানতলে রক্ষা করিয়া একাংশ দ্বারাই রাজোচিত সুখে বাস করিতে লাগিল। যে উচ্ছিখ পূর্বে দিবসান্তে ভিন্ন কক্ষে আশ্রয় লইত সেও ইদানীং রাত্রিকালে তাহার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিত না। সেই সময়ে একদা শিবিকারোহণে নগর-ভ্রমণে নির্গতা মন্থরা একটি পদ্মপলাশলোচনা দরিদ্রা নারীকে দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহাকে বর্তমানে কেহ কুৎসিত বলিতে না পারিলেও এখনও তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলিত না। চক্ষুদ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট না হইলেও এখনও ক্ষুদ্রাকৃতিই ছিল, নাসিকাও সূক্ষ্মাগ্র এবং সুন্দর ছিল না। সে শুনিয়াছিল অবন্তীর রাজবৈদ্য তিলক শস্ত্রোপচার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন. তিনি শরীরের এক অংশের ত্বক্ তুলিয়া অন্য অংশে যোজনা করিতে, এক অঙ্গ তুলিয়া অন্য অঙ্গে যুক্ত করিতে, এমনকি একজনের অক্ষিগোলক তুলিয়া অন্যজনের অক্ষিকোটরে বসাইয়া দিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ। তাহার নির্দেশানুসারে উচ্ছিখ বৈদ্যরাজের কাছে কিছুদিন যাতায়াত করিয়া তাঁহাকে মন্থরার চিকিৎসার ভার লইতে সম্মত করাইল। তিনি অর্থলোভে এই শস্ত্র-চিকিৎসায় সম্মত হইয়া জানাইলেন, একটি সুনাসা সদ্যোমৃতা নারীর শবদেহ প্রয়োজন। অর্থসাহায্যে ঐরূপ একটি শবদেহ সংগৃহীত হইল, কিন্তু মৃত্যুর পরমুহূর্তে না পাওয়ায় তদ্দ্বারা বৈদ্যরাজের কার্যসিদ্ধি হইল না। তখন মন্থরার আদেশে উচ্ছিখ তাহার পূর্বদৃষ্টা সেই পদ্মপলাশাক্ষী ভিখারিণী উৎপলাকে খুঁজিয়া আনিল। উৎপলার অল্পদিন পূর্বে পতিবিয়োগ হইয়াছে, উত্তমর্ণেরা তাহার সর্বস্ব কৌশলে অপহরণ করিয়া তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। একমাত্র শিশুপুত্র লইয়া সম্ভ্রান্ত বংশের কুলকামিনী সে পথে ভিক্ষা করিতেছিল। ধর্মরক্ষার জন্য রাত্রে একটি দেবায়তনের বৃদ্ধ পুরোহিতের দ্বারপ্রান্তে আশ্রয় লইত। এই অবস্থায় উচ্ছিখ যখন তাহাকে সযত্নে মাতৃসম্বোধন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি কক্ষে স্থান দিল, তাহার পুত্রকে মহার্ঘ কৌষেয় বসনে সাজাইয়া স্বর্ণহার পরাইয়া দিল, গৃহস্বামিনী মন্থরা তাহাকে ভগ্নীসম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিল তখন সে

কৃতার্থ হইয়া গেল। একমাসকাল তাহাকে সসম্মানে পোষণ ও তোষণের পর মন্থরা একদিন তাহার নিকট নিজের অন্তরের অভিপ্রায় জানাইল, তাহার নাসাগ্রভাগ ও চক্ষুদ্বয়ের বিনিময়ে সে তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিবে। উৎপলা প্রথমতঃ ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মন্থরা যখন এক সহস্রকে দশ সহস্রে তুলিল, অবশিষ্ট জীবন নিরাপদ্-নিশ্চিন্তে কাটাইবার এবং পুত্রটিকে মানুষ করিয়া তুলিবার আশায় তখন উৎপলা চক্ষু পরিবর্তনে সম্মতা হইল। অতঃপর মন্থরা অগ্রিম পাঁচসহস্র স্বর্ণমুদ্রা তাহাকে গণিয়া দিল, উচ্ছিখের চেষ্টায় সেই অর্থে নগর-বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত গৃহ তাহাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল তখন উৎপলা সানন্দে একদিন সন্ধ্যাকালে শস্ত্রচিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমতঃ তাহার নাসিকাগ্রভাগ কাটিয়া লইয়া বৈদ্যরাজ মন্থরার ছেদিতাগ্র নাসিকার সহিত যুক্ত করিলেন এবং মন্থরার নাসিকাগ্রভাগ তাহার ছেদনাবশিষ্ট নাসিকায় যুক্ত করিলেন। অতঃপর উভয়ের নাসিকা ঔষধলিপ্ত ও বস্ত্রজড়িত করিয়া তিনি উভয়ের চক্ষুগোলক উৎপাটন করিলেন। উৎপলার চক্ষুগোলক অবিলম্বে মন্থরার অক্ষিকোটরে প্রবিষ্ট করাইয়া উহা সম্যক্‌রূপে যোজিত করা হইল, কিন্তু তাহার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় হওয়ায় উৎপলার অক্ষিকোটরে মন্থরার চক্ষুগোলক প্রবিষ্ট করাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, ফলে সে চক্ষু লাভ করিলেও সে-চক্ষুতে দৃষ্টিলাভ করিল না। বৈদ্যরাজ সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। দুইমাস পরে ক্ষতচিহ্ন মিলাইয়া গেলে, পাশাপাশি দুই পর্যঙ্ক হইতে দুই নারী যখন রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিল তখন একজন পরম রূপবতী আর একজন বিকৃতনাসা অন্ধ। মন্থরার যে দাসী ঐ সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে বলে মন্থরা একজন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই, উৎপলার অন্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া সে বিজয়িনীর হাসি হাসিত। সেই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সে উৎপলার সঙ্গে তাহার গৃহে চলিয়া যায়। কিন্তু মন্থরার মতে সে উৎপলার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার অসুস্থতার সময়ে তাহার উপাধানতলস্থ অর্থ অপহরণে উদ্যত হইয়াছিল, উচ্ছিখের নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে এবং উৎপলাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। বলা বাহুল্য উৎপলার অকৃতজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া সে তাহার প্রাপ্য বাকী পঞ্চ-সহস্র মুদ্রা আর দেয় নাই। উৎপলার কোনও লিখিত প্রমাণ-পত্রী না থাকায় সে রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে নাই, তাহার কোনও সহায়-সম্বলও ছিল না। গৃহক্রয়ের পর যে অর্থ বাকী ছিল তাহার সাহায্যে সে মন্থরার পূর্ব্বোক্তা দাসীর সহায়তায় পুত্রটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইল। চিরঞ্জীব বলিল, "দিদি, কাজটা ভালো হইল না।" তৃষ্ণা বলিল, "ভ্রাতঃ, অর্থ বাঁচিলে তোমারই থাকিবে, আমি আর কয়দিন?"

এদিকে মন্থরা নূতন নেত্র লাভ করিয়া দেখিল, উজ্জয়িনীতে সুপুরুষের অভাব নাই। সে এতদিন শিবিকায় জালাবরণ না দিয়া বাহির হইত না, সম্প্রতি প্রকাশ্যে রথারোহণে ভ্রমণ করিতে এবং যত্রতত্র অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে পথিকজনের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইতে লাগিল। সে যতদিন লজ্জাশীলা পুরস্ত্রীর মতো ছিল ততদিন কোনো বিপদ্ হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি তাহার হাবভাবে তাহাকে কোনও নবাগতা রূপবতী বারাঙ্গনা বিবেচনায় অবন্তীর অর্থবান্ নাগরিকেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল, দিনে-রাত্রে তাহার নিকট পত্র এবং দূত পাঠাইতে লাগিল, কেহ বা সশরীরে আসিয়া তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল। উচ্ছিখ বিপদ্ গণিল। বৈদ্যরাজ তিলকের নিকট যাতায়াতকালে সে একদিন তাঁহার গৃহে শ্রেষ্ঠী সোমদত্তকে দেখিয়াছিল। ঐ শ্রেষ্ঠীর পত্নী অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ছিলেন, শ্রেষ্ঠীকে অন্য কোনো রমণীতে অনুরক্ত জানিয়া একদিন তিনি রোষবশে নিদ্রিত স্বামীর কর্ণাংশ ছেদন করিয়াছিলেন; বৈদ্যরাজের সাহায্যে শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত অবশ্য আবার কর্ণলাভ করেন কিন্তু তাঁহার দুর্নাম যায় নাই। সেই শ্রেষ্ঠীকে একদিন মন্থরার প্রসাদ প্রার্থনায় সমাগত দেখিয়া উচ্ছিখের মস্তকে দুর্বুদ্ধির উদয় হইল। সে শ্রেষ্ঠি-পত্নীকে গিয়া সংবাদ

দিল, তাঁহার স্বামী তৃষ্ণানাম্নী নবাগতা সুন্দরীর গৃহে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রেষ্ঠি-পত্নী তৎক্ষণাৎ একটি ছুরিকাহস্তে রথারোহণপূর্বক তৃষ্ণা তথা মহুয়ার গৃহে উপস্থিত হইলেন। উচ্ছিখ তাঁহাকে দূর হইতে গৃহ দেখাইয়া দিয়া রথ হইতে নামিয়া পথে দাঁড়াইয়া রহিল। সোমদত্ত সে-সময়ে মহুয়ার প্রাসাদদ্বারসম্মুখস্থ অতিথি-আপ্যায়নকক্ষে তাহার দর্শনাশায় বসিয়াছিলেন, বাতায়ন পথে স্বীয় পত্নীকে সম্মুখস্থ পথে রথ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া তিনি দ্রুতবেগে ঐ কক্ষের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। গ্রীষ্মবশতঃ তিনি উত্তরীয় এবং পাদুকা উন্মোচন করিয়াছিলেন, তাহা আর লইবার সময় হইল না। শ্রেষ্ঠিপত্নী বামাক্ষীও পথ হইতে স্বামীকে দেখিতেছিলেন, তিনি কক্ষে প্রবিষ্টা হইয়া যখন দেখিলেন সোমদত্ত পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহার উত্তরীয় এবং পাদুকা তুলিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দ্রুতপদে দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। সেখানে গৃহস্বামিনীকে না পাইয়া ত্রিতল অতিক্রমপূর্বক চতুর্থতলে একটি কক্ষে সখীপরিবৃতা মহুয়ার দর্শন পাইলেন। মহুয়া রণচণ্ডীরূপিণী শ্রেষ্ঠি-গৃহিণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি কে? কি চাও? সংবাদ না দিয়া উপরে আসিলে কেন?"

বামাক্ষী কোনও কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন, "তুমিই তৃষ্ণা? তুমিই আমার মূঢ় স্বামী সোমদত্তের মস্তক চর্বণ করিতেছ? পাপীয়সী ডাকিনী, তুই কাল-সর্পকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিস্, তোর জীবনের ভয় নাই?" সখীরা কোলাহল করিয়া উঠিয়া পড়িল, কেহ "দৌবারিক, দৌবারিক" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কেহ অন্যান্য ভৃত্যের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মহুয়া ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিল, "তুমি অবিলম্বে যদি স্থানত্যাগ না করো, তবে আমার ভৃত্যগণ তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইবে।" বামাক্ষী নীবিবন্ধ হইতে ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, "তৎপূর্বে আমি তোর নাসিকা-কর্ণ ছেদন করিয়া তোর চক্ষু ছুরিকা দ্বারা উৎপাটন করিয়া যাইব, যাহাতে ভবিষ্যতে তুই আর কোনও নারীর সংসার ভাঙিতে না পারিস তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতবেগে আসিয়া মহুয়াকে আঘাত করিল, মহুয়া সশব্দে গৃহকুট্টিমে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "রক্ষা করো, রক্ষা করো। উচ্ছিখ, উচ্ছিখ, কোথায় তুমি?" স্বামীর অতি আধুনিক নাম 'চিরঞ্জীব' ভয়-বিহ্বলতাবশতঃ সে বিস্মৃত হইয়াছিল।

বামাক্ষী ততক্ষণে তাহার বক্ষে-মুখে-উদরে পাদ-প্রহার করিতে করিতে গর্জন করিতেছেন, "কুলটা, রূপ দেখাইয়া তুই গৃহস্থ নারীর সর্বনাশ করিস, আজ তোর নাসাচ্ছেদন না করিয়া আমি জল গ্রহণ করিব না, দেখি তোর কোন্ প্রণয়ী আজ তোকে রক্ষা করে।" সখীরা যেই কেহ অগ্রসর হইতে যায় সেই তাহার ছুরিকা আস্ফালন দেখিয়া পশ্চাৎপদ হয়। এমন সময় উচ্ছিখ ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল এবং নতজানু হইয়া করপুটে বলিল, "মাতঃ, আপনি আমার পত্নীর প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

বামাক্ষী উচ্ছিখকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে তোমার পত্নী? এই কুলটা?" উচ্ছিখ বলিল, "তৃষ্ণা কুলটা নহে, তাহার পদস্খলন হইবার উপক্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু আপনি তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। সে আর কাহাকেও প্রলুব্ধ করিবে না, আপনার স্বামীকে তো নয়ই। আমি আপনার মঙ্গল কামনায় পথ দেখাইয়া আপনাকে গৃহে আনিয়াছি, এখন শরণাগত আমাকে গৃহশূন্য করিবেন না।"

বামাক্ষী তখনও ক্রোধে কম্পিতা হইতেছিলেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া তিনি উচ্ছিখকে উদ্দেশ করিয়া মহুয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি অদ্যকার মতো তোমার পত্নীকে ক্ষমা করিলাম, আর দ্বিতীয়বার করিব না। সাতদিন সময় দিলাম, ইহার মধ্যে তোমরা অবন্তী ত্যাগ করিবে। যদি না করো

তবে অষ্টমদিনে স্বয়ং ইন্দ্রও তোমার পত্নীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না জানিয়ো। আমার মূর্খ স্বামী পলায়ন করিয়াছে, তাহার এই উত্তরীয় এবং পাদুকা তোমার গৃহে পাইয়াছি। আমার স্বামীকে গুপ্তকক্ষে রুদ্ধ রাখিয়া আমি রাজদ্বারে জানাইব, তুমি তোমার পত্নীর সাহায্যে অর্থলোভে তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়াছ। নগরপাল আমার আত্মীয়, বহু রাজসভাসদ্ আমার আপনজন, তোমাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। তৎপূর্বে ঐ পাপীয়সীর নাসাকর্ণ ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমি উহার মতো সমস্ত কুলটাকে শিক্ষা দিব, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে মূর্খ গৃহস্থদের ভুলাইবার চেষ্টা করিবার পূর্বে ইহার শাস্তি চিন্তা করিয়া সাবধান হয়।"

বামাক্ষী পদশব্দে গৃহকুট্টিম কম্পিত করিয়া বিদায় লইলেন, কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। তখন মন্থরা অঙ্গ হইতে ধূলি মার্জনা করিয়া উঠিয়া বসিল, গলদশ্রুনয়নে বলিল, 'ধিক্ আমার অর্থে, ধিক্ তোমার মতো স্বামীকে! একটা উন্মাদিনী স্ত্রীলোকের নিকট আমি অপমানিতা হইলাম, তোমরা কেহ তাহাকে শাস্তি দিতে পারিলে না? তুমি আবার এমনই ভীরু যে পুরুষ হইয়া ঐ দুর্বৃত্তার নিকট দয়া ভিক্ষা করিলে, তাহার সমস্ত অসঙ্গত প্রস্তাব মানিয়া লইলে! এখন আমি যদি না যাই তবে ঐ রাক্ষসী কী করিতে পারে? আমি দ্বারে দশজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিব, আমি রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিব।"

উচ্ছিখ বলিল, "তৃষ্ণা, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ তখন আমার গত্যন্তর ছিল না। উন্মাদিনী শ্রেষ্ঠিপত্নী তোমার বক্ষে পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা ছিল, আমি বলপ্রয়োগে তাহাকে বাধা দিতে গেলে সে বিদ্যুদ্বেগে হয় তোমার কণ্ঠে পদাঘাত করিয়া তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিত, না হয় করধৃত ছুরিকা আমূল তোমার চক্ষে বসাইয়া দিত বা তোমার নাসিকা ছেদন করিত। এই অবস্থায় আমার ধৈর্যধারণ না করিয়া উপায় ছিল না। তারপর তাহার নির্দেশ পালন সম্বন্ধে আমার সম্মতিদান তোমার অপ্রিয় হইয়াছে বুঝিতেছি, কিন্তু উপায় কি ছিল? তুমি আমি এ-নগরীতে নূতন আসিয়াছি, আমাদের সহায় বলিতে অর্থ। একমাস বেতন না পাইলে ভৃত্যেরা এবং পরিচারিকারা ছাড়িয়া যাইবে, অধিকতর অর্থ পাইলে তাহারা আমাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। তুমি শুনিলে, নগরপাল এবং রাজপুরুষেরা শ্রেষ্ঠিজায়ার আত্মীয়, এক্ষেত্রে তাহার সহিত বিবাদ করিয়া এখানে অধিক দিন থাকা নিরাপদ্ নয়। তুমি বহু কষ্টে বহু সাধনায় বর্তমান রূপ-লাবণ্য লাভ করিয়াছ, কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে এক উন্মাদিনীর আক্রমণে তাহা হারাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। কাজ কি বিবাদে? উজ্জয়িনী ছাড়া কি নগর নাই, না সেখানে মানুষ বাস করে না?" মন্থরা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও উচ্ছিখের কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল। সে প্রাসাদ-স্বামীর প্রাপ্য দক্ষিণা শোধ করিয়া দাসদাসী-দিগকে বিদায় দিয়া একদিন রাত্রিকালে নিঃশব্দে অযোধ্যা হইতে আনীত তাহার সেই শিবিকাযোগে অবন্তী ত্যাগ করিল, উষ্ণীষ-পরিহিত সুবেশ উচ্ছিখ অশ্বপৃষ্ঠে তাহাকে অনুসরণ করিল, বহু অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র-বলদাদি পশু তাহাদের গৃহসজ্জা এবং মূল্যবান্ তৈজসপত্রাদি বহন করিয়া চলিল।

মন্থরা এখন সুন্দরী-পদবাচ্যা, উচ্ছিখেরও সুপুষ্ট সুন্দর দেহ দেখিয়া কাহারও তাহাকে অতীতের সেই ভিক্ষান্নভোজী পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠান নগরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মন্থরার বিরাগ বিদূরিত হইয়াছিল, প্রয়াগে স্নান করিয়া তাহারা নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া কপোত-কপোতীর মতো আনন্দে বাস করিতে লাগিল এবং নিত্য নানা সাধু দর্শন করিতে লাগিল। প্রয়াগের অনতিদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল, অতীতে একদা সেখানে অতিথি হইয়া কৈকেয়ী এবং ভরত অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ

করিয়াছিলেন। মন্থরা উচ্ছিখের সহিত সেখানে গিয়া শুনিল মুনিবর তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছেন। সে তাঁহার শিষ্য আয়ুর নিকট কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিল মহর্ষি চ্যবণের শিষ্য সুরসেন নামক যে বৈদ্যপ্রবর পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতির জরাজর্জর দেহে তাঁহার যুবক পুত্র পুরুর সতেজ গলগ্রন্থি সংযুক্ত করিয়া তাঁহার যৌবন ফিরাইয়া দিয়াছিলেন সেই দীর্ঘজীবী বৈদ্যরাজ তখনও জীবিত আছেন। যযাতির যৌবন লাভের গল্প মন্থরা পূর্বে রামচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিল, এক্ষণে সহসা তাহার আকাঙ্ক্ষা হইল সেও নবযৌবন লাভ করিবে। যতই সুন্দরী হউক, কেহ তাহাকে দেখিয়া সে-সময়ে চত্বারিংশ বর্ষের নিম্নবয়স্কা বলিয়া মনে করিত না, ইহাতে তাহার মনে শান্তি ছিল না। সে বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ সুরসেনের নিকট নানা আহার্য-পানীয় লইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল, দাসীর মতো তাঁহার গৃহমার্জনা, রন্ধন ও পদসেবা করিতে লাগিল, উচ্ছিখও ভক্তিবশতঃ ভৃত্যবৎ তাঁহার আদেশ পালনে তৎপর রহিল। সুরসেন প্রথমতঃ মন্থরার কামনা জানিয়া বহু আপত্তি করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া অপরাধ বলিয়া নিজের অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্থরার নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে সম্মত হইলেন। মন্থরা অতঃপর উচ্ছিখকে বলিল, "প্রাণনাথ, একটি পূর্ণ-যৌবনা যুবতী ভিখারিণী সংগ্রহ করিতে হইবে, যে স্বেচ্ছায় তাহার গলগ্রন্থিতে শস্ত্রোপচার করিতে দিতে সম্মতা হইবে। এ-জন্য যত অর্থের প্রয়োজন তাহা আমি ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। অবন্তীতে উৎপলাকে তুমিই আনিয়াছিলে, এ-বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। অদ্যই কাজে লাগিয়া যাও, এক সপ্তাহের মধ্যে শস্ত্রোপচার হওয়া চাই। বৈদ্যরাজ অর্থের বশীভূত নহেন, তাঁহার নিকট ঐ নারী নিজমুখে বলিবে, সে আমার আত্মীয়া, স্বেচ্ছায় আমার জরা গ্রহণ করিয়া সে আমাকে যৌবন দান করিতেছে। এরূপ স্বীকৃতি না পাইলে বৈদ্যরাজ কিছুই করিবেন না।" উচ্ছিখ উৎপলার ব্যাপারে অনুতপ্ত ছিল, সে বলিল, "প্রিয়তমে তৃষ্ণা, তোমার তৃষ্ণার কি বিরাম নাই? আমি ভাবিয়াছিলাম দীর্ঘায়ু মহাপুরুষের সেবা করিয়া তুমি পুণ্য লাভ করিতেছ। আবার একটি হতভাগিনী নারীর সর্বনাশ না করিলে—মহাপাপ না করিলে চলিতেছে না?" মুক্তাপাণ্ডু কৃত্রিম দন্তপঙ্‌ক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া আয়তলোচনে কটাক্ষ হানিয়া মন্থরা বলিল, "প্রিয়তম, এতদিনে বুঝিলাম তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না। নচেৎ আমার রূপ-যৌবন বৃদ্ধিতে তুমি আনন্দিত হইবে না কেন? নারীর যৌবন প[illegible] সুখের জন্য তাহা কি তুমি জানো না? তদ্ভিন্ন তুমি পাপের ভয় করিতেছ কেন? দ্রব্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে পাপ হয় না, আমরা যাহার যৌবন ক্রয় করিব তাহার চিরজীবনের জন্য অর্থচিন্তা থাকিবে না। যাও, অবিলম্বে ব্যবস্থা করো।" উচ্ছিখকে আর কথা বলিতে না দিয়া মন্থরা দ্রুত আসিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিল, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিল, তাহার পর তাহাকে আদেশ পালন করিতে পাঠাইল। উচ্ছিখ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পথে বাহির হইল এবং অচিরে চন্দনানাম্নী একটি দরিদ্রা নারীকে সংগ্রহ করিয়া আনিল। চন্দনা অষ্টাদশী, অবিবাহিতা, অর্থাভাবে তাহার দরিদ্র পিতা তিনজন পুত্র-কন্যা ও পত্নীসহ উপবাসী ছিলেন, যুবতী তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, একটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া উচ্ছিখ তাহাকে বিস্মিত করিল। তাহার গৃহ দেখিয়া তাহার ভ্রাতা, ভগ্নী ও মাতাপিতাকে জীর্ণ-বস্ত্রের পরিবর্তে নব-বস্ত্র দিয়া, তাহাদের মাসাধিক-কালের উপযোগী আহার্য কিনিয়া দিয়া উচ্ছিখ সমস্ত পরিবারটিকে একদিনের মধ্যে বশ করিয়া ফেলিল। অতঃপর কয়েকদিন যাতায়াত করিতে করিতে সে এক-দিন চন্দনার পিতার নিকট মন্থরার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে চন্দনার পিতা কন্যার গলগ্রন্থিতে শস্ত্রোপচার করিতে দিতে সম্মত হইলেন, পরিবারের মুখ চাহিয়া চন্দনাও সেই প্রস্তাবে সম্মতা হইল। সে বৈদ্যরাজের নিকট মিথ্যা পরিচয় দিল,

রাজ্যে যদি একটি সুপাত্র মিলিয়া যায় তবে তাহাকে এই-খানে পাত্রস্থ করিয়া যজ্ঞদত্ত শেষ জীবনটা নিশ্চিন্ত চিত্তে বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে কাটাইতে পারেন। রাজা কালিন্দী অবিবাহিতা জানিয়া আশান্বিত হইলেন, দিনের পর দিন তাহার গৃহোদ্যানে এবং প্রাসাদশীর্ষে বসিয়া তাহার কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীতসুধা কর্ণ দিয়া এবং কমনীয় দেহের রূপসুধা চক্ষু দিয়া পান করিলেন, তারপর একদা তাহার কাছে বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। মন্থরা অনেক ছল, কৃত্রিম বিনয় এবং আপত্তি করিল, তাহার পিতৃবন্ধুর মত না হইলে কিছু হইবে না জানাইল। যজ্ঞদত্তের নিকট রাজা জানিলেন এতদিনে কালিন্দীর যোগ্যপাত্র মিলিয়াছে, তাহার আপত্তি নাই। প্রথম পরিচয়ের তিনমাসের মধ্যে শুভদিনে শুভক্ষণে কাশীরাজ সুপর্ণ কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন। উচ্ছিখ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজাকে কন্যাদান করিলেন। তারপর কালিন্দী রাজার প্রিয়তমা মহিষী হইল। কিছুদিন পরে উচ্ছিখও কিরূপে বেতনভুক্ অমাত্য পদে বৃত হইয়া কাশীবাস করিতে লাগিল সে কথা পরে বলিতেছি।

৫

অনেক সময়ে দেখা যায়, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে পরিকল্পনা লইয়া কার্য আরম্ভ করে প্রতিকূল দৈবশক্তি অভাবনীয়রূপে তাহা পণ্ড করিয়া দেয়। অমাত্য ভদ্র মন্থরার অনুসন্ধান কার্যে মুহূর্তকাল বিলম্ব করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন কিন্তু প্রথমতঃ প্রভুর আদেশে সপরিবারে কুশাবতী গমন করিতে দ্বিতীয়তঃ সেখানে বাসস্থান সংগ্রহ এবং পোষ্যবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কুশাবতীতে থাকিতে মন্থরার পরিণাম চিন্তায় তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। বিশাখদত্তও রাজাদেশে কুশাবতীতে আসিয়াছিল এবং নিজগৃহে বন্দী থাকিয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণমূর্তি নির্মাণের জন্য মনুষ্যপ্রমাণ একটি সিক্থ-প্রতিমা গঠন করিতেছিল। অমাত্য ভদ্র তাহার নিকট মন্থরার সংবাদ লইতে গিয়া জানিলেন, সে কিছুই জানে না। বনমধ্যে একটি ভগ্নমন্দির এবং একটি কূপ সে একবার বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের মৃগয়াসহচররূপে যাইবার সময় দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইখানে সে তাহার ভৃত্যদিগকে স্বর্ণপ্রতিমাটি লুকাইয়া রাখিতে বলিয়াছিল। ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিলে সে তাহাদের নিকট মন্থরার সংবাদ পাইত, তাহারা ফিরিয়া না আসায় এবং বিশাখদত্ত সপরিবারে কুশাবতী নগরে চলিয়া আসায় তাহার পক্ষে এখন কিছুই বলা সম্ভব নহে। ভদ্র যে কয়দিন কুশাবতীতে ছিলেন প্রতিদিন সহস্র কার্যের মধ্যে একবার বিশাখদত্তের গৃহে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিতেন তাহার পলাতক ভৃত্যেরা ফিরিয়াছে কি না। অবশেষে হতাশ হইয়া রামতিরোধান দিবসের এক-বিংশতি দিন পরে তিনি যেদিন কুশাবতী ত্যাগ করিলেন সেদিন ঘরে বাহিরে অনেক বাধা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল। পত্নী বলিলেন, "সেই দগ্ধাননা কুব্জা বৃদ্ধাটার জন্য তোমার এত মমতা কেন? সে গিয়াছে সংসারের পাপ গিয়াছে। তাহাকে আজ যে দয়াটা দেখাইতেছ সেই দয়াটা সীতাদেবীকে যদি দেখাইতে, রামের কর্ণে দুর্মতি প্রজাদের কুকথাটা না তুলিয়া যদি চাপিয়া যাইতে তবে আজও আমরা রাম-রাজত্বে বাস করিতাম, তাঁহার গৃহত্যাগী পুত্রটার পাল্লায় পড়িয়া পিতৃপিতামহের বাস্তু ত্যাগ করিয়া এই অরণ্যের দেশে আসিতাম না।" ভদ্র বলিলেন, "ভদ্রে, নিয়তি বলবান্, কি করা যাইবে বলো? রামের জীবনের প্রথম পর্বে একটি ধূমকেতু তাঁহার ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিল, সে মন্থরা: রামের জীবনের দ্বিতীয় পর্বে আর একটি ধূমকেতু উঠিয়াছিল, সে ভদ্র। আজ রাম নাই, কিন্তু ধূমকেতুরা কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় ধূমকেতুর আজ ভয়, সে হয়তো প্রথমটিকে ধ্বংস করিয়াছে। দুইজনেই সগোত্র, পৃথিবীর ক্ষতি করিবার জন্যই দুইজনের জন্ম, সুতরাং পরস্পরের প্রতি একটু আকর্ষণ তাহাদের থাকিবে বই কি? মন্থরা বাঁচিয়া আছে জানিলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাজাদেশ,—তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে

হইবে। দেখি, যদি বাঁচিয়া থাকে তবে আনিব।" কুশের নিকট বিদায় গ্রহণকালে কুশ বলিলেন, "আপনাকে হয়তো দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিতে হইবে। আপনি রাজকার্যে যাইতেছেন, সুতরাং প্রয়োজনযোগ্য অর্থ রাজকোষ হইতে লইয়া যান। পারাবতগুলিও লইতে ভুলিবেন না।" তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মন্থরার যাহা হইবার এতদিনে তাহা হইয়া গিয়াছে, এতদিন পরে আর নাই বা গেলেন? বিলম্ব তো কম হইল না।"

ভদ্র বলিলেন, "আপনি নিষেধ করিলে অবশ্যই যাইব না, তবে আমার বিশ্বাস কর্তব্যকার্যে আপনি কখনও আমাকে বাধা দিবেন না। মন্থরা যদি মরিয়া থাকে তবে আমাকে চিরদিনের জন্য অপরাধী করিয়া গিয়াছে, আর যদি বাঁচিয়া থাকে তবে আবার যাহাতে কাহারও ক্ষতি করিতে না পারে সেজন্য তাহাকে কুশাবতীতে আনিয়া চক্ষের সম্মুখে রক্ষা করা প্রয়োজন। আমি দুইদিক্ চিন্তা করিয়াই যাইতেছি, মহারাজ।" রাজদত্ত অর্থ, মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়পত্র, ছদ্মবেশের জন্য বিবিধ উপকরণ, দুইজন বিশ্বাসী ভৃত্য এবং চারিটি পারাবত লইয়া ভদ্র কুশাবতী হইতে যাত্রা করিলেন। সুতপা অযোধ্যা হইতে আনীত কিছু শুষ্ক দেবনির্মাল্য সঙ্গে দিলেন, বলিলেন, "সর্বনাশী মরিয়াও স্বভাব ছাড়ে নাই, গৃহস্থকে বনবাসে না দিয়া স্বস্তি পাইতেছে না। দেখিয়ো, চৌদ্দ বৎসর কাটাইয়া আসিয়ো না যেন।"

মন্থরা ও উচ্ছিখ ক্ষীরগ্রাম ত্যাগ করিবার প্রায় একমাস পরে অমাত্য ভদ্র নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। নদীতে নৌকাবক্ষে থাকিয়াই তিনি তরুশ্রেণীর অন্তরালবর্তী ভগ্নমন্দিরচূড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, অনুচরদিগের তত্ত্বাবধানে নৌকায় আহার্য পরিধেয়াদি রাখিয়া তিনি কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। উচ্ছিখের পুত্র পঞ্চশিখ সেইদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে মন্দিরদ্বারে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "আমি তীর্থপথিক। সংসারে কোনো বন্ধন নাই। অযোধ্যায় আসিয়া এখানকার দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আসিয়াছি। দেখিতেছি গ্রামবাসীর দেবীর প্রতি তাদৃশী ভক্তি নাই, মন্দির সংস্কার এবং ভোগরাগের জন্য ব্যয় করিতে চাহে না।" পঞ্চশিখ বুঝাইল, নিকটস্থ গ্রামবাসী সকলেই দরিদ্র, তবে তাহার পিতা সম্প্রতি আশাতীতরূপে কিছু ধনলাভ করিয়াছেন। তিনিও তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন, ফিরিলে মন্দির সংস্কার হইবে। উপস্থিত তাহাদের গৃহনির্মাণের জন্য ইষ্টক নির্মিত হইতেছে, কাষ্ঠপ্রস্তরাদি সংগৃহীত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-কুমার পূজাশেষে অতিথিকে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইতে দিল। খাইতে খাইতে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ভদ্র উচ্ছিখের বিকটদর্শনা কুব্জা পিতামহীর আকস্মিক আবির্ভাবের গল্প শুনিলেন। উচ্ছিখ তাহাকে লইয়া কোন্ কোন তীর্থে যাইবে তাহা জানিতে না পারিলেও মন্থরা যে মরে নাই এইটুকু জানিয়া ভদ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত্রে তিনি মন্দিরচত্বরেই শয়ন করিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে বিদায় দিলেন। সে চলিয়া গেলে নৌকায় ফিরিলেন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার প্রথম পারাবত কুশাবতীর রাজপুরীতে সংবাদ লইয়া গেল, "মন্থরা মরে নাই, সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া দেশভ্রমণে গিয়াছে। সন্ধানে চলিলাম।" কুশও নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিতীয়দিন প্রভাতেও ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া ভদ্রের সহিত অনেকক্ষণ গল্প করিল, তাহাদের গ্রামের কয়েকজন কৌতূহলী বৃদ্ধ ব্যক্তিও তাহার নিকট সংবাদ পাইয়া বিদেশী বণিক্‌কে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বণিক্ কি বস্তু তাহা অনেকেই জানিতেন না, উজ্জয়িনীতে মৎস্যের সুলভতা, গৌড়দেশে গুড়, কলিঙ্গে লবণ কত অনায়াসলভ্য সেই বিষয়ে আলোচনা হইল। তাঁহাদের নিকট ভদ্র উচ্ছিখের বর্ণনা এবং তাহার বংশপরিচয় পাইলেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মন্থরার শিবিকা বহন করিয়া গ্রামবাসী যে কয়জন দরিদ্র ব্যক্তি মথুরা নগরে গিয়াছিল তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের নিকট মন্থরার বর্ণনা শুনিয়া অমাত্যের ধারণা

হইল মন্থরাকে মথুরাতেই ধরিতে পারিবেন। তিনি তিনদিন পরে গ্রামবাসীর নিকট বিদায় লইবার সময় উচ্ছিখ-পত্নী শঙ্করী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, উচ্ছিখের সহিত দেখা হইলে ভদ্র যেন তাহাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে বলেন। অর্থের জন্য চিন্তা নাই, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই কুসীদে খাটাইয়া তিনি অক্লেশে সংসার চালাইতে পারিবেন। দূরসম্পর্কীয়া পিতামহীর যেরূপ ডাকিনীর মতো মূর্তি তাহাতে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কোন্‌দিন রক্তশোষণ করিয়া লইবে কে বলিতে পারে? তাঁহার একটি মাত্র স্বামী, অনেক দুঃখে তাহাকে এতদিন লালন পালন করিয়াছেন, তাহাকে হারাইতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ভদ্র তাঁহার স্বামীর সন্ধান করিয়া তাঁহার কথা জানাইবেন বলিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে নৌকা ছাড়িয়া তিনি নাবিকদিগকে সারারাত্রি ক্ষেপণী চালনা করিতে বলিলেন। পরদিন তাঁহারা অযোধ্যা অতিক্রম করিলেন কিন্তু পরিত্যক্ত নগরে প্রবেশ করিলেন না। গঙ্গা ও সরযূর মিলনস্থলে পৌঁছিয়া সেখান হইতে উত্তরে প্রয়াগসঙ্গমে এবং সেখান হইতে যমুনার ধারা বাহিয়া আরও উত্তরে মথুরায় পৌঁছিতে তাঁহার পঞ্চ দিবস অতিবাহিত হইল। সেখানে একটি পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া নগরের চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া মন্থরার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা একজন বৈদ্যের নিকট শুনিলেন, তাঁহার গুরুদেব একজন ধনশালিনী বৃদ্ধা কুব্জার কুব্জে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাকে কুব্জভার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ভদ্রের দৃঢ় ধারণা হইল সেই বৃদ্ধাই মন্থরা, কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মন্থরার প্রাসাদের প্রহরিগণ, 'গৃহস্বামিনী শয্যাগতা আছেন, তিনি অসূর্যম্পশ্যা; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ' বলিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। উচ্ছিখের সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে পথে সাক্ষাৎ হইত। তাহার ঊর্ধ্বমুখ শিখা দেখিয়া এবং পুত্র ও পত্নীদত্ত বর্ণনার সহিত মিলাইয়া তাহাকে চিনিতে ভদ্রের বিলম্ব হয় নাই, নিজেকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া একদিন তিনি তাহার পত্নীর শুশ্রূষার ভার লইবার ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন, কিন্তু মন্থরার নির্দেশে উচ্ছিখ তাঁহাকে সে সুযোগ দিল না, তাঁহার সহিত সাক্ষাতে বাক্যালাপও বন্ধ করিল। অগত্যা ভদ্র কিছুদিন যাবৎ আর তাহাদের ত্রিসীমানায় গেলেন না, পান্থশালায় শুইয়া বসিয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া মন্থরাকে অযোধ্যায় লইয়া যাওয়া যায়। সপ্তাহকাল পরে তিনি আবার একবার মথুরায় সন্ধান লইতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রাসাদে অন্য গৃহকর্তা সপরিবারে রহিয়াছেন, মন্থরা ও উচ্ছিখ কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না। মন্থরা করতলগতা হইয়াও হইল না ইহাতে অমাত্যের দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি সন্ধান করিয়া মন্থরার ভূতপূর্ব ভৃত্যদের মধ্যে দুইজনকে বাহির করিলেন, তাহাদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া জানিলেন মন্থরা মায়ানগরে যাইবে, তাহার পর অবন্তী রাজ্যের রাজধানীতে যাইতে পারে। অবন্তী নগরে অমাত্য ভদ্রের জনৈক আত্মীয় বাণিজ্যোপলক্ষ্যে বাস করিতেন, মায়ানগরেও তাঁহার পরিচিত একজন রাজামাত্য ছিলেন। ভদ্র মায়ানগরে গিয়া বহু অনুসন্ধানেও মন্থরাকে দেখিতে পাইলেন না, মনে করিলেন সে বদরিকাশ্রম অথবা গঙ্গোত্রী বা যমুনোত্রী এইরূপ কোনো তীর্থদর্শনে গিয়াছে। হিমাচল বক্ষে বিভিন্ন তীর্থস্থানে প্রায় তিনমাস বৃথা পর্যটন করিয়া ভদ্র অবন্তী নগরে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয় রত্নবণিক্ রাজশেখরের নিকট গিয়া জানিতে পারিলেন, কোনো বিদেশিনী সম্প্রতি সেখানে কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু মন্থরার সহিত তাহার বর্ণনা মিলিল না। রমণী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজশেখরের গৃহে কয়েকবার নাকি যাতায়াত করিয়াছে। তাহার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর, কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ কিন্তু মুখশ্রী ভালো নহে। রমণীর সাক্ষাৎলাভের মানসে ভদ্র প্রতিদিন পথে পথে ভ্রমণ করিলেন কিন্তু মাসাধিককাল চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া কুশাবতীতে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে একদিন

বিশাখদত্তের ময়ূরাকৃতি সেই পূর্বদৃষ্ট শিবিকা তাঁহার নয়ন-পথবর্তী হইল। অনুসন্ধানে জানিলেন তৃষ্ণা নাম্নী কোনও ধনবতী বিদেশিনী সেই শিবিকায় ভ্রমণ করেন। তৃষ্ণা দেবীর প্রাসাদ সম্মুখে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি একদা বাতায়নে তাঁহার দর্শন পাইলেন কিন্তু মন্থরার সহিত তাঁহার কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন না। প্রৌঢ়া যে যৌবনকালে অসামান্য রূপবতী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ভদ্র সুদতী নাম্নী তাঁহার আত্মীয়ের একজন বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে তৃষ্ণা দেবীর গৃহে দাসীরূপে কাজ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার নিকট তিনি ক্রমে জানিতে পারিলেন, তৃষ্ণা দেবীর গোপন কথা। কিরূপে সেই হৃদয়হীনা নারী এক হৃদয়হীন চিকিৎসকের সাহায্যে উৎপলা নাম্নী এক দরিদ্রা সুন্দরীর চক্ষু ও নাসিকাগ্রভাগ হরণ করিয়াছেন তাহাও শুনিলেন। বামাক্ষীর নিকট লাঞ্ছিতা হইয়া তৃষ্ণা দেবী যখন সহসা উজ্জয়িনী ত্যাগ করিলেন তখন ভদ্রের ইচ্ছানুসারে তাঁহার আত্মীয় সুদতীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে দিলেন। সুদতী সেবাযত্নে গৃহকর্ত্রীকে এরূপ বশ করিয়াছিল যে পূর্ব পরিচয় গোপন করিবার জন্য মন্থরা তাহার ময়ূরাকৃতি শিবিকা ও বহু গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া এবং অন্য সমস্ত দাসদাসীকে বিদায় দিয়া গেলেও তাহাকে সঙ্গে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেও সংসারবন্ধন-হীনা বলিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মতা হইল। সুদতীর পরামর্শে অমাত্য ভদ্র অবন্তী হইতে বারাণসীতে যাত্রা করিলেন, সেখানে গিয়া একজন শ্রেষ্ঠী বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করিতে লাগিলেন। বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরে যে জটাজুটধারী দীর্ঘশ্মশ্রু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে দেবদর্শনে আসিতেন, দশাশ্বমেধ অথবা মণিকর্ণিকার ঘাটে যাঁহাকে কোনো কোনোদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ধ্যানস্থ দেখিতে পাওয়া যাইত, তিনিই যে অমাত্য ভদ্র তাহা স্বয়ং অযোধ্যাপতি কুশ অথবা তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পক্ষেও বুঝিয়া উঠা সম্ভব ছিল না। সেখানেও প্রায় দুইমাস কাল অপেক্ষা করিয়া ভদ্র যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন তখন একজন অষ্টাদশী সুন্দরীর সহিত তাঁহার দ্বারা নিয়োজিতা পরিচারিকা সুদতীকে রথ হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গা-স্নানের জন্য সমাগতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। স্নানশেষে স্বর্ণবিন্দুচিত্রিত পীতকৌষের বাস পরিয়া সুন্দরী দাসীগণপরিবৃতা হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা কি ভাবিয়া নতজানু হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। মহাপাপিষ্ঠা হইলেও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দেব দ্বিজের আশীর্বাদ লাভ বিশেষ প্রয়োজন এ বিশ্বাস মন্থরার যায় নাই। সন্ন্যাসী ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়াছিলেন, সহসা যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। সুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "মা, তোমার ললাটে রাজটিকা দেখিতেছি যে? তুমি কি কাশীতে নূতন আসিয়াছ, পূর্বে দেখি নাই তো?" মন্থরা তখন কাশীরাজকে ধরিবার জন্য ছলনাজাল বিস্তার করিতেছিল, সন্ন্যাসীর বাক্যে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা পাইয়া তাহার সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি বাড়িল। বলিল, "পিতঃ, আমার কররেখা যদি একটু দেখিয়া দেন—"

সন্ন্যাসী ইতোমধ্যে মন্থরার অজ্ঞাতে সুদতীকে ইঙ্গিতে নিজ পরিচয় জানাইয়াছিলেন, মন্থরার অনুরোধে তাহার বাম করপল্লব নিমেষের জন্য নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। পরে বলিলেন, "মাতঃ, তোমার জীবন বড়ো বিচিত্র দেখিতেছি। গহ্বর হইতে শিখরে উঠিয়াছ। অনেক দুঃখ পাইয়াছ, অনেক দুঃখ দিয়াছ, তোমার কথা তো, মা, সকলের সম্মুখে বলা যায় না, তোমার দাসীদের একটু অন্তরালে যাইতে বলো।" মন্থরার নির্দেশে মন্থরার দাসীরা দূরে অপসৃতা হইল, অন্য স্নানার্থীদেরও দূরে সরাইয়া দিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি এক সময়ে কোনও রাজগৃহে দাসী ছিলে, তোমার নামের আদ্যক্ষর ছিল 'ম'। তোমার পরামর্শে চলিয়া সেই রাজ্যের রাণী তাঁহার স্বামীর অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর কারণ হন, রাজ্যের সুখশান্তি হরণ করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর বৃদ্ধবয়সে তুমি তস্কর দ্বারা অপহৃতা হইয়া বুদ্ধিবলে

নবজীবন লাভ করিয়াছ। এখন বুঝিয়া চলিলে তুমি রাজরাণী হইতে পারো।" মন্থরা বিস্মিতা হইল; বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন, প্রভু? আমি কেকয় হইতে আগতা পিতৃহীনা ধনিকন্যা। আমার বয়স মাত্র অষ্টাদশবর্ষ। আমি আবার বৃদ্ধা হইলাম কবে, তস্কর দ্বারা অপহৃতা হইলামই বা কবে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা, জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা বলে না। আমি নিমেষমাত্র তোমার কররেখা পরীক্ষা করিয়া সমস্তই জানিয়াছি, আমাকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিয়ো না। আরও শুনিতে চাও? তুমিই কুখ্যাতা মন্থরা। রামতিরোধান দিবসে রাত্রিকালে স্বর্ণসীতা মূর্তি নষ্ট করিতে গিয়া তুমি শিল্পী বিশাখদত্তের নিকট বাধা পাইয়া অজ্ঞান হইয়া যাও। শিল্পী একটি চর্মদৃতির মধ্যে স্বর্ণসীতাকে ভরিয়া উহা অপহরণ করিবার মানসে অনুচরদিগকে ডাকিতে যায়। ততক্ষণে অমাত্য ভদ্র আসিয়া তাহার দৃতিমধ্যস্থিতা সীতা-প্রতিমাকে বাহির করিয়া সেই দৃতিমধ্যে হতচেতনা তোমাকে ভরিয়া দেন। অনতিকাল পরে বিশাখদত্তের অনুচরেরা তোমাকে শিবিকাযোগে ও নৌকাযোগে অযোধ্যা হইতে অদূরে ক্ষীরগ্রামের বনমধ্যস্থ দেবী-মন্দিরে পরিত্যাগ করে। সেখানে তুমি পুরোহিত ব্রাহ্মণ উচ্ছিখকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া পিতামহী পরিচয়ে তাহাকে লইয়া দেশভ্রমণে নির্গতা হও। তোমার মুক্তাশুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি তক্ষশিলার তোমার গাত্রবর্ণ ও কৃষ্ণকেশ মায়ানগরের, তোমার পদ্মপলাশলোচনদ্বয় অবন্তীনগরের অভাগিনী উৎপলার—তোমার যৌবন"—

আর বলিতে হইল না, ভদ্র আর কি বলিবেন নিজেই জানিতেন না, মন্থরা তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, বলিল, "পিতঃ, আপনি সর্বজ্ঞ। আমার হরণ ব্যাপারের যে বিবরণ আমি নিজে জানিতাম না তাহাও আপনি জানেন দেখিতেছি। উৎপলার চক্ষু এবং চন্দনার যৌবন আমি অর্থমূল্যে ক্রয় করিয়াছি, তাহাদের চির-দিনের জন্য দারিদ্র্য ঘুচাইয়া দিয়াছি তাহাও আপনি নিশ্চয় জানেন। কাশীরাজকে মোহিত করিয়া আমি রাজরাণী হইবার আশা রাখি, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, আশীর্বাদ করিতেছি তুমি রাজরাণী হইবে। তবে তোমার চতুর্দিকে শত্রু, বুঝিয়া চলিবে। যদি কখনও বিপদে পড়ো আমার সাহায্য লইবে, অপরন্তু আমার শত্রুতাসাধন করিবার চেষ্টা করিলে স্বয়ং যমরাজও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না জানিয়ো। এখন যাও, অনেক দর্শনার্থী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

মন্থরা কাতরভাবে বলিল, "পিতঃ, আমার গুপ্ত কথা প্রকাশ হইলে সর্বনাশ হইবে, আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

সন্ন্যাসী সস্নেহে বরাভয়হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন "পাগলী, আমার দ্বারা কোনও কথা প্রকাশিত হইবে না. তোর ভয় নাই। যাহা করিয়াছিস করিয়াছিস, আর কাহারও ক্ষতি করিস না।"

মন্থরা অনুচরীদের লইয়া চলিয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাকালে বারাণসীর লক্ষ্মীকুণ্ডের একটি প্রাসাদশিখর হইতে অমাত্য ভদ্রের দ্বিতীয় পারাবত কুশাবতীতে পত্র বহন করিয়া লইয়া গেল, 'মন্থরার সন্ধান পাইয়াছি। সে যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে, কাশীর রাজমহিষী হইবার চেষ্টায় আছে। শীঘ্রই নিজের জালে নিজে জড়াইবে আশা করি। আমার প্রত্যাবর্তনের অধিক বিলম্ব নাই। স্বামী রামানন্দ, লক্ষ্মীকুণ্ড।"

পত্র প্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে মহারাজ কুশ কয়েক-জন বিশ্বস্ত অনুচরকে অমাত্য ভদ্রের সহায়তার জন্য পাঠাইলেন। তাহারা কেহ শিষ্যরূপে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী সাজিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে রহিল, কেহবা গৃহস্থ ভক্তরূপে তাঁহার আশ্চর্য জ্যোতিষজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। ভদ্র কিন্তু অতঃপর কিছুদিন আর বাটীর বাহির হইলেন না, মন্থরা কয়েকবার গঙ্গাস্নানে আসিয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। বলা বাহুল্য, পাপীয়সী সেই সর্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর শক্তির

পরিচয় পাইয়া ভীতা হইয়াছিল। সুব্রতী একদিন একা স্নানে আসিয়াছিল, সেদিন একটি মুণ্ডিতশির ভিখারীকে পথপ্রান্তে ভিক্ষা দিতে গিয়া শুনিল, "লক্ষ্মীকুণ্ডের রামানন্দ স্বামীর মতো জ্যোতিষী এযুগে দেখা যায় না।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাসী বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই ভিখারী হাসিয়া বলিল, "তিনি লোকসমাগম ভালোবাসেন না। একা দ্বিপ্রহরের পর গেলে দেখা হইবে।" সুদতী অমাত্যকে চিনিল, চক্ষুর ইঙ্গিতে সাবধান হইয়া তখন কিছু প্রকাশ করিল না। দুই দিন পরে সুযোগ বুঝিয়া একদিন তাঁহার বাসস্থানে গিয়া সাক্ষাৎ করিল, আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল; তাঁহার নিকট পরামর্শ ও পুরস্কার গ্রহণ করিয়া বিদায় লইল।

ক্রমশঃ

আজ

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
(Thomas Carlyle, 1795-1881.)

এখানে এভাবে ভোর হয়ে গেল
আরেকটি ভালো দিন :
ভেবে ভাখো তুমি বৃথা চলে যেতে
দেবে কি অর্ব্বাচীন ?
অসীম কালের মাঝ থেকে এই
এসেছে দিবস নব ;
অসীম কালের মাঝে ফিরে যাবে
নিশা এলে নিষ্প্রভ।
নয়ন মেলিয়া দেখে নাও একে
ভাখে নি যা কোনো আঁখি ;
শীঘ্র লুকায়ে যাবে চিরতরে
সব আঁখে দিয়ে ফাঁকি।
এখানে বেশ তো ভোর হয়ে গেল
আরেকটি ভালো দিন :
ভেবে ভাখো তুমি বৃথা চলে যেতে
দেবে কি অর্ব্বাচীন ?

পত্র-সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য

চিঠিপত্রের সহিত প্রয়োজনের অভিন্ন সম্পর্ক এবং প্রয়োজন মানুষের বৈষয়িক কাজকর্ম লইয়াই হইয়া থাকে। সংবাদ আদানপ্রদান, টাকা পয়সার লেনদেন অথবা কুশলবার্তা বিনিময়—এইগুলিই ছিল চিঠিপত্রের প্রথম উপজীব্য, যতদিন পর্যন্ত পত্র সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের খাঁটি উদ্ভব যেদিন হইতে, তাহার বহু পূর্ব হইতে এই শ্রেণীর পত্রবিনিময় ডাক-বিভাগের উৎপত্তির অনেক আগে হইতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু একমাত্র গবেষণার প্রয়োজন ব্যতীত সেই পত্রপত্রিকার পঞ্জিকাকে সাহিত্যের দরবারে আনিবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত কেহ করেনও নাই, করিবার কোন হেতুও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, পত্র যেখানে নেহাৎ প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ব্যক্তিগত বার্তা-বিনিময় অথবা প্রেম-নিবেদন অথবা পাত্র-পাত্রীর ঘটকালি অথবা বৈষয়িক ব্যাপারের নির্ঘণ্টরূপে উপস্থিত হয় সেখানে সে পত্রের মূল্য প্রাপ্তির সাথে সাথেই নিষ্পত্তি হইয়া যায়—সহৃদয় সামাজিকের জন্য আর বিশেষ কিছু অবশেষ থাকে না। থাকে না বলিয়াই উহারা পত্র, সাহিত্য নয়। পত্র সাহিত্য হইয়া উঠিল সেইদিন হইতেই যেদিন লেখক লেখার ফাঁকে ফাঁকে সংবাদ ছাড়াও কিছুটা 'ফাউ' দিতে শিখিল। সংবাদটা প্রাপকের একার জ্ঞাতব্য-বিষয়, কিন্তু 'ফাউ'টা প্রাপকের একার নহে; উহাতে আমাদেরও ভাগ রহিয়াছে। এই 'অধিকন্তু'টুকুই সাহিত্য;—উদ্দিষ্ট জনের সহিত ইতর জনের সহযোগে একের 'সহিত' অপরের ভাল-লাগা নিবিড় হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর পত্রসাহিত্য বাংলায় বিরল হইলেও ইউরোপ ভূখণ্ডে যে ভূরি ভূরি আছে এমত মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেখানে 'মেময়ার্স্' ও 'ডায়ারী'রই প্রাধান্য। Belles-Lettres কথাটির মধ্যে Lettres থাকিলেও আসলে উহারা পত্র নয়, সাহিত্যকে সুখপাঠ্য করিবার একরূপ রম্য-শৈলী। হয়তো পত্রকে রচনা-গৌরবে ভূষিত করিবার প্রতি একরূপ তাচ্ছিল্যবোধ অথবা অযথা সময়ের অপচয় বোধে একরূপ রূঢ় সংযম ইংরেজ লেখককে জড় করিয়া রাখে, movementএর-গতি সেখানে স্তব্ধ। রাজকীয় ব্যাপারাদিতে কি ওদেশে কি এদেশে পত্র-সম্ভাষণ মাত্রই হয় উচ্ছ্বাসের অতিশয়োক্তিতে ভরপুর নয়তো যশঃকীর্তনের প্রলাপে উন্মাদিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য, বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন ও চতুর্দ্দশপদী কবিতার উদ্ভাবক, প্রচারক ও পথিকৃৎ কিন্তু পত্র লেখার বেলায় ঋজু ইংরেজ। হয় অতি 'অহং', নয় অতি তাচ্ছিল্য। ফলে, মধুসূদনের পত্রগুলিকে স্মৃতিরূপে রক্ষা করা যায়, সাহিত্যরূপে আস্বাদন করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বিরাট্ কিন্তু পত্র-রচনায় সঞ্জীবচন্দ্র আমাদের আপন জন। বিবেকানন্দের পত্রাবলী বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখে। বিবেকানন্দ ও বিবেকানন্দের পত্র, একে অন্যের পরিপূরক। এককে জানিতে হইলে অপরের প্রয়োজন, আবার অপরের মধ্যে একের পূর্ণ পরিচিতি। কিন্তু সাহিত্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিবেকানন্দের পত্রাবলী উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ধর্মব্যাখ্যায় এত ভরাট যে সাহিত্যরসপিপাসুর পক্ষে আস্বাদন সর্ব্বত্র সহৃদয় হইয়া উঠে না। উহাতে যেন একরূপ 'বিশেষে'র নিষেধ রহিয়াছে। বিশেষ ভাবের, বিশেষ মনের, বিশেষ অবস্থায় বিশিষ্টজনের যাহা আস্বাদনীয়। সর্বসাধারণের জন্য রহিয়াছে শুধু নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদনের মিশনারী আবেদন। আবার, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর সহিত দমদম জেলের রাজবন্দী অরবিন্দের পত্রাবলীর রহিয়াছে সমান্তরাল ভেদ।

বিপরীত নয়, কিন্তু ভিন্ন জাতের। অথচ উভয়েই অপূর্ব। বিশেষ করিয়া সংসার ত্যাগের পূর্বে স্ত্রীকে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি আত্ম-নিবেদন ও আত্ম-বিশ্লেষণের আন্তরিকতায় তুলনারহিত। শরৎচন্দ্রের পত্র রচনা আস্বাদনে ও মর্মঘনিষ্ঠতায় সাহিত্য হইয়াছে নিঃসন্দেহে কিন্তু কোথায় যেন 'কী একটা' ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। আর যাহাই হউক, শরৎ-সৃষ্ট সাহিত্য ও শরৎ-লিখিত পত্র সমান আস্বাদনীয় নয়। অত্যাধুনিক কালে পত্ররচনার বাহুল্য দেখা দিয়াছে যেমন, বাতুলতারও প্রশ্রয় বাড়িয়াছে তেমনি। যতটা সাজে ততটা দেখায় না; যে পরিমাণে শোনায়, সে পরিমাণে ভাবায় না।

এইদিক্ হইতে দেখিতে গেলে পত্ররচনার একটি সাহিত্যিক ধারাক্রম বজায় রাখিয়াছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র-রম্যতা জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া আসিয়া সংস্রোৎ-সারিত হইয়াছে কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথে।

রবীন্দ্রনাথের পত্ররচনার হাতে-খড়ি মায়ের জবানীতে। তারপর ১৪।১৫ বৎসর বয়সের পত্রাবলী বিশেষ রক্ষিত হয় নাই। তখন লিখিবার কারণ ও ও সুযোগও বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ঘটিল ১৭ বৎসর বয়েসে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যান। স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশের অভিমুখে পাড়ি জমাইবার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র-যাত্রা, বিদেশে পদার্পণ ও অবস্থান পর্যন্ত সময়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের সদ্যোদ্ভিন্ন personality-তে যে চিন্তন, মনন ও দর্শন অভিজ্ঞতায় ধরা পড়িয়াছে তাহাই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' রূপে পরে প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট বড়ো মোট দশখানি চিঠি—জ্যোতিদাদাকে লেখা। লিখিবার সময় নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হয় নাই যে পত্রগুলি কখনো মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইতে পারে। তাই অপরিপক্ব মনের আনন্দ, বিস্ময় ও মন্তব্য অসংকোচে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিদাদা খুশী হইলেও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। এমন কি বহুকাল পরে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সাবালক রবীন্দ্রনাথ নাবালক রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলিকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই; কারণ ঐগুলিতে তাঁহার মতে "আত্মপ্রকাশ ঔদ্ধত্যের সীমায় এসে পৌঁচেছে।" "বুঝেছি যেদেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি।" তারপর অবশ্য অনেক অজুহাত দিয়া য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের স্বপক্ষে তিনি নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন: "এ বইটাকে আমি সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে বসাতে চাই, ইতিহাসের পঙ্‌ক্তিতে নয়।.........এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।......আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

তা আছে। কিন্তু আমাদের নিকট এই চিঠিগুলিতে যে বস্তুটি বেশী করিয়া ধরা পড়িয়াছে তাহা হইল "রবীন্দ্র-শৈলী"। যে শৈলী উত্তরকালে রবীন্দ্ররচনা-গুলিকে অলোকসামান্য সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করিয়াছে সেই শৈলী ঐ সতেরো বছর বয়সের কিশোরের চিঠিতেই ক্রমোদ্ভিন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাউক:—"আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারদিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হ'ক গে—ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও হয় তোমার চোখের জল থাকবে না নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।......... পর্বতের উপরে রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন

হয়ে পড়েছে।.........দেখো। সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। কিন্তু দেখো, এ-কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রণ পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে।......ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো চুল, কালো কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।.........সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর। অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হ'য়ে যেতে হয়। হোটেলে গেলাম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধকরি তেমনি অসোয়াস্তি হয়।"

উপরের উদাহরণগুলিতে বর্ণনার প্রসাদগুণ ও চিত্ররূপ এবং উহাদের বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে একরূপ রম্য কৌতুকপ্রিয়তা তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়, দর্শনের সাথে মননের এবং বক্তব্যের সাথে মন্তব্যের একরূপ স্বকীয় অভিব্যক্তি। উত্তরকালে রবীন্দ্ররচনাগুলিকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে এই গুণগুলিরই সুসম্পৃক্ত ঔচিত্য ও বৈদগ্ধ্যে তৎসহ লাগসই উপমা ও ভাষার সঙ্গীতময়তার সুপরিচিত সুপরিবেশনে। বেশীদূর যাইতে হইবে না, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের পর ২৩ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্রে'র মধ্যেই রবীন্দ্র-শৈলীর ঐ গুণগুলির আর-এক ধাপ উচ্চ পরিণতি দেখা যায়।

'......এখানকার আদবকায়দা আমার ভালো জানা নাই—সেইজন্য তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ, বা চিঠিপত্র আরম্ভ করিতে কেমন ভয় করে। আমরা প্রথম আলাপে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু শুনিয়াছি এখনকার কালে বাপের নাম জিজ্ঞাসা দস্তুর নয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বাবার নাম আমার অবিদিত নাই, কারণ আমিই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলাম। ভালো নাম দিতে পারি নাই—গোবর্ধন নামটা কেন দিয়াছিলাম তাহা আজ বুঝিতেছি। তোমাকে বর্ধন করিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িবে ভাগ্য-দেবতা তাহা জানিতেন।" 'চিঠিপত্র'—১।

কৌতুকপ্রিয়তার সহিত ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া বক্তব্যকে আরো জোরালো করিবার একটি দৃষ্টান্ত:

"তবে আর কী। তবে সমস্ত চুলায় যাক। বাংলাদেশ তাহার আম-কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাকুক। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ করো, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত করো, ইংরেজি পড়া একেবারেই বন্ধ করো, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাকো। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়ো, কোন্ দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা করো। দালান, ভাবালুতা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘমধ্যাহ্ন অতিবাহিত করো। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষ্য পদার্থ করিয়া রাখো।" 'চিঠিপত্র'—৮।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনা-গৌরব লাভ করিয়াছে "ছিন্ন-পত্র" ও "জাভাযাত্রীর পত্র"। "ভানুসিংহের পত্রাবলী" আর একটি সুপরিণত সংযোজন।

ছিন্নপত্রের লিখন কাল ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৫ খৃঃ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের তখন পূর্ণ যৌবন। অধিকাংশ চিঠি লিখিত হইয়াছে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে।

সামান্য কিছু কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনোভাব কি দেখা যাউক।

"তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয় নি। ...যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরো অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।"

যে কোন সৃষ্টিকর্মের গোড়ার কথাই হইল এই। "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।" রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অনায়াস ঋজুতা ও আনন্দ, ইন্দিরার সপ্রতীক্ষ আস্বাদনের নির্বিরোধিতা উভয়ে মিলিয়াই ছিন্নপত্রের পঙ্‌ক্তিগুলিতে এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। এই পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের সকল প্রমূর্তি ধরা পড়িয়াছে। কোথাও সরস কৌতুকপ্রিয়তা, কোথাও নিসর্গপ্রীতি, কোথাও উদাসী মনের কাব্যকূজন, আবার কোথাও অপলক নেত্রে দৃশ্যের পর দৃশ্য শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখা।

"ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি—তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করিনি। অর্থাৎ আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশী ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল।.........কিন্তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি, বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বার করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এতো হারিয়েছে এবং এতো ফের পাওয়া গেছে এবং এতো পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্য এতো চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোন ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি।.....ক্রমে ঠাণ্ডা, তারপরে মেঘ, তারপরে নদিদির সর্দি, তারপরে বড়দিদির হাঁচি, তারপরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনকন, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার ভার, এবং ঠিক তারপরেই দার্জিলিং।" ছিন্নপত্র —১নং।

চিঠির এই মেজাজ সংলাপী রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয় আমুদে মনটির এক type। এইরূপ ঢঙে লিখিতে বলিতে রবীন্দ্রনাথ যেন খুব মুক্তি অনুভব করেন। নইলে, যেখানে তিনি মন্তব্য করেন "Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এরকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারিনে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা—কুটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।"—৪নং।

অথবা, 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে 'কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে—সেইজন্য হাতি কমিক, উট কমিক জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক।"(৪৭ নং)—সেখানে তাঁহার বক্তব্য প্রশ্নাতীত নয়। এমন কি নিজের সম্পর্কেও যখন তিনি সাহিত্যিক মন্তব্য করেন তখন উহা সর্বসাধারণের নিকট গ্রাহ্য হইবে কি না তাহার অপেক্ষা তিনি করেন না। যেমন,

"আমি যত ইংরেজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌স্‌-এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশী করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই।......কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে।...... টেনিসন, সুইন্‌বার্ন্ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে খোদা ভাব আছে - তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না।"

ছিন্নপত্র—২৫১ নং।

কবির বয়স তখন ছাব্বিশ আর কবি কীট্‌সও ছাব্বিশ বছরের বেশী বাঁচেন নি। এই বয়সের দুরন্ত

প্রতিভাধর কবিরা যদি emotional এবং sensitive হন, কি প্রকৃতিরাজ্য কি মানবলোক এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির প্রতিটি প্রকাশের উৎসর্জনের মধ্যে আনন্দসম্ভোগের একটি স্ফূর্ত লাভ করেন তবে অন্তরে অন্তরে সাযুজ্য লাভ সহজ হইয়া আসে। তাই কীট্‌স্‌ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আন্তরিক হইলেও সর্বকালীন ভাবিবার কোন হেতু নাই। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য ছিল বলিয়াই মাঝে মাঝে তাঁহার এইরূপ উক্তি ও মন্তব্যের মধ্যে রক্তমাংসের একরূপ ঘরোয়া মানুষটিকে পাই, যে খোলা মনে যাহা আসিল তাহাই বলে, অনেক কিছু ভাবিয়া বলে না—অতিথির সামনে অাঁটসাটো না হইয়া আটপৌরে প্রকাশ পাইতে লজ্জা নাই। অথচ, বৃহত্তর রবীন্দ্ররচনাবলী এতই অাঁটসাটো, এতই সচেতন প্রজ্ঞায় সুসম্বদ্ধ যে গবেষণা করিয়াও তাহার ভিতর ফাঁক খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। এমন কি যে সব রচনায় ফাঁক থাকিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইত সেগুলির প্রকাশে বা পুনর্মুদ্রণে তিনি বড়ো বেশী খুঁৎ খুঁৎ করিতেন। যাহা ক্ষণিক, যাহা সাময়িক, যাহা বুদ্‌বুদের মতো কোন কারণবশতঃ মনে ভাসিয়াই মিলাইয়া যায় তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন শ্রদ্ধা নাই। সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন। এক প্রথম দিক্‌কার দু'একটি চিঠিপত্রে কিছু কিছু অসাবধানতা থাকিলেও সমগ্র রবীন্দ্রনাথের আর কোথাও তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথের বীক্ষণশক্তি চমকপ্রদ। সাধারণভাবে যাহা দেখা যায় বা ভাবা যায় উহার নশ্বরতার ভিতর হইতে আসল সত্যটি উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যান করিতে তাঁহার জুড়ি নাই। উহা যেন অনেকটা হারানো সত্যকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবার তৃপ্তি-চমক। ধরা যাউক, উপরে উদ্ধৃত Anna Karenina,—টলস্টয়ের সেই বিখ্যাত বিশ্বনন্দিত উপন্যাসটির সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যটি। বইটিকে তিনি বিশ্রী ও sickly বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহা সত্য নয়। ইহা তাঁহার কোন কারণবশতঃ বিশেষ mood-এর reaction কিন্তু সত্য-মন্থনে যখন তিনি বীক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন তখন হারানো সত্যটিকে নিখুঁত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ছিন্নপত্রেরই ৮নং চিঠির এক যায়গায় তিনি লিখিতেছেন, "যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।...... যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হ'তে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশী নেই।" রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যান typical রাবীন্দ্রিক এবং হঠাৎ চমক লাগানো যে সত্যটি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে উহাই Anna Karennina গ্রন্থটির মর্মকথা। এইরূপে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যে আপাতবিরোধিতা যদি কিছু ধরা পড়ে তো রবীন্দ্রনাথের সমুদ্র-মনেই তাহার সুষ্ঠু সঙ্গমপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা রবীন্দ্রসাহিত্যে এক বিশেষ আলোচ্য দিক্‌। এ সম্পর্কে তাঁহার অনেক রচনা রহিয়াছে যেখানে তিনি অতি সাবধানে এবং নির্ভয়ে তাঁহার স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। চিঠিপত্রের মাঝেমাঝে তাঁহার স্বদেশচিন্তার কিছু কিছু প্রতিফলন চক্‌চক্‌ করিয়া উঠে এবং এ কথা না ভাবিয়া উপায় নাই যে অপরাপর অজস্র চিন্তার মধ্যে স্বদেশচিন্তাও রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে অনুক্ষণ উঁকি মারিত। কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তাগুলিকে পোশাকী বলিয়া পাশ কাটাইয়া যান। কিন্তু নিজের লোকের কাছে চিঠিপত্রে যখন তাঁহার চিন্তার ধারাগুলি ধরা পড়ে তখন উহাকে অকপট না ভাবিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে ছিলেন না ঠিক, রাজনীতি লইয়া কারবার করিবার অভিপ্রায় বা অভিমানও তাঁহার ছিল না, কিন্তু স্বদেশ সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাগুলি তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মতোই সত্য ও

নর্ভেজাল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাক ছিন্নপত্রের ।নং চিঠির একাংশ : "এদেশে এসে আমাদে সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি-সত্যি আমার মা ব'লে মনে হয়।......সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তাহলেই আর কিছু চাই নে।" অথবা, ৭৭নং - "একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। তারা স্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে।.........এক এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়। ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয় কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছু করছে না বলে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্র নেই—কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেখম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিম্বা হীনতা অনুভব করে না।.........এরা মনে করে কন্‌গ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গবর্ন্‌মেন্টের দোহাই পেড়ে বড়লোক হবে।"

ছিন্নপত্রের বহু চিঠি লেখা হইয়াছিল উত্তরবঙ্গের পদ্মাবক্ষ এবং তৎপার্শ্ববর্তী জমিদারি কুঠিবাড়ী শিলাইদহ ও সাজাদপুর হইতে। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচিত কবিতা, ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনায় পদ্মা, শিলাইদহ ও সাজাদপুরের দিনযাপনের প্রভাব অপরিসীম। এই সময়কার কাব্যে ও গল্পে মর্তলোক যেভাবে মূর্ত হইয়াছে এমনটি আর কখনো হয় নাই। ছোটগল্পের সংসারের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি এই সময়কার অভিজ্ঞতার ফল। উদার আকাশ, অসীম বায়ু, বৈশাখী ঝড়, অফুরন্ত নদী, অবাধ বিশ্ব ক্ষণে ক্ষণেই কবির মনে লুটোপুটি খেলিয়াছে। ১৩ নং চিঠি : "ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি—ওর এই গাছপালা নদীমাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত।"

১০ নং চিঠির সৌন্দর্য্য বহু কবিতায় অপূর্বভাবে লীলায়িত হইয়াছে : "সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হ'য়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। চারিদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষপ্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হ'য়ে উঠল—নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল—মনে হল ঐখেনে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো করে প্রতীক্ষায় বসে থাকে এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্‌গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে।"

১০নং চিঠির চিত্র অনেক ছোটগল্পে আঁকা হইয়াছে : "গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল-শূন্য মাটির দেয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা তিনেক ছাগল চরছে, গোটা কতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে নদী পর্যন্ত গড়ানে কাঁচা ঘাটে, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে, কোন কোন লজ্জাশীলা আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদার-বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে..."

'জমিদারবাবু'র প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন জমিদারি পর্যবেক্ষণের শিক্ষানবীস করিতে। কিন্তু জমিদার বাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্যটি তাঁহারই নিজের মুখে শুনা যাক।........."সেখানে ঘন্টাখানেক

গ্রহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়।......এই সমস্ত ছেলেপুলে গোরু-লাঙল-ঘরকন্নাওয়ালা সরল-হৃদয় চাষাভূষোরা আমাকে কী ভুলই জানে। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।...... Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস।"—১৫নং। জমিদারবাবুর খোলসের ভিতর হইতে কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ কত সহজে সকৌতুকে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সংসারে প্রচলিত ও করণীয় সংস্কারগুলির উপর রবীন্দ্রনাথের টীকাটিপ্পনি আচমকা যে নূতন সত্যের চমক সৃষ্টি করে উহা রবীন্দ্রশৈলীর একটি বিশেষ লক্ষণ। Prestige-এর এই নূতন ব্যাখ্যান বিতর্কের সৃষ্টি করিলেও বিভ্রান্তির কোন কারণ নাই।

"ভানুসিংহের পত্রাবলী" রবীন্দ্রনাথের পত্রধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'চিঠিপত্রে'র শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ এবং 'পত্রাবলী'র ভানুসিংহ একই ব্যক্তি, বয়সান্তর মাত্র। চিঠিগুলি লেখা হইয়াছিল একটি বালিকাকে। "সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।"

রবীন্দ্রনাথের উপরে উদ্ধৃত ভূমিকাটি একটু আলোচনা করা যাউক। চিঠিগুলি লেখা হইয়াছিল ১৩২৪ সাল হইতে ১৩৩০ সালের মধ্যে। কিন্তু ভূমিকা লেখা হইয়াছে ১৩৪৫ সালে অর্থাৎ ১৫ বৎসর পরে। রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত তাঁহার ভূমিকার সর্বত্র মিল নাই। লিখিবার তাগিদ আসে, তিনিও কিছু লিখিয়া দেন, নিজের লেখা সম্বন্ধে একটা idea থাকে, বাস্—ঐ পর্যন্ত। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে আর যাহাই থাকুক—"শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি" আদৌ নাই। কেহ যদি শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু জানিতে আগ্রহী হইয়া পত্রাবলী খুলিয়া বসেন তো তাঁহাকে ক্ষুব্ধ মনে হতাশাকে দমন করিতে হইবে। আবার ভূমিকার শেষে বলা হইয়াছে "তাকে কোনো শান বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই"। ইহ'ও সত্য নয়। প্রমাণ—পত্রাবলীর ১১নং চিঠি।

"......আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোট আর বড়ো—দুই-ই আছে। সেই ছোট মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়েকদিনের জন্যে আপনার একটি ছোট সংসার পেতেচে—সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেচে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর দুটি আবর্তন আছে—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘুরচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায় যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোট আবর্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি,

তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথের সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকবে, আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চলবে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে যে, আমি যা পাই বা আনি, সব আমি নিজে জমাব, তাহলেই বিপদ্ বাধে—কেননা, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত ধরে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তার সোনায় ভরা সকালটিকে এবং সোনায় ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মতো আপন সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেচে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালোবাসাকে চিরদিনের চলবার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে—তাহলেই ছোট-আমির সঙ্গে বড়ো-আমির মিল হবে, তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টানতে গেলেই সে-টান টেকে না, সেই বিদ্রোহে ছোট-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এইজন্যে ছোট-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করচে নমস্তেঽস্তু, বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই।"—এই চিঠিটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল শুধু প্রমাণের খাতিরেই নহে—ইহা একটি অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া। তদুপরি, ইহাতে যে বক্তব্য রাখা হইয়াছে উহা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সম্যক্ অনুধাবন করিবার একটি অব্যর্থ কবচ। রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' ও 'ধর্ম' নামক উপাসনা-গ্রন্থগুলিতে যাহা বলিয়াছেন তাহার বহুপূর্বেই লিখিত এই পত্রে রবীন্দ্র-দর্শনের গোড়ার কথাটা কী চমৎকার বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এই চিঠিটি "শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ" করা হয় নাই এরূপ মনে করা সত্যের অপলাপ মাত্র। বরং চিঠিটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ আরও কয়েকটি চিঠি ভানুসিংহের পত্রাবলীতে শোভা পাইয়াছে যাহা বর্ণনায় ও বক্তব্যে অপূর্ব।

শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার অন্য কোন ছবি না থাকুক, ঋতু পরিবর্তনের পালাবদলের ছবি ভানুসিংহের পত্রাবলীতে ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই আবহাওয়ার খবর। বিশেষ, ঝড়ের প্রসঙ্গ যখন আসে রবীন্দ্রনাথের লেখনী বাধা মানে না। ছিন্নপত্র ও ভানুসিংহের পত্রাবলীতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও হাসিতামাশা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিসর্গপ্রীতি অজস্রধারায় উৎসারিত হইয়াছে। হাসিতামাশা অর্থাৎ কৌতুকপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সংলাপে ও চিঠিপত্রে এই ক্ষেত্রটি উর্বর হইয়া উঠে। উদাহরণ স্বরূপ 'পত্রাবলী'র ২৮নং চিঠির উল্লেখ করা যাক। "আজ দুপুরবেলায় যখন খেতে বসেছি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নি কী খাচ্ছিলুম—খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি—কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ ধরে নেও তাহলে আমার টুকরোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাট্‌নি আর একটা তরকারিও ছিল। যাহোক, বসে বসে রুটি চিবোচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নি রুটি, ডাল, চাট্‌নি এল কোথা থেকে।—তুমি বোধহয় জানো, আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন গুজরাটি ছেলে আছে—আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি, এমন সময় দেখি, একটি গুজরাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক, নিচের ঘরে টেবিলে বসে বসে রুটির টুকরো ভাঙচি আর খাচ্চি, আর তার সঙ্গে একটু একটু চাট্‌নিও মুখে দিচ্ছি, এমন সময়—রোসো, আগে

বলে নি, খাবার কী রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হত তাহলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠত না, মজুর ডাকতে হত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল যে, খেলে-যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্ছি, এমন সময়—রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেছি, দুটো পাঁপর ভাজাও ছিল......সেই পাঁপর মচ মচ শব্দে খাচ্ছি, এমন সময়—রোসো, মনে করে দেখি সে সময়ে কে উপস্থিত ছিল ....." । এমনি করে 'এমন সময়—রোসো' বলিতে বলিতে suspense-এর যখন চূড়ান্ত তখন জানা গেল "ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।" চিঠি শেষ। বৃদ্ধ বয়সে 'প্রহাসিনী'র এক যায়গায় কবি লিখিয়াছেন:

হাসি-তামাশারে আমি কব হ্যাবলামি।

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি॥—

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য প্রমাণ মজুত রাখিয়াছে।

এইবারে আসা যাউক 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'। রবীন্দ্রনাথের 'জাভা-যাত্রীর পত্র' অপরাপর পত্রের মতো বিশুদ্ধ পত্রও নহে, বিশুদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীও নহে, বিশুদ্ধ প্রবন্ধও নহে; কিন্তু বিশুদ্ধ রচনা-সাহিত্য। রাশিয়া ও জাপান ভ্রমণ করিয়াও রবীন্দ্রনাথ বড়োবড়ো বহু চিঠি লিখিয়াছেন কিন্তু সেই সব চিঠিগুলিতে তৎ তৎ দেশের বৈশিষ্ট্য ও এতদ্দেশীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনামূলক আলোচনা, ভালোমন্দ ইত্যাদি স্থান পাইয়াছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ কখনো free-lance সংবাদ-প্রেরক, কখনো মর্ম-সুন্দর পর্যটক। কিন্তু 'জাভা-যাত্রীর পত্র' অনেকটা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমজাতীয়। অর্থাৎ, পত্র যাহাকেই লেখা হউক না কেন, বিষয়বস্তু যাহাই থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু বেশী করিয়া পাই কেবল রবীন্দ্রনাথকেই। এবং এইরূপ রবীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠ করিয়া পাইবার লোভ তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি অন্তরঙ্গ মহলের যত অধিক, পত্রের মাধ্যমে নিজেকে একটু এলাইয়া দিবার খুশিটুকু রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কম নহে। জাভাযাত্রীর ২নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "দরকারের উদ্দেশ্যে যে লেখা সেটা হিসাবি লেখা, আর নিজের জন্য যে লেখা সেটা নেহাৎ-ই বকে-যাওয়ার লেখা। নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের তৃপ্তি পায়।"

কিন্তু এইখানে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই "বকে-যাওয়ার লেখা", অন্যত্র যাহাকে তিনি "বাজে কথা" বলিয়াছেন, উহা শুনিতে যাহাই লাগুক, আসলে উহাও একরূপ সৃষ্টি। তিনি যখন বকিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে পত্র লিখিতে বসেন তখন কি উদ্দেশ্যে লিখিতে বসিয়াছেন বা কাহাকে লিখিতেছেন তাহা সুকৌশলে ভুলিয়া গিয়া কি ভাবিতেছেন অথবা কি ব্যাখ্যা করিতে চাহেন সেই ধ্যান-অনুধ্যান লইয়াই বকাবকি শুরু করিয়া দেন। সেইজন্য এই শ্রেণীর পত্ররাজির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কিয়দংশ আড়ি পাতিয়া অনেকটা দেখিয়া লওয়া যায়। ইহাতে একটা সুবিধা এই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যাংশে যে-'আমি'-টি রূপকের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে তাঁহার পত্রাংশে সেই 'আমি'-টির গতিবিধির একটা সুস্পষ্ট হদিশ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কাব্যের মধ্যে বীজরূপে এক ছড়াইয়া-পড়া বহু-রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়েই পত্রের মধ্যে বীজরূপে এক-রবীন্দ্রনাথে সংহত দেখি যেন 'অরা ইব রথনাভৌ'।

ভাবের সহিত ভাবনা, চিন্তার সহিত চিত্র, দর্শনের সহিত দৃশ্য একের পর এক গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যে পত্রগুলি তিনি লিখিয়া চলেন তাহার চলচ্ছক্তি এক আশ্চর্য চমৎকারের সৃষ্টি করে। সেই 'চমৎকার' একদিকে যেমন সাহিত্য অপরদিকে তেমনি সুন্দর। তবে একথা বলিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথমবয়সের পত্ররচনার মধ্যে যে প্রাণধর্ম ছিল, যেমন ছিন্নপত্র বা ভানুসিংহের পত্রাবলী, তাঁহার পরিণত বয়েসের পত্ররচনায় সে ধর্ম

পালা-বদল করিয়াছে ভাবধর্মের সহিত। ৪নং চিঠিতে তিনিই ইহার জাবাবদিহি করিয়াছেন,—"প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতিদিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চলতে চলতে চারদিকে পরিচয় দিয়ে যওেয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজ হয় না। অথচ, একসময়ে এ শক্তি আমার ছিল। ......এখন বুঝি বা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশী"।—এই কম-দেখা এবং বেশী শোনাটাই জাভা-যাত্রীর পত্রের সাহিত্য-সুর। তাই জাভা-যাত্রীর পত্রে আমরা জাভাকেও বিশেষ পাই না, পত্রকেও না——কেবল 'যাত্রী'র মনের অনুরণনগুলির ধ্বনি শুনিতে পাই বিশেষ করিয়া। ১নং পত্রে যেখানে তিনি কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা শুরু করিয়াছেন সেখানে জিনিসপত্র, লোকজন, খুঁটিনাটি—এসব কিছু নাই—পরিপার্শ্বের অবাধ ও অকৃপণ যে সবুজের বন্যা প্রকৃতিকে আনন্দময় করিয়াছে তাহারই ভাব-বিশ্লেষণই হইতেছে চিঠির সমগ্রটা। এই সূত্রে কত epigram, কত মৌলিক ভাবনা, য়ুরোপের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কত কথা আসিয়া গিয়াছে, নাই কেবল 'যাত্রা' ও 'যাত্রী'র ব্যক্তি-বৃত্তান্ত। এই চিঠির সংক্ষিপ্তসার হইল এই-যে, হিসাব ছাড়াও একটা বাড়তি মুনাফা না থাকিলে যে হিসাবিজীবনটা দুর্ব্বিবহ হইয়া উঠে এই তত্ত্বটা হিসাবি লোকেরা বোঝে না। বোঝে না যে, পর্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। এই অপর্যাপ্ততা আছে য়ুরোপের জীবনে। তাহারা কেবল প্রভুত্ব করিয়াই প্রভাব বিস্তার করে নাই, প্রভুত্বের দ্বারাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রভুত্বের বিরাটত্ব য়ুরোপ লাভ করিয়াছে বিজ্ঞানের দ্বারা। কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে মানুষের অধিকারকে করিয়াছে ক্ষুণ্ণ। এইখানেই ঘটিয়াছে য়ুরোপের ধর্মচ্যুতি। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক্ হইতে দমন করে সেই সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক্ হইতে দূর করে সেই সাধনা বিজ্ঞানের। এই ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়। কিন্তু য়ুরোপে আজ বিজ্ঞানবুদ্ধির সহিত ধর্মবুদ্ধির অসহযোগ দেখা দিয়াছে।—এমনি করিয়া পত্রের পর পত্রে পত্রলেখক সুন্দর সুন্দর চিন্তা ও ব্যাখ্যানের জাল বুনিয়া গিয়াছেন। কখনো প্রকৃতির শোভা, কখনো মানুষের বোধ, কখনো সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি নানা বিষয় চিঠির বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ৫নং চিঠিতে মানুষের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে চমৎকার এক কথা তিনি বলিয়াছেন। মানুষকে কর্ম করিতেই হইবে। কিন্তু কর্ম কেবল মজুরির বোঝা হইয়া মানুষকে চাপিয়া মারিলে সেই কর্মের বন্ধন বড়ো নিষ্করুণ। ইহাই মানুষের শূদ্রত্ব। কী করিলে কর্ম হইতে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হালকা করা যায় ইহার মীমাংসা করিলেই এই শূদ্রত্ব হইতে মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে ৭নং চিঠি হইতেই জাভার লোকজন, রীতিনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যাহার খুঁটিনাটি বর্ণনার ভার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করিয়া কবি নিজে একটু দেখিয়াই অনেক ভাবিবার অবকাশ হাতে রাখিয়াছেন। উহারই ফাঁকে কেমন করিয়া যেন কবির ভাবনাকে ফাঁকি দিয়াই ৮নং চিঠিটি বাহির হইয়া গিয়াছে—যাহা একটি উৎকৃষ্ট অন্তরঙ্গ চিঠি, অনেকটা ছিন্নপত্র যুগের ঢঙে লেখা। ভাবে, ভাষায়, বাচনভঙ্গিতে একটি নিখুঁত পরিহাস-সুন্দর লিপি-শিল্প। "ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি......পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জন করতে করতে, গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জ্জন করতে করতে আমার ভ্রমণ—গলা চালিয়ে আমার পা চালানো।......বলে 'মেসেজ' দাও। 'মেসেজ' বলতে কী বোঝায় সেটা ভেবে দেখো......পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পাইকেরি প্রথায় পিণ্ডি দেওয়ার মতো—যেহেতু সে-পিণ্ড কেউ খায় না সেইজন্য তাতে না আছে স্বাদ, না আছে শোভা।"

জাভা, বালি প্রভৃতি ভারতের পূর্বপ্রান্তিক দক্ষিণের দ্বীপগুলির সাথে ভারতের সংযোগ আজ ছিন্ন হইয়া

গেলেও এককালে নিবিড় হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রীতি সর্বজন-বিদিত। সেই প্রীতির বিস্মৃত-বিস্ময় কবির সোহাগি মনকে বিপুল আবেগে আপ্লুত করিয়াছে। যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই প্রাচীন ভারত তাহার রামায়ণ মহাভারত, স্মৃতি শ্রুতি, কাব্য পুরাণ লইয়া কবির ভারত-সংস্কারকে মুগ্ধ করিয়াছে। দেশ ওলন্দাজদের (তখন তাই ছিল), দেশবাসীর অধিকাংশ মুসলমান—কিন্তু নটরাজের নৃত্যের সেখানে শেষ নাই। শিল্পসমারোহের বিচিত্র সম্ভার লইয়া এই দেশটি যেন কবির চোখে স্বপ্নালুতার মায়াঞ্জন পরাইয়া দিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত এখানে বিকৃত, পূজাপাবর্ণ-ক্রিয়াকর্ম, শ্রাদ্ধবিধি বা বিবাহ কিছুই হয়তো শাস্ত্রশুদ্ধ ভারতীয় নয়, কিন্তু যে শ্রদ্ধা, যে সমারোহ, যে শিল্প, যে রুচি দিয়া, সেগুলির অপূর্ণাংশকে ইহারা সুসম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে সেই নিষ্ঠা, সেই সংস্কৃতি-পরায়ণতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বালি-দ্বীপের প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা, 'এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের, যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেছে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন করে।" এদের গামেলান বাদ্য, ছায়াভিনয়, নৃত্যকলা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসব কবির কাছে বহুযত্নে আয়ত্ত করা একপ্রকার সুশিক্ষিত শিল্প প্রকাশ। তাহাকে অভিনন্দন না জানাইয়া উপায় নাই। তবে এই সঙ্গে কবির মন্তব্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হউক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত। এই-সব দ্বীপে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলিতেছে বহু ব্যয় আর বহু কাল ধরিয়া, আর বর্তমানকালকে বহন করিতে হইতেছে তাহার ব্যয় আপনার সর্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া। ইহাতে শুধু অতীতকালকে ধরিয়া রাখাই হয়, বর্তমানকালকে শক্তিশালী করা যায় না।

যে ভারতকে আজ আমরা দেখি, সুদূরকালে সেই ভারতের একটা বৃহত্তর পরিমণ্ডল ছিল। ভারতের বৌদ্ধধর্মই যে কেবল সেই পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাই নয়, ভারতের হিন্দুধর্মও তাহাতে যোগান দিয়াছে কম নয়। বোরবুদুর যেমন বৌদ্ধ শিল্পকলার লীলাপীঠ, জাভা বালির সাধারণ মানুষের জীবন ও রাজরাজড়াদের সংস্কৃতি ও রুচি তেমনি হিন্দুর সগোত্র। "মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এদেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্তমান। অর্জুন এদের আদর্শ পুরুষ।.........হিন্দুভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কী রকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অবিমিশ্রিতভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সাথে মিলে গিয়ে সে এক বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গিটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের।"

এত শিল্প, এত সজ্জা, এত আনন্দ তবু বিদায় নেবার প্রাক্‌কালে কবির মন ভারতের মাটির জন্য আকুলিবিকুলি করিতে থাকে। 'দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভাল, তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হ'য়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁছচ্ছে।... সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারিদিকে; তবু সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে।" ১২নং।

ভারত-প্রীতিই কবিকে ভারতের দৈন্য ও চিন্তাশক্তির অভাবের দিক্‌টার কথা বেশী করিয়া ভাবাইয়া তোলে। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গসুন্দর একটি ইতিহাস রচনা করিতে যে দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃতি এবং ভারতের প্রদেশে প্রদেশে অবলুপ্ত-প্রায় লোককাব্য, রীতিনীতি ইত্যাদির বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন আছে এবং এই দিক্‌টি যে একটি মৌলিক গবেষণার দিক্ তৎপ্রতি কবি সখেদ কৌতুকের সাথে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। "কোন এক সময়ে

কোন এক জার্মান পণ্ডিত এই কাজ করবেন বলে অপেক্ষা করে আছি। তারপর তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।" ১৬ নং।

জাভাযাত্রীর পত্র কেবল কবির ধ্যান-ধারণা, দৃশ্যবর্ণনা, শিল্প-সংস্কৃতিরই পরিচয় দানে সীমাবদ্ধ নয়। মাঝে মাঝে অল্প কথায় দু'একটি নিপুণ চরিত্রচিত্রণও আছে যাহা চিরদিন মনে রাখিবার মতো। উদাহরণতঃ কবির গাইড স্তামুয়েল কোপেরবেরূগের নাম করা যাইতে পারে। এই ডাচ লোকটির অমায়িক চরিত্রমাধুর্য এমন একটি সহজ সরল মিষ্ট আত্মীয়তার পরিবেশ সৃজন করে যাহাতে কবি তো মুগ্ধই, আমরাও মুগ্ধ না হইয়া পারি না।

"দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে প্রশস্ত। কখনো তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখিনি। সব সময়েই দেখেছি, নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেছেন। তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল, অথচ সেই রুগ্ন শরীরের জন্য কোনদিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জন সহ্য করেছেন কিন্তু তা' নিয়ে কোনদিন তাঁর কাছে থেকে নালিশ বা কারও নিন্দে শুনিনি। ইংরাজি ভাল বলতে পারেন না, বুঝতেও বাধে, কিন্তু কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটর গাড়ীতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন, কিন্তু যেই দেখলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরাজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান করে দিলেন। কিন্তু এখন এমন হয়েছে, তিনি সঙ্গে না থাকলে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয়, আমার তো ভালই লাগে না।"—এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরাও ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। জাভা-যাত্রার দৌলতে বাংলা সাহিত্য যাত্রীর নিকট হইতে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা উপহার পাইয়াছে, যথা—'সাগরিকা', 'বোরবুদুর', 'বিজয়লক্ষ্মী', 'সিয়াম' ইত্যাদি। তাহাছাড়াও autograph-এর সমাধানে দু'এক লাইন স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোক লিখিয়া দিবার হাতেখড়িও এখান হইতেই—পরে জাপান-যাত্রায় যাহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া তাহারও পরে 'লিখন' গ্রন্থে শ্রীমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুখরঞ্জন রায়ের খণ্ড কবিতাবলী

অজয়কুমার ঘোষ

"সুখরঞ্জন রায়ের (১৮৮৯—'৯৬৪) দক্ষতা ছিল গদ্য পদ্য দ্বিবিধ রচনাতেই।...আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রণী সমালোচকদের মধ্যে সুখরঞ্জন রায় ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।..." ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সং। পৃঃ ৮৮, ৯০।

অথচ সুখরঞ্জন রায় আজ একটি অদ্ধ-বিস্মৃত নাম। রবীন্দ্র-সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে কিন্তু এটি একটি বিশিষ্ট নাম ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম পথিকৃৎ সুখরঞ্জন ছিলেন মূলতঃ কবি। তাঁর কবিপ্রতিভা রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের ভাবা মণ্ডলের মধ্যেই লালিত ও বর্দ্ধিত হয়েছিল।

কবির জন্ম ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৬, মৃত্যু ২৩শে চৈত্র, ১৩৭০ সাল। সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসরকাল জীবিত থাকলেও বহুদিন আগেই তিনি কাব্যচর্চা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মাত্র তিনটি কবিতার বই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। "হিমানীর বর" নামে একটি ছোটগল্পের বই ছাপা হয়ে সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। ঢাকা বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর বেনামীতে তাঁর বহু নাট্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল বলে কবিপুত্র শ্রীমিহিররঞ্জন রায়ের কাছে শুনেছি। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "চলমান জীবন"—প্রথম খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় এর ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়; বিশেষ করে ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, প্রতিভা, প্রবাসী ও বিচিত্রা-তে তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য প্রকাশিত হয়ে সে যুগের শিক্ষিত সমাজে প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেছিল। সেগুলি সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের মূল্যবান্ সংযোজন রূপে গণ্য হবে। তাঁর "কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" নামে প্রবন্ধটি (উপন্যাসের প্রথম বিস্তৃত আলোচনা) যখন ১৩১৮ সালে 'প্রতিভা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তখন সেটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সেটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁরই নির্দেশে তৎকালীন 'প্রবাসী' পত্রের সহ-সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সুখরঞ্জনকে 'প্রবাসী'র সমালোচনা বিভাগে আমন্ত্রণ করেন। সেই অনুযায়ী সুখরঞ্জন "জ্যোতিঃপিপাসু" ছদ্মনামে 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনেক পুস্তকের সমালোচনা করেন।

প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসাবে খ্যাতির প্রসারের ফলে সুখরঞ্জনের কবি-খ্যাতি অনেক পরিমাণে ম্লান হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া পর পর প্রকাশিত তিনখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠকসমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করল না দেখে তিনি হয়ত খানিকটা অভিমানবশেই কাব্যচর্চা ত্যাগ করেছিলেন। সুখরঞ্জনের 'শুক্লা' (১৩১৭), 'মায়াচিত্র' (১৩১৮) ও 'আকাশপ্রদীপ' (১৩২১)—বিস্ময়কর স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এই কাব্য তিনখানি যথাক্রমে কবির কুড়ি, বাইশ ও তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের রচনা হলেও তাদের মধ্যে অজস্র সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অন্যত্র[১] বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত কাব্য তিনখানি রূপক আখ্যায়িকা মূলক কাব্য। বর্তমান নিবন্ধের বিষয় তাঁর খণ্ড

১। বর্তমান লেখকের "রবীন্দ্রযুগের কবি সুখরঞ্জন রায়"। (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৫ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।)

কবিতাবলী। তাঁর খণ্ড কবিতার কোন পৃথক্ বই প্রকাশিত হয় নি। বিশেষতঃ এজন্যই এই প্রবন্ধ লেখার কিছুটা প্রয়োজনও আছে বলে মনে করি। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু কিছু অপ্রকাশিত খণ্ড গীতিকবিতা কবিপুত্রের প্রচেষ্টায় নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তাঁর জীবিতকালে ১৯৬১ থেকে যে সকল খণ্ড কবিতা ভারতী, মানসী, নব্যভারত, ভারত মহিলা, বিচিত্রা ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার খুব অল্পই এ পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে। সেগুলির পুনরুদ্ধার কিংবা পুনর্মুদ্রণ ঘটলে কবির খণ্ড কবিতাবলী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যেত। কিন্তু তার অভাবে হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই এই আলোচনা করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এতে অনেক অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যাবে স্বাভাবিক কারণেই। একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আলোচিতব্য কবিতাবলী বহুকাল পূর্বেই লেখা। অধিকাংশই কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে।

সুখরঞ্জনের কাব্যবিচারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে তাঁর খণ্ড কবিতাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অপরিসীম রবীন্দ্রভক্তি ও রবীন্দ্র-প্রশস্তি-মূলক কবিতা (২) রোমান্টিক সৌন্দর্য-প্রেমমুগ্ধতা ও স্বপ্নচারিতার কবিতা, (৩) প্রকৃতির রূপ-চিত্রণ-নৈপুণ্য-মূলক কবিতা, (৪) রূপক-প্রতীক-তত্ত্বধর্মী অতীন্দ্রিয় ভাবব্যাকুলতার কবিতা, (৫) ঘরোয়া জীবনরস ও লঘুরসের কবিতা, (৬)শিশু সাহিত্য।

সুখরঞ্জনের কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হয়েছিল অপরিসীম রবীন্দ্রভক্তি। রবীন্দ্রভক্তি তাঁর রক্তে রক্তে, মজ্জায় মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তাঁর অজস্র রবীন্দ্রপ্রশস্তিমূলক কবিতা ও গদ্যরচনাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গদ্যের কথা থাক, রবীন্দ্র-প্রশস্তিমূলক কবিতা সুখরঞ্জন এত লিখেছেন যে এদের সংকলনেই ছোটখাটো একটি কাব্যগ্রন্থ হ'তে পারে। তাঁর গীতি-কবিতাগুলির শ্রেণীবিন্যাসে রবীন্দ্র-প্রশস্তি-মূলক কবিতাগুলি, আমার মতে, অবশ্যই একটি শ্রেণীতে পড়বে।২ এখানে মাত্র এবিষয়ক কয়েকটি লেখারই উল্লেখ করব।

সংকৃতি, ১৩১৩, বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত সুখরঞ্জনের 'আত্মীয় হতে আত্মীয়তর' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত। এ কবিতায় রবীন্দ্রভক্তির আন্তরিক আবেগ-তীব্রতায় কবিহৃদয় স্পন্দিত হয়েছে।—

"আত্মীয় হতে আত্মীয়তর থেকে থাকে কেউ পৃথ্বী 'পরে,
সে ছিলে তুমি গো, বলিব সে কথা বুকফাটা আজি আর্তস্বরে;
জীবনে তোমারে হয়নি জানানো ফোটফোট করি ফোটেনি মুখে,
মৃত্যুর তীর উত্তরি' আজি সে কথা তোমায় বাজিবে বুকে।

* * *

ওগো প্রিয়তম প্রাণের বন্ধু, শুনিবে কি ডাক ওপার হতে?
নিকট সুযোগ হেলায় হারায়ে মিলিবে কি ওগো সুদূর পথে?
অশ্রুজলের শিকল ছিঁড়িয়া-বাঁধা কি যায় গো আকাশ-বঁধু?
আর কিছু নয়, পাব না কি আজ বিদেহী তোমার দৃষ্টিমধু?"

কিন্তু তৎসাময়িক অন্যান্য রবীন্দ্রভক্তদের মতো তিনি

২। এবিষয়ে কালিদাস রায়ের উক্তি উদ্ধৃতি-যোগ্য।—"বাঙলা দেশে হিমালয়, গঙ্গা, তাজমহল যেমন কবিতার সাধারণ বিষয়বস্তু—রবীন্দ্রমহিমাও তেমনি কবিতার একটি বিশেষ বিষয়বস্তু। এই রসবস্তু অবলম্বনে অনেকেই অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন।"—(রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। যতীন্দ্রমোহন বাগচী। আশুতোষ লাইব্রেরী। ১ম সং ১৩৫৪, ২য় সং ১৩৫৬। পরিচায়িকা – কালিদাস রায়, পৃ. ।৶৹ দ্রঃ।)

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নি, তাঁর স্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার বশবর্তী হয়ে। তথাকথিত অন্ধ রবীন্দ্র-স্তাবকতায়ও তিনি যোগ দেন নি। পূর্বোক্ত কবিতারই এক স্থলে তিনি বলেছেন——

"কললাস্তের কেলি কল্লোলে যারা ঝাঁপ দিল
তোমার কোলে
যোগ দেই নাই মুখর নৃত্যে সাজায়ে অর্ঘ্য তাদের
দলে।
রুদ্ধজীবন খুলেনি ক দল স্নিগ্ধ তোমার আঁখির
নীচে,
আজিকে শতধা ফাটিয়া পড়ে তা পাষাণে পাষাণে
আছাড়ি মিছে।"

'কথা-সাহিত্য' পত্রের ১৩৭২ সালের .বশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "রবীন্দ্র স্মরণে" নামক গন্ত প্রবন্ধেও তিনি যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।—"এক সময় কবির আত্মীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ ঘটেছিল, তখন ইচ্ছা করলে কবির সঙ্গে আমার সাহচর্যকে অতি সহজেই নিবিড় করে তুলতে পারতুম। কিন্তু এই উত্তুঙ্গ প্রতিভার সংস্পর্শে যেতে নিজের হীনতা ও ক্ষুদ্রতার সঙ্কোচ কাটাতে পারিনি, দূর থেকেই পূজা যুগিয়েছি। তারপর নিজের কিছু নিয়ে কবিকে পীড়া দেওয়ার ইচ্ছা কখনো হয় নি। নিজ সম্বন্ধে এই বিপুল ঔদাসীন্য এবং নিশ্চেষ্টতার অনুতাপ এখন তীব্রভাবে অনুভব করছি। কবির সঙ্গে নিবিড়তর বাহ্য পরিচয়ে হয়ত জীবনে স্বকীয় পথ বেছে নিতে পারতুম, হয়ত তাঁর স্নেহদৃষ্টির আলোকে জীবনের রুদ্ধদল খুলে যেত, অন্তর্জীবন বিকশিত হয়ে উঠতো, তা এমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো না। সেই ব্যক্তিগত তীব্র বেদনা-বোধ নিয়েই অগণিত দেশবাসী এবং লক্ষ লক্ষ বিদেশীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, জীবনে যতটুকু সৌন্দর্যের বোধ, সত্যের উপলব্ধি বা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়েছে তার জন্যে আমি তাঁর কাছে সুগভীর ভাবে ঋণী।"

রবীন্দ্রনাথের ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে রচিত এবং 'বিচিত্রা' পত্রের বৈশাখ, ১৩৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত সুখরঞ্জনের "মহামানব রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতাটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

"ওহে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, তোমার ওড়ার বেগে
পাথরে পাথরে হ'ল পক্ষের উদ্ভেদ,
ভাস্বর জ্যোতিষ্ক, ওহে স্পর্শমণি, তব স্পর্শ লেগে
অঙ্গার হীরক, লৌহ স্বর্ণ-সে অক্লেদ।"

'শিক্ষক' পত্রে ১৩৭- সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "রবিপ্রণাম" কবিতায়ও তিনি বলেছেন—

"নিখিলের পূজা গীতসম হয়ে তব পায়ে পড়ে লুটে,
সারাটি ভুবন তব পদতলে শতদল হয়ে ফুটে;
সকলের সাথে মূক বনফুল তাহারো পূজাটি মিলালে
গোপন বনের আড়ালে।"

এ ছাড়া এই প্রসঙ্গে সুখরঞ্জনের "নমস্কার" (রবীন্দ্র-নাথের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত "রবীন্দ্র-মঙ্গলে" সংকলিত) ও "প্রতিভার যুগসূর্য অস্ত গেল" (শনিবারের চিঠি, কার্তিক, ১৩৪৮) কবিতা দুটির কথাও উল্লেখ করা যায়।

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। আসল কথা, এই আত্যন্তিক রবীন্দ্রভক্তি তাঁর কাব্যসাধনায় যেমন সহায়ক, তেমনি ক্ষতিকরও হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যরস-সমুদ্রে আজীবন নিমজ্জিত থেকে তিনি নিজের কাব্য-সাধনার প্রতি অজ্ঞাতসারে (বা জ্ঞাতসারেই) অনেক অবিচার ও অবহেলা করেছেন।

শুধু রবীন্দ্র-প্রশস্তি-মূলক রচনাই নয়, সুখরঞ্জনের বহু কবিতার ভাষায়, ছন্দে ও ভাবের দিক্ থেকেও সুস্পষ্ট রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ ভারতী, ১৩১৫, ৫৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর "বীরধাত্রী" কবিতার কথা বলা যায়। এতে রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"র "অভিসার" কবিতার ছন্দধ্বনি শ্রুতি-গোচর হয়। যথা:—

গৃহে গৃহে ধীরে নিবিয়াছে দীপ,
রজনী তিমিরলিপ্তা,
সুপ্ত রবাব নয়নে নয়নে

এসেছে আনায়ে লইয়া স্বপনে,

শুধু জাগিতেছে চমকিত মনে

পান্না সে ক্রোধ-দীপ্তা।—ইত্যাদি।

কিংবা সংহতি মাঘ ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত "রূপতৃষ্ণা" কবিতার—

"রূপের অতলে যাই যে তলিয়ে

দূরে সীমা যায় ছলিয়ে ছলিয়ে,

কূল তল নাই,

তবু হিয়া বলে যাই;

কভু পূরে মনো-অভিলাষ?"—অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির "রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি"—ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক, ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রতিভার যুগসূর্য অস্ত গেল" কবিতার অংশ বিশেষ প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের পূরবী কাব্যগ্রন্থের "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতাটির কথা মনে পড়ে। যথা:

"ধন্য ওহে করিলে ধূলিরে;

তোমার নয়ন-আলো দিলে ঝলসিত নদীনীরে,

নূপুর-নিক্বণ যত ঝরণার ঝলকে ঝলকে

সুচিক্কণ তৃণে তৃণে পল্লবের পলকে পলকে

শ্যামল হিল্লোল-গলা, বিথারিলে মনের হরষ

তরঙ্গিত ধান্যশীর্ষে, রেখে গেলে হিয়ার পরশ

হাওয়া উতরোল তালবনে, মালতীর মর্মমূলে

আম্রমঞ্জরীর যত গুঞ্জিত বাসরে; আজ দুলে

মৃত্যুহীন আনন্দ তোমার ধরণীর কোণে কোণে

ধূলিকণিকায় খোলা সুন্দরের নন্দনে নন্দনে

তীর্থে তীর্থে বন্দন-মুখর।"

রবীন্দ্র ভাবশিষ্য সুখরঞ্জন মূলতঃ মুখ্যতঃ সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক গীতিকবি। এই সৌন্দর্যমুগ্ধতার সঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা ও রহস্যময়তা স্বাভাবিক ভাবেই জড়িত মিশ্রিত হয়ে আছে। তাঁর প্রথম যৌবনের প্রকাশিত তিনখানি কাব্যগ্রন্থ (শুক্লা, মায়াচিত্র ও আকাশ প্রদীপ) রূপক-আখ্যায়িকা মূলক কাব্য হলেও, সেখানেও কবির স্বভাবসুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্য-প্রেম-রহস্যময়তাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। তাঁর খণ্ড কবিতাবলীতেও এই একই সুর বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। 'সংহতি' পত্রের অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুরের ব্যথা' কবিতার নিয়োদ্ধৃত অংশে কবির রোমান্টিক ভাববাদী সত্তার প্রকাশ ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে।

"সারা দেহে মনে এ কি আয়োজন,

স্থূল আবরণ টুটিবে কবে?

হিয়া-অতলের ব্যথা-কোলাহল

গীতিফুলে কবে ফুটিয়া রবে?"

'সংহতি', আশ্বিন, ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত "মানসী প্রতিমা" কবিতায় সুখরঞ্জনের রোমান্টিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানসী ও মানসসুন্দরীরই যেন প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই। যে মানসী প্রতিমা একদিকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তিনিই আবার দেহের সীমায় ধরা দিয়ে থাকেন। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর" অথবা "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা"—রবীন্দ্রনাথের ইত্যাদি বহুখ্যাত সংগীত পঙ্‌ক্তির কথা সুখরঞ্জনের এ' কবিতা প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। যথা:—

"পরাণে ছড়ান ছায়া ধরিল নিবিড় কায়া

মোর দেহ সুতাটিরে ঘিরি,

এ দেহ আনিল তোরে রূপ সীমানায় ধরে'

অনন্ত হ'তে ওগো ছিঁড়ি।"

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে 'সংহতি', ১৩৭৪, শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "অনন্তরূপিণী" কবিতায়ও। যথা—

"শত জনমের রূপের ধেয়ান মোর

রূপ নিল মরি মরি,

হাজার যুগের আরাধনা এ আঁখির

তব দেহ নিল গড়ি।

* * *

তোমার মাঝারে তপন চন্দ্র ডোবে

ডুবে যায় দশ দিক

বন নদী গিরি গুটায়ে আসিল ওই
নয়নে নির্নিমিখ।

* *

অন্তরে ছিলে অন্তর্লীন ছায়া
আজি অপরূপ ধরেছ রূপের কায়া
পুনঃ অভিলাষ অন্তরতলে ধরি
শত জনমের রূপের ধেয়ান মোর
রূপ নিল মরি মরি।"

ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত শারদীয় (১৩৭৫) 'দৈনিক গণঅভিযান' পত্রের 'গান' এবং 'হৃদয়মণি' (সংহতি, পৌষ,১৩৭৪) কবিতায়ও এই একই ধরণের প্রেম-সৌন্দর্য-মুগ্ধতা। যথা, 'হৃদয়মণি' কবিতায়—

"কালো মেদিনীর মৌন ধেয়ান
আলোর আখরে যেমন ফুটে,
শতেক যুগের রূপের তিয়াষা
মণিরে জ্বালায় মরম পুটে,
তোমারে তেমনি গণি
ওগো আমার হৃদয়মণি।
মনের সিন্ধু অতলে বসিয়া
যে সুন্দরের করিনু পূজা
আমায় বুকে তা' তোমাতে ফুটিল
সার্থক আজি সকল খুঁজা।"

বহুকাল পূর্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত সুখরঞ্জনের "আঁখি ও তারা" কবিতায় রোমান্টিক সৌন্দর্য-কল্পনা-বিলাস ও সুদূর রহস্য-সৌন্দর্য-বিরহই প্রকাশ পেয়েছে। যথা :—

আঁখি বলে আমি যদি হইতাম তারা
সুদূর স্বরগ হ'তে স্বপনের পারা
ঝরিয়া পড়িত নীচে আলো মিটিমিটি
আভাসের মত শুধু, পৃথিবীর দিঠি
বিমুগ্ধ বিহ্বল ভাবে আমারে হেরিত,
রহস্য আভাসে শুধু ব্যাকুলি' উঠিত।
কি জানি কি সুদূরের লাগি' সব জনা
বিশ্ব হৃদে সৃজি' তোলে এ শূন্য বেদনা।
দূর স্বপ্ন স্বর্গে আমি রহিতাম ভাসি'
নিক্ষেপি' দিতাম নীচে রহস্যের হাসি।"

(ভারতী, ১৩১৫ পৃঃ ৪৯২।)

সৌন্দর্যসাধক কবি সুখরঞ্জনের সৌন্দর্য বন্দনা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশেও ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—

"জীবন আমার তাই-তো ওগো
ঐ চরণের ছন্দে লুটে ;
মনের কোণের মৌন বাণী
তোমার দেহে গীতে ফুটে।"

—(সৌন্দর্যলক্ষ্মী, সংহতি, মাঘ, ১৩৭৫।)

এই সৌন্দর্যবন্দনার সঙ্গে প্রকৃতি-প্রেম অপৃথক্-সূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রকাব্যে যেমন অপরিসীম প্রকৃতি-ব্যাকুলতা থেকেই অনির্দেশ্য রোমান্টিক সৌন্দর্য-বিরহব্যকুলতার জন্ম হয়েছে, রবীন্দ্রভাবশিষ্য সুখরঞ্জনের কাব্যেও অনুরূপ ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। 'শিক্ষক', অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭, সংখ্যায় প্রকাশিত "আমি নীহারিকা" কবিতাটি থেকে উদ্ধার করা যাক—

"আমি নীহারিকা
চন্দ্র সূর্য জ্বলে দুই আঁখি
ভালে শুকতারার টিকা।
সুনীল শাটীর অসীম জুড়িয়া
মুঠি মুঠি তারা দিয়েছি ছুঁড়িয়া
রূপালী মেঘের আঁচল ফুঁড়িয়া
ফুটিছে তারকা লিখা।।
রবি-কিরণের সুতায় গ্রথিত
তারকা-মালিকা কণ্ঠে দুলে,
তারার মেখলা শোভিছে কটিতে
তারকা মেঘ-লুণ্ঠিত চুলে,

* * *

অনামা নামিল নামের সীমায়
অরূপ ধরিল আমাতে রূপ,
অনাদি বাণী সে উঠিল ফুটিয়া
আলোর আখরে কি অপরূপ।"

'রৌদ্রে' (শিক্ষক, পৌষ, ১৩৭২) নামক সনেটকল্প কবিতাটিতেও কবির প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষতঃ নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিকয়টিতে।

"দেখিল সকলে
হৃদয়-বাসনা-চিহ্ন বহ্নি-রঙে-আঁকা
রঙীন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে—মত্ত কর্মস্রোতে
ঝাঁপায়ে পড়িল সবে—" ইত্যাদি।

মনোধর্মে মূলতঃ রোমান্টিক হওয়া সত্ত্বেও সুখরঞ্জনের কবিমানস প্রায়শঃই গভীরাশ্রয়ী তত্ত্বধর্মিতা ও অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার রাজ্যে প্রয়াণ করেছে। প্রথম যৌবনের প্রকাশিত তিনখানি রূপক-সঙ্কেত মূলক আখ্যায়িকা কাব্যগ্রন্থেও কবির এই তত্ত্বধর্মী মনোভঙ্গিটি বিধৃত হয়ে আছে। তাঁর কয়েকটি খণ্ড কবিতাতেও এই সুরটি বেশ লক্ষ্য করা যায়। 'শিক্ষক' পত্রের ১৩৭১, পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমি' কবিতাটি কবির সুগভীর আত্মোপলব্ধির প্রকাশক হিসাবে বিশিষ্ট রচনা। বিশেষতঃ নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি—

"ওগো নেমে যাও সেই মর্মমূলে
যেথা হ'তে সৃষ্টিপদ্ম তব দৃষ্টির আলোক
পাড়বে গো খুলে
তৃণে গুল্মে বল্লরী পল্লবে গূঢ় শিহরণে
আর অপূর্ব পুলকে
যেথা হতে দ্যুলোকে ভূলোকে
ফুটায়ে ফুটিয়া রবে ছত্র আলোকের
যেন শ্যামলে হরিতে নীলে বিশ্বময়ূরের
অপরূপ বর্হের বিস্তার।
বহে যায় কাল, ওগো নামো, কেন বা অপেক্ষা আর,
বহুমুখ রহস্যের সুগুপ্ত গহন আমি,
যাও নামি,
দিকে দিকে হিয়া-কন্দরের খোল অন্ধ দ্বার,
নৈঃশব্দের মর্ম ছিঁড়ি নীর-ধারা বহুক দুর্বার
শতমুখে উৎসারিয়া স্ফটিক ঝঙ্কারে আর স্ফুরিত ছটায়
রাত্রির গুণ্ঠন-মুক্ত অকুণ্ঠিত সূর্যকরোজ্জ্বল মহাসঙ্গীত
উৎসব প্রায়।"

অথবা 'নদীয়া মুকুর,' ১৩৭৪, শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'গান'টি থেকেও খানিকটা উদ্ধার করা যায়—

"অসীম সিন্ধু-সলিল-রাশিতে
বিন্দু-প্রমাণ মুকুতা ফলে
প্রাণ-সায়রের প্রান্তে প্রথম
মনোকণিকায় বহ্নি জ্বলে,
সেই মণিকার বরণোপহার
কুমারী হিয়ার স্বপন বোনা
আমি যে তোমারি সে মনোকণা।"

কিংবা 'বিচিত্রা', ফাল্গুন, ১৩৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত "জীবনে নিজ কাজ পাইনি খুঁজি" কবিতায়ও দেখি কবি আত্মানুসন্ধানের প্রয়াসী হয়েছেন।—

"জীবনে নিজ কাজ পাই নি খুঁজি,
তাই তো হেথা হোথা মরি যে যুঝি;
তাই তো দ্বারে দ্বারে
লুটাই আপনারে
খুঁজি যে দিবারাত কত কি পূজি'
সে ভুল পূজা, শেষ নেই গো বুঝি॥
আপন কোষে আসি
যেমতি রয় পশি'
পাখীটি নিজ নীড়ে নয়ন বুজি'
তেমতি নিজ ঠাঁই পাই নি খুঁজি॥
ফেনায় ফুলি ফুলি'
কাঁদিয়া পথ ভুলি'
সাগরে পড়ে নদী মাথাটি গুঁজি'
তেমতি নিজ-শেষ পাইনি খুঁজি॥"

'হোমশিখা' পত্রিকার ভাদ্র (১৩৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত 'সঙ্গীত' নামক সনেটটিতে একটি ঘনীভূত সংহত কল্পনার প্রকাশ দেখতে পাই।

"কর্মক্লান্ত বিশ্ব 'পরে সন্ধ্যা অন্ধকার
দিনান্তের রশ্মিচ্ছটা আঁচলে আবরি'
ঘনায়ে আসিল ধীরে।

হেনকালে বিশ্বমর্ম পলকে বিদারি'
প্রকাণ্ড সঙ্গীতে বাঁধি গ্রহ তারা সোমে
সুস্বর লহরী এ কি বিশ্ব প্লাবি' ছুটে
অন্তহীন অন্তর্গূঢ় রহস্য যাত্রায়,...
কভু কি সফল হয় স্বপন জীবনে ?"

'অতীতের পিছটান' (শারদীয়া সংহতি/১৩৭৩) কবিতায় কবিচিত্ত বিশ্বের অনন্ত ও বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে রূপ ও অরূপের রহস্যময় পদচারণা লক্ষ্য করেছেন।

"বর্ণে বর্ণে অহর্নিশি জীবনের বর্হের বিস্তার
চন্দ্র-ভানু-তারকার চূর্ণে চূর্ণে আলো ছত্র মেলা
আলোর কমলে ফোটা অ-লোকের প্রাণমূলে
গোটানো আবার,
রূপ অরূপের এ কি অফুরান অপরূপী
গতায়তি খেলা।"

'মানুষের শক্তি' নামে কবিতাটি শিশু কবিতা হিসাবে ১৩৭২ সালের শারদীয় 'সন্দেশ' পত্রে প্রকাশিত হলেও ঠিক শিশু কবিতার পর্যায়ে একে ফেলা যায় না। এতে মানুষের শক্তিরই জয়ঘোষণা। মানুষ আজ নিজ শক্তিবলে অসাধ্য সাধন করছে, অজানা রহস্যের কারণ জানতে পারছে। এ বিষয় নিয়ে নজরুল ইসলামের একটি বহুখ্যাত ছাত্রপাঠ্য কবিতা আছে কিন্তু সুখরঞ্জনের আলোচ্য কবিতাটি ঠিক সে পর্যায়ের নয়। নীচের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে।

"জানি গোপন মনের কথাটি ;
যে বা রহস্য ছলে গূঢ় তরুমূলে
যে পুলকে কাঁপে লতাটি ;
সেই সুগোপন সুতায় সুতায়
গ্রহ তারা বাঁধা যেন গো লূতার,
খনি তলে মণি যে মৌন কথায়
আভাসিয়া তুলে ব্যথাটি,
নাহি লুকানো কাহারো কথাটি।"

সুখরঞ্জনকে আমরা তত্ত্বধর্মী রোমান্টিক বা মিষ্টিক কবিরূপেই দেখেছি। কিন্তু ঘরোয়া জীবনরসের এবং লঘুরসের কবিতায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রথমে ঘরোয়া রসের দু'একটি কবিতার পরিচয় দেওয়া যাক।

নবকল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'কাজের চিঠি' কবিতার স্বাদ এতাবৎ আলোচিত অন্যান্য কবিতার তুলনায় স্বতন্ত্র। কিছুটা উল্লেখ করা যাক।—

'কাজের চিঠি সেদিন তুমি
পাঠালে মোর "শ্রীচরণে",
"প্রাণের অমুক", "প্রিয়তম"
নাই কো তোমার সম্বোধনে।
ছেলেপিলের অসুখবিসুখ,
আছে তাতে টাকার কথা,
বিন্দী-পিসীর ছেলের বিয়ে,
পাড়ার যত আর বারতা ;
সবই আছে, নেই কো শুধু
হিয়ায় কি হয় সঙ্গোপনে ;
কাজের চিঠি সেদিন তুমি
পাঠালে মোর "শ্রীচরণে"॥

কিংবা 'তরুণের অভিযান' পত্রের ১৯৬৯ সনের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'পলাতকা' কবিতার কথাও এ প্রসঙ্গে বলা যায়। সেখানেও এই একই সুর ও একই ঘরোয়া জীবনরসের প্রকাশ দেখি। যথা—

"পেয়েছি আজি তোমা শিয়রে বন্দী,
রোগে বলহীন দেখেছ যখন
তুমি করেছ সন্ধি॥
ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি যত
দূরে সরে গেছ ততই সতত
ছুটে চলে গেছ গৃহকাজে যত
তুমি করিয়া ফন্দী,
পেয়েছি আজি তোমা শিয়রে বন্দী।"

'মৌচমধু' পত্রের ১৩৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অক্ষয় দাতা' কবিতাটি লঘুরসের কবিতা। এর মধ্যে কবির প্রসন্ন স্মিত-কৌতুক-রস-প্রিয়তাই প্রকাশ পেয়েছে। যথা :

"করিব দানটান? কিন্তু পারি কই।
খরচ বেজায় যে—কণ্ঠ ছাড়ি কই॥
দেখ, সকালে 'মাটন-চপে' আহার রুচে না ক'
দুপুরে পলান্নেতে ক্ষিধেটা ঘুচে না ক'

*   *   *

তারপর, বিজলি পাখা ছাড়া ঘুম ত হয় না ক',
বন্ধুদের দিতে হয় পার্টি,
আর দেখ, করিতে হয় মোর অনেক সাজগোজ
পাছে কেউ বলে' বসে "ডার্টি"।
চলে না তিন বেলা তিনটি গাড়ী বই,
করিব দানটান? কিন্তু পারি কই?"

—ইত্যাদি অংশ রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকের দু-একটি গান ও 'প্রহাসিনী'র কবিতা এবং ডি. এল. রায়ের 'হাসির গানে'র কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ ছাড়া সুখরঞ্জন কৈশোরে শিশুদের জন্য অনেক ছড়া ও কবিতা এবং পরবর্তীকালে অনেক কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সেগুলি ধীরে ধীরে নানা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বাঙলা শিশু-সাহিত্যেরও এতে সমৃদ্ধি ঘটবে। এখানে তাঁর মাত্র কয়েকটি ছড়ার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে' এ আলোচনা শেষ করব। 'ঝিলিমিলি' পত্রের ১৩৭৩, ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাজিমাৎ' কবিতায় 'ৎ' ব্যবহারের সাহায্যে শিশুদের উপযোগী কৌতুককর ছড়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। যথা:

"বেল্ দিয়ে রেল গাড়ী
চলিল হঠাৎ
বিছানাটা মেলে দিয়ে
শোও চিৎপাত।
বসা লাগি কেউ যদি
করে উৎপাত
চোখ বুজে পড়ে' থাক
ঘুমে যেন কাৎ।
মাঝে মাঝে নাক ডেকে
কর ঘোঁৎঘাঁৎ
কেটে যাবে রাত, সোজা
হবে বাজিমাৎ।"

এ ছাড়া শারদীয়া (১৩৭৪) প্রতিদীপার 'চড়াই পাখি' ও 'দৈনিক বসুমতী'র 'ছোটদের পাতা'য় (৭ই কার্তিক, ১৩৭৬) প্রকাশিত 'সনৎ গণৎকার' ছড়া দুটিতে যথাক্রমে 'ড়' ও 'ৎ' ব্যবহারের সাহায্যে কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয়েছে। কিংবা 'রোশনাই' ১৩৭৩, শারদ সংকলনে প্রকাশিত 'কট্‌কী ঠাকুর' ছড়া দুটির কথাও উল্লেখ করা যায়। প্রথমটিতে 'ং' এবং দ্বিতীয়টিতে 'ট'-এর প্রয়োগে অপূর্ব ধ্বনিরস ও কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে। যথা:—

"হ্যাংচোর জংলায়
থাকে হংচু
কথা কয় চুং চাং
চিং চং চু।
কংগোতে আদিবাস
মামা কিংকং
ওরাং ওটাং পেলে
খেলে পিংপং।
হুংকারে বুক কেঁপে
ওঠে শংকায়,
ছোটে কেউ হংবং
কেউ লংকায়।
তাই দেখে চোখ বুজে
হাসে হংচু
গলা ছেড়ে গান গায়
'লিং-লং-চু'।" (রোশনাই।)

অথবা—

"মট্‌কার কোট গায় কট্‌কী ঠাকুর
চট্‌কিয়ে খায় কলা, টাট্‌কা কাঁকুড়।
শুঁট্‌কী ঐ মট্‌কিতে ঢাকা ঢ'কনায়
সিঁট্‌কায় নাক তবু গুণ বাখ্‌নায়।

*   *   *

ছটফট্ করে সদা পেশা ঘট্কালি
'ঘট্কী' ডাকিলে পাড়ে বিটকেল গালি।
সট্কায় ছেলেগুলো ঢিল মেরে ঝট্
ঝাপ্টি সে মেরে ঝোপে চায় কট্মট্।"

(কাগজের নৌকা।)

'সন্দেশ' ১৩১১, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চৈতন ঠাকুর' ছড়াটিতে 'ঐ'-কারের ছড়াছড়ি, কৌতুকও সৃষ্টি করা হয়েছে চমৎকার। যথা—

"হাঁকডাক মারে লাফ ডরে নাক বৈরী,
কি ভীষণ সাহসেতে বুক তার তৈরী।
কৈলাস পাহাড়টা নড়ে ওঠে ডাকেতে
ধরিতে সে পারে নাকি মৈনাকে নাকেতে।

* * *

চৈতন ঐ দিনে কি করিল কই তা।—
দৈবাৎ সৈনিক দেখিল সে পাছেতে
মৈ নিয়ে অমনি সে চড়িল গাছেতে
শিশুগুলি মৈ টেনে লাগাইল হৈ হৈ,
ছোট তার নাতনীটি কয় শুধু, 'মাভৈঃ'।"

মৌচাক (পৌষ, ১৩১২) পত্রে প্রকাশিত 'ঢুমচাঁদ শিকদার' ছড়াটিও বেশ উপভোগ্য।

"ঢুমচাঁদ শিকদার
গায়ে জামা ছিট্দার,
মুখে তার হাসি নেই
হাতে তার বাঁশি নেই
গলে তার কাশি নেই
পায়ে জুতো চিক্দার।
বাড়ি বাড়ি শুধু ঘুরে
যত পায় পেটে পুরে
আগে চায় সর-দই,
পরে কয় ঘর কই
বিছানাটা টেনে নিয়ে
শুয়ে পড়ে দিলদার।"—ইত্যাদি।

এখানে কবি সুখরঞ্জনের খণ্ড কবিতাবলীর (হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে) বিভিন্ন দিক নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। আশা করব, অর্দ্ধবিস্মৃতির কুহেলি-মুক্ত হয়ে সুখরঞ্জন বাঙ্লা সাহিত্যে আপনার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবেন।

উদ্ধৃতিতে, অনুবাদে, অনুবানানে অনুমান

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

সেযুগে বিবাহার্থী ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গেলে অন্য নানারকম পরীক্ষার মধ্যে তাকে 'উর্দ্ধ' বানান করতে বলা হত। অবশ্য বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ঐ বানানটির সঙ্গে আরও কয়েকটি tricky ধরণের, শক্ত শক্ত, গোলমেলে বানান অতি যত্ন-সহকারে শিখিয়ে রাখা হত বলে শুনেছি। তবে কোনো মেয়ে বানানের এই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে না-ও পারত ত সেজন্যে শুভকর্মটি আটকাত না, এবং তা নিয়ে বানান-বিলাসীদের উদ্বিগ্ন হবারও কোনো কারণ ঘটত না, কেননা সেই মেয়ের অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে লেখিকারূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা যা ছিল তাকে নিতান্তই নগণ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-যুগে দেখতে পাচ্ছি, উচ্চশিক্ষিতা লেখিকাদেরও মধ্যে অনেকে ঐ কথাটির বানান জানেন না, এমনকি নূতন নিয়মে 'ঊর্ধ্ব' বানানটিও তাঁদের জানা নেই। তাঁরা হয়ত কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেতে পারেন এইটে জেনে যে, আজকালকার লেখকদের মধ্যে বানান ভুল করার প্রবণতা তাঁদের তুলনায় হয়ত বা আরও বেশী।

কথা হচ্ছে, ঠিক বানানটা লেখক-লেখিকাদের নাই বা জানা থাকল? সব ক'টা কথার বানান সারাক্ষণ সকলের নখাগ্রে থাকবে এটা সত্যই ত আর কেউ আশা করে না? তাছাড়া এ ত পরীক্ষার হল-এ বসে লেখা নয় যে একমাত্র স্মৃতিশক্তির উপর বা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে? তাক থেকে একটা অভিধান পেড়ে নিয়ে তার পাতা ওল্টাবার মত দৈহিক সামর্থ্য এবং ঠিক বানানটা দেখে নেবার মত দৃষ্টিশক্তি যার আছে, তার বানানে ভুল কেন থাকবে?

অবশ্য নির্ভুল বানান করতে হলে ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় একটু কম থাকা দরকার। মাস্টার মশাইরা বরাবর বলেছেন, আমি বাংলা খুব ভাল জানি, পরীক্ষায় বাংলাতে বরাবর ভাল 'নম্বর' পেয়েছি, আমার ভুল হতেই পারে না, এই মনোভাবটা মারাত্মক। কেননা আমরা অনেকেই অনেক-কিছু জানি না; যা জানি তাও ভুলে যেতে পারি,—ভুলে যাই। খুব বড় পণ্ডিতদেরও কখনো-সখনো খুব সাধারণ শব্দের বানান লিখতে ভুল হয়ে যায়। ভুলে গিয়েছিলাম, ভুল করে ফেলেছি, হয়ত ভুল করছি, ভুল করতে পারি, এই কথাগুলি নিজের কাছে স্বীকার করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। ভুলে যাওয়া, ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম, আবার ভুল যাতে না হয়, 'নম্বর' যাতে কাটা না যায়, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ যাতে হতে না হয়, সেই চেষ্টা করাও মানুষেরই ধর্ম্ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হল-এ বসে যাঁরা বই খুলে নকল করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে নিশ্চয় লেখক-লেখিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু কুম্ভিলক-বৃত্তি চরিতার্থ করবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি না থাকলে ঐ সদভ্যাসটি তাঁরাও তখন বর্জন করেন বলেই মনে হয়। কারণ, বানানে ভুল নেই, অনুবানানে

(লিপ্যন্তরে) ভুল নেই, উদ্ধৃতিতে ভুল নেই, নূতন লেখক-লেখিকাদের রচনার এ-রকম পাণ্ডুলিপি খুব কমই চোখে পড়ে। অবশ্য প্রবীণ, প্রাচীন এবং প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের লেখাতেও এইসব ভুল, বিশেষ করে উদ্ধৃতির ভুল আজকাল খুব দেখতে পাওয়া যায়।

'আজকাল' কথাটা কেন ব্যবহার করলাম তা বলছি।

অর্দ্ধশতাব্দীরও বেশ কিছু আগে এবং বেশ কিছুদিন ধরে নবীন,প্রবীণ, খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখক-লেখিকার রচনার পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। অবস্থাটা তখন মোটেই এ-রকম ছিল না। রচনা ভাল হোক, মন্দ হোক, সেগুলিতে বানানের ভুল, অনুবানানের ভুল, উদ্ধৃতিতে ভুল খুব কম থাকত। হয়ত লেখক-লেখিকাদের ধর্ম্মবুদ্ধি তখন অনেক বেশী ছিল বলে এসব বিষয়ে শৈথিল্য কম ছিল।

বছর তেরো-চোদ্দ আগে দ্বিতীয়বার এই সুযোগ লাভ করেছিলাম। 'চল্তি' বাংলা বহুব্যাপকভাবে চালু হওয়ার ফলে বানান নিয়ে অনিশ্চয়তা তখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক-লেখিকাদের মধ্যে এই ধর্ম্মবুদ্ধির অভাব তখন এতটা লক্ষ্য করিনি। অভাবটা ঘটেছে অল্প কিছুদিন হল, এবং সবরকম অধর্ম্মাচরণের মতই, বাধা যত কম পাচ্ছে তত বেশী দ্রুতগতিতে বাড়ছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বানানের ভুল নেই, উদ্ধৃতিতে ভুল নেই এমন পাণ্ডুলিপি প্রায় আর চোখেই পড়ে না। আর সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল এই যে, যাঁরা দুছত্র নির্ভুল বাংলা লিখতে শেখেননি, একটি উদ্ধৃতি ঠিক মত দিতে পারেন না, তাঁরাও প্রায় সকলেই অত্যল্পকালের মধ্যে কতগুলি শব্দের অধুনা-প্রচলিত অপপ্রয়োগ বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন।

উপরে ধর্ম্মবুদ্ধি কথাটা ব্যবহার কেন করেছি তা বলি। ভুল বানান যদি লিখি, তাতে ছাত্রছাত্রীরা ত বিভ্রান্ত হতে পারে? সেই বিভ্রান্তি ত তাদের বিশেষ ক্ষতির কারণও হতে পারে? হয়ত ক্ষতি করছি জেনে অপরের ক্ষতির কারণ হওয়াটা কি ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয়? উদ্ধৃতিতে ভুল করলে যার লেখার থেকে উদ্ধৃতি তার প্রতি অবিচার করা হয়, এবং অশুদ্ধ উদ্ধৃতি সত্যের অপলাপ বলে এই দুই কারণেই সেটা অধর্ম্মাচার। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মানুষ হয়েও এই কথাগুলি কেন বুঝি না তা জানি না।

এবারে কয়েকটি উদাহরণ দিই।

প্রথমেই একটি ক্ল্যাসিক।

"আপনার কোনো গানের কলি মনে পড়ল বুঝি আবার?

—ঠিক ধরেছিস্ ইতু, ঠিক তাই। কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত রূপে দিলে দরশন।"

(একটি প্রখ্যাত মাসিক পত্র,
ফাল্গুন, ১৩৭৯।)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বলতে ইচ্ছা হয় না কি, হায় রবীন্দ্রনাথ!

ছোট ভুলগুলিও ভুল। আমাদের সেগুলি সামান্য মনে হলেও রচয়িতাদের কাছে হয়ত সেগুলি সামান্য নয়। বিচক্ষণ পাঠকদের কাছেও নয়। ছোট-বড়-মাঝারি সবরকম ভুলেরই নমুনা দিচ্ছি।

ঐ কাগজটিরই ১৩৭৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৫৫ পৃষ্ঠায় আছে—"ওয়ি ভুবনমনমোহিনী..."। "ওয়ি" হয়ত ছাপার ভুল, অন্য কথাটা হবে—"ভুবনমনোমোহিনী"। সম্প্রতি প্রকাশিত আর একটি মাসিক পত্রের অতুলপ্রসাদ সংখ্যাতেও দেখলাম "অয়ি ভুবনমনমোহিনী"।

প্রথমোক্ত কাগজটির ১৩৭৭ চৈত্র সংখ্যার ১০৪ পৃষ্ঠায় আছে 'উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে", ওটা হবে "বন্দন করি তারে"। ১০৫ পৃষ্ঠায় "হেথায় আর্য্য হেথায় অনার্য্য" হবে "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য"। ১৩৭৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ১৮৮ পৃষ্ঠায় "দুঃখে তাপে ব্যথিত চিতে" হবে "দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে"।

একটি সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৯ মাঘ, ১৩৭৯ সংখ্যার ১০৫২ পৃষ্ঠায় আছে—

'দিবসরজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি,
তাই চঞ্চল মন, চকিত নয়ন, তৃষিত আকুল আঁখি।"

অতঃপর পুনরায় ২৩ চৈত্র সংখ্যার ৬৭২ পৃষ্ঠায় একই ধারাবাহিক রচনায়:

"দিবসরজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি,
চঞ্চল মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি।"

রবীন্দ্রনাথ-রচিত মায়ার খেলার এই গানটির পঙ্‌ক্তি-দুটির শুদ্ধ পাঠ হবে—

"দিবসরজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি,
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল
আঁখি।"

একই কাগজে একই রচনার ২ চৈত্র, ১৩৭৯ সংখ্যার কিস্তিতে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় আছে—

"তুলিতে পূজার ফুল যেতাম যখন
সেই পথ ছায়াভরা
সেই বেড়া লতাঘেরা..."

ওটা হবে:

"তুলিতে পূজার ফুল
যেতেম যখন,
সেই পথ ছায়া-করা,
সেই বেড়া লতাভরা..."

ঐ কাগজটির ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় অন্য এক লেখকের দেওয়া একটি উদ্ধৃতি পাচ্ছি ৩৭৪ পৃষ্ঠায়। উদ্ধৃতিটি অংশতঃ এইরূপ:

"ঘরেও নাহি পারেও নাহি সে জন থাকে মাঝখানে,
...দিনের শেষে শেষ খেয়ায়।"

রবীন্দ্রনাথ-রচিত কাব্যগ্রন্থ খেয়া-র প্রথম কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি এইপ্রকার:

"ঘরেও নহে পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে
...দিনশেষের শেষ খেয়ায়।"

রবীন্দ্রনাথের বলাকা-র বহু-পরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কবিতার কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। উদ্ধৃতি বলে যে পঙ্‌ক্তিগুলি আর একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার ১ বৈশাখ, ১৩৮০ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যাটিতে ছাপা হয়েছে সেগুলির মূল পাঠ এইপ্রকার:

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

'উদ্ধৃতি'তে এটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা হল এই:

"বীরের এই রক্তস্রোত/মাতার এই অশ্রুধারা/এ কি শুধু ধরণীর ধুলায় হবে হারা? স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না কি এ ঋণ? নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা/ তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর্ত্য মহিমা?"

এ-ক্ষেত্রেও একমাত্র মন্তব্য, হায় রবীন্দ্রনাথ।

৮ আষাঢ়, ১৩৮০ তারিখে প্রকাশিত এই কাগজটির ৮৪২ পৃষ্ঠায় একই লেখকের রচনায় আর একটি 'উদ্ধৃতি' পাচ্ছি, সেটি এই:

"কাননে যত কুসুম ছিল
ফুটিল তব পায়ে।"

রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি যদি হয়ত ওটা হবে:

"কাননে যত পুষ্প ছিল
মিলিল তব পায়ে।"

'কুসুম' না লিখে রবীন্দ্রনাথ 'পুষ্প' কেন লিখেছিলেন এবং কুসুমই হোক বা পুষ্পই হোক সেটা যে ফোটে তা জেনেও 'ফুটিল' না লিখে 'মিলিল' কেন লিখেছিলেন তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। হয়ত কারণ কিছু ছিল।

এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই টানা-

টানিটা একটু বেশী হয়। অবশ্য খুব সঙ্গত কারণেই সেটা হয়। এই টানাটানিটা অপরিহার্য্য হয়, যদি তাঁরই সম্বন্ধে অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গে বক্তব্য পরিস্ফুট করবার জন্যে তাঁকে নিয়ে কিছু লিখতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই দেখি, ধান ভানতে শিবের গীত। ভূগোল, জ্যামিতি, পরিবার-পরিকল্পনা,—বিষয়টা যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে ভুল উদ্ধৃতি দুটো-একটা দিতেই হবে। পাণ্ডিত্য-খ্যাতিকামী ব্যক্তিরা কেন বোঝেন না যে এতে ফলটা উল্টোই হয়। তাঁদের উপর পাঠকদের শ্রদ্ধা কমে যায়, তারা হাসে।

যে ভুল উদ্ধৃতিগুলির উদাহরণ উপরে দেওয়া হল, কেউ না মনে করেন যে এগুলি ব্যতিক্রম। এই ধরণের ভুল উদ্ধৃতি দেওয়াই আজকাল প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বহু উদ্ধৃতি-সম্বলিত কোন প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হাতে এলেই এখন ধরে নিই, প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতেই লেখকের কিছু-না-কিছু ভুল থাকবে, এবং শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে তাই থাকে।

ধরা পড়বার ভয়ে নিশ্চয়ই নয়, মনে হয় অনাবশ্যক বোধেই, এঁদের মধ্যে অনেকে কোন্ বইয়ের কোন্ লেখা থেকে 'উদ্ধৃতি' দিচ্ছেন, তার উল্লেখ করেন না। ফলে প্রুফ যারা দেখে তাদের প্রাণান্ত হয়। 'যদ্দৃষ্টম্ তন্মুদ্রিতম্' বলে ছেড়েও ত দেওয়া যায় না। ছন্দের ভুল, মিলের ভুল, ভাষার ভুল, এগুলি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে চোখ পাকাতে থাকে। এসব ভুল না থাকলেও কোনো উদ্ধৃতিকে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে ছাপতে ছেড়ে দেবার বিপদ্ আজকাল অনেক।

বাস্তবিকই খুব দুঃখ হয় যখন দেখি, সংস্কৃত-ভাষার সঙ্গে পরিচয় যাঁদের অতি সামান্যই, এমনকি প্রায় নেই বললেই চলে, তাঁরাও কারণে-অকারণে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন কাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেবারলোভ সম্বরণ করতে পারেন না। ফল যা হয় সেকথা না বলাই ভাল। উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। একবারকার একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেই যথেষ্ট হবে। কিছুদিন আগে এইরকম একটি লেখা হাতে এসেছিল, তাতে এগারোটি উদ্ধৃতি, তাদের মধ্যে কথার ভুল সাঁইত্রিশটি। মহাভারতের একটি শ্লোকের এক-তৃতীয়াংশ অশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখকের নিজের রচনা।

অবশ্য আমি বলতে চাইছি না যে, আজকের দিনের এইসব ভুল বানান, অশুদ্ধ উদ্ধৃতি ইত্যাদির মূলে যা আছে তা শিক্ষার অভাব। কথাটার বানান 'আয়ত্ব' হবে, না 'আয়ত্ত' হবে, সেটা জানবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট নেবার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় একটি অভিধানের পাতা উল্টানোর। আর মহাভারতের শ্লোকের অংশবিশেষ নিজে রচনা করার গুরু দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়, মহাভারত খুলে প্রয়োজনীয় শ্লোকটি দেখে নিলে। কিন্তু আজকের দিনের অধিকাংশ লেখক-লেখিকা সেটুকু ক্লেশ স্বীকার করতে অনিচ্ছুক।

যাঁরা কেবল রচনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির প্রয়োজনে উদ্ধৃতি দেবার বিরোধী আমরা তাঁদের দলে। কিন্তু উদ্ধৃতি দেওয়া যদি অপরিহার্য্য হয়, কিংবা দেবার ইচ্ছা যদি দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে, ত স্মৃতিশক্তি যতই প্রখর হোক, একমাত্র তার উপর নির্ভর করে তা করতে যাওয়া অবিধেয়। কারণ, এটা হওয়া অসম্ভব নয়, যে, কোনো একটি কবিতা, বা শাস্ত্রগ্রন্থের কোনো একটি শ্লোক যখন মুখস্থ করেছিলাম তখনই অনবধানতা বশতঃ দু-একটি শব্দ ভুল মুখস্থ করেছি, আবার এমনও হতে পারে যে পরবর্ত্তী কালে অন্য কোনো লোকের ভুল উদ্ধৃতি বারবার দেখে বা বারবার শুনে আমার স্মৃতিতে অলক্ষিতে বিভ্রম এসে গিয়েছে। আরও নানা কারণে বিভ্রম আসতে পারে, আসে। "কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে" কথাটিকে আপনি যদি "কাল মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে" লেখেন ত 'উদ্ধৃতি' হিসাবে সেটা ভুলই হবে, কিন্তু খুব প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির স্মৃতিতেও 'কালি' কথাটা কালক্রমে 'কাল' হয়ে যেতে পারে।

এসব বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক একজন লেখিকার উদ্ধৃতিতে ছিল :

“পঞ্চনদের তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্মম নির্ভীক......
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।”

উদ্ধৃতিতে ভুল আছে এটা তাঁর মনেই হয়নি। কিন্তু ভুল আছে। চতুর্থ ছত্রের ‘উঠিল’ কথাটা ‘উঠেছে’ হবে। মাঝখানে ক’টি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি তিনি দেননি; শেষ পঙ্‌ক্তির ‘চাহিল’-র প্রভাবে ‘উঠেছে’ অলক্ষিতে ‘উঠিল’ হয়ে গিয়েছে।

স্মৃতি আমাদের নিয়ে এ-ধরণের রঙ্গ-রসিকতা সুবিধা পেলেই করে থাকে। অতএব সে সুযোগ তাকে না দিয়ে আমাদের উচিত, ঠিক বানানটির জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য অভিধান এবং নির্ভুল উদ্ধৃতির জন্যে যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি সেইটি দেখে নেওয়া। বই বাড়ীতে না থাকলে কোনো পরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়ে বা পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে সে-কাজটি করা। এটা এমন কি শক্ত কাজ ?

উদ্ধৃতি সম্পর্কে তবু ভয় থেকে যাবে, সামনে বই নিয়ে বসলেই সবাই কথাগুলিকে ঠিক ঠিক লিখতে পারবেন কি না। একটু আগে বলেছি, উদ্ধৃতি দিতে যে ভুল হয়, শিক্ষার অভাব তার কারণ নয়। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ত বই সামনে রেখেই উদ্ধৃতি দেন, তবু ভুল করেন। নির্ভুলভাবে নকল করতে পারাও একটা বিদ্যা, আর সে-বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হয়। যেসব ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার হল-এ বই নিয়ে ঢোকে নকল করবে বলে, তাদের যদি সেই বইয়ের দু-পৃষ্ঠা নকল করতে বলা হয় তবে শতকরা ত্রিশজনও সেটা নির্ভুলভাবে করতে পারবে কি না সন্দেহ। কারণ, নকল করতে কেউ তাদের শেখায়নি, তারা শিখেছে নকল করা অপরাধ। অপরাধ সেটা নিশ্চয়ই, কারণ তাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয় তা হল মুখ্যত: স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা এবং স্মৃতির সে পরীক্ষায় ফাঁকি দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই অসাধু আচরণ। পরবর্তী জীবনে এঁরা যখন লেখক-লেখিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, মনে হয় যেন তখনও পাশেই একজন ‘ইন্‌ভিজিলেটর’ দাঁড়িয়ে আছেন কল্পনা করে সেই স্মৃতিশক্তিরই তাঁরা পরীক্ষা দেন। হয়ত সেইজন্যেই নকল করতে দ্বিধাবোধ করেন এবং করতে গেলেও পারেন না।

যেজন্যে এমন কথাও মাঝে মাঝে মনে আসে যে, পাঠক্রম এবং পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে নকলনবিশির জন্যেও হয়ত খানিকটা জায়গা সংরক্ষিত থাকা উচিত। প্রবন্ধ-লেখকরা যেমন নানা গ্রন্থাদি পাশে নিয়ে কেউ ভাল, কেউ মাঝারি, কেউ বা কতকটা নীচুদরের প্রবন্ধ রচনা করেন, সেইরকম ছাত্রছাত্রীদের বেলাতেও,—অন্ততঃ কয়েকটি বিষয়ে,—এমন ভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন করা কি যায় না, যে, তাদের যে-বই খুশি এবং সেগুলি যত খুশি দেখে তারা উত্তর লিখলে তাদেরও ‘খুব ভাল, ভাল, মাঝারি, মন্দ, খুব মন্দ’ বিভেদে মূল্যায়ন করা যায় ?

জামাই-ঠকানো প্রশ্ন করার এবং ঘড়ি ধরে উত্তর নেবার বর্বরতা হয়ত তাহলে পরিহার করা যায়, এবং শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে দিতেও নূতন কিছু শিখবার সুযোগ পায়। পুলিশ-পাহারা রাখা, ইন্‌ভিজিলেটরদের মার খাওয়ানো, এ-সবের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়।

এবারে অনুবাদের কথা।

বাংলা সংবাদপত্রগুলি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে সংবাদ-পরিবেশনের এবং সংবাদ-ভাষ্যের যে ভাষা বাংলারাজ্যে গড়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বহুলাংশে অনুবাদ-ভিত্তিক। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, সে-অনুবাদ বেশ স্বচ্ছন্দ, সুষ্ঠু এবং প্রচুর গতিশীলতার অধিকারী। কতগুলি শব্দের অপপ্রয়োগ, কতগুলি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ শব্দের

ব্যবহার, যা কিছু কিছু রয়েছে, সেগুলি পরিহার করতে পারলে ভাবতে পারা যেত যে এদিকটাতে আমাদের অগ্রগতি সত্যই কিছু হয়েছে। শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। যে কয়েকটি জায়গায় অনুবাদ যথাযথ হয় না বলে মনে হয়েছে সেগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

"পদক্ষেপ গ্রহণ করা" জাতীয় উৎকট অনুবাদগন্ধী ভাষা রেডিওর (দিল্লী কেন্দ্রের) বার্তাপাঠে মাঝে মাঝে শোনা যায়। অনুবাদের ক্লেশ স্বীকারে অনিচ্ছাবশতঃ সংবাদপত্রের শীর্ষলিপিতে "জুয়েলার নিহত" ছাপা হয়। তাছাড়া আছে রিলে (relay), যেটার বাংলা আজ অবধি হল না কলকাতা রেডিওর বার্তা-পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে দু'জন কথাটার অর্থ জানেন, ত দু'জন জানেন না। যাঁরা জানেন না তাঁরা দিল্লী থেকে প্রচারিত খবর শোনাবার আগে বলেন, "আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দিল্লী থেকে রিলে করে শোনান হচ্ছে।" ইংরেজীতে শুনি, "The next part of our programme will be relayed to you from Delhi." এই জাতীয় ভুলের সংখ্যা অবশ্যই খুব কম, তাহলেও এগুলিকে রেডিওর কর্তৃপক্ষ কেন যে প্রশ্রয় দেন তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য।

যে অনুবাদের ত্রুটিগুলি প্রায়শঃই চোখে পড়ে এবং কানে আসে, তার মধ্যে আছে :

১। 'অংশ নেওয়া, অংশ গ্রহণ, অংশ অভিনয়।'

"ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে" বা "প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদ্দের মধ্যে ছিলেন" জাতীয় কথাগুলি কি বাংলা? অংশ মানে ত ভাগ। রাজনীতিতে বা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাতে ভাগাভাগির কি আছে? "ছাত্ররা রাজনীতি সংক্রান্ত কাজ করছে" বা "কাজে যোগ দিচ্ছে", "ক্রীড়া-প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন" বলা ও লেখা বেশী বাঞ্ছনীয় নয় কি? ইংরেজী part কথাটার একটা প্রতিশব্দ 'অংশ'। সেটা জানি বলেই লিখি "রাজার অংশ অভিনয় করেন প্রখ্যাত অভিনেতা—"। আসলে অভিনয়ের যে part সেটার অর্থ আলাদা। "Part—character assigned to actor on stage, words spoken by actor on stage, copy of those." (The Concise Oxford Dictionary)। 'অংশ' কথাটার এই জাতীয় কোনো অর্থ কোনো বাংলা অভিধানে পাইনি। রাজার "অংশ" নয়, part কথাটার প্রতিশব্দ এক্ষেত্রে হবে "ভূমিকা"।

২। Provocation অর্থে 'প্ররোচনা'।

প্ররোচনা কথাটার মধ্যে প্রলুব্ধ করার ভাবটা বেশী আছে। "প্ররোচন —রুচিসম্পাদন, প্রীতিজনন, প্রোৎসাহনার্থ অনুকূল বর্ণনারূপ প্রস্তাবনাঙ্গ বিশেষ।"—বঙ্গীয় শব্দকোষ। পক্ষান্তরে provocation কথাটির মধ্যে উত্তেজনা জোগানোর ভাবটা বেশী। "Provoke—rouse, cause (emotion); incite, urge; deliberately try to rouse another's anger or lust; enrage; annoy"—The Penguin English Dictionary। এই কারণে মনে হয়, ইংরেজী provoke করার অনুবাদ প্ররোচিত করা না করে উত্তেজিত করা দিয়ে করা ভাল। উস্কানি দেওয়া কথাটাও বোধ হয় বেশী মানানসই। ফজলুল হক সাহেব বলতেন, "আমাকে খুঁচাইলে—", কিন্তু খোঁচানো কথাটা সাহিত্যের ভাষায় কতটা চলবে তা জানি না।

৩। Incidentally অর্থে 'ঘটনাক্রমে'।

কথাটার অর্থ 'প্রসঙ্গতঃ'। এ নিয়ে আলোচনা অনাবশ্যক।

৪। Vagrant—'ভবঘুরে'।

The Penguin English Dictionaryতে পাই "Vagrant—a beggar with no fixed abode।" The Concise Oxford Dictionary অনুসারে "Vagrant—wanderer, idle rover, vagabond।" কিন্তু ভবঘুরেরা একটু অন্যস্তরের এবং অন্য জাতের মানুষ। "ভবঘুরে—যে অনর্থক নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়"—চলন্তিকা। "ভবঘুরে—ভবসংসারের সর্ব্বস্থানেই যাহারা অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ায়।"—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা কর্ত্তব্য বলে মনে করি। কলকাতার ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে শহরের যে-শ্রেণীর অধিবাসীদের vagrant বলা হয়, এবং বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে সেই কথাটারই অনুবাদ করে যাদের বলা হয় ভবঘুরে, তাদের বহুলাংশই আসলে vagrantও নয়, ভবঘুরে ত নয়ই। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার দিনে যাদের কথা ভেবে গেয়েছিলেন, "হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা," এদের মধ্যে অনেকে সেই জাতীয় মানুষ; এদের ঘর বাঁধবার সুবিধা দিলেই এরা ঘর বাঁধে। কিন্তু সবাই তাও নয়। বেশ কিছু সংখ্যক লোক যারা রাত্রিতে ফুটপাথে, গাড়ীবারান্দার নীচে, রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে শোয়, হাইড্রান্টগুলিতে সবরকমের প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে, তাদের "গতিহীন" বলা যায় না, তারা রোজগেরে মানুষ, ঘর-বাড়ীও তাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই আছে, তবে তা অন্যত্র। "গৃহহীন" বা "নিরাশ্রয়" বললেই বোধ হয় এদের সকলের ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয়।

৫। At the moment—'এই মুহূর্তে'।

Moment কথাটার একটা অর্থ যদিও মুহূর্ত, তার অন্য অর্থও আছে। "Am, was, busy, at the moment (just now, then)"—The Concise Oxford Dictionary। "Moment—brief time, instant"—The Penguin English Dictionary। অতএব (at the) momentএ সময়ের যে ব্যাপ্তির ইঙ্গিত, বাংলা "মুহূর্তে" শব্দটির মধ্যে তা নেই। অনুবাদে কথাটা হওয়া উচিত "বর্ত্তমানে", অথবা "সেই সময়", "সেই সময়টায়"।

অতঃপর অনুবানান বা লিপ্যন্তর বা বর্ণান্তর-এর প্রসঙ্গে চলে আসা যেতে পারে। প্রসঙ্গটির আলোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই আলাদা করে পরবর্তী কোনো এক সংখ্যায় তা করব।
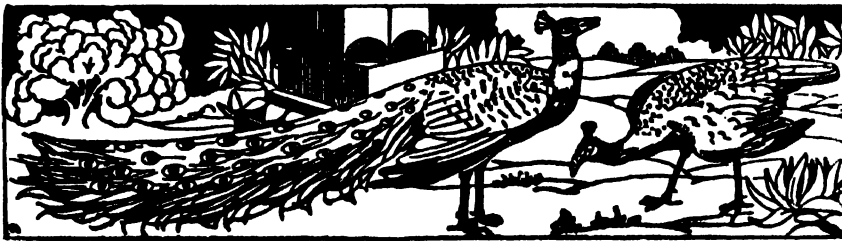
কংগ্রেস-স্মৃতি

(একচত্বারিংশ অধিবেশন—গৌহাটি—১৯২৬)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন স্বয়ং সভাপতি মশায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস—শ্রী উমর শোভানী যিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের জন্য বিশিষ্ট কাজ করেছেন তাঁর অকাল-মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করল।

তারপর মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুটি সভায় পেশ করলেন—

এই কংগ্রেস মনে করে যে কেনিয়া গভর্ণমেন্ট আইনের দ্বারা কায়েদীয় অপ-কৌশলে প্রাথমিক পোল ট্যাক্স ২০ শিলিং থেকে ৩১ শিলিং করে ভারতীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কুচিত আইন দ্বারা প্রমাণ করছে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থ ই হল ভারতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা এবং আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে ইউরোপীয়দের স্বার্থ বজায় রাখা।

এই কংগ্রেস দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বাসিন্দাদের স্ট্যাটাসের প্রশ্ন সমাধানের পদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য সম্প্রতি যে গোল টেবিল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হচ্ছে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে এবং তার সাফল্যের জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছে।

কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য মহানুভব ইংরেজ মিঃ সি. এফ্. এণ্ডরুজকে এই কংগ্রেস পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

প্রস্তাবটি জেনারেল হার্টজক্, স্যর হবিবুল্লা এবং সি. এফ্. এণ্ডরুজের নিকট কেব্‌ল্ করে পাঠানোর জন্য কংগ্রেস সভাপতি মশায়কে অধিকার দিচ্ছে।

প্রস্তাব দুটি উত্থাপন করে তার সমর্থনে মহাত্মাজী যুক্তিযুক্ত ভাষণ দিলেন। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব দুটি গৃহীত হল।

তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তরুণরাম ফুকন মশায় তাঁর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন।

প্রথমে তিনি সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তারপর তিনি আসামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে বললেন।

খদ্দর সম্বন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, হাতে সুতা কাটা ও তাঁতে খদ্দর বোনা আসামে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

তারপর দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করে বললেন যে, লর্ড বার্কেনহেডের জোর করে সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টার সমুচিত জবাব প্রতিনিধিরা যেন দেন এবং তাঁরা তাঁদের জন্মগত অধিকার স্বরাজের জন্য দাবি করেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আবেদন করে তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ভাইদের মধ্যে যে লড়াই চলছে তার তীব্রভাবে নিন্দা করলেন এবং এই ভ্রাতৃবিরোধ নিরসনের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

উপসংহারে তিনি বললেন যে, অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তা আশ্চর্য্যজনক। এই অসহযোগ তাঁদের শিখিয়েছে যে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রতিবাদে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী জাতির বিরুদ্ধেও বিরোধিতা করার ক্ষমতা দুর্ব্বলতম জাতিরও আছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় 'বন্দেমাতরম্', 'শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কী জয়' ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করলেন। সমবেত দর্শক ও প্রতিনিধিগণকে নমস্কার করে তিনি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন।

প্রথমে তিনি যথারীতি অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শোনালেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি বিস্তারিতভাবে স্বরাজ্য পার্টি ও তাঁদের পলিসি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করলেন।

জাতীয় দাবীর কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, কংগ্রেসের সমুদয় কর্ম্মসূচীই নির্ভর করছে গভর্ণমেন্টের ঐ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করার উপর। তিনি দাবী করেন যে সাধারণ নির্ব্বাচনের তাৎপর্য্য হচ্ছে যে দেশ স্বরাজ্য পার্টির কর্ম্মসূচী মেনে নিয়েছে। তিনি স্বরাজ্য পার্টির কাজ ও পলিসি সমর্থন করলেন।

কাউনসিল থেকে স্বরাজীদের বেরিয়ে আসার (ওয়াক্ আউট) নীতির সমর্থন করে তিনি বললেন যে, জাতীয় দাবীর সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের কোন পদ গ্রহণ করা চলবে না।

তারপর তিনি দ্বৈত শাসনের (ডায়ার্কি) ত্রুটির একটা ফিরিস্তি দিলেন এবং দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করলেন যে, এই দ্বৈত শাসন মোটেই কার্য্যকর হবে না। কি কি কারণে দ্বৈত শাসন অচল তা বিস্তারিতভাবে বললেন। তারপর তিনি জানালেন যে কেন্দ্রীয় বিধান-সভায় সদস্যদের কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নি এবং ভারত-শাসন সংবিধানের বহু দোষত্রুটি দেখালেন।

দেশবন্ধুর ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ উল্লেখ করে তাঁর সম্মানজনক সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় তিনি গভর্ণমেন্টের উপর দোষা-রোপ করলেন।

ভারতের পদ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সভাপতি মশায় ব্যাখ্যা করলেন যে তা ডোমিনিয়নগুলির সমতুল্য হবে এবং স্থল ও নৌ-সৈন্য এবং সামরিক কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এই দেশের থাকবে।

কাউনসিলের কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে তিনি যা সুপারিশ করলেন তা প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ্য পার্টি যা গ্রহণ করেছে তাই।

তিনি জাতীয় সরকার গঠনের উপর জোর দিলেন এবং বললেন যে লোকাল বোর্ডগুলি কংগ্রেসকে দখল করতে হবে।

খদ্দর, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক দ্রব্য বর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ম্মসূচী তিনি অনুমোদন করলেন এবং তা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করলেন।

গভর্ণমেন্টের মুদ্রানীতির নিন্দা করে তিনি টাকার বিনিময় হার ১৮ পেন্স রাখা ভারতের স্বার্থের হানিকর হবে বলে মত প্রকাশ করলেন।

তারপর তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিন্দা করলেন।

উপসংহারে তিনি ঐক্যের জন্য সকলের নিকট আবেদন করে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করার পর কাউনসিল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব আলোচনান্তে গৃহীত হল।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কংগ্রেসের নির্বাচন-প্রচারপত্রে যে সাধারণ নীতির কথা উল্লিখিত হয়েছে কংগ্রেস তা পালন করবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মতে তার জাতীয় দাবি সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কোন কংগ্রেস-সদস্য বিধান সভার কোন অফিস গ্রহণ করবে না।

যে সমস্ত প্রস্তাব দ্বারা গভর্ণমেন্ট তার ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করতে চায় সেগুলি অগ্রাহ্য করতে কংগ্রেস-সদস্যদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

এরপর সেদিনের মত অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

॥ ১৩ ॥

সেইদিন রাত্রি ৮ টার সময় বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। এদিনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কর্ত্তৃক উত্থাপিত কাউনসিলের কর্ম্মসূচী। বহু সদস্য এই আলোচনায় যোগ দিলেন। প্রস্তাবটি ভোটে দেবার প্রাক্কালে আনে মশায় পারস্পরিক সহযোগী দল সম্বন্ধে বিশদভাবে শোনালেন। তিনি জানালেন যে তাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু। এই কারণে এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রকার তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না এবং এই কারণেই তাঁদের দলের বহু

নেতা এবারকার অধিবেশনে যোগ দেন নি। পরিশেষে তিনি বললেন যে অন্যান্য দলের অনুগামীদের মত তাঁদেরও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য আছে।

তারপর বাংলার অন্তরীণ বন্দী দেশসেবকদের সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রস্তাব আলোচনাতে কংগ্রেসের জন্য সুপারিশ করা হল।

তারপর সেদিনের মত সভার কার্য্য শেষ হল।

॥ ১৪ ॥

২৭শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। এদিনও পূর্ব্ব দিনের মত নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই প্যাণ্ডেল পূর্ণ হয়েছিল, তবে আজ দর্শকের ভিড় কিছু কম ছিল।

পূর্বদিনের মত আজও সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে একদল অসমীয়া তরুণ-তরুণী অসমীয়া ভাষায় একটি জাতীয় সংগীত গাইলেন। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে এবং সঙ্গীত শুনে তাঁদের বাঙালীদের থেকে পৃথক মনে হল না।

তারপর দুজন বালক জাতীয় সঙ্গীত গাইল। এর পর শ্রীমতী শঙ্করী আম্মার নাম্নী জনৈকা তামিল নাড়ুর মহিলা তামিল ভাষায় একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।'

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেসের মতে কেনিয়াতে ভারতীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান অধিকার-সঙ্কোচ মূলক আইন প্রণয়ন, যার বলে কেনিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক পোল ট্যাক্স কুড়ি শিলিং থেকে মুদ্রানীতির কারচুপিতে ত্রিশ শিলিং-এ বাড়িয়েছিল এবং সম্প্রতি যা পঞ্চাশ শিলিং-এ বাড়ানো হয়েছে তা পুনরায় প্রতিপন্ন করছে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থই হচ্ছে ইউরোপীয়দের স্বার্থ, স্বাধীনতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংরক্ষণ।

প্রস্তাব উত্থাপন করে শ্রীমতী নাইডু তাঁর অনবদ্য ভাষায় নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

এম্. এস্. আনে কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

কাউন্সিল সম্বন্ধে পরবর্তী প্রস্তাব পেশ করলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই কংগ্রেস পুনরায় তার সংকল্প জ্ঞাপন করছে যে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যদের সাধারণ নীতিই হবে সকল কার্য্যে আত্মনির্ভরতা যাতে জাতি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে, এবং স্বরাজের দিকে জাতির অগ্রগতির বাধা স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট বা অন্যান্যদের কার্য্য-কলাপে দৃঢ়তার সহিত বাধাদান, এবং যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস বা অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মতে গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে জাতীয় দাবি সম্বন্ধে সন্তোষ-জনক সাড়া না পাওয়া যায় ততদিন কংগ্রেস সদস্যরা, (ক) গভর্ণমেণ্টের পুরস্কার স্বরূপ মন্ত্রিত্ব বা অন্য কোন পদ গ্রহণে অস্বীকার এবং অন্যদল কর্ত্তৃক মন্ত্রী গঠনে বাধা দান; (খ) অনুরূপভাবে গভর্ণমেণ্টের সাড়া না পাওয়া পর্য্যন্ত অথবা অল্-ইণ্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটির অনুরূপ নির্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত অর্থ নামঞ্জুর এবং বাজেট প্রত্যাখান করা; (গ) আমলাতন্ত্র তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করার জন্য আইন প্রণয়নের সমুদয় প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া; (ঘ) জাতীয় জীবনের সুস্থ উন্নতি এবং দেশের অর্থ-নৈতিক, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থের জন্য এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গোষ্ঠী রচনা এবং প্রেসের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন এবং বিল উত্থাপন ও সমর্থন করা; (ঙ) কৃষিজীবী প্রজাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের স্বত্ব স্থির করা এবং তাদের অবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করা; (চ) সাধারণতঃ কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধ্যে এবং শিল্পপতি ও মজুরদের মধ্যে সম্পর্ক ন্যায্যভাবে স্থির করা।

প্রস্তাব উপস্থিত করে সেনগুপ্ত মশায় তার সপক্ষে যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা দিলেন।

মৌলভী মহম্মদ সফী উর্দুতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বালকৃষ্ণ শর্মা একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তাতে মন্ত্রী গঠনে বাধাদান কংগ্রেসের সদস্যদের বাধ্যতামূলক অংশটি মূল প্রস্তাব থেকে বাদ দিতে বলা হয়েছে।

সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বললেন যে তাঁরা যেন এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন যার জন্য তাঁদের অনুতাপ করতে হয়। কারণ ঘটনাচক্রে এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যখন অন্যদল কর্তৃক মন্ত্রী গঠনে বাধাদান দেশের স্বার্থের হানিজনক হবে।

গোপীচাঁদ ভার্গব এই সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় একটি ভাষাগত সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, প্রস্তাবক তা মেনে নিলেন।

বসন্তকুমার মজুমদার একটি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা মূল প্রস্তাব থেকে (ঘ), (ঙ) ও (চ) ধারাগুলি বর্জন করতে বললেন যাতে বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের সদস্যদের একমাত্র কাজই হবে নির্বিচারে বাধাদান, যার ফলে আমলাতন্ত্র নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

নেকিরাম শর্মা এই সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এমন সময় পেথিক্ লরেন্স সভাগৃহে প্রবেশ করে দর্শকের আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি বৎসরের পর বৎসর স্বরাজীদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আসছেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, কাউন্সিলের কাজের দ্বারা তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। তাঁরা যদি সত্যিকার স্বাধীনতা চান তা হলে তাঁদের মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মসূচীর প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য কাজ করতে হবে।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার চক্রবর্তী মশায়কে সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন।

তারপর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য শোনালেন। প্রথমে তাঁর মতাবলম্বীদের পথ অবশেষে গ্রহণ করার জন্য তিনি কংগ্রেসকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর তিনি মূল প্রস্তাব থেকে (ক) ও (খ) ধারা বর্জনের জন্য সানবন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন যে, তা না হলে তাঁরা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণমূলক প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন না।

মালবীয়জীর উক্তির প্রত্যুত্তরে এস্. সত্যমূর্তি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি নানা যুক্তি দ্বারা পণ্ডিতজীর মত খণ্ডন করে বললেন যে, তাঁদের আদর্শ হচ্ছে ক্রমে ক্রমে আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটানো। তাঁরা কাউনসিলের কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুভব করছে যে, দেশের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টি'ই একমাত্র সংগ্রামশীল দল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বললেন যে, স্বরাজ্য দল ও মালব্যীয়জীর দলের মধ্যে যা পার্থক্য তা কেবল পদ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান নিয়ে। তিনি মালবীয়জীর নিকট তাঁর মত পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদন জানালেন।

সর্ব্বশেষে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায় বিতর্কের যথোচিত উত্তর বাংলায় দিলেন।

তারপর বালকৃষ্ণ শর্মা ও বসন্তকুমার মজুমদারের সংশোধন প্রস্তাব দুটি ভোটে দেওয়ায় অগ্রাহ্য হল।

এরপর সংশোধিত মূল প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, দেশের কার্য্য নিয়োজিত হবে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দান এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করার দ্বারা, বিশেষতঃ খদ্দর জনপ্রিয় করার দ্বারা,

সাম্প্রদায়িক ঐক্য বর্দ্ধনের দ্বারা, অস্পৃশ্যতা বর্জন দ্বারা, অবদমিত শ্রেণীদের অবস্থার উন্নতি দ্বারা এবং মাদক দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস দূরীভূত করা দ্বারা তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি ও প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জ্জনের শিক্ষা দান এবং এই কার্য্যের অন্তর্গত হবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি (লোকাল বডি) দখল, গ্রামের পুনর্গঠন, জাতীয় ধারায় শিক্ষার উন্নতি-সাধন, কৃষি ও শিল্পের মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, মালিক ও মজুরের মধ্যে এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা এবং অর্থ-নৈতিক শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা জাতির অগ্রগতি সাধন।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিতজী নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

মৌলানা শওকত আলী প্রস্তাব সমর্থন করে উর্দ্দুতে বক্তৃতা দিলেন।

ডাঃ সত্যপাল, হর্নিম্যান্ এবং প্রকাশম কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর বিদেশে প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং ২০শে জানুয়ারী ব্রুসেল্‌সে নির্য্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসে ভারতের পক্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

তারপর বি. জি. হর্নিম্যান নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করলেন :—

এই কংগ্রেস দৃঢ়তার সহিত অভিমত প্রকাশ করছে যে জরুরি অবস্থার জন্য প্রণীত ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন্ যা কংগ্রেস দ্বারা এবং অন্যান্য জনসভা দ্বারা বারে বারে ধিক্কৃত হয়েছে এবং ১৯২৫ সালের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট যা পরে বিধানসভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বলে আইনে পরিণত হয়েছে তা প্রয়োগ করার গভর্ণমেন্টের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই এবং যার ফলে বাংলার বহুসংখ্যক শান্তিপূর্ণ জনসাধারণের সেবককে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে কোন সঠিক চার্জ্জ গঠন না করে এবং প্রকাশ্য বিচার না করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং অজ্ঞাত চার্জে ও বিনা বিচারে এখন পর্য্যন্ত তারা কারাগারে বন্দী আছে।

এই কংগ্রেস বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের এবং দেশে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে তাদের এইভাবে আটক রাখা এবং বাংলার বাইরে প্রেরণের তীব্রভাবে নিন্দা করছে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করে হর্নিম্যান সাহেব সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ এবং তীব্রভাবে গভর্ণমেন্টকে নিন্দা করলেন।

সরদার শার্দুল সিং এবং শৈলেশনাথ বিশী কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পর সেদিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল।

॥ ১৫ ॥

২৭শে ডিসেম্বর রাত্রি ৮টার সময় বিষয় নির্বাচন সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কংগ্রেস সংবিধানের একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সংবিধানের ১নং ধারার (৪) নং উপধারার পরিবর্ত্তে একটি নূতন উপধারা গ্রহণ করতে বললেন। ঐ উপধারায় বলা হয়েছে যাঁরা সর্ব্বদা খদ্দর পরিধানে অভ্যস্ত নন তাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ করতে বা স্বয়ং প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হতে পারবেন না।

বেঙ্কটরামন আয়েঙ্গার প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এম্ এস্ আনে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে, এটা শোভন নয় যে কংগ্রেস জনসাধারণের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ন্ত্রণ করবে। বর্ত্তমান আইন যা কংগ্রেস সদস্যদের কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে খদ্দর পরিধান বাধ্যতামূলক করেছে তাই যখন কার্য্যকর হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে তখন এই সংশোধনী প্রস্তাব আরও অকার্য্যকর হবে।

তার পর তিনি একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তাতে মতিলাল নেহেরুর সংবিধান সংশোধনের এই প্রস্তাব কংগ্রেস কমিটীগুলির নিকট পাঠিয়ে তাদের মত সংগ্রহ করে ১৯২৭ সালের মার্চ

মাসের মধ্যে সিদ্ধান্তের জন্য অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে উপস্থিত করতে বলা হয়েছে।

নিমকর আনেকে সমর্থন করে বললেন যে, কংগ্রেস, যাকে ভারতের জাতীয় পার্ল্যামেন্ট বলে অভিহিত করা হয়, যে কোন লোকের পক্ষে তার সদস্য হওয়ার পথে দুষ্কর বাধা সৃষ্টি যেন না করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী বিতর্কে যোগদান করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁদের লক্ষ্য কি সংখ্যার দিকে না যোগ্যতার দিকে? বর্তমান আইনের গুরুতর অপব্যবহার তাঁর নজরে এসেছে। এই কারণে তিনি এই আইনের অবলুপ্তি চান। তিনি সভার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভাব খাটাতে চান না। এই প্রশ্ন বিচারের সময় তাঁকে যেন তাঁরা বাদ দেন।

তার পর তিনি বললেন যে, স্বরাজ ডাউনিং ষ্ট্রীট থেকে তাঁদের মাথার উপর পতিত হবে না। স্বরাজ অর্জিত হবে যদি সকলে সর্বান্তঃকরণে এবং অক্লান্তভাবে খদ্দরের সূচি প্রতিপালন করেন।

যোগলেকর আর একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করে বললেন যে সকল সময় খদ্দর পরিধানের জন্য কংগ্রেস সদস্যদের উপর যেন চাপ দেওয়া না হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রস্তাবে "খদ্দর" শব্দের পর "অথবা অন্য কোন স্বদেশী বস্ত্র" শব্দগুলি যোগ দিতে বললেন।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মালবীয়জীকে সমর্থন করলেন।

শাম্বমূর্তি আর একটি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস-নির্বাচনে ভোট দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষে প্রত্যহ আধ ঘন্টা সুতা কাটা বাধ্যতামূলক করতে বললেন।

ভোটে সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য সুপারিশ করা হল।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার একটি প্রস্তাব দ্বারা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের উপদেশানুসারে বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যদের ভারতের জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ করার প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে নির্দেশ দেবার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটীকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

আর একটি প্রস্তাব দ্বারা প্রতিনিধিদের ফি এক টাকার পরিবর্তে দশ টাকা করার জন্য সুপারিশ করা হল।

তারপর সেদিনের মত কমিটীর কার্য শেষ হল।

কমিটীর পরবর্তী অধিবেশন পরদিন ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময় বসবে ঘোষণা করা হল।

২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮াটার সময় বিষয় নির্বাচন সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল। বিষয় নির্বাচন সমিতির জন্য নির্মিত গৃহের পরিবর্তে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে সভার অধিবেশন হল। তার কারণ প্রবল ঝড়ঝাপ্টা এবং বৃষ্টিপাত।

গত রাত থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। প্রতিনিধিদের বাসের জন্য যে সকল গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল সেগুলির ছাদ ও দেওয়াল সমস্তই চটে নির্মিত। ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টির কোন আশঙ্কা না থাকায় এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভাগ্যে মুষলধারায় বৃষ্টি হয় নি। সমস্ত রাত ঝির ঝির করে বারিপাত হচ্ছিল। ডিসেম্বর মাসের শীতে আমরা জামা গায়ে দিয়েই আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে কোন প্রকারে রাত কাটাই। পরদিন সকল সময়ই বৃষ্টি।

এদিনকার বিষয় নির্বাচন সমিতির সভায় বুলুসু শাম্বমূর্তি কংগ্রেসের মূল নীতি সম্বন্ধে একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাব দ্বারা "স্বরাজ" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছিল পূর্ণ স্বাধীনতা।

হরি সর্বোত্তম রাও একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে বললেন যে, কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশ করেছে তাতে রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথের প্রশ্ন জড়িত আছে সুতরাং এই প্রস্তাব গৃহীত হলে তা কাউন্সিলে প্রবেশ নীতির পরিপন্থী হবে।

উত্তরে শাম্বমূর্তি বললেন যে, এই প্রস্তাব দ্বারা স্বাধীনতা ঘোষণা করা হচ্ছে না, কেবল মাত্র কংগ্রেসের আদর্শের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

সভাপতি মশায় বৈধতার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করলেন।

প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মহাত্মা গান্ধী ভাষণ দিলেন, কথাপ্রসঙ্গে তিনি নাভার মহারাজার প্রতি নির্য্যাতন এবং মুদ্রানীতির উল্লেখ করলেন।

মহাত্মাজী আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি মশায় মন্তব্য করলেন যে, যখন মহাত্মাজী কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন তখন তিনি এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করার জন্য আবেদন জানালেন।

সভাপতি মশায়ের এই মন্তব্যের উত্তরে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন যে, মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, কেবলমাত্র এই কারণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি স্বরূপ প্রযোজ্য হতে পারে না।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের এই অভিমতের জন্য মহাত্মাজী তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, দেশব্যাপী মহাত্মাদের ছড়াছড়ি। সেই সব মহাত্মাদের তাঁরা যেন গ্রাহ্য না করেন। তাঁদের কবল থেকে বেরিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু "আমি মহাত্মা নই। আমি দেশের একজন দীন সেবক এবং আপনারা আমার কবল থেকে সহজে মুক্তি পাবেন না, কারণ আমি আত্মোৎসর্গের জন্য কোন উগ্র এনার্কিষ্ট অপেক্ষা কম প্রস্তুত নই। আমি অত্যন্ত অগ্রসর কর্মসূচীর জন্য ভীত নই। কিন্তু যে ব্যক্তি তার জীবনে বহু সংগ্রাম দেখেছে এবং যে জানে কি করে এগিয়ে চলার পদযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তার কথা বিচার ও চিন্তা করে দেখতে আমি সকলকে অনুরোধ করি।"

এর পর সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

আর একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন অর্জুনলাল শেঠী; এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ফেডারেল রিপাবলিকই তাঁদের লক্ষ্য এবং তা অর্জন করতে সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করা এবং তা অহিংস হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সভাপতি মশায় প্রস্তাবটী বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করলেন।

তার পর শিখ বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচিত হল। দীর্ঘ আলোচনার পর খসড়া প্রস্তাব থেকে নাভা মহারাজার প্রতি অবিচার এবং নাভা রাজ্যে আকালী আন্দোলনের জন্য যে-সকল প্রজাদের বন্দী করা হয়েছে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য আলোচনান্তে বাদ দেওয়া হল, কারণ দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এতে কয়েকজন শিখ এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন আর কয়েকজন প্রতিনিধি নোটিস দিলেন যে, তাঁরা মহারাজা নাভা সম্বন্ধে প্রস্তাব প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করবেন। সভাপতি মহাশয় প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা না করার জন্য তাঁদের উপদেশ দিলেন। বাবা গুরদিত সিং এবং সরদার শার্দুল সিং তাতে সম্মত হলেন না।

রাজকুমার চক্রবর্তী একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে বলা হয়েছে যে, কাউনসিলের কোন নির্বাচিত সদস্য যেন প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ না করেন। কারণ এই পদটি সরকারের দান। বসন্তকুমার মজুমদার প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিরোধিতা করলেন।

প্রতাপচন্দ্র গুহরায় একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে, গভর্ণমেন্টের হস্তের পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেস সদস্যদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অস্বীকার করা ছাড়াও তাঁরা যেন যতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট জাতীয় দাবীর সন্তোষজনক সাড়া না দিচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত অন্য দল কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গঠনে বাধা দেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব সমর্থন করার পর তা গৃহীত হল।

ক্রমশঃ

পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

শেষ পর্ব

ছোটদের জ্ঞানসন্ধানী (বাকি অংশ)
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৭০
রীডার্স হোম
১২১ সি তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা—৬

১। কোন্ মাছ ডিম পাড়ে না?—তিমি মাছ।

২। রক্তহীনতা হইলে কি খাওয়া উচিত?—শামুকসিদ্ধ ঝোল।

(পাঠ্যপুস্তকে রোগীর কি খাওয়া উচিত তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়?)

৩। কোন্ উষ্ণ পানীয় দ্বারা হজমশক্তি নষ্ট হয়?—চা, কফি।

(কোন্ প্রমাণসিদ্ধ তথ্য থেকে এ-সংবাদ দেওয়া হয়েছে? অন্ততঃ এমন কথা বলা আইনসিদ্ধ কি না আমার জানা নেই।)

৪। সুস্থ ব্যক্তির হৃদ্‌পিণ্ড, গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃদ্‌পিণ্ড সদ্যোপ্রসূত শিশুর হৃদ্‌পিণ্ড...

(রক্তহীনতার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে শামুকের ঝোল। এবারে ব্যাকরণ শিক্ষা, অর্থাৎ ব্যাকরণের সন্ধি। যথা—হৃৎ + পিণ্ড = হৃদ্‌পিণ্ড এবং সদ্যঃ + প্রসূত = সদ্যোপ্রসূত। যে কোনো একখানা ব্যাকরণ খুলে কখনো দেখেছেন কি লেখক?)

৫। উল্কা কি?—আকাশের গায়ে আলোহীন কঠিন পিণ্ড বিশেষ।

(আকাশের গায়ে এ-জিনিস কিভাবে লেগে থাকে এবং দেখা যায় কিভাবে? ছাত্ররা দেখতে পাবে কি যদি আকাশে তাকায়? অথবা যদি দূরবীণের সাহায্য নেয়?)

৬। সর্বাপেক্ষা হাল্কা দ্রব্য কি?—হাইড্রোজেন গ্যাস (নব আবিষ্কৃত হিলিয়াম গ্যাস)।

(এই বন্ধনীভুক্ত হিলিয়াম গ্যাসও কি সর্বাপেক্ষা হাল্কা? তাহলে হাইড্রোজেনের সমান বলা চলে কি? এবং একে নব আবিষ্কৃত বলা হয়েছে তারই বা উদ্দেশ্য কি? ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্যাস প্রথম আবিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ এই বইখানা ছাপার ৮০ বছর আগে, তবু নব আবিষ্কৃত হল কিভাবে?)

৭। শীতের দেশে বরফ পড়ে কি করে?—বেশী শীতে বৃষ্টির জল ঠাণ্ডা হয়ে জমাট হয়, উহাই বরফ।

(অর্থাৎ বৃষ্টি পড়তে পড়তে বেশী শীত হলে সেই বৃষ্টিবিন্দুগুলি জমে বরফ হয়? উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে যে বরফ আছে তারও কি ঐ ইতিহাস? বরফ পড়া মানে কি? বৃষ্টি জমে, অথবা বৃষ্টির ফোঁটা জমে নানা জটিল পদ্ধতিতে আকাশে ওঠা-নামা করে, আকারে বড় হয় এবং তা যখন নিচে পড়ে তার নাম শিল। তাকে বরফ পড়া বলে না। যাকে তুষারপাত বলে তাও জমা বৃষ্টির জল নয়। তার চেহারা তুলোর মতো, কখনো বা পাউডারের মতো। বাতাসে যে বাষ্প থাকে তাকে বৃষ্টি বলে না। বৃষ্টি নাম নিতে হলে তাকে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। এবং সে-সব কি জানতে হলে তা শুধু ধ্যানের সাহায্যে হয় না।)

৮। কুয়াসা কিরূপে হয়?—বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী হলে।

(জলীয় বাষ্প বেশি হলেই কুয়াসা হয়? হিউমিডিটি আমাদের দেশে বর্ষায় বেশি হয়, কিন্তু কুয়াসা হতে তো দেখি না? তা হলে ব্যাপারটা কি? ইংরেজিতে ফগ, মিস্ট, হেজ প্রভৃতি শব্দ আছে, এগুলির অর্থ না জানলে এ-বিষয়েও শুধু ধ্যানে সত্য জানা যায় না।)

৯। লবণাক্ত জলে সহজে ভাসা যায় কেন?—জল গাঢ় বলে।

(তা হলে সমুদ্রে জাহাজ ডোবে কেন, এবং মানুষ ডুবে মরে কেন? এবং সমুদ্রজল এত লবণাক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা হয় কেন? ছাত্রদের উদ্দেশে বলা উচিত ছিল, বাছারা সব, আমি যা লিখছি তা আন্দাজে, তোমরা যেন সমুদ্রে নেমে আমার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করতে যেয়ো না।)

১০। ধূমকেতু কি?—একপ্রকার বাষ্পীয় বস্তু মাঝে মাঝে আকাশে দেখা যায়।

(কোনো ছাত্র যদি এই জ্ঞান লাভ করে মনে করে মেঘই তাহলে ধূমকেতু, তা হলে তার খুব অন্যায় হবে কি? কারণ বাষ্প মানে প্রথমেই ওরা জলীয় বাষ্প বুঝবে। কিন্তু ধূমকেতু জলীয় বাষ্পে গড়া 'বস্তু' নয়। তা ছাড়া আসল ধূমকেতু হল তার মাথাটা, যা প্রায় নিরেট বস্তুতে তৈরি।)

১১। ল্যাকটোমিটার কি?—জলমিশ্রিত দুধ পরীক্ষার যন্ত্র।

(এর অর্থ কি এই যে, যে দুধ খাঁটি তা এর দ্বারা পরীক্ষা করা চলবে না? কিন্তু পরীক্ষার আগেই বোঝা যাবে কি করে যে, সে দুধ জলমিশ্রিত? এবং না জেনে জলমিশ্রিত নয় এমন দুধে যন্ত্র ব্যবহার করলে বিস্ফোরণ ঘটবে কি?)

এই জ্ঞানগুলি যে বই থেকে নেওয়া, সে বই পূর্ব মাসে আলোচিত হয়েছে, আরও অনেক বাকি ছিল, তার কতক অংশ এবারে দেওয়া হল। আরো অনেক বাকি রইল, সেজন্য দুঃখিত।

এবারে নতুন একখানি বইতে প্রবেশ করা যাক। বইয়ের নাম—

রচনা বিচিন্তা
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭১
রবীন্দ্র লাইব্রেরি
১৫।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

১। বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপরঙ্গশালার প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম।......নিষ্করুণ নিদাঘসূর্য দাবদহনের অসহন জ্বালাময় তীর ছুঁড়িয়া মারেন। (রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতুবৈচিত্র্য নামক রচনা থেকে।)

(এই 'দাবদহন' নিয়ে আমি অনেক কাল ধরে আলোচনা করে আসছি। ২৩-৯-৫৫ তারিখে রাজশেখর বসু আমার একখানি চিঠিতে একটি আলোচনার সূত্রে আমাকে লেখেন—

...আপনার ২১ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। খবরের কাগজে (এবং অনেক নামজাদা লেখকের বই-এ) নিরঙ্কুশ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও আছে মনে হয় না। 'কার্য্যকরী উপায়', 'কলিকাতায় গ্রীষ্মের দাবদাহ' (forest fire) ইত্যাদি নিত্য নূতন idiom দেখা যাচ্ছে।......

চিঠিখানা আমার 'দ্বিতীয় স্মৃতি' নামক গ্রন্থে রাজশেখর বসু নামক অধ্যায়ে ব্লক করে ছাপা আছে। এবং অন্যত্রও এ চিঠির কথা বলেছি। বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যা প্রবাসীতে দাবদাহ, ফলশ্রুতি প্রভৃতি শব্দের অশিক্ষিত হাতের অপব্যবহার নিয়ে লিখেছি। সুধীরকুমার চৌধুরী গত আষাঢ় ১৩৮০ সংখ্যা প্রবাসীতে আরো বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, অতএব এ-ধরণের শব্দের অপব্যবহারকারীদের কেউ বলতে পারবেন না যে, আপনাদের অসতর্ক অবস্থায় ধরে ফেলা হয়েছে—You have been caught napping!)

২। গ্রীষ্ম ফুলের ঋতু নয়, ফুল ফুটাইবার দায়িত্ব তাহার নাই। ফলের ডালা সাজাইতেই তাহার বেলা

কাটিয়া যায়' (রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতুবৈচিত্র্য নামক রচনা।)

(এর অর্থ কি, চিন্তা করেছি। কিন্তু স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল। এ-সময় আমের বোল থাকে না; আম পাকে। কাঁঠালের ফুল প্রায় শেষ হয়ে কচি কাঁঠাল দেখা দেয়। কলার ফুল তো মোচায় ঢাকা থেকে কচি কলার মাথায় দেখা দিয়ে গ্রীষ্মকালে পুষ্ট ফলরূপে আবির্ভূত হয়। জামের ফুলও খুব বিখ্যাত মনে হয় না। তরমুজের ফুলও তাই। লিচুফুল, শশাফুলেরও খুব খ্যাতি আছে বলে শুনিনি। এ-সবের কোনো ফুলই খ্যাত নয়—একমাত্র আমের ফুল খ্যাত, তারও নাম মুকুল। ফুল নামে তা পরিচিত নয়। তবে লেখক কোন্ ফুলের কথা ভাবছেন? গ্রীষ্মকালে আমি যেসব ফুল ফুটতে দেখি, যেমন—কৃষ্ণচূড়া, যুঁই ফুল, চাঁপা যা বসন্তের শেষে ফোটে এবং চৈত্রের শেষ তারিখে মারা যায় না, গ্রীষ্মকালেও সমান সুরভিত থাকে। আমাদের গাছে বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে শিউলি ফুল ফুটতে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠ মাসে সকালে কত যে মাটিতে ঝরে পড়ে। আষাঢ়ে সংখ্যা আরো বেশি। জলে লাল ফুল (শিলি) অজস্র ফুটে আছে, বকুলে পথ ঢাকা পড়তে আরম্ভ করে—এরা সবাই বোধ হয় দ্বিতীয় শিফটে কাজ করতে আসে গ্রীষ্মকালে। কিংবা ওভার-টাইম? গ্রীষ্মের দায়িত্ব নেই ফুল ফোটাবার, তবে এ-সব ফুল ফোটাবার দায়িত্ব কার? কেন্দ্রীয় সরকারের?)

৩। গ্রীষ্মের মরুরসনায় মৃত্তিকার প্রাণরস শোষিত হইয়া দূর-দিগন্তে লোহি লোহি শিখায় উর্ধ্বে উঠিতে থাকে। কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই, শ্যামলতার আভাসমাত্র নাই। সর্বত্রই মরুভূমির ধূ ধূ বিস্তার। সমস্ত জীবজগৎ ও উদ্ভিদ্-জগতে নামিয়া আসে এক প্রাণহীন, রসহীন পাণ্ডুর বিবর্ণতা।

(বাংলাদেশের গ্রীষ্মের বর্ণনা। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব্ব বাংলা—দুটিকে মিলিয়ে চিন্তা করছি। সব মরুভূমি, শ্যামলতার আভাস নাই। আমগাছ পাতাশূন্য—শুধু আম ঝুলে আছে, বাঁশঝাড়ে একটি পাতাও নেই, লিচুগাছে লিচু ঝুলছে গাছে একটি পাতা নেই। জঙ্গল সব পাতাহীন, সবুজের চিহ্ন নেই, বাঘেরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সুন্দরবন ও দার্জিলিং জেলা থেকে। গোরু-মোষ প্রভৃতি ঘাস না পেয়ে চায়ের দোকানে বসে রুটি-মাখন খাচ্ছে। দেবদারু বনে সবুজ নেই, শালবনে সবুজ নেই,—শুকনো ডাল সব খাড়া হয়ে আকাশের দাবদাহকে অভিশাপ দিচ্ছে। বাঘেরা পালাচ্ছে এ-জন্য যে, জঙ্গলের কোনো গাছে পাতা না থাকাতে শুধু কয়েকটি কাঠির আড়ালে ওরা নিরাপদে থাকতে পারে না, exposed হয়ে পড়ে। হরিণদের অবস্থাও তাই। একটা ইংরেজি গল্পে পড়েছিলাম; একজন বলছে—তাদের দেশে এত গরম যে একটা বাঘ একটা হরিণকে তাড়া করে চলেছে, কিন্তু দুজনেই হেঁটে যাচ্ছে। এ-বইতেও আমাদের গ্রীষ্মের যে বর্ণনা আছে তাতে সম্ভবতঃ বাঘ ও হরিণের এই রকম অবস্থাই ঘটে। একবার কল্পনা করুন, সমস্ত বাংলায় গ্রীষ্মকালে সবুজ নেই কোথাও, সবুজ পোকাগুলিও হলদে হয়ে গেছে এমন দাবদাহ। আমার পাশের বাড়িতে দুটি সবুজ রঙের পোষা টিয়া পাখী আছে, তারা প্রতি গ্রীষ্মে ঠিক পাকা ধানের মতো রং ধরে। তারপর বর্ষার আরম্ভে একটু একটু করে সবুজ রং ফিরে পেতে থাকে। গ্রীষ্মে সবুজ আম ডালে ডালে পাণ্ডুর হয়ে ওঠে, ক্ষেতে তরমুজ ধানী রং ধারণ করে। তাল, নারকেল, সুপারী, পান সবার পাতা ফ্যাকাসে—পাণ্ডুর।)

৪। ....ওপারে ভাটিয়ালি, এপারে বাউল। তাহার উপর আজ আসিয়া পড়িতেছে প্রবল মার্কিনী প্রভাব।

(অ্যামেরিকান এবং মার্কিন দুই-ই অ্যামেরিকার বিশেষণ। যেমন জারমানি থেকে বিশেষণ জারমান। ব্যাপারটা মার্কিন না হয়ে জারমান হলে এই রচনার লেখক (অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক) কি লিখতেন "তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছে জারমানী প্রভাব?" বিশেষ্য বিশেষণের

অপূর্ব জ্ঞান। লেখক যখন পরীক্ষকও, তখন কোনো খাতায় "মার্কিন প্রভাব" দেখলে নিশ্চয় মার্ক কাটতেন, কারণ তাঁর মতে ওটা মার্কিনী প্রভাব হওয়া উচিত। (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৮০, সুধীরকুমার চৌধুরীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

৫। বাংলার পাখীদের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।

(বিহার, উড়িষ্যা, আসামের পাখীদের নিজস্ব সৌন্দর্য্য বড় একটা দেখা যায় না। ওদের ধার করা সৌন্দর্য্য? ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পাখীদেরও পারসনাল্ বিউটি নামক কোনো পদার্থ আছে কি না সন্দেহ জাগছে—পৃথিবীর কথা ছেড়েই দিলাম।)

৬। বাংলার কাকের কণ্ঠে প্রথম প্রভাত-রাগিণীটি বাজিয়া বাজিয়া উঠে। (এদের কণ্ঠেরও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে?) তারপর শ্যামা, ফিঙ্গে, দোয়েল, পাপিয়া, তাহাদের বিচিত্র কলতানে সৃষ্টি করে অপূর্ব ঐকতান।......ইহারা গ্রাম-বাংলার মুখর গায়ক, উদাসী বাউল।

(উদাসী বাউল? লালন ফকিরের সম্প্রদায়ভুক্ত এরা? জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ মানে না। অথবা নানক-পুত্র প্রবর্তিত উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত? সংসার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলেই মনে হয় এদের। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তবে সবাই মিলে লাইন বেঁধে বসে ঐকতান বাজায় এতে সন্দেহ কি?)

৭। দোয়েল-শ্যামা-ফিঙে (পূর্ব বানান ফিঙ্গে) তো একান্তভাবে বাংলারই পাখী।

(এরা নিশ্চয় বাউণ্ডারি মেনে চলে। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড-এর ফলে দুই বাংলার মধ্যে যে সীমারেখা আছে তা তো মানেই, তা ছাড়া মৈথিলী, হিন্দি, ওড়িয়া, আসামী ভাষা না জানাতে ও-সব রাজ্যে এদের যাতায়াত বা বসবাস নেই, এরা একান্তই বাংলার পাখী।)

৮। অনুচ্ছেদ: ডাঙার পাখী: দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে,......ঘুঘু, বাদুড়, লক্ষ্মীপেঁচা।

তারপর বলা হয়েছে—ঘুঘুও বাংলার একটি অতি পরিচিত পাখী। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন তাহার করুণ ডাকে ব্যথিত হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া অন্ধকার রাতে বাদুড়ের চিৎকার কে না শুনিয়াছেন? (বাংলার পশু-পাখী।)

(এতদিন পরে একটি সন্দেহের অবসান ঘটল। গাছে থাকে, ওড়ে, অথচ বাদুড় পাখী নয় এমন কথা শুনে এতদিন বিশ্বাস করি নি। এইবার ১১ টাকা দামের রচনা বিচিন্তা নামক বইতে অধ্যাপকের লেখা এই রচনা থেকে এই জ্ঞান লাভ করে ধন্য হলাম। এবং এতদিনে বিশ্বাস হল বাদুড় বাংলার পাখীদের অন্যতম।)

৯। সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের অবদান নামক রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

আজ মানুষ মেঘকে করিয়াছে বশীভূত, বিদ্যুৎকে করিয়াছে পদানত।

(বিদ্যুৎকে পদানত করার কথাটা কাব্যরূপে চললেও মেঘকে কিভাবে বশীভূত করা হল, তা আমার জানা নেই। বশীকরণ কবচ ধারণ করলে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কে ধারণ করেছিলেন মেঘকে বশীভূত করতে, তাঁর নামটা জানতে ইচ্ছা হয়।)

১০। ঐ একই রচনায়—......আকাশের বিদ্যুৎকে করিয়াছে করায়ত্ত, মুঠিতে পুরিয়া লইয়াছে আণবিক পারমাণবিক শক্তিকে।

(পড়ে মনে হবে পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যুতের শক্তি সব আকাশ থেকে ধরে আনা, করায়ত্ত করা বিদ্যুৎ। পারমাণবিক শক্তি বোঝা গেল, কিন্তু আণবিক শক্তি ব্যাপারটা কি? সে শক্তি তো আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেই করায়ত্ত হয়েছে মানুষের। এবং তত্ত্ব না জেনেই হয়েছে।)

১১। ঐ একই রচনায় আছে—সেই স্বার্থপর নরপিশাচদের হাতেই বিজ্ঞান বারে বারে তাহার মানবিক কল্যাণব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া করিয়াছে নরমেধ যজ্ঞের

্রয়োজন। দোষ হইতেছে সেই লোভী শয়তানদের... ই শক্তি-স্পর্ধিত ধনতান্ত্রিক সামাজ ব্যবস্থার।

(নরপিশাচ, লোভী শয়তান পর্যন্তই যে থামা গেছে, ট স্কুলের ছাত্রদের ভাগ্য। অবশ্য ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া াছে, এর পরের বিশেষণগুলি লিখতে বসলে, তাদেরই নে পড়বে এবং লিখবে। লিখবে, "ঐ sla লোভী য়তানদের জন্য।" রচনা শিক্ষার আদর্শ পুস্তক সন্দেহ াই।)

১২। (বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের দান নামক চনায় দেখা যাবে—)বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডেকে ধন্যবাদ, নি আকাশের বিদ্যুৎকে নামাইয়া আনিয়া মাটির ানুষের কাজে লাগাইয়াছেন।

এই বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার নয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক চনা-শিক্ষার পদ্ধতি এটা হতেই পারে না। আকাশে বদ্যুৎ ছিল, ফ্যারাডে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন ক করে—তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এ যদি কাব্য হয় বে বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনায় তা অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। ার শুধু এই একটা নয়, যেটুকু এর বিজ্ঞান-অংশ তাও ত্যন্ত অস্পষ্ট, এবং তা যে ভুল তা সহজেই প্রমাণ করা ায়। যথা—সর্বত্রগামী বিদ্যুতের উপস্থিতি রহিয়াছে ড়-জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই দুর্লভ সত্যটি সর্ব-থমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের সত্য উদ্‌ভাবনশীল মনোলোকে। উপযুক্ত পরীক্ষা ারা আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছিলেন যে সমগ্র ড়-জগৎকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে সর্বশক্তিমান বিদ্যুৎ। কংবা বলা চলে অসীম শক্তিশালী বিদ্যুতের এক বশাল মহাসমুদ্রে এই জড়জগৎ নিত্য ভাসমান।

এইসব অর্থহীন প্রলাপ (তা ছাড়া অন্য কোনো াষায় এর বর্ণনা সম্ভব নয়) স্কুলের ছাত্রদের সম্ভবতঃ বরাপদে বলা যায়। সমস্ত জড়জগৎ অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বদ্যুতের সমুদ্রে ভাসছে একথা জগদীশচন্দ্র কোন্ বিষয়ে প্রথম আবিষ্কার ও প্রচার করেছিলেন তা ানতে ইচ্ছা হয়। জগদীশচন্দ্র কি কি আবিষ্কার করে-ছিলেন তা বাদে, তিনি কি কি করেননি সেইগুলি তাঁর আবিষ্কার বলে চালানো সম্ভবতঃ সহজ।

এই 'রচনা বিচিন্তা' বিষয়ে আর একখানি বই লেখা যায়, তাই স্থানাভাবে এ প্রবন্ধে খুব বেশী বলা যাবে না। দু-একটি বলি—

১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে :—তাঁহার কাব্যে...রাজ-নীতিক পাইবেন নির্ভুল পথের নির্দেশ...আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবতরঙ্গে অবগাহন করি। তাঁহার চিন্তা-ধারায় চিন্তা করি, তাঁহার সুরে গান গাই, তাঁহার ভাষায় কথা বলি। আমরা রবীন্দ্রনাথে বাঁচি ও মরি।

(জিজ্ঞাস্য : রাজনীতিকদের নির্ভুল পথ-নির্দেশ দিয়েছেন তিনি কোন্ বইতে? রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারায় চিন্তা করি—এরই বা অর্থ কি? তাঁর সুরে কি কি গান করি? আমাদের এই বাংলা দেশেই কত সুর-স্রষ্টার অবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের সবার গান কি আমরা রবীন্দ্রনাথের সুরে গাই? সমাসমিক কালের অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত সেন, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—এঁদের গান সব কি আমরা রবীন্দ্রনাথের সুরে গাই?—বাকি কথাগুলির অর্থ বোঝা গেল না।)

১৪। রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের তীর্থভূমি।

(কোটি বছর আগে যে যুগ গেছে তাকে প্লাইওসিন যুগ বলা হয়। এই সময় থেকেই মানুষের আদি পুরুষের আবির্ভাব ধরা হয়। তারপর এসেছে দশ লক্ষ বছর আগে এক যুগ—নাম প্লাইস্টোসিন যুগ। তারপর হোলোসিন যুগ আরম্ভ হয়েছে দশ হাজার বছর আগে। মোট এই দীর্ঘকাল ধরে (এক কোটি দশ লক্ষ বছরের উপর) যত লোক পৃথিবীতে এসেছে সেই সমস্ত কালের, সকল মানুষের তীর্থভূমি রবীন্দ্রনাথ কেমন করে, বোঝা যাচ্ছে না।)

১৫। নারীর সতীত্ব কোথায়? -দেহে না মনে? ...সাহিত্যের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র এই জলন্ত জিজ্ঞাসাগুলিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন বার্থপর সমাজের সম্মুখে।

(সত্যই তো স্বার্থপর সমাজের এই বিচার স্কুলের ছেলেদের সম্মুখেও তুলে ধরা দরকার, কারণ তারা এর যথার্থ উত্তর দিতে পারবে হয় তো। আমি এ-বিষয়ে আরো কিছু সাহায্য করছি। ১৯৩৪ সনের ঘটনা। একখানা সাপ্তাহিকে একটি গল্প বেরিয়েছিল। এই সময়ে আমি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনা করি। এই গল্পের একটি প্যারাগ্রাফ ছিল এই রকম :

"......আমার দেহ নিয়ে যদি আমার বিচার করতে যাও, তবে সীতা-সাবিত্রীর মতই আমি সতী। আর মন নিয়ে যদি আমার সতীত্ব বিচার কর, তাহলে আমি অসতী, নিশ্চয়ই অসতী।..."

'বনফুল'কে দিয়ে এর একটি টিপ্পনি লিখিয়েছিলাম সে-সময়। তার অংশ এই—

"...আমার বুকসিনেটর, আমার ম্যাসিটার, আমার অরবিকিউলারিস ওরিস, আমার পেকটোরালিস মেজর, ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডস, আমার ওভারি, এমন কি আমার ইউটেরাস নিয়ে যদি বিচার করতে চাও, তবে সীতা-সাবিত্রীর মতই আমি সতী। কিন্তু সেরিব্রামের গ্রে ম্যাটারের ফাংশন বিচার করে যদি আমার সতীত্বকে বুঙ্গে ব্যালান্সে চড়াও, তবে আমি অসতী, নিশ্চয়ই অসতী।"

কোনো স্কুলের ছাত্র যদি একই সঙ্গে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয় তবে সতীত্বের বিচার সে এভাবেও করতে পারবে।)

এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করছি।

আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত আবোল-তাবোল রচনাটিতে ৩১৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে "এখানে সিনেমা ফিলম" স্থলে পড়তে হবে "এখনো সিনেমা ফিলম"...। দ্বিতীয় কলমে বাই-ডটারের পরে কোলন-চিহ্ন হবে না। ৩১৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ১১ সংখ্যক উক্তিতে পড়তে হবে "সূর্য্যমুখী ফুল সূর্য্যের সঙ্গে মুখ ঘোরাতে থাকে।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত দিনলিপি

(১৮৮৯)

প্রফুল্লকুমার দাস

১৮৮৯ সালের কয়েক মাসের দিনলিপিতে শিবনাথ শাস্ত্রীর আধ্যাত্মিক সাধনা, পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলী, তৎ-কালীন সামাজিক জীবনের ছবি এবং ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মসাধনা ও অবস্থা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ঐ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লণ্ডন থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর '৮৮ এক পত্রে তাঁর মেয়ে হেমলতা দেবীকে লিখছেন: "এখানে আসিয়া আমার বড় উপকার হইয়াছে—কি গুণে এজাতি বড় হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি। আত্মোন্নতির বাসনা দশ গুণ বাড়িয়াছে। ধর্মভাব ও সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি; কবে আমাদের দেশে এই সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি জাগিবে এই চিন্তা হৃদয়ে বার বার উঠিতেছে।"

উল্লিখিত আত্মোন্নতির বাসনা, ধর্ম্মভাব ও সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি এই সময়ের (১৮৮৯) দিনলিপির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

দিনলিপির সূচনাতে তিনি লিখছেন:

"১৮৮৯ সাল ১লা জানুয়ারী হইতে একমাস কালের জন্য নিত্য সমালোচনীয় কতকগুলি সত্য।

যাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিব:

(১) পবিত্রতার দাবী করা।

(২) বিদ্যার দাবী করা

(৩) জ্ঞানের বিষয়ে অন্যজনের উপর নিজের অগ্রাধিকার দাবী করা।

(৪) নিজের কার্য্যাবলী ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উচ্চ ভাবে বলা।

(৫) কোন বিষয়ে অপরকে বাদ দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

(৬) কোন বিষয়ে সাফল্যের জন্য নিজের কৃতিত্ব গ্রহণ করা।

কিন্তু যে সকল বিষয় করিব:—

(১) যেখান হইতে হউক শিশুর ব্যাকুলতার ন্যায় জ্ঞানার্জ্জন।

(২) অভিসন্ধি ও প্রতিরোধহীন ভাবে ন্যায় যাহা তাহাকে ধীর ভাবে ও দৃঢ়তার সহিত মানিয়া চলা।

(৩) জল যেমন তার সমোচ্চতায় ফিরিতে চায়, তেমনি সত্য, সৎ ও সুন্দরের অন্বেষণ।

(৪) ভয় অথবা কৃপার পরবশ না হইয়া ন্যায়, বিশ্বাস ও সত্যের জন্য দুঃসাহস অবলম্বন।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও মানবের প্রতি অক্লান্ত সেবার দ্বারা উচ্চতর জীবন লাভের চেষ্টা।

(৬) সুস্পষ্ট ভাবে নীতির উপলব্ধি ও তাহার প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ।"

(ইংরেজীর অনুবাদ, লেখক।)

১৮৮৯।১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার।

তিনি লিখছেন: "অদ্য প্রাতে উঠিয়া পারিবারিক

উপাসনান্তে নিজের উপাসনা সারা গেল। তৎপর বাহিরে আসিয়া বসা গেল। পাতুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমদাদা একজন ডাক্তারকে Darjeeling Sanatorium-এর জন্য সুপারিশ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আনিলেন। তাঁহাদিগকে সুপারিশ না করিতে পারিবার কারণ বলিলাম। তাঁহারা চলিয়া গেলে স্নানাদি করিয়া আহার করা গেল। আহারান্তে প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত বিলাতের পত্র লেখা গেল। Miss Collet. Mrs. Alice,Tawell, Miss Margaret, Voysey, Mrs. Catherine Impey, Prof. Newman এই কয়জনকে পত্র ও Mr. Knight ও Bristolএর E.G. Browne কোম্পানীকে এক কার্ড লেখা গেল। রাজা রামমোহন রায়ের গোরের ৬খানা ফটো পাঠাইতে লেখা গেল।"

"সায়ংকালে সীতানাথের (দত্ত) বাড়ীতে গিয়া Gerneral Committee'-র সভ্য· নির্ব্বাচন করা গেল। তৎপর সমাজে যাওয়া গেল। কেদারনাথ রায় খুব বক্তৃতা করিতেছেন; উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন—উৎসবের জন্য আয়োজন করা তাহার উদ্দেশ্য। কেদারের ভাবটা খুব সতেজ—কিন্তু এরূপ ভাবুক প্রকৃতির একটা ভয় এই যে ভাবটা অনেক সময় উচ্ছ্বাসেই উবিয়া যায়। আমাদের বঙ্গ দেশীয় ধর্ম্মভাবের মধ্যে এইরূপ ভাবের মাদকতা কিছু বেশী; বিশ্বাসের ও দৃঢ়তার তদনুরূপ নহে। রাত্রে P. L. Roy মহাশয়ের বাড়ীতে Miss Manning-এর অভ্যর্থনার্থ At Home Party-তে যাওয়া গেল। সেখানে কতকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে রাজা প্যারীমোহন মুখো, কানাইলাল দে, জজ্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

অতঃপর তিনি লিখছেন......"এই সকল পরিবার সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ দায়িত্ব আছে, কারণ ব্রাহ্ম সমাজের আমি ভিন্ন অন্য কোন লোকের ইহাদের উপরে কোন প্রভাব নাই। আমার কর্ত্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে। ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে। ইহাদের ধর্ম্মশিক্ষার উপায় বিধান করিতে হইবে।"

২রা জানুয়ারীর দিনলিপিতে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর পাই। সীতানাথ দত্ত, শিবনাথ প্রভৃতি কয়েকজন 'জাতিভেদ' প্রথা বর্জ্জনের প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এতে শিবনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কথাও চিন্তা করেন। তিনি লিখছেন: "সন্ধ্যার সময় আহারান্তে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাতে যাওয়া গেল। সেখানে জাতিভেদ বিষয়ে অনেক আলাপ হইল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের Rule Revision করিবার সময় পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীতে যে জাতিভেদ বর্জ্জনের কথা সন্নিবেশিত করা গিয়াছিল তাহা General Committee তুলিয়া দিয়াছেন। সীতানাথ প্রভৃতি তাহা পুনঃ সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য করিলে, জাতিভেদ মানিয়া লওয়া হইবে। এতদিনের পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদ sanction করিলে তাহার সহিত যোগ রাখা দুষ্কর হইবে।"

বিলাত থেকে ফিরে এসে শিবনাথ ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনার অভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। ১৮৮৯ ১৭ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত "পরিবারের ধর্ম্ম সাধন" বক্তৃতার স্মারক লিপিতে তিনি লিখছেন: "ভারত সমাজকে পুনর্গঠন করা ব্রাহ্ম সমাজের আকাঙ্ক্ষা। ২২০টী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে; ২৫ জনেরও অধিক লোক বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিয়া বেড়াইতেছেন; ৩০ খানি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা ধর্ম্ম-প্রচারার্থে নিযুক্ত রহিয়াছে, এসব কেন? ইহার উত্তর এই, ইহারা ভারতবর্ষের লোকদিগকে একটা সমাচার দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সে সমাচার কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর মানবের পিতা ও মানব

মানবের ভাই।" তারপর তিনি উপলব্ধি করেছেন, "ব্রাহ্মেরা যে ভারত রাজ্য গঠন করিবেন, দেখা যাউক তাঁহারা এক-একটী ছোট রাজ্য নিজ নিজ হাতে পাইয়াছেন তাহা কিরূপে গঠন করিয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র রাজ্য এক-একটী পরিবার।"

কিন্তু এই পরিবারে আধ্যাত্মিক সাধনার একান্ত অভাবের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে লিখছেন: "দেখিতে পাই বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনার নিয়ম নাই। আমরা সপরিবারে পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, ভাই-ভগিনী মিলিয়া আহার বিহার করা আবশ্যক মনে করি কিন্তু সেই সুখদাতা যিনি তাঁহাকে সকলে মিলিয়া ধন্যবাদ করা আবশ্যক মনে করি না।" অতঃপর ব্রাহ্ম পরিবারে বালক-বালিকাগণ যাতে ঈশ্বরকে পিতা বলে বিশ্বাস ও অনুভব করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি নেই। তাই তিনি লিখছেন: "আমরা যে ব্রাহ্ম ধর্ম দেশময় প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা যদি ঘরে না বসে——ঈশ্বর বলিবেন অকর্ম্মণ্য ভৃত্যগণ। তোমরা ক্ষুদ্র স্থানে আমার রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইলে না, বহুব্যাপক স্থানে সেই রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করা তোমাদের উচিত নয়।" ব্রাহ্ম সমাজকে আধ্যাত্মিকতায় শক্তিশালী করার জন্যই এই সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন এবং সেই কাজেই নিজেকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখেন। এই সময়েই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে 'উপাসক মণ্ডলী' প্রতিষ্ঠা করে তাকে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৮৮৯।১৪ই জানুয়ারী তাঁর দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন: "সীতানাথের বাড়ীতে রবিবারে যে কথা হইয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে এখানকার উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ ভার আমার কার্য্য—নীলমণিকে সেই কার্য্যের সহায় রূপে লওয়া যাইবে। একটী Body of Deacons থাকিবে। ইহাতে উপস্থিত সকলে আনন্দের সহিত সায় দিয়াছেন। বিলাত হইতে যত কার্য্যের সূচনা করা গিয়াছে এটা তাহার মধ্যে একটী। এইরূপ এক-একটী কাজ ধরিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহা কার্য্যকারী করিতে হইবে। সরসতা নিরসতার দিকে দৃষ্টিপাত করা হইবে না—সরসতা দিতে হয় প্রভু দিবেন নতুবা নীরস ভাবেই তাঁহার সেবা করিব। Character-এর Impulsiveness-টা ঘুচাইতে হইতেছে।

"জ্ঞানে রুচি, সদনুষ্ঠানে উৎসাহ, কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়তা—সর্ব্বজীবে প্রেম এই যে আদর্শ যাচ্ঞা করিয়াছি তাহা সাধন করিবার জন্য কি করিতেছি। পরমেশ্বর আমার সহায় হউন।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর পারিবারিক সাধনার কোন ত্রুটি ছিল না। দিনলিপিতে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই প্রত্যুষে উঠে শৌচান্তে নিজস্ব উপাসনা ও বাড়ীর মধ্যে সপরিবারে উপাসনার কোন ব্যতিক্রম নেই। এরপর সমাজ মন্দিরে উপাসনা তো আছেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পরিবারকে এক-একটা 'দেবমন্দির' করে তুলতে হবে। ১৮৮৯।২৪ ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের উপদেশের স্মারক লিপিতে তিনি লিখছেন: "দেবমন্দিরের সঙ্গে যেমন একটা পবিত্র ভাবের যোগ আছে, দেবমন্দির বলিলেই উপাসনা, ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি মনে হয়, সেই রূপ পরিবারকে এরূপ করিতে হইবে যাহার গুণে পরিবার শব্দটা পবিত্র ভাবোদ্দীপক হয়, পরিবার বলিলেই আত্মসংযম, সাধুতা, ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম সাধন মনে পড়ে! সেখানে ধর্ম্মভাব এরূপ জাগ্রত থাকিবে যে সেখানে প্রবেশ মাত্র আমাদের হৃদয়ের ধর্ম্মভাব প্রবল হইবে।" এবং পরিবারকে দেবমন্দির করতে হলে "উপাসনাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে।"

১৮৮৯।৩রা জানুয়ারী দিনলিপিতে তিনি লিখছেন:

"আজ সমস্ত দিনটা মনে এক প্রকার ভাব রহিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বার প্রার্থনা করিয়াছি। জীবনের সকল গুরুতর কার্য্যে সমগ্র প্রাণের সহিত প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার আলোক লাভের চেষ্টা কর্ত্তব্য এই সত্যটি হৃদয়ে বার বার উদিত হইতেছে। আমার ত একান্ত অন্তরে প্রার্থনারই শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ করিবার কত কারণ বিদ্যমান, প্রথম দারিদ্র্য,

দ্বিতীয় সমাজের কার্য্যের ভার, তৃতীয় নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের বাসনা। আমার প্রার্থনার ক্রোড়ে পড়িয়া থাকা উচিত।"

উপাসনাতেই আত্মসংযম এবং ঈশ্বর-চরণে একান্ত ভাবে আত্মনিবেদন। বিলাত থেকে ফিরে এসে শিবনাথ শাস্ত্রীকে বহু কাজে লিপ্ত হতে হয়, তার ফলে উপাসনার একাগ্রতায় চঞ্চলতা দেখা দেয় ও তাঁর হৃদয়ে যে হাহাকার উঠেছিল, তার স্বাক্ষর দিনলিপির পাতায় পাতায়।

১৮৮৯।৮ই জানুয়ারী তিনি লিখছেন: "এখানে ঘুরানীতে ধরিতেছে, পাঠ ও আত্মচিন্তার জন্য বসিতে পারিতেছি না। ইংলণ্ডে থাকিতে যে প্রার্থনা করিতাম তাহার ফল বিধাতা জীবনে দেখাইবেন বিশ্বাস কিন্তু আমি তদনুসারে প্রার্থনা ও জীবনের কার্য্যকে নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। একটা চিন্তা মনে উদয় হইতেছে—প্রভুর নিকট ভৃত্য তাহার বেতন পাইবে কিন্তু একমাত্র শর্ত এই যে সে প্রেম করিতে বিমুখ হইবে না, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার কাজ দিবে। আমার জীবনে কই সে প্রকার সেবাতে পূর্ণ করিতেছি। দৃঢ়তার সহিত কই তাঁহার কৃপাকে ধরিতে পারিতেছি। উপাসনা ও প্রার্থনাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিতে হইতেছে।"

১৮৮৯।৯ই জানুয়ারী তিনি লিখছেন: "যে প্রার্থনা দুইটি লিখিয়া বাড়ীর উপাসনাতে পড়িতেছি, হেমের মা আজি বলিলেন যে তাহা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। এ কথাটা রোজ রোজ ভাল লাগে না। এটা আমাদের প্রেমের অভাব। English Church-এ কত শত বৎসর Service পড়িয়া আসিতেছে। তাহাদের ভাল লাগে কিরূপে। যাহা হউক একটা নূতনত্ব করিতে হইবে।"

এই যে পারিবারিক বা সমাজে উপাসনায় একাগ্রতা আসে না তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি ১৮৮৯।১৬ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে প্রদত্ত "ধর্ম্মসাধন" উপদেশের স্মারকলিপিতে লিখছেন: "উপাসনার নির্দ্দিষ্টকালে যে উপাসনা ভাল লাগে না, অথবা সপ্তাহান্তে মন্দিরে আসিয়া যে মন বসে না, তাহার একটা প্রধান কারণ এই, নির্দ্দিষ্ট কয়েক সময় ভিন্ন অনেকের পক্ষে ধর্ম্মভাবের চালনার অন্য সময় বা উপায় নাই। প্রাতে ঈশ্বরের আরাধনা করিব এ-জন্য সমস্ত দিন ও রাত্রি প্রস্তুত হইতে হইবে, সপ্তাহান্তে উপাসনাতে যাইব এ-জন্য সমস্ত সপ্তাহ প্রস্তুত হইতে হইবে। এই প্রস্তুত হইবার জন্য তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—

(ক) দিবসের মধ্যে কিয়ৎকাল নির্জন চিন্তাতে যাপন করিবার নিয়ম।

(খ) ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মালোচনার নিয়ম।

(গ) ব্রত ও মন্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মভাবকে আয়ত্ত করিবার নিয়ম।"

পরিবার গঠনে নিজস্ব পরিবারের শিক্ষার ব্যাপারে শিবনাথের অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি ছিল। বিশেষতঃ পরিবারে স্ত্রীদিগের শিক্ষার জন্য তিনি উদগ্রীব ছিলেন। ১৮৮৯।৪ঠা জানুয়ারী তিনি লিখছেন:

"হেমের মা ও বিরাজ আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ঘোর দারিদ্র্য ভোগ করিয়া রন্ধনাদি করেন। তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির উপায় নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদিগকে রাখা অসুবিধা। ইংলণ্ডে যাওয়াতে এই অন্যায়টা চক্ষে বড় লাগিতেছে। উৎসবটা হইয়া গেলেই বাড়ীর বন্দোবস্তটা স্বতন্ত্র প্রকার করিয়া ফেলিতে হইবে।" ১৮৮৯।১০ই জানুয়ারীর দিনলিপিতে পরিবারের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিতে তিনি আবার বিলাপ করছেন: "এই নিরপরাধ স্ত্রীলোক দুইজন জন্মের মত ক্লেশভোগ করিতেছেন—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি আছে। ইঁহারা যে অবস্থায় রহিয়াছেন, তাহাও শোচনীয়। ইঁহারা কেবল রন্ধনশালার রাঁধুনী হইয়া রহিয়াছেন—ইঁহাদের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে কিছু চেষ্টা করা হয় না। আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সে বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারি না। অশিক্ষিত অবস্থায় নিষ্কর্ম্মা থাকিলে আলস্যে দিন যাপন করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। আলস্যের অনেক সহচর আছে। ইঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি অভ্যুদিত করিয়া সৎবিষয়ে লাগাইবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই।

ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন চিন্তার শক্তি নাই—দেশের নারী জাতির যে দুরবস্থা তাহা ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে আমার গুরুতর দায়িত্ব আছে—আমি তাহার উপযুক্ত কি করিতেছি।"

আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি সজাগ শিবনাথের জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতিপ্রীতিও দিনলিপির বহুস্থানে অভিব্যক্ত হয়েছে। ১৮৮৯।১১ই জানুয়ারী তিনি লিখছেন: "...রাত্রে ঠাকুর বাড়ীতে Evening Party-তে যাওয়া গেল। G. Yale ও Nortonএর অভ্যর্থনার জন্য এই Party হইয়াছিল।... একজন ইংরাজ Missionary উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন Mr. Shastri has become an Englishman. আমাতে সাহেবিআনা ঢুকিলে সর্ব্বনাশ। আমার কাজের একটা দায়িত্ব আছে। তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের লোকের সর্ব্বনাশ হইবে। ডাক্তার রায় প্রভৃতি এই দিকে টানিতেছেন, আমি যদি সেই দিকে দৌড়ি—সেই হিঁড়কে ব্রাহ্ম সমাজ সাহেবির তলে গিয়া পড়িবে।"

বিলাতে প্রদত্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতায় কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রথম, দেশে প্রচারিত হয় তিনি নাকি বিলাতে হিন্দুধর্ম-বিরোধী কথা বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিলাতে লিখিত History of the Brahmo Samaj পুস্তকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ও আদি ব্রাহ্মসমাজকে উচ্চভাবে তুলে ধরা হয়নি। এই সম্পর্কে ১৮৮৯।৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি লিখছেন: "...বিলাতের পত্র লিখিতে বসিয়াছি এমন সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের কয়েকজন শিষ্য আসিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন আমি denationalised হইয়া গিয়াছি। আমার বক্তৃতার একটা অযথা বিবরণ শুনিয়াছেন। সে বিষয়ে কিছু কথা হইল।" আবার লিখছেন: "এক অভিযোগ আমার নামে হইয়াছে যে আমি মহর্ষির নিকট বলিয়া গিয়াছি যে সেখানে আমি আমাদের শাস্ত্র হইতে বলিব কিন্তু সেখানে হিন্দুধর্মের নিন্দা করিয়াছি। অথচ সত্য এই, সেখানে ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা উপনিষদ্ হইতেই বলিয়াছি।"

দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে ঐ দিনেই তিনি লিখছেন: "আমার বিলাতের এক বক্তৃতার রিপোর্টে মহর্ষির নাম ছিল না, তাহাতে আদি সমাজের বন্ধুদের মনে হইয়াছে যে আমি মহর্ষিকে লোকচক্ষে হীন করিয়াছি—মহর্ষির কর্ণে বোধ হয় এই ভাবে গিয়াছে। তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। অথচ সত্য এই যে, আমি ব্রাহ্ম সমাজের যে ইতিহাস লিখিয়াছি তাহার যে অংশে আদি সমাজের কথা আছে, তাহাতে মহর্ষির জীবনের যে বিবরণ লিখিয়াছি তাহা পড়িয়া Miss Collet বলিয়াছেন যে মহর্ষির প্রতি তাঁহার ভাব অনেক ভাল হইয়াছে।"

১৮৮৯।৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি লিখছেন: "অদ্যকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার। ব্রাহ্ম সমাজের যে ইতিবৃত্ত ইংলণ্ডে লিখিয়াছি তাহার মধ্যে আদি সমাজের যে ইতিবৃত্ত অংশটুকু আছে, তাহা তাঁহাকে দেখাইতে যাওয়া গিয়াছিল। তিনি সেটুকু দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।"

এইসব বিরোধের সম্মুখীন হয়ে তিনি আশ্বস্থ হয়ে উপলব্ধি করে ১৮৮৯।৪ঠা ফেব্রুয়ারী লিখলেন: "আমার বিরোধী লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে—ইহাতে ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমাকে বিশ্বাসের দৃঢ়তার সহিত ও তাঁহার প্রতি একান্ত অন্তরে নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হইবে। এই সময়ে অণুমাত্র ভয় বা বিষাদের রেখা দেখিলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষতি হইবে।"

এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে শিবনাথের ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। তার পরিচয় পাই ১৮৮৯।১০ই ফেব্রুয়ারীর দিনলিপিতে। তিনি লিখছেন: "উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ আমাকে স্থায়ী আচার্য্য মনোনীত করিয়াছিলেন—কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনেকে তাহা উচিত বিবেচনা করিলেন না। ...আমি যে কলিকাতাতে স্থিরভাবে বসিয়া কাজ

করিব তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না—কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে ও তাহার বাহিরে এরূপ অনেক লোক রহিয়াছেন—যাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা যে, একা আমার হাতে অনেক শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, সেটা ভাল নয়। দ্বিতীয়তঃ অনেকের এরূপ ভাব যে আমাকে একেবারে কলিকাতায় ধরিয়া রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হইবে। যাহা হউক এই বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সমাজের হিতার্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে। ...লোকের মনে এই ভাব জন্মিবার সম্ভাবনা যে আমি বুঝি কলিকাতার কাজ একচেটিয়া করিয়া লইতে চাই। আমার প্রতি বন্ধুদের পূর্ণ আস্থা হইতেছে না বলিয়াই এরূপ সন্দেহ জন্মিতেছে। জীবনে আরও বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সঞ্চয় হইলে এই অনাস্থা দূর হইতে পারে।"

অতঃপর শিবনাথ শাস্ত্রীর ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীলতা, আত্মসমীক্ষা ও আত্ম-সমালোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। তাঁর কন্যা হেমলতা দেবী ঢাকায় ১৯২৮ সালে 'ব্রাহ্মিকা উৎসব' উপলক্ষে এক বক্তৃতায় তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন: 'পিতৃদেবের জীবনে কি দেখেছি? তিনি যে ভগবানের নামে দেহ-মনের সমুদয় শক্তি, দেহের প্রতি অণু-পরমাণু দান করেছিলেন, ভগবানের পূজা তিনি মুখেই করতেন না, তাঁর জীবন ছিল তপস্যাময়। এই পূজাই যে যথার্থ পূজা, কত বড় শ্রেষ্ঠ পূজা, তা এ-জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দেখেছি।" ঈশ্বরের পূজা এবং তাঁর প্রতি একান্ত নির্ভরতা ও তার জন্য নিজের সংগ্রাম শিবনাথের প্রতিদিনের প্রার্থনাতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৯৫।২৪শে মার্চ্চ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত 'প্রার্থনা' নামক উপদেশের স্মারকলিপিতে প্রকৃত প্রার্থনা সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন: "প্রকৃত প্রার্থনা কি, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—বিপথগামী পুত্র ও তাহার পিতার দৃষ্টান্ত। সে পুত্র যখন অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছে ও প্রাণপণে আত্ম-সংশোধনের প্রয়াস পাইতেছে, তখন এ আশা করা তাহার পক্ষে কি স্বাভাবিক নয় যে তাহার পিতার আশীর্ব্বাদ ও সাহায্য সে পাইবেই পাইবে? সেইরূপ মানুষ যখন নিজ জীবনের পাপ-প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করে এবং ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইবার জন্য প্রয়াস পায় তখন তাহার আশাপূর্ণ দৃষ্টি ঈশ্বরের উপর পতিত হয়।

"তবে প্রকৃত প্রার্থনার মধ্যে দুইটি সত্য নিহিত আছে, মানবের নিজের সংগ্রাম বা চেষ্টা এবং ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত্য। এই দুইটি প্রার্থনার উপাদান এবং প্রার্থনা এই দুইটিতেই বর্দ্ধিত করে এবং আত্মাতে একপ্রকার ঐশী-শক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়।"

১৮৮৯।২রা জানুয়ারী তিনি যে বিশেষ প্রার্থনাটি করেন তাতে তাঁর নিজের সংগ্রাম এবং ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত্যটি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন :—

বিশেষ প্রার্থনা

"হে দীন দয়াময়! আমি বিশেষভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমার প্রতি তুমি অনেক করুণা করিয়াছ। আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই এবং অনুতাপ করিবার আছে। তুমি আমাকে যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করিয়াছ, আমি তদুপযুক্ত কাজ করিতে পারি নাই। বিগত জীবনের জন্য অনুতাপিত হইয়া আমি ভাবী জীবনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আমি ভবিষ্যতে যাহাতে সমুচিত রূপে তোমার সেবা করিতে পারি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। আমাকে যে কার্য্যের জন্য ডাকিয়াছ সে কার্য্য সাধনে আমার সহায় হও। আমাকে তোমার ঐশী শক্তির ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান কর।"

এই প্রার্থনা ছিল শিবনাথের একান্ত নিভৃত সাধনা। এই সাধনায় কখনো আত্ম-ঘোষণা বা আত্ম-প্রদর্শন ছিল না। হেমলতা দেবী ডায়েরীতে লিখেছেন: "বাবা আপনাকে কখন ধর্ম্ম বিষয়ে অগ্রসর বলিয়া ভাবিতেন না। তাঁহার নিজের সাধন-ভজন ধর্ম্মচিন্তার কথা

কাহাকেও বলিতেন না, আমরা তাঁহার ডায়েরী পড়িলে জানিতে পারি।"

একদিকে ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসে একান্ত আত্ম-নিবেদন, অপর দিকে নিজের দীনতা সম্পর্কে আত্ম-সচেতনতা। হেমলতা দেবীকে লিখিত এক পত্রে তাঁর (শিবনাথের) দীনতা, হীনতা সম্পর্কে সরল স্বীকৃতিটি তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্যকেই ফুটিয়ে তোলে। চিঠির কিছু অংশ এখানে দেওয়া গেল।

31 Hilldrop Road,
London N,
14th September,
1888.

মা লক্ষ্মি, বাপধন,

তোমার দুইখানি পত্র এক সপ্তাহে পাইয়াছি। প্রথম পত্রে লিখিয়াছ কেহ কেহ গোপনে আমার নিন্দা করেন, তাহাতে তোমার গা জ্বলিয়া যায়। বোকা মেয়ে তুমি, তাহাতে বিরক্ত হও কেন? তোমার বাবা আপনাকে যত তীব্রভাবে নিন্দা করেন, এমন কোন বন্ধু আজিও করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ আমি আমার হীনতা সম্বন্ধে যেমন অনুভব করি আমার বন্ধুরা তত হীন আমাকে মনে করেন না।...আমার নিন্দা যদি কেহ করেন, তুমি তাহাদিগকে শত্রু ভাবিও না এবং তাহাদিগের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিও না। কারণ আমাদের সাধুতা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। আমাদের প্রতি কেহ সৎব্যবহার করিলে তবে আমরা সৎ হইব, তাহা নহে। লোকে সদ্ব্যবহার করুন আর নাই করুন আমরা যেন সকলের প্রতি সৎব্যবহার করিতে পারি।...যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও কি কি দোষ দেখাইয়াছেন তাহা যদি লিখিতে পার, ভাল হয়। হয়ত এমন হইতে পারে, তাঁহারা আমার যে দোষ দেখিতে পাইয়াছেন আমি তাহা পাই নাই। শুনিলে আমার উপকার হইতে পারে।...

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

এই আত্মসমীক্ষার পরিচয় পাই ১৮৮৯।১০ই জানুয়ারীর দিনলিপিতে। তিনি লিখছেন: "অদ্য প্রাতে নিজের উপাসনা করিবার সময় দেখা গেল যে উপাসনাকালে চিত্তের চঞ্চলতা অত্যন্ত বাড়িয়াছে। আবার আমি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে যাইতেছি। এখন আবার অধিক সতর্ক হওয়া উচিত।" ১৮৮৯।১৩ই জানুয়ারী লিখছেন: "অদ্যকার উপাসনাতে একটি বিষয় বিশেষরূপে অনুভব করিলাম। আমাদের চরিত্রে এক প্রকার effervescence আছে,—একটু বাতাস লাগিলে একপ্রকার উপরে উপরে ভাবের তরঙ্গ উঠে তাহার মধ্যে সারবত্তা থাকে না। আগামী বর্ষে যে বিশেষভাবে কার্য্য করিব ভাবিতেছি—এই অসারতার নিবারণ করা তাহার একটা লক্ষ্য।" হেমলতা দেবী ডায়েরীতে লিখেছেন: "ব্রাহ্ম-সমাজের লোকের ত্রুটি অপরাধ দুর্বলতার কথা শুনিলে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেন। 'আমি যদি মানুষ হইতাম এমন হইত না— আমার অপরাধে কিছু হইল না।' এই তাঁর কথা ছিল।" বাস্তবিক দেখছি ১৮৮৯।৩১ জানুয়ারী তাঁর জন্মদিনে তিনি লিখেছেন: "প্রচারকদিগের মধ্যে যোগটা কি আমার জন্যই হইতেছে না। আমার প্রেম ও উদারতার অভাব কি তাহার কারণ। দেখিতেছি এজন্য সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক ক্ষতি হইতেছে। যদি আমার জন্য ক্ষতি হইতেছে এমন হয়, ঈশ্বর আমাকে এই অপরাধ হইতে রক্ষা করুন।" ১৮৮৯।৭ই ফেব্রুয়ারীর দিন-লিপিতে পাই: "ইংলণ্ড হইতে যত প্রকার কাজ করিব মনে করিয়া আসিলাম, সে বিষয়ে এখনও বিশেষ করিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। আমার কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে করা হইতেছে না। পারিবারিক শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিব তাহা হইতেছে না—যে গ্রন্থ-গুলি প্রণয়ন করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা হইতেছে না— পূর্বের বিশৃঙ্খল অবস্থাতে যাইতেছি। সমাজের নানা-প্রকার কাজে জড়াইয়া পড়িতেছি। একবর্ণ পড়িবার কি দুই ঘণ্টা চিন্তা করিবার অবসর পাইতেছি না। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিতেই হইবে।"

সামান্য অপরাধ স্বীকার করার কি অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা রক্ষা। ১৮৮৯।১৬ই ফেব্রুয়ারী লিখছেন: "আজ দুইটা অন্যায় কাজ হইয়াছে। প্রথম নিজে কিরূপে ২১ ঘন্টা করিয়া পড়িয়াছিলাম তাহার বিবরণ বলিয়াছি —দ্বিতীয় নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, তুড়ীর বিবাহে যাইবেন কি না জানিতে পাঠাইয়াছিলেন—তদুত্তরে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছি তাহা খুলিয়া পাঠাইয়াছি। এ-কাজটা ভাল হয় নাই। আমি যে আমার experiences ও performances সম্বন্ধে highly বলিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা রক্ষা হইতেছে না।"

এই অকপট আত্ম-সমালোচনা ও নিজের দীনতা স্বীকৃতিই মহৎ চরিত্রের লক্ষণ। ১৮৮৯।২৯শে জুনের দিনলিপিতে সেই স্বীকৃতি ও ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: "যখন আমরা আপনাদিগকে নিরাপদ্ ভাবিয়া আত্মতৃপ্ত থাকি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা ম্লানভাব ধরিতে থাকে, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করিয়া আমাদিগকে কোন না কোন প্রবল প্রয়োজনের মধ্যে ফেলিয়া দেন অথবা বিপদ্‌রাশির দ্বারা আমাদিগকে আবৃত্ত করিয়া ফেলেন। তৎদ্বারা আমাদের আত্মদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়, দর্প খর্ব্ব হয়, ঐশী শক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়। উন্নতি-স্পৃহা আবার অন্তরে উদ্দীপ্ত হয়। কিছুদিন হইতে আমার জীবন ম্লান ভাবাপন্ন হইতেছে, চারিদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের অবস্থা অতি মলিন বোধ হইতেছে; সকলেই যেন উৎসাহবিহীন ম্লান ভাবাপন্ন। প্রচারকদিগের বিশেষতঃ আমার ম্লানভাব ইহার একটা প্রধান কারণ। আমি যেন সকলপ্রকার কর্ত্তব্যসাধনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছি। জীবনে ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশের অনুগত হওয়া দূরে থাকুক, তদ্বিরুদ্ধ দিকে গতি হইতেছে। এইজন্যই বোধ হয় কয়েকদিন হইতে জগদীশ্বর একটা বিশেষ প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ হইতে দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন আমি নিরাপদ্ অবস্থা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই।

আমার জীবনকে আবার নূতনভাবে বাঁধিতে হইতেছে, আবার নূতন প্রার্থনা ও নূতন উদ্যম আরম্ভ করিতে হইতেছে।...এজন্য এই ব্রত লওয়া যাইতেছে—

প্রথম। আগামী ১লা আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত একমাস কাল প্রতিদিন দৈনিক লিপি লিখিব।

দ্বিতীয়। নিজের উপাসনার প্রাক্কালে তিন পরিচ্ছেদ করিয়া পলের পত্র পাঠ করিব—তদ্দ্বারা বিশ্বাস, বিনয় ও আত্ম-সমর্পণের ভাব বর্দ্ধিত হইবে।

তৃতীয়। তদ্ভাবাপন্ন একটি প্রার্থনা প্রতিদিন উপাসনান্তে করিব।"

বিপ্রলব্ধ

ফজলুল হক

অবশেষে সুব্রত জেল থেকে ছাড়া পেল। নিঃসঙ্গ দিনগুলোর এবারে অবসান ঘটল। বিষণ্ণতার বিবর্ণ আকাশে হঠাৎ শান্তির শুকতারা দেখা গেল। অন্ধকার ত্যাগ করে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল সুব্রত।

কিন্তু কি তার অপরাধ ছিল? যার জন্যে তাকে আজ তিনটে মাস জেলের মধ্যে নিঃসঙ্গ ভাবে কাটাতে হয়েছে?

পথে নেমে আসে সুব্রত। রাস্তার দু'পাশের জনতার সঙ্গে সেও মিশে যায়। পলকহীন দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

কোথায় যাবে সে? কে আছে তার?

হঠাৎ শান্তির শুকতারা আবার হারিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের ফেলে আসা জীবনের কিছুটা-অংশ। একটা কথাই বারবার মনে পড়ে সুব্রতের—

মা ভাত দাও তো—

ব্যাস, এই কথা। মা যে এই কথার জবাবে অমন ধারা কথা বলবে, তা সে ভাবতেই পারে নি। আবার কথাটা কানের কাছে ভেসে আসে। মাঝে অবশ্য রাস্তার মোটরের ভোঁ ভোঁ শব্দ এসে সুব্রতের চিন্তার স্রোত ছিন্ন করে দেয়।

মা, ভাত দাও তো—

কি এমন রাজ-কাজ করে এলি যে, তোর জন্য ভাত বেড়ে রেখে দেব।

মা।

লজ্জা করে না তোর। এত কষ্ট করে তোকে বি এ পর্যন্ত পড়ালাম। এবারে তোর ভাতের যোগাড় তুই যদি না করতে পারিস তো আমরা কোথা পাব? তোর বাবা তো দিনের পর দিন খেটে খেটে মরতে বসেছে। তার উপর কন্যাদায়ের চিন্তা তাকে মুমূর্ষু করে তুলেছে। আর তুই দিনের পর দিন আমাদের ভাঁওতা দিয়ে যাচ্ছিস। আজ হবে, কাল হবে, চাকরি হবেই। কিন্তু কবে হবে শুনি? এতদিন ধরে যে লোকের পেছনে ঘুরে মরলি, তাতে কি লাভ হলো শুনি?

মা তুমি শুধু শুধু আমাকে বকছ—

তোকে বকব না তো কাকে বকব শুনি। বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে। এঘরের দরজা আজ থেকে তোর জন্যে বন্ধ।

এক মুহূর্তে সুব্রতের মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। সত্যি তো, এতদিন ধরে তার মা, বাবাকে সে কি দিয়েছে? কিন্তু তার জন্যে দায়ী কি সে নিজে? না যাদের পেছনে পেছনে এতদিন ঘুরেছে, তারা?

হ্যাঁ, তারাই তো। তারা কেবল সান্ত্বনাই দিয়ে এসেছে সুব্রতকে। আর সুযোগ বুঝে সুব্রতকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছে। মনের ভিতর প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত মায়ের কাছে নরম সুরে বললে, মা, আমার মত কত বেকার ঘুরে ঘুরে এই অমূল্য সময় নষ্ট করছে। কিন্তু কী করে সম্ভব এত বেকারকে চাকরি দেওয়া? দেশের যা পরিস্থিতি তাতে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। তবে আমরা চেষ্টা করতে ছাড়ব কেন?

—তবে যাও, তাই কর গে। এখুনি চলে যাও।

মায়ের কথা সুব্রতের বুকে ভীষণ ভাবে আঘাত দেয়। শরীরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো উত্তাল তরঙ্গের মত নাচতে থাকে। এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার। সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আর ফেরে নি। একটা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে সেদিন যে প্রচণ্ড মারপিট হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার জেল হয়।

চিন্তা করতে করতে কখন সে যে তার বাড়ীর সামনে এসে গেছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। এই সে এতদিন পর প্রথম বাড়ী ঢুকবে। এক সঙ্গে আবার অনেকগুলো চিন্তা এসে ভিড় করেছে, মা, বাবা, বোন, অণিমা, এরা সব কেমন আছে।

দরজায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর ভেসে এল তার কানে। আশ্চর্য্য হয়ে যায় সুব্রত। গান! তাও আবার তাদের বাড়ীতে। এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় সুব্রত। আরও আশ্চর্য্য হয়ে যায় গায়িকাকে দেখে।

হঠাৎ অপরিচিত একজন যুবককে দেখে গায়িকা তার সামনে এসে বললে, কি গো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এস।

কিছুক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে আবার বললে, তোমাকে নতুন নতুন মনে হচ্ছে, কোথা থেকে আসছ গো।

সুব্রত হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে বললে, অ—ণি—মা—

সঙ্গে সঙ্গে গায়িকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সুব্রতকে এতক্ষণ সে চিনতে পারেনি।

কি করে চিনবে, সারা মুখ যে দাড়ি গোঁফে ভর্ত্তি। শরীরটা কালি হয়ে গেছে। কণ্ঠস্বর না শুনলে হয়তো সে চিনতেই পারত না।

হ্যাঁ, সুব্রত চিৎকার করে একটা চড় বসিয়ে দিল অণিমার গালে। ততক্ষণে অণিমাও বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেও চিৎকার করে বলল, তোর লজ্জা করল না দাদা, আমাকে মারতে? যার এক পয়সা রোজগার নেই, সে কিনা পরের রোজগারে বাধা দেয়। এত সাহস—তোর।

—এ রকম রোজগার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল।

—তাই বুঝি মরতে গিয়েছিলি। তা মরলি না কেন?

সুব্রতের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

অণিমা বললে, মা বাবা আমার বিয়ের চিন্তায় শয্যাশায়ী। তাঁদের বাঁচানো উচিত মনে করেই তাঁদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু সেখানেও তো খরচ আছে। এই সব লোকেদের মনোরঞ্জন না করলে তাদের পথ্যের টাকা কোথা থেকে পাব শুনি? দে না কিছু টাকা, তা হলে আমি এসব ছেড়ে দি।

সুব্রত তখনও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল টপ টপ করে পায়ে এসে পড়ছে। অণিমা বললে, কি রে চুপ করে আছিস যে? বল্, কিছু টাকা দিবি দাদা, এসব আমার ভাল লাগে না। ব— দিবি—বল্—

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুব্রত। এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! তার জন্য কি কোন জায়গা খালি নেই? যেখানে সে দুটো পয়সা রোজগার করবে?

এগিয়ে যায় সুব্রত, যেমন করে হোক তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে বাবা, মা, অণিমাকে।

চিন্তা করতে করতে আবার সেই রাস্তার উপর নেমে আসে। রাস্তার পথিকদের সাথে সেও পথিক হয়ে যায়।

চলতে চলতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় সুব্রত। একটা রিকশার সামনে এসে দাঁড়ায়। চেয়ে দেখে তারই একজন কলেজের বন্ধু রিকশা টানছে। মনে মনে সেও আশার আলো দেখতে পায়। রিকশায় হাত দিয়ে বলে, কি রে অপু, চিনতে পারছিস্ না, আমি সুব্রত।

সুব্রত! তোর এ কি চেহারা, কবে বেরুলি?

আজ।

বাড়ী যাস্ নি—

কি হবে বাড়ী গিয়ে।

তা সত্যি কথা। বি এ পাশ করে রিকশা টানা ছাড়া আমাদের দ্বারা আর কিস্যু হবে না রে।

দে-না ভাই আমাকে এরকম একটা কাজ জুটিয়ে।

তুই পারবি?

কেন পারব না? তুই পারছিস—

আচ্ছা দাঁড়া—আমি দুটো সিগারেট কিনে নিয়ে আসি।

আরে না, না, সিগারেট নয়—বিড়ি নিয়ে আয়।

অপু চলে যায় একটা পানবিড়ির দোকানে।

সুব্রত ভাবতে থাকে। কি পেল সে। কত স্বপ্ন তার ছিল। কত আশা নিয়ে সে বড় হয়েছিল।

দিনের পর দিন কত রঙ্গীন স্বপ্ন সে দেখেছিল। মনে পড়ে যায় কণিকার কথা। হঁ্যা, যাকে সে সব চেয়ে আপন করে ভেবেছিল। যাকে নিয়ে সে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখেছিল। সেই কণিকা আজ কোথায় কে জানে? মনে পড়ে কণিকা তাকে বলেছিল, তোমার মনের সমস্ত বাসনা পূরণ করা যে আমার দরকার। কী চাও তুমি। বলো আমাকে, বলো।

সুব্রত বলেছিল, তুমি ছাড়া আমার আর চাইবার কিছু নাই কণিকা।

আমাকে তো তুমি পেয়েছ। যতদিন বাঁচব আমি তো তোমারই। শুধু তোমারই।

এত দুঃখের মাঝেও সুব্রতের মুখে হাসি দেখা যায়। আবার ভাবে সুব্রত। একবার কণিকার কাছে গেলে কেমন হয়। সে যদি কোন কাজের সন্ধান দেয়। তার বাবা তো বেশ নামজাদা লোক, নিশ্চয়ই কোন কাজের সন্ধ্যান দিতে পারবেন।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় কণিকার কথা, তুমি বাবাকে একবার ধর সুব্রত। বাবা তোমার কাজের যোগাড় করতে পারবেন।

কিন্তু সুব্রত যায় নি। অপরের দান গ্রহণ করে সে বেঁচে থাকতে চায় নি।

না, না এখন আর আদর্শ সে দেখবে না, এখন তাকে পয়সা রোজগার করতে হবে।

রিকশা থেকে সরে আসে সুব্রত। হঠাৎ রিকশার আয়নায় তার নিজের মুখটা দেখতে পায়। সে নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না। বিশ্বাস করতে পারে না যে, সে এত খারাপ হয়ে গেছে। কি বিশ্রী লাগছে তাকে!

না, না, এ চেহারা নিয়ে সে কণিকার কাছে যেতে পারবে না। সে রিকশাই টানবে। তার এ ছাড়া অন্য পথ নেই। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

ততক্ষণে অপু এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে জল দেখে বললে, কি রে, কাঁদছিস—

না—না বন্ধু, এযুগের ছেলেদের চোখে জল আসে না। তারা যে দুঃখকে সহ্য করে নিয়েছে। এটা নিছক—

থাক আর বলতে হবে না। নে একটা বিড়ি নে। হঁ্যা, ভাল কথা, রিকশা টানবি?

তবে কি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছি?

আচ্ছা. কাল পরশুর মধ্যে তোর রিকশা যোগাড় করে দেব। ততক্ষণ তুই আমারটা চালিয়ে অভ্যাস কর্।

—ও অভ্যাস আমার আছে।

—তবে ভাল কথা। এখুনি একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা আসছেন। ওনারা কোর্টে যাবেন? তুই ওঁদের নিয়ে যা।

কিছুক্ষণের মধ্যে একজন সুদর্শন যুবক ও একজন সুন্দরী যুবতী এসে অপুর রিকশার উপর উঠে বসল।

যা নিয়ে যা, বললে অপু।

সুব্রত কোনদিকে লক্ষ না করে, প্রথম পরীক্ষার জন্য রিকশায় চড়ে বসল। তারপর ধীরে ধীরে চালাতে লাগল।

রিকশার গতি দেখে যুবতী বিরক্তিভরে বললে, এই রিকশা-ওলা, জোরে চালাও—

যুবতীর কণ্ঠস্বর শুনে সুব্রত চমকে উঠল। পেছন দিকে চেয়ে দেখল কণিকা সিটের উপর বসে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সুব্রত। না, কণিকা তাকে চিনতে পারল না, বরং বললে, কি দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে, গাড়ি চালাও। সুব্রত ধীরে ধীরে গাড়ীটা নিয়ে এল কোর্টের সামনে। ওরা দু'জনে নেমে গেল, সুব্রতকে অপেক্ষা করতে বলে।

সুব্রত অপেক্ষা করল ওদের জন্য। ওরা এল। কণিকা এসে একটা দশ টাকার নোট সুব্রতের হাতে দিয়ে বললে, আমরা কোর্টে বিয়ে করলাম, তাই আজ খুশির দিনে তোমাকে আমরা দশ টাকা দিচ্ছি।

সুব্রত চেয়ে রইল কণিকার দিকে। চোখে তার বিন্দু বিন্দু জল। কণিকা বললে, কি ব্যাপার—আমাদের এই আনন্দের দিনে তুমি কাঁদছ কেন? টাকাটা নাও।

সুব্রত এবার খুব ধীরে ধীরে বললে, ওটা রেখে দাও কণিকা—তোমাদের বিয়েতে আমারও কিছু দেওয়া দরকার তো।

কণিকা মুহূর্তে চমকে উঠল। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল—

সুব্রত॥

শ্রীঅরবিন্দ

(প্রণতি-সঙ্গীত)

শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রচিত

নিশিকান্ত (১৯০৭-৭৩)

যেদিন তিমির বারিধি মথিল তব সাধনার উদয়াদিত্য :
ধূলায় সোনার সরণী হেরিল বসুন্ধরার পথিকচিত্ত,
মুক্তি লভিল জড়বাসনার পাষাণকারার অযুত বন্দী,
তব অসিধার-চেতনে খসিল অবচেতনের রুধিরগ্রন্থি।
অবতরণের পথের বিশাল সঙ্কটগিরি করি' বিদীর্ণ
পশিয়া পঙ্কে তনুপঙ্কজ রূপান্তরিলে, হে অবতীর্ণ।
   ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
   নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
সুনীল স্ফটিক-মূর্তনয়ন সুদূর-জাগর সুপ্তিমগ্ন,
উদার-ললাট-অচলশিখর পূর্ণশশীর বিকাশলগ্ন।
গগনে পবনে তব বিকিরণ, তব বিভা ধরে তপন-চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ জগত-জলধি উথলিয়া তোলে জ্যোতির্মন্ত্র।
অবিচল-ধ্যানে তুমি হিমাচল, জ্ঞানে অনন্তনভঃস্পর্শী,
রচনা তোমার সদাশাশ্বত, লোচন তোমার ত্রিকালদর্শী।
   ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
   নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
উর্ধ্ববিহারী প্রগতি তোমার জিনিল সৌরশৈলজঙ্ঘা,
তুষারশুভ্র কুন্তলে তব কল্প-কল্প-বাহিনীগঙ্গা।
তব সাধনায় মিটিল ধরার ভীষণ মরুর উষর তৃষ্ণা,
ভাসিল অতল সুধাতরঙ্গে পাতালবাসিনী—কামিনীকৃষ্ণা।
মর্তের মার্তণ্ডবিনাশী প্রতিভায় তব দ্বাদশ সূর্য,
নীরব লেখার অক্ষরে তব বাজিল বিশ্ববিজয়তূর্য।
   ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
   নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
কালের প্রলয় প্রবলঘনে হানে সংঘাত অবিশ্রান্ত,
তারি মাঝে তুমি তপোনিমগ্ন, হে চির নীরব, হে মহাশান্ত।
তারি মাঝে তুমি বিতরিছ তব শীতল করুণা-সলিল-বৃষ্টি,—
তারি সিঞ্চনে শ্মশান-মেদিনী করে নন্দনকানন সৃষ্টি।

তুমি যে মরণে মৃত্যুঞ্জয়, জীবনযাপনে জীবন্মুক্ত,
সমরে অধীর মানবতা মাঝে অটলযোগের আসনে যুক্ত।
ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
তোমার গভীর-উপলব্ধির বৈভবরাশি ভবে অমূল্য!
বিক্রমে তুমি মহাবিপ্লবী, বিনম্রতায় তৃণের তুল্য;
যশোগৌরবে বিশ্বে বিরাট্,—কবিসম্রাট্ তোমারে বন্দে
ভাবগম্ভীর নমস্কৃতির বাণীমন্দ্রিত উদার ছন্দে,
তারি ছন্দের ধ্বনির প্রবাহে জ্যোতিষ্কদল আসি' অলক্ষ্যে
তোমারে হেরিয়া হে জ্যোতির্ময়, লভে দেবালয় কারার কক্ষে।
ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
তুমি ছাড়া আর কাহারো কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে না অভয় উক্তি,
তুমি ছাড়া আর কেহ তো আনে না তৃষিতের প্রাণে প্লাবন-মুক্তি
দিশাহারাদের হে দেবদিশারী, ধ্রুবতারাসম তুমি অতন্দ্র;
হতাশ্বাসের প্রাণে তুমি দিলে পরমাশ্বাস-দানের মন্ত্র।
পার্থিব সম্মানের মুকুট পথের ধূলায় করিয়া তুচ্ছ
তুলেছ তোমার কর-কোকনদে দীনভক্তের প্রসূনগুচ্ছ!
ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
বসুমতী তব লীলার ক্ষেত্র, মহাশক্তি যে তোমার শক্তি,
মানব মানসে অভিনব তব অতিমানসের অভিব্যক্তি।
তব জন্মের শতবর্ষের শিখাশতদলে হইয়া দীপ্ত
কোটিকল্পের বিপুল ভ্রমর বহ্নিমধুর ধারায় তৃপ্ত।
নিয়তির নক্ষত্রমালিকা হেরিয়া মহোৎসবের মত্তে,
অনন্ত নভে আজি গতি লভে রূপান্তরিত বিভাবিবর্তে।
ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।
হে পদ্মপ্রভু, পরমোৎপল, বিভু অম্বুজ, সরোজসদ্ম।
অখিলে পাবক প্রাপ্তি আনিল তব শতাব্দী-শোভিত পদ্ম:
এই পার্বণে তব পার্বতী করে দীপারতি, বাজায় শঙ্খ;
তব কমলার কুসুমে-রতনে রঞ্জিত হয় পূজার পঙ্ক;
পঙ্কতিলক অঙ্কিত ভালে তব অবনীর জাতকবর্গ
আত্মদানের প্রণতির গানে সাধিল তোমার জ্যোতির স্বর্গ!
ধন্য করিয়া ধরণীকমল অমলবিকাশে তুমি অনিন্দ্য,
নিখিলশরণ তোমার চরণ, প্রণমি তোমারে শ্রীঅরবিন্দ।

শেষবারের মতো

করুণাময় বসু

চলে যেতে যেতে শেষবারের মতো বসন্ত ডাক দিয়ে
গেল :
আমলকী বনকে নাড়া দিয়ে, পাতাঝরা বকুলগাছের
নিচে
আলোছায়ার ঝিলিমিলি রেখা টেনে, আমের মুকুলে
হাত বুলিয়ে—
এবারের মতো তবে যাই—নীল, কমলা, সবুজ রঙের
পাল গুটিয়ে
আকাশের কোন নিভৃত দিগন্তের নির্জন উপকূলে
নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।
হঠাৎ গানের খুশির মতো একটা সুরেলা গোপন ইচ্ছা
আমার কানে কানে বললে : ভয় কি, বসন্ত গেলেও
আমি আসব ;

এই সেন্নো রোদে, ঘুমঘুম ঝিঁঝুকের স্বপ্নে, পিয়াল গাছের
ছায়ায় ছায়ায়
ঝরা পাতায় খেলনা সাজিয়ে আমি আসব। চিত্রকল্প
মায়ার জাল বুনে,
কল্পনার স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে, স্বপ্নকে রঙীন করে আবার আমি
আসব,—
দরজায় কড়া নেড়ে ডাক দেব : এই যে আমি, চিনতে
পারো ?
আমিই ছায়া থেকে ছবি আঁকি, বেদনার শূন্যতা থেকে
স্মৃতির পশরা সাজাই :
বুকের মণিহার থেকে যে টুকরো টুকরো মাণিক গড়িয়ে
জলে পড়ে গেল,
আমিই তাকে কুড়িয়ে এনে দেই : বলি, এই নাও।
জীবনের ফাঁকিকে
চিরকালের সুধারসে পরিপূর্ণ করে দেই। কেউ আমাকে
চিনতে পারে,
কেউ চিনতে পারে না।

পোলাণ্ডে "বসন্তসেনা" অভিনয়

পোলাণ্ডের ক্রাকো সহরের জুলিয়স স্লোওয়াকি থিয়েটারে সম্প্রতি শূদ্রকের লিখিত মৃচ্ছকটিক নাটিকা অবলম্বনে রচিত বসন্তসেনা নামক একটি নাটক অভিনীত হইয়াছে। নাটকের নানান ভূমিকায় যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা অতি সাধারণ মানুষ ও এক অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে তাঁহারা আন্দোলনে নিযুক্ত আছেন। মৃচ্ছকটিক নাটিকা আজকাল ভারতবর্ষে বিশেষ জনপ্রিয়তা আহরণ করিয়াছে। কারণ—যদিও উহা প্রায় ষোলশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল তথাপি বিষয়টির বেশ একটা আধুনিকতা আছে। ইয়োরোপেও এই নাটিকাটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। ক্রাকোর নাটক অভিনয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ক্রীষ্টীনা স্কুসজানকা এই অভিনয়ের ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন এবং দর্শকগণ অভিনয় দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী

ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময় বিপিনচন্দ্র পাল যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা "তত্ত্ব-কৌমুদী" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবি নাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। নূতন ব্রাহ্মসমাজে আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের একটা সর্বাঙ্গসুন্দর নমুনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের, আমেরিকার এবং ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া তাহার ছাঁচে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের constitution (কন্‌ষ্টিটিউশন) গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা কেবল একটা সংকীর্ণ ধর্মসমাজই গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই।...স্বাধীনতার এবং মানবতার সাধকরূপে ব্রাহ্মসমাজ যেমন একটা আদর্শ পরিবার ও একটা আদর্শ সমাজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া একটা আদর্শ রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রও গড়িয়া তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। এই ভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্‌ষ্টিটিউশনের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কন্‌ষ্টিটিউশনের একটা ছোটখাট নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মেরা গণতন্ত্রতা মঙ্গ করিবেন। দেশের লোকেও ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালীর ভিতর এই গণতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

দার্জিলিঙ হইতে নেপালী মুখপত্র প্রকাশ

নিম্নলিখিত সংবাদটি "পশ্চিমবঙ্গ" সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সম্প্রতি দার্জিলিঙে সরকারী প্রেসের উদ্বোধন করেন। এই প্রেস থেকে প্রধানতঃ নেপালী ভাষায় ছাপার কাজ চলবে। দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার সঙ্গে নেপালী ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদাদানের জন্য রাজ্য সরকার যে সংকল্প নিয়েছিলেন, এই ছাপাখানার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তার অন্যতম পদক্ষেপ সূচিত হল।

এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খুব সাধারণভাবে আজ এই প্রেসের কাজ শুরু হলেও অদূর ভবিষ্যতে, এ অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অগ্রগতির পাশাপাশি জনকল্যাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্ব লাভ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রেস শুধু দার্জিলিঙেরই নয়, পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির চাহিদাও পূরণ করবে এবং বেকার সমস্যা সমাধানেও এ যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হবে।

দার্জিলিঙ থেকে সরকারের নেপালী সাপ্তাহিক 'পশ্চিমবঙ্গাল' প্রকাশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্যসরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের নেপালী মুখপত্র সাপ্তাহিক 'পশ্চিমবঙ্গাল' পত্রিকাটি ১৮ মে থেকে দার্জিলিঙে মুদ্রিত ও সেখান থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া রাজ্যের সেচ ও বিদ্যুৎ এবং দার্জিলিঙ পার্বত্য-বিষয়ক মন্ত্রী আবু বরকত গণি খান চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা প্রমুখ ভাষণ দেন। শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীগজেন্দ্র গুরুং সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমতী মায়া রায় এম পি-ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকটি সংখ্যা

যুগবাণী হইতে এই সংখ্যাগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

পঃ বঙ্গ সরকারের পশুপালন ও পোলট্রি বিভাগ

	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২
(ক) হরিণঘাটায় গরুর সংখ্যা	১৫৪৬	১৩৭৫
,, দুগ্ধ উৎপাদনের		
দৈনিক গড় কে.জি.	৩০২৩	২৬৮৬
কল্যাণীতে গরুর সংখ্যা	৪৩৬২	৩৬৩৩
,, দুগ্ধ উৎপাদনের		
দৈনিক গড় কে.জি.	১০৮৩৯	১০,১৭৮
(খ) হরিণঘাটায় মহিষ	৩০	৩৪
দুগ্ধ উৎপাদনের		
দৈনিক গড় কে.জি.	৯১	৯০
পোলট্রি		
হাঁস	১৯২৫	৮৩০
দৈনিক হাঁসের ডিম		
উৎপাদনের হার	৫৮	৬৫
মুরগীর সংখ্যা	৫৭;৭০৩	৬৩,২৫৮
দৈনিক ডিম উৎপাদনের		
হার	৪,৯০৩	৫৬৪৯

কলিকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন

	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২
১। রুটের সংখ্যা	২৯	২৭
২। গাড়ীর সংখ্যা		
৩১ মার্চ	১০৫৯	১১২১
বার্ষিক গড়	১০৭৬	১১২১
(৩) দৈনিক গত গাড়ী		
রাস্তায় বাহির হয়	৪৯৩	৪৭১
৪ " কত কর্মী		
নিয়োজিত হয়	১২,০৮২	১২০১৭
৫। কত যাত্রী বহন		
করে (হাজারে)	২৮৯,৯০০	২৫৫,৩৪৬
৬। আয়		
(হাজারে)	৩৯,৯২৮	৩৭,৭১২

উড়ন্ত চাকি

শ্রীসন্তোষকুমার দে এম এ এইচ (কলি), ডিপ এড (ডাবলিন, "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছেন—

কিছুদিন আগে সুন্দরবন এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক সম্পন্ন চাষীবন্ধুর ঘরে গিয়ে উঠলাম। নিরক্ষর অজ্ঞ চাষীভাইদের মধ্যে দিন কতক কাটিয়ে আর সুন্দরবনের বনবাদাড় ও কিছু কিছু জন্তু জানোয়ার দেখে ফিরবো মনে করছিলাম। এমন সময় এক অঘটন ঘটে গেল। এক রাত্রে চাষীবন্ধুর ঘরের দাওয়ায় ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ এক চোখ-ঝলসানো আলোর ঝিলিকে ঘুম শুধু আমারি ভাঙল না, গৃহস্বামীরও ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম তিনি একবার মুখ বাড়িয়ে দেখেই ভক্তিভরে প্রণাম করে ঘরে ঢুকে

াড়লেন, আর আমাকে বললেন, ওদিকে অমন করে তাকিয়ে থাকবেন না, কিসে কি হয় বলা যায় না, ভেতরে চলে আসুন। তাঁর কথা অমান্য না করে ভেতরে গেলাম বটে কিন্তু মনটা পড়ে রইল বাইরের ঐ হঠাৎ আলোর ঝলকানির দিকে। যাই হোক গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ আলো দেখে আপনি অমন ভক্তিভরে প্রণাম করলেন কেন, আর তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরেই বা ঢুকে পড়লেন কেন? গৃহকর্তা বললেন, ওনারা এসেছেন দেবলোক থেকে, তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম যেন আমাদের চাষবাসের ক্ষতি না হয়। ওঁরা মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে উপস্থিত হন, আর আমরা, মানে এখানকার লোকেরা ওঁদের আগমন জানতে পারলেই প্রণাম আর প্রার্থনা জানিয়ে ঘরের ভেতর চলে আসি। কি উদ্দেশ্যে ওঁরা আসেন বা কি করেন তা আমাদের জানবার বা দেখবার দরকার কি? হ্যাঁ, যে বছরে আসেন সে-বছর দেখি ফসলটা ভালই ফলে; তা আমাদের মানতের জন্যে, না তাঁদের দয়ার জন্যে তা জানি নে।

অবাক কাণ্ড! এসব কথা কেউ মনেও নিতে পারে না, আর মেনেও নিতে পারে না। যাই হোক কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তাই ঘরের ভেতর থেকে দুয়োরটা একটু ফাঁক করে দেখতে লাগলাম—ব্যাপারটা কি, হঠাৎ অন্ধকারে এত আলোই বা কেন। কিন্তু দূর থেকে আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। মনের কৌতূহল মনের মধ্যে চেপেই ঘরের ভেতরে শুয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভোর হলেই উঠে ঐ জায়গাটা লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম। আন্দাজমত জায়গাটায় এসে দেখলাম কেউ নেই সেখানে; তবে ঝোপের মধ্যে কতকগুলো পাতা যেন একটু ঝলসানো বলে মনে হল, আর কতকগুলো ডালপালা ভাঙা, দোমড়ানো-মোচড়ানো, মাটিতে কিছু কিছু বড় বড় ছাপও দেখা গেল' কিন্তু সেগুলো ঠিক মানুষের পায়ের ছাপ বলে মনে হল না। একটু আশ্চর্য হলাম বই কি! কেউ যদি সত্যি-সত্যিই এসে থাকে তাহলে নিঃশব্দে কেনই বা এল, আর কেনই বা গেল, আর তাদের পায়ের ছাপ পড়ল নাইবা কেন? অদম্য কৌতূহল মনে, কাকে এদের কথা জিজ্ঞাসা করব? কেউ হয়ত এদের দেখেনি, আর দেখলেও জানলেও হয়ত অহেতুক ভয়ের জন্যে কিছুই বলবে না। কি আর করা যাবে? মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ঠিক করলাম, আজকের রাতটা জেগে থাকতে হবে, সত্যিই যদি কেউ আসে তা হলে চুপিসাড়ে তাদের কাজকর্ম দেখতে হবে, আর সম্ভব হয় ত তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে। সারা রাতটা জেগে কাটিয়ে দিলাম, কেউ এল না। ভোর হয়ে গেল।

পরের দিন ক্লান্ত হয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাঝরাতে আবার আলোর ঝলকানিতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম একটা গোলমত জিনিস প্রচণ্ডবেগে ঘুরতে ঘুরতে ঐ ঝোপগুলোর কাছে এসে থেমে গেল। তারপর মনে হল যেন দু-তিনজন লোক ঐ চাকি থেকে নেমে এল। মনের প্রচণ্ড কৌতূহল থামাতে পারলাম না। ঠিক করলাম, যা থাকে কপালে, আজ ওদের কাছে যেতেই হবে, দেখতে হবে ওরা কে, কি করছে, আর কোথা থেকে আচম্বিতে এসে উপস্থিত হল। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জুতো খুলে ফেলে গায়ে একটা জামা চাপিয়ে আস্তে আস্তে ঝোপের দিকে এগিয়ে চললাম। ঝোপের যেদিকটা একটু অন্ধকারমত ঘুরে সেই দিকটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। কাছাকাছি গিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কাজকর্ম লক্ষ্য করতে লাগলাম। অন্ধকারে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, আমি কিন্তু ওদের ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম। উঁকিঝুঁকি মেরে ওদের দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কে একজন এসে আমাকে খপ করে ধরে ফেলল। লোকটা ভয়ানক লম্বা, বোধ হয় আট-ন ফুট হবে। মুখগুলো ওদের মুখোসের মত কি একটা দিয়ে ঢাকা, চোখের গর্তে পুরু কাল কাচ, মনে হল যেন গগলস্ চশমা পরেছে। লোকটা আমাকে ধরেই টপ করে তুলে নিল, ঠিক যেমন আমরা এক-দু' বছরের বাচ্চা ছেলেকে অনায়াসে কোলে তুলে নিই ঠিক তেমনি। আমাকে তুলে নিয়ে এল ওর আর দুই সঙ্গীর কাছে। দেখলাম

ওরাও ঐ লোকটার মত লম্বা। মানুষ যে এত লম্বা হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। আমাকে এনে ঐ দু'জনার কাছে জিম্মা করে দিল। তারপর নিজেরা হাত মুখ নেড়ে কি যেন বলাবলি করল বুঝতে পারলাম না, আবছা অন্ধকারে দেখলাম, শুধু হাত পা নাড়ছে। তারপর বলা নেই, কওয়া নেই আমাকে সেই উড়ন্ত চাকিতে বসিয়ে দিয়ে, তারাও তার ওপর উঠে পড়ল। আবার আলো জ্বলে উঠল। একটা শব্দ হল। তারপর রকেট ছাড়ার মত একটা গর্জন করে চাকি সোঁ সোঁ করে প্রচণ্ডবেগে আকাশপথে পাড়ি জমালো। মনে হল যেন ঘন্টায় ৩০।৪০ হাজার মাইল বেগে চাকি উঠে চলেছে। খানিকক্ষণ পরে আমার ভয়ানক শীত করতে লাগল। ওরা কি একটা জন্তুর লোমে তৈরি একটা আলখেল্লার মত জামা দিয়ে আমায় জড়িয়ে দিল। শীতটা কমে গেল। বেগের আবেগে স্পন্দিত হতে হতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তারপর কতক্ষণ পরে জানিনে একটা ধাক্কা মত লাগল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাতে যে ঘড়িটা ছিল সেটা এক দমে ১২ ঘন্টা চলে। দেখলাম ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাহলে নিশ্চয় তিনদিনের বেশী ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গতে দেখলাম একটা নতুন দেশে এসে পৌঁছিয়েছি।

কোথায় এ দেশ, কি এর নাম জানিনে। পৃথিবীর দূরপ্রান্তে এদেশে, না দূর কোন গ্রহে বা উপগ্রহে এসে পড়লাম, তাও বুঝতে পারলাম না। টেনে আমাকে চাকি থেকে নামিয়ে নিল। প্রচণ্ড শীত। গায়ের আলখেল্লার ওপর একটা বালাপোষের মত জিনিষ জড়িয়ে দিল, পা দুটো মুড়ে দিল দু'টুকরা চামড়ায়। কিন্তু চোখে ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। এ কি, হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলাম নাকি! আঙ্গুল দুটো চোখের ওপর বুলোতে লাগলাম। মনে হল চোখ ত ঠিকই আছে। কিন্তু কী নীরন্ধ্র অন্ধকার—যেন সব আলো এক সঙ্গে নিভে গেছে, আর নেমে এসেছে নিঃসীম অন্ধকার। "কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্-দিগন্তর করি অন্তরাল। স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর সঘন অন্ধকার" নেমে এল। বুঝলাম এ জগৎ অন্ধকারময়। এখানে প্রাণে সাড়া জাগানো আলো নেই। জানিনে কেমন করে এখানে লোক বাস করে, আর বাস করে যে কেউ তাই বা জানব কি করে, কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি নে। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, দিগন্ত বাষ্পাচ্ছন্ন। হায় ভগবান! এ কোন্ জগতে এলাম। কত ভয়, কত ভাবনা মনে এসে ভীড় করতে লাগল। বসে বসে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবছি, এমন সময় একজন এসে আমার দু'চোখের মণির ওপর ফস্ফরাস মাখানো দু'খানা কাচ পরিয়ে দিল, ঠিক যেন আধুনিক যুগের কনট্যাক্ট লেন্স। তখন যেন খানিকটা আবছা আবছা কিছু দেখতে পেলাম। দেখা বলতে কায়া নয়, যেন ভূতের মত সব ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। মনে হল যেন একখানা কালো মেঘের চাদরে সারা আকাশ ঢাকা, মাটির উপরে তার ছায়া পড়েছে সর্বত্র। তারপর চোখে পড়ল, এ দেশের লোকের চোখ দুটো বেড়ালের মত অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। তাই অন্ধকারে তাদের কোন অসুবিধে হয় না, দিব্য ঘুরে ফিরে বেড়ায়, নিজের নিজের কাজকর্ম করে। অন্ধকার জগতের জীব হলেও এরা অন্ধ নয়।

তারপর আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। এ দেশ শব্দশূন্য। কোথাও কোন শব্দ নেই, মানুষের মুখে কথা নেই, জীবজন্তু ডাকে না, বা ডাকলেও সে শব্দ শোনা যায় না। প্রথমে মনে হয়েছিল আমি নিজেই বুঝি কালা হয়ে গিয়েছি, তাই কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে। না, সত্যিই কোন শব্দ নেই এদেশে। এ নৈঃশব্দের রাজ্য, শান্ত কোলাহলহীন। নদী আছে কিন্তু তার কলধ্বনি নেই, পাখি আছে তার কাকলি নেই, বাতাস আছে তার শব্দ নেই। এ কি রকম দেশ রে বাবা! মনে হল আদিম পৃথিবী বোধ হয় এই রকম "বাণীশূন্য ছিল একদিন। জলস্থল শূন্যতল ঋতুর উৎসব-মন্ত্রহীন"। লোকের মুখে ভাষা নেই। ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে তারা হাতের দশটা আঙ্গুল নানা মুদ্রার ধাঁচে ব্যবহার করে, মাথা ডাইনে বামে ওপরে নীচে হেলায়,

দুটো হাত আর পা নানা ভঙ্গিতে দোলায়। তার ওপর আছে দাঁতখিচুনি, হাসি, মুখভার প্রভৃতি। এ যেন টেলিগ্রাফের কোডের ভাষা। এই সাংকেতিক ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালায়। আলো নেই, শব্দ নেই, ভাষা নেই এ রাজ্যে। কেমন করে দিন কাটাবো এ রাজ্যে, আর কতদিনই বা থাকতে হবে এখানে জানি নে।

প্রবল শীতে—হিমাংকের নিচে ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওদের দেওয়া জামাকাপড় পরে থাকি। চারদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। ওদের দেওয়া লেন্স-লাগানো চোখেও ভাল করে কিছুই দেখতে পাইনে—যা দেখি সে হল শুধু প্রেতমূর্তির মত সারি সারি ছায়ামূর্তি। নতুন দেশে ঘুরে ফিরে দেখবার জন্যে একলা বার হতে পারিনে। ওরাই হাত ধরে সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ঐ লম্বা লম্বা লোক-গুলোর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাঁটতে পারিনে; তাই তারা অনেক সময় আমাকে কাঁধে বা বগলদাবা করে নিয়ে বেড়ায়। দেখি নদী আছে, পাহাড় আছে, পাখি আছে, আছে জীবজন্তু। দেশ মনে হল রুক্ষ, কাঁকুড়ে মাটির। গাছপালা কম হলেও যেগুলো আছে, কিন্তু অত্যন্ত লম্বা। মনে হয় গাছগুলো যেন আলোর ভিখারী হয়ে উর্ধ্ব আকাশে হাত বাড়াচ্ছে আলোর প্রত্যাশায়, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় না। এক অদ্ভুত জীব দেখলাম—দেখলাম ঠিক বলা চলে না স্পর্শ করে অনুভব করলাম ষাঁড়-জাতীয় জীব। হাতখানিক করে লম্বা লোমে সারা গা ঢাকা। অদ্ভুত সুগন্ধ বেরোচ্ছে এদের দেহ থেকে। তাই এদের নামকরণ করলাম কস্তুরী বৃষ। এদের লোমে শীতের জামা ও বালাপোষ তৈরি হয়। আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে বোধ হয় এদের দেখা যায় না।

ভাষা না থাকলেও দেশের লোকদের খুব মস্তিষ্কবান্ ও বিজ্ঞান-সচেতন বলে মনে হল। তারা দেখলাম পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা বানিয়েছে। তবে সে কারখানায় মানুষকে মৃত্যুবিভীষিকার স্বাদ দেবার জন্যে আণবিক বোমা তৈরি হয় না, তৈরি হয় বজ্র ও বিদ্যুৎ—যা আমরা বর্ষাকালে আকাশে ঘন ঘন গর্জে উঠতে ও সাপের মত কিলবিলিয়ে চলতে দেখি। ইস্পাতের মত শক্ত অথচ কাগজের মত হালকা কি এক অজানা জিনিসে দেখলাম তারা ঘরবাড়ি তৈরি করছে। এইসব ঘরবাড়ি তারা সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়—গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা পাহাড়ী অঞ্চলে, আর শীতকালে গরম সমতলভূমিতে; কাজেই আমাদের মত শীত বা গ্রীষ্ম সহ্য করতে হয় না তাদের।

দেশ বেশীর ভাগ অনুর্বর। কাঁকুড়ে মাটি আর বালি ভর্তি ছোট মরুভূমি এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। এইসব মরুভূমিকে মরূদ্যানে প্রসারিত করবার জন্যে মনসাজাতীয় গাছ রোপণ করা হচ্ছে। এইসব গাছ রোপণ করলে, যে অল্প পরিমাণ বৃষ্টি সেখানে হয়, তা এই সব গাছ, পাতা ও কাণ্ডের মধ্যে খানিকটা ধরে রাখতে পারবে, পরে তা চাষের সাহায্যে আসবে। পরে জেনেছিলাম এই মনসা গাছের সন্ধানে এ দেশের লোকেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যায়। পৃথিবী ও নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রহে যখন ধূলোর ঝড় বইতে থাকে, এ দেশের বিজ্ঞানীরা তখন শোষক-যন্ত্রের সাহায্যে সেই ধূলো তাদের মরু-অঞ্চলে টেনে নামিয়ে নিয়ে বালির ওপর বিছিয়ে দেন। এইভাবে বালির উপর কয়েক ফুট ধূলোর পুরু স্তর জমলে সেখানে চাষের ব্যবস্থা হবে। সমুদ্র সেখানে নেই, ছোট ছোট হ্রদ আছে। সেই হ্রদের শেওলা থেকে তাঁরা দুধ তৈরি করতে পেরেছেন, আর জলের তলায় যেসব গাছ আছে তা থেকেও কিছু কিছু খাদ্য তৈরি করতে পেরেছেন। গাছ-গাছালি কম এখানে। তার পাকা পাতাগুলো এরা সযত্নে সংগ্রহ করে, তাতে কিছু ভিটামিন যোগ করে মানুষের গ্রহণযোগ্য খাদ্য তৈরি করতে পেরেছেন। এ ছাড়াও বিজ্ঞানীরা ক্ষুধানিরোধক বটিকা তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। এই বটিকা সেবনে ক্ষুধা অনেক কমে যাবে কিন্তু তাতে শরীরের পুষ্টি ব্যাহত হবে না। চাষবাস কম হয়। নদীর ও হ্রদের মাছ ও অন্যান্য জলচর জীব

এদের প্রধান খাদ্য। লোক-সংখ্যা সীমিত, তাই তাদের এখনও কোন রকমে চলে যাচ্ছে। পরে লোকসংখ্যা বাড়লে কি হবে সেই ভাবনায় ভাবিত।

তিন চারদিনের চেষ্টায় এদের সাংকেতিক ভাষা কাজচলা মত খানিকটা আয়ত্ত করতে পেরেছি; তাই মনের ভাব তাদের কাছে খানিকটা প্রকাশ করতে পারি। দিন আর রাত্রির মধ্যে ফারাক বুঝতে পারিনে। এ আলোহারা অমা-বিভাবরী জগতে যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণ আমার কাছে দিন, আর ঘুম এলে বুঝতে পারি রাত হয়েছে। এ এক "দেশশূন্য, কালশূন্য জ্যোতিশূন্য" পরিবেশ। শুয়ে শুয়ে মনে মনে গাই, "নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী, প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি"। কিন্তু প্রভাত তার আলোকোজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়ে আসে না।...

তারপর একদিন, কতদিন পরে ঠিক জানি নে; কেননা দিন ও রাত্রির পার্থক্যবোধ না থাকায় দিনের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম, আমার সীমিত ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে ওদের জানালাম, এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব, আর কতদিন আটকে রাখবে, এবার মুক্তি দাও। এর উত্তরে ওরা যা বললে এবং যতটুকু বুঝতে পারলাম তার অর্থ হল, ওরা আমাকে জোর করে ধরে রাখতে চায় না। প্রথমে মনে করেছিল আমি গুপ্তচর, গোপনে ওদের কাজকর্ম লক্ষ্য করছি; তাই ধরে এনেছিল। এখন আমাকে নির্দোষ বলে বুঝতে পেরেছে, তাই ছেড়ে দিতে চায়, যেদিন খুশি ফিরে যেতে পারি। কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া হয়? যাব কি করে, ওরা যাবার ব্যবস্থা করে না দিলে। এ ত আমাদের দেশ নয় যে, টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলেই হল। ওরা জানালো, ওরাই পাঠিয়ে দেবে। যাক বাবা বাঁচা গেল, শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। দিন স্থির হল। ওদের হিসেব মত এগার দিনের দিন আবার উড়ন্ত চাকিতে চেপে বসলাম। ১০-৪০ ঘণ্টার পর আবার পৃথিবীর আভিকর্ষের মধ্যে এসে পড়লাম। কি সুন্দর লাগছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আমাদের আপন পৃথিবীকে। এসে পৌঁছালাম আবার সুন্দরবন এলাকায়। তখন সবেমাত্র সূর্যদেব পুব আকাশে জবাকুসুমের রং ধরে দেখা দিচ্ছেন। অমর্ত্যবাসীরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পরিচিত পৃথিবীতে পৌঁছে আবার আলো দেখতে পেলাম। ওঃ সে কি আনন্দ! যেন নবজন্ম লাভ করলাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, "আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো। ভাঙ্গা কারার দ্বারে আবার জয়ধ্বনি উঠিল রে।" এতদিন পরে আলো দেখে মনে হতে লাগলো, আমি যেন আদি প্রাণ বৃক্ষশিশু মৃত্তিকার বদ্ধ অন্ধগর্ভ হতে সূর্যের অহ্বানে উঠে এসে আলোকের প্রথম বন্দনাগান করলাম—

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।"

ফিরে ত এলাম; কিন্তু দশ এগারদিন সেই নিবিড় অমা-তিমির জগতে বাস করার ফলে মানসিক অবস্থা ঠিক আগেকার মত আর নেই বলে মনে হতে লাগল। প্রথমে ত সব জিনিষ যেন ভালভাবে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। দেখতে পেলাম যখন, মনে হল ঘরের দেওয়ালগুলো যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে! আলো দেখে মন আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছিল; তারই প্রতিফলন হল নাকি চোখে, না অনেকদিন পরে অন্ধকার থেকে আলোয় এলে এমনি হয়! মানুষ, জীবজন্তু যাদের দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে তাদের আকার ও আয়তন যেন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। সমতলভূমিকে মনে হতে লাগল ঢেউ খেলানো। এ ত গেল চোখের ভুল। কানের ভুলও বড় কম হয় নি। যে সব শব্দ কানে শোনা যায় না—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে ইনফ্রাসাউণ্ড বা অনুশব্দ বলে, সেগুলো যেন মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০ হাজার কম্পনযুক্ত শব্দতরঙ্গ মানুষ শুনতে পায়, কিন্তু ২০ চেয়ে কম কম্পনযুক্ত শব্দ মানুষের কানে ধরা পড়ে না—যেমন মানুষের চোখে ধরা পড়ে না নির্দিষ্ট আলোকতরঙ্গের

চেয়ে কম বা বেশী কম্পনশীল আলোকতরঙ্গ, যারা হচ্ছে অতি-বেগুনি আলোক-রশ্মি। এ ছাড়াও আগে যেসব যানবাহন চলাচলের শব্দ কানে বিকট ও অস্বস্তিকর বলে মনে হত, এখন সেগুলো আর অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে না, বরং আনন্দদায়ক বলেই মনে হচ্ছে। সেই নিঃশব্দের রাজ্যে অনেকদিন কোন শব্দ শুনতে না পাওয়ার ফলশ্রুতি এটা বলে মনে হয়! মোটের ওপর অবস্থা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। দুই এক দিন পরে এভাব কেটে গেল। আবার সুস্থ হয়ে উঠলাম।

সূর্য্যের তেজ জমা করিয়া ব্যবহার ব্যবস্থা

ইসরায়েলে কয়লা, তৈল, গ্যাস প্রভৃতি তেমন ভাবে বর্তমান নাই। এই কারণে ইসরায়েলের বৈজ্ঞানিকগণ নানা উপায়ে সূর্য্যের তেজ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া তাহা প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিয়া থাকেন। এক বর্গ মাইল ভূমির উপর যে প্রখর রৌদ্র পতিত হয় ও তাহার যে তেজ তাহা ১/৪ টন তৈল জ্বালাইলে যে তেজ পাওয়া যায় তাহার সমতুল্য। ইসরায়েলের বৈজ্ঞানিকগণ ঐ দেশের প্রখর রৌদ্রতাপ ব্যবহার করিয়া জল গরম করার ব্যবস্থা করেন ও সেই ফুটন্ত জলের বাষ্প দিয়া টার্বিন চালাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করেন। ঐ শক্তি নানা উপায়ে জমা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জোশী নামক একজন উদ্ভাবক "ভানুতাপ" নামক একটি সূর্য্যরশ্মি-উত্তপ্ত চুল্লি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে সহজেই রন্ধনাদি করা যাইত। আরও বহু বৈজ্ঞানিক সূর্য্যরশ্মি ব্যবহার করিয়া আগুনের কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইসরায়েলে সমুদ্রজল হইতে শুদ্ধ লবণমুক্ত পানীয় জল প্রস্তুত করার জন্যও সূর্য্য-তেজ ব্যবহার করিতেছেন।

মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে দধি

বুলগেরিয়ার মানুষ অধিক মাত্রায় দধি খাইয়া থাকেন। তাঁহারা দধিকে ইয়োঘুর্ত্ত বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহারা যে-সকল শিশু মাতৃদুগ্ধ পায় না তাহাদের যে দুগ্ধ খাওয়ান হয় তাহার সহিত শুখান ইয়োঘুর্ত্তের গুঁড়া মিশাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ভাবে যে শিশুখাদ্য বা বেবিফুড তৈরি হয় তাহা ঠিক মাতৃদুগ্ধের মত বলিয়া ডাক্তারগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই বিষয়টা আমাদের দেশেও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সাময়িকী

শ্রীকেদার পাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান

যুগবাণী সাপ্তাহিক প্রকাশ :—

সকল আশা-নিরাশার শেষ হয়েছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। অবশ্য তাঁর দলের লোকেরাই তাঁকে ধাক্কা দিয়েছেন। না দিয়ে উপায় ছিল না। সসম্মানে কেউ বিদায় না নিতে চাইলে, তাঁকে ধাক্কা দেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী? ভদ্রলোক বিহারবাসীর মন জয় করার জন্য অনেক কুকথাও বলতে লজ্জিত ছিলেন না। পশ্চিম বাংলার বুকে বসেই 'বিহার বিহারীদের' জন্য ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করেননি। সুরযনারায়ণ সিংজীর মৃত্যুও তাঁর শাসনেই ঘটে। এই কলঙ্কজনক ঘটনার জন্য কে দায়ী, তা তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠনে তিনি কম গড়িমসি করেননি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশজীর পরামর্শও তিনি আমল দেননি। শেষ পর্যন্ত এই তদন্ত কমিটি গঠন করে—পাণ্ডেজী জনমতের কাছে নতি স্বীকার করেছেন।

পাণ্ডেজীর স্বভাবই বোধহয় তাই। তিনি সব বিষয়েই একটু লেটে বোঝেন। পায়ের তলা থেকে যে মাটি সরে গিয়েছে, একথা বুঝতে তাঁকে ২৪শে জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ২২শে জুন ৪০ জন মন্ত্রীর মধ্যে যখন ২৪ জনই পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন—তখন যুদ্ধে ইস্তাফা দিলেই ত ভাল হতো। কিন্তু গদির লোভ বেচারা পাণ্ডেকে অন্ধ করে দিয়েছিল। ভোটাভোটির ফল প্রকাশের পূর্বমুহূর্তেও বোধহয় তিনি ভাবতে পারেননি যে মাত্র ২৪০ জন সদস্যের মধ্যে তাঁর পক্ষে রয়েছেন সাকুল্যে ৭৯ জন। বিরুদ্ধে ১৫৩ জন, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। নিজ দলের লোকদের মতিগতির হদিস যিনি রাখেন না, তিনি জনগণের মন বুঝে চলবেন কি করে? যা হওয়া উচিৎ ছিল—তাই হয়েছে।

কিন্তু বিহারের কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কোন্দল এতে মিটবে কী? পাণ্ডেজীকে কুপোকাৎ করার জন্য যে ৫৩ জন এককাট্টা হয়েছেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত একজোট, একপ্রাণ থাকতে পারবেন তো? এঁরা সবাই কোন আদর্শগত কারণে পাণ্ডেজীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন—এমন কথা কেউ বলেননি।

বিহার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় নতুন নেতা নির্বাচন নিয়ে ঐক্যমত হওয়া সম্ভব হয়নি। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সমর্থকেরা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্রের নেতৃত্বেও ঘোঁট পাকিয়েছেন। রেলমন্ত্রী শ্রী মিশ্র বিহারের হাল ধরুন এটাই তাঁদের বাসনা ছিল। কিন্তু রেলমন্ত্রী বোধহয় কেন্দ্রচ্যুত হতে গররাজি—কেননা কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই খুব সুখে নেই। তাঁকে রাজী করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ছোট ভাইকে মুখ্যমন্ত্রী করতেই তাঁরা নাকি একমত ছিলেন। ছোট ভাই জগন্নাথ মিশ্র হয়ত রাজী ছিলেন কিন্তু রেলমন্ত্রীর তাতে সম্মতি নেই। তাতে লোকে কানাকানি করবে এটাই হয়ত সমস্যা। কিন্তু লোকভয়, লজ্জা, সরম এসবকে প্রশ্রয় দিলে কি শাসক হওয়া চলে—না গদি রাখা যায়? বর্তমান যুগে ওসব অচল। ঐ সব দুর্বলতা থাকলে নেতা হওয়া চলে না। কারণ জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও ত মহামান্য জনপ্রতিনিধিদের লজ্জা লাগেনি। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কি অপূর্ব আদর্শই না স্থাপন করেছেন আমাদের সামনে। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একদিন জনগণ জুতোর মালা দিয়েই যে এদের অভ্যর্থনা জানাবেন, তাতে আর সন্দেহ কি।

যাক, বিহারের কংগ্রেসী এম এল এ'রা একমত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর উপরই বিহারের নেতা নির্বাচনের ভার দিয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মার উপর ভার দেওয়ার কথা চিন্তা করেননি। ডঃ শর্মা প্রথমে বলেছিলেন ইন্দিরাজী নেতা মনোনয়নে আর আগ্রহী নন। বিহারের পরিষদীয় দলকেই নেতা নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু পরে আবার ঢোক গিলে তিনি বলেছেন বিহার পরিষদীয় দল সর্বসম্মত যে সিদ্ধান্ত করেছে, সেটাই ভাল। দলের রাজনীতি কি হওয়া উচিৎ—সে সম্বন্ধে দলের সভাপতির কোন বক্তব্য নেই। যে যেমন খুশী ম্যানেজ করে নিক—শুধু কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা থাকলেই হল!

কিন্তু এভাবে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কি? গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? সব রাজ্যই যদি প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করতে থাকে, তবে অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে? দেখেশুনে মনে হচ্ছে রাজ্য এম এল এ'দের কাজ হচ্ছে ঘোঁট পাকিয়ে কোন মন্ত্রীসভাকে বিদায় দেওয়া, আর পরবর্তী নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপর সঁপে দেওয়া। কিন্তু এ ব্যবস্থায়ও বিশেষ সুফল পাওয়া গেল কৈ? গত নির্বাচনের পর থেকে প্রধানমন্ত্রীই রাজ্য মন্ত্রীদের মনোনীত বা নিয়োগ করে আসছেন। তাতেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না।

উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহীশূর, অন্ধ্র সব রাজ্যই তো কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্ষতবিক্ষত। ইন্দিরাজী আর কত জায়গায় প্রলেপ লাগাবেন। তাঁর ক্ষমতারও ত একটা সীমা আছে। তা ছাড়া সব রাজ্যের দলীয় কোন্দল যদি তাঁকেই সামলাতে হয়, তবে রাজ্য কংগ্রেসের থাকার দরকার কী? ঠাট বজায় রাখার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং পরিষদীয় দল ভেঙে দিলেই ত ল্যাটা চুকে যায়। এভাবে গোঁজামিল দিয়ে চলছে না, চলবে না।

গণতন্ত্রকে যদি একটা জীবনধারা বলে স্বীকৃতি দিতে হয়, তবে ভালমন্দের ঝুঁকি নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস ও পরিষদীয় দলের উপরই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে—এ ছাড়া অন্যপথে সমস্যার সমাধান হবে না—এবং এভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং ইন্দিরাজীর অবর্তমানে আর কেউ হাল ধরতে পারবেন না। একটা রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হতে দেওয়াই ভাল।

শ্রেণীসংগ্রাম প্রবল হইতেছে

গ নিকোলায়েভ "ইকনমিচেস্কায়া গাজেটা"তে লিখিয়াছেন:—

চলতি বছরের চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজির নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মঘট এবং মেহনতী জনগণের অন্যান্য গণসংগ্রামে তিন কোটিরও বেশী মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। গত বছর পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ। এই দু'টি সংখ্যার তুলনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাঁধা অ-স্থিতিশীলতা—উৎপাদনে মাঝে মাঝে ভাঁটা পড়া, বেকার, মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়া এবং মুদ্রা ও অর্থের জগতে আলোড়ন—এবং আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ গভীরতর হয়ে ওঠার অবস্থায়, উল্লিখিত তথ্যাদির মধ্যে যে শ্রেণীসংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা' ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে।

চলতি বছরের প্রথম দিন থেকেই ব্রিটেনে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। যেমন, ৬ই জানুয়ারি ওয়েলস্-এ ১৫ হাজার ইনজিনিয়ারিং শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার যে দমনমূলক শিল্পসম্পর্ক আইনের সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বাগে আনবেন বলে আশা করেছিলেন সেই আইনের বিরুদ্ধেই তাঁরা প্রতিবাদ জানান। কয়েক দিনের মধ্যে ইনজিনিয়ারিং শ্রমিকদের অনুসরণ করে ব্রিটেনের আড়াই লক্ষ সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট শুরু করেন। এটাই হল ব্রিটেনের প্রথম সরকারী

কর্ম্মচারী ধর্মঘট। ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী কর্মচারীরা আবার ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটে যোগ দেন ২ লক্ষ ৮০ হাজার লোক। এই মাসেই দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘট করেন ব্রিটেনের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, প্রায় ৩০ হাজার রেল শ্রমিক, ৪০ হাজার গ্যাসশিল্পের শ্রমিক এবং ২ লক্ষ ২০ হাজার হাসপাতাল কর্মী। মার্চ মাসে সংগ্রামে যোগ দেন খনি শ্রমিকরা, এপ্রিল মাসে যোগ দেন ডক শ্রমিকরা। চলতি বছরের প্রথম মাসগুলিতে সবশুদ্ধ ব্রিটেনে দশ লক্ষাধিক লোক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।

এবছর ইতিমধ্যেই দুইবার প্রবল প্রতিবাদ বিক্ষোভে ইতালী কেঁপে উঠেছে। নববর্ষ শুরু হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ইতালীতে সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হয়। এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে প্রায় দুই কোটি লোক অর্থাৎ কার্যতঃ সমস্ত মেহনতী মানুষ। এ্যামালগ্যামেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনস বা সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এই ধর্মঘট সংগঠিত ও পরিচালনা করে। এই সম্মিলিত সংস্থার মধ্যে ছিল দেশের তিনটি প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ—ইতালিয়ান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার, ইতালিয়ান কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্ অব ওয়ার্কার্স এবং ইতালিয়ান ইউনিয়ন অব লেবার। সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়াই এই ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ কারণ। আলোচনাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বেকারি দূর করা, কাজের অবস্থার উন্নতি সাধন, মজুরী বৃদ্ধি এবং দর বৃদ্ধি রোধ ইত্যাদি মূল সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানে সরকার অসমর্থ।

এর ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইতালীতে আর একটি সাধারণ ধর্মঘট হয়। প্রায় এককোটি ৪০ লক্ষ তাঁদের দাবিগুলি আবার দৃঢ়ভাবে জানান।

ফ্রান্সের বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণের শিল্পসংস্থা রেনল্ট কারখানায় মাসাধিক কাল তীব্র সামাজিক সংঘর্ষ চলে। প্যারিসের বুলোঁ বিলাকোর্ট শহরতলীতে অবস্থিত এই কারখানায় কাজের অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দাবিতে আরব্ধ ধর্মঘটের পাল্টাজবাবে কর্তৃপক্ষ ২১শে মার্চ থেকে লক আউট ঘোষণা করেন। ২৯শে মার্চ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, "কারিগরী কারণে" সাত হাজার শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হল। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ এই মহাকায় মোটর শিল্পসংস্থার নতুন নতুন শ্রমিকদল সংগ্রামে যোগ দেয়। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে অন্যান্য রেনল্ট কারখানাতেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে।

জানুয়ারি মাসে ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে এক বড় রকমের ধর্মঘট হয়। শ্রমসংক্রান্ত চুক্তি সংশোধন এবং মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মজুরী সম্পর্কে নতুন চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে বাভারিয়ার প্রায় ৭ লক্ষ ধাতু শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। মালিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হ'ন।

মার্চ মাসে বেলজিয়ামে ফোর্ড মোটরের শ্রমিকরা এবং হল্যাণ্ডে আমস্টারডামে ট্রাকটর কারখানাসমূহের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।

এই ধর্মঘট শেষ হতে না হতেই বেলজিয়ামের ঘেণ্ট নগরীতে অবস্থিত ফোর্ড কারখানার আর একটি ধর্মঘট শুরু হয়। এই কারখানাটি পশ্চিম ইয়োরোপে ফোর্ডের বৃহত্তম কারখানা। যুগপৎ ককারিল একচেটিয়া পুঁজির ইনজিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে ধর্মঘট হয়।

মার্চ-এপ্রিল মাসে ডেনমার্কে যে সামাজিক বিরোধ দেখা দেয় তা হল ৩০ বছরের মধ্যে সে দেশের বৃহত্তম বিরোধ। জিনিষপত্রের দরবৃদ্ধির এবং মালিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবি মানতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন ২ লক্ষ ৫৮ হাজার শ্রমিক। এ ধর্মঘটের ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন বহুল পরিমাণে অচল হয়ে যায়। মালিকরা লক আউটের আশ্রয় নেন। ব্যাপক ছাঁটাই সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল অটুট থাকে। মেহনতি জনগণের লেগে-পড়ে-থাকা ধর্মঘটের ফলে তাদের বহু দাবি স্বীকৃত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রাম বেড়ে চলেছে। ভোগ্য পণ্যসমূহের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি এবং কর ও খাজনা

বৃদ্ধির অবস্থাতে মেহনতি জনগণ ক্রমেই আরও ঘন ঘন ধর্মঘট করছে। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা সংগ্রামের পরীক্ষিত উপায় অবলম্বন করছে। বছর শুরু হওয়ার পর থেকে নিউ ইয়র্কের গৃহনির্মাণ শ্রমিক, দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিমান কোম্পানী ইস্টার্ন এয়ার লাইন্‌স্-এর কর্মীবৃন্দ, স্প্রিংফিল্‌ডের টেলিভিশন কারখানার শ্রমিকবৃন্দ এবং কনেকটিকাটের ৪২টি শহরের বাস ড্রাইভার ও অটোমোবাইল মেকানিকগণ সহ লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। মাইনে বাড়ানোর দাবিতে ফিলাডেলফিয়ায় ১১ হাজার শিক্ষকের ধর্মঘট প্রায় ছয়মাস চলার পর ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়। রয়াল ডাচ শোধনাগার ও রাসায়নিক কারখানাসমূহের কয়েক হাজার শ্রমিক প্রায় তিন মাস হল ধর্মঘট করে আছেন।

জাপানে জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (সোহিও) ৪৫তম বিশেষ কংগ্রেসে ব্যাপক সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ জাপানী শ্রমিকের সংকল্প দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়। এটা হল শ্রমিকশ্রেণীর ১৯৭৩ সালের "বসন্তকালীন অভিযানে"র সংকেত।

২৫শে মার্চ জাপানের রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থাসমূহের ৯ লক্ষ শ্রমিক ও অফিসকর্মী তাঁদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং মজুরী বৃদ্ধির দাবি জানান। পরে এই সংগ্রামে যোগ দেন আড়াই লক্ষ রেলশ্রমিক ও আড়াই লক্ষ ইনজিনিয়ারিং শ্রমিক।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই বছরের ১৭ই এপ্রিল জাপানী মেহনতি জনগণের বৃহত্তম বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন যুক্ত বসন্তকালীন সংগ্রাম পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সংগঠিত সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে ৩৫ লক্ষ লোক। জাপানী মেহনতি জনগণের "বসন্তকালীন অভিযান" এখনও চলছে।

"সবুজ বিপ্লব" কোন পথে ?

"লালতারা" তে নিত্যপ্রিয় দত্ত লিখিয়াছেন :—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পঃ বঙ্গ সরকারের Planning Board কৃষি অর্থনীতির সার্বিক উন্নতির জন্য এক কর্মসূচী হাজির করেছেন। এর নাম দিয়েছেন তারা Comprehensive Area Development Programme সংক্ষেপে C A D P। তাদের দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তারিত কর্মকাণ্ডের নকশার যাবতীয় খুঁটিনাটি আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা নয়। বর্তমান প্রবন্ধ এই বিশাল কর্মসূচীর মূল নির্যাস (essence) সম্পর্কে পাঠককে ওয়াকিবহাল করবার চেষ্টা করবে মাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই কর্মসূচীর জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে। গত কয়েক বছরে পঃ বঙ্গে যখন সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম বর্তমান, কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী ঘোষণা করল এবং এই দাবী যখন ব্যাপক কৃষক জনতার মধ্যে বিশেষ সোচ্চার হয়ে ওঠবার উপক্রম হয়ে দেখা দিল তখনই CADP তার আবির্ভাব ঘোষণা করল। যদিও কর্মসূচী কোন্ দেশের অনুসরণে করা হচ্ছে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি তবুও নিন্দুকরা বলাবলি করছে কিছু জাপানী স্টালিনীতির আশ্রয় এটার মধ্যে নেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচী রচনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন একজন ভূতপূর্ব মার্কসবাদী যিনি আবার বর্তমানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের (আসল মালিক বিড়লারা) ডিরেক্টরও বটে।

CADP যে অর্থনীতির কথা ভাবছে তার মর্মবস্তু হচ্ছে—'CADP যে ধরণের অর্থনীতির কথা কল্পনা করছে তা হল অতিরিক্ত খাজনা, সুদ এবং ঝুঁকিসম্পন্ন ব্যবসা থেকে মুক্ত ছোট ও মাঝারি কৃষকের অর্থনীতি। এমনকি জমির মালিকানার উর্ধ্বসীমা আরও কমিয়ে দেওয়া সহ ভূমি সংস্কারের উপায়গুলিকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করলেও এক বিরাট সংখ্যক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর থাকবে, তা সত্ত্বেও এই অর্থনীতি মূলতঃ ছোট কৃষক অর্থনীতিতে পরিণত হবে।......এই অর্থনীতির উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতির বিকাশ ঘটান যাতে করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরের পরিবর্তে

ধীরে ধীরে একটি নতুন ধরণের সমবায়ী সমাজবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যেখানে দরিদ্র কৃষক নয় এমন সব ক্ষুদ্র কৃষকের ছোট ছোট জমির মালিকানার নিশ্চয়তা রক্ষা পায়।"

উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার—ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি গড়ে তোলা। এই ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতির ফলে ব্যাপক ভূমিহীন কৃষকের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্ক যেরকম আছে ঠিক তাই থাকবে। তার উপর একটু চুনকাম করা হচ্ছে মাত্র।

বর্তমান সমাজ কাঠামোতে গ্রামের অবস্থা কী শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে সরকারী স্বীকারোক্তি থেকেই—

"পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৫৭ জন 'চাষী' অথবা সমস্ত কৃষক পরিবারে প্রায় শতকরা ৯০ জন লোক দারিদ্র্য সীমার কাছাকাছি অথবা নীচে রয়েছেন।"

এই হিসেবের মধ্যে ৫ জন সভ্য বিশিষ্ট পরিবার, যাদের হাতে ১০ একর মত জমি আছে তাদের ধরা হয়নি। সরকারী সমীক্ষাই বলছে, যদি দিন মজুরী ৩০০ টাকা থেকে বেড়ে ৪·২৫ টাকায় ওঠে তাহলে এই সব পরিবারও দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে পড়বে।

১৯৬১ থেকে ১৯৭১ এই দশ বছরে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ১৭·৭০ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২·৭২ লাখে। অর্থাৎ বৃদ্ধিটা হচ্ছে শতকরা ৮৩·৫ ভাগ। একই সময়ে ভাগচাষীর সংখ্যা ৪৪·৬০ লাখ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ৩১·৫৫ লাখে। জমির মালিকানা বণ্টনের হিসাবটা সত্যই চমৎকার। এক একরের থেকে কম শুরু করে প্রায় দশ একর (৯·৯) অব্দি জমির মালিকানা রয়েছে ৭২·০৪% লোকের হাতে। ১০ একর থেকে ১২ একর অব্দি জমির মালিক হচ্ছে ৩·৬৪% লোক আর ১২ একরের উপরের মালিক হচ্ছে কেবলমাত্র ৪·২৮% লোক। সাকুল্যে ২৬১৪ লোকের হাতে রয়েছে মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৭০%।

জমির কেন্দ্রীভবন যেভাবে ঘটছে সেটা সেই ভাবেই চলবে। এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে পঃ বঙ্গে সকলের মধ্যে বিলি করার মত তেমন জমি নেই। এই ধারণা পোষণকারীদের জেনে রাখা ভাল যে পঃ বঙ্গে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ হচ্ছে ১০৮ লক্ষ একর এবং মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৫৫ লক্ষের কিছু কম। এর অর্থ হচ্ছে প্রতি পরিবার পিছু ২·৫ একর জমি খুব সহজেই আসতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে এই কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভূমির বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক জীইয়ে রেখে রাসায়নিক সার এবং কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতির বাজার সৃষ্টি করা। এই ব্যাপারটা CADP-র কর্মকর্তারা অবশ্য গোপন করেন নি—"CADP যে ধরণের উন্নতির পরিকল্পনা করছে তাতে গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য শহরাঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে সার, পোকা-মাকড় মারার যন্ত্রপাতি, পাম্প, টিউব-ওয়েল ইত্যাদি সরবরাহের প্রয়োজন হবে।"

CADP এটা আশা রাখছে যে দশ একরের মালিকরা যদি এই পরিকল্পনার আওতায় আসে তাহলে তাদের আয় ৬৬৬ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১২৫০ টাকায়। আর যদি দিনমজুরীটা ৩ টাকায় ধরে রাখা যায় তাহলে এটা আরও বেড়ে দাঁড়াবে ১৯৫০ টাকায়। CADP-র মুখ্য লক্ষ্য এরাই। এদের উদ্বৃত্ত টাকা তারা সার, পাম্প ইত্যাদিতে আনতে চান।

যদি দুর্গাপুর ও হলদিয়ার সার প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার ৮০% ভাগ ব্যবহার করা হয় তাহলে পঞ্চম যোজনার শেষে নাইট্রোজেন ও পটাশ সারের উৎপাদন দাঁড়াবে যথাক্রমে ২,৪০,০০০ টন এবং ৬০,৮০০ টন। CADP 'আমেরিকান বদান্যতায় তৈরী, এই সারের বাজারের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। তাদের হিসাবে ৭৫-৭৬ সাল নাগাদ ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি মোটামুটি চালু হয়ে গেলে পঃ বঙ্গে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হবে ২,৪০,০০০ টন এবং পটাশের দরকার পড়বে ৫৪,০০০ টন।

CADP র কর্মকর্তারা বিরাট বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করছেন যে এই কর্মসূচী রূপায়িত

হলে ক্ষেত মজুরদের আয় যথেষ্ট বেড়ে যাবে, কিন্তু আয়টা কত বাড়বে? তাদের ভাষ্যটাই একবার শুনুন—"আধুনিকীকরণের ফলে, এমনকি তিন টাকা মজুরীর হারেও ভূমিহীন ক্ষেত মজুর পরিবারের মাথা পিছু বার্ষিক আয় ১০৮ টাকা থেকে ২৭০ টাকায় দাঁড়াবে। যদি এই মজুরীর পরিমাণ বাড়িয়ে পাঁচ টাকা করা হয়, তবে এই আয় বেড়ে ৪.৫০ টাকায় দাঁড়াবে অর্থাৎ দারিদ্র সীমা রেখার কাছাকাছি।"

এই কর্মসূচী আরও বলছে মহাজনী প্রথা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ সরকার বুঝতে পেরেছেন যে মহাজনী প্রথাই কৃষিতে আধুনিকী-করণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষককে ঋণ কে দেবে? না, তারাই দেবেন। তবে স্বল্প সুদে। আর এর জন্যে কৃষককে মরশুমওয়ারী গোটা ফসলটাই সরকারের কাছে বন্ধক রাখতে হবে। পরিষ্কার করে বললে ব্যাপারটাকে দাদন বলাই শ্রেয়। ব্যাপারটাকে একটু পরিশোধিত' করা হল আর কি। ফসলটা যখন বন্ধক পড়ছে তখন যে বন্ধক নিচ্ছে সেই এটার দাম ধার্য করে দেবে এবং বিক্রির উপর একচেটিয়া দখল রাখতে পারবে। অতএব সরকারী মহাজনী চালু হল। আর এর ফলে গ্রামের মহাজনরা পালিয়ে বাঁচবে? কেন ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা কী বলছে? ইতিমধ্যেই এটা দেখা গেছে যে, ব্যাঙ্কগুলো যে ঋণ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়েছে তার সিংহ ভাগটাই গেছে জমির বৃহৎ মালিকদের হাতে এবং বৃহৎ মালিকরা পরে সেটা আবার চড়াসুদে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের ধার দিয়েছে। সুতরাং মহাজনী প্রথা বন্ধ হচ্ছে না। বর্তমান সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক না ভাঙ্গা পর্যন্ত এটা বন্ধ হতে পারে না। দিনের পর দিন সে বেড়েই চলবে।

সবচেয়ে জোর গলায় যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে C A D P বেকার সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য নজীর সৃষ্টি করবে। পঃ বঙ্গে কত বেকার আছে? কেউ জানেন না। সঠিক হিসেব কেউ দিতে পারবেন না। রেজেষ্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাচিত্রটা মাঝে মাঝে দেওয়া হয়ে থাকে বটে কিন্তু গ্রামের যে অগণিত বেকার ও আধা-বেকার বসে রয়েছে তাদের খবর কেউ রাখে না। কত বেকার হিসেবটা এভাবে না করে কত সাকার এই হিসেবটা পেলে সংখ্যাতত্ত্বের গোলক ধাঁধাঁটা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে আসবে। শুধু বাংলার সাড়ে চার কোটি লোকের মধ্যে বেকার ও অর্ধবেকারদের ধরলে দেখা যাবে প্রায় ৩ কোটি লোকের কোন কাজ নেই। বলা হচ্ছে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কয়েক'শ লোকের চাকুরী এই মুহূর্তে হবে। পরে এটা আরও বাড়বে। ব্যাপারটা হাস্যকরই বটে।

C A D P-র উদ্দেশ্য জমির বর্তমান মালিকানার পরিবর্তন নয়। মালিকানা যেমন আছে সেরকম বজায় রাখতেই সরকার বাহাদুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার তারা ঘোর বিরোধী। অথচ আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতির মূল সমস্যাটা কী? মূল সমস্যা হচ্ছে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক। এই সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে আমাদের বিকাশ শুরু হয়ে গেছে। শিল্পীয় বিকাশের গতি হয়েছে রুদ্ধ। এই উৎপাদন সম্পর্ক যারা জীইয়ে রাখতে চায় তারাই হচ্ছে এদেশের কর্ণধার। ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি কোন সমাধান নয়। এর ফলে সৃষ্টি হবে আরও দারিদ্র কৃষক এবং ভূমিহীন ক্ষেত মজুর। কিন্তু C A D P চাইছে শোষণ যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে এবং সমাজতন্ত্রও আসবে। আসলে তারা জনগণকে নতুন করে একটা সোনার পাথর বাটি উপহার দিচ্ছেন।

দেশ-বিদেশের কথা

ব্যুরোক্র্যাট ও টেকনোক্র্যাট

যুগবাণীতে সম্পাদকীয় ভাবে বলা হইয়াছে :

পশ্চিম বাংলার ২৫০০ টেকনোক্র্যাট সংগ্রামের পথে পা বাড়াচ্ছেন। ২৭শে জুন থেকে তাঁদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হবে। প্রথমে তাঁরা নাকি কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রতিবাদ জানাবেন—পরে গণছুটির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই সংবাদে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকই উদ্বিগ্ন হবেন সন্দেহ নেই। শেষ পর্যায়ে লাগাতর ধর্মঘটের হুমকিও রয়েছে। কাজেই বিষয়টাকে হালকাভাবে দেখার কোন কারণ নেই।

কয়েক মাস আগে উত্তরপ্রদেশে টেকনোক্র্যাটদের ধর্মঘটের ফলে যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল, তা সকলের স্মরণ আছে। বিদ্যুতের অভাবে রেল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩ কোটি টাকা। পাইকারী হারে ধরপাকড়ও হয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটীদের দাবী মেটাতে হয়েছে।

টেকনোক্র্যাটদের বক্তব্যটা যুক্তিপূর্ণ বলেই আমরা মনে করি। পূর্ত, সেচ, জনস্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ পর্ষৎ, শিল্প পরিচালনা, কনষ্ট্রাকশন বোর্ড, ডেয়ারী ইত্যাদির প্রধানপদে টেকনোক্র্যাটদের বসানোই ত যুক্তিসঙ্গত। এই সব কাজগুলি সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানই তো প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সাহায্য করে। ঐ ক্ষেত্রে আই এ এস ভদ্রলোকেরা শুধু ফাইল নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কোন্ কাজ করেন? রাজ্য ও কেন্দ্র বাজেটের প্রায় ৮০ শতাংশ টাকা নাকি টেকনোক্র্যাটদের হাত দিয়েই খরচ হয়। অর্থাৎ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজ করেন এঁরাই। বাস্তব ঘটনা যখন এই, তখন তাঁদের মাথার উপর একজন ব্যুরোক্র্যাট আই এ এস-কে বসিয়ে রাখার প্রয়োজন কোথায়?

টেকনোক্র্যাটরা অভিযোগ করেছেন আই এ এস-দের প্রধান যে কাজ অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভূমি সংস্কার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি তা সবই ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থ ব্যুরোক্র্যাট দিয়ে কোন প্রকল্পই সার্থক হতে পারে না। ওসব বিষয়ে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। অন্যদিকে ইঞ্জিনীয়ারদের তুলনায় আই এ এস-দের বেতন আড়াই গুণ বেশী।

এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বাধীন ভারত আই সি এস-দের পরিবর্তে আই এ এস সার্ভিসের প্রবর্তন করছে। সরকার বাহাদুর এই আই এ এস-দের সবজান্তা বলেই মনে করেন। সরকারের অন্যসব চাকুরীওয়ালাদের থেকে এরা সুযোগ সুবিধাও বেশী ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারত সরকার ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কাজে যাঁরা জ্ঞানীগুণী তাঁদের মর্যাদা দেননি। এ ব্যবস্থা ও মানসিকতার পরিবর্তন অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন যখন বোঝা যাচ্ছে শুধু প্রশাসক দিয়ে দেশ গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তখন আর দেরী না করে টেকনোক্র্যাটদের বিক্ষোভের কারণগুলি অবিলম্বে দূর করাই সরকারের কর্তব্য।

ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানীরা যদি ধর্মঘট করতে বাধ্য হন, তবে দেশের অবস্থাটি কি দাঁড়াবে সহজেই অনুমেয়। আমাদের যোজনাগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য টেকনোক্র্যাটদের উপর নির্ভর করতে যখন হবে, তখন এ নিয়ে আর গড়িমসি করা চলে না। এ কথা

মনে রাখা ভাল যে পশ্চিম বাংলার ২২৮ জন আই এ এস অফিসার দিয়ে সোনার বাংলা গড়া যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রায় বিষয়টি বেশীদূর গড়াতে না দিয়ে একটা মীমাংসার ব্যবস্থা করুন। পশ্চিম বাংলার উন্নয়নকে গতিশীল করার জন্যই টেকনোক্র্যাটদের দাবীগুলির অবিলম্বে মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুর্নীতির অবাধ গতি

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত যুগশক্তি সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে—

কিছুদিন পূর্বে শিলচর জেলা যুবকংগ্রেস এক প্রস্তাব যোগে দাবী করিয়াছিলেন যে কংগ্রেস টিকেটে নির্বাচিত বিধায়কদের কেউ কেউ বিগত এক বৎসরে স্বনামে ও বেনামে যে পরিমাণ সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার হিসাব নেওয়া হউক। বলা বাহুল্য যুবকংগ্রেসের উক্ত প্রস্তাবে জেলাবাসীর সাধারণ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ফুটিয়াছে।

একবৎসর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ ক্ষমতায় আসীন হইয়া এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে সবস্তরের দুর্নীতি প্রতিরোধে তাঁহার সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইবেন। কিন্তু বিগত এক বৎসরে অন্ততঃ আমাদের কাছাড় জেলায় যে পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জনমনে এই প্রত্যয়ই দৃঢ়মূল হইয়াছে যে প্রশাসনিক স্তরে এবং রাজনৈতিক স্তরে দুর্নীতি পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করা সত্ত্বেও তাহার প্রতিরোধে কোনও কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্য নেতৃত্ব একান্তই অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ বিগত ভাষা আন্দোলনের পর দেখা যাইতেছে আসাম সরকার যেন একধরনের জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতির অবাধ কারবার চালাইবার নিঃসর্ত অধিকার দান করিয়াছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্নীতিপরায়ণ হইলে প্রশাসনে তাহার প্রভাব পড়িতে বাধ্য, কাছাড় জেলার এক ধরণের দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা সেই ভাবেই কোন কোনও সরকারী কর্মচারীকে নির্বাধ লুণ্ঠন চালাইবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। আজ পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে শক্ত খুঁটির দৌলতে অতিবড় অপরাধ করিয়াও সরকারী কর্মচারীরা পার পাইয়া যাইতেছেন, জনসাধারণ বিচার চাহিবারও জায়গা খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাছাড় জেলায় বিগত এত বৎসরে যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ হওয়ার কথা ছিল, তাহার অধিকাংশই দুর্নীতি পরায়ণ রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মচারীর যোগ সাজসে ব্যর্থ হইয়াছে, ফলে সংশ্লিষ্ট উভয় তরফই লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতেছেন, ক্ষতি যাহা তাহা নিরীহ জনসাধারণেরই হইতেছে।

এই দুর্নীতির অবাধ রাজত্বে শক্তিশালী এক টাউট শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, লুণ্ঠনীকৃত অর্থের সামান্য বখরার বিনিময়ে ইহারা এই সমস্ত দুর্নীতি পরায়ণ নেতাদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিতেছে। দুর্ভাগ্যতঃ যুব সম্প্রদায়ের কেহ কেহও বেকারী জনিত হতাশায় এই টাউট শ্রেণীতে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন এবং বর্তমান দুর্নীতিক্লিষ্ট পরিবেশ যদি আরো কিছুদিন বজায় থাকে, তবে গোটা যুব সম্প্রদায়ই নগদ প্রাপ্তির মোহে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি। এই পঙ্কিল পরিবেশ হইতে এই জেলাকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্বপ্রযত্নে তৎপরতা চালাইবার জন্য আমরা সৎনাগরিকদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

ব্যর্থতাই সাফল্যের স্তম্ভ

ত্রিপুরা পত্রিকা বলেন—

উন্নতির সোপান তৈরী হতে না হতেই যদি সোপান ভেঙ্গে পড়ে, তখন ঐ সোপান-মালাকে আরও শক্ত মজবুত করে গড়ে তুলতে হয়; অবশ্য যদি ঐ পথেই উন্নতি একান্ত কাম্য হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর মূলে রয়েছে একটিমাত্র খুঁটি বা পিলার। এই পিলারটি হল কৃষি। এখানকার শতকরা আশি ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কথাটাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে গেলে বলতে হয় ত্রিপুরার কৃষকরাই হইল আর্থিক বনিয়াদের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডটার বর্তমান অবস্থাটা যে কী তাহা ত্রিপুরা রাজ্যের কয়জন সঠিক উপলব্ধি বা যথাযথ অবলোকন করতে সমর্থ ও

সক্ষম হয়েছেন? আমাদের কথা হলো হাতের আঙুলে গণনা করা যায় মত সংখ্যার লোক হবে কিনা সন্দেহ। প্রথমে যাদের মেরুদণ্ড তারা দৃষ্টিশক্তিহীন নির্বোধ। তাই যদি না হয়, তারা আওয়াজ দিচ্ছে না কেন? দ্বিতীয়ে সরকার; দলাদলির রাজনীতিতে এদের কাণ্ডজ্ঞান (কমন্‌সেন্‌স্) বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর কল্যাণ সাধনের কথা এরা হামেশাই বলে; কিন্তু কাজে কর্মে সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা চায় নিজেদের (দলের বা গোষ্ঠীর) আত্মপুষ্টি এবং সর্বসাধারণের অপুষ্টি। অপুষ্টি-জর্জ্জরিতদের তাঁবেদার বানাবার কলাকৌশলটাই এদের একমাত্র রাজনীতি। এই রাজনীতি আজ নগ্নভাবে ত্রিপুরাতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রথমে বৎসরাধিক কাল খরা। বিগত বর্ষে আউস এবং আমন ফসলের শতকরা ৭০ হইতে আশি ভাগ নষ্ট হয়েছে। সরকারী হিসাবে তালবাহানা, গরমিল এবং নানা মুনির নানা মত ব্যক্ত হলেও ঐ খরায় কম পক্ষে তের চৌদ্দ কোটি টাকা যে ক্ষয় ও ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। খরার পর এলো বন্যা। গত ৮ই মে তারিখের প্রলয় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারিত হয়েছে সাড়ে এগারো কোটি টাকা। এই টাকার অঙ্কটা রাজ্যপালের মুখনিঃসৃত বিধায় অকাট্য সত্য। বিগত তের মাসে ত্রিপুরা রাজ্য মোট মাট ২৫ পঁচিশ কোটি টাকা ক্ষতির পাল্লায় পড়েছে। এই ক্ষতিটা কিন্তু পুরা-পুরি দিতে (বা বহন করতে) হয়েছে কৃষকদের। অর্থাৎ ত্রিপুরার আর্থিক বনিয়াদের মূলাধার কৃষকদের মেরুদণ্ড খরা ও বন্যার আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এই ভগ্নদশা অবলোকন করা, যথাযথ অনুধাবন করা এবং ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেবার কোন চেষ্টা-উদ্যোগ কি হয়েছে বা হচ্ছে? না, কিছুই হয়নি, হচ্ছে না, হবেও না বলেই নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়। খরার মোকাবিলা করতে যেয়ে সেনগুপ্ত সরকার সাফল্য লাভের পরিবর্ত্তে (ফেলিউর ইজ দি পিলার অব সাকসেস প্রবাদ বাক্যানুসারে) সাফল্যের পাকাপোক্ত মজবুত স্তম্ভ রচনা করেছেন। খরা-বিধ্বস্ত ত্রিপুরার মাটিতে ফসল উৎপাদনে অসমর্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ করা সেনগুপ্ত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ বাবতে অর্থ আদায় করবার কোন হিম্মৎ-হেকমৎই সেনগুপ্ত সরকার দেখাতে পারেননি। চেয়েছিলেন দশ কোটি টাকা, পেয়েছেন মাত্র দুই কি আড়াই কোটি। ঐ টাকাও কৃষকদের মেরুদণ্ড সারাবার কাজে লাগেনি। কিছু সংখ্যক তথাকথিত কৃষককে মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ মোট চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে বাকীটা "বানরের পিঠে ভাগ" হয়ে এ ও সে লুটে নিয়েছে। কৃষিখাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে সরকারী ঢাকঢোল পিটানীর ক্ষেমা নাই; বিগত দশ বছরের টাকা ছ মাসেই সেনগুপ্ত কৃষিখাতে কাবার করে দিয়ে ওস্তাদ বনে গেছেন। এই ছ মাসের রেকর্ড কি পরিমাণ টাকা ব্যয়ে কৃষির উপকার বা উন্নতি সাধিত হয়েছে বা হবে তা কিন্তু সেনগুপ্ত সরকারের তলপেটেই আছে। তলপেটের গুজরানি কৃষকরা টের পায় নাই; আমরাও জানি না। তবে যন্ত্রপাতি, পাইপ-টাইপ, হেন-তেন অনেক কিছুই কেনা হয়েছে, যার মধ্যে পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেই যুদ্ধের আমলের খারিজ করা মরিচা পড়া লোহালক্কড় জাতীয় তৈজসপত্রাদিও রয়েছে বলে দুষ্টলোকেরা প্রচার করে। তবে একটা কথা আমরা জেনেছি যে, খরা খাতে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে খয়রাতি সাহায্য খাতে প্রাপ্ত টাকার সঙ্গে কৃষিখাতে ছ মাস ব্যয়িত অর্থের কোন সংস্রব নেই। কৃষিখাতের টাকাগুলি ত্রিপুরা সরকারের বাজেট বরাদ্দেরই টাকা; উহা অনেকদিন খরচ হচ্ছিল না, সেনগুপ্ত সরকার খরচ করলেন আর কি। এখন (গত ৮ই মে) বন্যা এসে দেখিয়ে দিল ছ মাসের রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ব্যয় দ্বারা কৃষি বা কৃষিজমির প্রতিরক্ষা বাবতে কিছুই করা হয়নি। অতএব বন্যা এসে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মেরে আরও সাড়ে এগার কোটি টাকার ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দিল কৃষকদের ঘাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘাড় গোটা মেরুদণ্ডটাকে নিয়ে ভেঙ্গে পপাত ধরণীতলে। সেই ধরণীর (জমির)

উপর এখন স্তূপীকৃত বালুরাশি। এই বালির স্তূপ অপসারণ করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার কোন ক্ষমতাই নেই কৃষকদের; মাথা গুমরে গুমরাচ্ছে। এদের জমি করার সাধ সামর্থ্যের অতীত। সামর্থ্য বলতে কায়িক এবং আর্থিক দুইই আজ কৃষকদের টুটি চেপে ধরেছে। খরা,দুর্ভিক্ষ আর বন্যা—এই তিনের উপর্যুপরি আঘাতে এরা বেঁচে আছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এটাই আশ্চর্য্য। ততোধিক আশ্চর্য্য এদের বাঁচাবার বা বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থাই এদের ভোটে নির্বাচিত সরকার করেন নি, করতে চেষ্টাও করছেন না। আশ্চর্য্য আমাদের নীতি, অদ্ভুত আমাদের ধর্ম।

বন্যায় ক্ষতি হয়েছে সাড়ে এগার কোটি টাকা, ইহা সরকারী তথ্য। বস্তুতঃ ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। এবং ক্ষতিপূরণ ব্যয় আরও অনেক বেশি। ক্ষতিপূরণ মানে একদিকে বালি অপসারণ করে জমিকে চাষযোগ্য করা এবং বীজ, সার, চাষোপকরণ প্রভৃতি (যার যাহা প্রয়োজন) বিনামূল্যে বিতরণ করা। এ ছাড়া কৃষকদের মেরুদণ্ড যে সোজা হতে পারে না, সে আক্কেল বুদ্ধি ত্রিপুরা সরকারের ঘটে নেই। ঘটে নেই বলছি এই কারণে যে, বন্যার ক্ষতিপূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রিপুরা সরকার মাত্র ৭ সাতকোটি টাকা দাবী পেশ করেছেন। ঘটে বুদ্ধি থাকলে দাবীর পরিমাণ হতো কমপক্ষে ১৫ পনর কোটি টাকা এবং উহা আদায়ও করা হত। "বৌয়ের খোঁপা দেখলেই বোঝা যায় জামাই কেমন লায়েক"—ত্রিপুরা সরকারের দাবীর বহর দেখেই কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের হিম্মৎ-হেকমৎ যাচাই করে নিয়েছেন এবং সেই যাচাই অনুযায়ীই ১ এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। বলা হয়েছে ৭ সাত কোটি টাকা দাবী করা হয়েছিল অন্তর্বর্ত্তী সাহায্য হিসাবে। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এসে ক্ষতিপূরণের মোটা অঙ্ক সাব্যস্ত করবেন। এখনও সমীক্ষক দল আসে নি; আসার সম্ভাবনাও শোনা যাচ্ছে না। তবে যা শুনা যাচ্ছে, তাতে আশ্বস্ত হবার আশা ভরসা ত নেইই, বরং আতঙ্কই জোরদার হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আসাম হয়ে দিল্লী গেছেন। সাত কোটির এক সপ্তমাংশ মাত্র আদায় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা চরিত্রে তথা দিল্লীর দরবারে উহা বড় জোর অর্দ্ধাংশ (মোট সাড়ে তিন কোটি) পর্য্যন্ত উঠতে পারে। এতে ভাঙ্গা মেরুদণ্ড সোজা হওয়া ত দূরের কথা, জোড়াই লাগাতে পারে না; উপরন্তু সরকারের সহিত জনতার সম্পর্কের অবনতি ঘটার আশঙ্কাই প্রকটিত। বন্যার প্রশ্নেও সেনগুপ্ত সরকার সাফল্যের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবে ব্যর্থতার দ্বারাই সাফল্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্তম্ভ রচনা হতে পারে।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ প্রথম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৮০	৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৃটেনে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় করিবার চেষ্টা

বৃটেন যে ভারতের কোনও কার্য্যের অনুকরণ করিবে রূপ অপবাদ কেহ বৃটেনের নামে করিতে পারে না; ারণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় কোন কিছুই বৃটেনের ভারতের নকট শিখিতে হইতে পারে না একথাতেই বৃটেনের নগণের পূর্ণ বিশ্বাস। সুতরাং সম্প্রতি যে বৃটেনের মিক দলের (লেবার পার্টি) সভ্যগণ ব্যাঙ্ক, বীমা ও হনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান (বিল্ডিং সোসাইটি) প্রভৃতি-কে াতীয় করিয়া লইবার প্রস্তাব উঠাইয়াছেন তাহার মূলে ারতের অনুকরণ করিবার কোনও চেষ্টা আছে বলিয়া নে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহা াহাদের স্বাধীন চিন্তারই ফল বলিয়া ধরিতে হইবে। পরন্ত তাহারা এই চেষ্টায় যে সকল কারণ দেখাইতেছেন াহাও ভারতের ব্যাঙ্ক ইত্যাদি জাতীয় করণের সময় প্রদর্শন করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যে কারণগুলি বৃটেনে দেখান হইতেছে সেগুলি হইল :—

১। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয়ই অত্যধিক এবং উপরিব্যয় (ওভারহেড্স) খুবই বেশী বেশী।

২। যাঁহাদের সহিত এই সকল প্রতিষ্ঠান কাজ কারবার করেন তাঁহারা বহু অধিক খরচের ভার বহন করিতে বাধ্য হ'ন।

৩। এই সকল প্রতিষ্ঠান নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা মতই মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; লাভের কোনও অংশই অপর পক্ষ পাইতে সক্ষম হ'ন বলিয়া জানা যায় না।

৪। পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই সকল বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষমতা অল্প।

৫। ইঁহারা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুদের হার অথবা গৃহের মূল্য নির্দ্ধারণে যে রূপ ভাবে চলেন তাহা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া মনে হয়।

ভারতের জাতীয়করণ কার্য্য অর্থনীতির কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না; তবে মনে হয় যে তাহার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রনৈতিকই ছিল; অর্থনীতির কথা বিশেষ করিয়া সেই সূত্রে চিন্তা করা হয় নাই। জাতীয় করণের পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয় বৃটেনের অবস্থা ভারতের তুলনায় অন্য রকমই আছে।

ভারতে যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতীয় করিয়া লওয়া হইয়াছে; যথা ব্যাঙ্ক, বীমা, কয়লা খনি ইত্যাদি; সেগুলির জাতীয়করণের পূর্ব্বের ব্যয় জাতীয়করণের পরের ব্যয়ের তুলনায় অধিক ছিল কেহ বলিবে না। পরেই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া সকলে জানেন। অন্যান্য যে সকল অর্থ নৈতিক দোষত্রুটি ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বৃটেনে দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে সেইরূপ দোষ ছিল বলিয়া কেহ মনে করেন না। যতদূর জানা যায়, ভারতে নানান অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় করা হইয়াছে এই আশায় যে ঐ রূপ ব্যবস্থার ফলে জনহিতের পথ আরও সরল ও প্রশস্ত হইবে। সত্যই তাহা হইবে কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে পরে। শুধু, যদি সেইরূপ না হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার ব্যক্তিগত অধিকারে ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ সোসিয়ালিজম্ জন-মঙ্গল বৃদ্ধির সহায়ক না হইলেও তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তন করা ভারতবর্ষে কেহ চেষ্টা করিবে না।

মূল্য বৃদ্ধি

বাজারে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ হ্রাস এবং সকল বস্তুর দাম বাড়াইবার চেষ্টা ভারতবর্ষে একটা সামাজিক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্রব্যের অভাব কতটা উৎপাদনের কমতির জন্য হইয়াছে এবং কতটাই বা দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া দাম বাড়াইবার চেষ্টার ফলে হইয়াছে ইহার যথাযথ উত্তর দেওয়া সহজ নহে। বহু-লাংশে যে অনেক দ্রব্য গুপ্ত গুদামে লুকায়িত হইয়া আছে সে কথা সকলেই জানেন। ইহা ব্যতীত অনেক গোপন গুদাম আবিষ্কৃতও হইয়া যাইতেছে ও সেইগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকার চাল, ডাল, গুঁড়া দুধ, ডালডা প্রভৃতি পাওয়াও যাইতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বাজারে দ্রব্যের অভাব শুধু উৎপাদনের ঘাটতির জন্যই হইতেছে না। কিন্তু একথাও মানিতে হয় উৎপাদন যথেষ্ট হইতেছে না। বৃষ্টি না হওয়াতে যে ফসল কম হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া যে তুলনামূলক ভাবে সরবরাহ কম হইয়া গিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ জনসংখ্যা যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহার অনুপাতে বাজারে মাল যে পুরাপুরি বাড়িতেছে না তাহাও একটা চড়া বাজারের কারণ। জনসংখ্যা কমাইবার যে সকল উপায় এখন অবধি অবলম্বন করা হইয়াছে সে সকল উপায় উপযুক্তরূপে কার্য্যকর হয় নাই। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে কাজ হইতে পারে সেই সকল উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। যথা বিবাহের বয়স বাড়ান। এদেশে এখনও বাল্যবিবাহ প্রবল ভাবে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে; এবং যে সকল আইন করা হইয়াছে তাহা প্রয়োগ করা হইতেছে না। পুরুষের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর ও নারীর ১৮ যদি করা হয় ও তাহা মানিতে সকলকে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে শীঘ্রই জনসংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু আইন করা হইলেও তাহা প্রয়োগ করা হয় না বলিয়াই কোন চেষ্টা সফল হয় না। আর একটা দাম বাড়াইবার জোয়াল কারণ হইল অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। বাজারে যদি ব্যবসার অনুপাতে অর্থ বহু পরিমাণ মুক্তহস্তে ছাড়া হয় তাহা হইলে ক্রেতাদিগের ক্রয়-প্রতিযোগিতার ফলে সকল বস্তুরই মূল্য বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের দেশে যে সকল সরকারী বেসরকারী ঋণ গ্রহণ অবাধে চলিয়া থাকে তাহার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ জিনিস কিনিতে যতটা নিযুক্ত হয় জিনিস উৎপাদনকার্য্যে ততটা লাগে না। ফলে হয় অল্প বস্তুর অধিক ক্রেতার আবির্ভাব অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি। এই যে ঋণ করিয়া সেই অর্থ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ক্রেতার হস্তে আনিয়া দেওয়া ইহাতে যে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ও ব্যবসাগত বস্তুর ততটা

হয় না ইহাকে আমরা ইনফ্লেশন বা টাকার পরিমাণ ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া তোলা বলি। ইনফ্লেশন এদেশে ক্রমাগতই চলিতেছে ও ইহার জন্যও বাজারে মূল্য বৃদ্ধি অনেকটা দায়ী। বহুলোকের মতে এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিই বাজারে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই মত যদি মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে উৎপাদনের কমতি, জন সংখ্যা বৃদ্ধি, মালপত্র কিনিয়া গুদামজাত করিয়া লুকাইয়া রাখা ও কালো বাজারের কার্য্যকলাপ প্রভৃতির সমাজবিরুদ্ধতার শক্তি কি ভাবে নিযুক্ত হইতেছে বলিতে হইবে? নিশ্চয়ই ঐ সকল কার্য্যকলাপ সমাজবিরোধীদিগের শোষণপদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ এবং সেই শোষণপদ্ধতি নিশ্চয়ই প্রবলভাবেই কার্য্যকর। সুতরাং শুধু ইনফ্লেশনকে দায়ী করিয়া সমাজশত্রুদিগকে ততটা দায়ী না করার চেষ্টা কোন ভাবেই বিষয়টার ন্যায্য মূল্যায়ন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

"ভারত ছাড়ো" এবং "স্বাধীনতা" দিবস

৯ই আগষ্ট ও তৎপরে ১৫ই আগষ্ট দুইটি স্মরণীয় দিন। ৯ই আগষ্ট সেই ডাক পড়িয়াছিল যাহা ভারতের সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করে ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিবার জন্য। ঐদিন সেই আন্দোলন আরম্ভ হয় যাহা সত্যই একটা দারুণ বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। ইংরেজ সত্য সত্যই বুঝিতে পারে যে "ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাও" বলার ভঙ্গী ঠিক অহিংস অসহযোগের মত ইংরেজের পক্ষে নিরাপদ থাকিবে না। রেল লাইন কিম্বা রাস্তা সেতু প্রভৃতি ভাঙিয়া উড়িয়া যাইবে। সরকারী দফতর বন্ধ হইবে, বৃটিশ পুলিশ নিজ নিজ এলাকা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইবে। এমন কি বৃটিশ সেনাবাহিনীও সশস্ত্র ভাবে না চলিলে ফিরিলে "ভারত ছাড়িয়া" যাইতে বাধ্য হইবে। ঐ দিন যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বৃটিশকে তাহার সাম্রাজ্যবাদের চরম পরিণতির কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল। সেই বিপ্লবে সহস্র সহস্র আত্মত্যাগী দেশভক্ত নরনারী প্রাণ দিয়াছিলেন ও তাহার পর হইতেই ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া যাইবার সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নিজ মনে পোষণ করে নাই। ইহার পরে ইংরেজের সকল চেষ্টা শুধু ভারত ত্যাগ করা কি ভাবে কতটা ভারতবাসীদিগের শক্তিহানিকর করা যাইতে পারে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা যখন আসিল তখন তাহা যে জনমঙ্গল বিরুদ্ধ ভাবে আসিয়াছিল তাহা ইংরেজের মতলব হাসিল করিবার চেষ্টার ফলেই হইয়াছিল। ভারত বিভাগের আয়োজন ইংরেজের কারসাজিতেই হইয়াছিল ও তাহা করিতে ইংরেজের যে সাম্প্রদায়িক কলহ ব্যবস্থা করাইতে হয় তাহাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীশিশুর প্রাণ যায়। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কময় ইতিহাসের ইহা ছিল চরম কলঙ্কের অধ্যায়। কিন্তু ঐ সকল কথা সকলের মনে ক্ষোভ ও দুঃখ জাগ্রত করিলেও আমরা যে শেষ অবধি ইংরেজকে ভারত হইতে বহিস্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহার আনন্দ অন্ধকারে আলোকের আবির্ভাবের মতই আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন প্রভাতের অরুণোদয়ের ন্যায় আলোক সম্পাতিত করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পথ যতই রক্ত পিচ্ছিল হইয়া থাকুক না কেন স্বাধীনতা প্রাপ্তি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসে যেখানে যেখানেই লিখিত হইয়াছে কোথায়ই তাহা পূর্ণরূপে আনন্দোজ্জ্বল রূপ ধারণ করে নাই। সংগ্রাম হইলেই তাহার একটা কঠোর ভীষণতার দিক থাকে। আমাদের জাতীয় জীবনেও তাহাই দেখা গিয়াছে। সেই ভীষণতা হয়ত আরই ভয়ঙ্কর হইত যদি না মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংস অসহযোগ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বহু বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতেন। সংগ্রাম প্রচলিত রীতি অনুযায়ীভাবে চালিত হইলে লক্ষ লক্ষ নরনারীশিশুর যে প্রাণ যাইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে যে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিয়াছিল সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাধীনতা সংগ্রাম যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া চালিত না হইলেও সংগ্রামের সহিত জড়িত নানা ঘটনার ফলে বহু স্থলে রক্তপাত হইয়াছিল

তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আজ আমরা স্বাধীনতা দিবসের সম্পর্কে যাঁহাদের কথা ভাবিতেছি তাঁহারা দেশের জন্য বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন ও অনেকে মৃত্যু বরণ করিতেও পিছুপাও হ'ন নাই। আদর্শ সিদ্ধির জন্য যাঁহারা আত্মাহুতি দান করিতে দ্বিধা করেন নাই সেই সকল মহাবীরদিগের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণীয়।

যাহারা রাজপথে বাস করে

কলিকাতার রাজপথে চিরকালই বহু লোক রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কিছু কিছু ভিক্ষুক এবং কিছু আছেন মজুরী করিয়া যাঁহারা দিন কাটান। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রোজগার আছে কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা রাজপথের মুক্ত হাওয়ায় থাকিতেই পছন্দ করেন। এই সকল ব্যক্তির রাজপথে জীবন যাপন একটা সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইয়া চলিয়া আসিয়াছে ও তাহা লইয়া কাহারও কোনও শিরঃপীড়া হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে হঠাৎ রাজপথের বাসিন্দার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করায় সকলে বিষয়টা লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন যাঁহারা আসিয়া রাজপথে বাস করিতে আরম্ভ করিতেছেন তাঁহারা হইলেন পশ্চিম বঙ্গের গ্রামবাসী। ইঁহাদিগের গ্রামে খাদ্যাভাব হওয়াতে ইঁহারা কলিকাতায় খাদ্যের সন্ধানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের গ্রামবাসী প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি এখন কলিকাতার রাজপথে বাস করিতেছেন। আরও প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তি উত্তর প্রদেশ এবং বিহার হইতে কলিকাতার রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে এই সকল উত্তর প্রদেশ ও বিহারবাসী দিগের সংখ্যা এক লক্ষের অনেক অধিক। এবং ইঁহাদিগের খাদ্যাভাবও সবিশেষ গোলযোগের কারণ।

গ্রামবাসী বাঙ্গালী যাঁহারা কলিকাতার রাজপথে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও এখন অবধি খাদ্যাভাবে মৃত্যু হয় নাই। কারণ কলিকাতার জনসংখ্যার তুলনায় ঐ সকল রাজপথবাসীদিগের সংখ্যা তত অধিক নহে। কিন্তু যদি বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ পাঁচ বা দশ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার কারণ কলিকাতাবাসী বহুলোকের খাদ্যের জন্য কালো বাজারে যাইবার প্রয়োজন হয় এবং বর্ত্তমানে কালো বাজারে খাদ্যবস্তুর মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় তিনগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় কলিকাতাবাসী কিম্বা পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে আরও দশলক্ষ মানুষের খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ১৯৪৩ খৃঃ-অব্দে কলিকাতার রাজপথে সহস্র সহস্র মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। তখন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল পাঁচগুণ— দশগুণ এবং সেই মূল্যেও খাদ্যবস্তু পাওয়া যাইত না। তাহার কারণ ছিল, কয়েকজন ব্যবসাদারের খাদ্য সরবরাহ একচেটিয়া করিয়া লওয়া। বর্ত্তমানে সেইরূপ অবস্থা হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা হইল বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি না করা। বিদেশী অর্থ আমাদের যে পরিমাণ থাকা আবশ্যক তাহা আমাদের নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। এ অবস্থা কবে উন্নতির পথে যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। আর-এক ভাবে অবস্থা ভালো হইতে পারে। তাহা হইল স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া খাদ্যাভাব দূর হওয়া। ইহার সম্ভাবনাও আছে এবং এইরূপ হইলে সহজেই উত্তর প্রদেশের মানুষ উত্তর প্রদেশে এবং বিহারের মানুষ বিহারে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হইবে। পশ্চিম বঙ্গের গ্রামবাসীগণও নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন।

মূল্যবৃদ্ধির আর একটা কুফল

দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির যে সকল জনমঙ্গলবিরুদ্ধ কুফল দেখা যায় তাহার মধ্যে একটা অতি প্রকট অহিতকর বিষয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা হইল দ্রব্যে ভেজাল দিবার অভ্যাসের কথা। দ্রব্যমূল্য বাজারে যত অধিক হয় ভেজাল দিলে ততই লাভের সম্ভাবনা বাড়িতে থাকে। এই কারণে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও

মিশাল বস্তু বিক্রয় বৃদ্ধি প্রায় একই সঙ্গে পায়ে পা মিলাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। বর্ত্তমানে ভেজাল বর্জ্জিত প্রায় কোন বস্তুই বাজারে পাওয়া যায় না। তৈলে ভেজাল, ঘৃতে ভেজাল, আটা ময়দায় ভেজালত আছেই, তাহার উপরে আছে চাউলে কাঁকড় মাটি মেলান, চিনিতে জল ঢালা বা বালুকা মেলান, ডালে নানা প্রকার ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ছানার সঙ্গে চাউলের গুঁড়া, মাখনের সঙ্গে মার্জ্জারীন, রন্ধন করা খাদ্যে নানা প্রকার মিশাল আজকাল সকল সময়েই দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষাক্ত বস্তু মেলান হয় যাহাতে বহু লোক রোগাক্রান্ত হয় ও অনেকে প্রাণও হারায়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটা "পবিত্র সরিষার তৈলে" এত অধিক আর্জ্জিমন বা শেয়ালকাঁটার ফুলের বিচি পিষিয়া মেশান হইয়াছিল যে তৈলের বর্ণই অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছিল। আর্জ্জিমন হইতে যে বেরিবেরি রোগ হয় এ কথা সর্ব্বজন জ্ঞাত। যে সকল তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয় তাহা হইতে খনিজ তৈলের মূল্য অনেক অল্প। এই কারণে খাদ্যে ব্যবহৃত তৈলের সহিত খনির সাদা তেল মিশাইয়া দিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা হয়। ভেজালের কাহিনী যদি পূর্ণরূপে লিখিতে হয় তাহা হইলে একটা বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে পারে। এই কারণে শুধু বিষয়টার অবতারণা মাত্র করিয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা হইতেছে। জনসাধারণ ভেজাল সম্বন্ধে কিছু জানেন না এমন নহে; কিন্তু ভেজালের বিপদ সম্বন্ধে তাঁহাদের অবহিত করা তাহা হইলেও বিশেষ প্রয়োজন।

পাকিস্থানের সহিত মোকাবিলা

পাকিস্থানের সহিত ভারতবর্ষের কোন চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী মোকাবিলা হইবে কি না তাহা প্রধানত নির্ভর করে পাকিস্থানের নেতাদিগের মনের গোপন ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। পাকিস্থান গঠিত হইয়াছিল ভারতের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য এবং গঠিত হইবার পরেও পাকিস্থান সর্ব্বদাই ভারতের সহিত শত্রুতার উপরেই সকল বিষয়ের বিলিব্যবস্থা স্থির করিত। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, কচ্ছ ইত্যাদি নানা স্থানেই পাকিস্থান ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহা ব্যতীতও সকলেই সন্দেহ করেন যে পাকিস্থানী গুপ্তচরদিগের গোপন চেষ্টায় ফলেই ভারতের নানা স্থানে বহুবার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে। এই সকল ভারত-বিরুদ্ধতার প্রারম্ভ কালে পাকিস্থানী নেতাগণ বৃটিশ গুরুদিগের কথাতেই উঠাবসা করিতেন এবং বৃটিশের প্ররোচনাই তাঁহাদের নিকট মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিত। বর্ত্তমানে কাহার কথায় জনাব ভুট্টো ও তাঁহার সমর্থকগণ চলিয়া থাকেন সে কথা কাহারও পরিষ্কার জানা না থাকিলেও সকলেই অনুমান করেন যে পাকিস্থানের মন্ত্রণাদাতা এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং মাওবাদী চীন দেশ। আমেরিকার ও চীনের ভারত-বিরুদ্ধতা এখন ভারতের সহিত রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্বের ফলেই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই মনোভাব যে হঠাৎ পাকিস্থানের হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া যাইবে এইরূপ আশা কেহ করেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভারত পাকিস্থান আলোচনা ও বোঝাপড়া যাহাই হইবে না কেন তাহার ফল কি হইবে তাহা সর্ব্বদাই আমেরিকা ও চীন দেশের গোপন অভিসন্ধির উপর নির্ভর করিবে। আমেরিকা ও চীন দেশ যে রুশিয়া সম্বন্ধে নিজেদের শত্রুতা ভুলিয়া যাইবেন তাহার সম্ভাবনাও বিশেষ নাই বলিয়াই সকলের ধারণা। ভারতের সহিত রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও যেরূপ আছে, তাহাও যতদূর মনে হয়, বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। এইরূপ অবস্থায় পাকিস্থান যে হঠাৎ ভারতের সম্বন্ধে বন্ধুত্ব ভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিবেন ইহাও মনে করিবার কোনও সম্যক কারণ দেখা যাইতেছে না। তাহা হইলে আলোচনা ও বোঝাপড়া যাহাই হউক না কেন তাহার ফলে পাকিস্থানের মনের ভারত-বিরুদ্ধতা দূর হইবার কোনও আশা জাগ্রত হইতে পারে না। অন্তরের গোপন অভিসন্ধি যে শত্রুতার উপরে নিবিষ্ট সেই শত্রুতা যদি একই থাকিয়া যায় তাহা

হইলে কথাবার্তা যাহাই হইবে না কেন তাহার কোনও গভীরতা থাকিবে না। মনের গভীরে বন্ধুত্ব জাগ্রত না হইলে সকল কথাই হইবে উপর উপর লোক দেখান কথা।

এই সকল বর্তমান বৈঠকে আলোচ্য কথা যাহা তাহা প্রধানতঃ যুদ্ধবন্দীদিগকে পাকিস্থানে ফেরত পাঠান, যুদ্ধকালীন অপরাধের জন্ত যে ১৯৫ ব্যক্তি বিশেষ করিয়া আটক আছে তাহাদের বিচার ও বাংলা দেশ হইতে অবাঙ্গালী পাকিস্থানীদিগকে পাকিস্থানে যাইবার ব্যবস্থা করা এই তিনটি বিষয়েই নিবদ্ধ আছে। এই তিনটি বিষয়ের মীমাংসা কি হইবে, তাহাতে সাময়িক ভাবে মতবৈধ দূর হইলেও উভয় দেশের মধ্যে কোনও চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব গঠিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পাকিস্থানের ভারত-বিরুদ্ধতার ভিতরের কথা রহিয়াছে পাকিস্থানের কাশ্মীর দখল করিবার মতলবের মধ্যে। যুদ্ধবন্দী সম্বন্ধে অথবা অবাঙ্গালী পাকিস্থানী-দিগের পাকিস্থান গমন লইয়া অন্ত মতের ঐক্য হইলেও কল্যই যে পাকিস্থান কাশ্মীর দখল চেষ্টা করিবে না এই রূপ ধারণার কোনও নিশ্চিত কারণ দেখা যায় না। অথবা আমেরিকা ও চীনের সাহায্য যদি উপযুক্ত পরিমাণে পাকিস্থানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে তাহা হইলে পাকিস্থান যে ভারতের অপরাপর এলাকা দখল করিতে চেষ্টা করিবে না তাহাও কেহ বলিতে পারে না। ঐ দুই বৃহৎ দেশ ব্যতীত আরও একটি দেশ পাকিস্থানকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কাইতে সচেষ্ট আছে, সে দেশটি হইল ইরান। অবশ্য ইরান আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রেরই উপর নির্ভর করিয়া এবং ঐ দেশের প্ররোচনাতেই যে পাকিস্থানের সহায়ক হইয়াছে এ কথাও সর্বজনবিদিত। সকল দিক দেখিয়া এই কথাই বলিতে হয় যে বর্তমান আলোচনার ফলাফলে যাহা হইবে তাহা শুধু সাময়িক ভাবেই ভারত-পাকিস্থান সম্বন্ধ নির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারিবে। ইহার ফলে হয়ত সাময়িক শান্তি স্থাপিত হইবে কিন্তু বরাবরের জন্ত ভারতের প্রতি পাকিস্থানের কোনও সখ্যভাব জন্মলাভ করিবে না। এই জন্ত বলিতে হইতেছে যে এখন যে সকল কথাবার্তা চলিতেছে তাহা হইতে এই উপমহাদেশে বিশ্বশান্তির দিক হইতে কোনও মহান্ আদর্শ উপলব্ধি হইবে না।

জোর করিয়া বিমান দখল করা

জোর করিয়া বিমান দখল করা অথবা বিমান বন্দরে গমন করিয়া যাত্রীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া (এমন কি গুলি বোমা চালাইয়া হত্যা করাও) আজকাল একটা রাষ্ট্রক্ষেত্রে পারস্পরিক আক্রমণ চালাইবার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুপ্তভাবে বোমা রাখিয়া দিয়া আকাশে চলনশীল অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটাইয়া বিমান ধ্বংস করাও কখন কখন হইয়া থাকে। পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন (পি এফ এল পি) এই সকল হত্যালীলায় বিশেষ অপযশ আহরণ করিয়াছে এবং ঐ ফ্রন্টের নেতা ডাঃ হাবাস ও তাঁহার গেরিলা যোদ্ধাগণ বিপরীত পক্ষের নিকটে একটা ভয়াবহতার প্রতীকরূপে উপস্থিত হইতেছেন। ইসরায়েল যথাসাধ্য খোঁজ-খবর রাখিয়া চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে কোন ভাবে ডাঃ হাবাস ও তাঁহার সহযোগী ঘাতকদিগকে ধরা বা মারিয়া ফেলা সম্ভব হয় এবং কয়েকদিন পূর্বে যে একটি বিমানকে ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান দ্বারা জোর করিয়া ইসরায়েলের এক বিমান বন্দরে নামিতে বাধ্য করা হয় তাহার মূলেও ছিল ডাঃ হাবাস ও দলের লোকেদের ধরিবার চেষ্টা। ইসরায়েলের গুপ্তচরগণ একটা খবর আনিয়াছিল যে ঐ বিমানটিতে ডাঃ হাবাস সদলবলে যাইতেছেন। খবরটা ঠিক হয় নাই। ডাঃ হাবাস শেষ মুহূর্তে নিজের ব্যবস্থা পাল্টাইয়া অন্ত বিমানে গমন করেন এবং ইসরায়েল জোর করিয়া ধৃত বিমানে ডাঃ হাবাস ও সহকর্মীদিগকে না পাইয়া সকল যাত্রীকে যথাস্থানে চলিয়া যাইতে দিবার ব্যবস্থা করেন। অ্যাথেন্স বিমান-বন্দরে যখন আরব গেরিলাগণ আক্রমণ চালায় তখন তিনজন যাত্রী নিহত ও পঞ্চাশজন আহত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে একটি লিবিয়ান বিমানকে আকাশেই ধ্বংস করা হয় এবং তাহাতে শতাধিক যাত্রীর প্রাণহানি হইয়াছিল। ইসরায়েল বলেন যে আরব

গেরিলাদিগকে দমন করিবার যখন কোনও কার্য্যকারী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হইতেছে না এবং যখন ইসরায়েলের নিজ দেশের মানুষের নিরাপত্তার দিক হইতে আরব গেরিলাদিগকে দমন না করিলে চলিতেছে না তখন ইসরায়েলকে কিছু না কিছু করিতেই হইবে। এই কারণে ইসরায়েলকে গুপ্তচর রাখিয়া খোঁজ-খবর রাখিতে হইতেছে যদি কোন উপায়ে গেরিলাদিগকে যথেষ্ট সংখ্যায় ধরা যাইতে পারে এবং এই ব্যবস্থা তাহাদের জাতীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বলিয়াই তাহারা বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ হাবাস ও তাঁহার তিনজন সহকর্মী যে বিমানটিকে আকাশপথ হইতে ধরিয়া ইসরায়েলের বিমানবন্দরে লইয়া যাওয়া হয় তাহাতে যাত্রীরূপে যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিলেন। তাঁহারা শেষ অবধি কি করিয়া ও কি বুঝিয়া বিমানটিতে উঠেন নাই তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ঐ গমন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ইসরায়েলের সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা ও গেরিলাদিগের তাহা কাটাইয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিবার ক্ষমতা উভয়ই অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

অন্যান্য দেশে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি

এক ব্যক্তি সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইংলণ্ডে যদি কেহ কোনও রেস্তরাঁতে ভোজন করিতে যান তাহা হইলে কম কম খাইলেও অন্ততঃ ৫০।৬০ টাকার কমে একবার খাওয়া হয় না। হোটেলে বাস করাও বহু টাকার ব্যাপার। সাধারণ হোটেলে দিনে দুইশত টাকা দিলে থাকা ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ পুরাপুরি থাকা-খাওয়ার খরচ সাধারণভাবেও তিনশত হইতে তিনশত পঞ্চাশ টাকা দৈনিক লাগিয়া যায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন জুলাই মাসে যে মূল্যবৃদ্ধিরোধ করিয়াছিলেন সে-ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার ফলে খাদ্যবস্তর মূল্য অসম্ভব বাড়িয়াছে। সাধারণ মানুষের ঘরে মাংস আর কেনাই হয় না। একটি খবরে জানা যায় যে অনেক গৃহে গত পাঁচ সপ্তাহকাল মাংস রান্না হয় নাই। মাংস যদি কোথাও সস্তা দামে পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান হইয়া যায়। শুনা যায় টোকিওতে গোমাংসের দাম বার ডলার পাউণ্ড অর্থাৎ একশত আশি টাকা সের। এই মাংস কেনা হয় আমেরিকা হইতে। ভারতবর্ষে খাদ্যমূল্য বাড়িয়া থাকিলেও এই জাতীয় মূল্যবৃদ্ধি এখনও কোথাও হয় নাই। মৎস্য বিক্রয় কখন কখন বার হইতে চৌদ্দ টাকা সের হিসাবে হইয়াছে কিন্তু মাংস সচরাচর তাহা অপেক্ষা অল্প টাকাতেই বিক্রয় হইয়াছে। আমাদের দেশে যাহারা অল্প রোজগার করে, অর্থাৎ মাসিক একশত পঞ্চাশ হইতে দুইশত টাকা আন্দাজ, তাহাদের ঘরে নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি দেখা যায় না। কোনও প্রকারে ভাত-ডাল-রুটি খাইয়াই তাহাদের দিন কাটাইতে হয়। যাহাদের রোজগার পাঁচশত হইতে ছয়শত টাকা তাহারাও উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ তাহাদের বাড়ী ভাড়া, কাপড় চোপড় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঠিক রাখিতেই অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়। লোক দেখান ভদ্রতা রক্ষাই যেখানে বহু ব্যয়সাধ্য সেখানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের অপরাপর ব্যয়ের টাকা সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠে। যে সকল দেশে সরকারী ভাবে শিক্ষার, চিকিৎসার, অসুস্থতার, বেকার হওয়ার, বৈধব্য বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ঘটার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে সেইসকল দেশের মানুষ কিছুটা সহজে দিন কাটাইতে পারে; কিন্তু যে সকল দেশে, যথা ভারতে ঐ জাতীয় সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় না সেই সকল দেশের মানুষ সভ্যতার আদর্শ রক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে হইলে রোজগারের অনেক অংশই বাড়ীভাড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র যে মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে তাহার মধ্যে বাড়ীভাড়া, শিক্ষার খরচ, ডাক্তারের দক্ষিণাবৃদ্ধিও প্রকট আকারে দেখা দিতেছে। রেলভাড়া, ডাকমাশুল, গাড়ীভাড়া ইত্যাদিও পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্যান্য দেশে সকল

ব্যয় আরও অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু আমাদের তুলনায় তাহাদের আয়ও অনেক অধিক মনে রাখিতে হইবে।

ভুল করিয়া মানুষ মারা

কাম্বোজে আমেরিকানরা যেসকল স্থানে ভুল করিয়া বোমাবর্ষণ করিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইল নীক লুওং গ্রাম। এইখানে আমেরিকান বি-৫২ বিমানগুলি বহুটন বোমা ভুল করিয়া ফেলিয়া ১৪৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। আহত হয় কতজন তাহার হিসাব যথাযথভাবে কেহ বলে নাই। বাংলার একটা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহা হইল "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়"। এই প্রবাদ অনুসারে কাম্বোজের বহু নির্দোষ গ্রামবাসী সর্বস্ব হারাইয়া যে অবস্থায় পড়িতেছেন তাহার চরম নির্দয় অমানুষিকতার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আর একটি গ্রামেও আমেরিকান বৈমানিকগণ ভুল করিয়া বোমা বর্ষণ করে ও তাহার ফলে একজন গ্রামবাসী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার পরিবারের আর কেহই জীবিত নাই। গৃহও চুরমার হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামবাসীর তখন আর কিছুই করিবার রহিল না, শুধু কয়েকটি কবর খনন করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সৎকার ব্যতীত। ঐ গ্রামের সকল অধিবাসী ইহার কিছুকাল পরে পুনর্বার আমেরিকান বোমারু বিমান কর্তৃক আক্রান্ত হ'ন এবং গ্রাম ছাড়িয়া দূরে পলাইতে বাধ্য হ'ন। তাঁহারা যখন দুই-তিন ঘণ্টা পরে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইলেন তখন গ্রামের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যাহারা পলাইতে পারে নাই তাহাদিগের মৃতদেহ এবং ঘরবাড়ীর ভগ্নাংশ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আবার আরম্ভ হইল সেই কবর খনন ও স্তূপীকৃত ভাঙা-চোরা ইট-কাঠ সরাইয়া কোনও প্রকারে বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইবার চেষ্টা। কাম্বোজে এইরূপভাবে ভুল করিয়া মানুষ মারা ক্রমাগতই হইয়া চলিতেছে এবং ইহার ফলে যাহারা প্রাণ হারাইয়াছে বা সর্বহারা অবস্থায় চূড়ান্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছে তাহাদের কে কিভাবে সাহায্য করিয়া বাঁচাইবে তাহারও কোন স্থিরতা দেখা যাইতেছে না।

পাক-বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

বাংলাদেশে পাকিস্থান যে মার খাইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহার একটা ফল হইয়াছে পাকিস্থানের অন্যান্য ভূখণ্ডেও পাকিস্থান সম্বন্ধে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাওয়া। বালুচিস্তানে পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিশ্বাস কমিয়া আসিতেছিল এবং বাংলাদেশ হারাইবার পরে সেই বিশ্বাস আরই ক্ষীণ হইয়া যায়। পাঠানদিগের বাসভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও একটা বিভিন্ন পাকতুনিস্থান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা অনেককাল আগেই আরম্ভ হইয়াছিল, এখন দুই কারণে তাহা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম কারণ—বাংলাদেশ চলিয়া যাওয়ায় পাকিস্থানের অপযশ এবং দ্বিতীয় কারণ আফঘানিস্থানে লেঃ জেনারেল মহম্মদ দাউদের হস্তে রিপাবলিক গঠিত হওয়া। লেঃ জেনারেল মহম্মদ দাউদ রাজশক্তি আহরণ করিবার পরেই ঘোষণা করেন যে তিনি একটা স্বাধীন পাকতুনিস্থান গঠন করিবার চেষ্টার সমর্থন করেন। কিছু কিছু পাঠান ও বালুচি আছেন যাঁহারা পাকিস্থানের সহিত সংযুক্ত থাকিতেই চাহেন কিন্তু পাঞ্জাবী পাকিস্থানীদিগের অধীনে থাকিতে চাহেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা যাহাতে এরূপ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে বালুচি ও পাঠানগণ নিজ নিজ প্রদেশে নিজেদের রাজশক্তি নিজেরাই নিজহস্তে প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারেন। সে-ব্যবস্থা না হইলে তাঁহারা স্বাধীন বালুচিস্তান ও স্বাধীন পাকতুনিস্থানই গঠনের চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। আবার অন্য কিছু কিছু বালুচি ও পাঠান আছেন যাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহেন। অন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া পাকিস্থানের সহিত সংযুক্ত থাকিতে তাঁহারা চাহেন না। এইসকল আন্দোলন যে হইতেছে ইহা হইল পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া যাইবার লক্ষণ। পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছিল বৃটিশের মতলবে। এখন চলিতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাহায্যে ও গুপ্ত মন্ত্রণায়। এই দুই দেশ পাকিস্থানের নেতাদিগের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে, সাধারণ মানুষ ইহাদের মতলব ও সাহায্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু জানে না। তাহারা দেখে নিজেদের সুখ-সুবিধা কি আছে শুধু তাহাই। স্থানীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা এই সুখ-সুবিধাবৃদ্ধি চেষ্টারই অঙ্গ।

বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

॥ এক ॥

এটা আজ আর অবিদিত নেই যে, বিবেকানন্দ শুধুমাত্র অধ্যাত্মজগতের এক প্রেরিত পুরুষ নন, তিনি বীর সন্ন্যাসীও। নিছক ব্যক্তিগত মোক্ষচিন্তায় ব্যাপৃত না থেকে তিনি স্বদেশসেবাকেই মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বৈদান্তিক হলেও তাই তাঁর ধ্যানের ক্ষেত্র পবিত্র ভারতবর্ষ। স্বদেশের মুক্তি আর সমৃদ্ধির জন্য বিবেকানন্দ যে চিন্তা এবং কর্মের ঐতিহ্য রেখে গেছেন, উত্তরপুরুষের কাছে তার মূল্য অপরিসীম।

ব্যক্তিগত মুক্তি প্রার্থনা করে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একদিন জুটেছিল তীব্র ভর্ৎসনা। জেনেছিলেন, কোটি কোটি নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। মোহমুক্ত বিবেকানন্দ পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই সেই দায় তুলে নিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, তাঁকে স্নেহ দিতে হবে, শান্তি দিতে হবে, শোনাতে হবে জাগরণের দৃপ্তবাণী, বাজাতে হবে আসন্ন সংগ্রামের সঞ্জীবন দুন্দুভি। ধ্যানীর নির্মোক ছেড়ে এতদিনে আত্মপ্রকাশ করতে চাইল স্বদেশমন্ত্রের সন্ন্যাসী।

আরো 'পরে, পর্য্যটকের বেশে সারা দেশ ঘুরে বিবেকানন্দ দেখেছেন মানুষের দুঃখ, দুর্দশা; কুসংস্কার আর কুশিক্ষার বিষাক্ত পরিবেশ। ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯২, তিনি কন্যাকুমারীতে পৌঁছলেন। বাইরে তিনদিকে উত্তাল সমুদ্র, অন্তরে ঝড়। ধ্যানমগ্ন হলেন মহাসন্ন্যাসী। সেদিন ধ্যানে তিনি কি দেখেছিলেন কে উত্তর দেবে তার? কিন্তু রাতারাতি তরুণ তাপস রূপান্তরিত হয়েছেন এক শক্তিধর সংস্কারকে। এক সমৃদ্ধ স্বদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। সম্ভবতঃ সেদিন তাঁর চোখের সামনে ভারত-ইতিহাসের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন ভারতের ভাবীকাল সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল চিত্র, দেখলেন তার অতীত গৌরবের পুনরাবর্তন। কর্তব্য ঠিক হয়ে গেল। সেই সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে চাই শিক্ষা, দারিদ্র্যমোচন, সাম্য, স্বাধীনতা আর বীর্য্য। উপলব্ধির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে দ্বারে দ্বারে।

সেই থেকে বিবেকানন্দ স্বদেশমন্ত্রের বীর সন্ন্যাসী।

এবার ভগবান্ তাঁর কাছে সর্বতোমুখী নারায়ণরূপেই প্রতিভাত।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ
সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

তাঁরই পূজায় তাঁর অত্মোৎসর্গ। তাঁকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন দিক্‌বিদিকে। এই অপার্থিব অনুভূতিকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সমস্ত মানুষের মনে।

কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের সাধনার পীঠস্থান তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর স্বপ্নকে সফল করার জন্য আগে চাই মাতৃভূমির সমৃদ্ধি। স্বদেশের মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।

দেশসেবা তাঁর ভগবৎসাধনারই অনুষঙ্গ।

তিনি বলেছেন, বিশুদ্ধ আর নিষ্কলুষ প্রেমকে জাগ্রত কর হৃদয়ে। রূপায়িত কর দেশের কল্যাণে, মানুষের সেবাপরিচর্য্যায়। ভাস্বর-জ্যোতিঃ ব্রহ্মকে প্রকাশ কর। শিক্ষার দীপ নিয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়। অন্তরে রাখ গভীর সহানুভূতি ও সেবামাধুর্য্য। তারপর অগ্রসর হও, নির্ভীক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হও।

আরো বলেছেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য বিস্মৃত হও অন্য সকল দেবতা। সেবা কর, প্রসন্ন কর একমাত্র দেবতাকে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', যিনি

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'। এই দেবতাই বিবেকানন্দকে টেনে এনেছেন অধ্যাত্মজগৎ থেকে দেশহিতৈষণার মহান্ ক্ষেত্রে। ১৮৯৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে তিনি বলেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।"

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতো আমরাও প্রশ্ন করি, ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ পঞ্চাশ বছর শুধু দেশ জননীকেই পূজা করতে বলেছিলেন কেন? এটা লক্ষ্যণীয় যে ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। হয়তো ধ্যানদ্রষ্টা সন্ন্যাসী বুঝেছিলেন, ক্রান্তিকাল আসন্ন। এই কয় বছরের আত্মাহুতিতেই সমৃদ্ধি-দর্শনের প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত হবে। ঘটবে রাষ্ট্রীয় মুক্তি। আর তাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠবে আর্থিক মুক্তির জয়যাত্রা।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন, বিবেকানন্দই প্রথম দেশসেবাকে পূজায় উন্নীত করেন। সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত হয়েছেন পরবর্ত্তীযুগের অমিতবীর্য্য বিপ্লবীরা।

॥ দুই ॥

দেশ গড়ার ব্রতে তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন সত্যি, কিন্তু দেশপ্রেমের একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা বিবেকানন্দের ছিল। এই ঘোষণায় তিনি কখনোই সকুণ্ঠ নন।

তিনি বলেছেন, সত্যিই কি তুমি দেশকে ভালবাস? দেশের জন্য অতি তীব্র ও গভীর বেদনাবোধ কি তোমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে? দেশের দীন-দরিদ্র, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত নরনারীকে ভালবেসে, তাদের কথা চিন্তা করে,তাদের অপরিমেয় দুঃখের চিরন্তন অভিশাপের কথা উপলব্ধি করে তোমার চোখের ঘুম ও আহারে রুচি—দুইই কি অন্তর্হিত হয়েছে? গভীর, অথৈ জলে মানুষকে ডুবিয়ে ধরলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যে অব্যক্ত যন্ত্রণা সে অনুভব করে, তেমনি কঠিন যন্ত্রণা কি তোমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে দেশের জন্য? যদি হয়ে থাকে, তবে দেশসেবার এক-তৃতীয়াংশ অধিকার তুমি অর্জন করেছ।

কিন্তু এর পরেই দ্বিতীয় পর্য্যায়। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের প্রত্যেকটি ধাপ, পূর্বাপর প্রত্যেকটি স্তর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দরকার। যদি কোনো অস্পষ্টতা অস্বচ্ছতা না থাকে, তবে দেশসেবার দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার জন্মেছে।

এবার চাই পূর্ণ অধিকার। বৃহৎ ও নিঃস্বার্থ কর্মের পথ কখনো সুগম হয় না। সেই বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে যেতে পারলেই তবে অভীষ্ট-সিদ্ধি। সেই লক্ষ্যের পথে দুস্তর বাধা এসে দাঁড়াবে, অকল্পিত প্রতিবন্ধক চাইবে বারবার পথভ্রষ্ট করতে। সঙ্গীরা পিছিয়ে পড়বে হয়তো। আপনজন বর্জন করবে। অনিশ্চিত পথযাত্রা। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যিনি কৃতসঙ্কল্প, তিনি এবার লাভ করেছেন দেশসেবার পূর্ণ-অধিকার।

এই ধরণের কর্মীকেই তিনি জীবনভর খুঁজেছেন। আহ্বান করেছেন স্বদেশব্রতে।

বলেছেন, ভারতের গ্রামে গ্রামে যাও, কুটীরে কুটীরে যাও। কণ্ঠে ধ্বনিত হোক বেদান্তের অভীঃমন্ত্র—যে মন্ত্র অফুরন্ত শক্তি-উৎসরূপে উপনিষদের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। জগতের অন্য কোনো পুস্তকে, অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থে এমন একটি শক্তিগর্ভ শব্দ আর খুঁজে পাবে না। অথচ, দুর্ভাগ্যবশতঃ এর যথাযথ প্রয়োগ আমরা আমাদের জীবনে এতদিন করতে পারি নি। কিন্তু এবার বর্তমান মহাসম্ভাবনাময় যুগের অনুকূলতায় তাকে প্রয়োগ কর।

বড়লোক বা ধনীর প্রত্যাশা করো না। জগতে দরিদ্ররাই যুগে যুগে মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং নিষ্ঠার সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চল। বাজাও ডমরু, বাজাও শিঙ্গা। ঢাকের বাদ্যে ব্রহ্মরুদ্রতালে দুন্দুভিনাদ জাগিয়ে তোল। 'মহাবীর' 'মহাবীর' ধ্বনিতে আর 'হর' 'হর' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত কর।

বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশে প্রাণসঞ্চার হবে, বীর্যের কঠোর মহাপ্রাণতায় জাতি উদ্বুদ্ধ হবে।

জাতির মুক্তিসাধনায় বিবেকানন্দ চেয়েছেন সহস্র যুবকের আত্মবলি। চেয়েছেন যুবা—আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী। ভারতীয় যুবকদের মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন 'লৌহসদৃশ পেশী' আর 'ইস্পাতের ন্যায় স্নায়ু'। তাদের শরীরের ভেতরে এমন একটি মন বাস করবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।

এটা লক্ষ্যণীয় যে বিবেকানন্দের আহ্বান ব্যর্থ হয় নি।

স্বামীজীর মৃত্যুর (১৯০২ সাল) কিছুকাল পরেই এদেশে যেন মিছিল করে এসেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল। স্বামীজী বলি চেয়েছিলেন। বলি হয়েই এঁরা এলেন। ভীতিবিহ্বলতার অন্ধকারা ভেঙে এঁরা গেয়ে গেলেন জীবনের জয়গান। কে আগে প্রাণ দেবেন, তার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য হয়ে উঠল। ফাঁসীর রজ্জুকে ফুলের মালার মতো এঁরা বরণ করে নিলেন। পরম ঔদাসীন্যে সহ্য করলেন অকথ্য নির্য্যাতন, নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা, পৈশাচিক শারীরিক যন্ত্রণা—তবু মুখ খোলে নি, উচ্চারিত হয়নি কাতরোক্তি। জেলখানা তীর্থে রূপান্তরিত হল। মৃত্যুপথযাত্রীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল অভয়মন্ত্র, বন্ধনমোচনের আকুল আকৃতি।

রোম্যাঁ রোলাঁ তাই লিখেছেন, বিবেকানন্দের দেহভস্মই বৈরাগ্যে দীক্ষিত করল দেশকে। মৃত্যু-মাতাল তরুণদল এগিয়ে এলেন জীবন নিবেদন করতে। শহীদের রক্তেই তাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শুভ সূচনা। বিবেকানন্দ সেই সংগ্রামেরই নেপথ্য-নায়ক।

আগেই বলেছি বিবেকানন্দ দেশের স্বাধীনতা চেয়েছেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করার বাধা ছিল। প্রয়োজন ছিল লেখনীর সংযমও। তবু মাঝে মাঝে ভেতর থেকে সেই বিদ্রোহী প্রাণসত্তা মুখর হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য্য সংযম এবং বুদ্ধিমত্তার [illegible] তিনি প্রচার করেছেন তাঁর মহামন্ত্র।

তিনি মিস্ হেল্‌কে একবার লিখেছিলেন যে, যেভাবে তিনি বৃটিশ কুশাসনের উল্লেখ করলেন, তা যদি প্রকাশ পায়, তাহলে ইংরেজ সরকার তাঁকে দেশে নিয়ে বিনা বিচারে হত্যা করবে। সদা সতর্ক দেশপ্রেমিক তাই ইঙ্গিতে আভাসে লক্ষ্যের কথা প্রকাশ করেছেন, যার মর্মার্থ শাসককুল সব সময় বুঝে উঠতে পারে নি।

একবার কথা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে তিনি বলেছিলেন, এদেশের যা দরকার, তা হল বোমা। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী কালের তরুণেরা তাঁর রচনাবলী যেমন পড়েছেন, বোমার রাজনীতিকেও পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছেন। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের গুপ্ত হত্যায় বিবেকানন্দ নাকি উল্লসিত হয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, এই হত্যাকারীদের স্বর্ণমূর্ত্তি বোম্বাইয় জাহাজঘাটে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

অবশ্যই গুপ্তহত্যায় রাজনীতিতে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণা থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁর বাণীতেই যে পরবর্ত্তীকালের বিপ্লবীদের অগ্নিদীক্ষা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। জীবন-মৃত্যুর অতীত এক মানসিক স্তরে তাঁরা পৌঁছতে চেয়েছিলেন, দেশের নামে সর্বস্ব দিতে চেয়েছিলেন পরিণামের কথা না ভেবেই। এই নিষ্কাম কর্মে দীক্ষা বিবেকানন্দের রচনা দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল, এ-কথা শ্রীঅরবিন্দ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি অগ্নি-পুরুষরা সকলেই স্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়।

নিবেদিতা এদেশে এসেছিলেন বিবেকানন্দের কাজেই। তিনি যে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বিপ্লব-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেটা আজ ঐতিহাসিক সত্য। গুপ্ত-সমিতির কর্মপরিষদেও তাঁর নাম ছিল। মঠের কর্মসচিব ব্রহ্মানন্দ তাঁকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসার অনুরোধ করলেও নিবেদিতা বরং রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে গেলেন। এই স্বাধীনতা বিবেকানন্দ আগেই তাঁকে দিয়েছিলেন। তবে কি নিবেদিতার কর্মসূচী তাঁরও অভিপ্রেত? নিবেদিতা তো তাঁরই মানসকন্যা।

অনুশীলন সমিতির স্থাপয়িতা সতীশ বসু নিজেই বলেছেন, দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রেরণা স্বামীজী দিতেন অক্লান্তভাবেই। সেইজন্যই মঠ ও মিশন ইংরেজের সন্দেহ-ভাজন হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দ দৃঢ়তা দেখিয়েছেন যার ফলে মেঘমুক্তি ঘটেছে। কিন্তু ইংরেজ ঠিকই বুঝেছিল। যে-কোনো বিপ্লবীর কাছেই তারা পেয়েছে বিবেকানন্দের বই। গভর্ণর রোনাল্ড্ রস্ স্বয়ং একবার বিপ্লবী-নায়ক হরিচরণ চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বিবেকানন্দের ভক্ত কি না।

সগৌরবে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন বিপ্লবী। প্রতিনিয়ত তাঁরা তো জপ করতেন স্বামীজীর সেই বাণী—বলি চাই।

শক্তি, শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ্ বলেছেন—তিনি বার বার বলতেন।

বল্ অস্তি, অস্তি। নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলতে বলতে কি কুকুর-বেড়াল হয়ে যাবি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং।

ওঠো, জাগো। দুর্বলের কিছু নেই। শক্তি চাই। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।

॥ তিন ॥

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, দেশের মুক্তি আর সমৃদ্ধির জন্য দরকার জাতীয়তাবোধ ও ঐক্য। স্বার্থ ও নীচতা সমগ্র দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। একদিকে মুষ্টিমেয় সুযোগসন্ধানী অর্থ আর জাত্যভিমানে নিজেদের পৃথক্ করে রেখেছে সামগ্রিক জনসাধারণের কাছ থেকে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য, দারিদ্র্য আর অপমৃত্যু।

এরই মধ্যে স্বামীজী দিয়েছেন ঐক্যের ডাক। ভারতের জাতীয়তামন্ত্রের তিনিই প্রথমতম ও সার্থকতম ঋষি।

একদিন অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে তিনি দেশজননীর ধ্যানমূর্তির সামনে বলেছিলেন, জননী, আমি মুক্তি চাই না, তোমার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ম।

তাই কর্মবীর স্বামীজীর সাধনা জাতীয়তা আর স্বদেশমন্ত্রের উচ্চারণে।

জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন। ১৮৯৪ সালে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন: ধর্ম কি আর ভারতের আছে দাদা? জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন করেছেন, এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান। ভ্যালা মোর বাপ রে। হে ভগবান্। এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।

জাতীয় জীবনের এই কুসংস্কার এবং অনাচারগুলি নির্মূল করার জন্য তিনি বেদান্তের আলোকে দেখালেন পথ। জানালেন ভারতের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী এই বিবেকহীন ধর্মান্ধতা, শুচিবাই আর অজ্ঞানতা। নতুন শিক্ষার আলোকে মানবতার মহান্ মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে হবে সবাইকে। সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বললেন: এই ছুৎমার্গরূপ ঘোর অধর্মে তোমাদের জীবন খোয়াইও না।

এই সঙ্গে বিবেকানন্দ আঘাত হানলেন বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ মোহকেও। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে তিনি দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন স্বদেশের মানুষকে। বলেছেন যে, ইতিহাসের উদয়-লগ্নে একদিন ভারতের তপস্যাদীপ্ত দেশ-দেশান্তরে প্রাণের মন্ত্র ছড়িয়েছিল। কিন্তু তারপরেই এসেছে ঘোর দুর্দিন। আমাদের নিজের দোষেই ঘনিয়ে এসেছে দুর্ভাগ্যের ঘনঘটা। এই পটভূমিতেই একান্ত দরকার মুক্ত মনের সহজ অভিসার। আমাদের আবার পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হতে হবে। অনুভব করতে হবে চিরন্তন ভারতাত্মাকে।

এক সময় তাঁর ক্ষোভ জন্মেছিল, মনে হয়েছিল ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভা ম্লান হয়ে গেছে একেবারে। কিন্তু, অবশেষে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন তিনি।

বলেছেন, ভুল, আমারই ভুল। ভারতবর্ষ চলেছে তার চিরন্তন গতিপথেই। মানুষের মধ্যে দেবত্বকে সে খুঁজে পাবেই।

এই বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি বৈদেশিক অনুকরণকে নিন্দা করেছেন। বিদেশীর অন্ধ স্তাবক নতুন এক শ্রেণীকে বারবার ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন : হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?

তিনি দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তার ভাব জন্মে দুটো দিক্ থেকে—নিজেদের মধ্যে ঐক্য আর অপর কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষে। আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক-চেতনায় তিনি উল্লেখ করলেন, একান্ত স্বজাতিবৎসল ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংরেজ ও জার্মানীর, ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত। স্বামীজী অবশ্যই ভারতকে ইংরেজ-বিদ্বেষী হতে বলেন নি। কিন্তু সিদ্ধান্তটির ঐতিহাসিক উদাহরণ নিশ্চয়ই পরোক্ষে ইংরেজ-বিদ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত করেছে।

স্বামীজী দেশ-বিদেশের ইতিহাস মন্থন করে তাকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব জাপান ও ভারতে দেরীতে হলেও যে এসেছে, সেটা তিনি প্রমাণ করেছেন। এদেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যাতে বৃদ্ধি পায় তিনি তার জন্য অপর একটি এশিয়া-অন্তর্গত দেশ জাপানের নবজাগরণের উদাহরণ দিয়েছেন। তারপর লিখেছেন : অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, যে বিকৃতমস্তিষ্ক সে বুঝিতে পারিতেছে না যে, আমাদের মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই একণে ইহার গতিরোধে সক্ষম নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোনো বাহিঃস্থ শক্তিই একণে ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

শুধু দরকার ঐক্যবোধ আর স্বধর্মনিষ্ঠা। তাই বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মূলমন্ত্র : হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

জাতীয়তার এমন মন্ত্র এদেশে আর কে উচ্চারণ করেছেন?

॥ চার ॥

অসাধারণ মানবপ্রেম তাঁকে নিয়ে গেছে সমাজতন্ত্রের দিকে।

ভারতের জন্য তাঁর যে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বাণী, তা সমাজতন্ত্র-কেন্দ্রিক। এদিক্ থেকে দেখতে গেলে, তিনি যে এদেশের প্রথম সমাজতন্ত্র-প্রবক্তা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

এদেশের মানুষের দুঃখদুর্দশা তাঁকে উদ্বেল করে তুলেছে। ব্যাকুল হয়ে তিনি সন্ধান করেছেন মুক্তির পথ। বলেছেন : যতদিন অবধি আমার দেশের একটা কুকুর পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন তাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম। এছাড়া আর যা কিছু সব অধর্ম। বলেছেন—যতদিন ভারতের অগণ্য নরনারী দারিদ্র্যের আর অজ্ঞানের নীরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবে থাকবে, ততদিন, যারা তাদেরই শ্রমে মানুষ হয়েছে, তাদেরই রুধিরস্রাবে শিক্ষা ও সৌভাগ্যের প্রশস্ত পথ তৈরী করে নিয়েছে, তাদের আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করব, ধিক্কার দেব।

তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন পার্থিব প্রয়োজনীয়তার কথা। নিষ্ক্রিয় অধ্যাত্মবাদ তাঁর আদর্শ নয় বলেই, তিনি মানুষের জন্য দিয়ে গিয়েছেন সমৃদ্ধির মন্ত্র। বলেছেন—খালি পেটে ধর্ম হয় না। বলেছেন, যেই ভগবান্ ইহকালে দুমুঠো ভাত দিতে

পারেন না, পরকালে শান্তিই দিতে পারেন শুধু, সেই ভগবানে তাঁর প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন—আমি প্রার্থনা করি, আমি যেন বারবার জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ সহ্য করি, যেন সকল জন্মে একমাত্র যেই ঈশ্বরের বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের—উপাসনা করিতে পারি; আর সর্বোপরি, পতিত, দুঃখী, পাপীতাপীরূপী মানুষই আমার ঈশ্বর, আমার বিশেষ উপাস্য।

দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর ছিল অসীম মমতাবোধ। বেলুড়মঠে একবার কিছু সাঁওতালকে তিনি যত্নসহকারে খাওয়ালেন। তারপর সন্ন্যাসীদের বলেছেন: এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে কি হল? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছা হয়, মঠ কঠ সব বিক্রী করে দিই, এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই।

এই বেদনাবোধ নিছক সহানুভূতি-প্রজাত নয়। স্বামীজী সমাজের বৃহত্তর অংশের দারিদ্র্য আর দুঃখের কারণ হিসাবে মুষ্টিমেয় লোভীর শোষণের দিক্‌টাকেই প্রকট করে তুলেছেন। দেখিয়েছেন যে, সমাজে যে উৎপাদক, শেষ পর্য্যন্ত সে হয় বঞ্চিত। তারই শ্রমের ফসল অন্যেরা কৌশলে হস্তগত করে। স্বামীজী তাই উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন। স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল স্বদেশের জন্য অর্থসঞ্চয়, সেটা অনেকেই জানেন না। তিনি লিখেছেন: অবশেষে অর্দ্ধপৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই সুদূর বিদেশে সাহায্যলাভের আশায় উপস্থিত হইয়াছি। দয়াময় ভগবান্ অবশ্যই সাহায্য করিবেন। আমি হয়ত এই দেশে শীতে ও অনাহারে মরিব। কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র, পতিত ও উৎপীড়িত জনগণের সেবাকার্য্য মহাদায়রূপে অর্পণ করিতেছি। ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারীর সেবাব্রত গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পর্য্যায়ক্রমিক প্রাধান্যের কথা তিনিই প্রথমে ঘোষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুগ শেষ হয়েছে। সুতরাং বৈশ্যযুগ বা ক্যাপিটালিজম্-এর পর শূদ্রযুগ বা সমাজতন্ত্র দেখা দেবেই। নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের প্রথম জোয়ার আসবে রাশিয়া বা চীনদেশ থেকে। সেই ঢেউ আছড়ে এসে পড়বে দিক্‌দিগন্তে।

অবশ্য স্বামীজী স্বীকার করে নিয়েছেন যে সমাজতন্ত্রবাদও সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। বিশেষ করে, এতে সাংস্কৃতিক মান অবনত হবেই। তবু শূদ্রশাসন পৃথিবীতে সাম্যের সৌন্দর্য্য বয়ে আনবে। সুখসৌহার্দ্যে সকলে সুন্দর হয়ে উঠবে। স্বামীজী সমাজতন্ত্র চেয়েছেন এটা আদর্শ ব্যবস্থা বলে নয়, কিন্তু, পুরো রুটি না পাওয়ার চাইতে অর্দ্ধেক পাওয়া তো ভালই।

তাই তিনি বলেছেন: তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পদ্।

বলা বাহুল্য, স্বামীজীর সমাজতন্ত্রের আদর্শও পরবর্তী কালের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রভাবিত করেছে। সুভাষচন্দ্র তাই লিখেছেন যে, সমাজতন্ত্রের ধারণা এদেশে বহিরাগত আমদানী নয়। বিবেকানন্দের বাণীতে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

॥ পাঁচ ॥

অথচ সমাজতন্ত্রবাদী হয়েও স্বামীজী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী। এদেশের মানুষের জন্য তিনি চেয়েছেন

সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। বৈদান্তিক বলেই মুক্তিমন্ত্রে তাঁর অটল নিষ্ঠা। তিনি বারবার সমষ্টির কল্যাণের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু হেগেলের মতো সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া তাঁর ধর্ম নয়। তিনি জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের মতোই অন্যের ক্ষতি না করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকেও দাবী করেছেন। চেয়েছেন সর্বাত্মক স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি। কিন্তু সেই স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের পটভূমিকাতেই সম্ভব। কারণ স্বামীজী স্বীকার করেছেন, সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা থাকতে পারে না কিছুতেই।

এই সামঞ্জস্য বিধানই বিবেকানন্দের কাম্য।

সেটা সম্ভব শিক্ষাবিস্তারের ফলে। বিবেকানন্দ তাই প্রচলিত অর্থে দেশনেতা নন। তিনি চেয়েছেন আদর্শকে প্রচার করতে। সেই আদর্শে দীক্ষিত নবীন নায়কেরাই দেশগঠনের দায় নেবেন। মানুষ তৈরী করাই তাঁর কাজ।

বিবেকানন্দ তাই চেয়েছেন শিক্ষাবিস্তার। জনগণের দুঃখ দূর করবার এটাই একমাত্র পথ। তিনি লিখেছেন: আমাদের কর্তব্য তাদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের প্রণষ্ট ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। তাহারাও যে মানুষ, চেষ্টা করিলে তাহারাও যে মানুষের মতো মানুষ হইতে পারে—এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত মতবাদ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত। ইংরেজ প্রণীত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে তিনি নতুন শিক্ষাদর্শের কথা বলেছেন যাতে চরিত্র গঠন, জাতীয় ঐক্য, বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধন করা যায়। সেইজন্য তিনি বিজ্ঞানশিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষাকেও প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এদেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার করাও ছিল তাঁর অ্যামেরিকা যাত্রার অন্যতম কারণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আজ তাঁর সেই প্রথম প্রচেষ্টার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশের সঙ্গে সহযোগিতার কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে আদানপ্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠিতে চায় তাহা হইলে তাহার গুপ্তভাণ্ডারে যা সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

অথচ, সমৃদ্ধ ভারতের জীবনের মূলভিত্তি হবে ধর্ম-চেতনা। সনাতন ভারতবর্ষকে আবার খুঁজে নিতে হবে তার তপস্যায়, তার অধ্যাত্মবোধে। বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন, ধর্মের কুসংস্কারের চাইতেও ক্ষতিকর বিজ্ঞানের কুসংস্কার।

সংস্কারমুক্তিই নবীন ভারতের জন্য বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ বাণী।

তিনি শুনিয়েছেন জাগরণের বাণী—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সেই কম্বুকণ্ঠ শুনেই শতাব্দীর জড়িমা ভেঙে জাতি উঠে দাঁড়িয়েছে। চেয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার।

তিনি বলেছেন, দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক-এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি জোগাড় করে আনি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আরো বলেছেন, আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বিবেকানন্দ জানতেন, একটা জীবকেও পেছনে ফেলে রেখে ব্যক্তিগত মোক্ষ হয় না। তিনি তাই মোক্ষ চান নি। স্বদেশের সেবার জন্য বারবার জন্মাতে চেয়েছেন এই পবিত্র ভূমিতে।

মেধাবী ও মঞ্জুঘোষা

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

—কা ত্বং কন্যাসি রম্ভোরু প্রসন্না চ কথং মম ?

বয়স্ক ঋষিতনয়ের সন্দর্ভময় প্রশ্নে আত্মবেগোন্মাদিনী তটিনীর মতো উদ্দাম হাস্যে লুটিয়ে পড়ল প্রশ্নিতা মঞ্জুঘোষা,—কন্দর্পের বিজয়বৈজয়ন্তীস্বরূপা অপ্সরলোকের পরিপূর্ণযৌবনা পুণ্যতমা দুহিতা।

কী পার্থিবজ্ঞানহীন এই অমৃতলোকসন্ধানী চ্যবনপুত্র মেধাবী। আত্মজিগীষার্থে নিয়োজিত আপন প্রজ্ঞার সাথে কী কঠিন প্রবঞ্চনা। এরাই আবার সাধক। এদেরই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নাকি প্রজ্বলিত বা নির্বাপিত হয় সৃষ্টিলোকের অযুতাযুত সূর্যরাশি। বুঝতে পারে না যবীয়সী অপ্সরদুহিতা, নারী-পরিচয়হীন এই যে এদের তপোনির্দগ্ধকল্মষ তাপসজীবন, এটা কি এদের নিকৃতি-নিপুণতা কিংবা নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মোকাবরণ শুধু ? এটা কি সত্যই এদের আত্মিক সারল্যের দ্যোতক ? এই যে কাম-মোহহীন অনন্ত জীবনসাধনার অহংকার, এ কি এদের অপৌরুষের কোন অক্ষমতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগুপ্ত করে রাখার কোন ছলনা ? অথবা—

—ত্বৎসদৃশা ন দৃষ্টা চ ন শ্রুতা চ শুভাননে।

এবার শুধু হাসি নয়, সমগ্র শরীরটাতেই যেন তটিনীর বেগ এসে লাগে লাবণ্য-প্লাবিতাঙ্গী মঞ্জুঘোষার। সদাই আপন লীলায় আত্মহারিণী প্রমত্তা অপ্সরা, তার ওপরে এই অবিশ্বাস্য সারল্যের প্রমুগ্ধতায় যেন বিগলিত তার তনু-মন,—মৃগমদসৌরভিনীর মতো হৃদয়জ কৌতুকে কৌতুকিনী হয়ে ছুটে চলে সে বিস্তীর্ণ চৈত্ররথে।

তখন কুঙ্কুমরজে আকীর্ণভূমি সমগ্র চৈত্ররথ-কানন প্রফুল্ল কুসুমের পরাগরাশিতে আপ্লুতাঙ্গ হয়ে এবং চোলীকপোলফলরাশিতে চুম্বন দান করে প্রবাহিত হয়েছে সমীরণ। তপনরাগরঞ্জিত সন্ধ্যার সঙ্গমে উন্মুখ হয়ে গগনপ্রাঙ্গণের একদেশে লম্বমান হয়েছেন চৈত্ররথের চিত্রভানু। তখন বিমোহনী নিদ্রার মতো ঘনচ্ছায়ায় তুল্যশ্রী ধারণ করেও রক্তিম লাবণ্যে পরিপূর্ণ সেই চৈত্ররথের সর্বক্ষেত্রে সুরভিগর্ভ কুসুমমালামোদিত এক আমোদন বিস্তারিত হয়ে চলেছে দিকে দিকে। দিকে দিকে শ্রোত্রমধুর রবোদগার করে চলেছে সেই মায়া-কাননের চিরপোষ্য শারিকা ও রোচিষ্ণুর দল। তপোরাগ হেতু ধর্মের লুণ্ঠনলোভী সাধকের মতো নিত্যোৎসবে প্রমত্তা হয়ে উঠেছে যেন চৈত্ররথের প্রকৃতি।

তখন অনপহার্য অনেকানেক অমূল্য সম্পদ্‌সম্ভার বিতরিত হয়ে চলেছিল সেই প্রকৃতিলোকে। কিন্নর-কামিনীর সুরতক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ শীর্ণপল্লব মন্দারের একটি একটি কুঁড়ি ফুটে উঠছিল ফুলে। চন্দন ও কস্তুরীগন্ধের উন্মাদনায় দগ্ধ কন্দর্পদেহের নির্বাণাঙ্গরজ সুবাসের বিদগ্ধ বিভ্রম উদ্রিক্ত হয়ে উঠেছিল মুহূর্তে মুহূর্তে। যেন চৈত্ররথাধিষ্ঠাত্রীর কান্তি ও সৌরভ্য অবলোকন করেই কালিমা ধারণ করতে শুরু করেছিল কস্তুরিকা। কোথাও ময়ূরের মনোজ্ঞ নিনাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল লতাগৃহ, এবং তাদের পুচ্ছপক্ষ থেকে রঙের আভা উত্থিত হচ্ছিল ললিত গতিতে। কোথাও উত্তম গৈরিকাভ পঙ্কজদলের শোভায়, কোথাও নবজলবৎ আসনপত্রে ক্রীড়মান চকোরের চাঞ্চল্যে, কোথাও সিন্ধু-নদীতটের তরঙ্গ-তর্পণবৎ কুণ্ডলকুলের স্ফুরণে, কোথাও নিচুলমঞ্জরীবৎ বিনম্রনম্র ভূজাবলীর বিরাজনে যেন নবরূপা হয়ে উঠেছে চৈত্ররথ। দলিত কোকিলাকুলিত নূতন চূতাঙ্কুরে, কিংবা কুরঙ্গকুলসেবিত প্রবল শালি-মূলে, অথবা অদৃশ্যা সুরবধূর প্রবল-সুন্দর পদন্যাসে পরিপূরিত সেই কানন যেন মুনিমনেরও বিকারসম্পাদন-প্রয়াসী হয়ে উঠেছে সেই ক্ষণে।

কাননের বিভিন্ন অংশে তাকে অনুসন্ধান করে চলেন চ্যবনাত্মজ ঋষিসত্তম মেধাবী। যতই সেই ভোগী-কাননের মার্গে মার্গে বিচরণ করেন, ততই যেন সাধনমার্গ হ'তে দূরে সরে যান তিনি। রোমন্থকালীন মন্থরাপাঙ্গ মৃগবৃন্দের পরমসেব্য সেই কাননে অনিল-বিলোড়িত তরুরন্ধ্র থেকে পরমাহ্লাদজনক শব্দে আহ্লাদিত তাঁর প্রাণকেন্দ্র। পুষ্পের নির্যাস-সীধু-পানোন্মত্ত মধুকরের সঙ্গে সঙ্গে যেন উদ্‌ভ্রান্ত তাঁর চিত্তদেশ। মন্দমারুতে আন্দোলিতা চন্দনলতার আহ্বানে, নিরবচ্ছিন্ন মঞ্জরী-ভারে অবনত চূতক্রমের সঙ্কেতে এবং পুষ্পবিকাশচ্ছলে সিন্ধুবারের হাস্যে নবতন প্রযোজনা সংঘটিত হচ্ছিল তাঁর মনে, কিন্তু একটি একতমার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না থেকে পারেনি তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি।

কাননাভ্যন্তরের কোথাও সেই কান্তিকল্লোলিনী কামিনীকে খুঁজে পেলেন না মেধাবী, কিন্তু খুঁজে পেতে যে হবেই। বিশ্বাস জেগেছে ঋষির, মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত অংশুক কখনও বীতরাগ হতে পারে না। বিশ্বাস জেগেছে, আশ্চর্য্য পুষ্পমঞ্জরীর মতো সেই রমণীয় মন নির্দয় গোপনতায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না কিছুতেই। কিংবা নন্দনচারিণী সেই নতভ্রূ সৌন্দর্যে সুললিত শঠতারও স্থান নেই বুঝি। বুঝতে পেরেছেন তিনি, বাসনাভ্যাস-পথে প্রাণিগণের অন্তর-প্রবিষ্ট অনুরাগ কখনও কোনও মুহূর্তে তাকে পরিত্যাজ্য হ'তে দেয় না; —এবং যৌবনবিভ্রমযুক্তা সেই সম্রতাঙ্গী কৌতুকিনীর দুই বিলাসতরঙ্গিত নয়নের অঙ্গীকৃত সম্মোহনকে চিনতে একটুও ভুল হয়নি তাঁর।

দেহেন্দ্রিয়প্রীতিকর উপচারনিকর সযত্নে পরিহার করে চলেও শেষে অপ্সরদুহিতার অন্বেষণে চৈত্ররথের উপান্তে এক সরোবরতীরে এসে দাঁড়ান বল্কলপরিধারী একদা মুমুক্ষু ঋষিতনয়। সরোবরলগ্ন অনতিপ্রবল পবনবেগ-সম্ভূত তরঙ্গমালার উপরে বিরাজমানসদৃশ চক্রবাকযুগলের শেষ মিলনের নৃত্য মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শ্রেণীবদ্ধ হংস-কলহংস ও সারসবৃন্দের অবস্থান তীরে তীরে তরঙ্গবিক্ষিপ্ত শৈবালমণ্ডলীসজ্জিত সাগর প্রতীয়মান হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

বিরাটদেহী মীনপংক্তির উল্লাসবিক্ষুব্ধ সলিলাঘাতে বিত্রাসিত বিহঙ্গের ভয়সূচক শব্দ সরোবরের স্থানে স্থানে মনোহরতার পূর্ণাবয়বতা সাধন করে চলেছিল প্রতিক্ষণে। ফুল্লকমল ও কমলকলিকাযোগে স্থূল-বৃহৎ-ক্ষুদ্রাদি নানায়তনের নক্ষত্রখচিত গগনমণ্ডলের মতো দীপ্যমান সেই সরোবরকে সত্যই নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নীল জলখণ্ড বলেই প্রতীয়মান হলো মেধাবীর। মুহূর্তে হৃদয়মোহন-কারী সেই সরোবরের মরকতপ্রতিম পদ্মিনীপলাশদলে তাকে খুঁজতে থাকে তাঁর আকুল দৃষ্টির পরিলম্বিত অনুসন্ধিৎসা।

হতাশ হন না মেধাবী। জানেন তিনি, গগণবিহারী সূর্য-চন্দ্র ও নীরবাসিনী পদ্মকুমুদে দুস্তর অন্তর, তথাপি বহু দূর হতেও তাদের হৃদয়ব্যাকুলতায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে একে অপরে। তার চকিত দর্শনের প্রণয়াকুলতা চিনতে তো ভুল করেনি তাঁর আপন প্রণয়ী-মন।

পিতা মহর্ষি চ্যবনের শুভাশ্রমে তমোপহতচিত্তে ধ্যানে একাগ্রতাবশতঃ নিমীলিত লোচনে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রাংশু তপ্তকাঞ্চনদেহ সুস্কন্ধ ও আজানুলম্বিতবাহু মুনিপুঙ্গব মেধাবী। লাবণ্যধারাকার স্বভাবসুন্দর শোভমান সেই চন্দনতরুসদৃশ চারুচরিত্রবান্ মুনিতনয় নারী-পরিচয়হীন সারল্যে অবলম্বিত হয়েছিলেন এতদিন। নীবার-ফল-সন্তুষ্ট স্বচ্ছ, শান্ত ও ঔৎসুক্যশূন্য সেই তাপসের জীবনে সংযমের কোন পরীক্ষা দেবারও প্রয়োজন হয়নি কোনদিন। সুতরাং ধীরে ধীরে নির্বাধ-গতিতে উত্তমা সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে উপনীতপ্রায় হয়ে এসেছিল তাঁর মুক্তি-মার্গানুসরী ও মুক্তিদ্বারাভীপ্সী সাধনরথ।

এতদিন আপন একাগ্র সাধনা ছাড়া অন্য কিছুতে লক্ষ্যও পড়েনি তাঁর। কিন্তু একদিন আচম্বিতেই লক্ষ্য পড়ল।

সেদিন দূর্বাভোজনে পূরিতোদর মৃগীর দল মন্থর-গতিতে আশ্রমমণ্ডপের চতুর্দিকে বিচরণ করতে এসেছিল মৃগযূথের সাথে। রাগাগ্নিতে প্রজ্বলিত হৃদয়ে মিলিত হচ্ছিল তারা মৃগদলের সঙ্গে। বাসিতার পশ্চাতে

ধাবমান কামার্ত করীর আচরণটিকেও লক্ষ্য করেছিলেন মেধাবী। লক্ষ্য করেছিলেন রতিশ্রান্ত অনেকানেক শিখিমিথুনকেও। অস্তাচলমুখী রক্তবর্ণ বিকর্তনকে দেখেও নূতনভাবে বিভাবিত হয়েছিল মেধাবীর মেধা। মনে হয়েছিল, গগনোদ্যানে সন্ধ্যাবধূর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে বুঝি তারই কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল ঐ জ্যোতিষ্মান্ পুরুষের তনু।

স্বভাবজ কারণেই অনিবার্য ও অজানিতভাবে মদনোন্মথিত হয়ে উঠেছিল ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন নবস্ফূর্ত-সায়ন্ত চারুরূপধারী যুবক মেধাবীর চিত্ত। সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অননুভূত যুগপৎ পরিজ্ঞান ও অনুভবে অন্বিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আপন কল্পনাকারুতে পুরুষ ও প্রকৃতির চিরন্তন এক মিলনদৃশ্য যেন চিত্রায়িত করে তুলেছিলেন চিত্তপটেও। দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন মেধাবী—পুরুষভুজবেষ্টিতা মধুর মৃদুলদেহা প্রকৃতি যেন অপাঙ্গে তাঁর অমল মুখচন্দ্রের মাধুর্য পানে বিলাসচঞ্চলা হয়ে উঠেছিল প্রতিক্ষণে। রতিশয়নে মৃদুমদির হাস্তে সুশোভিতা সেই অদেখা বরবর্ণিনী,—আলুলায়িত কেশ-পাশে আবরিত-বদনা মৃগমদরসে খিচর্চিতা নবনলিনী-তুল্যা সেই প্রকৃতি, যেন পরিশ্রান্তারূপে পারবোধিতা; তবু যেন মনে হয়েছিল, সুরসিক বল্লভের সকল কলারসের লস্যভূতা সেই প্রকৃতির অসীম মাধুর্যপুঞ্জ সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। আর পুরুষ?—

মেধাবীর সমগ্র দেহ যেন সেই অদৃশ্য পুরুষের অনুমিত অনুভবের আবেশ নিয়ে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়ে উঠছিল বারংবার।

ধর্মধুরীণ তনয়ের এ-হেন অভিজ্ঞতাকে বুঝতে অক্ষম হলেন না তাপসোত্তম চ্যবন।

শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে সুশোভিত হয়ে দুষ্কর কঠোর নিয়মাবলম্বনে ক্ষীণকলেবর ভার্গব চ্যবনের জীবনেও একদিন অভাবিত এই অনুভব সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল। একদিন অস্থিমাত্রাবশিষ্ট, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বাঙ্গে কর্কশচর্ম-রয় পরিস্ফুরিত অবস্থায় মৃগচর্মে উপবিষ্ট থেকে কোমল বল্কল পরিধায়ী হয়ে নখ-লোম-জটা ধারণ করে, নৈগম জপে একনিষ্ঠ থেকেও ঠিক এইরকমই এক রমণীয় অনুভবে প্রহর্ষিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি নিজেও। আর, সেই একান্ত ও দুর্বার আকাঙ্ক্ষাতেই দারপরিগ্রহ করতে হয়েছিল তাঁকে। অস্বীকার করতে পারেন না চ্যবন, সেই আবশ্যিক সূচনাতে চিরাকাঙ্ক্ষিত যৌবনকে অর্জন করে ধন্যও হয়েছিলেন তিনি।

বুঝলেন, পুত্রের এই নিরন্তরা মোহনিদ্রা অহোরজনী স্বপ্ন ও মায়াবিলাস দিয়ে অদ্ভুত বিভ্রমই উৎপাদন করে যাবে চিরকাল, যদি না জাগতিক সত্যের মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াবার অনুমতি দান করেন তিনি এই মুহূর্তে। বুঝলেন, কামরূপী এই দুর্বার আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তি না হলে স্বভ্রোৎপন্ন হেমলতার পুষ্পের মতোই ব্যর্থ হয়ে যাবে ঐশ্বরিক সম্পদ্। বিষমেষু কন্দর্পের প্রদর্শিত বিষম পথে প্রধাবিত হওয়ার চেয়ে সকল স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। তাতেই একদিন পরিলব্ধা হয় সিদ্ধি-লাভশোভিনী শক্তিময়ী মেধা। আহা, বিশ্রব্ধ-প্রসুপ্তা সেই মেধাকেই লাভ করুক মেধাবী।

পিতার শুভেচ্ছা নিয়েই সুবিস্তীর্ণা অর্ণবাম্বরা মেদিনীমণ্ডলে পরিভ্রামিত হয়েছিলেন মেধাবী। কোন্ সে অভিপ্রায়ে কিসেরই সন্ধানে কোথায় যে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন পিতা চ্যবন, সে রহস্য নির্ভেদ করতে সক্ষম হননি তিনি। তবু যেন কোন্ এক অদৃশ্য আকর্ষণ, যেন কোন্ এক সুদূরাগত অবোধ্য অথচ অরোধ্য আহ্বান এসে লেগেছিল তাঁর নিজেরই অন্তরাভ্যন্তরে।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছু যেন একটা লাভের প্রত্যাশায় চিরাভ্যস্ত আশ্রমিক পরিবেশ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। কি যে পাবেন, সে সম্পর্কে সঠিক কোন বোধ ছিল না তাঁর। তবে একের পর এক যত জনপদ অতিক্রম করেছেন, যত সগৃহীর মধ্যে এসেছেন, ততই যেন বর্ধিত হয়ে গেছে তাঁর অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছেন, যৌবনের আসক্তিরূপিণী যে

অমূল্যায়তনা বোধয়িত্রী ধারণায় উদ্বোধনে ধন্য হয়ে ওঠে সকল সৃষ্টির প্রাণ, সেই বোধকে অস্বীকার করতে পারেন নি লালসাজিৎ ঋষিবৃন্দও। এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই সার্থক হয়েছেন স্বয়ং স্রষ্টা, সার্থক করেছেন তাঁর যাবন্ত সৃষ্টিও। সুতরাং—

পেতেই হবে সেই আসক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিকে।

সেই থেকে কি এক অপ্রাপ্তির ব্যথাভারে কৃশ-পাণ্ডুর অঙ্গে যেন কিসের দহন অহরহ অনুভব করে চৈত্ররথ কাননের উত্তরপ্রান্তস্থায়ী প্রবেশমুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মেধাবী।

অব্যাহত নীলালোকে স্বপ্নময় পরিবেশমণ্ডলস্থায়ী, চিরন্তন কুসুমসৌরভে সর্বসুরভিত-বায়ু, অজ্ঞাত-উৎস হতে উত্থিত সঙ্গীতময় ঝঙ্কাররাশিতে সর্বদা ঝঙ্কৃত সেই দৈবিক শান্তি ও শ্রীমণ্ডিত চৈত্ররথের তুলনা চলে না অন্য কোনও কাননের সাথে।

জানতেন না মেধাবী, মৌনেয় নামে সুকথিত পবিত্র-কর্মা গন্ধর্ববৃন্দের নিত্য-বিহারভূমি এই মায়াচ্ছন্ন মায়াময় কানন। জানতেন না, সংখ্যাতীতা যবীয়সী রূপোত্তমা অপ্সরার লাক্ষাপঙ্কারঞ্জিত চরণের স্পর্শে বিহ্বল হয়ে আছে এই কাননের প্রতিস্থল। জানতেন না, নিখিল-লোকের হৃদয়াভীষ্টদা এই চৈত্ররথের বায়ুতে বায়ুতে বিমিশ্রিত হয়ে আছে অনঙ্গের অমোঘ নিশ্বাসবায়ু।

একাক্ষিপিঙ্গলী বৈশ্রবণের অধিকারভুক্ত সর্বলোক-বিখ্যাত অতুলন এই উদ্যানটিকে রক্ষা করেন গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ অংশ অঙ্গারপর্ণ। চিত্র-বিচিত্রিত রথের অধিকারীরূপে চিত্ররথ নামেও সুখ্যাত ছিলেন তিনি সপ্তভুবনে। আর তাঁরই নামের সার্থকতাকে ধারণ করে চৈত্ররথ সংজ্ঞায় বিভূষিত হয়ে উঠেছিল এই কানন।

উত্তরদিগ্‌দেশের প্রবেশদ্বারস্বরূপ এই কানন। বিভ্রমসঞ্চারিণী কুবেরালয়ার বহুদ্যোতিতস্বরূপ এই কানন। এখানকার ব্যাঞ্জময় বাতাসকে অঞ্জলিভরে পান করতে উদ্যত হয় প্রবুদ্ধ জীববৃন্দও।

এই কাননে ক্রীড়াপরায়ণ হয়ে আসেন নন্দিত নন্দনাধিপতিও। এই কাননেই সংযম পরীক্ষায় পরীক্ষিত হতে আসেন ব্রহ্মলোকযাত্রী সংশিতব্রত মহত্ত্ববিজ্ঞ বিবুধেরা।

এতসব জানতেন না মেধাবী। তাই কাননাভ্যন্তরে অলস আগ্রহে প্রবেশ করেই বিপুল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। অদূর থেকে ভেসে আসছিল মুরজধ্বনি।

চৈত্ররথকে শুধু মায়াকানন বলেই শুনেছিলেন মেধাবী। কিন্তু এ কোন্ মায়া। অভিভূতের মানস-গহ্বরে কোনও জালিকা বয়ন করে না, বক্ষে জাগায় না কোনও পূর্বানুভূত উদ্‌ভ্রান্তি, তৃপ্তির আবেশে বিভোর হয়ে ওঠে না শ্রবণেন্দ্রিয়,অথচ উন্মুখ হয়ে ওঠে দু'চোখের দৃষ্টি শুধু মুরজধ্বনির উৎসের সন্ধানমানসে। মায়া কি কখনও মায়াবরণ উন্মোচনে প্ররোচিত করে মায়াবৃত সৃষ্টিকে?

এইবার আরও অগ্রসর হয়ে শেষ বিস্ময়েরও মুখো-মুখি দাঁড়িয়েছিলেন বিস্মিত মেধাবী।

কল্পপাদপসদৃশ ঐ বিপুল ও বিচিত্র পাদপের ছায়া-তলে ততোধিক বিচিত্র মনোজ্ঞ অত্যুত্তম ওটি কী কমলপর্যঙ্কের আস্তরণ? দিব্যগন্ধশোভাঢ্য ও নানা পুষ্পপরিচ্ছদে পরিশোভিত ঐ বেদিকামঞ্চে পদ্মকিঞ্জল্ক-সঙ্কাশা কে ঐ যৌবনারম্ভপরিশোভিতা? দিব্যদুকূলাবৃতা ও দিব্যমাল্যানুলেপনারূপে প্রতিভাসিতা কে ঐ স্বয়ং কমলালয়া? ঐ কি সর্বমঙ্গলাভিনী মুরজধারিণী স্বয়ং মুরজা? অথবা এই লোকের সকল তিতিক্ষায় পরিতুষ্টা হয়ে সর্বতিমির বিনাশে আবির্ভূতা হয়েছেন স্বয়ং জ্যোতির্ময়ী বাণী?

সামান্য দূরস্থায়ী এক গুল্মসংহতির অন্তরাল হতে মুগ্ধ বিস্ময়ে দৃষ্টির জিহ্বায় যেন তাঁকে অবলেহন করতে থাকেন ঋষিতনয় মেধাবী। কোন কিছু অসম্ভবের বোধে নয়, রসবর্ধহর্ষপ্রদ মুরজমন্ত্রের অতুলন মোহনীয়তাতেও নয়, নয় এ হেন অজ্ঞাতশেষ সংঘটনের আকস্মিকতাতেও, শুধু আশ্চর্যময় সেই রূপাতিশয়-দর্শনে উন্মাদিনী বুদ্ধিকে কোমক্রমে ধারণ করতে প্রয়াসী হচ্ছিলেন মেধাবী।

বিস্ময়কেও বিবশ করে এমন বিস্ময়বাহিনী সেই বিস্ময়া।

বামপদ জানুভঙ্গ-ভঙ্গিমায় স্থাপিত করে এবং বেদিকা-বিতানে বিন্যস্ত দক্ষিণ পাদতলের অলক্তক-রাগ উন্মোচিত রেখে কন্দর্পের বিজয়পতাকাস্বরূপ অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন মেধাবী-চক্ষের সেই অনুপমা প্রকৃতি। একমনে স্নিগ্ধ-কোমল-মধুর-নিষাদ-ঋষভাদি ষট্‌স্বরের মূর্ছনা ব্যক্ত করছিলেন তিনি দক্ষিণ-হস্তরক্ষিত সপ্ত-তন্ত্রীতে। সেইসঙ্গে শিঞ্জনমুখর হয়ে উঠেছিল তাঁর করবলয় ও বাম-নূপুর, এবং বায়ুতে প্রনর্তিত চেলাঞ্চল।

বন্ধুক-কুসুমনিভ রক্তবস্ত্রে, জ্যোতিঃস্ফুরিত দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলে, মাধবী-কুসুমের শিরোভূষণে, সত্যই যেন চন্দ্রবক্ষবিনিক্রান্তা সুখদা চন্দ্রিকার মতো রাজমানা হয়েছিলেন সেই হেমালঙ্কারভূষিতা ভামিনী। তাঁর সন্ধ্যাপদ্মসদৃশ মুদ্রিত চক্ষুপল্লবেও জগতের সকল প্রমুদিত আবেশকে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠতে দেখে পুলকিত না হয়ে পারলেন না মেধাবী।

জানতে ইচ্ছা জাগে, কোন্ দুর্লভ পরমাণু দিয়ে বিগঠিতা এই জ্যোতিঃ? শুনতে ইচ্ছা হয়, কোন্ মহৎ পুণ্যপুঞ্জের সকয়ে সম্ভাবিত হয় এই রূপোত্তমার দর্শন? দেখতে ইচ্ছা করে, কোন্ সেই লোকাতীত পুণ্যলোক, যেখানে অনুপম এই লাবণ্যরাশির আশিসধারা প্রবর্ষিত হয়েছে জনে জনে! ভাবতে ভাল লাগে, এই লোকের সকল দুর্ভাগ্যের অনল এই রূপরূপ অমৃত-নির্ঝরিণীর দানে নির্বাপিত হয়ে যাবে চিরতরে,—কিংবা এই জ্যোতিঃরই অনলে সকল অভিশাপকে দগ্ধ করে চিরন্তনী প্রীতির প্রশান্তিতে ধন্য হবে এই লোকের লোকবৃন্দ।

বহ্নিময়ী সুবর্ণিকার মতো উজ্জ্বলতমা সেই দীপ্তিময়ীর সম্মুখে কখন যে অনিবার মন্ত্রাকৃষ্ট পৃদাকুর মতো এগিয়ে এসেছিলেন, তা নিজেই জানতেন না মেধাবী। এক অকল্পনীয় নবতার প্রাপ্তিলোভে, এক অভাবিতা নবতনীর পরিচয় লাভের বাসনায় যেন জীবনের সকল নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে দিয়েছেন তিনি—যেমন শিথিল হয়ে যেতে চাইছে তাঁর মৌঞ্জীবন্ধন।

অদৃশ্যা শকাদিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশে ধ্বনিত স্তুতির মতোই শ্রুত হলো মেধাবীর বিহ্বলতা:

—কা ত্বং কন্যাসি রম্ভোরু প্রসন্না চ কথং মম?

মুহূর্তে আত্মমগ্নতাবিভঙ্গ হয়েছিল অপরোত্তমা মঞ্জুঘোষার। চকিতে সম্মুখপানে বিপতিত হয়েছিল তার উন্মীলিত দুই আঁখির কৌতূহল।

বিপুল ঔৎসুক্যে বিস্ফারিত দুই সরোজপত্রায়ত-নেত্রের অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যবদন সশিখ ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী এক ঋষিযুবা—দণ্ডধারী যেন চাপযুক্ত সাক্ষাৎ মন্মথ।

মুহূর্তে বিমুগ্ধা হয়ে পড়েছিল বিহ্বলা মঞ্জুঘোষা।—কে এই মেধাভ মৌঞ্জী, রক্তিম কটিসূত্র ও শৃঙ্খলধারী পরম কান্তিমান্? কোন্ প্রমাদে চৈত্ররথের এই মোহাচ্ছন্ন-প্রয়াসী পরিবেশে সম্ভাবিত হয়েছে এঁর আগমন?

—চকোরচক্ষের হর্ষবর্ষিতা জ্যোৎস্নাময়ী কে তুমি বরবর্ণিনী? পুনরাসর্ষনিঃশ্বাসের অসহনীয়তায় ব্রহ্মলোক হতে চ্যুতা হয়ে এসেছ, তুমি কি স্বয়ং ভারতী? অথবা কোন দুর্দৈবে বিষণ্ণা হয়ে ভূলোকে অবতীর্ণা হয়েছ তুমি দ্যুলোক-দুহিতা জ্যোতির্বসনা?

আচম্বিতে আক্রমণপ্রয়াসী কয়েকটি বিহ্বলতম মুহূর্তের সাময়িকতার মধ্যেই নিজেকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল রহস্য-সুনিপুণা মঞ্জুঘোষা। চিরাচরিত স্বভাবরীতির আনুকূল্যে আপন অধরপ্রান্তে সুধাশ্বেত জ্যোৎস্নাতরঙ্গ উচ্ছলিত করে তোলে। ধীরে ধীরে শায়িত রাখে বীণা।

তখনও ধ্বনিত হয়ে চলেছিল মেধাবীকণ্ঠের নমস্কৃতি:

—অয়ি আভাময়ী শুচিদীপ্তা দেবকন্যে, তোমার অমৃতনিস্যন্দী দিব্য করকমলের স্পর্শে ধন্যা হয়েছে ঐ প্রতিসার্যমাণা পরিবাদিনী। নিঃস্বাদকপ্রভাবে দূরীভূত হয়ে গেছে তমঃব্রজের অভিশাপ। আজ বুঝেছি, তোমারই আদিপীঠে সার্থক হয়েছে রজনীর কল্প-বিকল্পনা।

এবার হাসি পায় মঞ্জুঘোষার। স্বল্পায়ত্ত হলেও

ত্রিদিববাসিনী এ অপ্সরার জীবনে অনেক স্তুতিবিহ্বল বক্ষের একান্তে আসতে হয়েছে তাকে বহুবার; কিন্তু এমন অর্থগর্ভ প্রলাপের আন্তরিকতাকে উপলব্ধি করেনি কখনও।

—অয়ি মনস্বিনী, তুমিই কি অজিরাজবৃন্দকে ঐশ্বর্য-প্রদীপ্তি দানে ধন্য করেছিলে? তুমিই কি যাজ্ঞিক সত্যের পরমা দেবীরূপে বিরাজিতা সেই পরম রশ্মিসম্ভারের সম্বৃতা? হে সত্যপালিকা, সত্যসম্ভূতা, আনন্দময়ী, প্রিয়সত্যমন্ত্রপ্রেরয়িত্রী, সুকল্যাণধাত্রী রমণি! চ্যবনাত্মজ মেধাবীর জীবনে শ্রেষ্ঠতমারূপে অধিষ্ঠিতা হও তুমি, ধন্য কর তাকে।

অনেকানেক স্তুতিমন্ত ঋষিতনয়ের মনোবিকারের পরিচয়ে প্রতিবার শুধু আপন হৃদয়ে কৌতুকই অনুভব করেছেন মঞ্জুঘোষা। নির্মলকনকপ্রভদেহী ঐ চ্যবনাত্মজের এই অভিযাচনার মধ্যেও সেই একই মনো-বিকারের সুস্পষ্ট অভিব্যঞ্জনা এবারেও কৌতুকিনী করে তোলে কৈতবময়ী মঞ্জুঘোষাকে। দুরবগাহস্বভাব কত প্রবীণ ঋষির কাছে এর চেয়েও কৌতুকাবহ কত বাচালতাকে উপলব্ধি করেছেন মঞ্জুঘোষা। বেশ ভাল-ভাবেই জানেন মঞ্জুঘোষা, প্রথম দর্শনে যে কোনও রূপবতী রমণীকে দেবীরূপে আবাহন পুরুষপ্রকৃতির অতি স্বাভাবিক এক রীতি।

—অয়ি অচিন্ত্য-রূপাভিরামা, অনুপগুণে গুণবতী, অপার্থিবা অনুরাগিতা! চিন্তামণিস্পর্শে কালায়সের কাঞ্চনত্বপ্রাপ্তির মতো, অম্বুর প্রাপ্তিতে মৃত্তিকার সুবর্ণত্বের মতো, মানসসরোবরের সৌজন্যে বায়সের হংসত্বলাভের মতো, এবং একবার অমৃতপানে মানবের দেবত্বপরিগ্রহের মতো তোমার ঐ দুর্লভ অঙ্গসঙ্গে জীবিত হয়ে উঠুক আমার এতদিনের মৃত প্রাণ।

বুঝতে পারে মঞ্জুঘোষা, স্বেচ্ছায় বহ্নিপতনোন্মুখ শলভের নিয়তির মতো বিজৃম্ভমান যৌবনভরে কন্দর্প-মোহে আত্মবিনষ্টিতে উদ্যত হয়েছেন ঐ কষিতকাঞ্চনরুচি ঋষিতনয়। আত্মশক্তিবিস্মৃত হয়ে জৈবিক তৃপ্তির অন্বেষণে তৎপর হয়ে বিলুপ্তধৈর্য ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হয়ে পড়েছেন ঐ ব্রহ্মসমপ্রভ যোগবান্ যোগীনন্দন।

—তুমিই আমার অনাহতধ্বনিময়ী, বিন্দুনাদ-কলাত্মিকা সেই পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী। মনে হয়, লাবণ্যবতী তুমিই বুঝি স্বয়ং রতি, তোমার ঐ কান্তি-রাশিতে অনিশ বিকাসিত করেছ আমার হৃৎপদ্মটিকে। অয়ি জন্মজন্মান্তরীণ বাসনাস্বরূপা লাবণ্য-ললিতমুখী রুচে, চ্যবনাত্মজ মেধাবীর এই অকিঞ্চন-জীবনে চিরন্তন হোক তোমার অধিষ্ঠান।

পরম কৌতুকে তরল-হাস্যে বীণাবক্ষেই বিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে সুবক্ষী অপ্সরার উচ্ছলিত তনু। সেই সঙ্গে এক অকথিত অনুভবও সঞ্জাত হয়ে ওঠে হৃদয়ে। শুধু বুঝতে পারে না—এই কি করুণা?

সর্বলোকলক্ষ্মীস্বরূপা অয়ি জ্যোতির্মতি, আমার অন্তর্গূঢ়া কল্পনাই কি বাস্তবিতা হয়ে এসেছ তুমি তোমার ঐ স্মিতবিলাসের অর্ঘ্য নিয়ে? নবাভিলাষরূপিণী তোমাকে দর্শনমাত্র পুলকে পুলকে অঙ্কিত হয়ে উঠেছে আমার অঙ্গরুহ; তোমার নিরবদ্য অঙ্গসঙ্গের সম্ভাবনায় হর্ষবিদীর্ণপ্রায় আমার বক্ষঃপঞ্জর। একটি ক্ষুদ্রায়তন কুটিরের সুধন্য কুট্টিম থেকে তোমার ঐ পদালক্তকচ্ছুরিত অরুণদ্যুতিকে ধারণ করতেই বুঝি বিধৃত হয়ে আছে বক্ষোদেশ।

এক বক্ষোন্মাদের প্রলাপ শুধু হাস্যোদ্রেকই করে। কিন্তু জলন্ত হুতাশন-সন্নিভ তেজঃপুঞ্জাকৃতি সৌম্যস্বভাব ঐ ঋষিযুবার কণ্ঠে এ কি অভাবিত প্রলাপধ্বনি? নিজের কৌতুকে নিজেই যেন অপ্রত্যয়ান্বিতা হয়ে উঠতে থাকে লোকললামভূতা সুচারুহাসিনী। মত্ত মাতঙ্গযূথের বিলোড়নে বিদলিত কমলিনীদলের মতো এই ঋষিকণ্ঠের বলিষ্ঠ ঔৎসুক্যে দলিত হতে থাকে তার নিজেরই অন্তরের সর্বাবজ্ঞার অহংকার।

—কে তুমি গন্ধোন্মাদিতদয়িতা সঙ্গীতপ্রসন্নাভিজ্ঞা দুরাপা বরনারী? তোমার ঐ অতুলন মুখোদ্গীর্ণা বাণীর প্রতীত মধুক্ষরতার প্রতি প্রতীক্ষা করে আছে আমার সমগ্র আয়ুর পুণ্যনিচয়। বল, কলবতী হবে কি তোমাকে চিরপ্রাপ্তির এই দুরত্যয়া আশা?

বুঝতে পারে না কেন, তবু উপলব্ধি করতে পারে মঞ্জুঘোষা, বারংবার নিবেদিত এই উত্তমশ্লোকজন্ম জিজ্ঞাসার মন্ত্রময়তার সম্মোহনে কেমন যেন আত্মহারিণী হয়ে যাচ্ছে তার গর্বোদ্ধত সত্তা। প্রত্যয়তাপে বিগলিত মধুচ্ছিষ্টের মতো কেমনভাবে যেন বিগলিত হতে শুরু করেছে তার যাবন্ত মর্ত্যজন্মহষ্টিকে প্রত্যাখ্যানের অহমিকা। কেমন যেন জড়নিস্পন্দাঙ্গী হয়ে যাচ্ছে চিরচঞ্চলা স্বরনটী। কেমন করে যেন নিজেই উৎপন্নবিকারা হয়ে উঠছে জাতরতি অপ্সরা। একটি ছোট্ট উটজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আসছে কি চিরাগৃহা সুরপূজারিণীর কামনা?

চকিতে আপন মুখরেখায় প্রকটনপ্রয়াসী মনোভিলাষকে গুপ্তিমন্ত্রে সংগুপ্ত করে ফেলে মঞ্জুঘোষা। না, মর্ত্যজ ঐ ঋষিপুত্রের কাছে জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ কামনাকে অত অনায়াসে বিতরিত করে দিয়ে রিক্তা হয়ে যেতে পারে না স্বলপটীয়সী অপ্সরা।

সহসা তার সনূপুর চরণের চঞ্চল শিঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল কাননস্থলী। সুতন্ত্রী বীণাটিকে বামহস্তে গ্রহণ করে বেদিকাবক্ষের উপরে নৃত্যাবর্তের ভঙ্গিমা রচিত করে তারই পশ্চাতে লাফিয়ে পড়ল মঞ্জুঘোষা।

তারপর উন্মাদদর্শনে প্রগল্ভা কিশোরীর মতো সমগ্র পরিবেশে কলহাস্যের ধ্বনি বিতারিত করে যেন আপন চরণ-সরোজলগ্ন নূপুরের চিৎকারে তাড়িতা হয়েই বহ্নিময়ীর বহ্নিদানের মতো মেধাবীর প্রেমানুবিদ্ধ মনকে প্রজ্বলিত করে দিয়ে ক্ষণিকের জন্য অদৃশ্যা হয়ে গেল সে কাননগভীরে।

তীব্র আলোকচ্ছটার অপসারণে আকস্মিক তমঃপাতিতের মতো দৃষ্টিহারা হয়ে বহুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন চ্যবনাত্মজ মেধাবী।

দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য কাব্যে প্রকৃতি

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

১৯০৭ সালে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আলেখ্য কাব্য রচনা করেন। আলেখ্য কাব্যে উনিশটি চিত্র আছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, কবি এই কাব্যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের অপূর্ব ছবি এঁকেছেন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা সুনিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। আলেখ্য কাব্যে প্রকৃতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। উদার প্রকৃতির কোলে মানুষের বহুবিচিত্র জীবনধারা বয়ে চলেছে, এটাই কবি তাঁর কাব্যে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলেখ্য কাব্যে প্রকৃতির রূপ অপূর্ব, সৌন্দর্য অনুপম, মাধুর্য বিস্ময়কর।

প্রথম চিত্রটির নাম ঘুমন্ত শিশু। শিশু সবুজ ঘাসের ওপর খেলা করতে করতে বকুল গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। মা মুগ্ধ বিস্ময়ে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এই সুন্দর শান্ত বনভূমিতে প্রকৃতির কোলে সোনার বাছা ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমন্ত শিশু চিত্রে কবি প্রকৃতিকে অপূর্ব সাজে সাজিয়েছেন :

মর্মরিয়া রৌদ্রতলে তরুর পত্র নড়ে।
ঝিকিমিকি কিরণ মায়ের মুখে এসে পড়ে।
....

চারিদিকে এমন শান্ত নীরব, মধুর ছবি,
ধূ ধূ করে ধূসর আকাশ কিরণ দিচ্ছে রবি।
....

শরৎকালের পূর্ণশশী বড়ই মধুর বটে
তারারা যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে।

কবি তৃতীয় চিত্রের নাম দিয়েছেন 'নূতন মাতা'। মেয়েটি—নতুন মা হয়েছে। সে তার মেয়েকে কোলে নিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে চাঁদকে ডেকে যেন মেয়েকে ভোলাচ্ছে। এ প্রথা চিরন্তন। শিশুরা চাঁদের ভক্ত। আর মায়েরাও ওই চাঁদ দেখিয়ে শিশুদের ভোলাবার চেষ্টা করেন। কবি এখানে শুধু নতুন মায়ের কথাই বলেন নি, তিনি প্রকৃতির এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। সন্ধ্যার সময় ঝকঝকে আকাশে চাঁদ উঠেছে, ফুলের গন্ধ মাখা বাতাস বইছে, গাছে এক পাপিয়া ডেকে চলেছে, দূরে কোন চাষী মেঠো সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে, চাঁদের মিষ্টি আলো মেয়ের ও মায়ের চোখে মুখে এসে পড়েছে :

সুনীল সন্ধ্যাকাশে   শরৎচন্দ্র ভাসে
পূর্বাঙ্গনে। ধীরে,   সুমন্দ সমীরে
পুষ্পগন্ধ মধুর   ভেসে আসছে, অদূর
ফুলের বাগান হতে   অন্তঃপুরে।

কবি দশম চিত্রটির নাম দিয়েছেন 'বিধবা'। এক বিধবার সারা বুক জুড়ে অশ্রুভরা বেদনা, না পাওয়ার হাহাকার। কবি বিধবার মনের গভীর দুঃখের কথা লিখতে গিয়ে প্রকৃতিকে ভুলে যান নি :

স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন ;
ধরণীটি নিদ্রামগন ;
চাঁদের কিরণ পড়েছে তার মুখে
শস্যক্ষেত্রে, বনস্থলে,
কালো দীঘির কালো জলে
বিজন পথে, বিজন মাঠের বুকে।

বিধবা নারী যেন তার অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে। কবি বিধবার মনের কথা বলতে গিয়ে সুনীল আকাশ, শ্যামল পৃথিবী, চাঁদের আলো আর দীঘির কথা বলেছেন :

কুঞ্জবনের শ্যামল মায়া ?
মাঠের হরিৎ ? গাছের ছায়া ?
দীঘির জলে চাঁদের সাদা আলো,
আকাশ সুনীল, ধরা শ্যামল,

কিছুই তুমি দেখছ না মা,
দেখছ বসে বাতায়নের ধারে—
জীবনগ্রন্থখানি খুলি,
অতীতকালের পৃষ্ঠাগুলি
উল্টে পাল্টে তাহাই বারে বারে।

কবি দেখতে পান, একদিন চৈত্র মাসে সন্ধ্যায় সময় বিধবা মেয়েটি চাঁদের আলোয় চুপচাপ বসে আছে। কবির মনে হল, মেয়েটি স্বামীর চিন্তায় আকুল। কবি এখানে প্রকৃতির এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন :

বসেছিলে বাড়ীর ছাদে,
ছিলে চেয়ে পূর্ণ চাঁদে,
ঝাউয়ের প্রান্তে যাচ্ছিল সে দেখা ;
বইতেছিল বাতাস মধুর ;
গাইতেছিল দোয়েল অদূর
বকুলগাছে ; এমনি সুনীল গগন ,
সেও সে এমনি রাত্রি দুপর
একা তুমি ছাদের উপর
ছিলে বসে, স্বামীর চিন্তায় মগন ;

কবি ত্রয়োদশ চিত্রের নাম দিয়েছেন 'রাখাল বালক।' রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। মুঠো মুঠো সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে। কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ডেকে উঠছে। সূর্যমুখী ফুল জেগে উঠছে, কমল ফুটছে, কুন্দ ফুটছে, দূরে অপরাজিতা যেন নিঃসঙ্গ, সে ঢলে পড়েছে। কবি এখানে এক অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন :

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে,
পূর্বদিকে মেঘের গায়ে
প্রভাতসূর্যের কিরণ এসে লাগে,
ডেকে ওঠে কুঞ্জে পাখী,
ধীরে বহে স্নিগ্ধ বাতাস,
পুষ্পবনে সূর্যমুখী জাগে
কমল ফোটে, কুন্দ ফোটে
কনক চাঁপার চারিধারে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সৌন্দর্যের পূজারী। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য সঞ্চিত থাকে, কবি প্রকৃতির সেই অনুপম রূপটি তাঁর আলেখ্য কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি প্রকৃতি-প্রেমিক। 'আলেখ্য' কাব্যে একদিকে রয়েছে বিশ্ব-প্রকৃতি, আর একদিকে রয়েছে মানবজগৎ, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঘুমন্ত শিশু, বিধবা, রাখাল বালক প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে এক দুইয়ের মধ্যে এক সেতুবন্ধন করে দিয়েছেন। কবি আলেখ্য কাব্যে প্রকৃতির শান্তমধুর রূপটি নিখুঁতভাবে এঁকেছেন।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মাদুরাই

রামেশ্বরম থেকে মাদুরাই ১৬৪ কিলোমিটার পথ। মন মাদুরা জংশন থেকে আমাদের ভিন্ন পথ ধরতে হবে। তবে বাঁচোয়া এই যে দুখানা সরাসরি যাওয়ার বগী আছে এই গাড়িতে। আমাদের ওঠা-নামা করতে হবে না। রেল কোম্পানীই গাড়িদুটো কেটে নিয়ে ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিল।

দিনের বেলায় মাদুরা যাত্রা করায় রামেশ্বর সেতুবন্ধ সমুদ্র আর একবার দেখবার সুযোগ পেলাম। শুনছি ভারত সরকার প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে মোটর যানের জন্য একটি পৃথক সেতু নির্মাণ করবেন। এখন মণ্ডপম পর্যন্ত সর্বঋতুতে মোটর চলাচলের উপযোগী সুন্দর রাস্তা আছে। যে সব পর্যটক মোটরে ভ্রমণ করেন এবং মোটর নিয়েই রামেশ্বর বা সিংহল যেতে চান তাঁদের এখন রেল কর্তৃপক্ষের শরণ না নিয়ে উপায় নেই। রেলে এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

পথে বিবেকানন্দ-স্মৃতিজড়িত রামনাদ শহর দেখা যায়। এই রামনাদের রাজাই স্বামীজির নিকট প্রথম আমেরিকা ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুখ্যত তাঁরই প্রেরণা ও অর্থানুকূল্যে স্বামীজি ধর্ম-মহাসভায় যোগ দিতে সমর্থ হন। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রামনাদের জনসভায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

"তাঁহার (রামনাদের রাজার) পাশ্চাত্য বিদ্যা ধর্ম মান পদমর্যাদা সবই ধর্মের অধীন, ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন; এই ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা প্রত্যেক হিন্দুর জন্মগত সংস্কার।......তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা না কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও তবে তোমাদের এই ধর্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।"

এই যাত্রায় স্বামীজি এতদঞ্চলের বহু জনপদে অভিনন্দিত হন। আমাদের আজকের গন্তব্য স্থলে মাদুরাইতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"ভারত সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে।" গান্ধী-জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গেও মাদুরাই জড়িয়ে আছে। ১৯২১ সনে গান্ধীজি ভারত পরিক্রমায় বেরোন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজ ভ্রমণ করেন। সেখানকার জনসাধারণের অসীম দারিদ্র্য তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। বহুজনের একখানা পুরো কাপড় কেনার পয়সা নেই। কোমরে একটু ন্যাকড়া জড়িয়ে নেংটি পরে কত মানুষ এসেছে গান্ধী মহারাজকে দেখতে। এদের সমপ্রাণ হয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি এই মাদুরা স্টেশনেই নাকি কটিবাস গ্রহণ করেন। জামা টুপি প্যান্ট কোট সবই বাতিল হয়ে গেল। রেল কর্তৃপক্ষ মাদুরাই জংশন স্টেশনে একটি ফলকে লিখে রেখেছেন—"আপ্পু লোগোন দারিদ্র্যতাগ্রস্ত দশা দেখ কর স্বয়ং [illegible]সে সমানতা বর্তনে কে লিয়ে মহাত্মা গান্ধীজি সে সন্ ১৯২১ সেপ্টেম্বর মাহীনে এহি কমরসে কাপড়া পহননা গ্রহণ করা দিয়া।" ফলকের অপরদিকে এই কথাগুলি তামিল ভাষায় লেখা আছে।

মাদুরাই অতি প্রাচীন শহর। বর্তমানে তামিল নাডুর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। "মথুরা" এই কথাটা কি এখন মাদুরাইতে দাঁড়িয়েছে? এখানে তো 'ম'-এর ছড়াছড়ি। তার মধ্যে হঠাৎ করে 'ই' এসে কেন হাজির হলো? বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও নাকি মাদুরা বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। প্রাচীন পাণ্ড্য রাজাদের রাজধানী ছিল এই শহর। মুসলমানরা এখানে হামলা করেছে লুঠপাট চালিয়েছে। আজও প্রত্যহ দেশ-বিদেশের যাত্রী যে মাদুরা আসেন তা ঐ প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসের টানে নয়, আসেন মীনাক্ষী মন্দিরের অপরূপ রূপের টানে। ভারতবাসীর শিল্প-সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে দু-চোখ মেলে প্রাণ-ভরে দেখে নেওয়া যায়। ভারতের মানুষ সৌন্দর্য-সৃষ্টির সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েই অনির্বচনীয় অক্ষয় সম্পদ্ সৃষ্টি করে থাকে—এই সত্য মাদুরার মন্দিরে মন্দিরে পাথরের বুকে মুখর হয়ে আছে।

মাদুরা পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাতটায়। এইখানে দক্ষিণ রেলপথের যে-কোন স্টেশন থেকে যাত্রারম্ভের টিকিট কেনা যায়। প্রথমেই আমরা সেই খোঁজে গেলাম। সাতটার পর এই টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়। অতএব কাজ কিছু হলো না। কাল সকাল আটটায় আবার দরজা খুলবে, যা কিছু করার তখন করতে হবে। অতএব এখনকার মত আমাদের ছুটি। রেল-কর্মী সজ্জন মানুষ। আমাদের ছুটি দেবার আগে বলে দিলেন—কাছেপিঠে কোথায় অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ভদ্রগোছের থাকা খাওয়া মিলতে পারে।

রেল-কর্মী বন্ধুর নির্দেশ মত স্টেশনের নাকের উপর কলেজ হাউস নামক বিশাল যাত্রী নিবাসে অতিথি হলাম। খাট-বিছানা সমন্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর। থাকবার জন্য জন-প্রতি দৈনিক দক্ষিণা পাঁচ টাকা মাত্র। ঘরের আকৃতি ও আনুষঙ্গিক বিবিধ কারণে ভাড়ায় কম-বেশি হয়। দুজনের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে আমরা তিন জন ছিলাম তাই পনের টাকার পরিবর্তে বার টাকা ভাড়া নিয়েছিলেন কলেজ হাউস। মোট ৫৮০খানা ঘর আছে এই বাড়িটিতে। প্রায় হাজার খানেক লোক সেখানে থাকতে পারেন। চত্বরটা একটা বাজার বিশেষ। খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা আছে। সেজন্য যে যেমন খাবেন তাঁকে তেমনি দাম দিতে হবে। আমিষ ভোজ্য পাওয়া যায় না।

নিরামিষ ভাত ঘি ডাল তরকারি দই এবং পাঁপর পেট-চুক্তি দেড় টাকা মাত্র। টক দইকে সুসহ করতে চিনি দরকার হলে চা চমচের প্রতি চামচের দাম দিতে হবে পাঁচ পয়সা। নানা রকমের বহু দোকান-পাট ও গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা রয়েছে হোটেলের ভেতরেই। বই ও পত্র-পত্রিকার স্টলগুলিতে বেশ মজাদার একটি বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো—Avoid Free Reading—মুফতে পড়া এড়িয়ে চলুন।

ঐ শহরের ঘুম নেই। সারা রাত ধরে হোটেল ও স্টেশন এলাকার দোকানগুলি খোলা থাকে। হৈ চৈ কোলাহলও কিছু কম হয় না। হোটেল নিরামিষ হলে কি হবে, যাত্রীগুলি সব তো আর নিরামিষ নন। মধ্য রাত্রিতে তাঁদের অবকাশ-রঞ্জনের বিবিধ উপচার যোগান দিতে ব্যস্ত মানুষের ত্রস্ত আনাগোনা বেশ বুঝতে পারা যায়। এদের কর্মবিরতির মুহূর্ত থেকে হোটেলের খানাপিনা প্রাতরাশের আয়োজন হতে থাকে। এত লোকের রাশি রাশি চা জলখাবার তৈরি রাখতে হবে সকাল ৫টার আগে। অতএব হোটেলের চোখে ঘুম নেই।

সকালে স্নানাদি সেরে প্রথম কাজ হলো টিকিট কেনা। কয়েকটি নির্বাচিত স্টেশন থেকে টিকিট কিনে দক্ষিণ রেলপথের যে কোন স্টেশন থেকে যাত্রারম্ভ করা যায়। মাদুরায় বসে আমরা মাদ্রাজ থেকে কলকাতা যাবার টিকিট কিনলাম। এঁরা নির্দিষ্ট গাড়িতে আসন সংরক্ষণের জন্য মাদ্রাজে তার করে খবর দিলেন, মাশুলটা অবশ্য আমাদেরই দিতে হলো। নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট কিনে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মাদ্রাজ ঐ সব তারের কোন তোয়াক্কা করে

না। তারা আমাদের জন্ত আসন সংরক্ষণ করে নি। পরে মাদ্রাজ এসে জলপানি দিয়ে ঐ ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছিল। কেবল মাদুরা নয়, ব্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর সিটি, মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল, মাদ্রাজ এগমোর থেকেও টিকিট কেনার সুবিধা করে রেখেছেন রেল কোম্পানি। কিন্তু সে সুবিধা ক'জন ভাগ্যবানের সত্যকার কাজে লাগে তা ভগবান্ই জানেন। সুধীরদা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, নামটা বদ্‌লে মাদ্রাজী ধরণের নাম লেখালে কিছু সুবিধা হয়তো মিলত।

মাদুরার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মীনাক্ষী মন্দির। রেল স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার পথ। আমরা হেঁটেই গেলাম। জনবহুল রাস্তা। দুদিকেই জমজমাট চোখ ধাধাঁনো জমকালো সব দোকান। সারা পৃথিবীর সৌন্দর্যরসিক শিল্পপ্রাণ মানুষের এই পথে নিত্য আনাগোনা চলছে। তাদের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত করেই দোকানগুলি সাজানো।

জুতো পায়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢোকা নিষেধ। জুতো রক্ষক দ্বারেই আছেন। তাঁর মজুরি পাঁচ পয়সা। কিন্তু তাও আপনার লাগবে না যদি আপনি দয়া করে পাশের কাপড়ের দোকানের বেনিয়াকে 'ব্যাওসা'র সঙ্গে যাত্রী সেবার পুণ্য অর্জন করার অবকাশ দেন। অর্থাৎ জুতাজোড়াটি তাঁর দোকানে বিনা মাশুলে রেখে দিয়ে মন্দির দেখুন সেজন্ত কাপড় কেনার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তাও আপনাকে দোকানকর্মচারী, একান্ত বিনীত ভঙ্গীতে মনে করিয়ে দেবেন। আমরা এই কাপড়ের দোকানেই জুতো রেখে মন্দিরে ঢুকেছিলাম।

ঐ মন্দিরের নহবৎ অর্থাৎ গোপুরমের ভাস্কর্যের কোন তুলনা নেই। আমার মত শিল্পরসবোধবর্জিত মানুষেরও গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই নহবৎ বা প্রবেশ মন্দির দেখে। এর গঠন-নৈপুণ্য, শিল্প ও বর্ণ-সুষমা এবং বিশালতা সব মিলে এক অভূতপূর্ব রসাবেশে মন প্রাণ ভরে তোলে অতি সহজেই। কিন্তু আপনার মুগ্ধ মনের দুয়ারে আঁচরেই আঘাত হানবে মন্দিরের ছবি-বিক্রেতা বালকের দল। দর্শনের আনন্দে বিঘ্ন ঘটায় আপনি বিরক্ত হবেন। তখন কথাকাটাকাটি করার মত মনের অবস্থা নয়, তাই নীরবে ঢুকে পড়লাম মন্দির অভ্যন্তরে।

আগেই শুনেছিলাম পুরুষদের ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত করেই মন্দিরে ঢুকতে হয়। দক্ষিণের অনেক মন্দিরে এই নিয়মের কথা শুনেছি। কিন্তু মাদুরা আসার আগে তার মুখোমুখি হতে হয় নি। পরে অবশ্য কন্তাকুমারী, পদ্মনাভ প্রভৃতি মন্দিরে এই অভিজ্ঞতা দৃঢ় হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ঊর্ধ্ব-দেহ নিরাবরণ করা এবং নিম্নাঙ্গে যুক্ত কচ্ছ বস্ত্র ব্যবহারের মধ্যে প্রাচীন কালের নিরাপত্তার বিধিব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ঠিক এখন যেমন বিধানসভা ভবন, পাঠাগার প্রভৃতি স্থানে অনেক জিনিস নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। অতীতের মন্দিরে বিগ্রহের সঙ্গে রাজাও থাকতেন। তাই কঠোর নিরাপত্তার জন্ত এই সব নিয়ম প্রবর্তিত হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণেতর মানুষ যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্ত ঐ ব্যবস্থা হতে পারে না। তা যদি হত তাহলে অব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকদের জন্তও কিছু একটা ব্যবস্থা থাকত। আগে কোন মন্দিরেই অস্পৃশ্যদের ঢুকতে দেওয়া হত না। গান্ধীজি এর বিরুদ্ধে সব-চেয়ে সার্থক আন্দোলন করেছিলেন ১৯২৩ ও ১৯২৪এ ভাইকমে। ত্রিবাঙ্কুড় কোচিনের মহারাজা সত্যাগ্রহীদের নিকট নত হয়ে মন্দির দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত করে দেন। কলকাতায় যেমন একদা ইংরেজ ও ভারতবাসী একই রাস্তা দিয়ে চলবার অধিকারী ছিল না, তেমনি মাদ্রাজে ত্রিবাঙ্কুড়ে (বর্তমান কেরল) হরিজন ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চলার জন্ত পৃথক পথ ছিল। সাহেবদের হোটেলে যেমন 'ইণ্ডিয়ান এণ্ড ডগ্‌স্ নট অ্যালাউড' ছিল, ভারতের অনেক মন্দিরে তেমনি অহিন্দু বিধর্মী এবং হরিজনরা নট অ্যালাউড ছিলেন। এই বৈষম্য দূর করার জন্ত গান্ধীজি দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি।

ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন করা ইত্যাদি বিধিবিধান তুলে দেবার

দাবি তামিল নাড়ু সরকার স্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্রাণে আঘাত দেওয়া হবে। তামিল নাড়ুর আয়ের একটি প্রধান উৎস হল এখানকার মন্দিরগুলি। ভ্রমণকারী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ তো ওগুলির আকর্ষণেই আসেন। তা ছাড়া ভক্তদের নিকট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে থাকে এক-একটি মন্দির। খবরের কাগজের (ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১-১১-৭২) সংবাদ থেকে জেনেছি, তামিল নাড়ু বিধানসভায় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানিয়েছেন, দর্শনী ও পূজার ফি বাবদে পাওয়া অর্থ থেকে পূজা-অর্চনার ব্যয় ও মন্দিরাদি সংরক্ষণের কাজ করেও লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সেই টাকা আজকাল সাধারণ মানুষের হিতসাধনে ব্যয়িত হতে আরম্ভ করেছে।

মীনাক্ষী মন্দিরের আয় কত জানতে পারি নি। তবে অন্য দু'-একটি মন্দিরের বার্ষিক আয়ের খবর ঐ কাগজেই বেরিয়েছে। পালানী মন্দিরের বার্ষিক আয় ৫২ লক্ষ টাকা। সরকারী দপ্তরে যে টাকাটা জমা পড়ে এটা সেই হিসাব মাত্র। পুরোহিত পাণ্ডারা যাত্রী দোহন করে যা আদায় করেন তা পৃথক্। এই মন্দিরের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে বোবা ও বধিরদের জন্য স্কুল চলছে। হিন্দু মন্দিরের অর্থে এই রকম প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা ইতিপূর্বে শুনি নি।

মাদ্রাজে অর্থাভাবে বহু দরিদ্র মানুষ, অধিকাংশই হরিজন সম্প্রদায়ের, বিয়ে সাদী করতে পারেন না। বর্তমান তামিল নাড়ু সরকার মন্দিরের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে বছরে পাঁচ হাজার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন। মন্দ কি, পিতামাতার নিকট থেকে যাঁরা যৌতুক পাবার মত ভাগ্য করেন নি, বিধাতা দয়া করলে, ভাগ্য প্রসন্ন হলে সরকার তা পুষিয়ে দেবেন। চমৎকার।

প্রবেশ মন্দির ছেড়ে আমরা বেশি দূর এগোতে পারি নি। উঁচু শীর্ষদেশ থেকে একেবারে একতলার ছাদ পর্যন্ত সমগ্র প্রাচীরগাত্রটি অজস্র অসংখ্য ছোট বড় মূর্তি দিয়ে ভরা। এর মধ্যে তিলার্দ্ধ শূন্য স্থান খুঁজে পাওয়া ভার। মূর্তিগুলির সম্বন্ধে পুরাণোক্ত কথা জানা না থাকলেও শুধু শিল্পসুষমাই মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। সবচেয়ে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বৃষোপরি হরগৌরীর যুগলমূর্তি। সমুদ্রমন্থনের দৃশ্যটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। দেবতা ও অসুরের আকার আকৃতিতে শিল্পী কি নিপুণতায় পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সাধারণ পার্থক্য ছাড়া দেখা গেল অসুর মাত্রেই গুম্ফবান্, দেবতাদের কারো গোঁফ নেই। অসুরদের দলে দু'টি খর্বাকৃতি গোঁফহীন মূর্তি দেখতে পাবেন। তারা পুরুষ নয়, নারী।

নয় মাথা রাবণের একটি বড় মূর্তি দেখলাম। রাবণ দশম মাথাটি কোথায় খোয়াল তা তখন জানবার আগ্রহ হয় নি। কতই তো জানি না। যা দেখছি তার কতটুকুই বুঝি বা জানি। নয়ন-মনের তৃপ্তিতেই খুশী। বুদ্ধির সঙ্গে কারবার এখন প্রায় বন্ধ। রাবণ ছিলেন শিবের ভক্ত। শিবঠাকুরের দর্শনলাভের জন্য তিনি নিত্য কৈলাসে যেতেন। একদিন তাঁর দুর্বুদ্ধি হল, রোজ রোজ যাতায়াতের শ্রম লাঘব হয় যদি শিব সমেত কৈলাস পর্বতটাকেই নিয়ে আসা যায়। রাবণের বুদ্ধি চিরকালই সর্বনাশা। কৈলাস আনতে গিয়ে শিবের খেলায় চাপা পড়লেন কৈলাসেরই তলায়। এই সময় রাবণ নিজের একটি মাথা কেটে তন্ত্রী দিয়ে বীণা বাজিয়ে সামবেদ গান করে শিবকে তুষ্ট করে সে যাত্রা বাকী ন'টা মাথা নিয়ে ফিরে আসেন।

নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে কত মন্দির, কত দেব-দেবী, কত শিল্পসমৃদ্ধ অলিন্দ স্তম্ভ যে দেখলাম তার হদিস করা সহজ নয়। সভামণ্ডপই বা কত। এখানেও পাথরে গড়া সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ। পাথরের স্তম্ভ থেকে সুরধ্বনি ওঠে। একটি মণ্ডপে খড়্গ পরিহিতা নারী, বিদেশীসাজ-পোষাকের মূর্তি সহজেই দৃষ্টিআকর্ষণ করে। দ্বারপাল মূর্তির সৌন্দর্য ও বিশালতা যেমন বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তেমনি তাদের মুখের দুদিকে বেরিয়ে থাকা দুটো দাঁত আমাদের ভাবিয়ে তোলে। হাতি খুব [illegible]।

তার দাঁত মুখের বাইরে থাকে। তাই কি মূর্তিটির মুখের বাইরের দাঁত বল ও শক্তির প্রতীকরূপে স্থাপন করেছেন?

আর চোখে পড়ে অষ্টশক্তির বিগ্রহ। তলায় ইংরেজীতে নাম লেখা আছে। দুর্গা, মনোন্মণি, ভবানী, কৌশিকী, সপ্তমাতা, ইয়েস্থা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কল্যাণী, যোনী, শ্রীদেবী ও ভূমি দেবীর মূর্তি একস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকের বেলগাছ তলায় একটি সুন্দর হরগৌরী মূর্তি আপনাকে খানিক দাঁড়িয়ে দেখতেই হবে।

এইখানেই দেখেছিলাম হাতিকে ভাত খাওয়ানো হচ্ছে। তালের মত গোল করে মাখা ভাত একব্যক্তি সরাসরি হাতির মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। হাতটা প্রায় কনুই পর্যন্ত হাতির মুখগহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে।

মন্দিরচত্বরের মধ্যেই একটা বড়সড় বাজার পেরিয়ে আমরা মীনাক্ষী মন্দিরে ঢুকেছিলাম। গোলাপের মালা অফুরন্ত। প্রায় সকলেই কিনছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে একটি বেশ বড় মালার দাম মাত্র চার আনা। মীনাক্ষী দেবীকে পরানো হবে এই মালা। পুরোহিত দেবীর গলা থেকে ঐ মালা খুলে এনে ফিরিয়ে দেন। দেবার রীতিটি বড় মধুর। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে মালাটি যিনি দিয়েছিলেন তাঁর গলায় পরিয়ে দেন।

মীনাক্ষী দেবীকেও দূর থেকেই দর্শন করতে হয়। ঈষৎ বঙ্কিম ঠাটে দণ্ডায়মান সালঙ্কারা মূর্তি। পুষ্পস্তবকের উপর বসা, একটি পাখী ধারণ করে আছেন দক্ষিণ হস্তে। বিবাহিতা নারী সমাজ এখানে খুব ভক্তিভরে পূজা দেন। এই মন্দিরে ভস্মের পরিবর্তে কুমকুম দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দেবদেবী মাত্রই জোড়ায় জোড়ায় চলেন অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি একত্র থাকেন। তাই মীনাক্ষী যখন আছেন তখন শিব ঠাকুরকেও থাকতে হবে।

মীনাক্ষী মন্দিরের শিব হলেন সুন্দরেশ্বর। সত্য সুন্দর শিব। যা সত্য তা সুন্দর, তাই শিব। তবু শিবঠাকুরকে সুন্দর নামে অন্য কোথায়ও দেখিনি। শিব এখানে নানা রূপে বিরাজিত। নটরাজের দুটি বিখ্যাত ভঙ্গী, একটি অষ্টভুজ ও দক্ষিণ পদ উত্তোলিত, অন্যটি দ্বিভুজ এবং বামপদ উত্তোলন করা।

নয়ন ভরে দেখেছি, কিন্তু মনে নেই সব। আছে শুধু গভীর তৃপ্তি ও আনন্দের মাধুর্য। ফিরবার পথে তিনটি স্তন সমন্বিত সুন্দর একটি নারী মূর্তি দেখেছিলাম। এরকমটি ইতিপূর্বে কোথায়ও দেখিনি। মন্দিরের মধ্যে সরকারী বই ও ছবির দোকানদারকে ব্যাপারটার মর্মকথা জানাতে বললাম। তিনি ডি. মীনা কৃত মাদুরাই নামক ৩০ পৃষ্ঠার একখানা চটি বই আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, এতে জানতে পারবেন। পৌনে দুই টাকা দিয়ে ওটি কিনতে হলো। সেই বই পড়ে জেনেছি—রাজা মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য ও রাণী কাঞ্চনমালা সন্তানলাভের জন্য যজ্ঞ করেন। যজ্ঞকুণ্ড থেকে তিনটি স্তন সমন্বিতা তিন বছর বয়সের একটি কন্যা উদ্ভূত হন। রাজা রাণী স্বভাবতই ব্যাকুল হলেন। তখন দৈববাণী হলো, এই নারী যখন স্বামীর সাক্ষাৎ পাবেন তখনই তাঁর তৃতীয় স্তন লুপ্ত হয়ে যাবে।

পুত্রহীন রাজা কন্যাটিকে পুত্রবৎ মানুষ করেন। রাজা মলয়ধ্বজের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যশাসন ক্ষমতা লাভ করে নানা দেশ জয় করতে করতে কৈলাস পর্যন্ত উপনীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তাঁর তৃতীয় স্তন লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন স্বামীর দেখা পেয়েছেন। শিব ঠাকুর মাদুরা এসে বিয়ে করে কিছুকাল বসবাস ও রাজ্যশাসন করেছিলেন। উগ্র নামে তাঁর একটি পুত্র উপযুক্ত হলে তাকে রাজ্যভার দিয়ে তাঁরা মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর হয়ে গেলেন।

মন্দিরে সহস্র সহস্র ছোট বড় মূর্তির প্রত্যেকটির পেছনে এইরকম মনোহর কাহিনী রয়েছে। কারো পক্ষে এক জীবনে তার সব জানা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। এখানে কি আছে আর কি নেই তা খুঁটিয়ে দেখা আমাদের মত দর্শকের পক্ষে

অকল্পনীয়। সে চেষ্টাও আমরা করি নি। উৎফুল্ল মানুষের চলমান মেলা বসেছে মন্দিরে। আমরা সেই ভিড়ের মধ্যে এক মন্দির থেকে আর এক মন্দির, এক মূর্তি থেকে অন্য মূর্তির সামনে বারেক গিয়ে দাঁড়িয়েছি—আবার চলতে শুরু করেছি। আনন্দিত মন কি গ্রহণ করছে আর কি বর্জন করছে সে হিসাব তখন করি নি, করার অবকাশ ছিল না। আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে প্রফুল্ল হৃদয়ের আনন্দসূত্রে সব একাকার হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে দুচারটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার এই বর্ণনায় যারা মন্দির সম্পর্কে কোন ধারণা না করতেই অনুরোধ করি। কারণ আমার কোন কথার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই। ক্ষণিকের দর্শনে মনের উপর যে ছাপ পড়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু লিখতে চেষ্টা করি নি। এই তো ধরুন, মীনাক্ষী দেবীর বিয়ের সুখ্যাত মূর্তিটি আমাদের চোখে ধরে নি, অথচ জগৎ জোড়া এর নাম। নৃত্যপর গণেশ ঠাকুর দেখে হাসি পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে হাসতে পারি নি। হাসি পাক আর যাই হোক, এর শিল্পসুষমা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মন্দিরে নিত্য মেলা বসে। মন্দির, বিগ্রহ, দোকান-পাট, পুরুত, পাণ্ডা, ভক্ত, দর্শনার্থী ও ভ্রমণকারী সব মিলে জমজমাট অবস্থা কিন্তু কোলাহল বা গোলমাল তেমন আছে বলে মনে হলো না। ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত দেহে এক সময় বেরিয়ে এসেছিলাম। দিনমণি তখন মধ্য আকাশ অতিক্রম করে গেছেন। মন্দির প্রসঙ্গ শেষ করার আগে এই প্রাঙ্গণে নবপ্রতিষ্ঠিত একটি 'মন্দির'-এর প্রতি পাঠক সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ না করলে অন্যায় হবে।

তামিল নাড়ুর জাতীয় কবির মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই মন্দির প্রাঙ্গণের অপেক্ষাকৃত নবনির্মিত গৃহে। এ মন্দিরে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজার আয়োজন হয় না। কিন্তু দৈনিক ক্লাস হয়। সাপ্তাহিক সাহিত্য বসে। কবি নিয়ে তামিলবাসীর গর্বের শেষ নেই। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে তামিল ভাষায় ইনি বহু কবিতা রচনা করেন। আজও অনেক কবিতা, বিশেষ করে শ্লোকগুলি লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে থাকেন। শুনা যায় সহস্রাধিক শ্লোক প্রজ্ঞা ও ব্যবহারিক জ্ঞানে এখনো প্রোজ্জ্বল। চাণক্য শ্লোকের কথা প্রসঙ্গত আমাদের মনে আসে। তামিল নাড়ুর প্রত্যেকটি সরকারী বাসে দেখবেন কবির একখানি ছবি ঝোলানো রয়েছে। তামিলবাসীর ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি কত প্রগাঢ় তা এর থেকে সহজেই অনুভব করা যায়। অনেক সময় এই অনুরাগ সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতার দোষে নিন্দিত হয়। যাঁরা নিন্দা করেন তাঁদের অনৌদার্যই আমার নিকট অধিকতর ক্ষতিকর মনে হয়েছে।

কাপড়ের দোকানে জুতো আনতে গিয়ে সুধীরদা সৌজন্যের খাতিরে কাপড় দেখতে বসলেন। মাদুরার শাড়ীর খ্যাতি আছে। দোকানদার গুণী মানুষ, বিক্রয়ের কলা-কৌশল জানেন। নকল রেশমের সস্তা অথচ চোখ ঝলসানো হরেক রকমের শাড়ী নানা কথার ফুলঝুরি দিয়ে এমন করে তুলে ধরলেন যে কয়েক মিনিটের মধ্যে সুধীরদা মোহনদা সকলেই বেশ কয়েক-খানা করে কাপড় কিনে ফেললেন। সামান্য কিছু টাকা আগাম দিলেন। কাপড় ডাকে যাবে, তখন টাকা দিলে হবে। বেশ ব্যবস্থা। টাকার কথা যেমন তেমন, ভ্রমণকারীর পক্ষে কাপড় সামলে নিয়ে চলার ঝক্কি কম নয়। সামান্য ডাক-ব্যয়ের বিনিময়ে এই সুবিধা সকলেই গ্রহণ করে থাকেন। মোহনদা বললেন কলকাতার বাজার দরের তুলনায় এখানে কাপড়ের দাম পঁচিশ শতাংশ কম। সুধীরদা জানতে চাইলেন কোন্ হিসাবে বলছেন, কোথাকার দর বলছেন? গড়িয়াহাটের, না শ্যামবাজারের?

আমরা ঠেকে শিখেছি। দুপুরে খাবার সময় মাখন ও চিনি নিয়ে গিয়েছিলাম। অসুবিধা সত্ত্বেও পেট ভরে খেতে পারা গেল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়লাম টেপ্পাকুলাম, বসন্ত মণ্ডপ ও নায়েক মহল দেখতে। বাসে গেলাম টেপ্পাকুলাম।

বাসের টার্মিনাস এটি। যে বাসে গিয়েছিলাম সে বাসেই ফিরে এসেছিলাম। একটা বড়সড় পুকুরের মধ্যস্থলে মন্দির। মীনাক্ষী মন্দির দেখার পর এ আর চোখে ধরে না। পরিবেশটিও বড় নোংরা মনে হলো। উৎসবের জন্যই এর নামডাক। উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বলে টেপ্পাকুলামকে আমরা স্বীকার করতে পারি নি।

ওখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম নায়েক মহল। বাসের কন্ডাকটর আমাদের ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকটা পথ হেঁটে নানা জনকে জিজ্ঞাসা করে করে নায়েক মহলে আসতে হলো। সে কি ফ্যাসাদ। একটি বছর দশেকের মেয়ে সুন্দর ইংরেজীতে আমাদের পথ বাৎলে দিল। ইংরেজী ভাষাটা জানা যে কত দরকার তা মর্মে মর্মে বুঝেছি দক্ষিণ দেশে এসে। ভারতবর্ষ ইংরেজী ভাষাকে পরিহার করে চলতে চাইলে নিঃসন্দেহে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, এমন কি ঐক্য বিঘ্নিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

নায়েক প্রাসাদটি খুবই প্রাচীন। যতটুকু বাড়ি অক্ষত আছে তা দেখলেই এর বিশালত্ব ও অতীত ঐশ্বর্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রাসাদের অভিনয়-মঞ্চটি প্রায় অক্ষত আছে। বিস্ময়কর না হলেও এর বৈশিষ্ট্য বিপুল। নাটমঞ্চ ও দর্শক-আসন বিন্যাসে রীতিমত কুশলতা আছে। ব্যালকনি ছাড়া, নানা শ্রেণীর দর্শকের জন্য পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত ছিল।

প্রাসাদে একটি সুন্দর ফোটো প্রদর্শনী আছে। তামিল নাড়ুর সব মন্দিরের বড় বড় ছবি এখানে দেখানো হয়। আলোর ব্যবস্থা অপ্রতুল। ছবি ও দর্শকদের দাঁড়ানোর স্থানের মধ্যে দূরত্বটাও বেশি। ফলে দেখতে অসুবিধা হয়।

এই প্রাসাদে কিছু নির্মাণ কাজ চলছিল। মজুরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু কথাবার্তা বলায় অসুবিধা। তারপর আজকাল শ্রমজীবীরা একটু বেশি সেন্সিটিভ। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নিকট কিছু জানতে চাইলেই তাঁরা অপমান বোধ করেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই মজুরদলে একটি শিক্ষিত ছেলে ছিল। সে এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় পাস করেছে। চাকরি-বাকরি না পেয়ে মজুরের কাজে যোগ দিয়েছে। হাসিমুখেই সে কথা কইছিল পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায়। তার বাবাও মজুর। সে-ই তার পরিবারে প্রথম ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে। তার খুব বিশ্বাস শীঘ্রই সে একটা চাকরি পাবে। কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রে সে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু চাকরি কবে হবে তাই ভেবে তো আজকের দিনটা চলবে না! খেতে তো হবে, অতএব মজুরের কাজ করছে। একা সে নয়, তার মত অনেকেই এমন কাজ করে। আমি এক-আধজন তথাকথিত শিক্ষিত মজুরের দেখা ইতিপূর্বেও পেয়েছি। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরাও ঐ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে নায়েক প্রাসাদের ছেলেটির আকাশ-পাতাল তফাৎ। ওঁরা বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ। শ্রমজীবী হতে হয়েছে বলে তাঁদের লজ্জার ও দুঃখের শেষ নেই। কাজে যথাসম্ভব ফাঁকি দেন এবং নিজেকে ছাড়া বিশ্বশুদ্ধ সকলকে তাঁদের দুরদৃষ্টের জন্য অভিসম্পাত করেন। আর এই ছেলেটি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। নিজের আরও ভাল কাজের জন্য যত্ন নিচ্ছে। কাউকে ঐ অবস্থার জন্য দায়ী ক'রে নিজের শান্তি ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে শেখেনি। দেখে বড় ভাল লাগল। কাজে ফাঁকি দেওয়াটা এখন সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের নানা স্তরে, বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডুবতে বসেছে, দেশের সর্ববিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। এই রকম একটা দারুণ অবস্থার মধ্যে ছেলেটির সাক্ষাৎ পেয়ে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছিলাম, ভরসা পেয়েছিলাম।

নায়েক প্রাসাদ থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। অতএব বসন্ত মণ্ডপ যাত্রা বাতিল করে আস্তানায় ফিরে এলাম। রাত তখন আটটা হবে। মধ্য রাতের গাড়ি ধরে আমরা কন্যাকুমারীর দিকে যাত্রা

করব। গাড়ি যাবে ত্রিবান্দ্রামের পর্যন্ত — ত্রিরুনেলভেলি পর্যন্ত। রেলপথের শেষ সেখানে। তারপর বাসে যেতে হবে। মাদুরা থেকেও সোজা বাস যায় কন্যাকুমারিকা। ভাড়া লাগে বেশি। রাত্রে ঘুমোবারও অসুবিধা। তাই বাস আমাদের পছন্দ হয় নি। রেলে শোবার জায়গা পাওয়া যায় নি। রেল মজুরের বাক্সে শোবার ব্যবস্থা করার কৌশল জানা ছিল। অতএব একরাত্রির যাত্রায় আমরা অকুতোভয়। তবু ভয় কি একেবারে কাটে। গাড়ি ছাড়বার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে আমরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। মজুরের সঙ্গে বন্দোবস্ত হলো। এদিক-ওদিক করে সে একখানা একেবারে খালি গাড়িতে তুলে দিয়ে চুক্তি মত অর্থ নিয়ে চলে গেল। গাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিলেন না, অতএব বাড়তি পয়সাটা সে একেবারে ফাঁকি দিয়েই নিল। আপশোষ যে একটু হলো না, তা নয়। শোবার জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় ক্ষোভটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

কন্যাকুমারিকা

রাত এগারটায় ট্রেন ছাড়ল। তখন বেশ ভিড় হয়েছে গাড়িতে। ত্রিরুনেলভেলি মাদুরাই থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার। এই সামান্য পথ আসতেই গাড়ি প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব করেছে। কয়েক দিন ধরে খুব বর্ষা হচ্ছে। সেজন্য রেলপথের নাকি ক্ষতি হয়েছে, তাই এই দেরি। ত্রিরুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারিকার বাস ছাড়ে। গাড়িতে বারাকপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগারের জনৈক কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়ি এখানে। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা জেনে নিয়েছিলাম। খুব সজ্জন ও বিদগ্ধ মানুষ তিনি। আমাদের সঙ্গে করে বাসে তুলে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন হাসিমুখে এবং আমাদের নিষেধ উপেক্ষা করেই।

ছাড়বার মুখে বাসে এসে আমরা উঠলাম। উঠতে না উঠতেই বাস চলতে শুরু করল। ভদ্রলোককে ভাল করে একটু কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় পাওয়া গেল না। এখান থেকে সারাদিনে দু'খানা মাত্র বাস কন্যাকুমারিকা যায়। ভাগ্যক্রমে সকালের বাসখানা আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। না পেলেও ক্ষতি ছিল না। নাগেরকয়েল পর্যন্ত ঘন ঘন বাস যায়। সেখান থেকেও কন্যাকুমারিকার দূরত্ব মাত্র কুড়ি কিলোমিটার; বাসও চলে ঘন ঘন।

খানিকটা চলার পর আমাদের বাসখানায় কি একটা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল। পথের পাশের একটি বাস-ডিপোতে নিয়ে ভিড়িয়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে মেকানিক এলেন। তিনিও মিনিট পনর ধরে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঠোকাঠুকি করে রায় দিলেন, এ বাস চলবে না। আরও পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আমরা তো প্রমাদ গুনছি। ইতিমধ্যে একখানা খালি বাস পাশে এসে দাঁড়াল। কে কি নির্দেশ দিলেন জানি না। যাত্রীরা সেই বাসে গিয়ে উঠে বসলেন। আমরাও মালপত্র টানাটানি করে তাঁদের অনুসরণ করলাম। মনে হলো এই জন্যই মাদ্রাজের বাসের এত সুখ্যাতি।

ফেরার পথে আমরা নাগেরকয়েল দেখেছিলাম। কন্যাকুমারী জেলার সদর দপ্তর এই শহরে। এখন সোজা কন্যাকুমারী চলে গেলাম। বাসটি অবশ্য এখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত বাসনা দিয়ে রচিত ত্রি-সমুদ্রসেবিত ভারতবর্ষের শেষ স্থলবিন্দু কন্যাকুমারীতে সকাল ৯টা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম। উঠব কোথায় ঠিক করতে পারি নি। বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটির নবনির্মিত বাসভবন খাস কন্যাকুমারী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। অতএব আমাদের অপছন্দ। সমুদ্র-উপকূলে কয়েকটি ভাল হোটেল ও লজ আছে। লজ অর্থাৎ কেবল থাকবার ব্যবস্থা। কেবল ভাল দেখলে আমাদের চলে না, দক্ষিণার কথাও ভাবতে হয়। এক মজুর বালক বলল, চলুন আপনাদের বাঙালীর লজে নিয়ে যাই। বাঙালীর লজ কথাটায় কাজ হলো। ছেলেটির বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তার সঙ্গে গিয়ে অদূরের গোপী

নিবাস লজে উঠলাম। নামটাতে অবশ্য বাঙালী গন্ধ আছে, যাত্রীরাও অনেকে বাঙালী। কিন্তু বাঙালী মালিকের দেখা পাই নি কখন। আবাসটি এমনিতে খারাপ নয়। ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে। ছাদ থেকে সমুদ্র দর্শন হয়। বিবেকানন্দ শিলা ও স্মৃতিমন্দির ঘর থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। কন্যাকুমারীর মন্দিরও কাছে। তবে পল্লীটা অপরিচ্ছন্ন। লোকজন সেখানকার একটিও পছন্দ হয় না। তাই মনটা আমাদের প্রসন্ন হয়নি এই গোপী নিবাসে উঠে।

ত্রিকুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পথটির কথা একটু উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। পাহাড়ের বুক চিরে সবুজ ধানের ক্ষেত ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে মসৃণ রাজ-পথ। কাছে ও দূরে আন্দোলিত তাল-নারকেল কুঞ্জ আর তার পেছনে ধূমল পাহাড়। মনে হয় মেঘ এসে পাহাড়ের মাথাটা ঢেকে দিয়েছে। বঙ্গের সমতলবাসীর কাছে এ দৃশ্য অভিনব। মধ্যে মধ্যে খালও আছে। আর আছে খালের তীরে তীরে টকটকে লালরঙের টালি ছাওয়া ছোট বড় নানা ধরণের কুটীর। খালের ঘাটে স্নানরতা স্ত্রীপুরুষও দেখতে পাবেন। বাড়িগুলি সবই বাগান ঘেরা—নারকেল ও কলাগাছের প্রাচুর্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ফাঁকে ফাঁকে ত্রস্তপদে চলে যাওয়া তামিল গৃহিণী বা গৃহকর্মে রতা জনপদবধূ চকিতে নয়নগোচর হবে এবং মিলিয়ে যাবে। মিলিয়ে গেলে কি হবে—মনের ফ্রেমে ছবিটা চিরকালের জন্য বাঁধা হয়ে গেল। আপশোষ রয়ে গেল, এমন দেশে দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ করছি। সাধ্যে কুলালে একবার ত্রিকুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যাব। পুরাকালে পায়ে হেঁটে তীর্থে যাওয়ার বিধানের মর্ম, মনে হয় এমনি করেই বুঝেছি।

কন্যাকুমারীতে পা দিয়েই আমরা গেলাম বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির দেখতে। এক মুহূর্ত দেরি করি নি। কেননা আকাশ মেঘলা ছিল। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ঝড়ো হাওয়ার দাপটে প্রায়ই মন্দিরে যাওয়া বন্ধ থাকে। বর্ষা নামলে অক্টোবরেও ভাল করে মন্দির দেখা যায় না। তাই আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। বিকেলের আবহাওয়া আরও খারাপ হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

ক্রমশঃ

ময়া ও মিমির স্মৃতি

নন্দলাল পাল

মিমির দিকে যেতে হবে। সার্কেল অফিসার মিঃ যোসেফ বলেছেন, বহুদিন ওদিকে কেউ যায়নি। সেই কবে মেজর বড়ুয়া গিয়েছিলেন। মেজর বড়ুয়া তখন কিফিরিতে এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার। খুব ভাল শিকারী ছিলেন তিনি। দলবল নিয়ে তিনি মিমির দিকে গিয়েছিলেন। সে ছ'-সাত বছর আগের কথা। তারপর শুধু আসাম রাইফেল্‌সের লোকেরা বছরে দু'চার বার পেট্রল ডিউটিতে গিয়েছে। সিভিল কর্মচারী কেউ যায়নি। ওদিকের নাম শুনলেই নাকি সবার ওজর আপত্তির শেষ থাকে না।

আমি যাব। মনে পড়ল মিঃ জামিরের কথা, 'ডাক্তার যদি নাগাহিল্‌স্‌-এ থাকতে ভাল না লাগে, তবে নাই বা রইলেন, কিন্তু অন্ততঃ তুয়েনসাং পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলে আসুন। ওটা ত একটা এড্‌ভেঞ্চারও হবে।' কথাটা সত্যি। নইলে ত আমগুড়ি গেট থেকেই ফিরে যেতাম আমি।

মুছিমং বলল, 'সাহেব, আপনি শুনছি মিমির দিকে যাবেন। আমাকেও তা'হলে যেতে হবে। আপনাকে একা ওদিকে যেতে দেব না।'

মুছিমং বলে কী। আমাকে সে যেতে দেবে না। কী যেন একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তা'র কথায়।

আমি বললাম, 'ব্যাপার কী মুছিমং? তোমার শরীর ত ভাল নয়। তুমি যাবে কী করে? আমার রান্নাবান্নার জন্ত একজন লোক দরকার। সে জন্ত কেউ গেলেই চলবে।'

একটু চুপ করে রইল মুছিমং। কী যেন মনে মনে ভাবল। তারপর ইতস্ততঃ করে বলল, 'স্যার, ওদিকে যাওয়া নিরাপদ্‌ নয়। তবে আমি ইসচুংগর। আমি সঙ্গে থাকলে আপনার কোনও বিপদ্‌ হতে দেব না। আর বেশী কিছু বলতে পারব না, স্যার।'

বুঝলাম কী বলতে চায় মুছিমং। জানি পিতৃ-মাতৃহীন মুছিমং আমাকে ভালবাসে। স্থানীয় নাগারা সবাই আমাকে সমীহ করে। আচুংবা দোভাষীর স্ত্রী আমার চিকিৎসায় ভাল হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় নাগারা আমাকে অতিশয় সম্মান ও সমীহ করে।

নাগাদের মস্ত বড় গুণ—সাহসিকতাকে তা'রা শ্রদ্ধা করে। ভীরু, কাপুরুষ তাদের চোখে উপহাসের পাত্র। আমি মিমির দিকে যাব এ কথাটা সকলে জেনে ফেলেছে। এখন যদি না যাই তবে ওরা কী ভাববে।

স্থির করলাম—আমি যাবই।

মুছিমং বেতের ঝুড়িতে সবকিছু গুছিয়ে নিল। প্রায় পনের দিনের রসদ। ডাল চাল আলু পেঁয়াজ তেল নুন লঙ্কা কিছুই বাদ দিল না মুছিমং। বিছানা এবং কাপড়-চোপড়ও সে গুছিয়ে নিল। মুছিমং এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ। আমাকে ওসব কিছুই ভাবতে হয় না। আমার আগে এখানে তিনজন ডাক্তার ছিলেন। মুছিমং প্রত্যেকের সঙ্গেই কাজ করেছে।

সুবেদার ভীম বাহাদুর খবর পাঠালেন। ভীম বাহাদুর পেট্রল পার্টির ইনচার্জ। কালিম্পং-এ ভদ্রলোকের বাড়ী।

কী কী নিচ্ছি ভীম বাহাদুরকে সবিস্তারে বললাম। মন দিয়ে ভদ্রলোক শুনলেন। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আপনার ওদিকে যাওয়ার খুব প্রয়োজন আছে কি, ডাক্তার সাহেব ?'

আমি বললাম, 'কেন ?'

'আপনি নতুন লোক। বলতে গেলে ছেলেমানুষ। এখনও এদিকের হালচাল বিশেষ জানেন না।' সিগারেটের একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সুবেদার।

আমি বললাম, 'মিঃ যোসেফ যে বললেন, ওদিকে খুব অসুখ-বিসুখ হচ্ছে ?'

'অসুখ-বিসুখ হচ্ছে কথাটা হয়ত ঠিক। তবে আপনি দু'তিন ঝুড়ি ঔষধ গ্রামে গ্রামে বিলিয়ে দিয়ে কতটা কী করবেন ? ওটা ত কম্পাউণ্ডারও পারে এবং আমাদের সঙ্গে ত সিপাই কম্পাউণ্ডার যাচ্ছেই। প্রয়োজন বোধে ত আমরা ঔষধ দেবই। বড় অসুখ-বিসুখ হলে রোগীদের ত হাসপাতালে আনতেই হবে। তখন আপনার কাজ।'

লক্ষ্য করলাম সুবেদার ভীম বাহাদুরের মূল বক্তব্য যেন এ নয়। তিনি যেন আরো কিছু বলতে চান। এ যেন আসল বক্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়া।

এখানে আসার পর গত তিন-চার মাসে বুঝতে পেরেছি সুবেদার ভীম বাহাদুর আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আসার কয়েক দিন পরেই রাত্রে পেট্রোমাক্স জ্বালাতে বারণ করেছিলেন। আজও ভীম বাহাদুরের কথায় কী যেন একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে এবং সে ইঙ্গিত যেন আমারই স্বপক্ষে।

জুন মাসের ছ' তারিখ। রবিবার। সকাল থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে মেঘের সমারোহ।

সিপাই একশত কুড়ি জন। সুবেদার ভীম বাহাদুর তাদের সঙ্গে। তিনি ওই দলের অফিসার ইন্-চার্জ। সিপাইদের রসদ এবং গোলাবারুদ ইত্যাদি বয়ে নেওয়ার জন্য পঞ্চাশজন কুলি।

আমার কুলি চারজন। দু'জন আমার বিছানাপত্র ও খাবার জিনিষ বয়ে নিয়ে যাবে আর দু'জন নেবে ঔষধ।

আমরা বৃষ্টির মধ্যেই রওয়ানা হলাম। ভীমবাহাদুর আমাকে সব সময় ঠিক মাঝখানে থাকতে বললেন।

আমার পরনে প্যাণ্ট, গায়ে শার্ট, পায়ে হান্টিং বুট এবং হাতে একটা লাঠি। লাঠিটা প্রায় চার ফুট লম্বা এবং ওটার মাথাটা সরু করে ধারালো। পাহাড়ী রাস্তায় ভর দিয়ে চলতে সুবিধা হবে।

সুদূরপ্রসারী পুংরো টিলার পাইন বীথিকে ভেদ করে সরু এক ফালি পায়ে হাঁটা রাস্তা ক্রমশঃ ঝুমকি নদীতে নেমেছে। এ পর্যন্ত রাস্তাটা মোটামুটি সমতল ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ঢালু হতে লাগল। হঠাৎ চেপে বৃষ্টি এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পায়ে হাঁটা রাস্তাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

আমরা নীচের দিকে নামছি। অতি সন্তর্পণে—পা টিপে টিপে। হাতের লাঠিটাই ভরসা। পায়ের গোড়ালি কাঁপছে। একটু এদিক্ ওদিক্ হলেই বিপদ্।

কুলিরা এক বিচিত্র কৌশলে মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সিপাইদেরও তেমন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমার কষ্টের শেষ নেই। অনভিজ্ঞ পা দু'টো ;— প্রতি মুহূর্তে ভয়, বিপদের আশঙ্কা।

সুবেদার ভীম বাহাদুর আমার আগে আগে চলেছেন। তিনি বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, হুঁসিয়ার, একটুও যেন এদিক্ ওদিক্ না হয়।'

ঘন জঙ্গল—ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে। আমরা যেন একটা জঙ্গল গুহার ভেতর দিয়ে চলেছি। উপরে পাতার ছাদ ভেদ করে বৃষ্টির ফোঁটা আমাদের গায়ে পড়ছে। পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন একটা পিচ্ছিল সরীসৃপের গা বেয়ে নামছি। মাঝে মাঝে গাছের পাতাগুলো দুলে দুলে উঠছে। লক্ষ্য করে দেখলাম বিরাট্ বিরাট্ পাহাড়ী ছিনে জোঁক মানুষের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে।

আমরা এমনি ভাবে প্রায় হমড়ি খেয়ে চলতে চলতে এক সময় ঝুমকি নদীতে পৌছলাম। পুংরো ও ময়া টিলার মধ্য দিয়ে কলকল ছলছল শব্দে ঝুমকি ছুটে

চলেছে। ঝুমকি নদীর একপাশে পুংরো, অন্যপাশে ময়া বস্তি।

ঝুমকি নদীর ধারে নেমে আমরা বিশ্রাম করলাম। কুলিরা মাথার বোঝা নামাল, সিপাইরা রাইফেল মাটিতে রেখে বড় বড় পাথরের আড়ালে আড়ালে বসল। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আকাশে মেঘও তেমন নেই। কিন্তু পাহাড়ী নদী ঝুমকিতে ঢল্ নেমেছে। ঘোলা জলের তীব্র স্রোত পাহাড় ভেঙ্গে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে। তার উদ্দাম গতি দেখে ভয় হয়।

একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে আমি বিশ্রাম করছিলাম। পা দু'টো ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে। দু'হাতে টিপে দিচ্ছিল মুছিমং। ক্লান্তিতে গোটা শরীরটা অবশ হয়ে এল।

সুবেদার বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। তার মানে আবার চলতে হবে। সিপাইরা পিঠে তাদের ছোট ব্যাগ, কোমরে বুলেটের বেল্ট এবং কাঁধে রাইফেল নিয়ে চলতে শুরু করল। কুলিরা মাথায় বোঝা নিয়ে দুর্বোধ্য নাগা ভাষায় 'সারিগান' গেয়ে হৈ হৈ করে চলতে লাগল।

ঝুমকি পার হতে হবে। ঝুমকির ওপর বেতের ঝুলন্ত সেতু। মোটা দীর্ঘ বেত দিয়ে সে সেতু তৈরী। কুলিরা হৈ হৈ রৈ রৈ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে সেতু। সিপাইরাও বেশ কয়েকজন পেরিয়ে গেল। ভীম বাহাদুর বললেন, 'এগিয়ে যান, ডাক্তার সাহেব।'

সামনের সেতু আর নীচের নদীর দিকে তাকালে সামনে এগুতে পা চলে না। কিন্তু উপায় নেই—যেতেই হবে। সিপাইরা আমাকে উৎসাহ আর অভয় দিতে লাগল।

মুছিমং ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সেও বলল, 'স্যার, কোন ভয় নেই, আমি আছি।'

এতক্ষণ সহ্য করেছিলাম, আর পারলাম না। এরা আমাকে ভাবে কি? মুছিমংও আমাকে সাহস দেয়! কোথায় যেন পৌরুষে ঘা লাগল।

এগিয়ে গেলাম এবং বেশ সমান তালে পা ফেলে এগুতে লাগলাম।

সেতু পেরিয়েই আবার চড়াই। খাড়া পাহাড়। নদী থেকে ওপর দিকে তাকালে ভয় করে। যেন কোন অতল গহ্বরে দাঁড়িয়ে আছি—সামনে দুর্গম দুরতিক্রম্য পর্বত। কিন্তু কোন উপায় নেই। চল চল সামনে চল। পেছন দিকে তাকিও না।

মুছিমং বলল, 'স্যার, আস্তে আস্তে চলুন। তাহলে পরিশ্রম কম হবে, হাঁপিয়ে পড়বেন না।'

'থাম্, তুই আর বেশী বকিস্ না। আমি কি তোর চেয়ে ছেলেমানুষ যে কথায় কথায় আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিস্?'

ধমক খেয়ে বেচারা চুপ করে গেল এবং আমার পেছনে পেছনে নিঃশব্দে চলতে লাগল। এগিয়ে গেল না। সে ত ইচ্ছা করলেই কুলিদের সঙ্গে আগে আগে যেতে পারে। কিন্তু সে জানে, মুখে যতই হম্বিতম্বি করি না কেন, আমার দৌড় কতটুকু। জল ও চায়ের ফ্লাস্ক দু'কাঁধে ঝুলিয়ে সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল।

কতক্ষণ পথ চলেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি সামনের সিপাইরা বসে পড়েছে। সুবেদার ভীম বাহাদুরও বসে আছেন। আমি যেতেই ভীমবাহাদুর বললেন, 'বৈঠিয়ে ডাক্তার সাহেব, বস্তি আর খুব দূরে নয়। গাঁওবুড়োরা এসেছে।'

লাল কম্বল গায়ে গাঁওবুড়োরা এগিয়ে এল মধুর ভাঁড় নিয়ে। মুছিমং এগিয়ে গিয়ে বলল, ডাক্তার সাহেব মধু না-খাওয়া মানুষ অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব মধু খান না। গাঁওবুড়োরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

বস্তির একদিকে খানিকটা বেশ সমতল জমি। সেখানে তাঁবু পড়েছে। তাঁবু মানে খড় ও পাতার ছোট ছোট ঘর। এগুলো আগেই বস্তির লোক বানিয়ে রেখেছিল।

কিছু সিপাই তাঁবুর চারপাশে বিবর তৈরী করে পাহারায় বসে গেল। কয়েকজন রান্নাবান্নার কাজ শুরু করল।

আমার ও সুবেদার সাহেবের রান্নার তত্ত্বাবধান করতে লাগল মুছিমং।

খাবারের বাহুল্য নেই। ডাল ভাত ও হরিণের মাংস। টাট্টু ঘোড়ার আকারের একটা হরিণের প্রায় অর্ধেকটা দিয়েছিল গাঁওবুড়োরা আমাদের।

খাওয়ার পর ঘুমে দু'চোখ বুজে এল। মুছিমং আগেই বিছানা তৈরী করে রেখেছিল। আমি সটান তার ওপর শুয়ে পড়লাম।

গোটা রাতটা যেন এক নিমেষে কেটে গেল। মুছিমং-এর ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার ওপর মশারি টানানো। বললাম, 'মুছিমং, তুই কি মশারিও এনেছিস ?'

মুছিমং বলল, 'স্যার, আপনার ত কোনদিকে খেয়াল থাকে না। এখানে এক রকমের পোকা আছে যা কামড় দিলে একেবারে ঘা হয়ে যায়। মশারি না এনে কি উপায় আছে ?'

বলে কি মুছিমং ? সে ত দেখছি আমার অজান্তে আমায় অভিভাবক হয়ে উঠেছে। এই বাপ-মা মরা ছেলেটার প্রতি এই মুহূর্তে আমার মনটা মমতায় ভরে উঠল।

আমি বললাম, 'তোর কি মশারি আছে, মুছিমং ?'

মুচকি হেসে মুছিমং বলল, 'স্যার, আমাদের শরীর পোকার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। কত আর কামড়াবে ?'

তারপর বলল, 'বস্তিতে আজ পরব আছে। এক্ষুণি শুরু হবে। দেখবেন ত আমার সঙ্গে আসুন।'

মুছিমং ঘরের বাইরে চলে গেল। আমি লাফিয়ে উঠে বিছানায় বসলাম।

সুবেদার ভীমবাহাদুর লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, ভাল চাকর পেয়েছেন।'

সকালে সূর্য উঠেছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ঘন কুয়াশা সূর্যকে ঢেকে দিল। বস্তির ঘরগুলোর ছাউনির হলদে খড়ের ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছিল—তা মিলিয়ে গেল। কিন্তু ঘন কুয়াশাকে অগ্রাহ্য করে ময়া বস্তির দৈনন্দিন প্রাণস্পন্দন শুরু হল। ছেলে বুড়ো সবাই এর মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। মেয়েরা মাথায় লম্বা লম্বা বাঁশের চোঙা নিয়ে জল আনতে পাহাড়ের গা বেয়ে তরতর করে নেমে গেল ঝর্ণায়। পুরুষরা তাদের বাঁশের তৈরী পাইপে তামাক সেজে উনুন থেকে খানিকটা জলন্ত অঙ্গার নিয়ে পাইপ টানতে টানতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

সেদিন ময়া বস্তি উৎসব-মুখর। তসিমং-এর বাড়িতে উৎসব। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এমনি উৎসব কদাচিৎ হয়। আর তা চাট্টিখানি কথাও নয়। যে-সে করতে পারে না,—অতিশয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরাই শুধু এমন উৎসবের আয়োজন করতে পারে।

তসিমং সম্পন্ন গৃহস্থ। অনেকটা জমিই সে চাষ করে। তাছাড়া গরু, শুকর, মুরগীও তার অনেক আছে। এত স্বচ্ছল যার অবস্থা তা'কে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই হবে—এমন একটা চিন্তা তসিমং-এর মাথায় বেশ কিছুদিন যাবৎ ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু করব বললেই ত আর সব জিনিষ করা যায় না ? তা'হলে ত সমাজে সবাই গণ্যমান্য হয়ে যেত। তাই সমাজের বিধান—সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য গণভোজ দিতে হবে।

সে এক এলাহী কারবার।

উৎসবের দিন। তাই সেদিন কেউ ক্ষেতে গেল না। উৎসব-সাজে সেজে সবাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল এবং বস্তির এখানে ওখানে জড় হয়ে জটলা করতে লাগল।

পুরুষেরা মাথায় একরকমের অভিনব মুকুট পরল। এর টুপির মত অংশটা নানা রঙের বেত দিয়ে তৈরী। তার ওপর দু'দিকে কা'রো মাথায় মিথুনের শিং, কারো মাথায় শূয়রের দাঁত আঁটা। টুপির ঠিক মাঝখানে হালকা পাখির পালক এঁটে দেওয়া হয়েছে। পালকগুলো সামান্য হাওয়াতেই নড়তে শুরু করে। তা'দের

কানে কুণ্ডল—গলায় অজস্র রঙীন পাথরের মালা। যারা ধনী তা'দের হাতে হাতীর দাঁতের বলয়। পরনে নেংটি।

এটা পুরুষদের উৎসব। তাই পুরুষদের সাজগোজের ঘটাই বেশী। মেয়েদের উৎসব নয়। তাই তারা আজ সাধারণ পোশাকেই তুষ্ট।

সমস্ত আয়োজন শেষ করতেই সকালটা কেটে গেল। বেলা প্রায় ন'টা। কুয়াশার আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে পড়েছে। সকালের শিশির-ভেজা ময়া পাহাড়, তার গাছপালা, লতাগুল্ম সূর্যের আলো পেয়ে সতেজ হয়ে উঠেছে আর সতেজ হয়ে উঠেছে ময়া বস্তিও।

তসিমং-এর ঘরে উৎসব। বেশ বড় দেখে দু'টো ষাঁড়কে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল তসিমং। তার জোয়ান ছেলে ইয়াংবা জমকালো পোশাক পরে হাতে বর্শা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডান হাতে বর্শাটা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ষাঁড় দু'টোর গায়ে, মুখে ও মাথায় বাঁ হাতটা বুলাল ইয়াংবা। ষাঁড় দু'টো হয়ত ভাবল তাদের মনিব বড্ড ভাল। তারা নিষ্পাপ চোখ দু'টো বুজে আরামে জাবর কাটতে লাগল, আর ঠিক তখনই ইয়াংবার হাতের সুদীর্ঘ বর্শাটা সূর্যের আলোকে ঝলসে উঠে কাঁধের পেছন দিকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল একটা ষাঁড়ের। অব্যর্থ নিশানা। বর্শা হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে দিল। মুহূর্তে সবল সতেজ ষাঁড়টা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং চারখানা পা একটু টান টান করেই নিথর হয়ে গেল। রক্তাক্ত বর্শাটা আবার ঝলসে উঠল এবং দ্বিতীয় ষাঁড়টারও একই দশা, হল। ষাঁড় দু'টোর খানিকটা করে রক্ত বাঁশের চোঙায় তুলে রাখা হল।

জোয়ান জোয়ান আরো কয়েকজন লোক দা ও ছুরি নিয়ে এল এবং মিনিট ত্রিশেকের ভেতর ষাঁড় দু'টোর মাংস কেটেকুটে ভাগ ভাগ করে ফেলল। এক-এক ভাগ বস্তির এক-এক ঘরে দেওয়া হল। তসিমং নিজের পরিবারের জন্য রাখল ষাঁড়ের পেছন দিকের একখানা ঠ্যাং। উৎসব চলবে পনের দিন। পনের দিনের জন্য তসিমংদের ওই মাংসটুকুই সম্বল। তাদের প্রথা মত এই পনের দিনের ভেতর আর যা পশু-হত্যা হবে তার মাংস তসিমং পাবে না।

গাঁয়ের সর্দার তংকিবা নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রধান। পক্ককেশ বৃদ্ধ। সে শুধু বস্তির সর্দার নয়, আচার অনুষ্ঠানে তার ভূমিকা অনেকটা পুরুতঠাকুরের মত। উৎসব বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে তার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

তসিমং ও তার বউ এসে পাশাপাশি বসল। সর্দার তংকিবাকে পাতার ঠোঙায় মধু দেওয়া হল। তংকিবা মধুটুকু পান করে তসিমং ও তার বউকে আশীর্বাদ করল—'তোমাদের ক্ষেতের ফসল অফুরন্ত হোক, তোমাদের মধুর ভাণ্ড অক্ষয় হোক, তোমরা সুস্থ ও সবল হও, কোন বিপদ্ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে।'

তারপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। নিমন্ত্রিত সকলকে ভাত, মাংস ও মধু পরিবেশন করা হল। তসিমং সম্পন্ন ব্যক্তি। আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি।

খাওয়া দাওয়া চললেও আসল কাজ তখনও বাকী। বেলা প্রায় একটা। সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা নেমে গেছে।

তসিমং ও তার স্ত্রী গ্রামের লোকদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি-কাটা রাস্তাটা দিয়ে নীচে নেমে গেল। মুহিমংকে সঙ্গে নিয়ে আমিও হুমড়ি খেতে খেতে ওদের পেছনে পেছনে চললাম।

টিলার নীচে গভীর জঙ্গল। আমরা যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি তা নিবিড় বাঁশবনে ঢাকা। দিনের বেলায়ও অন্ধকার। টিলার গায়ে এখানে ওখানে জল চুঁইয়ে রাস্তাটাকে বিপজ্জনক ভাবে পিচ্ছিল করে তুলেছে।

একটা জায়গায় গিয়ে সবাই থেমে গেল। জায়গাটা মোটামুটি সমতল। সেখানে দু'টো বিরাট্ পাথরের টুকরো পাশাপাশি রয়েছে। পাথর দু'খানা কালো কিন্তু মসৃণ।

পাথর দু'খানার নীচ দিয়ে দু'গাছি করে শক্ত বেত

ঢুকিয়ে ওপরে গেরো দিয়ে বাঁধা হল এবং দুগাছি বেতের ভেতর দিয়ে একটি বেশ লম্বা বাঁশের টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর প্রতিটি পাথরের সামনে কয়েকজন এবং পেছনে কয়েকজন করে লোক দাঁড়িয়ে বাঁশের টুকরোটার কাঁধ দিয়ে অনেকটা পাল্কির মত করে পাথর দু'খানাকে কাঁধে তুলে নিল এবং চড়াই বেয়ে আবার ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। একটা আশ্চর্য কৌশলে লোকগুলো সেই বিপজ্জনক রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল। পদক্ষেপে একটু এদিক্ ওদিক্ হলে রক্ষা নেই—কাঁধ থেকে পাথর দু'খানা গড়িয়ে পড়বে এবং পেছন দিকের লোকগুলো পাথরের নীচে চাপা পড়ে পিষে মরবে। যারা পাথর দু'খানাকে বয়ে চলেছে তাদের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, কিন্তু পরিশ্রম লাঘবের জন্য তারা নিজেদের ভাষায় 'সারিগান' গেয়ে চলেছে। সমস্ত বনভূমি মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল।

খামারের কাছে রাস্তার পাশে আগেই দু'টো গর্ত করে রাখা হয়েছিল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পাথর দু'খানাকে ঐ গর্তের মধ্যে স্থাপন করা হল। তসিমং খানিকটা মধু বড় পাথরখানার ওপর ঢেলে দিল এবং হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পাথরখানাকে মধু দিয়ে ধুইয়ে দিল। তারপর বাঁশের চোঙা থেকে সকালে জমিয়ে রাখা ষাঁড়ের রক্ত পাথরখানার কিছুটা অংশে ঘষে দিল। ছোট পাথরখানার ওপরও একই প্রক্রিয়া চালাল তসিমং-এর বউ। তসিমং ও তার বউ তারপর একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, 'আমাদের ক্ষেতের শস্যবৃদ্ধি হোক, আমাদের শস্যভাণ্ডার অফুরন্ত হোক, আমাদের আয়ুবৃদ্ধি হোক, বলবৃদ্ধি হোক', ইত্যাদি।

কী আশ্চর্য! পৃথিবীতে প্রার্থনার ভাষা জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রায় একই। আমরাও চণ্ডী-স্তোত্রে বলি, —'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ধনং দেহি' ইত্যাদি। ওরাও প্রায় তা-ই বলছে।

সমস্ত উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ স্বামী-স্ত্রীর এই দীর্ঘ প্রার্থনা। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। ওই বড় শিলাটি স্বামী এবং ছোট শিলাটি স্ত্রীর প্রতীক।

মূল অনুষ্ঠান শেষ হল। তসিমং তা'দের ভাষায় একটা আনন্দধ্বনি করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা সমস্বরে তার পুনরাবৃত্তি করল। এই ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির অর্থ হল,—অনুষ্ঠান সফল হয়েছে।

তারপর ঘরে ফেরার পালা। অনেকগুলো মশাল জ্বালানো হল। আকাশে বর্শা এবং দা আস্ফালন করতে করতে নেচে নেচে এবং গান গেয়ে সবাই বস্তিতে ফিরে এল। মশালের আলোতে বর্শা এবং দাগুলোকে রক্তাক্ত মনে হচ্ছিল। সে রাত্রে বয়স্কদের কেউ ঘুমাল না। সারারাত সকলে নেচে গেয়ে এবং মধু পান করে কাটাল।

এ উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য নাকি অনেক। এ উৎসবের ফলে তসিমং-এর সামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। এ উৎসব সবাই করতে পারে না। এমন বিলাসবহুল গণভোজ দেওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। ধনী ব্যক্তি ছাড়া এটা করা অসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য খুব ধনী যারা, তারা সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য একাধিকবার এ উৎসব করে।

ময়া বস্তির লোকদের নাচ-গান ও হৈ-হল্লোড়ের জন্য আমাদের রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। মুছিমংকে সঙ্গে নিয়ে আমি অনেক রাত পর্যন্ত তাদের নাচ-গানের আসরে ছিলাম। শেষরাত্রে তাঁবুতে ফিরে এসে বাকী রাতটা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালাম। সিপাইরা ভোর বেলায় রান্না চাপিয়ে দিল।

সকালে আমাদের ময়া থেকে মিমির পথে রওয়ানা হতে হবে। সুতরাং জিনিসপত্র সব গোছগাছ করা হচ্ছে। উৎসব-ক্লান্ত ময়া বস্তি। সারারাত্রির নাচ-গানের পর বস্তির লোকেরা এখন ঘুমোচ্ছে।

আমি মনে মনে খুশী হলাম। ঠিক দিনটিতে এসেছিলাম, তাই এমন একটা উৎসব দেখতে পেলাম।

গণভোজের পর আজ থেকে তসিমং গণ্যমান্য ব্যক্তি। খামারের পাশে পুঁতে রাখা শিলাখণ্ড দু'টি পুরুষানুক্রমে মরা এবং তার আশেপাশের বস্তিতে তসিমং-এর সামাজিক মর্যাদা ঘোষণা করবে।

মুসিমং এসে বলল, স্যার, আপনার চা তৈরী। চা, বিস্কুট ও ডিমসিদ্ধ খেয়ে আমি তৈরী হয়ে গেলাম। সুবেদার ভীম বাহাদুর আগেই তৈরী ছিলেন। কুলিরা হৈ হৈ করে বোঝা নিয়ে রওয়ানা হল।

যাবার আগে তসিমং ও গাঁওবুড়োরা এল। ওরা আমাদের কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিল। যেতে যেতে পথের পাশে ক্ষেতের ধারে আগের দিনের শিলাখণ্ড দু'খানাকে আবার দেখলাম—তসিমং-এর সামাজিক মর্যাদার প্রতীক।

বেশ খানিকটা রাস্তা আমরা ভুট্টাক্ষেতের ভেতর দিয়ে চললাম। ভুট্টাক্ষেতের পরেই ঘাসবন—লম্বায় ঘাসগুলো আমাদের মাথার চেয়েও উঁচু; অনেকটা কাশ বনের মত। এই ঘাস দিয়ে ঘরের চালে ছাউনি দেওয়া হয়।

আমরা চলছি ঢালুর দিকে। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা। কোথাও হাতের লাঠি দিয়ে ঘাস সরিয়ে পথ পরিষ্কার করতে হচ্ছে।

আজ আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে—আঠার মাইল। তারপর মিমিতে যাত্রাবিরতি। মরাতে ভাত ও হরিণের মাংস রান্না করে আনা হয়েছে—পরে খাওয়া হবে।

আমরা যখন ছোট একটা পাহাড়ী নদীতে পৌঁছলাম তখন বেলা সাড়ে আটটা। একটানা দু'ঘন্টা পথ চলেছি। এখানে সিপাইরা চা তৈরী করে খেল। রওয়ানা হওয়ার আগে ওরা চা খায়নি।

চা খাওয়ার পর খাড়া পর্বত বেয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম। দুদিকে ঘন জঙ্গল।

আমরা টিজু নদীর গতিপথ ধরে চলেছি। টিজু এখানে কোহিমা, তুয়েনসাং ও মণিপুরের সীমানা নির্ধারণ করছে। টিজু বেশ চওড়া নদী। সে আমাদের ডানদিকে তার পার্বত্য দুরন্তপনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বয়ে চলেছে। দু'পাশে তার গভীর নির্জন দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্যময় পর্বত। সে অরণ্য ভেদ করে টিজুর বাঁ পাশে আমাদের পায়ে হাঁটা রাস্তা। কোথাও ডাইনে বাঁয়ে উপরে গভীর জঙ্গল—আমরা যেন জঙ্গলের এক সুরঙ্গ ভেদ করে চলেছি। ওসব জায়গায় সূর্যের আলোও দেখা যায় না। যা গভীর বন তা'তে বাঘ ভাল্লুক সাপ যে কোন সময় লাফিয়ে উপরে পড়তে পারে। কিন্তু সিপাইদের বুটের শব্দ এবং কুলিদের সারিগানের চোটে ওরাই বোধ হয় পালিয়ে যাওয়ার পথ পাচ্ছে না।

এতক্ষণ আমরা টিজু নদীর পাশে পাশে একটা টিলার গায়ে প্রায় সমতল রাস্তা ধরে চলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ রাস্তাটা বাঁক ঘুরে ওপর দিকে উঠছে। টিজু নদী টিলাটাকে প্রায় তিনদিকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা এতক্ষণ যেন প্রকাণ্ড একটা বৃত্তের পরিধি ধরে চলেছি। আমরা যেখানে বৃত্তের ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম, ঘুরে ঘুরে আবার তার কাছে এসে রাস্তাটা ওপর দিকে উঠে অন্য টিলার গায়ে চলে গিয়েছে। এই বৃত্তের মধ্যে আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা ঘুরেছি। এখন জঙ্গল কিছু হাল্কা, কিন্তু ধূপগাছের বন শুরু হয়েছে। নীচে লম্বা সবুজ ঘাস, ওপরে ধূপগাছের ছাউনি, অদূরে টিজুর কল-কল ছলছল শব্দ, এখানে ওখানে বনফুলের সমারোহ, গাছে গাছে নানা রকমের নাম-না-জানা পাখি—সব কিছু মিলে দৃশ্যটা অপূর্ব সুন্দর। জায়গাটা এতই মনোরম যে তপোবনের কথা মনে পড়ে যায়। এমন একটা স্থানে আমার বসে থাকতে ইচ্ছা করছিল। লোকালয় থেকে বহু দূরে ধূপগাছের গন্ধ, তার পাতায় পাতায় বাতাসের শিস, পাহাড়ী নদীর কলতান, নাম-না-জানা পাখির কাকলি এক অব্যক্ত, অনির্বচনীয় উদাসীনতায় মনকে বিবাগী করে তোলে। এমন স্থানে ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি থাকে না। এমন একটা জায়গা পেছনে ফেলে যেতে আমার একটুও ইচ্ছা করছিল না। আমি সুবেদার ভীম বাহাদুরকে বললাম, 'এখানে বসে বিশ্রাম করলে কেমন হয়, ভারী সুন্দর জায়গা।'

ভীম বাহাদুর বললেন, 'জায়গাটা সুন্দর বটে, তবে বিশ্রামের পক্ষে নিরাপদ্ নয়।'

ভীম বাহাদুরের কথায় যেন গূঢ় একটা অর্থ আছে। আমি আর উচ্চবাচ্য না করে চলতে লাগলাম।

সামনেই মিমি পাহাড় বিশাল দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর প্রায় শীর্ষে মিমি বস্তি। ওখানে আমাদের যেতে হবে। দূর থেকে ওর দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। মিমি পাহাড় পাতকৈ পর্বত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পাতকৈ পর্বতশ্রেণী ভারত ও ব্রহ্মদেশের সীমানা নির্দেশক।

আমরা যখন মিমি পাহাড়ের গোড়ায় মিমি নদীতে পৌঁছলাম, তখন বেলা একটা। ওখানে সবাই বিশ্রাম করলাম। সিপাইরা ময়া থেকে রেঁধে আনা ভাত খেল।

এতক্ষণ দিনটা চমৎকার ছিল। কিন্তু জুন মাসে নাগাপাহাড়ের প্রকৃতি বড়ই রহস্যময়ী। যে কখনো হাস্যোজ্জ্বলা, কখনো গোমড়ামুখী, আবার কখনো ক্রন্দসী।

দেখতে দেখতে চাপ চাপ মেঘ আকাশে জমা হতে লাগল।

সুবেদার বাঁশীতে ফুঁ দিলেন। কুলিরা মোট নিয়ে হৈ হৈ করে রওয়ানা হল। আমরাও চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে সুবেদার বললেন দিনের অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না।

সামনে কঠিন পথ। গগনচুম্বী পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে। তাহলেই আজকের যাত্রা শেষ।

আকাশ অন্ধকার হয়ে এল—অন্ধকার হয়ে এল চার-পাশের অরণ্যানী। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল, সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া।

আমরা ওপর দিকে উঠছি। পা টিপে টিপে, সাবধানে লাঠি ভর করে। বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। লতাপাতা, পাথরের চাঁই ধরে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা উঠছি। দশ হাত উঠছি ত দু' হাত সর্‌সর্ করে নীচের দিকে পিছলে পড়ছি। আমাদের অবস্থা সেই স্কুলের অঙ্কের শামুকের মত। শামুক তৈলাক্ত বাঁশে এক ঘণ্টায় ছ'ফুট উঠলে পরবর্তী ঘণ্টায় চার ফুট পিছলে নেমে পড়ে। এখানে পর্বতটা তৈলাক্ত নয়,—কর্দমাক্ত, এই যা তফাৎ। মিমি টিলার গা বেয়ে আমরা এক ঝাঁক সরীসৃপের মত বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। চারদিকে প্রকৃতির তাণ্ডব। আমার হাত-পা কাঁপছে। ভয় হচ্ছে যদি সত্যি হাত-পা একেবারে অসাড় হয়ে যায় এবং পাহাড়ের গা থেকে একবার ছিটকে পড়ি, তবে মৃত্যু অনিবার্য। সিপাইরাও পিছলে পিছলে পড়ছে। সকলের একই অবস্থা।

কতক্ষণ এভাবে চলেছি জানি না। মনে হল বৃষ্টির ধার কমে আসছে। কিন্তু বৃষ্টি কমলেও রাস্তা একই রকম বিপজ্জনক।

আমরা যখন মিমিতে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বস্তির লোক আগেই খড় ও লতাপাতা দিয়ে অনেকগুলো ঘর তৈরী করে রেখেছিল। গাঁওবুড়োরা মধু নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেও কিছুদূর এগিয়ে এসেছে। কিন্তু হাত-পায়ে কাদা নিয়ে বৃষ্টিতে কেউ মধুপান করল না। ক্যাম্পে গিয়ে অনেকেই মধুপানে মেতে উঠল।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশেও আর মেঘ নেই। রাশি রাশি তারা আকাশে ঝিকামক করছে। বোঝাই যায় না যে কিছুক্ষণ আগে একটা প্রলয়ঙ্কর অবস্থা গিয়েছে।

খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আমার ঘুম তখনো আসেনি। মুহিমং পা টিপে টিপে আমার কাছে এল। তা'কে এভাবে আসতে দেখে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। মনে হল মুহিমং আমাকে কিছু বলতে চায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি মুহিমং, তুই এত রাত্রে এখানে চুপি চুপি এসেছিস কেন?'

মুহিমং-এর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। একটা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে নীচু গলায় সে আমাকে বলল, 'স্যার, খবর কিছু জানেন?'

মুহিমং-এর চোখমুখ দেখেই মনে হল গুরুতর কোন

খবর নিয়ে এসেছে সে। মুহিমং বলল, 'স্যার, আজ কেবল আপনার জন্য একটা প্রকাণ্ড বিপদ্ কেটে গেছে।'

আমার জন্য বিপদ্ কেটে গেছে—আমি এর অর্থ কিছুই বুঝলাম না। মুহিমং তারপর সবিস্তারে যা বলল তার অর্থ হল, 'আজ টিজু নদীর পাড়ে ওই বৃত্তাকার রাস্তায় বিদ্রোহী নাগারা পেট্রল পার্টি'কে আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা খবর পায় যে পেট্রল পার্টি'র সঙ্গে আপনিও আছেন। তাই তারা আর আক্রমণ করেনি। বলা ত যায় না। যদি গুলি আপনার গায়ে লাগে, এই আশঙ্কায় ওরা গোটা পরিকল্পনাটাই বাতিল করে দেয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই এ-সব জানলি কী করে?'

মুহিমং বলল, 'আমি যে এইমাত্র বস্তি ঘুরে এলাম। গাঁওবুড়োরা আলাপ করছিল, আমি শুনে ফেলেছি।'

মুহিমং চলে গেল। আমি শুয়েও স্বস্তি পেলাম না। সুবেদার ভীম বাহাদুর আমার ঘরের অন্য পাশে। ওঁরও ঘুম আসেনি। মুহিমং চলে যেতেই তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, ব্যাপার কী?'

আমি চাপা গলায় তাঁকে সবকিছু বললাম। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'ওই টিলায় ওদের আস্তানা আছে, এ-খবর আমাদেরও জানা। তাই আপনি যখন পাশের মনোরম টিলাটায় বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন, তখন নিরাপদ্ দূরত্বে না গিয়ে আমি রাজী হইনি। যাহোক আজ আপনার জন্য একটা বিপর্যয় এড়ানো গেল। তাছাড়া এ-সব বিপজ্জনক জায়গায় আপনি আসুন, আমি রওয়ানা হওয়ার আগে তা চাইনি। কিন্তু আপনি জেদ্ ধরায় আর কিছু বলিনি।'

সুবেদার সাহেব তাঁর বিছানায় চলে গেলেন। আমি শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, প্রথম আসার পথে ডঃ পালিতের কথা—আচুংবার কথায় পুংরো এরিয়া ওঠে-বসে। সে যদি প্রসন্ন থাকে, তবে আপনার এলাকায় আপনি নিরাপদ্। কেউ আপনাকে স্পর্শ করবে না। আর সে যদি বিগড়ায় তবে সিপাই-শাস্ত্রী আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

একটা বিপদ্ কাটল। কিন্তু পরদিন নতুন এক বিপদ্ দেখা দিল। এ-বস্তিতে আমাদের দু'দিন থাকার প্রোগ্রাম। তাই বস্তির লোকদের জন্য প্রচুর ঔষধপত্র এনেছিলাম। কিন্তু বস্তির কেউ ঔষধ নিতে এল না। মুহিমং ঘরে ঘরে বলে এল। কিন্তু সবাই জানাল যে তাদের ঔষধের কোন দরকার নেই।

ব্যাপারটা রহস্যাবৃত মনে হল। সবাই যেন আমার ঔষধ বয়কট করতে চায়। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কোন খবরই জোগাড় করা গেল না।

আমার পক্ষে পরিস্থিতিটা খুবই অস্বস্তিকর। কোন ডাক্তার আজ পর্যন্ত এদের বস্তিতে আসেন নি। আমি এলাম কিন্তু এরা ঔষধ নেবে না।

দুপুরের দিকে মুহিমং-ই খবর আনল। ওঝা ইয়াংসু বস্তির লোককে নিষেধ করেছে, কেউ যেন ঔষধ না নেয়।

বুঝলাম ইয়াংসুর পশার নষ্ট হওয়ার ভয়। এই দুর্গম বস্তিতে এতদিন সে তার প্রাগৈতিহাসিক চিকিৎসা নিয়ে নিরাপদ্ ছিল। তার বস্তিতে কোন ডাক্তার কোনদিন ঔষধের বোঝা নিয়ে স্বয়ং এসে উপস্থিত হতে পারেন, এটা ইয়াংসুর স্বপ্নের অতীত ছিল। ঘটনাটা একটা প্রচণ্ড ঝড়ের মত এসে ইয়াংসুর বাট-বছরের বদ্ধমূল ধারণার জগতের ভিতটাই যেন নড়িয়ে দিল। ইয়াংসু ভাবে আর দাঁতে দাঁত ঘষে। সরকার—সরকার না ঘোড়ার ডিম। এই সরকার নামক বস্তুটি আসার পর থেকেই নাগাপাহাড়ে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ডাক্তারে আর হাসপাতালে ছেয়ে যাচ্ছে নাগাপাহাড়—এ-কথাটা ইয়াংসুরও কানে এসেছে। ইয়াংসুর কল্পনার রাজ্য টিজু নদী পর্যন্তই বিস্তৃত—তার কল্পনায় পক্ষীরাজ টিজু নদী অতিক্রম করতে পারে না। ইয়াংসু তাই ভাবত, সরকারের ওই ডাক্তার-টাক্তারগুলো টিজুর ঐ

ওপারেই থাকবে। টিজু অতিক্রম করে ওরা কোনদিন তার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব কল্পনার স্বর্গে হানা দেবে না। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে আজ যেন ইয়াংমুর সব হিসাব-নিকাশ গরমিল হয়ে গেল।

মিঃ যোসেফ্ বলেছিলেন, এদিকে রোগের ছড়াছড়ি। কোন ডাক্তার কোনদিন আসেননি, কথাটা সত্য।

মিমি পুংরো থেকে দু'দিনের পথ। এ-দিকের রাস্তা এত দুর্গম ও বিপদ্-সঙ্কুল যে এদিকে আসাটা সবাই এড়িয়ে চলে। ধারে-পাশে যে-সব বস্তি, সেখানের লোকেরা পুংরো থেকে এসে ঔষধ নেয়। কিন্তু মিমির লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্য ওঝাদের দাপট ওখানে প্রচণ্ড। অন্যান্য বস্তি থেকে ওঝার দাপট ক্রমশঃ কমছে।

আমি ঔষধের বোঝা নিয়ে বসে আছি। কিন্তু ঔষধ নিতে কেউ আসছে না। আমার পক্ষে পরিস্থিতিটা অস্বস্তিকর।

সকালে কয়েকজন সিপাই হরিণ শিকারে চলে গিয়েছে। মুছিমংও ওদের সঙ্গে তার 'এয়ার গান' (air gun) নিয়ে চলে গেছে। সুবেদার ভীম বাহাদুর বসে তাঁর কাজ করছেন এবং আমার কোন কাজ না থাকায় বসে বসে গল্পের বই পড়ছি।

হঠাৎ দূরের একটা 'খেল' থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল। মেয়েলী কণ্ঠ। বস্তির মধ্যে কয়েকটা ঘর নিয়ে একটা 'খেল' হয়—অনেকটা গ্রামের পাড়ার মত।

ব্যাপার কী জানবার জন্য ভীম বাহাদুর একজন নাগা কুলিকে পাঠালেন। সে এসে যা খবর দিল তার অর্থ—একটা ছোট শিশু মরে যাচ্ছে। ওঝা ইয়াংমু স্বয়ং সেখানে বাচ্চাটাকে নিয়ে ভূতের সঙ্গে টানাটানি করছে। কিন্তু ভূতটা এতই ডাঙর (প্রকাণ্ড) যে ইয়াংমুর শক্তিতে বোধ হয় বেশীক্ষণ বাচ্চাটাকে আটকে রাখা সম্ভব হবে না। বাচ্চাটার মা-ও তা বুঝতে পেরেছে তাই কান্নাকাটি করছে।

বিচিত্র পরিবেশ—ততোধিক বিচিত্র পরিস্থিতি। একটা ছোট বাচ্চা মরে যাচ্ছে—কাছেই শিক্ষিত ডাক্তার ঔষধ নিয়ে বসে আছি। অথচ আমার করার কিছু নেই।

আমি ঐ কুলিটাকে দিয়েই আবার বলে পাঠালাম যে, আমি শুধু একটিবার বাচ্চাটাকে দেখতে চাই।

সে এসে খবর দিল যে, ইয়াংমু এবং বাচ্চার বাবার ঘোর আপত্তি, তবে বাচ্চার মা শুনে রাজী হয়েছে।

বাচ্চার মা রাজী শুনে আমি একটু ভরসা পেলাম। সুবেদার ভীম বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখানে তক্ষুণি উপস্থিত হলাম।

ছোট এক শিশু—বছর-দেড়েক বয়স হবে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় এক প্রকাণ্ড মানকচুর পাতার উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চাটার রীতিমত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তার মা পাশে বসে কাঁদছে, বাবা অদূরে বসে মধু খাচ্ছে এবং আর একটু দূরে ওঝা ইয়াংমু দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর এক-একবার আকাশের দিকে ডান হাত মুঠো করে ঘুসি মারছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বাচ্চাটার গায়ে হাত দিলাম! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল ইয়াংমু। আমি সভয়ে পেছনে সরে গেলাম। কিন্তু এর মধ্যেই বুঝলাম যে বাচ্চাটার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর।

এরই মধ্যে সেখানে কিছু লোক জমে গেছে। আমাদের সঙ্গের কুলিটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম ইয়াংমু কী বলছে।

সে বলল, ইয়াংমু বলছে যে বাচ্চাটাকে হাওয়া-ভূতে ধরেছে। ও বাঁচবে না। সে হাওয়াতে ভূতের গায়ে কিল মারছে, ভয়ও দেখাচ্ছে ভূতকে, কিন্তু ভূত কিছুতেই বাচ্চাটাকে ছেড়ে যেতে রাজী হচ্ছে না। এ-ছাড়া আমি কেন বাচ্চাটাকে ধরলাম। যদি ভূত চটে যায় তবে সে দায়ী হবে না।

এই বুঝি ব্যাপার? আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। সঙ্গে সুবেদার ভীম বাহাদুর থাকায় আমার সাহস অনেক বেড়ে গেল।

আমি বাচ্চাটার পাশে বসে তার বুকে স্টেথেস্কোপ বসালাম। দুর্বোধ্য ভাষায় ওরা ইয়াংসু চীৎকার করতে লাগল।

পরিষ্কার ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া কেস্। একে এখনই ঔষধপত্র না দিলে আজই মরবে। আমি ক্যাম্পে ফিরে এসে পেনিসিলিন্ ইন্‌জেক্‌শন তৈরী করে নিয়ে কোন কথায় কর্ণপাত না করে বাচ্চাটার শরীরে ইন্‌জেক্‌শন দিলাম। পাতার ওপর থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিলাম এবং উনুনের পাশে তাকে একটা কাঠের মাচার ওপর রাখলাম। বাচ্চার মা এ·ং তার বাবাও কিছুটা খুশী হয়েছে মনে হল।

আমরা এখানে দু'দিন থাকব। সুতরাং বাচ্চাটার অবস্থা কী দাঁড়ায় দেখে যেতে পারব। আমি দু' ঘন্টা পর পর তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যেতে লাগলাম। অন্যান্য ঔষধপত্রও সঙ্গে চলল।

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ শ্বাসকষ্ট কমের দিকে মনে হল। জ্বরও কমেছে।

পরদিন সকালে জ্বর ছাড়ল। কাশি এবং শ্বাসকষ্ট অনেক কম। বুকের অবস্থাও বেশ ভাল।

দ্বিতীয় দিনে একমাত্র কাশি ছাড়া অন্যান্য উপসর্গ প্রায় সম্পূর্ণ সেরে গেল। এর ফল হল অপ্রত্যাশিত। আমরা ন'টা নাগাদ রওয়ানা হব, সকালে দলে দলে লোক এল ঔষধ নিতে। যারা দুদিন আগে বলেছিল যে তাদের কোন অসুখ নেই, তাদের সবাই আজ একটা না একটা অসুখ বলে ঔষধ নিতে লাগল। দু'ঝুড়ি ঔষধ দু' ঘন্টার মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে গেল। এল না কেবল ইয়াংসু। পরে এ-ঔষধ বিলানোর প্রতিক্রিয়া কী হল আমি দেখে আসতে পারলাম না। তবে এরপর আমার স্বল্পকালীন নাগাহিল্‌স্-এ অবস্থানকালে দেখেছি, মিমির লোক মাঝে মাঝে দল বেঁধে এসে ঔষধ নিয়ে যেত।

মিমির কাজ শেষ হয়েছে। আমরা রওয়ানা হব। সবাই তৈরী হয়ে গেছি। শেষ মুহূর্তে এল সেই বাচ্চাটার বাবা ও মা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে। দু'টি পাহাড়ী মানুষের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ। দু'টি মুরগীর বাচ্চা এনেছে ওরা আমার জন্য। মুহিমং বলল, ওরা জিজ্ঞেস করছে কবে আবার আমরা আসব।

কবে আসব? এ প্রশ্নের উত্তর দিই কী করে? মনের এক অস্থির তাড়নায় চলে এসেছিলাম নাগা-পাহাড়ে। এর পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না। সুতরাং নাগাপাহাড়ে বেশীদিন থাকব না এটা ঠিক। আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে কোন্ অজানা ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, কে জানে। মানুষ ভাবে এক এবং হয় আর। মায়ের মৃত্যু যদিও বা অপ্রত্যাশিত ছিল না, বাবার মৃত্যু যেন এক নিমেষে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত পরিকল্পনাকে ওলটপালট করে দিল। মা দীর্ঘ-দিন ধরে পা পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাবার মৃত্যু এতই আকস্মিক যে তা মুহূর্তে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ছককে অস্পষ্ট করে দিল। প্রাচীন অধ্যাপকের কণ্ঠ আমার কানে বাজছে, 'তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে কার্দার্‌স্টাডি করবে বলে তার কী হবে?'

কী হতে চেয়েছিলাম, আর কী হতে চলেছি কে জানে।

গাঁওবুড়োদের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার বাবা ও মা বেশ খানিকটা রাস্তা আমাদের সঙ্গে এল। যতদূর দেখা গেল, পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকালাম। হ্যাঁ, আসব —সত্যি আবার আসব যদি আমি এখানে থাকি।

দুর্গম অরণ্য, ভয়ঙ্কর গিরিখাদ, উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত গিরিনির্ঝরিণী অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি। কয়েক মাসের মধ্যেই আমি পাহাড়ী রাস্তায় চলতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পায়ে হাঁটার পরিশ্রমে শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমে যাচ্ছে। আমার বুকের ক্ষমতাও এখন অনেক বেশী, চড়াই-উৎরাই ভাঙতে এখন আর চট করে হাঁপিয়ে পড়ি না।

নিবিড় বনভূমি সিপাইদের বুটের শব্দ এবং কুলিদের হল্লোড়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। চারদিকে পর্বত আর পর্বত। চলতে চলতে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা বুঝি শুধু

পর্বতময়। অন্তহীন পর্বতমালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন অন্ত কিছু কল্পনাই করা যায় না।

হাতের ডানদিকে পাতকৈ পর্বতশ্রেণী। দূরের এক বিশাল টিলার দিকে তাকিয়ে মুহিমং এবং অন্ত নাগা কুলিরা প্রণামের ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করল। মুহিমংকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল যে ওখানে সর্পদেবতা থাকেন। তাকে ওরা প্রণাম করছে।

সর্পদেবতা। মুহিমং যা বলল, তার অর্থ, ওখানে ভয়ঙ্কর বিষধর প্রকাণ্ড এক সাপ থাকে। তার মাথায় নাকি হাজার মণির জ্যোতি। সর্পদেবতা গর্জন করলে চারপাশের বনভূমি কাঁপতে থাকে। নিজের আস্তানা তৈরী করার জন্ম সর্পদেবতা নাকি ছোবল দিয়ে ওই প্রকাণ্ড টিলাকে দু' ফাঁক করেছেন।

ভাল করে তাকালাম। প্রকাণ্ড টিলার গায়ে বিশাল এক ফাটল। ভূমিকম্প বা অন্ত কোন কারণে হয়ত টিলার গায়ে অমন ফাটল হয়েছে। যে কারণেই ফাটল হোক, ওখানে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প থাকা বিচিত্র নয়।

আমিও সেই সর্পদেবতার উদ্দেশে প্রাণাম করলাম। আমার দর্শন বলে, দেবতার জাতি নেই, ধর্ম নেই, রূপ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং অরূপ। সাপ, ব্যাঙ, পশু, পক্ষী, মানুষ—যে রূপেই আমরা তাঁকে কল্পনা করি, বা আরাধনা করি, তা একই ব্রহ্মে পৌঁছয়। গীতার বাণীতে আমার বিশ্বাস আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

যেভাবে যাহারা আমার ভজনা করে, হে অর্জুন! সেভাবে তাদের দয়া করে থাকি। লোকে সকল রকমেই আমার পথে চলে থাকে। অন্ত দেবতার সেবা করলেও প্রকৃতপক্ষে আমারই সেবা করে থাকে।

বাবা বলতেন, আত্মা মানে শক্তি—তা জীবাত্মাই হোন আর পরমাত্মাই হোন। একটি কোণের দু'টি বাহু যেমন এক বিন্দুতে মিলিত হয়, তেমনি জীবাত্মা এবং পরমাত্মা শেষ পর্যন্ত একাকার হয়ে যান। জীব মাত্রেই শিবের অধিষ্ঠান। সুতরাং সাপের মধ্যে ভগবান্‌কে কল্পনা করে যদি কেউ তা'কে প্রণাম করে, তবে তা সেই পরমব্রহ্মের কাছেই পৌঁছবে।

সর্পদেবতার পাহাড়কে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। এতক্ষণ পূর্বউত্তর দিকে চলছিলাম। এখন রাস্তাটা বাম দিকে ঘুরেছে। সুতরাং আমরা পশ্চিম দিকে চলছি। সর্পদেবতার পর্বত এখন আমাদের পেছন দিকে রইল।

আমরা এবার ঢালুর দিকে নামছি। কঠিন প্রস্তরের গায়ে পা রেখে আমরা খুব সাবধানে চলছি। অরণ্য এখানে খুব গভীর নয়। দু'পাশে আমলকীর বন। জুন মাস—গাছে আমলকী নেই।

সামনে মিনিক নদী। তার অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছে। হাওয়ায় দু'পাশের আমলকী বন কাঁপছে।

মিনিক নদীতে পৌঁছে সবাই বড় বড় পাথরের টুকরোর ওপর বসে পড়ল। সিপাইরা চা তৈরী করতে লেগে গেল।

নদী থেকেই মিনিক টিলা শুরু হয়েছে। নদীতে বসে মিনিক টিলার দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। ওই ভয়ঙ্কর চড়াই ভেঙ্গে আমাদের টিলার মাথায় উঠতে হবে। ওখানে একদা একটা সমৃদ্ধিশালী বস্তি ছিল। ওখানে পৌঁছাতে আমার কৌতূহলের সীমা নেই।

মিনিক টিলার ওপরটা বেশ সমতল। বুঝা যায় এক সময়ে এখানে মানুষের বসতি ছিল। এখন গভীর জঙ্গলে ঢাকা। আমি ঘুরে ঘুরে চারদিক্ দেখছিলাম। ভীম বাহাদুর তাড়া দিলেন। ভীম বাহাদুর জানেন না, কিন্তু আমি জানি এ টিলার সঙ্গে প্রেম ও প্রতিহিংসার এক নির্মম উপাখ্যান জড়িয়ে আছে।

মিনিক টিলাকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম। সামনে সলোমি বস্তি। আজ আমরা সলোমিতে থাকব।

সলোমি মস্ত বড় বস্তি—প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। সলোমির লোকেরা অতীত দিনের অনেক বীরত্বের নিদর্শন এখনো ধরে রেখেছে। বস্তির প্রবেশ পথে লম্বা বাঁশের মাথায় এখনো দু'টো নরমুণ্ডের মালা ঝুলছে। এখন আর মুণ্ডশিকার হয় না। মুণ্ডশিকার এখন আইন-বিরুদ্ধ। সলোমির লোকেরা তাই অতীতের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সলোমিতে আমরা একদিন রইলাম। ভীম বাহাদুর তাঁর নিজের কাজকর্ম করলেন। আমি ঔষধ বিলোলাম বস্তিতে।

সলোমির পরেই পুংরো। সলোমি থেকে পুংরোর ঘরবাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়। সমস্ত পুংরো টিলাটা পাইন ও ধূপগাছে ঢাকা। তার মধ্যে সাদা টিনের ঘরবাড়ী ছবির মত সুন্দর। সলোমি থেকে পুংরো স্পষ্ট দেখা যায় বটে, কিন্তু সলোমি থেকে পুংরোর দূরত্ব প্রায় পনের মাইল। ভালয় ভালয় পুংরোতে পৌঁছতে পারলে তুয়েনসাং জেলার সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল আমার দেখা হয়ে গেল। একটা এড্‌ভেঞ্চারই বটে। মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

আমরা যখন সলোমি টিলার গা বেয়ে নামছি, তখন হঠাৎ আমার মাথা ব্যথা শুরু হল। প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যথা বাড়তে লাগল। সঙ্গে বেদনা-নিগ্রহ বড়ি ছিল। তা খেলাম, কিন্তু উপশম কিছুই হল না। ব্যথা বাড়তে লাগল এবং ব্যথা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটাই যেন গুলিয়ে উঠতে লাগল। অত্যন্ত তীব্র একটা অনুভূতি যেন মাথা থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে এগুচ্ছি। বেশ বুঝতে পারছি, আমার শরীরের ভেতর একটা বিপর্যয় চলছে। আত্মীয়-বন্ধু-বিবর্জিত এই দুর্গম পর্বতে নিজের কথা ভেবে চিন্তিত হলাম। যদি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ি, যদি পুংরো পর্যন্ত না পৌঁছতে পারি তবে কী হবে।

সলোমি টিলা একটা ছোট নামগোত্রহীন পাহাড়ী নদীতে নেমে শেষ হয়েছে। এখান থেকে শুরু হয়েছে পুংরো টিলা। পুংরো টিলার এদিকটা ভয়ঙ্কর রকমের খাড়া। অথচ, সলোমি থেকে পুংরো যেতে হলে এ পথে যেতেই হবে।

সিপাইরা চা খাচ্ছে। আমি একটা বড় পাথরের আড়ালে কপালের দু'পাশের রগ দু'টোকে চেপে ধরে বসে রইলাম। বিন্দুমাত্র শব্দে আমার মাথার ভিতরে ঝনঝন করে উঠছে।

মুছিমং পাশে এসে বসল। তাকে কপাল টিপে দিতে বললাম। কিন্তু ব্যথা একটুও কমল না। মুছিমং চা এনে দিল। চা মুখে দিতেই সমস্ত মুখটা বিস্বাদে ভরে গেল। চা ঢেলে মাটিতে ফেলে দিলাম।

সঙ্গে ঔষধ বিশেষ কিছু নেই। প্রায় সমস্ত ঔষধ মিমি এবং সলোমিতে বিলিয়ে এসেছি।

সবাই রওয়ানা হল। আমি মুছিমং-এর কাঁধে ভর করে আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। মনে হচ্ছে চারপাশে যেন পৃথিবী টলছে।

আমার অবস্থা দেখে ভীম বাহাদুর প্রস্তাব করলেন, চারজন সিপাই বা কুলি আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি রাজী হলাম না। যতক্ষণ হুঁশ আছে, ততক্ষণ আমি নিজেই হেঁটে যাব।

আমার কপাল ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে। আমি কিসের ওপর দিয়ে চলেছি জানি না। কঠিন পর্বতকে যেন ডানলোপিলোর গদির মত মনে হচ্ছে। চারপাশের গাছপালা, নদী, পর্বত যেন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার চারদিক্‌ ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছে।

আমার শরীরের প্রায় পুরো ভারটাই মুছিমং-এর ওপর। মুছিমং এতে অখুশী নয়। কিন্তু একটা বালকের ওপর আমার শরীরের পুরো ভর দিতে আমারই খারাপ লাগছে। অথচ নিজের শক্তিতে আমি যে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছি না।

ডান হাতে বাঁ হাতের নাড়ী দেখলাম। নাড়ীর গতি

অস্বাভাবিক দ্রুত। মনে হল জ্বরও এসেছে। বগলে থার্মোমিটার দিলাম। তাপ ১০৩° ডিগ্রী।

আমার গলা ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে। জলের ব্যাগ থেকে মুখে জল দিলাম। কিন্তু জল যে এত বিস্বাদ হতে পারে, এর আগে কোনদিন বুঝিনি। বুঝলাম, আমার স্বাদের অনুভূতিই নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার ব্যথা এক বিচিত্র ঢেউ তুলে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তার প্রতি তরঙ্গে আমার অনুভূতি এবং চেতনা যেন একটু একটু করে লোপ পাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি আমি তলিয়ে যাচ্ছি এক অনন্ত অতল গহ্বরে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি ওপরে উঠবার, কিন্তু পারছি না। আমি যেন চোরাবালিতে পা দিয়েছি।

আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছে। মুছিমংকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পুংরো আর কত দূর?'

মুছিমং বলল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি।'

কম্পাউণ্ডার জর্জের গলা শোনা গেল। জর্জ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এসেছে।

আমার অবস্থা দেখে জর্জ ঘাবড়ে গেল। আমি অতি কষ্টে বললাম, 'ডঃ পালিতকে ক্লাশ সিগন্যাল কর যে, আই এ্যাম অন দি ভার্জ অফ ডেথ্।'

জর্জ ও মুছিমং আমাকে দু'দিকে ধরে কোনও রকমে নিয়ে এল। আবছা মনে পড়ে, মুছিমং কুলির ঘাড় থেকে আমার বিছানা নামিয়ে খাটের ওপর পেতে দিয়েছিল। তারপর আর কিছুই জানি না। অন্ধকার—চারদিকে শুধু অন্ধকার।

আমি অনন্ত অতল গহ্বরে পুরোপুরি তলিয়ে গেলাম।

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

॥ পনেরো ॥

কিন্তু এ-চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে। ইংলণ্ডে যখন আমি প্রথম যাই কেম্ব্রিজে ট্রাইপস পরীক্ষা দিতে, তখন (১৯১৯-২১) আমি বলিষ্ঠ নওজোয়ান, যুক্তির জয়গানে মুখর, মন নিঃসংশয় যে, "বিশ্বজনীন যুক্তি"কে খুঁজলে পাওয়া যাবেই যাবে এবং মানুষ স্বভাবে যুক্তিপন্থী। এককথায়, যুক্তির নির্দেশে চললেই জগতের ও জীবনের সব সমস্যার চমৎকার সুরাহা হবেই হবে। এ-বিশ্বাস সে-যুগে রাসেলেরও ছিল যিনি ছিলেন বুদ্ধিপূজারী যুক্তিবাদী-দের অবিসংবাদিত সম্রাট্—যাঁর নামডাক এ-যুগের বুদ্ধিমন্তদের মধ্যে আজও অচল-প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনে তিনিও দেখতে পেয়েছিলেন যে, মানুষ শুধু যে যুক্তির পথে চলে না তাই নয়, জীবনের লক্ষ্য কী বা বাঞ্ছিত সম্পদ্ কাকে বলে সে-সম্বন্ধেও যুক্তির কিছুই বলবার নেই। বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভারী মজার: "যদি আমি উড়ে নিউইয়র্কে যেতে চাই তাহলে যুক্তি আমাকে বলে ইস্তাম্বুলের বিমান না নিয়ে নিউইয়র্ক-মুখী বিমানে চড়াই ভালো, এর বেশী যুক্তি পারে না।" (Human Society in Ethics and Politics-এ ভূমিকা।) অপিচ, তিনি শেষ জীবনে দারুণ মাথা-বকানো শুরু করে দিয়েছিলেন—বুদ্ধি দিয়ে আমরা কোনো নৈশ্চিত্যে পৌঁছতে পারি কি না, যাকে জ্ঞান বলে বরণ করি সে সত্যি জ্ঞান, না আমাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়। তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেছেন: "জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, আমাদের কোনো জ্ঞান আছে কি না বলা কঠিন, এমনকি আমাদের যে জ্ঞান আছে সেটা জানাও কঠিন।"* তিনি আরও বলতেন শেষের দিকে যে, উদ্‌ভ্রান্ত জগতে এমন কোনো নীতি বা যুক্তির পাঠ দেওয়া যায় না যাতে জগতে সব জাতের মনই এক জোটে সায় দিতে বাধ্য। যদুবাবুর কাছে যা ভালো মনে হয় মধুবাবুর তাতে ঘোর আপত্তি, বিধুবাবুর কাছে যা সুন্দর সিধুবাবুর কাছে তা কুৎসিত, সাধুবাবুর কাছে যা দুষ্য মাধুবাবুর কাছে তা পোষ্য...ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের যৌবনে—যখন তাঁকে আমরা বুদ্ধিমত্তম দিশারি বলে বরণ করেছিলাম সে-সময়ে—তাঁর সন্দেহ এত বলীয়ান্ ছিল না। তিনি একটি প্রবন্ধে একবার লিখেছিলেন যে, যত বয়স বাড়ে ততই জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ বেড়েই চলে, ফলে আগে যেসব বিষয় সম্বন্ধে বলতেন "জানি বৈকি," পরে ক্রমশই বলতে বাধ্য হন—"কে জানে?" তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন:

"So what is the use of running down faith which after all gives something to hold on to amidst the contradictions of an enigmatic universe? If one can get at knowledge that knows, it is another matter, but so long as we have only an ignorance that argues,—well, there is a place still left for faith—even faith

* "Many difficult questions arise in connection with knowledge. It is difficult to define knowledge, difficult to decide whether we have any knowledge, and difficult, even if it is conceded that we sometimes have knowledge, to discover whether we can ever know that we have knowledge in this or that particular case."

(Truth & Falsehood...... Basic Writings of Bertrand Russell)

may be a glint from the knowledge that knows, however far off, and meanwhile there is not the slightest doubt that it helps to get things done. There's a bit of reasoning for you!— Just like all other reasoning too, convincing to the convinced, but not to the unconvincible, that is, io those who don't accept the ground upon which the reasoning dances. Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else."

(ভাবানুবাদ: "তাই বিশ্বাসকে অনর্থক নিন্দা করে লাভ কী—যখন দেখা যাচ্ছে এ-দুর্বোধ্য জগতের নানা স্ববিরোধী জটলার মাঝে বিশ্বাস অন্ততঃ ধ'রে দাঁড়াবার একটা খুঁটি জোগাতে পারে। যদি এমন জ্ঞানে পৌঁছনো যায় যে সত্যি জেনেছে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা; কিন্তু যতদিন শুধু অজ্ঞানই উড়ো তর্ক করতে কোমর বাঁধবে ততদিন বিশ্বাসের মর্য্যাদা থাকবেই থাকবে—এমন কি, বিশ্বাস হ'তে পারে যথার্থ প্রজ্ঞার একটি রশ্মি—সে প্রজ্ঞা যতই সুদূর হোক না কেন। শুধু তাই নয়, হাজার গণ্ডগোলের মধ্যেও বিশ্বাসের জোরে অনেক কিছু যে সুসম্পন্ন করা যায় এ-কথার মার নেই। এই দেখ, তোমার কাছে এক পশলা যুক্তি বর্ষণ করলাম —হুবহু অন্য নানা যুক্তির মতনই—অর্থাৎ বরণীয় কেবল তাদের কাছে যারা মানে, তাদের কাছে নয় যাদের কোনোমতেই বিশ্বাস করানো যায় না—এককথায়, যারা যুক্তির নাটদুয়ারকেই বরণ করতে নারাজ। খতিয়ে, ন্যায়শাস্ত্র মনের গোনাগুন্তি নাচের বোল ছাড়া আর কী?"

অপিচ—লিখছেন শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে—যুক্তি কিছুতেই সন্ধানী মানুষকে নিত্যদিশা দিতে পারে না, কেননা—

A million faces wears her knowledge here
And every face is turbaned with a doubt.
All is now questioned, all reduced to
nought.

অর্থাৎ

যুক্তি পায় যে-জ্ঞানের আভাস—অর্বুদ মুখ তার,
প্রতি শিরে রাজে যার সংশয়ের ছায়ার মুকুট;
সবই তাই অনিশ্চিত—শূন্যবাদ যার পরিণাম।

রাসেলের Truth and Falsehood নিবন্ধ থেকে যে-উক্তিটি দিয়েছি তা থেকে কি শ্রীঅরবিন্দের এ-সিদ্ধান্ত ষোল আনা মঞ্জুর হয় না?

॥ ষোল ॥

বুদ্ধি যুক্তি তর্ক দিয়ে ভগবানের নাগাল পাওয়া যায় না এ-কথা আমি যে আদৌ জানতাম না তা নয়। মহাভারতে পড়েছিলাম: "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তাং ন তর্কেন সাধয়েৎ"—অর্থাৎ অচিন্ত্য ভাবরূপ তর্কের চৌহদ্দির বাইরে। কিন্তু বিলেতের আবহাওয়ায় সে-সময়ে ছড়িয়ে ছিল বুদ্ধি তর্ক যুক্তির কৌলীন্যে গভীর শ্রদ্ধা। বুদ্ধিবাদীরা তখন মনে করতেন না যে, বুদ্ধির উদূখল দিয়ে সত্যের বহরকে মেপে পাওয়া যায় না, যেমন যশোদা পাননি কৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়ে—যতই উদূখল জোড়া দেন একটু কম প'ড়ে যায়। ভাগবতের এ-উপমাসমৃদ্ধ কথিকাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু তবু এসব নিষেধকে মনে হত সেকেলে। দেশ-কালের প্রভাব কাটানো কঠিন। বুদ্ধি তর্ক যুক্তির এখনো সবচেয়ে বেশি আদর। আমরা হলাম (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) "sons of an intellectual age"। তাই কেমন ক'রে সত্যি মনে ঠাঁই দেব যে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর?

কেম্ব্রিজের আবহাওয়ায় খাঁটিতে আরো যেন বিশ্বাসে অবিশ্বাস এসে গেল। তাই সময়ে সময়ে বিমর্ষ হয়ে পড়তাম যখন দেখতাম, বুদ্ধিবিচারের মারফৎ মনে শান্তির ছিটেফোঁটাও আসে না। তাই তো সাধু সুন্দর সিং খৃষ্টের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী শান্তি পেয়েছিলেন, শুনে মন আমার কেন বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। মীরার একটি গান মনে আসছে: "রাম সিমর সব পায়ো রী মৈঁ, রাম বিসর সব খোঈ"—অর্থাৎ ঠাকুরকে মনে রাখলে সবই পাওয়া যায়—ভুলে থাকলেই সব হারাতে হয়। শ্রীমা সারদামণিও বলেছিলেন: "শুধু ঠাকুরকে সদাসর্ব্বদা মনে রাখলেই সব হবে, সব পাবে বাবা।"

কিন্তু এ-ই তো মুশকিল। বিশেষ করে ওদেশের প্রাণচঞ্চল ধ্বনিলোকে ঠাকুরকে সদাসর্ব্বদা মনে রাখা কি চারটিখানি কথা? ওদেশে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে চিত্তবিক্ষেপের অন্তহীন হাতছানি—বন্ধু-বান্ধব, গান-বাজনা, খেলা-ধূলো, অজস্র সংবাদপত্র, থিয়েটার, সিনেমা, সর্বোপরি মোহিনীদের মোহ। এ-মোহ কেমন করে মানুষকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসে তার একটা দৃষ্টান্ত দেই।

সুভাষের সঙ্গে থাকলে কোনো কিছুই আমাকে পাকে ফেলতে পারত না। কিন্তু সে তো নানা ছুটিতে যেত আয়র্লণ্ডে বা জর্মনিতে শিনফেন ও ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসতে। সেবারও কোথায় গিয়েছিল—আয়র্লণ্ডেই হবে—শিনফেন চক্রের নিমন্ত্রণে। আমাকে বলল লণ্ডনে রাসেল স্কোয়ারে কোনো বোর্ডিং হাউসে থাকতে—কেননা রাসেল স্কোয়ার বৃটিশ ম্যুজিয়মের খুব কাছে। বলল: "কবে জর্মন পড়ো দিলীপ। ভাষায় তোমার একটা সহজপটুতা আছে, বৃটিশ ম্যুজিয়মও একাগ্রপাঠের অনুকূল," ইত্যাদি।

বৃটিশ ম্যুজিয়মে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে সানন্দেই পড়তাম কিন্তু জর্মন ব্যাকরণ নয়—পড়তাম ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, রোলাঁ, মপাসাঁ (ফরাসীতে)......... ইত্যাদি। যতদূর মনে পড়ে এই সময়েই রোলাঁর নানা আদর্শবাদী নাটকও পড়েছিলাম এবং টলস্টয়ের নানা চমৎকার ধর্মীয় গল্প।

কিন্তু বৃটিশ ম্যুজিয়মে কতক্ষণ মানস সংস্কৃতির উন্নয়নের সাধনা করা যায়—বিশেষ লণ্ডনে যেখানে আমি নানা সংসদে গান গেয়ে 'পপুলার' হয়ে উঠেছিলাম? তাছাড়া হ্যাম্পস্টেড হীথ, কিউ গার্ডেন, রিজেন্ট পার্ক... আরও কত কী মনোরম পরিবেশে আনন্দ পেতাম—কত নতুন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হ'ত—বলার জো কি বৈরাগ্যের সুরে: "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা।"

এবার হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমার গৃহকর্ত্রীর এক "তন্বী গৌরী শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" আমার দিকে নেকনজর দিচ্ছেন। আমি রাসেল স্কোয়ারে বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে পিয়ানোয় গাইতাম তো—হঠাৎ এ সুন্দরী তন্বী আমার গানের অনুরাগিণী হয়ে উঠলেন। ক্রমশঃ তিনি আমার সঙ্গিনী হয়ে যেতেন এখানে ওখানে আমার গান শুনতে। অতি সুভদ্রা—আচরণে পান থেকে চুনটি পর্য্যন্ত খসে না—তাঁর সঙ্গও স্বাদুও মনে হত বৈকি।

কিন্তু ক্রমশঃ আবিষ্কার করলাম যে, শুধু তিনিই আমার দিকে ঝুঁকছেন না, আমার মনেও বেশ একটা আবেশ জেগে উঠছে শনৈঃ শনৈঃ।

সেখানে ছিলেন আমাদের কেম্ব্রিজের একটি প্রবীণ মুসলমান ছাত্র। তিনি আমার হাত থেকে তন্বী গৌরীকে কেড়ে নিয়ে যেতেন থিয়েটারে, সিনেমায়, অপেরায়।

দিন সাত-আট পরে আমার নিজের মন বেশ এক? দুলে উঠতে শুরু করল, যখন আমার মুসলমান বন্ধুটি তাঁকে হাতিয়ে নিয়ে উধাও হত।

আমাদের মধ্যে ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন দূষ্য কিছু ঘটে নি। কিন্তু তন্বীর হাসি ঠাট্টা খোঁচা কটাক্ষ সবং আমাকে উস্কে দিত। ফলে আমিও তাঁকে থিয়েটার ও অপেরায় নিয়ে যাওয়া শুরু করলাম। সুভাষের ধমক উপেক্ষা করে যে "আগুন নিয়ে খেলা কোরো না।" রাসেল স্কোয়ারে আরো অতিথিরা (paying guest) বলাবলি করত—আমার কানে আসত। কিন্তু আমি গ্রাহ্যও করতাম না।

এমন সময়ে একদিন তন্বী এসে বললেন আমাকে যে মুসলমান ভদ্রলোকটি তাঁকে বিবাহ করতে চান। আমি চমকে উঠলাম কারণ আমি শুনেছিলাম তিনি বিবাহিত কিন্তু তন্বীকে কিছু বললাম না, মনে জপতে লাগলাম সুভাষ যেন এসে পড়ে—ঈর্ষা তখন আমার মনকে কালো ক'রে দিয়েছে—ভাবের ঘরে চুরি করি কী ক'রে? প্রাণপণে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম।

ঠাকুর প্রার্থনা শোনেন—এ আমি বহুবার দেখেছি। ঠিক এই সময়েই কি সুভাষ ফিরে এল [illegible]। আমাকে

টেলিফোন করতেই আমি ছুটে গিয়ে তাকে বললাম সব কথা। তার উজ্জ্বল মুখ মেঘলা হয়ে এল, সে বলল: "এ-পরিবেশে তোমার থাকা চলবে না। চলো আমার সঙ্গে কেম্বিজে ফিরে। বলি নি তোমাকে—আগুন নিয়ে খেলা নয়?"

আমার মন একটু ঘা খেলেও রাজী হলাম তৎক্ষণাৎ। সুভাষ ডাকছে, রাজী না হয়ে উপায় আছে?

কিন্তু কেম্বিজে ফিরতে হ'ল না। গোল্ডার্স গ্রীনে আমার পিতৃবন্ধু লোকেন কাকার বিধবা মেম স্ত্রী মেবেল পালিত ছিলেন স্বামীর রম্য নিলয়ে। তিনি আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি বললাম তাঁকে সুভাষের কথা। তিনি সাগ্রহে বললেন: "সুভাষ লণ্ডনে? বেশ হয়েছে—সে থাকবে মিস্টার ডাট্-এর অতিথি, তুমি আমার।"

শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত যুদ্ধের সময় জর্মনিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়ে ১৯১৯ সালে ইংলণ্ডে ফিরে আন্টির রম্য নিলয়ের নীচের তলায় ছিলেন সপরিবারে—স্ত্রী, একটি মেয়ে (বয়স ছয় বৎসর) ও একটি ছেলে (চার বৎসর)। সুভাষ শরৎবাবুকে গভীর শ্রদ্ধা করত আরো এইজন্যে যে, তাঁর কাছ থেকে সে জর্মনদের নানা গুণের পরিচয় পেয়ে বিশেষ লাভ করেছিল। আমি তাঁকে আন্টির ব্যবস্থার খবর জানাতেই তাঁর সে কী উৎসাহ!—"সুভাষ আমার অতিথি হবে, তার ওপর রসিক গায়ক দিলীপ উপর তলায়! গাও দিলীপ, শুধু গেয়ে চলো তোমার পিতৃদেবের গান: 'আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে'।" এ-গানটি আমি সে-যুগে বিলেতে প্রায়ই গাইতাম।

মন থেকে হ'টে গেল তন্বী-গৌরীর স্মৃতি। রশির টানের সঙ্গে সুতোর টান পেয়ে উঠবে কেমন ক'রে? কিন্তু মুশকিল বাধল প্রথমটায় সুভাষকে নিয়ে। সে বলল: "শরৎবাবুর চাকরাণী নেই, তাঁর স্ত্রী একাই সংসার চালান দুটি সন্তানকে নিয়ে..." ইত্যাদি। কিন্তু আন্টিও নাছোড়বান্দা, বললেন: আমরা থাকব একান্নবর্তী পরিবারের মতন—উপর নিচে একাকার—খাওয়া-দাওয়া হবে কখনো নীচের তলায় দত্ত-গৃহিণীর টেবিলে, কখনো উপর তলায়—আন্টির তদারকে। তার উপর আমিও ধরলাম: "খুব ক'রে গান শোনাব সকাল-সন্ধ্যা।" সুভাষ হেসে বলল: "ব্যস, আমার হার, তোমাদেরই জিৎ।"

সত্যিই সে-আনন্দ ফলিয়ে বলবার ভাষা পাই না। সুভাষ প্রথম প্রথম একটু গম্ভীর হয়ে থাকত। কিন্তু ক্রমশঃ আন্টির গল্পে, আমার গানে—সর্বোপরি শরৎবাবুর রসিকতায় তার কুণ্ঠা কেটে গেল। তখন কেবল অনাবিল আনন্দ আর আনন্দ! কেবল দুঃখ এই যে, সে-পরমানন্দের মাত্র তিন-চার সপ্তাহের মেয়াদ! —শেলির খেদ মনে পড়ত:

"How rarely comest thou, O spirit of delight!"

বিলেতে এই প্রথম (এক বৎসর পরে) সুভাষ থিয়েটার দেখল। একদিন আমি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম (আন্টি ও দত্ত-দম্পতীরও টিকিট কিনে) গলসবাদির Skin Game দেখতে। সুভাষের খুব ভালো লেগেছিল নাটকটি। আর একদিন আন্টি আমাদের সকলের টিকিট কিনে (শরৎবাবুর দুই ছেলে-মেয়েরও) নিয়ে গেলেন সবাইকে বিখ্যাত প্রহসন Charlie's Aunt দেখতে। আজও মনে পড়ে, প্রহসনটি দেখে সুভাষের সে কী প্রাণখোলা হাসি! আমি অন্যত্র লিখেছি—সুভাষের মুখ সচরাচর দেখাত "মেঘ-গম্ভীর" —বলতেন শরৎবাবু সহাস্যে। কিন্তু শরৎবাবুর নানা রসিকতায় সে যখন হেসে গড়িয়ে পড়ত—তখন তাকে মনে হত যেন ঠিক একটি শিশু! হাসলে কী যে সুন্দর দেখাত তাকে—আজও মনে দুঃখ জাগে যে অমন হাসি আর দেখতে পাব না! বিশেষ ক'রেই Charlie's Aunt-এ পুরুষের মেয়ে সাজা দেখে সুভাষের হাসি ছিল অবিস্মরণীয়। তার হাসির ছোঁয়াতে আমাদেরও হাসি হয়ে উঠত আরো বাঁধভাঙা।

কিন্তু শুধু হাসিই নয়। সবচেয়ে দীপ্যমান ছিল তার ব্যক্তিরূপ—radiant personality; আমাদের যুগপুরুষে (generation) এমন ব্যক্তিরূপ আমি দেখি নি। তার সহজাত পবিত্রতা ও ঐকান্তিকতার কবচ-

কুণ্ডল তারে বিবস্বান্ করে তুলত। এ শুধু আমার মতন সুভাষ-ভক্তের কথা নয়, লণ্ডনে নানা সাহেব-মেমও তাকে দেখে বলত : "There is a light on his face!"

আমাদের বুকের মধ্যে যেন একটা উল্লাসের জ্যোতি জেগে উঠত' চোখেও যার আভা ফুটে বেরুত। তাই সুভাষ যখন খাওয়ার পরে আমার ও দত্তজায়ার সঙ্গে বাসন-কোশন ধুতে প্রস্তুত—আমরা বলতাম, "না না,তুমি বাসন ধোবে এ কি একটা কথা হ'ল?" শরৎবাবু হেসে বলতেন : "না সুভাষ, এরা সবাই চায় তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে শুধু আলো ছড়াও, আর আমরা গদ্গদ হয়ে উঠি।" আর্টিও হাসতেন মন খুলে, তবু বলতেন : "আমার মেড-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি সুভাষ।" সুভাষ বলত : "আপনারা সবাই মিলে আমাকে এমন বিব্রত করলে আমাকে পাততাড়ি গুটোতে হবে কিন্তু।" তখন সবাই রাজী হতে বাধ্য হ'ত। এমনি ছিল তার স্বভাব। যেখানে সে থাকত সেখানেই তার চারদিকে একটা সহজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে তৃপ্তি ও দীপ্তির ভাব ফুটে উঠত যে-আবহে নির্মল রসিকতার স্থান থাকলেও প্রগল্ভতাকে দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রেই বিদায় নিতে হ'ত। সকলের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে সে পারত না আমার বা সুরবর্দির মতন, কিন্তু তাব'লে তার প্রীতির পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল না। তবে তার প্রীতি পেতে হলে একটু উচ্চতর স্তরে উঠতে হত। সুভাষের উপস্থিতিতে আমরা অনেকে অনুভব করতাম এই উচ্চতর স্তরের টান—কিন্তু ডিক্টেটরের টান নয়, মহৎ বন্ধুর, পথিকৃৎ-এর টান—যে-টান আমাদের নিচুটান তথা পিছুটান থেকে মুক্ত করতে চাইত। তাই বেশ মনে আছে অনেকেই সুভাষের সামনে একটা বাধার মতন অনুভব করত যার সাহেবী নাম constraint—যে-বাধা অপসৃত হ'ত সে প্রস্থান করলেই, তখন আমরা নিম্নতর স্তরে নেমে যেন বলতাম 'আঃ!' মনকে উঁচু সুরে বাঁধা তত কঠিন নয় যত কঠিন সে-সুরকে বজায় রাখা। তার এই সহজাত শক্তি শিখরচারী হয়েছিল চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে, যখন সে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী ("ঝাঁসির রাণী" চমূর নিয়ন্ত্রী) মাদ্রাজে আমাকে বলেছিলেন তার এই দীপ্ত ব্যক্তিরূপের কথা যার সামনে জর্মন ও জাপানের সেনানীরাও মাথা নোয়াত। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম সুভাষের জর্মন ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দেওয়ার কথা।

কিন্তু লণ্ডনেই তার এ-মহিমশক্তির প্রথম স্ফুরণ হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ফলে তার দীপ্তির পরিমণ্ডলে যে কী আনন্দে আমাদের দিন কাটত তা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাই না—কথাবার্তা, তর্কাতর্কি, হাসিগল্পের মাঝেও সুভাষ আসীন থাকত তার তুঙ্গ স্বরূপের প্রভালোকে—"স্বে মহিম্নি"—জ্বলত যেন অন্ধকারে স্বয়ংপ্রভ মণির মত—ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করে।

নানা ভারতীয় ছাত্রই আসত সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে—কেম্ব্রিজের, অক্সফোর্ডের, গ্লাসগোর, ম্যাঞ্চেস্টারের...। একদা শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এসে হাজির। সুভাষকে বললেন তিনি : "দিলীপ চলে আসার পরে আমি রাসেল স্কোয়ারে সেই বোর্ডিংটিতে যাই। গিয়ে শুনি—সেই মুসলমান প্রবীণটি গায়েব হয়েছেন গৃহকর্ত্রীর সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে। মা-র সে কী কান্না...।"

শুনবামাত্র বুকে আমার উচ্ছ্বাসের বান ডেকে গেল, মনে পড়ল স্বামী ব্রহ্মানন্দ কী বলেছিলেন আমার মাতামহকে—যে, তিনি সমাধিতে দেখেছেন "ঠাকুরের কৃপা দিলীপকে ঘিরে আছে। ভয় নেই প্রতাপবাবু, ও ছেলে মেম বিয়ে করবে না।" সেদিন রাতে আমি কথামৃত খুলে ঠাকুরের ছবির সামনে ধ্যানে বসলাম—মনে বল, চোখে জল, প্রাণে ভক্তি। অন্তরে কৃতজ্ঞতার বান ডেকে গেল। ঠাকুরকে প্রণাম করলাম বার বার যে তাঁর কৃপা আমাকে এ-সাংঘাতিক তরণীটির ছিপ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সুভাষের স্নেহের প্রভা ও পবিত্রতার রক্ষাকবচ ভাগবতী কৃপা ছাড়া আর কী?

(প্রথম উল্লাস সমাপ্ত।)

ভাব ও ব্যবহারের বৈষম্য বিচার

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি যে সকল মানবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সংক্রান্ত জটিল ও চির পরিবর্তনশীল বিষয় লইয়া আমরা সর্ব্বদাই পূর্ব্বের সত্যকে বর্ত্তমানের ভুল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে নিযুক্ত থাকি; সে সকলের কোন মীমাংসা, সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যার নিষ্পত্তিকেই মানুষ কখনও অভ্রান্ত ও চিরপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করে না। মানুষ জানে যে কালের স্রোতে গতিশীল সকল ধারণা ও যুক্তিই সদা পরিবর্ত্তনের প্রভাবাধীন। আজকার হেতু বিচার কল্য আর স্থির নির্দ্ধারিত থাকে না। আজকার দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় অজানার অন্ধকার কল্য নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত পূর্ণপ্রকাশিত রূপ আহরণ করে। জ্ঞানের বিস্তার যেমন দূর হইতে দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, অজানার সীমান্ত সেই সঙ্গে প্রসারিত হইয়া নূতন নূতন সমস্যা মানবচক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে আরম্ভ করে। নূতন নূতন পরিচয় প্রাপ্তি হইলেই যেন সেই সকলের সাঙ্গপাঙ্গ অনুচরের মতনই বহু অপরিচিত আশেপাশে উপস্থিত হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র গ্রামের মানুষ যেমন এ গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে যাইতে শিখিলেই আরও কত অপর গ্রামের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারে যে তাহার এখনও বহু স্থলই দেখা হয় নাই, জেলার সকল গ্রাম দেখা হইলেও মানুষ তেমনি দেখিতে পায় যে আরও বহুসংখ্যক না দেখা জেলা ভিন্ন ভিন্ন দিকে অবস্থিত রহিয়াছে। জেলা হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশ, তৎপরে জগতের নানা দেশ ও ক্রমে ক্রমে এই জগৎ অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশের সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যাতীত গ্রহতারকার আবির্ভাব দেখিয়া মানুষ বুঝিতে পারে যে, যাইবার ক্ষমতা থাকিলেও গন্তব্য স্থানের কোনও দিন শেষ হইতে পারে না। সেই ভাবেই বোঝা যায় যে, মনের ক্ষেত্রের সংখ্যাতীত দার্শনিক তথ্য ও ভাবের পূর্ণ উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, বিচার এবং ব্যাপক সর্ব্বঅন্তর্ভুক্ত হিসাব কেহ কখনও করিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের চুল চেরারও শেষ কোনও দিন হইবে না। মনোভাব ক্রমাগত জটিল হইতে জটিলতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সুদূর হইতে আরও দূরের পিপাসাতুর এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ত্রিধারা অতিক্রম করিয়া কল্পনার সহস্রধারায় চির বহমান হইতে থাকিবে। ভাবের ও জ্ঞানের বিস্তারের সহিত ভাষার বিস্তারও তাল রাখিয়া চলিতে বাধ্য হয় এবং সেই প্রসারশীল ভাষার নিয়ন্ত্রণ সাধন করিবার জন্য শব্দাবলীর বৃদ্ধি ও ব্যাকরণের নিত্য নূতন রীতি-পদ্ধতি গঠনও অব্যাহত থাকিতে বাধ্য। জ্ঞানের অপরাপর শাখারও যদি অনুশীলন করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, সেই চর্চ্চায় কোন শেষ হওয়া সহসা সম্ভব হইবে না। ভূগোল সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস যে, বহু পর্য্যটক বহু শত বৎসর ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর সকল দেশ তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই ধরিত্রীর কোনও অংশই আর মানুষের অচেনা অজানা নাই। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ মানুষ ভুলিয়া যায় যে এই পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মাত্র স্থল এবং অপর তিন ভাগই জল। জলের নিচে কি আছে তাহার সম্বন্ধে মানুষ অল্পই জানে। অতি সম্প্রতিই "ব্যাথিস্ফিয়ার" অবলম্বনে মানুষ সমুদ্রাভ্যন্তরে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও সেই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইতে কত শত অথবা সহস্র বৎসর কাটিয়া যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমুদ্রের তলদেশ দেখা হইলেও তাহারও আরও নীচে ধরাভ্যন্তরে কি আছে তাহা জানিতে আরও বহুযুগ অতিবাহিত হইতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্র ধরাপৃষ্ঠ হইতে প্রায় চার

হাজার মাইল ভিতরে এবং ইহার কয়েক মাইল মাত্র মানুষ প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেন্দ্রস্থল অবধি গমন করিতে মানুষের কয় সহস্র বৎসর লাগিবে তাহা আমরা মাত্র অনুমান করিতে পারি। সুতরাং ভূগোলের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করিতে মানুষের এখনও বহু সহস্র বৎসর লাগিবে একথা স্থিরনিশ্চয় ভাবেই বলা চলিতে পারে।

ভূগোলের সহিত জড়িত ভাবে যে অনন্ত আকাশের সকল গ্রহনক্ষত্রের ও ছায়াপথের অনুশীলন সিদ্ধ করা হইতেছে, সেই বিষয়ের এখন শুধুমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। গ্রহলোকে ভ্রমণ সম্ভব হইলেও এখনও মানুষ উপগ্রহ চন্দ্র ব্যতীত আর কোথাও যাইতে সক্ষম হয় নাই। সকল গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে মানুষের কত শত বৎসর কাটিয়া যাইবে তাহা অনুমানের বিষয়। তৎপরে রহিয়াছে দূর-দূরান্তরের নক্ষত্র জগতের সীমাহীন বিস্তার। সে যে কত দূর তাহার বিচারও কল্পনাতীত। আলোকের গতিবেগ এক মুহূর্ত্তে ১৮৬০০০ মাইল। বস্তুহীন শূন্যে বা vacu um-এ); অর্থাৎ এক বৎসরে ৬০০০০০,০০০০০০ ছয় লক্ষ কোটি মাইল। এই দূরত্বকে এক আলোক বৎসরের দূরত্ব বলা হয় ও তারকা জগতের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এই হিসাবেই মাপা হইয়া থাকে। অনন্ত শূন্যে কত দূর-দূরান্তরে নক্ষত্রমালা ছড়ান রহিয়াছে তাহার কিছুটা ধারণা করা যায় যখন বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের বুঝাইয়া বলেন যে, কোন কোন নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত আছে। অর্থাৎ ঐ সকল নক্ষত্র জগতে যদি আমরা এক মুহূর্ত্তে ১৮৬০০০ মাইল বেগেও যাইবার ব্যবস্থা করি তাহা হইলেও আমাদের সেখানে পৌঁছাইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লাগিবে। অর্থাৎ কোন মানুষেরই নিজের জীবদ্দশায় দূরের কোন নক্ষত্র জগতে পৌঁছান সম্ভব হইতে পারে না। যদি ধরা যায় যে আলোকের গতিবেগ অপেক্ষাও দ্রুতগতি কিছু হইতে পারে ও মানুষ কোন সময়ে সেই গতিবেগে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইবে—তাহা হইলে নক্ষত্র জগতে গমনাগমন সম্ভব হইতে পারিবে।. কিন্তু ঐ সম্ভাবনাও এতই সুদূর-পরাহত যে তাহা হইবে না বলিলেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের নিকটে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা দ্রুততর গতি সাধন করিবার উপায় অন্বেষণ বিজ্ঞান-জগতে চলিতে থাকিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এবং সেই অসম্ভব দ্রুততা মানব হস্তে নিয়মিত হইবার আশা বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসাকে চিরজাগ্রত রাখিয়া চলিতে থাকিবে। অনুপলব্ধ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে মানবমন কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। সেই কারণে এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কবে কত লক্ষ বৎসরে শেষ হইবে তাহা কেহই বলিতে পারিবে না।

ভূগোল ও গ্রহনক্ষত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া যদি আমরা মানব ইতিহাসের আলোচনায় নিবিষ্ট হই, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রসার সময়ের স্রোতের উল্টাপথে অতীতে বহুদূরে যাইতে পারে না। কারণ কিছুদূর যাইলেই সকল কথাই ক্রমশঃ অজানার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে আরম্ভ করে। বহু সভ্যতাই নিজ নিজ ইতিহাস যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই এবং যেখানে রাজপরিবারের কাহিনী কিম্বা ধর্ম্ম ও সংস্কারের কথা কিছু কিছু প্রস্তরে উৎকীর্ণ অথবা অপর ভাবে টালি বা ইষ্টকে চিত্রিত রহিয়াছে সেখানেও সময়ের হিসাব ঠিক নাই এবং ইতিহাসের সহিত উপাখ্যানের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। এই সকল কথা আজ হইতে দশ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যায় না এবং সেই সময়ে মানব সভ্যতা যে স্তরে পৌঁছিয়াছিল তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে তাহার আরও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সমাজ সুগঠিত ও মানুষ বিভিন্ন বহুজনের মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিত। এই অবস্থাতে যদি মানব ইতিহাসকে আরও কয়েক সহস্র বৎসর অতীতে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, তৎপূর্ব্বেও লক্ষাধিক বৎসর মানুষের ইতিহাস ছিল ও তাহার নানান লক্ষণ ও প্রমাণ অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে তাহা একটা আকার গ্রহণ করিতে পারে। মানুষ যেখানেই ছিল সেখানেই সে তাহার অবস্থানের

চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এই সকল চিহ্নের অর্থ আবিষ্কার সহজ কাজ নহে। কিন্তু তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতজনে মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতার আদান প্রদান ও গতিবিধি সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান অর্জ্জনে সক্ষম হইয়া থাকেন। মানুষের খাদ্য, কৃষিকার্য্য, পশুপালন, যুদ্ধের ও অস্ত্র নির্ম্মাণের অভ্যাস, গৃহ, আসবাব, অলঙ্কার ইত্যাদির আকার প্রকার; এই সকল কিছুই ধীরে ধীরে অজ্ঞাত রূপ ত্যাগ করিয়া মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়। সাক্ষাৎ আবিষ্কার হইতে যাহা জানা যায় না, চিহ্ন ও পরোক্ষ প্রমাণ হইতে তাহা অনেক সময় জানা যায়। বর্ত্তমান কালে বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা বিচার করিয়া তাহার বয়স নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ ভাবে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার সাহায্যে মানব ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য ক্রমশঃ মানুষের জানা হইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইতিহাসের অনুশীলন এখনও একটা নূতন বিষয়। ইহার চর্চ্চা হইতে থাকিবে এবং হয়ত সহস্র বৎসরেও এই অনুসন্ধানের সকল উপায় পূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া উঠিবে না। পূর্ব্বকালে ইতিহাস বলিতে প্রায় শুধু রাজবংশগুলির ও রাজাদিগের বর্ণনাই বুঝা যাইত। কাহার পরে কে জন্ম লাভ করিল, কোথায় কে কোন্ দেশ জয় করিল, কে কাহার উত্তরাধিকারী বা কোন্ বংশে কে বিবাহ করিল; এই সকল কথাই ইতিহাসের কথা বলিয়া জ্ঞাত হইত। অনেক সময় অনেক রাজার নাম বংশ-পরিচয় প্রভৃতি ঢাকা পড়িয়া যাইত এবং বংশপরম্পরার হিসাবে বড় রকম গরমিলের আবির্ভাব হইত। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরের ফ্যারোদিগের বর্ণনায় ঐভাবে বহুশত বৎসরের ইতিবৃত্ত বাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী ক্রমে ক্রমে বহু আবিষ্কারের ফলে তাহার বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ১৯২২ খৃঃ অব্দেও ঐজাতীয় আবিষ্কার-গুলির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার (তুতাখামেনের কবর) লোক-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের শেষ নাই এবং এখনও কতযুগ ধরিয়া ক্রমাগতই একের পর একটি করিয়া লুপ্ত সভ্যতার হারান ঐশ্বর্য্য মাটি খুঁড়িয়া বাহির হইতে থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে আমরা সিন্ধু উপত্যকার ভারতীয় সভ্যতার কথা কিছুই জানিতাম না। পরে আনুমানিক সিদ্ধান্ত হইল যে আর্য্যজাতির ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতে প্রবল ভাবে অধিষ্ঠিত ছিল, এই-সকল শহর সেই দ্রাবিড় জাতির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশিত হইতেছে। এমনকি ভারতে আর্য্যজাতির লোকেরা প্রবেশ করিয়াছিল অথবা আর্য্যগণই ভারত হইতে অন্য দেশে গিয়াছিল এই রূপ প্রশ্নও নানাপ্রকার যুক্তির সাহায্যে আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পৃথিবীতে বহু জাতি আছে। অনেক জাতি সকল শক্তি হারাইয়া এখন আর কোথাও প্রভুত্ব করিতেছে না। কিন্তু সেই সকল জাতি পূর্ব্বকালে মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নভিন্ন অবদানে নিজেদের বিশেষত্ব সকল ভাবেই চিহ্নিত করিয়াছিল। এই কারণে ঐ সকল জাতিকে মানব সভ্যতার ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলা যায় না। আমেরিকার মায়া, অ্যাজটেক, টলটেক, থাপোটেক প্রভৃতি জাতির অবদান কি ভাবে কোথায় মানব সভ্যতায় সংক্রমিত হইয়া আছে তাহা যথাযথ ভাবে কেহ বিচার করিয়া দেখে নাই। শ্বেতকায় জাতিদিগের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইতিহাস লিখিলে বলিতে হয় যে, শ্বেতকায় প্রভুত্ব কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইলেই সেই সকল স্থানের পুরাতন অধিবাসীদিগের কৃষ্টি, জাতিগত আচার ব্যবহার, রুচি, নীতিবোধ প্রভৃতি নিজরূপ হারাইয়া শ্বেতকায়দিগের অনুকরণে নূতন আকার ধারণ করে। কিন্তু সত্যই ত তাহা হয় না। পুরাতন মনোভাব ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য কখনও সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয় না। মিশ্রণ ঘটিলেও সেই সমন্বয়ের মধ্যে পুরাতনের আকার প্রকার থাকিয়া যায়। আমেরিকার তথাকথিত লাল ইণ্ডিয়ান-গণ শক্তি হারাইয়া থাকিলেও তাহাদের জাতির অস্তিত্ব নূতন যুগের মানুষের রক্তকণিকায় ও মানসিক প্রবৃত্তি ও

আকাঙ্ক্ষায় চিরবর্ত্তমান থাকিতে বাধ্য। আফ্রিকার বহু জাতির (যাহাদের ঐতিহ্য কোথায় কি ভাবে লুকায়িত থাকিবে তাহা কেহ হয়ত জানিবে না) হাবভাব, ধরণ ধারণ, পছন্দ অপছন্দ, ভালমন্দ বিচার মানব জাতির অঙ্গে অঙ্গে মনে প্রাণে সদা জাগ্রত থাকিয়া যাইবে। আমেরিকার নিগ্রো দাসদিগের উপস্থিতির ফলে আমেরিকার মানুষের শিল্পকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, কল্পনা, সংস্কার সকল কিছুই এমন একটা ধারা অবলম্বনে চলিয়া আসিতেছে যাহার তুলনা ইয়োরোপে অথবা এশিয়ার অন্য দেশে পাওয়া যায় না।

আমরা ভাবিতে পারি যে ভারতে আর্য্য সভ্যতার প্রভাবে অনার্য্যদিগের সকল কৃষ্টির ছাপ ভারতীয় মানুষের দেহমন হইতে মুছিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুত তাহা কি হইয়াছে? আমাদের কথিত ও লিখিত ভাষায়, আমাদের নৃত্যগীতে, ধর্ম্মসংস্কারে, আকৃতি প্রকৃতিতে অনার্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষগুণ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে। যদি আমরা সভ্যতা সংমিশ্রণের গূঢ় তত্ত্বের কথা আলোচনা না করিয়া শুধু যাহা চোখে দেখা যায় তাহারই পরিচয় স্বীকার করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দেবদেবীর মূর্ত্তির অধিকাংশই অনার্য্যদিগের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার ফসল উৎপাদন, কৃষিপ্রক্রিয়া ব্যবহার, ভেষজ ও অরণ্যজাত বস্তু সংগ্রহ, পশুপালন রীতি অবলম্বন প্রভৃতি আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর্য্যগণ সম্ভবতঃ তাঁবুতে বাস করিতেন ও নাগরিক সভ্যতা তাঁহাদিগের মধ্যে সেইভাবে গঠিত হয় নাই। দ্রাবিড়দিগের নিকট হইতেই নগর নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্প-কলা আর্য্যগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতজনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং আর্য্য সভ্যতা শাস্ত্রগত জ্ঞানে ও দর্শনে মহান্ হইলেও ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বহুঅংশই অনার্য্যদিগের নিকট হইতে বর্ত্তমান হিন্দুজাতি পাইয়াছে বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হয় না। বস্ত্র বয়ন, মাটির বাসন পুড়াইয়া লইয়া তাহা ব্যবহার, খনিজ ধাতব প্রস্তর গলাইয়া তাহা হইতে ধাতু বাহির করিয়া লওয়া ইত্যাদি অনেক কার্য্যও অংশত ও পূর্ণ রূপে অনার্য্যদিগের নিকট হইতে আমরা শিখিয়াছি।

সত্যের পূর্ণ অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা করা সহজ কার্য্য নহে। সহজ নহে প্রধানতঃ এই জন্য যে সত্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পথে বাধাবিঘ্নের আবির্ভাব ক্রমাগত হইতেই থাকে এবং তাহার ফলে যে ভ্রান্তি ও মিথ্যার মায়াজাল সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া দেখা দেয় তাহার অন্তরালে সত্য কোথায় চলিয়া যায় কেহ বলিতে পারে না। জড় বস্তুর ভিতরে তাহার সত্য রূপ কোথায় লুকাইয়া আছে বস্তুকে টুকরা টুকরা করিয়া তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অণু পরমাণু নিউট্রন প্রোটন পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু তাহার পরে ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম অখণ্ডনীয় বস্তুপিণ্ডকে আর ভাগ করা সম্ভব হয় না এবং সেই ক্ষুদ্রতম বস্তুখণ্ডই যে আমাদিগকে বস্তু পরিচয়ের তথা বাস্তব সত্য উপলব্ধির চরমে লইয়া যায় তাহাও মনে করা যায় না। কারণ আমরা দেখি যে বস্তুকে কাটিয়া কাটিয়া অবাস্তবে পৌঁছান যায় না এবং অবাস্তবকে একত্র স্থাপন করিয়া পুঞ্জীভূত অবাস্তবতা হইতেও বস্তুকে পাওয়া সম্ভব হয় না। ইহা ব্যতীত একথাও মানিতে হয় যে, বস্তুর যে স্বভাব ও স্বরূপ মানুষের উপলব্ধির বিষয়, সেই স্বভাব ও স্বরূপ নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রনের ভিতর কিছুমাত্রও লক্ষিত হয় না। অণু বা molecule-এর ভিতর বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে গুণাবলী তাহার হয়ত কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অণু যখন বিভক্ত হয় ও তাহার পারমাণবিক উপাদান-সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আত্মপরিচয় দান করে তখন সে পরমাণু বা atom-গুলির স্বরূপ অণুর স্বরূপ হইতে একান্তই অপর প্রকার হইয়া দেখা দেয়। জলের অণুতে দুই পরমাণু জলজান বাষ্প ও এক পরমাণু অম্লজান বাষ্প মিলিত হইয়া জলরূপে দেখা যায়। জলের স্বরূপ ও ঐ দুই বাষ্পের স্বরূপ কোনভাবে এক প্রকার বলা চলে না। এই ভাবে পারমাণবিক গুণাবলী বিচার করিয়া আণবিক বস্তুর গুণ-পরিচয় সহজলভ্য হয় না

এবং পরমাণু বিভাগ ও বিশ্লেষণ যে মহাগতিশীল ও ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রনীয় আবর্ত্তগুলির সহিত আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় ও অবগতির সৃষ্টি করে তাহা দ্বারাও আমরা অবাস্তব শক্তির কোন বাস্তব পরিণতি বোধে অক্ষম হই না। শক্তি, চেতনা, প্রাণ ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতরে যাহা আছে তাহার জড় অস্তিত্ব না থাকিলেও সৃষ্টিতে তাহার উপস্থিতি সবল ও প্রবল এবং জড় বস্তুর অবস্থার মহা পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম। সেই পরম অবাস্তব সত্তা জড় বস্তুর উদ্ভবের মূল কারণ কি না তাহার বিচারই ভারতীয় দর্শনের প্রধান অঙ্গ। ভারতীয় দার্শনিকগণ শিকড় হইতে শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে বস্তুর কাণ্ড ও শাখা প্রশাখায় যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তু ও বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিতর্ক, আলোচনা, অনুশীলন, বিশ্লেষণ সৃষ্টির উৎপত্তি ও অবসান সংক্রান্ত সত্য ও রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে কি না, তাহা লইয়া বহুযুগ ধরিয়া পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন। সেই সূত্রে তাঁহারা আনুষঙ্গিক ভাবে বহু বিষয়ে নিজেদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যে দর্শন অপেক্ষা বিজ্ঞানের চর্চ্চাই অধিক ব্যাপক ও গভীর ভাবে করা হইয়াছে ও হইয়া থাকে। যে স্থলে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন বিশ্লেষণ ও গবেষণা ক্ষেত্রে বহু সহস্র ব্যক্তিকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে দার্শনিক তথ্য লইয়া মাত্র দুই-চারি জন চিন্তাশীল নিবিষ্ট থাকেন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে সত্যের মূল অনুসন্ধান লইয়া ঋষিগণ অতি গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। পৃথিবীর কোনও সভ্যতায় যখন দার্শনিক তত্ত্বানুশীলন বা সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া কিছু ছিল না, সেই অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের সাধকগণ আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই সত্যের স্বরূপ ও বাস্তব অবাস্তবের পার্থক্য বিচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাদের সহিত তুলনায় বস্তু বিচারের উপর নির্ভরশীল সাইলোশিয়ান ও গ্রীক দার্শনিকদিগের চিন্তার ধারা যেন মূল সত্যকে পাশ কাটাইয়া তাহার মানব-হাস্তর অনুভূত বাহ্য প্রকাশ লইয়াই তর্কবিতর্কে নিযুক্ত থাকিত বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শনকে অবহেলার চক্ষে দেখিবার কোন কারণ নাই। মানব জীবন মূলতঃ যাহাই হউক না কেন; তাহার মানবীয় মূল্য বিচার করিতে হইলে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া শুধু অবাস্তবকে অবলম্বন করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। বৈদিক ঋষিগণ যখন কোন্ দেবতাকে ঘৃতাহুতি দান করিবেন এই সমস্যার সমাধানে মগ্ন ছিলেন তখন জীবনের সমস্যাগুলি আজকার মত প্রকট ও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে নাই। পাশ্চাত্যের জীবনযুদ্ধই তাহার বস্তুতন্ত্রে অভিনিবেশের প্রধান কারণ। থেলিস, অ্যানাক্‌সিম্যাণ্ডার, পিথাগোরাস, জেনোফিনিস, সোক্রাটিস, প্লেটো, অ্যারিসটট্‌ল্ মানব চিন্তাকে যে পথে চালাইয়াছিলেন তাহাতে সৃষ্টির চরম রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হইয়া থাকিলেও, অনন্ত সমস্যা সঙ্কুল মানব সমাজের বহু কঠিন প্রশ্নের কার্য্যকারী উত্তর পাওয়া সহজ হইয়াছিল। চিচেরো, সেনেকা, টমাস অ্যাকুনাস; অথবা পরে ডেকার্ট, লাইবনিৎস, লক, হিউম, কান্ট, হেগেল, মার্কস্, নীট্‌শে, বেয়র্গসঁ, রাসেল প্রভৃতিকে আমরা দিব্যজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। সত্য ও সত্যের অভিব্যক্তি এতই অন্তরতম ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত যে ইহা সত্য ও উহা তাহার প্রকাশ মাত্র বলিয়া যাহা সহজবোধ্য তাহাকে না বুঝিয়া যাহা বোধশক্তির অতীত তাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকা মানব জীবনের অভিপ্রায়সিদ্ধির দিক্ দিয়া কোন মহান্ আদর্শের অনুসরণ বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণও বস্তুকে অবহেলা করিয়া শুধু বস্তুহীন প্রবাহে অবগাহন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। বহু শাস্ত্রে সমৃদ্ধ ভারতীয় সভ্যতায় শুধু বেদ, বেদান্তই নাই। তৎসঙ্গে আছে শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, নৃত্য গীত অভিনয় সংক্রান্ত শাস্ত্র সকল। গোপাগন লইয়া গোপশাস্ত্র, রন্ধন বিষয়ে সূপশাস্ত্র, ভূগোল, জ্যোতিষ, কাল বিচারে পঞ্জিকা ও অঙ্ক গণনা ইত্যাদি বহু বিষয় লইয়াই প্রাচীন কালের

পণ্ডিতগণ অনুশীলন করিতেন। ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির প্রভৃতি গণিত ও শাস্ত্রে মহাখ্যাতিমান্ ও তাঁহাদের সময়েই রসায়ন পদার্থবিদ্যা দেহতত্ত্ব লইয়াও অনেক সম্যক্ আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেহে রক্ত-চলাচলের কথা পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক হার্ভির বহুপূর্ব্বেই ভারতীয় তান্ত্রিকগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তর্কে ন্যায়ের বিচার, ভাষায় শব্দ অক্ষর, উচ্চারণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ ও ব্যবহার, নীতি এবং কাব্যে ছন্দের বর্ণনা ও ব্যাখ্যান যেরূপ উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল তাহাতে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন, ভারতীয়গণ শুধু ভক্তিমার্গ অবলম্বনে পরব্রহ্মের স্বরূপবোধের চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের আরাধনা সম্পূর্ণ করিতেন না।

কোন সভ্যতা যখন একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া নিস্তেজ, নিশ্চল, শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কোনও প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার উৎকর্ষ ও উন্নতির কথা ত কেহ সম্ভব বলিয়া মনে করেই না, বরঞ্চ সকল দিক্ দিয়াই যাহাতে কোন কৃষ্টিগত সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় শুধু সেই চেষ্টা করিয়া চলাই কার্য্যকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়। ভারতে মুসলমানদিগের অনুপ্রবেশ ভারতীয় সভ্যতাকে এমনই একটা আঘাত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে বহু রাজসভার পণ্ডিতগণ ও বহু বিদ্যাকেন্দ্র আর সক্রিয় এবং চালিত থাকিতে সক্ষম হয় নাই। যথা, বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানগণ শত শত মন্দির ধ্বংস করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা-কেন্দ্রগুলিকেও নষ্ট করিয়া দেয়। ভারতের বাহিরে মুসলমানগণ জগৎবিখ্যাত আলেকজান্দ্রীয়ার পুস্তকাগার জ্বালাইয়া দিয়া বিশ্বজনের নিকট চিরস্থায়ী অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় চুরমার করিয়া বক্তিয়ার খিলজি সভ্যতা-বিধ্বংসী বর্ব্বরদিগের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মুসলমান শক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভারতীয় কৃষ্টি ও জ্ঞানবিজ্ঞান কেমন করিয়া হৃতগৌরব ও অসাড় হইয়া যায় তাহা উপরের কয়েকটি কথা হইতেই বুঝিয়া লওয়া যায়।

ইহার পরে আসিল পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির সমুদ্রপথে ভারতে অনুপ্রবেশ। পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ ব্যবসাদারগণ যখন আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসিতে আরম্ভ করিল তখন তাহাদিগের সহিত আসিল বহু ধর্ম্মযাজক, রাজদূত ও তাহাদের সহচর পেশাদার সেনাধ্যক্ষ জাতীয় লোকেরা। এই সকল ধর্ম্মযাজক ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ ভারতের নানা রাজসভায় গমনাগমন করিয়া, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, রাজন্যবর্গের মনে ইয়োরোপীয় ভাষা, যুদ্ধবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা বিস্ময় ও ভক্তি মিশ্রিত মনোভাবের সৃষ্টি করে। পরে ক্রমশঃ ইয়োরোপীয়দিগের রাজশক্তি যখন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল তখন ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগত বিদ্যা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সকল কিছুই জগতের সম্মুখে মূল্যহীন বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। এই কার্য্যে ভারত-লুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্যবাদী ও ব্যবসাদারগণ অগ্রগামী ছিল এবং তাহাদের সমর্থক ছিল খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ। ভারতীয়দিগকে যেটুকু শিক্ষা দান বা সাহায্য করা হইত তাহার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মনে শ্বেতকায় ভীতি ও ভক্তি জাগ্রত করা। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মতলব ছিল ভারতীয়দিগকে ইংরেজী পড়াইয়া তাহাদিগের দ্বারা রাজকীয় দফতরাদি পরিচালনার ব্যবস্থা করা; কারণ ঐ উপায়ে ইংরেজ কেরাণী নিয়োগ অপেক্ষা কম খরচে কাজ চালান সম্ভব হইতে পারিবে। ভারতবাসীদিগের প্রেরণা ও প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহারের কথা সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপীয়গণ কদাপি চিন্তাও করে নাই।

এই সময় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের অপপ্রচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া রাজা রামমোহন রায় হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ লব্ধ তথ্যাদি ব্যবহারে প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি নানা দিক্ দিয়া ইয়োরোপীয়-দিগের চিন্তাধারার তুলনায় উন্নততর প্রমাণ হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক আচার ব্যবহার অথবা পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত পৌরোহিত্যের নিন্দা করিয়া দিয়া ভারতের

দার্শনিক আদর্শের মূল্য বিচার করার কোন অর্থ হয় না, কারণ, বেদ-বেদান্তের সার কথা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ পরিচয় ঐ আচার পদ্ধতির মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। রাজা রামমোহন রায় যখন ভারতের সত্যানুসন্ধিৎসার ও আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতর পরিচয় দিয়া জগৎবাসীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে জনসাধারণের ধর্ম্মাচার সেই আধ্যাত্মিকতার সহিত কোন গভীর সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে না এবং তাহাদের পূজার রীতিপদ্ধতি ও সংস্কারাদির সহিতও ঐ আধ্যাত্মিকতার কোন বোধ, অনুভূতি বা অর্থগত সম্বন্ধ নাই; তখন ভারতের সমালোচকদিগের ভারতনিন্দার কার্য্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ভারতের মনীষীদিগেরও প্রেরণা ও প্রতিভা ব্যবহারের পথ খুলিয়া গেল। অতঃপর ভারতের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভারতের কোন কোন ভাষায়, বিশেষ করিয়া বাংলায়, যে উন্নতি ও সৃজনী শক্তিবৃদ্ধি রামমোহনের পরের যুগে দেখা গিয়াছে তাহার সহিত তুলনায় ভারতে সহস্র বৎসরের মধ্যে কোথাও আর সেইরূপ সাহিত্য রচনা-বৈভবের আবির্ভাব হয় নাই। শুধু সাহিত্যে নহে। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও এই নব জাগরণ প্রাণবান্ হইয়া দেখা দিয়াছিল। সকল মানুষের মানবতা বোধ, নারীদিগের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, জনসাধারণের সকলের মধ্যে শিক্ষার আলোক জ্বালাইবার চেষ্টা, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আহ্বান; আরও কতকিছু এই সম্পর্কে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। বলা উচিত যে পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শসমূহ সেই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৫) ও ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে নূতন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়া জগতের ন্যায়, অন্যায়; অধিকার, অনধিকার; সম্বন্ধে ধারণা আমূল পরিবর্ত্তনের পথে লইয়া যাইতেছিল। বাব্যাক, স্যাঁ সিমো, ফুরিয়ে, রুশ প্রভৃতির প্রভাবে রাষ্ট্র জগতে নূতন চিন্তার ধারা বহিতে আরম্ভ করে। ইহার মধ্যেই মার্কস, এঙ্গেলস-এর আগমনের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নবচেতনার উদ্বোধন সহসা হয় নাই। এই সূত্রে জন বানিয়ান-এর (১৬২৮-৮৮) ধর্ম্ম ও নীতি সংক্রান্ত পুস্তকাবলী ও মলিয়েরের (১৬২২-৭৩) ভণ্ডামি ও কপটাচারের বিরুদ্ধ বিদ্রূপাত্মক নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের পরে যাঁহারা বাক্যে, কার্য্যে ও লেখায় নবযুগের আদর্শ মানব জাতির সম্মুখে স্থাপন করায় প্রচেষ্টায় খ্যাতি অর্জ্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে রবার্ট ওয়েন, জেমস্ মিল ও তাঁহার পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের নাম করা উচিত। জার্মান দার্শনিক হেগেল চিন্তার ক্ষেত্রে সঙ্গতি-অসঙ্গতি, সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য, আছে নাই ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধে তাৎপর্য্য ব্যবহারে ন্যায্য ও সত্য নির্ণয়ের পথ খুলিয়া দেওয়াতে তার্কিক জগতে তর্কের এই নূতন অস্ত্র ব্যবহার করিয়া বহু তথ্যের নূতন ভাবের বিশ্লেষণ সম্ভব হইল। অবশ্য ঐ একই অস্ত্র ব্যবহারে যাহা আছে ও যাহা হওয়া উচিত উভয়েরই সমর্থন সহজ ও সবল হইয়া উঠিল।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে পাশ্চাত্যের চিন্তা ও আদর্শের হাওয়া ভারতে বহিতে আরম্ভ করে ও ভারতীয় জ্ঞানী ও গুণীগণ ইহাতে নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার সত্য প্রেরণা পুনরাবিষ্কার করিবার আবশ্যকতা প্রবলতর ভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। ভারত এক সময়ে যে সভ্যজগতের এক উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল, তাহা অকারণে সম্ভব হয় নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা ব্যাকরণ, গণিত, ও সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ব্যবস্থায় ভারত মানব জাতির বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক রূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের ধর্ম্ম প্রেরণা ও বিদ্যা নানা পথে চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ, মলয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, আরব, পারস্য ও পরোক্ষ ভাবে ইয়োরোপের বহু দেশে প্রবেশ করে। সেই যে ভাব ও জ্ঞানের সুপূর্ণ ভাণ্ডার, যাহার অধিকাংশ শিক্ষা ও চর্চ্চার কেন্দ্রগুলি মুসলমান বিজয় ও দেশে অধিকারের ফলে বহু শতাব্দী ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া ছিল; তাহার পুনরুদ্ধার এখন আবার ভারতীয়-

দিগের একটা মহান্ কর্তব্যরূপে দেখা দিল। ভারতের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে অনুশীলন কার্য্যে শেষের দিকে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য করণে জার্মানী, ফ্রান্স ও বৃটেনের সংস্কৃতজ্ঞদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়। ম্যাক্সমুলার, ওল্ডেনবার্গ, থিবো, ইয়োলি, রীস ডেভিডস্, ব্লুমফিল্ডস্ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগ দেখাইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে যে সকল চিন্তাশীল দার্শনিক ও সমাজনীতিবিদ্‌গণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের বিষয় উল্লেখ করা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব হইতে পারে না; কিন্তু তাঁহাদিগের মতামত বিষয়ে কিছু বলা উচিত। ইঁহাদের কাহারও মতে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই সকল মূল্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি; কেহ বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বলিয়া কিছু যে আছে তাহাই স্বীকার করেন না। কেহ বলেন মানবিক চিত্তজাত যে অবাস্তব মানসচিত্র তাহাই একমাত্র যথার্থ সত্য; কেহ বা বলেন যে, মনোভাবই প্রকৃত চিরস্থায়ী সত্য; তাহার যে বাস্তব প্রকাশ তাহা নশ্বর ও শুধু সাময়িক ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অপর কেহ বলেন, বাস্তব প্রকাশ ও তাহার সহিত সংশিষ্ট মনোভাব ব্যতীত আর কোনও সত্তার অস্তিত্ব নাই। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলদিগের মধ্যে কিন্তু বাস্তব উদ্দেশ্যবিহীন মনোভাবের প্রতি আকর্ষণ সচরাচর দেখা যায় না। এই জন্য ভারতীয় ধরণের আধ্যাত্মিকতা ইয়োরোপ আমেরিকায় প্রায় কখনও পণ্ডিতজনপ্রিয় হইতে দেখা যায় নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাঁহার সৃষ্টির সম্বন্ধ বিচার অথবা সৃষ্টিকর্ত্তার স্বভাব ও স্বরূপ বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান আহরণ চেষ্টা পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অল্প লোকেরই গবেষণার বস্তু হইয়াছে। মানব সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত আধ্যাত্মিকতা ভারতে যেভাবে জড়িত; পাশ্চাত্ত্যে তাহা নহে। বস্তুর বিশ্লেষণের শেষ কথা কখনও বাস্তবের আকার প্রকার স্বভাব স্বরূপের ভাষায় বলা যায় না। এই কথাই সর্ব্বদা বলিয়া আসিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার সেই [illegible] অবস্থা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। অর্থনীতি সমাজনীতি ও তাহা হইতে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানই আজকাল মানব সমাজকে চিরচঞ্চল করিয়া রাখে। দেনা-পাওনার আলোচনায় দুই হইতে দশ সত্যই অধিক কি না, এ প্রশ্ন কেহ উত্থাপন করিতে সাহস পায় না। চাওয়া ও পাওয়ার প্রকৃত অর্থ কি তাহাও দর্শনের চক্ষে কেহ দেখিতে যায় না। ভোগের অসারতা বুঝাইয়া শ্রমিকদিগকে অল্প বেতন গ্রহণ করিতেও কেহ শিখাইতে পারে না। "মাও" যে রিপুজাত লালসা প্রসূত তাহাই বা কে বলিতে অগ্রসর হইবে?

দেনা পাওনার কথা ছাড়িয়া অপর প্রসঙ্গের উত্থাপনা করিলেও দেখা যায় যে, কোথাও কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি ত নাইই উপরন্তু গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি প্রভৃতি নানান স্তরের শ্রদ্ধাভক্তিও হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। গুরুমারা বিদ্যার অতিপুরাতন নজির মহাভারতে থাকিলেও তাহা অর্জ্জুনের ন্যায় অশেষ গুণবান্ ও শক্তিশালী শিষ্যের মধ্যেই দেখা দিয়াছিল, আজকালকার সাত পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য গণ্ডমূর্খ শিষ্যদিগের সর্ব্বগুণহীন ঔদ্ধত্য অর্জ্জুন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধের সহিত তুলনাযোগ্য নহে। পিতামাতার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অনেক বয়স অবধি দিন কাটান পাশ্চাত্ত্য সমাজে চলে না। সেখানে অল্প বয়সেই মানুষকে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করা হয়। ভারতের মানুষ পাশ্চাত্ত্যের কোন কোন ধরণ-ধারণ নিজেদের সুবিধামত অনুকরণ করিলেও আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে পুরান রীতিই সুবিধাজনক বলিয়া স্থির করিয়াছে। কৃতজ্ঞতা, নিমকহালালী, যে বেতন দেয় তাহার হুকুম মানিয়া চলা, প্রবঞ্চনা না করা, অধর্ম্মের পথে না চলা ইত্যাদি বহু কথারই আজকাল কোন মূল্য নাই। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, অতীতের বাস্তব রীতিগত সত্য, আজ আধুনিকদিগের নিকট মিথ্যা ও ভুলের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত কার্য্য ও ব্যবহার ক্ষেত্রে ভালমন্দ বিচার বলিয়া কোন নীতিরই প্রতিষ্ঠা প্রায় হইতেছে

না। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাকে যেরূপ ভাবে উহা মানব মনের মোহমুগ্ধতার পরিচয় দেয় বলিয়া অবহেলার চক্ষে দেখিয়া আধুনিক সহজপথের পথিকগণ ভারতীয় ঐতিহ্যের ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করেন; বাস্তব ব্যক্তিচরিত্র ও সমাজগঠনের দায়িত্বও তাঁহারা সেই সহজ উপায়েই স্কন্ধ হইতে নামাইয়া ফেলিয়া যথেচ্ছাচারের আনন্দে বিভোর হইয়া জাতীয় সর্ব্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রগমনে নিযুক্ত হ'ন। অর্থাৎ দর্শন বিজ্ঞানের কঠোর সাধনার নিয়মানুগত্য পরিহার করিয়া মানসিক ও কর্ত্তব্যক্ষেত্রের অক্ষমতার গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া জীবন নির্ব্বাহই নূতন যুগের অভ্যাস। ভারতের হারান গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেহ কিছু করে নাই বা করিতেছে না বলা যায় না। দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি কৃষ্টির বহু শাখাতেই কিছু কিছু সাধক আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেশের সভ্যতা অতীতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া প্রাণবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা অনেকাংশেই অরণ্যে রোদন করিয়া চলিতেছেন। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই কলুষিত চিন্তাধারা ও নিকৃষ্ট রুচি প্রকট হইয়া উঠিয়া কৃষ্টির শুচিতা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সুন্দর যাহা, সুসংস্কৃতির দ্বারা যাহা ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল করে, তাহার ভিতরেই মানব সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষ জীবন্ত হইয়া দেখা দেয়। পাপ পঙ্কিলতার ভিতর মানুষের নীচে প্রবৃত্তি ও হীন প্রকৃতি প্রশ্রয়পুষ্ট হয়। ব্যক্তি বা সমাজ কদাপি তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে না। কিন্তু পতনোন্মুখ সমাজ বহু সময়েই সর্ব্বনাশের পথে গড়াইয়া অধোগমনকে গায়ের জোরে প্রগতি বলিয়া চালাইতে চাহে। কূটতর্কের সাহায্যে বহু পাপকে মহিমান্বিত করিয়া মিথ্যা ও অন্যায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা এই ভাবেই করা হয়। এবং ইহার ফলে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও জ্ঞানের যে ব্যাপক বর্দ্ধন ও উন্নয়ন, মানবজাতির উন্নতির জন্য তাহার কোন প্রকৃষ্ট ব্যবহার হওয়া সম্ভব হইতেছে না। পূর্ব্বকালে যে সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার চেষ্টা হইত তাহার ফলে পুরাতন বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শ অবলম্বন করা হইত এবং সেই সূত্রে চিন্তার শানিত অস্ত্রে বহু ভুল ভ্রান্তি যুগে যুগে খণ্ডিত হইয়া মানব মনকে সত্য উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিত। বর্ত্তমান কালে চিন্তা ও বিচারের পথে কেহ চলিতে চাহে না, উদ্দেশ্যসিদ্ধি অথবা চলিত ভাষায় মতলব হাসিল, করাই সকল প্রচেষ্টার মূল কারণ। উদ্দেশ্য বা মতলব প্রায়ই কাহারও নিজস্ব নহে। অধিক ক্ষেত্রেই তাহা অপরের প্ররোচনা জাত অথবা অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বহু দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্রের ফল। কখন কখন গুপ্ত অভিপ্রায় কোথা হইতে কোন্ পথে চলিয়া কাহার মনে কি কারণে বাসা বাঁধে তাহার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন সহজে সম্ভব হয় না। অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র গোপন রাখা আজকালকার রাজনীতি, অর্থনীতি, অবৈধ কারবার, প্রতারণা, নানাপ্রকার আন্দোলন ও বিপ্লববাদ প্রভৃতির অতি আবশ্যক অঙ্গ। এবং যেখানে কোন কিছুই সহজবোধ্য ও পূর্ণপ্রকাশিত নহে সেইখানে কোন্ বিশ্বাস কে খণ্ডন চেষ্টা করিতেছে, কে কিসের বা কাহার সমর্থক, সত্য কি এবং মিথ্যাই বা কি, তাহার কোন পরিষ্কার হিসাব কেহ করিতে পারে না। বিচিত্র মনোভাবের ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রেরণা, ধারণা, বোধ ও উপলব্ধি যে কোথায় তলাইয়া যায় তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। ব্যক্তির নিজধর্ম্ম নিজমত বা নিজদল ত্যাগ আর পূর্ব্বকালের মত দোষাবহ বিচার করা হয় না। ইহার একটা কারণ যে, মানুষ আর সেই প্রকার নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম বা মত গ্রহণ করে না এবং কোন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সহিত মানুষের যোগও শুধু সাময়িক সুবিধা অনুসারেই রক্ষিত হয় বা হয় না।

দার্শনিকদিগের যুক্তিতর্ক বিচার পূর্ব্বকালে ও তৎপরে যুগে যুগে যেরূপ ছিল এখন আর তাহা থাকিতেছে না। বিজ্ঞানে জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রধান কথা না হইয়া আর্থিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধিই মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষা এখন মনোভাব প্রকাশ না

করিয়া তাহা গোপন রাখিবার জন্তই অধিক ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অস্ত্র হইলেও ভাষার ব্যবহার এখন একটা দুঃসাহসিক অনিশ্চিতের অনুসরণ অভিযানে পরিণত হইয়াছে। ব্যাকরণের কার্য্যকারিতা সেই কারণে অসাড়তা-দোষ-দুষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মানব সভ্যতা এখন অবধি গুণবৈশিষ্ট্য-নির্ভরশীল ছিল। এখন তাহা ব্যাহিক লক্ষণ প্রদর্শনের ইচ্ছাবোধশূন্ত যান্ত্রিক আয়োজন মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্টির মূল কথা ছিল রুচি, রসবোধ, রসঅনুভূতি, কলা-কৌশল, শিল্পচাতুর্য্য, সৌন্দর্য্যের রূপধ্যান ক্ষমতা, প্রেরণার জাগরণ ও অভিব্যক্তির প্রতিভা। এখন কৃষ্টি কুচকাওয়াজের মত পঞ্চাশজনের সহিত মিলিত গতিবিধির রূপ ধারণ করিয়াছে। সকলে হাসিলে হাসিবে, সকলে কাঁদিলে কাঁদিবে। সকলের পুলকে পুলকিত ও সকলের নিশ্চেষ্টতা দেখিলে নিশ্চেষ্ট। কেতা-দুরস্ত হওয়াই আসল কথা। ভিতরের বোধ না থাকিলেও ক্ষতি নাই। ঘড়ি দেখিতে না জানিলেও হাতে হাতঘড়ি বাঁধা থাকা চাই। খবরের কাগজ উল্টা করিয়া ধরিয়া পাঠের অভিনয় করারও একটা কৃষ্টিগত সার্থকতা থাকে।

মানুষ যখন ধরাপৃষ্ঠে অঙ্কিত ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া দিক্ ও দৈর্ঘ্যের হিসাব করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিত তখন তাহার গমনের রীতি পদ্ধতি যাহা হইত, তাহার সহিত তুলনায় সে যখন আকাশপথে মেঘেরও বহু উর্দ্ধে বিচরণ আরম্ভ করিল, সেই গমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারণায় নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। আরও বহু উর্দ্ধে, অনন্ত শূন্যে চন্দ্রলোক অথবা মঙ্গলগ্রহযাত্রী মানুষের গমনের হিসাব পৃথিবীর সময়, পৃথিবীর দিক্ ও মাধ্যাকর্ষণ বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া নব নব স্থিরনিশ্চয় অবস্থা বিচারে গতির নির্দিষ্টতা রক্ষা করে। এই পৃথিবী হইতে লক্ষ কোটি যোজন দূরে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত সুমেরু কুমেরু না থাকায় উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমও থাকে না। পৃথিবীর নিজ অক্ষরেখা ধরিয়া চক্রাকারে আবর্ত্তন ও সূর্য্যের চারিদিকে পরিক্রমণ না থাকায় সেখানে সময়ের হিসাব নক্ষত্রকালের বিচারে হয়। গমনের ক্ষেত্রে এই সকল মহাপরিবর্ত্তন যাতায়াতের স্বভাব ও স্বরূপকে নূতন ছাঁদে ঢালিয়া নবকলেবর দান করিয়াছে। ভ্রমণ বৃত্তান্তের ভাষা পুরাতন অভিধান বর্জ্জন করিয়া নূতন শব্দাবলীর আশ্রয়ে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পুরাতন সত্য মিথ্যা, আনুগত্য বৈপরীত্য, ভুল ভ্রান্তির এক্ষেত্রে আর কোন বিশেষ অর্থ রহিল না। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বহু ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে তুলনামূলক আলোচনা বহু স্থলে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। সেই সকল ক্ষেত্রে চিন্তাধারার জাতিগত পার্থক্যের দোহাই দিয়া আলোচনা বর্জ্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং হইতে পারেও না। সত্য ও মিথ্যা, মঙ্গল ও অমঙ্গল, উন্নতি ও অবনতি, মনুষ্যত্ব ও পাশবিকতা প্রভৃতি কথার নূতনের ধাক্কায় আর অর্থ হইতেছে না বলা চলে না, সুতরাং অকৃতজ্ঞতা, মনুষ্যত্বহীনতা, দেশদ্রোহিতা, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, দরিদ্রদলন, ব্যভিচার, কলহপ্রিয়তা, অলসতা, প্রতারণা প্রভৃতি দোষ এখন আর দূষণীয় নহে একথা কেহ বলিবে না। জ্ঞানের বিস্তার ও বিশ্বমানবের মিলিত স্বরূপ সৃজনের ফলে মানব ধর্ম্ম নিজরূপ এখনও পরিবর্ত্তন করে নাই। ভবিষ্যতে করিবে বলিয়াও মনে হয় না।

কংগ্রেস-স্মৃতি

(একচত্বারিংশ অধিবেশন—গৌহাটী—১৯২৬)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(১৬)

২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল বটে, কিন্তু সভা তেমন জমল না।

একদল অসমীয়া বালক-বালিকা কর্ত্তৃক সমবেত কণ্ঠে জাতীয়-সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভায় কার্য্য আরম্ভ হল।

এদিনের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে হতে পারেনি তার কারণ, গতকাল সমস্ত রাত ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে ঝিরঝির করে বারিপাত হয়েছে। প্রতিনিধিদের জন্ম যে-সকল বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল তার দেওয়াল, ছাদ সমস্তই চটে নির্মিত ছিল। ভাগ্যক্রমে প্রবল বর্ষণ হয় নি, আমরা কোনমতে ডিসেম্বর মাসের শীতে আপাদমস্তক লেপে আবৃত করে রাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম। এমতাবস্থায় প্রতিনিধিদের বাসস্থানগুলি বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে সুতরাং প্রতিনিধিগণ গৌহাটী ত্যাগ করার জন্ম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

জাতীয় সঙ্গীত সমাপ্তির পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মশায় জানালেন যে তিনি একটি স্টীমার ভাড়া করেছেন তাতে এক-হাজার প্রতিনিধির স্থান হবে এবং ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেসের অধিবেশন এক ঘণ্টার জন্ম মুলতুবী থাকবে যাতে প্রতিনিধিরা তাঁদের জিনিস-পত্র ক্যাম্প থেকে স্টীমারে স্থানান্তরিত করতে পারেন। প্রতিনিধিরা এই ঘোষণায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং তাঁদের জিনিস-পত্র স্টীমারে নিয়ে যাওয়ার জন্ম ব্যস্ত হয়ে ক্যাম্পগুলিতে ফিরে গেলেন।

বিরতির পর ১॥৹টার সময় অধিবেশনের কাজ আরম্ভ হল।

প্রথমে যে-সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি কংগ্রেসের শুভেচ্ছা-সূচক বাণী পাঠিয়েছিলেন, সাধারণ সম্পাদক গিরধারীলাল তা পাঠ করে শোনালেন। যাঁরা বাণী পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বার্লিন স্টাডোর সম্পাদক হের গিবার্টা, লণ্ডন-প্রবাসী শাকলাতওয়ালা, কানপুরের লালা মুরালীলাল, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, লালা গোবিন্দ দাস, জোড়হাটের চক্রধর বড়ুয়া, যশোহরের যদুনাথ মজুমদার, মাদ্রাজের আর্য্য নেপ্পু, আমেদাবাদের অম্বালাল সারাভাই এবং পুনার বি. এস্. কামাথ।

তারপর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন:—

এই কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে নিন্দনীয় বর্তমান সংঘর্ষ অপনোদনের জন্ম অনতিবিলম্বে পন্থা উদ্ভাবন করে তৎসম্বন্ধে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করতে অল্ ইণ্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটীকে নির্দেশ দিচ্ছে।

এই কংগ্রেস অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কর্মীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবার এবং উপরোক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করে তাঁদের বিবেচনা মত পদক্ষেপ করার ক্ষমতা দিচ্ছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে পণ্ডিতজী হিন্দীতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন টি. প্রকাশম্।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সকল কংগ্রেস সদস্যকে হাতে কাটা সুতায় হাতে বোনা খদ্দর পরিধান করতে হবে।

প্রস্তাবের সপক্ষে প্রস্তাবক মশায় ইংরেজীতে ভাষণ দিলেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পর মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন স্বরাজ্য দলের সদস্যগণ, যাঁরা খদ্দর পরিধান আনুষ্ঠানিক পোশাকে পরিণত করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই মত পরিবর্তন হয়েছে এবং পূর্ব্বরীতি পুনরায় প্রবর্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে উঠে জানালেন যে তিনি তাঁর মন থেকে কাউনসিলের কর্ম্মসূচী চির-কালের জন্য মুছে ফেলেন নি। তিনি আরও জানালেন যে যদি কেবলমাত্র বিদেশী বস্ত্র বর্জন সফল হয় তাহলে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

(প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি গৌহাটী কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবেন বটে কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যে কোন অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁর পক্ষে কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করা প্রভৃতি কি কংগ্রেসে যোগদান নয়?)

রাজকুমার চক্রবর্তী একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে খদ্দরের পরিবর্তে স্বদেশী বস্ত্র পরিধানের কথা বললেন।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

জয়নারায়ণ সিং মূল প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে, দেশে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এইসকল দুর্ভাগা মহিলাদের পক্ষে খদ্দর মুক্তির উপায় স্বরূপ।

নিমকর মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে অনেককে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে।

সংশোধন প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হল।

তারপর মূল প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

শিখ বন্দীদের সম্বন্ধে পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন রাজ আয়ার।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করছে যে যদিও গভর্ণমেন্ট গুরুদ্বা[illegible] সম্বন্ধে আইন পাস করে শিখদের দাবীর ন্যায্যত[illegible] স্বীকার করেছে তথাপি এখন পর্য্যন্ত সরদার খড়গ সি[illegible] এবং অন্যান্য গুরুদ্বার-বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় নি।

এই কংগ্রেসের মতে শিখদের সমস্যা সমাধান হবে ন[illegible] যতক্ষণ পর্য্যন্ত (১) গুরুদ্বার আন্দোলন উপলক্ষে ধৃ[illegible] সকল বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া না হয় (২) তাঁদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার দমন-নীতিমূলক ব্যবস্[illegible] তুলে নেওয়া না হয় এবং (৩) শিখদের বর্তমা[illegible] অসন্তোষের কারণগুলি অপসারণ না করা হয়।

এই কংগ্রেস শিখ সম্প্রদায়কে পুনরায় প্রতিশ্রুতি[illegible] দিচ্ছে যে, গভর্ণমেন্টের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রামে কংগ্রেসে[illegible] পুরামাত্রায় সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। তাঁদে[illegible] অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন অহিংস কর্ম্মসূচ[illegible] শিখেরা গ্রহণ করবেন কংগ্রেস তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থ[illegible] করবে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে আয়ার মশায় ইংরেজীত[illegible] নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সাহেব উর্দুতে প্রস্তাব সমর্থ[illegible] করলেন।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বাংলা[illegible] ভাষণ দিলেন।

তারপর কোমাগাতা মারুর প্রসিদ্ধ গুরদিত সিং মূল প্রস্তাব থেকে নাভার মহারাজার প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ায় অ[illegible] উত্তেজনাজনক ভাবে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতা[illegible] উত্তেজিত হয়ে তাঁর অনুগামী অর্দ্ধশতাধিক শিখ সদস্য সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তখন সভাপতি মশায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন যে বিষয়টি ভারতীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আশঙ্কা[illegible] কংগ্রেস এ-সম্বন্ধে কোনপ্রকার মত প্রকাশে বিরত আছে। এ-সম্বন্ধে যা কিছু করণীয় তার সিদ্ধান্তের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়েছে। এতে মহারাজা[illegible] কোন অপকার হবে না।

সভাপতি মশায়ের আসন গ্রহণ করার পর বাবা গুরুদিত সিং বললেন যে এই প্রস্তাব শিখদের আশা পুরোপুরি পূর্ণ করে নি, কারণ নাভার প্রস্ন প্রস্তাব থেকে বাদ দিয়ে শিখদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করা হয় নি, যাই হোক তিনি সভাপতির নির্দেশ মেনে নিলেন।

এইসময় পঞ্জাব ব্লক থেকে একজন শিখ দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন যে শিখরা প্রতিবাদ স্বরূপ প্যাণ্ডেল থেকে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে দশজন প্যাণ্ডেল পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। ফলে পঞ্জাব ব্লকে গোলমালের সৃষ্টি হল। তখন দিল্লীর সর্দার গুরবক্স সিং বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করে বাবা গুরুদিত সিং-এর আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন। তারপর সভাপতি মশায় বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর রুলিং দ্বারা নাভার মহারাজার স্বার্থের কোনপ্রকার ক্ষতি হবে না। মহারাজার বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সভাপতির উক্তির পর প্যাণ্ডেলে শান্তি স্থাপিত হল।

তারপর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায় কংগ্রেস সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধনের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রায় সবগুলি গৃহীত হল কেবল প্রতিনিধিদের ফি এক টাকার পরিবর্তে দশ টাকা করার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হল। গৌহাটী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির অর্থ-সঙ্কট মোচনের জন্য কেবলমাত্র গৌহাটী কংগ্রেসের জন্য পাঁচ টাকা ফি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর প্রস্তাবানুসারে রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডাঃ এম্. এ. আনসারী আগামী বৎসরের জন্য সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবপরীক্ষক পুনরায় আগামী বৎসরের জন্য নিযুক্ত হলেন।

তারপর কংগ্রেসের কার্য্যের সমাপ্তি হল।

তখন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এস্. সত্যমূর্তি, ইংরেজী ভাষায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যথোচিত ধন্যবাদ দিলেন। তিনি কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে যুগান্তকারী আখ্যা দিলেন।

সভাপতি মশায়কে ধন্যবাদ দিতে উঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সভাপতিমশায়ের সুদক্ষ পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করলেন কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দুঃখের সহিত জানালেন যে এই অধিবেশনের ফলে তাঁর দল এবং স্বরাজ্য দলের মধ্যে ঐক্যের পথ আরও দুরূহ হয়েছে।

ধন্যবাদের উত্তর দিতে উঠে সভাপতি মশায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদের তাঁদের সেবার জন্য প্রশংসা করলেন। তিনি বিশেষ করে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে তাঁর সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং আশা প্রকাশ করলেন যে অদূর ভবিষ্যতে সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর ঐক্য স্থাপিত হবে।

সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করার পর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

তারপর অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে তামিলনাড় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নিমন্ত্রণে আগামী বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান মাদ্রাজ স্থির হল।

(১১)

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার পর আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান রজনীমোহন এবং আরও দুজন বন্ধুসহ কামাখ্যা পাহাড়ে উঠে আমাদের পারিবারিক পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় নিলাম। কামাখ্যার পাণ্ডার মত ভদ্র পাণ্ডা আর কোথাও দেখি নি। আমরা তিন-চার দিন তাঁর গৃহে ছিলাম। পাণ্ডা মশায়ের সাহায্যে কামাখ্যা দেবীর মন্দির এবং কামাখ্যা পাহাড়ের অন্যান্য মন্দির ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করলাম। কামাখ্যা পাহাড়ের উপর

থেকে অদূরে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের দৃশ্য অতি মনোহর। পাণ্ডু থেকে গৌহাটি শহরের পথটিও অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাণ্ডা মশায়ের উপদেশানুসারে আমরা ব্রহ্মপুত্র নদের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্মিত উমানন্দ ভৈরবের মন্দির এবং গৌহাটী শহরের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করলাম।

আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাণ্ডা মশায় ও তাঁর পরিবারের লোকদের যত্নের ত্রুটি ছিল না। বাড়ীর মহিলারা স্বহস্তে রান্না করে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন অথচ পাণ্ডা মশায়ের এ-সকলের জন্য কোন দাবি ছিল না। আমরা স্বেচ্ছায় যা দেব তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলেছিলেন। বিদায় নেবার সময় আমরা তাঁকে যথোচিত অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ব্যাপারের উল্লেখ করতে হচ্ছে। আমাদের পাণ্ডার গৃহে আর একদল বাঙ্গালী যুবক আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর ভদ্রতা এবং তাঁর প্রদত্ত আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার বিনিময়ে একটি পয়সাও পাণ্ডা মশায়কে না দিয়ে চলে আসেন।

গৌহাটী ভ্রমণের পর আমার ভাই আসাম মেল্-এ দেশে রওনা হয়ে গেল, আমি বিখ্যাত লামডিং বদরপুর রেল লাইনের শোভাদর্শন মানসে সেই পথে কলকাতা রওনা হলাম। ট্রেনে ওঠবার সময় দেখি মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম পুত্র দেবদাস গান্ধী (পরবর্ত্তীকালে চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারির জামাতা হন) এবং মহাত্মাজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই মশায়রাও কয়েকজন সঙ্গীসহ ঐ পথে কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ট্রেনে উঠেছেন।

লামডিং বদরপুর পথের অতুলনীয় শোভা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ট্রেনটি যখন পর্ব্বতমালার শিখরে ক্রমে ক্রমে উঠতে লাগল তখন নীচে রেল লাইনের তিনটি লুপ দৃষ্টিগোচর হল। যেমন বিশাল পর্ব্বতমালা তেমনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ দৃশ্যটিকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছিল। এই শোভা দর্শন করে হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হল। শিলিগুড়ি দার্জ্জিলিং রেলপথ বা বম্বে-পুণার পশ্চিম ঘাটের উপর নির্মিত রেলপথের শোভা অপেক্ষা লামডিং বদরপুরের লাইনের শোভা বহুগুণ বেশী চিত্তাকর্ষক। ঐ পথে ট্রেনে চাঁদপুরে এলাম। সেখান থেকে স্টীমারযোগে গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে কলকাতায় ফিরলাম।

ক্রমশ:

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা'

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলা কাব্য সাহিত্যে মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি, অনায়াস বিবৃতি এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশ —একান্তই তাঁর নিজস্ব। যে স্বাভাবিক পরিমণ্ডলে তিনি বিচরণ করেছেন সেইটিই তাঁর কাব্যজগৎ। তাঁর কাব্য তাই সহজ সরল, অথচ গভীর এবং মাধুর্যময়।

বাংলা সাহিত্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮—১৯২৪) কাব্যগ্রন্থ মোট নয়খানি—কবিতাহার (১৮৭০), অরত কুসুম (১৮৭৩), অশ্রুকণা (১৮৮৭), আভাষ (১৮৯০), শিখা (১৮৯৬), অর্ঘ্য (১৯০২), স্বদেশিনী (১৯০৬), সিন্ধুগাথা (১৯০৭) এবং নাট্য কাব্য সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই (১৮৯২)। কিন্তু তার অশ্রুকণা কাব্য উৎকর্ষ এবং জনপ্রিয়তা—দুটি দিক্ থেকেই শ্রেষ্ঠ।

'অশ্রুকণা' নামকরণের মধ্যেই কিছুটা কাব্যবস্তুর পরিচয় আছে। ভূমিকায় কবি বলেছেন—"অধিকাংশ কবিতা শোক সম্বন্ধীয় বলিয়া পুস্তকের নাম 'অশ্রুকণা' রহিল।" বাংলাদেশের অপর দুই শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসুর ন্যায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকেও বৈধব্য জ্বালা সহ্য করতে হয়। তাঁর স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে কবিতা রচনায় খুব উৎসাহ দিতেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহও ছিল অপরিসীম। কিন্তু ১৮৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সেজন্যে স্বাভাবিক কারণেই গিরীন্দ্রমোহিনী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁর সে সময়ের মানসিক জ্বালা নিবৃত্তির একটি প্রকৃষ্ট পথ হয় কাব্য। হৃদয়ের অপরিসীম বেদনা এবং শোকের মধ্যে 'অশ্রুকণা'র কবিতাগুলি রচিত—সেদিক্ থেকে অনুভূতি, স্বাভাবিকতা ও আকুলতায় অনবদ্য হয়ে ওঠার সুযোগ এবং পরিসর ছিল কবিতাগুলির। গীতি-কবিতার যে সুর-মূর্ছনা কবিতাকে একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় নিটোল করে 'অশ্রুকণা' সেই ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত। তাই অশ্রুকণার আবেদন এবং আহ্বান দুই-ই কালজয়ী; মানবপ্রকৃতির যে-বিশেষ অবস্থায় কবিতাগুলির জন্ম সে-অবস্থার ছবি সর্বকালীন, তাই সেদিক্ থেকেও অশ্রুকণার কাব্যমূল্য অপরিসীম। সেদিক্ থেকে প্রকাশ কালে অশ্রুকণার অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা লাভ সঙ্গত।

'অশ্রুকণা' মোট নিরানব্বইটি কবিতা নিয়ে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'অধিকাংশ কবিতা শোক সম্বন্ধীয়' হলেও অন্যান্য কবিতাও আছে। মোটামুটি ভাবে কবিতাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করলে দাঁড়ায়—শোক সম্বন্ধীয়, মাতৃস্নেহ, ভগবৎ প্রেম, প্রকৃতি প্রেম এবং দাম্পত্য প্রেম। শোক সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে—একটি বিধবার প্রতি, হায় কেন? এ কি? হৃদয়-পাখী, কতদিন, মরীচিকা, কোথায়, আকুলব্যাকুল হৃদি, ছাই, অশ্রু, বিষাদ, শ্মশান, বিধবা, তুমি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে পূর্ণিমাগীতি, মাধবী, গোলাপ, পাখী, গ্রাম্য ছবি, যমুনাকূলে, পাড়াগাঁ, বর্ষা, গার্হস্থ্যচিত্র, প্রজাপতি, জ্যোৎস্না, কাননে, পর্বত প্রদেশ, প্রভৃতি উল্লেখ্য। প্রেম বিষয়ক কবিতার মধ্যে প্রেম, পিপাসা, সুধা না গরল, উৎকণ্ঠিতা, প্রিয়তম, বাঁশরী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বিষয় যাই হোক, অনেক কবিতায় কবির শোকদগ্ধ হৃদয়ের ছাপ থেকেই গেছে। বিষয়বস্তুর ওপর এই শোকের ছায়া কবিতার ওপরও কিছুটা বাড়তি মাধুর্য আরোপ করেছে। বেদনা এবং আনন্দ একসঙ্গে মিশে কোন কোন কবিতায় একটি অনাস্বাদিত রসের সৃষ্টি করেছে। শোক তাই কাব্যের কোথাও অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। কবির নিজের কথায় নেয়লে প্রেমের সিন্ধু,

হৃদয়ে সৌন্দর্য-রাশি।' তারই রস সিঞ্চনে 'অশ্রুকণা' পরিপুষ্ট।

বৈধব্য অবস্থার ছবি কবি অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অবস্থা তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে—'প্রাণের মাঝে শ্মশান-ভূমি, চারিদিকে উড়ছে ছাই।' পত্নীবিয়োগে রচিত অক্ষয়কুমারের 'এষা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' বাংলা কাব্য সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ, পতিবিয়োগে রচিত গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা'ও এক কথায় অনবদ্য। গিরীন্দ্রমোহিনীর অশ্রুজল কাব্যে মুক্তায় পরিণত হয়েছে। তাঁর শোকাশ্রু হল—

এ শোকাশ্রু।
নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু।
বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু।
হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু।
জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।
(উপহার)

এই শোকাশ্রুতে পরিপূর্ণ তাঁর অন্তর। কিন্তু সবই সেই স্বামীবিরহে কেন্দ্রীভূত।

তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ।
তার প্রেম আশ তাহার আবাস,
তাহার আমি—এ বাদ,
তাহার এ দেহ তাহার বিরহ,
ত্যজিতে নাহিক সাধ।
(কোথায়)

তাঁর মানসিক এ অবস্থা সম্পর্কে তিনি অকপটে নিজেই একস্থানে বলেছেন—

মনের মাঝারে যদি দেখাবার হত, সই
তবে দেখাতাম খুলে, কত যে যাতনা সই।
(প্রেমময়ী)

তাই এ জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন জেগেছে—

এ দীর্ঘ জীবন-পথে
একেলা কি হবে যেতে?
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কভু তার।
কে বলে দেবে গো মোরে,
পাব কত দিন পরে
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার।
(ধ্রুব)

দীর্ঘদিন এ বিরহ-যাতনা সহ্য করে তিনি কাতর হয়ে পড়ছেন। অধৈর্য কবি তাই বলেছেন—

ক্রমে তার অদর্শন হ'ল অর্ধযুগ,
ফাটিল না, ফাটিল না তবু পোড়া বুক।
(ছয় বৎসর)

কিন্তু অধৈর্য হলেও তিনি কোন কোন মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি তো স্বামী ছাড়া নন। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে স্বামীর স্পর্শ সুস্পষ্ট, তাঁর সমগ্র জীবনই তো তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে ঘিরে—

তুমি কি গিয়াছ চ'লে?
নানা, তা' ত নয়।
যদ্দিন বাঁচিব আমি,
তদ্দিন জীবিত তুমি
আমার জীবন যে গো
শুধু তোমা-ময়।
(তুমি)

কিন্তু এ তো সাময়িক সান্ত্বনা? জীবজগতের সব কিছুর মধ্যে কবি তাঁর বিষাদময় অন্তরের সুর-সঙ্গতি খুঁজে দেখেছেন। তবে তো তাঁর যাতনা একার নয়। তাঁর মনে হয়েছে—

তটিনী যেতেছে বহি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
দুখীর রোদন সম, বাঁধিয়া বাঁধিয়া।
পূর্ণিমার নিশি যেন বিবশা হইয়া,
তটিনীর উপকূলে পড়েছে শুইয়া।
(আজ)

মলিন মাধবীকে দেখেও তাঁর নিজের অবস্থার কথা মনে পড়েছে। তাই ব্যাকুল ভাবে মাধবীকে প্রশ্ন করছেন তিনি—

তুমিও কি অভাগিনি!

তোমারো কি গেছে, সখি, চিরসুখ, মধুমাসে?

কাঁদিবে আমারি মত মলিন বৈধব্য-বাসে।

(মাধবী)

তাঁর এই অবস্থার একমাত্র কারণ তাঁর স্বামী-বিয়োগ; কবি সেকথা উপলব্ধি করে বলেছেন—তাই যদি হয়, তাহলে বস্তুজগতে এত কিছুর সমারোহ কেন? সব কিছুই তো ওই শোকের কাছে ম্লান—

বৃথা কেন, এই পাঠাগার,

জীবনের নাই পরপার!

ঘুচে গেল যত গণ্ডগোল,

বল হরি, হরি হরি বোল।

(হাই)

কিন্তু তাঁর এই ক্রন্দন শোকসর্বস্ব নয়, ব্যাকুল হৃদয়ের প্রেমাঞ্জলি—

এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুখাবে,

তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।

(প্রেমাঞ্জলি)

এই শোকাশ্রুর মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই। হাহাকার আছে, কিন্তু প্রেমও আছে। দুঃখ বেদনা আছে, কিন্তু নৈরাশ্যের শূন্যতা নেই। এজন্যেই হয়তো তাঁর পতিভক্তি—ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে। তাঁর মূল কথা তাই—

জানি শুধু—এই শুধু, তুমি মহা আকর্ষণ!

এবং এই অস্তিত্ব, এই অনুভূতির সঙ্গে আছে তাঁর আন্তরিক আত্মসমর্পণ—

কেন ভালবাসি তোমা, তাহা আমি নাহি জানি!

তোমার যে বাসে ভাল, সে পায় তা', অনুমানি।

(প্রভাতে)

গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি-প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একস্থানে বলেছেন—"গিরীন্দ্র-মোহিনীর প্রকৃতিটি একরূপই কবিজনোচিত। গর্ব নাই, দেষ নাই, আড়ম্বর নাই। শান্ত মৃদু কথাবার্তায় মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধবাসিনী কবি নিতান্তই যেন 'প্রকৃতিপালিতা'। আজও পর্যন্ত ইনি গম্ভীর প্রকৃতি গৃহিনী (Serious Housewife) নহেন। কিন্তু ভব-সমুদ্রের কূলে তিনি আবার সমুদ্রেরই মত গভীর।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য-রসাস্বাদন করতে গেলে তাঁর এই প্রকৃতিটি স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই আড়ম্বরহীন শান্ত মৃদু মিষ্ট মধুর বচনের গুণে তাঁর কাব্য এত মধুর। তাঁর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি কাব্যকে কতটা মর্মস্পর্শী করতে পেরেছে দু-একটি উদাহরণ তার প্রমাণ।—গোলাপফুল দেখে তিনি বলেছেন—

তুই কি রে নিরমল প্রেম,

ধরায় ফুটিলি হ'য়ে ফুল?

তাই কি রে তোরে হেরে সদা

প্রাণ হয় এমন আকুল।

এই স্বাভাবিকতার মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য সৃষ্টিই হল গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগুণের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে কি গভীর দর্শনই না সহজ সরল হয়ে ধরা দেয়। অসীম যেন বাঁধা পড়ে সীমারেখায়—

প্রেম যদি কালকূট হবে,

ত্যজিতে পারি না কেন তারে?

রাখি কেন বুকের মাঝারে?

মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া?

—তবে বুঝি, প্রণয় অমিয়া?

(সুধা না গরল)

চিত্রধর্মিতায় কবি গিরীন্দ্রমোহিনী যথাযথ চিত্রকর। তাঁর তুলি যেমন নিপুণ, তেমনি সুস্পষ্ট। নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের দুটি সার্থক দৃষ্টান্ত হল তাঁর গ্রাম্য ছবি ও গার্হস্থ্য ছবি কবিতা দুটি। গ্রাম বাংলার অনাদিকালের এবং চিরকালের বাঙালী পরিবারের ছবিটি অপরূপ সুষমায় চিত্রিত এই কবিতা-দুটিতে—

পিঞ্জরায় বদ্ধ বাঁধা, বউ কথা কহে কথা,

বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে;

মাকে তুলসীর চারা গৃহে শিশু বাক্স-ঝারা,

খোকা শুয়ে মাদুর বোলাতে। (গ্রাম্য ছবি)

অথবা আর একটি অনবদ্য ছবি—

ফুটফুটে জোছনায়, ধবধবে আঙিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে। (গার্হস্থ্য ছবি)

গিরীন্দ্রমোহিনী আজ বিস্মৃত, তাঁর কাব্যগুলিও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু কখনও কোন শোকদগ্ধ তাপিত হৃদয়ে অথবা সৌন্দর্যলিপ্সু হায় আকুল আর্তিতে যদি কোন কাব্য-রসিক কীটদষ্ট 'অশ্রুকণা'র পাতায় মনোনিবেশ করেন তাহলে গীতিকবিতার নিস্তব্ধ মহাসমুদ্রের কল্লোলে তিনি আলোড়িত হবেন—সন্দেহ নেই। এ আলোড়ন শুধু বিস্ময়ের নয়, পুলক এবং বিষাদেরও। জীবনে যেমন অশ্রুকণার আবেদন সর্বজনীন এবং সর্বকালীন—কাব্যজগতেও তেমনি 'অশ্রুকণা' অপূর্ব অনবদ্য।

অবিস্মরণীয়া মা

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

দেখতে দেখতে সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপী মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই সময়টিতে রণোন্মত্ত জার্মান ঈগল তার দুই পক্ষ বিস্তার করে সমস্ত বিশ্বের আকাশে হতাশার একটা কালো ছায়া এনে দিয়েছিল সেদিন। এই সময় দুর্ধর্ষ জার্মান নাৎসী বাহিনী হল্যাণ্ডকে কোন রকম সতর্ক না করেই হঠাৎ দেশটির অধিকাংশই অধিকার করে নিয়েছিল সেদিন। ওলন্দাজগণ প্রবল ভাবে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও শক্তিশালী জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন কিছুই করে উঠতে পারেনি তখন।

দেশের এই পরম দুর্দিনে প্রবল নৈরাজ্যের মধ্যেও এক বিংশতিবর্ষীয়া ওলন্দাজ তরুণী কোন এক শুভদিনের কল্পনায় বিভোর হয়ে চিন্তা করে চলেছেন তখন—"বিশ্ব একদিন বিপদ্‌মুক্ত হবে। তাঁর দেশ পুনরায় হয়ত স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হবে। ক্রীড়া জগতে তিনিও হয়ত বিশ্ববিজয়িনীর সম্মান অর্জনে সমর্থ হবেন।"

হ্যাঁ, এদিনটি সত্যেই তবে ফিরে এসেছিল ফ্যানী ব্লাঙ্কার্স কোয়েনের (Fanny Blankers Coen) ভাগ্যে। কিন্তু সেদিন যখন ফিরে এসেছিল, ফ্যানী তখন একজন অতিক্রান্ত-যৌবনা ত্রিংশতি বৎসর বয়স্কা সাধারণ গৃহস্থ বধূ।

ফ্যানীর জীবনের এই পরম ক্ষণটিতে বিশ্ববাসী তখন তাঁকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। এই কঠোর মনোবল সম্পন্না অতুলনীয় নারীর দ্বাদশ বৎসরের কঠোর সাধনাকে বিশ্ব-বাসী একটু তুচ্ছ ভাবেই নিয়েছিলেন সেদিন। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন, এই বিগত-যৌবনা নারীকে সুযোগের সন্ধানে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষমান থাকতে হয়েছে। সুতরাং এই অতিক্রান্ত-যৌবনা নারীর মধ্যে হয়ত তখন অতীত যৌবনের দীপ্তিময় শক্তি ও সামর্থ্য নাও থাকতে পারে।

এইজন্যই অনেকে তখন ফ্যানীর তৎকালীন সাফল্যের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করে তার একটি নূতন নাম-করণ করেছিলেন "অতুলনীয় মা" বা "Marvellous Ma"।

বিশ্ব-বাসীর এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যই ফ্যানী "বিস্ময়কর মা" নামক শ্রদ্ধাসূচক নাম নিয়েই ১৯৪৮

সালের ওলিম্পিক আসরে প্রতিযোগিতা করতে সাহসী হয়েছিলেন সেদিন।

বিরুদ্ধ পরিবেশ, ভাগ্যবিপর্য্যয় আর গভীর নৈরাজ্যের মধ্যেও ফ্যানী কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও তখন পর্য্যন্ত তাঁর মধ্যে শক্তি সামর্থ্যর কোনই তারতম্য ঘটে নি।

অনেকের মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্যানীকে ক্রীড়া-জগতে তাঁর স্বাধিকার স্থাপনা থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ—যুদ্ধের জন্য ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সালের ওলিম্পিক আসর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় নি। এইজন্যই তাঁকে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকের জন্য।

ফ্যানীর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে—যে কয় বৎসর ওলিম্পিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি সেই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্চাশটি ইউরোপীয় রেকর্ড ও দুইটি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছিলেন। দুইটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত দুইটি বিষয়ে প্রতিযোগিতার সংকল্প স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তিনি ওলিম্পিকের স্বল্প পাল্লার দৌড় ও ৮০ মিটার হার্ডল রেসের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করেছিলেন তখন।

এই ওলন্দাজ মহিলা নেদারল্যাণ্ডসের আমষ্টারডাম শহরে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে সাঁতারের প্রতিই তাঁহার অধিক আসক্তি ছিল। তখন তিনি স্বল্প পাল্লার দূরত্বের সাঁতারের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সন্তরণ করার বিভাগে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন না করায় এ্যাথলেটিকসের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই সময় মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ১৯৩৬ সালের বার্লিন ওলিম্পিকে হাইজাম্প বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তিনি দেশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় মাত্র ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনি তখনকার মত দেশে প্রত্যাগমন করেন।

দেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি প্রায় আধ ডজন এ্যাথলেটিক্স বিভাগের প্রতিটি বিষয়ই মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করে পরবর্তী ১২ বৎসরের জন্য ইউরোপের সকল নারী ক্রীড়াবিদ্‌দের পুরোভাগে থাকতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি ইউরোপের বহু দেশের বহু প্রতিযোগিতায় যোগদান করে প্রতিটি বিষয়েই জয়লাভ করেন। তিনি অতঃপর জনসমক্ষে "Fabulous Fanny" নামে পরিচিত হন।

এই সময়টিতে অন্যান্য ক্রীড়াবিদ্‌দের মতন তিনি কিন্তু সর্বতোভাবে আপনাকে ক্রীড়ার মধ্যে নিয়োজিত রাখেন নি। ক্রীড়া-জীবন ব্যতীতও তিনি তাঁর নিজস্ব গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিও কোন অবহেলা প্রদর্শন করেন নি তখন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ডাক্তারের গৃহিণী এবং দুই সন্তানের জননী। সাধারণ জীবনে তিনি ছিলেন সরলমতি স্নেহবৎসলা কোমল-প্রাণা জননী একজন। ক্রীড়া জীবনে তিনি ছিলেন কিন্তু একজন অতি কঠোর নিয়মানুগ উচ্চাভিলাষী নারী।

১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকে একজন উত্তর-যৌবনা মহিলাকে নিজের থেকে দশ বৎসরের ছোট প্রতি-যোগিনীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে দেখে অনেকেই তখন ইহাকে লজ্জার বিষয় বলে মনে করেছিলেন। তবুও কিন্তু এই বিগত-যৌবনা মহিলা ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকে নিজেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্‌দের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁর এই কৃতিত্ব আর কেহ কোনদিন ম্লান করে দিতে সমর্থ হবে কি না সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নিজস্ব বিভাগের (Individual Event) তিনটি এবং রীলে রেসের একটি পদক নিয়ে তিনি সর্ব সমেত চারিটি স্বর্ণ পদকের অধিকারিণী হন। ওলিম্পিকের ইতিহাসে তখনও পর্য্যন্ত কোন মহিলার পক্ষে এ কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভবপর হয় নি।

১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকে ১০০ মিটার ২০০ মিটার দৌড়, হার্ডল রেস এবং ৪০০ মিটার রীলে রেস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ফ্যানী সেদিন চারিটি স্বর্ণ পদক জয় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ওলিম্পিকের এই বিস্ময়কর কৃতিত্বে তিনি তাঁর পূর্বতন দুইটি বিভাগের বিশিষ্টতাকেও অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন সেদিন।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রতিযোগিনীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই প্রৌঢ়া মহিলা ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকে ১১.৯ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড় বিভাগে সর্বপ্রথম বিজয়িনীর স্বর্ণপদক লাভে সমর্থ হন। এরপর ২৪.৪ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে একটি বিশ্ব রেকর্ডের সহিত তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ৮০ মিটার হার্ডল দৌড়ে অতঃপর তিনি বিশ্ব-খ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে পুনরায় একটি বিশ্ব রেকর্ড করে তাঁর তৃতীয় স্বর্ণপদক অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ দর্শকদের নিকট ঐ প্রৌঢ়া মা তখন "বিস্ময়কর মা" পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু দর্শকদের বিস্ময়ের বোধহয় আরও কিছুটা বাকী ছিল। এরপরেও ফ্যানী রীলে রেস প্রতিযোগিতার নিজস্ব প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিকে পরাজিত করে স্বীয় দল এবং দেশকে পুনরায় বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন। এই সময়টিতে বিশ্ব সমাগত প্রতিনিধিগণের সকলেই তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

ওলিম্পিক ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা যিনি একই ওলিম্পিকের এ্যাথলেটিক্স বিভাগে একাদিক্রমে চারিটি স্বর্ণপদক লাভে সমর্থ হয়েছেন।

ওলিম্পিক বীর J.C. Wanes-এর পর তিনিই প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ্ যিনি ওলিম্পিকের সমগ্র স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিনিধিদের মধ্যে পুনরায় এই প্রশংসনীয় গৌরবের অধিকারিণী হন।

তাঁর এই কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে World Press সেদিন ফ্যানীকে পুরুষ J.C Wanes-এর নারী সমকক্ষা রূপে বর্ণনা করেছিলেন।

যুগযুগব্যাপী নারী ও পুরুষের ওলিম্পিক অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে Fanny এবং J. C. Wanes-এর কথা স্মরণ হ'লে আমাদের মনে উদিত হয় কবি-কণ্ঠের সেই অমর বাণী——

"কোন কালে একা হয় নাই জয়ী
পুরুষের তরবারি।
শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে
বিজয়লক্ষ্মী নারী॥"

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

সন্তোষকুমার দে
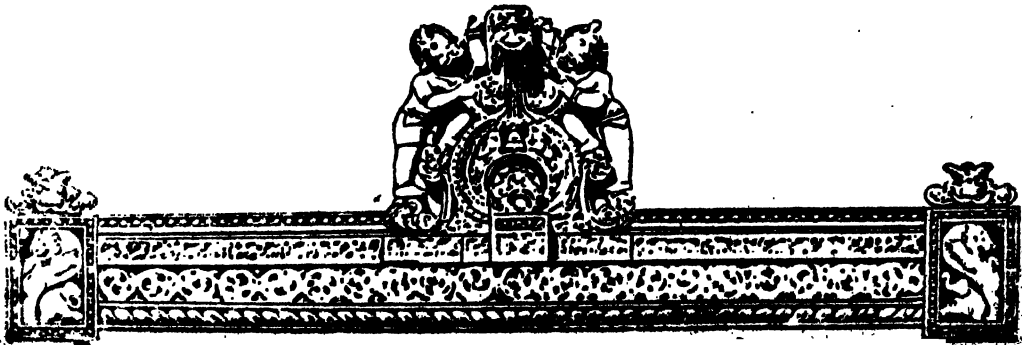
যশস্বী লেখক শ্রীদিলীপকুমার রায় "অঘটন আজও ঘটে" শীর্ষক যে-সব পুস্তক লিখেছেন এবং তাতে যে-সব অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছেন, তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যদি সত্য হয়, তাহলে অনেককে ভাবিত করে তুলবে, কেমন করে এ সব সম্ভব হয় তাই নিয়ে। ঘটনাগুলোকে অবশ্য একেবারে অসত্য বলছিনে, তবে এইটুকু বলা চলে যে, ঘটনাগুলো পরীক্ষিত সত্য নয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাস্তববাদী ব্যক্তিরা অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করেন না; আর স্বভাব-সন্দেহী বিজ্ঞানীরা যে এগুলিকে পাত্তা দেবেন না সেটা জানা কথাই। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, চাকা যেন ঘুরে গেছে। কয়েক বছর আগেও যে সব অলৌকিক ঘটনার (সাইকিক্যাল হ্যাপনিংস) কথা শুনে বিজ্ঞানীরা ঠোঁট ওল্টাতেন, এখন যেন মনে হয় তাঁরা আর তেমনটি করেন না। এই-সব অলৌকিক ঘটনার কোন কারণ আছে কি না জানতে যেন তাঁরা এখন কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

অলৌকিক ঘটনা বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস না করার কারণ হল, সেই যে কবে, কোন্ প্রাচীন যুগে প্লেটো বলেছিলেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া মানুষের মনে কোন জিনিস রেখাপাত করতে পারে না, মানুষের কিছু জানা বা উপলব্ধি করা সম্ভবই নয়। আর প্লেটোকে অনুসরণ করে দার্শনিক জন লকও বলেছিলেন, জন্মলগ্নে মানুষের মন একখানা ধোয়ামোছা শ্লেটের মতো, পরে সেই শ্লেটে যে-সব দাগ পড়ে সেগুলো ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হয়ে থাকে। আমাদের যোগশাস্ত্র পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়াও আর একটি ইন্দ্রিয়ের কল্পনা করেছে। হঠযোগের সাহায্যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় বলেও অনেকের বিশ্বাস। তা ছাড়াও অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা প্রভৃতি আট রকম ঐশ্বর্যের বিষয়ও আমাদের শাস্ত্রে কল্পনা করা হয়েছে।

যাই হোক দিলীপকুমার রায় মহাশয় যে-সব অলৌকিক ঘটনার কথা তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, সাধারণ বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই সব ঘটনার ব্যাখ্যার জন্যে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা খোলা হয়েছে। তার নাম হল প্যারা-সাইকলজি (অতি-মনস্তত্ত্ব বা পরাবিদ্যা)। একে এব্‌নরম্যাল সাইকলজি বলা হয়নি, কারণ, বায়ুরোগ (সাইকো-নিউরোসিস্) প্রভৃতি অনেক অস্বাভাবিক অবস্থা (এব্‌নরম্যাল কণ্ডিশন) বিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়ম বা বিধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা চলে।

এই নববিজ্ঞান, অতি-মনস্তত্ত্বের পর্যায়ে কোন্ কোন্ বিষয় পড়ে সেগুলো আগে থেকে জেনে রাখা ভাল। আগেই বলা হয়েছে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্যাহায্য ছাড়াই যে-সব খবরাখবর মানুষ পায় এবং যে যে ক্ষেত্রে জড়-পদার্থের ওপর মানুষ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, সেগুলো সবই এই শাস্ত্রের অন্তর্গত। এই রকম বিষয়গুলো হল,—টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ার-ভয়েন্স, ক্লেয়ারঅডিএন্স, প্রিকগনিশন, রিকগনিশন, প্রিমনিশন, সাইকো-কিনেসিস, প্রোফেসি, লেভিটেশন, পলটারগাইস্ট, রিকলেকশন অব ফরমার বার্থ প্রভৃতি। এক কথায় প্যারানরম্যাল অর্থাৎ

অলৌকিক ঘটনাই হল প্যারাসাইকলজির বিষয়। এগুলি আমাদের যোগশাস্ত্রে কিছু আলোচিত হয়েছে। আগে শিক্ষিত লোকেরা, বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা এগুলো একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। এখন ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এদের বিজ্ঞানসম্মত কারণ কিছু কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে, আর এদের অবিশ্বাস করবার কারণ নেই।

বহুদূরের দৃশ্য কোন যোগসূত্র ছাড়াই চোখে দেখতে পাওয়া, দূরের শব্দ কানে শুনতে পাওয়া, একজনের মনের ইচ্ছা আর একজনের মনে আরোপিত করা সম্ভব বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের লক্ষ্য করে এখন আবার অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন—রেডিও, টেলিভিশন, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হবার আগে যদি এদের কথা কেউ বলতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা এগুলোকে আজগুবি বলতেন; কিন্তু আজ এগুলো বাস্তব সত্য। শুধু তাই নয়, শক্তিশালী গ্রাহক যন্ত্র (রিসিভার) থাকলে শুধু পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকেই নয়, দূরদূরান্তের গ্রহনক্ষত্র থেকেও দৃশ্য ও শব্দ সবই দেখা ও শোনা যাবে। তাহলে অতি-মনস্তত্ত্বের বিষয় টেলিপ্যাথি প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনাগুলো অবিশ্বাস করবার কি কারণ থাকতে পারে? এই-সব যুক্তিতর্ক থাকা সত্ত্বেও অতি-মনস্তত্ত্বকে অনেক অতিবুজরুকি, কুসংস্কার ও ধাপ্পাবাজি বলে মনে করে এসেছেন। বিজ্ঞানীরা ত সহজেই একে স্বীকৃতি দেন নি—অনেক কূটতর্ক তুলেছেন। বলেছেন, লেবরেটরিতে বসে টেষ্ট টিউবের মধ্যে এর পরীক্ষা না হলে একে স্বীকার করব কেন। মনোবিজ্ঞানীরাও ঐ মত অনেকদিন ধরে পোষণ করে এসেছেন। তাই দেখতে পাই, কিছুদিন আগেও H. J. Eysenck নামে একজন মনোবিজ্ঞানী টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স প্রভৃতিকে nonesnse in psychology বলেছেন। তাঁর বইটির নাম হল—Sense And Nonsense In Psychology।

এইবার অতি-মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলো নিয়ে একটা একটা করে আলোচনা করব। তারপর এগুলো কি করে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেল এবং তাদের বৈজ্ঞানিক কারণ কিছু আছে কি না তা জানবার চেষ্টা করব।

টেলিপ্যাথি

বাংলায় বলতে হলে বলতে হয়, শব্দ বা সঙ্কেতের ব্যবহার না করেই চিন্তার যোগাযোগ। এটি হল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে দূরবর্তী দুই ব্যক্তির মধ্যে মনোভাবের যোগাযোগের ব্যাপার। এতে একজন হয় চিন্তাপ্রেরক, অপরজন হয় চিন্তাগ্রাহক। টেলিপ্যাথি হল অতিমনস্তত্ত্বের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সব চেয়ে পরিচিত বিষয়। আমাদের দেশে যোগী ও সাধকেরা হাজার হাজার মাইল দূরের দৃশ্য ও শব্দ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ করতে পারতেন, একথা সকলেই শুনেছেন; কিন্তু বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা এসব কথা বিশ্বাস করতেন না, এগুলোকে বাজে কথা মনে করতেন। আজকাল ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা এগুলোকে অলীক বা বুজরুকি বলে মনে না করে এর বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন দেখে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতের পরিবর্তন হয়েছে।

হয়ত সন্তান কোন দূর অজানা স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কোনরকম খবর পাঠাবার উপায় নেই। মা কিন্তু এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে সে খবর মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে গেলেন। মা যেন বলেন,—"আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে/কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।" এ রকম অসংখ্য ঘটনার কথা প্রায় শোনা যায়। হতে পারে এরকম বহু ঘটনা অলীক বা অতিরঞ্জিত; তবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষিত ঘটনারও বহু উল্লেখ আছে। এই রকম একটা পরীক্ষিত ঘটনার কথা এখানে বলা হচ্ছে। এটির বিবরণ ডাঃ হ্যাডফিল্ড নিজে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চ্যাথাম নৌহাসপাতালে কাজ করবার সময় এক নাবিক চিকিৎসার জন্যে তাঁর কাছে আসে। কিন্তু চিকিৎসার দিন সে বলে, তার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সোয়াস্তি পাচ্ছে না, তাই ঠিক ঠিক রোগের

বিবরণ হয়ত দিতে পারবে না। কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, আগের দিন ভোর রাতে স্বপ্ন দেখেছে যে তার ভাই ফ্রান্সে মারা গেছে, মরবার সময় তাকে বারবার ডেকেছিল; তাই তার মন অত্যন্ত খারাপ। ডাঃ হ্যাডফিল্ড এই ঘটনার কথা তাঁর সহকর্মীকে বলে তাঁকে নাবিকটির স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত ঘটনাটি সত্যি কি না খোঁজ করতে বলেন। দিন কতক পরে রোগীটি বাড়ি থেকে একখানা চিঠি পেয়ে জানতে পারে যে, সামরিক অফিস থেকে তাদের বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তার ভাই সেদিন (নাবিকের কথিত দিন) সকালের দিকে বিমান আক্রমণের ফলে মারা গিয়েছে। এই ঘটনার কথা শুনে ডাঃ হ্যাডফিল্ড প্রথমে এটাকে অতি তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির (Hyperacurity of hearing) ফল বা নির্জ্ঞান মনের কোন দুর্বোধ্য কারণে এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেছিলেন। পরে অবশ্য বলেছিলেন, শ্রবণশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হোক না কেন, ফ্রান্স থেকে ডাকলে ইংলণ্ডে শোনা সম্ভব নয়।

মৃত্যুর সময় কখনো কখনো এই রকম টেলিপ্যাথিক স্বপ্ন কেন দেখা যায়, তার কারণ সম্বন্ধে ডাঃ হ্যাডফিল্ড বলেন—

"এ থেকে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে, সজ্ঞান মনে আমরা যেসব বিষয়ে ধ্যানধারণা করতে পারি নে, নির্জ্ঞান মনে তা সম্ভব। এটা এখন সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় এবং এটা সম্ভব হয় নিদ্রা তথা স্বপ্নের মাধ্যমে এবং এটি পরীক্ষিত সত্য। এর চেয়ে বর্তমানে আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়...এই সব স্বপ্নকে টেলিপ্যাথি স্বপ্ন বলা চলে (যদি অবশ্য টেলিপ্যাথি বিশ্বাসযোগ্য হয়)। অবশ্য আজকের দিন টেলিপ্যাথি আগেকার কালের মতো আর অবোধ্য নয়; বিশেষ করে যেদিন থেকে ইংলণ্ডে মিসেস্ গোল্ডনী এবং ডাঃ সল আর আমেরিকায় অধ্যাপক রাইন (Rhine) এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং তাঁদের পরীক্ষার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন।"

নাবিকটির স্বপ্ন সম্বন্ধে ডাঃ হ্যাডফিল্ড মন্তব্য করলেন—"টেলিপ্যাথি বলে সত্যি সত্যি যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই এটা আশা করা যাবে যে নাবিকের স্বপ্নে সেটার দেখা মিলবে; বিশেষ করে যখন প্রেরক মস্তিষ্ক (Transmitting Brain) মৃত্যুযন্ত্রণায় অভিভূত যার ফলে অত্যন্ত প্রক্ষোভময় বিততি (Emotional Tension) দেখা দেয়। এই জন্যেই মনে হয় এই রকম স্বপ্ন ও কল্পনা (Phantasms) মৃত্যুকালে অনেক সময় দেখা দেয়।"

ডাঃ হ্যাডফিল্ড মনে হয় অতি-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে খুব বিশ্বাসী নন। তিনি বলেছেন, যদি এই সব খবরাখবর স্বপ্নের মাধ্যমে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেটা মস্তিষ্ক-তরঙ্গের (Physical Brain Wave) মারফত সঞ্চালিত হয়ে থাকে, কারণ আজকাল এনসিফ্যালোগ্রাফির সাহায্যে জানা গেছে যে, মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন আকার, গঠন ও দৈর্ঘ্যের মস্তিষ্ক-তরঙ্গ নির্গত হয়। সেই তরঙ্গ এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে স্বপ্নের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়; কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সুদীর্ঘ ব্যবধান, সেই ব্যবধান মস্তিষ্ক-তরঙ্গের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব কি না সেটাও ভেবে দেখা দরকার। এরপর আরও পরিষ্কার ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন:—

"পূর্বপরিচয় জ্ঞান, টেলিপ্যাথি, মধ্যপুরুষ (মিডিয়মশিপ), প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি অতি-মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নই, জানি নে এগুলো সত্যি কি না। এগুলো সব চালাকি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এসব অধ্যাত্মবিজ্ঞান-বিশারদদের বিষয় এবং এবিষয়ে কোন মন্তব্য করতে গেলে শুধুই গণিত, পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকলেই চলবে না, সেই সঙ্গে থাকতে হবে যাদুকরদের ভেল্কিবাজি এবং প্রবঞ্চক ও হাতুড়েদের সব রকম চালাকির সঙ্গে সম্যক্ পরিচয়।

বহু টেলিপ্যাথিক স্বপ্ন, যেগুলোর সত্যতা নানাভাবে

পরীক্ষিত হয়েছে; সেগুলো সংগ্রহ করে সোসাইটি ফর সাইকলজিক্যাল রিসার্চ সংক্ষেপে এস-পি-আর পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। এই বইটির নাম হল S. P. R' S Phantasms of the Living by Gurney, Myre and Padmore। এই বইটি থেকে দুএকটা স্বপ্নের কথা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এই পুস্তক প্রকাশিত হবার পর টেলিপ্যাথিকে আর অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। শ্রীদিলীপ-কুমার রায় 'অঘটন আজও ঘটে' শীর্ষক পুস্তকগুলিতে যে-সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সেগুলো অলীক না হলেও পরীক্ষিত সত্য বলা চলে না; কাজেই সেখানে সন্দেহের কিছু কিছু অবকাশ আছে বই-কি।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের চেয়ে অনেক জীবজন্তুর অনুভূতি-শক্তি অনেক তীক্ষ্ণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষও হয়ত এইরকম তীক্ষ্ণ-অনুভূতিশীল ছিল: কিন্তু গভীর ভাবে গুরুতর বিষয় চিন্তা করবার ক্ষমতা লাভের ফলে সেই অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে।

অলোকদৃষ্টি ও অলোকশ্রুতি

(ক্লেয়ার-ভয়েন্স ও ক্লেয়ার-অডিয়েন্স)

এই দুটি অতীন্দ্রিয়, অপরোক্ষ অনুভূতি হল বহুদূরের দৃশ্য বা শব্দ নিজের চোখ বা কানের সাহায্য ছাড়াই দেখা বা শোনার ক্ষমতা। এরজন্যে নিদ্রা বা স্বপ্নের দরকার হয় না। দিব্যদৃষ্টি ও অলৌকিক শক্তির ফলে কেউ কেউ এইরকম ভাবে দেখতে বা শুনতে পান। আমাদের যোগশাস্ত্রে একে বিভূতি বলা হয়েছে। যোগ-সাধনার ফলে এই বিভূতির অধিকারী হওয়া যায়। অতি মনস্তত্ত্বে একে E S P বা Extra Sensory Perception বলা হয়েছে। আমরা যেমন টেলিভিশনে দূরের দৃশ্য দেখতে পাই; রেডিও বা টেলিফোনের সাহায্যে দূরের শব্দ শুনতে পাই; এও যেন সেই রকম ব্যাপারটা। তবে টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি হল বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র। এ হল যন্ত্রাতিরিক্ত শক্তি। মনোবিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, এটা কারও কারও পক্ষে সম্ভব হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কল্যাণে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে,—

"কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচকপূরকবর্জিতে
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।"

অর্থাৎ রেচকপূরক-রহিত কেবল-কুম্ভকে সিদ্ধ হইলে ত্রিলোকে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। শিবসংহিতাতেও আছে,—

"কেবল-কুম্ভকে সিদ্ধে কিংন স্যাদিহ যোগিনঃ"

দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রুতি আলোচনা প্রসঙ্গে শিবসংহিতায় পরিষ্কার-ভাবে বলা হয়েছে,—

"বাক্‌সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনম্॥" ৬৪

* * * *

"ভবন্ত্যেতানি সর্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্"—৬৫

অর্থাৎ এই তিন অবস্থাতে (ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্ত্যবস্থা) যোগীর বাক্যসিদ্ধি, কামচারিতা, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি (ক্লেয়ারভয়েন্স ও ক্লেয়ারঅডিয়েন্স) মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মপদার্থ দর্শন, পরকায়ে প্রবেশ এবং গগনপথে বিচরণ—এই সমস্ত বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।

পূর্বপরিচয় জ্ঞান (প্রিকগ্‌নিশন)

হয়ত কারও হঠাৎ মনে হল তার ভিনগাঁয়ের পুরণো বন্ধুর সঙ্গে আগামী সপ্তাহে দেখা হবে এবং সত্যি সত্যি তা হয়েও গেল। এই রকম ঘটনাকে প্রিকগ্‌নিশন বলা হয়। অনেকের জীবনে এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কেন এমন হয়? কি করে মানুষ আগে থেকে জানতে পারে এরকম হবে? এর পূর্বাভাস আমাদের মনে উদয় হয়, না সেই বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে অনেক দিন ধরে মনে মনে ভাবতে থাকে, আর সেই ভাবনাচিন্তা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে আমার মনে এসে উদয় হয় আর তখন মন জানতে পারে অমুক দিন সেই বন্ধু আসবে।

এছাড়াও এমন ঘটনাও ঘটে যে, স্বপ্নে হয়ত কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল, কিছু কথাবার্তাও হল; তারপর বাস্তবিক সেই স্বপ্নে দেখা অপরিচিত

লোকটির সঙ্গে সত্যি সত্যি দেখা হয়ে গেল। তার আকার-প্রকার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি নামটা পর্যন্ত ঠিক ঠিক মিলে গেল। এটা বাস্তবিক খুব আশ্চর্যের বিষয়। এটাকে অলীক কল্পনা বলে বাতিল করা চলে না। এইরকম অনেক ঘটনা সোসাইটি ফর সাইকো-লজিক্যাল রিসার্চ সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের বিবরণ থেকে এইরকম একটা ঘটনা এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে। এই বিবরণ থেকে জানা যাবে স্বপ্নের মাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তির নামধাম, আকার-প্রকার সবই আগে থেকে জানা সম্ভব। ঘটনাটি হল এই রকম।

মিসেস্ সোয়াইট্সার নামে এই ভদ্রমহিলা একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর ছোট ছেলে এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে বিদেশে এক পাহাড়ের চূড়ায় বেড়াচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে ছেলেটি হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে মারা গেল। মহিলাটি ঐ অপরিচিত লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করায় সে তার ডাক-নাম আর আসল নাম দুইটি বললে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হয়ে বড় ছেলেকে তার ছোট ভাইকে তাড়া-তাড়ি দেশে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি লিখতে বললেন। বড় ছেলে মায়ের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললে, ভাই তার বিদেশে কোথাও যায় নি এবং ভালই আছে এর আট দিন পরে চিঠি এল, তার ছোট ভাই এক সপ্তাহ ছুটি কাটাবার জন্যে স্কারবরো গিয়েছিল এবং সেখানে পাহাড় থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। চিঠি পেয়েই মিসেস্ সোয়াইট্সার স্কারবরোতে অনুসন্ধানের জন্যে গেলেন। সেখানে যে অপরিচিত লোকটিকে স্বপ্নে ছেলের সঙ্গে বেড়াতে দেখেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া মাত্রই তাকে চিনতে পারলেন। তার নাম জিজ্ঞেস করতেই স্বপ্নে যে ডাক-নাম ও আসল নাম শুনেছিলেন, সেই দুটো নামই বললে। স্বপ্নে শোনা নাম আর ঐ লোকটির নাম ও পরিচ্ছদ মিলে গেল। এই স্বপ্নে দেখা যাচ্ছে, অপরিচিত লোকটির নাম মহিলা আগে জানতে পেরেছিলেন আর জানতে পেরেছিলেন সন্তানের মৃত্যুর খবর (পরের ঘটনা)। কি করে এটা সম্ভব হল? এটাকে নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; কারণ এ-বিষয়ে সব তথ্য নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করে পূর্বোক্ত সোসাইটির পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। (Proceedings of the S.P.R., V. 322, দ্রষ্টব্য।) এই রকম ঘটনার বিষয়ে এখন শুধু মনোবিজ্ঞানীরাই নয়, পদার্থ-বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে বলছেন, পূর্বপরিচয় জ্ঞান (প্রি-কগ্‌নিশন) বর্তমান যুগের স্থান ও কাল তত্ত্বের (Theory of Space and Time) বিরোধী নয়।

পূর্বাভাস (প্রিমনিশন)

এই-রকম স্বপ্নে আগে থেকেই বিপদের আভাস পাওয়া যায়; অর্থাৎ ঘটনা ঘটবার আগেই স্বপ্নে অনাগত বিপদের কথা জানতে পারা যায়। এই রকম একটা পরীক্ষিত স্বপ্নের কথা এখানে বলা হচ্ছে।—

শ্রীমতী 'ক' কাকার ঘরে সন্তান-স্নেহে লালিত পালিত। একদিন শ্রীমতী 'ক' স্বপ্নে দেখলেন যে তাঁর কাকা বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে এক বিশেষ রাস্তায় মারা পড়েছেন। মারা যাবার সময় পরনে ছিল একটা কালো রংএর সুট। মৃতদেহ বাড়ি আনার ব্যবস্থা হল। ভদ্রলোক খুব লম্বা চওড়া ছিলেন, তাই মৃতদেহ যখন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তোলা হচ্ছিল, একটা হাত খাটিয়া থেকে ঝুলে পড়ে রেলিংএর থামের সঙ্গে বেশ জোরে ধাক্কা খেল। ধাক্কা লাগার শব্দে শ্রীমতীর ঘুম ভেঙে গেল। সকালে উঠে কাকাকে স্বপ্নের সব বৃত্তান্ত বলে তাঁকে ঐ বিশেষ রাস্তায় একলা যেতে বারণ করে দিলেন। কাকাও তাঁকে কথা দিলেন যে একলা কখনো ঐ রাস্তায় যাবেন না। এরপর দুবছর বেশ ভালয় ভালয় কেটে গেল। স্বপ্নের কথা কারও মনে থাকল না। আবার ঠিক দুবছর পরে শ্রীমতী 'ক' ঠিক ঐ একই রকম স্বপ্ন দেখলেন। আগের স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু সব মিলে গেল। সকালে উঠে শ্রীমতী 'ক' তাঁর কথা না শোনায় কাকার সঙ্গে খুব ঝগড়া করলেন। কাকা বললেন, হ্যাঁ, দুএকবার ঐ রাস্তায় গিয়েছেন বটে তবে আর কখনো একলাটি যাবেন না। এর পর আরও চার বছর

কেটে গেল। শ্রীমতী 'ক'-এর বিবাহ হয়ে গেল, শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। তিনি এখন সন্তানসম্ভবা। একদিন তাঁর খুব অসুখ হল। অসুখ হবার আগের রাতে সেই পুরণো স্বপ্ন আবার দেখলেন। সব ঠিক ঠিক মিলে গেল। তফাৎ শুধু, আগে দুবার স্বপ্ন দেখেছিলেন কাকার বাড়িতে, এবার স্বপ্ন দেখলেন শ্বশুরবাড়িতে। আর একটু তফাৎ ছিল। স্বপ্নে দেখলেন কালো রংএর পোশাক পরে এক ভদ্রলোক (তাঁর মুখটা দেখতে পাননি) তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, তাঁর কাকা মারা গেছেন। ভয়ে আঁতকে উঠলেন শ্রীমতী—ঘুম ভেঙ্গে গেল। অসুস্থ থাকা সত্বেও কাকাকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে খবরাখবর জানতে চাইলেন। চিঠিটা কাকার মৃত্যুর দুদিন আগে পৌঁছেছিল। শ্রীমতীর অসুখ বেড়ে গেল। কাকার কোন চিঠি না-পাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে বললেন, বিকারগ্রস্ত অবস্থায় থাকার সময় তাঁর কাকা কালো রংএর সুট পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁর মাথার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েও ছিলেন। শ্রীমতী বললেন, না, হতে পারে না, স্বপ্ন দেখেছেন কাকা মারা গেছেন। (S. P. R Proceedigs, XI, 577 দ্রষ্টব্য।)

পরে সোসাইটির সভ্যেরা এই স্বপ্নটির বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, শ্রীমতীর কাকার একখানা হাত রেলিংএ ধাক্কা খাওয়া, তাঁর পরণে কালো রংএর পোশাক প্রভৃতি সমস্ত বিষয় স্বপ্নের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে গেছে। এই-রকম স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সোসাইটির প্রোসিডিংস বুকে অনেক আছে; তবে এ ক্ষেত্রে স্বপ্নের বিশেষত্ব হল যে, মৃত্যুর আভাস দু-বছর আগে জানা গিয়েছিল।

সাইকোকিনেসিস (Psychokinesis or PK)

এটি মনের এক বিচিত্র, রহস্যভরা শক্তি যা জড় পদার্থকে প্রভাবান্বিত করে। এটির বিশেষত্ব, বহু দেশের গবেষণাগারে একে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলে, অলৌকিক ঘটনা সব কেন ঘটে, স্বপ্নাদ্য ওষুধ, তাগা-তাবিজ মাদুলি প্রভৃতির সত্যি কোন গুণ আছে কি না, মানসিক বিশৃঙ্খলা থেকে উৎপন্ন শারীরিক ব্যাধির (Psychosomatic Disease) প্রশমনের জন্যে নানান টোটকাটাটকা প্রভৃতির সত্যিই কোন মূল্য আছে কি না জানা যাবে। আমেরিকার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী লুথার বুরব্যাঙ্ক, যিনি ৮০০-র বেশী নতুন রকমের গাছের কলম বেঁধেছিলেন এবং নতুন নতুন ফল আবিষ্কার করেছিলেন, বলতেন, ফলও ফুলের সঙ্গে তিনি ভালবাসার স্পন্দন (Vibration of love) অনুভব করতেন। শোনা যায় তিনি তাঁর বন্ধু স্বামী যোগানন্দের কাছে যোগ শিক্ষা করে না, ভগিনী এবং মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে টেলিপ্যাথি সাহায্যে কথোপকথন করতেন। পীড়িত মানুষ ও গাছগাছড়াকেও বিনা ওষুধে ভাল করবার ক্ষমতাও নাকি তাঁর ছিল। গবেষণাগারেও সাইকো-কিনেসিস সম্বন্ধে কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে ক্যামেরার দিকে শুধু তাকিয়ে কোন কোন লোকের এক অজানা দ্বিতীয় ব্যক্তির ছবি ক্যামেরাতে ফিল্মে প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা আছে। আমেরিকার শিকাগো শহরে টেড সিরিয়াস নামে একজন সাধারণ লোক এই ক্ষমতা দেখিয়ে সকলকে চমকিয়ে দিয়েছিলেন।

অনেক বিজ্ঞানী বলছেন, তাঁরা জানতে পেরেছেন 'সি' (P S I) দিয়ে উদ্ভিদ্‌জীবন প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। Pat Tucker বলছেন—"Using a polygraph—better known as a lie detector--Robert Brier found marginal evidence in a series of experiments at the Institute that some test subjects can affect the normal electrical activity of a plant merely by directing their thought towards it." জ্যাঁ বেরি (Jean Barry) নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী বলছেন, যাতে কোন রকম ধাপ্পাবাজি না থাকতে পারে তার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েকজন লোককে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তাদের শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক নানারকম ছত্রাকের জন্ম বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যবাণী

সব দেশেই দেখা যায়, যোগী ও সিদ্ধ পুরুষদের ভবিষ্যবাণী করবার ক্ষমতা আছে। আমাদের পুরাণে এইরকম অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে বাইবেলেও। বাইবেলে দেখা যায়, মিশরে মহামারীর কথা অনেক আগে থেকেই বলা হয়েছিল। টায়ার নগর কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, এজেকিএল তার আভাস অনেক আগে থেকেই দিয়েছিলেন। জ্ঞানী ডানিয়েল বেবিলন, পারস্য, মেসিডনীয় ও রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহুপূর্ব থেকেই নিখুঁত ভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন। প্যালেষ্টাইনে সল-এর রাজা হওয়ার সময় হিব্রু-পুরোহিত স্যামুয়েল যে ভবিষ্যবাণী করেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়েছিল: "এই রাজপদ সৃষ্টি-করার ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্যে একদিন তোমাদের ক্রন্দন করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করবেন না।" এইসব ব্যাপার কি করে সম্ভব হয় বা হতে পারে, তা এখনো পর্যন্ত ঠিকভাবে জানা যায় নি। স্থান-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে কিভাবে ঠিক ভবিষ্যবাণী করা সম্ভব তার বৈজ্ঞানিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। অবশ্য এগুলো অনেক সময় অতিরঞ্জিত বা অসত্য হতে পারে; কিন্তু কিছু কিছু সত্যও থাকতে পারে। একমাত্র যোগশক্তি-প্রভাবে এই রকম অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। শিবসংহিতায় এর কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

"ভূতার্থঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্বং সকারণম্
অশ্রুতান্যাপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেৎ ধ্রুবম্।"—৯০

অর্থাৎ যোগী ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্যাপার এবং তাহার কারণ-সমুদয় সহজে জ্ঞাত হতে পারেন; তিনি অশ্রুত ও অপরিজ্ঞাত শাস্ত্র এবং তার নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করতে পারেন।

লঘুকরণ (লেভিটেশন)

আসনে স্থির হয়ে বসে প্রাণায়াম করার পর শরীরকে লঘু করে ফেলে আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি বেঙের মত লাফাতে পারে, কখন কখনো লাফিয়ে ছাদ ছুঁতে পারে। এটা কি করে সম্ভব হয় তার বিজ্ঞানসম্মত কারণ জানা যায় না; অথচ এটা নিছক কল্পনা নয়। অনেকে এ ভেল্কি দেখে থাকতে পারেন। এটা কি হঠযোগের 'লঘিমা' সাধন? যোগশাস্ত্রে (শিবসংহিতার একটা শ্লোকে) এর বিবরণ পাওয়া যায় :—

"দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরোমধ্যমে মতঃ
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্ গগনেচর সাধকঃ।"

অর্থাৎ এইরূপে কিছুদিন সাধন করিলে যোগীর শরীরে আগে কম্পন, পরে আরও কিছুদিন সাধন করিলে যোগীর দার্দ্দুরীগতি (মণ্ডুকবৎ গতি) হইতে থাকিবে। তারপর সাধক পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শিক্ষা করিলে শূন্যচারী হইতে সমর্থ হন।

ঘেরণ্ড সংহিতাতেও এইরকম একটা শ্লোক পাওয়া যায় :—

অধমাজ্জায়তে ঘর্মো মেরুকম্পশ্চ মধ্যমাৎ
উত্তমাচ্চ ভূমিত্যাগ-স্ত্রিবিধং সিদ্ধিলক্ষণম্।—৫৫

অর্থাৎ অধমমাত্রা প্রাণায়াম সাধন করিলে ঘর্ম, মধ্যম মাত্রায় মেরুকম্প জন্মে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের তুল্য একটি নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত আছে, সেই নাড়ী কাঁপিতে থাকে; আর উত্তমমাত্রা প্রাণায়াম সাধন করিলে ভূতলত্যাগ শক্তি জন্মে, অর্থাৎ সাধক ধরাতল হইতে উঠিয়া শূন্যে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। ঘর্মনির্গম, মেরুকম্প ও ভূমিত্যাগ, এই তিনটি প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ।

ভুতুড়ে কাণ্ড (পলটারগাইষ্ট)

যাদুকরেরা ইন্দ্রজালের প্রভাব দেখাবার জন্যে ঘরের ভেতর ঢুকে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে সামনের চেয়ার বা টেবিলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর ভুরু কুঁচকে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে, সামনের চেয়ার বা টেবিল আপনা হতে মাটি থেকে চার-পাঁচ ফুট ওপরে উঠে শূন্যে ভাসতে থাকবে। আবার তাঁরই নির্দেশে ঐ চেয়ার বা টেবিল নেমে আসবে। আপনি যদি ঐ চেয়ার বা টেবিলে চেপে বসেন, তা হলে আপনাকে নিয়েই সে ওপরে উঠে যাবে। অনেক

সময় তাঁরা কোন জিনিসের সাহায্য ছাড়াই ঘরে দুমদাম প্রবল শব্দ হচ্ছে শোনাতে পারেন। জড়-বস্তুর মধ্যে জীবন্ত প্রাণীর মত গতিসঞ্চার কি করে হয়? কি করে জড়-বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে গিয়ে সেটি হাল্কা হয়ে যায়? এটা কি আধ্যাত্মিক শক্তি, না অতি-প্রাকৃতিক শক্তি, না ইচ্ছাশক্তি? এসবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, ইনস্টিটিউট অব প্যারা-সাইকলজিতে ডাঃ রাইন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তার অনুসন্ধানে রত আছেন।

জাতিস্মর (রিকলেক্শন অব ফরমার বার্থ)

অনেক সময় দেখা যায় কেউ কেউ পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বলতে পারেন। এদের জাতিস্মর বলা হয়। এদের বর্ণিত বিবরণ অনুসন্ধান করে জানা যায়, তারা যা বলছে সবই সত্যি। এক জন্মের বৃত্তান্ত পরজন্মে কি করে মনে রাখা সম্ভব? এর বিজ্ঞানসম্মত কারণ এখনও কিছুই জানা যায় নি। কবি বলছেন,—"দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি/নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,/চিত্রকরা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়, নিয়ে তার বাঁশিখানি।/.........ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে, মিলে যায় দেহ অন্তহীন তমিস্রায়।" তা হলে কি করে এক জন্মের ঘটনা অন্য-জন্মে স্মরণ রাখা সম্ভব? রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালী অধ্যাপক এসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তিনি যদি এর একটা বিজ্ঞানসম্মত সমাধান খুঁজে পান তাহলে, অতি-মনস্তত্বের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে। কবি শেক্স্পীয়র যে-কথা বলেছিলেন তা খুবই সত্যে—স্বর্গে মর্তে এমন অনেক জিনিস আছে; হোরেশিও যা তোমাদের শাস্ত্র ভাবতে-ও পারে না।

বিজ্ঞান-ভিত্তি

অতি-মনস্তত্বের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে মোটামুটি-ভাবে সবই আলোচনা করা হল। এবার অতি-মনস্তত্ব, বিজ্ঞানীদের কিরকম নিরলস চেষ্টার ফলে বিজ্ঞান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে সেটার আলোচনা দরকার। অতি-মনস্তত্ব আজ আর হাসিঠাট্টার বিষয় নয়। সে বিজ্ঞানের পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। এ যুগে বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা-চলে না, তাকে কেউ মানতে চায় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিজ্ঞান হল সকল বিষয়ের (subjects) উপাদান, কারণ ও নিমিত্ত কারণ-নিরূপক শাস্ত্র। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বিষয়ের চর্চা বা আলোচনা করতে গেলে তা ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ হবে। বিজ্ঞান হল ধ্রুব—সর্বকালের সত্য। তাই বিজ্ঞানীরা অতি-মনস্তত্বকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে সচেষ্ট হলেন। এর জন্যে তাঁদের অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৬৯ সালে অতি-মনস্তত্ব বিজ্ঞানের পূর্ণ মর্যাদা পেয়ে আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের (এ. এ. এস.) সঙ্গে একই আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে অতি-মনস্তাত্বিকেরা এ. এ. এস.-এর অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সঙ্গে বসে সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অতি-মনস্তত্ব কুসংস্কার ও বিজ্ঞানের মাঝামাঝি যে সঙ্কীর্ণ স্থানটি অধিকার করে আসছিল, এখন সেটা দূর হয়ে বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অধিষ্ঠিত হল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এটাও অন্যতম শাখা বলে পরিচিত হয়েছে।

এখন আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজ, ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপনা ও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে এর আদর ও এ বিষয়ে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। তাই দেখা যাচ্ছে সুইডেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী নেদারল্যাণ্ড্স্, আর্জেন্টিনা, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশেও অতি-মনস্তত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা দিনদিন ছড়িয়ে পড়ছে আর নতুন নতুন গবেষণা-কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। অমন যে দেশ সোভিয়েট রাশিয়া,

যেখানে এ-বিষয়টি হয়ত তাদের "ইজ্‌মে"র সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, সেখানেও দেখতে পাচ্ছি এবিষয় নিয়ে গভীর ভাবে গবেষণা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণারত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন আকাদেমি সদস্য ভি বেখ্‌তেরফ, এ লিওন্তোভিচ, অধ্যাপক এল ভাসিলেয়েফ, ভি এল ডুরোভ, ডাঃ সার্জিয়েভ প্রভৃতি।

আত্মা সম্বন্ধীয় গবেষণায় (সাইকিক্যাল রিসার্চ) ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানে (স্পিরিচুয়াল সায়েন্স) বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোকপাত করার জন্যে সভ্যবদ্ধ প্রচেষ্টা মনে হয় ইংলণ্ডেই প্রথম হয়েছিল। অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় ১৮৮২ সালে লণ্ডনে সর্বপ্রথম সোসাইটি ফর সাইকলজিক্যাল রিসার্চ (এস পি আর) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরই প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকান সোসাইটি ফর সাইকলজিক্যাল রিসার্চ (এ এস পি আর)। তারপর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ইউরোপের অন্যান্য দেশেও গজিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে ডাঃ এনি বেশান্ত থিয়সফিক্যাল সোসাইটি মারফৎ এবিষয়ে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন। শুরুতে যখন লণ্ডনে এস পি আর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, লেখক, অধ্যাপক, চিকিৎসক প্রভৃতি এর সদস্য ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক পণ্ডিত হেনরী সিজ-উইক, চিকিৎসক সার আর্থার কোনান ডয়েল (ইনি পরবর্তী কালে শার্লক হোম্‌স্‌ গোয়েন্দা কাহিনী লিখে বিখ্যাত হন), সার অলিভার লজ (ইনি পরে অনেক ভুতুড়ে গল্প লিখেছিলেন), সার উইলিয়ম ক্রুকস, অধ্যাপক ম্যাকডুগাল প্রভৃতি এর সদস্য ছিলেন। জার্মানীতে সদস্য ছিলেন ফ্রয়েড ও য়ুং, আর আমেরিকায় ছিলেন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্‌।

ইউরোপ আমেরিকায় অতি-মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক যে-সব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তাদের প্রথম কাজ হল এবিষয়ে যে-সব জালজুয়াচুরি, মিথ্যা এতদিন অতি-মনস্তত্ত্বের নামে চলে আসছিল সেগুলোর মুখোস খুলে দেওয়া। তারপর তাঁরা যত্ন ও কষ্ট করে অসংখ্য ঘটনা সংগ্রহ করলেন, সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে এই সব ঘটনার যাথার্থ্য নিরূপণ করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, সত্যি সত্যি এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা অনেক ঘটনা বা দৃশ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই দেখতে, শুনতে বা উপলব্ধি করতে পারেন। এই যে শক্তি, যা দিয়ে তাঁরা এইসব বিষয় হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে দেখতে বা শুনতে পান, এঁরা সেটার নাম দিলেন Extra Sensory Perception (ESP) অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তি। এই ই এস পি, বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শক্তির বলে ঘটে থাকে তার নাম দিলেন 'সি' (PSI)। আমেরিকায় যিনি এ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অতি-যত্নের সঙ্গে গবেষণা করেছেন, তিনি হলেন Dr. J. B. Rhine ও তাঁর সহধর্মিণী Lowisa Weckesser এবং তাঁদের সহকর্মীরা। তাঁদের সমস্ত গবেষণা পরিসংখ্যানামুগত ভ্রমক্রটিহীন এবং সেগুলির জন্যে পরীক্ষামূলক সততা এবং মনোবিজ্ঞানের কঠোর নিয়মাবলী অনুসৃত হয়েছিল। তাঁরা সমস্ত গবেষণা নিজেদের গবেষণাগারে করেছেন এবং তার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম সংবেদনশীল যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করেছেন। Dr. Helmut Schmidt যে যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন, তার নাম হল Random Target Generator (R. T. G.) এই R. T. G. যন্ত্র সম্বন্ধে বর্ণনা আছে,—"R. T. G. was Strontium 90 emissions to generate an endless supply of random target. Since radioactive decay is the most random process known in nature, Schmidt's RTG solves a problem that plagues basic research in many fields: ensuring the randomness of a series of tests without tedious recourse to bulky number tables and elaborate precautionary procedures to find a random entry potnt into the tables."

ডাঃ রাইন ১৯৬৫ সালে Institute of Para Psychology স্থাপন করেন। এখানে সব দেশ থেকে অতি-মনোবিজ্ঞানীরা এসে বছরে তিন বার মিলিত হয়ে তাঁদের গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি ও প্রতিবেদন পাঠ ও আলোচনা করেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল, তার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে টেলিপ্যাথিক চিন্তা সঞ্চালনের একটা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের জীবনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, তাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থা, আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের ছন্দের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, ইলেকট্রো এনসেফ্যালোগ্রাম, মায়োগ্রাম, নিওমোগ্রাম এবং ট্রেমারোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। এক কথায় বিজ্ঞানসম্মত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

তারপর পরীক্ষাধীন দুজনের একজন (চিন্তা-প্রেরক) ছিলেন মস্কোয় আর অন্যজন (চিন্তা-গ্রাহক) ছিলেন লেনিনগ্রাদে। মস্কোতে চিন্তাপ্রেরকের সামনে নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচটি-জিনিস রাখা হল—(১) আইডেনটিফিকেশন কার্ড (২) অঙ্কিত সার্কেল (৩) একটা থার্মোমিটার (৪) একটা টুথব্রাশ (৫) একটা ছুরি। অপর প্রান্তে যে চিন্তাগ্রাহক বসে আছেন, তিনি জানতেন না মস্কোর চিন্তাপ্রেরকের কাছে কি কি জিনিস রাখা হয়েছে বা চিন্তার মূর্তি কি হবে। শুধু এইটুকুই জানতেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে চিন্তা-সঞ্চালন কাজ আরম্ভ হবে। পরীক্ষার পর দুই শহরের তথ্য তুলনা করে দেখা গেল যে, চিন্তা-সঞ্চালন ঠিক সময় চিন্তাগ্রাহকের কাছে পৌঁছে গেছে। পাঁচটি জিনিসের মধ্যে চিন্তাগ্রাহক তিনটি বিষয় ঠিক ঠিক মত বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরীক্ষার সময় বিজ্ঞানীরা গ্রাহক ও প্রেরক দুজনের ইলেকট্রো-এনসেফ্যালোগ্রামে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। পরিবর্তনগুলো সাময়িক হলেও সেগুলো এত পরিষ্কার ছিল যে তা থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কে টেলিপ্যাথি চিন্তা বাহিত হচ্ছে কি না তা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। যন্ত্রে গ্রাহকের মস্তিষ্ক-প্রতিক্রিয়া আর মৌখিক স্বীকৃতির ৩।৪ সেকেণ্ড পূর্বে ধরা পড়ে। ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রামের উপাত্ত থেকে দেখা গেল যে, পরীক্ষাকালে প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ের হৃদয়-স্পন্দন একই ছন্দে স্পন্দিত।

অনুরূপ ভাবে আমেরিকাতেও টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ব্রুকলিনের মেমোনাইড হাসপাতালের ডাঃ মনটেগু উলম্যান টেলিপ্যাথি স্বপ্ন নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁর একটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা হচ্ছে। তিনি তাঁর "স্বপ্ন গবেষণাগার"-এ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে কয়েকজনকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তাদের মাথায় ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ ইলেকট্রোড (বিদ্যুৎশলাকা) লাগিয়ে দেখে নিলেন তারা স্বপ্ন দেখছে কি না। যখন বুঝতে পারলেন তারা স্বপ্ন দেখছে তখন আর একটি ঘরে গিয়ে তাঁর পরীক্ষার বিষয়বস্তুর (target object) ওপর মনঃসংযোগ করলেন। এক্ষেত্রে টার্গেট ছিল গ্যগাঁর (Gauguin) একখানি তৈলচিত্র। চিত্রটির বিষয়বস্তু হল, তিনটি কুকুরছানা আর কতকগুলো নীল রংএর পানপাত্র। পরীক্ষক এই চিত্রের দিকে একাগ্র চিত্তে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চিন্তা বিভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সঞ্চালিত করবার চেষ্টা করলেন। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙ্গলে, তাদের স্বপ্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে একজন বললে, সে স্বপ্ন দেখছিল একজোড়া কুকুর চীৎকার করছিল আর দেখছিল কতকগুলো ঘন নীল রংএর বোতল। এক্ষেত্রে চিন্তা-প্রেরক পরিপূর্ণ ভাবে সফল হন নি, তবে চিন্তা প্রেরণ করা যে সম্ভব সেটা জানা গেল। টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলছে এবং তা থেকে যতটুকু সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মনে হয় টেলিপ্যাথিক চিন্তা সঞ্চালন একটা বাস্তব ঘটনা।

অতি-মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল। এখন সব দেশের বিজ্ঞানীরা এই সব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানে রত আছেন। আমেরিকার ডাঃ রাইন এবিষয়ে মনে হয় বেশ একটু সফল হয়েছেন। তিনি বলছেন, এইসব অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে রয়েছে এক অলৌকিক শক্তি, যাকে তিনি PSI বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই 'সি' কি বস্তু তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

এটা কি যোগশক্তি, না ইচ্ছাশক্তি? তবে PSI এবং ESP দুটি আলাদা জিনিস।

ডাঃ রাইন তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে ESP সম্বন্ধে বলেছেন,—

"There simply is no explanation based on physical principles that will do............no hypothesis which could explain ESP phenomena as a whole on a physical basis has been offered.........[and] the most devoted physicalist finds himself in the sloughs of insuperable intellectual difficulty."

মন বা আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে রাইন-দম্পতি লক্ষ্য করেন, যাঁরা টেলিপ্যাথি, সাইকো-কিনেসিস প্রভৃতির অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত; তাঁদের মধ্যে ESP বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষমতা দেখা যায়। তাই বেছে বেছে এইসব লোক নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলেন। এই পরীক্ষার জন্যে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের (ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এনালিসিস) আশ্রয় নিলেন। কেননা একটা বা দুটা পরীক্ষায় ESPর সন্ধান পেলে সেটাকে আকস্মিক ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে যদি এটা দেখা যায়, তাহলে তাকে আর আকস্মিক বলা যাবে না—সত্যি বলে ধরে নিতে হবে। এই লক্ষ্য সুমুখে রেখে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন।

PSI সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি মানুষের বয়স, মেজাজ, মর্জি, স্ত্রীপুরুষ ও আবহাওয়া ভেদে কম বেশি লক্ষিত হয়। এছাড়াও তাঁরা দেখতে পান বহির্মুখীরা (এক্সট্রোভার্ট) অন্তর্মুখীদের (ইন্ট্রোভার্ট) চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে PSI পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান আবার অন্তর্মুখীরা যে-সব ক্ষেত্রে ভাল ফল দেখান সে-সব ক্ষেত্রে বহির্মুখীরা ভাল ফল দেখাতে পারেন না।

ইউরোপ আমেরিকায় যে-সমস্ত অতি-মনস্তত্ব বিষয়ক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে; সেখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে—এগুলোকে "ডেটা ব্যাংক" বলা হয়। এ বিষয়ে সবেমাত্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। আগামী ২০।২৫ বছরে মনে হয় এবিষয়ে অনেক কিছু নির্ভুলভাবে জানা যাবে।

আগে বলা হয়েছে যে ফ্রয়েড, সোসাইটি ফর সাইকলজিক্যাল রিসার্চের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি নিজে এবিষয়ে কোন অনুসন্ধান করেন নি এবং মনে হয় অতি-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি অথবা ছিলেন অনীহ। তাই তাঁর "সাইকোপ্যাথোলজি অব এভরি-ডে লাইফ" নামক পুস্তকে বলেছেন,—"আমি এগুলোকে (টেলি-প্যাথি, অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন প্রভৃতি) এখন একেবারে নাকচ করে দিতে পারছি নে; কারণ এসম্বন্ধে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন আর তাঁদের এই সব অনুসন্ধান ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি বলে বিবেচিত হবে।"

আমাদের মনে হয়, ভারতীয় যোগশাস্ত্র গভীর-ভাবে অনুশীলন না করলে অতি-মনস্তত্ত্বের অনেক রহস্য অজানাই থেকে যাবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতীয় যোগসাধনা নিয়ে কিছু-কিছু গবেষণা চলছে। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন, যোগী বা সাধকেরা সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি বিভিন্ন আসন ও খেচরী, মূলবন্ধ, বজ্রোলী প্রভৃতি দশটি মুদ্রা আশ্রয় করে প্রাণায়াম করলে বহু জটিল রোগ আরাম করা যায়। শিবসংহিতায় বলা হয়েছে,—

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য রোগানাং সংক্ষয়োভবেৎ।
(যোগাভ্যাসতত্ত্ব কথন নামক তৃতীয় পটল দ্রষ্টব্য।)

অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাবান্ সাধক তালুমূলে জিহ্বা রাখিয়া প্রাণবায়ু পান করিবেন (মুখ দ্বারা শুদ্ধ বায়ু টানিয়া লইয়া নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিবেন) তাঁহার উৎপন্ন-প্রায় বা বর্তমান ব্যাধিসকল পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

অনুরূপভাবে ঘেরণ্ড সংহিতাতে বলা হয়েছে,—

গুল্মজ্বরপ্লীহাকুষ্ঠকফপিত্তং বিনশ্যতি
আরোগ্যং বলপুষ্টিশ্চ ভবেত্তস্য দিনে দিনে।

অর্থাৎ (বাসোধৌতি অভ্যাস করিলে) গুল্মজ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং দিনে দিনে আরোগ্য, বল ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

তাই দেখতে পাই আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিভিন্ন ভারতীয় যৌগিক আসনগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন তাদের ফিজিওথিরাপি নাম দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন আসনগুলির এক-একটি ইংরেজী নাম দিয়ে বাতব্যাধি সারাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

উপসংহারে বলি, জড়সত্তাকে বিশ্বরহস্যের একমাত্র অকৃত্রিম উৎসরূপে স্বীকার করার প্রচেষ্টা অবৈজ্ঞানিক ও অ-দার্শনিক বলেই মনে মনে হয়। জড় ও চৈতন্যের সুনির্দিষ্ট বেড়া ভেঙে দিয়ে জড় ও চৈতন্য যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছে, সেই নতুন রাজ্যে বিজ্ঞানীরা এখন প্রবেশ করতে চাইছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বলেছেন,—"দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি (বিজ্ঞানী) আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।.........সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেই জন্যই প্রতিদিন দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।"

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে টেলিপ্যাথি, সাইকো-কিনেসিস প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে অনেক মিথ্যা, গুলগল্প অনুপ্রবেশ করেছে। এগুলোর থেকে বেছে প্রকৃত ঘটনাগুলো বার করতে হবে। ওই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "এই সংসারে বালি আর চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মত বালি ত্যাগ করে করে চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সে-ই চতুর।" তা যদি পারা যায় তাহলে অতি-মনস্তত্ত্ব স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে, আলোকের কাছে হবে আঁধারের পরাজয়। অনুসন্ধিৎসায় অনুবীক্ষণে সব কিছু ধরা পড়বে। তখন জানা যাবে বুদ্ধি ও যুক্তির সীমা পেরিয়ে কখনো কখনো অঘটন কেন ঘটে।

যখন সম্পাদক ছিলাম

পরিমল গোস্বামী

(লেখকের পঞ্চম স্মৃতিগ্রন্থ 'যখন সম্পাদক ছিলাম' পুস্তকাকারে ছাপা হচ্ছে। এটি সেই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সম্পাদনা-জীবনের স্মৃতির সঙ্গে গাছের প্রাণ আবিষ্কার বিষয়ে কিছু ব্যঙ্গ রচনা স্থান পেয়েছে। অতএব এটিকে লেখকের পূর্বপ্রকাশিত প্রবাসীর আবোল তাবোল পর্যায়ের লেখাগুলির পরিপূরকরূপে পড়া যেতে পারে।)

১৯৪৫—১লা মার্চ, যুগান্তরের ম্যাগাজিন সেকশন, যার নাম যুগান্তর সাময়িকী, তার সম্পাদক রূপে যোগ ঘটাল প্রিয় বন্ধু প্রমথনাথ বিশী। সে তখন সম্পাদকীয় বিভাগের সহকারী। আনন্দ চাটুজ্জে লেনের পুরানো এক বাড়িতে সব কিছু। আবার নতুন করে আনুষ্ঠানিক-ভাবে সম্পাদনা-জীবন শুরু। এবার দীর্ঘমেয়াদি। হিসাবে ১৯ বছর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মানির সঙ্গে শেষ হতে মাস তিনেক বাকি। কিন্তু তখন থেকেই নিশ্চিত বোঝা গিয়েছিল পরিণামে কি হবে। কলকাতার উপর বোমা পড়ার ভয় তখন একেবারেই ছিল না। সে তো ১৯৪২ সনেই শেষ হয়ে গেছে। ঐ সময় গোটাকত জাপানি বোমা কলকাতায় না পড়লে শহরের দুর্দশা এতটা বাড়ত না। দুর্দশা লোক পালানো এবং ফিরে আসায়। শুধু এই কাজে যে কত লোকের নিদারুণ ক্ষতি হল তার হিসাব হয়নি অদ্যাবধি। বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে পালাতে গিয়ে। অনেকে দামী জিনিস ফেলে পালিয়েছে, অনেকে সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। আসবাবপত্রও তাই। তারপর রেলস্টেশনে অসম্ভব রকম ঘুষ দিয়ে কামরার ভিতরে যেতে পেরেছে। দেশে গিয়েছে প্রায় শূন্য হাতে। কলকাতায় তখন বাড়িভাড়া বেজায় সস্তা হয়ে গেল। আমি যে বাড়িতে ছিলাম তার ভাড়া ৪০ থেকে ২৫ টাকায় নামল। এখন শুনতে পাই সে বাড়ির পৌনে দুশ টাকা মাসিক ভাড়া।

সবই জাপানি বোমার ফল। তার উদ্দেশ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি, বোমার নাম ছিল অ্যান্টি-পারসনেল বম্। আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। কিন্তু এর তিন বছরের মধ্যে ৬ই অগস্ট (১৯৪৫) হিরোশিমার উপর এবং ৯ই অগস্ট নাগাসাকির উপরে যে পরমাণু-বোমা পড়ল, তাতে সমস্ত পৃথিবী আতঙ্কিত হল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হল ১৪ই অগস্ট—সেই দিন জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল।

যুদ্ধ থেমে গেলে আমরা কিছু নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু এ থামাটা কিছুদিন আগে থেকেই অপেক্ষিত ছিল।

কাজে উৎসাহ নতুন করে জেগে উঠল। একদিকে যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, তাতে আমরা নিশ্চয় অল্পদিনের মধ্যেই সুখের দিন দেখতে পাব এই আশা, অন্যদিকে নতুন পরিবেশের রোমাঞ্চ।

এখনকার মতো তখন লেখক-সংখ্যা অথবা প্রেরিত লেখার সংখ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে তখন অনেকেই অতি ব্যস্ত এবং ক্লান্ত। একটা মজার ব্যাপার এই যে, যুদ্ধের কয়েক বছরে পাঠক-সংখ্যাই শুধু অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। এবং সেও যুদ্ধের বিষয়ে প্রবন্ধ বা পুস্তক পাঠকের সংখ্যা। যুদ্ধ বেশ ভাল ভাবে জমে উঠলে কাগজে পড়ে বা রেডিওতে শুনে সাধারণ পাঠক হঠাৎ বুঝতে পারল, তাদের এ বিষয়ে অনেক কিছুই জানা নেই, তাই এই আগ্রহ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ল। এর পর যখন প্রায় বছর দশেকের মধ্যে লেখক-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার মুখে, তখন যুগান্তরের এক সাংবাদিক ত্রিবিক্রম

পাঠক, এম-এ, (অধুনা মৃত) আমার কাছে একটি প্রবন্ধ নিয়ে এলেন। আমি তখন ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলাম, বাংলাদেশে একমাত্র আপনিই পাঠক ছিলেন, শেষে আপনিও লেখক হলেন ?

এই কথাতে বোঝা যাচ্ছে, লেখক-সংখ্যা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সেও তো প্রায় দশ বছর হতে চলল। এখন সাময়িকী বিভাগে লেখার হিসাব রাখতে সহকারী-সংখ্যা আরও বাড়াতে হয়েছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার তখনকার সাব-এডিটর প্রফুল্ল মিত্র, ইনি আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন, আমাকে একদিন বললেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাল লোক তুষারকান্তি ঘোষ। হঠাৎ এ কথার তাৎপর্য আদৌ বুঝতে পারিনি। প্রফুল্লবাবু বললেন, সবচেয়ে ভাল, কারণ তিনি আমাদের প্রত্যেকের বেতন প্রতি মাসের পয়লা চুকিয়ে দেন। বলা বাহুল্য কথাটা শ্রুতিমনোহর। এবং কথাটা যে বাড়িয়ে বলা নয়, তা পরবর্তী ১৮ বছর ধরে প্রতি মাসে অনুভব করেছি।

যুগান্তরে এসে দেখি কাজে জটিলতা নেই। সে সময় প্রেরিত রচনা-সংখ্যা নাম মাত্র, কাজেই আমাকে পরিচিত লেখকদের শরণাপন্ন হতে হল কিছু পরিমাণ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি ধারাবাহিক ঘরোয়া উপন্যাস লিখছিলেন। আমি আমন্ত্রণ জানালাম প্রমথ চৌধুরীকে। ইন্দিরা দেবী খুব যত্ন করে তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি লেখা আমার পাবার ব্যবস্থা করলেন। বিজ্ঞান-সংবাদ বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু লেখার ব্যবস্থা করা গেল শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী (বি-এসসি)-কে দিয়ে। গৌরী সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর স্ত্রী। দুজনেই বিজ্ঞানের উপাধিধারী। জিনিসটি নির্ভরযোগ্যও হল অবশ্যই। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে রচনা লেখাবার ব্যবস্থাও করলাম। আমি নিজে দুচারটি বাইরে থেকে আসা রচনা বাছাই করার কাজে তৃপ্তি না পেয়ে ছদ্মনামে নানা বিষয়ে সরস প্যারাগ্রাফ কয়েকটি করে লিখতে আরম্ভ করলাম। অনেক জিনিস বলবার আছে অথচ বলব না, এ অবস্থা আমার কাছে পীড়াদায়ক বোধ হয়েছিল। এডিটিং-এর আসল অর্থ ছাপার জন্য কপি সংশোধন ইত্যাদি করে তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু শুধুই সে কাজ আমার ভাল লাগেনি। সম্পাদক যখন, তখন কিছু সম্পাদকীয় অবশ্যই লিখতে হবে, এইটি হলেই তা আমার মনের মতন হয়। শেষে আনন্দ চাটুজ্জে লেন থেকে বাগবাজার স্ট্রীটে সম্পাদকীয় বিভাগ উঠে এল। নিয়মিত সাপ্তাহিক ফীচার লিখতে আরম্ভ করলাম ম্যাগাজিন সেকশনে। নাম ইতস্ততঃ। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সেক্রেটারি আমাকে বললেন, ঐ নামে আগে সম্পাদকীয় পাতায় অন্য একজন লিখতেন। আমার এ লেখার নাম ইতস্ততঃ হওয়াতে লেখক অভিযোগ করেছেন, অনেকে ভাবছেন এটি তাঁর লেখা, তাতে তাঁর লেখার এই অবনতিতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইতস্ততঃ নাম যে বহু আগে আর একজন ব্যবহার করেছেন তা আমার জানা ছিল না। এটি একটি সাধারণ নাম। এই শিরোনামে যে কোনো কাগজে যে কোনো লেখক লিখলেই একমাত্র সেই বিশেষ ব্যক্তির লেখা বলে সবাই সন্দেহ করবে এবং তাঁর কলমে এমন নিকৃষ্ট লেখা বেরুচ্ছে কেন, বলে অভিযোগ করবে, এটি অবিশ্বাস্য মনে হল। কোনো কোনো ব্যক্তির এ রকম ভ্যানিটি থাকে বটে। কিন্তু এ কথা আমার কানে আসামাত্র আমি সঙ্কুচিত হলাম এই ভেবে যে, আমার লেখা অন্য কারো লেখা বলে পাঠক সন্দেহ করবেন এ ব্যাপারটা আমার পক্ষেও অসহ্য। তাছাড়া আমি সে ব্যক্তির কোনো লেখাই পড়িনি। তাই নাম বদল করলাম উৎসাহের সঙ্গে। নতুন নাম দিলাম ইতশ্চেতঃ। একই অর্থ—ইতঃ+চ+ইতঃ। এই নামটিই আমার কানে বেশি ভাল লাগল আরো এ জন্য যে, শব্দটি অন্য কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখিনি। এককলমী অর্থে এক কলমে যে লেখে তা নয়। একটি কলম আছে যার তাও নয়। একটি মাত্র চুলে যে সূক্ষ্ম তুলি তৈরি হয় সেই কলমের অধিকারী, এককলমী।

১৯৪৫ সনে আমি প্রমথ চৌধুরীর চারটি রচনা ছাপি, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৮৯০ সনে চুয়াডাঙা থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেখানাও প্রকাশ করি। প্রমথ চৌধুরীর রচনা এই পত্রে আর কোথাও ছাপা হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

দীর্ঘ সাত বছর অন্ধকারের কলকাতায় যুদ্ধের প্রভাব-ক্লিষ্ট শহরের পরিবেশে যত বৈচিত্র্যই থাক, মন অজ্ঞাতসারেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা হঠাৎ খুব বেশি করে বোঝা গেল ২রা সেপটেম্বর (১৯৪৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর। সমস্ত মনপ্রাণ শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে যে-কোনো খোলা জায়গায় ছুটে যাবার জন্য ছটফট করতে লাগল। কবি কীটস লিখেছেন—

> To one who has been
> long in city pent
> 'Tis very sweet to look
> into the fair
> And open face of heaven
> —to breathe a prayer
> Full in the smile of the
> blue firmament.

আমি ঐ very sweetএর স্থানে, বলতে চাই, ঐ লাইনটা বদল করা উচিত এইভাবে, Tis a crime not to look into the fair and open face of heaven.

একটা মিল দেখতে পাচ্ছি।—যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রায় দেড় মাস পরেই ভবিষ্যতে কবে আর বাইরে যেতে পারব আশঙ্কায় গিয়েছিলাম দার্জিলিং। আমার সঙ্গী ছিল তিনজন, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, কিরণকুমার রায় ও সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। এবারে যুদ্ধান্তে প্রায় সেই একই সঙ্গী—শুধু অতুলানন্দের স্থলে রবি ঘোষ।

গিয়েছিলাম হাজারিবাগ রোডে ও পরে হাজারিবাগ জেলাশহর থেকে রাজরপ্পা। হাজারিবাগ রোডের সামান্য কয়েকটা দিনে যে আশ্চর্য মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলাম তা আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। না-শীত না-গ্রীষ্মের আবহাওয়া, অথচ তারই মধ্যে একদিন সমস্ত আকাশ জুড়ে ঘনকালো, ধূসর, আর শাদা মেঘের গাঢ় বিজড়িত আবির্ভাব, আকাশ জুড়ে তীক্ষ্ণ আগুনের ডালপালা বিস্তার করা বিদ্যুতের মুহুর্মুহু রেখাচিত্রাঙ্কন আর সমস্ত আকাশ জুড়ে গুরুগর্জনের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘোষণা, তার সঙ্গে বিপুল বর্ষণ, সে যে কি প্রবলভাবে সুন্দর তা শুধু অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন দিগন্তব্যাপী ঝড়ের আবির্ভাব কতদিন যে দেখিনি গ্রাম ছাড়ার পর, তাই মনে হল এ যেন মুহূর্তকালের মধ্যে আমার জন্মান্তর ঘটে গেল। আরো একদিন ঐ স্থানের বিরাট মুক্ত প্রান্তরে নিস্তব্ধ পরিবেশে আকাশ-জোড়া নক্ষত্ররাজির ক্রমআবির্ভাবের দৃশ্যের নিচে বসার দুর্লভ পুণ্য লাভ করেছিলাম। এ সব সেদিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল যুদ্ধান্তের দিনে। ফিরে এলাম নতুন জীবন আর উৎসাহ নিয়ে। এ ভ্রমণে সঞ্চয় যা কিছু হল শুধু মনের। ১৯৪৬ সনের কথা এটি এবং ঐ একই বছরের শেষ দিকে আর এক ভ্রমণে যেতে হল এক দুর্লভ দর্শনীয়ের টানে। জলপাইগুড়ি থেকে আমন্ত্রণ এল, খেদা প্রস্তুত, চলে আসুন। অশোক মৈত্রের পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ, তবু ত্রুটি ছিল না কিছু। এবারে সঙ্গী মাত্র সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। হাতী খেদা দেখা হল, বুনো হাতী বাঁধার কৌশল দেখারও সুযোগ ঘটল, ফোটোগ্রাফ তোলার সুযোগ ঘটল। (এই দুটি ভ্রমণের বিবরণই ১৯৪৬-৪৭ সনে প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।)

কিন্তু জয়ন্তীর জনহীন উঁচুনিচু পাহাড়ী অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এমন এক গম্ভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম মুহূর্তের জন্য, যা আর কোথাও অনুভব করিনি। আধুনিকতার সকল স্পর্শ বর্জিত হিংস্র জন্তুর গোপন নিবাসে বসে সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটাই তার অতীত নিয়ে মনে মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সে-কথা এখন আর বলা চলবে না। কারণ এ-সবই প্রসঙ্গত এসে গেল, হয়তো অপ্রাসঙ্গিকও মনে হতে পারে। তাই ফিরে যাই বাগবাজার স্ট্রীটে। আসল কথা হচ্ছে, মনের দিক থেকে হাওয়া পরিবর্তন দরকার ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণেই হল। এবং ফিরে এসে

আর এক অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। এক বন্ধু আমার এই ভ্রমণকাহিনী শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব কাগজের খরচে তো? আমি বললাম, না, নিজের। তিনি বললেন, এটা আপনার নির্বুদ্ধিতা। এসে বিল করবেন এবং কাগজের কাজেই যে গিয়েছিলেন তা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। বললাম. তা কঠিন না হলেও আমার পক্ষে কঠিন, কারণ অভ্যাস নেই। তিনি দুতিন দিন ধরে আমাকে এবিষয় বুঝিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, তিনি বাইরে গেলে সব সময় বিল করেন। কারণ অতিরিক্ত কিছু আয়ের পথ কর্তৃপক্ষ এইভাবেই করে রেখেছেন, এটা সবাই জানে। কিন্তু তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে না পেরে হতাশ হয়েছিলেন।

আমি অপেক্ষাকৃত নবাগত বলে অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ দিয়ে ম্যাগাজিন সেকশনের সমালোচনা করতেন। নামকরা বিজ্ঞান-লেখকদের নিয়মিত সরল ভাষায় লেখা বিজ্ঞান-কথাও চলল না। আর একজন বললেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার হয়েছে, তাঁর বিষয়ে আর কোনো রচনা ছাপান কি ভাল? আর একজন লিখে জানালেন, 'হাসির অন্তরালে' পর্যায় আর কত দিন চালাবেন? আর একটি ধারাবাহিক রচনা—ব্যক্তিগত জীবনের কৌতুক-কাহিনী (দেশী ও বিদেশী) চলতে না চলতে একজন বললেন ভাল হচ্ছে না। বাইরের অ্যানেকডোটগুলি অবশ্য বিদেশে বহুখ্যাত ছিল।

নবাগতকে এত সমালোচকের মন রাখার চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু পরে এঁদের সবাইকে অগ্রাহ্য করতেই হল। যাই হোক, আমি যে-সব ধারাবাহিক রচনা নিজে লেখকদের অনুরোধ করে লিখিয়েছি এবং প্রকাশ করেছি তা প্রায় সবই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং খ্যাতিলাভ করেছে। 'হাসির অন্তরালে' একখানি অতি উল্লেখযোগ্য পুস্তকরূপে সমাদৃত হয়েছে। 'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' চমৎকার বই হয়েছে। এ ছাড়া দুখানি শিকারের বই। আর একখানি বই 'আমার ঘরের আশেপাশে'—পুস্তকাকারে ছাপা হওয়ার পর 'নরসিং দাস' পুরস্কার পেয়েছে। এই বই সম্পর্কে কিছু পূর্ব ইতিহাস আছে যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং শুনলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি বিষয়ে কিছু জ্ঞানলাভও হতে পারে। অনেক আগে থেকে আরম্ভ করতে হবে ইতিহাসটি।

বিষয়টি জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে। ১১-১০-৫৯ তারিখে রেডিওর একটি 'রূপক' শুনে বিস্মিত হলাম। দীপালি দত্ত নামক একটি অনাথ মেয়েকে উদয় ভিলা আশ্রমে রাখা হবে, তার সঙ্গে কথা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, জগদীশচন্দ্র বসুর নাম জান? মেয়েটি বলল, জানি, তিনি গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। প্রশ্নকারী শুনে মহা খুশি। বা! বা! তুমি তো অনেক জান, তোমাকে আমরা ভরতি করে নেব।

আমার সমালোচনাটি এই উপলক্ষেই আরম্ভ। গাছের প্রাণ আবিষ্কার করার প্রশ্নটাই এমন অসম্ভব রকমের হাস্যকর যে এ কথাটা কে প্রচার করল সন্ধান নিতে গিয়ে দেখি, ছোটদের পাঠ্য প্রায় সকল বইতে ঐ এক কথাই লেখা আছে। কিন্তু কি করে এই প্রাণ আবিষ্কারের প্রশ্ন উঠল? জীববিদ্যা বা বায়োলজির দুটি ভাগ আছে, একটি ভাগে জুওলজি, অন্য ভাগে বটানি। উদ্ভিদের জীবন আছে বলেই এই বিদ্যা জীববিদ্যার মধ্যে স্থান পেয়েছে জগদীশচন্দ্রের জন্মের অন্তত আড়াই শ' বছর আগে। কাজেই তিনি গাছকে প্রাণীরূপে জৈববিজ্ঞানের জগতে চিনিয়ে দিয়েছেন এ কথা জগদীশচন্দ্র কল্পনা করেননি কখনো। প্রাণ আবিষ্কারের কথা কোনো প্রাণী সম্পর্কেই অদ্যাবধি ওঠেনি। তবে যদি কেউ বলেন ধাতু এক জাতীয় প্রাণী, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রমাণ দেখাও। এবং সেই ব্যক্তি যদি একখণ্ড সোনা এনে দেখাতে পারেন, সোনার বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, বাচ্চা হয় তবে সেই ব্যক্তির বিষয়ে এ কথা বলা চলে যে তিনি সোনাকে প্রাণীরূপে প্রমাণ করেছেন।

তা ছাড়া কোনো প্রাণী বা জীবের প্রাণ তার সর্বাঙ্গে কোষের মধ্যে সঞ্চারিত থাকে। কাজেই তার প্রাণ

কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আবিষ্কার করা যায় না। এবং সে প্রাণ দেহের অংশ বাদ দিলেও থাকে আর যদি প্রাণ মানে আত্মা হয় তা হলে সে আত্মাও কোথায় থাকে তার প্রমাণও অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। কোনো জীবেরই না। অতএব একমাত্র গাছের আত্মা আছে এবং সে আত্মা জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন এমন কথা ঐ পাঠ্যপুস্তক লেখকগণ, ও সেগুলি পাঠ করে যারা এই জ্ঞান লাভ করছে, তারা ভিন্ন পৃথিবীর আর কেউ জানে না।

এই প্রাণ আবিষ্কারের সংবাদ যে মিথ্যা একথা ইতস্ততঃতে লেখার পর বহু চিঠি পেলাম আমার মতের বিরুদ্ধে। কেউ লিখলেন, জগদীশচন্দ্র যদি গাছের প্রাণ আবিষ্কার না করে থাকেন তবে তিনি কি করেছেন?

প্রসঙ্গত বলি, আজ এই ১৯৭৩-এর এপ্রিল মাসে যখন এই সব কথা লিখছি—আজও আমি অনেক গ্র্যাজুয়েটের কাছ থেকে জগদীশ বসুর কোন্ আবিষ্কার বিখ্যাত, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি গাছের প্রাণ আবিষ্কার। যাই হোক, আমার 'কলমে' এই মূঢ়তার বিরুদ্ধে সোজাসুজি কিছু বলে কোনো লাভ হবে না জেনে কিছু কৌতুকের পথে যেতে উৎসাহিত হলাম। উৎসাহ আরো বাড়ল সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে। সে জানিয়েছিল, কোনো একখানি স্কুলপাঠ্য বইতে লেখা আছে গাছের সুখদুঃখ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতির বোধ আছে, এবং এ সবই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার।

আমি যে পথ অবলম্বন করেছিলাম তা বলার আগে সামান্য কয়েকটি ব্যাখ্যা দরকার। মানুষের বিবর্তনের ধারা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি দেশে এমন কয়েকটি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাদের বংশধর এখন কেউ নেই। দক্ষিণ ফ্রানসের ক্রো-মানির্য় গ্রামে এমনি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল—সেই মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে ক্রো-মানির্য় ম্যান। ইংরেজি উচ্চারণে ক্রো-ম্যাগনন। এমনি নিয়ানডারথাল ম্যান, পিকিন ম্যান, রোডেশিয়ান ম্যান, সোলো ম্যান, ইত্যাদি নির্বংশ প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়াতে বিবর্তনের ধারা বুঝতে কিছু সুবিধা হয়েছে। (এর মধ্যে পিলটডাউন ম্যান নামক মিঃ ডসনের একটি ধাপ্পা বাতিল হয়ে গেছে।) আমার লেখার মধ্যে ঐই সব নাম জীবিত রূপে কল্পিত হয়েছিল, এবং এই ধাপ্পার কিছু কাজও হয়েছিল। অন্তত তখনকার মতো হয়েছিল। তাছাড়া ডকটর কেঞ্চু নামের এক কল্পিত বিজ্ঞানীকে আমদানি করেছিলাম। এটি আমারই উদ্ভাবিত কেঁচোর একটি ভদ্র নাম। কেঞ্চু নামে একটি গল্প ছন্দে কাহিনীও লিখেছিলাম এককালে শনিবারের চিঠিতে। এতদিন পরে সেই কেঞ্চুকে বিজ্ঞানী সাজিয়ে হাজির করা গেল প্রাণ আবিষ্কারের আলোচনার মধ্যে। আরো বিজ্ঞানীর মর্যাদা দেওয়া গেল কেফালোপডকে (শামুক জাতীয় জীব), মারসুপিয়ালকে (অর্থ, পেটে থলে বিশিষ্ট জীব, যেমন ক্যাঙারু) এছাড়া প্রোটোজোয়াকেও বিজ্ঞানী বানিয়েছিলাম।

এইবার আমি যা লিখেছিলাম (১লা নভেম্বর ১৯৫১, ইতস্ততঃতে) তার অংশ উদ্ধৃত করছি (আগের জের টেনে)—

গত সপ্তাহে ইতস্ততঃ লিখতে আরম্ভ করেই বুঝতে পারছিলাম মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছিলেন, এই তথ্যটা দেশে কতখানি প্রচার হয়েছে তা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কারণ আমি নিজে একখানি সাধারণ-জ্ঞানের বই লিখছি, এবং ছাপাচ্ছি (কারণ তা ভিন্ন মৌলিক জ্ঞান প্রচারের স্বাধীনতা আর কোন্ বইতে পাওয়া যাবে?)...আমার বইয়ের একটি অধ্যায় একটু পরেই উদ্ধৃত করব, কিন্তু তার আগে আমার উপর আক্রমণের কিছু কিছু নমুনা দিই:

একজন লিখছেন...দীপালি দত্ত (রেডিওর সেই রূপকের অনাথ বালিকা) প্রসঙ্গে আপনি কি বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জগদীশচন্দ্রের সর্বজনপরিচিত আবিষ্কারকে অস্বীকার করাই কি আপনার উদ্দেশ্য?

আপনার লেখা থেকে আপত্তিকর অংশটুকু উদ্ধৃত করছি —'জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছিলেন, এই মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে ঐ মেয়েটি বলল (রেডিওর সেই রূপক প্রসঙ্গে) এবং তাকে যাঁরা ভরতি করে নিলেন তাঁরা এই মিথ্যা কথাটা শুনে প্রশংসা করলেন এবং তাকে আনন্দের সঙ্গে ভরতি করে নিলেন এবং নিলেন এমন একটি আশ্রমে যার সঙ্গে অবলা বসুর নাম জড়িত।"—আশা করি আপনার মতটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন। (২৫।১০।৫৯।)

আর একজন লিখছেন—আপনার ২৫শে অক্টোবর-এর যুগান্তরে দীপালি দত্তের ভাগ্যের কথা পড়িয়া মনে হইতেছে যেন জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেন নাই।...

ফলিত গণিত বিভাগের (কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়) বিহারী ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র (পঞ্চানন রায়) এক চিঠি লিখে আমাকে বিব্রত করলেন। তিনি লিখলেন...উদ্ভিদের প্রাণ আছে এটা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার এ ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা নিরানব্বই জন পোষণ করে আসছে।...

এ চিঠি দীর্ঘ। এই প্রথম এক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এমন চিঠি পাওয়া গেল। এ চিঠির পরে আমার মন্তব্য ছিল এই :

এইবার আমার নিজের লেখা বই থেকে প্রতিশ্রুত উদ্ধৃতিগুলি নিচে দিচ্ছি।

১। স্পঞ্জ, সামুদ্রিক বিছা, ও কেঁচোর প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন ডকটর জন কেঞ্চ্ (১২৯৯ খ্রীঃ)।

২। শামুকের প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন ডকটর কেকালোপড (১৩০০ খ্রীঃ)।

৩। ক্যাঙারুর প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন, ডকটর মারসুপিয়াল (১৩৫০ খ্রীঃ)।

৪। বানরের প্রাণ আছে, আবিষ্কার করেন, চার্লস ডারউইন (১৮০৬ খ্রীঃ)।

৫। বিভিন্ন জাতীয় মানুষের মধ্যে একমাত্র পিলটডাউন ম্যানের প্রাণ আছে—আবিষ্কার করেন মিস্টার ডসন (১৯১২ খ্রীঃ)। বাকি সব মানুষ, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতির প্রাণ আছে কি না তা এখনও জোর করে বলা যাচ্ছে না। আমি গত কুড়ি বছর যাবৎ গবেষণা করে যে সব প্রাণ আবিষ্কারকের নাম সংগ্রহ করেছি তা সবই এখানে দেওয়া হল। অন্য নাম পাওয়া যায় নি, অতএব আমাকে বাধ্য হয়ে এই অনুমান করতে হচ্ছে যে, অন্যান্য মানুষ, পশু, পাখী ও কীটপতঙ্গের প্রাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

ঐ তারিখে এই পর্যন্তই লিখেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই থামেনি, এর জের চলেছিল আরো। এবং মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গ আরো উঠেছে এবং ১৯৭২ সনেও আবার উঠেছে। সে সব একটু পরেই বলছি।

১৫/১১/১৯৫৯ তারিখে আরো লিখলাম—(আসলে এটি আর একটি ধাপ্পা, যদিও দুখানা চিঠি ধাপ্পা নয়)। আমি লিখলাম—

জগদীশচন্দ্র ও গাছের প্রাণ আবিষ্কার বিষয়ে, এত চিঠি পাব ভাবতেই পারিনি।...সিংভুম চক্রধরপুর থেকে একজন এই প্রশ্নগুলির উত্তর চেয়েছেন; (১) উদ্ভিদের প্রাণ আছে কি? থাকলে কোন্ বৈজ্ঞানিক তা কখন আবিষ্কার করেছেন? জগদীশচন্দ্রেরই বা কি দান রয়েছে? (২) আমরা পিলটডাউন ম্যানের অন্তর্গত কি না?

উপরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে আর একখানা চিঠির একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করতে হবে আগে। চিঠিখানা এসেছে হাওড়া থেকে। পত্র-লেখক ডকটর কেঞ্চ্ কর্তৃক স্পঞ্জের প্রাণ আবিষ্কার বিষয়ে আমার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, স্পঞ্জ যখন উদ্ভিদ্ (পত্র লেখকের মতে) তখন জগদীশচন্দ্র বসু ও ডঃ কেঞ্চ্ (১২৯৯) এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে প্রকৃত আবিষ্কারক বলিয়া জানিব?

উপরের এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায়, উদ্ভিদের প্রাণ আবিষ্কারের গৌরব ডকটর কেঞ্চ্-র প্রাপ্য, অবশ্য স্পঞ্জ যদি উদ্ভিদ্ হয়। ইটালিয়ান এনসাইক্লোপীডিয়ার তৃতীয় সংস্করণে মিস্টার চৌলানি ক্রোচেস্কোয়া প্রাপক

এক জীবুদ্ধি-বিজ্ঞানী এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন। আমার জ্ঞানের সীমা ঐ বইখানা পর্যন্তই বিস্তৃত।...প্রথম পত্রলেখকের দ্বিতীয় প্রশ্ন—"আমরা পিলটডাউন ম্যানের অন্তর্গত কি না।"—অর্থাৎ তিনিই আমাদের আদিপুরুষ কি না। কিন্তু আমি ইতিপূর্বেই নৃবিজ্ঞানী মিষ্টার সোলো ম্যান (যাঁর বংশ থেকে জ্ঞানশ্রী সলোমনের উদ্ভব) এবং মিস্টার নিয়ানডারথাল ম্যান (যাঁর উত্তর পুরুষ টমাস ম্যান, হাউসম্যান) প্রভৃতির মত কি, জানবার জন্য বিলেতের টেট গ্যালারির অধিকর্তা মিঃ তুলুস লোত্রেক ও হুইপস্নেড পার্কের অধিবাসী বিখ্যাত নরুরক্ত-বিজ্ঞানী ডকটর ফেলিস টিগ্রিসের সঙ্গে পত্রালাপ করেছি।...এঁরা সবাই আমাকে ডকটর ক্রো-মানিয়ঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে বলেন। তাই করেছিলাম। ডকটর ক্রো-মানিয়ঁ আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন তার সামান্য কিছু তুলে দিচ্ছি।—

মঁসিয়ে, আপনার প্রেরিত চিঠি ও আপনার নিজের চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছি। বাংলা দেশের শিক্ষার কি এই পরিণাম হয়েছে এখন? গাছের প্রাণ আবিষ্কার কে করেছে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া লজ্জাকর মনে করি। আচ্ছা বলতে পারেন, পৃথিবীর মাটি কে প্রথম আবিষ্কার করেছে? প্রথম কে মানুষ আবিষ্কার করেছে? প্রথম কে কাক আবিষ্কার করেছে? প্রথম কে সূর্য আবিষ্কার করেছে?...আমার এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে পারেন তা হলেই আপনার পত্রপ্রেরকের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। নির্বুদ্ধিতার একটা সীমা থাকা উচিত।...ইতি বশংবদ ক্রো-মানিয়ঁ। দরদয়েন, পুই ৯-১১-৫৯।

এই চিঠির পরের প্যারাগ্রাফে আরো দুজন কল্পিত বিজ্ঞানীকে আমদানি করতে হয়েছিল, একজন ডকটর ফেলিস পারডুস, অন্যজন মিস্টার প্যাংগোলিন। (প্রথম জন লেপার্ড, দ্বিতীয় জন পিঁপড়ে-খাওয়া প্রাণী।) এবারে আমি যা লিখেছিলাম তা বুঝতে সুবিধা হবে। যথা—

চিঠিখানা ছাপার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রূঢ় ভাষা থাকা সত্ত্বেও দেশের কিছু উপকার হবে বিবেচনায় ছাপাই ঠিক করলাম। আমার নিজেরই বলা উচিত ছিল অ্যালেকজাণ্ডার হিল বা হ্যালিবারটন প্রভৃতি শারীর-তত্ত্বে পণ্ডিতগণ এবং জগদীশচন্দ্র বসু একাসনে। প্রথম দুজন মানুষের প্রাণ আবিষ্কার করেননি, জগদীশচন্দ্রও গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেন নি। অর্থাৎ ডঃ কেকু ও জগদীশচন্দ্র সমগোত্রীয়, কেউ কারো চেয়ে বড় নন। (আমার কাছে ডঃ ফেলিস পারডুস লিখিত একখানি চিঠি আছে, সেটি আমি যে কোনো মুহূর্তে প্রকাশ করতে প্রস্তুত আছি।) পরিশেষে বক্তব্য আমরা পিলটডাউন মানুষের বংশধর নই। ডসন ১৯০৮ সনে তাকে আবিষ্কার করেন ও ১৯১২ সনে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন আইনজীবী, আইন বাঁচিয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁর সেই জোচ্চুরি অনেককাল পরে ধরা পড়ে। এ-বিষয়ে আফ্রিকার মিস্টার প্যাংগোলিন আমার সঙ্গে একমত।

এইবার পূর্বের কথায় ফিরে যাই। ইতস্ততঃ কলমে যখন গাছের প্রাণ নিয়ে এই খেলা চলছিল, সেই সময় এক অপরিচিত লেখকের কাছ থেকে এক প্রবন্ধ এসে হাজির। লেখকের নাম অধ্যাপক তারকমোহন দাস পিএইচ-ডি (লণ্ডন)। তাঁর রচনার নাম 'জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেননি, সে চেষ্টাও তিনি করেননি।' ডকটর ক্রো-মানিয়ঁর চিঠি ছাপার পর ডকটর তারকমোহন দাসের এই প্রবন্ধ ছাপা হল। ফলে অল্প কিছুদিন সবাই চুপ। (যদিও খুব বেশিদিনের জন্য নয়।)—যাই হোক, এই উপলক্ষে তারকমোহনকে আমন্ত্রণ জানালাম দেখা করার জন্য। পরিচয় হল। তাঁকে অতঃপর অনুরোধ জানালাম, ধারাবাহিক একটি বিষয়ের রচনা লিখতে। তাঁকে বললাম আমাদের চারিদিকে যে সব গাছপালা ফুল প্রভৃতি দেখতে পাই, সে সবের অনেকগুলিরই নাম আমরা জানি না। সেই সব পরিচিত অথচ নাম-না-জানা গাছপালা ও ফুলফল যাতে আমরা নামেও চিনতে পারি তার জন্যই এই অনুরোধ এবং সেই লক্ষ্য মনে রেখেই লিখতে হবে। আমি আরো বলেছিলাম, (অর্থাৎ আমি কেন এ ইচ্ছা

করেছি) আমাদের লেখকেরা অনেকে গল্পের পটভূমি রচনায় প্রকৃতির যে সামান্য বর্ণনা দেন তাতে অনেক সময় নাম-না-জানা ফুল, নাম-না-জানা পাখী প্রভৃতির উল্লেখ করেন। নাম জানা থাকলে কিছু বৈচিত্র্য বাড়তে পারে। অবশ্য তিনি যদিও খুব যত্ন করে অনেকগুলি সচিত্র প্রবন্ধ লিখলেন পর পর এবং তা পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে পুরস্কারও লাভ করল (পূর্বে উল্লেখ করেছি এ কথা), কিন্তু ইতিমধ্যে লেখকেরা গল্প উপন্যাস থেকে প্রকৃতিকে মনে হয় একেবারেই বাদ দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর ফিরে পাওয়া গেল না।

জগদীশচন্দ্র ও গাছের প্রাণ বিষয়ে প্রসঙ্গ কিছুকাল চুপচাপ থাকার পরে মাঝে মাঝেই নতুন করে আরম্ভ হয়েছে, এবং আবার এর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিত পাঠ্যপুস্তক-লেখক ও উদাসীন শিক্ষা বিভাগের যোগাযোগে জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন এ জ্ঞান অদ্যাবধি সচল আছে। এমন কি জগদীশচন্দ্রের একান্ত স্নেহভাজন ও সহকর্মী বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের একখানা চিঠি ছাপার পরেও পাঠ্যপুস্তক থেকে ঐ মিথ্যাটি দূর হয়নি। গোপালবাবু লিখেছেন, জগদীশচন্দ্রের গাছের প্রাণ আবিষ্কারের কথা তিনি জানেন না, কারণ কখনো শোনেননি। অথচ তিনি প্রায় ৫০ বছর সেখানে আছেন।

ইতিমধ্যে তারকমোহন দাসের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, তা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছে। এবং তিনি ১৯৭২-৭৩তে অ্যামেরিকায় থাকতে যে কয়েকখানি মূল্যবান্ চিঠি (শিক্ষা বিষয়ে প্রধানত) লিখেছিলেন তার কয়েকখানি প্রবাসী মাঘ ১৩৭৪—বৈশাখ ১৩৭৬ সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে। কিন্তু তার আগে জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে আরো একবার কিছু বলতে হচ্ছে। এক পাঠিকার কাছ থেকে ১৯৬৭ সনের প্রথম দিকে এক চিঠি পেলাম, তা থেকে জানা গেল, কোনো একখানা অভিধানেও ঐ প্রাণ আবিষ্কারের কথা লেখা আছে। এবারে এর উত্তরে আর ঘোরা পথে যাইনি। সোজাসুজি যা লিখেছিলাম তার সারাংশ হচ্ছে এই যে, জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে এ দেশের ভ্রান্তি ঘোচানো আর বোধ হয় সম্ভব নয়। যে-কোনো ছাত্র বা ছাত্রী (স্কুল বা কলেজের) সবাই ঐ একই কথা বলবে, জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। আমি নিজে বহুদিন ধরে বহু জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঐ একই উত্তর পেয়েছি। জগদীশচন্দ্র যে উক্ত চেষ্টা করেননি, কারণ এমন অসম্ভব প্রশ্ন তাঁর মনে আসেনি, আসতে পারে না, কোনো জন্তুজানোয়ার বা কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদ্ বিষয়ে বা মানুষের বিষয়ে এ প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করানো এদেশে এক অসম্ভব ব্যাপার।

মানুষের আত্মা আছে কি না এমন কথা বিজ্ঞানী মহলে আলোচিত হওয়ার কথা শুনেছি, কিন্তু সে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। দেহে আত্মার বসতি কোথায়, এ প্রশ্ন নিয়ে আমি বড় প্রবন্ধ লিখেছি এককালে। তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে, কিন্তু যাদের জন্ম, বৃদ্ধি, আহার বংশবিস্তার, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় বা আয়ুষ্কাল শেষ হলে মৃত্যু—প্রত্যেকটি মানুষের কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ এবং এই চিহ্ন দেখেই যাদের প্রাণ আছে এই ধারণা, জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ থেকেই স্থান ও কালের ধারণার মতো মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার পরেও তাদের প্রাণ আছে কি না এ প্রশ্ন একমাত্র পাগল ভি[ন্ন] আর কারো মনে জাগবার কথা নয়।

কোনো জীবের মৃত্যু হলে যদি কারো মনে সন্দে[হ] হয় মৃত্যু হয়নি, তা হলে সে সন্দেহের মূল্য আছে অর্থাৎ মৃত্যু হলে প্রাণ আছে কি না এমন সন্দেহ, কি[ন্তু] প্রত্যক্ষ জীবন্ত থাকতে প্রাণ আছে কি না এ সন্দে[হ] পাগলের।

খবর রাখলে জানতে পারা যেত, সপ্তদশ শতক থে[কে] বটানি শাস্ত্র দ্রুত এগিয়ে এসেছে বর্তমান যুগে। জা[না] যেত, রবার্ট হুক নামক এক ভদ্রলোক ১৬৬৫ খ্রীষ্টা[ব্দে] উদ্ভিদের গঠন নিয়ে আলোচনা করে দেহগঠনের সূ[ক্ষ্ম] একক-গুলিকে কোষ বা সেল নামে অভিহি[ত] করেছিলেন। প্রায় এই সময় আরো দুজন বিজ্ঞা[নী]

উদ্ভিদের অ্যানাটমি নামক বিদ্যার ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। এই সময় অন্য আর একজন বিজ্ঞানী বীজ-উৎপাদনে পরাগ রেণুর ভূমিকা, পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেছেন। আর এক বিজ্ঞানী পরাগ-যোগ কাজে কীট পতঙ্গের ভূমিকা আবিষ্কার করেছেন, এবং হাইব্রিডাইজেশন বা সঙ্করণ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন। প্ল্যান্ট ফিজিওলজির কার্যধারার নির্ভুল হিসাব করেছেন। এর পর আরো গবেষক আছেন।

কিন্তু এঁরা কেউ প্রাণ আবিষ্কারের মতো মূর্খ-সুলভ বাক্য উচ্চারণ করেননি। জগদীশচন্দ্রও করেননি। এঁরা সবাই গত তিনশ বছরের মধ্যে গাছের প্রাণ আছে জেনেই তার অ্যানাটমি ফিজিওলজি এবং যৌন-জীবন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে গেছেন।

তবে একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত যে, আমার এসব কথা কেউ শুনবে না। তবু আমি এই ১৯৬৭ (একথা যখন লিখেছিলাম) খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশ করেও 'জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন' যাঁরা লিখতে সাহস পান, যাঁরা সে লেখা পাঠ্যরূপে চলতে অনুমতি দেন, এবং যাঁরা সে লেখা পড়ান, তাঁরা এদেশে শিক্ষার পটভূমিতে কোন্ ঘৃণ্য স্তরে বাস করেন তার একটা ইতিহাস ছাপার অক্ষরে রেখে দিলাম, ভবিষ্যৎ গবেষকের কাজে লাগবে।

এসব লিখেছিলাম ১৯৬৭ সনের ফেব্রুয়ারির প্রথমে। এবং আমার ভবিষ্যদ্বাণী যে বৃথা হয়নি তা বোঝা গেল আর এক সমজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে। ডকটর তারকমোহন দাস, বর্তমানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, যুগান্তর সাময়িকীতে আর একবার জগদীশচন্দ্র বসু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, অতএব প্রসঙ্গত একথাও লিখতে হল যে, জগদীশচন্দ্র পাগল ছিলেন না, তিনি যা করেছেন তাই করেছেন, প্রাণ আবিষ্কার ইত্যাদির চেষ্টা করেননি। কেন করেননি আমি সেই কথাই এতক্ষণ ধরে বলেছি। আমার সম্পাদন কালে ঐ একই তারকমোহনের জগদীশচন্দ্র বসু প্রবন্ধ ছাপার পর অনেকেই কিছুকাল চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এবারে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রবন্ধে যুগান্তর চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হল তারকবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

আবার তা পড়ে আমার মগজের কৌতুককেন্দ্র উল্লসিত হয়ে উঠল। আমি ঐ প্রতিবাদের সমর্থনে চিঠিপত্র বিভাগে পুরাতন কৌশলের আশ্রয় নিলাম অনেক দিন পরে। আমার চিঠিখানা আগাগোড়াই hoax, ধাপ্পা, কিন্তু এমন গম্ভীরভাবে লিখলাম যাতে অনেকে বিশ্বাস করতে পারে। আমার চিঠি শিরোনাম সহ সবটাই উদ্ধৃত করছি।—চিঠিখানা ছাপা হয়েছিল ১৭/১২/৭২ তারিখে।

বৃক্ষের সুখদুঃখ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গাছের প্রাণ আবিষ্কার সম্পর্কিত চিঠির (১৩।১২।৭২) বক্তব্য নির্ভুল। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯৩৭) ঠিক এক বছর আগে ১৯৩৬ সনের ৭ই জুন থেকে ২৫শে জুন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন গবেষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণে যে অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, সেই নৈপুণ্যের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র অন্যের অগোচরে কয়েকটি যুগান্তকারী পরীক্ষা চালান। কিন্তু সে যন্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি মাইক্রোসোনিওফোন নামক সেই অসম্পূর্ণ যন্ত্রের সাহায্যে যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, গোপালবাবুর কাছ থেকে আমি তা অনেক দিন আগেই শুনেছিলাম। এই যন্ত্রের দ্বারা জগদীশচন্দ্র বৃক্ষ-কোষের বেদনায় ক্রন্দন, ও আনন্দে হাসির শব্দ ১০ লক্ষ গুণ অ্যামপ্লিফাই করতে সমর্থ হন, এবং খুব ক্ষীণ হলেও সে শব্দ তাঁরা দুজনেই শুনতে পান। তা ছাড়াও এমন একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন যার ম্যাগনিফিকেশন ১৪ হাজার। এর সাহায্যে আরো এক অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের বক্তৃতা গৃহে একটি গ্রামোফোন যন্ত্রে একখানি অর্কেস্ট্রা-বাদনের রেকর্ড চালিয়ে উক্ত বৃক্ষকোষ-সমূহে তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেন। দেখা যায়, সঙ্গীতের সুরে কোষগুলি ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে, আবার যন্ত্র বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দনও থেমে যাচ্ছে।

একে কোষের নৃত্য বলা চলে। জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল কাজটি সম্পূর্ণ হলে তবে তা প্রকাশ করবেন। তাঁর হাতের লেখা নোট ও অসম্পূর্ণ যন্ত্র দুটি এখনো গোপালবাবুর বাড়িতে রক্ষিত আছে। ডকটর তারকমোহন দাস ও আমি দুজনেই কয়েকমাস আগে সেসব একত্র দেখে এসেছি। তবু কেন যে তারকবাবু ম্যাগাজিন সেকশনে ওরকম লিখলেন তা বোঝা যায় না।

জগদীশচন্দ্রের আরো অনেকগুলি পরীক্ষার বাসনা ছিল, ব্যাঙের প্রাণ আবিষ্কার তার অন্যতম। তাঁর মতে গালভানি ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন।

—পরিমল গোস্বামী, কলিকাতা-৫০

আমি এ চিঠি প্রকাশের আগেই গোপালবাবু ও তারকবাবুকে টেলিফোনে শুনিয়ে দিয়েছিলাম। গোপালবাবু একটু ভয় পেলেন, কারণ অনেকেই এচিঠি বিশ্বাস করে তাঁর কাছে ঐ সব যন্ত্র দেখতে আসবেন। আমি বললাম, যদি কেউ দেখতে চান বলে দেবেন ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী তাঁর কাছ থেকে সম্প্রতি যন্ত্রগুলি, জগদীশচন্দ্রের হাতে লেখা নোট সমেত কিনে নিয়ে গেছেন।

দেশের প্রথম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথ একেবারে গোড়াতেই বন্ধ করে দেওয়ার এমন ষড়যন্ত্র পৃথিবীর কোনো শিক্ষিত দেশে নেই। আমি সম্পাদক রূপে একা প্রায় পনেরো বছর ধরে শিক্ষার নামে ধাপ্পাটা দেশবাসীর চোখের সামনে ধরে দেবার চেষ্টা করেছি, এখনো করছি। সম্পূর্ণ একা। কিন্তু প্রতারকদের দুর্গ দুর্ভেদ্য, সে দুর্গে কোথাও ফাটল নেই, কোনো দুর্বল অংশ নেই। এ তো শুধু জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে নয়। ইতস্ততঃতে প্রতিবছর অনেকগুলো করে 'পাঠ্য' বই নিয়ে আলোচনা করে আসছি, সে সব বইতে শত রকম মিথ্যা আজগুবি সব তথ্য বা সংবাদ জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে চালানো হয়। শিক্ষা-বিভাগে এমন কোনো যথার্থ শিক্ষিত কর্তাব্যক্তির পরিচয় অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি, যিনি এসব বইয়ের প্রতারণা ধরতে পারেন। নইলে চলে কি করে?

আজ শিক্ষার যে পরিণতি হয়েছে তার সূচনা শিক্ষার আরম্ভ থেকেই। শিক্ষা হবে কোথায়? গোড়াতেই শিক্ষা নেই। কাজেই পরীক্ষায় নকল অনিবার্য। আমার এ কাজে খুব সমর্থন আছে। পাস করা যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে শিক্ষার কথা বলার মতো ভণ্ডামি আর নেই। সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষার অপব্যবস্থা, এবং শেষে পরীক্ষা ঘরে নকলের জন্য প্রায় হাহাকার। যেন একমাত্র এটাই অন্যায়। যাঁরা এ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা নিষ্পাপ, শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যায় কাকে বলে একেবারে যেন জানেন না। শাস্তি কার প্রাপ্য একদিন তার হিসাব অবশ্যই হবে।

দারোয়ার কপালকুণ্ডলার মন্দির দেখে এলাম

বাণীকুমার দেব

মণিবৌদির বোনের মুখেই খবরটা শুনলাম। বললেন—'অনেক কিছুই ত দেখে বেড়ান—কাঁথি এসে দারোয়ার কপালকুণ্ডলার মন্দিরটা দেখলেন না?' তাই একদিন বৈকাল বেলা কাঁথি থানার পাশ থেকে রিকশায় চেপে মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেদিনটা ছিল সোমবার। ২৮শে মে।

দারোয়া। ছোট্ট একটি গ্রাম। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হতে মাত্র মাইল-খানেক এর দূরত্ব। রিকশায় যাতায়াত মাত্র দুই টাকা। সাইকেল রিকশা। রাস্তাও মন্দ নয়। পীচঢালা কালো পথ। নাম গান্ধী রোড। নূতন তৈরী। দারোয়া হাসপাতাল পর্যন্ত গিয়েছে।

রিকশা কিছুটা চলার পরই দেখতে পেলাম রাস্তার বাঁ পাশে 'ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়' বিরাট বিল্ডিং। এর পরেই প্রায় গ্রাম্য পরিবেশ শুরু। রাস্তার দুপাশে মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট দোকান। কোথায়ও বা কিছু লোক জটলা করছে। কোন ঘরের বারান্দায় বা আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথে দু'একজন গ্রাম্য বধূকে দেখা যাচ্ছে। দুপাশে খেজুর, আম, জামরুল, কাঁঠাল ইত্যাদির গাছ। কিছু ঝোপ-ঝাড়ও নজরে পড়ছে। খেজুর গাছে থোকা থোকা পাকা খেজুর। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে।

সূর্য্য প্রায় গলে গলে ঢলে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশের বুকে। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তাই গাছের ফাঁকে-ফাঁকে পাতায়-পাতায় পড়ন্ত রোদের 'সোনা বরানো ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চারিদিক নিচু দেয়ালে ঘেরা একটা উঁচু জায়গায় চোখ আটকে গেল। আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম, জায়গাটার চারিপাশে মানুষের মাথার অনেক আস্ত খুলি পড়ে রয়েছে। সাদা হয়ে আছে জায়গাটা। একটা সম্পূর্ণ কঙ্কাল দেখে ত আমি শিউরেই উঠলাম। আমার ভাবান্তর দেখে রিকশাওয়ালা ছেলেটি বলল—'এটা খড়্গচণ্ডীর গোরস্থান বাবু।'

—কাদের? হিন্দু, মুসলমান না খ্রীষ্টানদের?

—সবাইর। যাদেরই লোক মারা যায় এখানে নিয়ে আসে। কেউ বা পোড়ায় কেউ বা বালির নিচে পুঁতে যায়। ধূর্ত শিয়ালেরা সন্ধ্যায় বা রাতে তুলে ফেলে, তাছাড়া হাসপাতালের বেওয়ারিস লাশও এখানে আনা হয়।

—মন্দির আর কতদূর?

—অর্দ্ধেক পথ এসে গেছি বাবু।

রিকশা এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে। সামনে দেখা গেল ডান দিকে পি-ডব্লিউ-ডির (রোড) অফিস। ইট, এসবেসটস, ষ্টোন-চিপ, লোহালক্কড় ইতস্ততঃ ছড়ান। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তোর নাম কিরে?'

সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল—'আজাদ'। ইতস্ততঃর কারণ বুঝতে পারলাম যেহেতু আমি হিন্দু ও কালীমন্দির দর্শনার্থী।

ক্রমে দিনের আলো আরও কমে এল। আরও কিছুটা রাস্তা পার হয়ে এলাম। তন্ময় হয়ে গোরস্থানের দৃশ্যটা ভাবছি। হঠাৎ আজাদ বলল—'এই যে বাবু এসে গেছি। ঐ সামনেরটাই মন্দির।' আমি রিকশা হতে নেমে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলাম সোজা বালি-ঢাকা রাস্তা চলে গেছে মন্দিরের দিকে। ওকে অপেক্ষা করতে বলে পা চালিয়ে দিলাম।

প্রথমেই সামনে পড়ল একটি নাদুসনুদুস গোবৎস। আপনমনে ঘাস চিবুচ্ছে। তারপর দেখলাম একটা টিউবওয়েল। চতুর্দিক্ তার বাঁধানো। হাতমুখ ধুয়ে নিলাম ঠাণ্ডা জলে। তার পাশেই দেখলাম একটা বড়

কাঁঠাল-চাঁপার গাছ। অজস্র ফুল। তার অদূরে একটা গন্ধরাজের গাছ। তারপর যুঁই, বেল, লঙ্কাজবা, রক্তজবা, কনকচাঁপা ইত্যাদি নানারকম ফুলের গাছ এখানে সেখানে লাগানো দেখলাম। আর ফুটেও আছে তাতে অজস্র ফুল। গন্ধে ম ম করছে চারিদিক্। অদূরে সীমানার ধারে বেশ বড় বড় কতগুলি আম কাঁঠাল গাছও দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ঝাঁট দেওয়া। তার মাঝেই নজরে পড়ল ছোট্ট চৌচালা একটি টালির ঘর। বেড়া মুলিবাঁশের। এটা নাটমন্দির বোধ হয়। ঘরটির দুদিকেই দরজা। এই দুই দরজার ভেতর দিয়েই মূল মন্দিরের সামনে গেলাম এবং দেখলাম বহু-আকাঙ্ক্ষিতসেই কপালকুণ্ডলার মন্দির। ঠিক মন্দিরের মত তৈরী নয়। আনুমানিক বার ফুট দশ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটা একতলা দালান। সম্মুখে লাল রঙের চওড়া বারান্দা। আরও দেখলাম দরজা বন্ধ। হতাশ হলাম। দরজার কাঠের উপর লেখা দেখলাম, অস্পষ্ট লেখা, বোঝা যায় না। মন্দিরের বাঁ পাশে ছোট আর একটি ঘর। এ ঘরেরও মুলিবাঁশের বেড়া। বেড়ার গায়ে লেখা আছে 'মায়ের রান্নাঘর'। পেছনে ফিরে দেখলাম পূর্বোক্ত নাটমন্দিরের গায়েও লেখা আছে—'এই মন্দির জজসাহেবলাট কর্তৃক পুনর্গঠিত। সন ১১৪০'। প্রায় হুবহু লেখাটি তুলে দিলাম। সব লেখাই কাঁচাহাতের। রঙে লেখা আর এই জজসাহেব হলেন মেদিনীপুরের তদানীন্তন জজ বিমল মুখার্জ্জী মহাশয়।

এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ শুনলাম খুট করে আওয়াজ এবং দেখলাম মন্দিরের দরজা খুলে গেল। অবাক্ হলাম। নিশ্চয়ই মন্দিরের পেছনে আর একটি দরজা আছে। আর সম্মুখে দেখলাম খোলা দরজায় একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে মন্দিরের ভেতর নজর চলে গেল। দেখলাম প্রায় ফুটতিনেক লম্বা কালীমায়ের একটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। চার হস্ত চারদিকে প্রসারিত। মুখ ব্যাদান করে বেরিয়ে আছে লোল জিহ্বা। পদতলে পড়ে আছেন মহাভোলা সৌম্য শিব। সামনের মাটির প্রদীপে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখলাম, মায়ের গায়ের কালো কুচকুচে পাথুরে রূপ। অতীব মসৃণ গাত্র। সুশ্রী মুখমণ্ডল। টানাটানা চোখ। যে শিল্পী এ মূর্ত্তি তৈরী করেছেন তাঁর শিল্পকর্মের তারিফ করতে হয়। আর দেখলাম টাটকা জবা, যুঁই, গন্ধরাজ, বেল ও কাঁঠালিচাঁপার অজস্র ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে মায়ের সারা দেহ ও বেদীমূল। টাটকা তাজা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে মন্দির-প্রাঙ্গণ ভরপুর। এর পর আরও দেখলাম, ভেতরে শ্বেত মর্মরে খোদাইকরা আছে: "স্বর্গীয় বীরনারায়ণ মাইতির স্মরণার্থে তৎপুত্র তারকনাথ মাইতি ও তস্য পত্নী কাত্যায়নী দাসী কর্ত্তৃক এই প্রস্তরময়ী মায়ের মূর্ত্তি কাশীধাম হইতে সংগৃহীত হইল। ১৩২৯ সন।"

এতক্ষণে মেয়েটির দিকে নজর দিলাম আবার। সে একটি ছোট্ট খাতা এগিয়ে দিল। দেখলাম তাতে অনেক দর্শনার্থীর সই আছে। খড়্গপুর, কাঁথি, কলকাতা, নদীয়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ইত্যাদি নানা জায়গার লোকের সই ও তারিখ। আমিও সই দিলাম। মায়ের চরণামৃত ও পূজার ফুল নিলাম। দেবীর পদমূলে ও মেয়েটির হাতে কিছু পয়সা দিলাম। মেয়েটি বললে, 'দশজনের দানেই চলে আসছে এই মন্দির।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'মন্দিরের দরজা কি বন্ধই থাকে?' সে বলল, 'না। তবে বন্ধ থাকলে লোক এলেই আমরা দরজা খুলে দিই। যে কোনদিন সকালে এলেই পূজোও দিতে পারবেন।'

মেয়েটিকে আরও বললাম, 'কপালকুণ্ডলার মন্দির এর নাম। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি কোথায়? এ ত কালীমূর্ত্তি।' সে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না, তবে বলল, 'সব সময় ত কালীমূর্ত্তিই এখানে আছে। তবে সবাই একে কপালকুণ্ডলার মন্দির বলেই জানে।'

—'তোমার বাবা মা কোথায়? বাবার নাম কি?'

'বাবার নাম নারায়ণ পাণ্ডা। তিনিই পুরোহিত। বাইরে গেছেন। পাশে আমাদের ঘর আছে। মা

সেখানে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। মা-ই ত আমাকে আপনার খবর দিলেন।

মন্দিরের পাশ থেকে অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম লালপেড়ে, আটপৌরে শাড়ী পরা এক ভদ্রমহিলাকে। অঙ্গে দীনতার ছাপই যেন স্পষ্ট। তাই আর বিরক্ত করলাম না তাঁকে। মেয়েটির নাম নর্মদা। ফুলগাছের ফাঁকে ফাঁকে সীমানার ধারের আম কাঁঠালের গাছগুলির নীচে দেখলাম অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে দানা বেঁধে যাচ্ছে। রাত্রি আসন্ন। নর্মদার নিকট বিদায় নিয়ে এবং আবার আসব কথা দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ হতে ফিরে চললাম।

রিকশায় উঠার মুখে স্থানীয় কয়েকজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলতে পারেন, ভিতরে শুধু কালীমূর্ত্তি অথচ মন্দিরের নাম কপালকুণ্ডলার মন্দির কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কপালকুণ্ডলার মন্দির ত আর এখানে নয়?

তাঁরা যা বললেন তার সারার্থ এই: কেউ স্পষ্ট করে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছে না। তবে অনেক শিক্ষিত লোক বলাবলি করেন, কালীভক্ত মাইতি পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই কালীমন্দির হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কপালকুণ্ডলার স্মৃতিকেই বহন করবার জন্য নয়ত মাননীয় জজসাহেব বঙ্কিমচন্দ্র ও কপালকুণ্ডলা উভয়কেই এর সাথে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই এই কালীমন্দিরের নামও ক্রমে কপালকুণ্ডলার মন্দির হয়ে থাকবে। কাপালিক, কপালকুণ্ডলা এবং কালীকে ত একই পটভূমিকায় রেখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা গ্রন্থ লিখেছিলেন।

এ যুক্তির সারবত্তা অবশ্য কিছুটা আমার মনে ধরল। রিকশায় উঠে বসতেই ঘন্টি দিয়ে রিকশা ছেড়ে দিল আজাদ।

বাড়ী ফিরে আসতে আসতে এ কথাই বার বার মনে হল আমার, সারা বাংলার এখানে সেখানে কত মন্দির, মনসাতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, দেবদেউলই না ছেয়ে আছে যা আমাদের চোখের আড়ালে, যা আমরা অনেকেই জানি না বা দেখছি না কিন্তু যদি জানতাম বা তলিয়ে দেখতাম তাদের ইতিহাস বা কিংবদন্তী তবে হয়ত আমাদের বাঙালীর সভ্যতার, সাহিত্যের ও লোকসংস্কৃতির একটা নতুন দিগন্তের নিশানা পাওয়া যেত।

মন্থরা-হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ছয় ॥

সুদতীর সহিত ভদ্রের সাক্ষাতের কয়েকদিন পরেই প্রবল জনরব শ্রুত হইল যে, কাশীরাজ সুপর্ণ জনৈকা অজ্ঞাতকুলশীলা বিদেশিনী সুন্দরীকে বিবাহ করিতে উদ্গ্রীব হইয়াছেন। তৎপরে যথাসময়ে উক্ত জনরব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল, বিবাহ-উৎসবে বারাণসীর আবালবৃদ্ধবনিতা নিমন্ত্রিত হইল, সহস্র সহস্র দীন-দরিদ্র ব্যক্তি সপ্তাহকাল মনের আনন্দে পানভোজন করিল। অমাত্য ভদ্রও ভিখারীর ছদ্মবেশে সদলে এই উৎসবে যোগ দিলেন, তিনদিন রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত অঙ্গনে শালপত্রের আধারে বিবিধ সুখাদ্য আহার করিলেন এবং দূর হইতে নূতন রাজমহিষী কালিন্দী দেবীর দর্শনলাভ করিয়া জয়ধ্বনি দিলেন। মহিষীর পশ্চাদ্বর্তী একটি হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, শুভ্র কৌষেয় বসন, উত্তরীয় ও উষ্ণীষ-শোভিত স্বর্ণকুণ্ডল-বলয়ধারী উচ্ছিখকে প্রথমে তিনি চিনিতে পারেন নাই। পরদিন বিশ্বেশ্বর-মন্দির-সম্মুখস্থ পথে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তিনি দূরে থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দশাশ্বমেধ নামক সুবিখ্যাত ঘট্টে গঙ্গাতীরে উষ্ণীষ উত্তরীয়াদি উন্মোচন করিয়া স্নানে নামিলে, তাহার ঊর্ধ্বমুখ শিখাটি দৃষ্টিগোচর হইতেই ভদ্রের আর সন্দেহ রহিল না। তিনিও সোপানোর্ধ্বে একটি সুবৃহৎ স্বর্ণশলাকানির্মিত ছত্রের ছায়ায় বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেদিন ভদ্রের অঙ্গের সন্ন্যাসীর বেশ, মস্তকের জটাজুট এবং আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু দেখিয়া পূর্বদিনের ভিখারীর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। উচ্ছিখ স্নানশেষে সোপানে রক্ষিত বস্ত্র পরিধান করিয়া সিক্তবস্ত্রনিষ্পীড়নপূর্বক উপরে উঠিলেই সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উচ্ছিখ প্রণাম করিলেন, ভদ্র বলিলেন, "জয়োঽস্তু। বৎস, তোমার মনে বড় অশান্তি, বিশ্বেশ্বর তোমাকে শান্তি দিন।"

উচ্ছিখ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি কে? আমার অশান্তির সংবাদ আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

স্নানঘট্টে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, উচ্ছিখ জনতার ভিড় এড়াইবার জন্যই তৃতীয় প্রহরে স্নান করিতে আসিয়াছিল। ভদ্র মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "বিশ্বেশ্বরের সেবক আমি, তাঁহার দয়ায় মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বৎস, তোমার করতল একবার দেখিতে পারি? ভয় নাই, অর্থ লাগিবে না। তোমার ললাট দেখিয়া মনে হয় তুমি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি, কিন্তু তোমার চিত্তে সুখ নাই কেন?"

বিনাব্যয়ে করকোষ্ঠী-বিচার করাইবার প্রলোভন উচ্ছিখ ত্যাগ করিতে পারিল না। সেইদিনই তাহার উপর আদেশ হইয়াছিল, বরুণাতীরের আবাসগৃহখানির ক্রেতা সন্ধান করিয়া সেখানি আবলম্বে হস্তান্তরপূর্বক সে

যেন ক্ষুদ্রতর কোনও গৃহে আশ্রয় লয়। কার্যসিদ্ধির পর আর উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণের জন্য অধিক অর্থব্যয় করা মহুয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতেছিল, উঞ্ছবৃত্তিও নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। সে ইদানীং মহুয়ার স্নেহভ্রষ্ট হইবার পর তাহাকে প্রদত্ত বাজারখরচ হইতে কিছু কিছু অর্থ সরাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্য প্রকাশ পাওয়ায় মহুয়ার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানিবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর সহিত সেই বিশাল বংশছত্রের তলদেশে কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিল। জ্যোতিষী কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া টিপিয়া-টুপিয়া ঘুরাইয়া উহা নানারূপে পরীক্ষা করিলেন। তারপর শিরঃকম্পনপূর্বক কহিলেন, "হুঁ"। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিল, "কি দেখিলেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সত্য বলিলে তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না তো?"

উঞ্ছবৃত্তি বলিল, "আর উদ্বেগ বাড়াইবেন না, যাহা বলিবার বলিয়া ফেলুন, আমি ক্রোধ করিব না।"

সন্ন্যাসী তখন আর একবার করতলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার জীবনে শনির দশা কাটিয়াও কাটিতেছে না। উপস্থিত তোমার চন্দ্র দুর্বল হইয়া দ্বাদশে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা।" উঞ্ছবৃত্তি সম্মতিসূচক শিরঃকম্পন করিল। সন্ন্যাসী বলিয়া চলিলেন, "আজীবন দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিয়া তুমি বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে এক নারীর দয়ায় সুখের মুখ দেখিয়াছিলে, কিন্তু সে-নারী তোমার সাহায্যে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া তোমাকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি স্ত্রী-পুত্র-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া জাতি নষ্ট করিয়া তাহার সেবা করিয়াছ, এখন অনুতাপ করিতেছ। সত্য কি না?"

উঞ্ছবৃত্তি চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "সমস্তই সত্য। অদ্ভুত আপনার গণনাশক্তি। আর কি দেখিতেছেন? অতীতের কথা তো বলিলেন, ভবিষ্যৎ?"

সন্ন্যাসী তাহার করতলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, "ভবিষ্যৎ তোমার ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তুমি কোনও বহুসম্মানিত ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছ, কুমারী-পরিচয়ে নিজের পত্নীর সহিত তাহার পুনর্বিবাহ দিয়াছ। তিনি এ-সংবাদ অচিরে জ্ঞাত হইবেন। তোমার মৃত্যুযোগ লক্ষিত হয়, অতি শোচনীয় মৃত্যু।"

উঞ্ছবৃত্তি দুইহস্তে সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ধারণ করিল, বলিল, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন। কি করিলে আমার জীবন রক্ষা হয় বলিয়া দিন।"

সন্ন্যাসী তাহাকে সযত্নে ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার গ্রহশান্তির জন্য উদ্যোগ করিতেছি। তোমার বর্তমান নাম যজ্ঞদত্ত, অবন্তীতে তোমার নাম ছিল চিরঞ্জীব, মথুরায় তোমার নাম ছিল দেবপ্রিয়, ক্ষীরগ্রামে তোমার নাম ছিল উঞ্ছবৃত্তি। কিন্তু উহাও তোমার পিতৃদত্ত নাম নহে। তোমার প্রকৃত নাম ধনঞ্জয়। তোমার পিতার নাম সুলোচন, পিতামহের নাম ইন্দ্রধ্বজ, প্রপিতামহের নাম—"

উঞ্ছবৃত্তি করপুটে বলিল, "আর বলিয়া লাভ নাই, আমার প্রপিতামহের নাম আমি নিজেই জানি না। দেখিতেছি আপনি আমার বিষয়ে আমা অপেক্ষা অধিক সংবাদ রাখেন। অথচ জীবনে আপনার সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। কি আশ্চর্য!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অযোধ্যার সন্নিহিত ক্ষীরগ্রামে তোমার পর্ণকুটির ছিল, সেখানে সম্প্রতি ইষ্টকগৃহ নির্মিত হইয়াছে। তোমার গৃহিণী ঈষৎ কোপনস্বভাবা হইলেও সতীলক্ষ্মী, তিনি প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করেন। এই মুহূর্তে তিনি তোমার প্রিয় বদরীফলের আচার রৌদ্রে শুখাইতে দিয়া তোমার উদ্দেশে অশ্রুমোচন করিতে করিতে একটি দুইটি মুখে নিক্ষেপ করিতেছেন।"

উঞ্ছবৃত্তি বলিল, "আমার গৃহিণী রন্ধনে সুদক্ষা, তেমন মধুর আচার করিতেও আর কাহাকেও দেখিলাম না। আম্র বলুন, তিন্তিড়ী বলুন, আর নিম্বু বলুন—"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অথচ সেই ধর্মপত্নীকে প্রতারণা

করিয়া তুমি একটা বৃদ্ধা কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছ। যদি নিজের কল্যাণ চাও তবে অবিলম্বে তাঁহাকে বারাণসীতে আনাইয়া লও, তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করো। ডাকিনীর সংশ্রব সাধ্যমতো বর্জন করো। একদিকে সতীর শুভকামনা অন্য দিকে আমার গ্রহশান্তির চেষ্টা মিলিত হইলে এ-যাত্রা তুমি রক্ষা পাইতে পারো।"

সেই সময়ে ঘাটে জনসমাগম আরম্ভ হওয়ায় সন্ন্যাসী বিদায় লইলেন। উঞ্ছিথ তাঁহাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিতে গেলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন; বলিলেন, "তোমার অর্থ লইলে আমাকে সেইসঙ্গে তোমার পাপের ভাগ লইতে হইবে, অবন্তীর উৎপলার,—প্রতিষ্ঠানের চন্দনার অভিশাপ আমাকে অনুসরণ করিবে। আমি নিজের পাপের ভারে অস্থির, আর ভার বাড়াইতে চাহি না। দৈবক্রমে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তুমি বিপন্ন, আমার দ্বারা যদি কিছু সাহায্য হয় আমি তাহা বিনা বেতনেই করিব। তুমি আমাকে তোমার নিঃস্বার্থ শুভার্থী বলিয়া জানিয়ো।"

উঞ্ছিথ পদধূলি লইয়া বলিল, "প্রভুর সাক্ষাৎ কোথায় কখন পাইব? আপনি আমাকে এই দুর্দিনে পরিত্যাগ করিবেন না তো?"

সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "বৎস, দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি তোমার পত্নীকে আনাইয়া লইতে পারো, তবে এই স্থানেই এক পক্ষকাল পরে এই সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমাকে গ্রহবৈগুণ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা ততদিনে সফল হইতে পারে। তুমি শীঘ্রই রাজসভায় স্থান পাইবে—যোগবলে জানিতেছি, রাজা পরামর্শ চাহিলে সর্বদা যাহাতে তাঁহার কল্যাণ হয় সেইরূপ পরামর্শই দিয়ো। উপস্থিত কিন্তু সেই ডাকিনীর সহিত প্রকাশ্যে বিরোধ করিয়ো না। সে অচিরে আর একবার তোমার সাহায্য চাহিবে, তুমি শেষবারের মতো তাহাকে সাহায্য করিয়া তাহার বিশ্বাস অর্জন করিয়ো। অতঃপর আমার সাহায্যে তুমি তাহার মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিবে। নচেৎ সে যেরূপ উচ্চাভিলাষিণী এবং দুঃসাহসী তাহাতে রাজাকে ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত করিয়া সে-ই কাশীরাজ্য শাসন করিবে; তখন শুধু তোমার সর্বনাশ নয়, রাজ্যের সর্বনাশ হইবে। প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিবে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন, "সাবধান, আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে সে-কথা পাপীয়সী যেন জানিতে না পারে।"

সন্ন্যাসী বিদায় লইলে উঞ্ছিথ গঙ্গাতীরে পাষাণ-চত্বরে চিন্তাযুক্ত হইয়া পাদচারণা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাজপ্রাসাদের জনৈকা দাসী স্বর্ণকলস-কক্ষে তাহার পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়া গেল, অন্যের অলক্ষ্যে উঞ্ছিথের দিকে অপাঙ্গে ইঙ্গিত করিয়া সে তাহার হস্তে একটি স্বর্ণকবচ প্রবেশ করাইয়া দিয়া গেল। উঞ্ছিথ কিছু বলিল না, দ্রুতপদে আবাসগৃহে ফিরিয়া স্বর্ণকবচ মধ্যস্থ ভূর্জপত্রটি বাহির করিয়া পড়িল। মন্থরা লিখিতেছে, "আগামী পরশ্ব অমাবস্যার রাত্রে বিশ্বনাথ মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর মহারাজ গোপনে নৌকাবিহারে যাইবেন। বরুণাসঙ্গম হইতে যাত্রা করিয়া দশাশ্বমেধের ঘাট পর্যন্ত গিয়া তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। প্রধানা মহিষী কর্ণধারের ভূমিকা লইবেন, আমরা অপর তিনজন মহিষী এবং চারজন সখী ক্ষেপণীচালনা করিব। নৌকা যতদূর সম্ভব তীরের নিকট দিয়া যাইবে, মহারাজ বেণু অথবা বীণা বাজাইবেন। তুমি দুইজন বিশ্বস্ত অনুচরকে মণিকর্ণিকার ঘাটের নিকট আমাদের প্রমোদ-তরণী আক্রমণ করিতে পাঠাইবে। একজন নৌকায় উঠিয়াই মহারাজাকে নিরস্ত্র করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে, আর একজন তরবারি লইয়া তাঁহার গলদেশে আঘাত করিতে যাইবে। তাহারা উভয়েই যেন আমার ক্ষেপণীর আঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে, সে-জন্য তাহাদের উপযুক্তরূপ পুরস্কার দিবে। আমার নিকট পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলে আমার পরিকল্পনা সফল হইবে; তোমারও পদোন্নতির

ব্যবস্থা করিব। সাবধানে আয়োজন করিবে, কেহ যেন জানিতে না পারে।" পত্রের মধ্যে কোনও সম্বোধন বা লেখিকার নাম নাই। সে-জন্য বুঝিতে বাধিল না, উচ্ছ্রথ সেই হস্তলিপি চিনিত। সে মনে মনে মহাপুরুষকে প্রণাম জানাইল, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আবার সফল হইয়াছে। উচ্ছ্রথ নিশ্চিত জানিত, রাজদ্রোহের অপরাধে ধরা পড়িয়া সে যদি শূলে যায় তবে তাহার ভূতপূর্বা পত্নী নিশ্চিন্তা হইবে, তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রুপাতও করিবে না। কাশীরাজ এবং উচ্ছ্রথ দুইজনেই এই ব্যাপারে নিহত হইলেও তাহার ক্ষতি হইবে না, সে হয়তো অতীতকে ধুইয়া মুছিয়া নূতন প্রণয়ের সন্ধানে বাহির হইবে। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী স্বয়ং আদেশ দিয়াছেন বলিয়াই সে দ্বিধা করিল না। প্রতিষ্ঠান হইতে দুইজন ভৃত্যকে সে উদ্যান-বাটিকা প্রহরার জন্য আনিয়াছিল, বাটি বিক্রয়ের কথা হওয়ার পর তাহাদের বেতন মিটাইয়া দেওয়া হইলেও তাহারা কার্যান্তরের সন্ধানে তখন পর্যন্ত বারাণসীতেই ছিল এবং তাহার জন্য নূতন গৃহের সন্ধান করিতেছিল। তাহাদের কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত করিয়া এবং সর্বাঙ্গে কালিমা লেপন করিয়া উচ্ছ্রথ সন্ধ্যার পর মণিকর্ণিকার ঘাটে পাঠাইয়া দিল। কার্যান্তে সন্তরণপূর্বক গঙ্গার অপরপারে পৌঁছিয়া তাহারা যাহাতে অবিলম্বে গোপনে প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যায় সে-জন্য সে তাহাদের প্রত্যেককে তিনমাসের বেতন এবং পাঁচটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা অগ্রিম পুরস্কার দিয়া দিল। অর্থের জন্য কাশীরাজকে হত্যা করিতে তাহাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নারীর নিকট পরাজিত ও প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিতে তাহাদের পৌরুষে বাধিতেছিল, স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করিল না। ইতোমধ্যে ভদ্রের ভিক্ষুকবেশী অনুচরগণ উচ্ছ্রথের নূতন আবাসগৃহ এবং সে যে দুইজন ভৃত্যকে নিযুক্ত করিল তাহাদের নামধাম জানিয়া আসিল। তাহারাই অযোধ্যা হইতে আগত জনৈক বণিক্‌কে ভদ্রের নিকট কয়েকদিন পূর্বে লইয়া আসিয়াছিল, তিনি রাজাধিরাজ কুশের লিখিত অনুমতিপত্র দেখিয়া তাঁহার কথামতো উচ্ছ্রথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উচ্ছ্রথের উদ্যান-বাটিকা ন্যায্য-মূল্যে ক্রয় করিলেন এবং একজন অনুগত পুরোহিতের সাহায্যে কেদারেশ্বর সন্নিহিত পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ তাহার জন্য সামান্য মাসিক ভাটকে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এত সহজে কার্যোদ্ধার হইবে তাহা উচ্ছ্রথ কল্পনাও করে নাই। সেই অযোধ্যাবাসী বণিক্ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার পত্নীর নিকট তাহার পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা এবং তাঁহাকে বারাণসীতে আনাইবার জন্য নৌকা ও শিবিকার ব্যবস্থা করিলেন এবং জানাইলেন, স্বীয় গুরু রামানন্দের নির্দেশেই তিনি এ-সমস্ত করিতেছেন তখন উচ্ছ্রথের ভক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। নূতন বাটিতে যাইবার পরদিন সে উদ্যান-বাটিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কাশীরাজের নিকট উপস্থিত করিল, বলিল, "মহারাজ, ঐ বৃহৎ প্রাসাদ আমার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া উহা বিক্রয় করিয়া দিলাম। উহা কালিন্দীর অর্থে-ই ক্রীত হইয়াছিল, সে এখন আপনার মহিষী, আপনিই উপস্থিত এই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। আমি কেদারেশ্বর অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিব, নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া দেবদর্শন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব, আমাকে বিদায় দিন।"

কাশীরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনার মতো নির্লোভ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আমি অধিক দেখি নাই, আপনি দয়া করিয়া আমার অমাত্যপদ গ্রহণ করিলে আমি অনুগৃহীত হইব। দিনের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ আপনি যদি সভায় উপস্থিত হন এবং কর্তব্য নির্ধারণে আমাকে সহায়তা করেন, তবে সে-জন্য মাসিক একশত স্বর্ণমুদ্রা আমি আপনাকে প্রণামী দিব, আপনার কাশীবাসকালে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় না করিয়া ঐ অর্থ ব্যয় করিলে আমিও আপনার পুণ্যফলভাগী হইব।"

অমাত্যপদে বৃত হইয়া উচ্ছ্রথ নিশ্চিন্ত হইল, তাহার ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা ঘুচিল। লোকে বলে, "ভিক্ষুক, অন্নভোজন করিবি? না, ভোজনের পর আচমন করিব কোথায়?" উচ্ছ্রথের

তখন সেই অবস্থা। কিন্তু সেইদিন প্রাতেই জনৈক ব্রহ্মচারী বটু তাহাকে রামানন্দ স্বামীর একখানি পত্র আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে রাজা কি বলিবেন, তাহার কি উত্তর দিতে হইবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত ছিল। তদনুযায়ী উচ্ছৃংখ বলিল, "মহারাজ, আমি নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে চাই, রাজপ্রসাদ আমার কাম্য নহে। আপনার অমাত্যপদলাভ অনেকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে, আমিও যে করিতেছি না তাহা নহে। তবে রাজসঙ্গ মুক্তিকামীর পক্ষে বন্ধনস্বরূপ। তদ্ভিন্ন আমি ঐ কার্যের যোগ্য নহি। প্রথমতঃ আমি রাজকার্য কিছুই বুঝি না, রাজনীতির কোনও সম্পর্ক রাখি না; দ্বিতীয়তঃ অমাত্যপদ গ্রহণ করিলেই আমি আপনার বেতনভুক্ পাদোপজীবী হইব, কোনও অপ্রিয় সত্য কথা বলিলে আপনার বিরাগভাজন হইব, সে-জন্য আপনার দ্বারা প্রদত্ত এই সম্মান শিরোধার্য করিতে ভয় পাইতেছি।"

কাশীরাজ বলিলেন, "আর্য, আপনি নির্লোভ এবং আমার শুভার্থী জানিয়াই আমি আপনাকে আমার এবং রাজ্যের কল্যাণার্থে সভায় রাখিতে চাই; আপনি আমার চাটুবাদ করিবেন বলিয়া নহে। সেরূপ সভাসদ্ আমার অনেক আছেন, বাড়াইয়া লাভ নাই।"

উচ্ছৃংখ বলিল, "মহারাজ, আমি তবে স্পষ্ট কথা বলি। আমার বন্ধুকন্যা কালিন্দীকে আমি আশৈশব দেখিতেছি; তাহার বহু গুণ আছে। কিন্তু দোষেরও অভাব নাই। সে অত্যন্ত বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়া এবং উচ্চাভিলাষিণী। আপনি যদি তাহার কথায় প্রজাদের করভার বৃদ্ধি করেন অথবা আপনার পূর্বপত্নীদের অনাদর করেন তবে অধর্মে পতিত হইবেন, সে-ক্ষেত্রে আপনার অমাত্যরূপে আমাকেও আপনার বিরোধিতা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে অথবা আমার পক্ষে রুচিকর হইবে না।"

কাশীরাজ ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত হইতেছিলেন। পূর্বরাত্রেই কালিন্দী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার প্রাসাদের পিঙ্গলবর্ণ প্রস্তরে গঠিত কক্ষগুলির অভ্যন্তরভাগ শ্বেতমর্মরে আচ্ছাদিত এবং ভিত্তিসমূহ চিত্রশোভিত করিয়া দিতে হইবে, তাহার বর্তমান গজদন্ত নির্মিত পর্যঙ্কের পরিবর্তে তাহার জন্য মরকত ও পদ্মরাগ মণিভূষিত একখানি স্বর্ণপর্যঙ্ক নির্মাণ করাইয়া দিতে হইবে। সে নাকি শৈশবে একবার কোশলেশ্বরের রাজান্তঃপুরে ঐরূপ বহু বিলাসোপকরণ দেখিয়া আসিয়াছিল, নিজের এবং নৃপতি-স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য সেইসমস্ত সংগ্রহ করা সে বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছিল। কাশীর রাজকোষে তদুপযোগী অর্থের অভাব শুনিয়া সে বলিয়াছিল, "মহারাজের বহু কর্মচারী অতি অলস, অথচ উচ্চ বেতনভোগী। তাহাদের সংখ্যা এবং বেতন কমানো চলে না? রাজ্যে ধনশালী বণিকের অভাব নাই। সাধারণ নাগরিকেরাও যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট, কাহারও গৃহে অর্থাভাব নাই বলিয়া মনে হয়। উহাদের রাজকর কিছু বাড়াইয়া দিলেই রাজকোষে অর্থাভাব থাকিবে না। সর্ষপকে পেষণ না করিলে সে তৈল প্রদান করে না, প্রজাকে চাপ না দিলে রাজার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় না।" কথাগুলি কাশীরাজের ভালো লাগে নাই, ইতঃপূর্বে তাঁহার রাজবংশীয়া অন্য কোনও রাজ্ঞী রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে আসেন নাই। ব্রাহ্মণের কথায় নিজের মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, কালিন্দীরই আত্মীয় ধর্মার্থে তাহার বিরুদ্ধতা করিতে প্রস্তুত জানিয়া বলিলেন, "দ্বিজোত্তম, আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যে-কোনো গুরুতর পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কাজ করিব না, আমার পক্ষে রুচিকর না হইলেও আপনার উপদেশ বিবেচনা করিয়া দেখিব। যাহা হউক, উপস্থিত আপনি যে ষষ্টিসহস্র রৌপ্যমুদ্রা দিলেন ইহা কালিন্দীর স্ত্রীধন, তাহাকেই প্রদত্ত হইবে। সে ইহা হইতে তাহার গৃহসজ্জার জন্য যাহা ইচ্ছা ব্যয় করুক, রাজকার্যে তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া অন্তঃপুরে আসিলে কালিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে

পারে। মাতাপিতৃহীনা বালিকা নিশ্চয় আপনার অদর্শনে দুঃখ পাইতেছে।"

উচ্ছিখ বলিল, "মহারাজ এখন তাহার সহিত ঘন ঘন দেখা না করাই ভালো, তাহাতে তাহার নূতন সংসারে মন বসিতে বিলম্ব হইবে। আমি চাই, সে যখন সৌভাগ্যক্রমে আপনার মতো পতি লাভ করিয়াছে তখন মনেপ্রাণে আপনার সহিত এক হইয়া আপনার এবং রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় যেন নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিতে পারে। আমার মতো সংসার-বিরাগী ব্যক্তির জন্য চিন্তা করিয়া তাহার আর লাভ নাই। আমি আমার এক আত্মীয়াকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া লইব, তিনিও কাশীবাসের জন্য বিশেষ ব্যাকুলা। আপনার দয়ায় অন্নচিন্তা যখন রহিল না তখন আর অন্তঃপুরে যাতায়াত করা আমার উচিত হইবে না। অন্য কোনও রাজ্ঞীর আত্মীয় যখন অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন না তখন কালিন্দীর আত্মীয়েরও ঘন ঘন যাতায়াত দৃষ্টিকটু হইবে, তাহাতে আপনার মর্যদা-হানি হইবে। তবে যদি আপনি দয়া করিয়া আমাদের দাসী সুদতীকে অনুমতিপত্র দিয়া রাখেন, তবে সে প্রয়োজন মতো আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার বন্ধুকন্যার সহিত যোগাযোগ রক্ষায় আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে।"

কাশীরাজ অবিলম্বে সুদতীকে ডাকাইয়া তাহাকে মুদ্রাঙ্কিত অনুমতিপত্র দিলেন। উচ্ছিখ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইল। রাজা তাহার নির্লোভ নিঃস্বার্থ স্বভাব এবং বিবেচনাবুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, উচ্ছিখও স্বামী রামানন্দের দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া কম বিস্মিত হয় নাই, সে মনে মনে তাঁহার চরণোদ্দেশে বারবার প্রণাম জানাইল। কালিন্দীর বিনা সহায়তায় সে অমাত্যপদ লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানও বৃদ্ধি পাইল।

॥ সাত ॥

কাশীরাজ সুপর্ণ কেবল সুপুরুষ ছিলেন না, বহু-গুণান্বিত বিদগ্ধ রসিক পুরুষ ছিলেন। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-বাদনে তাঁহার নিপুণতা ছিল, সঙ্গীতে এবং চিত্ররচনাতেও বিশেষরূপে অধিকার ছিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মতো তাঁহারও কেবল যুদ্ধ-ব্যাপারে অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্রাদির চর্চায় তেমন আগ্রহ বা পারদর্শিতা ছিল না। সে-জন্য বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই, কারণ বহুদিন পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্ব-মেধ যজ্ঞকালে তাঁহার পিতৃদেব যখন কোশলেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করেন তখন হইতেই তাঁহাদিগকে আর রাজ্যরক্ষার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন রাজ্যলাভ করেন তখন রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের সুশাসনে সমগ্র জম্বুদ্বীপে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, প্রজার ও রাজার ঘরে সুখ ও প্রাচুর্যের অবধি নাই। নিকটস্থ অন্য কোনও সামন্ত-নৃপতি প্রত্যন্তদেশে কোনওরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলে অথবা প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কোথাও অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে জানিতে পারিলে তিনি তাঁহার সভাস্থ কোশলেশ্বরের দূতকে সে-কথা জানাইলেই প্রতিকারের ব্যবস্থা হইত, সম্রাটের দূত অথবা সেনাবাহিনী অচিরে তাঁহার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিত। এতদবস্থায় কাশীরাজ সুপর্ণ আশৈশব কলাচর্চা করিয়াই দিনযাপন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে সুন্দরী এবং সুগায়িকা একটি করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরের শোভা এবং নিজের রূপলিপ্সা ও গীতশুশ্রূষা চরিতার্থ করিয়াছেন। বয়স চত্বারিংশ অতিক্রম করিলেও তাঁহাকে বিগতযৌবন বলা চলিত না। অষ্টাদশী কালিন্দীর সহিত বয়সের ব্যবধান অবশ্য তাঁহার মনের অগোচর ছিল না, সে-জন্য তাঁহার কুণ্ঠারও অবধি ছিল না। তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য তিনি সাধ্যমতো অর্থব্যয় করিতেন, তাহার সহিত গীত-বাদ্যে মাতিয়া দিবারাত্রির অনেকাংশ অতিবাহিত করিতেন। তাহার বিভিন্ন ভঙ্গীর অনেকগুলি ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন; তাঁহাকে লইয়া বরুণার পরপারে উদ্যান-বিহারও প্রায় তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুপর্ণ নিজে আশৈশব সাধনা করিয়া প্রৌঢ় বয়সে যে চতুঃষষ্টি কলায়

মধ্যে মাত্র চর্যাবিংশটিতে অল্প-বিস্তর দক্ষতালাভ করিয়াছিলেন কালিন্দী যৌবনের প্রারম্ভেই কিরূপে তাহার প্রায় সমস্তগুলিতে নৈপুণ্য লাভ করিল তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। প্রধানা রাজমহিষী অবন্তীরাজকুমারী মহাদেবীর বাক্‌-বৈভব অধিক ছিল, তাঁহার সহিত কাব্য আলোচনা করিয়া বা কথা কহিয়া সুখ ছিল, কালিন্দীর সেরূপ বৈদগ্ধ্য নাই সে-কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিবার তো বেশী প্রয়োজন হয় না; শুধু চাহিয়া থাকিলেই দিন কাটিয়া যায়। মহাদেবী তো তাহার মতো রূপের তরঙ্গ তুলিয়া হাস্যে লাস্যে এমন করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভুলাইয়া দিতে পারিতেন না। মধ্যমা মহিষী সুপ্রিয়া সৌবীর রাজদুহিতা। তাঁহার কণ্ঠস্বর কালিন্দীর চেয়ে মধুর, এক সময় কাশীরাজ দিবারাত্র তাঁহার মুখ-নিঃসৃত সঙ্গীতসুধা পান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতেন; এখন বুঝিতে পারেন, কালিন্দীর মতো উচ্চাঙ্গের তালমানের জ্ঞান তাঁহার ছিল না। তৃতীয়া মহিষী শাশ্বতী দেবী অঙ্গরাজের অনুজা। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা এবং ভক্তিমতী। দেখা হইলেই পুষ্প-চন্দন দিয়া স্বামীর চরণবন্দনা করিতেন, তাঁহার পাদোদক পান করিতেন, নিত্যনূতন দেবমন্দিরের নির্মাল্য এবং সাধু-সন্ন্যাসীর আশীর্বাদী পুষ্প লইয়া স্বামীর বক্ষে এবং মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। ব্রতে-উপবাসে অপরূপ রূপযৌবন ক্ষয় করিয়া, স্বামী কাছে আসিলেই বিবাহের দশ বৎসর পরেও সসঙ্কোচে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তিনি যে ক্রমেই স্বামীর অন্তর হইতে সরিয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিতেও পারিতেন না, ইদানীং স্বামীর অবহেলায় ব্যথিতা হইয়া অদৃষ্টকে দোষ দিয়া গোপনে অশ্রুমোচন করিতেন। কাশীরাজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে এখনও ইঁহাদের সকলের কক্ষেই সপ্তাহে দুই-একবার যান, মাঝে মাঝে মন বিশেষ প্রফুল্ল থাকিলে চারজন রাজ্ঞীকে একরথে লইয়াও ভ্রমণে বাহির হন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের আকর্ষণ যে নবীনা রাজ্ঞীর প্রতি তাহা অন্য সকলের বুঝিতে বাকী থাকে না। রাজার দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধে যখন প্রথম আলোচনা শুনা গিয়াছিল তখন মহাদেবী তিনদিন নিজ কক্ষ হইতে বাহির হন নাই, তিনমাস স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তৃতীয় বিবাহের সময় সপত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সাধ্যমতো বাধা দিয়াছিলেন, উভয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি এবং বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুপ্রিয়া তো পিতৃগৃহে চলিয়া যাইতে প্রস্তুতই হইয়াছিলেন। কিন্তু শাশ্বতী যখন স্বামীর ভাগ লইয়া কোনও বিবাদই করিলেন না, তাঁহার ইহকাল সপত্নীদের নিবেদন করিয়া পরকালের উন্নতির জন্য স্বামীসঙ্গ এড়াইয়াই চলিতে লাগিলেন, তখন মহাদেবী ও সুপ্রিয়াও ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কালিন্দীর বিবাহের সময় তিন মহিষী মিলিয়া তাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, ভগ্নী সম্বোধনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, কিন্তু কালিন্দীরূপিণী মদ্বরাকে তাঁহারা ভুলাইতে পারেন নাই। সে প্রথম হইতেই সপত্নীদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল, পতিগৃহে একেশ্বরী হইবার—সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার সংকল্প লইয়াই সে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীকে করতলগত করিবার জন্য সুপরিচিত দুইটি সার্থক আদর্শ—কৈকেয়ী এবং সীতা,—তাহার চক্ষুর সম্মুখে ছিল, সময় বুঝিয়া সে একটির বা অপরটির অনুসরণ করিত। রাজা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরামপ্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকন্যা পত্নীরা যে শারীরিক সুখ তাঁহাকে সর্বদা দিতে পারিতেন না মদ্বরা তাহা সহজেই দিতে পারিত। সে প্রতিদিন স্নানের পূর্ব্বে দাসীর মতোই সুপর্শে আপাদমস্তক তৈলমর্দন ও অঙ্গ-সংবাহন করিয়া দিত, প্রতিরাত্রে তাঁহার পদসেবা করিত, ললাটে করকমল সঞ্চালন করিয়া এবং ব্যজন করিয়া নিদ্রাকর্ষণে সহায়তা করিত, বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া কাছে বসিয়া ভোজন করাইত। এই সমস্ত প্রিয়কার্য সাধনের দ্বারা একদিকে সে যেমন রাজার হৃদয়-মন জয় করিতেছিল, অপরদিকে তেমনি সুযোগ পাইলেই কথাচ্ছলে সপত্নীদিগের সামান্যতম দোষ-ত্রুটিও তাঁহার কর্ণগোচর করাইয়া দিতে দিতে

তাঁহাকে তাহাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতেছিল। সুপর্ণ দাসদাসীর সেবায় অভ্যস্ত হইলেও মনের মধ্যে তাঁহার একটা অভাববোধ রহিয়া গিয়াছিল, তাঁহার রাজ-দুহিতা পত্নীরা সে অভাব পূর্ণ করা তো দূরের কথা, বুঝিতেই পারেন নাই। কালিন্দীর দ্বারা এতদিনে সে অভাব পূর্ণ হওয়ায় রাজার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। কালিন্দীর পরশ্রীকাতরতা এবং তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধি মাঝে মাঝে তাঁহাকে আঘাত করিত। গৌড়-দেশীয় গুড়ুনি এবং শুঁটকি মৎস্য, কেকয়দেশীয় পিণ্ড-খর্জুর ও বিদেহদেশীয় রসাল ফলের রসনাতৃপ্তিকর যত গুণই থাকুক তাহাদের আলোচনায় সুপর্ণ তেমন রস পাইতেন না, অপরদিকে নবীনা রাজ্ঞীর সেই সবই ছিল প্রধান, আলোচ্য বিষয়। অবশ্য জম্বুদ্বীপের কোন্ প্রান্তে কোন্ রত্ন কত মূল্যে পাওয়া যায়, কোন্ অঞ্চলের ক্ষৌমবস্ত্র এবং কার্পাসবস্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ এ-সমস্ত তথ্যও ছিল তাঁহার কণ্ঠস্থ। রাণীর মানসিক দৈন্যের পরিচয় এক-এক সময়ে রাজার বিরক্তি উৎপাদন করিত, তথাপি তিনি রূপমোহে পরক্ষণেই সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার ধর্মবুদ্ধি একেবারে লুপ্ত হয় নাই, সেজন্য কর্মচারী-দিগের বেতন হ্রাস এবং প্রজাদের করবৃদ্ধি করিবার পূর্বে তিনি চিন্তা করিবার জন্য সময় চাহিয়াছিলেন, উচ্ছ্বসিত বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ঐ সমস্ত চিন্তা তিনি আপাততঃ মন হইতে বিসর্জন দিলেন।

সেদিন চৈত্রের অমাবস্যা, সুপর্ণের জন্মতিথি। ঊষাকালে কাশীরাজ সপরিবারে গঙ্গাস্নান এবং সপরিবারে শোভাযাত্রা করিয়া বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রণাম নিবেদন পূর্বক বাতায়ন হইতে প্রজাসাধারণকে দর্শন দিলেন। রাজপ্রাসাদে সারাদিন গীতবাদ্য এবং পানাহার উৎসব চলিল, সহস্র সাধুসন্ন্যাসী এবং দরিদ্র ব্যক্তি আহারান্তে কম্বল, বস্ত্র এবং রৌপ্যমুদ্রা লইয়া রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া গেল। কাশীরাজ দিবসের তিনপ্রহর অন্য তিন রাজ্ঞীর কক্ষে কাটাইয়া সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্বে কালিন্দীর কক্ষে আসিতেছিলেন, পথে মহাদেবীর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রতিবৎসর জন্মদিনে আমাদের লইয়া নৌকাবিহারে যান, আজ কি সুবিধা হইবে না?"

কাশীরাজ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "ঠিক বটে, স্মরণ ছিল না। তোমরা তিনজনে সখীদের লইয়া প্রস্তুত হও, আমি নূতন রাজ্ঞীকে লইয়া অবিলম্বে আসিতেছি। বেত্রবতীকে দিয়া সংবাদ পাঠাও, প্রমোদ-তরণী যেন প্রস্তুত থাকে।"

মহুয়ার মনটা ভালো ছিল না। প্রথমতঃ সারাদিন নানা উদ্যোগ আয়োজনে তাহাকেও অংশ লইতে হইয়াছে, সেজন্য শরীরটা ক্লান্ত; দ্বিতীয়তঃ সারাদিন যে অর্থের অপচয় সে দেখিয়াছে তাহা সহ্য করা কঠিন, সেই অর্থে তাহার জন্য দর্পণালয় বা মর্মরগৃহ নির্মাণ করিলে তাহার মতে সদ্ব্যয় হইত, কিন্তু রাজা মুখে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত

নিজের মতেই চলিতেছেন; তৃতীয়তঃ প্রধানামহিষী মহাদেবীর পুত্র ঋতুপর্ণ প্রায় তাহারই সমবয়স্ক অর্থাৎ অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক তরুণ; তাহাকে দেখিলে মহুয়ার মনটা আজকাল চঞ্চল হয়, সে কিন্তু ফিরিয়াও চাহে না, বিমাতার পদ্মপলাশলোচনের ভ্রূবিলাস উপেক্ষা করিয়া রাজ্যের পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে তাহাকে উৎসব উপলক্ষ্যে, রাজার সহিত রাত্রে নিজ গৃহে নৈশভোজনের জন্ত নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিল, সে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, অন্ত তাহার নিজ মাতৃগৃহে না যাইলেই নহে। চতুর্থতঃ উঞ্ছবৃত্তিকে সে যে-ভার দিয়াছে তাহার কতদূর কি হইল এখনও বুঝা যাইতেছে না। যদি আততায়ীরা রাজাকে হত্যা করে তাহা হইলেও বিপদ, যদি তাহারা আক্রমণ করিবার পূর্বে বা পরে ধৃত হইয়া প্রাণভয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয় তাহা হইলে তো মহুয়ার জীবন বিপন্ন হইবে। নৌকাবিহারের কথা রাজার স্মরণ না থাকিলেও মহুয়ার স্মরণ ছিল, সে সপত্নী শাম্ভবীর মুখে সপ্তাহকাল পূর্বে ঐ প্রথার কথা শুনিয়াছিল এবং তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল। কাশীরাজ যখন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, আজ সন্ধ্যায় তোমাদের সকলকে লইয়া আমার নৌকাবিহারে যাইবার কথা। প্রতিবৎসর এইদিনে আমি রাজ্ঞীদের সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে এই ভাবে গঙ্গাবক্ষে আনন্দ করি, তুমি যদি অনুমতি দাও এবং সঙ্গিনী হও তবে সুখী হইব।"

মহুয়া হাসিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার সুখেই আমার সুখ। কিরূপ ছদ্মবেশ করিব বলুন, এখনই প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। অন্ধকারে এবং ছদ্মবেশে আজ কিছুক্ষণ অন্তঃপুরিকারা স্বাধীনতা উপভোগ করিবেন আশা করি। আমি স্বহস্তে ক্ষেপণী চালনা করিতে পারিব তো? আমি রক্তবসনা গোপালিকা সাজিব, অলঙ্কার খুলিয়া পুষ্পাভরণ পরিব। আপনি গোপালক সাজিলে কেমন হয় মহারাজ?"

রাজা সহাস্যে রাজ্ঞীর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, মহুয়া নিজে গোয়ালিনী সাজিয়া রাজাকে স্বহস্তে গোপালকের বেশে সাজাইয়া দিল, কণ্ঠে কৃষ্ণসূত্রে রৌপ্যপদক এবং বাহুতে রক্তসূত্রে রৌপ্যকবচ বাঁধিয়া দিল, তাহার পর হস্তে পাঁচনীর সহিত একটি বংশী তুলিয়া দিল। বলিল, "আজ প্রাণ ভরিয়া আপনার বেণুবাদন শুনিব। প্রাসাদকক্ষে আপনার বংশীর মহিমা সম্যক্ প্রকাশিত হয় না, উদার গঙ্গাবক্ষে আজ তাহার অবাধ মুক্তরূপের পরিচয় পাইব। আজ সমস্ত বারাণসীর পুরনারী কুলত্যাগিনী না হয়, সমস্ত পুরবাসী নদীতে ঝাঁপ দিয়া না পড়ে। এইরূপ কোনও দুর্দৈব ঘটিলে মহারাজ যেন আমাকে দায়ী করিবেন না।"

মহুয়ার চাটুবাদে রাজা কেবল মৃদু হাসিলেন।

ক্রমশঃ

ছেলেদের পাততাড়ি

সিন্দুকের রহস্য

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগে কাবুলের কোন এক জায়গায় মেহেরুন্নিসা নামে এক সুন্দরী থাকতেন। তাঁর সৌন্দর্য্যের তারিফ বহুলোকে করত ও অনেকে তাঁকে বিয়ে করতেও চাইত। কিন্তু মেয়ের বাপের কারুকে পছন্দ হলো না। শেষে এক বুড়ো ধনী বণিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করল। লোকটা কুঁজো ট্যারা আর খোঁড়া, তার উপর খোনা. কাজেই এই অপরূপ বরকে মেয়ের পছন্দ হলো না। কিন্তু সে বুঝল যে বাপকে রাগিয়ে কোন লাভ হবে না সুতরাং সে ঠিক করল যে সুযোগ পেলেই সে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। মুখে সে বাপকে বল্লো, "বাবা, তুমি তো বর পছন্দ করেছ—এবার আমাকে আমার পছন্দমত কাপড় গয়না কিনে দাও।" তার বাপ এসব কথা শুনে খুব খুশী হয়ে বল্লো "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার পছন্দমত যা চাইবে তাই কিনে এনে দেবো। তুমি কি চাও তা বলো।"

মেহের বল্লো, "আমার একটি সিন্দুক চাই। এটি তিন ভাগে তৈরী হবে। ভিতর থেকে এর বন্ধ করবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি ভাগে একটি সম্পূর্ণ পোশাক থাকবে—প্রথমটিতে হালকা আসমানী রংয়ের রেশমের উপর রূপালি চাঁদ তারা নক্সা করা হবে। দ্বিতীয়টিতে সমুদ্রের জলের মত ঘোর নীল রংয়ের পশমের পোশাক থাকবে—এতে ছোট ছোট সোনালী মাছের নক্সা থাকবে আর তৃতীয়টিতে হালকা হলুদ রংয়ের কিংখাবের পোশাক একটি থাকবে। এটির উপর রংবেরংয়ের নানা রকমের ফুলের নক্সা করা হবে। সিন্দুকের বাইরে দু'দিকে দু'টি কাঠের ডানার মত থাকবে। এ'গুলি ধরে সিন্দুক তোলা হবে এদিক ওদিক আর উপরের ঢাকার মাঝখানে একটি বড় গর্ত করা হবে যাতে হাওয়া চলাচল বন্ধ না হয়।"

মেহেরের বাবা মেয়ের পছন্দমত সিন্দুক তৈরি করালেন। ভিতরে সোনার পাত দেওয়া হলো ও বাইরে লাল, কাল ও সোনালি রংয়ের নানা রকম নক্সা করা হলো। সিন্দুকের তিনটি ভাগে সেই তিনটি সুন্দর পোশাক রাখা হলো ও তারই সঙ্গে গয়নার বাক্স সাজান হলো। তিনটি হাল্কা পশমের উড়ুনি সর্বশেষে রাখা হলো। এবার বিয়ের দিন ঠিক হলেই হয়—বুড়ো বর আহ্লাদে আটখানা, খালি ঘোরাঘুরি করে এদিকে ওদিকে ভাবী বউকে দেখবার আশায়।

মেহেরের মা এক প্রসিদ্ধ যাদুকরের মেয়ে। তিনি মেয়ের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। জিনিসপত্তর

যোগাড় হবার পর তিনি মেয়েকে এক পাশে ডেকে বল্লেন, "তোমায় কিছু বলব। ওই সিন্দুক তো করেছ কিন্তু ওটা চালাবে কি করে ?"

মেহের বল্লো, "তুমি আমাকে কিছু মন্ত্র দাও তাহলে উড়ে পালাব এখান থেকে।"

ওর মা বল্লো, "বেশ—এই মিষ্টিগুলি সঙ্গে রাখো। এর অল্প মুখে দিলেই তুমি উড়ে যেতে পারবে—নামবার সময় এটা মুখ থেকে ফেলে দেবে।"

মেহের মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল।

তার পরদিন সকালে সিন্দুকটি বাগানে বার করে সে তার ভিতরে গিয়ে বসল। তারপর গর্তের ভিতর থেকে মাথাটা বার করে মুখে খানিকটা মিষ্টি দিতেই সিন্দুকটা ডানা মেলে উড়তে সুরু করল। নিচে তাকিয়ে দেখল যে তার বাবা চাকরবাকর নিয়ে চেঁচামেচি করতে করতে দৌড়ে আসছে। তাদের পিছনে সেই বুড়ো বর হোঁচট খেতে খেতে আসছে। মেহেরের সিন্দুক জোরে উড়তে লাগল এবার ও কিছুক্ষণ পর এদের আর কারুকে দেখা গেল না।

আকাশে উড়ে চলেছে মেহের। নানা রকম পাখী এই অচেনা পাখীটিকে দেখে এগিয়ে আসছে। বড় বড় বাজপাখী ঈগল পাখী সব উড়ে এসে মেহেরের চোখ ঠুকরাবার চেষ্টা করল। ডানা দিয়ে এগুলিকে তার মেরে তাড়াতে হলো। বহু শহর পার হয়ে সে এক জঙ্গলের উপর দিয়ে গিয়ে আর এক রাজার দেশে পৌঁছল।

সিন্দুক নিয়ে নামল সে একটি পাহাড়ের উপর। সেই সময় সে দেশের রাজপুত্র এই জায়গায় শিকারে এসেছিলেন। এরকম একটা অদ্ভুত রংবেরংয়ের কাঠের পাখি সেখানে দেখে সে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল সেটা দেখতে। তার ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে মেহের সিন্দুকের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে নিলো ও সেখান থেকে চিৎকার করে বললো, "এখানে মারামারি করবেন না—আমিও আপনার মত মানুষ যদিও সিন্দুকের ভিতর থাকি।"

রাজপুত্র থতমত খেয়ে বললো, "তাহলে তোমাকে আমি রাজবাড়িতে নিয়ে যাই—আমার মা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।" রাজপুত্র সিন্দুকটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে সোজা বাড়ি গেলেন। সেখানে পৌঁছে চিৎকার করে বল্লেন, "মা, আমি তোমার জন্য একটা তাজ্জব চিড়িয়া এনেছি।"

রাণীমা তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখলেন যে একটি অতি সুন্দরী মেয়ের মাথা দেখা যাচ্ছে—বাকিটা কাঠের সিন্দুকে ঢাকা। তিনি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, "এ তো সত্যিই দেখছি আশ্চর্য্য ব্যাপার—মাথাটা মানুষের মত, হাতগুলি কাঠের ডানা কিন্তু কথা বলতে পারে। একে দিয়ে আমি কি করব ?"

মেহের বললো, "রাণীমা, আমি খুব ভাল সেলাই করি আর তা ছাড়া আপনাকে নানা দেশের গল্প শোনাব।"

রাণীর লোভ হলো—তাই তো, ভাল গল্প যদি শোনাতে পারে তাহলে রেখেই নেওয়া যাক ওকে। নিজের ঘরের কোণে তার সিন্দুকটা রাখলেন ও মেহেরের আদর যত্নর কোন ত্রুটি রইল না। গল্পও খুব শুনতে লাগলেন—এরকম করে দিনগুলি কাটতে লাগল। মেহের ভোর রাত্রে উঠে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে স্নান করে একটু হাঁটাহাঁটি করে আবার সিন্দুকের ভিতর গিয়ে বসে। সুন্দর গান গায় মেহের, তাই রাণীমার ঘরে অনেকে এই অদ্ভুত পাখির গান শুনতে আসে।

কয়েক মাস পর সে দেশের সব চেয়ে বড় উৎসবের সময় হলো। সেদিন সকালে সকলে স্নান করে নতুন পোশাক পরে পরস্পরের বাড়ি যাওয়া আসা করে। রাজবাড়ীতে বিরাট জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। মেহেরের খুব ইচ্ছা হলো এই জলসায় যেতে। সে ঠিক করল যে যেমন করে হোক রাজবাড়ীর বাগানে যাবে ও গান বাজনা শুনবে।—উৎসবের প্রথম দিন সকাল থেকে রাজবাড়ীর লোকেরা ব্যস্ত। সকলে স্নান করে নতুন কাপড় গয়না পরে বাইরে যাচ্ছে। রাণীমা অনেক

গয়নাগাটি পরে মেহেরকে এসে বল্লেন, "আমার ফিরতে দেরি হবে, তোমার খাবার দিয়ে যাচ্ছি, তুমি আরাম করো।" রাজপুত্রকে নিয়ে রাণীমা জলসায় চলে গেলেন। দেখতে দেখতে সকলেই চলে গেল, কেবল মেহের বেচারি পড়ে রইল।

ঘর খালি হতেই সে আস্তে আস্তে সিন্দুক খুলে বেরিয়ে এলো। স্নান করে তার হালকা আশমানী রংয়ের পোশাকটি পরে কিছু গয়না পরে সে নাচতে নাচতে জলসা যে বাগানে হচ্ছিল সে দিকে চল্লো। তাকে যে দেখে সেই হাঁ করে তাকায়। সভায় পৌঁছবার সময় উড়্‌নিটি ভাল করে জড়িয়ে সে মেয়েদের পর্দার পিছনে বসবার জায়গায় গিয়ে বসল। তাকে দূরের থেকে আসতে দেখে রাণীমা ভাবতে লাগলেন, "বা কি সুন্দর মেয়েটি, না জানি কোন্ দেশের রাজকন্যা। মুখ চেনা চেনা।"

কিছুক্ষণ পর রাণীমা উঠতেই মেহের তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালাল। বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে সে আবার সিন্দুকের ভিতর গিয়ে বসল। রাত্তির বেলা রাণীমা আপশোস করলেন—বললেন, "দেখো তো, জলসার সভায় একটি অপরূপ সুন্দরী এসেছিল। তার পোশাক যেমন সুন্দর, সব কিছুই তার অপূর্ব। আমি ওকে বউ করতে চাই কিন্তু ওর খোঁজ খবর কি করে পাব তাই ভাবছি। কালকে চর লাগাব ওর পিছনে, তারা হয়ত কিছু খবর আনতে পারবে।"

দ্বিতীয় দিন আবার রাজ-বাড়ীতে সকলে জলসায় গেল। এবার বরকন্দাজ নিয়ে রাণীমা গেছেন যাতে সেই অজানা সুন্দরী পালাতে না পারে। রাজপুত্রও আগ্রহ এই রাজকন্যাকে দেখার জন্য। সকলে চলে যাবার পর মেহের আবার সিন্দুক থেকে বেরল। এবার সে তার সোনালি মাছের নক্সা করা নীল পোশাকটি বার করল। স্নান করে সেটি পরে কিছু গয়না পরে সে তাড়াতাড়ি জলসায় গেল। দরজায় রাজপুত্র নিজে দাঁড়িয়ে আছে। মেহেরকে দেখে দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। মেয়েদের পর্দার আড়ালে তাড়াতাড়ি মেহের চলে গেল। রাণীমা ঘুরে তাকে দেখে হাসলেন ও মনে মনে বললেন, "তোমাকে এবার আর পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে না।"

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠবার চেষ্টা যেই করলেন অমনি মেহের উঠে পর্দার বাইরে চলে গেল। চরগুলি তার পিছনে আসছে দেখে সে এক মুঠো মোহর তাদের সামনে ফেলে দিলো। তারা সেগুলি যেই তুলতে লাগল, সে দৌড়ে গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে সিন্দুকের ভিতর ঢুকে পড়ল। কে বলবে যে সে সেই রাণীমার অজানা তাজ্জব চিড়িয়া?

বেশ কিছুক্ষণ পরে রাণীমা আবার হাহুতাশ করতে করতে এলেন, "হায় হায় ওই বরকন্দাজগুলো রাজকন্যাকে খুঁজেই পেল না। আজকে তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওকে আমি যেমন করে পারি বউ করব। জলসায় এবার রাজপুত্র নিজে ওর খবর নেবে।"

পরের দিন জলসার শেষের দিন। সেইজন্য একটু আগে যাচ্ছে সকলে। মেহের এবার তার কিংখাবের পোশাকটি বের করে পরল। হাতে একটি ছোট পুঁটলিতে কিছু বালি নিল। গায়ে তার হীরের গয়না। তাকে আজ ঠিক বিয়ের কনের মত দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে পর্দা তুলে সে সকলের পিছনে গিয়ে বসল। কি চমৎকার গান গাইছে ওস্তাদেরা। কিন্তু বেশিক্ষণ সে গান শুনতে পেল না কারণ রাণীমা যেই পিছন ফিরে তাকে দেখতে পেলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে এগিয়ে এলেন—মেহের সেই সময় পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেল কিন্তু আজ রাজপুত্র নিজে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। কোন্ দিকে পালাবে ভাবতে না পেরে সে হাতের মুঠোর বালিটুকু রাজপুত্রর চোখে ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র চোখ বন্ধ করে দু'হাত তুলে চোখ মুছতে গেল আর মেহের এই সুযোগে রাজপুত্রর হাতের একটি মুক্তোর আংটি কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। এবার আর কাপড় খোলবার সময় রইল না—সে অমনি সিন্দুকে ঢুকে পড়ল।

অল্পক্ষণের ভিতর রাণীমা ও রাজপুত্র ঘরে এসে

উপস্থিত হলেন। মেহের মাথা সিন্দুকের ভিতর করে বসল, আর গয়নাগুলিও যে খোলা হয়নি। রাণীমা দুঃখ করে বললেন, "এবারেও তাকে ধরা গেল না!"

রাজপুত্র বললো, "ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। দরকার হলে দেশ বিদেশ ঘুরে তাকে বার করতে হবে— আমার আংটি যখন সে নিয়েছে তখন সেও নিশ্চয় আমাকে বিয়ে করতে চায়।"

মেহের হেসে বল্লো, "রাণীমা, রাজপুত্র এদেশ ওদেশ কোথায় যাবেন। এতটুকু সময়ের মধ্যে মেয়েটি নিশ্চয় বহদূরে যেতে পারে না। ও নিশ্চয় এদেশেই থাকে, নয়ত রোজ কোথা থেকে সে সেজেগুজে যাওয়া আসা করছে? অন্য কোন উপায় দেখুন।"

রাণীমা বললেন, "তাই তো—তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু কোন্ উপায়ে ওর সন্ধান পাওয়া যায়?"

মেহের বললো, "রাণীমা, আপনি একটি নতুন রকমের বিয়ের দরবার করুন। রাজ্যে খবর দিয়ে দিন যে যার হাতের রান্না মিষ্টি খেয়ে রাজপুত্রের পছন্দ হবে, তিনি তাকেই বিয়ে করবেন "

রাজ্যে পরদিন ঘোষণা করা হলো যে রাজপুত্রের বিয়ে হবে। পাত্রীদের হাতের তৈরী করা মিষ্টি খাবেন রাজপুত্র। যার মিষ্টিগুলি পছন্দ হবে তাকেই তিনি বিয়ে করবেন।

দেশময় বাড়ীতে বাড়ীতে মিষ্টি গড়ার ধুম পড়ল। মেয়েরা হাত পাকাতে লাগল আর বাড়ীর ছেলেরা অম্বলে ভুগতে লাগল। শেষে দরবারের দিন ঘোষণা হলো। সকাল থেকে বাড়ীতে থালা ভরা মিষ্টি আসছে। সামনের বড় বড় বাগানগুলি ভরে উঠেছে, এবার দালানগুলিও বুঝি ভরে গেল। রাজপুত্র এখানে একটু চাখছে, ওখানে একটু ভেঙে খাচ্ছে, কোনটা যেন তার পছন্দ হয় না। একেবারে শেষে দালানের এক কোণায় দেখল কিছু মিষ্টি একটা ছোট মাটির পাত্রে রাখা আছে। প্রায় সেটা অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে এমন সময় কি যেন একটা চকচক করছে সে দেখতে পেল। নিচু হয়ে দেখে যে তার মুক্তোর আংটি ওই মিষ্টির মাঝে রাখা আছে।

আনন্দে চিৎকার করে রাজপুত্র যেই না মিষ্টি মুখে দিয়েছে অমনি সব শুদ্ধ সে উড়তে শুরু করল। সেই ভাবে তার মায়ের ঘরে গিয়ে পৌঁছে দেখল যে সিন্দুকের পাখিটাও উড়ছে। কাছে গিয়ে রাজপুত্র বললো "এটা কি যাদু হলো? তুমি কি সেই অজানা? আমাকে এবার নামাবার মন্ত্রটা বলো তাহলে।"

মেহের হেসে বললো, "মিষ্টি মুখের থেকে ফেলো, তাহলেই সব ঠিক হবে।"

রাণীমা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে তাদের দু'জনকে উড়তে দেখে বললেন, "তাহলে তুমিই সেই অজানা। একবার সিন্দুক থেকে বেরও তো দেখি।"

এবার রাজপুত্র আর মেহের দু'জনেই নিচে নেমে এলো। তারপর তাদের দু'জনের খুব ঘটা করে বিয়ে হলো। এখনও সেই সিন্দুকটা রাজবাড়ির বাগানে রাখা আছে, তোমরা গিয়ে সেটা দেখতে পার। কিন্তু খবরদার কেউ সেটার ভিতর ঢুকোনা—কখন যে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক থাকবে না, জেনো।

রামমোহন

[তিরোধান : ২৭শে সেপ্টেম্বর]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধানগরের পল্লীতে যেই পথ শুরু,
সাগরপারের ব্রিস্টলে তার অবসান,
প্রাণের বন্যা কেমনে আনিলে যুগগুরু,
মরু-বালুকায় শুনি সিন্ধুর কলতান।

আলসে-বিলাসে কাটাওনি দিন সুখছায়ে,
তরঙ্গ 'পরে ভাসায়েছ তরী ভয়হীন,
শত দুর্যোগে বজ্রনিনাদে বিষবায়ে
অবিচল হৃদি, চিরনির্ভীক, উদাসীন।

সংসার যেথা ছিল খেলাঘর অবোধের,
সেথা নিয়ে এলে বিচারের বাণী যুক্তির,
সতীধর্মের নামে বিধবায় দহনের
প্রথা রোধ করে পথ খুলে দিলে মুক্তির।

স্বজাতির মান রক্ষা করেছ প্রাণপণে,
বিজাতিরে দিয়ে সম মর্যাদা সম্মান,
শুদ্ধ শাস্ত্র শুনাতে চেয়েছ জনে জনে,
দর্শন-সাথে মিলাতে চেয়েছ বিজ্ঞান।

ধর্ম তো নহে জীবন-বিমুখ লোকাচার,
আত্মবিকাশ ধর্মের মূল মন্ত্র,
মানবতা হোক সব সদ্‌গুণ-সমাহার,
বিকারবিহীন শক্তিসাধন তন্ত্র।

অতিচার নয়, নয় প্রমত্ত উল্লাস,
সংযত ধীর ব্রহ্মানুগামী বুদ্ধি,
ভাবালুতা নয়, ভক্তি বা প্রেম-উচ্ছ্বাস,
শান্ত নম্র দৃঢ় চরিত্রশুদ্ধি।

তুমি চেয়েছিলে ভারতের নব জাগরণ,
বিশ্বের সাথে নূতন মিলন-গ্রন্থি,
ঘুচাও ঘুচাও চিত্তের যত আবরণ,
প্রণমি তোমারে হে বীর অগ্রপন্থী।

"আনত চোখের জলে"

মনোরমা সিংহরায়।

আনত চোখের জলে শ্রাবণের আলোর ধারায়
অন্ধকার দিনগুলি মুছে যাবে হৃদয়ের পাতে—
বুঝি ভেবেছিলে মনে। বুকের গোপনে থেকে যায়
কিছু বা আপন, আর ফুল হয়ে ফোটে অকস্মাতে॥
কী নামে ডাকবে তাকে? সুকোমল সুরভি কুসুম
অনামী এমন কিছু যে ফুল গোপনে ফুটতে পারে,
হৃদয় সুবাসে ভরে অথচ যায় না দেখা তাকে,
কুশলী আলাপ তার কারুকার্য জীবনে আঁকায়॥
রৌদ্রঝরা পৃথিবীর রূপময় আশ্চর্য বিস্তার।
অন্ধকার কে রাখবে মনে? সুরে বাজে সেতারেরতার॥

পঞ্চশস্য

চা শিল্পের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত

যুগবাণীতে শ্রীহরিপদ মজুমদার লিখিয়াছেন :—

ভারতীয় চা শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক মেজর রবার্ট ব্রুস ১৮২৩ সালে আসামের জঙ্গলে প্রথম এই চা গাছের সন্ধান পান। পরবর্তী যুগে আসামের বনাঞ্চলে এই গাছের আরও সন্ধান পাওয়া যায়। আসামের জঙ্গলে স্বাভাবিক ভাবেই এই গাছ জন্মাতো—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৩৪ সালে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক চা চাষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির কাজের ফলেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চা চাষের শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। প্রথমে তদানীন্তন সরকারই প্রাথমিক চাষ শুরু করেছিলেন। ১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানী প্রথমে স্থাপিত হয়। ভারতে এই কোম্পানীই প্রথমে চা-এর চাষে হাত লাগান বলা চলে।

তারই এক বছর পর ১৮৪০ সালে দার্জিলিং জেলায় চা-এর চাষ করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে এই চাষ শুরু হয় ১৮৬২ সালে, ডুয়ার্সে শুরু হয় প্রায় তার বারো বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে।

চা এর চাষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলার কৃষিতে এক নবযুগের সূচনা দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাসের শুরু প্রকৃতপক্ষে চা চাষের মাধ্যমেই যে আরম্ভ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। চাষের যন্ত্রপাতির প্রচলন এ ভাবেই এ দেশে আরম্ভ হয়েছিল। তাছাড়া আরও একটা মস্ত উপকার হলো, যে সব অঞ্চলে চাষ-বাস হতো না, প্রচুর পতিত জমি পড়ে ছিল, সে সব জায়গাতে চায়ের চাষ শুরু হওয়ায় জমির সদ্ব্যবহার শুরু হলো। এই চাষ-বাসের কাজে বহুলোকের কর্মসংস্থানও সম্ভব হলো।

ধীরে ধীরে চায়ের প্রচলনও বেড়ে যেতে লাগলো। এ দিকে চায়ের কোম্পানীগুলিও প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। বিদেশী ধনপতিরা চা উৎপাদনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে শুরু করলেন। ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ বণিকশ্রেণী যে সুযোগ সুবিধা মাত্রাতিরিক্ত পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চাষ-বাসের ব্যাপারে জমির ভূমিকাই হচ্ছে প্রধান। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার তার জাতভাইদের আসামে বিনা খাজনায় প্রথম ১৫ বছর জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। ১৫ বছর পর, পরবর্তী ১০ বছর প্রতি একরে খাজনা ধার্য হল মাত্র ৩ আনা। তারপর বহু বছর পর্যন্ত প্রতি একরে খাজনা ছিল বছরে ৬ আনা হিসেবে। ১৯৭৪ সালে (?) এই খাজনার হার বৃদ্ধি করে একর প্রতি ৮ টাকা ধার্য করা হয়। মাদ্রাজে এই হার সাধারণতঃ একরে ছিল মাত্র ১ টাকা।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল নাগাদ ভারতীয় চা শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। শুধু পশ্চিম বাংলাতেই ১৯৪৭ সালে ৩২১টি চা বাগিচা বা টি ষ্টেট ছিল। তখন পশ্চিম বাংলায় মোট ৭৯,০০০ হেক্টর জমিতে চা-এর চাষ হতো। উৎপাদিত চা-এর পরিমাণ ছিল ৭ কোটি কে জি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৩০ সালে পৃথিবীব্যাপী মন্দার ফলে চা এর বাজারও মন্দা থাকে ফলে চা উৎপাদন, রপ্তানী ইত্যাদি সববিষয়েই নিয়ন্ত্রণ

করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চা শিল্পকে মন্দার থেকে রক্ষার জন্য এক আন্তর্জাতিক চা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। চুক্তির সময়কালে নতুন আবাদ করা বন্ধ হয়ে যায় এইং রপ্তানী বাণিজ্যও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৫০-৫৫ সময়কালে এই নিয়ন্ত্রণ অনেকটা শিথিল করায় নতুন আবাদ এবং পুরোণো জমিতে নতুন চাষ করা সম্ভব হয়।

পশ্চিম বাংলায়, ১৯৪৭ সালে যেখানে ৭৯ হাজার হেক্টর জমিতে চা চাষ হতো, বর্তমানে ৮৮ হাজার হেক্টর জমিতে চা চাষ হচ্ছে। উৎপাদন ৭ কোটি কে জি থেকে বেড়ে বর্তমানে ১০ কোটি কে জি হয়েছে অর্থাৎ জমির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ১১ এবং উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৪৩। প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ১৯৪৭ সালে ছিল ৮৮৮ কে জি, ১৯৭১ সালে প্রতি হেক্টরে উৎপন্ন হয়েছে ১১৩৭ কে জি।

চা চাষে এই যে অগ্রগতি তার মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরণের উন্নত ফলনশীল চা চারা রোপন, সার ব্যবহার, এক কথায় কৃষির আধুনিকীকরণ। পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিতে চা শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনেও চা-এর গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মসংস্থানের দিকে বিবেচনা করলে চা শিল্পের স্থান তৃতীয় স্থান দখল করে আছে বলা যায়। বর্তমানে প্রায় ২.৫ লক্ষ মজুর চা শিল্পে নিযুক্ত। এদের উপর নির্ভরশীল পোষ্য ৩.৫ লক্ষের কম হবে না।

এ ছাড়া চা শিল্পের আনুষঙ্গিক কাজ, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, প্লাইউড, নির্মাণকাজ, যানবাহন, ব্যবসায়ী, ছোটবড় দোকানী, পাইকার ইত্যাদি বহু হাজার হাজার লোক অর্থোপার্জন করছে।

পেপার মিলে উৎপাদন '৭৭ সালে শুরু হতে পারে

কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রীতপনলাল বরুয়া ও হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের একজন উর্দ্ধতন অফিসারের মধ্যে সম্প্রতি যে আলোচনা হয়, তাতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পেপার মিলের উৎপাদন ১৯৭৭ সন থেকে শুরু হতে পারে। এর জন্য মোট ব্যয় হবে ৫২ কোটি টাকা এবং বৎসরে আশী হাজার টন গজ মিলটি তৈরি করবে। প্রায় চার হাজার ব্যক্তি এই মিলের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের পরিচালনায়ই পেপার মিল নির্মাণের কাজ হবে। মিলের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন বাঁশ) সংগৃহীত হবে কাছাড় ও উত্তর কাছাড় থেকে।

এই উদ্ধৃতি দুইটি তত্ত্বকৌমুদী হইতে গৃহীত :—

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তাহা তিনি জানিতে পারেন; ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।...পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্রাহ্ম ধর্মসংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য। ভাস্কর, আর্যভট্ট এবং নিউটন ও হার্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং গাল ও বেকন যে কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ, যিশু ও চৈতন্য এবং পার্কার ও লেহন্ট্ পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্বচনীয় রূপে উৎপন্ন হইবে।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

সাময়িকী

পি এল-৪৮০ তহবিলের বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু

আমেরিকান রিপোর্টারে প্রকাশ—

গত সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে বিপুল টাকা জমা রয়েছে তার বিলি-বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত হয়। বিগত কয়েক বছরে ভারতে আমেরিকার খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় সূত্রে এই অর্থ জমা হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত ময়নিহান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারকে "সম্পূর্ণ হৃদ্যতাপূর্ণ এবং পুরাপুরি গঠনমূলক" বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ, এঁরা দু'জন ভারতে বর্তমানে যে উন্নয়নমূলক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়েও আলোচনা করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে প্যারিসে এইড-ইণ্ডিয়া কনসরটিয়ামের বৈঠকে এই বিষয়ের পূর্ব্বাভাস মিলেছে। এছাড়া, দুই নেতা ভারত-মার্কিন বাণিজ্য এবং আর্থনীতিক সম্পর্কের উন্নয়ন বিষয়েও আলোচনা করেছেন বলে প্রকাশ।

এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পি এল-৪৮০ তহবিলের বিলি-বন্দোবস্ত সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে।

এ-বিষয়ে সরকারীভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে ২৩শে জুলাই। ঐদিন ভারতের অর্থমন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যবন এবং রাষ্ট্রদূত ময়নিহানের মধ্যে এক বৈঠক হয়।

এই কর্ম্মসূচীর সূচনা থেকে পি এল-৪৮০ অনুসারে আমদানি করা কৃষিপণ্যের বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থের ৪০ শতাংশ সরাসরি অনুদান হিসাবে ভারত সরকারকে দেওয়া হয়েছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতি বছর পি এল-৪৮০ তহবিল থেকে আনুমানিক ৪০ কোটি টাকা তোলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে পি এল-৪৮০'র টাইটেল টু অনুসারে যে-সব দ্রব্যসম্ভার পাঠিয়েছে তার মাশুল ও বন্দরের আনুসঙ্গিক ব্যয়ও নির্ব্বাহ হয়েছে উপরোক্ত ৪০ কোটি টাকা থেকে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে রাষ্ট্রদূত ময়নিহান তাঁকে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সাহায্য কর্ম্মসূচীর অবসানের কথা জানান। এই কর্মসূচীর কাজ চলেছিল ২১ বছর। এই কর্মসূচী সম্পর্কে মার্কিন দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র পরে বলেন যে "আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ইতিহাসে এত ঘনিষ্ঠ ও ফলপ্রদ সম্পর্কের নজীর খুব কমই পাওয়া যাবে।"

এই কর্মসূচী অনুসারে কৃষি, শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। এই কর্মসূচীর কাজকর্ম যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখন এ'তে ২৬২ জন মার্কিন কর্মচারী ও টেকনিশিয়ান কাজ করেছেন, এবং আরও কয়েক শত মার্কিন উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা ভারতে এসেছেন। গত ৩০শে জুন এই কর্মসূচীর অবসান হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ইউ এস এ আই ডি'তে (যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা) কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র নয় জন আমেরিকান অফিসার। এঁরা শান্তির-জন্য-খাদ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা, ঋণ-সংক্রান্ত নথিপত্র এবং সাধারণ হিসাবনিকাশ সম্পর্কিত কাজ করেছেন।

কারিগরি সাহায্য কর্মসূচীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে দেওয়া হলো:

* কৃষিকর্ম: ২,৪০০ জন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছেন। এ আই ডি আটটি কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। এগুলি স্থাপিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল শস্য, সার এবং কৃষি-কৌশল সম্পর্কিত গবেষণারও সহযোগিতা করেছে এ আই ডি। আর এসব ভারতে 'সবুজ বিপ্লব" ঘটার অবদান যুগিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচকার্য এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১২টি নদী-উপত্যকা প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করেছে, সাহায্য যুগিয়েছে বিশাখাপত্তনম, ট্রম্বে, মাদ্রাজ, গোয়া ও কান্তলা-কলোলে বড় বড় সার কারখানা

স্থাপনে এবং পাঁচটি পল্লী-অঞ্চল বিদ্যুৎ সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র উত্তর প্রদেশের রিহান্দ নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণে এবং সমগ্র ভারতে ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধানের কাজে সাহায্য করেছে।

* শিক্ষা: আমেরিকার সাহায্যে ভারতে উচ্চ-শিক্ষার নতুন যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কানপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি, পাঁচটি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ন'টি এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ইনস্টিটিউট, ১৪টি রিজিওন্যাল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং চারটি রিজিওন্যাল কলেজ অব এডুকেশন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় যে সকল কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে তাতে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩১,০০০ ভারতীয় বিজ্ঞান-শিক্ষক তালিম নিয়েছেন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ে শিক্ষা দান ব্যাবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে এবং লখনউ-এর কাছাকাছি লিটারেসী হাউসে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানে নিরত ৩,০০০ শিক্ষক শিক্ষা পেয়েছেন।

* ব্যবস্থাপনা: প্রায় ১৬০ জন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবস্থাপনা এবং সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনুশীলন করেছেন। ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল এবং বহুসংখ্যক লোক্যাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল স্থাপনে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করেছে।

* স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা: ভারতে ৫০-এর দশকে বছরে প্রায় ৮০০,০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যেত, '৭০-এর দশকের গোড়ায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা প্রায় ছিলই না—পৃথিবীতে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ইতিহাসে এরকম বিপুল সাফল্যের নজীর খুব কমই আছে। যুক্তরাষ্ট্র এই ম্যালেরিয়া উৎসাদন প্রকল্পে সহযোগী হতে পেরে গর্বিত। এতে যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষিত কর্মী জুগিয়েছে আর অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করেছে।

কারিগরী সাহায্য কর্মসূচীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচীতে ৪০০ জন ভারতীয় মেডিকেল-শিক্ষক যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছেন। অল-ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস এবং বরোদা, কটক, হায়দরাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, মহীশূর ও ত্রিবান্দ্রমে অবস্থিত সাতটি মেডিকেল কলেজ মার্কিন সাহায্য পেয়েছে। এছাড়া হায়দরাবাদ, ইন্দোর এবং জয়পুরের নার্সিং কলেজে নার্সিং-শিক্ষক সংস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে এই কর্মসূচীতে।

জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা প্রভৃতি জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়, এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত গবেষণায় আমেরিকান টেকনিশিয়ানরা সাহায্য করেছেন। পুষ্টি এবং শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ওঁরা সহযোগিতা করেছেন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম পরিবার পরিকল্পনার কাজে বিভিন্ন বেসরকারী ফাউণ্ডেশন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকারকে সাহায্য করেছে।

* ট্রেড ইউনিয়ন: ২০০ জনেরও বেশী ভারতীয় শ্রমিক নেতা, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, আবার আমেরিকান বিশেষজ্ঞরাও ভারতে কাজ করেছেন। এছাড়া ইনস্ট্রাক্টারদের জন্য সাতটি সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৩৫৭টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট এবং বহুসংখ্যাক কর্ম প্রশিক্ষণ (অ্যাপ্রেন্টিসশিপ) কর্মসূচী চালু করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিয়েছে।

কারিগরি সাহায্য কর্মসূচীর অবসান, এবং ইউ এস এ আই ডি'র কর্মীসংখ্যা হ্রাসের ফলে নয়া দিল্লীর প্রান্ত এলাকার হাউজ খাসে স্টাফহাউস ও মালপত্র রাখবার যে সমস্ত গুদাম ছিল সেগুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। গুদামগুলি ও সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র গত এপ্রিল মাসে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, আর স্টাফ-হাউস ও অ্যাপার্টমেন্টগুলি তুলে দেওয়া হবে আগামী ১লা অক্টোবর।

দেশ-বিদেশের কথা

খেলার মাঠে গুণ্ডার উপদ্রব

কলিকাতায় খেলার মাঠে মারপিট একটা মহামারীর মতই প্রায় দেখা দিয়া থাকে। ইহার কারণ নানাপ্রকার হয়। যে-সকল খেলার দল প্রতিযোগিতা করে তাহাদের সমর্থক দর্শকবৃন্দের পারস্পরিক কলহ হইতেও কখন কখন দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যায়। মোহনবাগান দল ও ইস্ট-বেঙ্গল দলের মধ্যে খেলা হইলে সর্ব্বদাই দর্শকগণ দুই-ভাগে বিভক্ত হইয়া কলহ করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। ঐভাবে মাহোমেডান স্পোর্টিং দলের সমর্থকগণও কলহে নিযুক্ত হইতে অনেক সময় প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটা বড় কারণ কখন কখন উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইল রেফারীর মীমাংসার সহিত দর্শক-দিগের মতের অমিল হওয়া। ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ দর্শক যদি ভাবেন যে রেফারী ভুল মীমাংসা করিয়াছেন তাহা হইলে অনেক সময়ে গোলমালের শুরু হয়। অনেক দর্শক ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য ইষ্টকখণ্ডাদি সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকেন। গোলমাল অধিক হইলে রেফারীর প্রতি ঐ সকল বস্তু নিক্ষেপ করা আরম্ভ হইয়া যাওয়া আর অসম্ভব থাকে না। কেহ কেহ যদি রেফারীর প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা রেফারীর সমর্থনে ইষ্টক-নিক্ষেপকারীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যান ও ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। কখনও কখনও দর্শকদিগের মধ্যে অধিক উত্তেজিত জনগণ খেলার মাঠে নামিয়া পড়িয়া রেফারী অথবা কোন কোন খেলোয়াড়দিগের উপর আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিয়া বিষয়টার জটিলতা বৃদ্ধি করে। এইরূপ ঘটিলে শান্তিরক্ষার্থে পুলিশবাহিনী মাঠে ঢুকিয়া খেলোয়াড় ও রেফারীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে অগ্রসর হয় ও তাহাদিগের লগুড় সঞ্চালনের ফলে উত্তেজিত জনতা আরই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া ইষ্টক নিক্ষেপ আরও প্রবলভাবে করিতে আরম্ভ করে। এরূপও হইতে পারে যে খেলোয়াড়দলের মধ্যেই মারা-মারি আরম্ভ হইয়া গিয়া তাহা ক্রমশঃ দর্শকদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া যায়। এই প্রকার হইলে অনেক সময় খেলোয়াড় ও রেফারী দর্শকদিগের সহিত কোনও সংঘাত না হইলেও নিজেদের হাতাহাতির ফলেই আহত হইয়া যাইতে পারেন। সম্প্রতি খেলার মাঠে যে একটা প্রবল হাতাহাতি ঘটে তাহাতে অনেক খেলোয়াড়ই মারপিটের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া পুলিশ-পক্ষ মনে করেন। কোন কোন খেলোয়াড়কে এই অভি-যোগের কারণে গ্রেফতার করা হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে। খেলার সময় সকলেই অল্পবিস্তর উত্তেজিত হইয়া থাকেন এবং সেই কারণে যদি খেলোয়াড় বা দর্শকগণ আত্মসংযমের চেষ্টা না করিয়া উদ্দামতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে অগ্রসর হ'ন তাহা হইলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা কেহই দমন করিতে সক্ষম হইবেন না। পুলিশও সহজে লাঠি চালনা শুরু করিলে দাঙ্গা বাড়িয়াই যায়, তাহা কমিবার সম্ভাবনা আর থাকে না। যাঁহারাই খেলার মাঠে যান, কি দর্শক, কি খেলোয়াড় বা শান্তি-রক্ষক গণ, সকলেরই কর্ত্তব্য আত্মদমন চেষ্টা চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য গভীরভাবে আগ্রহান্বিত থাকা। এই মনোভাব সকলের অন্তরে না জন্মাইলে খেলার মাঠে শান্তি কখনও থাকিতে পারে না।

॥ রামমোহন-স্মরণে ॥

কলিকাতা: বিগত ২২ মে, ১৯৭৩, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ২০১ তম জন্মদিবস উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭

ঘটিকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সমাজ-মন্দিরে এক জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস রামমোহন জীবনী সম্পর্কিত নবাবিষ্কৃত তথ্য বিষয়ে এক সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, রামমোহন-দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের যে উৎসব অঙ্গ তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু আলোকমালা, সঙ্গীত, উপাসনা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে রামমোহনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেই আমাদের কর্তব্য ফুরাইল না। এখন পর্যন্ত রামমোহন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁহার বাল্যজীবন, কর্মজীবন, বিদ্যার্থী জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সংবাদ মাত্র জানি। তাঁহার রচনা ও পত্রাবলী এযাবৎ সম্পূর্ণ আবিষ্কার হয় নাই। মানব সভ্যতা যতই অগ্রসর হইতেছে, রামমোহনের চিন্তার গভীরতা, প্রসার এবং তাঁহার দূরদৃষ্টি ও মনীষা সম্পর্কে আমরা ক্রমশই অধিক সচেতন হইতেছি; সাম্প্রতিক কালের পক্ষে তাঁহার বাণী ক্রমশঃ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র স্তরে অধিকতর উপযোগী প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার জীবন ও চিন্তা সম্পর্কে বহু সমসাময়িক উপাদান এ যাবৎ পৃথিবীর নানা দেশে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় নানা ভাষার আধারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইগুলি নিষ্ঠা ও সাধনার সহিত সংগ্রহ করিয়া রামমোহন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিলে স্থায়ী কাজ হইবে ও রামমোহন জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকী পালন সার্থক হইবে। বক্তা রামমোহন সম্পর্কে তিনি যে সকল নূতন দলিল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন ও তাহার কিছু কিছু সভায় প্রদর্শন করেন।

২২ মে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে রামমোহনের দ্বিশতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে ও বিভিন্ন বক্তা তাঁহাকে ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎরূপে অভিহিত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ৮৫ রামমোহন সরণিতে (আমহার্স্ট স্ট্রীট) অবস্থিত রামমোহনের বসতবাটিতে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক জনসমাবেশ হয়। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সমাজ-সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ রূপে রামমোহনকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দিন অপরাহ্নে রামমোহন লাইব্রেরী হলেও রামমোহন জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সাহিত্যতীর্থের উদ্যোগে ঐ দিবস সন্ধ্যায় রামমোহনের মাণিকতলার বাটী বর্তমান ১১৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (আপার সার্কুলার রোড) ভবনে আরও একটি স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছিল। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এখানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে রামমোহনকে বিরাট প্রতিভাশালী আত্মসন্ধানী পুরুষসিংহরূপে চিত্রিত করেন। সর্বশ্রী শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, নলিনী দাস, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, অমিয়কুমার মজুমদার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সমরেন্দ্রনাথ বাগচি, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ও জীবেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সভায় ভাষণ দেন। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় রামমোহন রচিত সংগীত পরিবেশন করেন।*

* "তত্ত্ব কৌমুদী" হইতে উদ্ধৃত।

পুস্তক পরিচয়

Hark ! His Flute !—Poems and Translations—by Dilip Kumar Roy—Rs. 8·00—Hari Krishna Mandir, Poona-16. প্রকাশ-কাল, জানুআরি, ১৯৭০। কে, আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার লিখিত Foreward ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পরিচিতি বা Introdction ; উৎসর্গ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র-সেনকে ; প্রকাশক M J Shahani, Allies Book Stall, Deccan Gymkhana, Poona-4. পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪+৩০।

অতি সুন্দর চিত্র ও প্রচ্ছদপটশোভিত আবরণ মণ্ডিত সুমুদ্রিত বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত এই কাব্যগ্রন্থটি নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী দিলীপকুমার রায়ের আধুনিকতম অর্ঘ্যরূপে রসজ্ঞ বিদগ্ধ পাঠকসমাজে উপস্থাপিত। কবির সৃষ্টিপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের উৎসাহব্যঞ্জক এই দৃষ্টান্তটি যে কোন শিক্ষিত বাঙালির বুক গর্বে দশ হাত ক'রে দেবে, এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায়। ইংরেজি ভাষায় দিলীপকুমারের সহজাত অধিকার সম্ভ্রমে পাঠকের মাথা নত করে।

এই চয়নে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আবাহন বা Invocation কবিতাটি ছাড়া ক্ষিতীশচন্দ্র সেন—কর্তৃক অনূদিত দিলীপকুমারের একটি বিখ্যাত বাংলা গানের ইংরেজি অনুবাদ আছে যার মাধুর্য ও নৈপুণ্য শতমুখে প্রশংসার যোগ্য, আর আছে ৯৫টি মৌলিক ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি কবিতা, শ্রেষ্ঠ-বাঙালি-হিন্দি-গুরুমুখী সংস্কৃত কবিদের অতি উৎকৃষ্ট ৯২টি গীতিকার মনোমোহন ইংরেজি অনুবাদ এবং Free Verse বা মুক্ত ছন্দে লেখা ১২টি বড় ইংরেজি কবিতা। আত্মিক, মানস ও হার্দিক ভোজের এমন পরিপাটী আয়োজন বহু কালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

দিলীপকুমারের গান ও কবিতার আগাগোড়া সকলই মধুময়। তাঁর সম্বন্ধে "তুমি মধু" শীর্ষক গানটি স্মরণীয়। যাঁরা তাঁর মধু গন্ধী মৃদু স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল কাব্যের দিব্য লাবণ্য ভোগ করতে চান, তাঁরা এই সুন্দর রমণীয় সঙ্কলনটি পড়লে মুগ্ধ অভিভূত না হয়ে পারবেন না। ইংরেজি ভাষায় আমার স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতার জন্যে গত ২৪শে জানুয়ারি বইটি আমাকে পড়বার সুযোগ দেওয়া হলেও আমার অবস্থা হয়েছিল তপ্ত ইক্ষু চর্বণের মতো। মধুর রসের লোভে ছাড়তেও পারি না, আবার চর্বণের ক্লেশ ও তাপের জ্বালাও আছে। কিন্তু পাপী-তাপীদের তরাবার জন্যে বিপদ্যে মধুসূদনের অভাব হয় না কোন দিন। তেমন সহায় হয়ে দেখা দিলেন শ্রদ্ধেয় স্নেহশীল শ্রীগৌতম সেন। তাঁর সাহায্যে গ্রন্থটির রসাস্বাদ সম্পূর্ণ হল। এখন চেতনা দিব্য আনন্দ ও প্রশান্তিতে ভরপুর। বাঁশির ডাক যাদের উন্মনা করেছে এ গ্রন্থ তাদের জন্যে। বাইরের লোক যারা তারাও কাব্য-অলঙ্কারের চকমকি দীপ্তি খুঁজলে এ-গ্রন্থে এলে পাবে বৃন্দাবন-আলো-করা চির-জ্যোৎস্না।

সেই জ্যোৎস্নায় হরিচন্দন ও মুচুকুন্দ ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। এমন বই যারা উপেক্ষা করবে, তাদের দুর্ভাগ্য সমালোচকের চক্ষে-বক্ষে শোকের যমুনা প্রবাহিত করবে।

—অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৩তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৮০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রোডিশিয়ার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়

বৃটেনের "নিউ স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে রোডিশিয়ার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় বহুজাতির শিক্ষা-কেন্দ্র বলিয়া সকলে বলিয়া থাকেন কিন্তু বস্তুতঃ ইহা যে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র সেকথা ঠিক বলা চলে না। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু রোডিশিয়ার শ্বেতকায় সাধারণের প্রাদুর্ভাবই প্রকটভাবে লক্ষিত হয়। এই দেশে কৃষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দিগের তুলনায় সংখ্যায় ২১গুণ অধিক কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৭৬ জন ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্ণকায়, আছেন মাত্র ৪১৭ জন। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬০ জন শ্বেতকায় ও ৪০ জন কৃষ্ণকায়, যদিও সংখ্যার অনুপাতে হওয়া উচিত ছিল শতকরা ৫ জন শ্বেতকায় ও ৯৫ জন কৃষ্ণকায়। ছাত্রদিগের মতে এই বিশ্ববিদ্যালয় একান্ত ভাবেই শ্বেতকায়-প্রধান এবং ইহার প্রধান অধ্যক্ষ জগৎবাসীকে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল বুঝাইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা রোডিশিয়ার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় নহে। ইহা রোডিশিয়ার শ্বেতকায়দিগেরই নিজস্ব বলিলেই উচিত কথা বলা হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে রোডিশিয়ার পার্লামেন্টের একজন সভ্য বলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বড়ই নোংরা ও নানা প্রকার দুশ্চরিত্র লোকের এখানে প্রভাব ও প্রতিপত্তি। এখানে এই সকল ব্যক্তি যথেচ্ছা নানা প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া বেড়ায়। এখান হইতে ঐ সকল ইতর ব্যক্তিদিগকে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে এইখানে কোন উচ্চশিক্ষার কার্য্য কখনও সুসংযতভাবে চালিতে পারিবে না। সকল কথাই এখানে বেঁকাইয়া বক্র অর্থ আরোপ করিয়া বলা হয়। ইহাতে বহুলোকই অপমানিত বোধ করেন। অনেকের মতে রোডিশিয়াতে আফ্রিকানদিগের জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। আফ্রিকানদিগের উপর যেরূপ অন্যায় করা হয় তাহাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোনও উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত নহে। কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সংঘে ইহার স্থান থাকা অনুচিত এমন কথাও উত্থাপিত হইয়াছে। আফ্রিকানদিগের মতে রোডিশিয়াকে বহু সম্মানের আসন হইতে অপসৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ আফ্রিকান ছাত্রদিগের সহিত দেখা করেন ও তাহারা তাঁহাকে যে সকল কার্য্য

করিতে বলে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমতঃ তাঁহারা পরিচালনা কার্য্যে আরও আফ্রিকান কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রার্থনা করেন। বর্ত্তমানে পরিচালকগণ প্রায় সকলেই শ্বেতকায়। তৎপরে তাঁহারা আরও অধিক আফ্রিকান শিক্ষক নিযুক্ত করিতে বলেন। আরও বলা হয় যে আফ্রিকানদিগের বেতন এখন অপেক্ষা বৃদ্ধি করা আবশ্যক, অধ্যক্ষ মহাশয় উত্তরে যাহা বলেন তাহাতে অমত জানাইয়া আফ্রিকানগণ বলেন যে, বেতন ঠিক করিবার ব্যবস্থা না করিলে গোলযোগ হইবে। গোলযোগ অতঃপর হয় এবং ১৪ জন ছাত্রের নামে অভিযোগ করা হয়। ফলে আরও আন্দোলন বৃদ্ধি হয় ও ১৫১ জন ছাত্র ধরপাকড়ের মধ্যে জড়িত হইয়া যান। অধ্যক্ষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় পুলিশ—ও পুলিশের কুকুর ব্যবহারে ছাত্র-দমনের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। পুলিশ ঐ ভাবে ছাত্র দমন চালাইয়া ও অভিযোগ ইত্যাদির বিচার ব্যবস্থা করিয়া অধ্যক্ষের নাম আরও খারাপ করিয়া তুলিল। অধ্যক্ষ নিজে সাক্ষী দিয়া অধিক ভাবে অখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। অভিযোগগুলিও অপরূপ। জানলায় কাচ ভাঙ্গা হইয়াছে, একটা কাঠের টেবিলের অংশ চুরমার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটা চায়ের পাত্র বিনা অনুমতিতে নেওয়া হইয়াছে, ইত্যাদি। ঝাড়ন, চায়ের পেয়ালা, জলপাত্র ইত্যাদি নেওয়াও অপরাধ। ছাত্রদিগকে সংযত করিবার ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান বিচার করিলেন ছয়জন ছাত্র বহিস্কৃত হইবেন ও চারজন বছরের শেষ অবধি কেন্দ্রে আসিতে পারিবেন না: চারজনের ৫০ ডলার করিয়া জরিমানা হইল। গোলযোগ ততটা হইত না যদি না প্রধান অধ্যক্ষ পুলিশ ডাকিয়া ও পুলিশের কুকুরের ভয় দেখাইয়া ছাত্রদমন চেষ্টা করিতেন। প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়ের দোষেই সকল গোলযোগ হইয়াছে এবং তাঁহার স্থলে অপর কোন উপযুক্ততর ব্যক্তিকে আনিয়া বসাইলে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়টি কোন ভাবে নামরক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইবে। নতুবা এই "নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়"টি শুধু রোডিশিয়ার শ্বেতকায়-প্রধান অতি সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়াই পরিগণিত হইতে থাকিবে।

জাতীয় কলহ কিন্তু ব্যক্তিগত গুপ্ত আক্রমণ

পূর্ব্বকালে যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত হইত, যে কলহের কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হইত না, তখন দেশে দেশে যুদ্ধ লাগিয়া যাইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের চরম যুক্তিই শেষ অবধি প্রমাণ করিত যে কোন্ দেশের কথা মানিয়া কলহের শেষ হইবে। কিন্তু দেশে দেশে যখন যুদ্ধ হইত তখন সে যুদ্ধ খোলাখুলি ও জাতীয় ভাবেই হইত। গুপ্তভাবে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করিবার চেষ্টা কেহ কখনও করিত না। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে কাইজার ভিলহেল্‌ম্ অথবা লয়েড জর্জ্জকে কেহ গুপ্তঘাতকের সাহায্যে অথবা বোমা ফেলিয়া মারিবার চেষ্টা করে নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধেও কেহ গুপ্তভাবে উইনস্টান চার্চ্চিল অথবা কোনও জার্মান বা ফরাসী নেতাকে হত্যা চেষ্টা করে নাই। হিটলার নিজ দেশের কোন কোন মানুষকে অথবা ইহুদিদিগকে জাতিগত ভাবে হত্যা করাইয়াছিল, কিন্তু তাহার পশ্চাতে হিটলারের যে উন্মত্ত ও ঘৃণ্য আবেগ ছিল তাহাকে ঠিক জাতীয় প্রেরণা বা ইচ্ছার অভিব্যক্তি বলা চলে না।

বর্ত্তমান কালে যে সকল যুদ্ধ চলিয়াছে ও চলিতেছে তাহার রীতি কিন্তু পুরাতন যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিতেছে না। তাহাতে গুপ্তঘাতক নিয়োগ, যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে আক্রমণ, গোপনে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া অজানা মানুষের জীবন নাশ চেষ্টা, যাত্রীবিমান ধ্বংস, অপর নির্লিপ্ত দেশে গিয়া শত্রুদেশীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা প্রকার জঘন্য উপায়ে নরহত্যা করা হইয়া থাকে। ডাক যোগে চিঠির আকারে গুপ্ত বোমা পাঠান হইতেছে ও তাহাতে চিঠি খুলিতে গিয়া অনেকে নিহত আহত হইতেছেন। আয়রল্যাণ্ডের কিছু লোক বৃটেনে ঐরূপ চিঠি পাঠাইয়া লোক মারিবার চেষ্টা চালাইতেছে ও তাহার ফলে ঐ আইরিশ দলের লোকের সহিত বৃটেনের জনসাধারণের শত্রুতা আরও তীব্র ও প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। এই নূতন ধরণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ১৯৭১ খৃঃ অব্দে এবং ইহার ফল হইয়াছে বিষময়। বহুকাল পূর্ব্বে আর একবার আইরিশ-

গণ এই পথে চালিয়াছিল। তখন ইহার ফলে আইরিশদিগেরই ক্ষতি হইয়াছিল অধিক। বৃটেনে যে সকল আয়রল্যাণ্ড আগত ব্যক্তি রোজগার করিয়া দিন গুজরান করিত তাহারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ঐ জাতীয় আক্রমণ আইরিশগণই নিজেদের মঙ্গলের জন্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এখন যা অবস্থা তাহাতে আইরিশ বোমা প্রেরকগণ জগৎবাসীর নিকট নিজেদের হেয় প্রতীয়মান করিতেছেন। তাঁহারা বৃটেনে এখানে ওখানে আগুন লাগান, গাড়ীতে বোমা রাখিয়া গাড়ী উড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি দুষ্কার্য্যও করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে বৃটেনের সৈনিকগণ যদি আয়রল্যাণ্ডে গুলি চালাইয়া আইরিশদিগকে মারিতে পারে তবে তাহারা যেভাবে সম্ভব বৃটেনের মানুষের উপর আক্রমণ চালাইলে তাহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া ধার্য্য হইতে পারে না। যুক্তিটা খুব ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত কি না তাহা নৈয়ায়িকগণ বলিবেন তবে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে সৈন্যদিগের আক্রমণের উত্তরে সৈন্যদিগকেই আক্রমণ করা সুযৌক্তিক, যাহাকে তাহাকে হত্যা করা তাহার যথার্থ প্রত্যুত্তর নহে। কোন কোন বৃটেনবাসী অবশ্য আইরিশদিগের সপক্ষেই মত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "আমাদের আয়রল্যাণ্ডে সৈন্য স্থাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহারা নিজ দেশে যাহা খুশি করিয়া মরুক, আমাদের ওদেশে যাইবারই প্রয়োজন নাই।" কথাটা সত্য হইলেও আইরিশগণ চিঠির ভিতর বিস্ফোরক রাখিয়া অজানা মানুষকে মারিলে তাহা নীতিসঙ্গত কার্য্য প্রমাণ হয় না।

মধ্য এশিয়ায় যে সকল আরব ও ইসরায়লি ঐরূপ প্রায় একইভাবে নরহত্যা চালাইতেছেন এবং সেই কার্য্য ন্যায়যুদ্ধের অঙ্গ বলিয়া প্রমাণ চেষ্টা করিতেছেন তাহাও সকল রণনীতি বিরুদ্ধ অন্যায় কার্য্য বলিয়াই জগতের অধিকাংশ লোক মনে করেন। মিউনিখের হত্যা লীলা কিম্বা অ্যাথেন্সে বিমান কেন্দ্রে গুলি বর্ষণ কোন নীতি অনুসৃত কার্য্য নহে। যাত্রীবিমান ধ্বংস করিয়া বহু নরনারী শিশুর প্রাণনাশও কোনও যুক্তিতর্ক ব্যবহারে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে না। নরহত্যা সকল সময়েই অন্যায়। তবে যুদ্ধ যদি লাগিয়াই যায় তাহা হইলে সে যুদ্ধ সামনাসামনি সমভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধাদিগের মধ্যেই হওয়া সমীচীন। নিরস্ত্র নরনারী শিশুকে অতর্কিতে মারিয়া ফেলা সকল অবস্থাতেই চরম অধর্ম্ম ও দুর্নীতির কার্য্য। অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় করারও সমর্থন সুযুক্তির কথা নহে। নারীহত্যা বা শিশুহত্যা করিলে, আক্রমণকারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পরিবারের নারী ও শিশুদিগকে হত্যা করা মহাপাপ বলিয়াই ধার্য্য হইবে। তাহা অন্যায় নহে কেহ বলিবে না। অন্যায়ের সাফাই গাওয়া কূটতর্কের সাহায্যে চালাইতে পারা যায় কিন্তু তাহা কখনও শেষ অবধি সত্য বলিয়া ধার্য্য হয় না।

চিলির মার্কসিষ্ট রাষ্ট্রপতি নিহত

ডাঃ সালভাডোর আলেন্দ পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি মার্কসিষ্ট হইলেও সাধারণ ভাবে নির্ব্বাচনের পথে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি অনেকবার নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ অবধি ১৯৭০ খৃঃ অব্দে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইতে সক্ষম হ'ন। আমেরিকার এই রাষ্ট্রে অনেককাল হইতেই বামপন্থী দলগুলি এক জোট হইয়া শাসন শক্তি হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়া আসিয়াছেন। ১৯৭০ খৃঃ অব্দে আলেন্দই সেই নির্ব্বাচন সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন যাহাতে কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট ও বামপন্থি উন্নতি শীল দলগুলি একত্র হইয়া একটি জনপ্রিয় মিলিত মহাদল গঠন করিয়া শাসন-শক্তি করায়ত্ত করেন। ডাঃ আলেন্দ ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ভালপারাইজো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। ডাঃ আলেন্দ ১৭ বৎসর বয়সে দুই বৎসর সামরিক শিক্ষা লইয়াছিলেন ও তৎপরে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি ধর্ম্মঘট, রাজপথে লড়াই চালনা প্রভৃতিতে যোগ-

দান করেন ও কারাগারেও গমন করেন। এই সকল ঘটনা ঘটে ১৯৩০ ও তাহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে। তিনি পরে একবার মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার জন্ম চিলির সমরবাহিনীর অনেক ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করে। তিনি ঐ যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া চলেন ও পরে তাঁহার মৃত্যুদেহ প্রাসাদের একটি কক্ষে পাওয়া যায়। বিদ্রোহীদিগের তরফ হইতে বলা হয় যে তিনি আত্ম-হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আরও দুইজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরও মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইঁহারা কি ভাবে মারা গিয়াছেন তাহা অবশ্য নিশ্চয় ভাবে কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ফ্যাসিষ্ট জাতীয় ব্যক্তি। ইহারা কিউবার ডাঃ কাস্ট্রোর শত্রু ও কিউবার সহিত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক। ইহাদিগের পশ্চাতে কে আছে তাহা অনুমানের বিষয়।

কেন নাই, কেন হয় না ?

ভারতবর্ষে জীবন যাপন করিতে হইলে সর্ব্বাধিকবার উপরোক্ত দুইটি প্রশ্ন মানুষের মনে জাগ্রত হয়। উপার্জ্জনের ব্যবস্থা ও উপায় কেন নাই ? চাল, ডাল, তেল, মাছ, কাপড়, বাসস্থান, আরও কত কিছু আবশ্যকীয় বস্তু কেন নাই ? জাতীয় ভাবে উৎপাদন করার পরেও নানা বস্তু কেন নাই ? যদি বা কিছু কিছু বাজারে আসে তাহা হইলেও সে সকল বস্তু ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় না কেন ? বৎসরের পর বৎসর কলিকাতায় রাজপথে জল দাঁড়াইয়া সকল কিছু অচল করিয়া দেয় কিন্তু জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা কেন হয় না ? রাজপথগুলি যত্রতত্র গ্যাস জল টেলিফোন বা বিদ্যুৎ সরবরাহের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নির্দ্দেশে খনন করিয়া ক্ষত বিক্ষত গহ্বরবহুল ভাবে বিরাজমান। তাহার মেরামত হইলেও হয় না ; কারণ যেন তেন প্রকারে ভরাট করা কাজ অল্পকাল গত হইতে না হইতেই আবার পূর্ব্বের অসমতল অবস্থায় ফিরিয়া যায়। যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লইয়া রাস্তাগুলি কাটাকাটি করা হয় সেই গ্যাস বিদ্যুৎ ও টেলিফোনও কিন্তু ঠিকভাবে কেহ পায় না। গ্যাস অর্দ্ধেক দিন থাকে না, বিদ্যুৎও সপ্তাহে কয়েকদিন ঘন্টার পর ঘন্টা বন্ধ করিয়া রাখিয়া সকলের চরম অসুবিধা ও লোকসানের কারণ সৃষ্টি করা হয়। রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশনার, লিফ্‌ট, রেডিও ও বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি অচল হইয়া নিদারুণ লোকসান হইতে থাকে। রাস্তা খনন করিয়া শুধু কর্ম্মকর্ত্তাদিগের অক্ষমতাই ব্যক্ত হয় কাজ কিছুই হয় না। কেন হয় না ? পৃথিবীতে আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই রাস্তা নির্ম্মাণ ও তাহা যথাযথভাবে রাখা হইয়া থাকে। সকল দেশেই যাহা হয় এ দেশে তাহা হয় না কেন ? যদি না হয় তো কাহার দোষে হয় না এবং দোষীদিগকে কি শাস্তি কখন কিভাবে দেওয়া হইয়াছে বা দেওয়ার চেষ্টাও হইয়াছে ? গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা টেলিফোন ব্যবস্থা চালিত রাখাই বা এমন কি কঠিন কার্য্য যে তাহা কিছুতেই ঠিক ভাবে করা যাইতেছে না ? যাহারা কোন কাজই ঠিক ভাবে চালাইয়া জনসাধারণের সুবিধা করিয়া দিতে অক্ষম তাহাদিগকে কার্য্যভার দিয়া সমাজকে কেন বহন করান হয় ? তাহাদিগকে অপসৃত করিয়া সক্ষম ব্যক্তি সংগ্রহ করিবার কি চেষ্টা কখন করা হইয়াছে ? যদি হয় নাই তাহা হইলে কেন করা হয় নাই ? যে সকল অভাব জনসাধারণকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে সে সকল অভাব দূর করা কি অসম্ভব ? নিশ্চয়ই নহে। শুধু অক্ষমদিগকে স্কন্ধে লইয়া চলার অন্যায় আগ্রহের জন্যই এই অবস্থা। নতুবা গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদির অভাব অনায়াসেই দূর করা যাইত।

কয়লা জাতীয় ভাবে উঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সাধারণের কোন সুবিধা হয় নাই। কয়লা পাওয়া সম্বন্ধে, না মূল্য হ্রাস হইয়া। শুনা যায় যে কয়লার মূল্যও বাড়িয়াছে এবং সরবরাহ পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপই হইয়াছে। এরূপ হইলে জাতীয় ভাবে কার্য্য চালাইবার সামাজিক আবশ্যকতা কেমন করিয়া প্রমাণ হয় ? যাঁহারা বাসে গমনাগমন করেন তাঁহারা বলেন

হে বহু বাস থাকা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ বাস প্রায়ই অচল হইয়া যায় বলিয়া যাত্রীদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। পৃথিবীতে বাস চালাইয়া যাত্রীদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া আজকাল সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যদি সেই কার্য্য ঠিক ভাবে করিতে কর্ম্মকর্ত্তারা অক্ষম হ'ন তাহা হইলে সেরূপ হয় কেন? যাহারা বাস চালাইয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে অক্ষম তাহাদের সেই কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে কেন? তাহাদের সরাইয়া অপর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে সে কাজের ভার দেওয়া হয় না কেন? যে সকল যান মন্দগতি ও যেগুলির উপস্থিতির ফলে অপর যানবাহনের চলার গতিবেগ হ্রাস হইয়া যায়, সেগুলি কি কারণে এখনও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে? সেগুলির ক্রম অপসারণ ব্যবস্থা কেন করা হয় না? অপসারণ না হইয়া ক্রমশঃ সেই-গুলির সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

ভারতবর্ষে শুনা যায় আট কোটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন আছে। এই নূতন গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে না বলিয়া মানুষের বসবাস অস্বাস্থ্যকর হইতেছে এবং বহু ব্যক্তি গৃহহীন ভাবেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যে মাল মশলা প্রয়োজন হয় তাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই অনেকে ইচ্ছা ও অর্থ থাকিলেও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। কালো বাজারে সিমেন্ট, ইস্পাত প্রভৃতি ক্রয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনেকেই পারেন না। এই কারণে মাল মশলা যাহাতে ন্যায্য মূল্যে সকলে পাইতে সক্ষম হ'ন সেইরূপ ব্যবস্থা না করিলে গৃহ নির্ম্মাণ কখনও যথাযথ ভাবে চালিত হইবে না। ইহার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কেন হয় না?

আরব-ইহুদি সংঘাতের পুনরভিনয়

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ইসরায়েল ও সিরিয়ার বিমান বাহিনীর মধ্যে একটা প্রবল আকাশযুদ্ধ হয় এবং ইসরায়েল বলেন তাঁহারা ১৩টি সিরিয় বিমান ধ্বংস করিয়াছেন ও তাঁহাদের নিজেদের মাত্র একটি বিমান নষ্ট হইয়াছে। সিরিয় খবর যে এই যুদ্ধে পাঁচটি ইসরায়েল বাহিনীর বিমান ধ্বংস হইয়াছে এবং আটটি সিরিয়া বিমান আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। সিরিয় খবরে বলা হয় যে ৬৪টি ইসরায়েলের বিমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রায় ৮।৯ মাস পরে একটা আরব-ইহুদি বিমান যুদ্ধ হইল। ইহা বৃহত্তর ভাবে যুদ্ধ পুনরারম্ভের পূর্ব্বাভাষ কিনা তাহা কে বলিতে পারে? আরবদিগের যুদ্ধের আগ্রহ কোনও সময়েই নিবৃত্ত হয় নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা যুদ্ধ করিয়া ইসরায়েল রাষ্ট্র বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। ইসরায়েলও জানেন যে এই যুদ্ধ তাঁহাদের জীবনমরণ সমস্যার কথা। যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ ইসরায়েল রাষ্ট্রের শেষ। ইহা জানিয়াই ইসরায়েল যুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্র ও তাহার জনসংখ্যার অনুপাতে ইসরায়েলের সামরিক শক্তি, শিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্ভার পৃথিবীতে অতুলনীয়। এখন অবধি কোন যুদ্ধেই আরবগণ ইহুদি-দিগকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। কিন্তু আরবদিগের জনবল ইসরায়েলের তুলনায় অনেক অধিক। শিক্ষা ও চেষ্টা থাকিলে তাঁহারা কোনও না কোনও সময় সেইরূপ যুদ্ধক্ষমতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন যাহাতে তাঁহারা ইসরায়েলকে কোনঠাসা করিয়া বিপদে ফেলিতে পারিবেন। সেই সময় দূরে থাকিলেও সেই দূরত্ব ক্রমশঃ হ্রাসের দিকেই যাইতেছে।

দুই কংগ্রেস কি এক হইতে পারে?

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত কামরাজের আলোচনার ফলে দুই কংগ্রেস এক হইতে পারিবে কি না সে কথা এখন কার্য্যকর সম্ভাবনার বিষয়; তাহা এখন আর আন্দাজে কথা তুলিয়া কিছু হয় কি না দেখার চেষ্টা মাত্র নহে। এক হইলে উভয় পক্ষেরই লাভ হইবে এবং পৃথক থাকিয়া দুই দলেরই ক্ষতি হইতেছে তাহা এখন বহুলোকেই পরিষ্কার বুঝিতেছেন। একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হয় যে কিছু লোক আছেন যাঁহারা কোন মতেই মিলিত ভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন, তবে সেরূপ চরমপন্থী লোক সকল সময়ে সকল রাষ্ট্রীয় দলে কিছু কিছু থাকিতে দেখা যায়

ইহাতে এইরূপ হইতে পারে যে উভয়দল মিলিতভাবে কার্য্য করিতে পারেন যদিও দুই দলেই কিছু কিছু লোক মিলিত ভাবে কাজ করার বিপক্ষে থাকিয়া যাইবেন। অতঃপর আরও আলোচনা চলিবে এবং তৎপরে বুঝা যাইবে যে কি ভাবে কতদূর মিলিত কার্য্য পরিচালনা সম্ভব হইবে। একথা এখন বুঝা যাইতেছে যে কিছুদূর অবধি মিলিত কার্য্য পরিচালনা হইতে কোন বাধা থাকিবে না, অর্থাৎ মিলন বর্ত্তমানে প্রায় নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। যে সকল বাধা দেখা দিয়াছে তাহা ক্রমশঃ ঘষিয়া মাজিয়া সংযোগের প্রতিবন্ধক হিসাবে উপস্থিত না থাকিতে দিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং সে চেষ্টা ধীরে ধীরে সফলতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। যাহারা মিলন চেষ্টা লইয়া বিশেষ ভাবে ব্যস্ত তাঁহাদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী আছেন। এখন যে সকল আলোচনার বৈঠক হইবে তাহার কেন্দ্র হিসাবে মাদ্রাজ ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতির নাম উত্থাপিত হইয়াছে। এই মিলন চেষ্টার মূলে আছে কিছুদিন পূর্ব্বের নানা প্রদেশে কংগ্রেস (আর) ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করার চেষ্টা। অর্থাৎ কংগ্রেস তাহা হইলে তিন দলে বিভক্ত হইত। মিলিত হইয়া কাজ করিলে প্রথমতঃ এই ভাঙ্গন রোধ করা হইবে এবং কংগ্রেস আর অধিক বামপন্থী হইবার দিকে যাইবে না। সাধারণতন্ত্র ও সমাজবাদের একটা সমন্বয় হইবে যাহাতে উভয় মতাবলম্বীগণই জোরাল হইবেন। একথা সকলেই জানেন যে যদিও রুশিয়া কম্যুনিষ্টদিগের প্রতি স্বভাবতই বিশেষ সহানুভূতি পোষণ করেন ও যদিও কংগ্রেস (আর) সমাজবাদে বিশ্বাসী হইলেও পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত হইবার কোনও লক্ষণ প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি রুশিয়া অদ্যাবধি সকল সময়েই কংগ্রেস (আর)এর নানাভাবেই সবিশেষ সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় রুশিয়ার ধারণা যে ভারতবাসী এখন অবধি কংগ্রেসেরই অনুগত এবং রুশিয়া যদি কোনও কারণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা হইলে ভারতবাসী রুশিয়াকে আর বন্ধুত্বের চক্ষে দেখিবেন না। অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণ পূর্ণ কম্যুনিজমে বিশ্বাসী নহেন যদিও সমাজবাদ তাঁহারা অনেকদূর অবধি স্বীকার করিয়া লইতে অনিচ্ছুক নহেন। অর্থাৎ ভারতের কম্যুনিষ্টগণ যতদূর অবধি সমাজবাদ বা সোসিয়ালিজম সমর্থক থাকিবে কিন্তু পূর্ণ কম্যুনিজম প্রবর্ত্তন চেষ্টা করিবেন না, ততদূর অবধি ভারতবাসী কম্যুনিষ্ট দলকে শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখিবেন না। রুশিয়া এই মনোভাব বুঝিয়া কম্যুনিষ্ট দলকে কংগ্রেসের সহিত যতদূর সম্ভব মিলিত থাকিতে দেখিলেই সন্তোষ অনুভব করেন। কম্যুনিষ্টদল যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহাতে রুশিয়া প্রীত হ'ন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট দল কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমালোচনায় নামিয়াছেন ও কংগ্রেসও সেই কারণে পুরাতন কংগ্রেস দলের সহিত মিলনের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। ইহাতে রুশিয়ার সমর্থন আছে কি না তাহা সম্যকরূপে কেহ বলিতে পারে না। একথা কিন্তু নিশ্চয়ভাবে বলা চলে যে কংগ্রেস দল মিলিত ভাবে কাজ করিলে সেই মিলিত দলের শক্তি বামপন্থীদিগের অপেক্ষা অধিক হইবারই সম্ভাবনা। কারণ দক্ষিণপন্থীদলের অনেক দল এরূপ হইলে কংগ্রেসের সমর্থনই করিবেন বলিয়া মনে হয়—বামের নহে।

মতবৈপরীত্যহেতু মানুষকে পাগলা গারদে বন্ধকরা

একটা কথা বৃটেন ও অন্যান্য দেশে খুবই প্রচলিত হইতেছে যাহাতে রুশিয়ার বিশেষ দুর্নাম হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। রুশিয়ার শাসক গোষ্ঠী নাকি যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সমালোচনা করেন অথবা মতবাদের ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন তাঁহাদিগকে উম্মাদ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাগলাগারদে বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে রুশিয়ায় এইভাবে উম্মাদ আখ্যা দিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রচার। বৃটেনের "গার্ডিয়ান" সাপ্তাহিকে প্রকাশ হইয়াছে যে আগামী মাসে রুশিয়ায় একটি সর্ব্বদেশীয় আলোচনা সভা বসিবে যাহাতে

বিভক্ত ব্যক্তিত্ব অথবা "স্কিৎসোফ্রেনিয়া" নামধেয় মানসিক অসুস্থতা লইয়া অনুশীলন ও তত্ত্বানুসন্ধান করা হইবে। বৃটেনের যে সকল বিশেষজ্ঞ ঐ আলোচনা সভায় যোগদান করিতে যাইবেন তাঁহারা যদি রুশিয়ায় গিয়া রুশিয়ার পাগলা গারদে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ দর্শন প্রার্থনা করেন তাহা হইলে রুশিয়ার শাসকগণ ঐরূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজি হইবেন কি না? ইহাতে একটা কথা উঠিতে পারে এই যে বৃটেনের মনো-বৈজ্ঞানিকদিগের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক অনুসন্ধান চেষ্টা মিলিত ভাবে করার চেষ্টা সমীচীন হইবে কেমন করিয়া? যাহারা একটা মানসিক ব্যাধির বিচার আলোচনা করিতে যাইতেছেন তাঁহারা কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া পাগলাগারদে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে সে কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত হইবে কি? বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় অন্যায়ের কথা জড়িত করা কখনই উচিত হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যে স্তরের মানুষ সে স্তরে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলিয়া অন্য কোনও মতলবসিদ্ধির পন্থা অনুসরণ কখনই ন্যায্য বলিয়া ধার্য্য হইবে না। সুতরাং বৃটেনের বৈজ্ঞানিকগণ যে রুশিয়ায় গমন করিয়া বিভক্ত-ব্যক্তিত্বজাত মানসিক ব্যাধির অনুশীলনসূত্রে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া পাগলা গারদে আবদ্ধ রুশিয়ান মনীষীগণের খোঁজখবর সংগ্রহ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। বৃটেনের বৈজ্ঞানিকগণ কখনই নাম করিয়া ইহার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন না এবং পাগলা গারদে যাইতে চাহিলে তাঁহাদিগকে রুশিয়ান শাসকগণ যেসকল ব্যক্তি সত্য সত্যই পাগল শুধু তাহাদের সহিতই সাক্ষাৎ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

আলজিরিয়ার "শিখর" আলোচনার বৈঠক

আলজিরিয়াতে যেসকল জাতি একত্র হইয়া আন্তর্জাতিক দলবদ্ধতা বিরোধ লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিল ৬৩টি রাষ্ট্র যেগুলি আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং আরও কয়েকটি রাষ্ট্র যেগুলি দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিল। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব্বের ন্যায় সামরিক দলবদ্ধতা আর নাই, কারণ এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীন ও রুশিয়া উভয় শক্তির সহিতই সখ্য স্থাপন চেষ্টা করাতে আমেরিকার কম্যুনিষ্টবিরোধী সামরিক দলের গঠন উদ্দেশ্য আর থাকিতেছে না। রুশিয়া ও চীনের মধ্যে ঝগড়া আছে কিন্তু নিজ নিজ সামরিক দল গঠন করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিবার আয়োজন চেষ্টা নাই। আরব জাতিগুলি মিলিত ভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধতা করিতেছে কিন্তু তাহাদের সমর্থক শুধু অর্থ বা অস্ত্র সাহায্যের জন্যই দুই একটি বৃহৎ রাষ্ট্র আছে, সামরিক সহায়তা সাক্ষাৎ ভাবে কেহ আরবদিগকে অথবা ইসরায়েলকে করিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় সামরিক দলবদ্ধতা অথবা নির্দ্দলীয়তার আর কোনও বিশেষ অর্থ থাকিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় যে ৫০।৬০টি রাষ্ট্র নিজ নিজ রাজা, রাষ্ট্রপতি, শাসকগোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তি বা অপর প্রতিনিধি পাঠাইয়া আলজিরিয়ার শিখর সম্মেলনে যোগদান করেন তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদ বৃহৎ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক কমজোর রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ আলোচনা করিয়াই চলিয়া আসিতে হয়। অপর কোন প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধি আলজিরিয়াতে হয় নাই। আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি শ্রী হুয়ারি বুমেদিয়েন আলোচনা বৈঠক আরম্ভকালে বলেন যে সকল জাতিরই কর্ত্তব্য বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের আদেশ নির্দ্দেশের চাপ সহ্য না করা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে আন্তর্জাতিক সাহায্যদান আজকাল দাতা জাতির হুকুম মানিয়া চলার উপর নির্ভরশীল করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ হুকুম মানিয়া সাহায্য গ্রহণ কখনও উচিত কার্য্য নহে। প্রেসিডেন্ট টিটো বলেন যে অল্পশক্তি রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ যদি বৃহৎ বৃহৎ শক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয় তাহা কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না।

লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি কর্নেল গাদ্দাফি বলেন যে নির্দ্দলীয় জাতিগুলির উচিত হইবে নিজেদের সকল কলহ বিবাদের নিষ্পত্তি কোন যুদ্ধ না করিয়া সাধন চেষ্টা করা। কোন কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কোন কোন বৃহৎ শক্তির নাম করিয়া তাহাদিগের উপর দোষারোপ চেষ্টা করেন। চীন, রুশিয়া ও আমেরিকার এইভাবে তীব্র সমালোচনা হয়।

বৃটেনের পত্রিকায় শ্রীমতী গান্ধীর সমালোচনা

নিউ স্টেটস্ম্যান পত্রিকা বৃটেনের প্রগতিশীল সাপ্তাহিক। ইহাতে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে শ্রীমতী গান্ধীর দৃষ্টিহীনতার কথা উত্থাপন করিয়া। লেখক কে, আর, সুন্দররাজন। প্রবন্ধের আরম্ভে আছে লেখকের দ্বারা রাষ্ট্রপতি গিরির প্রশস্তি; কেননা তিনি এক বক্তৃতায় কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী যে সাতটি পাপের কথা বলিয়াছিলেন সে সকল পাপই পূর্ণ প্রসারিত হইয়া বিগুমান রহিয়াছে। সাতটি পাপ হইল নীতিবর্জ্জিত রাষ্ট্রনীতি, কর্ম্মবর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য, বিবেকবর্জ্জিত সুখভোগ, চরিত্রহীনের বিদ্যাঅর্জ্জন, ন্যায় অন্যায় বোধহীন ব্যবসাবাণিজ্য, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত বিজ্ঞান এবং ত্যাগবর্জ্জিত পূজা। শ্রীগিরি তৎপরে বলেন যে গভর্ণমেণ্টের উচিত যে সকল ব্যক্তি খাদ্যবস্তু বহুল পরিমাণে জমাইয়া রাখিয়া লাভের চেষ্টা করে ও যাহারা অন্যান্য উপায়ে অতিরিক্ত মুনাফা প্রাপ্তি চেষ্টা করে তাহাদিগকে অবিলম্বে কারাগারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা। তাহারা চাষবাসই করুক অথবা রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তিমান্ ব্যক্তিই হউক, সেদিকে, কোনও দৃষ্টি না দিয়া এই কার্য্য করা প্রয়োজন। লেখক অতঃপর কিছু কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া ভারতের অবস্থা চিত্রণ চেষ্টা করিয়াছেন। যথা মহারাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি (কংগ্রেসের দলভুক্ত) ১ লক্ষ মানুষকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। মহীশূরে আর একজন মন্ত্রীস্থানীয় ব্যক্তি অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ও সকল নিয়ন্ত্রণ অবজ্ঞা করিয়া অসংখ্য নিমন্ত্রিতকে ভোজ খাওয়াইয়াছেন। বর্ণনাগুলি অসম্ভব হইলেও লেখকের উদ্দেশ্য যে শ্রীমতী গান্ধীর গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করা তাহা বেশ বুঝা যায়। লেখকের মতে শ্রীমতী গান্ধী সকল কিছু দেখিয়াও দেখেন না অথবা সংস্কার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যতঃ কোন কিছু করিবার ক্ষমতা আর তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু তিনি যদি একবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে আর কোনও বিলম্ব থাকিবে না। লেখক ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে খুবই একটা সহজ সরল রূপ দিয়াছেন কেননা শ্রীমতী গান্ধী অঙ্গুলী সঞ্চালন করিলেই যদি এই বিরাট, শত শাখা-প্রশাখা বহুল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় তাহা হইলে বিষয়টার দুস্তরতা ও দুরপনেয় ভাব আর থাকে কি করিয়া? লেখক আরও মনে করেন যে শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ব্বের পরামর্শদাতাগণ ফিরিয়া আসিলেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও কর্ম্মক্ষমতাও ফিরিয়া আসিবে। আসল কথা যাহা অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থার জটিলতা, তাহা লেখক যথাযথভাবে দেখাইতে সক্ষম হ'ন নাই। আর একটা কথাও বুঝা যাইতেছে না। শ্রীমতী গান্ধী কি কারণে বৃটেনের এক প্রগতিশীল পত্রিকার বিরাগভাজন হইয়াছেন? কারণ শ্রীমতী গান্ধী যে প্রগতিশীল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ কাহারও থাকা উচিত নহে।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে দুদিন
ভারতের বাইরে প্রবাস

গৌরমোহন দাস দে

বাড়ী ফেরার পথে লণ্ডনের টাওয়ার হিল দেখেই প্যারিসের ভিসা না নিয়েই আমরা প্যারিসের অর্লি বিমান বন্দরে (Orly) অবতরণ করি। কপালে যদি দুর্ভোগ থাকে তা মানুষের এড়াবার সাধ্য নেই। প্যারিসের ভিসা নেবার জন্যে আমি বিমান বন্দরের পাসপোর্ট অফিসারের কাছে যেতেই তিনি সরাসরি প্যারিস ছেড়ে পরবর্তী দেশে চলে যেতে আমাদের উপদেশ দিলেন। আমরা সেদিন অনেক কষ্টে ভারতীয় হাইকমিশনারের চেষ্টায় তিন দিনের জন্যে ভিসা পেয়েছিলাম। এই ঘটনাটি আমি প্যারিস ভ্রমণে লিখেছি। এই ভিসার ভয়ে প্যারিসে আমরা অন্যান্য দেশের ভিসার পিছনে বেশ কয়েকঘণ্টা মূল্যবান্ সময় নষ্ট করেছিলাম। রোম ও এথেন্সের ভিসা নেবার পর আমরা স্পেনের কনস্যুলেটের দরজায় সরাসরি ধর্না দেব স্থির করলাম। দেশ ঘুরতে ঘুরতে বারটা আর মনে থাকত না। সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্ট শেষ করে আমরা অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার পর স্পেনের কনস্যুলেটে যাবার জন্যে সাবওয়ের ট্রেন ধরলাম। তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। ট্রেনের মধ্যেই জানতে পারলাম যে আজ শনিবার ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সাল। সমস্ত অফিস একটার সময় বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা ট্রেন থেকে নেমেই হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ষ্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। এই সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া খুব দুঃসাধ্য ছিল। আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অফিসের বড় দরজায় এসে পৌছলাম। দরজায় দ্বারী রয়েছে, যেতেই আমাদের জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দিলে। স্ত্রীকে নীচে বসিয়ে ওপর থেকে দুটি ফরম এনে ভর্তি করে আবার ওপরের কাউন্টারে জমা দিলাম। কাউন্টারের ভদ্রলোকটি ভিসার টাকা চাইলে আমি আমেরিকান ডলার দিতে গেলাম। তিনি ফ্রান্সের মুদ্রা চাইলেন। আমি দিতে না পারায় তিনি বাইরে থেকে ভাঙ্গিয়ে আনতে বললেন। তখন প্রায় একটা বাজে। আজই সন্ধ্যা ৬ টায় আমাদের প্যারিস ত্যাগ করতে হবে। আমাদের প্লেন এফ ৫১৫ অর্লি বিমান বন্দর থেকে ৬টায় ছেড়ে মাদ্রিদে ৯-৪০ মিঃ পৌছাবে।

শনিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ। দ্বারীই আমাদের ডলার ভাঙ্গানোর একটা ছোট্ট দোকান দেখিয়ে দিলে। দোকানটিতে গিয়ে দেখলাম টাকা ভাঙ্গানোর জন্যে বড় লাইন পড়েছে। ঘড়ি দেখি একটা বেজে গেছে। ওখানকার একজন ইংরেজী জানা ভদ্রলোককে আমার অবস্থা বোঝাতে আমাকে প্রথমেই টাকা ভাঙ্গাতে দিলেন। টাকাটি ভাঙ্গিয়েই আমি পড়ি কি মরি করে কনস্যুলেটের দরজায় এসে পৌছলাম। দরজাটি তখন বন্ধ হয়ে গেছে। পাশেই ঘণ্টা রয়েছে সেটা বাজাতেই ভেতর থেকে উত্তর এল যে আজ অফিস বন্ধ হয়ে গেছে সোমবারে খুলবে। আমি বুঝিয়ে বলি যে, আমার স্ত্রী ভেতরে আছেন। আমি টাকা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এসেছি। দ্বারীটি আমার কথা শুনতে পেয়ে দরজা খুলে আমায় ভেতরে নিয়ে আসে। আমরা ভিসা করে বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

আইনতঃ আমরা যে দেশে যাই না কেন সেই দেশের অফিসাররা অস্থায়ী একটি ভিসা দিতে পারেন। কিন্তু

এই অস্থায়ী ভিসা মস্কো ও ফ্রান্সে আমরা পাই নি। লণ্ডনে টাকা দেখালে সহজেই ভিসা পাওয়া যায়। এরা একেবার ছ'মাসের ভিসা আমাদের দিয়েছিল।

আমাদের হাতে এখন আর সময় নেই। কারণ এখনও আমাদের আর একটি দ্রষ্টব্য স্থান Hotel de Invalide দেখা হয় নি। এখানে একটি মিউজিয়াম আর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সমাধি রয়েছে। কর্সিকা থেকে তাঁর মৃতদেহটি এনে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আমরা এখানে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এ বাড়ীটিতে লিফট্ নেই। আমাদের পায়ে হেঁটে চারতলা সিঁড়ি ভেঙ্গে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিস দেখতে হ'ল। আমরা দুজনেই পরিশ্রমে এত ক্লান্ত যে আমরা আর আমাদের পা দুটো টেনে নিয়ে যেতে পারছিলাম না। আমার স্ত্রী ট্যাক্সি ডাকতে বললেন। এখান থেকে একটি বড় মাঠ পার হলেই সিটি এয়ার অফিস। কোন ট্যাক্সিকে মাথা খুঁড়ে ডাকলেও তারা আসবে না। কারণ তারা মনে করে যে তাদের সঙ্গে আমরা বড়মানুষী দেখাচ্ছি। যখন প্রথমে এখানে আসি তখন আমি হোটেলে যাবার জন্যে একটি ট্যাক্সি ডাকলে ট্যাক্সি চালকটি ঠিকানা জেনে আমার মুখের ওপর বলে দিলে "আপনারা এইটুকু রাস্তা হেঁটে যান।"

এই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা ট্যাক্সি না ডেকে ধীর পদক্ষেপে সিটি অফিসে পৌঁছলাম। স্ত্রীকে সেখানে বসিয়ে রেখে বিমান বন্দরের বাসের সন্ধানে গেলাম। অনুসন্ধানের পর আমাদের বাসটিকে বাড়ীর নীচে যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখতে পেলাম। আমরা বাসে এসে উঠে বসলাম। এই বাসে করে গেলে অনেক কম খরচায় বিমান বন্দরে যাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য পরিবহনে গেলে অনেক খরচা—ভারতের সব জায়গায় এয়ার ইণ্ডিয়া বা অন্যান্য কোম্পানী বাসের ভাড়া নেয় না। বিদেশে সব জায়গাতেই ভাড়া নেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসটি ছেড়ে দিলে। ধীরে ধীরে প্যারিসের জনবহুল প্রশস্ত রাজপথ, তার পাশের নিষ্পত্র বৃক্ষরাজির সার আর বিরাট বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ পুরাণো বড় বড় অট্টালিকাগুলি ও সীন (Seine) নদী একে একে মিলিয়ে আসতে লাগল। তবু Eiffel Towerটি তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। সেটিও আবার ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হ'ল। আমরা হিলটন হোটেলের পাশ দিয়ে বিমান বন্দরে এসে উপস্থিত হ'লাম।

আমরা বাস থেকে নেমে প্রথমে বাড়ীর নীচের ঘরের লকার (locker) থেকে আমাদের ব্যাগেজগুলি বের করলাম। বড় সুটকেসটি খুলে পরিষ্কার জামা কাপড় বের করে ব্যবহৃত জামা কাপড়গুলি তার মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিলাম। তারপর ব্যাগেজগুলি এয়ার ফ্রান্স কাউন্টারে জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে লাউঞ্জে এসে বসলাম। এর মধ্যে আমাদের পাসপোর্ট এয়ারপোর্ট ট্যাক্স সব দিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের ভিসার জন্য যারা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা যথাসময়ে প্লেনে উঠে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বিমানটি স্পেনের আকাশ পথের দিকে রওনা হয়ে গেল। বিদায়, প্যারিস বিদায়। আমাদের বিমানটি কোন্ কোন্ শহরের ওপর দিয়ে যাবে এয়ার হোস্টেসকে দিয়ে আমি আমার রুট ম্যাপের ওপর দাগ দিয়ে নিয়েছিলাম। সব বিমানের এয়ার হোস্টেসরা সব সময় হাসিমুখে জিজ্ঞাস্য জিনিস বলে বুঝিয়ে দিতেন। সুন্দর এঁদের ব্যবহার। তবে পুরুষদের কাছ থেকে অনেক সময় ভাল ব্যবহার পাইনি। মনে হয় এটা প্রকৃতির গুণে একটু অদল বদল হয়। অন্যান্য বিমানে আমরা যদি কিছু খাদ্য মুখে না তুলতাম তাহলে নারীরা আমাদের অসুবিধা জেনে তা দূরীকরণ করতেন কিন্তু পুরুষরা এসব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। "খেতে হয় খাও, না হয় উপোস থাক" এইরকম মানসিক ভাব তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিমানটি Chartres আর Fontainebleau শহরের মধ্য দিয়ে Amboise শহরের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে এগিয়ে চলল।

এদিকে পাহাড় থাকলেও খুব যে ছোট ছোট পাহাড় তা বুঝতে পারলাম। বিমানে আমাদের high tea দিল। নানা রকমের কেক ফল কফি খেয়ে পেট ভরালাম। কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছেন, কেউ জানালা দিয়ে নীচের জমি, পাহাড়, নদী দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা আর একটা বড় শহর দেখলাম। এই শহরটির নাম জানলাম Bordeaux। এর পর আমরা কিছুক্ষণ সমতল, নদী ও হ্রদ পার হয়ে বিসকে উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে একটি বড় শহর San Sebastian পার হলাম। এই শহরটি পার হতেই আমরা বড় বড় পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগলাম। দিনের আলো তখনও বেশ রয়েছে। পাহাড়ের মাথায় তুষারের রৌপ্য মুকুটগুলো আমাদের চোখে পড়ল। এদিকে প্রায় সব পাহাড়ের চূড়ায় তুষার জমেছে। অস্তগামী সূর্যের আলো তাদের মাথার ওপর পড়ে এক অভাবনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। এই পর্বতমালার নাম Pyrenees পর্বতমালা। এই পাহাড়ের সারিটি দুটি দেশের সীমানা করে দিয়েছে। এদিকে সমতলভূমি আর আমাদের চোখে পড়ল না। প্রকৃতিদেবী, স্পেনের তিন দিকে সমুদ্র আর উত্তর দিকে পাইরেনিজ পর্বতমালা দিয়ে একে সুরক্ষিত করে রেখেছেন বলে মনে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরের শত্রুর হাত থেকে স্পেন কোনদিনই রক্ষা পায়নি।

ধীরে ধীরে সূর্যদেব অস্ত গেলেন আর এদিককার সমস্ত জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল। মাথার উপরে অসংখ্য তারা দেখা দিল। তার মধ্যে মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় মেঘের সারি ধীরে ধীরে উড়ে চলেছে। আধ ফোটা চাঁদটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কোথায় যে হারিয়ে গেল তাকে বেশ কিছুক্ষণ খুঁজে পাওয়া গেল না। নীচে ঘন অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট শহরের আলো মাটির প্রদীপের মত মিট মিট করে জলতে দেখলাম। আমাদের যাবার কয়েকদিন পূর্বে এই সময়ে একটা আফ্রিকাদেশীয় যাত্রীপূর্ণ বিমান এই পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সকলেই মারা যান, কেউ প্রাণে বাঁচেননি। যদিও আমরা সব সময়েই বাস ট্রামের মত বিমান বদল করেছি তবুও এই দুর্ঘটনার কথা মনে করে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। অনেক যাত্রীও এই দুর্ঘটনার কথা নিয়ে নিজেরা আলাপ আলোচনা করছেন শুনতে পেলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের বিমানটি ঠিক সময়ে মাদ্রিদের বিমান বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে নেমে পড়ল।

স্পেনে এসে অনেক টুরিষ্ট ভিসা করলেন। পাসপোর্ট অফিসার আমাদেরও জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা ভিসা নেব কি না। আমাদের ভিসা করা আছে জানাতে তাঁরা আমাদের পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিয়েছিলেন। এখানে ভিসার খরচ প্যারিসের ভিসার খরচের প্রায় অর্দ্ধেক। এর কারণ আমি জানতে পারলাম না। তবে এদের স্বাস্থ্য বিভাগ অন্যান্য দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ে খুব কড়া। অন্যান্য দেশে বসন্তের টিকা হলেই ছেড়ে দেয়, এখানে কিন্তু কলেরা ও বসন্ত দুটোরই টিকা দেওয়া না থাকলে এদেশে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এঁরা যাত্রীদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন দেখলাম। ভিসার জন্যে কাকেও ঝামেলা পোহাতে হয় না। ফ্রান্সের মত এত অভদ্র পাসপোর্ট অফিসার পৃথিবীর কোন দেশে দেখলাম না। আবার ফ্রান্সের বিমান বন্দরের অন্যান্য অফিসারদের মত এত নম্র বিনয়ী ও প্রত্যেককে সাহায্য করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা আমি আর কোন দেশে দেখতে পাই নি।

আমাদের সমস্ত সুটকেস ওদের লাগেজ রুমে জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে এয়ার বাসে উঠে পড়লাম। এই লাগেজ রাখতে দিন প্রতি ভাড়া গুনতে হয়। কোথায় কম ও কোথায় খুব বেশী। ইস্তামবুলে আমাদের লাগেজের ভাড়া সবচেয়ে বেশী লেগেছে। আমাদের বাসটি শহরের অনেক ছোট বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। যদিও স্পেন খুব উন্নত দেশ নয় তবুও

আজকালকার সভ্যতার চিহ্ন সব জায়গাতেই বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর সকল জাতিই এখানে ব্যবসা করতে এসেছে। তাদের প্রত্যেকের বড় বড় অফিস ও দোকান এই সব রাস্তায় রয়েছে দেখলাম। রাত্রির অন্ধকারে শহরটি আলোর মালাতে সেজে দিনের আলোর মত দেখাচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাসটি দমদম এয়ার পোর্ট থেকে পুরানো রাস্তা ধরে শ্যামবাজারের মধ্য দিয়ে চলেছে। দুধারে নর্দমা আর দোকানের সারি পর পর চলেছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটা বড় স্কোয়ারে এসে পৌছলাম, এটার নাম Canovas স্কোয়ার বা নেপচুন স্কোয়ার। এর পাশেই শহরের এয়ার টার্মিনাল অফিসটি। অফিসটি খুবই বড়। অনেক কর্মচারী এখানে কাজ করছেন। একটু দূরে রয়েছে স্কোয়ারের মাঝখানে নেপচুনের ঘোড়ায় টানা রথের উপর মূর্তি। এর চারদিকে ফোয়ারা দিয়ে নানা রঙের জল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রাত্রে জলের ওপর আলোর কৌশল আমরা অনেক দেশে দেখে এসেছি।

এই সব শহরের বিমান অফিসে আমরা সব সময় হোটেলের সন্ধান নিয়ে থাকি। এঁদের কাছে অনেক হোটেলের সন্ধান লিপিবদ্ধ করা আছে। এঁরাই হোটেলের সব কিছু বন্দোবস্ত করে দেন। অনেক দেশে এর জন্যে আমাদের কিছু পারিশ্রমিক দিতেও হয়েছে আবার অনেক দেশে কিছুই দিতে হয় নি। সুইডেনের ষ্টকহোমে এর জন্যে ছটি সুইডিশ মুদ্রা আমাকে দিতে হয়েছিল। এখানে আমাকে কিছুই দিতে হয় নি। এই অফিসের মহিলা কর্মীটি আমি কত ডলারে ঘর ভাড়া নেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি উত্তর দিতেই তিনি হোটেলের রেজিষ্ট্রি দেখতে আরম্ভ করলেন। পাশেই একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ওদের ভাষায় মহিলা কর্মচারীটিকে কিছু বললেন। তিনি খাতাটি আর দেখলেন না। তিনি আমাদের দিন প্রতি ৮ ডলার ভাড়া দিতে হবে বলে ভদ্রলোকটির সঙ্গে যেতে বললেন। সেই ভদ্রলোকটি তখন আমাদের দুটি ব্যাগ দুহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আমাদের তাঁর পিছু পিছু আসতে বললেন। বুঝলাম ইনি হোটেলের দালালি করেন। ট্যাক্সি ডাকতে বলায় তিনি ট্যাক্সি নিতে বারণ করলেন। "হোটেলটি খুব নিকটেই, ট্যাক্সির কোন দরকার নেই" বলে তিনি এগুতে থাকেন। আমরাও তাঁর পিছন পিছন চললাম। মাদ্রিদ শহরটি পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। তাই রাস্তায় ওঠা নামা করতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সারা সকালটা ফ্রান্সে প্রায় পায়ে হেঁটেই ঘুরেছি। পায়ের ব্যথা বেশ হচ্ছে, যতটুকুই রাস্তা হোক, আর হাঁটা যায় না। সমতল হলে না হয় ডলার বাঁচাবার জন্যে কষ্ট করতাম, কিন্তু সোজা পাহাড়ে খাড়াভাবে উঠতে হচ্ছে। আমরা বেশ হাঁপাচ্ছি। আমার স্ত্রী গজগজ শুরু করে দিয়েছেন। আমি টাকা বাঁচাচ্ছি বলে তিনি আমায় দোষ দিয়েই চলেছেন। ভদ্রলোককে ট্যাক্সি ডাকতে বললাম, তিনি হাত দিয়ে একটি বড় বাড়ী দেখিয়ে বললেন "ঐ বাড়ীটার গায়েই আমাদের হোটেল। একটু পা চালিয়ে আসুন।" পা যে আর চলে না তা আর তাঁকে বোঝাতে পারলাম না। অনেক কষ্টে একটি গলির মধ্যে দিয়ে ঢুকে হোটেলে পৌছলাম। গলিটি খুব নোংরা ও অপরিসর। দুধারে হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট। সেই সব রেষ্টুরেন্ট থেকে হৈ-হল্লার শব্দ আমাদের কানে আসছে। গিন্নীর মুখ বেজায় ভার। আমেরিকা প্যারিস থেকে এসে এই নোংরা জায়গায় ঢুকতে ওঁর মনটা যে বেশ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের হাওড়ার টিকিয়া পাড়ার চেয়ে এ গলিটা যে হাজার গুণ ভাল তাও তিনি বুঝতে পারছেন। তবুও নিজের দেশ নোংরা হোক্ তবু ভাল, এ ত বিদেশ, ভাল হওয়া উচিত ছিল। অর্থ খরচ করে তবে এলাম কি করতে?

হোটেলে এসে নামধাম লিখে তেতলার ঘরে লিফ্‌টে করে উঠে এলাম। ঘরটি খুবই বড়। দুটি বিছানা পাশাপাশি, টেবিল চেয়ার সোফা রয়েছে। তার

ওপর ডাইনিং হল, তার সঙ্গে সংলগ্ন স্নানের ঘর। আট ডলার রোজ ভাড়া আর সকালে দুজনের ব্রেকফাস্ট ফ্রী। এত সস্তায় যে এদেশে ঘর পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। পোলাণ্ডে ৮ ডলারে ঘর ভাড়া পেয়েছিলাম কিন্তু কোন ব্রেকফাস্ট সেখানে ফ্রী পাইনি। ঘরটি পেয়ে খুবই আনন্দ হ'ল সেদিন। কিন্তু পরদিন একজন আমেরিকান টুরিষ্টের মুখে শুনতে পেলাম যে এখানকার ৮ ডলার ভাড়া বেশ বেশী দাম নিয়েছে। তিনি একটি বড় ঘর পাঁচ ডলারে পেয়েছেন সেখানে তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র সমেত আছেন। আমরা তা হলে দিনপ্রতি তিন ডলার ঠকলুম। যাকৃগে, তা আর কি করা যায়।

হোটেলের ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমার স্ত্রী এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কাপড় না পরিবর্ত্তন করেই বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। আমি স্যুটটা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ভালভাবে স্নান করে একটি পরিস্কার স্যুট পরে কিছু খাদ্যের সন্ধানের জন্যে প্রস্তুত হ'লাম। ভদ্রমহিলা আমায় এত কর্ম্মঠ দেখে বলে ওঠেন, "তোমার শরীর কি লোহা দিয়ে তৈরী? বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। কোন দিন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতেই মুখ থুবড়ে পড়বে আর উঠতে হবে না, আমি বলে দিচ্ছি। বিশ্রাম নাও, আর খাবার আনতে যেতে হবে না।"

"আমি রোজই ত তাই ভাবি গো। একবারে পড়ব আর উঠব না। রোগে না ভুগে মরার চেয়ে করোনারি এ্যাটাকে মরা ভগবানের আশীর্ব্বাদ জেনো। এসব কথা ছেড়ে দাও। রাতে কিছু খাবে না?"

"আসবার সময় প্লেনে আমাদের হাই টি দিলে, পেট ভরে সব খেলাম। আবার তোমার খিদে পেয়ে গেল, না রাত্রে শহরটা দেখবার জন্যে তোমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে?"

"দেখ, সেই লণ্ডনে চিকেন কারি আর সরু চালের ভাত খেয়েছিলাম। প্যারিসে ভাত খাওয়া আমাদের ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। তাই বাড়ীর আশেপাশের রেষ্টরেন্টে যদি ভাত আর মাংসের ঝোল পাই, একবার চেষ্টা করে দেখে আসি না।"

"এই বললে যে তোমার পকেটের ডলার ধীরে ধীরে কমে আসছে? থাক না, রাত্রে না হয় আজ কিছু নাই বা খেলাম। আসছে কাল সকালেই না হয় ব্রেকফাষ্ট খাব। পয়সাও বাঁচবে আর বিশ্রামও নিতে পারবে।"

ওদের জনসাধারণের রেষ্টরেন্টের হৈ হল্লা, আর সেখানে রাত্রে কি কি জিনিষ বিক্রয় হয়, কি ভাবে ওরা খায়, গল্প করে, ওদের মাতলামি প্রভৃতি না দেখলে স্পেন দেখার একটা অংশ দেখা হয় না। শুনেছিলাম যে ওদের সাধারণ জনগণকে দেখতে হলে রাতের রেষ্টরেন্টে দেখতে যাওয়া উচিত। তাই এই দেখাটার লোভ সংবরণ না করতে পেরে আমি বিশ্রাম না নিয়েই সেখানে যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলি "দূর থেকে রান্নার গন্ধটা পাচ্ছ না? ঐ গন্ধে আমার ত বেশ খিদে পেয়ে গেল। কিছুটা কিনে এনে দুজনেই ঘরে বসে খাব এখন।" আর অন্য কথা না পেড়েই একটি ব্যাগ হাতে করে আমি লিফ্‌ট দিয়ে নেমে সটান রেষ্টরেন্টে ঢুকে পড়লাম। রেষ্টরেন্টটি প্রাচীন কালের একটি কাফের মতন। আজকালকার রেষ্টরেন্টের মত আধুনিক ভাবে সাজানো নয়। তাই আমি এটিকে কাফে বলেই অভিহিত করব। কাফেটি লোকে লোকারণ্য। ঘরটির মধ্যে ইলেকট্রিক বালব জ্বললেও ঘরটি খুব আলোকিত নয়। অনেক সজ্জিত ভদ্রসন্তান ও অনেক ভদ্রঘরের তণ্বী সুন্দরী সজ্জিতা যুবতীদের আগমনে কাফেটি বেশ চঞ্চল দেখলাম। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ খদ্দের দিন মজুর বলে আমার মনে হ'ল, এরাও তাদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মনে হয় সারাদিনের পরিশ্রমের পর এরা সকলে এখানে একটু আনন্দ আহরণ করবার জন্যে এসে থাকে। এখানে এসে এদের দেখলেই মনে হয় যে স্পেনের জনসাধারণ বেশ আনন্দপ্রিয়। এই কাফের পাশে সারি সারি অনেক কাফে রয়েছে। আর সেই সব কাফে থেকে নানা রকমের সঙ্গীত, হাসির ঢেউ আমার কানে আসছে। কাফেটি

বেশ বড়। ঘরের কোণে কয়েকটি চেয়ার ও কয়েকটি টেবিল রয়েছে। টেবিলগুলোর একটাও সাজানো নেই। টেবিল আর চেয়ারগুলো যে কত দিনের পুরানো তা বলা যায় না। ওখানে অনেক খদ্দের বসে বসে তাদের আহার সমাধা করছে আর হাসির তুফান বহাচ্ছে। আলো আঁধারে তাদের মুখগুলো বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে বেশীর ভাগ খদ্দের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট লাল রঙের মদের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর কল্লা করছে। ষোড়শী যুবতীরাও যুবকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তাদের আনন্দমুখর মুখগুলো দেখে আমার খুব ভাল লাগল। আজকাল-কার ছেলেমেয়েরা কেমন স্বাধীন, কেমন প্রাণখোলা, তারা কেমন বাধাহীন ভাবে ঘোরাফেরা করে। মনে হয় তারা কারও তোয়াক্কা করে না, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না, বর্তমানের চিন্তাতেই তারা যেন মশগুল হয়ে রয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা আমাদের গুরুজনদের, শিক্ষকের কাছ থেকে প্রতি পদে পদে কত বাধা পেতাম, কারণ অকারণে তাঁদের কাছে থেকে নিগৃহীত হতাম তা ভাবলেও আজ আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এরা আনন্দ করতে জানে। এরা বেপরোয়া হয়ে প্রবল নদীর স্রোতের মত ভেসে চলেছে, কোথায় যে যাচ্ছে তার চিন্তাও এরা করে না। সম্পূর্ণভাবে এরা এদের জীবনটাকে ভোগ করতে জানে। আজ আমরা অস্তমিত রবির মত পশ্চিম দিকে চলে পড়ছি। কিন্তু এদের মত প্রাণখোলা হাসতে, স্বাধীন ভাবে ঘুরতে আর জীবনটাকে ভোগ করতে কখনও আমরা পারিনি। জীবনের পদে পদে আমরা শুধু বাধা পেয়ে এসেছি। আমি মনে মনে প্রার্থনা করি "সুন্দর হোক, মঙ্গল হোক ওদের চলার পথ।"

ঘরে ঢুকতেই বাঁদিকে একটু উঁচু জায়গায় রয়েছে বড় লম্বা টেবিল। তার ওপর রয়েছে নানান রকমের মাংসের তৈরী খাদ্য। কোনটাই ঢাকা নেই। টেবিলের ওপরে বেশ কয়েকজন বিক্রেতা মাথায় লম্বা লম্বা বাবুর্চির টুপি পরে ক্রেতাদের খাবার জিনিষ বিক্রি করছে। অন্য কোণে লাইন দিয়ে ক্রেতারা লাল রঙের মদ ছোট ছোট গেলাসে করে কিনে চলেছে। হাতে হাতে তারা দাম দিয়ে দিচ্ছে। কোথায় কোনও ক্যাশি-য়ারের কাউন্টার দেখলাম না। ঘরটির চারপাশে সিদ্ধ গরু, শুয়োরের বড় বড় টুকরো মাংস কাড়িকাঠ থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঝুলছে। ক্রেতারা সেই সব মাংস থেকে মাংস আর পাশের রুটি বিক্রয়ের জায়গা থেকে রুটি কিনে মহা আনন্দে দাঁত দিয়ে টানাটানি করে আহারে ব্যস্ত দেখলাম। ঘরটি পুরাণো ত বটেই তবে তার মধ্যে কোনদিন বোধহয় চুনকাম পড়েছে বলে মনে হল না। আমেরিকান জলদস্যুর ঘটনাবহুল ছবিগুলোতে এই রকম কাফে অনেক দেখেছি। জলদস্যুরা লুঠপাট করে সহচরদের সঙ্গে নিয়ে এই রকম কাফেতে ঢুকে খাওয়া দাওয়া করত। সেখানে অবশ্য নর্তকী এসে আসর জমাত ও জলদস্যুদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত। কিন্তু এখানে কোন নর্তকী দেখতে পেলাম না। তবে যে সব যুবতী অষ্টাদশী ষোড়শী ও সুন্দরী নারীরা তাদের চালক বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ করতে এসেছে তাদের সকলকে বেশ আনন্দে মাতামাতি করতে দেখলাম। এ ওর মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, এ ওর ঠোঁটে চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়ে অন্যের কাছ থেকে বাহবা নিচ্ছে। যদিও এখানে সকলেই আনন্দে মত্ত তবুও কাকেও মদ খেয়ে মাতলামো করতে দেখলাম না। আর দেখলাম না আমেরিকা বিলাতের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে বালিকা বান্ধবীকে তার বালক বন্ধু জড়িয়ে জড়িয়ে চুমা খেতে আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্রীদের হোষ্টেলের দাওয়াতে প্রেমিক ছাত্র প্রেমিকা ছাত্রী বান্ধবীকে কোলের ওপর বসিয়ে সকলের সামনে তার সারা দেহ চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে। এইসব প্রেমালাপন স্বচক্ষে দেখে আমেরিকায় এক নৈশ ভোজে এক আমেরিকান বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, "এখানকার মেয়েরা বয়স্থা হলে তারা তাদের বালক বন্ধুদের সঙ্গে ডেট করতে যায়। তখন তাদের মায়েরা গর্ভধারণের ভয়ে মেয়েদের অজান্তে প্রত্যহ

একটি করে গর্ভনিরোধক বটিকা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তাদের মেয়েদের খাইয়ে দেন, এ কথাটা কি সত্য?" বান্ধবী আমার কথা শুনে চমকে ওঠেন, 'আপনি একথাটা কেন বলছেন আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না।"

আমি বললাম, "আমাদের এক লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখক কয়েক মাস আমেরিকা ভ্রমণ করে তিনি তাঁর একটা বইতে এই সব কথা লিখেছেন। সেই বইটা পড়েই আপনাকে আমি বলছি।"

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। তিনি তব্যতার অন্তরে কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার কাছে মাপ চেয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন। কথাগুলো শোনার পর প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার মুখ চোখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল তা আমার চোখে পড়ল। শুধু ধীরে ধীরে তিনি কয়েকটি কথা আমায় জানালেন, "আজকাল আমাদের মেয়েরা এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছে। ঐ বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে তাদের মায়েদের আর প্রয়োজন হয় না। এই সব বড়ি বা অন্যান্য গর্ভনিরোধক জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধের দোকানে এই সব বড়ি ও অন্যান্য জিনিষপত্র ঢেলে বিক্রয় হচ্ছে তা সকলেই কিনতে পারে আর তাদের ব্যবহার করার জন্যে অনেক উপদেশ তার মধ্যেই থাকে। আর এ বিষয়ে শিক্ষা স্কুল থেকেও তারা পায়। এই সব জিনিসপত্র বিবাহিতা যুবতীদেরই বেশী প্রয়োজন। কুমারীদের প্রয়োজন হয় না। তবে আজকাল মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে মিশতে মিশতে ত ঐ সব জিনিষের প্রয়োজন হয় সত্য তবে তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। এই অল্প সংখ্যাটি সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সিনেমাতে টেলিভিশনে বিষ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। কোন দেশ এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। আপনাদের লেখক এই কয় মাসে আমেরিকাকে চিনলেন কি করে? আমেরিকা মহাদেশ, তাকে চিনতে জানতে হলে, তার বিষয় লিখতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন।"

আমি তখন তাঁকে কলেজ ক্যাম্পাসের কথা আর রাস্তায় রাস্তায় প্রেমালাপন করা কথা ধীরে ধীরে বললাম। তিনি তা শুনে আমাকে বললেন, "কলেজ ক্যাম্পাসের ঘটনা আমারও চোখ এড়ায় নি, তবে তাদের সংখ্যা খুবই অল্প। এদের বাধা বা শাস্তি দেবার জন্যে আমাদের সরকারের কোন আইন নেই বা আমাদেরও নেই। আমাদের সময়ে আমরা আমাদের বাবা মা ও গুরুজনদের কথায় চলতাম কিন্তু এরা কারও কথা শুনতে চায় না। এরা যে সম্পূর্ণ স্বাধীন সেটা এরা সব সময় মনে করে থাকে। যুগ পালটাচ্ছে তাই আমরা যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলছি। আমাদের সময়ে দুটো হষ্টেল ছিল, একটি পুরুষদের ও একটি মেয়েদের। এখনও এই রীতিটা চলছে। কিন্তু এখন এরা এই আলাদা থাকাটা আর পছন্দ করছে না। তাই দু-এক জায়গায় একই হষ্টেলেই ছাত্র ছাত্রীর থাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটি পরীক্ষা-মূলক।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনারা মেয়েদের ঐ সব হষ্টেলে থাকতে দেবেন ত?"

বন্ধুটি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন হঠাৎ বলে ওঠেন "ক্ষেপেছেন? ঐ সব পাগলামির জায়গাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের থাকতে দেব না। তুমি কি বল গো?" ভদ্রমহিলা কর্তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, "তাও কি কখনও হয় নাকি? আর আমার ছেলেমেয়েরা ও-জাতের ছেলেমেয়ে নয় যে তারা ঐ সব জায়গায় থাকতে যাবে।" আমি বললাম, "আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার এই সব কাজে সায় দেন ত?" তিনি বললেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের কোন হাত নেই। প্রদেশ-সরকার তার প্রদেশে যা করবে সেটাই চলবে। তবে অন্যায় কাজ করলে জনসাধারণেরা বাধা দেয়।"

আমি আবার বললাম, "সেদিন একজন যুবক গাড়ী চালাতে চালাতে তার বান্ধবীকে জড়িয়ে চুমা খাচ্ছে দেখে পুলিশ দুজনকেই ধরে নিয়ে থানায় যায়। সেখানে ছেলেটির লাইসেন্স কয়েক মাসের জন্যে বাতিল করে দেয় ও তাকে বেশ মোটা জরিমানা করেছে।"

ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন, "দেখেছেন ত আমাদের আইন কেমন কঠোর। এখানকার ছেলে-মেয়েরা নির্লজ্জ ভাবেই সকলের সাক্ষাতেই প্রেম করতে থাকে। তাদের পাগল ছাড়া আর কি বলা যায়? আমাদের মত বয়সীরা ওদের দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অতি বৃদ্ধবৃদ্ধারা ঐ সব দেখে নিজেদের মনে মনে গজগজ করতে থাকেন। পাগলের কাণ্ড-কারখানা দেখে কে আর মন্তব্য করতে যাবে বলুন।"

এখন রাত দশটা বেজে গেছে। গোলমাল ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে। লোকজনরাও একে একে আবার ঢুকছে। এখন এদের কোন মাতলামি আমার চোখে পড়ছে না তবে মাঝ রাত্রিতে এদের মনের কি পরিবর্তন হয় তা দেখার সুযোগ আমার হয় নি। বাড়ীটা অনেক বছরের পুরনো, ঘরটার মধ্যে রান্নার কালির দাগ সর্বত্র। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ছাদটিকে ধরে রাখা হয়েছে, মাথায় এক রকমের টালির ছাউনি। আমার এখানে এই সব দেখে মনে হ'ল যে কাফের অধিকারী এই কাফেটিকে আজকালকার ধরণের তৈরী না করে পুরাতনের ঐতিহ্যটা বজায় রাখবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছেন।

আমি খরিদ্দারদের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বিক্রেতার টেবিলের ওপর উঁকি-ঝুঁকি মারছি, তা তাদের চোখ এড়ায়নি। আমি যে একজন বিদেশী তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছি তা তারা টের পেয়েছে। সকলেই আমার দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে দেখছে তা বুঝতে পারছি। ওরা মাংস খাচ্ছে, খেয়ে হাড়গুলো তাদের পায়ের তলায় ফেলে দিচ্ছে, চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে, খোলাগুলো পায়ের তলায় ফেলে দিচ্ছে, তা আমার চোখ এড়ায় নি। তাদের খাওয়ার রীতি দেখে আমার মনে বেশ একটু রেখাপাত করল। এই নোংরা পরিবেশে ওরা কি করে ওদের খাদ্য ওরা মুখে তুলছে তা ভাবতেও পারছিলাম না। ইউরোপের অন্যান্য দেশে দেখেছি যে খাবার পর হাড় কাঁটা ও অন্যান্য উচ্ছিষ্ট খাবার এক কোণে জমা করে রাখে বা ঘরের মধ্যে রাখা ডাষ্টবিনের মধ্যে ফেলে দেয়। হাড় কাঁটার সঙ্গে সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো সারা মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। অন্যেরা এই সব নোংরামির প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক তাদেরও এই ভাবে আহার করতে দেখতে পেলাম। তাই আমার মনে হ'ল যে এরাও সেই পুরাকালের কাফের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে।

বিক্রেতার কাছে গিয়ে টেবিলের এক ধারে চিকেন কারি দেখে ইংরেজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করি যে এটা চিকেন কারি না ফ্রগ কারি। কারণ পাশ্চাত্ত্যদেশে ব্যাঙের মাংস খাবার জন্যে ব্যাঙের চাষ হয় শুনেছি ও বইয়ে পড়েছি। ওরা কেউ ইংরেজী জানে না ওরা ইশারায় আমায় জানিয়ে দেয়। থালায় চিকেন কারি রয়েছে বলে মনে হ'ল। ওদের ঠ্যাংগুলো লাল ঝোলে ভাসতে দেখে আমার রসনা বেশ ভিজতে আরম্ভ করেছে বুঝতে পারি। একদল যুবক ও তার মধ্যে একটি যুবতী আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখতে পাই। তাদের আমি জিজ্ঞাসা করি এগুলো চিকেনের ঠ্যাং না কোলা ব্যাঙের ঠ্যাং। ওদের দলটি আমাকে দেখে খুব আগ্রহ দেখায়, সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ওরা থালার মাংস দেখিয়ে মুছে হাত তুলে ইশারায় বলে যে আমি ওগুলো খেতে পারি। আমি তাদের বোঝাতে চাই যে ওগুলো কি মুরগীর মাংস, তাই মুরগীর ডাক আমায় ডাকতে হয়। মেয়েটি আমার ডাক শুনে হেসে গড়াগড়ি দেয়। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ক্ষমা চেয়ে তাদের মধ্যে একটি যুবককে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে এল। পরে আমায় ইশারায় বুঝিয়ে দেয় যে ছেলেটি ইংরেজী জানে, তার সঙ্গে আমি যেন কথা কই। আমি একজন ইংরেজী জানা যুবককে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আমি পরিষ্কার ইংরেজীতে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করি। ওর বন্ধু-বান্ধবীরা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর কান খাড়া করে শুনতে চায় যে তাদের ইংরেজী জানা বন্ধুটি আমায় কি উত্তর দেয়। কিন্তু যুবকটি মোটেই ইংরেজী জানত না। দু-একটি ইংরেজী শব্দও যা জানত তাও

এত ভুল উচ্চারণ করল যে তাও আমার বোধগম্য হ'ল না। সে কথার উত্তর না দিতে পেরে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে স্পেনীয় ভাষায় কি একটা কথা বলতেই ছেলেটা ধীরে ধীরে কাফে ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। যুবকটি যে সত্যিই ইংরেজী ভাষার একটি অক্ষরও জানে না তা আজ তাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল। ওদের ভাবে বুঝতে পারলাম যে যুবকটি অনেকদিন থেকে ওদের কাছে সে ইংরেজী জানে বলে জাহির করে আসছে কিন্তু আজ পরীক্ষার সময় একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়াতে সে পালিয়ে তার মান বাঁচাল। যুবকটি চলে যেতে ওদের আবার হাসির উচ্চ শব্দে কাফেটি মুখরিত হয়ে উঠল। আমাকে মেয়েটি চিকেন কারি কিনতে বলতে আমি প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ চাইলাম। ওরা অবাক্ হতে ইশারায় আমেরিকাতে প্ল্যাস্টিক ব্যাগ পাওয়া যায় জানালাম। আমেরিকার নাম শুনে ওরা মুখ বেঁকায়। বেঁকিয়ে বলে, "এটা আমেরিকা নয়, এটা স্পেন।" বুঝলাম আমেরিকানদের ওপর ওরা মোটেই সন্তুষ্ট নয়। আমি হাসতে হাসতে ইশারায় বলি যে আমি কোন পাত্র আনি নি তাই কোন একটি পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। ওরা বুঝে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিক্রেতাকে একটা প্লেট দিতে বলল। বিক্রেতা একটি প্লেটে চার টুকরো ঠ্যাং ও একটু ঝোল দিয়ে প্রায় দেড় ডলার চাইলে। ডিশের জন্যে জমা দিতে হল প্রায় আধ ডলার। ওদের টাকা দিয়ে ব্যাগের মধ্যে ভাল ভাবে ঢুকিয়ে রুটির অনুসন্ধান করলাম। এক প্রান্তে একটি ভদ্রলোক রুটি খাচ্ছিলেন সেটি দেখিয়ে বলি যে আমি কিনব। রুটি এখানে বসে খেতে হয়, নিয়ে যাওয়া যায় না, ইশরায় আমায় তারা জানিয়ে দেয়।

এর মধ্যে মেয়েটি আমাকে লাল মদ খেতে অনুরোধ করল। আমি ওদের অনুরোধ বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে জানাই যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা ঐ সব পানীয় মুখে তোলে না। তবে বড় বড় অফিসার বা অনেক ধনী তাঁরা পান করেন। কথায় কথায় আমি যে ভারতীয় তা প্রকাশ করি। ওরা ইন্দিরা গান্ধীর নাম শুনেছে। ইন্দিরা গান্ধী যে মহাত্মা গান্ধীর মেয়ে তা তারা ভাল ভাবেই জানে বললে। আমি ওদের পার্থক্যটা বুঝিয়ে বলাতে ওরা অবাক্ হয়ে যায়। রাত হয়ে আসছে বলে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাই। ওরা আবার আমায় আগামী রাত্রে এখানে আসতে অনুরোধ করতে থাকে। নেশাটা একটু একটু বেশ জমেছে বুঝতে পারলাম, তাই মাথা নেড়ে জানাই যে আবার আসব। রুটি কেনবার জন্যে আমার সঙ্গে একটি যুবককে মেয়েটি পাঠিয়ে দিল। দু-চারটে দোকান ঘুরে ঘুরে রুটি পেলাম না। সব কাফেগুলিই এই ধরণের। পরে ছেলেটা একটা নতুন কাফেতে গিয়ে একটা রুটি কিনিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় চাইল। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় দিলাম।

রুটি আর থালায় করে চিকেন কারি ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে আমি দরাসার লিফ্‌টে করে নিজের ঘরে এসে চেঁচিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। মুখটা বেশ একটু ভার ভার দেখলাম। আমি হাসতে হাসতে বলি, "কি গো, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"হোটেলের ওধার থেকে ভাত আর চিকেন কারি নিয়ে আসতে যদি এক ঘন্টা সময়ের ওপর লাগে তাহলে কি করে পৃথিবী ভ্রমণ করছ তাই দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।" ভদ্রমহিলা বেশ রাগত ভাবে কথা-গুলো আমায় জানালেন।

"যা বলেছ, খুবই দেরী হয়ে গেল। কেন হ'ল বলছি শোন।"

বলে ঘটনাটি আমি পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি, তিনি আমায় থামিয়ে বললেন, "আর বলতে হবে না, আমি সব জানি। একলা একলা স্পেনের রাজধানীটা রাতের আলোয় কেমন দেখলে? নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লেগেছে?" আমাকে অন্যায় ভাবে এ কথা বলাতে

আমার বেশ রাগ হল। কিন্তু আমি কোন কথা না বলে খাবার টেবিলে মুর্গির মাংসটা বের করে রাখলাম। থালা থেকে চল্‌কে চল্‌কে ঝোলটা সারা হাত ব্যাগের ভেতরে পড়ে ভেতরটা নষ্ট করে দিয়েছে। সাবান দিয়ে না ধুলে কারির দাগ যাবে না।

ভদ্রমহিলা মুর্গির মাংসটা চেখেই হাসতে হাসতে বললেন, "তাহলে সত্যি সত্যি আজ আমায় মুর্গির ঝোল আর ভাত খাওয়াবে। ক' থালা ভাত আনলে? নিশ্চয়ই দু থালা? খেতে পারবে, না ফেলে দিতে হবে? লণ্ডনে দুজনে খেতাম একথালা, ভাত আনতে দুথালা। একথালা ভাত ফেলে দিতে হত। বিদেশের সরু সরু চালের ভাতগুলো দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে" বলে তিনি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে টেবিলে এসে বললেন, "কই, ভাত বের কর দেখি কতখানি এনেছ।" আমি ঝোলা থেকে দুটি লম্বা রুটি বের করে বললাম, "এরা রাত্রে ভাত খায় না, সকলে রুটি খায়।"

"নিশ্চয়ই ভাতের দাম খুব বেশী? তোমায় ত আমি চিনি। যেটার দাম কম সেটাই তুমি আনবে। বেশ কয়েকদিন ভাত পেটে পড়েনি। ভাত আনলেই পারতে, না হয় দুটো টাকা বেশী খরচই হত।" মুর্গির কারিটা দেখতে দেখতে তিনি মন্তব্য করেন, "কারিটা বা ঝাল হবে বুঝতে পারছি, মুখে দেওয়া যাবে না। আমায় নিয়ে গেলে আমি ভাল করে অন্য রকমের কারি কিনে নিয়ে আসতাম।" বলে তিনি চিকেন কারি দুভাগে ভাগ করতে লাগলেন।

আমি বললাম, "এখানে রাত্রে ভাত পাওয়া যায় না। এটা তোমার বাংলাদেশ নয় যে যেখানে সেখানে যখন তখন ভাত কিনতে পাওয়া যাবে।" "বিদেশে বলেই বলছি। এদিককার চালের ভাত আমাদের দেরাদুন চালের ভাতকেও হার মানিয়ে দেয়। বাংলাদেশ হলে বলতাম না, কারণ সেখানে রেশনে যা চাল পাওয়া যায় পশুও খেতে চায় না। আবার আমাদের কল্যাণীর রেশনের চাল।"

"জাপানের রেষ্টরেন্টের ভাত খাওয়া ভুলে গেলে? মোটা মোটা ভাতের সঙ্গে কে যেন খানিকটা গমের আটা ফেলে দিয়েছিল। শুধু মুরগীর ঠ্যাংগুলো খেয়েই সেদিন পেট ভরাতে হয়েছিল।"

রুটি আর মাংসের কারি খেতে খেতে গিন্নী বলতে আরম্ভ করলেন, "কি রান্নাই এনেছ, না আছে ঝাল আর না মিষ্টি, এমন বিস্বাদ কারি কোনদিনই আমি খাই নি।"

আমি খেতে খেতে বলি, "স্পেনদেশীয় কারি খাচ্ছি। ফিরে গিয়ে দেশের লোকের কাছে জানাতে পারব যে আমরা সব দেশেরই কারির আস্বাদ করেছি।"

গিন্নী বললেন, "ব্যাঙ্ককের সেই সরু চালের ভাত আর মুরগীর মাংসের কারি কত বছর আগে খেয়েছি এখনও মুখে আমার লেগে রয়েছে বলে মনে হয়।"

আমি বলি, "কেন, সেই হংকংএর জলের ওপর ভাসমান রেষ্টরেন্টের বড় বড় চিংড়ির স্বাদ এখনও ভুলতে পারছি না।"

গিন্নী বলেন, "আর ওসব কথা বলে আমার খিদে বাড়িও না। একে আমার খেতেই ইচ্ছে ছিল না জোর করে চিকেন কারি এনে খাওয়ালে। মুখ বিস্বাদ হয়ে গেল। আমি আর খাব না।" বলে তিনি না খেয়েই উঠে পড়লেন। আমারও কারি ভাল লাগছিল না। আমিও সেগুলো ঘরের মধ্যে রাখা ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিলাম। তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। সামনে দোকানগুলো থেকে হৈ হল্লার শব্দ এখন বেশ বেড়েছে জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিতে হ'ল, তা না হলে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। পরিশ্রমে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার অভ্যাসমত আমি খুব ভোরেই উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে লাগলাম। গিন্নী তখন ঘুমে অচেতন। ডাকার সাহস হ'ল না। ভ্রমণ করতে করতে যে এত পরিশ্রম হয় সেটা আমাদের দুজনেরই জানা ছিল

না। এয়ার ইণ্ডিয়া হোটেল ঠিক করে দিয়েছে, প্লেনে প্লেনে যাব। সেজ মেয়ে ডলার পাঠিয়েছে, মজা করে খাব, থাকব, ঘুরব। তা না, এই ভ্রমণের মাধ্যমে যে এত ঝামেলা সহ্য করতে হবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। ভদ্রমহিলার ওপর বেশ একটু আমার মায়া হল। একটু বেশী করেই নিদ্রা যাক না। পরে জাগলেই হবে। আমার স্যুট পরে প্রস্তুত হতে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ৮টায় গাড়ী এসে আমাদের মাদ্রিদে নিয়ে যাবে। এর মধ্যে আমাদের ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নিতে হবে। ডাকতে বাধ্য হলাম। ভদ্রমহিলা উঠেই বললেন যে তাঁকে এর অনেক পূর্বেই জাগানো উচিত ছিল। তিনি বাথরুমে গেলেন, আমি দরজা বন্ধ করে গতকালের কাফের থালাটি ব্যাগের মধ্যে পুরে কাফেতে ঢুকলাম। কেউ কোথায় নেই, সব ফাঁকা। গতকাল যে কাফেটি এত কোলাহল-মুখরিত ছিল আজ সেখানে একজনও নেই। শুধু দোকানের মালিকের ছেলেটি বসে রয়েছে। আর একটি ঝাড়ুদার ঘরগুলো পরিষ্কার করছে। আমি থালাটা দিতে আমায় আমার সব পয়সাটা ফেরত দিয়ে দিলে। আমি পয়সাকটি নিয়ে হোটেলে ম্যানেজারের সঙ্গে টুরের টিকিট কিনলাম। মাদ্রিদ শহর, রাজার বাড়ী আর প্রাডো (Prado) যাদুঘরটি ঘোরাবার জন্যে আমার কাছ থেকে পাঁচশত পিয়েসটাস (Peastas) নিয়ে তিনি দুটি টিকিট দিলেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল এদেশের বিখ্যাত ষণ্ড-যুদ্ধ (Bull fight) দেখব। কিন্তু এর জন্যে টিকিট পেলাম না। কারণ ষণ্ডযুদ্ধ মার্চ মাস থেকে আরম্ভ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে হয় না। আমরা এখানে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে পৌঁছেছি। ষণ্ডযুদ্ধ দেখতে এক এক জনের টিকিটের দাম সাতশত পঞ্চাশ পিয়েসটাস পড়ে। আমেরিকান ডলারের প্রায় দশ ডলার পড়ে।

সকাল ঠিক আটটায় বয় ব্রেকফাষ্ট ঘরের মধ্যে দিয়ে গেল। রুটি, মাখন, জ্যাম আর গরম কফি ও চা। গৃহিণী চা পান করেন, আমি পান করি কফি। আমার হলেও চলে, না হলেও চলে। তবে বিনা পয়সার কফিটা ছাড়তে আমি রাজী নই। আমরা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে লাউঞ্জে গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ পরে আমাদের টুরিষ্ট সেণ্টারে নিয়ে যাবার জন্যে একটি ট্যাক্সি এল। আমরা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সিটি এঁকে বেঁকে এ গলি সে গলি দিয়ে আমাদের টুরিষ্ট কেন্দ্রে নিয়ে এল। এই সরু সরু গলিগুলো পুরাতন মাদ্রিদের মধ্যে অবস্থিত। এই সব সরু সরু আর ঘোরানো গলিগুলো আমাদের হাওড়ার কদমতলার অনেক গলিকেও হার মানিয়ে দেয়। এই টুরিষ্ট সেণ্টারের নাম Pulmantur Terminal। এটি একটি বড় বাগানের ধারে একটি বড় বাড়ীর মধ্যে অবস্থিত। টুরিষ্টদের কাছ থেকে অনেক পয়সা এরা রোজগার করে থাকে। এদের বাসগুলো বেশ বড় বড় ও নতুনের মত দেখতে। নানা জায়গার টুরে এখান থেকেই যাওয়া হয়। এখান থেকে টুরিষ্টরা Toledo, Diaria, Escorial and Valley of the Fallen, Avila, Segovia and La Granja, Aranjuez প্রভৃতি অনেক জায়গায় যেতে পারেন। অন্যান্য টুরিষ্টরা অন্যান্য জায়গা যাবার জন্য সেইসব বাসে উঠে পড়লেন। আমরা অনেকেই মাদ্রিদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখার জন্যে আর একটা বাসে উঠে পড়লাম। দেখতে দেখতে বাসটার সব আসনগুলোই ভর্তি হয়ে গেল। আমাদের গাড়ীতে ৪৩টা মাত্রই গাড়ীটা ছেড়ে দিল। গাইডটি খুব ভাল ইংরেজীতে কথা বলেন আর সব সময়েই ফ্রাঙ্কো সরকারকে হেয় না করে তিনি কথা শেষ করেন না। যাবার পথে যখন আমরা স্কটল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম, ওখানকার গাইড রাণী এলিজাবেথ ও তাঁর ছেলেমেয়েদের হেয় প্রতিপন্ন না করে ছাড়তেন না। আমরা যখন ওখানে ভ্রমণ করছিলাম তখন রাণী ও তাঁর স্বামী ছেলেমেয়েরা আসবে বলে চারদিকে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিল। গাইডটি রাণীর বিষয়ে অনেক কথা বলে একটা ছড়া কেটে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন তা আজও আমার মনে আছে।

"She is coming to drink honey
with Philips and children form our money" ।

স্কটস্ম্যান গাইডটির কথায় বেশ রস ঝরত। কিন্তু সেই সব রসই রাণীর বিপক্ষে ছিল। রাস্তাটা Bailen Street ও Mayor Street-এ যেতে যেতে গাইডটি আমাদের মাদ্রিদ নগরী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন।

দশম শতাব্দীতে মুরদের তৈরী একটি দুর্গ এখানে ছিল। সেই দুর্গটিকে তাঁরা Madjrit নাম দিয়েছিল। তারই নাম অনুসারে এই সহরের নাম মাদ্রিদ হয়েছে। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রামিরো (Ramiro II of Leon) যুদ্ধ করে এটাকে অধিকার করেন। পরে ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ড রামিরোর বংশধরের কাছ থেকে যুদ্ধ করে তাঁর দখলে আনেন। কিন্তু ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ আলফনসো (Alfonso VI) এটাকে স্থায়ীভাবে তাঁর দখলে নিয়ে এসে এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। ১১১৮ সালে এ জায়গাটার খুব উন্নতি সাধন হয়। এখানেই Trastamara-র তৃতীয় হেনরী রাজমুকুট পরেন। এখানে প্রথম আইনসভা ১৩২৯ সালে বসে। এটা Toledo রাজ্যের মধ্যে ছিল কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপস্ এটিকে Toledo থেকে বিচ্ছিন্ন করে ১৫১৬ সালে স্পেনের রাজধানী করলেন। মাদ্রিদের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে Manzanares নদীটি। এই শহরটী Meseta মালভূমিতে অবস্থিত। সমুদ্রতট থেকে শহরটি ২০৪২ ফুট উঁচু। এর লোকসংখ্যা ১৯ লক্ষের ওপর। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে। এখানে ৫১ মাইলের বেশী সাবওয়ে আছে। এখানে শীতকাল খুব দীর্ঘ ও শীতল কিন্তু শুষ্ক। গরমকালে খুবই গরম পড়ে। এই শহরের আশেপাশে বিমান তৈরীর কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, রেডিও, টেলিফোন ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানা আছে। তারপর টিনের খাদ্য তৈরীর কারখানাও আছে। স্পেনের এটি একটি কৃষ্টিকেন্দ্র। Puertadel Square এই শহরের কেন্দ্রস্থল ও এখানে বড় বড় অফিস রয়েছে। এই শহরে দেখবার অনেক দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত Cathedral Calle de Toledo, ১৫০৮ সালে তৈরী মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় এখানে ৪৫,০০ ছাত্র পড়াশোনা করে থাকে। এখানে একটি লাইব্রেরী আছে তার মধ্যে বই সংগ্রহ রয়েছে তার সংখ্যা চার লক্ষ আশী হাজার। ইউরোপের মধ্যে ছাত্রদের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এটিই সব চেয়ে বড়। ১৭১৪ সালের Royal Spain Academy, ১৭৩৮ সালের Royal Academy of History, National Museum of Modern Art এর মধ্যে Pablo Picasso-র অঙ্কিত ছবি রয়েছে আর আছে Prado Museum।

আমরা ওঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেণ্ট জেরোনিমো ষ্ট্রীট, পার্লিয়ামেন্ট স্কোয়ার দিয়ে ক্যানোভাস স্কোয়ারে এসে পৌছলাম। এই জায়গাটিকে Neptuno Square-ও বলা হয়ে থাকে। এইখানে এসেই আমরা প্রথম নামি। আর একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা প্র্যাডো যাদুঘরের সামনে এসে পৌছলাম। আমরা যাদুঘরটিতে ডানদিকের ফটক দিয়ে ঢুকলাম। মনে হয় সামনের ফটক দিয়ে কেউ ঢোকে না। এর সামনে একটি সুন্দর উদ্যান ও অনেকগুলি শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি রয়েছে। আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকলাম তার সামনেই রয়েছে শিল্পী Goya-র বড় একটা মর্ম্মরমূর্ত্তি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভেতরে যাবার জন্যে প্রবেশপত্র কিনতে হয়। আমাদের গাইড ভদ্রলোক আমাদের প্রবেশপত্র কিনে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। এর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখলাম। ভাল ভাল নাম করা ছবির সামনে গিয়ে গাইড ভদ্রলোকটির বক্তৃতা শুনলাম। তবে প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে যা দেখে এসেছি তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। লুভর তুলনাহীন।

এখানে Rogier van der Weyden-এর Descent of the Cross দেখলাম, পরণের বস্ত্রটির প্রত্যেক ভাঁজটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে তা দেখলে সত্যই আশ্চর্য্য লাগে। এই ছবিটি তৈরী হয় ১৪৩৫ সালে। শিল্পীর জন্ম ১৩৯৯ সালে ও মৃত্যু হয় ১৪৬৪ সালে। তারপর দেখলাম Goyaর el Aquelarre, La Maja des Nuda, আর Los Fusila Mientos del de Mayo ছবিগুলি। এত সুন্দর যা লেখায় বোঝান যায় না।

তারপর শিল্পী Ribera-র Martirio de san Bartolome, শিল্পী Murillo-র Immaculada, শিল্পী Velazquez-এর Los Borrachos, Cristo Crucificado, Las Danzas, শিল্পী El Greco-র Cristo con la Cruz, El Caballero de la Mano en el Pecho ও শিল্পী Zurbaran-র Santa Casilda. আরও অনেক শিল্পীর ছবি আমরা দেখে প্র্যাডো ছাড়লাম। আসবার সময় এখানকার কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কয়েকটি ছবি কিনে নিলাম। এরপর আমরা ৭৮১ সালে তৈরী বোটানিকাল গার্ডেনের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম। এই উদ্যানটি তৃতীয় চার্লসের এখানে আগমনের সময় তৈরী হয়েছিল। মেয়র স্ট্রীটের নিকট Plazza Mayor, যেটি আসবার সময় দেখে এসেছিলাম সেখানে সকালে বাজার বসে, সন্ধ্যায় এখানে জনসাধারণেরা বেড়ান। এটি ৪০০শত ফুট চওড়া ও লম্বায় ৫০০ শত ফুট। এটি তৃতীয় ফিলিপ তৈরী করেন এবং তৈরীর সময় লেগেছিল দুবছর (১৬১৭-১৬১৯ সাল)। এখানে তিনি প্রথমে ষণ্ডযুদ্ধ দেখতেন। মাদ্রিদে দুটি ষণ্ডযুদ্ধের (Bullfight Ring) জায়গা আছে। একটি এখন ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে Plaza de Toros-এ। এই Plaza de Toros-এতেই অনেক ষাঁড় রয়েছে। সেখানে থেকে বাছাই করে একটি ষাঁড় অপরাহ্নে লড়াই করবার জন্যে রেখে দেওয়া হয়। তারপর লড়াই-এর পর মেরে ফেলা হয় বলে তাকে জবাই করার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা ছোট গির্জা আছে, সেখানে ষণ্ডযোদ্ধারা যুদ্ধ করবার পূর্বে প্রার্থনা করে থাকেন। তারপর সেখানে একটা যাদুঘর আছে। সেই যাদুঘরে ষণ্ডযুদ্ধের ইতিহাস আর অন্যান্য দর্শনীয় জিনিস দেখান হয়ে থাকে। এইসব দেখানর পর সকল টুরিষ্টের আহার দেওয়া হয়, তারপর স্পেনদেশীয় নৃত্যগীত দেখিয়ে টুর শেষ করা হয়। প্রত্যেকের খরচ পড়ে ১১০০ পিয়েসটাস। এটি সত্যই দেখবার জিনিস কিন্তু মার্চ মাস থেকে এটি আরম্ভ হয়ে থাকে। শীতের পূর্বেই ষণ্ডযুদ্ধ (bull fight) বন্ধ হয়ে যায়।

এই মাদ্রিদ শহরে Cervantes-এর মর্ম্মর মূর্ত্তি রয়েছে। ওঁর পুরো নাম Miguel de Cervantes Saavedra। ওঁর জন্ম ১৫৪৭ সালে, মৃত্যু ১৬১৬ সালে। স্পেনের Alcala de Henares নামক জায়গায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৬০৫ সালে ডন কুইক্সোট (Don Quixhote) বইটি মাদ্রিদে রচনা করে বিখ্যাত হন। এই শহরের সাত মাইল উত্তরে প্র্যাডো রাজপ্রাসাদ। জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো বাস করেন। এখানে আমাদের সময়াভাবে যাওয়া হয় নি।

আমরা Cibeles Square, Alcala Street, Jose Antonio Avenue, Spain Square দিয়ে আবার Bailen Street-এ ফিরে এলাম। এর কাছেই আমাদের দর্শনীয় স্থান হচ্ছে রাজপ্রাসাদ। রাজাদের নিজস্ব ঘরগুলি ছাড়া অন্য সব ঘরে আমাদের প্রবেশ করা যায়। সেইসব নিজস্ব ঘরগুলিতে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো অন্যান্য দেশের রাজারাণী প্রেসিডেন্ট ও বড় বড় শাহজাদা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এদেশে বেড়াতে এলে তাঁদের থাকতে দেন। এখানে তাঁদের থাকবার জন্যে সুন্দর বন্দোবস্ত আছে গাইড জানালেন। এখানে আমাদের ক্যামেরা ছাতা ব্যাগ জমা দিতে হল। প্রবেশপত্র এখানেও লাগে। আমাদের গাইড ভদ্রলোকটি প্রবেশপত্র কিনে আনতে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমরা বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম।

মাদ্রিদের রাজবাড়ীতে ঢুকতে গেলেই সামনে পড়ে Campo del Moro নামে সুন্দর সুসজ্জিত উদ্যানটি। এর মধ্যে অনেকগুলি পুরনো দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি, ফোয়ারা, কতগুলি পাথরে তৈরী বসবার জায়গা আর চতুর্দিকে সবুজ বৃক্ষরাজি ও পুষ্পে ভরা সবুজ মাঠ রয়েছে। এখানে অনেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে এসেছেন দেখতে পেলাম। রাজবাড়ীর ঢোকবার ফটকটি পার হলেই ভেতরে রয়েছে ৫০ মিটারের মত খোলা ময়দান। ময়দানটির তিনদিকে বড় বড় উঁচু বাড়ী দিয়ে ঘেরা। আর একপাশে বেড়াবার জন্যে বড় বড় থামওলা খোলা বারান্দা। এখান থেকে অনেক নীচে

Manzanares নদী ও তার উপত্যকাটি সত্যই মনোমুগ্ধকর। একটু দূরে পাহাড়ের শ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে. সামনে সুউচ্চ রাজবাড়ী, এর চূড়ায় একটি কারুকার্যখচিত বড় ঘড়ি সময় নির্দেশ করছে। রাজবাড়ীতে ঢোকবার মুখেই রয়েছে দুজন সশস্ত্র প্রহরী। এই রাজবাড়ীটি দেখলে অষ্ট্রিয়ার রাজপ্রাসাদ Alcazar-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা প্রথমে আসবার সময় সেখানে ঘুরে এসেছিলাম। প্রবেশপথে হাতে নিয়ে গাইড আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। রাজবাড়ীর ঘরগুলো ঘোরাবার পূর্বে আমাদের এই রাজবাড়ীর ইতিহাস ছোট্ট করে জানিয়ে দিলেন, তা আমি আমার নোট বইতে টুকে রাখলাম।

এইখানে একাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মুরদের একটি দুর্গ ছিল তার নাম ছিল Alcazabar দুর্গ। এই দুর্গে রাজা ও রাজপুত্রেরা এসে শিকার করতেন ও কিছুদিন আনন্দ উপভোগ করে তাঁরা ফিরে যেতেন। সেইসময় El Prado ও মাদ্রিদের জঙ্গলে অনেক জন্তু জানোয়ারের আবাসস্থল ছিল। এখন সেখানে বড় বড় সুউচ্চ অট্টালিকা আর জনারণ্যে ভর্তি করে গেছে। তারপর এটি Trastamara রাজত্বের সময় দ্বিতীয় হেনরী, জন, ও চতুর্থ হেনরী) এই দুর্গটি রাজপ্রাসাদে পরিণত হল। রাজা ফার্দিনান্দ (Ferdinand) ও রাণী ইসাবেলা এই রাজপ্রাসাদে কিছু কাল বাস করেন। এর পরে পঞ্চম চার্লস ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ-এর সময়ে এই দুর্গটি একেবারে রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়। তাঁরা এর অনেক উন্নতি সাধন করে গেছেন।

রাজা চার্লসের সময়ে এই রাজবাড়ীটির তৈরী করবার সমস্ত দায়িত্ব পড়ে তখনকার দিনের বিখ্যাত স্থপতি Luis de Vega ও Alfonso Convairrubias-এর ওপর। তারপর দ্বিতীয় ফিলিপের উপদেশে কাজ করতেন স্থপতিগণ Juan Bantista de Toledo, Juan de Herrera ও Francisco de Mora। তৃতীয় ফিলিপের সময়ে স্থাপত্যবিদ Juan Gonez de Mora কাজ করেন।

১৫৫১ সালে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর বিচারালয়টি মাদ্রিদে স্থানান্তরিত করেন কিন্তু সেই রাজপ্রাসাদ দৈবক্রমে ১৭৩৪ সালে ২৪শে ডিসেম্বর অগ্নিতে একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়, তার আর কোন চিহ্নই ছিল না। এর পর পঞ্চম ফিলিপ একটি নতুন প্রাসাদ তৈরী করতে আদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, এমন প্রাসাদ তৈরী করতে হবে যা সারা ইউরোপে কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। তিনি তাঁর এই রাজপ্রাসাদ তৈরী করবার সমস্ত ভার বিখ্যাত স্থপতি Abbe Philip Juvara-র হাতে তুলে দিলেন। ইনি একজন ইতালীবাসী ছিলেন। ইনি রাজপ্রাসাদটি তৈরী করবার পূর্বেই ১৭৩৬ সালে মারা যান। এঁর মৃত্যুর পর এঁরই ছাত্র Juanকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি এসে নতুন একটি নকশা তৈরী করলেন অগ্নিতে ভস্মীভূত হবার ভয়ে এটি সম্পূর্ণভাবে শ্বেত প্রস্তর দিয়ে তৈরী করা হ'ল। অবশ্য এই শ্বেত প্রস্তরের সঙ্গে গ্রানাইটও রয়েছে!

এই প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে পাঁচটা বড় বড় দরজা রয়েছে। এই দিক দিয়েই রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। ভিতরে প্রবেশ করেই বড় একটি ময়দান পড়ে তা পূর্বেই বলেছি। পূর্বে sun dial ত আছে, এখন একটি বড় ঘড়ি রয়েছে। নীচে একটি স্ট্যাচু রয়েছে, তার পদতলে একটি বৃদ্ধ নতজানু হয়ে আছে; স্পেনের পদতলে টাজো (Tajo) নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে, এটাই এখানে বোঝানো হয়েছে। উত্তর দিকের প্রবেশ পথে রয়েছে মাতা মেরীর একটি মূর্তি।

আমরা প্রাসাদটার মধ্যে ঢুকে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। প্রথমেই পড়ে Albardiero-র প্রকাণ্ড হল ঘর, তারপর পরপর pillared হল, ছোট একটা বৈঠকখানা ঘর, ante-chamber ও Gasparini ড্রয়িং রুম, দ্বিতীয় চার্লসের বসবার ঘর, porcelain রুম, yellow রুম, তারপর পশ্চিমদিকে রয়েছে মস্তবড় খাবার ঘর, এরপর tapestry গ্যালারীর মধ্যে দিয়ে আমরা বাইরে চলে এলাম। যে-সমস্ত

ঘরগুলো আমরা দেখলাম সেই সব ঘরের মধ্যে রয়েছে সুন্দর সুন্দর পুরণো আসবাবপত্র, বাতিদান, ট্যাপেষ্ট্রী আর বড় বড় সুন্দর সুন্দর গালচে। এই সব জিনিষপত্র রাজাদের বিভিন্ন সময়ে তাঁদের রুচি অনুযায়ী ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সব তৈরী করা হয়েছে। এই সব ঘরের মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দামী হস্ত অঙ্কিত ছবি রয়েছে। সেই সব ছবিগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্পীদের তৈরী ছবি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন Corrdo, Antonio, Raphael, Juna আর স্পেন দেশীয় শিল্পী Freanisco, Mariano, Autonio Gonzalez ও Vincente Lopez। আর ট্যাপেষ্ট্রীগুলি এঁকেছিলেন ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর ফ্লেমিশ শিল্পীগণ। আর যে সব জিনিষ তাঁতে তৈরী করা হয়েছে সেগুলি এত সুন্দর যে লেখায় তা প্রকাশ করা যায় না। এগুলি সব অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছে। এই ট্যাপেষ্ট্রীর ওপর শিল্পীরা অনেক গল্পের কাহিনী অঙ্কিত করেছিলেন। যেমন রয়েছে Cristina-র গার্ডেন চেম্বারে Story of Psyche ও ছেলেমেয়েদের খেলা, Gun room-এ রয়েছে Story of Scipion, Halbardier-এর রুমে রয়েছে চার ঋতু (four seasons), এবং ভাল দেখবার জিনিষ। Tapestry গ্যালারীতে Cervantes-র ডন-কুইক্-জোট (Don Quixhote) এর পুরো গল্পটা আঁকা রয়েছে। State Dining room আর Cristina-র শোবার ঘরে অনেক ট্যাপেষ্ট্রীর ওপর অঙ্কিত ছবি দেখলাম। তারপর চতুর্থ চার্লসের বসবার ঘরে ট্যাপেষ্ট্রীর ওপর অঙ্কিত Alchemist ও Grape Harvest ছবি দুটি। রাণী Cristina-র ante chamber-এ রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৈরী ট্রোজান যুদ্ধের বীরদের ছবি। তাঁদের ছবিগুলি দেখলে মনে হয় যে তাঁরা যেন সব জীবন্ত। এরপর ঘরে ঘরে রয়েছে রাজাদের রাণীদের ও রাজপুত্র রাজকন্যাদের হস্ত-অঙ্কিত ছবিগুলি। তখনকার দিনের বিখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত এই সব ছবিগুলি। তারপর রয়েছে নানা রকমের chandeliers, candelabra, কয়েক শত বছরের পুরণো বড় ঘড়ি ও পরিসিলেনের বাসনপত্র জিনিসপত্র সে এক অপূর্ব। এরাও দর্শকদের দেখাবার জন্যে যত্ন করে সব রেখে দিয়েছে। ঘরের মেঝেগুলি সব ভাল ভাল মার্বেল আর মোজেক দিয়ে তৈরী আর সেগুলি সব দামী দামী গালচে দিয়ে মোড়া। এই গালচেগুলো সুতো ও ভাল পশম দিয়ে তৈরী। যেগুলি পশম দিয়ে তৈরী সেগুলি ষষ্ঠ ফার্ডিন্যাণ্ড ও দ্বিতীয় ফিলিপ-এর সময় থেকে আছে। আর অন্যান্য যে সব ট্যাপেষ্ট্রী দেখলাম সেগুলি মাদ্রিদের Royal Tapestry Loom থেকে আনা হয়।

নীচের তলায় লাইব্রেরী রয়েছে। এটি রাজার নিজস্ব লাইব্রেরী ছিল। এখানে নানা রকমের অমূল্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। বস্তুর ওপর নানা রকমের নকশা করা কাজ, নানা দেশবিদেশের পুরণো দিনের মুদ্রা, মেডেল ও আরও অসংখ্য মূল্যবান্ জিনিস আর-একটি ঘরে রয়েছে। তারপর রয়েছে অস্ত্রশস্ত্রের ঘর। এখানে অনেক পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেলাম। এই সব দেখে আমরা ফিরে এলাম।

এই অপূর্ব জিনিসগুলি এই রকম ভাবে যদি রাজারা সংগ্রহ না করে রাখতেন তাহলে তাঁদের সময়কার অনেক জিনিস লোকচক্ষুর গোচরে আর আসত না, ইতিহাসে আর তাঁরা কোনদিনই স্থান পেতেন না। ফেরবার পথে শুধু আমাদের মনে হ'তে লাগল যে যা দেখলাম তা অপূর্ব, তা তুলনাহীন।

সেদিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ওদের একটি বড় সিনেমা গৃহে একটি ইতালীয় ছবি দেখি। ছবিটি সার্কাসের অতীত ও বর্তমান ক্লাউনদের সাক্ষাৎকারের জীবনী গাথা। ছবিটি স্পেন ভাষায় ডাব করা হয়েছে। সিনেমা গৃহের মধ্যে আমাদের এদেশের ছেলেমেয়েদের মতনই হৈহল্লায় পূর্ণ। তবে সিনেমা দেখবার সময় এরা সব চুপচাপ, তবে বাদামভাজা, তরমুজের বিচি ভাজা, আইসক্রীম, চকোলেট, লজেন্স খাওয়াটা সব সময়েই চলছে বুঝতে পারি। প্রেক্ষাগৃহের একটিও

আসন শূন্য ছিল না। আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেও গিয়েছি। কয়েকটি আসন ছাড়া প্রায়ই সবই শূন্য পড়ে থাকে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম একটি কাফেতে। এই কাফেটি সকাল দশটা থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে। আমরা গিয়ে ভাত আর মাছভাজা চাইলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে আমাদের মাছভাজা আলুভাজা আর ভাত দিয়ে গেল। কিন্তু মাছের ওপর শূকরের মাংস বেশ খানিকটা রয়েছে দেখতে পেলাম। আমরা যে মাংসটা খাই না তা তাদের বুঝিয়ে বললাম। অল্প কয়েকটি ইংরেজী কথা জানে। বুঝতে তাদের কষ্ট হ'ল না। স্বয়ং মালিক এসে আমাদের দুটি ডিশ তুলে নিয়ে গেলেন। আমাদের আবার প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল দুটি মাছ ভাজার জন্যে। আবার নতুন করে দুটো টাটকা মাছ আমাদের ভেজে দিয়ে গেল। অনেকদিন পরে নদীর টাটকা মাছভাজা খেয়ে রসনার তৃপ্তি হ'ল। অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিংড়ি মাছের খোলা পায়ের কাছে ফেলে চিংড়ি মাছ আর লাল পানীয় খাচ্ছে দেখলাম। দিনের আলোতে এদের মেয়ে-পুরুষদের খুব সুন্দর লাগল। এদের মেয়েরা বেশ সুন্দরী আর পুরুষেরা বেশ সুপুরুষ বলে মনে হ'ল। অন্যান্য টেবিলগুলো সব খদ্দেরে ভর্তি, সকলের মুখ চলছে। আমাদের দুজনের মাছভাজা আলুভাজা আর দুটি করে ভাত খেতে লাগল চার ডলার। পাওনা মিটিয়ে আমরা হোটেলে চলে এলাম।

দুপুরের পর আমরা হোটেল ছেড়ে বিমান পথে রোমের অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথে আমাদের বিমানটি বার্সিলোনা বিমান বন্দরে কিছুক্ষণ থেমে রোম অভিমুখে যাত্রা করল।

মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের সুপ্রাচীন সম্পর্ক

সুধীন্দ্রকুমার কাব্যসাংখ্যতীর্থ

কালজয়ী জাম্বুবান ও জম্বু বৃক্ষের নামাঙ্কিত পৌরাণিক এক সুবিশ্রুত নাম জম্বুদ্বীপ। অশোকের কালেও ভারতের নাম ছিল। এক প্রাচীনতম নাম। এক প্রাচীনতম দ্বীপেরই নামে। বহু দশ লক্ষ বছরের আগেকার পৃথিবীর বিলীয়মান স্মৃতির শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তবু আজও একেবারে মুছে যায় নি।

আমাদের চিরযৌবনা পৃথিবীর বয়স মাত্র পাঁচশো কোটি বছর অন্ততপক্ষে। মাদ্রাজের 'চারনোকাইট' নামের এক বিশিষ্ট শিলা বা ভূগর্ভস্থ পতিত প্রস্তরেরই বয়স ২৬০ কোটি বছর। প্রাচীনতম রকের বয়স সাড়ে-তিনশো কোটি বছর। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই কাল নির্ণীত। কল্পনার স্থান ক্রমেই সীমিত হয়ে যাচ্ছে। রূপকথারও চেয়ে বহু বৈজ্ঞানিক সত্য তথ্য কম অদ্ভুত নয়। প্রচলিত ও জনপ্রিয় বহু পৌরাণিক ও ধর্মীয় সংস্কারেরও মূলে করে তা প্রচণ্ড আঘাত। কিন্তু সত্যকেই করে প্রতিষ্ঠিত। অপ্রিয় হলেও নিরূপিত সত্যকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীই বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশারদ হলেই কেউ অন্ধ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিরোধী সংস্কার হতে মুক্ত হয় না। বহু বৈজ্ঞানিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত অনেক পণ্ডিত আজও অল্পবিস্তর প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব হতে মুক্ত নন। তাঁদের লেখাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তথ্যের সঙ্গে নির্বিচারে বা সত্য মিথ্যা জড়িয়ে মিশে যায় সংস্কারেরই ঘোরে নানা অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা। এমন কি পুরাতন বাইবেলীয়, ইরাণীয় বা গ্রীক পুরাণের রূপকথাও। তাই তথ্য হতে অপ্রমাণিত সব কিছুই পৃথক করে দেখানো দরকার। তাতে রূপকথারও যদি কিছু সত্যকার বাস্তব ভিত্তি থাকে তা স্বতন্ত্রভাবে নিরূপিত হতে পারে।

ষষ্ঠ শতকের পারসী লিপিতে ইরাণ সম্রাটের সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল শোগধিয়ার পারে 'শকে' বা শকভূমি হতে কুশদ্বীপ (NUBIA বা নাভীয়) এবং সিন্ধুদেশ হতে 'স্পাডা' বা স্পার্টা। স্পার্টা সম্ভবত আদিতে স্পার্ত্তা অর্থাৎ অস্পরতা অশ্ব দ্বারা কর্ষিত ভূমি। অররতের মত। অর অর্থাৎ লাঙ্গল রত। এই সম্রাট আজও আমাদের ইতিহাসে 'দারিয়ুস' বা 'দারিয়স' এই ভুল নামে পরিচিত। গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত নামে। অথচ আমাদেরই প্রতিবেশী ও ভারতের সঙ্গে সুপ্রাচীন কাল হতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বহুকাল আগেই পারসী লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত ইরাণীয় নাম আজও অজানা বললেই চলে অন্তত অনেকেরই কাছে। যদিও তাঁর নামটি ভারতেরই ঋগ্বেদী কালের এক প্রাচীন 'জন' গোষ্ঠী 'দ্রুহ্যু' দ্রুহ্যুক দেরই নাম। প্রকৃত নাম 'দহ্যুস্ব'। দরয়বউষ' এই পাঠও আগে পড়া হয়েছে- কিন্তু তাঁর যথার্থ নামের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর নিজস্ব পরিচয়ে। তাঁকে এই ঐতিহাসিক লিপিতে বলা হয়েছে 'দহ্যুনাম্ দহ্যুপতি' 'ক্ষয়াথিয়ানাম্ ক্ষয়াথিয়' ও 'হথমানিষিয়'। অর্থাৎ দহ্যুদের দহ্যুপতি—ও ক্ষয়াথিয়দের ক্ষয়াথিয় ও শক মনুষ্য। দ্রুহ্যু হয়েছে 'দহ্যু', ক্ষত্রিয় হয়েছে ক্ষয়াথিয়। শক ইরাণীয় উচ্চারণে হথ হয়েছে। সিন্ধু হিন্দুর মত।

পার্স ভারত কৃষ্টির পক্ষে গৌরবজনক নাম গ্রীক নামের মধ্যে ডুবে গেছে, কম খেদের কথা নয়। এর চেয়েও বেশী দুঃখের বিষয় যে ভারতীয় ক্ষত্র-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে

অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ এশিয়া মাইনর, পশ্চিম এশিয়া, সুমের, বাবিলন, মিশরের সুপ্রাচীন 'খেত' (ক্ষেত) 'খাত্তি' (ক্ষাত্তি ক্ষত্র) ক্ষাত্তি জনের রাজ্য ও সাম্রাজ্যের নামগুলি পুরাতন বাইবেলের ভুল নাম-'হেত' 'হিট্টাইট' 'হাট্টি'র মধ্যে হারিয়ে গেছে। ক্ষাত্তিদের সম্বন্ধে ভুলে ভরা বিকৃত ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ বাইবেলীয় পুরাণ-কাহিনীতেও। অর্বাচীন ইহুদী খৃষ্টান লেখকদের কোন জ্ঞানই ছিল না সেকালেরও ক্ষাত্তিদের সুপ্রাচীন রাজ্য সুবিশাল সাম্রাজ্য সভ্যতা কৃষ্টির সম্বন্ধে। তাদের রাজ্য ও সাম্রাজ্য খৃঃ পূঃ তিন সহস্রক হতে দুই সহস্রকের হলেও। 'কিউনিফর্ম' লিপিতে আন্তর্জাতিক ভাষাসহ তাদেরই নিজস্ব গৌরবপূর্ণ ভাষাগুলি এবং লিখিত বিবরণাদি তৃতীয় সহস্রকের শেষের দিক হতে বর্তমান ছিল তাও আজ প্রামাণ্য ইতিহাসের অন্তর্গত। ইহুদীদের এক সর্বপ্রাচীন পুরুষ আব্রাহাম সেকালের বা তারই কাছাকাছি পরবর্ত্তীকালের হলেও তাঁরও সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানই ছিল না। তবু ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরাই নয়,বহু খ্যাতনামা ও এমন কি ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও আজও তাঁদের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে সেই ভুলে ভরা পুরাণ-কাহিনীর ভুল শব্দগুলিই ব্যবহার করে চলেছেন। বাইবেলী পুরাণকথার উল্লেখও পদে পদে। আমাদের পুরাণগুলি অনেক বেশী ভৌগোলিক, প্রাক্‌ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ হলেও প্রসঙ্গ-ক্রমে তার উল্লেখ খুব কমই। ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা ও তথ্যের উল্লেখ তো দূরের কথা, দেশ-বিদেশের প্রাক্‌ইতিহাস ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার বৈজ্ঞানিক বিচার তো আরও দূরের।

দ্রুহ্যরা ঋগ্বৈদিক ও পৌরাণিক দ্রুহ্যু 'জন'। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৬ সূক্তের অষ্টম ঋগেদে দ্রুহ্যু ও পুরুদের একত্রে বড় যোদ্ধা বলা হয়েছে। প্রাচীনতম সপ্তর্ষির অন্যতম ভরদ্বাজ ইন্দ্রের মন্ত্রণাদাতা ও সহায় বৃহস্পতির পুত্র। ইনি তুর্বসুদের সঙ্গে 'দ্রুহ্যাবা জনের' কথা বলেছেন সুবিখ্যাত সূক্ত-রচয়িতা কণ্বেদের জনক কণ্বেরও প্রসঙ্গে। তারই আগের ঋকে 'নাহুষী' ("নাহুষীষ্বা") জনেরই শুধু নয় "পঞ্চক্ষিতীনাং" পঞ্চক্ষিতিগণের বিভিন্ন কৃষ্টির বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। কণ্ব কাণ্ব ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সুপ্রাচীন ঋষিদের, সেকালের জনগণের, ইন্দ্র অগ্নি মরুৎ অশ্বিনীগণের চর্ষণীদের দিক্‌বিজয়ী এত সব পিতৃপুরুষ শূর বীরদের কীর্তি কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে পঞ্চ ক্ষিতির কৃষ্টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চক্ষিতি খুব সম্ভব ক্ষাত্তিদেরও পঞ্চপুর রাষ্ট্র নগর রাজ্য। তার মধ্যে খৃঃ পূঃ ত্রিসহস্রক হতে দ্বিসহস্রকের মধ্যে খ্যাত রাজ্যগুলি 'পুরুষখণ্ড', 'আর্ষ্টিব', কুশব, লব, প্রল, অম্বাব, কণেশ প্রভৃতি। ঋগ্বেদেই পরে সপ্ত ক্ষিতিরও কথা আছে। ক্ষাত্তি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সেকালের সুবিশ্রুত নগরী ক্ষাত্তুশাশ অর্থাৎ ক্ষাত্তিদের শাসনক্ষেত্র। পরবর্তী নাম, বর্তমানেও একই ভগজ্কুই বা ভগজকুই। ক্ষাত্তিদের পশ্চিম এশিয়ার ঋগ্বেদীকালের ভারতের বিখ্যাত দেব ভগের নামে। ভগজকুই হতে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীরে সোভিয়েত তুর্কমেনিয়ার ক্ষাত্তুশাশের সুদূর উত্তর পূর্বে 'করভাজজল'। অপর দিকে আরও সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে সৌরাষ্ট্রে আরব সমুদ্র তীরে হরোপ্পা সভ্যতার ভগত্রভে। আর্ষব হতে আর্যাবর্ত। কুশব হতে কুশস্থলী মধ্যভারতে। পুরুষ খণ্ডেই হয়তো ছিল আরো প্রাচীন পুরুরাজ্য ঋগ্বেদে অসংখ্য ঋকে যার কাহিনী ভারতের সুবিখ্যাত পুরুজন-দের পৌরব বংশ। বুধ বা চন্দ্র ও অপ্সরী ইলা পুত্র পুরুরবা ও অপ্সরী উর্বশীর চন্দ্রবংশ। হয়তো অপর পুরুরাজ্য পরে খণ্ড হয়ে হয়েছিল পুরুষখণ্ড। ক্ষাত্তি রাজ্যের ভূপতি লবর্ণেশ দ্বিতীয় সহস্রকের (খৃঃ পূঃ) প্রথমার্দ্ধের নৃপতি। তাঁরই নামে ভূমধ্যের পূর্ব তীরে লবর্ণ পরে লেবাননে রূপান্তরিত হয়েছে। ইউক্রেনের পুরুত্তু তীরে ক্ষাত্তিদের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী কর কামীশ কাশুকর কামীশ কাশুকর কুরুদের নামে।

টলেমির ভূগোল মতেও 'শোগ্ডিয়ানার' উর্ধ্বে পার্বত্য বনভূমিতে যাযাবর শকদের এবং নিম্নভূমি শোগ্ডিয়ানা (পৌরাণিক সুহ্ম) ও 'শকথিয়া' (শিথিয়া) বা 'শক-স্থানে' প্রাচীন শক সভ্যতার ভূমি। হিমালয় হিন্দু-

কুশেরই পারে। শিরদরিয়া ও অক্ষুর মধ্যবর্তী ছিল এক শকভূমি। অক্ষু ইস্‌সাকুরের নামাঙ্কিত। বর্তমান আমুদরিয়া সম্ভবত অমুর অমরদের নামে। চীনের উত্তর সীমায় পূর্বসাইবিরিয়ায় অমুর ঋঃ বেঃ ৪।৬।২।৭।।৬১।৫) নদী। আমুর উত্তরপথে এক উপনদী শখদরিয়া। শীংকিয়াংগে চীনের তারিম উপত্যকাতেই তীরম কাঙ্গেরির ত্রিশৃঙ্গের (২৪২০০—২৪৫০০ ফুট উচ্চ) উত্তরে 'শকসগণ' উপত্যকা। শিমশাল 'শকসগণ' নিম্ন জলাভূমিও এখানে। এই সঙ্গে স্মরণীয় মনুকন্যা 'মানবীপর্শু'র উল্লেখ ইন্দ্রপুত্র বৃষকপির রচিত ঋগ্বেদের ১০।৮৬।২৩ ঋকে বিংশতি 'সাকং' বা বসতির সঙ্গে। এই সূক্তটি ইন্দ্র ইন্দ্রাণী ও বৃষকপির নামে যুক্তভাবে রচিত। এই সূক্তে 'তিরিন্দির পাশব্য' নামটি পার্শবদের ভূপতি তিরিন্দিরের বা ত্রিইন্দ্রের প্রীতি বৎস কাণ্বের দানস্তুতিতে। ঋঃ বেঃ ৮।৬।৪৬-৪৮ ত্রি শব্দটি পবিত্র শব্দে রূপান্তরিত হবারই প্রাচীনকালে। পাশ পার্শবেরই দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে পাশ উপসাগর তীরে সুপ্রাচীন লিপিবিৎ মানুষদের সুষা। ঋগ্বেদের সুষামণ। ঋঃ বেঃ ৮।২৬।২৮।

ইরাণ-পার্শিয়ার পূবে সন্দক্ষিণে সিন্ধুপ্রদেশ। উত্তরভাগে কান্দাহার গান্ধার আফগানিস্তান চিত্রলকাশ্মীর গিলগীত ঝিলগীত। বর্তমান পাকিস্তান। হরোপ্পা সভ্যতারই পশ্চিম অংশ। দক্ষিণভাগে আরব সাগর তীরে শতকগণদ্বার হতে কিলি মহীআম্মির চন্দুদারো নল মহেঞ্জোদারো কৃষ্টি। উত্তরভাগে বেলুচিস্তানের গণ্ডুতাই কোয়েতা কোব খব্যাবর্তী উপত্যকার কৃষ্টি। বেদপূর্ব আদিবাসী ভারতেরই। এই সব নাম প্রসঙ্গে ঋগ্বেদীয় কালের সিন্ধুদ্বীপের অম্বরীষ পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র" দশম মণ্ডলের নবম সূক্তের রচয়িতারূপে। এই বিশিষ্ট নামগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদীয় কালের সমসাময়িক হরোপ্পা সিন্ধু সভ্যতার শেষ পর্যায় জড়িত। যথাস্থানে তা আলোচ্য। এখানে শুধু লক্ষ্যণীয় 'সিন্ধুদ্বীপ' কথাটি ও তার ভৌগোলিক তাৎপর্য। কুশদ্বীপ শকদ্বীপের মত তখনও ঋগ্বেদী ঋষিদের ও মানুষদের কাছে নিশ্চয়ই সিন্ধুদ্বীপেরই খ্যাতি। এই দ্বীপেরই অস্তিত্ব সেখানে ছিল। প্রাক্‌-ঐতিহাসিক কালেই পৃথিবীর নানাস্থানে বহু দ্বীপ উপদ্বীপ উপসাগর নদনদীর পুরাতন খাতও ক্রমে স্থলভাগে পরিণত হয়েছে। ঋগ্বেদে অন্য কোন দ্বীপের নাম নেই তাও লক্ষ্যণীয়।

বেলুচিস্তান আফগানিস্তান সীমান্তে পাকৃতুনিস্থান। ঋগ্‌বেদীয় কালের ইন্দ্রসাহায্যপুষ্ট 'পকথ'দের বাসভূমি। ঋঃ বেঃ ৬।২০।১৩। ভারতীয় কাশ্মীরের সুপ্রাচীন 'বর্জহম্' (ঋঃ বেঃ ১।৯২।৪) আফগানিস্তান গান্ধারের বদাক্ষণ। চিত্রল ঝিলগীত কাশ্মীর বক্ষণ পামির আফগানিস্তান পারে সোভিয়েত ভূমি। মধ্য এশিয়ায় গতকালের ইসলামী রাজ্যগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার পর হতে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সবগুলি জনপদই বহুকাল পরে নিজ নিজ জাতীয় এলাকায় স্বয়ংশাসিত। সুবিশাল সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসন নিয়ন্ত্রিত হলেও স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য। ১৫টি সোভিয়েত সোসালিষ্ট রিপাবলিকের বৃহত্তম হতে ক্ষুদ্রতম রাজ্যটি সমান অধিকার ও ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেকটি নিজস্ব মন্ত্রীসভা ও সোভিয়েত বিধান পরিষৎ দ্বারা পরিচালিত। নিজ নিজ জাতীয় ভাষাভাষী রাজ্য। দক্ষিণে পাশাপাশি সব ইসলামী রাজ্যে।

উত্তর-পশ্চিম ভারত আফগানিস্তান ইরাণের উত্তর সীমান্তে এই সব স্বতন্ত্র সোভিয়েত রাজ্য। কাশ্যপী-কাশ্য কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে ককেশাসভূমি জর্জিয়া বা গুরজীয়া সোভিয়েত রাজ্য। সুবিখ্যাত ককেশাস পর্বত দক্ষিণ-পূব হতে কোণাকুণি যুক্ত করেছে কৃষ্ণ সাগরকে কাশ্যপ সাগরের সঙ্গে। ককেশাসের দুটি প্রান্ত দুটি সাগরের তীরে। তারই পশ্চিমে উত্তরভাগে জর্জিয়া দক্ষিণে আযরবাইজান বা, আর্যবজনের সোভিয়েত রাজ্য। তারই পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তে আরমেনিয়া সোভিয়েত রাজ্য। তারপর পশ্চিমে তুর্কি। সবকটি রাজ্য ও তুর্কি রাষ্ট্র সুপ্রাচীন ভূভাগ এশিয়া মাইনরেরই অন্তর্গত ছিল। আযরবাইজানের

বিপরীত দিকে কাস্পিয়ানসাগরের পূর্বতীরে সোভিয়েত তুরকমেনিয়া। উত্তরে তুরদের প্রতিবেশী কাস্পের পূর্ব-কূলে কশেশাক কশাক ভূমি কাজাখিস্থান সোভিয়েত রাজ্য। আরব সাগরের দক্ষিণে তুরকমেনিয়ার পূর্ব সীমান্তের আর এক প্রতিবেশী সোভিয়েত রাজ্য আর্যবক খণ্ডবক উজবেকদের উজবেকিস্থান। তারও পূর্ব সীমায় কাজাখিস্তান। উজবেকিস্তান কাজাখিস্তানের দক্ষিণে পূর্ব হতে পশ্চিমে—কিরঘিজ কিরগিজ করগজদের কিরঘিজিয়া সোভিয়েত রাজ্য। তার পশ্চিমে ও দক্ষিণে পৌরাণিক তক্ষক ভূমি তাজিকস্থান সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী রাজ্য। পৃথিবীর ছাদ পামিরের উত্তর পশ্চিমে। তার দক্ষিণে আফগানিস্থান। দক্ষিণ পূর্বে হিন্দুকুশ-পারে অখণ্ড কাশ্মীর ও সপ্তসিন্ধু ভারত। ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে ও হরোপ্পা সভ্যতার পরি-প্রেক্ষিতে অখণ্ড হলেও আজ দ্বিখণ্ড। ইতিহাসের বিচিত্র গতি।

তৈত্তরীয় তাতাররা বিরাট রুশীয় সংযুক্ত সোভিয়েত রাজ্যের অন্তর্গত ৩১টি জাতি বা উপজাতির অন্যতম। তাতার ভূমিও স্বতন্ত্র। 'তাতার' স্বয়ংক্রিয় সোভিয়েত রিপাব্লিক। সব জাতি বা উপজাতিগুলিরই নিজ নিজ নির্দিষ্ট এলাকায় আপন আপন মাতৃভূমিতে অল্পাধিক স্বায়ত্ত শাসন আছে। নিজ নিজ মাতৃভাষায় সকলেরই শিক্ষার ও শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড খণ্ড হয়েও আবার অখণ্ড হয়েছে এবং অখণ্ডই রয়ে গেছে। ভারত এ পথে গেলে সমাজতন্ত্রী রাজ্য না হলেও খণ্ড খণ্ড হত না। কিন্তু সে অন্য প্রশ্ন।

বেদপূর্ব ও পরবর্তী ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট এই সব জনপদের ও দেশের অধিবাসীরা।

বৈজ্ঞানিক ও যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রাচীন কালের মানুষের প্রাথমিক সংগঠনের স্তর হতে নানা বর্ণের ও আকৃতির বিভিন্ন মানুষের ছোট বড় দলগুলিকে যতদূর সম্ভব সঠিক নাম দিতে হলে 'জাতি' শব্দ অবশ্যই পরিহার্য। নানা অন্ধ সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন এই শব্দ। সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতম অর্থে প্রযুক্ত। অন্যায় ভেদাভেদের অনর্থক সৃষ্টিকারী পৃথিবীতে কোন অমিশ্রিত বা তথাকথিত ('pure') শুদ্ধ শোণিত বা বর্ণের কোন মানুষ কোন 'জাতি' নেই কোন কালে ছিলও না। মানুষের প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিকাশের এবং সমাজ সংগঠনের প্রমাণিত-তথ্যভিত্তিক মূল ধারাই তা' হওয়া অসম্ভব করেছে। আকাশ কুসুমেরও চেয়ে।

আদিকাল হতে সব মানুষের সব 'জাতি' 'গোষ্ঠী' বা 'গোত্রের' নরনারীর রং মিশ্রিত। সকলেই বর্ণ সংকর। বর্ণ-ধর্ম ভিত্তিক জাতিভেদের ও তথাকথিত শুদ্ধ শোণিতের দৃষ্টিভঙ্গী হতে এই মূল সত্য, যা অপ্রিয় হলেও, অনস্বীকার্য।—এই পরিপ্রেক্ষিতে ঋগ্বেদ কালেও বারংবার প্রযুক্ত 'জন' শব্দটি এ সব দোষ হতে মুক্ত। 'জনন্' অর্থাৎ আদি ও অকৃত্রিম জন্মানোর ভিত্তিতেই জন। ইংরেজী 'নেশনে'র প্রতিশব্দ রূপে 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে সমগ্র অধিবাসীদের বোঝাতে চললেও চলতে পারে। শুধু বলব জাতিবর্ণ ও গোত্রকুলের দেশে দেশে ও কালে কালে প্রচলিত সংস্কার ও ধারণার ঊর্ধ্বে যদি কোন রাষ্ট্রের সব বর্ণ সব 'জাতি' ও সব মতের অধিবাসীদের সমগ্র রূপটি সত্যিই বোঝাতে হয় তবে 'নেশনের' পরিবর্তে ('people)' জন শব্দের প্রয়োগই বহুগুণে শ্রেয়। 'পিপল' শব্দও অত ব্যাপক নয়।

আমাদের দেশে মূলত শ্রুতিভিত্তিক বেদ অতি প্রাচীন। সর্বকনিষ্ঠ অথর্ব বেদের কোন কোন সূক্ত বা সূক্তাংশ প্রাচীনতম সূক্তগুলির সমকালীন বা তার কাছাকাছি হলেও ঋগ্বেদই সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান মূল ও আদি গ্রন্থ বলেই সুধীগণ-স্বীকৃত। তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন সংহিতা। ছন্দকাল। মন্ত্রকাল তার পরবর্তী। ব্রাহ্মণ কাল তারও পরবর্তী। প্রথম মণ্ডল ও দশম মণ্ডল অন্যান্য মণ্ডলের তুলনায় পরবর্তী বলে সাধারণত গণ্য হলেও এই মণ্ডল দুটিরও ভাব ভাষা

বিষয়বস্তু ও রচয়িতাদের নাম প্রভৃতি সম্যক্ বিচার করলে অনেক সূক্ত ও অসংখ্য ঋক্ প্রাচীনতম বা অতি প্রাচীন বলে গণ্য হতে পারে। অধিকাংশ সব মণ্ডলেরই বহু ঋক্ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভাষাতত্ত্বের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক বিকাশ ও ভারতে ও ভারতের চারিপাশের ও দূরদূরান্তরের প্রাচীন সভ্যতাগুলি ও বিভিন্ন জনগণ সম্বন্ধে ভূগর্ভ-উত্থিত নানাবিধ তথ্যের সর্বাধিক আবিষ্কারের কালেও আমাদের দেশের বহু ভাষাবিৎ ও বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতরাও ঋগ্বেদের সূক্ত ও ঋকগুলির রচনার বিভিন্ন কাল নির্ণয়ের বিশেষ কোন গবেষণাই করেন নি। হরোপ্পা সভ্যতার লিপি পাঠেরও।

হরোপ্পা মহেঞ্জোদারোর মানুষদের অপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক স্বতন্ত্র এক বিশিষ্ট লিপি পাঠের কোন চেষ্টাই আমাদের কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্ববিৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যাবিৎ আজও করেন নি। বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মত এ সব ক্ষেত্রে আজীবন সাধনায় মৌলিক গবেষণায় ও বিচার বিমর্ষে নিমগ্ন থাকা তো দূরের কথা। তাঁদের আজীবন সাধনায় সুমেরু মিশর বাবিলন অসুরীয়ের এশিয়া মাইনর তুর্কি অরমেনীয় ক্রিতের লিপিগুলি পাঠ সম্ভব হয়েছে। সুরাসুর যুদ্ধ-অসুর ক্ষাত্তি মিতান্নি হরি, 'হস্‌সাকু' 'পত্তেসী' গাদি গাথী, কাশ্য কাশশিপী কাশ্যপদের সভ্যতা ও কৃষ্টির উপর নব নব আলোকপাত ঘটেছে। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর দস্যু দানব দৈত্য শক সর্পনাগ আর্য অনার্যের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। নিঋতি যক্ষী লক্ষ্মী অলক্ষ্মী বিদ্যা অবিদ্যা দেবী দানবী গান্ধর্বী অপ্সরী কিন্নরী প্রভৃতিদেরও। শবরী কিরাতী চণ্ডী মুণ্ডী রাক্ষসী পিশাচী কুরুকুল্লা কপালিনী যোগিনী ডাকিনীদেরও। ভূগর্ভ-খোদিত নানা পুর নগরীর অজানা ঐশ্বর্যে মণ্ডিত বিচিত্র বাস্তব তথ্যে পূর্ণ আভারত এশিয়া পৃথিবীর দেশে দেশে আমাদেরও বিস্মৃত ইতিহাসের নানা উপকরণ ছড়ানো। ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে এবং পরবর্তী কালের মহাভারত রামায়ণ পুরাণেও। এই সব তথ্য ঋগ্বেদের বহু বর্ণিত বিষয় ও ঘটনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন সভ্যতা ও কৃষ্টির রূপ প্রকৃতি ও বিকাশ সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করেছে। ঋগ্বেদাদির ব্যাখ্যায় রূপকের আধ্যাত্মিকতার ও কষ্টকল্পনার স্থান ক্রমেই অনেক সীমিত হয়ে এসেছে। অনেক চিরা-চরিত ব্যাখ্যা অচল হয়ে পড়েছে। নানা ক্ষেত্রে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত গণিত জ্যামিতি শিল্প বিজ্ঞান জ্ঞান যোগদর্শনের ক্ষেত্রে নিজস্ব সৃষ্টির নানা প্রমাণে ভরা কৃষি-বাণিজ্য শিল্প-বাণিজ্য পোতাশ্রয় সমৃদ্ধ হর নগরীর হরোপ্পীয় সভ্যতার আবিষ্কারের কাল হতেই তা ঘটেছে। ঋগ্বেদপূর্ব ও ঋগ্বেদকালীন আদিবাসী ভারতের এক অপূর্ব রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতার তুলনায় তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র বিকাশে বহু খ্যাতনামা পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞদের মুগ্ধ করেছে। তবু অস্থিমসার খণ্ডবিখণ্ড ধ্বংসশেষ কঙ্কালেরই মহিমায়। তার লিপিপাঠের আলোকও তাতে পড়েনি।

নিঃসঙ্গ বার্দ্ধক্য

ভাগবতদাস বরাট

২২শে শ্রাবণ। অবিনাশের জন্মদিন। এই তারিখেই সে প্রথম স্পর্শ করেছিল পৃথিবীর মাটি। আলো-বাতাসের সংস্পর্শে এসে ক্রন্দনের শব্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সে আজ পঁচাত্তর বৎসর আগের কথা।

বাপের একক সন্তান। একমাত্র কুলপ্রদীপ। মাতৃহারা শিশুকে অতি কষ্টে পালন করেছিলেন মহীতোষ বাবু। অনেক ঝড়ঝাপ্টা ও বৃষ্টি বর্ষণের হাত থেকে এই প্রদীপশিখাকে রক্ষা করতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবু তিনি বিয়ে করেন নি। আপন জন ও বন্ধুবর্গের পুনরায় দারপরিগ্রহের নানা উপদেশ ও পরামর্শে তিনি কর্ণপাত করেন নি। ঝি-চাকরের হেফাজতে টবে রাখা উদ্ভিদ-শিশুর মতই তাদেরই যত্ন-আত্তিতে অবিনাশ বড় হল। তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। উদ্ভিদ-শিশু বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এখন তার জীবনের অপরাহ্ণ। দিবাভাগের অলস মধ্যাহ্নক্ষণ। অবিনাশ আপন কক্ষে স্মৃতির রোমন্থনে স্তব্ধ ভাবে বসে আছে। এখন সে সংসারের ভারবাহী ক্লান্ত ধেনু ছাড়া আর কিছু নয়! অথচ একদিন সে ছিল সংসারের সকলেরই কামধেনু।

অবিনাশ ভেবে দেখে এই সবই সময়ের দান বা দাম। যে সময়ে বাড়ীর সকলেই ছিল তার কৃপাপ্রার্থী, আজ সময়ান্তে সে তাদেরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু কৈ? কেউ তো ওর দিকে মুখ তুলে তাকায় না। সবাই ওকে এড়িয়ে চলেছে। আজ সে সবার কাছে ভারাক্রান্ত। ওর পোষ্যবর্গের কাছে আজ সে পোষ্য। যদিও কাগজে কলমে এই সংসারের অবিনাশই কর্তা। কিন্তু কর্তা হলে কি হবে, আদেশ পালনে যে সবাই পরাঙ্মুখ। হায়, বিস্মিত হয়ে সে ভাবে, তাদের কোন কর্তব্যবোধ নেই। মানুষ বৃদ্ধ বা অকেজো হলে এতখানি যে অনাদৃত হয় তা ওর জানা ছিল না। তখন জানল। ভাবল জগৎ স্বার্থপর।

সংসারের নানা রূপ ও বিচিত্রতা ওর চোখের সামনে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে সত্য সাজা অসারতায় সংসার রঙ্গীন। যা এতদিন ওর ভাবনা চিন্তার সীমানায় ছিল না, ওর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যা কোনোদিন ধরা পড়ে নি, তা আজ অনায়াসে প্রতিফলিত হচ্ছে। ভাবছে সারা জীবন সে যা করেছে তা ভুল,—মহাভুল। সংসারের সংবৃত মূর্ত্তি এখন সে দর্শন করছে। সংসার মোহময়।

চিটেগুড়ের আস্বাদনে মত্ত পিপীলিকা গুড়ের মিষ্টত্ব উপলব্ধি করে মশগুল হয়। কিন্তু সেই গুড়ের তরল রসে যখন সে তলিয়ে যায়, তখন প্রাণ বাঁচাতে অস্থির হয়ে উঠে। অবিনাশের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। ও পিঁপড়াদের মত। এতদিন সে সংসারের রসাস্বাদনে মত্ত ছিল—আজ জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁছে সংসারকে ওর চিটেগুড়ের পর্য্যায় ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

হ্যাঁ, চিটেগুড়ই বটে। মিষ্টতার অভাব নেই বলেই তো সংসার আকর্ষক। কামিনী-কাঞ্চনের জৌলুসেই সংসার অনেকের কাছে—মধুময়। তা ছাড়াও বহুবিধ মিষ্টতার সমাবেশ। ইহাতেই আটকা পড়েই তো মানুষ হাবুডুবু খেয়ে মরে। কিন্তু এখন দেখছে—এই সবই নিশার স্বপন। আতরের ক্ষণস্থায়ী সুবাস। আর এই সুবাসে একদিন সেও বিমোহিত হয়েছিল।

তখন ওর বয়স আঠার। মন রঙ্গীন। কেমন যেন এক নূতন আমেজে সারা অন্তর ভরপুর। কায়িক শ্রমে ক্লান্তি ছিল না। ছুটোছুটিরও অন্ত নেই। সেই সময়ে নারীর সাহচর্য্য ওর কাছে ছিল আকাঙ্ক্ষিত। পাড়ার অনন্তবাবুর মেয়ে শিপ্রাকে প্রাণাধিক ভালবেসে ওর

মন পাবার চেষ্টা করেছিল। পড়ার বই-খাতা অচল-অনড় অবস্থায় পড়ে রইল। শিপ্রার সঙ্গে এটা সেটা কেনাকাটা, হেথা হোথা ঘোরাঘুরি শুরু হল। ওর উপঢৌকন ও উপহারের চাহিদা মেটাতে বাপের সিন্দুক থেকেও টাকা সরিয়েছে সেই সময়। কিন্তু নানা আবদার মিটিয়েও ওর মনে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে নি। নাজেহাল হয়েও ওর মনের নাগাল পেল না। শিপ্রা যা করল তা অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। পরিশেষে জানিয়ে দিল, তোমাকে বিয়ে করতে পরব না। বাবা মায়ের মতো ওঁদের পছন্দ মাফিক ছেলের সঙ্গেই পাঁচদিন পরে আমার বিয়ে।

অতি ছোট সামান্য ক'টি কথা। কিন্তু কথার তীব্রতা অপরিসীম। অবিনাশ তা শুনে গাছের আধভাঙ্গা ডালের মত মুষড়ে পড়েছিল। ব্যর্থতার ব্যথায় দিনকয়েক ঘরে টিকতে পারে নি। ট্রেনে চড়ে হেথা হোথা ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর যখন বাড়ী ফিরেছে তখন দেখেছে শিপ্রা নেই। পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। অতীতের এই সব কথা ও কাহিনী ওর কাছে এখন তুচ্ছ উপলখণ্ডের মত মনে হচ্ছে। শৈশবের খেলার সামগ্রীর মত সেদিনের রঙ্গীন নেশা এখন কানাকড়ির সামিল। অতীতের স্মৃতিপুঞ্জ যতই সুখদায়ক বা বেদনা-ভরা হোক না কেন, আজ সে সবের তীব্রতা বিলুপ্তপ্রায়।

অনেকের মুখে সে প্রায়ই শুনত,—সংসারে কেউই সুখী নয়। কিন্তু সে কথা ওর কাছে সেই সময় অলীক বলে মনে হত। অপরের দুঃখবেদনার কথা শুনে নিজেকেই ভাগ্যবান্ ভাবত। আবার যখন শুনত, পাপীরা সংসারে কষ্ট পায়, তখন নিজেকে ধর্ম্মাত্মা ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। অথচ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে কোন-দিন কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করে নি। এবং মনে মনেও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় নি। যারা ওর সঙ্গে মেলামেশা করত, ওর বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, তারা ওর সংসারে সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে প্রায়ই বলত,—পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল। অবিনাশ সেকথা বিশ্বাস করত। নাস্তিক হয়েও সেই ক্ষণে ওর মন ও অন্তর এক সঙ্গে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত। গর্ব্বের পুলকবন্যায় নিজেকে মনে হত, সে স্বয়ং এক দিগ্বিজয়ী সম্রাট্। দীন দুঃস্থ, অন্ধ ও খঞ্জ ভিক্ষুক,—যারা ওর সামনে হাত পেতে দাঁড়াত, তাদের সে ঘৃণা করত। সোজাসুজি বলে দিত,—পারব না। অন্যত্র চেষ্টা কর। স্মৃতির রোমন্থনে তখন সে ভাবছে, ওর হেনস্থা হয়ত সেই কারণে। সংসারে ওর মূল্যমান আজ ক্ষীণ বিন্দুর মত। সে অথর্ব্ব বলেই তার অনাদর। শক্তি-সামর্থ্য ক্ষীণ বলেই সকলের কাছে হীন হয়ে পড়ছে। অথচ ওর রোজগারের অর্থে এই সংসার সাজন্ত। এখন কৃষকের হাল টানা বৃদ্ধ গরুর মত নিজকে মনে হচ্ছে।

শিপ্রার মত সেও বাপের মতানুযায়ী একটি মেয়ের পাণিগ্রহণ করেছিল। এবং তাকে পেয়ে সুখীও হয়েছিল। মাধবী ছিল অবিনাশের অবিমিশ্র ভার্য্যা। প্রথিত প্রণয়িনী। নানা প্রয়াসে সে আগাগোড়া স্বামীর পরিচর্য্যা করেছে। ওর সদা সহাস্য আনন অবিনাশের ভারাক্রান্ত অবিদিত মনে পুলক সঞ্চার করেছে সর্ব্বদা। কিন্তু ওর ভাগ্যে সেই ভার্য্যাও ক্ষণস্থায়ী। ঘাসের গায়ে শিশিরবিন্দু যেমন প্রভাতের সূর্য্যালোকে মুক্তার মত ক্ষণিক চিকচিক করে বিলুপ্ত হয়, তেমনি অবিনাশের যৌবনের প্রথম উন্মেষে মুক্তার হারের মত কয়েক বৎসর মাধবী কণ্ঠলগ্না ছিল। তারপর সে চলে গেল। অবিনাশের সেই সময় মনে হয়েছিল ওর তরণী হঠাৎ যেন এক অজানা দ্বীপে ওকে পৌঁছে দিয়ে ডুবে গেছে।

তখন ওর বয়েসও কম। বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বাবা শহরের বড় ব্যবসায়ী। পুত্রের উদাসীন ভাব দেখে মহীতোষবাবু ওর লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটিয়ে আপন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু ব্যবসাতে মন বসল না অবিনাশের। কেমন যেন এক অব্যক্ত ব্যথায় ওর মন-প্রাণ আনচান করত। অজ্ঞাত যন্ত্রণায় ছটফট করত অহর্নিশ।

স্মৃতির জোয়ারে অনেক সময় উল্লাসের ঢেউ উঠলেও এক এক সময় তা কাঁটা হয়ে ফুটে। বেদনা দ্বিগুণ বাড়ায়। মাধবীর স্মৃতি অবিনাশের মানস কোঠায় কাঁটার

মত ফুটোছিল। এখন এইক্ষণে সে ভেবে দেখে সেই সময়ের সেই ব্যথাও হাস্যকর। কিন্তু তখন সে তা বোঝে নি। এখন বুঝেছে, খেলার সামগ্রীর যেমন খেলার শেষে দাম থাকে না, তেমনি বয়স অনুপাতে জীবনের চিত্তাকর্ষক বস্তু—এমন কি ব্যথা বেদনা ও রসাস্বাদের মূল্যায়নও তুচ্ছ।

মাধবী মারা যেতে সে আবার বিয়ে করল পাড়ার এক দরিদ্রের মেয়েকে। নাম তার সোহাগী। সেও স্বামী-সোহাগিনী ছিল আর এই সোহাগীর সাহচর্যে অবিনাশ অতি সহজেই মর্ম্মব্যথা ভুলতে পেরেছিল। আচমকা ঘরে আগুন লেগে মানুষের সব কিছু যখন ভস্মীভূত হয়ে যায়, কিংবা চোরডাকাতে এক রাত্রে যখন তার ধনসম্পদ্ সবই অপহরণ করে, তখন মানুষ মাত্রই মর্মান্তিক মর্মব্যথায় মুষড়ে পড়ে। নিজেকে মনে হয় খুবই অসহায় অক্ষম ও অসমর্থ। অবিনাশের পত্নী-বিয়োগে নিজেকে ঠিক ঐরূপ অসহায় মনে হয়েছিল। ওর অন্তরের অসীম শূন্যতা সেই সময় এই সোহাগীর সোহাগই পূরণ করেছিল। সে শুধু ওর শয্যাসঙ্গিনীই ছিল না, ছিল মর্ম্মসহচরী। শুধু সহধর্ম্মিণীই ছিল না, সোহাগী ছিল ওর সহযাত্রিণী। সকল কর্ম্মেই ছিল সহযোগী। ওর বুদ্ধি পরামর্শ ও সহযোগিতায় অবিনাশের ব্যবসাও ফেঁপে উঠেছিল। দু'হাতে পয়সা লুটে ধরে তুলেছিল। কিন্তু সেই সোহাগীও রইল না। ওর সঙ্গে আঠারো বৎসর কাটিয়ে বিদায় নিল। সেই থেকে অবিনাশ সংসারে নিঃস্ব। সম্পূর্ণ একা। কিন্তু সেই একাকিত্ব এতদিন সে অনুভব করে নি, এখন করছে। যখন ওর শরীর অকেজো, বার্দ্ধক্যে জবুথবু, রোগ-অসুখে দেহ অবসন্ন, প্যারালিসিস্ হয়ে ডান ধারের হাত পা সমেত সারা অঙ্গ অচল ও অক্ষম হয়ে পড়েছে,—অথচ সেবাযত্নের লোক নেই। এখন সে বুঝছে বেঁচে থাকার স্বাদ নেই। আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মৃত্যুকে ডাক দিলেই তো সে এসে সামনে দাঁড়াবে না। বা তখুনি সে এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে না। সুতরাং অপ্রয়োজনেও বাঁচতে হবে।

এখন ভাবছে স্ত্রী থাকলে ওর এতটা হতাদর হত না। সোহাগীর সোহাগ আদরের কথা মনে হওয়ায় মন উদ্বেল হয়ে উঠে। ভাবে, মায়ের আদেশ মেনে ছেলে, মেয়ে ও বউ ঝিরা ওর হয়ত সেবাযত্ন করত। কিন্তু পরক্ষণেই বন্ধু দিবাকরের কথা মনে পড়ায় ওর প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীর রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রলয়ঙ্করী পত্নীর প্রাণনাশ কামনা করে দিবাকর। সোহাগী হয়ত এতটা বেয়াড়া না হলেও অহরহ স্বামীর পরিচর্য্যা করে সেও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। আর তখন যদি সে বন্ধুপত্নীর মত বাক্যবাণ প্রয়োগ করত, তা হলে তার এই অসুস্থ শরীরে মনের ক্ষতে জ্বালা ধরত। অবিনাশ বুঝেছে, এই সংসারে আপন শরীর ছাড়া অপর কারও সাহায্য প্রত্যাশা করা সমীচীন নয়। অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মত বড় অভিশাপ জগতে নেই।

বাড়ীতে লোকজনের অভাব নেই। আত্মীয় পরিজনে অবিনাশের সংসার বেশ জমজমাট। কিন্তু ওদের নজর ওর উপর নেই। আর দরদও নেই। কেউ ওর বাঁচা মরার কথা ভাবে না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ওর অস্তিত্ব যেন ওরা সবাই ভুলে গেছে একজোটে। সে এখন বাড়ীর চেয়ার টেবিলের সামিল নয়। অথচ সারা জীবনে সে নানা ফন্দি ফিকিরে অগুনতি টাকা লুটে এই সংসারকে সচ্ছল করেছে। যা করে রেখেছে তাতে ওর পুত্র পৌত্র কোন কাজ না করেও আরামে দিন কাটাতে পারবে। চোরা কারবারে দেশবাসীকে শোষণ করে পয়সা জমিয়েছে। ওর পোষ্যদের পিছনে টাকা ছড়িয়ে তাদের বাড়ন্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেখছে এসবের কোন সার্থকতা নেই। এত টাকা সঞ্চয়েরও প্রয়োজন ছিল না।

ছেলেমেয়ে পাঁচ জন। দুই ছেলে আর তিন মেয়ে। বড় ছেলে ওরই পৈতৃক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত। মেয়েরাও সুপাত্রে প্রদীপ্ত। ছোট ছেলে জেলে। রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ। কলেজে পড়তে পড়তে ওর মাথায় কি ভূত যে চাপল তা অবিনাশ বলতে পারবে

না। লোকে বলে নকশাল। সে যাই হোক, ওর কারাদণ্ডের সংবাদে অবিনাশ মোটেই বিচলিত হয় নি। বিন্দুমাত্র মর্মাহতও হল না। ওর উদ্ধত আচরণ অবিনাশকে বীতস্পৃহ করে তুলেছিল।

পড়তে পড়তে হঠাৎ মতিগতি গেল পাল্টে। পুত্র পিতার দিকে মোটেই নজর নেই, নজর আছে পিতার সঞ্চিত অর্থের উপর। উপরন্তু পিতার উপর ওর ছিল অপরিসীম বিদ্বেষ। জোরজুলুমে বারকয়েক টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। বলেছে, তুমি অর্থপিশাচ। তোমাদের মত কয়েকজন স্বার্থপর অর্থসঞ্চয়কারীই দেশের শত্রু। তোমরাই দেশে গরীবের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছ দিন দিন। আরো কত কি বলেছে, যা অবিনাশের এক্ষণে মনে আসছে না। অবিনাশ ওকে কুলাঙ্গার বলেই ভেবে নিয়েছে। ঔরসজাত সন্তানই ওর পরম শত্রু। অবিনাশ ভেবে দেখে—সারা জগৎটা স্বার্থপরদের আস্তানা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যবহার্য জিনিষপত্রের প্রয়োজন মিটে গেলে বা সেগুলো অকেজো হলে আমরা যেমন তাকে তুচ্ছ ভাবি,—অবিনাশ দেখে এখন সেইরকম ওর অবস্থা। অব্যবহার্য্য ভাঙ্গা একটা চেয়ারের মত অবহেলিত। বাড়ীর চাকর নরোত্তম ছাড়া ওর মত নরাধমকে দেখাশুনার কেউ নেই। আর ঐ নরোত্তমও সব সময় ওর আদেশ নির্দেশ পালন করে না। শুধু নরোত্তম কেন, ওর নাতি-নাতনী, বউমা এবং ছেলে-মেয়ে—এদের কাছেও সে অপাঙ্‌ক্তেয়, অবজ্ঞাত। ওর প্রতি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই, কর্তব্যবোধও নেই। সখেদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে,—হায় রে দুনিয়া।

ট্রেন আসার প্রতীক্ষায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবিনাশ এসে দাঁড়িয়েছে। লাইন ক্লিয়ার। সিগ্‌ন্যাল পোস্টের সিগ্‌ন্যালও ড্রপ হয়েছে। ট্রেন আসার তবু দেরি। এইক্ষণে জীবনের হিসাবনিকাশ করে অবিনাশ দেখে, এজগতে চাওয়া-পাওয়া এবং ব্যথা-বেদনা যেমন নিরর্থক, তেমনি অর্থ-সম্পদ ও সুখানুভবতার মূল্য ক্ষীণ। জয়-পরাজয়ে চিত্তচাঞ্চল্যেরও কোন অর্থ নেই। শোক-তাপ ও বিয়োগব্যথায় মর্মাহত হওয়া মূর্খামি। কিন্তু তবু তার প্রতি এইক্ষণে ওর আত্মীয়পরিজনদের হতাদর দেখে সে মনে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কেন? মনে মনে মনকে প্রশ্ন করেও সদুত্তর পেল না। ভাবে, মানুষের মন।

মনে পড়ে একদিন মধ্যাহ্নে সে একটা বুড়ো ষাঁড়কে মাঠে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। একটা গাছের ছায়ায় পরম তৃপ্তিতে ষাঁড় জাবর কাটছিল। ওর হাল টানার শক্তি ছিল না। গাড়ী টেনে ভার বহারও ক্ষমতা রহিত। মানবের সম্পূর্ণ কৃপাপ্রার্থী। ওর আরও মনে হয়েছিল,—মানবের আদরযত্ন থেকেও সে বঞ্চিত। মানব ওকে কতটুকু যে খাইয়েছে তা অবিনাশ দেখে নি, কিন্তু তাহলেও পরম তৃপ্তিতে সেই খাদ্যেরই সে জাবর কাটছিল। অথচ মানুষ অবিনাশ ঐ পশুর চেয়েও অধন্য। কিন্তু কেন? মানুষ যে পশুর চেয়েও স্বার্থপর। নকশালপন্থী কারারুদ্ধ ছেলের প্রতিও ধনী পিতার দরদ নেই। ঘরের কোণে মাকড়শার জালে আটকে পড়া মাছির মত সে শুধু ছটফট করছে। সব বুঝেও নিজে-কেই বোঝে না অবিনাশ। আর তা বোঝার চেষ্টা অপরের মত সেও করে না।

ওর নাতনী বুলা পাশ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। তৃষ্ণার্ত অবিনাশ বলল, এক গ্লাস জল এনে দাও দিদি-ভাই। বুলা একটু থমকে দাঁড়াল। বলল, আনছি। কুমারী কিশোরী বুলা চলে গেল। কিন্তু আর সে ফিরল না। অবিনাশ ওর আসার আশায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ তা জানল না। হুইসল দিয়ে ট্রেনটা বোধ হয় চলে গেল।

ফেলে আসা দিনের কথা অবিনাশ আর ভাববে না।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল ভূভাগ থেকে বিবেকানন্দ শিলা মাত্র পাঁচ শ' ফুট হবে। অথচ সমুদ্র উত্তাল হলে এইটুকু পথও অতিক্রম করা যায় না। যন্ত্রচালিত ফেরিতে পারাপারের ব্যবস্থা। বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটি এর বন্দোবস্ত করেছেন। পারাপারের জন্য কোন ভাড়া ধার্য্য নেই। তবে কমিটির দপ্তর থেকে এজন্য একটি পাস সংগ্রহ করতে হয়।

আর সেই সময় কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিকট সাধ্যমত দানের জন্য আবেদন জানান। এতে পারানির কড়ির চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আমদানি হয়। প্রবেশ পথটি অপরিচ্ছন্ন। এটাকে একটু সুন্দর করা উচিত।

কয়েক মিনিট আমাদের সমুদ্রযাত্রা হলো। সুরক্ষিত, সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন বিবেকানন্দ শিলায় পা রাখার আনন্দে দেহমন আমার রোমাঞ্চিত হয়েছিল। আজ থেকে ৮১ বছর আগে (১৮৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে) স্বামী বিবেকানন্দ সাঁতার কেটে এসে উঠেছিলেন এই শিলাখণ্ডের উপর। এইখানে বসে ধ্যানস্থ হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই ধ্যানদৃষ্টিতে সেদিন কেবল ঈশ্বরই নন, বহু শতাব্দী ব্যাপী জড়তায় পঙ্গু ভারতের প্রকৃত রূপটি তার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গৌরব ও গর্ব নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই ভারত-দর্শনের ফলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে এক নবজাগৃতি দেখা দিয়েছিল। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা নানা কার্যে ও নানা রূপে প্রকটিত হয়েছে। এ নিয়ে অনেকে তর্ক তুলতে চাইবেন। বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। শুধু সবিনয়ে প্রার্থনা করব, বিবেকানন্দ-পূর্ব ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাসের সঙ্গে বিবেকানন্দ পরবর্তী ভারতবর্ষের সত্যস্বরূপটি একবার সযত্নে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে মিলিয়ে দেখুন।

এই শিলাখণ্ডের আর-এক প্রান্তে বিস্মৃত ইতিহাসের কোন একটি অধ্যায়ে মাতা কন্যাকুমারীও তপস্যা করেছিলেন, ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। কুমারী কন্যার পদচিহ্ন এখনও এই শিলাখণ্ড বুকে ধারণ করে আছে। সেই চিহ্নকে কেন্দ্র করে এখন শ্রীপদ মন্দির নির্মিত হয়েছে। পাথরের উপর নারীপদচিহ্নটি স্পষ্ট দৃষ্টি-গোচর হয়। পাথরে পায়ের চিহ্ন পড়তে পারে তা আমরা বিশ্বাস করি না। বহুজন এখানেই উচ্চকণ্ঠে এর অবাস্তবতা ঘোষণা করতে দ্বিধা করলেন না। জনৈক বাঙ্গালী যুবক বললেন 'বুজরুকি'। প্রতিবাদ করা নিরর্থক। আমরা কেউই আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে কিছু বুঝি না। বুঝতে পারি না। মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম।

সুদৃশ্য স্তম্ভ নির্মিত প্রবেশপথ। বেলুড়ের মন্দিরের আভাস পাওয়া যায় এই মন্দিরে। চার ফুট বেদীর উপর পরিব্রাজক বেশে যেন জীবন্ত বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্তিটিই আট ফুট উঁচু। ঘরটি বেশ বড়-সড়। এটিকে বলা হয় সভামণ্ডপ। উজ্জ্বল কালো রঙের স্তম্ভগুলির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। বিপরীত দিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীমার দুখানা চমৎকার তেল রঙের ছবি দুপাশে দেওয়ালের মধ্যে বসানো রয়েছে। পেছনের দিকেই বোধহয়, ধ্যানমণ্ডপ। ঘরটিতে জানালা নেই। একদিকে দেবনাগরী অক্ষরে 'ওঁ' শব্দটি এমন করে স্থাপন করা হয়েছে, যে দর্শক সহজেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। শ্রী এস. কে. আচারি নামক জনৈক স্থপতি এর নকশা করেছেন। ধ্যানমণ্ডপে আমরা কিছু সময় নীরবে বসে ছিলাম।

মন্দিরের পরিকল্পনাটিও চমৎকার। এক কোটির

লক্ষ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয় নি। ভারত-সরকার এবং রাজ্য-সরকারগুলি অর্থ সাহায্য করেছেন, কিন্তু ব্যয়ের অধিকাংশ পাওয়া গেছে ভারতের জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসেবে। আয়-ব্যয়ের একটা মোটামুটি হিসাব মন্দির প্রাঙ্গণে লিখে রাখা হয়েছে। মূল মন্দির ও শ্রীপদ মন্দির ও ধ্যানমণ্ডপ ছাড়া বইয়ের দোকান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, শৌচাগার ইত্যাদি। রক্ষণাবেক্ষণও চমৎকার। দৈনিক কয়েক সহস্র যাত্রী আসেন, তথাপি কোথাও এক বিন্দু আবর্জনা নেই, ধুলো-বালি নেই। এখানে ছবি তোলা, পিকনিক ইত্যাদি হুল্লোড় নিষিদ্ধ। ছবি তোলার নিষেধটা অনেকেই মানছেন না। নিষেধের সাকার যুক্তিটি কি তাও অবশ্য বোধগম্য হয়নি।

প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ দণ্ডে গেরুয়া রঙের ত্রিকোণাকৃতি পতাকা উড়ছে। মধ্যস্থলের 'ওঁ' অক্ষরটি সহজেই চোখে পড়ে। পতাকাটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোলা হয় এবং কাঁটায় কাঁটায় সূর্যাস্তের সময়ে নামানো হয়। মূল তোরণ ও গান্ধী মণ্ডপের পথে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটির আপিস আছে। সেখানে একটি বোর্ডে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় লিখে দেওয়া হয়।

১৯৭০ সনের ২ সেপ্টেম্বর মন্দিরটির উদ্বোধন করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাতাত্তর বছর আগে এই তারিখে চিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজি হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন সত্যকে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকটিত করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন (খবরের কাগজে দেখেছি) বিবেকানন্দ শিলাটি যেমন ছিল তেমনি রাখলেই ভাল হতো। মানুষের নখরাঘাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হোক এটা তাঁর কাম্য নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের শেষ বিন্দুতে স্বামী বিবেকানন্দের এই আসনটির প্রতি নবজাগ্রত ভারত কোনক্রমেই উদাসীন থাকতে পারে না। আমার তো মনে হলো লাল ও ধূসর বালি পাথরের মন্দিরটি শিলাখণ্ডের স্বাভাবিক রূপকে উজ্জ্বলতর করেছে।

মোট ঘণ্টা খানেক এখানে ছিলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু দুপুরে কিছুক্ষণ ফেরি বন্ধ থাকে। এ বেলার শেষ ফেরিখানা ছাড়লে দুপুরের স্নানাহার বরবাদ হয়ে যাবে। অতএব 'ফিরে চল মাটির টানে'। উজ্জ্বল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম জেটিতে। সিঁড়িগুলিই বা কি চমৎকার।

দুপুরের স্নান ও আহার দুটো নিয়েই বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। স্নান করতে গিয়েছিলাম সমুদ্রে। স্নানের একটি বাঁধানো ঘাট আছে কুমারী মন্দিরের কাছে। প্রায়-ঝড়ো হাওয়ায় সমুদ্র সেখানে অশান্ত। আমাদের সাহস হয় না জলে নামতে। তবু ভয়ে ভয়ে এখানে সমুদ্রেই স্নান করেছিলাম। জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ মন্ত্র পড়া অসুবিধাজনক বলে বাঁধানো মেজেতে বসে জলে পা রেখে উচ্চারণ করেছিলাম—

নমঃ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতা মহোদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপানবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥
যে বান্ধবা অবান্ধবা বা যে অন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই দক্ষিণের গোদাবরী-তীরে শ্রীরামচন্দ্র একদা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে এই মন্ত্রে তর্পণ করেছিলেন। তার আগেও ভারতবর্ষের মানুষ এটা করতেন নিশ্চয়ই। পরেও হাজার হাজার বছর ধরে একই মন্ত্রে আমরা পিতৃপুরুষের তর্পণ করে আসছি। বাড়ি থেকে আসবার সময় চৌদ্দপুরুষের নাম লিখে নিয়ে এসেছিলাম রামেশ্বরম্ বা কন্যাকুমারীতে তর্পণ করার জন্য। রামেশ্বরের বিধিব্যবস্থা দেখে প্রবৃত্তি হয় নি। এখানেও কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি। তাই মন্ত্র পড়েই শান্ত থাকতে হলো।

স্নানের ঘাটে আসবার পথে টাটার ইঞ্জিনীয়ার অসীম চাটার্জি সাহেবের সঙ্গে পুনরায় দেখা হলো। তিনি তাঞ্জোর থেকে আমাদের সঙ্গে রামেশ্বরম্ অবধি ছিলেন। রামেশ্বরম্ থেকে আগে বেরিয়ে যান। এখানে

দেখা হতেই উভয় পক্ষের প্রাণখোলা কুশল-বিনিময় হলো—যেন হারানো মাণিক ফিরে পাওয়া গোছের অবস্থা। অথচ এক সপ্তাহ আগে কেউ কাউকে চিনতাম না। তিনি আমাদের ছবি নিলেন। আর আমাদের স্নান করতে দেখে নিজেও স্নান না করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে জলে নামলেন।

স্নানের ভিজে জামা-কাপড় বগলে করে আমরা তিনটি প্রাণী গলাধঃকরণ করা যায় এমন খাদ্যের খোঁজ করতে চললাম। বহুজনের বিচিত্র কথার মর্ম ভেদ করতে করতে একটি হোটেলে উঠলাম। এখানে এক-গাদা বাঙ্গালী কিশোরীর কাকলী শুনে আশ্বস্ত হলাম। না, ঐ পর্যন্তই। আমরা তাঁদের কাকলীই শুনেছি, নাকের জলে চোখের জলে একাকার হওয়াটা দেখি নি। তাঁরা কলকাতার উপকণ্ঠের একটি স্কুলের ছাত্রী। শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে এসেছেন। জনৈক শিক্ষিকা তো হোটেল-ওয়ালাকে রান্না শেখাতেই শুরু করলেন। এইসা করেগা, ঐসা করেগা। হোটেলের কর্তা সব কথাতেই হ্যাঁ বলছেন। এদের স্বভাবই এই রকম। আপনার কথার কোন প্রতিবাদ করবে না, অথচ নিজেরা যা করার তার ইতরবিশেষ ঘটাবে না। দিদিমণিকে আমার এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিবেশন করে বললাম —আমি একটা উপায় বাৎলে দিতে পারি। দিদিমণির চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না তিনি বিরক্ত হয়েছেন, না বিস্মিত হয়েছেন। কথা বলায় আমাকে তখন পেয়ে বসেছে। তাই কপাল ঠুকে বলেই দিলাম —আপনি যদি রান্নাঘরে ঢুকতে পারেন তবেই একটা কিনারা হতে পারে। নান্য পন্থা। দিদিমণি রাগ করার আগে ছাত্রীরা অনেকে আমার দলে ভিড়ে গেল, তারা সমস্বরে আমাকে সমর্থন করল। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি রাতে আপনাদের গেস্ট। এবার সাড়া দেবার জন্য কেউ মুখ খুলল না। তাদের যে অধিকার নেই। আর আমাদের দেশের দিদিমণিদের ছাত্রীদের সামনে হাসতে নেই। রাজ্যসরকারের হাউসে তাঁরা উঠেছেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

দুপুরে সামান্য বিশ্রামের পর আমি সমুদ্রতীর ধরে উল্টো দিকে খানিকটা গেলাম। সঙ্গী জুটে গেলেন জনৈক উড়িষ্যাবাসী অধ্যাপক। তিনি চলেছেন জেলে পল্লীতে। শত শত তিন-কোণা পাল-তোলা মাছধরার নৌকো আমরা দেখছি। এখনও দেখছি। দূর সমুদ্রে কোনটিকে পাখী, কোনটিকে বা একটি বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে। এর উপরে বসা মানুষগুলো নিত্য জীবনমৃত্যুর সীমরেখায় দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার দুঃসাধ্য তপস্যায় রত। আমাদের আবাস থেকে অল্প দূরেই একটি গ্রাম রয়েছে। মূর্তিমান্ দারিদ্র্য এর চতুর্দিকে নখদন্ত বিস্তার করে রয়েছে।

সমুদ্রবুকের মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষগুলোর ঘরবাড়ি ছেলে-মেয়ে পরিবার-পরিজন একেবারেই বেমানান।

এই অঞ্চলটি ত্রিবাঙ্কুড় কোচিন করদ রাজ্যের অধীন ছিল। দেশ স্বাধীন হলে প্রথমে যুক্ত হয়েছিল কেরলের সঙ্গে। পরে ভাষার দাবিতে তামিলনাড়ুর ভাগে পড়েছে। বাইরের এত উত্থান-পতন বদলার পালা সত্ত্বেও এদের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। শহরের কাছাকাছি অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্টান। কাছে পিঠে নাকি একটি অতি প্রাচীন গীর্জা আছে। গ্রামে এত বড় গীর্জা আর কোথায়ও নেই খ্রীষ্টান হলে কি হবে, ভারতীয় রীতিনীতির, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার (ছুঁই 'ছুঁইভুই')থেকে এঁরা মুক্ত নন বলে জানালেন অধ্যাপক মহান্তি। তিনি গঞ্জাম জেলার লোক। সেখানেও অনেক খ্রীষ্টান আছে। মুসলমানরা নিজেদের ভারতীয় বলে মেনে নিতে একদিন অস্বীকার করেছিল। সেটা যে মিথ্যা তা তো আজ প্রমাণিত সত্য। তবে এ কিসের গবেষণা। বুঝিনি তার কথা। যেটুকু বুঝছি তা হলো ভারতের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান শিখ জৈন এবং হিমালয়ের বা আসামের পাহাড়ী মানুষ, দক্ষিণ সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র তটের অধিবাসী এবং বাংলা বিহার ওড়িশার সমতলের নরনারীর মধ্যে একটা ঐক্য-সূত্র আছে। সেটা কি—কোন্ আচার-আচরণের মধ্যে তা হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী এবং আরব সাগর থেকে

অরুণাচল পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাভারতের ঐক্য বিধান করেছে—তাই তিনি খুঁজে দেখতে বেরিয়েছেন।

অপরাহ্ন বেলায় বেরোলাম গান্ধীমণ্ডপের দিকে। সমুদ্র এ বেলায় আরও একটু বিক্ষুব্ধ হয়েছে। আকাশ মেঘ জমাট বেঁধেছে। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা কপালে নেই। গান্ধী স্মৃতিসৌধের ছাদে চড়লে সূর্যাস্ত দেখার ভারি সুবিধা হয়। সূর্যাস্ত দেখা যাবে না জেনেও সকলে উপরে চড়ছেন। গান্ধী-মণ্ডপ তো দেখা হবে এই ভেবে আমরাও এগোলাম। এই মন্দিরটি ভারতবর্ষের স্থলভাগের শেষ বিন্দুতে নির্মিত হয়েছে। তাই তিনতলায় উঠে একবার ভাল করে স্থলভাগের দিকে চেয়ে দেখলে সহজেই বুঝা যায়, শেষ বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছি। মহাত্মা গান্ধীর অনেকগুলি স্মৃতিসৌধ সারা ভারতে নির্মিত হয়েছে। সেগুলির আকার আকৃতি প্রায় এক রকম। কিন্তু মাতৃতীর্থের এই নবীন তীর্থ গান্ধীমণ্ডপের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে।

গান্ধীজির চিতাভস্ম এখানে তিন সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ১৯৪৮ সনে ১২ই ফেব্রুয়ারি। যেখানে দাঁড়িয়ে চিতাভস্ম বিসর্জিত হয়েছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে গান্ধী স্মৃতিসৌধ। এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। নীচের তলায় যে বেদীটি আছে সেখানে বছরে একটি দিন (গান্ধীজির জন্মদিন) দুপুর বারোটার সময় উপরের গবাক্ষ পথ দিয়ে সূর্যকিরণ এসে পড়ে।

ভারতবর্ষ এই বিন্দুতে শেষ নয়, এখান থেকে শুরু। আর আগামী দিনের বিশ্ব হবে গান্ধীজির পৃথিবী। ভারতবর্ষ থেকে হবে পৃথিবীর শুরু। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজ ছাড়া সুখে ও স্বস্তিতে মানুষের বেঁচে থাকার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। এ সত্য আমরা সহজে হয়তো বুঝব না, ঠেকে শিখব। আজ এই সারা বিশ্বে যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দুর্বিষহ বেকারী দেখা দিয়েছে। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বকাজে যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মানুষের হাত যা করতে সমর্থ সেখানে যন্ত্রকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবেই সব হাতই কাজ করবার সুযোগ পাবে। নইলে যন্ত্রদানব মানুষ দেবতাকে পরাজিত করে পৃথিবীতে দৈত্যের রাজত্ব শুরু হবে। তারই লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে নাকি? ঈশ্বরের, সত্যের, সাম্যের, অনুসন্ধান যাঁরা করেন, সুস্থ মানবতার পথিক যে জন, গান্ধীপথ তাঁরই পথ।

যন্ত্রের যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতেই সারা পৃথিবীর আবহাওয়া বিষাক্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এই হারে চলতে থাকলে পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে বলে বিশ্ববিজ্ঞানীরা সাবধান করে দিয়েছেন। আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে অকালে মরতে হবে বহু মানুষকে।

গান্ধীজী বলেছেন—প্রয়োজন বাড়ানোকে সভ্যতা বলে না, সভ্যতা হলো স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনকে হ্রাস করা। এটা প্রাচীন ভারতবর্ষের বৈদিক আদর্শ। মানুষের বাঁচতে হলে এ পথে আসতেই হবে।

গান্ধীজি কন্যাকুমারী এসেছিলেন ১৯৩৭ সনে। তিনি তখন এই স্থানটি সম্পর্কে লেখেন—I am writing this at the cape, in front of the sea where three waters meet, and furnish sight unequalled in the world. For this is no port of call for the vessels, like the goddess the waters around are virgin' কথা ক'টি গান্ধী সৌধে ক্ষোদিত আছে।

কুমারী সমুদ্রের কুমারীত্ব হয়তো সেই দিন ঘুচবে যে দিন মানুষ আবার সমস্বরে বলতে শুরু করবে

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

নেমে আসতেই দেখা পেলাম আরও কয়েকটি পুরনো পরিচিত মুখের। প্রজ্ঞা আর তার মা বাবা। প্রজ্ঞার বয়স বছর পাঁচেক, তার বাবা এবং মা উভয়েই আদ্রার রেল স্কুলের শিক্ষক। আমাদের পরিচয়ের মাধ্যম ছিল প্রজ্ঞা—পাণ্ডিচেরির নিউ সুইট হোমে। মোহনদার সঙ্গে তার ভাবটা জমেছিল বেশি। কত যে

নিভৃত আলাপ হতো তাদের। এখানে দেখলাম সকলের প্রতিই সে সমান মনোযোগী। ফেরার দিন মাদ্রাজ স্টেশনে আমরা আবার মিলিত হয়েছিলাম। প্রজ্ঞার বাবা ঠিকানা লিখে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন সুবিধা মত তাঁদের বাড়ি যাবার জন্য।

কুমারিকা অন্তরীপের ইংরেজী নাম কেপ কমোরিণ। কুমারী থেকে কি কমোরিণ হয়েছে? তিন সমুদ্রের জল এক, কিন্তু তিন এলাকায় তিন রঙের বালুকার দর্শন মেলে। সাদা লাল আর হলুদ। তার আকার গোল নয়। চালের মত দেখতে। কলকাতার রেশনের চালে যেমন কাঁকর মেশানো থাকে এর অনেকগুলির আকার আকৃতি ঠিক তেমনি। ঐ কাঁকরগুলি এখান থেকে চালান যায় কি না কে জানে?

রং বেরঙের বালির একটা মজাদার গল্প আছে। শিবঠাকুর কন্যাকুমারীর প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করেন। শিবের ইচ্ছায় বাদ সাধবে কে? সব ঠিকঠাক হলো। একেবারে রাজকীয় স্কেলেই সব হয়েছিল। এদিকে দেবতারা প্রমাদ গণলেন। কুমারী কন্যার হাতে বাণাসুর বধ হবার কথা। সেই জন্য কন্যাকুমারীর সৃষ্টি। শিবঠাকুর বিয়ে করে বসলে এত দিনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাণাসুরের দাপটে টেকা যাবে না। নারদের উপর ভার পড়ল একটা বিহিত করার জন্য। কৈলাস থেকে শিব আসছেন। পথ তো কম নয়। আসতে একটু রাত হয়ে গেল। কিন্তু রাতের মধ্যে পৌছতে হবে নইলে বিয়ে ভেস্তে যাবে। তিনি একটু পা চালিয়ে দিলেন। তাতে কি হবে, বাহন তো ষাঁড়। সে আর কত জোরে চলবে! তবু আসতে পারতেন রাতের মধ্যে। নারদ করলেন কি, কুমারিকা থেকে মাইল তিনেক দূরে যখন শিবঠাকুর এসে গেছেন, তখন মোরগ ডেকে উঠলেন। ব্যস, তাতেই কাজ হলো। বিদ্যাবুদ্ধি বেশি হলে অনেক সময় সাধারণ জ্ঞানে টান পড়ে বলে প্রবাদ আছে। শিব ঠাকুরের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

ভোলা মহেশ্বর মনে করলেন ভোর হয়েছে বলেই মোরগ ডেকেছে। রাত যখন কাবার তখন আর গিয়ে কি হবে, সেখানেই বসে পড়লেন। জায়গাটির বর্তমান নাম শুচিন্দ্রম। এখানে শিবের একটি সুন্দর মন্দির আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বাল্যমূর্তি এই মন্দিরের বিশেষত্ব। একথা শুচিন্দ্রম প্রসঙ্গে বলা যাবে।

এই অঘটনের কথা তো আর কন্যা জানেন না। তিনি সুসজ্জিতা হয়ে অপেক্ষাই করতে থাকেন। অপেক্ষা করতে করতে রাত এক সময় সত্য সত্য প্রভাত হলো—শিবের দেখা মিলল না। প্রতীক্ষারতা কন্যা ভগবতী তখন ঠিক করলেন বিয়ে আর কখনো করবেন না। তাই আজও তিনি কুমারী। এর মধ্যে যতটা দেবত্ব আছে, মানবিকতা তার চেয়ে কম নেই। এই ঘটনার মধ্যে কুমারী কন্যার আত্মমর্যাদাবোধ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তা না হলে হয়তো আর কোনদিন আবার এই বিয়ে হতে পারত। তেমনটি যে ঘটেনি তার জন্য ভারতের নারী সমাজ গর্ববোধ করতে পারেন।

আজও বিয়ের উৎসবের সঙ্গে বিপুল ভোজের আয়োজন ঘটে। কন্যা ভগবতীর বিয়ে উপলক্ষে তার ব্যতিক্রম হয়নি। শিবঠাকুর আর ভগবতীর বিয়েতে ত্রিলোকের মিলন ঘটার কথা বিবাহ-বাসরে। তাই সেদিনকার সুখাদ্যের আয়োজনের বহরটা সহজেই অনুমেয়। সেই খাদ্যবস্তুই নাকি নানা রঙের বালুকা আর পাথরের নুড়ি হয়ে হয়ে ছড়িয়ে আছে কুমারিকা অন্তরীপ জুড়ে। বালির দানাগুলি যে চালের আকৃতি তা তো সাদা চোখেই দেখলাম। এ কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কি না তা জানতে আমার আগ্রহ নেই। স্মরণাতীত কাল পূর্বে এমন অনবদ্য মধুর কথা যিনি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও দূরদৃষ্টিকে অস্বীকার করবে কে? দেবী কুমারীর সঙ্গে তাঁকেও প্রণাম করে আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগোলাম।

আসতে আসতে সুধীরদা স্মরণ করলেন কন্যাকুমারীর জন্মবৃত্তান্ত। স্কন্দ পুরাণে আছে দৈত্যরাজ বাণাসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গের অধিকার লাভ করেন।

দেবতারা যখন অসুরের পদানত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করছেন তখন ভগবতী শক্তি এলেন তাঁদের উদ্ধার করতে। কুমারী কন্যারূপে তিনি এখানে এসে অসুর বধের শক্তি অর্জনের সাধনা করতে থাকেন। বিয়ে করে ঘরসংসারে মন দিলে আসল কাজ অর্থাৎ অসুর নিধন হবে না; তাই দেবতারা চক্রান্ত করে ভণ্ডুল করে দিলেন বিয়ে। পরে বাণাসুর দেবী কর্তৃক নিহত হন। যে অস্ত্রে (চক্র) তিনি অসুরকে হত্যা করেছিলেন সেটা নাকি মাইল খানেক দূরে গিয়ে ভূমি বিদ্ধ করে একটি কুয়ো সৃষ্টি করেছিল। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের পাশে মিষ্ট জলের উৎস রূপে এই কুয়োটি আজও দেখা যায়। জায়গাটি এখন শ্মশান রূপে ব্যবহৃত হয়। কালক্রমে বিশ্বনাথ শিবের একটি মন্দিরও নির্মিত হয়েছে এখানে। কন্যাকুমারী নামের অন্য একটি ঐতিহাসিক শ্রুত হয়।

ভারত রাজা পরিণত বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তার পূর্বে তিনি সাম্রাজ্যটিকে নয় ভাগে ভাগ করে পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিলি করে দেন। তাঁর একমাত্র কন্যা পান দাক্ষিণাত্যের প্রান্তের খণ্ডটি। তিনি কুমারী ছিলেন, তাই নাম হয়েছে কুমারিকা। যে কারণেই নাম হয়ে থাক, স্থানটির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। দাক্ষিণাত্যের প্রবল প্রতাপশালী এবং সুখ্যাত পাণ্ড্য-রাজাদের সময়েও কুমারিকার খ্যাতি ছিল। কেউ কেউ বলেন কন্যাকুমারী এই রাজাদের গৃহদেবী ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক পোলেমির লেখায়ও কন্যাকুমারীর উল্লেখ আছে।

ঘটনাচক্রে সান্ধ্য আরতির মুহূর্তে আমরা কুমারী কন্যা মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলাম। এখানেও পুরুষদের ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত করে মন্দিরে ঢুকতে হয়। তবে চাদর বা তোয়ালেতে আপত্তি নেই। নানা ধরনের আলোর আরতি। দর্শকদের দাঁড়াবার স্থান থেকে দেবীর সিংহাসন বেশ দূরে এবং ভাল করে দেখা যায় না। আসনটি বহু প্রদীপের আলোয় সুন্দর করে সাজানো। আরতির বাজনা সেই ঢোল ও লম্বা সানাই। লম্বা সানাইয়ের স্থানীয় নাম নাদেশ্বরম। ভিড় মোটামুটি মন্দ ছিল না। কেরলের একটি খৃষ্টান মিশনারী কলেজের বহু ছাত্রী ছিলেন। তাঁদের আগ্রহ ও ভক্তি কারও চেয়ে কম দেখলাম না। এদের সঙ্গে পুরোহিতের কোন বন্দোবস্ত হয়ে থাকবে। সকলেই দেবীকক্ষে প্রবেশ করে নিকট থেকে প্রতিমা দর্শন করার সুযোগ পেলেন। আমিও কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে তাদের অনুসরণ করেছিলাম। প্রবেশ পথের দরজাটি নীচু। বেরোবার দুয়ার নিম্ন এবং আরও ছোট। একটু বেখেয়াল হলে পাথরের চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাবেই।

ঋজুভঙ্গীতে দাঁড়ানো মূর্তি দেবীর। মুখখানি অপূর্ব সুন্দর। নানা রঙের ও আকৃতির প্রচুর ফুলমালা সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে বলে মনে হলো। ধূপ দীপ চন্দনের সমারোহও খুব। দেবী সালঙ্কারা। বড় বড় হীরকখণ্ডের দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়। আর তার ফলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়।

এ মন্দিরেরও পুরোহিতের চেহারা ভক্তির উদ্রেক করে না। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি মীনাক্ষী মন্দিরে। সেখানে অধিকাংশ পুরোহিত সুদর্শন এবং কয়েকজনের সঙ্গে সামান্য সামান্য আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ তো বটেই, ইংরেজীও জানেন। কন্যা-কুমারীতে হিন্দী ও এমন কি বাংলা জানা দু-চার জনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

দেবী মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ পথ উত্তর দিকে। পূব দিকে একটা দরজা আছে সেটা আজকাল খোলা হয় না। মন্দিরে কিছু শিল্প-কীর্তি আছে, কিন্তু তা অসাধারণ কিছু নয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার পথে আমার মনে হতে লাগল ভারতবর্ষে দেবতার চেয়ে দেবীর সংখ্যাই বোধ করি বেশি। দেবতারা যেখানে ব্যর্থ দেবীরা সেখানে সার্থক বলে কীর্তিত হয়েছেন। কুমারী দেবী তো দেবতাদের পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত করেছেন। এই দেবী-প্রাধান্য থেকে অনুমিত হয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী-প্রাধান্য ছিল। সমাজে নারীর সংখ্যা কম বলেই কি তাঁরা বন্দিত হয়েছেন? দুর্লভ জিনিসের কদর ও মূল্য উভয়ই বেশি হয়।

সব মন্দির-প্রাঙ্গণের মত এখানেও সৌখীন ও প্রয়োজনীয় নানা দোকানপাট রয়েছে। সৌখীন জিনিসগুলি কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল চিনে ওঠা দুষ্কর। ভাজ করা মাদুরগুলি বেশ। একটি পুরো মাদুরকে খণ্ডবিখণ্ড করে কাপড় দিয়ে জুড়ে ভাঁজ করার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাঁজ করার পর একটি প্রমাণ সাইজের মাদুর একখানা বাহাদুর খাতার চেয়েও ছোট হয়। দেড় দুটাকা থেকে বিশ ত্রিশ টাকা দামেরও মাদুর আছে।

সন্ধ্যার পরও রাস্তাঘাটে মানুষ ছড়িয়ে আছে। খুব অল্প পরিসর জায়গা। অনেকের সঙ্গে একাধিক বার দেখা হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এক-আধবার কেউ কোন কথাবার্তা বলেন না, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়বার দেখা-সাক্ষাৎ হলে প্রায়ই আলাপ জমে ওঠে। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকেই সব বয়সের নরনারী এসেছেন। বাংলার লোকজনও অনেক। কিসের টানে এঁরা এত দূরে পাড়ি জমিয়েছেন? নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—আমি কেন এসেছি! পুণ্যলাভের জন্য? অথবা সুন্দরকে দু'নয়ন ভরে দেখব বলে এসেছি? এর কোন নিশ্চিত উত্তর আমার মন জানে না। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ হিন্দু যাত্রীর মনে সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর নেই।

যত চেষ্টাই করি না কেন, পুরুষ পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া কি সহজ কথা! বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালেই মনটা আপনা থেকেই নম্র নত হয়ে ওঠে। কেউ আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, কেউ কেউ বা শুধুই মনে মনে; বাইরে তার কোন প্রকাশ ঘটে না। দক্ষিণ ভারতীয়েরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কেউ প্রণাম করেন না; যুক্ত করে প্রণাম করাই এখানে বিধেয়।

তিন সমুদ্র, ভারত মহাসাগরকে মধ্যে নিয়ে আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর—কোথায় কার শুরু বা শেষ কে তা নির্ণয় করবে। কন্যাকুমারীর কর্তৃত্ব বদল হয়েছে, মাদ্রাজের নাম বদল হয়েছে কিন্তু মহাম্বুরাশির কোন পরিবর্তন নেই। বঙ্গোপসাগর নামে বঙ্গটুকুর জন্য এতকথা মনে পড়ল, পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায় হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে যখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। না, এখানে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত কোনটা দেখা এবার আমাদের ভাগ্যে নেই। সামান্য একটু রক্তিম আভা মাত্র দেখেছি। মেঘের দাপটে আর কিছুই দেখা গেল না। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় এখানে বঙ্গোপসাগরে যখন পূর্ণ চন্দ্রোদয় হয় ঠিক তখনই আরব সাগরে দিনমণি ডুবতে থাকেন। সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য। গান্ধী স্মারকের উপর দাঁড়িয়ে দুটো দৃশ্যই এক সঙ্গে দেখা যায়। আমাদের হাতে আর সময় নেই, তাই কন্যাকুমারীতে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিয়ে তখনই যাত্রা করলাম ত্রিবান্দ্রমের পথে।

বাস বা ট্যাক্সী এক মাত্র যান। শেয়ারের ট্যাক্সীও পাওয়া যায়। জনপ্রতি টাকা-দশেকের মধ্যে হয়। পথে তাঁরা শুচিন্দ্রম মন্দির দেখিয়ে নিয়ে যান। শুচিন্দ্রম মন্দিরের খ্যাতি দু'টি কারণে। কন্যাকুমারীর ভগবতী দর্শনের ফল পেতে হলে শুচিন্দ্রমের শিব দর্শন করতে হবে। মহর্ষি অত্রির বিদুষী সহধর্মিণী শ্রীমতী অনসূয়ার সঙ্গে রংবাজি করতে এসে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দিক্‌পাল দেবতাকে নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল এই মানবীর হাতে। দেবতা তিনজন অতিথির বেশে আশ্রমে আসেন। ভারতবর্ষে অতিথি দেবতারূপে সৎকৃত হবার অধিকারী। অতিথিরূপী দেবতাত্রয়ের দাবি হলো অনসূয়াকে নগ্ন দেহে খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। এই নারী অতিথিদের দাবি পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের বালকে রূপান্তরিত করে নেন। তারপর নানা কাহিনী। অনেক নাকানি-চোবানির পর দেবতারা উদ্ধার লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেই স্মৃতি বহন করে তিন বালদেবতা এখানকার মন্দিরে বিরাজ করছেন।

শুচিন্দ্রমেও ঊর্ধ্ব-দেহ অনাবৃত করে মন্দিরে প্রবেশ করার বিধি। শিবের একটি সুন্দর মানুষ মূর্তি আছে এখানে। শিবের এই রকম বিগ্রহ আর কোথায়ও দেখিনি, আছে বলেও শুনি নি। মন্দির, বিগ্রহ ও

জনপদের নামকে কেন্দ্র করে নানা পৌরাণিক কাহিনী আছে। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু স্থানাভাব। ইন্দ্রের লুব্ধ দৃষ্টির শিকার হয়ে অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন গৌতমের শাপে। আর ইন্দ্রের দেহে ফুটে উঠেছিল সহস্র যোনি চিহ্ন। এইখানে তপস্যা করে, চিকিৎসিত হয়ে, ইন্দ্র নিরাময় বা শুচি হন। তাই জায়গাটির নাম হয়েছে নাকি শুচিন্দ্রম। কাছেই কিন্তু ঔষধি বনের জঙ্গল আছে। নাম ভানলাই পাহাড়। গন্ধমাদন নিয়ে যাবার সময় এক টুকুরো পাহাড় হনুমানের মাথা থেকে এখানে ভেঙ্গে পড়েছিল বলে কিংবদন্তি। এই গল্প নানা স্থানে ভিন্ন পরিবেশে পরিবেশন করা হয়েছে। স্থান কাল পাত্র নিয়ে তাই মাথা ঘামানো নিরর্থক। মূল মর্ম কথাটি সেই হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বোধ করি এক।

নাগেরকয়েল পর্যন্ত তো পুরণো রাস্তা, যে রাস্তায় তিরুনেলভেলি থেকে আমরা এসেছিলাম। এখানে পঞ্চ মুণ্ড সর্পমন্দির আছে বলে শুনেছি। কয়েল মানে মন্দির। নাগ যে সাপ তা আমরা সকলেই জানি। সমুদ্র উপকূলবর্তী বঙ্গ দেশে সাপের খুব উৎপাত। সেখানে সাপ তাই পুজো পায় একটু বেশি করে। বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে আড়ম্বরে মনসা পূজা হয়। মনসা গ্রামের নামও আছে সে দেশে। এখানে আমরা যান বদল করে ত্রিবান্দ্রমের বাস ধরলাম। কেরল ও মাদ্রাজ দুই রাজ্য সরকারেরই পরিবহন সংস্থার বাস আছে। আমরা কাছে মাদ্রাজ সরকারের একটা পেয়ে তাতেই উঠে বসলাম। মজুরের জুলুম এখানে সীমাহীন। বাস কনডাকটর এবং সাধারণ ভাবে অন্য যাত্রীরা মজুরদের এই জুলুমবাজির অপ্রত্যক্ষ সমর্থক। এক টাকা মজুরিও যার হতে পারে না, তার জন্য চার টাকা দাবি শুনে তো আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। জেদ চেপে গেল। যা থাকে ভাগ্যে জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করব না। সে দুর্বোধ্য ভাষায় যত চিৎকার চেঁচামেচি করে তত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা আমাদের বক্তব্যে অটল রইলাম। এই দৃঢ়তায় ফল হয়েছিল। জনৈক স্থানীয় যাত্রী একটা রফা করে দিয়েছিলেন। কনডাকটরাও ওদের ভয় পায়। ওরা নাকি হিংস্র প্রকৃতির!

কন্যাকুমারী জেলাকে স্থানীয় লোকেরা সংক্ষেপে কে-কে জেলা বলে। নাগেরকয়েল জেলা শহর। এর দক্ষিণে যতটা উত্তরে তার চারগুণের বেশি। কোভালম্ বীচের সামান্য দক্ষিণ থেকে কেরল রাজ্যের শুরু হয়েছে। কোভালম বীচ বাস থেকে আমরা দেখতে পাই নি। তার সৌন্দর্য অতুলনীয়। এই বেলাভূমি শীঘ্রই নতুন সাজে সজ্জিত হবে। ভারত সরকার আরব সাগরের তীরে বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য কুঞ্জবন গড়ে তুলছেন। কথাকলি নাচ, আয়ুর্বৈদিক মতে অঙ্গ সংবাহন, তৈল স্নান, যোগ-ব্যায়াম ইত্যাদির সঙ্গে ধ্যান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

কিন্তু নাগেরকয়েল থেকে ত্রিবান্দ্রম সমগ্র পথটির প্রাকৃতিক শোভারও বুঝি কোন তুলনা নেই। এ রাস্তাও সেই পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার সানুদেশ দিয়ে চলেছে সোজা উত্তরে। পথের দু পাশই প্রকৃতি তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে অপরূপ করে সাজিয়ে দিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না সহজে। বড় দুঃখ এগুলি পলকে পার হয়ে যাচ্ছি। সেই পরিচিত ধান ক্ষেত, কাঁঠাল, তেঁতুল, নারকেলের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে কফি ক্ষেত। দু-চারটি আম শুপারীর গাছও চোখে পড়ছে। যতই ত্রিবান্দ্রমের দিকে এগোচ্ছি ততই নরনারীর চেহারার রুক্ষতা কমছে, বেশবাসে সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হচ্ছে।

ডকটর নীহার রায় বলেছেন বাঙ্গালীর সঙ্গে দক্ষিণীদের মিল বেশি। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক্ থেকে কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে জানি না। তবে কেরলের মানুষ দেখে ডকটর রায়ের কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে। বাংলার মত এখানে একটা বলিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে। মধ্যবিত্ত মানুষই সমাজের সর্ববিধ উন্নতির অগ্রদূত। আজকাল গৌরব করে শ্রমিক কৃষক বলা হয় বটে, তা তাদের দলে পাবার জন্য। এ ক্ষেত্রেও নেতারা সব কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ।

কলকাতা শহর দেখতে অভ্যস্ত চোখ ত্রিবান্দ্রম শহরের ক্ষুদ্র দুই-একটি এলাকা ছাড়া অন্য অংশকে শহর বলতে দ্বিধা করবে। পরিচ্ছন্ন রাজপথের 'পর তরু-বীথিকায় ছাওয়া অনুচ্চ সপ্রাঙ্গণ বাড়ি যে শহরের সীমানার মধ্যে থাকতে পারে, দু-চারটি নয়—শত শত, তা এই কেরলে এসে জানতে হয়।

ত্রিবান্দ্রম কেরল রাজ্যের রাজধানী। এটি যখন করদ মিত্র রাজ্য তখনও রাজধানী ছিল এখানে। পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আরব সাগর তীরে গড়ে উঠেছে এই শহর। স্বাধীন ভারতবর্ষে কেরলই প্রথম রাজ্য যেখানে বিরোধী দল একটি অকংগ্রেসী সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মলায়লম ভাষাভাষী কেরল রাজ্য গঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সনে। কে এম পানিককর কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্যটি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সমাজকে এড়িয়ে চলবার সাধ্য নেই। শিক্ষিতের হার এখানে সর্বোচ্চ। গোলমরিচ রবার ও কফির প্রায় একচেটিয়া উৎপাদকও এই দেশটি। খৃষ্টান মিশনারি কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এই রাজ্যের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সুন্দর করে রাজ্যটিকে সাজিয়েছেন। গুণকীর্তন বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গেল। কিন্তু এর কোনটাই তো মিথ্যা নয়।

ঘটনাচক্রে অনেকদিন আগে একবার বামপন্থী কম্যুনিষ্টদলের, সর্বভারতীয় নেতা ও কেরলের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে মিনিট পনের নিভৃতে আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। তখন বনগাঁ কৃষক সম্মেলন হচ্ছে। সেই সম্মেলন থেকে ফেরার পথে মধ্যমগ্রামে একটা প্রোগ্রাম ছিল। মধ্যমগ্রাম স্টেশনের মাঠে আমি ভোরে বেড়াতে গিয়েছি। একখানা গাড়ি এসে সেই মাঠে দাঁড়াল। ফাঁকা মাঠে ভবানী সেন মশায়কে নামতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। ঐ গাড়িতে ছিলেন নম্বুদ্রিপাদ। এখানে মীটিং হবার কথা। অত সকালে যে ওঁরা আসবেন উদ্যোক্তারা তা আশা করতে পারেন নি। তাই তাঁরা তখনো হাজির হন নি। ভবানীবাবু বিব্রত বোধ করছিলেন। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে ই এম এসকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি দলের লোকজনের খোঁজে গেলেন। একজন সর্বভারতীয় নেতা আরও মুখ্যমন্ত্রী, আমি আর কি আলাপ করব? গাড়ির দরজাটা খোলাই ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুই-একটা কথা কইছিলাম। তিনি হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। চারিপাশের নারকেল গাছ ও কলা ঝোপের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কেরলের সঙ্গে এর বস্তুতঃ কোন তফাৎ নেই। মুগ্ধ মনে স্বগতোক্তির মত বললেন—আসুন, আমার কেরলে দেখবেন আপনাদের দেশের সঙ্গে তার সাদৃশ্য কি গভীর। এ কথা পূর্বেও শুনেছি। লোকে বলে পূর্ব বাংলার সঙ্গে মিলটা আরো বেশি, তাও জানালাম। তিনি নিরুত্তর দেখেন নি। উদ্বাস্তুদের খোঁজখবরও নিলেন কিছু। ইতিমধ্যে ভবানী সেন মশায় দলীয় লোকজন নিয়ে হাজির হয়েছেন। আমি সরে এলাম। নম্বুদ্রিপাদের কয়েক মিনিটের আলাপে মুগ্ধ হয়েছি—এবং মনে বাসনা জেগেছে সুযোগ হলেই কেরল যেতে হবে। কত বছর পরে সেই সুযোগ আজ হয়েছে। দেরি হোক তবু হয়েছে, সেজন্য ভাগ্যবিধাতাকে প্রণাম করি। কেরলে এসে বুঝেছি নম্বুদ্রিপাদ সত্যই বলেছিলেন বাংলার প্রকৃতি আর কেরলের প্রকৃতির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষগুলোকেও একটু বেশি আপনার মনে হয়। ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ত্রিবান্দ্রমে আমরা রেল স্টেশনের নিকট কর্পোরেশনের লজ-এ উঠেছিলাম। কর্পোরেশন আধা সরকারী ব্যাপার, তাই বোধ হয় কর্মচারীরা এখানে অমনোযোগী। বেলা দশটার মধ্যেই আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম। শান্ত শহর, জীবন চলে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে। দ্রুত স্নানাহার সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম নগর পরিক্রমায় আমাদের তালিকায় ত্রিবান্দ্রমে দর্শনীয়

বস্তুর মধ্যে পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরটিই ছিল প্রধান। তাই হাঁটতে হাঁটতে সেখানেই গেলাম সর্বাগ্রে। আদালত পাড়ার মধ্য দিয়েই পথ। তবু পথে তেমন ভিড় নেই। পায়ে হাঁটা মানুষের চেয়ে যানবাহন এখানে কিঞ্চিৎ বেশি মনে হলো। রাস্তা সামান্য অসমতল। হাঁটবার সময় চড়াই-উৎরাই, তা যত সামান্য হোক, বেশ অনুভব করা যায়। চড়াইয়ে উঠতে ক্লান্তি আসে, গতি মন্থর হয়।

পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির-প্রাঙ্গণ বড় রাস্তা থেকেই শুরু। আসল মন্দিরটা ভেতরে। কিছু দোকান, বাড়িঘর, একটা বড় পুকুর পেরিয়ে এই মন্দির। দুপুরে বন্ধ থাকে। খুলবে সেই বিকেল ৫টার সময়। আমরা কালক্ষেপ না করে ফিরে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। কোভালম সৈকত, মৎস্য সংগ্রহশালা, যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল। বাস স্ট্যাণ্ডে বিজয়ন নামে একটি যুবক যেচে আলাপ করলে। কোথায় যাবেন? বাংলা থেকে আসছেন বুঝি? যুবকটির বয়স কম। তথাকথিত সৌজন্যের ধার ধারে না। সোজাসুজি কাজের কথা বলে। এতে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেও, পরে ভাল লাগে। বাসে করে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দেবার প্রস্তাব করল সে। বাস ভাড়া ও দুটো টাকা মাত্র তার দাবি।

প্রথমে সামান্য সংশয় যে না ছিল তা নয়। কিন্তু একটা পরিচিত লোক থাকলে যে অনেক সুবিধা তা আমরা ঠেকে শিখেছি। তাই ছেলেটির হাতে নিজেদের সঁপে দিলাম। যেখানে যাই ৫টার মধ্যে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে ফিরে আসবার প্রয়োজনের কথা তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলে সে আমাদের আশ্বস্ত করে বলল—সেজন্য কোন ভাবনা নেই; আমার আশঙ্কার কথা অবশ্য গোপন করলাম না। কোভালম্ বীচ ১৮ কিলোমিটার—বাসে যাওয়া-আসা, অন্যান্য স্থানে ঘোরা-ফেরার জন্য ঘণ্টা চারেক সময় কি যথেষ্ট? সে আমার কথার উত্তর দেবার আগে একটা বাস এসে দাঁড়াল। তার নির্দেশে দ্বিতল সেই বাসখানার উপরের তলায় বসলাম। কোথায় চলেছি আমরা? সে জানাল মৎস্য সংগ্রহশালায়।

শহরের ছোট-বড় নানা পথ ঘুরে এঁকে বেঁকে বাস চলেছে। কেরলের সেই বিখ্যাত নারকেল তরুবীথি ঘেরা ছোট ছোট সরল রেখার মত খালে ছবির মত নৌকোগুলো, দাঁড়িয়ে আছে। নারকেল ছোবড়া বোঝাই করা এই সব নৌকোর ছবি দেখেছি বিস্তর। এবার তা নিজের চোখে দেখে ধন্য হলাম।

আমরা ভিন্ন পথে ফিরেছিলাম। বাসে যাওয়ার এই সুবিধা। রুট নং বদল করলে নতুন পথে ঘোরা যায়। বিজয়নভাই যাওয়া-আসার পথে এক-একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে চলেছেন—এটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানসভা, অমুক কলেজ ইত্যাদি। বিধানসভা বা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সেক্রেটারিয়েট এ সব কিছুই দেখা হয়নি, দেখেছি কতকগুলি পাকা বাড়ি।

বাসটা এক সময় হুস করে জঙ্গল ঘরবাড়ির থেকে বেরিয়ে যেন হঠাৎ দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। একদিকে তার শান্ত সুনীল সমুদ্র, অন্যদিকে বহু দূর প্রসারিত বেলাভূমি। সমুদ্রতীর ধরে আমরা চলেছি। রাস্তাটি চমৎকার। তার দুপাশে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। খানিক পরে ত্রিবান্দ্রম বিমান বন্দর ডাইনে রেখে আমরা রাজ্য সরকারী মৎস্য সংগ্রহ-শালায় উপস্থিত হলাম। বালুময় প্রান্তরে একটি বাড়িতে এই সংগ্রহশালা। একেবারে হাল আমলে তৈরি। বাগানটি সুদৃশ্য, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

দেওয়ালে সারি সারি কাচের চৌবাচ্চা বসিয়ে বহু রকম মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণী রাখা আছে। সোমবার দিন বন্ধ থাকে। আমরা যখন দেখতে গিয়ে-ছিলাম তখন জনা দশেক বাঙ্গালী ছাড়া আর কোন দর্শক ছিলেন না। রং-বেরঙের মাছের চেয়ে রঙীন কচ্ছপগুলি বিশেষ আকর্ষক মনে হয়েছিল। এগুলির কোনটির মুখ প্রায় পাখীর ঠোঁটের আকার নিয়েছে, কোন কোনটির সামনের দু'টি হাতা অচিরেই ডানায় রূপান্তরিত হবে বলে সহজেই মনে হবে; কোন কোনটার গাত্রবর্ণ রামধনুকেও হার মানায়। কুমীরও আছে। সমুদ্রের তলায় বিচিত্র সব জীব বাস করে, তার বিশেষ কোন

খবর আমরা রাখি না। সেখানকার বিস্ময়কর রাজ্যের অভাবিত ও অকল্পনীয় বৈচিত্র্যের প্রতি এই প্রদর্শনী আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। একটি কুমীরও ছিল এখানে। সামুদ্রিক অনেক অচেনা মাছের সঙ্গে মিষ্টি জলের অনেক চেনা মাছ আছে।

মাথার উপর তখন উত্তপ্ত সূর্য। তবু হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র বেলার দিকে গেলাম। দিগন্ত-প্রসারিত নিস্তরঙ্গ জলরাশি। এ দৃশ্য মনকে পুলকিত করে, দেহে শিহরণ জাগায় ঠিকই, কিন্তু সমুদ্র দেখার সাধ মেটায় না। সফেন ও উত্তাল না হলে সমুদ্র তার স্বমহিমা-ভ্রষ্ট হয়। এখানেই ঠিক করে ফেললাম কোভালম আর যাব না। সময়ও যথেষ্ট ছিল না। বিজয়ন প্রস্তাব করলে—তবে চলুন এরোড্রোম দেখে আসি। বিজয়ন দমদম বিমান বন্দর দেখে নি, সে জানেও না এই বিমান বন্দরের সীমানায় আমরা বাস করি। তবু বাসে উঠবার সময় দেখতে পেলাম ত্রিবান্দ্রম বিমান বন্দর। মৎস্য সংগ্রহ-শালার বিপরীত দিক্ পর্যন্ত বিস্তৃত বিমান ক্ষেত্রটি এদিক্ থেকে ছন্নছাড়া শ্রীহীন বলেই মনে হয়েছিল।

অন্য একটি রুটের বাস ধরে শহরের মধ্যস্থলে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরের নিকট ফিরে এলাম। মন্দির খুলতে তখনও ঘণ্টা খানেকেরও বেশি বাকি আছে। আমরা শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখে সময় কাটিয়ে দিলাম। একটি খ্রীষ্টান স্কুলের খ্রীষ্টান শিক্ষিকাগণ ছাত্রীদের নিয়ে এসেছেন মন্দির দেখতে। শাদা শাড়ীর উপর এক ধরণের মস্তকাবরণ শিক্ষিকাদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। পোশাক দেখে সহজেই চেনা যায় তাঁদের মিশন ও বৃত্তি। ছাত্রীদেরও ইউনিফর্ম। সাদা খাটো স্কার্ট ও জামা। স্কুলের বাইরে কেরল ও মাদ্রাজের কুমারীরা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট ও জামা পরেন। একখানা পৃথক বস্ত্রখণ্ড ঊর্ধ্বদেহে শাড়ীর আঁচলের মত করে জড়িয়ে দেন। কিছু কলেজের মেয়েদেরও এই পোশাক দেখেছি। খ্রীষ্টান মিশনারী কলেজ থেকে হিন্দু মন্দির দেখতে আসাটাই আমার নিকট বিশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত মনে হয়েছে। খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও ভারতের অতীত শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এঁরা শ্রদ্ধা হারান নি দেখে আনন্দ হলো। এঁরা সেই ইংরেজী প্রবচনটির মর্মার্থ অনুধাবন করেছেন—**A nation which forgets its past has no future**।

এ মন্দিরেও ঊর্ধ্বদেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত করেই ঢুকতে হয়। যে ভদ্রলোক নগদ দক্ষিণার বিনিময়ে জামা জমা রাখেন তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন, টাকা পয়সা সঙ্গে রাখবেন। অন্যান্য মন্দিরে জামা খুলে হাতে নিয়ে ঢুকেছি। এখানে সে পদ্ধতি অচল। মন্দিরে নানা প্রণামী দেবার জন্য টাকা পয়সার দরকার হয়। জামা কাপড়ের সঙ্গে রেখে যাওয়া নিরাপদও নয়।

মূল মন্দির ঘিরে গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ, রাম লক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদির আরও বহু ছোট বড় মাঝারি ধরণের মন্দির উঠেছে। নৃত্যমণ্ডপ, সভামণ্ডপ ইত্যাদিও যথারীতি আছে। এ মন্দিরে সর্বাধিক দৃষ্ট হয় দীপলক্ষ্মী ও প্রদীপের বাহুল্য। নারকেলের তেল দিয়ে প্রদীপগুলি জালানো হয়। প্রত্যহই জ্বলে, তবে উৎসবের দিনে নাকি লক্ষাধিক দীপ জ্বলে। ছোট ছোট বিজলি আলোর বাল্‌ব্‌ এখন অধিককাংশ প্রদীপের স্থান নিয়েছে। একটি মন্দিরের সমগ্র দেওয়ালটিতে ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ বসানো। পশ্চিম দরজায় রয়েছে দু'টি সুদৃশ্য দীপস্তম্ভ।

মূল মন্দিরে অনন্ত শয়নে শ্রীবিষ্ণু। মহাপ্রলয়ের পর বিশ্বসংসার প্রলয় সাগরে ডুবে গেলে শ্রীবিষ্ণু সেই সাগর জলে অনন্তনাগ শয্যা গ্রহণ করেন। বিশাল মূর্তি। দক্ষিণে ঈষৎ কাত হয়ে পদযুগল ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সর্পাসনে যোগনিদ্রা মগ্ন হয়ে আছেন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। মূর্তি এতই বড় যে একটি দরজা দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন পাওয়া যায় না। ডান দিক্‌কার দরজা দিয়ে শ্রীপদ, মধ্য দরজায় নাভিমণ্ডল এবং বাম দরজায় মস্তক ও মুখমণ্ডল দর্শন করতে হয়। নাভি ভেদ করে উঠেছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। তার উপরে বসে আছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত বহু দেবদেবী ঘিরে আছেন এই শ্রীমূর্তি। বাহির-দেওয়ালেও এইসব চিত্র।

বিষ্ণু প্রণাম মন্ত্রের মতই এখানে বিগ্রহ

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥

শুধু দেবতা নন, সামনের দিকে দুই প্রান্তে দু'জন মুনিও রয়েছেন। এর তাৎপর্য আমাদের জানা নেই। তবে শ্রীশ্রী চণ্ডী থেকে জানা যায় এই সময় শ্রীবিষ্ণুর কানের মল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর জন্মগ্রহণ করে। তারা সামনে পদ্মাসনে ব্রহ্মাকে দেখেই তাঁকে মারতে উদ্যত হয়। বিষ্ণু থেকে যারা জন্মলাভ করেছে বিষ্ণু ছাড়া আর তো কেউ তাদের মারতে সমর্থ নয়? ব্রহ্মা তখন স্তব-স্তুতি করে যোগমায়াকে সন্তুষ্ট করলে নিদ্রারূপিণী ভগবতী দেবী শ্রীবিষ্ণুর নাক মুখ চোখ বুক থেকে বেরিয়ে এলেন। বিষ্ণু জেগে উঠেই অসুরদ্বয়ের সঙ্গে শুধু হাতে সংগ্রাম শুরু করলেন। সে যুদ্ধ চলেছিল পাঁচ হাজার বছর ধরে।

পাঁচ হাজার বছর পরে অসুররা শ্রীবিষ্ণুর যুদ্ধের প্রশংসা করে বলল—তুমি চমৎকার যুদ্ধ করেছ, এবার আমাদের কাছে বর চাও। বিষ্ণু বললেন—আমার হাতে তোমরা মর—এই বর দাও। অসুররা প্রমাদ গুনল। পালাবার পথ নেই। চারিদিকে জল আর জল ছাড়া কিছু নেই। তারা আত্মরক্ষার শেষ পথ হিসেবে খুব বুদ্ধি করে বলল—আমরা তোমার হাতে মরতে পারি কিন্তু জল ছাড়া অন্য কোন জায়গায় মারতে হবে।

বিষ্ণু অসুরদের ধরে নিজের উরুর 'পর রেখে হত্যা করেছিলেন। এই ভাবে অসুরদ্বয় তাদের হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। এ যুদ্ধে কে জিতেছিলেন তাতে আমার সংশয় আছে। বিষ্ণু না ভগবতী উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর আরাধ্য তাও বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। এই এই সব অর্ধ জানা কথা ভাবতে ভাবতে মন্দির ছেড়ে এলাম। সামনে পড়ল সারা দেহে মাখনলিপ্ত একটি বিরাট হনুমান। মাখন এখানে সুলভ বলেই বোধ হয় বেশ পুরু করেই লাগানো—আর গন্ধটা মাখনেরই, চর্বির নয়। পদ্মনাভ স্বামীর প্রভাব এ দেশে খুব। এই রাজ্যের রাজা নিজেকে 'পদ্মনাভদাস' অর্থাৎ পদ্মনাভের চাকর বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন।

পদ্মনাভ মন্দির থেকে স্টেশনে যাবার পথে একটি নতুন গণেশ মন্দির পড়ে। দেওয়ালীর ঠিক পূর্বেই আমরা গিয়েছিলাম। এখানে তখন উৎসব শুরু হয়েছে। গণপতি মন্দিরে নারকেল উৎসর্গ করা এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। মন্দিরের সামনে পাথরের একটা চৌবাচ্চা এমন করে তৈরি করা হয়েছে যে, একটি ঝুনো নারকেল একটু জোরে তার গায়ে ছুঁড়ে মারলেই কেটে দু-তিন খণ্ড হয়ে যায়। লোক আসছে আর দু', চার, পাঁচ, দশটা নারকেল দমাদম ফাটাচ্ছে। একজন মজুর শ্রেণীর লোক পূজার্থীকে এক আধফালি নারকেল প্রসাদ হিসেবে দিচ্ছেন। অবশিষ্টাংশ বস্তাবন্দী করছেন। চার-পাঁচ বস্তা ভাঙ্গা নারকেল তার ভাণ্ডারে জমা দেখলাম।

আমরা যেমন পাঁঠাবলি মানত করি, এদেরও তেমনি নারকেল মানত। উপচারের ভিন্নতা ঘটেছে নানা কারণে—কিন্তু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম গোটা ভারতবর্ষের মানসিকতা যে এক তাতে আর সন্দেহ কি!

আমরা আসার পথে একটি সুদৃশ্য মসজিদ দেখেছি। এই রাজ্যে মুসলীম লীগের খুব বাড়-বাড়ন্ত কেরলে শিক্ষা মন্ত্রীই মুসলমান। আমরা ওখানে থাকতে থাকতে এই ভদ্রলোক বিধান সভায় একটি ভাল কথা বলেছিলেন। 'কথাকলি' নাচের স্কুল খোলা নিয়ে আলোচনা হতে হতে ছাত্র অশান্তির কথা ওঠে। জনৈক সদস্য অভিযোগ করেন, ছাত্ররা আজকাল প্ররোচনা-মূলক ধ্বনি তুলছে। এর প্রতিবাদ করে মন্ত্রী মশায় (মিঃ কয়া) বলেছিলেন, ছাত্রদের ধ্বনি শিক্ষকদের ধ্বনি থেকে অধিকতর প্ররোচনা-মূলক নয়। এতবড় সত্য কথা আজকাল কেউ বলতে সাহস করেন না।

শিক্ষা নিয়ে কেরলে বড় একটা তোলপাড় হয়ে গেল। মিশনারী কলেজগুলির সঙ্গে সরকারের নীতির

বিরোধ ঘটেছিল। তার ফলে কলেজগুলি অনেকদিন বন্ধ থাকে। এখন একটা মিটমাট হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন নানান গোলমাল। নানা রকম শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য যেমন এই গোলমাল, তেমনি বিশৃঙ্খলা ঘটে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার অপপ্রয়াসে। বিনোবাজি বলেছেন —বিচার বিভাগের মত শিক্ষাকেও সরকারী অর্থপুষ্ট করতে হবে কিন্তু সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, এই রকম ব্যবস্থায় শরীরশ্রমভিত্তিক শিক্ষাই একমাত্র সার্থক শিক্ষা। কেরল শিক্ষায় অগ্রগণ্য রাজ্য বলে এর শুভারম্ভ এখান থেকে হতে পারে।

আসবার পথে আমরা দূর থেকে আর একটি উৎসব দেখেছিলাম। সেখানে সুসজ্জিত একাধিক হাতিকে দাঁড় করিয়া দেওয়া হয়েছে অভ্যর্থনার জন্য। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সব গণ্যমান্য অতিথিরা আসবেন। মহারাজার ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজবাড়ি থেকে জনগণকে প্রদত্ত উপহার চিত্তিরা তিরুনাল মেডিকেল সেণ্টার উদ্বোধন হচ্ছে বলে শুনলাম। আরও একটি জিনিস আমাদের চোখে অদ্ভুত ঠেকেছিল। পুকুরের মত স্টেডিয়াম। শহরটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর। তাই জল জমে না কোথায়ও। পুকুরের মত করে কেটে নিয়ে তলাটা খেলার মাঠ আর পাড়গুলিতে আসন বসিয়ে গ্যালারি করা।

কেরলে এলে সকলেই একবার থুম্বার রকেট কেন্দ্র দেখতে যান। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওর কিছুই বুঝি না আমরা। কয়েকটি বাড়িঘর ও যন্ত্রপাতি দেখতে যাবার কোন প্রেরণা পাই নি। এখানেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম সরাভাই স্পেস্ সেণ্টারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর্ণাকুলাম কোচিন

ত্রিবান্দ্রম থেকে রাত ন'টায় এর্ণাকুলাম প্যাসেঞ্জার ধরে কোচিন যাত্রা করলাম। এর্ণাকুলামএ গাড়ি বদল করতে হয়। ভোরে আমরা এর্ণাকুলাম পৌঁছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে মালাবার এক্সপ্রেস পাওয়া গেল। দু'টার মধ্যে আমরা স্বপ্নরাজ্য কোচিন-এ পৌঁছে গেলাম। কেরল রাজ্যটাই শুধু স্বপ্নমোহাচ্ছন্ন করে না, এর জায়গার নামগুলিই আমার বেশ রোমাণ্টিক মনে হয়।

কোচিন স্টেশনের পাশেই মারুতি হোটেল। পশ্চিমী কায়দায় সাজানো। কার্পেট বিছানো লাউঞ্জ। ঘরে ঘরে ফোন। এলাহি কাণ্ড। দক্ষিণা যে বেশি হবে তা ধরেই নিয়েছিলাম। দশ পনের টাকা যাই হোক্ একটা ঘর নিয়ে একটু চান করে নেব আর মালপত্র রেখে ঘুরে বেড়াব। রাত্রিবাসের ঝামেলা নেই। কিন্তু হোটেলওয়ালা এক ঘরে তিন জনকে থাকতে দিতে নারাজ। সেজন্য জনপ্রতি আরও চারটাকা দাবি করল। আমরা একেবারে বিনা বাক্যব্যয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্টেশনে ফিরে এসে মাল জমা দিলাম রেল কোম্পানির লেফট লগেজে। তারপর একটু বে-আইনী করে উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামাগারে স্নান ও শৌচক্রিয়া সেরে নিলাম। অতঃপর যথারীতি কফি ও বড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম—কোচিনকে আবিষ্কার করতে।

রেলগাড়ি শেষ হয়েছে কোচিন বন্দরে। এটা একটি দ্বীপ। কোচিন বন্দর তৈরি করার সময় সমুদ্রগর্ভ থেকে যে মাটি খুঁড়ে তোলা হয়েছিল সেটা জমিয়ে এই সুন্দর দ্বীপটি তৈরি করা হয়েছে। নাম উইলিংডন আইল্যাণ্ড। একপারে কোচিন শহর, অপর পারে এর্ণাকুলাম। সব মিলিয়ে আরব সাগরের রাণী নামে খ্যাত এই কোচিন।

আমরা প্রথমে বন্দরের দপ্তরে খোজখবর নিলাম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তরে। এঁরা উভয়েই খুব সৌজন্য সহকারে আমাদের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন। ঘণ্টায় পঁচিশ টাকা করে দিলে ব্যাকওয়াটারে মোটর বোট করে ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। দিশি নৌকা আমাদের পছন্দ নয়। তাই ঠিক করলাম কোচিন শহরে তো যাই —তারপর একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

ছায়াঘন ট্যুরিস্ট আপিস প্রাঙ্গণ থেকে ঘাট দেখা

যায়। মাঝিরা যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে শুনতে পা আমরাও সেদিকে পা বাড়ালাম। হঠাৎ একটি মোটাসোটা গোবেচারি গোছের লোক আড়াল থেকে কোঁচায় কাপড়টা ঈষৎ সরিয়ে একটা মদের বোতল এক ঝলক আমাদের দেখিয়ে আবার ঢেকে ফেললো। এ টেকনিক আমাদের অজানা নয়। চৌরঙ্গী পাড়ায়, গড়ের মাঠে এ ত নিত্যকারের ব্যাপার। বন্দর শহরে বিদেশী দ্রব্যাদির কলাও কারবার চলে। আমরা উপেক্ষা করেই এগিয়ে গেলাম। দশ পয়সা মাত্র দিয়ে বেশ বড়সড় খাঁড়ি পার হয়ে কোচিন শহরে যাই। একখানা ছোট বোট, একটি মাত্র মাঝি, দাঁড় কিন্তু দুখানা। সে একাই দুহাতে দুখানা দাঁড় চালায়। জল শান্ত। নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়।

কোচিন শহরের সমুদ্রের এই দিকটা জনবিরল বলে মনে হলো। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য তাও পাইকারী ও চালানী কারবারের প্রাধান্য বেশি। কোচিন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। খানিকটা এলোমেলো ঘোরাফেরা করলাম পায়ে হেঁটেই। কোথায় সিনাগগ, কোথায় বা ডাচ প্রাসাদ কে জানে, দেখিয়ে দেবার লোক হলো না। জলবিস্তার আমাদের আকুল করে রেখেছে। অন্য কিছুতে মন টানছে না। যেতে যেতে একটা বড় গোছের হোটেল পেলাম—শ্রীকৃষ্ণ হোটেল। এখানেই কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। বাইরে যতটা চমক খাবারটা ততটাই জঘন্য। মিষ্টি চাইতে এনে দিল পাকা কলা সেদ্ধ। ভূভারতে আর কোথায়ও এই বিচিত্র খাদ্যের নাম শুনি নি। মুখে তোলা গেল না। সব জিনিসের দামও আকাশ ছোঁয়া। একটা কোকাকোলার দাম নিল পঁচাত্তর পয়সা। বিদেশী পেয়ে ঠকিয়ে নিল বলেই ধারণা হলো।

এখানকার যাত্রীবাহী মোটর লঞ্চ চালান রাজ্য নদী-পরিবহন কর্পোরেশন। তুলনামূলক ভাবে ভাড়া খুবই সস্তা, পনের পয়সা ভাড়ায় কোচিন থেকে এর্ণাকুলাম যাওয়া যায়। রেলের ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা। দুই-চার মিনিট অন্তর অন্তর মোটর লঞ্চ যাত্রী নিয়ে নানা দিকে যাচ্ছে। মহিলা যাত্রীর সংখ্যা পুরুষের সমান না হলেও বেশ চোখে পড়ার মতই বেশি। বাংলার পুরুষেরা যেমন জাতীয় পোশাক ধুতি অথবা বিদেশী পোশাক প্যান্ট পরেন এখানেও তেমনি পুরুষের পোশাক প্যান্ট বুশ সার্ট অথবা লুঙ্গি-জামা। কিন্তু আধুনিকারা আঞ্চলিক পোশাক বর্জন করে শাড়ী ধরেছেন প্রায় সবাই। কথা না বলা পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না কে কেরলী আর কে বাঙালী। গ্রামের নারীদের পোশাক অবশ্য ভিন্নতর। সেই লুঙ্গির উপর ব্লাউজের মত একটি জামা মাত্র। দেখতে যে খারাপ তা নয়।

ত্রিবান্দ্রমের চেয়েও এখানকার মানুষ আরো ভাল লেগেছিল। সে হয়তো প্রকৃতির পরিবেশের প্রভাবে। তবে একথা ঠিক যে এরা অনেক বেশি ধীর এবং নম্র কিন্তু তার মধ্যে দুর্বলতা বা দ্বিধার অবকাশ নেই। দক্ষিণের বহু মানুষকে খুবই স্পর্শকাতর মনে হয়েছে। সচেতন ভাবে নিজেদের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে একটা অমার্জিত স্থূল আচরণ প্রকট হয়ে পড়ে। এ দেশে সেটা অনুভবগ্রাহ্যরূপেই অনুপস্থিত।

কোন উপায় না পেয়ে আমরা সরকারী পরিবহনের লঞ্চে একাধিকবার এর্ণাকুলাম, কোচিন, কোচিন বন্দর ঘোরাঘুরি করলাম। শান্ত জল। এই হলো কেরলের বহুখ্যাত অপূর্ব সুন্দর ব্যাকওয়াটার। লঞ্চগুলি ঘাটে ঘাটে থামছে। যাত্রীদের ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চিৎকার যেমন নেই, তেমনি নেই লঞ্চ-ওয়ালাদের লগী ঠেলাঠেলি হাঁক ডাক। লোকাল ট্রেনের মত মিনিট খানেকের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। জাহাজ চলছে, বড় বড় জাহাজ। নোঙর করা জাহাজের বিদেশী নাবিকেরা যেন স্বর্গে দাঁড়িয়ে নিচের নৌকার বিক্রেতা রমণীর সঙ্গে দরদস্তুর করছেন, দামে পটলে মাল পছন্দ হলে পয়সাসহ দড়ির ঝাঁপি নামিয়ে দিচ্ছেন—দোকানী পয়সা রেখে জিনিস তুলে দিচ্ছে তার ঝাঁপিতে।

একটা মোটর লঞ্চ চার পাঁচটা বোঝাই নৌকা টানতে টানতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমরা নতুন যে দ্বীপ গড়ে তোলা হচ্ছে তার কাছে এসে পড়েছি। জল সেখানে একান্তই অগভীর। হাঁটাচলা করছে সবাই জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে। চাটাইয়ের বিধিনিষেধ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ভুল করে যানবাহন চড়ায় গিয়ে না ঠেকে। রাত্রে আলোর ব্যবস্থা আছে তা ঐ লাল মুখো খুঁটিগুলো থেকেই বুঝা গেল। পোলোর মত এক রকম গোল জাল দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে অনেকে। এগুলি কেউ বলে চীনা জাল। এক ফালি গুঁড়ির মধ্যখানটা খুঁড়ে ফেলে দিলে যা দাঁড়ায় তেমনি সব ডিঙ্গি নৌকো অনেক। গাছপালা প্রকৃতির কথা বলবার নয়, দেখবার।

খুব একটা গাঁয়ে গঞ্জের মধ্যে যেতে পারি নি। কেরলী গ্রামের মোহমায়াজালের কথা শুনেছি অনেক। যতটুকু দেখেছি তাতে শোনা কথায় বিশ্বাস হয়েছে।

দাক্ষিণীরা গয়না পরেন কম বলে শুনতাম। কিন্তু মাদ্রাজে মাদুরায় কম কিছু চোখে পড়ে নি। রামেশ্বরে গয়নার ভারে কান ছিঁড়ে পড়ছে। খাস ত্রিবান্দ্রমেও নিরাভরণা নারী দেখিনি। এখানে একাধিক জনকে দেখলাম কোন রকম গয়নার বালাই নেই। তাঁরা সধবাই হোন আর বিধবাই হোন, এবয়সে খ্রীষ্টান হলেও কিছু গয়না থাকা বেমানান হতো না। গয়না এ দেশে মর্যাদার মানদণ্ড হয়ে ওঠেনি বলেই মনে হলো।

সব দেশের মত এখানে নিত্য নানা উৎসব লেগে আছে বলা চলে। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন সামাজিক উৎসবে ধর্মের ভিন্নতা যোগদানের বাধা বলে বিবেচিত হয় না। অন্যতম প্রধান সর্বজনীন উৎসব নাকি নৌকা বাচ। ছিপ নৌকার বাচ—! বাট বৈঠা শত বৈঠার নৌকাকে এরা কি বলে তা আমাদের মাঝি বলতে পারেন নি—অর্থাৎ আমরা তাকে আমাদের প্রশ্নটা বোঝাতে পারি নি। জনৈক ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ স্থানীয় ব্যক্তিকেও বোঝাতে সমর্থ হইনি। বাচের নৌকা আর রেসিং বোট তাদের কাছে এক। বৈঠা আর দাঁড় দুটোকেই তরজমা করি 'ওর' বলে। যত বিশেষণই লাগাই 'বাট বৈঠা ছিপের' ইংরেজী হয় না, কথা দিয়ে ওর ধারণা দেওয়া যায় না। এসে দেখতে হয় তবে বোঝা যায়। কেরলে এই ব্যাকওয়াটার আর আমাদের দেশে বর্ষায় প্লাবিত বিলগুলির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য আছে।

প্রমত্তা পদ্মা দেখেছি, দেখেছি মেঘনার ভয়ঙ্কর রূপ, শান্ত শীতলক্ষা বা পুণ্যসলিলা গঙ্গারও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। ওদের কারও সঙ্গেই এখানকার জল-পথের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। মানুষকে ও নদীগুলির মর্জিমাফিক চলতে হয়। যেমন খুশি যখন খুশি ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু কেরলের এই ব্যাকওয়াটার নিয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই। যখন ইচ্ছে খুশি মত সকলেই সব কাজে লাগাতে পারেন। একেবারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ডিঙ্গি চালিয়ে চলছে নির্ভয়ে।

এক সময় আমাদের যাত্রা শেষ হলো। আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। আজই কোচিন ছেড়ে যাব। কিন্তু হায় আমাদের গাড়ি বাতিল। কয়লার অভাবে গাড়ি হ্রাস করেছেন কর্তৃপক্ষ। ভ্রমণসূচীতে গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিকার যার হাতে নেই তা হাসি-মুখে সহ্য করতে না পারলে যন্ত্রণা বাড়ে। এখান থেকে আমরা ট্রেনে কোয়েম্বাটুর যাব। সেখান থেকে বাসে করে চলব মহীশূর। পুরানো এই ভ্রমণসূচীই আঁকড়ে রইলাম আমরা।

কোচিন বন্দর থেকে কোয়েম্বাটুর......কিলোমিটার পথ। পথের দুধারে সেই ঘন সবুজ নারকেল সুপারির কুঞ্জ, আর কফি ও ধান ক্ষেত। তার মধ্যে ছোট ছোট বাড়িগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পটভূমিকায় আকাশ ও পৃথিবীর ফ্রেমে আঁটা একখানা নিটোল সুন্দর ছবি। গোলমরিচ লতা এর আগে দেখি নি। কফি গাছ আমাদের দেশের ভেরেণ্ডা ঝোপের মত কতকটা। স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে দিলে আট-দশ ফুট বড় হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক চাষের জন্য গাছগুলিকে ফুট চারেকের বেশি বাড়তে দেওয়া হয় না। কথিত আছে জনৈক মুসলমান ফকির মক্কা থেকে কফি বীজ এনে ম্যাঙ্গালোরে পশ্চিম ঘাট পর্বতের সানুদেশে প্রথম চাষ করান। সেখান

থেকে মাদ্রাজ ও কেরলে এই চাষ ব্যাপ্ত হয়েছে। এর বাণিজ্যিক সাফল্য যেমন একে জনপ্রিয় করেছে তেমনি আদর বাড়িয়েছে সর্বজনীন ব্যবহারে। কফি দক্ষিণ ভারতের অপরিহার্য পানীয়। চা এখানে অচল। ঘরে ঘরে কফির চাষ হয়। নিজেরাই ফলটা গুঁড়িয়ে ঘরেই কফি করে নেন। বাজারে কেনা নামী দামী কফির চেয়ে এগুলির স্বাদ ভাল, তাই কদরও বেশি।

গোলমরিচ তো সোনার দামে বিকোয়। পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট পাট স্বর্ণতন্তু নামে যে কারণে খ্যাত হয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে কেরলে গোলমরিচ কালো সোনা বলে আখ্যাত হয়। বনজ সম্পদ অর্থাৎ কাঠও কেরলে কম নেই। চেলা স্টেশনে গাড়িতে বসেই একটি কাঠের বড় কারখানা দেখা যায়। একাধিক হাতি সেখানে শুঁড়ে করে বড় বড় গুঁড়িগুলি সরিয়ে নিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। কারখানাটি সরকার পরিচালিত।

কেরল এত সুন্দর বলেই বোধ করি ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ভাইকমে ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। যেখানেই যাই সে দেশ ছেড়ে আসতে দুঃখ হয়। কিন্তু কেরল ছাড়তে মনটা যেন একটু বেশি বিষণ্ণ হলো। কতটুকুই বা দেখলাম! অবশ্য-দর্শনীয় অনেক জায়গা আমরা সময় ও অর্থাভাবে ছেড়ে দিয়েছি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশে বন্য প্রাণীর মেলা থেক্কাডির পেরিয়ারে যেমন এমনটি নাকি আর কোথাও নেই। ত্রিবান্দ্রম থেকে ২২৮ কিলোমিটার—যাওয়াই প্রশস্ত। শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালাডি যেতে না পারার দুঃখ ভুলব না কোনোদিন। এর্ণাকুলাম থেকে বাসে মাত্র ৫২ কিলোমিটার পথ তাই ব্যবস্থা করতে পারি নি। নৈসর্গিক সৌন্দর্য দর্শনের জন্য সৌন্দর্যপিপাসুগণ কুইলনকে কখন বাদ দেন না। এর্ণাকুলাম থেকে নৌকা করে যাওয়া যায়। কিন্তু অনেকটা দূর ১৪৮ কিলোমিটার। ত্রিবান্দ্রম থেকে বাসে যাওয়াই প্রশস্ত—মাত্র ৭০ কিলোমিটার।

কোচিন থেকে অশোক সোজা বাঙ্গলোর চলে গেলেন। আমরা নেমে পড়লাম কোয়েম্বাটুরে। উটি বাস কায় যাত্রীদের এখানে নামাতে হয়। আমরা উটি যাব না। মহীশূর যাব বলে এইখানে নামলাম। যারা সরাসরি বাঙ্গালোর চলে গেলেন তাঁরা বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর আসবেন। আবার ফিরতে হবে সেই বাঙ্গালোর হয়েই। আমাদের এক পথ দু'বার মাড়াতে হবে না।

রেলস্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভোর ছ'টায় বাস ছাড়বে। বাস স্টেশনটি বেশ খানিকটা দূরে। মোট ছ'ঘণ্টা লাগবে পৌঁছাতে। ভাড়া ৭ টাকা ৩০ পয়সা। আমরা পাঁচটার মধ্যে স্নানাদি সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

বাস স্টেশনটিতে এলাহি ব্যাপার। এদেশে বাস যেন রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। বাসের রুট চার্ট বিক্রী হয়। যাত্রীদের রিটায়ারিং রুম আছে। আগাম টিকিট বিক্রী ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। হাজার মাইলের পাল্লায়ও বাস যাত্রী বহন করে বাঙ্গালোর থেকে বোম্বাই। ভোর পাঁচটা, তখনও আলো ফোটেনি। এরই মধ্যে যাত্রীর ভিড়ে বাস স্টেশন ভর্তি। বাঙ্গালোরের দুখানা মাত্র বাস। সকাল ৬টা ও বিকেল তিনটে। যাত্রীর বহর দেখে স্থান সঙ্কুলান হবে কি না—এই ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মালপত্র নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে ওঠা কষ্ট। তাই প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। বাস এলে দুজনে গিয়ে তিনটে সিট দখল করে বসব, আর একজন মালের ব্যবস্থা করব। মাত্র মিনিট দশেক আগে বাসটি এসে দাঁড়াল প্ল্যান মাফিক কাজ করে কোন রকমে জায়গা পেয়েছিলাম।

মহীশূর

কোয়েম্বাটুর থেকে মহীশূর আসবার রাজপথের সবই রাজকীয় ব্যাপার। সে পথ জীবনে ভুলবার নয়। যাত্রারম্ভের পর প্রথম বাস থামল ভানীরতে। ছোটখাটো শহর মত জায়গা। একটা সাধারণ গ্রাম্য মন্দিরের নিকট বাস ঘুমটি। কনডাকটর আমাদের ভ্রমণ পরিচাল-

কের কাজ করলেন। বাস থামতেই তিনি জানিয়ে দিলেন এই মন্দিরে দক্ষিণ কালিকা বিগ্রহ নিত্য পূজিতা হন। দিনটা ছিল কালীপূজার। স্বভাবতই আমরা আগ্রহী হলাম। কিন্তু যে মাতৃমূর্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত এখানে তার দর্শন পাওয়া গেল না। শান্ত উপবিষ্ট মূর্তি। যাই হোক, কালীপূজার দিন মা'কে প্রণাম করার এই অভাবিত সুযোগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলাম। থিনেগোরঘাট নামক একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মাথা টপকে মহীশূরে যেতে হয়। পাহাড় ছোট বলে উপেক্ষার কোন ব্যাপার নয়। পায়ে হেঁটে ও পাহাড় ডিঙ্গানো আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। পাকদণ্ডীর মতো ঘুরে ঘুরে পথটি ২৭টি পাক খেয়ে চূড়ায় উঠেছে। এই রকম পথে নিরাপদ যন্ত্রযানে পাক খেতে খেতে ক্রমাগত ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতা যে ইতি-পূর্বে অল্পবিস্তর না হয়েছে তা নয়। তবু এ পথ অনন্য। কেননা বান্দীপুরের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ভেদ করে চলেছে পথ। বুনো হাতি, সজারু, কৃষ্ণসার মৃগ, সম্বর, বাসে বসেই দেখা যায়। বনের অভ্যন্তরে ঘুরে যাবারও পথ আছে। বন বিভাগ থেকে নামমাত্র খরচায় জীপ গাড়ি ভাড়া মেলে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার জন্য। হাতি চড়ে জঙ্গল দেখবেন তো চলে যান নীলগিরির মাদুমালাই-এ।

পাহাড় আর বনভূমির পথে পথে ছড়ানো চন্দন গাছ। মহীশূরের চন্দনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ভূগোলে পড়া বিদ্যাটা আমাদের মধ্যে ঝালাই করে নিতাম মাইসোর সোপ ফ্যাক্টরীর গোল্ডেন স্যাণ্ডাল সোপ দিয়ে স্নান করে। এখানে বাসে বসেই মধ্যে মধ্যে আমরা চন্দন গন্ধমাখা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিলাম। চেনা-অচেনা গাছ গাছালি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ। প্রায় গোটা পথটার দুপাশে অজস্র বনফুলের সমারোহ। মাইলের পর মাইল বিচিত্র বর্ণের পুষ্পিত ঝোপ।

এত দীর্ঘ পথ একটানা বাসে ইতিপূর্বে কখনো চড়তে হয়নি। রেলের তুলনায় বাসে ভ্রমণ অবশ্যই একটু ক্লেশ কর হয়। কিন্তু ততটা পথ এসেও আমরা কোন ক্লান্তি বোধ করি নি। রাজ্যসীমান্তে ত্রকদল শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীরা তদন্ত করলেন। রুট পারমিট সংক্রান্ত গোলমালের জন্য আমাদের বাস বদল করতে হলো। কর্তৃপক্ষ নিজেদের মজুর দিয়েই মালপত্রের ওঠানো-নামানো করিয়ে নিলেন। যাত্রীদের কোন ঝামেলাই পোহাতে হলো না।

মহীশূর পৌঁছাবার খানিকটা আগে বাস থেমেছিল নাঞ্জনগুড-এ। এখানে একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। দর্শনার্থীরা সাধারণত মহীশূর থেকেই দেখতে আসেন। যে দিন আসে সেই দিনই ফিরে যান। আমরা এখানে সুন্দর ভাব পেয়েছিলাম।

নির্দিষ্ট সময়েই আমরা মহীশূরে পৌঁছেছিলাম। শহরের কেন্দ্রস্থলেই বাস স্টেশন। দেওয়ালীর দিন দুপুরে আমরা পৌঁছাই। শহরে পা দিয়েই অনুভব করা গেল উৎসব আর ছুটির আমেজ। দশেরা উৎসবের রেশ থাকতে থাকতেই আসে দেওয়ালী। এবার দেওয়ালীর পরেই পরেছে ঈদ। ফলে উৎসবের বহরটা একটু যে বেশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত না থাকলে কোন উৎসবই মনোরম হয়ে ওঠে না। আমাদের সাধ্যের মধ্যে যে-সব হোটেল পাওয়া গেল সবই নিরামিষ। তারই একটিতে আশ্রয় নিলাম। এখানেও সেই থাকা-খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা। কিন্তু সবই এক জায়গায় মেলে বলে বিশেষ অসুবিধা হয় না। দাক্ষিণী খাবার, তবে স্বাদ পৃথক। এগুলি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ও স্বাদু। সুধীরদার মত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন আসলে ঠিক আছে। সপ্তাহ তিনেক ধরে এই সব খেতে খেতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি বলেই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে।

দুপুরে আর কোথায়ও বেরোনো হলো না। কাছে পিঠে একটু ঘোরাঘুরি করে খোঁজ-খবর নিয়েই কাটিয়ে দিলাম বিকালটা। মহীশূর শহর ও আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলি, যেমন চামুণ্ডি পাহাড় ও মন্দির, শ্রীরঙ্গ পাটনা, কাবেরী সঙ্গম, কৃষ্ণরাজ সাগর, বৃন্দাবন গার্ডেন ইত্যাদি দেখানোর জন্য যাত্রীবাহী ডি-লুক্স

বাস পাওয়া গেল। দুই ক্ষেপে দেখানো, শহরের মধ্যে আশেপাশে সকাল ৮টা থেকে ১২টা, শহরতলীতে বেলা দুটো থেকে রাত আটটা। ভাড়া জনপ্রতি ১২ টাকা। আমাদের হোটেল কর্তৃপক্ষেরও একটা বাস রোজ বেরোয়। সেই বাসের টিকিট কিনে ফিরে এলাম সন্ধ্যার আগেই। আজ রাতে কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেই। পায়ে হেঁটে শহর দেখাই ঠিক হলো। দশেরা উৎসবের মুখ্য অংশ শেষ হলেও তার রেশ রয়েছে। আলোর রোশনাই, প্রদর্শনী, গান-বাজনা, অভিনয়ের আসর এখনও জমজমাট। তার উপর আজ জুটেছে দেওয়ালীর বাজি। সে কি গগনভেদী শব্দ। এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একটা আলোঝলমল প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে এসে গেলাম।

দশেরা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এখানে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। জায়গাটির নাম হয়েছে একজিবিশন গ্রাউণ্ড। প্রবেশমূল্য পঞ্চাশ পয়সা। আজকাল পাঁচটা প্রদর্শনী যেমন হয়, এটিও তেমনি, কোন বিশেষত্ব নেই। প্রদর্শনীর দুটো মণ্ডপ আমার বেশ ভাল লেগেছিল। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী মণ্ডপটির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা করেছেন ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর। স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস ও স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশ গঠনের মহাযজ্ঞের কথা ফোটো ছবি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরিকল্পনা যিনি করেছেন তাঁর পক্ষে কাজটা স্বভাবতই কঠিন ছিল। পর্বত প্রমাণ ঘটনা-স্তূপ থেকে কয়েকটি মাত্র বেছে নিতে হবে, আবার তারই মধ্যে সংগ্রাম ও সংগঠনের একটা সামগ্রিক ধারণা তুলে ধরতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একদিকে সিপাহী যুদ্ধের সামরিক অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের গণসংগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে একদিকে রয়েছে অহিংস সত্যাগ্রহের উজ্জ্বল ও আনন্দময় বিকাশ, অন্যদিকে ভাস্বর হয়ে আছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রচলিত ভাষায় সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত। তার সমান্তরালে চলেছে গান্ধীজির আঠার দফা কর্মসূচী, বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন। কয়েকখানা ছবি দিয়ে এই বিরাট আন্দোলন তুলে ধরা সহজ কথা নয়। তবু বলতে হবে দারুণ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রদর্শনীটি সার্থক হয়েছে। স্বাধীন ভারতে দেশ গড়ার ক্ষেত্রটিও বিশাল। শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তি কেবল বড় বড় কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শ্রমিক পিতা ও ভাই, এ. এস পুত্রের যুগল ছবি বা হাঁটু অবধি বস্ত্রাবৃত আদিবাসী ঠাকুরমা এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুবেশা-নাতনীর যুগ্ম চিত্র দর্শক-মনে সরাসরি গভীর আবেদন সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক নির্মাণ যজ্ঞের মতই আরতি সাহার ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার যে নবীন ও উন্নত ভারতের প্রতীক—একথা স্বীকার করতেই হবে। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এর উজ্জ্বল স্বীকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সকলেই।

ক্রমশঃ
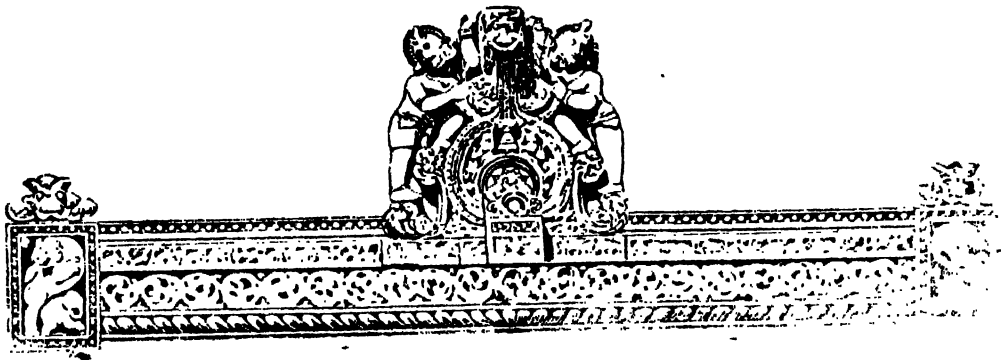
দেবা ন জানন্তি

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

অফিস থেকে ফিরে শান্তার থমথমে মুখ দেখে ঝড়ের পূর্বাভাস পেলাম। আমাকে খাবার টাবার দিল। মুখে কোন কথা নেই। খেতে খেতে সাহস করে বললাম —'শান্তা চল আজ গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি। যাবে?'

শান্তা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। যাবে না। আমি নাছোড়বান্দা।

—'চল না? কলকাতায় এসে অবধি তুমি তো কোথাও বেড়াতে যাও নি।'—

'বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।' নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর।

—'মা! ও মা—বাবলুটা আমায় মারল।'

—'এই বাবলু মারলি! মারলি কেন? তবে রে—'

চীৎকার। গালাগাল। কান্না। পাশের ভাড়াটেদের নিত্য রুটিন শুরু হয়ে গেছে। শান্তা দুহাতে কান চেপে মাথা ঝাঁকাল। তারপর ছুটে শোবার ঘরে চলে গেল। আমিও ধীরে ধীরে গেলাম ও ঘরে। শান্তা উপুড় হয়ে শুয়ে। শরীরটা ফুলে ফুলে উঠেছে না? শান্তা কাঁদছে নীরবে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কী করতে পারি জানি না। কলকাতায় আসবার পর থেকে এটা প্রায় রোজকার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সান্ত্বনা দিলাম না। তাতে ওর কান্না বেড়েই যাবে। খাটের একপাশে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম। বুঝছি, শান্তার পক্ষে এ পরিবেশ কতখানি অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমারও যে এখানে ভাল লাগছে তা নয়। কিন্তু আমি তো প্রায় সারাদিন বাইরেই থাকি। আর ও বেচারা সারাদিন একলাটি। ভাল অঞ্চলে একটা ভদ্রস্থ বাসার খোঁজে আছি। কিন্তু কলকাতায় ভাল বাড়ী পাওয়া লটারি পাবার মত ঘটনা। বহরমপুরে ছিলাম আরামে। ছোট্ট বাগান ঘেরা ছিমছাম বাড়ী, প্রতিবেশীদের ঝগড়া কোঁদল কানে পৌঁছত না। দূরে দূরে বাড়ী। আর এখানে! ঘাড়ের উপর ভূতের নেত্য। পাশের ভাড়াটে রাজেন ঘোষের পাঁচ মাস থেকে বছর বারোর আটটা ছেলেমেয়ে। তাদের উপদ্রব এই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরগুটোকে নরকেরও বাড়া করে তুলছে। শুধু ছেলেপুলেগুলো কি? তাদের মাও কম নয়। তার 'মধুর' কণ্ঠস্বরে কানের পর্দা ছিঁড়বার উপক্রম। বাড় বাম্বোটা একটা অবধি ওদের ঘরে যেন যুদ্ধ চলে। শান্তার ঘুম আসে না। কতদিন ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি শান্তা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঘুমের ব্যাঘাত বিশেষ হয় না। কিন্তু শান্তার ঘুম-চোরা রাতগুলো আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। শান্তার এই রাত-জাগার আর একটা দিক একদিন খুলে গেছিল। কথায় কথায় ও বলে ফেলেছিল—'ভগবানেরও কী অবিচার! ঐ ঝগড়ুটে মহিলার আট দশটা বাচ্চা। আর আমার।' বুঝলাম, শান্তার মনের ক্ষত কোন্‌খানে। দশবছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সন্তান হয় নি। এ নিয়ে ওর মনে যে বড় দুঃখ, বুঝি, কিন্তু এর আগে কোনদিন শান্তার মুখে এরকম ক্ষোভের কথা শুনি নি। তাই ওর ঐ কথা আমার কাঁটার মত বিঁধেছিল।

অনেকক্ষণ পর শান্তার কান্না থামল। চোখ মুছে বলল—'বাড়ী পেলে?' অপরাধীর মত মাথা নাড়লাম।

—'খুঁজছি খুব। শীগগীর পেয়ে যাব।'

—'তার আগেই না পাগল হয়ে যাই।' গভীর নিঃশ্বাস ফেলে শান্তা।

—'কাকীমা। ও কাকীমা।' বাচ্চা মেয়ের গলা।

—'ঐ এল জ্বালাতে। দরজা খুলো না।' শান্তার তিক্ত স্বর।

রাজেন বোসের পাঁচ বছরের মেয়ে টুসি। বড্ড গা-ঘেঁসা। যখন তখন এসে হাজির হয়। শান্তা ওকে দেখলেই ভুরু কুঁচকোয়। বলে—'কেন এসেছিস এখানে? যা বাড়ী যা।'

মেয়েটা বিচলিত হয় না একটুও বলে—'আমার ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। আমি যাব না।'

শান্তা বিরক্ত হয়ে অন্য কাজে মন দেয়। টুসি চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্ন করে। শান্তা জবাব দেয় না। টুসি চলে গেলে শান্তা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'উঃ। দুচোখে দেখতে পারি না। কী নোংরা। কী গায়ে পড়া। মাগো! ভাগ্যিস আমার ছেলেপুলে নেই। তাহলে এই এদের সঙ্গেই তো মিশত! ভাবলেই গা রী রী করে।'

আমি চুপ করে থাকি। শান্তাই আবার বলে—'তুমিই বলো এদের সঙ্গে মিশলে তাদের ভবিষ্যৎ কী হত!'

—'কাকীমা গো। দরজা খোল।' ছোট ছোট হাতের নরম ধাক্কা পড়ে দরজায়।

আমি অজ্ঞাতে উঠে পড়ি।

—'কোথায় যাচ্ছ?' শান্তার গম্ভীর গলা।

—'দরজাটা খুলে দিই।'

—'অত দরদ দেখাতে হবে না। লাই দিলে মাথায় চড়বে।'

মেয়েটার আকুল কান্না শোনা যায়। আমি শান্তার মুখের দিকে তাকাই। ওকে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। একটা পাঁচবছরের শিশু। নোংরা হোক, যাই হোক। তার সঙ্গে এ কী ব্যবহার!

ওদিক থেকে টুসির মায়ের গলা শোনা যায়—'ও আবাগী—। আঁটকুড়ো ডাইনীর কাছে গেছে পীরিত দেখাতে। আয় মুখপুড়ী—'

শান্তার মুখে কে যেন চাবুক মারল। আমি চোরের মত পালালাম পাশের ঘরে। শুনলাম টুসিকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে ওর মা। মহিলাটির মুখ বড় ধারাল। এখানে আসবার পর শান্তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তার বরফের মত ভাব দেখে সুবিধা হয় নি। এখন মহিলা আসে না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেলেই এসে পড়ে। রাজেন বোসও দুয়েকবার এসেছেন। লোকটি আমুদে। সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মুখের হাসিটি মিলোয় নি। আমায় বলেছিলেন—'বেশ আছেন সুভাষবাবু কপোত কপোতীতে। কোন ঝাক্কি নেই। আমরা মশাই চল্লিশেই বুড়িয়ে গেলাম।'

ওর কথা শুনে মনে মনে হাসি। 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস—'

অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে মাস কয়েকের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। বাঁধাছাঁদা শুরু হয়ে গেছে। শান্তার উৎসাহ দেখে স্বস্তি পাচ্ছি। এ কদিন টুসি খুব ঘন ঘন আসছে। আমাদের বাক্স প্যাটরা গোছগাছ করতে দেখছে। বারবারই জিজ্ঞাসা করছে—'কাকীমা, তোমরা কোথায় যাবে গো? ও কাকীমা, বল না।'

শান্তা বেজার মুখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বাক্স গোছাতে থাকে।

শান্তার কাছে জবাব না পেয়ে ছুটে আসে আমার কাছে।—'ও-কাকু তোমরা কোথায় যাবে?'

বলি—'আমরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি।'

টুসি বলে—'আবার কবে আসবে?'

—'আর আসব না।'

টুসি চোখ বড় বড় করে।—'না কাকু তোমরা যেও না।' আমার বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে।

শান্তা বিরক্ত হয়ে মুখ ঘোরায়, 'এই টুসি! এক্ষুণি পালা বলছি। কান ঝালাপালা করে দিলে বাপু। সেই থেকে কিছু গুছিয়ে উঠতে পারলাম না। হাড়-জ্বালানেদের হাত থেকে কবে যে রেহাই পাব।'

—'মাত্র দুদিন পর।'

—'এই দুদিনেই ঝাঁঝরা হয়ে যাব।'

টুসি তখন বসে আছে দেখে শান্তার মেজাজ চড়ে যায়। উঠে পড়ে টুসির হাত ধরে হেঁচকা টান দেয়। হিড়্‌হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাইরে মেয়েটার ব্যাকুল আবেদন—'দরজা খুলে দাও। কাকীমা গো।'

যাওয়ার সময় হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র সব উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শান্তা যেই উঠতে যাবে অমনি কোথা থেকে টুসি ছুটে এল। শান্তার আঁচল চেপে ধরল সবটুকু শক্তি দিয়ে। শান্তা জোর করে ওর হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিল। ছোট ছোট দুহাতে শান্তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। শান্তা ওকে ঠেলে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। দরজা বন্ধ করল সশব্দে। টুসি হাতপা ছড়িয়ে রাস্তায় বসে পড়ে কান্না জুড়ে দেয়। 'কাকীমা গো আমায় নিয়ে যাও—'

টুসির মা ছুটে আসে বাইরে। মেয়ের গালে পিঠে চড়চাপড় লাগাতে থাকে; সঙ্গে চীৎকার।—'সোহাগ দেখে বাঁচি না। কী আমার সাত জন্মের কাকীমা রে! চেয়েও দেখে না। আর আদেখ্‌লা বজ্জাত—' বাকিটুকু শুনতে পাই না। ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

নূতন ফ্ল্যাটটি ছিমছাম। অন্যান্য ভাড়াটেরা ভদ্র। হৈ হল্লা নেই। সব পরিবারেই দু'তিনটি সদস্য। রাত দশটার পর বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ। পাড়াটিও বেশ নিরিবিলি। বাসাটি শান্তার পছন্দ হয়েছে নিশ্চয়। ওকে শুধোলাম—কেমন ফ্ল্যাটে? ভাল নয়?' শান্তা হুঁ না কিছুই বলল না। আমি অপ্রস্তুত হলাম। এ বাসা পছন্দ না হয় তো করবার কিছু নেই। আমার মত চাকুরের পক্ষে এর চেয়ে ভাল বাসস্থান হওয়া সম্ভব না। শান্তার গম্ভীর মুখের কোন পরিবর্তন হ'ল না। একদিন হঠাৎ নিজের মনে বলে উঠল—'এ বাড়ীটা বড্ড নিঃঝুম। ভাল্ লাগে না।' আমি ওর মন্তব্য শুনে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাই। মেয়েদের মন। 'দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ—'

নাঃ। শান্তার মুখে কথা হাসি কিছুই ফোটান গেল না। আমার মানসিক অবস্থা যখন চরমে পৌঁছল তখন হঠাৎ শান্তা মুখ খুলল—'আমি বুঝতে পারছি আমি কখনো মা হব না।' বলে ও আমার মুখের দিকে চাইল।

কিছু একটা বলতে হয়। বলি—'তা কি কিছু বলা যায়?'

—'হ্যাঁ, বলা যায়। আমি ঠিক জানি। তাই বলছিলাম—'শান্তা ইতস্ততঃ করে।

—'বল কি বলছিলে?'

—বলছিলাম আমরা পোষ্য নিই না কেন?'

—'পোষ্য!' আমি হকচকিয়ে বলে উঠি।

—'হ্যাঁ। যাদের ছেলেপুলে হয় না, তারা অনেকেই তো নেয়।'

—'তা নেয়। কিন্তু—'

—'এর মধ্যে কিন্তুর কি আছে?'

—'না, বলছিলাম, পোষ্য যে নেবে সেরকম ছেলে-মেয়ে কোথায় পাবে? একদম অচেনা অজানা কারোকে নেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

— অচেনা অজানা কেন হবে! আমেদের টুসি তো রয়েছে।'

—'কে টুসি?' আমার প্রশ্নে শান্তা চটে ওঠে—'টুসিকে এর মধ্যে ভুলে গেলে? তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল?'

এবার মনে পড়ল। টুসিকে ঠিক ভুলি-নি। কিন্তু শান্তা টুসিকে পুষ্যি নিতে চাইছে এটাই যে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য। বললাম—'কিন্তু ওরা কি মেয়েকে পুষ্যি দিতে চাইবে?'

—'চাইবে না মানে। খেতে পরতে দিতে পারে না। অমন সুন্দর মেয়েটাকে নোংরা কুচ্ছিৎ করে রেখে দেয়। আমাদের দিলে ওদের মেয়ে রাজার হালে থাকবে।'

মনে মনে ভাবি—ভাল থাকবে জেনেও সন্তানকে কি সহজে কেউ পরকে দিতে পারে?

শান্তার পীড়াপীড়িতে যেতে হল রাজেন বোসের বাসায়। খানিক হেনাতেনা করে প্রস্তাব পাড়লাম। রাজেনবাবু তো এক কথাতেই রাজি। গিন্নী শুনেই মারমুখী। কর্তাকে যাচ্ছেতাই করে গাল দিলেন। শান্তার উদ্দেশেও বিস্তর কুশ্রাব্য কথা বললেন।

নিজেকে অক্ষত রেখে কোন রকমে মহিলার খপ্পর থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

শান্তা অধীর আগ্রহে বসে ছিল। তার আশা ছিল আমি টুসিকে হয়তো সঙ্গেই নিয়ে আসব। আসতেই বলল—'একা এলে ?'

বললাম সব কথা। অবশ্য শান্তার উদ্দেশে গিন্নীর বাক্যবাণের কথা বেমালুম চেপে গেলাম। শান্তা শুনে খানিক চুপ হয়ে রইল। তারপর বলল—'কক্ষনো তা নয়।'

—'কী নয় ?' আমি হতভম্ব।

—'ওরা টুসিকে পুষ্যি দিতে চাইল না এ কথনো হয় না। আটদশটা ছেলে-মেয়ে যাদের তারা একটাকে দিতে পেছপা হবে ? তুমি নিশ্চয় ওখানে যাও নি।'

—কী বলছ শান্তা। আমি মিথ্যা বলছি! আমি রাজেনবাবুর বাড়ী যাই নি !'

—গিয়েছিল হয়তো। কিন্তু মন খোলসা করে কথা পাড় নি। আমি তো জানি তুমি টুসিকে একটুও পছন্দ কর না। তোমার আগ্রহ নেই দেখেই ওরা মেয়েকে দিতে চায় নি।'

আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। শান্তা হঠাৎ সশব্দে কেঁদে ওঠে। তারপর ছুটে শোবার ঘরে চলে যায়। দড়াম করে দরজা বন্ধ করবার শব্দে সচকিত হই। ছুটে যাই। ওর নাম ধরে চীৎকার করি। দরজা খুলবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করি। কোন ফল হয় না। ভিতর থেকে গুমরানো কান্নার আওয়াজ আসছে। হতাশ হয়ে মেঝেতে বসে পড়ি। চোখের সামনে ভাসে একটা উলঙ্গ ছোট্ট মেয়ে। গায়ে মাথায় ধুলো মাটি ময়লা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটওয়ালা এক মাথা চুল। ভাসা ভাসা ছলছল চোখে তাকিয়ে রয়েছে যেন। শেষকালে রাজেন বোসের এ ক্ষুদে মেয়েটা আমার ও শান্তার মধ্যে অযথা ভুল বোঝাবুঝির বিষ ঢুকিয়ে দিল! একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।
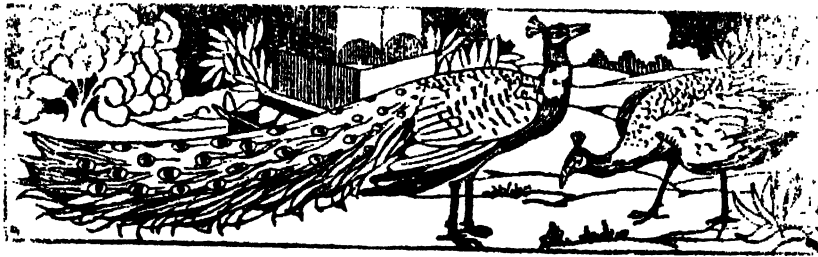
অমৃত আলোর পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী

(অপরিচিত মনীষী)

অরিন্দম দাশগুপ্ত

সে অনেক দিনের কথা। বাংলার মসনদে তখন মুর্শিদ কুলি খাঁ। ছোট্ট মসনদ। কিন্তু বিরাট রাজ্য। নবাব খাঁয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রজারা টুঁ শব্দ করতে পারে না। নবাবও চায় না কেউ তাকে অসম্মান করুক।

বাংলার গ্রাম ঘিরে সেদিন ছিল জঙ্গল-ময় জল-পূর্ণ। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। ছোট্ট ছোট্ট সড়ক ঘিরে থাকত গভীর বন। বনের মধ্যে অপেক্ষা করত লেঠেল ঠ্যাঙাড়ের দল। পথিকেরা সাবধান ভাবে হাঁটত।

হ্যাঁ, সতর্ক ভাবে হাঁটছিলেন রামকানাই ঘোষাল। যাবেন অনেকটা দূর কাঁকড়া-কচুয়া গ্রাম। এখনও তো টাকি গ্রাম আসেনি, তিনি আসছেন কলকাতা থেকে। বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ। ধর্ম আহ্নিক করেন, অবসর সময়ে ঈশ্বর চিন্তা করেন। রাজপুত্রের মত চেহারা।

হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। কে—কে ওখানে বসে? টাকি সংলগ্ন ছোট্ট বনের ভিতরে কে বসে ও? এক দিব্যজ্যোতি মহাপুরুষ। আহা, কি চমৎকার তার রূপ! কি সুন্দর তার চাউনী! 'কে বাবা তুমি, কি চাও—'

সাধু হাসে। না, কিছুই সে চায় না। তার মুখের দিব্যজ্যোতি রামকানাই ঘোষালকে মুগ্ধ করে। বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন। তাঁরও তো তিনটে পুত্র আছে, কেউ যদি ঐ রকম সন্ন্যাসী হয়ে যেত—সংসারের অসার আবর্জনা থেকে যদি কেউ ঐ বেশ ধারণ করে প্রসন্ন বদনে চেয়ে থাকত আগন্তুক পথিকের দিকে তবে কি পথিক মুগ্ধ হয়ে যেত না? সাধুকে বারংবার দেখলেন রামকানাই ঘোষাল।

সারা দিনটা কি ভাবে কাটল জানেন না রামকানাই ঘোষাল, পরে গভীর রাতে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ধর্মপত্নী কমলা দেবীকে বললেন, 'ওগো, জানো—আমার ইচ্ছা ঐ তিনটে ছেলের মধ্যে একটা সন্ন্যাসী হোক—'

'না, না, তা হয় না—' কমলা দেবী কেঁদে উঠলেন. 'মাত্র তো তিনটে ছেলে, এদের মানুষ করতে দাও। সাধু সন্ন্যাসীর কথা বলো না—'

রামকানাই ঘোষাল ব্যথা পেলেন মনে। মুখে কিছুই বললেন না। সারা রাত জেগে রইলেন। সন্ন্যাসীর প্রসন্ন চেহারা তাঁকে আকুল করে দিল।

দীর্ঘ একটা বৎসর রামকানাই ধর্মের প্রতি বেশী সময় দিলেন। সব সময়ই প্রায় গীতা চণ্ডী নিয়ে পড়ে রইলেন।

একটা বৎসর যেতে না যেতেই, রামকানাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কমলা দেবী আবার গর্ভবতী। একনিষ্ঠ ধর্মসাধক ভগবান্ গাঙ্গুলীকে ডেকে রামকানাই বললেন, বুঝলে ভগবান্, এবার যদি কপালে পুত্র জোটে তবে তাকে ব্রহ্মচারী করব। সংসারে রাখব না।—বুঝলেন ভগবান্ গাঙ্গুলী। বুঝে হাসলেন। কেবল বললেন: 'দেখো, স্বয়ং ঈশ্বর না তোমার ঘরে এসে হাজির হন!'

ভগবান্ গাঙ্গুলীর কথা বুঝি বা ঠিক হয়ে যায়—সকলে চমকে ওঠে নবজাতককে দেখে। সত্যি তো, স্বয়ং এক মহাপুরুষ বুঝি রামকানাই ঘোষালের ঘরে জন্ম নিলে।

দীর্ঘ বাহু, উন্নত নাসিকা, দীর্ঘ উজ্জ্বল দুটি চোখ—এ ঋষি না হয়ে যায় কোথায়। ভগবান্ গাঙ্গুলী মশায় বসে গেলেন পুঁথি হাতে—গ্রহনক্ষত্র গুণতে। তৈরী হয়ে গেল ঠিকুজি। 'স্বয়ং ঈশ্বরই একে পাঠিয়েছেন হে।' ভগবান্ গাঙ্গুলী বললেন, 'বুঝলে রামকানাই, এ-যে দীন দুঃখী লোকদের ত্রাণকর্তা, হয়ে এসেছে, এর নাম দাও লোকনাথ।'

রামকানাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চতুর্দিকে ঘোষিত হলো নবজাতকের নাম।

২

ভগবান্ গাঙ্গুলী মশায় বলেছিলেন এ-নবজাতক মহাপুরুষ হবে কিন্তু শিশু লোকনাথ হয়ে উঠল অতীব দুরন্ত। প্রসাদ খাওয়ার শেষে শিবলিঙ্গের মাথায় ডাণ্ডা মেরে শিবলিঙ্গকে গুঁড়িয়ে দিল। পূজা হবার আগেই প্রসাদের ডালি থেকে মুঠি মুঠি প্রসাদ নিয়ে পালাল। লোকে বলল, এ-এক সৃষ্টি ছাড়া জন্মেছে গো তোমাদের ঘরে। যাদের সাত পুরুষ পুজো না হলে প্রসাদ ধরেনা—' ভগবান্ গাঙ্গুলী অটল। তিনি বললেন, 'না, এ যুবার ক্ষমতা আছে পূজার আগে প্রসাদ খাবার, শিবের মাথায় ডাণ্ডা মারার। এ অনন্ত মহাপুরুষ।...'

কথাটা মিথ্যে হলো না অবশেষে। এগারো বছর বয়েসেই ভগবান্ গাঙ্গুলী মশায় নিজের হাতে উপনয়ন সম্পন্ন করতে, বালক লোকনাথের দেহ-মনের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। কোথায় সেই দুরন্ত লোকনাথ। এখন সে শান্ত, নির্লিপ্ত, এক উদাসীন বালক। সব সময় চিন্তা করে ঈশ্বর...ঈশ্বর...

ভগবান্ গাঙ্গুলী তখন পঞ্চাশে পড়েছেন। ছেলে-পিলেরা সবাই সংসারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। একদিন রাত্রে তিনি ভাবলেন, সমস্ত ঈশ্বরের আবাসস্থল হিমালয়ে গিয়ে তিনি তপস্যা আরম্ভ করবেন। তপস্যা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য কতটুকু বা পাওয়া যায়। বালক লোকনাথ খবরটা শুনেই চীৎকার জুড়ে দিল, 'আমি যাব, আমি যাব—'

'তুই যাবি কি রে?—'

'হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। ছেড়ে দাও পথ।'

ছেড়ে দিতে তো হবেই। এ ছাড়া উপায় কি। ভগবান্ গাঙ্গুলী হাসলেন। মহামুক্তির ডাকে সাড়া দিতে যখন হবেই, তখন ওকে বাধা দিও না। বাধা দিলেন না রামকানাই ঘোষাল। মনে পড়ল তাঁর সেই দুই প্রসন্ন দৃষ্টি চক্ষু। আহা, তাঁর পুত্রও কি অবশেষে ই......।

ভগবান্ গাঙ্গুলীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল এগারো বছরের বালক লোকনাথ। মুখে অদ্ভুত শান্ত হাসি। আয়ত চাউনি। প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।

'আগে দক্ষিণেশ্বরে যাব—' ভগবান্ গাঙ্গুলী বললেন, সেখানে মন্ত্র নিতে হবে গুরুর কাছে। তারপর হিমালয় তুষারাচ্ছন্ন দেশ, দেবতাদের আবাস-স্থল।'

তাই হলো। দক্ষিণেশ্বরে ভগবান্ গাঙ্গুলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন লোকনাথ। তারপর বর্ধমানের নিকট বেরুগ্রামের বনে কয়েকদিন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে হিমালয়ে। এখানেই তো তপস্যা করার স্থান।

দুটি নির্লিপ্ত স্থান বেছে নিলেন বালক লোকনাথ এবং ভগবান্ গাঙ্গুলী মশায়। ক্রমে ক্রমে বরফ তাঁদের আচ্ছন্ন করে দিল। একদিন ঘুম ভাঙ্গলে লোকনাথ দেখলেন, তাঁরা জড় হয়ে গেছেন।

অর্থাৎ সাধনা করতে করতে প্রায় একশত বৎসর অতিক্রান্ত। গুরুদেবের একশত ষাট। তাঁর একশত দশ। চোখে জ্যোতির্গময় দৃষ্টি। মুখে তাঁর অমৃত সুধা। এ-সুধা যে পান করবে—সেই হবে অমৃত লোকের যাত্রী। ব্রহ্মচারী হয়ে উঠলেন অমৃত লোকের মহাপুরুষ।

ভগবান্ গাঙ্গুলী বললেন, 'লোকনাথ, তোমার শরীরের মধ্যে জ্যোতির্গময়ের অদ্ভুত রূপ আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি যাও,......বাংলা দেশে যাও...... তুমি লোকনাথ। তুমি গিয়ে ত্রাণ কর তাদের যারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে—'

লোকনাথ ব্রহ্মচারী চললেন ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষে ঘেঁষে। দিব্যজ্যোতি মহাপুরুষ তিনি। শত বৎসরের সাধনা শেষে তিনি ত্রাণ করতে চলেছেন বাংলার বুকে অসহায়দের। যারা এতদিন তাঁর সান্নিধ্য স্পর্শ চেয়ে ছিল।

৩

নাগা সন্ন্যাসী তাঁকে বন থেকে নিয়ে এল। বলল, 'উহ্ তো তুমার জায়গা নেহী বাবা—তুমার জায়গা ভি আমি জানি, তুমি চল্‌হো...।' হ্যাঁ, পার-

শ্রান্ত ব্রহ্মচারী আবার তপস্যায় বসে গেছিলেন ব্রহ্মপুত্রের তীরে গভীর বনে। চতুর্দিকে বেষ্টিত বাঘ, সিংহ, সাপ। এরই মাঝে তাঁর সাধনা থাকে অটুট। নাগা সন্ন্যাসী বোঝে এ যে সে সাধু নয়। শতশত বৎসরের সাধনার নিমিত্ত এর শরীরে অস্থি চর্ম মাংসশূন্য হয়েছে। বিনিময়ে এর শরীরে জ্যোতির্গময়ের ছটা আলোকিত করছে। এই ছটা যাদের দরকার তাদের কাছে তিনি নিয়ে চললেন পূর্ব বাংলার বারদী গ্রামে। চতুর্দিকে জল। এরই মাঝে আশ্রম হল। গরু এল। কুকুর এল, টিয়া এল, ময়না এল। আর এল কাতারে কাতারে লোক।

'বাবা, আমার এই আত্মজান আমার প্রাণের-জান, বাবা, একে বাঁচান।'

'ও তোর ছেলের রোগ। দে আমার শরীরে দে—'

'আপনি ছেলের রোগটা নেবেন, প্রভু ?—'

'তাতে কি হয়েছে রে ? দে।' ব্রহ্মচারী স্পর্শ করলেন ছেলেটিকে যাদুমন্ত্রের মত ভালো হয়ে গেল ছেলেটি। বিবি কপাল ঠুকে অনেকবার প্রণাম করলে। পরে মিছরি আর দুধ দিলে বাবাকে পায়েস খেতে।

এবং যেতে যেতে খবরটা ছড়িয়ে দিল। বাবা নাকি স্বয়ং রোগটা নিয়ে নিলেন তার ছেলের গা থেকে। এ এক আশ্চর্য পুরুষ। বারদীর লোকেরা এ-রকম পুরুষ দেখেন উপরন্তু ভূভারতে নামও শোনেনি।

আরেক বিবি এল কাঁদতে কাঁদতে। 'বাবা মিনসে কে যে পাই না—'

'সে কি রে, ওকে যে ওরা (জমিদাররা) পুঁতে দিলে ঐ চরটাতে। যা দেখ্ গে—'

বিবি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায়। গিয়ে দেখে, হাঁ, মৃত তাঁর স্বামী—চরটাতে পোঁতা। ফিরে এসে ব্রহ্মচারীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বাবা, আমাকে বাঁচান, কি করব বলুন—'

৪

'কি আর করবি—' ব্রহ্মচারী হাসেন, 'মামলা ঠুকে দে—জিতে যাবি। টাকা পাবি। আর ওর একটা সাজা হবে—'

'মামলা করে ওদের সঙ্গে পারি ?'

'নিশ্চয় পারবি। আমি সাক্ষ্য দেব তুই যা—'

স্বয়ং ব্রহ্মচারী সাক্ষ্য দেবেন। হুলস্থুল পড়ে গেল চতুর্দিকে। সে কি। যে আশ্রম থেকে বেরোয় না—সে দিতে আসবে সাক্ষ্য ?

সাক্ষীর দিন উপস্থিত। বিবি এসে বলে, 'বাবা, আপনি কি আমাদের সঙ্গে নৌকাতে যাবেন—'

'না, আমি হেঁটে যাব।'

হাকিম এজলাসে প্রচণ্ড ভিড়। একে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা, তায় সাক্ষ্য দেবেন ব্রহ্মচারী। যথাসময়ে চিৎকার ওঠে, 'সাক্ষী লোকনাথ ব্রহ্মচারী উপস্থিত ?'

মৃদু কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'হ্যাঁ, উপস্থিত।'

সবাই চমকে উঠল। হাকিম বললেন, 'আপনি ওকে খুন করতে দেখেছেন ?'

'দেখেছি—'

'আশ্রম থেকে কত দূরে ?'

'মাইল দুই দূরে —'

'মাইল দুই দূরে দেখলেন কি করে ? —'

'আমি দেখতে পাই।'

'আচ্ছা, এখান থেকে দু'মাইল দূরে কি হচ্ছে বলুন তো ?'

'এখান থেকে দুমাইল দূরে —এক বট গাছের নীচে কিছু কালো পিঁপড়ে একবার উপরে যাচ্ছে, আরেক বার নীচে নামছে। আর দুটো কাক তাদের ঠোকরাচ্ছে—'

সবাই ছুটে গেল। গিয়ে দেখে ঠিক তাই। হাকিমের রায়ে জমিদারের সাজা হল। বিবি পেল অর্থ।

এইভাবে, হাজারে হাজারে মানুষ, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এসে জমায়েৎ হত ব্রহ্মচারী আশ্রমে। আশ্রম ভরে যেত লোকে আর ফলমূলে। কাউকে নমস্কার করতে দিতেন না ব্রহ্মচারী। আর বলতেন, 'উপদেশ কি দিব, উপদেশ দেওয়াটা তো আমার কাছে মিথ্যা লাগে না। আমাকে কাজ দাও...কাজ—'

সেই কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে চাইতেন। হিন্দু মুসলমান কাউকে তিনি ভিন্ন ভাবে দেখতেন না। সবাই ছিল তাঁর কাছে সমান। সবাইকে তিনি সমান ভাবে উপকার করে যেতেন।

তাঁর দেহত্যাগের পর দাঙ্গার সময় একদল মুসলমান তাঁর আশ্রমে আগুন দিয়ে দিল। আশ্চর্য, সব পুড়ে গেল, পুড়ল না তাঁর খড়ম, পিঠে ঠেস দিয়ে বসার কাঠটা। হৈ হৈ পড়ে গেল।

পরে হিন্দুদের কাউকে ওটা ধরতে দিল না মুসলমানরা। আজও ওটা অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে বারদীতে।

মন্তুরা-হরণ

(উপন্যাস)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার অন্ধকারে কাশীরাজ সুপর্ণ আদিকেশবের মন্দিরে প্রণাম করিয়া পাষাণ-সোপান-শ্রেণী অতিক্রম-পূর্বক অন্তঃপুরিকাদের সহিত নৌকারোহণ করিলেন। রাজ্য নিরুপদ্রব, প্রজাগণ রাজভক্ত। বারাণসীর গঙ্গায় বহু প্রমোদতরণী তখন বর্ত্তদিকে চলিয়াছে, তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটি কাষ্ঠময়ী নৌকায় পল্লীজনসুলভ বেশভূষায় সজ্জিত রাজপরিবারকে কেহ লক্ষ্যই করিবার কথা নহে, সুতরাং বিপদের কোনও সম্ভাবনা সুপর্ণের কল্পনারও অগোচর ছিল। তরণী অগ্রসর হইয়া চলিল, মহিষীরা এবং তাঁহাদের সখীরা পর্যায়ক্রমে ক্ষেপণী চালনা করিতে লাগিলেন, কাশীরাজের বংশী সুললিত স্বরে বাজিতে লাগিল।

তখন নদীতীরস্থ প্রাসাদসমূহে কোথাও দীপ জ্বলিয়াছে, কোথাও জ্বলে নাই। সোপানশ্রেণীর ঊর্ধ্বে প্রশস্ত পাষাণময় চত্বরে শত শত নরনারী উপবিষ্ট হইয়া কোথাও পুরাণ-কথা শুনিতেছে, কোথাও গীতবাদ্য করিতেছে। কোথাও সোপানশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া স্নানার্থীরা গল্প করিতেছে বা স্তব পাঠ করিতেছে, কোথাও কেহ নীরবে ধ্যান করিতেছে। প্রতি ঘাটে বহু পুণ্যার্থী গৃহস্থ ও সাধুসন্ন্যাসী সন্ধ্যাস্নান করিতেছেন। নৃপতির প্রমোদতরণী যেখানেই কোনও ঘাটের সমীপস্থ হইতেছিল, সেখানেই পাঠ ভুলিয়া, ধ্যান ভুলিয়া, স্নান ভুলিয়া তীরস্থ এবং জলমধ্যস্থ নরনারী উৎকর্ণ হইয়া তরণীস্থ গুণিমুখনিঃসৃত বেণুরব শুনিতেছিল। নৌকা ক্রমে মণিকর্ণিকার নিকট আসিলে দেখা গেল, গঙ্গা-তীরে দুইটি চিতা জ্বলিতেছে, তাহাদের উজ্জ্বল আলোক গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করিয়া তরল অনলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়েরা সেই চিতাগ্নির চারিদিকে ছায়া-মূর্তির মতো বসিয়া ছিল। সেইদিকে চাহিয়া কাশীরাজ সহসা বিমনা হইয়া গেলেন, তাঁহার বংশী থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপণী-চালিকারাও ক্ষেপণী ক্ষেপণে ক্ষান্তি দিলেন। আনন্দের মধ্যে যেন অকল্যাণের ছায়া পড়িল। সকলেই অন্যমনস্ক, সকলেরই মন সাময়িক বিষাদ-ভারাতুর. এমন সময়ে সহসা কে যেন গঙ্গাজলের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া একটা দীর্ঘ রজ্জুপাশ নিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই নৌকার দুই পাশ হইতে দুইজন ভীষণাকার সন্তরণকারী লম্ফ দিয়া তরণীমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্যে একজনের রজ্জুপাশ তৎপূর্বেই রাজার বক্ষস্থলের নিকট দুই বাহুকে আবদ্ধ এবং অক্ষম করিয়া দিয়াছিল, সে এখন তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্রতহস্তে সেই রজ্জু দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল, আর একজন কৌপীন-মাত্র-পরিহিত ঘোরাকৃতি আততায়ী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। নিমেষ মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ বসিয়া রহিলেন, প্রধানা মহিষী এবং অন্য কয়েকজন ভীতচকিত হইয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন, সখীরা এবং রাজমহিষী সুপ্রিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণে কালিন্দী নিঃশব্দে অকুতোভয়ে দুই হস্তে দীর্ঘ ক্ষেপণীটি তুলিয়া আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষেপণীর প্রচণ্ড আঘাত মস্তকে পড়িতেই একজন আক্রমণকারী 'বাপ' বলিয়া ঘুরিয়া নদীজলে পড়িয়া গেল। ক্ষেপণীর দ্বিতীয়

আঘাত অপর ব্যক্তির বাহুতে লাগিতেই তাহার করধৃত তরবারি সশব্দে নৌকাবক্ষে পড়িয়া গেল, পৃষ্ঠদেশে আর একটি আঘাত সহ্য করিয়া সে 'ঝপাং' করিয়া জলে লম্ফ প্রদান করিল। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনিয়া তীর হইতে কয়েকজন স্নানার্থী দ্রুত সন্তরণ করিয়া আসিল, চারিদিকে আততায়ীদের সন্ধান করিল, কিন্তু কাহাকেও কোথাও পাওয়া গেল না। অন্ধকারের মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো আসিয়া কয়েক নিমেষের মধ্যেই তাহারা আবার যেন অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল। কাশীরাজও নিজ পরিচয় প্রকাশের ভয়ে তখন রাজপুরুষদের কাহাকেও ডাকিয়া সন্ধানকার্যে নিয়োগ করিতে পারিলেন না। নৌকা নীরবে ফিরিয়া চলিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মহাদেবী বহুদিনের বিদ্বেষ ভুলিয়া সাশ্রুনয়নে মন্থরার মুখ চুম্বন করিলেন, সুপ্রিয়া এবং শাশ্বতী তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন। রাজার সে রাত্রিতে কালিন্দীর গৃহে থাকিবার কথা, তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। কি দিয়া তোমাকে পুরস্কৃত করিব বলো?"

মন্থরা বলিল, "মহারাজ, জীবিতেশ্বর, ও কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না। আপনি আমার জীবনের জীবন, আমার ইহ-পরলোকের আশ্রয়। আপনাকে অস্ত্র রক্ষা করিতে না পারিলে আমাকে কল্য কে রক্ষা করিত মহারাজ? আপনার অন্যান্য মহিষীরা রাজকন্যা, তাঁহারা আপনার বিপদে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন, আপনার আশ্রয়চ্যুতা হইলেও তাঁহাদের পিতৃগৃহে স্থানাভাব হইবে না। আমার মতো অনাথার তো আপনি ভিন্ন গতি নাই, তাই নিরুপায় হইয়া আমি অস্ত্র দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। আমি কর্তব্য করিয়াছি, পুরস্কারের আশা রাখি না।"

সুপর্ণ বলিলেন, "আমি পুরুষ হইয়া পাশবদ্ধ পশুবৎ মৃত্যু বরণ করিতেছিলাম, তুমি নারী হইয়া অসীমসাহসে দুইজন ভীমকায় আততায়ীকে পরাজিত করিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছ। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে কিছু না দিতে পারিলে আমি শান্তি পাইব না। বর প্রার্থনা করো।"

মন্থরা কহিল, "তবে আমাকে চিন্তা করিতে সময় দিন। এক মাস পরে আমার প্রার্থনা আপনাকে জানাইব।"

পূর্ববর্ণিত সাক্ষাতের এক পক্ষকাল পরে উচ্ছ্বখের সহিত অমাত্য ভদ্রের যথানির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ হইল। উচ্ছ্বখ প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনার নির্দেশ মতো আপনার শিষ্যের সহায়তায় আমার পত্নী ও পুত্রকে বারাণসীতে আনাইয়াছি। পুত্র শীঘ্রই দেশে ফিরিবে, পত্নী আমার সহিত কাশীবাস করিবেন। দীর্ঘদিনের বিরহে এবং অর্থসাচ্ছল্যে তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি মধুরভাষিণী হইয়াছেন। ইহার সমস্তই আপনার আশীর্বাদ। সেদিন রাজাকে আক্রমণ করার পুরস্কার স্বরূপ ভূঙ্কা আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছে। অমাত্যপদপ্রাপ্তির পর অর্থচিন্তা ঘুচিয়াছে। এখন কি কর্তব্য আদেশ করুন।"

ভদ্র বলিলেন, "আমিও তোমার কল্যাণকামনায় হোম এবং মন্ত্রপাঠ করিতেছি, দেবতারা প্রসন্ন হইয়াছেন মনে হইতেছে। ওদিকে মহারাজ্ঞী কালিন্দী কাশীরাজের জীবনরক্ষা করিয়া একটি বর পাইবেন, আর একটি বরের তাঁহার প্রয়োজন, সেজন্য আবার তোমার সাহায্য প্রয়োজন হইবে। রাজার অন্নে বিষ মিশাইতে হইলে তুমি বিষ সংগ্রহ করিয়া দিবে, রাজার জীবনরক্ষা করিয়া কালিন্দী আর একটি বর লাভ করিবেন। ভয় নাই, এবারেও তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিবে।"

কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল। মন্থরার পত্র পাইয়া উচ্ছ্বখ বিষ ক্রয় করিয়া পাঠাইল। পট্টমহিষীর প্রাসাদে ভোজনে বসিয়া কাশীরাজ যথারীতি পালিতা বিড়ালীকে একমুষ্টি অন্ন দিলেন, বিড়ালী অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিল, তারপর রাজার আসনের কাছেই পড়িয়া মরিয়া গেল। কিছুদিন হইতে মন্থরা মহারাজকে রাজনীতি শিখাইতেছিল। বহুপত্নীক রাজগণের পক্ষে

পত্নীদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয় একথা বুঝাইয়াছিল। রাজের মহলে মহারাজকে আহার্য দিবার সময় সে একটি বিড়ালীকে প্রথমতঃ সেই অন্ন খাওয়াইত। সেই নিয়মানুযায়ী রাজা আজকাল সর্বত্রই সেই বিড়ালীর দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না। আজ পট্টমহিষীর পাকশালায় সুপকার যখন রন্ধন করিতেছিল সেই সময় মন্থরার পরিচারিকা সুদন্তী যথারীতি তাহার সহিত কিছুক্ষণ হাস্যপরিহাস করিয়া গিয়াছিল, পাচক ব্যঞ্জনের বাটি সাজাইবার সময় রাজার অন্নপাত্রে সে যে কখন বিষ মিশাইয়াছিল তাহা হতভাগ্য জানিতে পারে নাই। বিড়ালী প্রাণত্যাগ করিলে রাজা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, রোষকষায়িত লোচনে সম্মুখে দণ্ডায়মান পাচকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, আমাকে হত্যা করিবার জন্য তুমি কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছ? কালসর্পের বিবরে হস্ত প্রবিষ্ট করাইবার দুর্মতি তোমার কেন হইল?"

পাচক কম্পান্বিত কলেবরে ভীতি-গদগদ কণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, সত্য বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না।"

রাজাজ্ঞায় প্রহরী আসিয়া পাচককে বাঁধিয়া লইয়া গেল। পট্টমহিষী এতক্ষণ ব্যজনীহস্তে পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়া ছিলেন, তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না। আমার কোনো মহাশত্রু আজ আপনার এবং আমার সর্বনাশ সাধনের জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমি যদি সতী নারী হই তবে সে ইহার প্রতিফল পাইবে।"

কাশীরাজ ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন, "মহিষী, সতীত্বের আস্ফালন এখন বৃথা। তুমি যে রাজমাতা হইবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হইয়াছ তাহা জানিতাম না। সেদিন নৌকাবক্ষে যে আততায়ীরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা কি তোমারই অনুচর? যাহা হউক, তোমার সহিত দীর্ঘকালের সম্বন্ধ, তোমাকে সামান্যা নারীর মত প্রাণদণ্ড আমি দিব না। তুমি এই গৃহেই থাকিতে পারো, ইচ্ছা করিলে পিতৃগৃহেও যাইতে পারো। আমি অতঃপর আর তোমার মুখদর্শন করিব না।"

রাজা সবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে গিয়া থামিয়া গেলেন। কালিন্দী আলুলায়িত কেশে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ, এ কি শুনিতেছি? আপনার জীবন নাশ করিবার ষড়যন্ত্র রাজান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। ভগবান্ বিশ্বনাথের কৃপায় আজ আপনার জীবন—"

রাজা কালিন্দীর কম্পিতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আজও তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। তোমার পরামর্শ অনুযায়ী বিড়ালীকে প্রথমে খাইতে দিয়াছিলাম বলিয়াই জানিতে পারিলাম আমার অন্ন বিষমিশ্রিত। তোমার ঋণ কি করিয়া শোধ করিব জানি না।"

মন্থরা রাজার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে পট্টমহিষীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "মহারাজ, আপনি আর-একদিন আমাকে একটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি লইতে চাহি নাই। আজ আবার আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, বর দিতে চাহিয়াছেন। যদি আপনার আমার এবং রাজ্যের কল্যাণার্থ আমি আপনার কাছে কোনো বর প্রার্থনা করি তবে তাহা পাইব তো? যদি দুইটি বরই চাই?"

কাশীরাজ বোধ হয় তাহার দৃষ্টিতে সপত্নীবিদ্বেষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, হয়তো কেকেয়ীর কথা মনে পড়িয়াছিল, সেজন্য মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত রাখিয়াই বলিলেন "একথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ মহারাণী? স্ত্রীহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যার অনুরোধ ভিন্ন তোমার সমস্ত অনুরোধ আমি রক্ষা করিব। বলো, কি চাও?"

রাজার বচনবিন্যাসে সতর্কতা মন্থরার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি প্রপিতামহীর বয়সী পত্নীকে চাতুর্যে পরাস্ত করেন। মন্থরা যুগপৎ স্বামীকে এবং পট্টমহাদেবীকে বিস্মিত করিয়া করপুটে বলিল, "আমি চাই এক বরে আমার যাবজ্জীবন নির্বাসন, অন্য বরে কুমার ঋতুপর্ণের যৌবরাজ্যে অভিষেক।"

সুপর্ণ কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজ্ঞীর মুখকমল নিরীক্ষণ

করিলেন। তারপর বলিলেন, "সহসা এ বাসনা তোমার মনে কেন উদয় হইল জানিতে পারি কি ?"

মন্থরা কহিল, "মহারাজ, সিংহাসন অতি সাংঘাতিক বস্তু। উহার লোভে পুত্র পিতৃহত্যা করে, পত্নী স্বামিহত্যা করে। আপনার উপর পূর্বে তো এত ঘন ঘন আক্রমণ হইত না। অভাগিনী আমি আপনার সংসারে আসিবার পর হইতে, পাছে আমার সন্তান ভবিষ্যতে অন্য কাহারও সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসনে বসিতে চায়, তাহার পথ বন্ধ করিবার জন্যই এই সব ষড়যন্ত্র এবং উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। আপনি নিমিত্তমাত্র, আপনার অবর্তমানে একটা সহায়সম্বলহীনা বিধবাকে অবলীলাক্রমে পিষিয়া মারিবার জন্যই আপনার মৃত্যু কয়েকজনের প্রয়োজন। রাজকুমার ঋতুপর্ণের জন্যই যখন আপনার প্রাণহানির চেষ্টা চলিতেছে তখন তাঁহাকে সিংহাসন দান করিলে আপনার সহিত তাঁহার আর স্বার্থের সংঘাত বাধিবে না, পুত্রের দ্বারা পিতৃহত্যা ঘটিবে না। এদিকে আমি আপনাদের রাজপুরী হইতে বিদায় লইলে আমিও কিছুদিন প্রাণে বাঁচিতে পারি; শত্রুপুরীতে বাস, কখন কি ঘটে বলা যায় না। আপনার এবং নিজের জীবন রক্ষার এবং আপনার সংসারের কল্যাণের জন্যই আমি ঐ দুইটি বর চাহিয়াছি। উহাতে বিরোধবিদ্বেষের মূলোৎপাটন হইবে।"

সুপর্ণ বলিলেন, "তুমি মহীয়সী, তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ; কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা রাজোচিত বা ক্ষাত্রিয়োচিত হইবে না। অন্যায়কারীদের নিকট আত্মসমর্পণ ভীরুতার নামান্তর। বিরোধের মূলোৎপাটন এ ভাবে হয় না। আমি ভাবিয়াছিলাম, আজকার অপরাধও উপেক্ষা করিব, কারণ আমার গৃহবাসী আমার মৃত্যু-কামনা করে একথা আমার কর্মচারীদের, প্রজাদের কাছে প্রকাশ করা আমার পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু দেখিতেছি পাপ ক্রমেই প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, আমি আর শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে ক্ষমা করিব না। প্রতিহারী, এখনই কুমার ঋতুপর্ণকে সংবাদ দাও, আমি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী। না, থাক, সেই সুন্দর মুখ চক্ষে দেখিলে আবার হয়তো কর্তব্য বিস্মৃত হইব। আমার লেখনী ভূর্জপত্র এবং মুদ্রা আনয়ন কর।" প্রতিহারী আদেশ পালন করিলে কাশীরাজ দ্রুতহস্তে একখানি আজ্ঞাপত্র লিখিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। বলিলেন, "এই পত্রখানি প্রাসাদরক্ষীদের প্রধানকে দাও। আমার আদেশ যেন অবিলম্বে পালিত হয়।" প্রতিহারী "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া বিদায় লইল।

মন্থরা করজোড়ে প্রশ্ন করিল, "মহারাজ কি লিখিলেন জানিতে পারি কি ?" কাশীরাজ বলিলেন, "অন্তঃপুররক্ষীরা অন্তঃপুরে এবং নগরপাল বাহিরে অপরাধীদের সন্ধান করিবে, তাহাদের অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবে। সপ্তাহকালের মধ্যে আমি বিচারসভা করিয়া দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিব। অপরাধী আমার যত আপনজন এবং প্রিয়পাত্র হউক অব্যাহতি পাইবে না। প্রয়োজন হইলে অন্তঃপুরিকাদের সমস্ত পেটিকা এবং মঞ্জুষা খুলিয়া দেখিবে, দাসদাসীদের প্রহার এবং নির্যাতন করিয়াও তথ্য সংগ্রহ করিবে, সেই অধিকার আমি তাহাদের দিলাম। যতদিন আমার বিচার শেষ না হয় ততদিন কুমার ঋতুপর্ণকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দিলাম।" তাঁহার শেষ কথাটি শুনিবামাত্র মহাদেবী "মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া গৃহকুট্টিমে লুটাইয়া পড়িলেন। মুহূর্তের জন্য কাশীরাজ বিচলিত হইলেন, তাঁহাকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইবার জন্য দুইপদ অগ্রসরও হইলেন, তারপর আত্মসংবরণ করিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিপুণিকা তোমার কর্ত্রী বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, উঁহার পরিচর্যা কর। মহারাণী, চলো আমরা অন্যত্র যাই। আমার মন বড়ো দুর্বল।"

মন্থরা ততক্ষণে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া নিপুণিকার পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। মহাদেবীর কেশে এবং মুখমণ্ডলে জলসেচন এবং ব্যজন করিতে করিতে বলিল, "আমার তো এখন যাইবার উপায় নাই। কিন্তু মহারাজ, সহসা সন্দেহবশে এতটা কঠোরতা অবলম্বন না করিলেই ভালো হইত না ? কয়েক জন অপরাধীর জন্য

বহু নিরপরাধের উপর হয়তো নির্যাতন হইবে। আমার স্বামী যুবতী চিরদিন স্নেহে এবং সম্মানে অভ্যস্তা, এমন হইবে জানিলে আমি তাহাকে বিবাহের পর রাজপুরীতে আনিতাম না।"

সুপর্ণ বলিলেন, "তুমি এবং তোমার দাসী সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। তোমাদের উপর যাহাতে কেহ কোনও অত্যাচার না করে সেজন্য আমি বিশেষ ভাবে বলিয়া দিব। আমার চরেরা এখন রাজবৈদ্য সন্দীপনের সাহায্যে খাদ্যে মিশ্রিত বিষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া পরে কোন্ বৈদ্য উহা কয়েক দিনের মধ্যে কাহাকে বিক্রয় করিয়াছে তাহা বাহির করিবে। রাজপ্রাসাদের কোনও দাস বা দাসীর সাহায্যে নিশ্চয় উহা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইলেই প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িবে। নির্যাতন ও প্রলোভনের সাহায্যে তাহাদের নিকট সত্য উদ্ধার করিতে বিলম্ব হইবে না।"

মন্থরা বলিল, "আমার প্রার্থিত বর তাহা হইলে দিবেন না? মহারাজ সত্যভ্রষ্ট হইবেন?"

সুপর্ণ বলিলেন, "প্রথমে অপরাধীদের বিচার হইবে, তাহার পরেও যদি তোমার মত অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে তখন তোমার প্রার্থনা বিবেচনা করিব। প্রয়োজন হইলে দুজনে একত্রে নির্বাসনে যাইব।"

শেষ কথাটায় লঘু পরিহাসের আভাস পাইয়া মন্থরা বলিল, "মহারাজ, আপনার হৃদয় কঠিন, রাজকার্যে আপনার কোমলতা দুর্বলতার স্থান নাই জানি। কিন্তু আমি নারী, শত্রুর প্রতিও নির্যাতন আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি কয়েকদিন স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি পাইব কি? আমার পিতৃবন্ধু নগরেই আছেন। আমি তাঁহার গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিলে কি আপনার সম্মানহানি হইবে?"

কাশীরাজ বলিলেন, "রাজমহিষীদের সাধারণতঃ আত্মীয়গৃহবাসের প্রথা নাই। তবে আমি আজ তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না। সপ্তাহকালের জন্য তুমি অমাত্য যজ্ঞদত্তের গৃহে থাকিতে পারো। কবে যাইতে চাও বলো, আমি নিজে রথে করিয়া তোমাকে রাখিয়া আসিব এবং ফিরাইয়া আনিব।"

মন্থরা কহিল, "মহারাজের অসুবিধা না হইলে আজ অপরাহ্নেই আমাকে লইয়া গেলে সুখী হইতাম। এ পুরীর চারিদিকে যেন অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। আপনিও কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গে চলুন না, মহারাজ। আপনাকে এই শত্রু-পুরীতে রাখিয়া আমি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?"

কাশীরাজ হাসিয়া বলিলেন, "মুগ্ধে, আমি গেলে এখানে সমস্ত কার্যে অব্যবস্থা ঘটিবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে, আমি সর্বদা সতর্ক থাকিব, বাহিরে গেলে দেহরক্ষক সঙ্গে লইব। প্রতিদিন প্রাতে একবার অন্ততঃ তোমাকে দেখিয়া আসিব। মহাদেবীর জ্ঞান ফিরিতেছে মনে হয়, আমি উঁহার সহিত এখন বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমি নিজ প্রাসাদে চলিলাম। অপরাহ্নে রথ প্রস্তুত হইলে তুমি সংবাদ পাইবে।" মহাদেবী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই কাশীরাজ দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মহাদেবী উঠিয়া বসিলেন, কয়েক পল নির্নিমেষ নেত্রে মন্থরাকে লক্ষ্য করিলেন। তারপর বলিলেন, "আমার পরিচর্যা করিতেছিলি? সর্বনাশী, আমার পুত্র তোর কাছে কি অপরাধ করিয়াছে বল্, কেন তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছিস?" মন্থরা সস্নেহে তাঁহার সিক্ত কেশ ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "দিদি, আপনি গুরুতর মানসিক আঘাত পাইয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, কি বলিতেছেন জানেন না, সেজন্য আমিও মনে কোনও ক্ষোভ রাখিব না। আপনি সুস্থ হউন, আমি এখন আসি।"

মহাদেবী নিজের কেশ মন্থরার হস্ত হইতে সবেগে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন, বলিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিস না, রাক্ষসী! হাঁ রে, চন্দ্রসূর্য কি উঠিতেছে না? আমাদের নামে এত বড়ো মিথ্যাপবাদ দিতে তোর পাপ-জিহ্বা খসিয়া গেল না? তুই মানবী, না ডাকিনী?" মন্থরা তাঁহাকে আর কোনও কথা না বলিয়া নিপুণিকাকে বলিল, "কিঞ্চিৎ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া এখন উঁহাকে পর্যঙ্কে শয়ন করাইয়া দাও। আমার উপর যে কারণেই

হউক উনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তখন আমার আর কাছে থাকিয়া লাভ নাই।" সে নিজের মুক্ত কেশরাশি আলোলকবরীবদ্ধ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত মুখে গজেন্দ্রগমনে প্রস্থান করিল।

॥ আট ॥

দুঃসংবাদ বায়ুর অগ্রে ধাবিত হয়। অন্তঃপুরে রাজার প্রাণ-নাশের প্রচেষ্টা প্রমোদতরণীতে তাঁহার উপর আক্রমণের উপাখ্যানের সহিত মিলিত হইয়া, কয়েক দণ্ডের মধ্যেই বারাণসীর পথে ঘাটে সাগ্রহে আলোচিত হইতে লাগিল। রাজবাড়ীর দাসী সুদতী উঞ্ছিথ এবং ভদ্র উভয়কেই গোপনে সমস্ত সংবাদ দিয়া গেল। মন্থরা যে সপ্তাহকালের জন্য উঞ্ছিথের গৃহে বাস করিতে আসিতেছে, সে কথা শুনিয়া তাহার পত্নী শঙ্করী বিস্মিতা হইয়া কপালে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "সে আবার কি? রাজার রূপসী রাণীর সঙ্গে তোমার কিসের এত কুটুম্বিতা?" উঞ্ছিথ বুঝাইল, "ধনীগৃহের অনাথা বালিকা, তীর্থভ্রমণের সময় তাহার পিতা আমার উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া সহসা পরলোকে গমন করিলে আমিই কাশীরাজের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। সে আমাকে পিতৃব্য সম্বোধন করে, তোমার কন্যার বয়সী, কোনও চিন্তার কারণ নাই। তবে একটা কথা, তোমাকে লইয়া একটু চিন্তার কারণ ঘটিতেছে। কালিন্দী আসিলেই রাজা ঘন ঘন এই গৃহে আসিবেন, তিনি জানেন আমি মৃতদার, সহসা আমার পত্নী আছেন শুনিলে হয়তো আমার উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইবেন। তোমাকে কিছুদিন অন্যত্র রাখিলে হয় না?"

পত্নী বলিলেন, "দেখ, আমাকে আর জ্বালাইও না। আমাকে সরাইয়া দিয়া তুমি যুবতী রূপসী রাণীর সঙ্গে কাইনষ্টি করিবে, তাহা কিছুতেই চলিবে না। ওসব পিতৃব্য পাতানোয় আমি বিশ্বাস করি না, রাণী আসে তো সর্বদা আমার চোখে চোখে থাকিবে। তুমি কেন প্রথমে রাজার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে? জল-জ্যান্ত পত্নীকে পরলোকে পাঠাইয়া যেমন সাধু সাজিয়াছিলে তেমনি এখন তাহার ফলভোগ করো।"

উঞ্ছিথ বলিল, "ব্রাহ্মণী, রাজরোষে অমাত্যের বৃত্তিটি গেলে দুইজনেই বিপদে পড়িব, আর জীবনটি গেলে তুমি মৎস্যমাংসভোজনে বঞ্চিতা হইবে। তদপেক্ষা এক কাজ করো। তুমি এখন অকালে বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছ, আমি তোমাকে স্বামীপরিত্যক্তা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিব। রাণীকে তুমি সেই কথা বলিয়ো।"

পত্নী বলিলেন, "হ্যাগা, এতবড়ো মিথ্যা কথা কেমন করিয়া বলিব? স্বামী থাকিতে"—উঞ্ছিথ বলিল, "আরে বুঝিতেছ না, আমার এতো স্বামী থাকাও যাহা না থাকাও তাহাই। ভাবিয়াছিলাম পিতামহী বিলক্ষণ কিছু সম্পত্তি দিয়া যাইবেন, ধুমধামে তীর্থভ্রমণে দানধ্যানে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া মৃত্যুকালে মাত্র পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া গেলেন। তাহাতে আর কয়দিন চলে? এখন তুমি দয়া করিয়া পরিচয় না দিলেই রক্ষা পাইব, নচেৎ ধনেপ্রাণে মরিব।" শেষ পর্যন্ত শঙ্করী সম্মত হইলেন। রাজা যখন মন্থরাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া এক কোণে দণ্ডায়মান রহিলেন, উঞ্ছিথ পরিচয় দিলে মন্থরা পদধূলি লইল, রাজা নমস্কার করিলেন। মুহূর্তকাল কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া রাজা বিদায় লইলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

রাণীর সম্মানে ব্রাহ্মণী সেদিন সপ্তব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন, কালিন্দী চাহিয়া চাহিয়া খাইলেন, শেষে বলিলেন, "পিসিমা, এমন সুস্বাদু ব্যঞ্জন জীবনে খাই নাই। এখন ইচ্ছা করিতেছে বাকী জীবনটা রাজবাটীতে না ফিরিয়া তোমার কাছেই কাটাইয়া দিই।" এই প্রস্তাবে যুগপৎ গর্বিতা ও ভীতা হইয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "অমন অলক্ষণে কথা বলিতে নাই। তোমার রাজা স্বামী তাহা হইলে আর আমাদের রক্ষা রাখিবেন না। চিন্তা কি, আমি মাঝে মাঝে তোমার পিতৃব্যের হস্তে তোমার জন্য দুই-চারিটি ব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিব।" এইরূপে রন্ধনের সুখ্যাতি দ্বারা মন্থরা ব্রাহ্মণীর হৃদয় জয় করিল।

সুদতী সন্ধ্যাকালে পরদিনের রন্ধনের উপকরণ

সংগ্রহ করিতে বাহিরে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া বলিল, "পণ্যবীথিকায় শুনিয়া আসিলাম, নগরপাল নাকি সেই বিষবিক্রেতা বৈশ্যকে আবিষ্কার ও বন্দী করিয়াছে। তাহার উপর নির্যাতন চলিতেছে, শীঘ্রই বোধ হয় সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।"

উচ্ছিখ এবং মন্থরা দুজনেরই মুখ শুখাইল। উচ্ছিখ বলিল, "বিষবৈশ্যের নাম কি শুনিয়াছ?" সুদতী বলিল, "রেবন্ত। অসিসঙ্গমের দক্ষিণে বনাঞ্চলের মধ্যে সে নাকি বাস করে।" উচ্ছিখ উঠিয়া পড়িল, বলিল, "কালিন্দী, এ বিপদে আমার গুরুদেবই ভরসা। আমি তাঁহার নিকটই চলিলাম। দেখি তিনি কি বলেন।" উচ্ছিখ প্রস্থান করিলে সুদতী বলিল, "এইবার আমি মরিলাম। কুক্ষণে আপনার কাছে দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছিলাম।" মন্থরা বলিল, "তোর কোনও ভয় নাই। আমি স্তম্ভন মারণ বশীকরণ সমস্ত বিদ্যা জানি। বহুদিন চর্চা নাই, তথাপি মন্ত্র মনে আছে। কাছাকাছি কোথায় শ্মশান আছে বলিতে পারিস?" সুদতী বলিল, "পার্শ্বেই তো হরিশ্চন্দ্র ঘাট। এমন নির্জন ভয়ঙ্কর শ্মশান কাশীতে আর নাই।" মন্থরা বলিল, "আমি তালিকা করিয়া দিতেছি, এই দ্রব্যগুলি তুই অবিলম্বে মূল্য দিয়া সংগ্রহ করিয়া আন্। তারপর দুইজনে শ্মশানে যাইব। আমার মন্ত্রবলে রেবন্ত আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার পূর্বেই মূক জড়বুদ্ধি হইয়া যাইবে, সহস্র উৎপীড়ন করিলেও তাহার নিকট নগরপাল কোনও কথা বাহির করিতে পারিবে না।" সুদতী বাহির হইয়া গেলে মন্থরা ব্রাহ্মণীকে গিয়া বলিল, "মাসের পর মাস পাষাণপুরীতে আবদ্ধ ছিলাম, আজ যখন মুক্তি পাইয়াছি তখন আমার দাসীকে লইয়া একটু বাহিরে ভ্রমণ করিয়া আসি।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "সত্যই তো বাছা, বদ্ধা গাভী মুক্তি পাইলে আর কি গোষ্ঠে ফিরিতে চায়? কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, তুমি অল্পবয়স্কা বালিকা, যদি কোনও বিপদ্ ঘটে?"

মন্থরা বলিল, "আমরা কাছাকাছি থাকিব। আপনি চিন্তা করিবেন না।" সুদতী ফিরিলে দুইজনে শ্মশানে গেল। কিছুক্ষণ পরে যথারীতি পূজাদি করিয়া বগলামুখীর কৃপা প্রার্থনা করিল, ওঁ হ্লীঁ বগলামুখী রেবন্তস্য বক্তব্য বাচং মুখং স্তম্ভয়, জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় ওঁ হ্লীঁ স্বাহা। ওঁ হিলি হিলি চিলি চিলি ফুঃ, ব্রহ্মণে ফুঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যো ফুঃ।"

নগরপাল সত্যই সে পর্যন্ত বিষবিক্রেতার সন্ধান পায় নাই, সুদতী বিষবৈশ্যের নামধাম অমাত্য ভদ্রের নিকট শুনিয়াছিল। বলা বাহুল্য ভদ্রের চর সর্বদা উচ্ছিখের পশ্চাতে থাকিত, তাহারাই তাহাকে বিষ ক্রয় করিতে এবং সুদতীকে দিতে দেখিয়াছিল। ভদ্রের গৃহে পৌঁছিবামাত্র তিনি উচ্ছিখকে নিভৃতে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "রেবন্ত ধরা পড়িয়াছে, তুমি বোধ হয় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতেছ?"

উচ্ছিখ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, আপনার নির্দেশেই আমি এই দুষ্কার্যে যোগ দিয়াছিলাম, এখন আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি অবিলম্বে কালিন্দীকে সংবাদ দাও, নগরপাল রেবন্তকে রাজার সম্মুখে লইয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোনও শব্দ বাহির করিতে পারে নাই। সে জড়বুদ্ধি মূকবধিরবৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নগরপালের চর সন্ধান পাইয়াছে এক দাসী বিষ লইয়া রাজবাটীতে গিয়াছিল। রাজবাটীর দাসীদের মধ্যে সুদতীর মতো অবাধ ভ্রমণের অধিকার কাহারও নাই, সুতরাং তাহার উপর সন্দেহ পড়িয়াছে, সে যেন অতঃপর সতর্ক থাকে। আর, রাজা তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে কল্য প্রাতে বিমর্ষ দেখিলে কথাচ্ছলে তাঁহার নিকট আমার প্রশংসা করিয়ো, বলিয়ো আমি তাঁহার সংসারে শান্তি আনিতে পারি। আর কালিন্দীকে বলিয়ো, আগামীকল্য রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে সে যেন সাবধান থাকে, তাহার বধবন্ধনের আশঙ্কা আছে। তবে অত্যন্ত বিপদে পড়িলে সে আমার নিকট আশ্রয় পাইবে ইহাও জানাইয়া রাখিয়ো। কাশীরাজ যদি আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন তবে কল্য রাত্রিশেষে অর্থাৎ

পরদিন উষাকালে লক্ষ্মীকুণ্ডের পশ্চিমস্থ দ্বিতল গৃহে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

উচ্ছিথ বলিল, "কিন্তু মহারাজের নিকট যাইতে হইবে ভাবিলেই যে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। কি করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিব?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবার বলিতেছি, তোমার কোনও ভয় নাই। আজ হইতে দুই রাত্রির মধ্যে কালিন্দীর ছলনাজাল ছিন্ন হইবে, সে কাশী হইতে বিদায় লইবে। তারপর তুমি নির্বিঘ্নে সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে পারিবে।" উচ্ছিথ প্রশ্ন করিল, "প্রভু, আপনি তাহার প্রাণদণ্ড ঘটাইবেন না তো?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভয় নাই, তাহাকে সসম্মানে অন্য এক রাজগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিব।" উচ্ছিথ বলিলেন, "আপনার অসাধ্য কিছুই নাই।" সে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন উচ্ছিথ যথারীতি রাজসভায় গেল এবং সভাশেষে মহারাজের নিকট স্বীয় গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় জানাইয়া গৃহে ফিরিল। মন্থরা জিজ্ঞাসা করিল, "পিতৃব্য, রাজসভার নূতন সংবাদ কি?" উচ্ছিথ বলিল, "অদ্ভুত ব্যাপার। গতকল্য রেবন্ত ধরা পড়িয়া আর্তনাদ করিয়াছিল, প্রহার হইতে নিষ্কৃতির জন্য রাজার সম্মুখে সমস্ত কথা স্বীকার করিবে জানাইয়াছিল, আজ সে মূক-বধিরবৎ আচরণ করিতেছে, সহসা তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। দারুণ আতঙ্কে অনেক সময়ে মানুষ এরূপ জড়বুদ্ধিবৎ হইয়া যায়।" মন্থরা নিজের মন্ত্রশক্তির প্রভাব দেখিয়া পুলকিতা হইল, চক্ষুর ইঙ্গিতে সুদতীকে জানাইল, "কেমন? দেখিলে তো?" সুদতীও মৃদু মৃদু শিরঃকম্পন করিয়া তাহার মন্ত্রশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইল। উচ্ছিথ তখন নিজ গুরুদেবের পরিচয় দিয়া তাহার যে কোনও বিপদের ভয় নাই সে কথা জানাইল। সুদতীর প্রতি সন্দেহ পড়িয়াছে, সেকথা এবং কালিন্দীর যে মধ্যরাত্রে বধবন্ধনের আশঙ্কা আছে তাহাও জানাইল। উহার যে একমাত্র সেই মহাপুরুষের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গতি নাই তাহাও জানাইতে ভুলিল না।

মন্থরা সেদিন সারাদিন সুদতীকে ঘরের বাহির হইতে দিল না। সন্ধ্যার পর পূর্বের মতো হরিশ্চন্দ্র ঘট্টের মহাশ্মশানে দুজনে গেল। আজ তাহারা পিতৃস্বসাকে বলিয়া আসিয়াছে, ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে, তিনি যেন অপেক্ষা না করিয়া খাইয়া শয়ন করেন। তাহারা একটা ঘরের তালাচাবি নিজেদের কাছে রাখিয়াছে, রাত্রিতে যত বিলম্বই হউক, সেই ঘরে রক্ষিত অন্নব্যঞ্জন খাইয়া শুইতে পারিবে। মন্থরা স্থির করিয়াছিল, তাহাকে বধ বা বন্ধন করিবার পূর্বে নগরপালকে যদি মন্ত্রবলে হত্যা করা যায় তবে উপস্থিতের মতো তাহার নিজের বিপদ্ কাটিয়া যায়, নূতন লোক একার্যের ভার লইবার পূর্বেই তাহারা কাশীর খেলা শেষ করিয়া অন্য কোনও দেশে সরিয়া পড়িতে পারে।

॥ নয় ॥

মণিকর্ণিকায় কাশীরাজের প্রমোদতরণী আক্রান্ত হইবার পর একমাস গত হইয়া গিয়াছে, সেদিন অমাবস্যা। কাশীনগরের একান্তে পুণ্যশ্লোক মহারাজ হরিশ্চন্দ্র একদা যে শ্মশানে শবদাহ করিয়া তাঁহার কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন সেইখানে সে রাত্রিতে একটিও চিতা জ্বলিতেছিল না। শব-সংকারের জন্য যে চণ্ডাল কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিত সে সম্ভবতঃ অদূরে চণ্ডালপল্লীতে নিজ গৃহে সুপ্তিমগ্ন ছিল। মন্থরা পূর্বদিনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া আজ শত্রুহননের জন্য আর্দ্রপটী বীজ জপ করিতে আসিয়াছিল। অন্ধকারে অনেক অস্থি ও করোটি পদে পদে তাহার যাত্রায় বাধা ঘটাইতেছিল, অর্ধদগ্ধ মনুষ্যদেহ ভোজনে নিরত দুইটা শৃগাল তাহাকে দেখিয়া বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, সুদতী তো শ্মশানের ভিতর অধিক দূর প্রবেশই করে নাই, মন্থরার বস্ত্র-অলঙ্কারাদি লইয়া পূর্বদিনের মতো শ্মশানের প্রবেশপথেই দাঁড়াইয়া ছিল। মন্থরা ভূষণহীনা হইয়া একখানি মাত্র কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্বক নদীতে অবগাহন করিল। স্নানশেষে মুক্তকেশে আর্দ্র বস্ত্রে ঊর্ধ্ববাহু অবস্থায় দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া পাপীয়সী মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল, "ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে

রক্তবাসসে অপ্রতিহতপরাক্রমে নগরপাল-শত্রু-বধায় বচেতসে স্বাহা”—

অশুদ্ধ মন্ত্রের এরূপ আশ্চর্য প্রভাব ইতঃপূর্বে বা পরে বোধহয় আর কখনও দেখা যায় নাই। শুনা যায় বৃত্রাসুরের মারণ যজ্ঞে পুরোহিত ‘ইন্দ্রং শত্রুং জহান’ না বলিয়া ‘ইন্দ্রশত্রুং জহান’ উচ্চারণ করায় ইন্দ্রশত্রু বৃত্র নিজেই নিহত হইয়াছিল, কিন্তু সে মন্ত্রোচ্চারণের অনেক পরে মন্ত্র-শক্তির সহিত দৈবশক্তির মিলন ঘটিবার পর। এক্ষেত্রে অত বিলম্ব হইল না, মন্ত্রোচ্চারণ শেষ করিয়াই মন্থরা অনুভব করিল কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি নিঃশব্দচরণে তাহার নিকটবর্তী হইয়াছে। কাশীর নিস্তব্ধ গঙ্গাতীরে বহুদূর হইতে রাজপ্রাসাদের ঘন্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষিত হইল। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া মন্থরা শিহরিয়া উঠিল, ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, “তোমরা কে? কি চাও?”

গম্ভীর পরুষকণ্ঠে উত্তর আসিল, “আমি কাশীর নগরপাল মহাবল। মহারাণী, মহারাজা সুপর্ণ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমি শিবিকা আনিয়াছি। বাহকগণ, শিবিকা নামাও।”

সেইখানে সেই মুহূর্তে বজ্রপাত হইলে মন্থরা এত চমকিত হইত না। আতঙ্ক সীমা ছাড়াইলে মানুষ জ্ঞান হারায়, মন্থরাও জ্ঞান হারাইয়া সেই শ্মশানের কর্দমে পতিত হইতে যাইতেছিল, বাহকেরা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া সযত্নে শিবিকা-মধ্যে শয়ন করাইয়া দিল। শিবিকা শ্মশানভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্চক্রোশী মহাপথে উঠিল এবং বরুণাসঙ্গমের নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল।

কিছুক্ষণ পরে আন্দোলিত শিবিকা-মধ্যে মন্থরার সংজ্ঞা ফিরিল। প্রথমতঃ সে কেন কোথায় আসিয়াছে কিছুই স্মরণ ক[illegible] ত পারিল না, তাহার পর সিক্ত বস্ত্রের জন্য শৈত্য অনু[illegible] করিতেই শ্মশানের এবং নগরপালের কথা মনে পড়িল। সে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল, এখন উপায় কি? এমন সময়ে সহসা শিবিকা থামিয়া গেল। মন্থরা শুনিতে পাইল প্রহরী প্রশ্ন করিতেছে, “তোমরা কে? এতরাত্রে কোথায় চলিয়াছ?” উত্তরে শিবিকার পুরোবর্তী নগরপালবেশী উষ্ণীষধারী ব্যক্তি মৃদুস্বরে কহিল, “আমি শ্রেষ্ঠী রাজতিলক। আমার পত্নী সন্ধ্যাকালে গঙ্গাস্নানে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ায় ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে।”

মন্থরা বুঝিল, সে নগরপালের বন্দিনী নহে, কোনো তস্করের দল তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে সাহস ফিরিল, সে শিবিকাভ্যন্তর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, “মিথ্যা কথা। প্রহরী, ইহারা আমার কেহ নহে। বলপূর্বক আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে জানি না তুমি রক্ষা করো।” প্রহরী বিস্মিত হইল, আদেশ করিল, “শিবিকা নামাও। আমি দেখিব।”

সম্মুখবর্তী তথাকথিত নগরপাল বলিল, “প্রহরী, আমার পত্নী উন্মাদরোগগ্রস্তা, উঁহার কথা শুনিয়ো না। আমাদিগকে যাইতে দাও।” প্রহরী শিবিকার উপর দীর্ঘ যষ্টির আঘাত করিয়া বলিল, “শিবিকা নামাও। যদি সহজে আদেশ পালন না কর তবে এই যষ্টি দেখিতেছ; প্রয়োজন হইলে কটিবদ্ধ কৃপাণও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইব।”

শিবিকা নামিল। প্রহরী শিবিকাদ্বার ঈষৎ উন্মোচন করিয়া মশালালোকে দেখিল এক সিক্তবসনা সুন্দরী শায়িতা। প্রহরীর মুখ দেখিয়া মন্থরা উঠিয়া বসিল, প্রহরী সম্পূর্ণরূপে দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলে সে বাহিরে আসিল, বলিল, “আমি দস্যুর কবলে পড়িয়াছিলাম, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। এখন দয়া করিয়া যদি আমাকে আমার গৃহের পথ দেখাইয়া দাও”—

প্রহরী বলিল, “এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, এই কাপুরুষগুলোকে আগে বন্দী করি।” সে চারিদিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, শিবিকাবাহকদল বা তাহাদের পুরোবর্তী তথাকথিত নগরপালের কোনও চিহ্ন নাই! সে মশাল লইয়া কিছুক্ষণ নিকটবর্তী ক্ষুদ্র-

পথগুলিতেও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কয়েকটি গৃহের গৃহস্থকে জাগ্রত করিয়া প্রশ্ন করিল, কোন ফল হইল না। নিকটে-দূরে কোথাও দস্যুদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন প্রহরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মাতঃ, আপনি কোথায় যাইবেন?" মন্থরার সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, তাঁহার নিকট আশ্রয় মিলিতে পারে। বলিল, "লক্ষ্মীকুণ্ড কোন্ পথে যাইব বলিতে পার?" প্রহরী বলিল, "লক্ষ্মীকুণ্ড তো অদূরে। এই পথ ধরিয়া এক পল চলিলেই আর একটি সঙ্কীর্ণ পথ দক্ষিণদিকে গিয়াছে দেখিতে পাইবেন। সেই পথে দশ বা দ্বাদশখানি গৃহ অতিক্রম করিলেই দক্ষিণে দেখিবেন একটি বিরাট্ বটবৃক্ষ, উহার বামে প্রস্তর-সোপানাবদ্ধ ক্ষুদ্র কুণ্ডটিই লক্ষ্মীকুণ্ড। কিন্তু মা, আপনাকে কিছুক্ষণ যে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি নগরপালকে সংবাদ পাঠাইব। চৌরগণ পলায়ন করিয়াছে শুনিলে তিনি অবশ্য বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি জানিলে প্রসন্ন হইবেন। কাশীতে দিন দিন তস্করদের স্পর্ধা বাড়িতেছে। রাজা রাজকার্যে পূর্বের মতো মনোযোগ দেন না, নগরপালও দুইদিন হইল কয়েকজন আততায়ীর সন্ধানে নগরীর অধিকাংশ প্রহরী ও গুপ্তচরকে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ কাছাকাছি অন্য প্রহরী কেহ ছিল না বলিয়াই পাপিষ্ঠেরা পলাইতে পারিল।"

মন্থরা নগরপালের নামে ভয় পাইল। কে জানে, নগরপালের গুপ্তচরেরাই হয়তো তাহাকে লইয়া যাইতেছিল নচেৎ তাহার সন্ধান দুর্বৃত্তেরা পাইবে কোথায়? এই হতভাগ্য হয়তো না জানিয়া বাধা দিয়াছে। সে বলিল, "সত্যই তোমার কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু আমাকে নগরপালের নিকট লইয়া গিয়া কেন অপদস্থ করিবে? আমি ধনীগৃহের গৃহিণী, আমাকে তস্করে স্পর্শ করিয়াছে শুনিলে হয়তো আমার স্বামী আমাকে গৃহে লইবেন না, গৃহে লইলে হয়তো তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবে। কেন আমাকে বিপদে ফেলিবে? তুমি আমার ধর্মভ্রাতা, প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এবার মানরক্ষা করো। আমাকে যাইতে দাও।"

প্রহরী তখনও দ্বিধা করিতেছিল। বলিল, "পুরস্কারের লোভ করি না, কিন্তু আমার কর্তব্য?" মন্থরার সহসা মনে পড়িল, সর্বাঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিলেও তাহার কর্ণের মণিময় কুণ্ডলদ্বয় খুলিতে ভুল হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ দুই কর্ণ হইতে দুইটি কুণ্ডল খুলিয়া প্রহরীর হস্তে দিয়া বলিল, "তোমার কর্তব্য এখন আমার মানরক্ষা। এই কুণ্ডল দুইটি আমার ভাতৃজায়াকে ভগ্নীর আশীর্বাদ বলিয়া দিয়ো।"

প্রহরী আর দ্বিধা করিল না। তাহাকে ছাড়িয়া তো দিলই, কর্তব্যের ত্রুটি করিয়া তাহাকে মশাল ধরিয়া পথ দেখাইয়া লক্ষ্মীকুণ্ডের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। কুণ্ডের পশ্চিমকোণে একটি দ্বিতল পাষাণগৃহে দীপালোক লক্ষিত হইল, নিম্নতলের একটি কক্ষে কাহারা মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিল। প্রহরীকে বিদায় দিয়া মন্থরা সেই গৃহের দ্বারে গিয়া করাঘাত করিল।

ক্রমশঃ

যখন সম্পাদক ছিলাম

পরিমল গোস্বামী

(লেখকের শীঘ্র-প্রকাশ্য গ্রন্থের আর একটি অধ্যায়।)

পূর্ব অধ্যায়ে কিছু কিছু কৌতুককর ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছিলাম, কিন্তু এই অধ্যায় লিখতে বসেছি অন্য সুরে। আমার সম্মুখ দিয়ে আমার বহুদিনের সব বন্ধু একে একে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি বসে বসে দেখছি। আমার জীবিত ও মৃত দুটি তালিকায় জীবিত তালিকা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, মৃতের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। সবাই জীবিত থাকলে সবার সঙ্গে যে সব-সময় দেখা হত তা নয়, কারো সঙ্গে পাঁচ-ছ বছরও দেখা হয়নি। সবাই বেঁচে আছি এই চেতনা মনের মধ্যে সুপ্ত থাকা সত্ত্বেও সবার অস্তিত্ব-বোধটা মন থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে না। সেই বোধটা অদর্শনের অভাব ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে মনকে ভারী করে তোলে। তখন বোঝা যায় শত চেষ্টাতেও আর যে গেল তাকে দেখা যাবে না। এই বোধটা পীড়াদায়ক। এ-সব ভেবেছি আর একের পর এক বন্ধুর মৃত্যু বর্ণনা করে চলেছি।

ইতিমধ্যে আরও দুটি মৃত্যু আমাকে মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে গেল। কালীকিঙ্কর ঘোষ-দস্তিদার ছিল মহৎ শিল্পী এবং মহৎ মানুষ। সকল জাতীয় লোভ থেকে মুক্ত হয়ে একটা মানুষ কি করে চরম দুঃখের মধ্যেও হাসিমুখে বিনা অভিযোগে জীবন কাটিয়ে যেতে পারে তা দেখলাম তার মধ্যে। আমার সঙ্গে, বিশেষ করে আমার সম্পাদকীয় জীবনের সঙ্গে, সে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আমাকে সে বুঝতে পারত। আমি তাকে বুঝতে পারতাম। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর শিল্পরুচি ও শিল্প-আত্মার সঙ্গে সে নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল। সে-সব কথা আমার প্রথম ও চতুর্থ স্মৃতিগ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছি, এবং গত ৮ই অক্টোবর ১৯৭২ তারিখের যুগান্তরে লিখেছি তার মৃত্যুর ১১ দিন পরে। যা লিখেছিলাম তা থেকে কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি:

"কালীকিঙ্কর মানুষটিকে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী আমাকে লিখেছিলেন, জনসমাজে চিনিয়ে দিতে। তাঁর আদেশ আমি পালন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে মানুষটি যে তার আকাশচুম্বী উদাসীনতায় পার্থিব সবকিছুকে তুচ্ছ করে জীবন শেষ করে গেল।*

আমার রচনাটির শেষ কয়েকটি ছত্র এগুলি।

নির্মলকুমার বসুর মৃত্যু ঘটল গত ১৫ই অক্টোবর (১৯৭২) তারিখে। ১৯৩৩ সন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে সময় তিনি আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ের পূর্ব থেকে কয়েক বছর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাঁর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম যখন তিনি অ্যামেরিকায় ছিলেন, ১৯৫৭তে। এবং তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছে (টেলিফোনে) ১৯৭১, ১১ই জানুয়ারি সোমবার। এসব কথা পরে বলছি।

নির্মলবাবু কর্মীরূপে ছিলেন নিষ্ঠাবান্ এবং কঠোর, অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলতেন। চরিত্রবিশ্লেষণেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞানপদ্ধতির অনুরাগী। তাঁর বড় বই My Days with Gandhiতে সত্য কথা সহজভাবে

---

*কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের বহুবর্ণ চিত্র এককালে প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে। পরে প্রবাসী ষাষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে শিল্পীর বহু পোর্ট্রেট ও অন্যান্য লাইন ড্রয়িং-এর চমৎকার সব নিদর্শন আছে।

—প্রবাসী-সম্পাদক।

বলেছেন। এটি স্বয়ং গান্ধীর প্রভাব। আবার যেখানে তিনি হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে তিনি কবির স্তরে উন্নীত। তিনি পরিব্রাজক ছিলেন নিজের কাজের তাগিদেই। আদিবাসী অথবা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে তিনি আত্মীয়রূপে মিশে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বোলপুরে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য একটি শিক্ষায়তন পরিচালনা করেছেন।

নির্মলবাবুর সঙ্গে আমি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক থাকা কালে, মাঝে মাঝে, হ্রস্ব বা দীর্ঘকালীন অদর্শন সত্ত্বেও একটা নৈকট্য অনুভব করেছি, কারণ তিনি যেখানেই থাকুন, আমার একটি বিশেষ অনুরোধ তিনি বন্ধুরূপে পালন করেছিলেন। অর্থাৎ আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাকে লেখা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এটি ১৯৩৫ সনের ঘটনা। সে লেখার পরিচয় দেবার আগে তাঁর বিষয়ে আগে আমি যা লিখেছি তা থেকে সামান্য কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি—

"নির্মলবাবুর চরিত্রে বেশ একটি উদার মাধুর্য্য ছিল। সামান্য একটি ঘটনা বলি। একদিন তাঁর হাতে বড় একটা চামড়ার ব্যাগ দেখি। ব্যাগটি নতুন নয়, কিন্তু নির্মলবাবুর হাতে নতুন। উৎকৃষ্ট চামড়া, ওজনে বেশ ভারী এবং তার ভিতর অনেকগুলি ঘর। শুনে চমকে উঠলাম—নির্মলবাবু ঐ ব্যাগ বউবাজারের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকান থেকে মাত্র আড়াই টাকায় কিনেছেন। তখনই ওর দাম পঁচিশ টাকা বললেও বিশ্বাস করতাম। ব্যাগটিকে এবং তার ক্রেতাকে একই ভাষায় প্রশংসা করলাম। তিনি যদি বলতেন ওটি বিনামূল্যে পেয়েছেন, তা হলে বলবার কিছুই ছিল না, কিন্তু আড়াই টাকায় ওরকম একটি ব্যাগ পাওয়া এবং সে-কথা প্রচার করার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে। শুনে মনে আঘাত লাগে না কি?

"পরদিন ঐ ব্যাগ নিয়ে আবার এলেন নির্মলবাবু এবং এসেই আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে, বললেন ব্যাগটি আপনাকে দিলাম। কিছু বলতে দিলেন না, তবে আমি এরপর থেকে সাবধান হয়েছি, নির্মলবাবুর কোনো শখের জিনিসের আর কখনো প্রশংসা করিনি।"

(স্মৃতিচিত্রণ, ১৯৫৮।)

আর এক পৃষ্ঠায় লিখেছি—

"নির্মলবাবু প্রকৃত রসিক ব্যক্তি।...... একদিন এক ক্যামেরা উপলক্ষে বেশ একটা নাটক রচনা করলেন। (ঘটনাটি ঘটেছিল যুগান্তর অফিসে আমার টেবিলে) কম্পাস নামক এক আশ্চর্য ক্যামেরা, যার বিজ্ঞাপন দেখেছি অনেকদিন, চোখে দেখিনি। এত ছোট যে প্রায় হাতের মুঠোয় ধরে। চতুষ্কোণ একটি ক্যামেরা, কিন্তু তার মধ্যে এমন জটিল সব ব্যবস্থা যে আশ্চর্য হবারই কথা। তিন রকম ফিলটার—সব ভিতরে। ঐ ক্যামেরার মধ্যে প্লেট ও রোল ফিল্মের ব্যবস্থা, এবং আরো পঞ্চাশ রকম কৌশল। নির্মলবাবু আমার সামনে এই ক্যামেরা ধরে, এবং কোনো ভূমিকা না করে ক্রমাগত এক-একটি কৌশল দেখাচ্ছেন আর গম্ভীরভাবে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন।"

আর একখানা বইতে "নানা রঙের দিনগুলি" নামক রচনায় বঙ্গশ্রী অফিসের বর্ণনায়, বন্ধুদের একের পর এক ছবি এঁকেছিলাম অল্প কথায়। তার মধ্যে নির্মলবাবু বিষয়ে লিখেছিলাম—"প্রকাণ্ড ব্যাগে গান্ধীজি, উড়িষ্যার মন্দির এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পুরে নির্মলকুমার বসু আসতেন প্রসন্ন হাসিমুখে।" (সপ্তপঞ্চ ১৯৫৭।)

তাঁর My Days with Gandhi (১৯৫৩) নামক বইখানার একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলাম যুগান্তরে তাঁরই তোলা গান্ধীজির একখানা ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি সমেত। সমালোচনাটির কপি আমার হারিয়ে গেছে। বইখানার নাম-পৃষ্ঠায় শুধু তাঁর হাতের বাংলা লেখা "শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, বন্ধুবরেষু, ২৭শে এপ্রিল ১৯৫৩, নির্মলকুমার বসু" কথাগুলির দিকে তাকিয়ে সমস্ত স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠছে। তবে সান্ত্বনা মাত্র এই যে, তাঁর সম্পর্কিত আমার সমস্ত লেখাই তিনি পড়েছিলেন, এবং এতে সম্পর্ক মধুরতর হয়েছিল।

'শনিবারের চিঠি'র জন্য আমাকে পরিব্রাজক

পর্যায়ের প্রথম যে লেখাটি দেন, তার নাম ছিল 'কবি'। বেরিয়েছিল মার্চ ১৯৩৫, ফাল্গুন ১৩৪১-এর সংখ্যায়। পরবর্তী কিস্তিতে পেলাম একসঙ্গে দুটি রচনা, নাম 'সাধু' ও 'শিল্পী'। এই দুটি রচনাই প্রকাশিত হল পরের মাসে। তারপরে আর কয়েকটি। ছোট ছোট রচনা, কিন্তু অখ্যাত গ্রাম্য মানুষদের নিয়ে নির্মলবাবু যে-সব ছবি এঁকেছেন এইসব রচনায়, তার তুলনা করি এমন কোনো রচনা বাংলা ভাষায় আর মনে পড়ছে না।

তারপরের কিস্তিতেই দুটি রচনা প্রকাশিত হল বৈশাখ ১৩৪২-এর সংখ্যায়। দুটি লেখার নাম 'দেশ-সেবক' ও 'অধ্যাপক'। যেদিন এই লেখা নিয়ে নির্মলবাবু আমার কাছে এলেন, সেদিন প্রস্তাব করলাম, সবগুলি রচনাই যখন এক জাতের এবং এক সুরের তখন এর একটা সাধারণ নাম দিতে চাই—পরিব্রাজকের ডায়েরি। নির্মলবাবু বললেন, যা ভাল মনে করেন করুন। এবং সেই সংখ্যাতেই ফুটনোটে বলে দেওয়া হল সে-কথা। নির্মলবাবুর বিজ্ঞান-সাধনার জন্য তাঁর স্বেচ্ছারত পরিব্রাজকের জীবনের একটি বিশিষ্টতা আছে। তিনি তাঁর এই কর্তব্যবোধের সঙ্গে হৃদয়ের এমন একটা যোগসাধন করেছিলেন যাকে অভূতপূর্ব বলা চলে আমাদের সমাজে। একদিকে নৃতত্ত্বের উপকরণ সংগ্রহ, এবং যার জন্য অশেষ দুঃখবরণ, অন্যদিকে দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ, যার জন্যও নিজেকে বহুদিক থেকে বঞ্চিত রাখা, এই দুইয়ের সংযোগে নির্মলবাবুর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। দরিদ্র অসহায়ের সেবা, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজের দিক থেকে যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছিল। এবং বৃহত্তর কর্তব্যবোধের খাতিরে নিজেকে প্রেম-ভালবাসা থেকে কতখানি বঞ্চিত রেখেছিলেন, তারও সন্ধান হঠাৎ কখনো মিলবে তাঁর ঐ ডায়েরি থেকে। দেশসেবা তাঁর জীবনের বড় আদর্শ ছিল বলেই তিনি গান্ধী মহারাজের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর তাঁর এই আকর্ষণ যে কতখানি ভাবালুতাবর্জিত এবং আন্তরিক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গান্ধীজিও তাঁকে অকপটে বিশ্বাস করতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করতে তা থেকে।

নির্মলবাবুর চরিত্র কঠোরে-কোমলে গড়া। তিনি প্রকৃতির প্রভাব নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করেছেন, এবং ক্রমে তা মানুষের মধ্যে এনে বিস্তার করিয়ে দিয়েছেন। মানুষের প্রভাব তাই অন্য প্রভাবকে অতিক্রম করেছে অধিকাংশ সময়েই। নির্মলবাবু অন্তরে অন্তরে ছিলেন প্রেমিক, আর ছিলেন কবি। এই তাঁর হৃদয়ের দিক। আমি একে একে তাঁর মনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্রকে তিনি বিজড়িত করেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য এবং তাঁর গভীর সহানুভূতিশীল মনে তিনি তাদের ভালবেসেছিলেন। বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য এ ভালবাসা তাঁর অত্যাবশ্যক ছিল না। এ-ভালবাসা ছিল তাঁর স্বভাবের মধ্যে। অন্যদিকে যার সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড় যোগ ছিল, তাঁকেও তিনি সকল কাজের মধ্যে স্মরণ করেছেন। তিনি এ-বিষয়ে যেটুকু লিখেছেন তা আমি শুধু বলতে পারি।

একটা ঘটনার কথা পরিব্রাজকের ডায়েরিতে আছে। সাঁওতালদের একটি উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সুরাপানে উন্মত্ত নরনারীকে দেখে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি লিখেছেন—

"বর্ষায় নদীর জল ঘোলা হইয়া উঠে। ইহাদের আনন্দের স্রোত ঘোলা হইয়া উঠিয়াছিল। মনের তলদেশে যত সুপ্ত তামসিকতা সঞ্চিত ছিল, সেগুলি যেন তাড়নায় আজ যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই তমসার আঘাতে আমার অন্তঃকরণ পীড়িত হইয়া উঠিল। আমি উৎসবের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া গহন অন্ধকারের মধ্যে শালের বনপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ব্যাপিয়া পদচারণ করিতে লাগিলাম।

"মনের ছায়ায় আমার মানসী প্রিয়ার মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। আমি যেন উৎসবের প্রাঙ্গণে ধীর পদক্ষেপে আনন্দের বহুবিধ মূর্তি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি।.....

"আমার গায়ের পাশে একজনের নিবিড় অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করিলাম। দেখিলাম আমার সঙ্গে আমার মানসী প্রিয়াও এই সকল দৃশ্য নিবিষ্ট মনে দেখিতেছেন। তাঁহার হাত আমার হাতের মধ্যে আবদ্ধ। আমি নীচু হইয়া পথ হইতে একমুঠা ধুলা কুড়াইয়া তাঁহার কপালে...মাখাইয়া দিলাম। হঠাৎ নিবিড় উজ্জ্বল আনন্দে প্রিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথার কালো চুলের আবেষ্টনের মধ্যে শুধু দুটি চোখের উজ্জ্বলতা দেখিতে পাইলাম।......"

ডায়েরির এই অংশে নির্মলবাবু নিজের মনকে অকপটে প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্য প্রকাশ! সাঁওতালদের উন্মত্ততার কুৎসিত দৃশ্যে মন পীড়িত হয়েছিল, কিন্তু 'মানসী'কে স্মরণমাত্র সে-সমস্ত দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠল, সব ভাল লাগল তখন।

হৃদয়ের যোগে প্রকাশের এই যে কাব্যময়তা, এর পাশাপাশি আমি তাঁর আর একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করছি :

"অন্ধতমিস্র রজনীর আকাশতলে লেনিন কর্মকারের বেশে লৌহের উপরে প্রদীপ্ত লৌহখণ্ড রাখিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহাতে আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতেছেন। সম্মুখে প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু উপরে রাত্রির যে অন্ধকার ঘেরিয়া আছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার অন্তরের বিক্ষুব্ধ আশা, বাহুর বিপুল শক্তি, কর্মের প্রচণ্ড উন্মাদনা সবই নক্ষত্রের নিশ্চল কঠোর আলোর স্পর্শে পরাহত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে যেমন প্রভেদ নাই, মানুষের এই ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ লীলারও তেমনি কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই। আর অপরপক্ষে গান্ধী নিথর নীরব রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর নক্ষত্রালোকের দিকে চিরদিনের যাত্রীর মত বহিয়া চলিয়াছেন। সে যাত্রার কোনদিনই শেষ হইবে না জানিয়াই তিনি তাঁহার সকল শক্তি সকল দৃষ্টি, শুধু পায়ের তালের উপরেই নিবদ্ধ করিয়াছেন, পথে চলায় ভুল হইলে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের নিশানা ঠিক করিয়া লইতেছেন। বিগতকাল এবং অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমানের যে মহামুহূর্ত বিরাজ করিতেছে, তাহারই উপরে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সকল প্রাণকে ঢালিয়া দিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার বিশেষত্ব, ইহা হইতেই তিনি জীবনের সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪১, "কমিউনিজম্ ও গান্ধীবাদ"।)

পূর্বের উদ্ধৃতি ও এই উদ্ধৃতিটি ভিন্নজাতের হলেও উভয়ের মধ্যে কাব্যধর্মিতার দিক থেকে মিল আছে। এবং কোনো ব্যক্তির জীবন-আদর্শের বিশ্লেষণ কাব্যের ভাষায় করতে গেলে যে ত্রুটি ঘটে, এখানেও তা অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু নির্মলবাবুর প্রায় সমস্ত কাজে হৃদয়াবেগ যুক্ত, একমাত্র নৃতত্ত্ব বা প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাড়া। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ জরিপের কাজ করেছেন। গান্ধীকে নোয়াখালির পটে বিশ্লেষণেও তাই করেছেন। অন্যত্র যেমন দেখা যাবে তাঁর 'কোণারকের বিবরণ' অথবা 'হিন্দুসমাজের গড়ন' অথবা 'Cultural Anthropology' নামক বইগুলিতে। সত্যসন্ধানী আবেগ-বর্জিত হবেন যথাসম্ভব। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব। এবং নির্মলবাবু চেষ্টা করেছেন নিঃসন্দেহে। শেষদিকে গান্ধীজির মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নোয়াখালি ভ্রমণের সঙ্গীরূপে এবং পূর্বে বহুবার তাঁর একান্ত বন্ধুরূপে তাঁর সঙ্গে বাস করে তিনি গান্ধীজিকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন, এবং 'My Days with Gandhi' নামক নির্মলবাবুর সর্ববৃহৎ বইতে যথাসম্ভব আবেগ বর্জন করেছেন। অতএব এই বই ছাপা নিয়ে নির্মলবাবুকে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের টাকায় ছেপেছিলেন। আমাদের এই বঙ্গদেশের হিন্দুদের একটি বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ আমরা কার্যতঃ যে-সব মনীষীর পথ অনুসরণ করতে অসুবিধা বোধ করি, এবং যা আমাদের দ্বারা প্রায় অসম্ভব, সেইসব মনীষীকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখে আমাদের নিজ

অভ্যাসের পথে নিশ্চিন্ত মনে চলি। সে-জন্য সেইসব মনীষীর প্রতি আমাদের শেষ পর্যন্ত একমাত্র কর্তব্য হয় তাঁদের স্মৃতি পূজা করা, এবং তাঁদের জীবন-ইতিহাস থেকে মানুষের স্বাভাবিক যাবতীয় গুণকে অস্বীকার করে তার স্থলে কল্পিত অনেক গুণ আরোপ করা এবং নিয়মিত দিবস পালন করা।

নির্মলবাবুর গান্ধীচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার দিকও তিনি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন, তাই তাঁর এ-বই গান্ধীজির দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তগণ (যাঁরা গান্ধীজির আদর্শ খুব যে মানেন তা নয়) প্রকাশ করতে বাধা দিয়েছেন। সে-সব কথা ভূমিকায় নির্মলবাবু অকপটে লিখে গেছেন। তাঁর নিজের কাছে এ-সব কাহিনী অনেক শুনেছি। একপ্রান্তে অবাস্তবতার দিকে আর এক প্রান্তে অসভ্যতার দিকে, সহজে ঝুঁকে পড়া আমাদের স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য।

নির্মলবাবুর হতাশার সঙ্গে আমার হতাশা একই পথের যাত্রী। সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, কৌতুকপ্রিয়তা, এবং নিজকর্মে নিষ্ঠা, এইসব গুণ নির্মলবাবুকে নীচতার উর্ধ্বে ধরে রেখেছিল।

আমার একখানি ভ্রমণকাহিনী (বেঙ্গল পাবলিশার্স) —নাম 'পথে পথে'—নির্মলবাবু সমালোচনা করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৮-৯-৫৫ তারিখে। তাঁর শিল্প-রুচিকে আমি খুশি করতে পেরেছিলাম, সে-জন্য আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তিনি যা লিখেছিলেন তার একটি অংশ এই—

"......His range of movement has been small, and he has never ventured to pursue the extraordinary under any circumstances, what is most delightful in his travel-diary is its simplicity and keen sensitiveness to beauty, whether in nature or in man, in which he invites his readers to participate. A refined sense of humour also pervades his accounts......"

—Nirmal Kumar Bose

একটি সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় দিচ্ছি আমাকে লেখা চিঠি থেকে। নির্মলবাবু এ-সময়ে (১৯৫৭) ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র ভিজিটিং প্রোফেসর। তাঁর চিঠিখানি এই—

C/o Indian Press Digest
456 Library Aunex
University of California
Berkley 4, California U.S.A.
13-10-57

পরম প্রীতিভাজনেষু,

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিমানীশের বন্ধু এবং ভূতত্ত্বের ছাত্র শ্রীমান্ শশির সেনের নিকটে সংবাদ পেলাম হিমানীশের মায়ের পরলোক গমন ঘটেছে। আপনার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হচ্ছে যে, ক্ষতি ও বেদনা আপনার যতই হোক তিনি যন্ত্রণার থেকে যে মুক্তি পেয়েছেন তাই আপনার কাছে খানিক সান্ত্বনা বহন করে আনবে।

আপনার নিজের শরীর কেমন আছে জানাবেন। নিজে চিঠি লেখার ইচ্ছা যদি না হয় অন্ততঃ মঞ্জুকে বলবেন আপনার সংবাদ মাঝে মাঝে জানায়।

আমি এখানকার কাজকর্মের মধ্যে এখনও স্থির হয়ে প্রবেশ করিনি। তবে শিকাগো ও নর্থ-ওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে পাঁচ-ছ মাস থাকবো ও বর্তমান ভারত ও গান্ধীজির রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনাও করতে হবে। ক্রমে এদিককার সংবাদ কিছু কিছু দেবো।...... উত্তর না পেলেও জানবো আপনি ভালো আছেন। কালীকিঙ্করবাবু, ভূষণ প্রভৃতিকে সস্নেহ নমস্কার জানাচ্ছি।

ইতি—
নির্মলকুমার বসু

এই প্রসঙ্গে, এই চিঠিতে কালীকিঙ্করের, নামের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে নির্মলবাবুর সম্পর্কের কথাটাও বলে রাখি। এ অধ্যায়ের আরম্ভেই আমি কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার বিষয়ে কিছু বলেছি। কালীকিঙ্করের ছবি ও চরিত্র নির্মলবাবুকে মুগ্ধ করেছিল। কালী ও আমি একাধিকবার নির্মলবাবুর বোসপাড়া লেনের

বাড়িতে গিয়েছি। তারপর ১৯৪০ সনে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত নির্মলবাবুর "লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' পর্যায়ে 'হিন্দুসমাজের গড়ন' নামক একখানা অতি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তকে উড়িষ্যার এক অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে তেল নিষ্কাশনের জন্য যে রকম সব ঘানি ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে ৭খানা ছবি কালীকিঙ্করকে দিয়ে আঁকানো হয়েছিল। একাজে লেখক নির্মলবাবু যেমন তৃপ্ত হয়েছিলেন, বিশ্বভারতীর পক্ষের পুলিনবিহারী সেনও তেমনি তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি করল কালীকিঙ্কর নিজে। কালীকিঙ্করের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আমি অন্যত্র নানা উপলক্ষে এবং বিশেষ করে আমার 'পত্রস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছি। তার স্বভাব হল কাজ করে টাকা নেওয়া বিষয়ে উদাসীনতা। আসল কথা, বিল করে টাকা নিতে সে পারত না। এবং যেখানে বিনাপয়সার কাজ সেখানে তার আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশি। কাজেই বিশ্বভারতী টাকা দিতে চায়, কিন্তু দেবে কাকে? শিল্পীর দেখা নেই। ভার পড়ল শেষে আমার উপর। পুলিনবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, শিল্পী কোথায়? আমি কালীকিঙ্করকে বলি, যাও একবার দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। এভাবে অনেক দিনের চেষ্টাতে দুপক্ষের যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

নির্মলবাবুর মনোজীবনের আরো একটা দিক আছে। এবং তা পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই শেষ নয়। তাঁর ১৯৩০এ লেখা 'নবীন ও প্রাচীন' নামক ছোট্ট একখানি বইতে তিনি সমাজ ধর্ম রাজনীতি প্রভৃতি নানা দিকের মননশীল চিন্তার এক আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তখন সম্ভবত ২৬ বা ২৭ বছরের যুবক। কিন্তু বইখানা পড়লে প্রবীণ কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখা মনে হবে। প্রথম বয়স থেকেই স্বাধীন চিন্তা ছিল তাঁর মজ্জাগত। কোনো মতবাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ থাকলেও সেখানে তিনি প্রতিপক্ষকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'নবীন ও প্রাচীন, ১২ পৃষ্ঠার পকেট বই, চার আনা দামের। কিন্তু এই অল্প পরিসরের মধ্যেও আদর্শ ও অনুভূতি, সত্যাগ্রহ, বাংলার ভাব-কার্পণ্য, সংগ্রাম, সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা, প্রাচীন হিন্দু-সমাজের আদর্শ, কোণার্কের মন্দির, কোণার্ক ও খাজুরাহোর মন্দির, তিলজী বাবার শিক্ষা, ভারত ইতিহাসের এক অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, ও মহাত্মা গান্ধীর সত্য সাধনা,—এই বারোটি ছোট ছোট রচনায় তিনি যে বিশ্লেষণী শক্তি ও মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা খুব সুলভ নয়।

নির্মলবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে, আগেই বলেছি, ১১ই জানুয়ারী ১৯৭১, সোমবার। এর আগে অনেক দিন দেখা ছিল না। গান্ধীজির মৃত্যুর পরে তিনি কর্মক্ষেত্রের কিছু বদল ঘটিয়েছিলেন। ততদিন নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার কাজ তাঁর শেষ হয়ে এসেছে। শেষ দিকে দিল্লীতেই প্রায় থাকতেন। আমিও প্রায় গৃহবন্দী। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল-সফির রীডার ডকটর মিসেস মারগারেট চ্যাটার্জি নির্মলবাবুর বিশেষ পরিচিত। আমারও। নির্মলবাবুর মৃত্যুর (১৫ অকটোবর) ৫ দিন পর ২০ অকটোবরে মার-গারেট এলো আমার কাছে। সে নার্সিং হোমে নির্মলবাবুর রোগশয্যার পাশে উপস্থিত ছিল। বলল শেষে আর কাউকে চিনতে পারতেন না। আগে মৃত্যুর কারণ আমি ভুল শুনেছিলাম সম্ভবত। কাগজেও দেখেছিলাম লিউকীমিয়া। তার অর্থ ব্লাড ক্যানসার। কিন্তু মারগারেট বলল প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ হয় ক্যানসার, শেষে সবদেহে ছড়িয়ে পড়ে। আমাকে মারগারেট কয়েক মাস আগে লিখেছিল, নির্মলবাবু একটা mysterious illnessএ ভুগছেন। তারপর নির্মল-বাবুর কলকাতা আসার খবর জেনে ভেবেছিলাম ভাল আছেন। তাঁকে জোর করে বললাম, অনেক দিন দেখা হয় না, আসুন এবারে। তিনি যে অসুস্থ একথা আমাকে একবারও বললেন না, বললেন, নিশ্চয় যাব কয়েকদিনের মধ্যেই। জিজ্ঞাসা করলাম, সাইকেলখানা কি এখনো ব্যবহার করেন? বললেন, না। তারপর

আমার এখানে আসার পথ-নির্দেশ চাইলেন। অথচ তারপর বছর কেটে যায়, অথচ আসেন না। আমি তাঁর অসুখ-বৃদ্ধির কথা একেবারে জানতাম না। তিনি এ বিষয়ে প্রচার হয়তো পছন্দ করতেন না।

আমি নির্মলবাবুর ক্যালিফোরনিয়া থেকে লেখা চিঠি উদ্ধৃত করেছি। তাতে আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি লিখেছিলেন, "ক্ষতি ও বেদনা আপনার যতই হোক, তিনি যন্ত্রণার থেকে যে মুক্তি পেয়েছেন তাই আপনার কাছে খানিক সান্ত্বনা বহন করে আনবে।"

আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছিল ক্যানসারে। নির্মলবাবু সেই অসুখ দেখেছিলেন, তাই ক্যানসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, রোগীর দিক থেকে যে বড় মুক্তি এ-কথা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সেই ক্যানসার রোগে এতদিন পরে তাঁর নিজেরই মৃত্যু ঘটল, তিনি কি যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলেন, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, ঐটুকুই যা সান্ত্বনা।

আমার এই রচনার চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের (১৯৩২-৩৬ সনের) সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের জীবিত ও মৃত দুটি তালিকা দিয়েছিলাম। তারপর থেকে একে একে মৃতের সংখ্যা এই অধ্যায় লেখা পর্যন্ত, (সেই দুই তালিকা মিলিয়ে যে ৫২ জনের নাম উল্লেখ করেছিলাম) হিসাব মিলিয়ে দেখছি মোট ২৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে, জীবিত মাত্র ২৫ জন। আমার নাম কোনো তালিকাতে নেই। অর্দ্ধমৃত নামক তৃতীয় তালিকা থাকলে সেখানে দেওয়া যেত।

সেই সেদিনের যাঁরা ছিলেন প্রায় এক পরিবারভুক্ত, তাঁদের অনেকেই এখন আর খুব সচল নেই। প্রত্যেকেরই বয়স এখন এমন যে, দেহটা কেমন আছে এখন আর তা জিজ্ঞাসা করা চলে না। এখন চোখ কেমন আছে, বা রক্তের চাপ কেমন, বা হার্টের প্যালপিটেশনটা কমেছে কি না, বা হাতের আঙুল কাঁপে কি না, হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে, নাকের ডগাটা কি এখনো লাল আছে? এই জাতীয় সব অঙ্গগত প্রশ্ন করা চলে, সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন কি? কারও বলবার উপায় নেই, কারণ তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

তবু যদিও সেই ১৯৩২-৩৬কে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, তখনকার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আবার মিলতে ইচ্ছা জাগে খুব প্রবলভাবে। ইচ্ছাপূরণ মাঝে মাঝে হয়েছে, এখনো হয়। গোপাল হালদার গত তিন-চার মাসে তিনবার এসেছেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ডিসেম্বরের ৬ তারিখে ও জানুয়ারির ১৫ (১৯৭৩) তারিখে এসেছেন এবং শেষবারে এসেছেন গোপাল হালদারের সঙ্গে। আমি বন্দী, তাঁরা মুক্ত, তাই এই পুরাতন প্রীতির টান আমার কাছে বড়ই মূল্যবান্ বোধ হয়। এবং এইসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সম্পাদক যোগানন্দ দাস গত কয়েক মাসে তিনবার এসেছেন। তাঁর সঙ্গ আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ। কিন্তু এ-সব কথা ভবিষ্যতে আর কখন বলব? তাই এই প্রসঙ্গে বলে রাখছি। আরও একটি আশ্চর্য সংবাদ এই যে, সুনীতিবাবুর বয়স ৮৩ (১৯৭৩)। তিনি এখনও যুবক। এবং আর এক ৮০ বছরের যুবক যাঁর কথা পূর্ব অধ্যায়ে একটু বেশি বলেছি, তিনি নিখিলচন্দ্র দাস, এখনও মাসে দুবার আসেন। সেদিনের বন্ধুদের মধ্যে এঁরা এখনো সচল।

স্বপ্ন-মঙ্গল

সিদ্ধেশ্বর মাইতি

ধীরা, মীরা, নীরা, হীরা। ওরা চারজন। চার বাড়ীর চারটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে; বেরিয়ে এসে বসে এই বকুল গাছটার তলায়, পড়ন্ত বেলায় গাছের পাতায় পাতায় চৈত্রের হাওয়া যখন করতালি দিয়ে আসে, কলকে কদমের লালচে সাদা ফুলগুলো শিরালো লম্বা পাতাগুলোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র হাওয়াকে বুকে পুরে নিয়ে দোল খায়, বিশাল বকুলের মাথা থেকেও ঝুরঝুর করে নামে তারার মত ছোট ছোট সুগন্ধি ফুলগুলি, তখনি বকুলতলা ওদের সান্ধ্য মজলিসে সরগরম হয়ে উঠে।

ওরা চারজন স্বপ্নকাহিনী শোনাতে আসে, চারজনই শ্রোতা; চারজনই বক্তা, চারজনের জায়গায় পাঁচজন হোক —এটা ওদের মনের কামনা, কিন্তু সেটি আর একজনের অনুপস্থিতিতে সাতদিনের সাতদিনই শূন্য রয়ে যায়, অতএব চারজনই পালা করে বলে যায়, কে কী আগের রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে। এই স্বপ্ন-কাহিনী বলা ও শোনার জন্য ওদের চারজনে মিলে বানাল স্বপ্নমঙ্গল ক্লাব, স্বপ্নই যখন; তার স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে খোলা-মেলা বকুলতলাই তেমন একটা ক্লাবের পক্ষে বেশি মানান-সই স্থান বলে সকলে মেনে নিয়েছে—

শুরুটা হল এইভাবে। ঝরা বকুলফুলে আঁচল ভরাতে ওরা সুনিয়মিত ভাবে ভোরের বেলায় বকুলতলায় ভিড় জমাত। একদিন ধীরাই বললে, ভাই, কাল রাত্রে ভারি একটা মধুর মধুর স্বপ্ন দেখেছি, একটা সুন্দর ছবির মত ঘর, আর তার সামনে একটা বাগান, বাগানে আশ্চর্য সব ফুল ফুটে বাগান আলো করে আছে, আর দেখা হল না, স্বপ্নটা ভেঙে গেল, কিন্তু বাগান আর ঘরটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। মীরা স্বপ্নবার্তা শুনে মনে মনে বলে, এ শহরে একটি মাত্র সুন্দর বাড়ী আছে, যার সামনে আছে সুন্দর সবুজঘাসের লন, ধারে ধারে আছে ছোট ছোট বাগান ঝাউ, আর হিসেব মত বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ডালিয়া, পাম, এরিকা বুগেনভিলিয়া, আর নানা-রঙা মরসুমী ফুলের কেয়ারী, সে বাড়িটা হীরকের, তবে কি ও হীরকের কথা ভাবে? ওর মনের কথা মনের অন্তরালে রয়ে যায়, মুখে বলে ও অন্যকথা।

ও বলে,—আমি ভাই সুন্দর একটা খেলার স্বপ্ন দেখেছি। ক্রিকেটের মাঠে জবর হাতে ব্যাট ধরেছি, কাট, ড্রাইভ করে বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী মেরে ডাবল সেঞ্চুরী করে ফেলেছি, খেলার শেষে ফ্যানেদের আমাকে নিয়ে কী উল্লাস? গলায় মালা দিয়ে কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়ে সে এক হুলুস্থুলু ব্যাপার। মার ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল, আর দেখা হল না।

নীরা ভাবে, দূর, ও গুল মারছে। স্বপ্ন দেখেছে না ছাই, ও আসলে এ টাউনের চোস্ত খেলোয়াড় রজত বোসকে ভালবেসেছে। রজত বোসের ভূত ওর ঘাড়ে চেপেছে। রজতের ত ঘুম হচ্ছে না ওর কথা ভেবে?

কিন্তু ওর স্বপ্ন-কাহিনীটা আর এক রঙের।

ও বলে, আমি ভাই সুন্দর সাজান ঘরে বসে আছি, দামী দামী পেইন্টিং, আসবাব, খেলনা, আর আলমারি ভর্তি কত দামী দামী পোশাক গয়না। আমাকে কারা ফোঁটাচন্দন দিয়ে সাজাচ্ছে, পাশের ঘর থেকে ছোট ভাইটা হঠাৎ কান্না জুড়ে দিল। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল।

হীরা ভাবে, কী স্বপ্নের ছিরি। সুবীরের সঙ্গে তার নিজের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। ও মনে মনে নিশ্চয়ই হিংসে করে তাকে, সেটা দিনের বেলায় ভাবে, রাত্তিরে ও সেটা স্বপ্ন দেখে। আসলে ওটা অবচেতন মনের তলা থেকে জেগে উঠা ঘুমন্ত ইচ্ছাগুলো। কাজেই ও

যেটা বলে, সেটা ওর অপূর্ণ ইচ্ছার বেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু মুখে বলে, দূর, ওসব স্বপ্ন-টপ্ন আমার আসে না, ডুবো জাহাজের মত ঘুমের অতলে তলিয়ে যাই, মাথার উপর ডাইনে, বামে, আগে, পাছে নিথর নীল সমুদ্র, কিচ্ছু নেই, শুধু ঘুম আর ঘুম, একটানা ডুবে থেকে তারপর হুস্ করে ভেসে উঠি, মানে জেগে উঠি।

এবার তিন জনের আক্রমণের মাঝে ওকে পড়তে হয়। ধীরা বলে, তাহলে তুই না স্বপ্ন দেখে ঘুমাস? কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম কোত্থেকে পাস বল? কি রে মীরা, তোর কি মনে হয়, স্বপ্ন না দেখার মত হীরার চেহারাটা যথেষ্ট ঘুমসী?

মীরা তার মুক্তির হাতিয়ারটা বাড়িয়ে দেয়: ওর মত পলকা শরকাঠির মত শরীর নিয়ে কেউ স্বপ্ন দেখবে না এ হতেই পারে না। ও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখে, হয়ত ও বেশী দেখে।

এবার নীরা বলে উঠে, ও কি স্বপ্ন দেখে না রে? এই হীরা তুই সেদিন আমাকে বলিসনি, সুন্দর একটা নদীর তীর, আর ফুলের বাগান। সেই বাগানের পাশে একটা শানবাঁধান ঘাট? একজন নেয়ে না বাইতে বাইতে গান গেয়ে এল? সে গাইল, কে যাবি পারে, ওগো তোরা কে? আর তার মুখটা ঠিক— না ভাই সেটা তোদের বলব না—ওটা top secret।

হীরা রেগে যায়, রাগলে ত তার মুখটা কমলালেবুর মত হয়ে যায়। একে ত নীরা মিথ্যা কথা বলছে, তার উপর আর একটা নাম জড়াতে চাইছে, সেটা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লে, তার জীবনের শুভ সূচনার উপর— নাঃ ভাবা যায় না। অতএব সে কিল বাগিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হয়ত ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত, কিন্তু ক্যাক্টাসের ঝোপের আড়াল থেকে একজন উট্‌কো লোক এসে দেখা দেয়। ওদের সব কথাই ওর কানে গেছে, ওদের সামনে এসে হেসে বলে, আপনাদের মাঝে হঠাৎ এসে পড়ায় আমি দুঃখিত, স্বপ্নের কথাগুলো আমার কানে গেছে, কি জানেন, আমি স্বপ্ন-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছি। স্বপ্ন কেন দেখেন, সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, স্বপ্নের ফল কেন ফলে এবং কোন্ স্বপ্নের কি ফল ফলে, তাই নিয়ে আমার গবেষণা এবং শুনে আশ্চর্য হবেন, আমি এ ব্যাপারে অনেকটা সফল হয়েছি। আমি স্বপ্ন-বার্তা শুনে বলে দিতে পারি সে স্বপ্ন কি ভাবে কখন ফলবে।

চারজন তরুণীর চার জোড়া ডাগর ডাগর চোখ এই প্রায় অপরিচিত আগন্তুকের উপর এসে পড়ে, চোখে চোখে বিরক্তি ভরা বিস্ময়, কিন্তু তার চাইতেও বোধ হয় বেশী করে কৌতূহলটা সেখানে ঝিলিক হেনে যায়, লিলিপুট আকারের শীর্ণ রুগ্ন এই লোকটির মুখাবয়বে যদিও বেশ কয়েকটা বয়সের আঁচড় রেখা পড়েছে, তবুও ওর কণ্ঠস্বরে, চালচলে একটি বালকসুলভ উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে।

—দেখুন, আমাকে আপনারা ঠিক চিনবেন না, আমার নাম শঙ্খ ঘোষ, আমার বাড়ী আসামের কামরূপের ওদিকে, ওখানে এক গুপ্তযোগীর কাছে যে বিদ্যাটা শিখেছি, সেটি হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা। কর-কোষ্ঠী, স্বপ্ন-তত্ত্ব, গ্রহগণনা এগুলো কিছু কিছু শিখেছি। কিন্তু স্বপ্নতত্ত্বটি হচ্ছে আমার favourite subject and the most interesting one—আপনারা কি কি স্বপ্ন দেখলেন এবং তার ফল আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে ফলবে, আশা করি আপনারা নিজেরা আমার সাহায্য ছাড়াই মিলিয়ে নিতে পারবেন। এই যে আমার ঝোলায় রয়েছে, স্বপ্নমঙ্গল বই কয়েকখানা, এ হল সত্যিকারের dream interpreter অথবা guide to your dream। ওতে আমার হেড অফিসের ঠিকানা রয়েছে, আপনাদের শহরে এসেছি একটা ব্রাঞ্চ খুলতে। দেখুন ঘটনার কি আশ্চর্য যোগাযোগ, যখন ওই কথাটি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম, তখনই আপনাদের কথাগুলো কানে এল।—শঙ্খ ঘোষ হাসিমুখে দন্ত-রুচিশোভা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাস্তবিক আর 'না' বলতে পারে না ওরা। কিনেই ফেলে এক-একখানা স্বপ্ন-মঙ্গল। দেখা যাক, এই অদ্ভুত

বালক-বালক চেহারার লোকটার সবটা বুজরুকী কি না, দায়টা নতুন লাগছে। গলায় যেন শাঁখের ডাক শোনা যায়, আর এই শহরেই যখন ডেরা বাঁধছে, তখন ওকে বাজিয়ে নিতে পারবে যখন খুশি।

শঙ্খ ঘোষ লোকটা বোধ হয় অন্তর্যামী। বলে ফেলে। ভাববেন না এটা আমার বুজরুকী, আর এই শহরেই ত আছি, বাজিয়ে নেবেন যখন খুশি।

ওদের মনের কথাগুলো এই ভাবে আকস্মাৎ বলে ফেলে লোকটা কিন্তু আর দাঁড়ায় না, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে হাওয়া হয়ে যায়।

একটুখানি সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সেটা বিশ্বাসে দানা বেঁধে ওঠে, তখন মনের খোসা ভেঙ্গে ইচ্ছার অঙ্কুর গজায়। আর সেই অঙ্কুর থেকে গাছ। ওদের স্বপ্ন-মঙ্গল ক্লাবটা এমনি করে জন্ম নেয় সেই বকুলতলায়।

ওরা ঠিক করে, একজনের স্বপ্ন আর একজনকে বলবে। বই মিলিয়ে তার ফলটা কি হতে পারে তাই বলবে, এবং সত্যি সত্যি তাই ফলে কি না, তা র জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবে।

অতএব বকুলতলা ওদের কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে, গোধুলির আলোয়, একই দৃশ্যলীলায় কিন্তু বিচিত্র কাহিনীতে ভরে উঠে। যথা-সময়ে বকুলফুলগুলো ফুটে টুপটাপ ঝরতে শুরু করে। মিষ্টি লাল ফলগুলো পাখীদের চঞ্চু-ক্ষত হয়ে ওদের পায়ের কাছে পড়ে, পাতা ঝরে, আবার নতুন পাতা হয়। তবুও ওদের স্বপ্ন দেখার শেষ হয় না। আর কাহিনী শোনারও ছেদ পড়ে না। আর ফল ?—সেটা ফলেছে কি না টের পায় না। তবে ফলবার রঙীন আশার নেশার সব সময়ই ফলের মত নরম মনগুলো যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ওদের ঘরের ভাবনা বলে তেমন কিছু ছিল না কি ? ভাবেন যাঁরা, তাঁরা অভিভাবক। তাঁদের বাড়ী গাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্যবসার থেকে ওদের হেসেখেলে বেড়াবার চাহিদা আপনার থেকেই মিটে যাচ্ছে, কাজেই বাকী দুটো কাজ, হাত দেখান, প্রশ্নগণনা, যা মানুষ দুঃখকষ্ট, পরীক্ষায় ফেল, মামলায় হারা, স্বাস্থ্যজনিত ফাঁড়া ইত্যাদির জন্য জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়, তা ওদের কোনদিন বড় একটা জরুরী ব্যাপার হয়ে দেখা দেয় না।

অতএব শঙ্খ ঘোষ ওদের অজ্ঞানতে শহরের এক কোনায় তার জ্যোতিষী কার্যালয় অফিসের ব্রাঞ্চ খুলে বসে। টিনের শেড, খুঁটির বেড়া দেওয়া জ্যোতিষী কার্যালয়টি ধীরে ধীরে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। অবশ্য এই অস্থায়ী ব্যবস্থাটিও একসময় উঠে যায়। তার জায়গায় একটি ছোট্ট পাকাগাঁথুনি ইটের ঘর দাঁড়িয়ে যায়, বাকী থাকে শুধু দরজা-জানলার ফাঁকগুলো। ওইটুকুর অভাবে বাড়ীটা যেন খাঁ-খাঁ করতে থাকে।

শঙ্খ ঘোষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করে আর ভাবে, বাড়ীটার যেন খিদে মিটছে না, সে ভুঁখা হুঁ বলে একটা আওয়াজ তুলে চলেছে। ঠিক হ্যায়, দাঁড়াও তারও ব্যবস্থা করছি তোমার।...

ধীরা, মীরা, নীরা, হীরা ওরা চারজন শুধু খারাপ-খারাপ স্বপ্ন দেখেছে কাল রাতে। স্বপ্নমঙ্গলখানা মিলিয়ে দেখে ওরা বেশ একটু ভাবনায় মুষড়ে পড়ে, একটা আসন্ন ক্ষতির ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বপ্ন-ফলটি।

সেই ক্ষতির কথাটা বলবে বলে ওরা ঠিক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়, আর হঠাৎই ওদের বুকের ভিতরটা মোচড় খায়। হায় হায়, ওদের এতদিনের আশ্রয়দাতা স্বপ্নবকুলটি কে কেটে ফেলেছে। ভূ-শায়ী সৈনিকের মত তার শেষ নালিশটুকুও জানিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না গাছটা।

সশস্ত্র মানুষগুলো তার শাখা-প্রশাখা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে। তার দেহটাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আর একদল জল্লাদের হাতে তুলে দেবে এখুনি। তারা হল করাতি। লম্বা দাঁতাল করাত দিয়ে ফাল ফাল করে তক্তা বানাবে। মারণ-যজ্ঞের এই মহা-আয়োজনের শেষটুকু ওরা ফ্যালফ্যাল করে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে।

বিলুণ্ঠিত ডালপালার আড়াল থেকে শঙ্খ ঘোষ হঠাৎই বেরিয়ে আসে। তার দেঁতো হাসির বাহারটুকু

আজও বিস্তৃত করে বলে, এই যে, আপনারা আজও এখানে আসেন নাকি? আমার স্বপ্নমঙ্গলটার পাতাগুলোর উপর নিশ্চয়ই ধুলো জমতে দেন নি। পড়ে একটু দেখবেন, তার একটি কথাও মিথ্যা লেখা নেই। আর সুসংবাদ আপনাদের জানাই। রেললাইনের ধারে স্টেশন রোডের ডানদিকে শিরীষ গাছের তলায় আমার অফিসঘর তৈরী হয়েছে। শুধু জানলা দরজা বাকী। এই বকুল গাছটা নীলামে কিনে নিলাম। অনেকদিনের পুরণো গাছ। এর থেকে কাইন্ পাল্লার কাঠ বেরোবে, কি বলেন? যাবেন কিন্তু একদিন আমার অফিসে।

চারজোড়া চোখের ভর্ৎসনা শঙ্খ ঘোষের উপর তীরের ফলার মত এসে পড়ে। নির্লজ্জ দেঁতো হাসির ঢাল উঁচিয়ে শঙ্খ ঘোষ আত্মরক্ষা করে। ওরা শোধ নেয়। একটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে স্বপ্নমঙ্গলের বহুৎসব ঘটে। তার সাক্ষী থাকে এক মহাবৃক্ষ। কিন্তু সে বকুল নয়—বট।

নদীর তীরে তীরে অনেকদূর অবাধ তার শিকড় আর ঝুরি নামিয়ে মৃত্তিকাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। চারিটি আশাহত তরুণীকে জানায় চিরন্তন আশ্বাসের অক্ষয়বাণী।

বাসা বদল

মানসী বসু

অমরেশ ক'দিন ধরেই ভাবছে সরমাকে কথাটা বলা দরকার, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ এসে ওর গলা চেপে ধরে। সরমার দুর্বলতার দিকটা ও জানে, সেই জন্যই ওর সঙ্কোচ হয়। ও জানে সরমার মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা—স্বামী ও সন্তানদের জন্য সরমা সদা সতর্ক—অমরেশ যে টাকা সংসারে খরচ করবার জন্য সরমার হাতে দেয় তাতেই সুশৃঙ্খলভাবে সরমা সংসার চালায়, কখনো নিজের শাড়ী গহনার জন্য ব্যস্ত হয় না কিংবা অমরেশের টাকার সঠিক অঙ্ক নিয়েও মাথা ঘামায় না—তবে? সরমার একমাত্র শখ—অভিজাত পাড়ায় থাকবে। অমরেশ ভাল কাজ করে—তখন মাত্র একটি সন্তান—সরমার ইচ্ছামত প্রচুর ভাড়া দিয়ে, অভিজাত পাড়াতেই বাড়ী নিয়েছে।—অবশ্য সারাদিন খাটুনির পর ছিমছাম, সাজানো গোছানো একটি বাড়ীতে ঢুকে শান্ত পরিবেশ ভালই লাগে! এত বেশী ভাড়া তখন গায়ে লাগে না আর সরমাও খুশী থাকে। কিন্তু এখন? ক'দিন ধরেই বলি বলি করে ও কথাটা বলতে পারছে না আর বলতে পারছে না বলেই এখন মনের হাওয়াটা উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। ক'দিন ধরে অমরেশের ফিরতে একটু রাত হচ্ছিল, এর জন্য সরমার যে উদ্বেগ, তাকে ও হাল্কা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ বলা দরকার।

অমরেশ বাড়ীর দরজার কলিং বেল'টা টিপল, সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে মনে করল এটাও সরমার জন্য করতে হয়েছে—অভিজাত পাড়ায় নাকি কড়ানাড়া চলে না, নীচু রুচির ব্যাপার। অপ্রসন্ন মনে ও কাপড় ছেড়ে বারান্দায় ঈজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল, সরমা রান্নাঘরে ছিল, ওর আসার খবর পেয়ে এসে বললে—আজও

ত রাত হয়ে গেল, তুমি মুখ হাত ধোও, আমি চা আনছি। হঠাৎ অমরেশের খুব রাগ হ'ল—ওর মনে হতে লাগল এতসব বিপত্তির জন্য সরমাই দায়ী।—দ্বিগুণ ভাড়ায় এখানে বাড়ী নেওয়াতে এতকাল ধরে কত টাকা জলে গেল—এ কেবলমাত্র সরমার উৎকট শখের জন্য।—এই মুহূর্ত্তে অমরেশ ভুলে গেল, আগে এটাও তার ইচ্ছা ছিল—আর সরমা রান্না ইত্যাদি নিজেই করে, বাড়তি লোকের জন্য খরচ করে না।

চায়ের পাত্রটা হাতে নিয়ে অপ্রসন্ন মুখে অমরেশ বললে দিন পনের আগে বাবার একটা চিঠি পেয়েছি, আর ৫।৬ দিন হ'ল মাও একটা চিঠি দিয়েছেন।

সরমা উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠল—কই, বলনি তো? সকলে ভাল আছেন ওঁরা?

হাঁ, তবে বাবা এবার রিটায়ার করেছেন জানিয়েছেন—মাও লিখেছেন সুচির ছেলেরা উঁচু ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে—সুচি এবার এম-এ দিচ্ছে।

সুচিত্রা ওদের একমাত্র বোন, ২।৩টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিধবা হবার পর বাপ-মায়ের কাছেই আছে। অমরেশ একটু দম নিল। সরমা আন্তরিকতার সঙ্গে বলে উঠল—কতদিন ওদের দেখি না। ছুটিতে চল না?

অমরেশের খুব রাগ হতে লাগল—সরমা পরিস্থিতি বুঝেও বুঝতে চায় না। এবার সে বলে উঠল—বাবা আমাকে অন্ততঃ একশ টাকা পাঠাতে বলেছেন—রিটায়ার করলেও ওঁর খরচ থেকে যাচ্ছে। লিখেছেন সম্ভব হলে আরও কিছু বেশী দিতে।

সরমা আগ্রহভরে বললে—খুব উচিত এখন ছেলেদের ওঁকে দেওয়া—এতদিন ত উনি একলাই সব চালিয়েছেন? – তুমি বাবাকে এখনই টাকা পাঠিয়ে দাও আর, প্রতিমাসে মাইনে পেলে আগে ওঁকে টাকা পাঠিও।

এবার অমরেশ নির্লিপ্ত সুরে জানাল—এত বাড়ী-ভাড়া দিয়ে টাকা পাঠান অসম্ভব, তাই এই বাড়ী ছাড়ার নোটিস দিতে হয়েছে।

সরমা পাথর হয়ে গেল—এ বাড়ী ছাড়া হবে? আজ কতকাল ও এই বাড়ীতে কাটিয়েছে। একটু একটু করে টাকা জমিয়ে এইভাবে বাড়ী সাজিয়ে তুলেছে।—বাড়ী-ওলার সঙ্গেও হৃদ্যতা হয়েছে।

সরমার নিস্তব্ধতা দেখে অমরেশ একটু বিদ্রূপের সুরে বললে—যদি বাড়ী ছাড়তে না চাও, তবে বাবাকে লিখে দিই টাকা পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কানু যতটা পারে দিক, কারণ—এতগুলো ইনসিওরেন্স সামলে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে টাকা জুগিয়ে, কম্পালসারী সেভিংস্‌এর টাকা কাটার পর এই বাড়ী ভাড়া।

বাধা দিয়ে বলে উঠল সরমা— ছিঃ ছিঃ, বাবাকে টাকা পাঠাতে পারবে না লিখবে কী করে? আর এই যে ফর্দ্দ দিলে, এ ত সবই নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু বাড়ী ত সুবিধামত একটা দেখতে হয়।

এবার অমরেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল—না রমা, সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের অফিসের মোতিবাবু ঠিক করে দিয়েছেন।

বাড়ীও ঠিক হয়ে গেছে?—কোথায়, কী রকম বাড়ী—শুনতে পাই না?

শহরতলিতে—অমরেশ ঢোক গিলে বলে, নয়ত কম ভাড়ায় পাওয়া যায় না।

কোন্ জায়গা—কত ভাড়া? কিন্তু না জায়গা, না ভাড়া কোনটাই সরমাকে সান্ত্বনা দেয় না। জায়গার তুলনায় ভাড়া বেশী—আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাবার কী ব্যবস্থা? সরমা নীরসভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে।

অমরেশ এখন বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে, না—না সে-সবের কিছু চিন্তা নেই—ওরা আমার সঙ্গে বেরুবে, আর চাপরাশী ওদের বাসে ফেরবার সময় তুলে দেবে। সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি, বাস স্ট্যাণ্ড কাছে আছে। এখানের বাড়ী-ওলার সঙ্গে কথা হয়েছে, ওর আত্মীয় আসছে— ও খুশীই।

অন্যমনস্ক সরমা, কিছু শুনতে পায় না, বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ে ভাবে, বিয়ের আগে ও যে বেসরকারী কলেজে পড়াত, সে কাজটা যদি না অমরেশের আগ্রহে ছাড়ত, তবে এ বিপত্তি আজ হত না।

॥ ২ ॥

সরমা বাস্তববাদী, তাই নতুন জায়গায় গিয়ে যাতে অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা সঙ্গে রাখে।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকে ও নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। কঠিন সুরে ও অমরেশকে বলে—এই বাড়ী তুমি নিজে দেখে ঠিক করেছ?

মোহিতবাবু, যিনি বাড়ীওলার বন্ধু, বাড়ি হিসাবে বেশী ভাড়া পাইয়ে দিচ্ছেন তিনি উৎসাহভরে বাড়ির সুখ্যাতি শুরু করেন, আর অমরেশ বিরক্ত হয়ে বলে—আহা, গুছিয়ে বসে যদি অসুবিধা হয় তখন না হয়—

সরমা গ্রাহ্য করে না, রোজ রোজ বাসা বদল করা যায় না এই জিনিসপত্র নিয়ে' এই যদি তোমার পছন্দের বাড়ী হয় ত তাই বহাল থাকবে।

অমরেশ এতটুকু হয়ে যায়, সত্যই সে নিজে বিশেষ দেখেনি—ঐ মোহিতবাবুর উপরেই সব ভার দিয়েছিল।

কিন্তু দিন গড়িয়ে চলে। সরমা এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সন্তানদের সুখ-সুবিধার উপর দৃষ্টি রাখে, কারণ পরিবেশ একেবারে ভাল নয়। অমরেশ সংসারের কোন দায়-দায়িত্ব নেয়নি—শুধু টাকাটা সরমার হাতে দিয়ে তার ব্যবস্থা মতই চলেছে। কিন্তু সেই অমরেশই, এক সন্ধ্যায় ফিরে, সরমাকে বললে—দেখ, মোহিতবাবুর কথা শুনে এখানে এসে বড় অন্যায় হয়েছে, এ পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলো অসভ্য, গিন্নীরা ঘোরে বেড়ায় আর পুরুষগুলো সংসারের কাজ দেখে।

সরমা মুখ টিপে হেসে বললে—ভালই তো, রোমে এসে রোমানদের মতই ব্যবহার করতে হয়। তুমি আগামী কাল থেকেই এখানকার লোকের মত ঘরের কাজকর্ম দেখ আর আমি বরং—

বাধা দিয়ে অমরেশ হেসে উঠে বললে—দোহাই তোমার, বাচ্চাগুলোকে একটু দেখো—কী করে এখানে তুমি এতমাস কাটালে, তাই ভাবছি।

কেন, কানে তুলো গুঁজে—তা নইলে ঐ আনকালচার্‌ড্ মালিকানীর সঙ্গে একদিনও থাকতে পারতাম না। যেমনি ক্যাটকেটে কথা—আর তেমনি আমার রুচি ও ভব্যতার উপর কটাক্ষ। যাই হোক, তুমি ভেবো না বাচ্চাদের আমি বাইরে ঘুরে বেড়াতে দিই না, আর জান, সেটাও আমার নাকি দম্ভ। সরমা হেসে ওঠে—কিন্তু অমরেশকে চিন্তিত দেখায়।

এর মধ্যে অমরেশের ভাই কানু ইণ্টারভিউ দিতে কলকাতায় এল।

এই দেওরের সঙ্গে সরমার বরাবরই খুব হৃদ্যতা—সে অমরেশের মত উদাসীন নয়, যে চাকরি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। সরমা অমরেশকে এই নিয়ে অনুযোগ করলে কানু বরাবর হেসে বলেছে—জান বৌদি, দাদা মায়ের আদরের প্রথম ছেলে, ওকে মা কোন কিছু করতে দিতেন না। দরকার মত 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' এই কানু। —বাবা যখন কিছু ফরমাস করতেন, মা বাবাকে বলতেন, আহা ওকে কেন বলছ, কানু তো রয়েছে। অথচ ভাব, দাদার চেয়ে আমি ৫ বছরেরও বেশী ছোট।

অমরেশ বরাবরই প্রথম কি স্কুলে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেইজন্য অল্প বয়সেই সে অফিসার হয়েছে—কিন্তু কানুও যে পড়াশুনায় একটি উজ্জ্বল রত্ন, তাও সরমা জানে।

ক'দিন ওর খুব আনন্দে কাটল। কানুর সঙ্গে সিনেমা দেখল, সকলে মিলে এধার ওধার খুব বেড়াল। কানাই চা বানাল, বাজারে গেল, বাচ্চাদের নিয়ে ইনডোর, আউট-ডোর গেম্‌স্ করল। কানাই চলে যেতে সরমা আবার খুব একা বোধ করতে লাগল। কলকাতায় থাকতে তবু একটা 'লাইফ' ছিল, কিন্তু এখানে এদের পরিবেশে সে নিঃসঙ্গ। প্রথম প্রথম আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সব কথায় ঠেস দিয়ে কথা বলা সে সহ্য করতে পারেনি।

সেদিন বাচ্চাদের ছুটি ছিল স্কুলের। সরমা একটু অসুস্থ বোধ করছিল বলে দুপুরে বাচ্চাদের ঘরে বসে খেলতে বলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সরমা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শুয়েছিল। পাশের ঘরে সোরগোল কানে আসতে উঠি উঠি করেও একটু দেরি হয়ে গেল—হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠ শুনে ও তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকে পরিস্থিতি

দেখে ফেলে ফেলত, যদি না বাড়ীওলার স্ত্রীর বিচিত্র মুখভঙ্গি দেখতে হ'ত। বড় ছেলে ও মেয়ে ক্যারম বোর্ডএ টকাটক করে খেলে চলেছে—কোনদিকে ওদের চোখ কান নেই।—সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পাঁচ-বছরের, তিনি কয়েকটা ইঁটের টুকরো এনে, কয়লা ভাঙ্গা হাতুড়ি দিয়ে শ্রম সহকারে ইঁটগুলি ভাঙ্গছেন সামনে যে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সেখানে ও খোয়া ভাঙ্গতে দেখেছে আর বাচ্চা নেপালী চাকরটা হামানদিস্তায় ঠকাঠক করে মশলা পিষছে আর মাঝে মাঝে নিজের দেশের সুর ভাঁজছে।

বাড়ী-ওলার স্ত্রী খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে কোমরে দুহাত দিয়ে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—বলি ব্যাপারটা কি? এটা কি হাট নাকি আর আমার বাড়ীটা কি মাঠ, যে হাতুড়ি পেটা হচ্ছে?

সরমা মহিলার অনেক ব্যঙ্গোক্তি শুনেছে আড়ালে আবডালে কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। ও জানে মহিলা ওর সমপর্যায়ের নয়, এটা ঐ মহিলাও জানত বলে 'কমপ্লেক্সে' ভুগত।

ব্যাপার তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। ছুটির দিনে ওরা খেলা করছে, আপনি দরজা খোলা পেয়ে, না বলে ঢুকে এসেছেন কেন?

বাঃ, বাঃ, আমার বাড়ীতে আমি ঢুকব—তাও আমার অনুমতি নিতে হবে?

না, যখন ভাড়া দিয়েছেন, তখন যতক্ষণ ভাড়া নিচ্ছেন এ বাড়ী আমার, এই তলাটা।

বাড়ীওলা গৃহিণী প্রায় নেচেই উঠলেন—কিন্তু সরমা কঠিন ভাবে বললে, যান, বেরিয়ে যান, সীন্ করবেন না, নিজের ঘরে থেকে স্বভাব ও অভ্যাস মত বাক্যছটা ছড়াতে থাকুন।

ভদ্রমহিলারও এর পর তাই করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল ঘর ফাঁকা, অপরাধীদের কোন পাত্তাই নেই। হেসে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

তিনমাসের বাড়ীভাড়া। অমরেশ অগ্রিম দিয়েছে মোটে তো দেড়মাস হয়েছে, এখন কী করে বলা যায় এ বাড়ীতে থাকা আর সম্ভবপর হচ্ছে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অমরেশকে বিরক্ত করতেও সরমা লজ্জা পায়। ছেলেদের তো দিন পনেরো পরেই ছুটি হবে—তখন ও ওদের নিয়ে শ্বশুরের কাছে চলে যেতে পারে কিন্তু—অমরেশকে একা রেখে যাওয়া কী করে সম্ভব হবে? শাশুড়ীও অনুমোদন করবেন না। সরমার মনটা দুঃখে অভিভূত হয়ে ওঠে।

অন্য দিনের চেয়ে অমরেশ আজ সকাল সকালই ফেরে—কনিষ্ঠ পুত্র একটা ট্রাইসাইকেল চালিয়ে বেড়াচ্ছিল, অমরেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, দাদা দিদি কোথায় রে—বাচ্চুয়া? বাচ্চুয়া পিতার পোশাকের উপর পাছে জুতার ধূলা লাগে—সেই সাবধানতা নিতে নিতে বলে, ওরা সারা দুপুর খেলেছে—এখন মা বই নিয়ে বসতে বলেছে।

আর সারা দুপুর তুমি কী করেছ বাচ্চুয়া?

আমি! বাচ্চু চোখ বড় বড় করে বলে—জান বাবা আমি কত ইঁট ভেঙ্গেছি বাড়ী তৈরী করব বলে। আর জান বাবা, ওপরের মাসীমার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়েছে।

তাই নাকি? আচ্ছা বাচ্চু তুমি মাকে খবর দাও আমি এসেছি, আমি কাপড় ছাড়ি।

বাচ্চু ছুটে রান্নাঘরে চলে গেল।

সরমা ভেবেছিল, তার স্বামী ফিরলে সে আজ আর চুপ করে থাকবে না।

কিন্তু আজ অমরেশের সকাল সকাল ফেরায় সে অশান্তি না করতে মনস্থ করল। প্রতিদিনের মতই হাসিমুখে এগিয়ে এল,—এর মধ্যে কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়েছ — চা আনতে বলি?

উঁহুঃ—কী খাবার আছে বল—সুখবর দেব।

চিঁড়ে ভাজা আছে। কী সুখবর বল?

অমরেশ চিঁড়ে ভাজা পছন্দ করে না—উত্তর দিলে, চিঁড়ে ভাজায় সুখবর বলা যায়?

সরমা সব ভুলে খিল খিল করে হেসে উঠল—আচ্ছা, চিঁড়ে ভাজা মোগলাই পরোটা হয়ে যাবে, যদি খবর 'সু' হয়।

অমরেশ প্রসন্ন মুখে বললে—আজ বাবার চিঠি পেলাম—কাসুর কাজটা হয়েছে। ও এখন বাংলা সরকারের একজন কেমরা চোমরা লোক হ'ল।

ওহো, কী মজা, কী মজা।

ব্যস্ত হয়ো না, আরও আছে, ও খুব বড় কোয়াটার্স পাচ্ছে—উপস্থিত সামনের মাসে সেখানে আমরাও যাচ্ছি।

সত্যি? সরমা খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

আরও শোন তো, বাবা আমাকে টাকা পাঠাতে বারণ করেছেন, কারণ উনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের কাজ পেয়েছেন, এবং আমাকে যাচ্ছেতাই তিরস্কার করেছেন—লক্ষ্মী বউমাকে কষ্ট দেবার জন্য।

সরমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে—বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন।

আরে সবটা শোনতো—অমরেশ খাবারটা মুখে পুরে দিয়ে বলে—কোনকালে সস্তায় বাবা সাউথ ক্যালকাটায় এক টুকরো জমি কিনে রেখেছেন, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকায় সেখানে একটা বাড়ী তুলতে চান সেটা তোমার পছন্দমত হবে, কারণ—আমি বা কারু ঠিক তাঁর মনের মত করতে পারব না। আমাদের দুজনের নাকি রুচি নেই।

সরমা স্তব্ধ হয়ে ভাবে—এত একগুলো সুখবর পাওয়া গেল কী করে, এ কি সম্ভব?

অমরেশ হেসে বলে আরও একটা আনন্দের খবর দেব, কিন্তু আমাকে এককাপ কফি তার বদলে দিতে হবে।

সরমা বিস্মিতভাবে বলে, আরও সংবাদ আছে নাকি?

হঁ, তুমি ত আমাকে অকেজো লোক বলেই ভাব? তবে শোন, অফিস থেকে 'লোন' নিয়ে মোটর কিনছি—তোমার বহুদিনের ইচ্ছা ওটা।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অমরেশ বলে—আগামী কাল অফিসে 'অফ' নিয়েছি, এসে পর্যন্ত ত বেশী বেরুতে পাওনি—বাচ্চাদেরও ছুটি আছে। খাবার-দাবার নিয়ে আগামীকাল সকালেই সকলে আউটিং-এ বেরুব।

সরমা সুখ-দুঃখ নিয়ন্তা শ্রীভগবানের উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার করে।

কহিল দুর্ব্বাসা
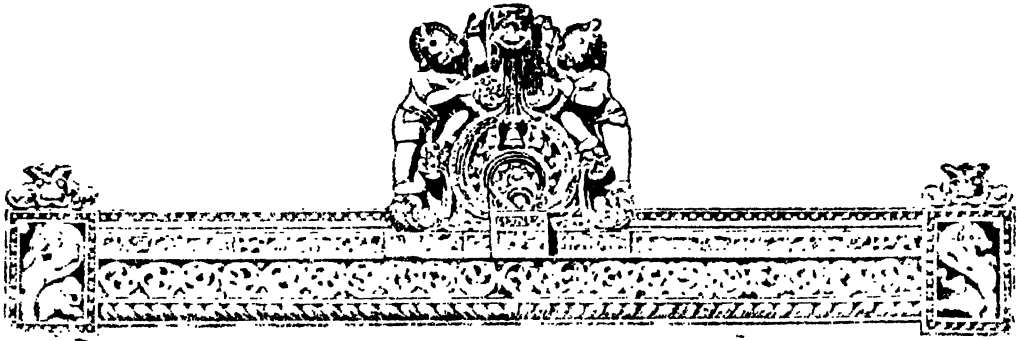
সুশীতল দত্ত

বাজারে আগুন, জঠরে জ্বালা নিয়ে ভুগছি এই জীবন-যন্ত্রণা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নিগূঢ় চাপে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে—পরিধেয় বস্ত্র হয়েছে দুর্মূল্য। জীবন-যাত্রা পদে পদে বিড়ম্বিত—অশান্ত সমাজ—অস্থির মানুষের মন, অশান্ত যৌবন কর্ম্মক্ষম তবু কর্ম্মহীন। জীবনের বাকীপথ অন্ধকারের আবরণে ঢাকা। ভেঙেছে দেশ, ভেঙেছে সমাজ—ভাঙছে পরিবার—পরিবর্তনের জোয়ারের টানে ভেসে গেছে সব,—প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা, দয়া করুণা, মায়া-মমতা, শালীনতা-বোধ। আরে ছাই এ ত তুচ্ছ, আমরা ভুলে গেছি মনুষ্যত্ব বোধ পর্যন্ত। তার বদলে জায়গা নিয়েছে হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, হত্যার নেশায় উন্মত্ত যেন একেকটি ছিন্নমস্তা। শত্রুর রক্ত খেয়েও নয়কো শান্ত, শেষে নিজ মস্তক কেটে করছেন নিজরক্ত পান—তবু কি দেবী হয়েছিলেন তৃপ্ত—শান্ত? আমাদের এই খুনী যৌবন হবে কি শান্ত? অন্ধকারের কালো অন্ধকারে উদ্দেশ্যহীন রক্ত পানের আনন্দে অট্টহাস্যরোলের মধ্যে আমরা কি ছিঁড়ে ফেলব আমাদের ঐতিহ্যের কৃষ্টির সোনাল'বন্ধনসূত্রকে? এই করেই কি প্রতিষ্ঠা করব সমাজতন্ত্র গড়ে তুলব শান্ত সুস্থির সমাজ জীবন?

এ অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণগুলি খুঁজে দেখার জরুরী প্রয়োজন। দেশের চিন্তাশীল পুরুষদের, সমাজ নেতাদের, শিক্ষকদের ভাববার কথা। কারণ নির্ণয় করে তবে তার সুষ্ঠু প্রতিকারের আশুব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। নয়তো চরম বিশৃঙ্খলতার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার অতল গর্ভে নিমজ্জিত হবে সমাজ। তখন তাকে সামলাবার পথ পাবেন না কেউ। সেই ভয়ঙ্কর দিন আসার আগেই আমরা যেন সাবধান হতে পারি, সতর্ক হতে পারি. পারি যেন আমাদের ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে, পারি যেন সুস্থ সবল সমাজ পত্তন করতে——যেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে—যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অটুট থাকবে, মানুষ পাবে অবাধ মুক্তির স্বাদ। মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমাজ—জনকল্যাণব্রতী প্রশাসন। কারণ অশান্ত মানুষের সমাজ হতে পারে না—হতে পারে না আধুনিক কল্যাণব্রতী, হয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের গুটি, হারিয়ে ফেলে গতিশীলতা। অথচ গতিশীলতাই জীবন। সমাজ বদলায়—বদলায় মানুষের মন, কিন্তু ধ্যান-ধারণার মৃত্যু হয় না। ধ্যান-ধারণা সঞ্চিত হয়ে থাকে বিশ্বজনীন সচেতনতার মধ্যে, মূল্যবোধ বদলে যায় ধারণা অনুসারে।

গতিশীল জীবনে সমস্যা থাকবেই, স্বচ্ছ সুস্থির জীবন বোধের আস্বাদন পেতে হলে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে—করতে হবে তার সুষ্ঠু সমাধান। এর জন্য হতে হবে নির্মল চিন্তার অধিকারী। ঐ সমস্যাগুলি যদি আমরা অবহেলা করি, হালকাভাবে যদি তার সমাধানে অগ্রসর হই তবে একদিন ঐ সমস্যাগুলি একত্রে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করবে—জাতীয় দুর্য্যোগের সৃষ্টি করবে—এমনি এক ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের সামনাসামনি

আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই দুর্যোগ যদি আমরা না কাটাতে পারি—না যদি পারি সমাজকে জাতিকে সফল উদ্ধারণের পথ নির্দেশ করতে তাহলে অন্ধকার বিভীষিকার পঙ্কে আমরা ডুবব সবাই—প্রশাসন, সমাজ-সংসার নেতারাও যাঁরা আজ আমাদের এই জাহান্নমের পথে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা কষ্ট পাচ্ছি—খাদ্যে, পরিধেয় বস্ত্রে, ঔষধে, পরিবহনে, বিজলীর অভাবে, আইন-শৃঙ্খলায় কৈবল্য-প্রাপ্তিতে। একটা চরম মানসিক যন্ত্রণায় আমরা ভুগছি সবাই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভারে—একটা ভীষণ অরাজকতার মধ্যে আমরা আবর্তিত হচ্ছি বুদ্ধিভ্রষ্ট প্রবীণের দল, ঘরে বাইরে জটলা পাকাচ্ছে কর্মহীন যৌবন—আশাশূন্য আস্থাহীন জীবন। জীবনের বাকী পথ অন্ধকার। দুর্নীতির পঙ্কজালে আবদ্ধ নীতিহীন দুর্বল প্রশাসন। আর এই সুযোগে মুনাফা লুটছে, সমাজের রক্তশোষণ করছে গৃধিনীদল। মানুষের ধৈর্য্য ভাঙছে; তারুণ্য হয়েছে অস্থির-তরুণ-তরুণীরা হয়ে পড়েছে উচ্ছৃঙ্খল—কথায় বিচারে-আচারে—আমরা বড়রা হয়েছি মতিচ্ছন্ন, নীতিজ্ঞানহীন—যার ফলে নষ্ট হয়েছে সমাজের নৈতিক-চরিত্র।

কেন এমন হয়েছে—এ-বিচার নিরর্থক নয়—রোগের কারণ বিশ্লেষণ করলে নিরাময়ের ঔষধও নিরূপিত হবে—রাস্তাও বের হবে। সুতরাং—এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে বাঁচাবার পথ করে নিতে হবে—দিতে হবে সঠিক পথের সন্ধান। এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সকল মানুষকে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ কাজের ব্রত গ্রহণ করতে হবে। জানি ভাল কথা শোনার যুগ এটা নয়, নীতি-ন্যায় ও সত্যের আবেদনও মানুষের কাছে আজ ক্ষীণতর হয়ে এসেছে—একটা অকল্যাণ গ্রাস করেছে সমগ্র সমাজমনকে। তবু আমরা বলছি যদি কেউ শুনে এই আশায়। আমরা সমস্যা-গুলির প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়ার কথা বলবার চেষ্টা করছি।

খাদ্যে আমরা স্বয়ম্ভর নই অথচ দেশটা কৃষি-প্রধান। কৃষিক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট টাকা খরচ করেছি, নূতন ধানের বীজ এনেছি বিদেশ থেকে যাদের ফলন নিয়মিত জল পেলে বিঘায় ৩০ মণ—৪০ মণ—৬০ মণ পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। বৎসরে দু'বার করে ফলন ফলে। উন্নত সেচের ব্যবসা করতে পারলেই ভাল ফসল পাওয়া যায়। খরা ও বন্যায় ক্ষতি হয় বৎসর-বৎসর। ভগবানের করুণার দিকে চেয়ে থাকি আমরা—"আল্লা জল দে, পানি দে" বলে ডাকি। ভগবানে বিশ্বাস থাকা ভালো—কিন্তু নিজের শক্তি ভুলে নয়। আমাদের মনে হয় উন্নত সেচের ব্যবস্থা ও নদী শাসন বোর্ড গঠন করে দেশের নদীর জলের সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সদিচ্ছা থাকলে মনে হয় এ কাজটা অসাধ্য ও অসম্ভব নয়। খরা ও বন্যায় নষ্ট হয়—সরকার খাদ্যদ্রব্য আমদানী করেন বিদেশ থেকে। কিন্তু বিদেশী মুদ্রার অভাব। ভারতের অর্থ-মন্ত্রী সেদিন ঘোষণা করেছেন—কৃষকেরা যদি উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সরকারকে না দেন তবে সরকার বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে বাধ্য হবেন। এ কেমন কথা? কৃষকেরা যদি সরকারকে খাদ্যদ্রব্য দিতে অস্বীকার করেন তবে সরকার ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সরকারী আদেশে নিজ দখলে নিতে পারেন না? কোলে কয়লা খনিগুলি যেভাবে নিয়েছেন? এতে কি অসুবিধা আছে! আমরা বলছি—জনসাধারণকে যারা বঞ্চিত করে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে কোন বাধা নেই। অথচ সরকার এ কাজ করছেন না—এর কারণ আরো গভীরে। অথচ জিনিষের মূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে একটা ন্যায়ভিত্তিক বিন্দুতে সরকার বেঁধে রাখতে পারছেন না। অর্থাৎ চাইছেন না। অথচ কি আশ্চর্য্য দেখুন, ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা চাই। কেন, অভাগা জনসাধারণ কি এঁদের সঙ্গে একাজে অসহ-যোগিতা করবেন বলে তাঁর ধারণা হয়েছে? তবে বাধা কোথায়?

চাউল, গমের দাম, মশলাপাতির দাম কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে আর কোথায় যাবে কেউ জানে না। এই দালদাতে দর সরকার বাড়ালেন ৭৫ পয়সা প্রতি কেজি-তে আর দোকানদাররা ৬-৫০-পঃ থেকে দয়া করে দাম চাইছেন ১০-টাকা করে। কাপড়ের দর, সুতির শার্টিং ১.২৫ পয়সা প্রতি মিটারে, ধুতি শাড়ীতে ৩।৪ টাকা প্রতি জোড়ায়, টেরিলিন প্রভৃতিতে ৭৫-পয়সা থেকে ১০০ পয়সা পর্যান্ত প্রতি মিটারে বেড়েছে। মাছ তরকারী, ফল, মিষ্টির কথা বলে আর লাভ কি—এ ত বুঝতেই পারছি হাড়ে হাড়ে প্রতিদিন। পরিস্থিতিটা ভাবুন তো একবার। সরকার দর বাঁধেন—ব্যবসায়ীরা আঙুল দেখায় ক্রেতাদের, সরকার পারেন না আটকাতে। চাবনজী বাজেট উপস্থিত করলেন—বসালেন ১৯২ কোটি টাকার নূতন কর, যার ফলে মধ্যবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দর বৃদ্ধি পেয়েছে ভয়ঙ্কর ভাবে, অথচ তিনি বলছেন যে সাধারণ মানুষের পকেটে তিনি হাত দিচ্ছেন না—অথচ কর বসিয়েছেন সিগারেট, ক্রীম বস্ত্র, পেট্রল, ক্রীম সুতার আঁশ ইত্যাদিতে। কি সুন্দর রসিকতা! এ বৎসর ৮০ লক্ষ টন গম সংগ্রহের কথা ছিল এর মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে মাত্র ৪০ লক্ষ টন (কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতে)। আর পাওয়া যাচ্ছে না দুষ্ট ব্যবসায়ীদের দৌলতে। ওদের বিরুদ্ধে সরকার কিছু করতে পারেন না—পারবেন আমার আপনার পকেট কাটতে। তিনি যাচ্ছেন ৫২০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য আমদানী করতে। সংগ্রহ-লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা না করে একাজ করা হচ্ছে কেন? কার স্বার্থে?

ভেজাল ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা সাহস করে কোন ঔষধ ব্যবহার করতে চান না নিজ দায়িত্বে। অনেক ঔষধই জাল। এমনকি বিষও নাকি ভেজাল অথচ একাজগুলি চলছে সমাজে অবাধ-গতিতে, যারা ব্যবহার করছেন তাঁরা ভুগছেন, ঠকছেন, মরছেনও, আর যারা ঐ-সব ভেজাল মিশাচ্ছেন তাঁরা বুক ফুলিয়ে সমাজে চলছেন, টাকা ও মুরুব্বির জোরে। অথচ এই সমস্ত পিশাচদের শাস্তি হয় না—হয় না জেল জরিমানা। কিন্তু কেন? যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াবেন সেই সরষেতেই ভূত আছে। যাবেন কোথায় তা হলে? বেহুলার বাসরঘরে কালসাপের মত দুর্নীতি এখন সর্বস্তরে। কালোবাজারী-ফাটকাবাজ মজুতদারেরা, কর ফাঁকি-বাজরা পরমানন্দে অবাঞ্ছিত লাভ করে চলেছে দিনের পর দিন—ব্যবসা-বাণিজ্যকে করছে নষ্ট একেবারে। অর্থনীতিকে করছে তছনছ কালো টাকার দৌলতে—করছে নষ্ট কারবারের—রক্ত শোষণ করছে সমাজের। খাদ্যের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে ধীরে ধীরে জাতটাকে করছে শক্তিহীন বীর্য্যহীন—জাতির [illegible] করছে [illegible]। রেশনে যে চাউল পাচ্ছি দিনের পর দিন—এ চাউলে আমরা হয়েছি শক্তিহীন—প্রতিবাদের কণ্ঠ দুর্বল হয়ে গেছে ঐ সব অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে খেয়ে—অথচ পশ্চিমবঙ্গের চাউল রেশনে মিলে না।

পাওয়ার সাপ্লাই-এর দুরবস্থা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নহে সর্বভারতে তবু আমরা আমাদের কথাই বলছি। উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে সব কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য, অথচ কি মজার কথা দেখুন, ১৯৭১ সালে ইলেকট্রিক কোম্পানী তাঁদের পকেট ক্যালেণ্ডারে ছেপে দিয়েছিলেন—

"ইলেকট্রিক কারেন্ট বন্ধ হলে কি হবে?—

অন্ধকারে নাগরিক জীবন নিরাপত্তাহীন হবে, পানীয় জল থাকবে না, কাজ করবে না জল নিষ্কাশন পদ্ধতি, মহামারী দেখা দেবে। ট্রাম চলবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা থমকে দাঁড়াবে। এক কথায় বিপর্য্যয় ঘটবে। সেই জন্যে যুগের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহের মান যে বজায় রাখা উচিত এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সকলে একমত।"

কি সুন্দর সতর্কতা, কিন্তু কোথায় তার সার্থকতা? কথায় ও কাজে কত তফাৎ! অন্তরে আছে কি এঁদের সততা। আজ জীবন হয়েছে অতিষ্ঠ আমরা দাঁড়িয়ে

চাইতেও এরা আরো ভয়ঙ্কর। এরাই সমাজকে করছে নিবীর্য্য। কর ফাঁকি-বাজরা রাষ্ট্রের শত্রু—তারা সরকারী রাজকোষকে করছে দুর্ব্বল—প্রশাসনকে সকলে মিলে করছে কলুষিত। এরা ভুলে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যকে—স্বদেশকে—সত্য ও সুন্দরের পথকে।

দেশের বর্তমান সঙ্কটের মূলে আছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি—চোরাকারবারী ও ভেজালকারীর দল—কালোটাকার সাম্রাজ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন। এরা গণতন্ত্রকে করছে দূষিত, দলের মধ্যে গড়ে তুলছে উপদল, নেতৃত্ব-অভিলাষী কর্ম্মীদের এরাই দিয়েছে অর্থের প্রলোভন, করছে লোভী, তারই ফলে এই আত্মকলহ। সুতরাং এই সঙ্কটের মূল সমূলে বিনাশ না হলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না—আর এই প্রচেষ্টা যদি বিলম্বিত হয় তবে দেশের সামনে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। সেদিনগুলি হবে আরো ভয়ঙ্কর।

তাই বলছি—নেতারা সতর্ক হউন—সচেতন হউন নিজেদের আদর্শে, ঘোষিত লক্ষ্যে নির্লোভ চিত্তে এগিয়ে আসুন জনকল্যাণ মানসে, প্রশাসন হউক কলুষ-মুক্ত, অনন্যচিত্ত হয়ে আমরা পৌঁছবার চেষ্টা করি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে, দারিদ্র্য মোচনে আর গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায়। যেখানে মানুষ পাবে সামাজিক ন্যায় বিচার—মানুষের মত বাঁচার অধিকার—কর্ম্মে ও বাক্যে পাবে পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ আর জীবনের পরমানন্দকে।

একটি সময়োচিত সাবধান-বাণী

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহরে বিশ্ব ওলিম্পিকের পোলভল্ট বিভাগের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ফাইনালে প্রতিযোগিতা করার জন্য অনুমোদন-সাপেক্ষ লম্ফন আরম্ভ হয়েছে তখন।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসে জগতের সেরা দুইজন প্রতিযোগী সেদিন এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। তাঁরা হলেন ইংলণ্ডের বাব রিচার্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের বব্ গুটায়াস্কি।

এই প্রতিযোগিতার মাত্র কিছুদিন পূর্বে পোলভল্টের ঐ একই ক্রীড়াঙ্গনে পোটারিকার একজন ১৭ বৎসর বয়স্ক কিশোর প্রতিনিধি সাড়ে তেরো ফুট উচ্চতা অতিক্রম করায় এই সময় অস্ট্রেলিয়ান জুনিয়ার পোলভল্ট রেকর্ড নির্ণয়ের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়। আর এই জন্যই নির্দিষ্ট উচ্চতাটি মাপবার জন্য পোল বিদ্ধ করার স্থান নির্দ্দেশকটিকে এগিয়ে এনে ক্রস বারের (Cross Bar) ঠিক সরাসরি নীচে এনে রাখার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য সেটিকে যে আবার যথাস্থানে এনে রাখা উচিত সেটি কিন্তু আর তখন কাহারও খেয়াল হয়নি। মাত্র একজন বাদে পরিচালকদের এই ত্রুটি সেদিন সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনার পরক্ষণটিতেই বাব রিচার্ডের লাফানোর পালা ছিল। অনায়াসসাধ্য উক্ত উচ্চতা অতিক্রম সম্বন্ধে অকুতোভয় ববি সেদিন অতি সহজভাবে ছুটে এসে অতি মোলায়েম ভাবে একটি লাফ দিবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরিচালকদের উপরোক্ত ত্রুটির জন্য ক্রস বারটি (Cross Bar) লম্ফদণ্ডের সংস্পর্শে এসে স্থানচ্যুত হল। কিন্তু কেন? সেটা কিন্তু কেহই বুঝে উঠতে পারলেন না। ববি রিচার্ড নিজেও বিষয়টি সম্বন্ধে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি সেদিন। প্রাথমিক এই অসাফল্যের জন্য তিনি মনের ভেতর কিরকম যেন একটা অশান্তি অনুভব করতে আরম্ভ করলেন।

এই রকম মানসিক অবস্থার মধ্যেই ববি রিচার্ডের নামে দ্বিতীয় ডাক এল। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এবার তিনি দৌড়ে সীমার দৈর্ঘ্য এবং লম্ফদণ্ডের দ্বারা উচ্চতার সঠিক দৈর্ঘ্যটি মেপে নিলেন। এবারও তিনি ছুটে এসে স্থান-নির্দ্দেশকটির উপর পোল গেঁথে নির্দ্ধারিত উচ্চতা অপেক্ষা তিন ফুট উপরে উঠে গিয়ে পোল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু লম্ফদণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে ক্রস বারটিকে এবারও ভূপাতিত হতে দেখা গেল। ববি হতাশ অন্তরে ভূপাতিত দণ্ডটির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ববিকে অতঃপর তৃতীয় অথবা শেষ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হলো। সত্য সত্যই ববি রিচার্ড এবার উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। হৃদয় মধ্যে দেখা দিল তাঁর একটা প্রচণ্ড সংশয়। মনের মধ্যে তখন তিনি চিন্তা করে চলেছেন—আবার যদি কিছু অঘটন ঘটে। যদি হাত পিছলে যায়। সময় মতন যদি ঠিক লাফ না দেওয়া যায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মানসিক চাঞ্চল্যে উত্তেজিত ববির কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। মানসিক উদ্বেগে সত্য সত্যই তিনি এবার দিশেহারা হয়ে উঠেছেন।

দ্বিধা-শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত হাতে আবার পোল তুলে নিলেন ববি রিচার্ড। উচ্চতা এবং দৌড়ে সীমার

দৈর্ঘ্য মেপে এনে আবার তিনি প্রাক্‌লম্ফন দৌড়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন। কিন্তু এই সময় পূর্বোক্ত দুই ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল তখন বিপুল হতাশা। বাহু দুটিতে তিনি আর তখন তেমন বল পাচ্ছেন না। পা দুটিতে অনুভব করছেন এক অব্যক্ত অবশ অনুভূতি। সমস্ত শরীরের ভেতর তখন বয়ে চলেছে এক অস্বস্তিকর শিহরণ।

ইহা সত্ত্বেও ববি রিচার্ডকে লাফাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আবার এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

এই সেই ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন। এখানে সামান্যতম ত্রুটি অথবা একটুখানি ভুলের ফল স্বরূপ বিজয়-গৌরবের বাসনাকে চিরতরে বিসর্জন দিতে হয়।

এই রকম অবস্থায় মানসিক চাঞ্চল্যে দ্বিধা-বিদীর্ণ ববি যখন দৌড় শুরু করবেন ঠিক এই রকম সময় তিনি একটি মমতাময় কোমল কণ্ঠের বাণী শুনতে পেলেন—"বব, আমার মনে হয় লাফাবার আগে স্থান-নির্দেশকটি তোমার একবার দেখে নেওয়া দরকার। কিছুক্ষণ আগে উচ্চতা মাপের সময় এটাকে একটু এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্রীড়াবিদ্‌ বব গুটারাস্কির সময়োচিত এই সাবধান-বাণী রিচার্ডের তৎকালীন সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল সেদিন। অতঃপর ব্যর্থতার সেই তুচ্ছ কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন ববি রিচার্ড।

প্রাক্‌লম্ফন প্রস্তুতিতে ক্ষান্তি দিয়ে রিচার্ড এবার ধীরে ধীরে নির্দেশকটির দিকে অগ্রসর হয়ে সেটিকে আবার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে দিয়ে এলেন। অতঃপর কোথায় যেন অদৃশ্য হল তাঁর মনের ভিতরকার সেই আতঙ্ক ও পুঞ্জীভূত হতাশা। নবীন উদ্যমে ছুটে গিয়ে তিনি তেরো ফুট দেড় ইঞ্চির বাধা অতি সহজেই অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হলেন।

এরপর থেকে নির্ভুল লাফের পর লাফ দিয়ে ববি রিচার্ড ক্রমান্বয়ে আরও উচ্চতর উচ্চতা অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হলেন। অতঃপর চোদ্দ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে উক্ত বিভাগে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। কিন্তু এর চেয়েও কোনও এক বড় বিস্ময়কর ঘটনা বোধহয় অপেক্ষা করছিল সেদিন। এই প্রতিযোগিতায় রিচার্ড গুটারাস্কিকে মাত্র এক ইঞ্চির ব্যবধানে পরাস্ত করলে পর পরাজিত গুটারাস্কি নিজেই ছুটে এসে রিচার্ডের সঙ্গে করমর্দনরত অবস্থায় বলে উঠেছিলেন, "বাহবা ববি! চমৎকার লাফিয়েছ তুমি। আমার চেয়েও অনেক ভাল লাফিয়েছ। তুমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।" এমন সহজ সরল উদার বাণী বোধহয় উন্নতমনা প্রকৃত ক্রীড়াবিদের নিকট থেকেই শুধু আশা করা যায়।

কিন্তু একটা প্রশ্ন—গুটারাস্কি কি এই মহত্ত্ব প্রদর্শন করে ভুল করেছিলেন সেদিন? বোধ হয় না। সকলের অলক্ষ্যে অন্ততঃ একজন তাঁর এই নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা স্মরণ রেখেছিলেন হয়ত বা পরবর্তীকালের কোনও উৎকৃষ্টতর পুরস্কারের জন্য।

এর পরের বৎসরই Mill Rose Games এ গুটারাস্কি ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি অতিক্রম করে ববি রিচার্ডের সমান লাফানোর কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সমর্থ হন। এই-খানেই কিন্তু এর শেষ নয় এর পরও তিনি পনেরো ফুট পৌনে ৮ ইঞ্চি লাফিয়ে পুনরায় একটি রেকর্ড স্থাপনে সমর্থ হন।

এই অমৃতময় কাহিনী স্মৃতিপথে উদয় হলে বাস্তবিকই মনে হয়—"Nothing goes unrewarded in this world."

কান্ত-কথা

শান্তিলতা রায়

আমরা ছোটবেলায় রাজসাহীতেই থাকতাম। রাজসাহীতে কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের 'আনন্দ নিকেতন'-এ। আনন্দ নিকেতনই বলা যায়। আমরা ভাই-বোনেরা, মা ঠাকুমা, আরও অনেক আত্মীয়-স্বজনে বাড়ীপূর্ণ ছিল। রজনীকান্তের সাহচর্য্যই আনন্দ নিকেতনের আনন্দের উৎস ছিল। তাঁর স্নেহে ও শিক্ষায় লালিত-পালিত হয়েছি। তাঁর কাছে ছোটবড় ভেদ ছিল না। আমরা ছোট ছিলাম কিন্তু তাতে কি এসে যায়, সব সময়ই তাঁর সঙ্গ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গীত, তাঁর সুর, সব তাঁর কাছ থেকেই উপলব্ধি করেছি, উপভোগ করেছি। মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হয়ে থেকেছি। তিনি মনে করতেন আমরা ছোটরাও তাঁর সঙ্গীতের, সুর রচনার, কবিতার, ভারি এক-একজন সমজদার। আমাদের তিনি বাদ দিয়ে কিছু করতে পারতেন না। এখন মনে হয় আমাদেরও ভেতরে সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল যা দিয়ে আমরা গ্রহণ করতে পারতাম, সেটা বাবা বুঝতে পারতেন। আমাদের লেখা-পড়ার প্রতি প্রখর দৃষ্টি তাঁর ছিল। নিয়মানুবর্ত্তিতা আমাদের মেনে চলতে হত। অনেক দুঃস্থ ছাত্র আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করত, তাদের প্রতি কোনো অবিচার বা অবহেলা না হয় এর জন্য ঠাকুর-চাকরদের প্রতি কঠিন আদেশ ছিল। আবার সেটা পালিত হচ্ছে কি না বাবা নিজে সেটা দেখতেন। এই সর্ব্বব্যাপী আনন্দময় পুরুষ আনন্দ দিয়ে সবাইকে শীতল তৃপ্ত করে রেখেছিলেন।

কান্ত কবির স্মৃতিচারণে প্রথমেই মনে পড়ে মা ও ছেলের মধুর সম্পর্কের কথা। তাঁর মাতৃভক্তি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরা ছিল। মায়ের সঙ্গে তাঁর যেন বন্ধুত্ব ছিল। মাকে না বলে কোথাও যেতেন না। যত গান, যত কবিতা লিখেছেন আগে মাকে এসে শুনিয়ে যেতেন। গান গেয়ে শুনিয়ে দিতেন। কবিতা পড়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মা, শুনলে তো? যা বলতে চেয়েছি তা বলতে পেরেছি কি? মা বলতেন, রজন, যা ঈশ্বরকে বলতে চেয়েছ তাই তোমার কলমে এসেছে। আমি সবটাই বুঝতে পেরেছি। রজন, এর সমালোচনা হতে পারে না। বাবা খুশী হয়ে উঠে যেতেন। কবি রাজসাহীতে ওকালতি করতেন। কোর্টে যাবার আগে মায়ের সঙ্গে মকদ্দমার জটিল বিষয়গুলি আলোচনা না করে গাড়ীতে গিয়ে উঠতেন না। বিকেলে কোর্ট থেকে এসেই উপার্জিত যা-কিছু টাকা পয়সা সমস্ত মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। আর আমাদের জন্য বরাদ্দ ছিল একটি করে তামার পয়সা—যেগুলি রূপোর টাকার মতন ঝকঝক করত। সেই-গুলি বাবা আমাদের ছোটদের দিতেন। আমরা তাতেই খুব খুশী থাকতাম।

বাবা বারান্দায় চেয়ারে এসে বসতেন কোর্ট থেকে এসে। সেই সময়টা ছিল আমাদের সবারই একটা আনন্দের সময়। সবাইকে এসে বসতেও হত। আমাদের গৃহভৃত্যদের চাকর আখ্যা দেওয়া যায় না। আমাদের সেই রকম কয়েকজন গৃহভৃত্য ছিল, আমরা তাদের দাদা বলেই সম্বোধন করতাম এবং যথোচিত সম্মান দিতাম। আমাদের মা তাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখেই কথাবার্তা বলতেন। বলতে কি তারাই আমাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি দেখাশুনা করত। বাড়ীর কর্তাই একরকম ছিল। তাদেরই একজন ছিল মধু দাস। আমরা মধুদাদা বলতাম। বাবা এসে বসলে মধুদাদা বাবার গায়ের কোট খুলে নিত। জুতো মোজা

খুলে দিত। আগে থেকে তোলা জলে হাত পা ধুয়ে দিত। গরম দিন হলে বড় হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া দিত। ঠাকুমা তখন জলখাবার সাজিয়ে দিতেন মায়ের হাতে। মা সেই শ্বেতপাথরের রেকাবীতে সর-ভাজা, ছানার পায়েস, ক্ষীরের সন্দেশ পাথরের গেলাসে বেলের সরবৎ বাবার সামনে এনে দিতেন। বাবা বলতেন, মা—রাঙা বউ যে এগুলো কাকে দিয়ে গেলেন তা তো বুঝতে পারলাম না। এই রকম হাসি গল্প চলত আর মধুর সময়টা কোথা দিয়ে বয়ে যেত। আমরাও বাবার আশেপাশে বসে যেতাম। ঠাকুরমার হাতের সাজানো খাবারের একটি করে রেকাবী মা আমাদের হাতে ধরে দিতেন। বাবা আমাদের একটি খাবারের রেকাবী নিয়ে আর একজনকে দিতেন, আর-একজনেরটা নিয়ে অন্যকে দিতেন। যার রেকাবীটা সামনে থেকে উধাও হত সে তো মহকান্নাকাটি লাগিয়ে দিত অথবা রাগ করে উঠে চলে যেত। অমনি বাবা উঠে তার হাত ধরে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসাতেন, তাঁর খাবারের ভাগ থেকে তুলে দিতেন। আমাদের ঝোঁক ছিল সরভাজা বেশী পাওয়ার। আর কিছু চাইতাম না, সরভাজা যারটা বেশ বড় হ'ত সে খুব খুশী হত।

সেখানেই বসে আমরা সারাদিন কে কি করেছি সব কথা বাবাকে বলতে হ'ত। এবং সঙ্গে সঙ্গে চলত হাসির গল্প, কত কলরব। বাবা অনেকরকম খেলা শেখাতেন। কাগজের ফুল তৈরী করা, তাসের পাঁচতলা ছ'তলা বাড়ী তৈরী করা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তামাক খাওয়াও চলত।

সন্ধ্যে হয়ে এলে উঠোনের ওপর শিউলি ফুলের গাছে হলুদ রংএর পাখীরা ফুলের কলি খেতে আসত। কামিনী ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে উঠত। পেয়ারা গাছে পেয়ারা ফুলের গন্ধে সমস্ত উঠোন ম' ম' করত। আর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরের গুনগুনানিতে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত। থোকা থোকা লাল করবী আস্তে আস্তে ফুটে উঠত। আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম। লাল হলুদ সাদা সন্ধ্যা-মালতী উঠোনের চারপাশে ফুটে উঠত। খাওয়ার কথা ভুলে শুধু নির্বাক্ হয়ে বসে থাকতাম। হঠাৎ রাখাল ছোকরা চাকরকে দেখা যেত ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিয়ে আসছে। ঘরে ঘরে আলো দিয়ে যেত। মধুদাদা এসে বলত, তোমাদের মাস্টারমশায় এসেছেন। আমরা তখন উঠে পড়তাম। বাবার কাছেও খবর আসত, বৈঠকখানায় ভদ্রলোকরা এসেছেন। বাবাও উঠে পড়তেন। বলতেন, বাইরে পান তামাক দাও, আমি যাচ্ছি। মনে পড়ে বাবা উঠে মায়ের মাথা থেকে ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে একটু হেসে চলে যেতেন।

রাখাল চাকরের কাজ ছিল বৈঠকখানা ঘরে কেউ এলে ঝালর দেওয়া বড় পাখা টানা আর মাঝে মাঝে পাখায় গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া। দিনের বেলায় সকলের ফরমাস খাটত কিন্তু সন্ধ্যা হলেই তাকে পাখা টানতে হ'ত। বৈঠকখানায় তখন একে একে অনেকেই এসেছেন। কত গল্প বাবার, একের পর এক হাসির গল্প—নানাধরণের কত আলোচনা চলত। তারপরে হ'ত গান। বাবা একে একে কত গান গেয়ে যেতেন। রোজই তাঁর লেখা নতুন নতুন গান, যেমন 'পীযূষসিঞ্চিত সমীরচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল দোলে রে' অথবা 'অব্যাহত তোমারি শক্তি গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' এই সব গান একের পর এক গেয়ে যেতেন। চোখ থাকত বন্ধ। যেন সামনে পাশে কেউ নাই, নিজের মনে গেয়ে চলেছেন। কে শুনছে, কে শুনছে না সেদিকে নজর নেই। তাঁর অন্তর তাঁরই সঙ্গীতে যেন পরিপূর্ণ। বাবার বন্ধু ছিলেন শ্রীগোবিন্দ রায় (সাহিত্যিক শ্রীসুশীল রায়ের পিতা), তিনি বাবার গানের সঙ্গে এস্‌রাজ বাজাতেন। বাবার আর-এক বন্ধু, শ্রীগোবিন্দ রায়ের ভাই তিনি, বাবার গানের সঙ্গে তবলা বাজাতেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রও আসতেন। শশধর রায়, ললিত মৈত্র প্রমুখ অন্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সমাগম হত। বাবা গান গেয়ে যেতেন। সুরের ঝরণা-ধারায় সবাই সিক্ত হয়ে উঠতেন। যেন বাবা একা গাইছেন না, সবাই একসঙ্গে একাত্ম হয়ে উপলব্ধি করছেন।

গাইয়ে এবং শ্রোতা উভয়েই এক হয়ে গেছেন। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধি আমেজ আর গোলাপজল ছিটানো পাখার হাওয়া— তার মধ্যে বাবা গাইছেন 'মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে ব্যাকুল হ তার অন্বেষণে, প্রেম নয়নে সঙ্গোপনে দেখবে যেমন দেখতে পাবে'। অথবা নতুন লেখা 'বেলা যে ফুরায়ে যায় খেলা কি ভাঙ্গে না হায়'—এ খেলা কি করে ভাঙবে? এই সব গান এখনও যেন অন্তরে কান পাতলেই শুনতে পাই। আবার মাঝে মাঝে আমাদেরও বাবার কাছে যাবার ডাক পড়ত। আসরে আমার ছোটদাদারই ডাক পড়ত বেশী। আমার বৈঠকখানা ঘরে অত মজলিশের মধ্যে যেতে একটুও ইচ্ছে হত না। পড়াশুনা নিয়ে বসে থাকতাম, পড়ি বা না পড়ি। কিন্তু মধুদাদা বারে বারে বলতে আসত, শীগগির যাও, সবলে ডাকছেন। যেতেই হ'ত। আস্তে করে গিয়ে হয় অক্ষয় মৈত্রের পিছনে বা শশধর রায়ের কাছে গিয়ে বসতাম। গান শেষ হলে বাবা যখন চোখ মেলে চাইতেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টি পড়ত। তাঁর সামনে এগিয়ে আসতে বলতেন। আবার তাঁর গানের সঙ্গে আমার ও ছোটদাদার এক সঙ্গে গাইতে হ'ত। পর পর অনেক গান গাইতে হ'ত। কখনো বাবার সঙ্গে গান শুরু করেছি, দুবার গেয়েই বাবা তাঁর গান বন্ধ করে দিতেন, আমার আর ছোটদাদার একলা গাইতে হ'ত। রাজসাহীতে এক-জন বেশ নামকরা গাইয়ে ছিলেন, তাঁর ভাল নাম কেউ জানত না। তাঁকে সবাই কটা সাহেব বলত। তিনিও এসে বাবার সান্ধ্য মজলিশে যোগ দিতেন ও অনেক গান গাইতেন। তাঁর সঙ্গে এক যোগে আমরাও গান গেয়েছি—যেমন 'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম', 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম', এই গান-গুলি শিখেছিলাম। এই ভাবে গান শুনেছি শিখেছি। মজলিশে থেকেছি। মনীষীদের নানা রকমের কথায় গানে বাজনায়, এখন বলতে পারি, যেন সুরলোকের মাঝে ভেসে বেড়িয়েছি। আমাদের কোথাও বাধা ছিল না শুধু আনন্দ কুড়িয়ে বেড়িয়েছি। ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন বাবার সঙ্গে উঠে এসেছি, তাও ঘুমের মধ্যে।

রাত্রে আমরা ছোট ছোট ভাইবোনেরা বাবা-মার কাছেই শুয়েছি। কখনও বাবা-মা ছাড়া আমরা অন্য ঘরে ঘুমাতাম না। কখনও কখনও রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে চেয়ে দেখেছি, বাবা বসে লিখছেন। তাঁর তন্ময় ভাব। যেন কোথাও অনেক দূর চলে গেছেন, বিভোর হয়ে লিখে চলেছেন, আধো আলো অন্ধকারের মধ্যে। 'সামনে কোন বাধা নাই, যেন কেউ কোথাও নাই। বাবা লিখে চলেছেন। সন্ধ্যায় মজলিশে যে রজনীকান্ত হাস্যে সঙ্গীতে গল্পে সবাইকে বিভোর করে দিয়েছেন, এ রজনীকান্তের সে রূপ আর নাই। শুধু ঈশ্বর, শুধু ভগবৎসাধনা, শুধু প্রেম তাঁকে কোন্ গভীরে নিয়ে গেছে। তিনি তাঁর পরম ধনের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। বাহিরের চেতনা অবলুপ্ত। চিন্ময় চেতনায় সঙ্গীত রচনা চলছে। বলছেন, 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে'। ভোর বেলায় বিছানায় বসেই সেই গানে সুর দিয়ে নিজেই গুন গুন করে গাইছেন, এই অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব অনুভূতি প্রত্যক্ষ করেছি। সেই রূপ, সেই সুর, সেই ভগবৎপ্রেমসঙ্গীত আমাদের অন্তর মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মতন এখনও আলো করে রেখেছে। সুদীর্ঘ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সে আলো এখনও আমার অন্তরে ভগবৎ-সাধনার পথ দেখায়।

বাবার এই গানগুলি আমাদের কেউ শেখায়নি। নিজেরাই তাঁর গাইবার সময় শুনে শিখতে পেরেছি। বিছানায় বসেই লিখছেন—"এই যে সুত-জায়া ওদের বড় মায়া ওরা সাধনপথের বন্দী রে"—অথচ তাঁর চার পাশে ছেলেমেয়ে শুয়ে রয়েছে। মনের গহনে তখন ঈশ্বরোপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নাই। সুত-জায়া তখন অবলুপ্ত। সমাধি-ভঙ্গে আবার সেই স্নেহময়

কর্তব্যনিষ্ঠ আনন্দময় পুরুষ। এঁকে বুঝাবার শক্তি কোথায়?

ঠাকুমা হয়তো কখনো বলতেন, রজন, সভা-সমিতিতে যখন যাও, ছেলেদের তো সঙ্গে নাও না, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাও কেন? গান তো ছেলেরাও খুব ভাল গায়, তাদের তো সঙ্গে নাও না। বাবা বলতেন, মা, ছেলেরা বড় হয়েছে; স্কুল, কলেজে পড়ছে, ওদের নিয়ে গেলে পড়াশুনার বড় ক্ষতি হয়। পড়াশুনার ক্ষতি যাতে না হয় আমি সেই চেষ্টাই করে থাকি। তা তো তুমি জানো মা! তুমি দেখো মা, বাপ আর মেয়ের গানে সমস্ত পাবনা জেলা আমি ভাসিয়ে দেবো। এই জন্য আমি সর্ব্বত্র মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

দাদারা আমার বড় তিনজন। পিসতুতো ভাইয়েরাও আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি। মার্ব্বেল খেলতে ভাল পারতাম না, হেরে যেতাম আর কাঁদতাম, দাদারা আমাকে খেলতে নিতেই চাইত না। বাবা এসেই যে-পক্ষ হেরে যেত অর্থাৎ আমার পক্ষ নিয়ে খেলা করে দাদাদের হারিয়ে দিয়ে উঠে চলে যেতেন। দাদারা বলতেন, এমন কেঁদে যদি জিতে যাও তবে তোমার সঙ্গে আর খেলব না। দাদারা যখন ব্যাডমিন্টন খেলত আমিও পিছন পিছন যেতাম খেলতে। বাবাও কখনও কখনও এসে খেলতেন। কোর্ট থেকে বিকেলে ফিরে এসে যে চকচকে পয়সা দিতেন, আমাদের সেগুলো জমানোই থাকত যার যার লুকানো জায়গায়। মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে বার করে আবার দেখে শুনে রেখে দিতাম। একদিন আমাদের মেজদাদা ছোটদাদা দুজনে এসে বললেন, ভাখ্, তোদের পয়সাগুলি তো পড়েই আছে, আমাদের কাছে দে, তোদের সামনেই মাটির তলায় পুঁতে রেখে দি, কয়েক দিন পরে তুলে দেখবি পয়সা সব সোনার মোহর হয়ে গেছে। আমরা খুশী হয়ে সব পয়সা দাদাদের হাতে তুলে দিলাম। আমাদের সামনেই সেগুলি মাটির নীচে রাখা হ'ল। একটা কাঠি পুঁতে দিয়ে জায়গাটা চিহ্ন করে রাখা হ'ল। কয়েক দিন যায়, দাদারা আর কোন কথা বলে না, আমাদের যেন একটু এড়িয়ে চলে। বেশ সন্দেহ হ'ল। সেই জায়গায় গিয়ে দেখি কাঠিটা ঠিক বসানো আছে কিন্তু মাটি আবার খুঁড়ে ফেলা আর পয়সা একটাও নাই। পয়সা কোথায় গেল, মহা কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলাম। মা তো হাসতে লাগলেন, রাখাল চাকর বলল, সে তো দাদারা কবে তুলে নিয়ে গজার দোকানে গিয়ে গজা কিনে বৈঠকখানা ঘরের পাশের বারান্দায় নিয়ে বসে খেয়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যি, আমি দেখেছি। মেজদাদা আমাকে তোমাদের কাছে কইতে বারণ করে দিয়েছিল। আমরা তো আরও কান্না লাগিয়ে দিলাম, কি, আমাদের পয়সা দিয়ে গজা খাওয়া?

ঠাকুমা আমাদের ডেকে দুটো চারটে করে পয়সা দিতে মনটা খুশী হ'ল। দাদারা সেদিন চুপি চুপি এসে ঠাকুরের কাছে বসে খেয়ে স্কুলে গেল। আমাদের সঙ্গে দেখাই করলে না। বাড়ীর ভিতরেও এল না। তখনকার দিনে এক পয়সায় বড় বড় চারটে গজা পাওয়া যেত। এ লোভ কি ছাড়া যায়?

আমাদের দেশ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় 'ভাঙাবাড়ী' গ্রামে। আমাদের বাড়ীতে প্রত্যেক বছর দুর্গোৎসব হত। খুব ধুমধাম করে হত। দেশে আমাদের অনেকেই থাকতেন। আমরা প্রত্যেক বছর পুজোর সময় দেশে যেতাম। দেশে যাওয়া তখনকার দিনে সহজ ছিল না। রাজসাহী শহরের চারদিক পদ্মা নদীতে ঘেরা ছিল। যেখানেই যেতে হ'ত পদ্মা নদী পাড়ি দিতেই হত। আর বর্ষার সময় পদ্মার রূপ হ'ত ভীষণ। যেমন তার গর্জ্জন তেমনি স্রোত আর তেমনি নদীর মাঝখানে বড় বড় ঘুর্ণির পাক। তার মধ্যে নৌকা পড়লে বেশীর ভাগই ডুবে যেত। পাড় ভেঙে ভেঙে পদ্মার জলে দিন রাত পড়ে যাচ্ছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির এপার থেকে ওপারটা সূক্ষ্ম একটা নীল রেখার মত দেখা যেত। পাড়ের মাটিতে ঢেউ এসে

ভেঙে পড়ত আর ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ হ'ত। অবশ্য চৈত্র বৈশাখ মাসে পদ্মার এ রূপ থাকত না। তখন একটা শান্ত ভাব থাকত। এই পদ্মা দিয়ে আমাদের দেশে যেতে হ'ত। যেতে আট-দশ দিন লেগে যেত। ষ্টীমারে সারা ঘাট পার হয়ে ওপারে দামুকদিয়া ঘাটে যেতে হত। সেইখান থেকে রেলগাড়ীতে পোড়াদহ রেলষ্টেসন জংসন, সেখান থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলে গিয়ে আবার ষ্টীমারে পদ্মায় এসে পড়তে হত। সেই ষ্টীমারেই যমুনা নদীতে এলে পাবনা জেলায় এসে পড়লাম। তারপর স্থলচর, সাজাদপুর হয়ে বেলকুচি ষ্টীমার ষ্টেশন, সেখানে নেমে নৌকা। একেবারে বাড়ীর সামনে এসে নৌকা লাগত। তখন তো সারা ঘাটে পদ্মার ওপরে ব্রীজ তৈরী হয়নি, তাতেই অতখানি ঘুরে গোয়ালন্দ হয়ে আমাদের দেশে যেতে হত। দেশে যাবার সময় আমরা বড় বড় নৌকা, বজরা করেই ৮।১০ দিনে গেছি। চার-পাঁচখানা নৌকা ও একটি বজরায় আমরা যেতাম। রাজসাহীতে পদ্মার ঘাট ছিল আখড়ার ঘাট। আখড়ার ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ত। বজরায় যেতেন বাবা আর তাঁর সঙ্গী হারমোনিয়াম। মাও বজরাতে থাকতেন। আর পিসিমা ঠাকুমা দাদারা সবাই অন্য অন্য নৌকাতে। আমরা এ-নৌকা ও-নৌকা করে বেড়াতাম। যখন ঘাট থেকে নৌকায় গিয়ে উঠতাম তখন আমাদের খুশীর জোয়ার বয়ে যেত। কত জিনিষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাস্তায় রান্নাবান্না করার সরঞ্জাম। রূপোর বাসন পুজোর জন্য। গ্রামের সকলের জন্য নতুন ধুতি শাড়ি। কলসী কলসী গঙ্গার জল। ঠাকুর চাকরও যাচ্ছে। ঠাকুমার রান্নার আলাদা সরঞ্জাম। সার বেঁধে বজরা আর সব নৌকা চলেছে, সে যেন এক সচল দুর্গোৎসব। আমরা সব ভুলে নৌকার ছাদে বসে থাকতাম, মাঝিদের দাঁড় বাওয়া দেখতাম। বাবা বজরার ছাদে বসে তন্ময় হয়ে লিখে যেতেন কত গান, কত কবিতা। গানে সুর দিচ্ছেন, গেয়ে যাচ্ছেন, আর পদ্মার ঢেউ-এর সঙ্গে সে সুর নেচে চলেছে।

কিছুক্ষণ নৌকা চলবার পর-পরই নদীর পাড়ে বাবা নৌকা থামাতে বলতেন। মাঝিরা পরিষ্কার ঢালু জায়গা দেখে নৌকা লাগাত। নদীর পাড় দিয়ে ভিতরে গ্রাম। আমরা নেমে পড়তাম। বাবাও নামতেন। ঠাকুররা চরে নেমে রান্না-বান্না শুরু করে দিত। আম-কাঁঠাল গাছে ঘেরা গ্রাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গরু-ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। আমরা গ্রামের আরও ভেতরে চলে যেতাম। আশেপাশে ছোটবড় খড়ের ঘর, টিনের ঘর। ঘরের দাওয়ায় বসে কেউ তামাক খাচ্ছে, ছোট ছোট হুঁকো নিয়ে। বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ী, আমাদের দেখে বউ-মেয়েরা এগিয়ে আসত—তাদের বাড়ীতে বসতেও বলত। কত পাখীর কলরব। দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যেত। পদ্মা-পাড়ের শ্যামল ছায়ায় ঘেরা সেইসব গ্রাম মনকে এখনও টানে। ঠাকুরমার রান্না নৌকোতেই হ'ত। মা রান্না করে দিতেন। ঠাকুরমা আর কারও হাতের রান্না খেতেন না। ফিরে এসে আমরা জলের ধারেও গেছি। জলের ধারে চুপ করে বসে থেকেছি। পদ্মা যেন প্রাণটাকে টেনে রেখেছে। দেখে দেখে চোখ তৃপ্ত হ'ত না। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়েদের সঙ্গে নাইতে নেমেছে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুড়োহুড়ি করছে। মায়েরা ঘোমটার ফাঁকে একবার আমাদের দিকে চাইছে, একবার ছেলেমেয়েদের শাসন করছে।

পরিষ্কার জায়গা দেখে চাকররা আমাদের জন্য শতরঞ্চি পেতে দিয়ে যেত। তার একটু দূরেই আমাদের রান্না হচ্ছে। গাঁয়ের মধ্যে চাকররা চলে গেছে দুধ জোগাড় করবার জন্য। যেখানে বসতাম সেখানে দেখেছি বাঁশগাছের ঝাড় জলে নুয়ে পড়েছে। তার ভেতরের কচিপাতা নিয়ে হাতের বালা তৈরী করেছি। ঝাউগাছের পাতা নিয়ে ফুলের মতন করে মাথায় গুঁজেছি। মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়িয়েছি, 'কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে'। বাবার শেখানো গান। সেই গান শুনে আশেপাশের গ্রামের কত লোক এসে দাঁড়াত। আমাদের ইচ্ছে হ'ত, ঐ ছেলেমেয়েদের মত

পদ্মায় নেমে আমরা ঝাঁপিয়ে স্নান করব। কিন্তু তা হ'ত না। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হলে আবার নৌকায় চড়তাম। নৌকা দাঁড় বেয়ে চলত। তখন কোথাও কোথাও পদ্মার জল কম—বর্ষা কমেছে—শরৎ এসেছে। জল আর অত ঘোলা নয়। কোথাও কোথাও পদ্মার জল এত কম যে জলের নীচের বালি ঝক্‌ঝক্ করছে। জলে নেমে মাঝিরা নৌকা ঠেলে নিয়ে চলেছে। আবার কখনো নৌকা ঠেলে নিয়ে এমন একজায়গায় এসে পড়েছে যেখানে যেমন স্রোত তেমনি ভয়ঙ্কর ঢেউ—তেমনি গভীর—স্রোতের কি টান। জলে হাত লাগালে যেন হাতশুদ্ধ কেটে নিয়ে যেতে চায়। আবার হাওয়া উঠলে মাঝিরা পাল তুলে দেয়। মাঝিদের ভাটিয়ালী গান আকাশ আর নদীর জলে ভেসে চলে। আর বজরার ওপরের ছাদে বসে হাত দুখানি কোলের ওপরে রেখে উদাস চোখে বাবা চেয়ে আছেন। দৃষ্টি অন্তরে কি বাহিরে বোঝা যাচ্ছে না। কখনো উপরের দিগন্ত-প্রসারিত নীল আকাশে, কখনো নীচে নৃত্যময়ী পদ্মার চঞ্চল রূপের মাঝে তিনি তাঁর দেবতার সাধনায় নিমগ্ন। সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগীশ্বরের ধ্যানে বসে আছেন। পদ্মার রূপ, নীল আকাশের দীপ্ত রূপ, মাঝিদের ভাটিয়ালী সুরের গান, দাঁড়টানার সমান তালের আওয়াজ,—আর তার মাঝখানে রজনীকান্তের ঈশ্বর ধ্যানের মূর্তি—এখন মনে হয় কি দেখেছি প্রকাশ করবার ভাষা নেই।

মা গিয়ে বসতেন বাবার পাশে। তখন রাত হয়েছে। আমরা ভেতরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি। পরদিন ভোর হল,—এইভাবে আরও দু-তিনদিন নৌকা চলল। বাবার কত লেখা, কত গান চলেছে। ক্রমে পদ্মা ছাড়িয়ে আমরা বড়োল নদীতে এসে পড়েছি। ইনিও ভয়ঙ্করী, কোন রকমে এক পাড় ঘেঁসে নৌকা চলেছে। আশে-পাশে গ্রাম—লোকজনের আনাগোনা। মহাজনী নৌকা বড় বড়। ছোট ডিঙি। জেলেরা মাছ ধরবার জাল ফেলছে। পাট বোঝাই নৌকা চলেছে। সমস্ত ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়েছি শাহাজাদপুর গঞ্জে। সংক্ষিপ্ত নাম সাজাদপুর। এটা মস্তবড় ব্যবসার জায়গা। নদীতে সারি সারি ছোট-বড় নৌকা—লোকজনের আনাগোনা। কত দ্রব্য-সম্ভার। ওখানকার তাঁতীদের বোনা শাড়ী-ধুতি-গামছা-চাদর ইত্যাদি সব নিয়ে নদীর ধারে বিক্রী করতে আসত। কত বড় বাজার, সবই নদীর ধার দিয়ে। কতরকম খাবার—রসগোল্লা, ছানার জিলাপী, ঘি, ক্ষীর, দই—সব নৌকার কাছে আসত। পুঁতির মালা, সাবান, আলতা—তাও ফেরি করতে আসত। আমাদের কিছু কিছু কেনা হ'ত। নদীর পারে বড় বড় বাড়ী ছিল। খুব সমৃদ্ধিশালী গঞ্জ ছিল। সেখান থেকে আমাদের নৌকা আবার ছাড়ত। বিনাটৈ নামে একটা গ্রামের ঘাটে এসে নৌকা দাঁড়াত। সেখানকার নতুন গুড়ের রসগোল্লা বিখ্যাত ছিল। আমাদের হাতের পাতায় ধরে না এত বড় বড় তৈরী হত। সেই রসগোল্লা হাঁড়ি ভর্তি করে এনে ময়রারা দিয়ে যেত। সে যে কি অপূর্ব স্বাদ, এখনও ভুলতে পারিনি। বিনাটৈ থেকে আর দু-চারটে গ্রাম পেরিয়ে আমরা যমুনা নদীর মুখে এসে পড়তাম। এইখানেই স্থলচর নামে বর্দ্ধিষ্ণু একটি গ্রাম ছিল। পাকড়াশীরা স্থলচরের জমিদার ছিলেন। পাকড়াশীদের বাড়ীতে যখনই খবর যেত—ভাঙাবাড়ীর রজনী সেনের বজরা এদিকে আসছে, তখনই তাঁরা তাঁদের ঘাটে লোক মোতায়েন করে রাখতেন। রজনী সেনের বজরা যেন স্থলচর পার হয়ে না যায়। ঘাটের কাছাকাছি বাবার বজরা এলেই তাঁকে আটকানো হত। জমিদারবাড়ীতে খবর যেত—তাঁরা নিজেরা ঘাটে এসে অতি সমাদরে বাবাকে নামিয়ে নিয়ে যেতেন। বলতেন, অন্ততঃ একটা দিন থেকে যান। বাবার সঙ্গে অনেক লোক কত লটবহর—বাবা যদি বা একটু ইতস্ততঃ করতেন কিন্তু তাঁরা কিছুতেই বাবাকে ছাড়তেন না। ওদিকে ঠাকুরমাও বাবাকে ছাড়া দেশে যাবেন না। আমাদেরও পাকড়াশীদের বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ হত। আমাদের কিছুতেই ইচ্ছা হত না যে নৌকা থেকে নামি। কিন্তু নামতেই হত। মা-ঠাকুরমা নামতেন না। ঠাকুরমার রান্না করবার অজুহাতে মা নৌকাতেই রয়ে

যেতেন। ঘাটের পথ দিয়ে যখন গ্রামে ঢুকতাম তখন চারদিকে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত। কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পথের দুধারে বড় বড় গাছ—আশেপাশে ছোট ছোট বাড়ী, ফুলের গাছ, গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের আনাগোনা—ব্যাপারীদের ঝুড়ি ভর্তি ফল—কলা, কামরাঙা, করমচা, বৈঁচি, বেতফল নিয়ে নদীর ধারের বাজারে যাচ্ছে। আমরা জমিদার-বাড়ীতে এসে ঢুকলাম। বাবাকে নিয়ে তাঁরা উৎসবের আয়োজন করলেন। আশ-পাশের গ্রাম থেকে কত ভদ্রলোক এলেন, এমনকি হরিপুর থেকে আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ীর কত লোক এলেন—সলপের জমিদার সান্যালবাড়ী থেকে এলেন। আর কি বাবার ইচ্ছামত আসবার উপায় রইল? পাকড়াশী-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বাবাকে অভ্যর্থনার আয়োজন হল। চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে দুর্গোৎসবের আয়োজন হচ্ছে। দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হচ্ছে। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বাবাকে নিয়ে বসলেন। কুশলবার্তা বিনিময়ের পর বাবার গান শুনবার অনুরোধ এল। কত দুর-দুরান্ত থেকে সবাই এসেছেন—রজনীকান্তের সঙ্গ পাবেন, গান শুনবেন, আর একসঙ্গে খাওয়ার আয়োজন। তখন থেকেই যেন দুর্গোৎসব শুরু হল। বাবা গান গাইলেন—তার সঙ্গে পাকড়াশী-বাড়ীর নিপুণ ঐতিহ্যময় শিল্প, পাখোয়াজ বাদন, অপূর্ব মাধুর্য্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বাবা পরপর অনেক গান গেয়েছিলেন—আমরা গাইবার ভয়ে আর ওদিকেই যাইনি। বাইরে বাইরেই ঘোরেছি। হাসির গানের সঙ্গেও পাখোয়াজের গম্ভীর মিষ্টি বাজনা অপূর্ব লাগছিল। এরপর নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার পালা। সে এক এলাহি ব্যাপার। বাড়ীর ভিতরে প্রকাণ্ড একখানা খাবার ঘর। তাতে মেয়েদের হাতের তৈরী ফুল-লতা-পাতার কাজ করা কার্পেটের আসন সাজানো। প্রত্যেক আসনের সামনে একই রকমের রূপোর বাটি আর গেলাস। সামনে পিতলের পিলসুজে ঘিয়ের প্রদীপ জলছে। আর দেওয়ালের চারধারে লতা-পাতার গাছ। অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মেয়েদের হাতের তৈরী পিঠে-পুলি-পায়েস অমৃতের আস্বাদ এনে দিত। এখান থেকে মধুর আপ্যায়নের পরে আমরা আবার নৌকায় ফিরে আসতাম। তারপর কত জনপদ পেরিয়ে নৌকা চলত। সেইদিন আমরা একটা বিলে এসে পড়তাম। এই বিলটা মস্তবড়। হাজার হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে। যতদূর চোখ যায় আর কোথাও কিছু নেই—আছে শুধু পদ্মকলি, পদ্মফুল আর পদ্মপাতা। পদ্মের ওপর ভ্রমরগুলি গুনগুন করছে। কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। বালিহাঁস, কত রঙবেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। সাদা বক একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালো বক উড়ছে। মাছ-রাঙা পাখি জলের একটু ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমাদের নৌকা যেই পদ্মবিলে পড়েছে অমনি মন আকুল হয়ে উঠল। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। মনে হল চোখ বন্ধ করে পদ্মগন্ধের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিই। এখানে যদি মরে যাই সেও যেন ভাল। তার চেয়ে আর সুখ নাই। এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—এই রূপ আর দেখতে পাব না। এই শান্ত প্রকৃতিতে যেন আর উৎপাত না করি। মাঝিরা বললে, আপনারা এদের কোনরকম বিরক্ত করবেন না। চলুন আমরা এদের এলাকা ছেড়ে চলে যাই। মাঝিরা লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে বিল পার হয়ে যেতে লাগল। আরও এগিয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় গ্রামের কাছে এসে পড়লাম। আস্তে আস্তে আমাদের নৌকা গ্রামের নদীতে এসে পড়ল।

গাঁয়ে গাঁয়ে পুজোর বাজনা বাজছে। আমাদের ছোট্ট নদী দিয়ে গিয়ে বাড়ীর ঘাটে বজরা নৌকা ভিড়ল। বাড়ীর সামনে মাঠ, তাকে বলে হাটখোলা। তারপরেই আমাদের বাড়ীর দালান দেখা যাচ্ছিল। আমরা তো মহা খুশী—দৌড়ে হাটখোলা পার হয়ে বাড়ীতে গিয়ে হাজির। বাড়ীতে জেঠিমা পিসিমা জেঠতুতো দাদা-দিদিরা তো সবাই আমাদের ঘিরে ধরলেন। বলে উঠলেন, এসেছিস? বিদেশ থেকে আরও অনেকেই পুজো উপলক্ষে এসেছেন। চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হচ্ছে। তাতে ডাকের সাজ পরানো হচ্ছে, প্রতিমা ঝলমল করছে। সেখানেই

বেশীক্ষণ থাকতাম। সে ক'টাদিন আমাদের স্বাধীনতা খানিকটা ছিল। আমাদের স্নানের পুকুর বাড়ীর ভেতরই ছিল। ঘাটের চারপাশ বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। গাছের ডালগুলো প্রায়ই জলের মধ্যে এসে নুয়ে পড়েছে। আমার জেঠতুতো পিসতুতো দিদিরা আর আমরা একসঙ্গে দল বেঁধে ঘাটে নাইতে যেতাম। আমার এক দিদি গাছের ডাল ধরে চণ্ডীমঙ্গলের একটি গান গাইতে শুরু করতেন, "এ জীবনে নাই রে জীবন সঙ্গেতে নাই সম্বল, দুর্গা বলে ঝাঁপ দিলাম জলে দুখানলে প্রবেশিলাম, তোমরা সবে হরি বল, আমার বুঝি দিন ফুরালো, দেশে গিয়ে মাকে ব'লো শ্রীমন্ত তোর মশানে ম'ল।" তারপর সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। সেখানেই থাকতাম মনের সুখে যতক্ষণ না বড়োরা এসে জল থেকে টেনে তুলত। বাড়ীর সামনে হাটখোলার মাঠের দুধারে ছিল আম, কাঁঠাল, বেল, কয়েৎ বেলের গাছ। সামনে ছোট্ট স্রোতস্বতী নদী। আমাদের নজর ছিল কয়েৎ বেলের গাছের ওপর। কখন একটা বেল পড়বে আর কাড়াকাড়ি করে খাব। নদীতে ছোট্ট একটি নৌকা থাকত এপার ওপার করবার জন্য। গাছের সঙ্গে নৌকা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। সবাই মিলে এসে নৌকায় চড়তাম। দড়ি খুলে নিয়ে নৌকা করে ভেসে যাব কত দূর কেউ যেন না জানে। দড়ি খোলা হয়েছে, এর মধ্যে আমাদের পাহারাদার ভাদুড়িদাদার আবির্ভাব। দড়ি টেনে নিয়ে ঘাটে বেঁধে নৌকা থেকে সবাইকে নামিয়ে নিয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসত। সপ্তাহে একদিন হাট বসত। কতরকম জিনিষের কেনাবেচা হত সেখানে। আমাদের লক্ষ্য ছিল 'সেন সেন' নামে ছোট্ট ছোট্ট দানার মিষ্টি মশলা। তাই কিনেই আমরা খুশী।

মণ্ডপে পূজা হচ্ছে। ঢাক বাজছে। তিন-চারটা কাঁসি বাজছে। ধূপ আর গুগ্‌গুল চন্দনের ধোঁয়া। ঝাড় লণ্ঠন সাজানো হচ্ছে। নতুন নতুন কাপড় পরে কত জায়গা থেকে লোক এসেছে, পূজো দেখছে। স্থল-পদ্ম, শিউলি, জবা, পদ্মফুল, বেলপাতা সাজিয়ে মায়ের পূজো হচ্ছে। থালায় থালায় সাজানো ফল ও মিষ্টি। ক্ষীরের সাঁচ, নারকোলের সন্দেশ, পায়েস। অঞ্জলি দেবার পর যেন প্রসাদ না নিয়ে শুধুমুখে ফিরে যায় না কেউ। চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। প্রত্যেকেই কাজে ব্যস্ত। ওদিকে দুজন ঠাকুর মায়ের ভোগ রান্না করছে। বাড়ীর ভেতরে আমাদের খোরাকার রান্না হচ্ছে। মা পিসিমা ঠাকুমাদের আর দেখতেই পাওয়া যায় না।

এর মধ্যে একদিন বাবা দাদাদের ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেলেন। সবাই মিলে সাঁতার দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে হুটোপাটি করে এলেন। বাড়ী এসেই দেখেন মণ্ডপের সামনে অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছেন। আর মণ্ডপের মধ্যে দুর্গাপ্রতিমা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনীর দীপ্তরূপে ঘর আলো করে আছেন। বাবা আসতেই যাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন তাঁরা মা ভগবতীর জয় হোক বলে বাবার কাছে এগিয়ে এলেন। বাবাকে নমস্কার করলেন। বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চাইতেই তাঁদের একজন বললেন, আপনি এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করে কিছু শুনতে এসেছি আপনার কাছে। আমরা আমাদের খেত, খামার, ব্যবসা নিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়েছি। দুর্দিন এসে গেছে। আমরা দিশেহারা, আপনি কিছু বলুন। আমাদের আশা দিন। দেশের জন্য, আমাদের নিজেদের জন্য, আপনাদের জন্য কি করতে পারি আর কি করা উচিত? আপনি আমাদের পথ দেখাতে পারেন এই ভরসা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। বাবা চারিদিকে চেয়ে পূজোর দালানে চওড়া সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনারা এসেছেন কত দূর-দূরান্ত থেকে, আমাকে কিছু বলতেই হবে। তবে কি বলব? এই টুকুই বলতে পারি, আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম, আমাদের প্রাণ আপনারাই। আপনারাই দেশের শক্তির উৎস। আপনাদের কর্মের প্রেরণা, কর্মপথ আমাদেরই দেখিয়ে দিতে হবে। আপনারা বিলাতী কাপড় বর্জন করুন, ঘরে ঘরে চরখা প্রবর্তন করুন। সুতো কাটুন—

সেই সুতোয় ঘরের তাঁতে কাপড় বুনে দিন—আপনাদের বোনা সেই কাপড় আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব হাটে, গঞ্জে, বাজারে। ঘরে ঘরে বিক্রী করব। এই প্রতিশ্রুতি আমাদের দিন যে বিলিতি বর্জন করবেন, সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করবেন, বিলিতি লবণ ঘরে নেবেন না। একবার আমার সঙ্গে বলুন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই'। বাবার সঙ্গে তাঁরা সবাই সুরে বেসুরে গাইলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' তারপরে গাইলেন, 'রে তাঁতী ভাই একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস'। সকলেই যেন নিজের প্রাণের কথা নিজেরাই কান পেতে শুনতে পেলেন। আরও একটা গান গাইলেন, 'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত। মায়ের ঘি সৈন্ধব মার বাগানের কলার পাত। ভিক্ষার চালে কাজ নাই সে বড় অপমান, মোটা হোক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান, সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।' পরে বাবা বললেন, যেখানেই থাকি, আপনাদের সঙ্গেই আছি। সুখে দুঃখে আমি আপনাদের সঙ্গী। বাবার ভিজে গামছা মাথাতেই শুকিয়ে গেল। বললেন, আপনারা এসেছেন, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করবেন। কেউ না খেয়ে যাবেন না। আজ আমি ক্লান্ত—আপনাদের কাছ থেকে ছুটি নিলাম। এই বলে ঠাকুরেরা যেখানে পূজোর ভোগের রান্না করছিল সেখানে গিয়ে তাদের বললেন, আজ যাঁরা আমার বাড়ীতে এসেছেন তাঁরা কেউ যেন না খেয়ে চলে না যান। ঠাকুমা জেঠিমাদের বললেন—এঁদের যেন যত্ন করে খাওয়ানো হয়। তারপর বাবা বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন।

যতদিন বাবা দেশে থাকতেন, গ্রামের সকলের খোঁজ নিতেন। অন্য গ্রামে গিয়েও প্রজাদের খবর নিতেন। বাবার সঙ্গে প্রজাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছিল না। ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যেন সকলের পরমাত্মীয়। তারাও সুখদুঃখের কথা নিঃসঙ্কোচে বাবার কাছে বলত। এই ভাবেই বাবার পূজোর ক'টা দিন কেটে যেত।

বিজয়াদশমীর দিন বিসর্জনের জন্য দেবী দুর্গাকে নৌকায় তোলা হত। তার আগে তাঁকে বরণ করে নিতেন আমাদের মায়েরা। পিতলের থালায় ধূপ দীপ ধান দূর্ব্বা মিষ্টি পান প্রদীপ দিয়ে দেবীকে বরণ করে নিতেন। আঁচল দিয়ে মায়ের মুখ মুছিয়ে দিতেন, যেন মাটির প্রতিমা নয়—এঁদের বড় আদরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন। বাবা গ্রামের কয়েকটি ছোট ছেলেকে কোন গ্রাম্য কবির এই গানটি শিখিয়েছিলেন, 'সোনার কমল ভাসালে জলে কে রে—মা বুঝি কৈলাস চলেছে।' সকলেরই চোখে জল—এই গান চলেছে আর দেবী দশভূজা মা নৌকা করে খরস্রোতা নদী দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

এইভাবেই দুর্গা পূজো, লক্ষ্মী পূজো কাটিয়ে আমরা আবার নৌকা করেই রাজসাহী অভিমুখে রওনা হতাম। সেই জলপথ, সেই যমুনা, সেই বড়োল নদী, আবার পদ্মা আশ্বিন কার্তিকের পদ্মা কিছুটা শান্ত, গৈরিক-বসনা এখন শুভ্রবেশা খরস্রোতা চঞ্চলা তটিনী, ছলছল করে চলেছে। ঝলমলে নীল আকাশ আর দিগন্ত-বিস্তৃত পদ্মা আমাদের স্তব্ধ, মুগ্ধ করে রাখত। রজনীকান্তের হৃদয়-মন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। নৌকার ছাদে বসে যেন ধ্যানস্থ। তাঁর অন্তর তাঁকে পরিপূর্ণ করে টেনে নিয়ে গেছে সুরে ও সঙ্গীতে। মাঝে মাঝে যেন অন্তরদ্বার খুলে যাচ্ছে—রূপে রসে সেই সঙ্গীত জলে স্থলে নীল আকাশে সবুজ সুষমায় মিলিয়ে যাচ্ছে। 'পীযূষসিঞ্চিত সমীর-চঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল দোলে রে'। আবার লিখছেন —'আর কত দূরে আছ প্রভু প্রেম-পারাবার'। লিখে যাচ্ছেন, গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন। হারমোনিয়াম সঙ্গেই আছে। মাও পাশে বসে কখনো লিখে নিতেন। আমরা মাঝখানে পদ্মার রূপ, আকাশের রূপ, গাছ-পালার রূপ, আবার সবশেষে রজনীকান্তের গানে বিভোর হয়ে বসে থাকতাম। আবার মাঝিরা যখন

বৈঠা বেয়ে গান গেয়ে যেত—সেও যেন অপরূপ লাগত। কোথা দিয়ে রাত কেটে গেছে, ভোর হয়েছে, কোথা দিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, রাত হয়েছে বুঝতে পারতাম না। কিছুই একঘেয়ে লাগত না। আনন্দমনে জলের ওপরে ক'টা দিন কাটিয়ে এসেছি। আবার বাবার সঙ্গে আমরা সব ভাইবোন মিলে গান গেয়ে চলেছি—সে যে একটা কী অনুভূতি বুঝাতে পারব না।

আবার সেই স্কুল, দাদাদের পরীক্ষা, দাদাদের পড়াশুনা পুরো দমে চলল।

বাবার কোর্ট। তারই মাঝে সন্ধ্যায় মজলিশ, গান, কখনো বা সভাসমিতি। এর মধ্যে হঠাৎ স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এল বাংলাদেশকে ভাসাতে এবং তার প্রভাব আমাদের পরিবারেও ছায়া ফেলল। এখানে-ওখানে সর্বত্র সভাসমিতি চলছে, ঐ সময় মনে পড়ে। ভোরবেলায় বাবা পথে পথে খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও থেকেছি, —"আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট, তবু আছি সাতকোটি ভাই, জেগে ওঠো।"

এই গান দিয়েই নগরপরিক্রমা হত। আরও কত নতুন গান গেয়ে চলেছেন ভোরবেলা।

আমাদের গানের সময় অনেকেই পিছনে এসে আমাদের সঙ্গে ধরতেন। এর মধ্যে ছিলেন দেবেন চক্রবর্তী বলে রাজসাহী কলেজের একজন ছাত্র। তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন। কটা সাহেবও আসতেন। শরৎ ব্যানার্জীও আসতেন। খুব সুন্দর গান গাইতেন তিনি।

তাছাড়া আমাদের বাড়ীতেও গানের আসর বসত। সেই সময় সত্যেন দত্তের "কোন্ দেশেতে তরুলতা", রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি বাংলার জল" আর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের "শাসনসংযত কণ্ঠে জননী গাহিতে পারি না গান", এইসব গান আমাদের বাবার সঙ্গে গাইতে হত। "ফুলার করলে হুকুম জারি" এই গানটি বাবা একাই গাইতেন।

এই ভাবেই সুখের স্রোতে ভেসে দিন চলছিল। পরিবেশ একই রকম—সেই কামিনী গাছ, করবী গাছ, শিউলি ফুল, সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যামালতীর লাল-সাদা-হলুদ রূপে উঠোন মনোরম হয়ে উঠত। ঠাকুমার পুজোর জায়গা, মায়ের পানের বাটা; সন্ত স্নান করে, শান্তিপুরী একখানা শাড়ী পরে, মাথার চুলের আগায় গ্রন্থি দিয়ে সিন্দুর পরতেন—এসব আর দেখব না। মনে পড়ে যায়, মা পান খাচ্ছেন, বাবা তাঁর কাছে বসে কথা বলছেন।

আমাদের সে আমলের ছোট-খাটো দু-একটা ঘটনা বলি।

গ্রামের বাড়ীর কথা আগে বলি। আমাদের বাড়ীটা ছিল খুব বড়, চারধারে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। রাত্রে বাড়ীর চারদিকে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত, কোন বেহারা দারোয়ান নয়, আমাদেরই রায়ত বা প্রজারা। তার মধ্যে একজন ছিল ভাদুড়িদাদা। ভাদুড়িদাদা বাড়ীর সবাইকার দেখা-শুনা করত। বাড়ীর কর্তাদের, গিন্নী-দের সকলের কাছে সর্বদা হাজির থাকত। আমাদের যত্নও যেমন নিত তেমনি শাসনও করত। তাছাড়া ঘরে ঘরে বিছানা করা, দেউড়িতে ও ঘরে ঘরে আলো দেওয়া, সমস্ত কাজ করত। যতক্ষণ বৈঠকখানায় ঠাকুরদাদারা ও গ্রামের অন্যান্য লোকেরা থাকতেন, বাবা থাকতেন, রায়ত প্রজারা থাকতেন ততক্ষণ ভাদুড়িদাদা, মধুদাদাকে সেখানেই থাকতে হত। তামাক সেজে দেওয়া, রেকাবীতে সুগন্ধি পান তৈরী করে এনে রাখা, আর টানা-পাখার হাওয়া দেওয়া। পাখার নীচে ঝালর দেওয়া থাকত—বাতাসে ঢেউ-এর মত দুলে উঠত। আর রাত্রে কাজ ছিল—বাড়ীর চারদিকে পাহারা দেওয়া।

একদিন রাত্রে মধুদাদা বন্দুক ঘাড়ে করে বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল পুজোর একখানা বড়ো রূপোর থালা মণ্ডপঘরের বাইরে উঠোনে পড়ে আছে। পুজোর বাসন মধুদাদা ধরবে কি ধরবে না ইতস্ততঃ করে বাড়ীর ভেতরে এসে আমাদের বাড়ীর কর্ত্রী পিসিমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। পিসিমা উঠে এসে বললেন, চল তো কোথায় কি পড়ে আছে দেখে আসি। দেখলেন, সত্যি একখানা

থালা পড়ে আছে; কার ভুলে এটা পড়ে আছে? বললেন, কাল তো থালাটা ধোয়াই হবে মধু, বন্দুকটা দিয়ে থালাটা সরিয়ে দে। মধুদাদা সঙীনের খোঁচা দিয়ে যেই থালা সরাতে গেছে অমনি থালা তো নয় একটা প্রকাণ্ড সাপ—ফোঁস করে ফণা বিস্তার করে মানুষের সমান উঁচু হয়ে উঠল। পিসিমা ততক্ষণে ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছেন আর বলছেন, মধু, মার—মার। মধু সাপ মারবে কি, থতমত খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাপটা ফোঁসফোঁস করছে। যেন এখনই মধুদাদাকে ছোবল দেবে। পিছনে ছিল ভাদুড়ি-দাদা। ভাদুড়িদাদা দৌড়ে এসে তার বন্দুকের গুলি ছুঁড়ল সাপটার দিকে। সাপের মাথায় না লেগে গুলি লাগল সাপটার শরীরের মাঝখানে। সাপটা মরল না বটে, কোমরে চোট লাগায় আর নড়তে পারল না। খালি ফোঁসফোঁস করতে লাগল আর মাটিতে ছোবল দিতে লাগল। পরে লাঠির ঘায়ে মেরে ফেলা হল সেটাকে। এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনে চারদিক থেকে লোক আসতে লাগল। সেন-বাড়ীতে কি হয়েছে। সাপটাকে দেখে সবাই শিউরে উঠল। বাব্বা, এই সাপ কামড়ালে কি রক্ষা ছিল?

সাপের মসৃণ শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে—তার উপরে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছিল—তাতেই মনে হচ্ছিল যেন রূপোর থালা। মধুদাদা সেবার খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়ছে—এটিও মায়ের কাছে শোনা। বললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তখনকার দিনে গ্রামের জমিদার প্রজা জেলে মালি কুমোর কৃষক পরস্পরের প্রতি দুঃখে সুখে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। আমাদের গ্রামে এই জিনিষটা বেশীই ছিল। আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানার ছাদে বেশ বড় একটা জয়ঢাক ছিল। সেটা আমরাও দেখেছি। রাত্রে কি দিনে ঢাকটাতে ঘা দিলে সে আওয়াজ শুনতে পেলেই গ্রামবাসীরা বুঝতে পারত কোন একটা বিপদের সূচনা। তখন তারা দলে দলে আমাদের বাড়ীর সামনের হাটখোলায় এসে জমায়েৎ হ'ত, এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা শুরু হ'ত। একদিন রাত্রে আমাদের বাড়ীর চারদিকে মধুদাদা পাহারা দিচ্ছিল—হঠাৎ ছাদে উঠে দেখতে পেল গাঁয়ের থেকে অনেক দূরে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছে—আর তাদের হাতে মশাল জ্বলছে। মধুদাদা ভয় পেয়ে ছাদ থেকে নেমে এসে আমার ঠাকুরদাদাদের সবাইকে ডেকে উঠাল এবং ছাদে নিয়ে গেল। ঠাকুরদাদা, তাঁর বড়ভাই আমাদের বড় ঠাকুরদাদা আর আমাদের বাড়ীর কর্ত্রী বিধবা পিসিমা সবাই ছাদে এলেন এবং দেখতে পেলেন অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছে ও মশাল জ্বালিয়ে হৈ-চৈ করছে। তখন ভাদুড়ি-দাদারও ডাক পড়ল। ঠাকুরদাদা বললেন, মধু ঢাকে খুব জোরে ঘা লাগাও—আর ভাদুড়ি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ কর। গাঁয়ের সবাই আসুক, একত্র হোক। কারা কি উদ্দেশ্যে এসেছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সাড়া দিয়ে সাবধান করা দরকার। ঢাকের আওয়াজ পেয়ে সমস্ত গ্রাম সচকিত হয়ে উঠল। যার যা অস্ত্র আছে, লাঠি, শড়কি, দা, শাবল, হাতে নিয়ে এসে হাজির হল। পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন তাদের মধ্যে। আর ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ, ঢাকের ডুম ডুম শব্দ, যেন যুদ্ধ এখনই আরম্ভ হবে। তা হ'ল না। মশাল-ধারীরা ক্রমে ক্রমে চলে গেল। যতক্ষণ তাদের দেখা গেল ততক্ষণ বন্দুকের আওয়াজ চলতে লাগল। সব নিঝুম হলে গ্রামের লোক-জনেরা নিশ্চিন্ত হয়ে যার যার ঘরে ফিরে গেল। ঠাকুরদাদারাও বাড়ীর ভিতরে চলে এলেন। পরদিন আমাদের পিয়ন ছুটতে ছুটতে এসে একটি চিরকুট পিসিমার হাতে দিল—গাছের ডালে কাগজে লেখা আছে—আমরা পুঠিয়ার রাজা নরেশ নারায়ণের লাঠিয়াল। কোন কাজে আমাদের এদিকে আসতে হয়েছিল, দেখে গেলাম ভাঙাবাড়ীর বাবুরা কি রকম ভাবে তৈরী আছেন। বিপদে-আপদে তাঁদের অস্ত্র ধারণ করবার ক্ষমতা আছে কি না। চিরকুট পড়ে বাড়ীর কর্তারা নাকি হাসাহাসি করেছিলেন। এই

ভাবেই আমাদের ও আশে-পাশে, গ্রামের নিরাপত্তা-বাহিনী তৈরী হয়েছিল। পরস্পরের প্রতি কত নির্ভয়-শীল ছিলেন এঁরা। সুখদুঃখের সাথী ছিলেন পরস্পরের।

দেশ থেকে আসবার সময় নানা জায়গা ঘুরে আমাদের আবার রাজসাহীতে আখড়ার ঘাটে এসে নৌকা লাগত। সেখানে নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী এসে পৌছাতাম। বাড়ীতে সন্ধ্যামালতী রজনীগন্ধার ঝাড়, টগর ফুলের শুভ্ররূপ আমাদের অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যেত। এতটা পথ নৌকায় এসে আমরা ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম। তারপর থেকে আবার স্কুল-কলেজ, মাষ্টারমশায়ের আগমন। পরীক্ষা এসে গেছে। পড়াশুনার ধুম। বাবার কোর্টও শুরু হল। সঙ্গীতসাধনা অবশ্য সমানভাবেই চলতে লাগল। ভোরবেলা তামাক খাচ্ছেন চোখ বন্ধ করে। তার মধ্যে মনে কি গান এল—তামাক খাওয়া বন্ধ হ'ল—বন্ধ চোখ কিন্তু খুলল না—গুনগুন করে গানের সুর বেজে উঠল। তারপরেই উঠে গিয়ে গানটি লিখলেন, সুর দিলেন, গাইলেন, তবে ঘর থেকে বেরুলেন। কখন যে কি গান, কি কবিতা লিখছেন আমরা বুঝতেও পারতাম না। আর বুঝবার যে খুব চেষ্টা করেছি তাও নয়। যখন হারমোনিয়ামে সুর দিয়ে আস্তে আস্তে গেয়েছেন তখন গানটা শুনেছি ও আমরা শিখেও নিয়েছি। তখন বুঝিনি, তারপরে বুঝেছি, বাবার সুরে বৈচিত্র্য ছিল না—ছিল ভাব, ভাষা, ভক্তির সমন্বয়ে গানের মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য-পরিবেশনকারী সকলের অন্তরকে টেনে নিয়েছিলেন। এই জন্য সমস্ত দেশবাসীর কাছে বাবা ছিলেন অপরিহার্য্য রজনীকান্ত। আমাদের বাড়ী হয়ে উঠেছিল আনন্দ-উজ্জ্বল, সঙ্গীত-মুখর মজলিশ। এই সান্ধ্য মজলিশে শহরের গণ্যমান্য সুধী-জনেরা আসতেন তা আগেই বলেছি। নিত্য-নূতন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মজলিশের উদ্বোধন হত। চাকর-বাকরদের পান-তামাক নিয়ে ছুটোছুটি, আর রাখাল চাকরের পাখা টানা। সেই মজলিশে আমিও থেকেছি, দাদারাও থেকেছেন। দাদাদের পরীক্ষার পড়া বলে তাঁরা বাবার কাছে থাকতে পারতেন না। এই রকম প্রায় রোজই চলত। বৈঠকের শেষে অনেক রাত্রে আসতেন রাজসাহী একাডেমী স্কুলের হেডমাষ্টার গোষ্ঠবাবু। বাবা দাবা খেলতে খুব ভালোবাসতেন আর গোষ্ঠবাবুও খুব দাবা খেলার ভক্ত ছিলেন। রাত্রে আড্ডা ভাঙলে দুজনে বসে দাবা খেলতেন, অনেক রাত পর্য্যন্ত। খেলা ভাঙলে গোষ্ঠবাবু বাড়ী চলে যেতেন, বাবা বাড়ীর ভিতরে আসতেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যেত। ঠাকুর ভৃগুনাথ রাগ করত। ঠাকুমা মা ঠায় বসে থাকতেন। বাবা একটু লজ্জিত হয়ে বলতেন, ইস্, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

কংগ্রেস-স্মৃতি

(দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(১)

গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির অব্যবহিত পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ওয়ার্কিং কমিটী সমুদয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী-গুলিকে অনুরোধ করছে যে তারা যেন তাদের অধীনস্থ জেলা কংগ্রেসগুলিতে কাজ চালাবার জন্য সদস্যদের চাঁদা ছাড়াও অন্যূনপক্ষে গ্রাম প্রতি একটাকা হারে চাঁদা আদায়ের জন্য প্রত্যেক গ্রাম থেকে কমপক্ষে ১০জন করে কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেয়।

ওয়ার্কিং কমিটী আরও সিদ্ধান্ত করছে যে অন্যরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত আদায়ী চাঁদার এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটীর জন্য, এক তৃতীয়াংশ জেলা কংগ্রেস কমিটীর জন্য এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

প্রত্যেক ইউনিয়নে অথবা গ্রামসমষ্টিতে একটি করে কংগ্রেস কমিটী গঠন করার জন্যও ওয়ার্কিং কমিটী নির্দেশ দিচ্ছে।

ওয়ার্কিং কমিটী আরও প্রস্তাব করছে যে সংগঠনমূলক কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করা হোক এবং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া হোক।

১৯২৭ সালের প্রারম্ভে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ দিনের পর দিন জোরদার হতে লাগল। চারমাস পূর্ব্বে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল তার গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। কানপুর, বিহার, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহুলোক সত্যাগ্রহের নেতা সতীন্দ্রনাথ সেন এবং ঢাকা শক্তিমঠের স্বামী জ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে মিলিত হতে লাগল। বারাণসী থেকে স্বামী কমলাপুরী, ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দ, মধুসূদন শর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে বরিশাল পৌঁছুলেন। কারামুক্ত সত্যাগ্রহী শরাফত আলী সত্যাগ্রহের জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বিহারে রওনা হয়ে গেলেন।

জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে জনসভা আহুত হল।

অপরদিকে গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী, কুমারী মীরা বেন, কুমারী যমুনা বাঈ, দেবদাস গান্ধী, মহাদেব দেশাই এবং কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করে অভয় আশ্রম পরিদর্শনের জন্য ৫ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে কুমিল্লা ষ্টেশনে অবতীর্ণ হলেন। হরদয়াল নাগ, কামিনীকুমার দত্ত, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নেতাগণ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কুমিল্লার রেল ষ্টেশন থেকে অভয় আশ্রমের দূরত্ব ছিল তিন মাইল। মহাত্মাজী পদব্রজে সেখানে যাওয়া পছন্দ করলেন।

মহাত্মাজী এই উপলক্ষে নমঃশূদ্রদের একটি গ্রাম পরিদর্শন করলেন। তিনি সেখানে খদ্দর, অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

কুমিল্লা যাওয়ার সময় যখন গোয়ালনন্দ থেকে স্টীমারে মহাত্মাজী দলবলসহ চাঁদপুর পৌঁছান তখন জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করে।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের ভয়াবহ সংবাদে দেশের সর্বত্র উদ্বেগের সঞ্চার হল।

এই সময়ে সি. এফ. এনড্রুজ সাহেব কেপ্ টাউন থেকে ইণ্ডিয়ান ডেইলি মেলে—কেব্ল্ যারা জানালেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান একান্ত আবশ্যক। তিনি মনে করেন যে মার্চ মাসে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর এই চুক্তি সম্পাদিত হবে। ইতিমধ্যে তিনি ডারবানে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সবপ্রকার সাহায্য করবেন।

দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষতের মত হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ এই সময়ে বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করল।

৯ই জানুয়ারী শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের ২৭১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, শিখদের শোভাযাত্রা যখন চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ঐ শোভাযাত্রা মুসলমানরা আক্রমণ করে। এর ফলে কয়েকজন হিন্দু ছুরিকাহত হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৪ টার সময় বরিশাল ধর্ম-রক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে পঞ্চ সহস্রাধিক নাগরিক একটি সরস্বতী মূর্তি নিয়ে বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করে নগর প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। শহর প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যা ৬টার সময় শোভাযাত্রা চক-বাজারে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি মসজিদ ছিল, এই মসজিদকে অতিক্রম করে শোভাযাত্রাকে এগিয়ে যেতে হবে। মসজিদের নিকট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপার, তাঁর সহকারী কর্মচারীগণ এবং বহু সশস্ত্র পুলিশ অপেক্ষা করছিল, শোভাযাত্রাকারীদের মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান বন্ধ করতে বলা হল, তা পালন করতে অস্বীকার করায় তাদের গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হল এবং সকলকে ব্যক্তিগত জামিনে খালাস দেওয়া হল।

ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন সরলচন্দ্র দত্ত এম্. এল্. সি. (অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র), বিখ্যাত নেতা সতীন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অন্যতম প্রধান নেতা শরৎ-চন্দ্র ঘোষ এবং ঢাকার স্বামী জ্ঞানানন্দ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাদের জন্য এই ব্যবস্থা সেই মুসলমান সম্প্রদায় অকুস্থলে অনুপস্থিত ছিল না এবং যাঁরা মসজিদের অভ্যন্তরে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কোন প্রকার বাধা দেননি।

এই প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আনীত মকদ্দমায় সতীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি নেতাদের বিনাশ্রমে ছয় মাস করে জেল হল।

বরিশালের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চরমে উঠল। ভোলায় ১৭ই মার্চ তারিখে রথযাত্রার উৎসব উপলক্ষে এই দাঙ্গায় বহু হিন্দুর দোকান লুণ্ঠিত হয়।

বরিশাল জেলায় পোনাবেলিয়া গ্রামে শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষে পুনরায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল। বিক্ষুব্ধ জনতা ম্যাজিস্ট্রেটকে আক্রমণ করার ফলে পুলিশ গুলি করে ১০ জনকে হত এবং ৪০ জনকে আহত করল।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে লাগল। মে মাসের প্রথম দিকে সুরাটে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রার উপর বহু সংখ্যক মুসলমান লোষ্ট্রক্ষেপণ করায় ফলে বহু হিন্দু জখম হয়।

লাহোরে মুসলমানদের দ্বারা একজন শিখ মহিলার অবমাননার ফলে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল। এই দাঙ্গায় দুজন মুসলমানের মৃত্যু হল। এই উপলক্ষে বার জন শিখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যখন এইরকম গোলমাল চলছে তখন বাংলার কংগ্রেস দলে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ হল। ক্ষমতা গ্রহণ

করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে শাসমল ও সেনগুপ্তের পক্ষদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল। অবশেষে ১১ই ও ১২ই মার্চ তারিখের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটীর একটি রেকিউজিশন সভায় কমিটীর সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর কার্য্যকরা সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস করা হল। ফলে শাসমল মশায় গদিচ্যুত হলেন এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁর স্থলে সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

এদিকে সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের ক্রমবর্ধমান অবনতি দৃষ্টে কর্তৃপক্ষ ১০ই মে তারিখে তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অপসারণের আদেশ দিল কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পরবর্তে প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁকে পাঠানো হল। তার অব্যবহিত পরে ১৬ই মে তারিখে সুভাষচন্দ্রকে কারামুক্ত করা হল।

এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ উকিল এবং উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল। হাওড়া আমতা লাইট রেল যোগে আমরা অধিবেশনে যোগ দিতে যাই। এবার প্রতিনিধি ও দর্শকদের সংখ্যা অন্যান্যবারের চেয়ে কম ছিল।

(২)

এই পরিস্থিতিতে ১৫ই মে বোম্বাই শহরে ওয়ার্কিং কমিটীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। কমিটী মুসলমানদের প্রস্তাব সম্বন্ধে সাব-কমিটীর রিপোর্ট আলোচনা করে যৌথ ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন সম্বন্ধে মুসলমানদের প্রস্তাব গ্রহণ করার সুপারিশ অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট দাখিল করার জন্য একটি প্রস্তাবের মুসাবিদা করল।

বোম্বাই প্রদেশ থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটী অভিমত প্রকাশ করল যে, কংগ্রেস সকল সময়েই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের স্বপক্ষে—সুতরাং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি নেই।

সেই দিনই সভাপতি এস্. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হল।

প্রথমেই সভাপতি মশায় মহাত্মা গান্ধী যাতে শীঘ্র ব্যাধমুক্ত হয়ে ভারতের এবং জগতের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তজ্জন্য প্রার্থনা করে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

তারপর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করলেন—

(১) ভবিষ্যতের যে কোন সংবিধানের পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিধান-সভাগুলির প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশে ও কেন্দ্রে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে।

(২) দুটি মহান্ সম্প্রদায়কে বর্তমান বিধান-সভাগুলিতে তাদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং বাঞ্ছনীয় মনে হলে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে যৌথ নির্বাচনের আসনগুলি সংরক্ষিত করা হবে। প্রকাশ থাকে যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুকূলে এইরূপ সুবিধা দেওয়া হবে যাতে তারা কোন প্রদেশে বা প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে যে সংখ্যক আসনের অধিকারী তদপেক্ষা বেশী আসন পেতে পারে এবং এই অনুপাত কেন্দ্রীয় বিধান-সভার নির্বাচন ক্ষেত্রেও রক্ষিত হবে।

(৩) (ক) অন্যান্য প্রদেশগুলির ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য মুসলমান নেতাদের প্রস্তাব এই কমিটীর মতে উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত।

(৩) (খ) বম্বে প্রেসিডেন্সী থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেসের সংবিধানে ইতিপূর্বেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের নীতিতে গৃহীত হয়েছে এবং কমিটি এই মত প্রকাশ করছে যে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হোক।

(৪) ভবিষ্যতের সংবিধানে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক বিধান-সভাগুলির বিশ্বাসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা থাকবে না। বিশ্বাসের স্বাধীনতা হচ্ছে ধর্ম্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা। ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান ও মিলনের স্বাধীনতা এবং অন্যের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রচার কার্য্যের স্বাধীনতা।

(৫) আন্তঃসাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কোন বিল, প্রস্তাব বা কোন সংশোধনীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে যদি বিধান-সভায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সভ্য আপত্তি করে তাহলে তা উত্থাপন, আলোচনা বা পাস করা চলবে না। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিষয় হচ্ছে বিধান-সভার প্রত্যেক অধিবেশনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট হিন্দু-মুসলমান সদস্যগণ যে যৌথ কমিটী গঠন করবে সেই কমিটী কর্ত্তৃক স্বীকৃত বিষয়।

আলোচনান্তে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাবও উপস্থাপিত করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটীর রিপোর্ট এবং তন্নিহিত সুপারিশগুলি অনুমোদন ও গ্রহণ করছে এবং উক্ত সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করতে সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানাচ্ছে।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

অক্রের বিশ্বনাথম একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে মুসলমানদের দিল্লী প্রস্তাবের প্রশংসামাত্র করা হয়েছে এবং যৌথ নির্বাচন এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন সম্বন্ধে নীতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ভারতের স্বরাজের সংবিধানে এই নীতিগুলি সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

নিম্বকর মশায় সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলে কয়েকজন সদস্য তাঁর খদ্দর পরিধান না করার জন্য আপত্তি করলেন। নিম্বকর মশায় জানালেন যে সভাপতি মশায় তাঁকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

ডাঃ আনসারী মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর এল্. সি. দাস মশায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন। তাতে বলা হয়েছে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন সম্বন্ধে কংগ্রেস কোন মত প্রকাশ না করায় এই কমিটী সে-সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকুক।

সংশোধনী প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হল।

তারপর এস্. সত্যমূর্ত্তি মশায় মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর এম্. আর. জয়াকর মশায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তাতে মূল প্রস্তাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে শাসন-সংস্কারের প্রবর্তনের প্রস্তাবের পরে অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ের সংস্কারের কথা যুক্ত করতে বলা হয়েছে এবং সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যখন ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র দেশ পুনর্গঠিত হবে সেইসময় সম্পূর্ণ পরিকল্পনার অংশরূপে তা কার্য্যকর করা কর্তব্য।

সংশোধনী প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হওয়ার তখনকার মত কমিটীর অধিবেশন শেষ হল। সভা অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

বিকালে পুনরায় কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হলে সভাপতি মশায় সদস্যমণ্ডলীর হর্ষধ্বনির মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তির কথা ঘোষণা করলেন।

তারপর প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হল।

আরও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত হল।

বালুস্থ শাম্বমূর্ত্তি মশায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনা স্থগিত রাখতে বললেন।

ডাঃ পট্টভী সীতারামায়া এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা সফী দাউদী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মৌলানা শওকত আলী মূল প্রস্তাব সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন।

জিন্না সাহেব একটি টেলিগ্রাম দ্বারা মুসলমানদের দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণ করতে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে অনুরোধ করেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত মহোদয়াও অনুরূপ অনুরোধ করে টেলিগ্রাম করেন।

সুদীর্ঘকাল আলোচনার পর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

ক্রমশঃ

বঙ্কিমচন্দ্র

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যর্থ। জয় ফিরিঙ্গীর।
জয় জয় পশ্চিমের 'টেক্‌নলজি'র।
বিজেতার জয়গানে মুখর আকাশ।
ভেঙে যায় স্বদেশের ঐতিহ্যে বিশ্বাস।
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি—সবই অপাংক্তেয়—
এই ঘৃণ্য মনোভাব সেদিন পাথেয়
ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের। সেই রাত্রিকালে
রণতূর্য হাতে তুমি এলে চক্রবালে।
কম্বুকণ্ঠে যুগ-বাণী কালপুরুষের।
জিজ্ঞাসিলে, 'কারে বলো শ্রীবৃদ্ধি দেশের?
তুমি আমি কয়জন? গরিষ্ঠ সংখ্যায়
ঐ যারা চাষী—ওরা আধপেটা খায়।'
সেদিন একক তুমি ঋষি চক্ষুষ্মান্
বৈদেশিক শাসনেরে দাওনি সম্মান।

জন্মাষ্টমী

দিলীপকুমার রায়

তুমি বিমুখ হ'লে বলো মুখ চেয়ে কার থাকব?
তুমি শরণ না দিলে কার চরণে প্রাণ রাখব?
না না—যখন তোমার বাঁশি
শুনে আমার মন উদাসী,
তোমার জাগরণী গানেই আনন্দে নাথ জাগব।
তোমার মলয় দোলেই তোমার প্রণয় পরাগ মাখব।

গাই যেমনি: "এসো আরো কাছে হে প্রেমসিন্ধু!"—
শঙ্খে তোমার নাচে আমার প্রতি রক্তবিন্দু।
জানিয়ে দিলে যখন তুমি—
কালোই আলোর জন্মভূমি,
অভয় তোমার বাজবেই—যেই সুর আমি তার সাধব,
প্রতিপদেই তোমার স্বপন-বরণমালা গাঁথব।

বাহিরের ডাক

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

দেবালয়ে স্থান লয়ে তুই
থাকবি কত পড়ে
বাহির তোকে ডাকছে ওরে
আর নয় সে অনাদরে।
নিজের মাঝে থাকতে ডুবে
এ-বাসনায় অন্ধকারে,
চারিদিকের উতোরলে
আর রোসনা বসে ঘরে।
চোখ মেলে কি তাকাবি না
লজ্জা আছে ভয়ে,
কাট্‌বি যদি, ফাটা এবার
তূর্য্যনাদে ঝরে।
কাটবে সকল যত নকল
আর জড়তায় নারে
ভুলতে যদি চাস্ এবার
থাকিস্ না আর পড়ে।

॥ ২ ॥

পথের পারে ডাক দিয়েছে
থাকা আমার দায়,
বাহির পানে ছুটে ত্বরা
যাবি কিনা আয়,
পথ সে চেনা হবে জানা
ডাক এসেছে পায়,
কি যে ফেলে রাখব কাছে
আমার বাসনায়।
অন্ধকারে, রুদ্ধদ্বারে
যা বা ফিরে যায়,
গৃহের পানে অভিমানে
বৃথা খুঁজে হায়।
আসবে কভু নূতন তবু
আসবে পথের ছায়,
যাকনা চলে যা'বা যাবার
ঘোচে আমার দায়।

॥ ৩ ॥

অসময়ে ক্লান্তি যেন
ভ্রান্তি নাহি আনে
চলার বেগে গেছি আগে
পিছন না আর মেনে।
ছিঁড়ে গেছে সূতোর বাঁধন
আর লাগেনি জোড়া,
জানি না তো সেকি কভু
দেবে না আর ধরা।
বেঁধেছিলেম একে একে
এমন গানের ছড়া,
বুঝতে সময় নিলেম এত
আর হল না গড়া।
হালকা মেঘের বুকের মাঝে
নীল আকাশের পানে,
চলার বেগে গেছি আগে
পিছন না আর মেনে।

॥ ৪ ॥

পারের বাঁশী বাজল বলে
যে যার ঘরে থাক্‌না,
হয়তো এমন আসবে নাকো
মেলে জীবন পাখনা।
নদীর ধারে সারে সারে
উঠল দূরে ডাক্‌না,
গোঠের রাখাল ফেরার পানে
উঠল বেজে দিক না।
শ্রান্তি ল'য়ে এল এ-দিন
মিলিয়ে গেল বাজনা,
মনের মাঝে জুটল এসে
বুঝি সে'ত কাজনা।
পারের কড়ি ফুরিয়ে গেছে
সঙ্গী-স্বজন সাজনা,
বাকী আছে লাজ-আভরণ
যাক্‌ সে মুছে যাক্‌না।

আমার সুখ

মনোরমা সিংহরায়

আমার সুখ কোথায় তুমি
কোথায় তোমায় পাই।
আমার সুখ যখন পাই
নাই তো রাখার ঠাঁই॥

আধি ব্যাধির ধুলার থাকে
আকাশ ভরা আলো।
যখন দেখি তখন যেন
সবায় বাসি ভালো॥

কে সে আপন খুঁজে বেড়াই
চোখের জল ঝরে।
আমার সুখ থাকো তখন
সারা হৃদয় ভরে—॥

জলসার ঘর

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

জীবনের ভালবাসা জলসার ঘরে
তুমি আছ, আমি আছি বহু নাম ধরে
আমাদের রূপ—সদা গতিমান নদী
সময়ের স্রোতে রঙ খেলে নিরবধি।

বিরহের সুরে গাঁথি' মিলনের রাখী
হাসি, কাঁদি স্নেহ-সুখ সুরভির পাখি।
যত পাই আরও চাই, দেখি সারাবেলা
প্রজাপতি ফুলেদের উৎসব মেলা।

আকাশের তারাদের আছে প্রেম-প্রীতি
মেঘ, চাঁদ লুকোচুরি খেলে তাই নিতি।
মা-মাটির বুকে মধু, সবুজের সোনা
জলসার ঘরে তুমি কেন আনমনা?

সঙ্কশস্য

জাপানে অল্প সময়ের জন্য স্ত্রী-মজদুর নিয়োগ

ওসাকার কানসাই জেলার কর্ম্মী নিয়োগকর্ত্তা সংঘের দ্বারা পরিচালিত একটি অনুসন্ধানের ফল মে ১৯১২-এ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহা মূলতঃ স্ত্রীলোকদিগকে কারখানায় পূর্ণকাল হইতে কম সময়ের জন্য কর্ম্মে নিয়োগ করা লইয়াই হইয়াছে। ২৭টি কোম্পানী অনুসন্ধানে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই সকল কোম্পানীর শতকরা ৬০টি কোম্পানী অল্প সময়ের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ঐ সকল কারখানার সকল কর্ম্মীর সংখ্যার অনুপাতে ঐ ভাবে নিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা একশত জনের মধ্যে এক জনের অধিক কিন্তু পাঁচ-জনের অপেক্ষা কম। মোট কর্ম্মীসংখ্যা যত অধিক ঐ জাতীয় স্ত্রীলোক কর্ম্মীর শককরা ভাগ ততই কম হইতে দেখা যায়। এই সকল স্ত্রীলোক-কর্ম্মীদিগকে জোগাড় করা হয় বিজ্ঞাপনের সাহায্যে অথবা পরিচিত ব্যক্তি-দিগের সহায়তায়।

বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানীগুলির শতকরা নব্বইটিতে, মাঝারী কোম্পানীগুলির শতকরা ষাটটিতে এবং ক্ষুদ্রাকার কোম্পানীগুলির শতকরা তেতাল্লিশটিতে এইরূপ কম সময়ের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মীদিগকে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য রাখা হয়। এই সকল কর্ম্মীগন পূর্ণকাল কার্য্য যাহারা করে তাহাদিগের অপেক্ষা দৈনিক এক বা দুই ঘণ্টা অল্প সময় কাজ করে। ইহারা দৈনিক পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কাজ করে। যে সকল কোম্পানী এই জাতীয় কর্ম্মী নিয়োগ করে তাহাদের মধ্যে বৃহৎ কোম্পানীর শতকরা ৭০টি কোম্পানী ঐ কর্ম্মীদিগকে এক বৎসরের অধিক কাজ করিলে বেতন সমেত বাৎসরিক ছুটি দিয়া থাকেন। মাঝারীগুলির শতকরা ৫৮টী ও ক্ষুদ্রগুলির শতকরা ৪২টি ঐ রূপ ছুটি ধার্য্য করেন। ১০৫টি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৫টি কোম্পানীর ইউনিয়নে এই সকল অল্প সময়ের স্ত্রী-কর্ম্মীগণ সভ্য হইতে পারেন।

অল্প সময়ের কার্যের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মীগণকে মাহিনা দেওয়া হয় ঘণ্টা হিসাবে। তাহারা অপর কর্ম্মীদিগের প্রাপ্য নানা প্রকার বিশেষ ভাতা পাইয়া থাকেন। শুধু অবসর গ্রহণ করিবার পরে যাহা দেওয়া হয় তাহাই তাহাদের দেওয়া হয় না।

বৃহৎ ও মাঝারী আকারের কোম্পানীগুলিতে অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে এই ভাবে বেকারী, অসুস্থতা, মাতৃত্ব, বার্দ্ধক্য, অকর্ম্মণ্যতা বা মৃত্যু ঘটিলে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল কর্ম্মীর শিশু সন্তান আছে তাহাদের সন্তানাদি দেখিবার ব্যবস্থার "খেলাঘর" বা ক্রেশ" ১১১ টি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র চারটিতে আছে।

অল্প সময়ের কর্ম্মীদিগের নিয়মিত কাজে আসা না আসা লইয়া শতকরা পঞ্চাশটি কোম্পানীর কোনও অভিযোগ নাই। শতকরা চল্লিশটি কোম্পানীর মতে ঐ কর্ম্মীদিগের সময়-জ্ঞান যথাযথ নহে। অনেক সময়েই তাঁহারা কাজে আসেন না বা বিলম্বে আসেন। এই

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

প ত্র স্মৃ তি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মূল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৮ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩৫০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

—পত্রস্মৃতি সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পত্র—

২৩ রজনী, সেন রোড
কলকাতা ২৬
১৩. ১০. ৭১

প্রীতিভাজনেষু,

...আপনার বই পড়তে সুরু ক'রে সাধ্য কী একটি লাইন থেকেও মন স্খলিত হয়। পরিচয়ের কী বিরাট পরিধিতে আপনি আপনার হৃদয়ের সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ করেছেন। সুখে দুঃখে মেশানো কত বিচিত্র তথ্য আর কী স্নিগ্ধসুন্দর প্রীতিপূর্ণ পরিহাস। পড়ছি আর আপশোস হচ্ছে প্রথম বয়সে কেন আপনার সন্নিহিত হইনি। হলে আর যাই না হোক, আপনার হাতে হয়তো উজ্জ্বল একটা ছবি হতে পারতাম। সেই সজীব বয়সের ফোটোতে একটি দীপ্তকণ্ঠও অবিনশ্বর হয়ে থাকত। আপনি সুন্দর লিখেছেন: 'মানুষের জীবনের ও চেহারার হ্রাসবিকাশ যেন একটি নিশ্বাসের ব্যাপার।'...

আপনার
অচিন্ত্যকুমার

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯)

স্মৃতি সাহিত্যে পত্রস্মৃতি এক অভিনব সৃষ্টি। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যে সব চিঠি পেয়েছেন তাদের কেন্দ্র করে কতকগুলি উপভোগ্য স্মৃতিচিত্র রচনা করেছেন লেখক। এই সব চিত্রে পরিবেশ কোথাও কৌতুকের, কোথাও বৈদগ্ধ্যের, কোথাও বা সাহিত্যরসের।...পরিমলবাবু চিঠিপত্র সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। পত্রচারীর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্ভাসিত করাই তাঁর লক্ষ্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে এক-একটি চাবির মতো লেখকের স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। পাঠক তাঁর সঙ্গে পশ্চাতে তাকিয়ে নিজেও স্মৃতিচারণার অংশীদার হয়ে পড়েন।...বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁদের কোনো দান আছে তাঁদের অনেকেই কোনো না কোনো রূপে পত্রস্মৃতিতে উপস্থিত আছেন। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার টুকরো টুকরো পরিচয় পাওয়া যাবে পত্রস্মৃতিতে, একালের পাঠক অনেক নতুন তথ্য পাবেন।

পরিবেশক : রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

সকল কোম্পানীর মধ্যে শতকরা ৬০টি ঐ জাতীয় কর্মী নিয়োগ একভাবে করিতেই থাকিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শতকরা ৩০টি কোম্পানীর ইচ্ছা আরও অধিক সংখ্যায় ঐরূপ কর্মী রাখেন এবং শতকরা ১০টি কোম্পানী ঐরূপ কর্মীর সংখ্যা হ্রাস করিতে ইচ্ছুক।

কনসটান্টি আন্দ্রেজেই কুলকা

১৯৬৬ খৃঃ অব্দের মিউনিখে পরিচালিত আন্তর্জাতিক বেহালা প্রতিযোগিতার ফল যখন বাহির হইল তখনই ১৯ বৎসর বয়স্ক বেহালা-বাদক কনস্টান্টি আন্দ্রেজেই কুলকাকে ইয়োরোপের বহু আয়োজনকারী "শো" ব্যবসায়ীগন ঘিরিয়া ধরিলেন। ইঁহারা কুলকাকে নানা স্থানে বাজাইবার জন্য নিযুক্ত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ কুলকা প্রতিযোগিতায় যে ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বকার বিজেতাদিগের তুলনায় অধিক শক্তির পরিচায়ক হইয়াছিল। পশ্চিম জার্মানীর সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে "বেহালা বাদক নূতন 'তারকা'" "অভাবনীয় শক্তিশালী বেহালা বাদক", "পোল্যাণ্ডের নূতন বেহালা ক্ষেত্রের আবিষ্কার" ইত্যাদি খবর বাহির হইতে থাকে ও তিনি খ্যাতির পথে সহজেই অগ্রে গিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হ'ন।

কুড়ি বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই কুলকা বেহালা বাদক হিসাবে নাম করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি লুসার্ণ, মনট্রিয়ল, লণ্ডন, বার্লিন ও মাদ্রিদে বেহালা বাজাইতে গমন করেন। আরও অনেক নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল কিন্তু কুলকা সেগুলি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, তিনি গ্দানস্ক-এর সঙ্গীত আকাডেমির উপাধি প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত ছিলেন ও তাহা পাওয়াই সেই সময়ে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কুলকা বাল্যকালে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রথমতঃ পিয়ানো শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্থির হয় কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি যখন নয় বৎসর বয়স্ক বালক তখন তিনি রেডিওতে নানা প্রকার সঙ্গীত বাদ্য শ্রবণ করিতেন। তিনি স্থির করিলেন যে বেহালা শিক্ষা করিবেন ও পরে সাত বৎসরে যাহা শিখিবার কথা তাহা পাঁচ বৎসরে সম্পূর্ণ করিলেন। তাঁহার শিক্ষক তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে স্টেফান হারমান নামক অধ্যাপকের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। ইনি ছিলেন গ্দানস্ক সঙ্গীত আকাডেমির অধ্যাপক ও ইনিই কুলকাকে পরে সকল শিক্ষা দান করেন।

প্রথমত তাঁহার বিজয় গৌরব লাভ সহজ হয় নাই। বহু প্রতিযোগিতাতে তিনি উচ্চে স্থান পাইতে সক্ষম হ'ন নাই। পোলাণ্ডের যুবজনের প্রতিযোগিতাতেও তিনি অনেক সময় নিচে স্থাপিত হইতেন। জেনোয়ার এক প্রতিযোগিতাতেও তিনি উচ্চে স্থান পান নাই যদিও অনেক সমালোচক ও জুরিগণও বলেন যে তিনি পাগানিনির কনসার্ট খুবই ভাল বাজাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পূর্ণ সক্ষমতা হয় মিউনিখের প্রতিযোগিতায়।

মিউনিখের একটি সংবাদপত্র লেখেন, "একজন অতি প্রতিভাবান্ বেহালা-বাদক পোলাণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।...আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। আমরা পৃথিবীর উচ্চ স্তরের বাদকদিগের বহু বাজনা শুনিয়া থাকি। কিন্তু কনস্টান্টি আন্দ্রেজেই কুলকা নিজের জন্য একটি একান্ত নিজস্ব স্তর গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি অভাবনীয়। তিনি সকল বিচারের রীতিনীতির উর্দ্ধে ও কনসার্ট হলের মাপকাটিতে তাঁহাকে মাপা সম্ভব হয় না। তাঁর আত্মনির্ভর অপরূপ এবং বাদ্য-কৌশলের কথা তাঁহাকে লইয়া ওঠান চলেই না। তাঁহার বাজান এরূপ যে তাহাতে জ্ঞান, কৌশল ও বিস্তার আলোচনা উঠান চলে না। তিনি যাহাই বাজান না কেন, তাহার বিস্তার অনন্ত ও সুরসৃষ্টি বহু অজানাকে আলোক উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। সুরের উচ্চারণ নিভুল ও নির্দ্দোষ।"

মিউনিখের প্রতিযোগিতার পরে শুধু যে বাজনার আয়োজন-কর্তারাই কুলকার নিকট গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাই নহে; বহু সঙ্গীত-বাদ্য-জগতের জ্ঞানী-গুণীরাও তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায়

জাহাজের খোলের মধ্যে ফেলতে হবে। প্লাষ্টিকের ফেনা সম্প্রসারিত হয়ে খুব জোরদার এক প্লবতার সৃষ্টি করবে, ফলে ডোবা জাহাজটি জলের ওপরে ভেসে উঠবে।

বিগত দুই দশক যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্লাষ্টিকের উৎপাদন প্রচুর বেড়ে গেছে। ১৯৫০ সালে ২১০ কোটি পাউণ্ড (প্রায় ৯৫ কোটি কিলোগ্রাম) প্লাষ্টিক উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৬৭ সালে এই উৎপাদন সাতগুণ বেড়ে গিয়ে ১৪৫০ কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৬৫০ কোটি কিলোগ্রাম হয়।

আমেরিকায় বর্তমানে প্রায় ৬ হাজারটি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে প্লাষ্টিক শিল্পের শুভযাত্রা শুরু হয়। হাতির দাঁত দিয়ে আগে বিলিয়ার্ড খেলার বল তৈরি হত। ১৮৬৮ সালে জন ওয়েসলি হায়াট ঐ বল তৈরির জন্য সেলুলয়েড আবিষ্কার করেন। তুলা, কর্পূর আর নাইট্রিক এ্যাসিডের সংমিশ্রণে এই সেলুলয়েড তৈরি হয়েছিল। এ থেকে খুব সুন্দর বিলিয়ার্ড বল তৈরি হল। তাছাড়া, সেলুলয়েড থেকে প্রস্তুত হত ভাল ভাল নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যেমন, জামার কলার, কৃত্রিম দাঁত আর চলচিত্রের ফিল্ম। গোড়ার দিকে এ দিয়ে মোটরগাড়ির জানালার পর্দাও তৈরি হত। ১৯০৯ সালে ডঃ লিও এইচ বীবল্যাণ্ড ফেনল ও ফর্মালডিহাইডের সঙ্গে একটা নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথম ফেনলিক প্লাষ্টিক তৈরি করেন। এটা একটা কঠিন, অনমনীয় আর মজবুত পদার্থ। তিনি এর নাম দেন বেকলাইট। টেলিফোন, দেয়াল ঘড়ি, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির হাতল আর রেস্তোরাঁর টেবিলের ওপরে এর ব্যাপক ব্যবহার হতে লাগল।

আধুনিক প্লাষ্টিক শিল্পের কাজ আসলে শুরু হয় ১৯৩০ সাল থেকে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে যে হাজারো রকমের হাইড্রোকার্বণের মিশ্রণ প্রভৃতি রয়েছে সেগুলি দিয়ে অনেক নতুন নতুন পদার্থ তৈরি করা যায়। এইভাবে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্ম হল। বর্তমানে প্রতি

একশো পিপা তেল থেকে প্রায় চার পিপা পেট্রোকেমিক্যাল উৎপন্ন হয়। আর ৩০ শতাংশ পেট্রোকেমিক্যাল প্লাষ্টিকে রূপান্তরিত হয়। আজকাল অবশ্য কিছু কিছু প্লাষ্টিক সেলুলোজ থেকে অথবা কয়লা ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য থেকেও উৎপন্ন হয়, তবে ৮৯ শতাংশ প্লাষ্টিকই পাওয়া যায় পেট্রোকেমিক্যাল থেকে।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির অমূল্য সম্পদ কর্ণিয়া আজকাল প্লাষ্টিকে তৈরি হচ্ছে। কৃত্রিম কর্ণিয়ার এই ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে। একজন প্রখ্যাত চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হলে বিশ্বের অন্ধত্ব ১৫ শতাংশ বিদূরিত হবে।

প্লাষ্টিকের এই চমকপ্রদ প্রয়োগ কেবলমাত্র চিকিৎসা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিসীম। চন্দ্রলোকে ঐতিহাসিক বিজয়-যাত্রার পর অ্যাপোলো ৮-এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁদের মহাকাশ-যানটি ২০ হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট (১১ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রা থেকে রক্ষা পেল একটি তাপরোধকারী বর্মের সাহায্যে। এই বর্মটি ফেনোলিকপূর্ণ মৌচাক আকৃতির একটি বস্তু দ্বারা আবৃত।

শেষ পর্যন্ত আমরা কত কাজে যে প্লাষ্টিক ব্যবহার করব তার কোনও লেখাজোখা নেই। দিন দিনই নানা নতুন নতুন ধারণা নানা জনের মাথা থেকে বেরুচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে যে প্লাষ্টিকের প্রদর্শনী হয়েছে তাতে এসব অনেক কিছু দেখানো হয়েছিল। বাতাস দিয়ে ফোলানো যায় এরকম চেয়ার-টেবিল, পরীক্ষামূলক ফোমের বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি নানা জিনিস ঐ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীর একদিকে দেখানো হয়েছিল শ্রীমতী ফ্রেডা কোরিকের ভাস্কর্য নিদর্শন। ২৫ বছর যাবৎ তিনি প্লাষ্টিকের ভাস্কর্য নিয়ে একান্তভাবে কাজ করে গেছেন।

শ্রীমতী কোরিক প্লাষ্টিকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে অনেক আশাব্যঞ্জক কথা বলেছেন। এই শিল্পের মুখপাত্ররা বলেছেন মানব সভ্যতা প্লাষ্টিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আগামী দিনের পূর্বাভাসে তাঁরা বলেছেন প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগের মত প্লাষ্টিক যুগও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দেশ-বিদেশের কথা

পাপাদোপুলসের একাধিপত্য

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জুলিয়াস সিজার যখন রোম সাম্রাজ্যের একনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হ'ন, তিনি তখন রাষ্ট্রীয় বন্দিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করিতেন এবং বন্দিদিগকে শারীরিক নির্য্যাতন করাও নিবারণ করিবার আদেশ দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল জগতের মানুষকে দেখান যে তিনি কত সদয় ও জনমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেশ-শাসক ছিলেন। বর্ত্তমানে জর্জ্জ পাপাদোপুলস গ্রীসের সর্ব্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে তোপ-সৈন্যের কর্ণেল ছিলেন এবং ১৯৬৭ খৃঃ অব্দ হইতে অ্যাথেন্সের হর্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া আছেন। ইনি ঠিক জুলিয়াস সিজারের সহিত তুলনীয় না হইলেও শতকরা ৭৮·৪ ভোটে একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ইঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় তাঁহার মনে সিজারের অনুসরণ আগ্রহ কোথাও অর্দ্ধসুপ্ত ভাবে উপস্থিত আছে। পাপাদোপুলস এখন আট বৎসর গ্রীসের একাধিকারী থাকিবেন। চুয়ান্ন বৎসর বয়স্ক এই গ্রীক রাষ্ট্রপতি রাজশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই সিজারের ঢংএ চাল চালিয়া সমালোচকদিগকে অবাক করিয়া দিয়াছেন। তিনি ৩৩০ জন রাষ্ট্রীয় বন্দিকে মুক্তিদান করিয়াছেন—এমন কি তাঁহাকেই হত্যা চেষ্টা করিয়াছিলেন যে পানাগুলিস তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র তিনি "পূর্ণ সাধারণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীসের জনসাধারণকে নিজের অন্তরের বাসনা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রীয় দলগুলির অধিকার ইত্যাদি বহু কথাই তিনি তুলিয়াছেন এবং ১৯৭৪ খৃঃ অব্দে নির্ব্বাচন ব্যবস্থার আয়োজনও তাঁহার হুকুমে হইবে—বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান অক্টোবর মাসে একজন প্রধান মন্ত্রী শাসন কার্য্য চালনা করিতে আরম্ভ করিবেন ও তিনিই নির্ব্বাচন কার্য্য কি ভাবে হইবে স্থির করিবেন।

পাপাদোপুলসের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ বিশ্বাস নাই। তাঁহার সমালোচকগণ মনে করেন তিনি যথেচ্ছাচারী ও তাঁহার যথেচ্ছাচার এখনও চলিতেই থাকিবে। বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্ণেল অ্যানাস্টাসিয়স মিনিস কারাগারে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়া এখন মুক্তিলাভ করিয়া বলিয়াছেন যে, পাপাদোপুলস প্রয়োজন বোধ করিলেই পুনর্ব্বার সকলকে জেলে বন্ধ করিতে কোনও দ্বিধা করিবেন না।

কিন্তু বন্দিদিগকে মুক্তিদান কার্য্য যে ভাবে করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জাগাইবারই চেষ্টা হইয়াছে যে পাপাদোপুলস কোনও মিথ্যার অভিনয় করিতেছেন না। প্যানাগুলিসকে যখন ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন সেখানে খ্যাতনামা কোন কোন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্যানাগুলিস কারাগারের বাহিরে আসিয়া নিজের মাতার আলিঙ্গনবদ্ধ হইবার পরে নিজের আইনজ্ঞ বন্ধুকে বলেন, "আমি অনুতপ্ত নহি। আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমার কোনও লজ্জা নাই।" তিনি নিজের পরিধেয় কুর্ত্তা তুলিয়া সকলকে অঙ্গের একটা দীর্ঘ আঘাতের দাগ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন তাঁহার নির্য্যাতক তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিবার সময় বলে "তোমার দেহের চর্ম্ম ছাড়াইয়া লওয়া হইবে।" পাপাদোপুলস আদালতে দৌড়ান হইতে বাঁচিবার জন্য সমাসীন সকল রাষ্ট্রীয় বন্দিদিগকে

মুক্ত দেয়া দিলেন ও সেই সঙ্গে যে সকল পুলিশ ও কারাকর্মচারীদিগের নামে অত্যাচার ও নির্য্যাতনের অভিযোগ উঠিতে পারে সকলকে অভিযোগের পূর্ব্ব হইতেই অভিযোগমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া রাখিলেন। গ্লানাওলিস একটি পুস্তক লিখিবেন মনস্থ করিয়াছেন। উহার নাম হইবে "নোংরা কুকুর" নয়ত "নির্ব্বোধ কর্ণেল"। তিনি খুবই গরম গরম কথা বলিতেছিলেন। অন্যান্য বন্দিগণ ততটা মুক্তকণ্ঠে কিছু বলিতেছিলেন না কিন্তু মুক্তির জন্য কোনও কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক কথাও কাহারও মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই।

পাপাদোপুলস-রাজ যে বিপরীত পক্ষের রাষ্ট্রকর্মীদিগকে বৈপরীত্যের জন্য সুযোগদান করিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহার রাজশক্তি একাধিপত্যেই বিশেষ করিয়া সুনিবিষ্ট। তিনি আইনতঃ তিন মাস অবধি সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। "সিডিশন" করিলেন তাহার চূড়ান্ত শাস্তির ব্যবস্থা, ছাপাখানার উপর জবরদস্ত নিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং ছাত্র দমন ব্যবস্থাও কঠোর। লণ্ডনে এক নারী সমালোচক বলেন, "আমাদের মুক্তিদান করিয়া নিজে দোষমুক্ত হওয়া যায় না। শকুনি কখনও নিরামিষাশী হয় না।"

ভারত সোভিয়েট ঘনিষ্ঠতা

সোভিয়েট ল্যাণ্ড পত্রিকার নিকট শ্রীযোগজীবন রায় যে মতামত জ্ঞাপন করেন তাহাতে তিনি বলেন যে ভারত সোভিয়েট সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে ভারতের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযোগজীবন রায় পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত সোভিয়েট মিতালির মূল্য বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি মস্কোতেও গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে বিগত কুড়ি বৎসরে এই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বহু বিষয়েই দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গী এক রকমই হইতে দেখা যাইতেছে। তিনি একথার প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং শান্তিপ্রিয়তাবে সকল জাতির একত্র বাসের আদর্শ সংরক্ষণের জন্য সকলের জাতীয়তা, রাজত্বের সীমানাদি একভাবে রাখিয়া চলাও বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করেন।

এই সম্পর্কে ৯ই আগষ্ট ১৯৭১ এর ভারত সোভিয়েট সন্ধির প্রশংসা করিয়া শ্রীযোগজীবন রায় বলিলেন যে ঐ সন্ধি দুইদেশের পারস্পরিক সম্বন্ধ আরও জোরালভাবে ঘনিষ্ঠতর করিয়াছে। ঐ সন্ধি শুধু দুই জাতির বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তরই করে নাই, উহা দ্বারা দুইজাতির বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টা এবং সকল জাতির মধ্যে বিবাদ-কলহের অবসান ঘটাইবার আগ্রহ আরো বিশেষ করিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীযোগজীবন রায় বলেন যে ঐ সন্ধি এমন একটা সময়ে স্থাপিত হয় যখন ভারতের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

খুবই একটা বিপদ্‌জনক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের দেশে তখন বাংলা দেশ হইতে এক কোটি উদ্বাস্তু ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান আমাদের উপর পূর্ণ ও প্রবলতর ভাবে সামরিক আক্রমণ চালাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছিলেন। এই অবস্থায় ঐ সন্ধি দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। প্রথমতঃ উহাতে ভারতের আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তার রূপ ধারণ করে এবং উহাতে অপর জাতি-সকলের ভারত-বিরুদ্ধতাও ক্রমশঃ হালকা হইতে আরম্ভ করে। যাঁহাদের ভারতের উপর আক্রমণ করিবার ইচ্ছা ছিল তাঁহারাও সে ইচ্ছা দমন করিয়া অন্য পথের পথিক হইতে চলেন।

ঐ সন্ধি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং ঐ জাতীয় সম্বন্ধ গঠনের আন্তর্জাতিক মূল্য আরও উত্তমরূপে জগৎবাসীকে দেখাইয়াছে।"

"আমরা সোভিয়েটের সাহায্য খুবই মূল্যবান্ মনে করি।"

শ্রীযোগজীবন রাম বলেন যে ঐ সন্ধি ভারতকে আরও অধিক ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করিয়াছে। ইহা সম্ভব হইত না যদি না সোভিয়েট রাষ্ট্র ভারতকে আত্মীয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেন। অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সোভিয়েটের সাহায্যেই ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এইভাবে "আমাদের আত্মবিশ্বাস যতটা বাড়িয়াছে ততই আমরা পরমুখাপেক্ষিতার দুর্বলতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছি।"

তিনি সম্প্রতি মস্কো গিয়া কি করিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযোগজীবন রাম বলেন তিনি মার্শাল গ্রেচকো ও প্রধান মন্ত্রী কসিগিনের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন। এই সকল আলাপে ইহা বুঝা গিয়াছে যে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও অপরাপর বিষয়ে ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই।